অমৃত

CUK-H 4863-53-P35954

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

৩ জানুয়ারী ১৯৭৫ ॥ মূল্য ৬৫ পয়সা

(53)

অমৃত
খণ্ড - ১৪
সংখ্যা - ৬৪ - ৬৬, ৪
১৩৮১ - ১৩৮২

ডা-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক,
আর সুস্থ, সতেজ ও
উঠবে।

বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

যার সহায়
শীতে
তার ভয় কি?

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস

এক নতুন
অনুপম পাউডার!

সুপার ৭৭৭

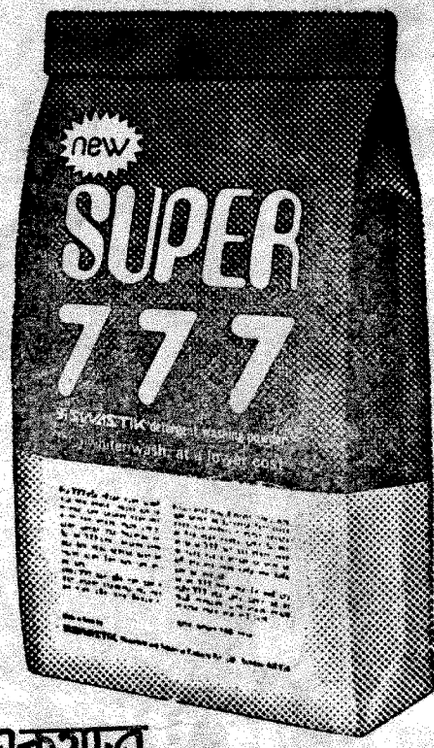

সোনালী রঙের একমাত্র
কাপড় ধোয়ার ডিটারজেন্ট পাউডার

সুপার ৭৭৭ করে
"সুন্দর সাদা!"

* অন্যান্য দামী ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার পাউডারের থেকে দাম অনেক কম।
* জল যে রকমই হোক—
কাপড় ধোয়া হয় চমৎকার।
* সাদা করার জন্যে নীল বা অন্য কিছু মেশাবার প্রয়োজন নেই।

**পয়সা বাঁচান,
বেশী সাদা করুন**

Shilpi-DM 10/74 BEN

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ১০৲
গৌরাঙ্গ পরিজন ১২৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
হিমালয়ের পথে পথে ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
অশান্ত ঘূর্ণি ১০৲
কলঙ্ক কথা ৮৲
ছিন্নপত্র ৭৲ ময়ূরমহল ৭॥০
ঝড় ১২৲ নিশিপদ্ম ৭॥০
নীলতারা ৭॥০ নূপুর ৬৲
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ১২৲
সেই মরুপ্রান্তে ১৩৲
কোমল গান্ধার (১ম) ১০৲
কোমল গান্ধার (২য়) ৯৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিযান ৯৲ যোগভ্রষ্ট ৯৲
সন্দীপন পাঠশালা ৯৲
সংকেত ৭৲ উত্তরায়ণ ৭৲
রচনাবলী (৫ম) ২০৲
রচনাবলী (৬ষ্ঠ) ২০

জরাসন্ধ
লৌহকপাট (অখণ্ড) ২৫৲
ছায়াতীর ৭৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৮৲

আশাপূর্ণা দেবী
যার যা দাম ৭৲
উড়োপাখী ৮৲

কালিদাস রায়
School Pocket Dictionary - 5.00

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপরাজিত ১৫৲ আরণ্যক ১০৲
আদর্শ হিন্দু হোটেল ৮৲
দেবযান ১০৲
দৃষ্টি প্রদীপ ৮৲
বিভূতি রচনাবলী (৪র্থ) ২০৲
" " (৫ম) ২০
" " (৬ষ্ঠ) ২০৲
" " (৯ম) ২০
" " (১২শ) ২০

সৈয়দ মুজতবা আলী
বড় বাবু ১০৲ টুনিমেম ১২
পছন্দ সই ৯৲ রাজাউজীর ১০৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিভূতি মুখোপাধ্যায়
রচনাবলী (১ম) ২০৲

সুমথনাথ ঘোষ
বনরাজিনীলা ১০৲
নীলাঞ্জনা ৯৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
নগর পারে রূপনগর ২৫৲
স্বয়ংবৃতা ৮৲
শতরূপে দেখা ২০৲

নলিনীকান্ত সরকার
দাদাঠাকুর ৮৲

বিমল মিত্র
একক দশক শতক ২০৲
সখী সমাচার ৮৲
কলকাতা থেকে বলছি ৮৲
বেনারসী ৮৲ কুমারী ব্রত ৬৲
শ্রেষ্ঠ গল্প ৮৲ স্ত্রী ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
বহ্নিবন্যা ১৩৲ দহন ও দীপ্তি ৮৲

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
ঠাকুরদার ঝুলি ৭॥০

প্রমথনাথ বিশী
কেরী সাহেবের মুন্সী ১৫৲
ভূদেব রচনাসম্ভার ১২৲

নীরদ সি, চৌধুরী
বাঙালী জীবনে রমণী ১২৲

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ৬৲

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

১৯৭৫ কেমন যাবে ও ভৃগুজাতক পঞ্জিকা ৪৲

বাজারে এই ধরণের কয়েকটি বই বেরিয়েছে। আমাদের প্রকাশিত বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য **ভৃগুজাতকের** বইটি কিনবার **সময় দুটি জিনিস লক্ষ্য করতে অনুরোধ করছি।** (১) বইটির শেষদিকে এক বছরের পঞ্জিকা দেওয়া আছে এবং (২) বইটির পিছন দিকে লেখকের ছবি দেওয়া আছে। সহৃদয় ক্রেতারা অবশ্যই এই দু'টি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেবেন।

অনিলেন্দ্রনাথ মিত্রের (মামাবাবু)

ব্যাডমিণ্টন ৪॥ ব্যাডমিণ্টন ও তার নিয়মকানুন ৫॥

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ৩৪-৮৭৯১

সবচেয়ে সাদা করার জন্যে

টিনোপাল®

সিন্থেটিক ও ব্লেনডেড কাপড়ের জন্যে

টিনোপাল®-এস

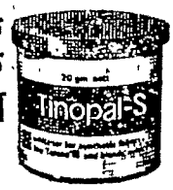

সুতীর কাপড়ের জন্যে

টিনোপাল®

® টিনোপাল সুইজারল্যাণ্ডের সীবা গায়গী লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
সুন্দর গায়গী লিঃ পোঃ অঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ৪০০০২০.

১৪ বর্ষ

অমৃত

৩৪ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

P 35,924

Friday, 3rd January, 1975 শুক্রবার ১ পৌষ ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	মীশুর পুতুল	(গল্প)	শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
১৪	পুনশ্চ		শ্রীক্ষণপনক
১৫	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবব্রত
১৭	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১৬	দেশে বিদেশে		পুণ্ডরীক
১৮	গোয়েন্দা ধাঁধা		শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
২০	সাপ	(কবিতা)	শ্রীপ্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
২০	ওভারহেড লাইন	(কবিতা)	শ্রীপরেশ মণ্ডল
২০	সহজীবন	(কবিতা)	সামসুল হক
২০	নাবকান্ডা ১৯৭২	(কবিতা)	শ্রীপরেশ মণ্ডল
২১	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২৫	যুবক-যুবতী		শ্রীঅমর দাশ
২৭	চিঠিপত্র		
২৯	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান		

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

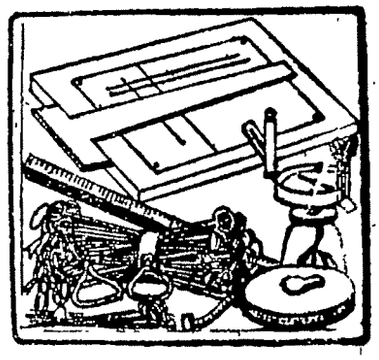

সার্ভে ড্রইং, নানা রকম কাগজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮ ৬৭-৪৬৬৪
গ্রামঃ [illegible] হাওড়া
পরিবেশক : [illegible]
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকৃমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন
কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম
মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন
প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না।
ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকএ
মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক
তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না
করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায়
আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
(কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা
রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক
প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকৃমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

যুগজয়ন্তীবর্ষ তৃতীয় সংখ্যার লেখকসূচী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বঙ্গদর্শন/সূচনা) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনা) হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ), রমা চৌধুরী (রসেশ্বর দর্শন), রমেন্দ্রনাথ মল্লিক (গীতি-কবিতার আলোকে রামমোহন), সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (শিবাজী ও তাঁর রাজ্যাভিষেক) ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক (বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু), অপূর্ব সান্যাল (টেম্পেস্ট সমালোচনা ও রবীন্দ্রনাথ) বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (মহাকবি মিলটন) জয়ন্তকুমার দাস (ডব্লু বি ইয়েটস্), ধীরেন্দ্র দেবনাথ (রবীন্দ্র-উপন্যাস জীবনভাবনায় সূত্রসন্ধান), শিবদাস চক্রবর্তী (গ্রন্থসমালোচনা)।

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র । প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

মহাত্মা শিশিরকুমারের

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

নিমাই সন্ন্যাস

(নাটক) ২য় সংস্করণ ২.০০

নরোত্তম চরিত

৩য় সংস্করণ ২.০০

লর্ড গৌরাঙ্গ

(২২টি খণ্ডে) (ইংরাজী) প্রতি খণ্ড ৩.০০

নরোত্তম চরিত

(হিন্দী) ২.০০

প্রাপ্তিস্থান : পত্রিকা ভবন

—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩০	শ্রীঅরবিন্দ অরণে	শ্রীদিলীপকুমার রায়
৩২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	শ্রীজ্বৎকারু
৩৪	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৩৬	রত্না কয়ে দেখলে	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৩৭	শেষ বিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিবিন্দ্র নন্দী
৪১	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৩	অদৃশ্য জট (গল্প)	শ্রীসুবন্ধু ভট্টাচার্য
৪৭	ক্রিকেটের রাজা সোবার্স	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৪৯	টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	শ্রীঅজিতকুমার রায়
৫১	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅময়
৫৩	মাঠের নায়ক	শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫	খেলাধুলা	শ্রীদর্শক
৫৭	প্রেক্ষাগৃহ : ফ্লোর থেকে বলছি	স্টুডিও সংবাদদাতা
৫৯	স্টুডিও সংবাদ	
৬১	বায়োস্কোপিক	শ্রীবন্ধন মজুমদার
৬৫	নাট্যমঞ্চ	
৬৭	চিত্র সমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৬৮	বিদেশী ছবি	শ্রী শা, রু, চ
৬৯	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৭১	জলসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীনির্মল সাহা

সাহিত্য সংসদ -এর

অভিধান গ্রন্থমালা

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত

SAMSAD STUDENT'S ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

ছাত্রদের অহরহ ব্যবহারের যোগ্য সহজ বহনীয় শব্দকোষ।
[মজবুত সাধারণ বাঁধাই ১১.০০। বোর্ড বাঁধাই ১৪.০০]

SAMSAD ENGLISH- BENGALI DICTIONARY

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ। শব্দের উচ্চারণ ইংরেজি ও বাঙলায়-প্রতি শব্দের ব্যুৎপত্তি। [বোর্ডে মজবুত বাঁধাই ২৫.০০]

SAMSAD BENGALI- ENGLISH DICTIONARY

অর্ধলক্ষাধিক শব্দ ও শব্দসমষ্টি। পূর্ণাঙ্গ অভিধান। [বোর্ডে মজবুত বাঁধাই ১৬.০০]

সংসদ বাঙ্গলা অভিধান

তৃতীয় সংস্করণ। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীদীনেশ ভট্টাচার্য সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ কোষগ্রন্থ। [বোর্ডে মজবুত বাঁধাই ১৫.০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯

শীঘ্রই প্রকাশিত হয়েছে
গ্রন্থ সাহেবার ১ম অংশ

জপজী মূল্য—১.২৫ পঃ

অনুবাদ : কবি অমর চক্রবর্তী
প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা

কুমারেশ ঘোষের

॥ রঙ্গ-ব্যঙ্গের নাটক ॥

ম্যানিয়া (ছেলেদের)	৩.৫০
ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল (মেয়েদের)	৪.০০
চক্র (ছেলেমেয়েদের)	২.৫০
যম (বড়দের)	২.৫০
বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস (ঐ)	যন্ত্রস্থ

গ্রন্থ - গৃহ
৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

RUPA PAPER BACKS

NOVELS

Knut Hamsun	
GROWTH OF THE SOIL	5.00
HUNGER, 3rd Edition	5.00
PAN	2.50
Thomas Mann	
THE TRANSPOSED HEADS AND THE BLACK SWAN 2 novels in 1 volume	3.50
Ivo Andric	
THE VIZIER'S ELEPHANT 1) Zeko 2) Anika's time 3) The Vizier's Elephant 3 novels in 1 volume	6.00
Bimal Jyoti Das	
THE ROSE & THE LILY	7.00
Anita Desai	
CRY, THE PEACOCK	5.00
Anais Nin	
CHILDREN OF THE ALBATROSS and THE FOUR CHAMBERED HEART 2 novels in 1 volume	4.50
Goethe	
KINDRED BY CHOICE	4.00
THE SUFFERINGS OF YOUNG WERTHER	2.50
Will Durant	
TRANSITION	4.75
John Cowper Powys	
ALL OR NOTHING	3.00
Rene Puissesseau	
SOMEONE WILL DIE TONIGHT IN THE CARIBBEAN	2.50
Johan Bojer	
THE GREAT HUNGER	3.00

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 012

Also at:
Allahabad : Bombay : Delhi

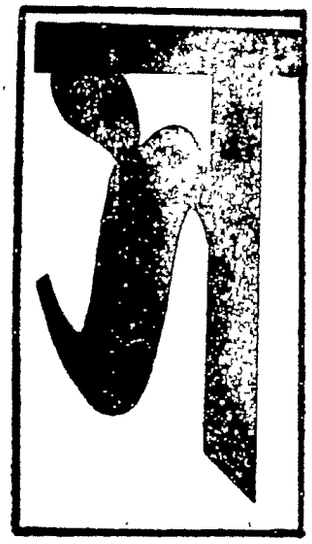

সম্পাদকীয়

নববর্ষ

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই অমৃতের সকল শুভানুধ্যায়ীদের। নতুন বৎসর সকলের জীবনে আনুক নতুনতর সম্ভাবনা ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ। দুঃখ দৈন্য ও হতাশার স্মৃতি জীর্ণ পাতার মতো মিলিয়ে যাক পুরাতনের বিস্মৃতির অতলে। অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব গোটা পৃথিবীতেই অনেক ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের ছায়াকে করেছে গাঢ়তর। গরীব দেশগুলো তো বটেই সচ্ছল দেশগুলোও এই সংকট থেকে মুক্ত নয়। তবুও মানুষের অগ্রগতির প্রচেষ্টার বিরাম নেই। সে চেষ্টা সামলে চলবে না। কারণ এগিয়ে না যাওয়ার অর্থ হল পিছিয়ে পড়া। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষকে যে-ক্ষমতা এনে দিয়েছে তাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে সুন্দরতর ও বাসযোগ্য করতে হবে।

ঔপনিবেশিকতার বন্ধনে আবদ্ধ দেশগুলোতে মুক্তিসংগ্রাম অব্যাহত চলেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পর্তুগালের মতিগতি পরিবর্তন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে পর্তুগালে চলছিল একনায়কতন্ত্রী শাসন। নিজের দেশের জনতার কণ্ঠরোধ করেই তারা ক্ষান্ত থাকে নি। আফ্রিকায় ছিল তাদের বিরাট উপনিবেশ। পর্তুগালে একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা দখলের পরই আফ্রিকায় উপনিবেশের মুক্তিদানের সংকল্প তাঁরা ঘোষণা করেন। গিনি-বিসাউ মুক্ত হয়েছে; মোজাম্বিকের মুক্তি আসন্ন। অ্যাংগোলাও মুক্ত হবে। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে নতুন পর্তুগীজ সরকার ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। পর্তুগীজ বিদেশমন্ত্রী ভারতে মৈত্রী সফরে আসবেন শিগগিরই।

এদিকে আমাদের এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চলছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে। আমাদের দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অনেক দূর প্রসারিত। ভারতবর্ষ তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে যে আগ্রহের পরিচয় দিয়েছে তার ফলেই শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠায় ও যত্নে পরমাণু বিস্ফোরণ গত বৎসরের একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রতিবেশীদের আশংকা দূর করার জন্য ভারত সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, শান্তিপূর্ণ কাজেই এই শক্তি ব্যবহার করা হবে, অস্ত্র নির্মাণ করা হবে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি কার্যত পূব ও পশ্চিম উভয়ই মেনে চলছে বলতে হবে। দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র রাশিয়া এবং আমেরিকা বার বার নিজেদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করে উত্তেজনা হ্রাস করছে। চীনও আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে আগ্রহী। এ সবই আগামী বছরের পক্ষে আশার কথা। তবে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা হল দারিদ্র্য ব্যাধি এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এই কাজে সমৃদ্ধ দেশগুলোর সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। কিন্তু এখনও সমৃদ্ধ দেশগুলোর বিবেক জাগ্রত হয়েছে বলে মনে হয় না। আমেরিকা তো সাফ বলে দিয়েছে যে সে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য রাষ্ট্রসংঘ তহবিলে কিছু দিতে পারবে না। যদি দিতে হয় সে নিজে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করে দেবে নয়তো নিজের পছন্দমত সংস্থার মারফৎ। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করাতেই আমেরিকা এত খড়্গহস্ত। রাষ্ট্রসংঘ যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং যাঁদের হাতে ভিটো তাঁরা যদি এভাবে রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে অসহযোগিতা করে তাহলে এই বিশ্বসংস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। তা সত্ত্বেও ভারত ও এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দারিদ্র্য, জনসংখ্যার চাপ কিংবা খাদ্যাভাব যে কোনো সমস্যা সমাধানেই আজ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আগের চেয়ে বেশী দরকার। নতুন বছরে সেই সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে, এই আশাই আমরা করব।

যীশুর পুতুল

বীরেন্দ্র দত্ত

মাঝে মাঝে সশব্দ বর্ষণসহ গত তিন দিন বেশ ঝড় বয়ে গেছে। ফিন ফিনে পাতলা কাগজের মত উড়াল কিছু মেঘে এই সকালে বৃষ্টিও হতে পারে, কিন্তু জমাট চাপা দিগন্তজোড়া সাদা মেঘে চারপাশ থমথমে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই কবিতার তাই মনে হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর গিরিশংকরের গজগজ কণ্ঠস্বর কানে এল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। পাশে শুয়ে-থাকা স্বামী দেবেশকে দেখেই মনে মনে বিড়বিড় করল, 'বড়দিভাই কি আজ এখনো ওঠেন নি?' ঘড়ির দিকে তাকাল। এখন সাতটা।

গিরিশংকর আবার চীৎকার করলেন, 'ব্যাপারটা কী? আমাকে এখুনি বেরুতে হবে চা-টা তার আগে পাবো না?' এই বয়সেও বাড়ির সকালের দুধ-আনা বাজার দোকান সব নিজে করেন গিরিশংকর। সব সেরে চা-টা ঠিক সময়ে ওঁর চাই।

'কেন চেঁচাচ্ছ সকালবেলা? কে তোমার চাকরাণী আছে যে এমন সাত সকালে প্রত্যেক দিন চা যুগিয়ে যাবে মুখের সামনে? বাইরে গিয়ে খেয়ে নাও। যোগমায়া দেবী চাপা কণ্ঠে শাসন করলেন স্বামীকে।' যতো বুড়ো হচ্ছ ভীমরতি হচ্ছে তোমার। পোড়া সংসারের হাল দেখছ না। নাকি কানা?

কবিতা দরজা খুলে বাইরে এল। পুরনো জীর্ণ দোতলা বাড়ি। ড্যাম্পের ভ্যাপসা গন্ধ সকালের আবছা অন্ধকারে মিশে কবিতার মুখ চোখ ঢেকে দিল। দোতলার বারান্দা ধরে একটু এগোতেই পাশে মেজদিভাই-এর ঘর চোখে পড়ল। দরজা আধ-ভেজানো। তিন মেয়েকে সামনে নিয়ে চা খাচ্ছে। মেঝের ভাঙা কাপ তোবড়ানো বাটি ছড়ানো। বিছানায় মেজভাসুর নেই, বোধ হয় ভোর হতেই জোর করে তুলে কোন কাজে পাঠিয়ে দিয়েছে বাইরে মেজদিভাই। কবিতার খারাপ লাগল। গতকাল রাত্রের তুমুল ঝগড়ার জের সকাল থেকেই শুরু হয়েছে। এখন কিছু বলতে যাওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া নিত্যনৈমিত্তিক ছোট-বড় ঝগড়ায় নিয়ম হয়ে গেছে কেউ কারোর ঘরে ঢোকে না, কথা বলাও প্রায় বন্ধ, বললেও ঘুরিয়ে। অন্তত কবিতা বছর চারেক আগে এ বাড়ির বউ হয়ে ঢোকার পর থেকেই দেখছে।

নীচে নামার সিঁড়ির কাছে এল কবিতা। সিমেন্ট বাঁধানো সরু সিঁড়ি। জলের ছিটে লেগে মোটা শ্যাওলা-ধরা। দেয়াল থেকে হাত সরিয়ে নিল। বালি ঝুরঝুর করছে। নীচে থেকে মুখ ধুয়ে উঠে আসছে মনু—বড় ভাসুরের মেয়ে। চোখাচোখি হল।

'মা ওঠেন নি এখনো?

কাল রাত থেকে যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না।

ও। কবিতা গলায় শব্দ করল। বাবা চা চাইছেন তাই ভাবছি বড়দিভাই তো অনেক আগে ওঠেন, কি হল? একটু থেমে বলল, ঠিক আছে আমি দেখছি। নীচে নেমে এল কবিতা।

গিরিজাশংকর বেরিয়ে এলেন বাইরে। বাইরে যাবার জন্যেই তৈরী হয়েছেন।

আপনি একটু বসুন, আমি চা করে দিচ্ছি। কবিতা শ্বশুরের দিকে না তাকিয়েই বলল।

থাক মা, বাড়ির নিয়ম যখন বদলাচ্ছে তখন যে যার নিজের মত করেই বদলে নিক। আমি এবার থেকে চা-ট বাইরেই খেয়ে নেব। প্রায় আশি বছরের শক্ত-সমর্থ বৃদ্ধ এক অদ্ভুত অভিমানে দৃপ্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন কবিতাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই। গায়ের লোম, মাথার চুল গোঁফ সব শাদা। কবিতা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শ্বশুরের চেহারা, চলে-যাওয়া দেখল।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে খুড়শ্বশুরের একমাত্র ছেলের বউ বাণী। দেখে মনে হল উঠেছে অনেকক্ষণ। কবিতা আড়চোখে একবার দেখে নিল। কথা বলল না। কবিতাকে নোংরা হিংসে করে সেজদিভাই। তাই খুব দরকার না হলে কথা বলে না। বাণী রান্নাঘরে ঢুকল।

বৌমা! যোগমায়া দেবী ডাকলেন।

আমায় বলছেন? কবিতা শাশুড়ীর ঘরের দিকে একটু এগোল।

তোমায় নয় তো কাকে? থামলেন, যোগমায়া দেবী। মেজবৌমা তো দেখলুম উঠেছে অনেক ভোরে। কমলকে চা করে খাওয়ালো, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিজেও খেল। শ্বশুরকে একটু দিতে পারল না? একটু থেমে যেন নিজের মনেই বললেন, আমি যে আর তেমন চলাফেরা করতে পারি না। পারলে ছেলের বউদের তোয়াক্কা করতুম নাকি?

থাক মা, সকালে আর এ সব নিয়ে কথা তুলবেন না। কবিতার কণ্ঠস্বর চাপা, ভয়ার্ত। রান্নাঘরে সেজদিভাই যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। এখন শাশুড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেই আরও কথা তৈরী হবে, গড়াতে গড়াতে ছড়িয়ে পড়বে স্রোতের মত। তাই কবিতা দ্রুতপায়ে কলঘরের দিকে এগোল। আজ ওকেই এখুনি রান্নাঘরে ঢুকতে হবে।

কলঘরে কবিতার মুখ ধোয়ার শব্দ হতেই বাণী এক ফাঁকে বেরিয়ে এল বাইরে। যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি ত্রস্তপায়ে ওপরে উঠে এল।

এই শোন। মেজবৌ শান্তা ডাকল বাণীকে। ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, মা কি বলছিলেন?

তুমি নাকি ভোরে উঠে চা করেছ? শ্বশুরকে দাও নি?

মাকে কে বলল?

কে আবার। আমার মনে হয় ও-ই তোমায় দেখে গিয়ে লাগিয়েছে'

কিন্তু আমার তো দেওয়ার কথা নয়? কেন, ওঁদের বিনি আদরের বড়বউ তিনি গেলেন কোথায়? তিনিই তো সব সেবাযত্ন করেন! তাঁকে বলছেন না কেন? হুঁ, আদেখলেপনা আর কত দেখব। চোয়াল শক্ত করে থামল শান্তা। তা ছাড়া সংসারের চা-চিনি-দুধ কোথায়? কোত্থেকে দেব? সংসারের জন্যে টাকা ঢালব, আবার নিজেদেরটাও দেব! আমি দিই নি বলে কত কথা। আমি নাকি পয়সা জমাই! না থাকলে আমার মেয়েগুলোকে দেখবে কে?

থাক মেজদিভাই। ঝগড়ার মধ্যে যেও না, ভাল লাগে না।

ঝগড়া আমি করেছি? তুমি তো দেখেছ, কাল বিকেল থেকে আমাকে কি না বলেছে!

থাক না, চুপ করে যান। একটু উৎকর্ণ হল বাণী। ছোট আসছে বোধ হয়। ওকেই তো মা বলছিলেন। একটু থেমে বলল, আমি ছাদে যাই। বলেই বাণী অদৃশ্য হল।

শান্তা গজ গজ করছে, সব সমান। বাইরে ভাল, ভিতরে কি তা জানা আছে। শান্তার ঠোঁটে শ্লেষের হাসি। আমরা খারাপ মুখের ওপর সব বলে ফেলি, এই যা।

কবিতা শুনছে কি শুনছে না বোঝা গেল না। নির্বিকারভাবে ঘরে ঢুকে জানালার সামনে দাঁড়াল।

তেতলার সবটাই ছিল ছাদ। চিলেকোঠা ঘরও ছিল না। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, শোয়া-বসা-পড়াশুনোর জায়গা পায় না বলে একখানা ঘর করেগেটের ছাদ ঢেকে তৈরী করল বড় ছেলে নিখিলেশ। দেখাদেখি মেজ-জায়ের চাপে পড়ে কমলেশও ঘর করে নেয়। ওদের কাকার ছেলে সরোজ। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাকা-কাকিমা অনেকদিন হল মারা গেছেন। সরোজও কবিতাদের ঘরের ছাদে একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছে। ওদের পুরনো ঘরটা নীচের তলায়।

ছাদের ঘরে ঢুকেই বাণী বলল, জান তো, সকাল থেকেই আবার লাগছে।

সরোজ প্রেসের কম্পোজিটর। বাঁধা মাইনের কাজ ছাড়াও ওভার টাইম হিসেবে ঠিকে কাজও করে। বেবুবে বলে থমথমে আকাশ দেখছিল। বলল দেখ তো, ছাতা নিয়ে বেরুব?

হঠাৎ মাথা গরম হল বাণীর। তুমি কিছু বলছ না যে!

কি বলব?

এ বাড়ি ছাড়বে না? বাড়ি করার তো মুরোদ নেই, একটা ফ্ল্যাট কেনারও তো চেষ্টা করতে পার!

হাসল সরোজ। মশা আবার পাখি! প্রেসের কম্পোজিটার, তার আবার ফ্ল্যাট কেনা! বাজারটা দেখেছ? সংসারই চলে না' একটু থেমে চোখের দৃষ্টি চশমার পুরু লেন্সে রেখে তাকাল বাণীর দিকে। বিশ্রী ভেঙানোর মত মুখভঙ্গি করে বলল, এ বাড়িটা ছাড়ো, আর অন্যে ভোগ করুক। ছাড়লেই বেওয়ারিশ তখন? সরোজের চোয়াল-ভাঙা বুক বুড়োটে মুখ কেমন হঠাৎ যেন বহু-দিনের জমা বিরক্তিতে ভয়ংকর হয়ে গেল। তোমাদের ওই মেয়েলি ঘ্যানঘ্যানানি শুনিও না যত্তো সব—।

বাণী সরে গেল সরোজের কাছ থেকে। জানালায় মুখ চেপে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। দু চোখের পাতা ভিজে, ভারী। অসহায় অভিমান সামলে যেন নিজের মনেই বলল, 'ছোট ভাইয়ের মত নির্বিকার হতে চাইছ? আগে ছোট ভাইয়ের মত উপায় করতে শেখ, তবে হবে। সংসারে যাদের হাতে প্রচুর টাকা থাকে, তাদের নির্বি-কার হওয়া সাজে।' থামল বাণী। 'কি আছে, ছোট ভাইয়ের মত লেখা-পড়াও শেখনি।'

এরপরেই একটা ধমকের শব্দ কানে এল কবিতার। সরোজ চেঁচিয়ে উঠেছে। তার-পরের কোন কথা শোনা গেল না। তিন তলায় সরোজের ঘরটা ঠিক কবিতাদের ঘরের ওপরে বলেই এতক্ষণ স্পষ্ট কথাগুলো কানে আসছিল। বাণীকে অদ্ভুত লাগে। কিছুতেই সহ্য করতে পারে না ওদের। কবিতা আপন মনে হাসল। সিঁড়িতে সেজ-ভাসুরের পায়ের শব্দ ক্রমশ নামছে। কবিতা পিছন ফিরল। উপুড় হয়ে শুয়ে-থাকা দেবেশের দিকে চোখ পড়ল। মানুষটা যেমন সমস্ত বিষয়ে নির্বিকার, এর শোয়া-ঘুমোনও তেমনি। এখনি তো উঠবে, মুখ-হাত ধুয়ে চা হল কি হল না জেনে নিয়ে বেরিয়ে যাবে বাইরে। পুরনো বাড়ির দেয়াল কত পুরনো হল, কত ঘুণ ধরেছে, একদিনও তা দেখে না। পুরুষ মানুষ বুঝি এই রকমই ভাল? চার বছর ধরে দেখছে মানুষটাকে। কবিতা হাসল। দেবেশের হাতের শক্ত মুঠি বুক পিঠে দুই ঠোঁটে চোখ বুলোল। নাকের নীচে সিঁদুর লেপটে আছে, আঙুলের ডগায়ও। চকিতে নিজের ঠোঁটে আঙুল বোলালো। কি ভেবে পরার কাপড় বদলাতে লাগল। এখনি রান্নাঘরে ঢুকবে।

কবিতা উনুন সাজিয়ে কাগজ জ্বেলে ধরিয়ে দিয়েছে, মনু সামনে এসে দাঁড়াল। 'ছোট্‌কাকিমা, আঁচটা উঠলে বোলো, মা আসবে।'

'দরকার কি? মায়ের যখন এত শরীর খারাপ।' একটু থামল কবিতা। 'বরং তুমি এসো এক সময়ে। আবার তোমারও তো কলেজ, টিউশনি—'

'তাতে কি? আচ্ছা মাকে আমি বারণ করছি। তুমি বরং আমাকে ডেকো। ছাদে আছি। একটা দিন তো!'

'তাই ডাকব।'

মনু চলে গেলে কবিতা আনাজ কুটতে বসল বাইরে। চুন-বালি খসেপড়া দেয়াল, ড্যাম্প-শ্যাওলায় নোংরা, ফেটে চৌচির মেঝেয় ঘুপসি রান্নাঘর। উনুন জ্বললে বসা যায় না। বাইরেও ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে, মেজ-জা শান্তা পায়ে শব্দ তুলে সামনে এসে দাঁড়াল।

'ছোট, বলে রাখি, বড়দিভাই রাঁধলে আমি এখানে খাব না, আমার ছেলেমেয়েরাও না।'

কবিতা আচমকা প্রস্তাবে কি বলবে ভেবে পেলো না। নির্বিকার তাকিয়ে রইল শান্তার দিকে।

'তুমি রাঁধছ?'

'হ্যাঁ।'

'তবে এই যে শুনলাম, বড়দি রাঁধবেন। সেজ বলছিল। তা যদি হয়, আমি ঘরে স্টোভ জ্বেলে রেঁধে নিচ্ছি। এই বলে গেলুম।' যেমনভাবে এসেছিল, সেই ভাবেই দৃষ্টির আড়াল হল শান্তা। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, পিছু পিছু বাণীও অদৃশ্য হল।

এমন ঝগড়া নতুন নয়। বছর চারেক আগে এ বাড়িতে প্রথম ঢোকার কদিনের মধ্যেই কবিতা বুঝেছিল। দিনের পর দিন নিত্য নতুন অভাবের মধ্যে ক্রমশ ভাঙতে ভাঙতে চার ছেলে মেয়ে নিয়ে বড়জা ব্যতি-ব্যস্ত। মেজজা শান্তার তিন মেয়ে। বড়-জার সঙ্গে মেজজার সম্পর্ক তেমন সহজ নয়। মেজ ভাসুর কমল সামান্য মাইনের চাকরী করত। ইউনিয়নের গোলমালে হঠাৎ চাকরী চলে যেতে বেশ কিছুদিন বেকার থাকার পর এখন কিছু ফুটকা

করেন। কবিতা নিজের বুদ্ধিতেই আন্দাজ করেছিল, দেবেশও দাদার স্মাগলিং-এর কথা ওকে বলেছে। বেশ কিছু কাঁচা টাকা হাতে আসে মেজজা বাড়িতে তো নয়ই, কাউকেই বুঝতে দেয় না। কোথায় যেন জমি কিনেছে। সেজ বাণী এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে কোনরকমে সংসার চালায়। বাপের বাড়ির সচ্ছল পরিবেশে আদুরে ছোট মেয়ে ছিল বাণী। তারই স্মৃতি এই ধ্বংসে যাওয়া শ্বশুর বাড়িতে দুষ্টক্ষতের মত সেজ-জায়ের স্বভাবের মধ্যে কি তৈরী করে দিয়েছে? অহংকার, দম্ভ দেমাক? নাকি ভয়ংকর অসহিষ্ণুতার মধ্যে নোংরা হিংসা?

কবিতা সচেতন হল। বাঁ হাতের আঙুলটা হঠাৎ একটু কেটে গেল। ডান হাত দিয়ে কেটে যাওয়া জায়গাটা চেপে ধরে কবিতা চারপাশ দেখল। বেলা হয়েছে তবু বাড়ির থমথমে পরিবেশ এতটুকু সরে নি। দেবেশ এখনো ঘুমচ্ছে। হাসল কবিতা। ভাইদের মধ্যে এমন সুখী কিসে? বি-কম পাশ সুন্দর দেখতে, ব্যাঙ্কের চাকরী—এ সবের মধ্যেও দেবেশ নিজের স্ত্রী ছাড়া বাড়ি আর বাড়ির বাইরে অদ্ভুত নির্বিকার। কাল বিকেলে অফিস-ফেরত অমন নোংরা ঝগড়া, গোলমালের মধ্যেও।...

শান্তা। শৈলজা শান্তার ঘর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। সাবানদানিটা ভুল করে কলঘরে রেখে এসেছি দীপু ওটা মাখল। ও জানে ওর গায়ে নোংরা ঘা আছে। সাবা বাড়ি ছড়াবে।

কি যা তা বলছেন বড়দি? ও কেন মাখতে যাবে? ও তো নিজের সাবান নিয়ে কলঘরে ঢুকেছে, আমি দেখেছি।'

আমি কি মিথ্যে বলছি? শৈলজার কণ্ঠস্বর শান্ত সংযত।

কি জানি। কাকে যে বিশ্বাস করি।'

শান্তার বলার ভঙ্গিতে শৈলজা চাপা সূক্ষ্ম অপমান বোধ করল। মেয়েকে জিজ্ঞেস করে দেখ। তারপর বলবে। নতুন দামী সাবানটা এবার ফেলেই দিতে হবে। ধীর পায়ে নিজের ঘরে ঢুকল শৈলজা।

আমরাও দামী সাবান ব্যবহার করি। শৈলজা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হতেই শান্তা ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখটায় এসে ডাকল, দীপু। তাড়াতাড়ি নীচে আয় তো। বছর পনেরোর রোগা লম্বা দীপু দোতলায় এসে দাঁড়াতেই শান্তা চড়া গলায় বলল তুই আজ বিকেলে কার সাবান মেখে গা ধুয়েছিস?'

দীপু থতমত খেল প্রথমটা। আমাদের সাবানের টুকরোটা ঝাঁকরির মধ্যে পড়ে গেছে। জ্যাঠাইমারটা একবার নিয়েছিলুম।

যেন ধাকরা খেল শান্তা। কেন নিতে গেছিস? লজ্জা করে না তোর? বলতে বলতে দীপুর সামনে এগিয়ে এল। ঠাস করে একটা চড় বসাল গালে। তোরা কি সাবান মাখতে পাস না। এমন হা-ঘরে বৃত্তি কেন?'

'আর মারছেন কেন মেজদিভাই। এত বড় মেয়ে!' কবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল

'থাক ছোট আমার মেয়েদের এত আদর দেখাতে এসো না। কথা তো আমাকেই শুনতে হচ্ছে।'

কবিতা কথা বলল না। দীপু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই শৈলজার ঘর। কোন শব্দ নেই। এমন নিরাসক্ত নীরবতা যেন ব্যংগ করছে শান্তাকে। 'আর কোনদিন যদি ওদের জিনিসে হাত দিস মেরে ফেলব।' থামল শান্তা। 'ভাল সাবান মেখে ফুলেল-ফুলেল হয়ে ছাদে দাঁড়াতে চাও? ঝুনুর মত ছেলে ধরার শখ হচ্ছে বুঝি? যেমন দিদি!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল শৈলজা। 'যা তা কথা বোলো না মেজ। নিজের মেয়েকে শাসন করছ করো আমার মেয়েকে নিয়ে নোংরা কথা বোলো না।'

'নোংরা কথা? আমার মেয়ে গায়ে ঘা বলে দশটা কথা শুনিয়ে গেলেন আর নিজের মেয়ের ভিতরে ঘা শুধু হয়েছে। মজাচ্ছে সারা বাড়ি।' চেঁচিয়ে উঠল শান্তা গজগজ করল। 'সামান্য একটু সাবান মেখেছে তাতে এত—ছিঃ।'

মেজবৌমা সন্ধ্যেবেলায় এত চেঁচাচ্ছ কেন?' যোগমায়াদেবী নীচে থেকে চীৎকার করে উঠলেন। 'তোমরা কি কেবল ঝগড়াই করে যাবে?'

'কে ঝগড়া করছে দেখে যান। আপনি তো আমাকেই শুধু ঝগড়া করতে দেখেন।

শৈলজা ভিতরে কাঁপছে থরথর। 'ঝগড়া আমি করতে আসিনি মেজ। কিন্তু আমার মেয়ের সম্বন্ধে তুমি কোন কথা বলবে না।'

'কেন মারবেন নাকি? শ্বাশুড়ী-বৌ মিলে বুঝি তাই করবেন।'

'ভদ্রভাবে কথা বলো মেজ।'

'ভদ্রতা আর শেখাতে এসো না। বংশের খবর নিলেই বোঝা যেত। কে কত ভদ্র তা জানা আছে বলতে বলতে নিজের ঘরে ঢুকল শান্তা। ছোট মেয়ে নীপা কি করছিল ঘরে। কোণে কাঁচের স্লেট পড়ে টুকরো হয়েছে। শান্তা রেগে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল 'কি করছিস রে এখানে?'

'দিদি একবার পেনটা চাইছিল!' ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে নীপার।

'পেন চাই? একটা জিনিসও আস্তো রাখা যাবে না তোদের জন্যে। বেরো এখান থেকে।' বলেই ঘাড় ধরে ঠেলে দিল শান্তা নীপাকে। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল চৌকাঠে। ঠোঁট কেটে গেছে। তারই ওপর একটানা মারতে লাগল পিঠে। যেন শুধু শৈলজাকে নয় সারা বাড়ির বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ জানিয়ে শাসন করছে শান্তা।

এরই মধ্যে যোগমায়াদেবী ওপরে উঠে এসেছেন। 'ও কি করছ বৌমা মেয়েটা যে মরে যাবে!'

'আপনাকে বলতে হবে না যান।'

'তা বলে এমন করে মারবে অকারণ। এতো দেখতে পারি না।'

'দেখতে হবে না। আমরা এখান থেকে চলেই যাবো। আমরা চোর মিথ্যেবাদী।' মেয়েকে মারতে মারতে হাঁপাচ্ছে শান্তা। কথার শেষদিকে কেঁদেই ফেলল। শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দরজা বন্ধ করল। শব্দ করে খিল দিল।...

কাল সারা রাত কিছু খায়নি শান্তা। আনাজ কুটতে কুটতে কবিতার কথাটা মনে পড়ল আজও সেই ঝগড়ার জের জীইয়ে রাখতে চাইছে। কি হবে কে জানে! সিঁড়িতে মনুর নীচে নামার পদশব্দ কানে এল। কবিতা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

দুপুরে নিখিলেশ খাওয়া-দাওয়ার পর শৈলজার সামনে এসে বসল। শৈলজা বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল।

'শৈল, দেখেছ দিনের পর দিন আমাদের সংসারটা কেমন নীচে নেমে যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে কি নেমেই তো গেছে।'

'অথচ আমাদের শেষ ঝুনু হওয়া পর্যন্ত বাড়িটা কি হাসিখুশি ছিল।'

'মেজটা তো আর থাকতে দেবে না! খুব পয়সা জমাচ্ছে তো।'

'কিন্তু শান্তার কথাই ভাবো। পিঠোপিঠি ঝুনু দীপু সরোজের মেয়ে কণা। যখন তখন ওদের নিয়ে তোমরা একসঙ্গে কি না করতে। ঝুনুটা তো শান্তার কাছেই দিনরাত পড়ে থাকত।' একটু থামল নিখিলেশ। 'এই বছর বারো-তেরোর মধ্যে কেমন সব বদলে গেছে। তুমিই কি ভাবতে পারতে মেজ তোমার সঙ্গে এমন ঝগড়া করবে? সংসারটায় এমন পচা পাঁকের গন্ধে টেকা যাবে না।' নিখিলেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ---- ১৪'০০
২। গুল বাগিচা ----৩'৫০, ৩। কাব্য আমপারা--৪'০০
৪। পূবের হাওয়া----২'০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি--২'০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

শৈলজা পাশ ফিরে শুল। 'আমার আর ভাবতে ভাল লাগে না।'

'আসলে তুমিও ভয়ংকর অধৈর্য হয়ে পড়েছ! অসহিষ্ণুতা দুঃখ যন্ত্রণা বাগে আমরা প্রত্যেকেই কোথায় নামছি দেখেছ?' নিখিলেশ উত্তেজিত কিন্তু ক্লান্ত।

'হবো না! দুটো ছেলের কিছু করতে পারলে তুমি? মেয়ে দুটোরও তো বিয়ে দিতে হবে! কাপড়ের দোকানে বসে আমায় সারাজীবন তুমি কি দিতে পেরেছ বল।'

নিখিলেশ একেবারে চুপ করে গেল। এ অভিযোগ তো দশ-বারো বছর ধরে ক্রমাগত অনেকবার করেছে শৈলজা। কিছুই দিতে পারেনি বরং ঘুণধরা মেরুদাঁড়া নিয়ে নিখিলেশ অনেক নুয়ে পড়ছে।

পাশের ঘরে শান্তা মেঝেয় বসে কমলেশের সদ্য আনা দশ টাকার এক হাজার নোট গুণছিল মন দিয়ে।

আগের কোন কথার জের টেনেই কমলেশ বলল 'সামান্য সাবান নিয়ে ঝগড়াটা তুমি না বাড়ালেই পারতে!'

'তোমার মেয়েই তো যত নষ্টের গোড়া।'

'তা ওকে তো একটা ভাল সাবান কিনে দিতে পারো। বরং ওদের থেকে দামী কিনলে তোমারও মান থাকত। বুঝিয়ে দিতে ওদের যে তুমিও এসব কিনতে পার!'

টাকা গোনা শেষ করে শান্তা দম ফেলল এবার। কমলেশের দিকে তাকিয়ে বলল 'তোমার বুদ্ধি তো? এই বকমই! একটা ভাল সাবান কেনো সংগে সংগে ওদের চোখ টাটাবে। বলবে পয়সা হয়েছে সংসারে আরও পয়সা ঢাল। শ্বশুরমশাই তো অভাব হলেই চাইবেন! ভাল উপায় করছ যখন। দেখছ আমি কত চেপেচুপে থাকছি। একটুও বুঝতে দি ওদের?' গলা ফিসফিস করল শান্তার।

স্ত্রীর যুক্তি অকাট্য বুঝতে পেরে কমলেশ সস্তা দামের সিগারেটটা সুখ টান দিয়ে বাইরে তাকাল।

দুপুরেও ফিরতে পারেনি সরোজ। প্রেসের বাঁধা কাজ ছাড়াও ঠিকে কাজও করে ও অন্যান্য প্রেসে। টাকা দরকার তাই বাড়িতে সুস্থির হতে পারে না। বাণীর একটি মাত্র ছেলেকেই প্রেসের কাজ শেখাচ্ছে বলে বাবা সংগে নিয়ে যায়। বাণী একা-একা ঘরে শুয়ে করে তার ঘর হবে একটা বারান্দা থাকবে সেখানে বসে বসে শুধু রাস্তা দেখবে, নিজের মত করে ঘর গুছোবে প্রচুর টাকা জমাবে—এসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল এমন নিথর দুপুরে।

কবিতা শ্বশুর-শাশুড়ী আর স্বামীকে খাইয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছে। একটু পরে ও নিজের ঘরে এল। দরজা বন্ধ করতেই দেবেশ ওর দিকে তাকাল।

'কি ব্যাপার বলতো! সব কেমন চুপচাপ। তুমি একেবারে খাটতে খাটতে কেমন হয়ে গেছ!'

'তোমার এসব জেনে লাভ কি? তোমার তো আর ছেলেপুলে নেই যে এসব ভাবতে হবে।'

'তা না থাক এমন একটা গ্র্যান্ড বউ তো আছে!'

'হ্যাঁ তার থেকেও বড় আড্ডা আছে।'

'কিন্তু বউয়ের সংগে এমন দুপুরে আড্ডা আহ—' বলেই হাতের নাগালের মধ্যে কবিতা আসতে ধরে টেনে আনল কাছে। 'এই আমার কাছে কিছুক্ষণ থাকো তো।'

কবিতা ঠিক করে রেখেছিল দেবেশের সংগে ঝগড়া করবে। পারল না। হেসে ফেলল। 'ছাড়।'

'পাগল। আর ছাড়ি! আজ সারা দুপুর তুমি-আমি এক।'

'কি হবে? সাহস তো নেই।'

'থাকলে কি হত? সেই তো নিজের ছেলেটাকে নিয়েই ঝগড়ায় নেমে পড়তে! তার থেকে যতদিন না হয়।' দেবেশ কবিতাকে জড়িয়ে ধরে থাকল।

'না-না।' কবিতা দেবেশের বুকে মুখে লুকোল। সংগে সংগে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ। 'কে?' কবিতা ছিটকে সরে এসে ঘরের মেঝেয় দাঁড়াল।

'আমি পাপু ছোটকাকীমা। ছোটপিসির চিঠি এসেছে বিলেত থেকে। কাল সকালে প্লেনে দমদম পৌঁছচ্ছে। চিঠিটা দেখ।'

পাপু বড় ভাসুরের বড় ছেলে। কবিতা ওর সবচেয়ে প্রিয় কাকিমা। তাই চিঠি নিয়েই ওর কাছে এসেছে। কবিতা দরজা খুলল। পাপুর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। কবিতাকে চিঠিটা দিয়েই চলে গেল। কবিতা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল। সংগে সংগে চিঠি খুলে সামনে মেলে ধরল।

'আবার এই সংসারে আসছে বাচ্চা নিয়ে বিলিতি নান্তুটা!' দেবেশ হাসতে হাসতে বলল 'ওহ্ এবার তো হোলি খেলা হবে সারা বাড়ি!' ছোট বোন নান্তুর কথা ভেবে দেবেশ শব্দ করে হেসে উঠল।

চিঠির দিকে চোখ রেখেই কবিতা বলল, 'আসুক না। ছোড়দির বছর তিনেকের ছেলেটা নাকি দারুণ হয়েছে। আমরা তো কেউ দেখিইনি এক ফটো ছাড়া। আহ, এলে যা মজা হবে না!' বলতে বলতে যেখানটায় খবর আছে নান্তুর নতুন একটা বাচ্চা হবে এখন দুমাস সেখানেই কবিতা আরও গভীর মনোযোগী হল।

পরের দিন সকালের দিকে নান্তুদের প্লেন দমদমে আসতেই দেরী করল বেশ। ওরা যখন ট্যাকসি নিয়ে বাড়ির সামনে এসে থামল তখন বেলা হয়ে গেছে পুরুষরা নিজেদের কাজে বাইরে। শৈলজার দুই মেয়ে মনু ঝুনু আজ বেরোয়নি ওরা আসবে বলে। শান্তা আর বাণীর মেয়েরা স্কুলে চলে গেছে নিয়মমাফিক। শ্বশুরমশাই এই বয়সেও কোথায় যেন হিসেবের খাতা লেখেন বেরিয়ে গেছেন। গাড়ির শব্দ পেয়েই মনু ঝুনু নীচে নেমে এল। পিসিমণি অনেক দেরী হয়ে গেল কিন্তু তোমাদের!' মনু গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল।

'আর বোলো না যা ওয়েদার! প্লেন ল্যান্ড করতে খুব ট্রাবল হয়েছে।' বলতে বলতে ট্যাকসির দরজা খুলল নান্তু। আগেই ছিটকে বেরিয়ে এল বুবাই। 'বুবাই আস্তে নামো।' ভিতর থেকে বিকাশ চেঁচিয়ে উঠল।

'ইস কি সুন্দর দেখতে হয়েছে ছেলে। এই এদিকে এসো।' বলেই মনু হাত ধরে কাছে টানল। বুবাই বড় বড় চোখে মনুর দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ সপ্রতিভ উৎসুক দৃষ্টি নাক তীক্ষ্ণ দু চোখের ওপর টানা কালো ভুরু ঘন পাতায় ঢাকা দৃষ্টি গভীর। নিষ্পাপ। গাল ফোলা। মাথায় এক ঝাঁকড়া চুল বুবাইয়ের। বয়সের অনুপাতে একটু বেশী লম্বা চেহারা। ঠিক মোমের পুতুলের মত! হাসি-হাসি অথচ দুষ্টুমিতে ভরা মুখ।

বিকাশ মনুর দিকে একবার তাকাল শোন এদের নিয়ে যাও। আমি মালপত্তর আনার ব্যবস্থা করি। তা ছাড়া কলকাতায় অফিসে খুব জরুরী কিছু কাজ সারতে বেশ দেরী হবে। এখানে এবেলা খাবো না। বাবাকে বোলো।'

নান্তু বলল 'তুমি এই ট্যাকসিতেই চলে যাও। তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা কোরো।'

'পিসেমশাই একেবারে কিছু না খেয়ে যাবেন! মনু বলল।

'থাক থাক ওসব পরে হবে।' বলতে বলতে ব্যস্ততায় বিকাশ গাড়ির মধ্যে ঢুকে বসল। গাড়ির ভিতর থেকেই নান্তুকে বলল 'দেরী হলে ভেবো না।' ছেলের দিকে তাকাল 'বুবাই একটুও দুষ্টুমি করবো না কিন্তু!'

বুবাই একদম করবে না জানানোর মত করে ঘাড় নাড়ল। হাত নাড়ল বাবাকে বিদায় দেওয়ার। গাড়ি দ্রুত অদৃশ্য হল।

'কি, আমার কোলে আসবে তো?' মনু তাকাল বুবাই এর দিকে।

'আসবে না আবার' ওর আপন-পর চেনা-অচেনা একটুও নেই। ওইটাই তো আমাকে ভাবায় মনু। নীচু হবে সামান্য কিছু মালপত্তর গোছাতে গোছাতে নান্তু বলল।

বুবাই ততক্ষণে মনুর কোলে। মা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাতেই বুবাই বলল 'মা দেখ আমি কেমন কোলে উঠেছি বুড়োছেলে!'

হেসে উঠল মনু-ঝুনু দুজনেই। 'কে বলল তুমি বুড়ো ছেলে?' মনু বুবাইর গাল টিপে জিজ্ঞেস করল।

'ওই যে আমি বার বার ওকে বলি এখন তুমি বুড়ো ছেলে কোলে উঠতে নেই!' নান্তু হাসছে।

'এসো পিসিমণি।' ঝুনু দুটো ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে ওদের নিয়ে ওপরে এলো।

ঘিরে ধরল সবাই। বারান্দার ভাঙা তক্তপোষে নান্তু বসতেই এগিয়ে এল

শৈলজা কবিতা। শান্তা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। পাশে বাণী। যোগমায়াদেবী ছোট মেয়ে আসবে জেনে ভোরে থেকেই তক্তপোষে এসে বসেছিলেন। নান্তু প্রণাম করতেই টেনে পাশে বসালেন। ছেলে তো খুব বড় হয়েছে তোর!' যোগমায়াদেবী বললে।

'যীশুর দেশের ছেলে মা। কি সুন্দর দেখতে দেখেছেন?' কবিতা হাসতে হাসতে মনুর কোলে বসানো বুবাইয়ের মাথার ঝাঁকড়া চুলে বিলি কাটল।

'ওকে নামিয়ে দাও না মনু। কতক্ষণ ওভাবে রাখবে! বুবাই নেমে পড়ো দিদির কষ্ট হচ্ছে না!'

'তোমার কষ্ট হচ্ছে? বুবাই মনুর চিবুক ধরে টানল।

না-না কষ্ট হবে কেন। মনু আদর করল বুবাইকে।

'দেখেছ মায়ের সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি!' বুবাই জিভে জড়িয়ে বলল কথাগুলো। শব্দ করে হেসে উঠল সবাই। 'ইস কি কথা শিখেছে ছেলেটা। শৈলজা হাসতে হাসতে বলল।

'বলবেন না বৌদি ওর কথায় আমি তো ঝালাপালা।'

'দেখ কেমন একটুও চেনা-অচেনা মানে না!' কবিতা বলল। 'খুব ভাল।' বুবাই ততক্ষণে লজ্জায় মনুর কাঁধে মুখ লুকিয়েছে।

'ঠাকুরঝি তোমরা কথা বলো তোমার ছেলেকে একটু সাজাই।' কি বিচ্ছিরী দেখাচ্ছে। এই মনু এদিকে এসো তো ওকে নিবে।'

বুবাই এরা সব তোমার দিদি। ওই দেখ ওঁরা মামীমা। এ হচ্ছে দিদা। মনে থাকবে।

পাখির মত তাকাল বুবাই। তুমি তো বলেছ মাম্মি ছবি দেখিয়েছ। কতবার বলবে? চটপটে কথায় শব্দ করে হেসে উঠল সবাই। কথায় কণ্ঠস্বরে মুখভঙ্গিতে কেমন মায়া জড়ানো। ঠিক যেন কেউ মুখস্থ করিয়ে দিয়েছে ব্যাটাকে। যোগমায়াদেবী হাসতে হাসতে বললেন।

'না মা। ও নিজেই কোত্থেকে শিখেছে।' নান্তু বলল।

কবিতার ঘরে এলো ওরা। বিছানার ওপর বসালো বুবাইকে।

কবিতা জিজ্ঞেস করল বুবাই তোমাকে কে বেশী ভালবাসে খু-উব।

'মাম্মি-বাপ্পি দুজনেই' বলেই বড় বড় চোখে তাকাল কবিতার দিকে।

'আর একটা ভাই আসবে ঠিক এই রকম' বলে বড় মোমের পুতুলটা সামনে রাখল কবিতা। তখন তোমাকে ভালবাসবেই না!

গম্ভীর হল বুবাইয়ের মুখ পুতুলটাকে দেখল, নিল না। হঠাৎ বলল আসুক না এলে ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব নীচে।'

'ওরে গুন্ডা!' ঘরের উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে শৈলজার দুই ছেলে ঢুকল। খুব কথা শিখেছিস। পাপু বলল। পাড়ায় আড্ডা দিচ্ছিল ও।

'কেন হবে না! কোন বাড়ির বস্তু আছে দেখতে হবে তো!' মনু বলল 'দাদা তুমিও তো এরকম ছিলে, মা বলেন?'

ঝুনু বলল 'ছোটকাকিমা একে নিয়ে ছাদের কবে যাবো?'

'বেশ তো একটু সাজিয়ে দিচ্ছি তোমরা নিয়ে যাও আমি পরে যাচ্ছি।' কবিতা দ্রুত পাউডারের পাফ ঘষে চুল আঁচড়ে বুবাইকে সামান্য সাজিয়ে দিল।

বুবাইকে নিয়ে ওরা কবিতার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুবাই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হাঁটছে। টলতে টলতে ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। পাশেই শান্তার ঘর। দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়ল ওঘরে। মনু-ঝুনু থমকে দাঁড়াল। কি ভাবল। মেজকাকিমার ঘরে ঢোকা বারণ। কথাও বলে না। পাপু দরকারে বাড়ি ঢুকেছিল। ও নীচে নেমে গেল: মনু-ঝুনুও ঘরের মধ্যে মেজকাকিমাকে দেখে সরে গেল ওখান থেকে। দোতলার বারান্দা থেকে নান্তু নীচে কলাঘরে গেছে।

বুবাই ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে শান্তাকে দেখছে। শান্তা আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে ডালা খুলে কি দেখছিল। বুবাই ঢুকেছে বুঝতে পারেনি।

'তুমি কে?' বুবাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল। 'এত গম্ভীর কেন, আমার সংগে কথা বলছ না যে?'

শান্তা পিছন ফিরল। 'আরে! এসো এসো।'

'না আগে বল তুমি কে?' বুবাই স্থির দাঁড়িয়ে হঠাৎ গোমড়া মুখের ভঙ্গি করে করেই বলল 'মুখটা এরকম করে আছ কেন?'

'আমি তোমার মেজমামিমা।' বলেই এগিয়ে এসে বুবাই-এর হাত ধরল। 'তুমি আমার ঘরে আসছ না, তাই মন খারাপ। তোমার ওপর ভীষণ রেগে গেছি। দুষ্টু ছেলে।' একটু আদর করল শান্তা।

'তোমার এত পুতুল। আমাকে দেবে?'

'কি করবে নিয়ে, ভেঙে ফেলবে।'

বুবাই তাকাল শান্তার মুখের দিকে। 'ওটা দেবে? ওই যে লাল মতন!' বুবাই কাচের ওপর দিয়ে চকচকে লাল রঙের বটুয়াটা দেখাল। ওটায় শান্তা সারা মাসের যাবতীয় খরচ রাখে।

'তোমায় সব দেব। আগে তোমার নাম বল।' শান্তা বুবাইকে কোলে তুলে নিতে চাইল।

বুবাই উঠল না। দু'হাত দিয়ে শান্তাকে ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'আমার নাম বুবাই, বাবার নাম বাপ্পি, মার নাম মাম্মি।' বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দালানে।

'এই, এই ছেলে সিঁড়ির দিকে যেও না। পড়ে যাবে!'

শান্তার কণ্ঠস্বর শুনে মনু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুবাই ওদের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শৈলজা নীচে রান্নাঘরে ঢুকেছে। ঝুনু বোধহয় ছাদে। নিমেষের মধ্যে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে এলো মনু।

'বোসো, তোমার সঙ্গে গল্প করব।' মনু বুবাইয়ের চিবুকে ঠোঁট বুলোল।

'আমার সংগে খেলবে?' মনুর চিবুক ধরে টানল বুবাই। বাপ্পি আমার সংগে যেমন খেলে, তেমনি।'

'কি রকম?' মনু অবাক। দু'চোখে বিস্ময়ের ভান।

'আচ্ছা, তুমি আমার মা হয়ে যাও, আমি আমার বাবা।'

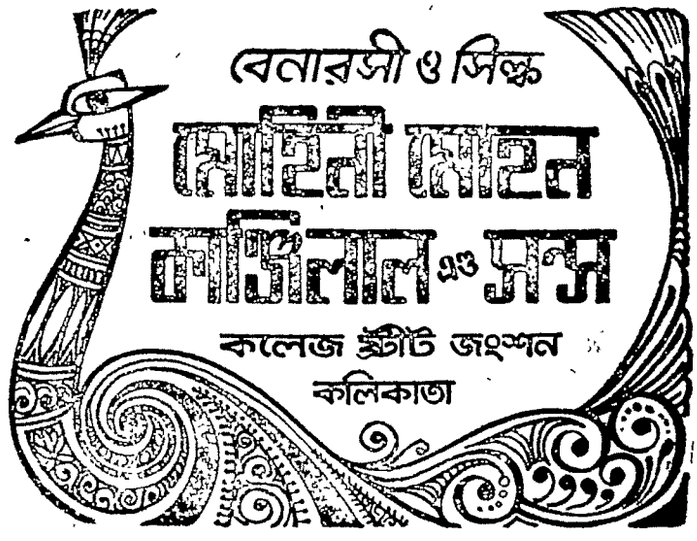

'বেশ। আমি তোমার মা।'

'আমি বাপ্পি।'

'তারপর?'

'তুমি এবার আমাকে বল, কি আজ ফিরতে এত দেরী হল কেন?'

'কি আজ ফিরতে এত দেরী হল কেন?'

বুবাই চুপ করে বসে রইল অন্য দিকে মুখ করে। নিজের জামার পকেট হাত বুলোচ্ছে। কিছু যেন বের করে রাখবে সামনে টেবিলে।

মনু অবাক হয়ে দেখছে বুবাইকে। কথা বলছে না দেখে মনু বলল, 'কই, বুবাই তুমি কথা বল?'

'দূর, তুমি কিছু জান না। আমি বুবাই নাকি! আমি তো বাপ্পি। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকব। তারপর তুমি মাম্মি। আমায় জড়িয়ে ধরলে তবে তো বলব, আহ্ ছাড়ো।' তোমার সঙ্গে খেলব না, তুমি কিচ্ছু জান না!'

মনুর চোখ বড়। 'উঃ কি দস্যি ছেলে তুমি। চল, তোমার মাকে সব বলছি!' বলেই মনু হো-হো করে হাসতে হাসতে বুবাইকে কোলে নিয়ে ছাদে চলল। ছোট-পিসি এইমাত্র নীচে স্নান সেরে ছাদে গেছে।

গড়ানো দুপুরে খাওয়া শেষ হল সকলের। কবিতা বুবাইকে কাছে নিয়ে একটু শুয়ে পড়ল। শান্তা-বাণীর মেয়েরা এখনো স্কুল থেকে ফেরেনি। শেন-জার্নির ক্লান্তিতে নান্টু এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে সিঁড়ির পাশের ঘরে। বুবাইকে চাপড়াতে চাপড়াতে কবিতা সামান্য তন্দ্রার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়ে।

বুবাই চোখ বুজিয়ে পড়েছিল একটুও ঘুমোয়নি। আস্তে আস্তে কবিতার সদ্য-কেনা চকচকে জুতো দুপাটি পা গলিয়ে উঠে পড়ল। শোবার আগে কবিতা মেয়ের পুতুলটা বুবাইকে খেলতে দিয়েছিল। বুবাই মাথার কাছে রাখা পুতুলটা হাতে নিল। কিছু সময় দেখল পুতুলটা। সারা মুখে কয়েক ঘা, চড় মারল। এক সময় এখানে-ওখানে টিপে তুবড়ে দিল। শেষে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে চেপে তার ওপর বসল। পুতুলটা নিয়ে কিছুক্ষণ খেলার পর নিজের খেয়ালেই ভেজানো দরজা খুলে বারান্দায় এলো। শান্তার ঘরের দরজা আধখোলা। পায়ের জুতোয় অসুবিধে হচ্ছে বলে দরজার সামনে ফেলে রেখে ঘরে ঢুকল। একা শান্তা শুয়ে ঘুমে অচেতন। বুবাই আলমারীর ডালা খুলে এক হাতে একটা ঘোমটা দেওয়া বউয়ের মূর্তি নিল। আর এক হাতে লাল বটুয়াটা। টলতে টলতে বেরিয়ে এসে নীচে নামার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে ফিরে এল। শৈলজা গভীর ঘুমে অচেতন। ছাদের ঘরে কনু-মনু শুয়ে। শৈলজার ঘরে খোলা তাকে পুতুলগুলো নাড়ল। নিজের মনে খেলা করল কিছুক্ষণ।

একসময়ে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল ওর ফেলে-রাখা কবিতার নতুন জুতো-জোড়া। দু'হাতে নিয়ে সিঁড়ি ধরে ছাদে উঠে এল। বাণীর ঘরটা সোজা দূরে দেখা যাচ্ছে। বুবাই আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঢুকল। বাণীর সাজানো ট্রাঙ্কগুলোর ওপর একটা নতুন ফ্রক। দু'হাতে জুতো সমেত ওটা ধরতে গিয়ে দু'হাতের জুতো ট্রাঙ্কের পিছনে শব্দ করে পড়ে গেল। বাণীর ঘুম ভাঙলো না। বাণীর মেয়ে কণার ফ্রক। একটা হাতে হাত গলিয়ে বুবাই আবার টলতে টলতে এখানে-ওখানে খেলতে খেলতে নীচে নেমে এল। বারান্দার বেড়ালটাকে তাড়াল ঠেলে ঠেলে, বারান্দার এমাথা থেকে ওমাথা ঘুরে ঘুরে। কবিতার ঘরে ঢুকল আবার। হাতে-পায়ে বড় ফ্রকটা জড়িয়ে যাচ্ছে বলে টেনে টেনে কোনরকমে খুলেই ছুঁড়ে ফেলে দিল তক্তপোষের নীচে। বাইরে কোন বাড়ির ছাদে বুঝি পাখি ডাকার একটানা শব্দ। বুবাই শব্দ শুনতে শুনতে বেরিয়ে এল আবার। ছাদে উঠতে লাগল নিজের খেয়ালে।

নীচে থেকে ওপরে ওঠার শেষ ধাপে দীপুদের স্কুল থেকে ফেরার পায়ের শব্দ। পিছন ফিরতে যেতেই বুবাই ছাদে ওঠার কয়েক ধাপ সিঁড়ির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল আচমকা।

'এই, এই, পড়ে গেল।' দীপু চেঁচিয়ে উঠল। ততক্ষণে বুবাই দোতলার বারান্দায় পড়ে গেছে সশব্দে উপুড় হয়ে। ককিয়ে কেঁদে উঠল।

দীপু দৌড়ে গিয়ে বুবাইকে কোলে তুলে নিল। ঘুম ভেঙে গেছে শৈলজার, শান্তারও। কবিতা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এত জোর শব্দ আর কান্নায় ছাদ থেকে দৌড়ে এল মনু-কনু বাণী।

'ইস্ রক্ত পড়ছে যে!' কবিতা দৌড়ে এসে বুবাই-এর কপাল চেপে ধরল। 'বেশ ছাড় গেছে।'

'কি করে পড়ল?' শান্তা যেন দীপুকে জিজ্ঞেস করছে।

'দাঁড়াও ছোট, একটু তুলো নিয়ে আসি।' শৈলজা স্লেত পায়ে ঘরে ঢুকল।

বাণী দৌড়ে গেল। 'একটু জল দিতে হবে।'

'নীচে নামবে কেন, আমার ঘরে আছে দেখ।' কবিতা বুবাইকে বুকে চেপে ধরে বাণীকে বলল। বুবাইয়ের দিকে তাকাল।

'শুধু তুলোয় হবে কি!' কবিতা যেন বিড় বিড় করল।

'দাঁড়াও, দেখি আমার ঘরে একটু বার্নল আছে', শান্তা ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

মনু খুঁচিয়ে দেখল কাটা জায়গাটা। 'হ্যাঁ, বার্নলেই হয়ে যাবে, সামান্য ছড়ে গেছে।'

'ছোটপিসি কোথায়?' নীপা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'থাক, ওকে আর ডেকোনা। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আচমকা ডাকলে খারাপ হবে।' শৈলজা তুলো চেপে ধরে শান্তার মেয়েকে বলল।

শান্তা আরও ঘন হল কবিতার। 'বড়দি, আপনি তুলোটা চাপুন, আমি ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দি। ছোট, তুমি ধরে থাক।'

নীচে থেকে যোগমায়া দেবী চেঁচালেন, 'কি হল ওপরে।'

'কিছু না মা।' বাণী নীচে নামার সিঁড়ির কাছে ঝুঁকে উত্তর দিল।

'ইস, কখন উঠে বেরিয়ে এসেছে বুঝতেই পারিনি। কি দস্যি ছেলে!' কবিতা বলল।

'তোমার ঘরেই শুইয়ে দাও ছোট।' শৈলজা বলল।

'না আমি শোব না। আমার কিছু হয়নি।' বুবাই শৈলজার দিকে তাকাল। চোখের গোড়ায় জল। ফর্সা তুলতুলে নরম চিবুক, গাল থেকে যেন এখুনি রক্ত ফেটে বেরুবে!

'দেখ ছেলের কথা দেখ। আবার হাসছে!' বলতে বলতে কবিতা ওকে নিয়ে ঘরে এল। 'বস এখানে!' বিছানায় বসিয়ে দিল। হঠাৎ মেঝের কোণে দৃষ্টি পড়ল, 'আরে, এ-জামাটা কার, কে নিয়ে এল!'

মনু সামনে দাঁড়িয়েছিল। অবাক হয়ে বলল, 'এটা তো সেজকাকীমার মেয়ের ফ্রক!'

ততক্ষণে বাণী ছাদের ঘর ঘুরে এসে কবিতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'এই নাও ছোট, তোমার জুতো!' এই প্রথম নতুন করে কবিতার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল বাণী ওর সঙ্গে।

'আমার জুতো! কোথায় ছিল?' কবিতা অবাক।

'আমার ঘরে।' হাসল বাণী। 'উঃ, কি ছেলে, আমার ঘরে কখন গিয়ে ফেলে রেখে এসেছে!' বুবাইয়ের দিকে তাকাল বাণী। বুবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে বাণীকে। একসময়ে ঘরে ঢুকে কবিতার জুতোজোড়া মেঝেয় রাখল কণা, বাণীর মেয়ে। হাত বাড়িয়ে বাণী কবিতার হাত থেকে কণার ফ্রকটা হাসতে হাসতে নিল। 'চলি ভাই।' বলে বাণী চলে গেল।

কিছু পরেই পাশের ঘরে শান্তা বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে আলমারীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠল। আলমারীর সমস্ত জিনিসপত্তর তছনছ। লাল বটুয়াটা নেই। ধড়াস করে উঠল শান্তার বুকের ভিতরটা। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। চেঁচিয়ে উঠল, 'দীপু, আলমারীর ডালা কেন খোলা?'

'আমি জানি না তো মা, এইমাত্র এলাম তো স্কুল থেকে।' নীচে কলঘর থেকে দীপু চেঁচাল।

শৈলজা হঠাৎ এসে দাঁড়াল শান্তার ঘরের সামনে। 'মেজ, একবার আমার ঘরে এসো।'

শান্তা বিরক্তি এবং বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকালো অনেকদিন দুজনের কথা বন্ধ। কেউ কারোর মুখের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত কাল বিকেল থেকে। হঠাৎ কি এমন হল? 'কেন?'

দেখে যাও, তোমার পুতুল আর ব্যাগ কোথায়?'

শান্তা অবাক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে শৈলজার পিছু পিছু ওর ঘরের সামনে দাঁড়াল। দেখল, শান্তার বউ-পুতুলটা শৈলজার ঘরের তাকে আর একটা বউ-পুতুলের পাশে বসানো। যেন খেলতে খেলতে সাজিয়ে রেখেছে। দুটো বউয়ের মাঝখানে লাল বটুয়াটা।

'যাও, নিয়ে এস। সব বুবাইয়ের কীর্তি।' শৈলজা হাসছে।

শান্তা হাসতে হাসতে শৈলজার ঘরে ঢুকল। পুতুল আর বটুয়া হাতে নিয়ে বলল 'উহু সারা দুপুর 'এই করেছে ও' সকালেই আমাকে এই দুটো চাইছিল। আর ঘর তো একেবারে তছনছ। দেখবে এসো!' শৈলজাকে সঙ্গে নিয়ে শান্তা নিজের ঘরে ঢুকল।

কবিতার বুকের মধ্যে গুড়ীশ হয়ে শুয়েছিল বুবাই। হঠাৎ উঠে বসল। 'আমি বাপ্পির কাছে যাবো।'

'কেন? তোমার বাপ্পি তো এখনো ফেরেনি। শুয়ে পড়।' কবিতা টানল বুবাইকে।

'বাপ্পির সঙ্গে খেলব একটু।'

'এই তো, আমার সঙ্গে খেলো, কি খেলবে?' কবিতা উঠে বসল।

'তুমি বাপ্পির খেলা জান?'

'শিখিয়ে দাও।'

বুবাই সরে বসল। 'বেশ, তুমি বড়-মামিমা হয়ে যাও!'

'হয়েছি, এবার কি হবে?'

'আমি মেজমামিমা। আমরা খুব গম্ভীর। একটিও কথা বলবে না কিন্তু!' সুন্দর সরল ভঙ্গি করে কথা বলতে নিষেধ করল বুবাই কবিতাকে।

দুজনেই চুপ। কবিতা মিটমিট করে দেখছে বুবাইকে।

হঠাৎ বুবাই বলল, 'এবার তুমি বল, 'তুমি এত গোমড়া-মুখ কেন?' তুমি বড়, তুমি আগে বলবে!'

'এত গোমড়া-মুখ কেন?' কবিতা বুবাই-এর কথা বলার ভঙ্গি নকল করল।

'তুমি এত গোমড়া-মুখ কেন, রাগ হয়েছে?' বুবাই কবিতার দিকে তাকাল।

কবিতা শব্দ করে হেসে উঠল। বুবাইও। বুবাইকে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে।

ঘরদোর গুছিয়ে এসে জানলার ফাঁক দিয়ে শৈলজা-শান্তা বুবাই-এর খেলাটা দেখছিল এতক্ষণ। দেখতে দেখতে দুজনেরই মনে পড়ে যাচ্ছিল, খুব ছোট্ট-বেলায় কুনু-দীপু-কণা ওদের মা-দের কাপড় নিয়ে এরকম খেলত। এক সময়ে শৈলজা-শান্তার দৃষ্টি বিনিময় হতেই হেসে উঠল। ওদের দুজনকে দেখেই লজ্জায় বুবাই কবিতার কোলে মুখ লুকোল।

সন্ধ্যের বেশ কিছুটা পরে নীচে গিরিশংকরের ঘরে সবাই হৈ-চৈ করে কথা বলছিল। বুবাইয়ের কথার ওরা হাসিতে ভরপুর। এক সময়ে বুবাইয়ের খোঁজ পড়ল। গিরিশংকর নীচে থেকে বললেন, 'ছোটবৌমা, দাদুভাইকে একবার এখানে নিয়ে এসো তো!'

কিন্তু বুবাইকে হঠাৎ যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কিছুক্ষণ আগেও শান্তার ঘরে দীপু-নীপা-কণাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে খেলছিল। কোথায় গেল। দীপু নীপার কাছে রেখে ছাদে চলে গিয়েছিল। পাশের ঘরে ঝুনুর গলা পেয়ে নীপা বুবাইকে কখন একা রেখে ছাদে গেছে। তারপর? নীচে সবাই রান্না নিয়ে ব্যস্ত। কোথায় গেল! ছাদে উঠে এল কবিতা। ছাদের ঘরে নেই। দোতলায় খুঁজল। নেই।

'কোথায় গেল তাহলে!' কবিতা নীচে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল।

'কোথায় আবার যাবে?' যোগমায়া দেবী বললেন, 'ওপরেই আছে, দেখ।'

'বাইরে বেরিয়ে যায়নি তো?' নান্তু বলল, 'এই আমার ছেলে, কি যে দুরন্ত। চেনা-অচেনা নেই তো—আরো ভয়।'

বাইরে যাবে কি করে? আমরা তো বসে আছি এখানে! ঠিক আছে, আমি দেখছি।' গিরিশংকর দোতলায় এলেন। নান্তুকে যে ঘরটায় থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেই সব সময় তালা দিয়ে রাখা ঘরটায় কি ভেবে ঢুকলেন। মনু বিছানা করেছে নান্তুদের। তক্তপোষের ওপর বড় চাদর-ঢাকা বিছানা করেছে। বেডকভার মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে। হঠাৎ কি খেয়াল হল, ঝোলানো চাদরটা তুললেন। বুবাই শুয়ে আছে চিত হয়ে। অঘোর ঘুমে অনড়।

'এই তো!' কবিতা উল্লাসে স্বগতোক্তি করল। 'এখানে শুয়েছে কখন?'

'ডাকো সকলকে।'

সকলে এলো। বুবাই আরাম করে শুয়ে আছে। মোমের ডল-পুতুলের মত হাসি-হাসি মুখ. চিবুক। দুটো হাত দু-পাশে টান টান করে ছড়ানো। এক পায়ের ওপর আর এক পা রাখা, জোড়া। কপালে ছড়ে-যাওয়া লাল দাগ।

'ঠিক যীশুর মত। দেখুন বড়দিভাই।' কবিতা শব্দ করে হেসে উঠল।

'ঘুমোবে না, সারা দুপুরটা ঘুই-জুই করেছে!' শান্তা শৈলজার দিকে তাকাল।

'ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও না ছোট-বৌদি। সন্ধ্যের যা খেয়েছে, আর খাবে না, জাগবেও না।'

কবিতা তুলে বিছানায় যত্ন করে শুইয়ে দিল।

খাওয়া-দাওয়ার পরও নান্তু, বিকাশ, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ঘিরে ভাসুর-জায়েরা হৈ-হৈ করে গল্প করছে এখনো। কবিতা এক ফাঁকে নিজের ঘরে এলো। দেবেশ বিছানায় শুয়ে। কবিতা দরজায় খিল দিল। আলো না নিভিয়েই দেবেশের থেকে সামান্য দূরত্ব রেখে শুয়ে পড়ল।

'তোমার আদরের পুতুলটা এমন দুমড়ে-মুচড়ে গেল কি করে?' দেবেশ মিটমিট করে তাকাল কবিতার দিকে।

'বুবাইটা রাগে এমন করেছে। খেলতে দিয়েছিলাম।'

'আর একটা কিনবে তো?' খুক খুক করে হাসল দেবেশ।

'বুবাইটা কি রকম দুষ্টু দেখলে তো! আর কি কথা!' কবিতা প্রসঙ্গ ঘোরালো। পাপু, মেজদিভাই-এর বড় মেয়ে সেজ-ভাসুরের মেয়ে কণাও নাকি এরকম ছিল!'

'বাচ্চা ছেলে যত দুরন্ত হয় ততই ভাল। যে-কোন বাড়ির চেহারাই বদলে দেয়।'

নীচে থেকে সমবেত হাসির শব্দ কানে এল ওদের।

'তাই তো দিয়েছে!'

'আজ বাড়ি ফিরে বুঝেছি।'

'কিন্তু বেশী দিন থাকবে না। নন্দাই তো মাস তিনেকের কাজ হয়ে গেলেই চলে যাবে। তারপর?'

'তোমার খুব কষ্ট হবে তো?'

মাথার দিকের দেয়ালের সুইচে হাত রাখল কবিতা. আলো নিভল। অনেক ঘনিষ্ঠ হল দেবেশের। কানে কানে বলল, 'জ্ঞানপাপী!'

দেবেশ জড়িয়ে ধরল কবিতাকে। কয়েক মুহূর্ত স্থির অনড় হয়ে চুমু খেল। 'আর ক'মাস অপেক্ষা কর।' হাঁপাচ্ছে দেবেশ।

'না।' কবিতা গা খুলল আস্তে আস্তে। জামাও। ফিস ফিস করে বলল, 'আর একদিনও না।'

দেবেশ অভ্যস্ত হাতে মাথার বালিশের নীচে হাত ঢুকোল কিছু একটা নেওয়ার জন্যে। কবিতা শক্ত হাতে বাধা দিয়ে দেবেশের শরীরের সঙ্গে লেগে থাকল।

কবিতা এই মুহূর্তে বুঝতে পারছে, সারা বাড়ির ওদের ঘর ছাড়া প্রত্যেক ঘরে আলো জ্বলছে। ঠিক এমনটি ওর বিয়ের পর কোনদিন দেখেনি কবিতা।

পুনশ্চ

ইংরেজ আমলের কথা ছেড়ে দিলেও বড় দিন ও ইংরেজী নববর্ষ আজ আমাদের সামাজিক জীবনেও কিছু কম রেখাপাত করেনি। এই ক্রিসমাস ও নিউ ইয়ার্স ডেতে হিন্দু বাঙালীবাবুরা একমাত্র গীর্জায় যাওয়া ছাড়া আর সব কিছুই বোধ হয় সাড়ম্বরে করে থাকেন। সন্দেশ-রসগোল্লা ফেলে এ-সময়টা সকলে কেক-পেস্ট্রি খান এবং প্রিয়জনকে খাওয়ানো ও উপহার দেওয়াটা যেন একটা অপরিহার্য সামাজিক প্রথা হিসাবেও গণ্য করে থাকেন। এছাড়া কার্ড-বিনিময়, দোকানপাটে কাগজের ফুল, মালা ও আলোকসজ্জা ছেলেমেয়েদের মাথায় কাগজের রঙিন টুপি পরানো, সেল্টা ক্লজের মোজা-ভর্তি খেলনা-খাবার কিনে দেওয়া বেশ চল হয়ে গেছে। এর উপর এ সময় উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বায়স্কোপ, থিয়েটার ও সার্কাস দেখার প্রাচুর্য তো আছেই। এ-শুধু পয়সাওয়ালা লোকদের মধ্যেই নয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মেহনতি জনগণকেও এই বড়দিন নানাভাবে আজও আকৃষ্ট করে থাকে। বিশেষ করে পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের হোটেলগুলিতে মদের ফোয়ারা ওড়ে।

এই বড়দিন সম্পর্কে ১৩২২ সালের 'মালঞ্চ' পত্রিকা থেকে একটি নিবন্ধ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। নিবন্ধটি উক্ত পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' মধ্যে প্রকাশিত হয়।

। বড়দিন ।

বড়দিন আসিতেছে। বড়দিন খৃষ্টান ইংরেজের বড়দিন—আমাদের নিতান্ত ছোট-দিন তা যে নয়। শীতকালে আমোদপ্রমোদ এদেশে জমে ভাল; ভবা শীতে বড় দিনে ১০।১২ দিনের বড় ছুটি। এই সময় অবস্থাপন্ন অনেকেই প্রমোদ ভ্রমণে বাহির হন। কলিকাতার বাহিরের বাঙ্গালীরা অনেকেই রাজধানী কলিকাতায় আসেন—কলিকাতার থিয়েটার, সার্কাস, বায়স্কোপ সব বেশ জমিয়া উঠে, আয়ও যথেষ্ট হয়। পরিবার-পরিজন-বিরহিত যাহারা শহরে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করেন, তাঁহারা কপি কড়ইসুটি কমলালেবু ও নূতন গুড়ের সন্দেশাদি সহ গৃহে যান। গৃহের পরিজন-বর্গ ও গৃহে সুলভ বহু পিষ্টক-মিষ্টান্নাদিতে ইহাদিগকে পরিতুষ্ট করেন। গৃহে গৃহে প্রায় পূজার মতনই বড়দিনের ঘটা আরম্ভ হয়।...

যিশুখৃষ্টের জন্মোৎসবের দিনকেই খৃষ্টানরা খৃষ্টমাস বলিয়া থাকেন। সেই খৃষ্টমাসই যে এদেশে বড়দিন বলিয়া কথিত, একথা বলাই বাহুল্য। তবে এ-দিনের নাম 'বড়দিন' কেন হইল? খৃষ্ট-মাসের যে অর্থ, তার সঙ্গে 'বড়দিন' কথার অর্থের কোনও সঙ্গতি নাই। তবে এই উৎসবের তারিখকে বড়দিন নাম দেওয়া হইল কেন? প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কি ইহার কোন উত্তর দিবেন? আমরা প্রত্নতত্ত্ববিৎ নই, তবে মোটা-মুটি যেমন বুঝি, তেমন একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

ঠিক বড়দিনের সময়েই সূর্যের উত্তরায়ন আরম্ভ হয়—দিন পলে পলে বড় হইতে থাকে। ছেলেবেলায় সব ভূগোলে পড়িয়াছি, ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে (একেবারে ঠিক যিশুখৃষ্টের জন্মতারিখে —খৃষ্টমাসের দিনে) সূর্য্যদেব বিষুবরেখার দক্ষিণ মকর ক্রান্তিতে স্থিতির পর ধীরে ধীরে উত্তরে আসিতে থাকেন অর্থাৎ সাধু জ্যোতিষী ভাষায় তাঁর 'উত্তরায়ন' আরম্ভ হয়। আজকালকার ভূগোলে আবার দেখিতে পাই সেদিন ২৫শে নয়, ২১শে ডিসেম্বর। তবে এদেশের পঞ্জিকাকারগণ এ সম্বন্ধে স্থির মত—তাঁরা বরাবরই লিখিতেছেন ১১ই পৌষ হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। কিন্তু ১১ই পৌষের সঙ্গে ২১শে ডিসেম্বরের মিল কখনও হয় না। ২৫শের সঙ্গে কখনও মেলে কখনও মেলে না। ৯ই হইতে ১১ই পৌষের মধ্যে বড়দিন পড়ে। এখন ঠিক উত্তরায়ণ যে কবে আরম্ভ হয় তা কেমন করিয়া বলিব? সূর্য্যের যদি প্রাণ ও জ্ঞান থাকে তবে তিনিই বোধহয় সব চেয়ে ঠিক জানেন, ঠিক বলিতে পারেন।

যাহাই হউক আগে আগে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখই বিলাতী উত্তরায়ন আরম্ভের দিন বলিয়া ধরা হইত। এই দিন হইতে দিন বড় হইতে আরম্ভ হয় তাই ইহার নাম 'বড়দিন' হইয়াছে—এরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই মত আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হইবার পর এদেশে যে খৃষ্টমাসের এই নাম হইয়াছে, এবং ইংরেজদের তৎকালীন দেশীয় কর্ম্ম-চারিগণই যে এই উৎসবকে এই আখ্যা দিয়াছেন একথা সহজেই বুঝা যায়। এদেশে উত্তরায়ন আরম্ভের কোনও উৎসব নাই। ইংরেজের তৎকালীন দেশীয় কর্ম্ম-চারিগণ যে জ্যোতির্বিদ্যায় বড় পণ্ডিত ছিলেন—পঞ্জিকা দেখিয়া উত্তরায়নের হিসাব করিয়া তার সঙ্গে এই উৎসবের কোনও সম্বন্ধ আছে মনে করিয়া ইহাকে 'বড়দিন' নাম দিয়াছেন এরূপ মনে করা কঠিন। জ্যোতিষ ও ভূগোলবিদ্যা যাঁহারা কিছু আলোচনা না করিয়াছেন এখনও দেখিতে পাই উত্তরায়ন বলিয়া একটা কথা বা তাহার ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহারা বড় কম জানেন ও বুঝেন। ঠিক এই সময় হইতেই যে দিন বাড়িতে থাকে এটা ধরাও বড় সহজ নয়। পৌষের শেষ বা মাঘের প্রথম হইতেই সকলে অনুভব করিতে থাকেন হ্যাঁ দিন কিছু বড় হইতেছে বটে।

উত্তরায়ন এবং তার জন্য দিবাভাগের কালবৃদ্ধির সঙ্গে বড়দিন নামের কোনও সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে করার তেমন যুক্তিযুক্ত কারণ কিছু দেখিতে পাই না। তবে খৃষ্টমাসের নাম 'বড়দিন' কেন হইল, তাহার একটি উত্তরও বেশ আছে। আমাদের যেমন দুর্গোৎসব খৃষ্টানদেরও তেমনি 'খৃষ্টমাস' সবচেয়ে বড় ধর্ম্মোৎসব। এদেশে খৃষ্টানদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি উৎসব আমরা দেখিতে পাই। ১ম খৃষ্টমাস, ২য় গুডফ্রাইডে বা ইষ্টার। যিশুখৃষ্টের জন্ম এবং মৃত্যু ও স্বর্গারোহণ—এই দুইটি ঘটনাই খৃষ্টানদের পক্ষে বিশেষ দুইটি স্মরণীয় দিন। তাঁহার জন্ম তারিখে খৃষ্ট-মাস উৎসব হয়। তারিখ ও তিথি লইয়া একটা বড় জটিল হিসাবে গুডফ্রাইডে ও ইষ্টারের দিন ঠিক হয়। প্রতি বৎসর ২১শে মার্চ্চ বা তার পরে যে পূর্ণিমা তার পরের রবিবার হইল ইষ্টার তার আগে যে শুক্রবার তাহা হইল গুডফ্রাইডে।

গুডফ্রাইডে তারিখে যিশু ক্রুশদণ্ডে প্রাণদান করিয়া মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং তার তৃতীয় দিনে তিনি কবর হইতে উঠিয়া ভৌতিক দেহেই স্বর্গারোহণ করেন। এই দুইটি ঘটনা লইয়াই গুডফ্রাইডে এবং ইষ্টার উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

যাহা হউক ইষ্টার অপেক্ষা খৃষ্টমাসের উৎসব অনেক বড় উৎসব। ইহার বড় দিন আর খৃষ্টানদের নাই। তাই মনে হয় খৃষ্টান ইংরেজ কোম্পানীর দেশীয় কর্ম্ম-চারিগণ এই দিনকে সাহেবদের বড়দিন নাম দিয়াছিলেন। এবং সেই নামই আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে—বরাবর চলিবে বলিয়াই মনে হয়।

বড়দিন নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ বলিয়াই অনুমান হয়। তবে আমরা জোর করিয়া কিছুই বলিতে পারি না।

—স্বগত

এই বাংলার খবর

ছাত্র-যুব ঐক্য

এই বাংলার চার ছাত্র-যুব নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য আর নুরুল ইসলামকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া। তাঁরা দিল্লি গেলেন এই মাসের ১৮ তারিখে। আর ১৯ তারিখেই কলকাতায় খবর এসে পৌঁছালো যে তাঁদের বিরোধ মিটে গেছে। ঐ দুদিন দিল্লিতে এই চার তরুণ নেতা দফায় দফায় দেবকান্তবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তা ছাড়া কথাবার্তা বলেন নিজেদের মধ্যেও। এই সব আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয়, রাজ্য কংগ্রেসের যুব আর ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার ফয়সালা করবেন চারজনের একটি কমিটি। প্রিয়-সুব্রত-প্রদীপ-নুরুল, এই চারজনই থাকবেন এই কমিটিতে। এঁদের কথা মেনে চলতে হবে সকলকে। যদি কেউ এই কমিটির কথা অমান্য করেন তবে ধরে নেওয়া হবে যে তাঁরা দলবিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছেন। বিরোধ মীমাংসার শর্তের মধ্যে আরো রয়েছে ছাত্র পরিষদের উপদেষ্টা কমিটিতে লক্ষ্মীকান্ত বসুকে ঠাঁই দেওয়ার প্রস্তাব। তেমনই আনন্দমোহন বিশ্বাস জায়গা পাবেন যুব কংগ্রেসের উপদেষ্টা পরিষদে। তা ছাড়া বারিদবরণ দাস আর সোমেন মিত্র রাজ্য যুব কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হবেন।

দিল্লিতে সফল আলোচনার শেষে চার তরুণ নেতা যান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে তাঁরা জানান যে, এখন থেকে তাঁরা এক হয়ে কাজ করবেন পশ্চিম বাংলার উন্নতির জন্যে। রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাড়তি সাহায্যের দাবি জানান। রাজধানীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা জানালেন, নিচের তলায় বিরোধ মেটাবার জন্যে এরপর তাঁরা যাবেন জেলায়-জেলায়। আসছে বছরের গোড়ায় পাঁচ হাজার ছাত্র আর যুব কর্মী নিয়ে একটা শিবির হবে। তারপর তাঁরা চেষ্টা করবেন রাজ্যে এমন একটা পরিবেশ গড়ে তুলতে যাতে বিভিন্ন প্রগতিশীল আর গণতান্ত্রিক শক্তি শান্তিতে পাশাপাশি থাকতে পারে। কলকাতায় ফিরে এসে চার নেতা বললেন, এখন থেকে তাঁরা মিলেমিশে কাজ করবেন। গঠনমূলক কাজের ভিত্তিতে তাঁরা এই ঐক্যকে মজবুত করে তুলবেন। কাউকে সংগঠনের বাইরে রাখা হবে না, কাউকে অখুশি রাখা হবে না। যাঁর যেমন গুরুত্ব, তিনি তেমন গঠনমূলক কাজের দায়িত্ব পাবেন।

আচমকা নির্বাচন ?

কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর হানাহানিতে রাজ্যে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল, সুতরাং এখন এই হানাহানি মিটে যাওয়ায় শাসক দলের সকলেই খুশি। তবে অনেকে মনে করছেন, লোকসভা, এমন কি বিধানসভার নির্বাচনও আসছে বছরের গোড়াতে হতে পারে বলেই এমন চট করে কংগ্রেসী ছাত্র-যুব ঐক্য সম্ভব হলো। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী অবশ্য সে-কথা অস্বীকার করেছেন, কিন্তু আচমকা নির্বাচন হতে পারে এমন জনরব প্রবল। কদিন আগে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয়ে গেল কলকাতায়। ঐ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, আসছে বছরের গোড়ায় নির্বাচন হতে পারে বলে সি পি এমের ধারণা। এদিকে একটি খবরে দেখা যাচ্ছে, এপ্রিলে লোকসভার নির্বাচন হতে পারে বলে রাজ্য কংগ্রেস সম্ভাব্য প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েও আলাপ-আলোচনা সুরু করে দিয়েছেন। লোকসভার সদস্যপদের জন্যে মনোনয়ন বর্তমান সব সদস্যের মিলবে না, অনেক তরুণ নেতা মনোনয়ন পেতে পারেন, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ লোকসভায় যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, এই সব কথা শোনা যাচ্ছে।

আচমকা নির্বাচনের জনরব জোরদার হয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধনের উদ্যোগ সুরু হওয়ায়। এই সংশোধনের কাজ সুরু করার জন্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার এস এস শর্মা জেলাশাসক আর বিভাগীয় কমিশনারদের এক বৈঠক ডেকে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আসছে পয়লা জানুয়ারি থেকে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ সুরু হবে। শেষ হতে লাগবে এক মাস। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে অনুসন্ধান করে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে। সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করতে লাগবে আরো মাস পাঁচ-ছয়। তবে নতুন ভোটার তালিকা তৈরির চেয়ে বড় কাজ নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস। প্রতি দশ বছর অন্তর লোকগণনার শেষে এই পুনর্বিন্যাস করতেই হবে বলে সংবিধানের নির্দেশ। সেই কাজও পশ্চিম বাংলায় সুরু হচ্ছে।

পরীক্ষার নতুন পদ্ধতি

পশ্চিম বাংলা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ঠিক করেছেন, তাঁরা পরীক্ষা নেওয়ার নতুন পদ্ধতি চালু করবেন। এগার ক্লাসের জায়গায় দশ ক্লাসের ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিও চালু হবে। এতদিন হায়ার সেকেন্ডারি বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে পাস করতে হতো। নতুন ব্যবস্থায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে প্রতিটি গ্রুপে শতকরা ৩৪ ভাগ নম্বর পেতে হবে। এইরকম গ্রুপ থাকবে চারটি : ভাষা (৪০০ নম্বর), বিজ্ঞান (৩০০), ভারত ও তার মানুষ (২০০) এবং কর্মশিক্ষা (১০০)। তবে একটি গ্রুপের প্রতিটি বিষয়ে কম করে শতকরা ২০ ভাগ নম্বর না পেলে ঐ গ্রুপে পাস করা যাবে না। কোনো গ্রুপ বা বিষয়ে অকৃতকার্য হলে সেই গ্রুপ বা বিষয়ে আবার পরীক্ষা দেওয়া যাবে। তা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষাও চালু হবে। এই পরীক্ষা নেবেন বাইরের পরীক্ষকেরা। ১৯৭৬ সাল থেকে এই নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া সুরু হবে।

দশ ক্লাসের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ক্লাসের আগে মাঝের দুবছরের জন্যে যে ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্যক্রম চালু করা হলো তার তদারকি কে করবে তা অবশ্য এখনও ঠিক হয় নি। এই পাঠ্যক্রম স্কুলেই পড়ানো হবে, না কি কলেজে তাও ঠিক হয় নি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অবশ্য চাইছেন, এই পাঠ্যক্রম তদারকির দায়িত্ব তাঁদের হাতেই দেওয়া হোক।

—দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

সংসদের শীত অধিবেশন

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন পূর্ব-নির্দিষ্ট তারিখেই সমাপ্ত হল। এবারকার এই ছয় সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনের মত ঘটনাবহুল অধিবেশন অতীতে আর কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই ছয় সপ্তাহের বৈঠকের প্রায় সবটাই জুড়ে ছিল লাইসেন্স কেলেঙ্কারি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রসঙ্গ। সি-পি-আই বাদে অন্য বিরোধী দলগুলি যে প্রসঙ্গটিকে সরকারের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে রেলমন্ত্রী ললিত-নারায়ণ মিশ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর তার প্রমাণ বিরোধীপক্ষ শেষ পর্যন্ত দিয়ে গেছেন। লাইসেন্স কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গে সি-বি-আই রিপোর্ট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র দেখার অধিকার অনিচ্ছুক সরকারের কাছ থেকে আদায় করেই বিরোধী সদস্যরা ক্ষান্ত থাকেন নি, ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে ললিতনারায়ণ মিশ্রের আচরণ সম্পর্কে নতুন করে পার্লামেন্টারি তদন্তের দাবি তুলে তাঁরা সরকারের উপর চাপ শেষ পর্যন্ত বজায় রেখে গেছেন। অধিবেশনের শেষের দিকে বিরোধী সদস্যরা ললিতনারায়ণের বিরুদ্ধে পর পর আরও দুটি অভিযোগ এনে তাঁরা তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। একটি অভিযোগ হচ্ছে এই যে, ১৯৭১ সালে তিনি সিঙ্গাপুর থেকে পলিয়েস্টার তন্তু আমদানি করার জন্য একটি দাগী ফার্মকে লাইসেন্স মঞ্জুর করেছিলেন। দ্বিতীয় অভিযোগটি হল, কুশী পরিকল্পনায় তিনি ভারত সেবক সমাজের তহবিলের অপব্যবহার করেছিলেন।

বিতর্কগুলি মুলতুবি রয়েছে এবং বিরোধী সদস্যরা যে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনেও এইসব বিতর্কের জের টানতে ছাড়বেন না তার যথেষ্ট আগাম ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।

তুলমোহন প্রসঙ্গের পাল্টা চাল হিসাবে কংগ্রেস ও সি-পি-আই অধিবেশনের শেষের দিকে নির্দলীয় সদস্য রামনাথ গোয়েঙ্কার বিরুদ্ধে অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ এনে বিরোধী সদস্যদের নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেস পক্ষ থেকে বলা হয় যে, শ্রীগোয়েঙ্কা জালজুয়াচুরি করে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের টাকা নিয়েছেন এবং তুলমোহন রামের চেয়ে তিনি অনেক বড় কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত। আরও অভিযোগ করা হয় যে শ্রীগোয়েঙ্কা কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে আর্থিক সাহায্য করছেন এবং বলে বেড়াচ্ছেন, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া হলে তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবেন। বিরোধী সদস্যরা বলেন যে, সংসদের কোন সদস্য যদি সংসদের বাইরে কোন কাজের জন্য অভিযুক্ত হন এবং তাঁর সেই আচরণ সম্পর্কেও যদি সংসদে আলোচনা করতে হয় তাহলে অশোক সেন ও তায়েব হোসেনের মত কংগ্রেস সদস্যের আচরণ নিয়েও আলোচনা করতে হয়। বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত অভিযোগে অশোকবাবুর পাসপোর্ট আটক করা হয়েছে এবং তায়েব হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

*

নির্বাচনের ব্যঞ্জনা ?

সরকারিভাবে বারবার অস্বীকার করা সত্ত্বেও লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলছেই। নির্বাচন কমিশন অবশ্য ইতিমধ্যে জানিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসের কাজ সমাপ্ত করে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে ১৯৭৫ সালের জুলাই মাস এসে পড়বে। তা যদি হয় তাহলে পুনর্বিন্যস্ত নির্বাচন কেন্দ্রের ভিত্তিতে নির্বাচন করা ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের আগে সম্ভব হবে না। রাজ্যসভায় এন জি গোরে ও অন্যান্য কয়েকজন সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে আইন, বিচার ও কোম্পানিবিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সরোজিনী মহিষী বলেছেন লোকসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আচমকা নির্বাচন করার কোন সিদ্ধান্ত সরকার নেন নি। এ সম্পর্কে বাইরে যেসব কথাবার্তা চলছে সেগুলি নিছক জল্পনা-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আচমকা নির্বাচন যাতে করা যায় সেজন্য সরকার সংবিধান সংশোধন করে নির্বাচন কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস কমিশনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছেন, এই রটনাও ডঃ মহিষী অস্বীকার করেছেন।

সরকারি এই অস্বীকৃতি সত্ত্বেও যেসব রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক অকাল নির্বাচনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে চাইছেন না তাঁদের ধারণা, এ ব্যাপারে আইনের বাধাটা অলঙ্ঘনীয় হবে না। যেমন এটা লক্ষ্য করা হয়েছে যে, নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাস ও পুনর্বিন্যস্ত কেন্দ্রগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে, একথা আইনে বলা হলেও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২১ নম্বর ধারায় এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম করার ক্ষমতাও নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া আছে। তাছাড়া, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যদি আগামী মার্চে সে নির্বাচন ডাকার প্রয়োজন অনুভব করেন তাহলে আইন অনুসারে ফেব্রুয়ারি সে নোটিশ দিলেই চলবে, এত আগে কে তাঁর হাতের তাস দেখাবার কোন দরকার নেই।

শ্রীমতী গান্ধী অকস্মাৎ লোকসভার নির্বাচনের ডাক দিতে পারেন একথা যাঁরা মনে করছেন তাঁরা তাঁদের অনুমানের সপক্ষে অনেকগুলি ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন যেমন, প্রথমে নারোরাতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, তারপর রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের যেসব শিক্ষাশিবির হচ্ছে সেগুলি নির্বাচনের প্রস্তুতি বলে মনে হচ্ছে। দশ লক্ষ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তার সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্কটা স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়াই খোলাখুলিভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রতি পোলিং বুথ পিছু যাতে অন্তত দুজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই দশ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হচ্ছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শেষে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী যে সমাপ্তি ভাষণ দিয়েছেন তার কয়েকটি কথাও এদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ ভাষণে তিনি কংগ্রেস এম-পিদের নিজের নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে উদ্যোগী হতে পরামর্শ দিয়েছেন। এটাকেও নির্বাচনের প্রস্তুতির লক্ষণ বলে গণ্য করা হচ্ছে।

*

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য

দিল্লিতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ দুই দেশের মধ্যে নতুন বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য-চুক্তি চালু আছে তাতে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ভারত ও বাংলাদেশ পরস্পরের কাছ থেকে যে পণ্য আমদানি করবে তার দাম তারা শোধ করে দেবে পরস্পরের কাছে সমমূল্যে পণ্য রপ্তানি করে। কথা ছিল এভাবে দুই দেশের মধ্যে মোট ৬০ কোটি টাকা দামের পণ্যের সুষম লেনদেন হবে। কিন্তু ঐ দুটি আশার কোনটিই পূর্ণ হয় নি। চলতি বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ এই বছরই শেষ হবে। অথচ এর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের পরিমাণ ১৬ কোটি টাকার অঙ্ক ছাড়ায় নি। বাংলাদেশও তার পণ্যের দ্বারা আমদানি-করা ভারতীয় পণ্যের দাম শোধ করতে পারে নি।

এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবার দুই দেশের মধ্যে যে নতুন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হল সেটা অনেক বেশি বাস্তবতা-সম্মত। এই নতুন চুক্তিতে স্থির হয়েছে যে, বাণিজ্য হবে অবাধে বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায়। অর্থাৎ, পাউণ্ড স্টার্লিং বা ডলারের অঙ্কে উভয় দেশের মধ্যে দেনাপাওনার পরিমাণ স্থির করা হবে।

দুই দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীই আশা প্রকাশ করেছেন যে নতুন চুক্তিতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।

২২-১২-৭৪ —পুণ্ডরীক

পটভূমি

বিধানসভা কি থাকছে ?

মন্ত্রিসভার কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ডাক দেবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। খবরটা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পেয়েছি। তবে একথা এখন পর্যন্ত জানা যায় নি যে, এই পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন কিনা? কিন্তু ঐ গোপন শলাপরামর্শের সময় তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলি অবশ্য শুনেছিলেন।

কথা শুনলে কি হয়, সিদ্ধার্থবাবুর 'মুড' বোঝা এক অসাধ্য সাধনা। কারণ, গত কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেছে ক্ষণে ক্ষণে কারণে বা অকারণে তাঁর 'মুড' বা কথার পরিবর্তন হয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞমহল অবশ্য বলবেন, এটাই হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতি। এই স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ না করলে তিনি ভারসাম্য বজায় রেখে দলের নেতার পদে থাকতে পারতেন না। উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে নয়। মাস দুই আগে তিনি হঠাৎ তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কাছে গিয়ে বললেন ঃ না, আর পারা যাচ্ছে না। মন্ত্রিসভাকে একটু 'স্ট্রীম লাইন' করা উচিত। তা না হলে কাজ এগুচ্ছে না। ঐ সহযোগী মন্ত্রী-মহোদয় ধরে নিলেন সিদ্ধার্থবাবু তাঁর পরামর্শ চাইছেন রাত জেগে তিনি তাঁর পরামর্শ একটুকরো কাগজে লিখে খামে 'সীল' করে তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর দু'মাস কেটে গেলো খামের কোন পাত্তা নেই। ঐ সহযোগীর সঙ্গে পরে মুখ্যমন্ত্রীর বেশ কয়েকবার গোপনে দেখা হয়েছে। কিন্তু কোন সময়ে তিনি এ-প্রশ্ন আর তোলেননি। ফলে মন্ত্রীর পক্ষেও 'সীল-করা খামের ভাগ্যে কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে প্রশ্ন করারও সাহস হয়নি।

এবার হয়তো মনে করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর কিছুটা সাহস হবে। কারণ, কংগ্রেসের ভেতরের ছাত্র ও যুবদের মতপার্থক্য ঘুচে গেছে বলে বাইরে ঘোষণা করা হচ্ছে। সামনে হয়তো বা পার্লামেন্টের নির্বাচন। অতএব এই সময় রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন যদি করিয়ে নেওয়া যায় তাহলে অনেকদিক থেকে সুফল পাওয়া যেতে পারে। যেমন, (১) অন্ততঃ নির্বাচনকে সামনে দেখতে পেয়ে কংগ্রেসী ছাত্র ও যুবরা এক হয়ে লড়বে। নচেৎ দুই দলের লড়াই-এর মধ্যে কংগ্রেস দিনের পর দিন তলিয়ে যাচ্ছে। (২) নতুন নির্বাচন হয়ে গেলে অনেক ঝড়তি-পড়তি বাদ যাবে। তাহলে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধে দূর হয়ে যাবে এবং (৩) এ-কারণটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবচেয়ে বেশী জরুরী। তিনি সুযোগ পেলেই স্থায়ীভাবে দিল্লী চলে যেতে চাইছেন। গত দু'বছর ধরে চেষ্টা করে তিনি কিছু করতে পারেননি। পার্লামেন্টের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য বিধানসভার 'ইলেকশন' হলে মুখ্যমন্ত্রী অনায়াসেই লোকসভার প্রার্থী হতে পারবেন। এবং এখানকার কংগ্রেসী নেতারা তাঁর বদলে অন্য কাউকে নেতা নির্বাচনের সুযোগ পাবেন। এর ফলে ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধার্থবাবুকে জোর করে পশ্চিমবাংলায় আটকে রাখতে পারবেন না।

আসলে মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তার এটা হচ্ছে 'পজিটিভ সাইড'; আর 'নেগেটিভ দিক হচ্ছে সত্যি সত্যি যদি ছাত্র ও যুবদের মধ্যে মিল হয়ে গিয়ে থাকে (যা তাঁরা বলছেন), তাহলে এদের মধ্যে সমবেতভাবে যে-শক্তির সঞ্চার হবে, প্রয়োজন হলে সেই শক্তি যে-কোন মন্ত্রী এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকেও পর্যুদস্ত করতে পারে। বিশেষ করে বর্তমানের ছাত্র ও যুবদের মধ্যে সবাই যে সিদ্ধার্থবাবুর অনুগামী তা বলা চলে না।

মুখ্যমন্ত্রীকে বারংবার বলতে শোনা গেছে, না আর নয়, আমি চলে যেতে চাই। আপনারা নেতা নির্বাচন করুন। গত দু' বছরে গোপন শলাপরামর্শ বা প্রকাশ্য সভায় তিনি এ-কথা বহুবার বলেছেন। মাঝখানে তাঁর এই উক্তির কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল। আবার সম্প্রতি তিনি এ-কথা বলতে শুরু করেছেন। কিছুদিন আগে নাকি তিনি এক মন্ত্রী বন্ধুর কাছে প্রাণের কথা শোনাতে গিয়ে তিনজন নেতার নাম করে বলেছেন এই তিনজনের মধ্যে আপনারা একজনকে বেছে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করুন।

আবার কেন অন্য লোককে মুখ্যমন্ত্রী করার পরামর্শ সিদ্ধার্থবাবু দিচ্ছেন? এই প্রশ্নটা এখন রাজনীতিবিদদের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে পার্লামেন্টের নির্বাচন এলে তিনি কি একা পঃ বঙ্গ থেকে সরে গিয়ে দিল্লীর জন্য প্রার্থী হবেন? না, রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিয়ে অন্য লোককে তিনি নিজ নেতার পদে বসিয়ে চাবিকাঠি হাতে রাখতে চান?

তবে তিনি যাই করুন না কেন, বর্তমানের এই সকল সহকর্মীদের নিয়ে তিনি যে চলতে পারছেন না তা পরিষ্কার। এবং এটা যেমন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি সংগঠনের ব্যাপারেও। বিশেষ করে জানুয়ারী মাস শেষ হওয়ার আগেই বিচারপতি ওয়াংচুক রিপোর্ট বেরিয়ে যাবে। ফলে অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠবে। তথ্যাভিজ্ঞমহল আরো মনে করছেন এর পরে কংগ্রেসপক্ষে মন্ত্রিসভার বিশেষ দুই সদস্যকে নিয়ে একদলে প্রশাসন চালানো সম্ভব নয়। অতএব এঁদের বিদায় দিতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন এসে যাবে। অর্থাৎ মন্ত্রী করা বা বাদ দেওয়ার ব্যাপারে দর কষাকষি আরও হয়ে যাবে।

তবে কথা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যি সত্যি রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেবার পরামর্শ দেন, তাহলে মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন কেন আসবে? এ-প্রশ্ন আসার একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও এম এল এ পুরো টার্ম চালিয়ে যেতে চাইছেন। যাহোক, এটা আজ রাজনীতিবিদদের মনে হচ্ছে আসছে জানুয়ারী মাসটা রাজ্যের রাজনীতির ক্ষেত্রে বেশ উত্তেজনার সময় হয়ে উঠবে। এ-সময় সবদিক থেকে ব্যস্ত হবার মত কতকগুলো ঘটনা যে ঘটতে চলেছে, তার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

—কৌটিল্য

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস.
ডাঃ এস. এম. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬.
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও কৃষ্টিচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

গোয়েন্দা ধাঁধা

ডোরাকাটা ফিতে ।।

শার্লক হোম্‌স্‌ ।।

স্যার আর্থার কোনাল ডায়াল

সাতসকালে মেয়েটা দৌড়ে এল দেশের বাড়ী থেকে শার্লক হোমসের ডেড়ায়। চোখ রগড়াতে রগড়াতে ওয়াটসনকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকল হোম্‌স্‌। শুরু হল সেই রোমাঞ্চকর ভয়ংকর কাহিনী।

মেয়েটার নাম হেলেন। ওর যমজ-বোনের নাম জুলিয়া। ওদের জন্ম ভারতবর্ষে। মা বিধবা হবার পর ফের বিয়ে করে স্টক মোরানের অতি প্রাচীন রয়লট পরিবারের শেষ বংশধর ডাক্তার রয়লটকে।

ডাক্তার রয়লট পড়ন্ত জমিদার বংশের বাড়ী আঁকড়ে পড়ে না থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন পশার জমাতে। কিন্তু চন্ডাল স্বভাবের জন্যে শেষ পর্যন্ত জেল খেটে ফিরতে হয়। বিয়ে করেন জুলিয়া আর হেলেনের মা-কে।

ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেল যমজ বোনের মা। মারা যাবার আগেই তার বিপুল সম্পত্তি লিখেপড়ে দিয়েছিল ডাক্তারকে। শুধু সুদই পাওয়া যেত শ'খানেক পাউন্ডের মত। একটা সর্ত ছিল উইলে। মেয়েদের বিয়ে হলে কিছু টাকা দিতে হবে তাদের। অর্থাৎ সৎমেয়েদের বিয়ে দিলে লোকসান বি-পিতার-ই।

স্টক মোরানে ফিরে আসার পর থেকেই দিনে দিনে আরো উগ্র হয়ে উঠল ডাক্তারের মেজাজ। পুলিশ-কোর্ট পর্যন্ত দৌড়োতে হয় গোটা দুই মামলার নিষ্পত্তি করবার জন্যে। কারও সঙ্গে মিশতেন না ডাক্তার। কেউ মিশতেও চাইত না। বন্ধু বলতে ছিল একদল ভবঘুরে বেদে। কাঁটাঝোপভর্তি বাগানে বেদেদের থাকতে দিয়েছিলেন ডাক্তার। মাঝে মাঝে নিজেও থাকতেন ওদের তাঁবুতে। কখনো-সখনো বেদেদের সঙ্গে হাওয়া হয়ে যেতেন দিন-কয়েকের জন্যে।

ডাক্তারের আরো একটা বিটকেল সখ হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে। ভারতবর্ষ থেকে জন্তু জানোয়ার আমদানী করেন। বাগানের মধ্যেই একটা চিতা আর একটা বেবুনকে পোষেন। যত হিংস্র জীবের সঙ্গেই তাঁর ওঠাবসা—মানুষের সঙ্গে নয়।

বছর দুই আগে বিয়ের ঠিক হল জুলিয়ার। ডাক্তার বাধা দিলেন না। কিন্তু তারপর থেকেই প্রতি রাত্রেই একটা শিস শুনতে পেত জুলিয়া। শব্দটা শুধু জুলিয়ার কানেই আসত রাত তিনটে নাগাদ—হেলেন শুনতে পেত না। অথচ দুই বোন শোয় পাশাপাশি ঘরে। প্রথমে হেলেনের ঘর, তারপর জুলিয়ার ঘর, সবশেষে ডাক্তারের ঘর। তিন ঘরের জানলার সামনে লন এবং দরজার সামনে টানা বারান্দা। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার পথ নেই।

আওয়াজটা যদি লন থেকেই আসবে তো হেলেন শুনতে পায় না কেন? প্রতি রাত্রে জুলিয়ার ঘুম ভেঙে গেছে শিসের শব্দে। সেই সঙ্গে নাকে ভেসে এসেছে ভারতীয় চুরুটের কড়া গন্ধ—ও-বাড়ীতে শুধু ডাক্তারই খান ভারতীয় চুরুট। প্রতি রাতে তিনিও তাহলে জেগে ওঠেন শব্দ শুনে?

বিয়ের ঠিক সাত দিন আগে এক রাতে বিকট চীৎকার শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল হেলেন। জুলিয়ার চীৎকার, একটা মৃদু শিসের শব্দ এবং পরক্ষণেই ঝনঝন শব্দে যেন একরাশ বাসন পড়ার আওয়াজ শুনেই তেড়েমেড়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। টানা বারান্দায় পা দিয়ে দেখল আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে জুলিয়ার ঘরের দরজা। ভেতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল জুলিয়া। চোখমুখ আতংকে যন্ত্রণায় বিকৃত। আচ্ছন্নের মত ডাক্তারের দরজা দেখিয়ে বোধহয় ডাক্তার ডাকতেই চাইল। শেষ মুহূর্তে শুধু বলল দুটি কথা—'কী ভয়ংকর! ডোরাকাটা ফিতে!'

মারা গেল জুলিয়া। করোনারের তদন্তে মৃত্যুর কারণ বার করা গেল না। দরজা-জানলাও ভেতর থেকে বন্ধ। অথচ নিশীথ রাতের নিষ্ঠুর নাটক প্রাণ হরণ করে নিয়ে গেল তার।

এবার এসেছে হেলেনের পালা। দিন পনেরো আগে বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছে হেলেন। ডাক্তার এবারও আপত্তি করেননি। কিন্তু কাল রাতেই আবার শোনা গেছে সেই ভয়ংকর শিসের শব্দ। নিজের ঘরে মিস্ত্রী লেগেছে বলে পাশেই জুলিয়ার ঘরে শুতে হয়েছিল হেলেনকে। শিসের শব্দ শুনেই রাত ফুরোতে না ফুরোতে দৌড়ে এসেছে শার্লক হোমসের কাছে—বাঁচবার তাগিদে।

হোমস সব শুনে গম্ভীরকণ্ঠে বললে—'আমি আপনাদের জমিদারবাড়ীটা গিয়ে দেখতে চাই। ডাক্তারের অবর্তমানে তাঁর ঘরটাও দেখতে চাই। ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

'পারবো।'

'তবে নির্ভয়ে বাড়ী যান। শার্লক হোমস আপনাকে রক্ষা করবে।'

হেলেন বিদায় হতে না হতেই মূর্তিমান ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল ঠিক যেন একটা মানব-দানব—ডাক্তার রয়লট স্বয়ং। শাসিয়ে গেল হোমসকে, সৎ-মেয়ের প্যান-প্যানানি শুনে যদি তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে আসে হোমস—তাহলে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে তবে ছাড়বেন।

বিদ্রূপ হাসি হেসে ডাক্তারকে বিদায় করল হোমস। যথাসময়ে এল স্টক মোরানে। সঙ্গে ওয়াটসন। ডাক্তারের অবর্তমানে হেলেন ওদের নিয়ে গেল প্রথমে নিজের ঘরে। হোমস লক্ষ্য করল, সে ঘরে মিস্ত্রী না লাগালেই চলত। অর্থাৎ হেলেনকে কায়দা করে সরানো হয়েছে জুলিয়ার ঘরে।

জুলিয়ার ঘরে ঢুকে হোমস তাজ্জব হয়ে গেল তিনটে অদ্ভুত জিনিস দেখে। ইঁদুর গলবার মত একটা ঘুলঘুলি রয়েছে ডাক্তারের ঘর আর জুলিয়ার ঘরের মাঝের দেওয়ালে। কেন? ঘুলঘুলি তো থাকে বাইরের দেওয়ালে বাইরের বাতাস ঘরের ভেতরে আনার জন্যে।

দ্বিতীয়তঃ, একটা দড়ি ঘুলঘুলির হুক থেকে ঝুলছে বিছানার ওপর পর্যন্ত।

তৃতীয়তঃ, জুলিয়ার খাটটা মেঝেতে আংটা দিয়ে আটকানো।

এবার ডাক্তারের ঘর। ঘরের মধ্যে একটা সিন্দুকের ওপর এক কাপ দুধ দেখে চমৎকৃত হল হোমস—'কী ব্যাপার? সিন্দুকের মধ্যে বেড়াল জাতীয় চিতা নেই তো? কিন্তু এক কাপ দুধে কি বেড়াল বা চিতার পেট ভরে?' বিছানার পাশে রাখা ডগায়-ফাঁসওলা একটা চাবুক দেখে শুধু ভুরু কোঁচকালো। সবশেষে আসনপিঁড়ি হয়ে মেঝেতে বসে আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করল ঘরের একমাত্র চেয়ারের বসবার কাঠটা।

আসবার সময়ে বললে—'গভীর জলের মামলা। ঘরের জানলায় মোটা শিক। বাইরে থেকে ঢোকা সম্ভব নয়। সুতরাং বিপদ আছে ঘরের মধ্যেই।'

সেই রাতেই ভাঙা জমিদারবাড়ীতে ফের আবির্ভূত হল শার্লক হোমস আর ওয়াটসন। পকেটে রিভলবার, হাতে বেত আর দেশলাই মোমবাতি নিয়ে শিবনেত্র হয়ে বসে রইল আংটা দিয়ে আটকানো খাটের ওপর। হেলেনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নিজের ঘরে।

নিশুতি রাতে শোনা গেল শিসের আওয়াজ। নাকে ভেসে এল গরম ধাতু আর পোড়া তেলের গন্ধ। অর্থাৎ লন্ঠন

জ্বলছে। ঘুলঘুলিতে দেখা গেল আলোর ঝলক। সেই সংগে একটা অদ্ভুত শব্দ—যেন কেটলী থেকে স্টীম বেরুচ্ছে।

লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দেশলাই জ্বালল হোমস। পরক্ষণেই পাগলের মত সপাং সপাং করে বেত মেরে চলল ঝুলন্ত দড়িটার ওপরে। সেই সংগে আতংক-বিহ্বল চীৎকার — 'ওয়াটসন! ওয়াটসন! দেখতে পাচ্ছো না?'

বন্ধুবরের ভয়ে পাংশু মুখ ছাড়া ওয়াটসন আর কিছুই দেখতে পেল না। তবে বেত মারা বন্ধ হতেই কানে ভেসে এল একটা লোমহর্ষক চীৎকার। রক্তজল করা সেই মরণ চীৎকার শোনা গেল ডাক্তারের ঘরে।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল হোমস। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকল ডাক্তারের ঘরে। দেখল, চেয়ারে বসে ডাক্তার রয়লট। বিস্ফারিত চোখ ঘুলঘুলির দিকে নিবদ্ধ। নিথর দেহে প্রাণ নেই।

কপাল ঘিরে রয়েছে শুধু একটা হলদে ফিতে। তাতে বাদামী ডোরা। সহসা সেই অদ্ভুত পাগড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল রুইতনের মত একটা চ্যাপটা মোটা কুৎসিত মাথা।

বলুন তো কার মাথা?

অদ্রীশ বর্ধণ

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ২৯ পাতায়)

২'টি ফসফোমিন টনিক...

ফসফোমিন আয়রন

মেয়েদের জন্যে আয়রন টনিক

ফসফোমিন আয়রন শরীরে আয়রন বাড়াবার এক অতিরিক্ত উপায় যা রক্তকে লাল করতে আর শরীরে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দিন নিন মেয়েদের জন্যে তৈরী এক আয়রন টনিক—ফসফোমিন আয়রন।

ফসফোমিন ভিটামিন

পরিবারের সকলের জন্যে ভিটামিন টনিক

ফসফোমিন-এ আছে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন আর পুরো মাত্রায় মিসারোফস্‌ফেট্‌স যা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে ২'টি ফসফোমিন টনিক

ফসফোমিন টনিক খিদে বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যোগায় আর প্রফুল্ল করে তোলে।

®ই. আর স্কুইব ও সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী

SQUIBB® SARAF CHEMICALS LTD. লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ভারত, ডি. ৪৪

Shilpi SC 8A/74 ben

কবিতা

সাপ ॥ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তোমার রক্তে এক সাপ আছে।
আমি যতোবার
ভেবেছি এখন থেকে শান্ত খেলা হবে—
স্তব্ধ হ্রদের মতো তুমি ছড়াবে একেলা
একদিন দুদিন আমি নৌকো ক'রে যাবো।

দু'এক মুহূর্ত তুমি হয়তো বা প্রকৃতির মতো
গাছ-ফুল-জলের আড়ালে
নিজেকে ঢেকেছো,
দু'এক মুহূর্ত কোনো শব্দ করোনি।
কিন্তু তার পরে তুমি একটু একটু বিষ
উগ্‌রে দিয়েছো। তুমি সমস্ত ছোবল
আমাকে লক্ষ্য করে বাড়িয়ে রেখেছো।

আমি এরকম প্রেম বুঝতে পারি না।

তোমার রক্তে এক সাপ আছে।
তোর কুণ্ডলীর আস্ফালন থেকে
কোনোদিন মুক্ত হবো না।।

সহজীবন ॥ সামসুল হক

স্মৃতির শস্যের গন্ধ চুরি ক'রে মনীষার স্বেদ তাকে
ডমরুর মতোন বাজায়
ডমরুর শব্দের জরায়ু থেকে সুন্দরের অধিকার রক্তমাল্যসহ নেমে আসে
স্বপ্নের শস্যের ক্ষেতে লাঙলের ঠোঁটে তীক্ষ্ণ বেজে ওঠে
কৃষালীর করোটির শাঁখ
সে-সময় স্বর্গের চিতার ছাই মানুষের অভিকর্ষে
যন্ত্রাস্ত্রের অবয়বে নেমে
ঈশ্বরের পরিত্যক্ত জন্মের শহর ঘিরে জননীর চোখে
ঠায় পাহারায় থাকে
এখন স্মৃতি ও স্বপ্ন খরার জ্যোৎস্নায় শিশুদের নীল অশ্রুর
উপরে ফুটে আছে
সহজীবনের জন্যে প্রস্তুত মেধা ও শ্রম দগ্ধ পুরুষের
মাঝখানে চলে যায়

ওভারহেড লাইন ॥ পরেশ মণ্ডল

না
ভিস্যুভীয়স না
কিংবদন্তীর 'নুগ্‌গর' না
তুমি
ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের ওপরে
ওভারহেড লাইন
তোমার চোখ চোখ নয়
সমুদ্র
সমুদ্র নয়
রাইফেলের ছুটন্ত গুলি

এভারেস্টের মাথায় চড়ে
যখন নিশান পুঁততে যাচ্ছি
তুমি
রুমাল উড়িয়ে
বিদায় জানালে
জাহাজের বাঁশি বেজে উঠল।

নারকাণ্ডা ১৯৭২ ॥ পরেশ মণ্ডল

এখানে নৈঃশব্দ্য এখানে হিমালয়
হিমালয়ের এই বুকের মৌনতায়
সুন্দর নারকাণ্ডা
দিগন্তজোড়া বরফের শাদা
পাইনের গভীর সবুজ ছড়ানো
বড্ড ভালো লাগছে
তবু যেন একটুখানি কিন্তু রয়ে গেছে
কেননা
তোমার ভর্ৎসনা নেই
ভারতবর্ষ
বলতে ইচ্ছে করছে
তোমাকে আমি ভালোবাসি
এখানে প্রশান্তি এখানে হিমালয়।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দু ভাই। ভবনাথ বড়। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতার ছোট আদালতে ওকালতী পরীক্ষা দেওয়া দেবনাথের হল না। পরে বিদেশে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরেছেন।

আষাঢ় মাস। এবারে রথের সঙ্গে ঈদ ও রবিবার জুড়ে গিয়ে কাছারি তিন দিন বন্ধ। মাদার ঘোষ হারু ঝন্টু এবং হিমচাঁদ গড়মণ্ডলে চললো রথের মেলা দেখতে। হারুর মতলব আবার শুধু রথ দেখা নয় থিয়েটারের সিন আঁকার কত দূর কী হল তাও একবার সরেজমিনে দেখে আসা।

এদিকে পুজো প্রায় আসি আসি। হারু সরকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে গিহার্শালের লোক ডেকে বেড়াচ্ছে। ছোট কর্তা বরদাকান্ত জলচৌকিতে বসে ফর্দের ছাড়ছুট ধরিয়ে দিচ্ছেন। দেবনাথ বাড়ি আসছেন। সঙ্গে বিস্তর মালপত্তর—কলকাতা থেকে কেনাকাটা করে নিয়ে আসছেন।

কতকাল পরে ভরা বিলে নেমেছেন বলে দেবনাথের রোমাঞ্চ লাগে। এই পথটাই বেশী চালু। বিল ভেঙে গাঙ-খাল পাড়ি দিয়ে ন'পাড়া স্টেশনে ট্রেন ধরা, আবার ট্রেন থেকে ন'পাড়ায় নেমে বাড়ি যাওয়া। শুকনোর সময়টা হাঁটতে হাঁটতে পায়ের নাল ছিঁড়ে যেত। বর্ষার সময়টা মজা, এই আজকের মতন।

এই অকূল সমুদ্রে লাইট হাউস বানিয়ে দিয়েছিলেন চাঁদুবাবু। যার পোষাকী নাম চন্দ্রকান্ত ঘোষ।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নেবা নাকি?

দেবনাথ বললেন, দাও চাট্টি—

নয়না, পুঁটি, তারাবাইন টোরাকই-হরকয়লা মাছ। বঁকদাজ পাত্রের অভাবে গামছা পেতে ধরল—শানকিতে মাছ তুলে এক শানকি ঢেলে দিল গামছায়। আরও কয়েকটা দিতে যাচ্ছে দেবনাথ আপত্তি করে উঠলেন : উঁহু, আর নয়। কুচোমাছ কোটা-বাছা করবে কে এত? পৌঁছুতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে—ঘরে কি আছে না-আছে তাই কিছু সম্বল করে যাওয়া। কত দিতে হবে, বলো।

দাও যা হয়। হাট-বাজার নয় টোঙে এসে মাছ চাইলে, দরদাম কি করতে যাব? যেমন খুশি দিয়ে দাও।

দেবনাথ বললেন আমি বাইরে থাকি, দরদাম কিছু জানি নে। মাঝি, তুমিই বলে দাও উচিত দাম কি হতে পারে।

গামছার মাছ মাঝি একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখল। বলে সিকি একটা দিয়ে দেন বাবু—

গেঞ্জি খুলে দেবনাথ বললেন, টাকার ভাঙানি হবে তো?

টোঙের মানুষ ঘাড় নাড়ল : উঁহু, বিলের মধ্যে কেনাবেচা কোথায়? তা ছাড়া পয়সাকড়ি কিছু হলেই সঙ্গে সঙ্গে অমনি বাড়ি রেখে আসি।

দেবনাথ বললেন, খুচরো চার আনা তো হচ্ছে না—আনা দুই হতে পারে। এক কাজ করো অর্ধেকগুলো মাছ তুলে নাও তুমি।

যা দেওয়া হয়েছে, আবার তা তুলতে যাবো কেন? যা আছে দিয়ে যাও। বাকি পয়সা যে দিন হয় দিয়ে যেও। না দিলেই বা কী?

ঘাটে ডিঙি লাগল। ভর সন্ধ্যাবেলা। বাড়ির লাগোয়া উলুক্ষেত হাটখোলা ও আমবাগান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সামান্য কয়েকখানা ধানক্ষেত পার হয়ে গিয়ে। শুকনোর সময় একদৌড়ে গিয়ে ওঠা যায়। এখন ভাঙা-পথে অনেকখানি ঘুরে প্রায় অর্ধেক গ্রাম চক্কোর মেরে বাড়ি পৌঁছতে হবে। দেবনাথ চললেন বঁকদাজ দুজন নৌকো আগলে রইল।

P 35,954

নতুন মণ্ডপে ছেলেপুলের ভিড়। প্রতিমা চিত্তির হচ্ছে—দু-পাশে দুই জ্বলন্ত-লণ্ঠন, আলোয় অনেক দূর অবধি উদ্ভাসিত হয়েছে। কমল-পুঁটিও সেখানে — সকলের আগে কমল দেখেছে, বাবা বাবা করে ছুটতে ছুটতে এসে সে বাপের হাত ধরল। মণ্ডপের সামনে এসে দেবনাথ মুহূর্তকাল দাঁড়ালেন। চার কারিগর কাজে লেগে আছে—রাজিবপুরের পালেদের চারজন।

দেবনাথ বললেন, এখনো সারা হয় নি? চালচিত্তির ধরেই নি, দেখতে পাচ্ছি।

মাতব্বর কারিগর বলে, যত বাতই হোক হাতের কাজ সারা করে ফেলব। দিনমানে কাজ আমাদের গাঁয়ে ভটচাজ্জি-বাড়িতে। সন্ধ্যেয় আবার আসব এসে চালচিত্তির ধরব। চার হাতে কাজ—কদিন লাগবে? হয়ে যাবে সময়ের মধ্যে। এক বাড়ি তো নয়, সব বাড়ি সমানভাবে সামাল দিয়ে বেড়াচ্ছি।

হাটবার আজ কৃষময় আর মাহিন্দার অটলকে নিয়ে ভবনাথ হাটে চলে গেছেন। রীতিমতো ওজনদার কেনাকাটা—সেই কারণে শিকে-বাঁক ধামা-ঝুড়ি গেছে। বাড়িতে মানুষ কিলবিল করছে। আত্মীয়কুটুম্ব অনেক এসেছেন আরও কেউ কেউ আসবেন। দেখে দেবনাথ বড় খুশি—এমন নইলে কর্তা-বাড়ি কিসের? পায়ের গোড়ায় ঢিবঢাব প্রণাম করছে অধিকাংশই দেবনাথ চেনেন না। বিদেশে পড়ে থাকেন না-চেনা আশ্চর্য নয়। কিন্তু ভবনাথ চিরকাল দেশে ঘরে থেকেও তো চিনতেন না—ছোটকর্তার ফর্দ অনুযায়ী নেমন্তন্ন পাঠিয়েছিলেন, আসবার পথে চেনা-জানা হয়েছে। উমাসুন্দরী ভবনাথের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন : অমুকের অমুক ইনি। আর দেবনাথ বয়স বুঝে প্রণাম করছেন। না করলে ফিরে গিয়ে নিন্দেমন্দ করবে : দেখ দুটো পয়সা রোজগার করে বলে ঘাড় আর নীচু হয় না মোটে। এক বৃদ্ধার পায়ের ধুলো নিতে গেলে ফোক্লা মুখ নাচিয়ে না-না-করতে করতে তিড়িং করে তিনি পিছিয়ে গেলেন : কী সর্বনাশ, পায়ে হাত পড়লে পাপ হবে, হিসাব মতন তুমি যে খুড়ো আমার।

উমাসুন্দরী বললেন, বয়েসে তবু তো কত ছোট—

ওটা কি বললে কেষ্টর মা, সাপটা ছোট বলে বিষ তার কি কম হয়ে থাকে?

হিরন্ময় শিশুবরকে নিয়ে নৌকোয় মালপত্র আনতে ছুটল। দুজনে কি হবে—চাষীপাড়া থেকে শিকে-বাঁকসহ আরও কটিকে জুটিয়ে নিল সঙ্গে। তিনটে কাপড়ের বাণ্ডিল দমাদম করে রোয়াকে এনে ফেলল। কপালের ঘাম মুছে হিরন্ময় বলে কলকাতার দোকানের যত কাপড় কাকা বোধহয় সমস্ত তুলে এলেছেন।

দেবনাথ হাসতে হাসতে বলেন, নতুন কাপড় পরে পুজো না দেখলে পুজো আবার কিসের? কিন্তু সকলের জন্য তো হয়ে উঠল না—বাছাই বিবেচনা করে দিতে হবে। অগ্নিমূল্য হয়েছে—লাট্টু ধুতি এই সেদিন চোদ্দ-পনের আনা জোড়া ছিল পাঁচ সিকের কমে তা ছাড়তে চায় না। বেশি মাল নিচ্ছি বলে শেষটা তিন আনায় রফা হল। এ রকম

হলে লোকে তো কাপড় পরা ছেড়ে দিয়ে সেকালের মতন গাছের বাকল পরবে।

তরঙ্গিনী ঘরে ঘরে ডেকে বেড়ান : ওঠো, ঢেঁকশালে চলো। চিঁড়ে কোটা হবে আর কখন? এখন তো পর পর আসতে থাকবে। গোলমালে ঘটে উঠবে না। কলসি কলসি ধান ভেজানো জল, নামাতে হবে তো সেটা।

তরঙ্গিনীর মাথায় জট নড়ে। রাতের এখনো কী হয়েছে—টেমী ধরে ঘরে ঘরে ডেকে তুলছেন। শীত-শীত লাগছে বেশ, আঁচলের মুড়ো ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। এখন শীত ভানা-কোটা শুরু হয়ে গেলে শীত উড়ে পালাবে। ষষ্ঠীর দিন থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো অবধি ঢেঁকির পাড় পড়তে নেই। কত লোক আসবে, কাজকর্ম করবে—খই-চিঁড়ের বিস্তর খরচ। গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে থাকলে হবে কেন?

ওঠরে বিনি ওঠো বড়বউ, উঠে এসো বসন্তর মা। বলি তিন কলসি ধান ভিজিয়েছ কাল মনে আছে সে কথা?

শুধু ওই এক বাড়ি নয়, বাড়ি বাড়ি এমনি। ঢ্যা-কুচকুচ, ঢ্যা-কুচকুচ—সব ঢেঁকিশালে শোন, শেষ রাত্রি থেকে পাড় পড়ছে।

গ্রাম গুলজার। নিত্যিদিন মানুষ এসে পড়ছে। পুজোর সময় বরাবরই আসে এমনি। বাইরে কাজকর্মে থাকে ছুটি পেয়ে তারা বাড়ি আসে। অন্যান্য বছর পুজো ছিল না, তবু এসেছে—পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় সেটা বড় কম কথা নয়। পুজো বলে এবারে অতিরিক্ত ভিড়। গাঁয়ের মানুষ ছাড়াও ভিন্ন জায়গার মানুষ পুজো দেখবার ইচ্ছায় কুটুম্ববাড়ি আসছে। জোড়া তালতলার ঘাটে যখন-তখন ডিঙি ডোঙা এসে লাগে, জুতো হাতে নিয়ে নেমে পড়ে মানুষ। আবার নাগরগোপ থেকে দেড় ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটেও আসছে সব। চিঠি লেখা আছে অমুক দিন যাচ্ছি। সময় আন্দাজ করে পাকা রাস্তার উপর লোক বসে থাকে। থালি-হাতে কেউ আসে না, কাপড়-চোপড় মিষ্টি-মিঠাই ফরমাসের টুকিটাকি থাকবেই—সেই সমস্ত মাল বয়ে নিয়ে যাবে। বাড়ির ছেলেপুলে ঘন ঘন হরিতলা অবধি চলে যায়। ফিরে এসে বলে, নাঃ এলো না আজকে। হঠাৎ মোড় ঘুরে মানুষটি দেখা দিল, পিছনের লোকের মাথায় বোঁচকা-বুচকি। এয়েছে এয়েছে—বলতে বলতে খুচরো এটা-ওটা মানুষটির হাত থেকে নিয়ে ছেলেপুলেরা দৌড় দিল, বাড়িতে আগে আগে গিয়ে খবরটা দেবে। উনুনের আগুন নেভে না আজকাল আর এক খাওয়া মিটতে না মিটতে আবার চড়ে যায়। বউগুলো খেটে খেটে সুখ করে নিচ্ছে। গ্রামের দিন আজকাল ফুড়ুত করে যেন উড়ে চলে যায় টেরই পাওয়া যায় না। রাত্রে ঘুমে যখন চোখ বন্ধ জড়িয়ে আসে যেখানে হোক একটা মাদুর নিয়ে গড়িয়ে পড়ে পলকে রাত কাবার হয়ে যায়।

হাটে কেনাকাটার খুব ধুম। সব বাড়ি থেকে হাট করতে যাচ্ছে, ভাল মাছটা শাকটা কেনার জন্য কাড়াকাড়ি। নিতান্ত গরিব মানুষটাও ট্যাঁকের অবস্থা ভুলে বসে আছে : আহা দেশে ঘরে থাকে না, কদিনের তরে এসেছে—নিজেরা খাই না-খাই ওদের পাতে কিছু ভালমন্দ যাতে পড়ে দেখতে হবে বইকি।

এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় চলতে-ফিরতে কত রকম টানের কথা কানে এসে ঢোকে। দত্তবাড়ির বউটা খাস কলকাতার মেয়ে—এলুম-গেলুম হলুম বলে কথা বলে। চারি সুরি ফুন্টি মেয়েগুলো হেসে কূল পায় না। ওরা আরও জুড়ে দেয় : গেলুম হলুম হালুম-হুলুম। বলে আর হেসে লুটোপুটি খায়। তেমনি এসেছেন উত্তর বাড়িতে যজ্ঞেশ্বরের শালা—ঢাকার বাসিন্দা তিনি। বললেন, ওয়ান থনে আইতে বড় কষ্ট। জল্লাদটা পাড়ায় এসে সেই টানের অনুকরণ করে আর লোক হাসিয়ে মারে।

নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন লেগেই আছে, কোন বাড়ি কোন দিন বাদ নেই। তোমার জামাইর নেমন্তন্ন পশ্চিমবাড়ি, আবার তোমার বাড়িতেই ঐদিন স্বারিক পালের ভাগনি দুটো বারান্দি থেকে এসেছে। তাদের নেমন্তন্ন দিয়ে বসে আছ। চিরদিন তো থাকতে আসে নি, পুজো কাটিয়ে টেনেটুনে আর হয়তো পাঁচ-সাতটা দিন রাখা যাবে। অতএব দেরী করে বয়ে-সয়ে করার জো নেই সময়ে বেড় পাবে না। তাড়াহুড়ো না করলে হাতনেয়ে বসিয়ে দুটো ভাত খাওয়ানো ঘটে উঠবে না।

আহা দ বৈরাগীর গলা পাওয়া যায় ভোরবেলা এক-একদিন। মায়ের পিছন পিছন মায়ের দু-কাঁধে দু হাত রেখে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। পূববাড়িতে এসেছেন, বাড়ির সকলে এখনো ওঠে নি। উঠানে দাঁড়িয়ে বৈরাগী আগমনী ধরেছেন।

ওঠো গো মা গিরিরাণী
ঐ এলো নন্দিনী তোর—
(ও মা) বেহুঁশ হয়ে রইলি পড়ে
এমনি বিষম ঘুম-ঘোর।

তরঙ্গিনী রান্নাঘরে গোবর দিচ্ছিলেন। ন্যাতা হাতে দ্রুত বেরিয়ে দাওয়ায় দাঁড়ালেন। শুনতে শুনতে দু চোখে জল টলমল করে ওঠে। মর পোড়ারমুখী গিরিরাণী অনেকা—মা মেয়ে এসে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে, ঘুম তবু দু-চক্ষু ছাড়ে না।

বাইরের উঠানের ওদিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। ষষ্ঠীর দিন চণ্ডলা আসবে—সুরেশ নিয়ে আসবে দুটো দিন বাকী তার এখনো। হিসাবের বাইরেও তো সংসারে কত জিনিস ঘটে। কী কারণে, ধরো সুরেশের অফিস আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ গিয়ে পড়ে অবাক করে দেবে সেই জন্য ধরো। যুগলে এসে হাজির।

গান শেষ করে বৈরাগী চাল-কাঁচকলা-পয়সা বিদায় নিয়ে আর এক বাড়ি গেল তরঙ্গিনী নিশ্বাস ফেলে আবার গোবর লেপার কাজে গিয়ে লাগলেন।

দেবেন্দ্র চক্রবর্তী এসে উপস্থিত—দেবনাথ যাকে মিতে-মিতে করেন, কাজের গুরুর পাঠশালায় যার সঙ্গে পড়তেন। সেবারে দেখা হয় নি, মেয়ের বাড়ি ছিল সে তখন। মাঝে সে এসে খবর নিয়ে গেছে, ঘাড়ে পুজো পড়েছে এঁদের পুজোর সময় দেবনাথের না এসে পরিত্রাণ নেই। হিসাব কষে দেবী-চতুর্থীর দিন সে পূর্ববাড়ি এসে পড়ল। কালো রোগা লম্বা আকৃতি — সব মিলিয়ে প্রায় এক তালগাছ। হেঁটে আসছে—পা একখানা এখানে, পরের খানা ফেলল হাত পাঁচ-ছয় এগিয়ে। মানুষের পা এত দীর্ঘ কী করে হয়—সন্দেহ জাগে দুই পায়ে দুই রণপা লাগিয়ে ছুটছে। ছুটুক আর যা-ই করুক হুড়ুপ-গুড়ুপ আওয়াজ তুলে হুঁকোটানার বিরাম নেই। কষে এক-একটা দম দিয়ে যাবতীয় ধোঁয়া মুখাভ্যন্তরে পুরে ফেলছে, ছেড়ে দিচ্ছে ক্ষণ পরে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে আগ্নেয়গিরির ধূম-উদ্গীরণের মতো। ঠোঁটের উপরে গোঁফ আছে এবং নিম্নে সামান্য দাড়ি—সেগুলোর কালো রঙ তামাকের ধোঁয়ায় জ্বলে জ্বলে কটা হয়ে গেছে। হুঁকোই বা কী! আয়তনে বিপুল ডোবা থালের নীচের দিকটা সূক্ষ্ম হতে হতে একেবারে সূচিমুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কালো কুদ আবলুস কাঠের নলচে নিয়মিত তেল মাখানোর গুণে আদ্যন্ত ঝিকমিক করে, হাত থেকে পিছলে যাবে শঙ্কা হয়। নলচের গলায় বাঁধা রয়েছে হুঁকো আর ঝাঁঝরি-কাটা টিনের চাকতি। হুঁকো থাকায় যত্রতত্র টাঙিয়ে রাখা চলে। আর কলকের আগুন ঝাঁঝরি চাপা দিয়ে দেয় ফলে আগুন উড়ে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে না।

দেবেন চলল তো তার শখের হুঁকোও চলল সঙ্গে সঙ্গে। এক কলকে শেষ হয়ে গেলে পথের মাঝেই উবু হয়ে বসে নতুন এক ছিলিম সেজে নেবে। যতক্ষণ জাগ্রত আছে হুঁকো টানা লহমার তরে কামাই না যায়। রাতেরবেলা ঘুমানোর সময় চাল কি বেড়ার সঙ্গে হুঁকো টাঙিয়ে রাখে—কিন্তু ঘুম আছে নাকি পোড়া চোখে? তামাকের পিপাসায় তড়িঘড়ি উঠে পড়ে। কুটুম্ব বাড়ি গিয়ে সাজা তামাক সঙ্গে সঙ্গে পেলো তো ভাল, নয়তো নিজেই লেগে যাবে — মান টানিয়ে ভদ্র হয়ে বসে থাকার ধকল সইবে না। মোকদ্দমার সাক্ষী দিতে কাঠগড়ায় উঠেছে হুঁকো বাঁহাতে ঝুলোনো। মাঠেঘাটে বনেবাদাড়ে যেখানেই যাক, হুঁকো ছাড়া দেবেন নেই। রথের বাজারে পোড়া মাটির খেলনা-হুঁকো পাওয়া যায়—লোকে গল্প রটিয়েছে জন্মের সময় দেবেন নাকি অমনি এক সেট হুঁকো মুঠোয় নিয়ে মাতৃগর্ভ থেকে পড়েছিল। এবং যেদিন সে শ্মশানের মহাযাত্রায় যাবে, পড়সিস্বজনেরা ঠিক করে রেখেছে জ্বলন্ত চিতায় মড়ার সঙ্গে শখের হুঁকো-কলকে এবং কিছু তামাক-টিকে দিয়ে দেবে। অচেনা পরলোকে গিয়ে তামাকের অভাবে গোড়াতেই চোখে অন্ধকার না দেখে।

যাকগে, যা হচ্ছিল। সোনাখড়ি পূববাড়ি দেবেন এসে উপস্থিত। কাঁধে যথারীতি ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে চটি গলায় চাদর মুখে হুঁকো। ব্যাগ খুলে পুঁটুলিতে বাঁধা পাশার সরঞ্জাম বের করতে করতে ক্ষুব্ধ স্বরে বলে বোশেখ মাসে এসেছিলে তখন আমি রেণুর বাড়ি গোঁসাইগঞ্জে। নমাস

ছ'মাসের পথ নয়—কাক পক্ষীর মুখে একটু খবর পেলে হামলা দিয়ে এসে পড়তাম।

সক্রোধে তাকিয়ে দেবনাথ বলেন, ও কি মিতে হুক্ক পাতছ সকালবেলা এখন—

দেবেন বলে এখনই কাল হে। কাজের বাড়ি জমে উঠতে উঠতে আমাদের এক-বাজি দু-বাজি সাবা হয়ে যাবে তার মধ্যে।

দেবনাথ হেসে বলেন এক বাজিতে মানায় না—দু-বাজি! আম্বা বলিহারি যাই।

দেবেন বলছে, উঁ, তোমার সঙ্গে কত দিন বসি নি! তখন তো পাশা তোমার হুকুমের গোলাম। হাঁক পেড়ে বললে ছ-তিন-নয়—তাই পড়ল। বললে, কচে বারো—ঠিক তাই। এখন কি রকম।

ভাব চটে গেছে মিতে পাশা আমায় ভুলে গেছে। ছুঁই নি পাশা কত দিন—সময়ই নেই।

সেকালের দুই পরম সুহৃদ, পাশা এবং দেবেন চক্রবর্তী—তাদের সামনে পেয়ে কাজের দায়িত্ব যতই থাক দেবনাথ না বলতে পারলেন না। পাশা তিনটে তুলে নিয়ে দু-হাতে রগড়ে নিলেন একবার। হাত শুড় শুড় করছে দান ফেলবার জন্য। বললেন, দুজনে কি হবে? খেড়ি কই?

এসে পড়বে। সাজিয়ে নিই আগে কাতার দিয়ে আসবে। ঠেলে কুল পাবে না।

সত্যি তাই। একে দুয়ে বেশ কিছু মানুষ। হাবু সরকার কোন দিকে ছিল—সবো সরো করতে করতে মানুষজন ঠেলে দেবনাথের খেড়ি হয়ে বিপরীতে বসে গেল। দেবেনের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর বসলেন। ঘন্টু অক্ষয় ভুলো শ্যামাপদরাও খেলে ভাল, কিন্তু হিরন্ময়ের জুড়ি ও সমবয়সী হয়ে কাকামশায়ের সঙ্গে খেলা চলে না। খেলা দেখছে তারা চতুর্দিক ঘিরে জুত দিচ্ছে, কলহ ও কথা-কাটাকাটি করছে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছে মাঝেমধ্যে।

দেবনাথ সুবিধা করতে পারছেন না। চর্চা নেই তো বটেই তার উপর লোকজন মিনিটে মিনিটে এসে মনোযোগে বাধা ঘটাচ্ছে। হাজু ময়রার ফর্দটা কার কাছে চণ্ডীপাঠের কথা পাকা হয়ে গেছে তো? হ্যাজাকের ম্যান্টল না থাকে তো কেশবপুরে লোক যাচ্ছে—নিয়ে আসুক। ইত্যাকার হরেক প্রশ্ন ভবনাথের। অক্ষক্রীড়া ব্যসন বিশেষ—অগ্রজ গুরুজন হয়ে নিজে তিনি এই আসবে আসতে পারেন না লোকমুখে ঘন ঘন প্রশ্ন পাঠাচ্ছেন।

ঘাড় তুলে দেবনাথ একবার নজর ঘুরিয়ে দেখে আঁতকে উঠলেন : আসে সর্বনাশ, কাজের মানুষ সব কটি যে এখানে। তাড়াতাড়ি সারো মিতে। দাদা গরম হচ্ছেন—ঘন ঘন লোক পাঠানোর মানেটা তাই।

এতক্ষণ যজ্ঞবাড়ির হুঁকোয় চলছিল এইবাবে দেবেন নিজের হুঁকো নামিয়ে নিয়ে সাজতে বসল। ফরমায়েসি কলকে, হিমালয় গিরি বোধহয় ঢোকানো যায়—সেই কলকে কানায় কানায় তামাকে ভরতি করল। অতএব বলে দিতে হয় না, দেবেন চক্‌কোত্তি এইবারে বেরিয়ে পড়বে—পথ হাঁটবে।

দেবনাথ বললেন, এক্ষুনি কেন মিতে? পাকশাক করো এখানে, ওবেলা যেও।

মালসা থেকে ঘুঁটের আগুন কলকের উপর তুলে ভুড়ুক-ভুড়ুক কয়েকটা টান দিয়ে দেবেন বলল, খাজনার তিনটে টাকা দেবো-দেবো করে হরিশ কুণ্ডু আজ চার-পাঁচ মাস ঘোরাচ্ছে—তার বাড়ি হয়ে যাবো এখন। দেবী ঘটস্থাপনা হয়ে গেলে তারপরে আর টাকা বের করবে না—ছুতো পেয়ে যাবে।

ছক-গুটি পাশা ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল আজ কিছু হল না, তাড়াহুড়োর জিনিস নয়। মচ্ছব মিটেমেটে যাক—

দেবনাথ সোৎসাহে বলেন, কোজাগরী রাত্রে পঞ্জিকার বিধান রয়েছে—

থাকবে তুমি সেই অবধি?

দেবনাথ বললেন কালীপুজোর পরেও আছি। ভাই-দ্বিতীয়ায় দিদির হাতের ফোঁটা নিতে হবে এবার, ঐজন্যে তিনি আসবেন।

একগাল হেসে দেবেন বলল পাকা হয়ে রইল কিন্তু মিতে। নিশি-জাগরণ অক্ষক্রীড়া চিপিটক-নারিকেলোদক ভক্ষণ — শাস্ত্রের বিধান অক্ষরে অক্ষরে মানব আমরা। আমার খেড়ি আমি নিয়ে আসব, তোমার খেড়ি তুমি ঠিকঠাক করে ফেল এর মধ্যে। কেমন?

দুর্গাপুজো সকলের সেরা। পুজো মাত্র নয় উৎসব—দুর্গোৎসব। এদিকে-সেদিকে কিছু খুচরো পরবও আছে। দুর্গাপুজো দেরীতে—কার্তিক মাসে। খুচরোরা এবারে আগে এসে যাচ্ছেন।

তিরিশে আশ্বিন, সংক্রান্তির দিন। মন্ডপে প্রতিমা রং চিত্তির হচ্ছে ওদিকে বিলের ধান বনের মধ্যেও একটুকু ব্যাপার। এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ-খাওয়ানো। এক হাঁটু কাদা ভেঙে বুড়ো-মানুষ ভবনাথ নিজেই বিলে চলে গেলেন, সঙ্গে শিশুবর। এ পুজোর পুরুত বলতে হবে শিশুবরকেই।

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে,
মা-লক্ষ্মী গর্ভে বসে,
সাধ খাও মা সাধ খাও—

এই হল মন্তোর। মন্তোর বলে শিশুবর ক্ষেতের ধারে এক ফোঁটা দুধ ঢেলে দেবে। ধানের ভিতরের দুধ, শস্যের যা আদি অবস্থা—সেটা যেন খুব ভাল হয় এই কামনা। দুধ দিয়ে তারপর বাতাসা ছড়িয়ে দেবে, অর্থাৎ চালের স্বাদ যেন মিষ্টিও হয়। শিশুবর চাষ-বাসও করে—অতএব ক্ষেত হল তার মেয়ে। গর্ভবতী মেয়েকে আপনজনেরা সাধ খাওয়ায় না—ক্ষেতকে মা ডেকে শিশুবর সাধ খাওয়াচ্ছে দেখুন।

সংক্রান্তির রাত ভাল করে না পোহাতেই আবার এক পরব। গারসি! পোহাতি-তারা আকাশে। বাদুড়ের ঝাঁক কালো কালো ছায়া ফেলে বাসায় ফিরছে। তরঙ্গিনী উঠে ডাকাডাকি করছেন: ওঠো সব। কমলকে তুলে বসিয়ে দিলেন: ওঠ রে, গারসি করবি নে?

সবাই উঠেছে সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো বলে বাছাবাছি নেই। শরিক বংশীধরের বাড়িতেও উঠে গেছে, শুধুমাত্র সিধু বাদ। দক্ষিণের ঘর ও দালানের মাঝে ভিটার উঁচু খানিকটা ফাঁকা জায়গা—'বারান্ডা' নামে জায়গাটুকুর পরিচয়। আপনা আপনি একটা কাঁঠাল চারা জন্মেছে আর কয়েকটা কৃষ্ণকলি ফুলের গাছ। গারসি করতে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি ঐ একটা জায়গায় এসে সব জমল।

আশ্বিনে রেঁধে কার্তিকে খায়,
যে বর মাগো সেই বর পায়—

ছড়া কেটে বিনো পুকুরঘাটে দৌড়ল ঘটি নিয়ে। শ্রীতকর্মে জলটা শুধু টাটকা লাগে আর সমস্ত বাসি। রাতজুড়ে পোহালেই যে দিন, তার মধ্যে উনুনে আগুন দেওয়া যাবে না—চিঁড়ে-মুড়ি বাসি-পান্তা খেয়ে সব থাকবে। বিলের উপরে গ্রাম বলে এরই মধ্যে বেশ শীত-শীত ভাব। এক আঁটি পাটকাঠি নিয়ে মাহিন্দার অটল এসে গেল—খালি গা-হাত-পা দেহের উপর আবরণ বলতে হাঁটুর উপরে তোলা এক চিলতে কাপড়। তুর-তুর করে কাঁপছে সে। বড়গিন্নি বললেন জড়িয়ে আয়রে গায়ে একটা কিছু—

অটল অবহেলায় উড়িয়ে দিল : কিছু লাগবেনে না ঠাকরুণ। জাড় আর কতক্ষণ?

কমল পুঁটিকে বলে, সিগারেট খাবো আমিন দেখিস।

পুঁটি বলে, আমিও—

কমল অবাক হয়ে বলে, সে কী রে, তুই যে মেয়েছেলে।

আজকে অত মেয়েছেলে বেটাছেলে নেই। গেল-বছর খাইনি অসুখ ছিল বলে। জানলার উপরে চুপচাপ বসেছিলাম।

কমলের স্ফূর্তি মিইয়ে গেল। দিদিটাও খাবে—তবে আর পুরুষমানুষ হয়ে কী হল, ধুস!

আপনার পরিবারের সবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য
হাওড়া সমবায়িকা

বিনো জল নিয়ে ফিরেছে। হলুদ-বাটা সর্ষে-বাটা মেথি-বাটা তেল ঘি বাটিতে-বাটিতে। কুলগাছের নতুন পাতা একটা বাটিতে বেটে রেখেছে। কাজলপাতায় কাজল পরানো। মুঠোখানেক কাঁচা তেঁতুল। থরে-থরে সমস্ত কুলোয় সাজিয়ে নিমি কঁঠাল-তলার ঐখানটা এনে রাখল।

পাটকাঠির কাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘটির জলে হাত ধুয়ে নিয়ে আগুনে হাত সেঁকছে সবাই, পা সেঁকছে। কাঁচা তেঁতুলগুলো পাটকাঠির আগুনে পোড়ায়—খোলার নিচে ক্ষীরের মতন হয়ে গেছে। এবারে তেলে-হলুদবাটায় মিশিয়ে রগড়ে রগড়ে গায়ে মাখে, মেথি তেঁতুলপোড়া ইত্যাদি মাখে। ঘি-ও মাখে ঈষৎ। মাথার চুলে কিন্তু মেখো না খবরদার। চুল সাদা হয়ে যাবে। এক-ফোঁটা এই যে কমলবাবু, রাতারাতি যে পাকাচুলো বুড়ো হয়ে গেছে দেখবে।

পাটকাঠির এক-এক টুকরো ভেঙে সকলকে দিচ্ছে—এক মুখে তার আগুন। ফুকফুক করে টানছে কমল যাকে বলেছিল সিগারেট খাওয়া। খেতে হয় এই রকম—গারসির বিধি। সর্বসমক্ষে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করা—কী মজা কী মজা। কিন্তু কাশি খেয়ে যাচ্ছে যে বড্ড।

ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলা। পয়লা কার্তিক আজ—আহ্লাদ ও মা বগলা আজ থেকে টহলদারি ধরলেন। বৈশাখ আর কার্তিক বছরের মধ্যে এই দুটো মাস প্রভাতী গাইতে হয়। গাইছেন আজ আগমনী গান। ক'দিন পরে বিসর্জনী—মানুষ কাঁদাবেন বিসর্জন গেয়ে গেয়ে। দুর্গোৎসব চুকেবুকে যাওয়ার পর হরিকথা, কৃষ্ণকথা—বরাবরকার যে সমস্ত গান। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আওয়াজ আসে নতুন বাড়ির ওদিক থেকে—সাতসকালে জল্লাদের দল হা-ডু-ডু খেলায় নেমেছে। ভোরের এই খেলাধুলো গারসিরই অঙ্গ—গারসির দিন এমনি দৌড়ঝাঁপের খেলা খেলে। শীতকাল আসছে—গারসি করলে হাত-পা ফাটার ভয় থাকে না।

আজই আবার সন্ধ্যাবেলা ওপাড়ার শশধর দত্তমশায়ের উঠানে আকাশপ্রদীপ আকাশে চড়ে বসবেন সকাল হলে ভুঁয়ে নামবেন। পুরো কার্তিক জুড়ে প্রদীপের এই ওঠা-নামা। আগে চাঁদুবাবু করতেন, তিনি গত হবার পর আজ ক'বছর শশধর ধরেছেন।

কলকাতায় থাকার দরুন কালিদাসটা নাস্তিক হয়ে পড়েছে জিনিসটা বাপের উদ্ভট খেয়াল বলে মনে করে সে। দু-ভায়ে হাসি-তামাসা চলে—কালিদাস বলে, সারারাত ধরে এক পিদ্দিম তেল পুড়িয়ে গুচ্ছের মরা পোকা আকাশ থেকে নামিয়ে আনা। এছাড়া আর কোন মুনাফা নেই।

আছে বে আছে। হিসাবি মানুষ বাবা হুট করে কিছু করেন না, পিছনে গভীর মতলব থাকে। এই আমাদের ভাইদের নামের ব্যাপারে দেখ। দাদার নাম ছিল হরিদাস আমার নাম নারায়ণ দাস, তোর কালিদাস। সেই কতকাল আগে ভেবেচিন্তে বাবা নামকরণ করেছেন।

নামকরণের গূঢ় তাৎপর্য নারায়ণ দাস পিতৃ মুখে শুনেছে, ভাইকে সে বুঝিয়ে দিল: ওরে হরি ওরে নারায়ণ, ওরে কালি—ছেলেদের শশধর হরবকত তো ডাকবেন, ভগবানকেও অমনি ডাকা হয়ে যাবে। বিনি খাটনিতে আপনাআপনি পুণ্য-লাভ। এতদূরে অবধি তলিয়ে দেখেন উনি—ইহলোক-পরলোক কোন দিকে দৃষ্টি এড়ায় না। এই আকাশপ্রদীপ চালু করার মধ্যে পারলৌকিক তদ্বির। মহালয়ার পার্বণশ্রাদ্ধ নিতে স্বর্গীয় কর্তারা পিতৃ-লোক থেকে এখন ভূলোকে নেমে পড়েছেন—বুড়োমানুষরা অনভ্যাসে হোঁচট না খান, সেই জন্যে তেল পুড়িয়ে আলো দেখানো। বয়স হয়েছে শশধরের—অঁচিরে উনিও ঐ স্বর্গীয়দের দলে গিয়ে পড়বেন। আলো-টালো দেখিয়ে ওঁদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ খাতির জমিয়ে রাখছেন।

প্রতিমা চিত্রিত সারা হতে চতুর্থী অবধি লেগে গেল। চালচিত্রে এখনো হাত পড়েনি—দুই কারিগর দুই পাশ দিয়ে ঘোর বেগে লেগে গেল। রাজার শিরে রাজছত্র ধরে—সেই রকম খানিকটা। আধেক গোলাকার জায়গাটুকুতে নানান পৌরাণিক ছবি—ঠিক মাঝখানে দেবী দুর্গার মাথার উপরে মহেশ্বর, ডাইনে-বাঁয়ে পর পর ব্রহ্মা বিষ্ণু রামরাজা দেবর্ষি নারদ সমুদ্রমন্থন দক্ষযজ্ঞ দশমহাবিদ্যা। সর্বশেষ দুই প্রান্তে দেবী রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করছেন। নাগাল পায় না বলে প্রতিমার সামনে ভারা বেঁধে নিয়েছে সেখানে বসে কাজ করছে।

বেলগাছের গোড়ায় মাটির বেদী—বোধনতলা। কাঁচা বেদীতে এবারের ঘট-স্থাপনা। মা যদি করুণা করে বছর বছর এমনি আসেন, ইটে-গাঁথা পাকা বেদী হতে পারবে। ঢাক বাজে ঢোল বাজে। বড় পাল-মশাই নিশিরাত্রে কখন প্রতিমার মুখে ঘামতেল মাখিয়ে গেছেন—ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি এসে পার্বতীর মুখ-খানা হাসিতে যেন ঝিকমিক করছে। কলা-বউকে স্নান করিয়ে আনল নতুন পুকুর থেকে, পুকুর কাটা সার্থক। শুধু এক পুরবাড়ির পুজো কে বলে গ্রাম জুড়ে পুজো লেগে গেছে। বাড়ি বাড়ি আলপনা, চৌকাঠের মাথায় সিঁদুর। সন্ধ্যা হলে ধূপ জ্বালিয়ে দেয় প্রতিটি ঘরে সন্ধ্যা দেখায় গাল ফুলিয়ে শঙ্খ বাজায় মেয়ে-বৌরা। কত মানুষ এসে পড়েছে ছোট গ্রামে মানুষ কিলবিল করছে। আসছে তবু কামাই নেই এখনো। এ-হে ও-হো হাঁক পেড়ে পালকি আসে ক্যাচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে গরুর গাড়ি আসে ধুজি ঠকঠকিয়ে জোড়া-তালগাছতলায় ডোঙা-ডিঙি এসে লাগে। আর কাজকর্ম ফেলে তরঙ্গিণী ক্ষণে ক্ষণে বাইরের উঠানের হুড়কোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। না সুরেশ-চঞ্চলা নয়-ষষ্ঠী পার হয়ে যায়, মেয়ে-জামাই চিঠিপত্র বন্ধ করে আছে।

ফুল—অনেক তো ফুল চাই। ফুলের শখ আর কজনের। সব ফুলে আবার পুজোও হয় না। গাঁদা দোপাটি টগর কৃষ্ণ-কলি অপরাজিতা জবা ঝুমকোজবা পদ্ম স্থলপদ্ম—কার বাড়ি কী আছে দেখে রাখো। তিন-চার দিনের পুজো তার উপরে এত মানুষের অঞ্জলি—গাঁয়ের ফুলে কুলাবে না, গড়ভাঙা মাদারডাঙা সাগর-দত্তকাটি অবধি ফুল খুঁজে বেড়াতে হবে।

(ক্রমশঃ)

স্নায়ু ক্ষয়ের জন্য

ওকাসা গ্রহণ করুন বিশ্ববিখ্যাত বলবর্দ্ধক টনিক ট্যাবলেট যা আপনাকে ৬টি বায়োকেমিকাল, ১০ টি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও ৬টি খনিজ উপাদানের মাধ্যমে প্রচুর শক্তি এনে দেবে।

ওকাসা টনিক ট্যাবলেট

(পুরুষদের জন্য—"রূপালী")।

প্রত্যেক সব ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

OKASA CO. PVT. LTD.
12 Gunbow Street,
P.O. Box No. 398,
Bombay 400 001.

যুবক যুবতী

যুবহতাশা

শিখা দাস

যৌবন বলতেই আমরা মনে করি তারুণ্যে ভরপুর প্রাণচাঞ্চল্যে সজীব জীবনকে। কিন্তু আজকের যুবক-যুবতীরা সত্যিই কী সুখী? মনে হয় না। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা হতাশ, শিক্ষা সম্বন্ধে আস্থা-হীন, বেকারীর অন্ধকারে দিশেহারা। যা চায় তা এরা পাচ্ছে না। হাত পা বিচারবুদ্ধি শিক্ষা সব আছে কিন্তু করার মতো বেঁচে থাকার মতো অবলম্বন নেই। দেখা যাক এই হতাশা সম্বন্ধে এদের নিজেদের ধারণা কি।

শ্রীমান সুভাষ রায়ের সঙ্গে কথা হল। খড়দহের ছেলে। বাবা ফায়ার সার্ভিসে সামান্য চাকরী করেন। নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম কলেজ থেকে বি-কম পার্ট ওয়ান পাশ করেছে। তারপর আর পড়া হয়নি।

—পড়াশুনা ছেড়ে দিলে কেন?

—সংসারের টাকায় আর কুলোচ্ছে না। বাবার হোটেলে আর কত দিন চালাব?

—পরীক্ষা দেওয়ার আর ইচ্ছে নেই?

—পরীক্ষা দিয়ে আর কি হবে বলুন? হয়তো রাতভোর পড়াশুনা করে যা লিখব সেই পরীক্ষক পড়েই দেখবেন না, টুকলি হিসাবে জিরো বসিয়ে দেবেন।

—পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমার এ ধারণা হল কেন?

—পরীক্ষা তো এখন লটারী খেলা। 'ফি' জমা দিয়ে টিকিট কাটলাম কপালে লাগলে পাশ আর না হয় ফেল। এবার পার্ট ওয়ানে একই জিনিস লিখে কেউ পাশ আবার কেউ ফেল করেছে। নিজে মুখস্থ করে লিখে নকল লেখার বলি হয়েছে মানে ফেল। এই পরীক্ষায় আস্থা কি? পড়াশুনা করে কি হবে?

—কেন? তা নাহলে তো চাকরীবাকরী জুটবে না কিছুই করতে পারবে না।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কোন দাম আছে? যার টাকা আছে সেতো কোন পরীক্ষা না দিয়েই সার্টিফিকেট কিনতে পারে। এ পড়াশুনায় পেটের ভাত জুটবে না। কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে গেলে দেখতে পাবেন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বি-এ এম-এ পাশ করে ভেরান্ডা ভাজছে।

—তুমি চাকরীর চেষ্টা করছ না?

—হাসালেন। আজ পর্যন্ত হাজার তিনেক দরখাস্ত করেছি. পিয়নের কাজ থেকে শুরু করে কেরানী পদের জন্য। কোন সাড়া পাইনি। টাইপিং জানি, স্টেনোর কাজ শিখছি তবু নয়।

—এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ কোন সাহায্য করছে না?

—ঐ আর এক গ্যাড়াকল। লোক না থাকলে দশবছরেও একবার কল পাবেন না!

—ছোটখাটো ব্যবসা করলে ক্ষতি কি?

—টাকা কোথায় পাব? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে স্বনির্ভর প্রকল্প অনুসারে দরখাস্ত করেছি ব্যাঙ্কে গিয়েছি—বরাতে কিছুই জোটেনি।

—তবে এভাবে চুপচাপ বসে জীবনটাকে শেষ করবে?

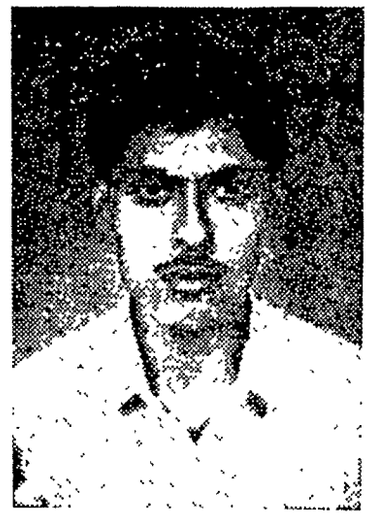

সুভাষচন্দ্র রায়

—আর কিছুই ভালো লাগে না। চাকরীর আশা ছেড়ে দিয়েছি। দরখাস্তও আর বেশী করি না। বাড়ীতে বসে থাকতে লজ্জা লাগে। পালিয়ে পালিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। টাইপিং প্র্যাকটিশ এখনো ছাড়িনি। ওদিকে চাকরীর ঊর্ধ্বতন বয়ঃসীমাও শেষ হয়ে এলো।.....কি যে হবে।

বেকারী সুভাষকে গ্রাস করে ফেলছে। হতাশা তাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিস্পৃহ করেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সবিতা রায়ের সঙ্গে কথা হল। দাদার সংসারে সে গলগ্রহ হয়ে আছে। সংসারে অভাব অনটন—অসুস্থ মা বাবা—নানা ঝামেলা। লেখাপড়া শিখেছে চুপচাপ অথর্ব হয়ে সব হজম করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

—আমার একটা চাকরী করে দিন না।

—পড়াশোনা শেষ হোক সুযোগ সুবিধা হলে নিশ্চয়ই জানাব।

—এতদিন পড়াশোনা নিয়ে ছিলাম। ইউনিভার্সিটি যেতাম হৈ-চৈ করে সময় কেটে যেত। এখন?

—কিছুদিন ইনটারভাল .....তারপর

—মরে যেতে ইচ্ছে করে। বেঁচে থেকে—পরের অনুগ্রহ.....ভালো লাগে বলুন?

—এতো ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

—এখনো মুষড়ে যাইনি। আশায় আশায় বি-টি কলেজে ভর্তি হয়েছি। যখন শুনলাম অনেক দাদা দিদি চার পাঁচ বছর পাশ করে বসে আছেন তখন আর পড়ার উৎসাহ পাচ্ছি না।

চোখেমুখে তার বিমর্ষভাব। চলতি সমাজের বিরুদ্ধে দীর্ঘশ্বাস জানিয়ে সে অভিশাপ জানাল। তবে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনেও সব আশা সে ছেড়ে দেয়নি। রাতের তপস্যা যদি কোনক্রমে দিন এনে দিতে পারে।

বেকারীর হতাশা যেমন বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েদের ঘিরে ফেলেছে তেমনি যারা কিছু একটা করছে তারাও সে কাজে সন্তুষ্ট নয়। জীবন সংগ্রামের তীব্রতায় আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। মুখে তাই হতাশার সুর.....কি করলাম এতো পড়াশুনা করে?

তরুণ অধ্যাপক শ্রী আর চক্রবর্তী। তিনি জানালেন—'কি আর বলব বলুন সারা মাস পড়িয়ে সময়মতো মাইনে পাই না। পেটের জন্য আবার ছাত্র পড়াতে হয়।'

—কেন এখন তো আপনাদের স্কেল ভালো.....

—ওসব কাগজকলমেই রয়ে গেছে, বাস্তবে দূর অস্ত্...তাছাড়া

—তাছাড়া কি?

—অসহ্য, পড়ানোর ইচ্ছে থাকলেও পরিবেশ নেই। ছেলেরা জ্ঞান হজম করতে চায় না। না পড়েই তারা পাশ করবে।

আর এক যুবক তরুণ ভাদুড়ী, বি-ই। বর্তমান পেশা—কেরানীগিরি।

—আপনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এখন এই লাইনে এলেন?

—খেতে হবে তো। এঞ্জিনিয়ারের চাকরী জুটলো না—যেটা পেলাম.....

—আপনার কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে না?

—প্রথম প্রথম একটু কেমন লাগতো। এখন মানিয়ে নিয়েছি। তবে ভাবি এত খরচ-পত্র করে উৎসাহ নিয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কি করলাম।

ভিক্টোরিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ষোড়শী শ্যামলী বসুও পড়াশোনায় তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না।—'পাশ করে তো হাপিত্যেশ হয়ে বসে থাকতে হবে—বেকারের খাতায় নাম বাড়িয়ে।' কথা প্রসঙ্গে সে জানাল আমাদের সমাজে মেয়েদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। নানা নিষেধ এবং সীমার মাঝে তাদের আটকে রাখার জন্য তারা ক্রমে ক্রমে নিরুৎসাহ ও হতাশ হয়ে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি কি মনে কর আমাদের দেশের মেয়েরা পরাধীন।'

—অনেকাংশে। তাদের বেলায় শুধু নিষেধের ডোর। শাসনের বেড়াজাল। ছেলেদের মতো আড্ডা জমাতে পারবে না, প্রাণ খুলে মিশতে পারবে না ইচ্ছামতো সিনেমায় যেতে পারবে না আরো কত কি? একটা ছেলের সঙ্গে কথা বললেই অমনি কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল।

—আমাদের সমাজ সম্বন্ধে তোমার প্রচন্ড বিক্ষোভ?

—নয় কেন? পদে পদে ছেলেদের সঙ্গে আমাদের কম্পিটিশান করে বাঁচতে হচ্ছে কিন্তু সে তুলনায় আমরা সুযোগ পাচ্ছি কই।

হেসে বললাম—তাহলে আপনার ছেলে-বন্ধুজনিত হতাশাও রয়েছে। মুচকি হেসে সে বিদায় নিল।

সন্ধ্যা রায়। বয়স হয়েছে। যৌবন তো চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু আমাদের সমাজের নানা চাহিদা মিটিয়ে তার জন্য পাত্র জুটছে না। কি যেন না পাওয়ার বেদনায় সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সোদপুরের অমিয় চক্রবর্তী পাঁচ বছর বি-এস-সি পাশ করে ঠায় বসে আছে। তার মার মুখে জানতে পারলাম সে এখন মানসিক বিকারগ্রস্ত।

স্বপন সেন—শিক্ষিত বেকার। প্রেম করেছে। প্রেমিকাকে এখনই বিয়ে না করলে সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। অথচ চাকরী নেই নিরাপদ একটা আশ্রয় নেই' তার করুণ জিজ্ঞাসা—'জানেন অনেক চেষ্টা করছি। অবশেষে ভালোবাসাটুকুও হারাতে হবে?'

তন্দ্রা ব্যানার্জি—বি-এ বি-টি। চাকরী নেই। সামান্য টিউশনী করে। বাবা রিটায়ার্ড। তার জিজ্ঞাসা—'সংসারে কিছু তো দেওয়া দরকার, কি করি বলুন, তো?'

সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শিখা দাস। ভাল পরীক্ষা দিয়েও 'ব্যাক' পেয়েছে। খেটেখুটে পরীক্ষা দিয়েও তার ভরসা নেই। সব জায়গায় হু-য-ব-র-ল। বয়সও বসে থাকবে না। জীবনের কি কোন শখআহ্লাদ নেই। স্বাধীনভাবে এগুলো মেটাতে তার একটা চাকরী চাই। হেসে বললাম—বাড়ীতে বলুন না একেবারে পার্মানেন্ট চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতে।

—সে চেষ্টাও হচ্ছে। তবে কালো মেয়ের বিয়ে হওয়া কি কম কথা। কালো কারো পছন্দই হতে চায় না। তারপর রূপপ্রত্যুবদের বায়না আর দাবীর বহর দেখলে তো চক্ষু ছানাবড়া।

কী এক সমাজে বাস করছি আমরা। চারিদিকে এত দীর্ঘশ্বাস।

—অমর দাশ

RADEUS/LIC/AS-9

মাইনে পাওয়ার দিনই

আপনার জীবন বীমার প্রিমিয়াম দেবার দিন

আপনার নিজের ও আপনার পরিবারের স্বার্থের জন্যে পলিসিটি সচল রাখা একান্ত প্রয়োজন।

মাইনে পাওয়ার দিনই আপনার প্রিমিয়াম দিন

চিঠিপত্র

চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী প্রসঙ্গে

১৩৮১ বঙ্গাব্দের ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ফেলো রয়েল সোসাইটি অব আর্টস (লন্ডন) ও প্রধান অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ হেরম্বচন্দ্র কলেজ কলিকাতা মহাশয় প্রকাশিত চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়েছি। শিষ্টাচার ও রুচির দায়ে বর্তমান পত্রলেখক শ্রীমুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদর্শিত পথে তাঁর চিঠির উত্তর দিতে অনিচ্ছুক। অমৃত-এর পাঠকদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক কিছু বক্তব্যই কেবল উপস্থিত করছি :

(১) শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'শাশ্বত' নামে কোনো পত্রিকা আজ পর্যন্তও তাঁর চোখে পড়েনি। অথচ দেখা যাচ্ছে 'শাশ্বত' পত্রিকায় (১৩৭৮ সালের ২য় সংকলন) প্রকাশিত প্রবন্ধটির (চন্দ্রকেতুগড়ের স্বর্ণমুদ্রা: গৌরীশংকর দে) প্রথম বাক্য 'সুপ্রাচীন চন্দ্রকেতুগড় আজ আর পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না'—সম্পূর্ণ চেহারা নিয়ে ১৩৮১ সালের ৩রা আশ্বিনের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী : নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়) আত্মপ্রকাশ করেছে এবং প্রবন্ধের প্রথম বাক্য রূপে। না। এই তিন বছর পরেও বাক্যটির একটুও বয়েস বাড়ে নি একটুও চেহারা পাল্টায় নি এই ক' বছরের শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার ছোঁয়া একটুও লাগে নি। অথচ শ্রীমুখোপাধ্যায় নাকি পত্রলেখকের প্রবন্ধটি চোখেই দেখেন নি! এই ক্ষেত্রে এই ধারণাই করে নিতে হয় যে হয় নির্মলেন্দুবাবু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, নয় তো আমার লিখিত বাক্যটি চলৎশক্তিসম্পন্ন। শ্রীমুখোপাধ্যায় আলোচ্য বাক্যটিকে 'একটি সাধারণ ভাববাহী বাক্য' বলে বর্ণনা করেছেন। তবু অতীব বিস্ময় জাগে—'এই একটিমাত্র অত্যন্ত সাধারণ ভাববাহী বাক্যএর লোভও কেন তিনি সম্বরণ করতে পারলেন না। শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'জানি না অমৃত-এর লক্ষাধিক পাঠকের মধ্যে কয়জন এ পত্রিকার সন্ধান রাখেন।' তা সত্যি। 'শাশ্বত'-এর মতো মফঃস্বলের একটি লিটল ম্যাগাজিনের পাঠক-সংখ্যা সীমাবদ্ধ। আর সত্যি সীমাবদ্ধ বলেই নির্মলেন্দুবাবুদের মতো লেখকেরা নির্ভয়ে ওই সব অখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রকাশিত লেখার কিছু কিছু অংশ বাক্য অনায়াসে নিজের বলে চালিয়ে দিতে পারেন (কচিৎ উদ্ধৃতি দিয়ে হামেশাই উদ্ধৃতি না দিয়ে) বিশেষত যদি পত্রিকাটি কয়েক বছর আগেকার হয়। স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিনে লেখা নেয়ার সময় এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এ রকম অভ্যাসের কথা হয়তো নির্মলেন্দুবাবুও শুনে থাকবেন।

(২) চন্দ্রকেতুগড়ের খনামিহিরের ঢিপি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত মন্দিরটি যে গুপ্তযুগের অনেকেই এ-কথা বলেছেন। যিনি এই উৎখনন পরিচালনা করেছিলেন সেই অধ্যাপক কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামীর মতে তাই

> Chandraketugarh And Its Archaeslogical Importance' K G Goswami, Indian Museum Bulletin July, 1966, p 44).

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

> studies in Museum and Museology in India: D P Ghosh (p. 51).

এবং শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলার মঠ মন্দির মসজিদ শারদীয় গল্প-ভারতী পৃঃ ৭৮) একই মত ব্যক্ত করেছেন।

> Archaeslogical Survey of India, Government of India,

প্রকাশিত

> 'Archaeslogical Remains, Monuments And Museums

গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৮১ পৃষ্ঠাতেও বলা হয়েছে যে উক্ত মন্দিরটি গুপ্তযুগের। সর্বজনবরেণ্য অতিসতর্ক ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতেও উক্ত মন্দির গুপ্তযুগে নির্মিত

> "reference may be made to the ruins of a big Temple at Chandraketugarh (Berachampa in the 24 Parganas Dt) of the Gupta period"—History of Ancient Bengal' R. C Majumdar, p 612

চন্দ্রকেতুগড়ের মন্দিরের গঠন ও মন্দির অঞ্চলে প্রাপ্ত্য পুরাদ্রব্য পরীক্ষা করেই এই সব বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। নির্মলেন্দুবাবুর মতে তবু নাকি কোনো বস্তুগত প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নি। পাল্টা প্রমাণ উপস্থিত না করে বিশেষজ্ঞদের সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে 'কল্পনাধর্মী অনুমান' ও 'গর্হিত অপরাধ' বলা ইতিহাস-চর্চার লক্ষণ নয়। যুক্তি-প্রমাণ ব্যতিরেকে এই ধরনের মোটা দাগের দায়িত্বহীন মন্তব্য পাঠকসাধারণের পক্ষে কেবল বিভ্রান্তিকর নয় ক্ষতিকরও বটে।

(৩) চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী প্রসঙ্গে 'দশচূড়' কথাটি ব্যবহার করার জন্য শ্রীমুখোপাধ্যায় বর্তমান পত্র-লেখককে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু এই কথাটি শুধু বর্তমান পত্রলেখকই ব্যবহার করেন নি, আরো অনেকে করেছেন। ব্যবহার করেছেন 'রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী (ঐতিহাসিক কালের প্রারম্ভে চব্বিশ পরগণা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মাঘ—চৈত্র ১৩৭৩, পৃঃ ২৮৯)। নির্মলেন্দুবাবুর সহজে ভুলে যাওয়ার গুণ আছে বলেই পত্রলেখককে এ-রকম বিদ্রূপ করতে সাহসী হতেন না। কেননা তিনি তাঁর পূর্ব প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে নিজেই 'দশচূড় যক্ষিণীর কথা উল্লেখ করেছেন ('বত্যগর্ভা আটঘরা' 'অমৃত' ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ পৃঃ ২৮৮ ও বিদ্যাধরীর প্রত্নতাত্ত্বিক পটভূমি' হেরম্বচন্দ্র কলেজ পত্রিকা ১৯৭৩—৭৪ পৃঃ ৫৪)। তাহলে পত্র-লেখকের প্রতি নিক্ষিপ্ত শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিদ্রূপ বুমেরাং হয়ে তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছে না কি?

(৪) শ্রদ্ধেয় আনন্দকুমার স্বামীর পুস্তকটির নাম—'যক্ষস্' না লিখে বর্তমান পত্রলেখক যক্ষ লিখেছিলেন—এই অপরাধে শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'কুমারস্বামীর পুস্তকের প্রচ্ছদপটের সঙ্গেও তাঁর (বর্তমান পত্রলেখকের) পরিচয় নেই।' নির্মলেন্দুবাবু ১৩৮১ সালের ২০ অগ্রহায়ণের চিঠিতে বানগড়' ও চন্দ্রকেতুগড়ের খননকার্যের পরিচালক অধ্যাপক কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামীর নাম লেখেন 'কুঞ্জবিনোদ গোস্বামী' একে আর ছাপার ভুল বলে চালাবার উপায় নির্মলেন্দুবাবুর নেই। কেননা ৩০শে নভেম্বর (১৯৭৪) তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় (পৃঃ ৩৭৮) তাঁর 'জাদুঘর থেকে চুরি' শীর্ষক যে চিঠিখানি প্রকাশিত হয়েছে তাতেও আছে 'কৃষ্ণবিনোদ গোস্বামী।' দেশ ও অমৃত নিশ্চয়ই একই প্রেসে ছাপা হয় না। নির্মলেন্দুবাবুর এই ধরনের নামোল্লেখের জন্য বর্তমান পত্রলেখক কিন্তু তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কোনো অসৌজন্যসূচক মন্তব্য করছেন না।

(৫) তাঁর নামের আগে প্রতিবার কেন বর্তমান পত্র-লেখক শ্রী ব্যবহার করেন নি তার জন্য নির্মলেন্দুবাবু বর্তমান পত্রলেখককে সৌজন্য সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু 'সৌজন্য-বিদ্যার অধ্যাপককে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা : বিখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দকুমার স্বামীর নাম তিনি দুবার কেবল 'কুমার স্বামী বলে উল্লেখ করলেন কোন সৌজন্য-শাস্ত্র অনুযায়ী? শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর চিঠির এক জায়গায় শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ শেখার জন্য শিশুবোধ বাংলা ব্যাকরণের আশ্রয় নিতে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। নির্মলেন্দুবাবুর নামের আগে কেন আমি বারবার শ্রী ব্যবহার করিনি তার কারণ জানতে হলে নির্মলেন্দুবাবুরও ওই ব্যাকরণেরই আশ্রয় নিতে হবে; কেননা তাঁর মতো 'মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগ-প্রধানকে' সর্বনামের ব্যবহার শেখাবার ধৃষ্টতা আমার নেই।

(৬) নির্মলেন্দুবাবু লিখেছেন : 'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী' প্রবন্ধের রচয়িতার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সরকারী বেসরকারী ও বিদেশী বিদ্বৎকুলের কিছু স্বীকৃতি লাভে ধন্য হয়েছে।' তাঁর এই স্বীকৃতিতে আমরা তাঁর দেশবাসীরাও ধন্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা অত্যন্ত অপ্রিয় অথচ চরম সত্য জানালে বোধহয় কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে। ১৯৭২ সালের ২৭শে অকটোবর তারিখের অমৃত' পত্রিকায় শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখিত 'নিমজ্জিত নগরী হরিনারায়ণপুর' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে-সব আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছিলো তার

একটি হলো 'সূর্যমূর্তির পাটপীঠ পাল ভাস্কর্য' (পৃঃ ৯২২)। ওই প্রবন্ধেই লিখিত ছিল 'সূর্য মূর্তির ভগ্নাংশ' (পৃঃ ৯২৩)। ওই আলোকচিত্র ও ওই মূর্তির পরিচয়-জ্ঞাপক লেখা দেখে বর্তমান পত্র-লেখক বিস্মিত স্তম্ভিত ও মর্মাহত হন। কেননা মূর্তিটি (ভগ্ন সূর্যমূর্তি) আদৌ হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত নয়। এই ভগ্ন-মূর্তি নির্মলেন্দুবাবু সংগ্রহ করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম থেকে (মূর্তিটি সংগ্রহ করার সময় নির্মলেন্দু-বাবুর সঙ্গে ছিলেন বর্তমান পত্র-লেখক এবং হাবড়া প্রফুল্লনগরবাসী শ্রীপ্রবীর ঘোষ)। বর্তমান পত্র-লেখক শ্রীমুখো-পাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্ষতি করতে চাননি বলে 'অমৃত' সম্পাদককে চিঠি না দিয়ে প্রবন্ধ-লেখককে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দেন। এই চিঠির উত্তরে নির্মলেন্দুবাবু বর্তমান পত্র-লেখককে যে চিঠি দেন তাতে লেখেন, "সূর্য মূর্তি" (প্রস্তর) সম্পর্কে ভুল হয়েছে— অসাবধানতাবশত অন্য ছবি চলে গেছে।" ধরা যাক অসাবধানতাবশত ছবি ছেপেছেন কিন্তু প্রবন্ধের ওই লিখিত অংশটুকু? তারো চেয়ে বড়ো কথা ১৯৭২ সালের অকটোবরের পরেও 'অমৃত'-এর পাতায় দীর্ঘ বহু প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেছেন; কিন্তু আজ অবধি কোথাও তো তিনি স্বল্পতম শব্দ ব্যয় করেও ভুল স্বীকার করেন নি। 'অমৃত' পাঠকগণ ক্ষমা করবেন উক্ত আলোকচিত্র অসাবধানতাবশত-নয় ইচ্ছাকৃতভাবেই ছাপা হয়েছে (সাধারণ বুদ্ধি এই কথাই বলে)। আর তাহলে বলতে হয় নির্মলেন্দুবাবু সত্যকে বিকৃত করার অপরাধে অপরাধী। প্রত্ন-চর্চা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি দেশের স্বার্থে ইতিহাসের স্বার্থে আপন বিবেকের স্বার্থে সৎ ও দায়িত্বশীল হবেন এঁদের উপরে নির্ভরশীল সাধারণ পাঠক এমন আস্থাই পোষণ করেন। সাধারণ মানুষের এই সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যাঁরা রাতারাতি খ্যাতি, উন্নতি ও জাগতিক সুযোগ-সুবিধার মোহে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এক অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরাদ্রব্য অন্য অঞ্চলে প্রাপ্ত বলে চালিয়ে দেন তাঁরা অপরাধী। এরকম কাজ করে শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 'অমৃত'-এর মতো একটি সম্ভ্রান্ত পত্রিকার পৃষ্ঠা কলুষিত করেছেন অতি নিন্দনীয় ভাবে প্রতারিত করেছেন 'অমৃত'-এর লক্ষাধিক অতীত-জিজ্ঞাসু পাঠকদের। যদি 'অমৃত' সম্পাদক ও 'অমৃত'-এর পাঠকগণ প্রমাণ চান তবে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের পত্রের আলোক-চিত্র হাজির করতে বর্তমান পত্র-লেখক রাজী আছেন। উপরোক্ত ঘটনায় সন্দেহ জাগে ঃ শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রকাশিত অন্য প্রবন্ধগুলিতেও এই ধরনের ব্যাপার আছে কি না! সেই বিচার ও পরীক্ষার ভার প্রতিষ্ঠিত প্রত্নতাত্ত্বিক ও বিশেষজ্ঞদের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। প্রত্নচর্চার ক্ষেত্রে এ-হেন অসাধুতা করেও যদি কেউ সরকারী বেসরকারী ও বিদেশী বিদ্বৎ কুলের স্বীকৃতি লাভ করেন, তবে এই কথাই বলতে হয় স্বর্গীয় কথাশিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্ট ব্রজ-মাস্টারের দিন আজো শেষ হয় নি।

গৌরীশংকর দে
বিভাগীয় প্রধান ইতিহাস
শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয় হাবড়া
২৪ পরগণা।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

৮ নভেম্বর '৭৪ সংখ্যায় 'অমৃত'-এ প্রকাশিত অমল সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' শীর্ষক চিঠিটি পড়লাম। শরৎচন্দ্রের নাম রবীন্দ্রনাথ সর্ব-প্রথম কবে শুনেছেন—এ নিয়ে সেনগুপ্ত মহাশয়ের মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে জেনে আমি তার নিরসনে প্রয়াসী হলাম।

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে মুদ্রিত পুস্তক গুলির মধ্যে 'বড়দিদি'-ই সর্বপ্রথম। ১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম দুই সংখ্যায় এই উপন্যাসের লেখকের নাম মুদ্রিত হয়নি শেষের সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয়। আর শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'। রবীন্দ্রনাথ যে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' পড়েই তাঁর সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে উঠেন তার বিশেষ প্রমাণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সঙ্গী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কিছু উক্তি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই, যা থেকে সেন-গুপ্ত মহাশয়ের উত্থাপিত তর্কবহুল বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে মনে করি।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর থেকে কলকাতা আসার সময় বিভূতিভূষণ ভট্টের কাছ থেকে দুখানি গল্পের খাতা সঙ্গে এনেছিলেন। ঐ দুখানি খাতার এক-খানিতে ছিল 'বোঝা' 'সুকুমারের বাল্য কথা' 'কাশীনাথ' 'অনুপমার প্রেম' প্রভৃতি গল্প; অপরখানিতে ছিল 'কোরেল' 'চন্দ্রনাথ' 'বড়দিদি' প্রভৃতি। ১৯০৭ সাল। 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের ভার তখন সরলা দেবীর উপর ন্যস্ত ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন সেই সময় সরলা দেবীর হাতে 'বড়দিদির' কপি দিয়ে ওটি পড়তে বললেন। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্র-মোহনের নিজস্ব উক্তি হোল—

'আমার কাছে ছিল শরৎচন্দ্রের লেখা বড়দিদির কপি। সরলা দেবীকে সেটি পড়তে দিলাম। পড়ে তিনি বিমুগ্ধ হলেন, বললেন—চমৎকার। এটি দাও ভারতীতে ছাপাতে। এক সংখ্যায় শেষ না করে তিন চার সংখ্যায় শেষ করো। লেখকের নাম প্রথমে চেপে রাখো—শেষের সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশ করো—Commercial stunt.... বুঝলে। লোকে ভাবুক রবীন্দ্রনাথের লেখা। এ-লেখার জন্যে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে খন।' ('শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য')।

'বড়দিদি' পড়ে সেই সময় অনেকের মনে এই ধারণা হয় যে, ওটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গল্পটি পড়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন এবং লেখক সম্বন্ধে গভীর আগ্রহের কথা শুনে সৌরীন্দ্রমোহন, অবনীন্দ্রনাথ ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং শরৎ-চন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎ-চন্দ্রকে সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে এনে বাংলা-দেশের প্রকাশ্য সাহিত্যসভায় হাজির করার জন্য অনুরোধ জানান। সৌরীন্দ্রমোহনের কথায়, 'রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—যেমন করে পারো তাঁকে আনাও সৌরীন..... তাঁকে ধরে এনে লেখাও। বাংলাদেশে এঁর জোড়া লোক পাবে না।' ('শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য')।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'বড়দিদি' থেকেই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় লাভ হয়, 'পণ্ডিতমশাই' থেকে নয়।

বারিদবরণ ঘোষ
চুঁচুড়া।

(২)

অমৃত পত্রিকার ৮ নভেম্বর '৭৪ সংখ্যার চিঠিপত্রের পৃষ্ঠায় শ্রীঅমল সেনগুপ্তের উত্থাপিত রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণটি 'ভারতী' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'শরৎ-চন্দ্রের জীবন রহস্য' নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'বৈশাখের (১৩১৪) ভারতী ছেপে বেরুলো ভাদ্র মাসে।'

'বড়দিদির শেষাংশে শরৎচন্দ্রের নাম ছাপা হলো—লেখক পরিচয়ে।'

'ভারতী (১৩১৪) বেরুবামাত্র মণিলাল (গঙ্গোপাধ্যায়) আমাকে বলেন, 'বড়দিদি' গল্প নিয়ে শৈলেশচন্দ্রের (বঙ্গ দর্শনের তৎকালীন সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার) রবীন্দ্রনাথকে অনুযোগ করার কথা। অবনীন্দ্রনাথ নিলেন শরতের পরিচয় এবং আমাকে বললেন—চলো তো কবির কাছে। লেখকের পরিচয় পাবার জন্য তিনি আকুল। রবীন্দ্রনাথের কাছে তখুনি গেলুম..... সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ও মণিলাল। মণিলাল বললেন—আসামীকে এনেছি, রবিদা। এর জন্যই শৈলেশবাবু এসে আপনাদের সঙ্গে মান অভিমান করছিলেন। 'ভারতী'র 'বড়-দিদি' গল্পটি এঁরই বন্ধু শরৎ চাটুজ্জের লেখা। ইনিই গল্পটি ভারতীতে ছাপিয়ে-ছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে। আমি বললুম তার কথা—'

উক্ত পুস্তকের ২০-২৩ পৃষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্যের স্পষ্ট সমর্থন ও অমলবাবুর প্রশ্নের উত্তর ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিবরণ সুন্দর লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং 'ভারতীর্থের' বিবরণ ভুল ধারণা সঞ্জাত লেখকের স্মৃতিকথা হিসাবে মনে করা যেতে পারে। ইতি

দ্বিজেন সাহা
শ্রীরামপুর, হুগলী।

মহিলারা এখনও সেই তিমিরে

৯ঠা অকটোবর অমৃততে প্রকাশিত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'মহিলারা এখনও সেই তিমিরে'-এর ওপরে লেখা চিঠিটা পড়ে আমি কিন্তু পত্রপ্রেরকের সঙ্গে একমত হতে পারি নি। আমাদের দেশে ছেলেরা সংসারে এমনভাবে মানুষ হন যেখানে সাংসারিক কাজে মহিলারাই তাদের দূরে সরিয়ে রাখেন। স্বভাবতঃই ছোটবেলা থেকে কোন কাজ না করার অভ্যাসে বড় হয়ে অধিকাংশই এসব কাজ করতে পারেন না। তাছাড়া অনেক পুরুষেরই ধারণা সংসারের কোন কাজ মানে মেয়েলিপনা। সুতরাং সে কাজ করতে গেলে পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য আমি সব পুরুষের বেলায়ই এ-কথা প্রযোজ্য বলছি না' ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। তবে তাদের সংখ্যা এত স্বল্প যে হিসেবের বাইরে। সে হিসেবে আমি শ্রীমতী চৌধুরীর সঙ্গে একমত যে অধিকাংশ পরিবারে মহিলারা এত কাজ করেও ঠিক ঠিক মূল্য আদায় করতে পারছেন না।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরী করলে মহিলাদের বাইরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাজটিও নিপুণভাবে সমাধা করতে হয়। তবেই মেয়েরা গৃহলক্ষ্মী কথাটি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। স্ত্রী চাকুরী করলে ইজিচেয়ারে পা তুলে আরামে না বসলেও ছুটির দিনে নিয়মমাফিক আড্ডা, ক্লাব অথবা অন্য কিছু থাকলে বাদ দিয়ে স্ত্রীর কাজে সাহায্য করেন কম স্বামীই। উপরন্তু অনেক স্বামী চাকুরীজীবি স্ত্রীদের বলেন, মেয়ে যখন হয়েছো বাইরের চাকরীবাকরী যাই কর না কেন ঘরের কাজ তোমাদের করতেই হবে। এ প্রসঙ্গে আমার প্রতিবেশীনীর একটি আক্ষেপ তুলে দিচ্ছি। তাঁর স্বামী প্রায়ই বলেন, জামা-কাপড় কাচাকাচি এসব তোমাদেরই কাজ। চাকুরীজীবী মহিলাদের স্বামীর এ রকম উক্তিটি নিঃসন্দেহে খুবই দুঃখজনক।

আধুনিক অনেক মহিলারা শ্বশুরবাড়ীর প্রতি যতই দরদ দেখান না কেন একান্নবর্তী পরিবারে স্বামীর রোজগার অধিক থাকলে তাঁরা একান্নবর্তী পরিবারের ততটা পক্ষপাতী থাকেন না। এ ব্যাপারে পুরুষেরা যদি দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দেন তবে মহিলারা কি একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে পৃথক হতে পারেন? সমগ্র পুরুষ-সমাজকে শ্রীমতী চৌধুরীর একই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা ঠিক হয় নি। তবুও তিনি যে আমাদের গৃহিণীদের নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

রমা সেনগুপ্তা
কলি-৩৭

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

সাপের।

বেকার স্ট্রীটের ঘরে বসেই হেলেনের মুখের কথা শুনে মনে মনে হোমস বুঝে নিয়েছিল, নিশ্চয় ডাক্তার আর জুলিয়ার ঘরের মধ্যে একটা ঘুলঘুলি আছে। তাই চুরুটের গন্ধ পেয়েছিল জুলিয়া। শিসের আওয়াজটাও ভেসে এসেছিল জুলিয়ার ঘরেই—হেলেনের কানে তা পৌঁছোয় নি।

হোমসের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা মস্ত ইন্দ্রিয়ের মত ক্ষিপ্র হলেও যুক্তিনির্ভর। তাই মনে মনেই হিসেব করে দেখলে, ডাক্তার বোধহয় এমন একটা বিষ দিয়ে মেয়েকে মেরেছেন (টাকার লোভে) যে-বিষ কবোনারের রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা যায় না। ডাক্তারের ভারতীয় জন্তু জানোয়ার পোষার সখ আছে শুনে এবং বেদেদের সঙ্গে ওঠাবসা আছে জেনে সন্দেহ হল—সাপের কামড় নয় তো? সাপের দাঁতের দুটো ছোট্ট ফুটো কে আর দেখছে! শিস দিয়ে কি এই সাপকেই বোজ লেলিয়ে দেওয়ার পর ডেকে নেওয়া হয়েছে ঘুলঘুলি দিয়ে? তারপর সত্যি সত্যিই একদিন কামড়েছে জুলিয়াকে?

জমিদারবাড়ী এসে প্রমাণ পেল হোমস। জুলিয়ার খাট মাটির সঙ্গে আটকানো—যাতে নড়াতে না পারে। সাপ যাতে ঘুলঘুলি থেকে নেমে আসতে পারে—তাই দড়িটাও ঝুলছে সেখান থেকে। দুধের লোভ দেখিয়ে শিসের আওয়াজ শুনিয়ে সাপটাকে ফিরিয়ে আনতেন ডাক্তার—ফাঁসওলা চাবুক দিয়ে টেনে নিয়ে বন্ধ করে রাখতেন সিন্দুকের মধ্যে। ঝনঝন শব্দটা সিন্দুক বন্ধ করার শব্দ—বাসন পড়ার নয় চেয়ার পরীক্ষা করে দেখল হোমস—তার ওপর দাঁড়ানোর চিহ্ন রয়েছে। অর্থাৎ চেয়ারে দাঁড়িয়ে সাপটাকে ঘুলঘুলি দিয়ে কন্যা-নিধনে পাঠাতেন ডাক্তার।

ভারতবর্ষের অতি-বিষাক্ত অ্যাডার সাপ শার্লক হোমসের বেত খেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে গিয়ে কামড়েছে ডাক্তারকেই—দশ সেকেন্ডের মধ্যে খতম হয়েছেন মহাপাপিষ্ঠ ডাক্তার রয়লট।

তার মানে, এ-মামলার অন্যতম হত্যাকারী শার্লক হোমস স্বয়ং!

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে

অমৃত (২৯-১১-৭৪) সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হোসেন মুরশিদের এক পত্রের এই মন্তব্য—'তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) মৃত্যুর পর চল্লিশ দশকের শেষ দিকে এবং পুরো পঞ্চাশ দশক রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা আরো হ্রাস পায়'—তথ্যসিদ্ধ নয়। বরং আমাদের স্মৃতি উল্টো কথারই সাক্ষ্য দেয়। সে সময়কার সিনেমা সঙ্গীত কিম্বা আধুনিক গানগুলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। হয়তো একালের মত এত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সেকালে ছিলেন না। কিম্বা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনের সংখ্যাও এত ছিল না। কিন্তু অন্যান্য গানগুলি যে একালের মতো এতখানি অধঃপতিত যে ছিল না, তার কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থায়ী প্রভাব। আর একথা তো সর্বজনবিদিত যে, গোটা চল্লিশ দশক জুড়ে যে সঙ্গীতশিল্পী সম্পূর্ণ একক-ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তিনি পঙ্কজকুমার মল্লিক। সন্তোষ সেনগুপ্তের কথায় প্রতিধ্বনি করে বলা যেতে পারে—এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একক ও নিঃসঙ্গ পথিক। মুক্তি আলোছায়া অভিজ্ঞান অধিকার ডাক্তার প্রভৃতি ছায়াছবিতে পঙ্কজকুমারের আশ্চর্য কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি সাধারণের কানে পৌঁছে যাচ্ছিল এবং লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছিল। সঙ্গীতপরিচালনাকালে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তো গ্রহণ করেই ছিলেন, এমন কি টাইটেল মিউজিকে এবং স্বীয় আরোপিত সুরে রবীন্দ্রপ্রভাবকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। কানন দেবী ও কে এল সাবগলের কণ্ঠস্বরকেও তিনি এই কাজে ব্যবহার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আকাশবাণীর একদা জনপ্রিয় সঙ্গীতশিক্ষার আসরে নিরলস প্রচার করে চলেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের।

সুচিত্রা মিত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীগণ স্বমুখে স্বীকার করেছেন তাঁদের শিল্পীজীবনে পঙ্কজকুমার মল্লিকের প্রভাবের কথা।

ছবি রায়
কলকাতা-৩৭।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(কুড়ি)

শ্রীঅরবিন্দের এই লিপিকার হেমপ্রভা আমার মনে শুধু যে এক গভীর আলোড়ন এনেছিল তাই নয়, আমার মূঢ় ধারণার নিরসন করেছিল যে শ্রীঅরবিন্দ কোনো কীর্তির কৈলাসবাসী হতে চান। কৈশোরে আমার অন্তরে প্রথম এ ধরনের আলোড়ন আসে যখন 'কথামৃতে' পড়ি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী : 'ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।' শ্রীঅরবিন্দের এ-পত্রটির মধ্যে আমি শুধু যে তাঁর বীর্যের স্পন্দন শুনেছিলাম তাই নয়, হৃদয় আমার উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রেমে। পরে তাঁর সাবিত্রীতে পড়েছিলাম এই দীপ্ত প্রেমের উচ্ছলন—ভাগবতী বাণী :

> Ask not the imperfect fruit,
> the partial prize.
> Only one boon, to greaten
> thy sprit demand;
> Only one joy,
> to raise thy kind desire.

চাহিও না কখনো এ-জীবনে
অপরিণত ফল,
অপূর্ণ কীর্তির সিদ্ধি।
চাহিও কেবল এ-ধরায়
আত্মার প্রসার তব।
একটি পরম বর শুধু
করিও কামনা—তব
সাথী মানবের উন্নয়ন।

এই-ই চিরদিন চেয়ে এসেছে শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রেমিক অন্তরাত্মা। তাই তিনি আমাকে লিখেছিলেন তাঁর একটি প্রাণস্পর্শী গভীরদর্শী পত্রে* : ইংলণ্ড থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর থেকে আমার যোগ চিরদিনই হয়ে এসেছে ঐহিক তথা পারমার্থিক। .....আমি বম্বেতে আপলো বন্দরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার নানা আত্মিক উপলব্ধি হয়েছিল কিন্তু কোনো মাটিছাড়া উপলব্ধি নয়...আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল যে, সৃষ্টির সবই ব্রহ্মে অনুস্যূত†...

আমার যোগে ঐহিকতা ও পারমার্থিকতা দুই-ই পাশাপাশি ঠাঁই পেয়ে এসেছে।..... এই দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি থেকেই আমি আমার 'লাইফ ডিভাইন' ও 'সাবিত্রী' লিখি। ভগবানকে পেতে হবে অবশ্যই, কিন্তু তাঁকে ভালোবেসে তাঁর সেবা করা কর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁকে জানতে ও চিনতে চাওয়া 'শুধু বুদ্ধির মাধ্যমে নয় আত্মিক অনুভূতির আলোয়—আমার পূর্ণযোগে এ-সবই চাই। তুমি যদি কৃষ্ণপ্রেমের এ-নির্দেশ মানো যে, তোমাকেও চলতে হবেই হবে এই জ্ঞান কর্ম ভক্তির সমন্বয়-পথে—তাহলে সংসারবিমুখ পারমার্থিকতা তোমারও স্বধর্ম হতে পারে না।.....তুমি চিরদিনই গুরুবাদে বিশ্বাস করে এসেছ : আমি তাই বলতে চাই—তুমি গুরুর দেখানা (guidance) মেনে এখন ভগবানের করুণায় পূর্ণ নির্ভর করে কৃতকৃত্য হতে আর বিশ্বাস রেখো আমার অটল স্নেহে .....

এই বিশ্বাস ও নির্ভর আমার মনে আরো দৃঢ়মূল হয়েছিল গুরুদেবের অতি মানস-প্রত্যয়ের মন্ত্রময়ী লিপিকায়—যার প্রেম, ধীর্য ও ঐকান্তিকতার ত্রিবেণীসঙ্গমে আমি যেন স্নান করে নির্মল হয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, তাঁর বিশাল হৃদয়ের অমল আলোর স্পর্শে আমার নানা কুতর্কের অন্ধকার মিলিয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল—ধন্য আমি যে, এহেন মহামহিমার্ণব দ্রষ্টা গুরুর অপার স্নেহগঙ্গায় অবগাহন করে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছি তাঁর উদার আদর্শকে—যে-আদর্শ পরে তিনি কবিতায়ও ফুটিয়ে তুলেছিলেন সাবিত্রী-তে অশ্বপতির চিন্তায়ণে (৩. ২) :

> His single freedom could not satisfy
> Her light, her bliss he asked for earth and men
> Into the darkness of the suffering world.

শুধু আপনার একেলার আত্মসুখী
মুক্তি তাঁর
ছিল না ইপ্সিত আর—চাহিলেন
তিনি তারিণীর
আলোক আনন্দরস মর্ত্যের ও
মর্ত্যবাসী তরে—
আতা ধরণীর মুখ-অন্ধকার ঘুচাতে
সাধনে।

(একুশ)

কিন্তু মানুষের চেতনার রূপান্তর সম্বন্ধে গুরুদেবের অপরূপ নিশ্চয়োক্তি আমাকে অভিভূত করার ফলে অতিমানস সম্বন্ধে তাঁর নানা বাণীতে আমি সাড়া দিলেও সে-বাণী আমার বুকের তারে বেজে ওঠে নি—বলতে পারি নি মন মুখ এক করে : 'অতিমানসলোকেই আমি চিরাশ্রয় চাই, আমার ইষ্ট বলে বরণ করতে চাই অতিমানস অনামীকে।' এর একটা প্রধান কারণ—আমি আলোয়ার নানা বৈষ্ণব পরমভাগবতকে আমার প্রেমের প্রণামী নিবেদন করার ফলে আমার সংস্কার গড়ে উঠেছিল রূপোৎসবী কৃষ্ণমুখী হয়ে। তাই আমি অচিন্ত্য অতিমানসলোকের মহামহীয়ান দেবদেবকে ডাকতে পারি নি সর্বান্তঃকরণে গাইতে পারি নি তাঁর অবোধ্য অপার সত্তার উচ্ছ্বসিত গুণগান। কৃষ্ণের ব্যক্তিরূপের বহুরূপী বৈচিত্র্যই আমার মনকে রঙিয়ে তুলেছিল। ব্যক্তিরূপ—ব্যক্তিরূপ—এই-ই তো তৃষ্ণার জল, চোখের আলো বুকের নিশ্বাস। শিব দুর্গা কালী তাঁদের ছবিও আমার প্রাণের পটে প্রেমের রেখায় রঙে আঁকতে পেরেছিলাম বলেই আমি সাড়া দিতাম দেব-দেবীদের ডাকে। গঙ্গার তো কথাই নেই। ঐতিহাসিক টয়েনবি তাঁর আত্মজীবনী EXPERIENCES-এ লিখেছেন (১৪৭ পৃঃ)

> "I believe that the true end of Man is self sacrificing love; that love is divine; that it is the only God that we know from experience".

: অর্থাৎ, সে-প্রেম শুধু সব ছারাতে ভয় না পেয়ে চলে একটানা আত্মোৎসর্গের দুরন্ত-সারে সে-প্রেম স্বরূপে দেবতা—কেবল এই দেবতাকেই আমরা জানি, চিনি অপরোক্ষ অনুভবে।

গঙ্গার দৈবী সত্তা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটিই আমি প্রতিধ্বনি করতে চাই : সে তিনি শুধু আকাশের দেবদুহিতা নন, মর্তেরও মাতা পতিতপাবনী, অমৃতার্থিনী, আনন্দসুরধুনী। তাঁকে ভালোবেসে পূজা করে এসেছি আলোয়ার—পুণ্যসলিলা বলে তার আদরকে জগন্মাতার ঘুমপাড়ানি কোল বলে। কৈশোরে একটি গান আমাকে মুগ্ধ

---

* SRI AUROBINDO' LETTERS — FOURTH SERIES .p 28-33
২৮-৪-৪৯

† শ্রীঅরবিন্দ বারবারই সমর্থন করেছেন উপনিষদের মহাকাব্য : 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—বিরক্ত বৈরাগীদের মায়াবাদ যে, 'জগৎ মিথ্যা'—এ-বাণীতে তিনি কোনদিনই সাড়া দেন নি।

করত ঃ যে শেষের দিনে যখন অন্তর্জলী হব তখন

অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে অর্ধ অঙ্গ রবে স্থলে
কেহবা লিখিবে ভালে কৃষ্ণনামাবলী।
(মূল গানটিতে ছিল কালীনামাবলী)

আমার একটি কামনা আমি বহুবারই ঠাকুরকে নিবেদন করেছি চোখের জলে—যার প্রণকাড়া রূপ দিয়েছিলেন আমার পিতৃদেব, গঙ্গাপূজারী দ্বিজেন্দ্রলাল (সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে গের) ঃ

পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত
অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ
সুস্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে
বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথী! জাহ্নবি! সুরধুনি!
কলকল্লোলিনি! গঙ্গে!

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ কৃষ্ণ তো গঙ্গার মতন প্রত্যক্ষ দেবতা নন—জগতে কোথাও তো তাঁকে দেখা যায় না—তাঁর বিগ্রহকে তো বলা চলে না মূর্ত কৃষ্ণ, যেমন গঙ্গাকে বলা চলে মূর্তিমতী নিস্তারিণী। এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর বুদ্ধির কাছে মেলে না, কিন্তু যার হৃদয়ে তিনি একবারও উঁকি দিয়েছেন যে শুনেছে তাঁর অকূল বাঁশি সে ধ্রুবপ্রত্যয়ের আখরে আনন্দের অবাধ উচ্ছ্বাসে ঃ

ওরা হাসে.....কলভাষে ...
ওরা জানে না, তাই হাসে.....
ওরা জানে না.....তাই মানে না.....
আমি জানি.. ...তাই মানি.....
আমি অন্তরে তব বাঁশরী শুনেছি তাই
বঁধু আমি জানি—
তুমি আজো ডাকিলেই আসো.....
আজো বাঁশিসুরে ভালোবাসো.....
ডাকি আঁখিজলে যেই 'কোথা তুমি?'
সেই করুণায় নেমে আসো.....
তুমি নয়ন মুছাতে আসো.....
তুমি করো বুকে বুকে যুগে যুগে
গান বঁধু.....
তাই আজো তব বেণু সুখে দুখে
ঝরে মধু.....
দুখ-বাদলে তোমায় জানি.....
সুখ-কিরণে তোমাকে জানি...
বঁধু, বিরহে তোমায় জানি.....
মধু মিলনে তোমায় জানি.....
আমি জীবনে তোমায় জানি.....
স্বামী মরণে তোমায় জানি।

---

* কয়েক বৎসর আগে হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে আমি একটি গান বেঁধেছিলাম ঃ

এসো কাছে .. আরো কাছে.....
শুনি তোমার জলের মুরলিপুরের বাজে
যারা বলে ঃ তুমি শুধুই জলের ঢেউ মা,
তারা প্রাণ-অতলে তোমার কোলের
ডাক শোনে নি কেউ মা।

শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে কৃষ্ণের বাণী পেয়েছিলেন, দেখেছিলেন তাঁকে সর্বত্র—'তেন সর্বমিদং ততম'। তাঁর বর্ণনা পড়লে মনে আসে গীতার 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'—যিনি কৃষ্ণকে সবখানেই দেখেছেন এমন মহাত্মা সুদুর্লভ। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এমনি মহাত্মা পূর্ণকৃষ্ণোপলব্ধি করে। তাই তিনি আমার কৃষ্ণসংস্কারকে শুধু যে সমর্থন করেছিলেন তাই নয় আমাকে একাধিকবার লিখেছিলেন যে, আমার কৃষ্ণলাভ হোক এ তিনিও চান সর্বান্তঃকরণে—শুধু তাই নয়, ১৯৩৩ সালে মে মাসে আমাকে লিখেছিলেন জোরালো সুরেই ঃ

"I am prepared to take you the whole way myself"

শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে প্রস্তুত!)

কৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি আরো জোর দিয়ে লিখেছিলেন একটি বিখ্যাত দীর্ঘপত্র মনীষী শ্রীসজীব রাওয়ের প্রশ্নের উত্তরে। এ-প্রশ্নটি তাঁর কাছে আমি দাখিল করেছিলাম রাও-সাহেবের চিঠি পাঠিয়ে। বন্ধুবর প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি কৃষ্ণচেতনাকে সত্য বলে মানলেও জানতে চান—কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা বা গোপীদের আত্মহারা প্রেমলীলা ঐতিহাসিক সত্য, না শুধু প্রতীক মাত্র অথবা সাধু বা ভক্তের মনগড়া গল্পগাথা বা মূর্তি গড়ার সনাতন উচ্ছ্বাস? আমি আমার পত্রে শুধু এইটুকু জুড়ে দিয়েছিলাম যে, আমি মানি বৈষ্ণবদের বাণী যে প্রতি হৃদয়েই এক একটি গোপী হৃদয়—যদি অবশ্য সে কৃষ্ণকে মধুরভাবে বরণ করে তাঁর পরম মিলন চায় নিত্যবৃন্দাবনে।

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন রাওসাহেবের প্রতি প্রশ্নের খুঁটিয়ে উত্তর দিয়ে। কিন্তু সে-সব উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। কেবল এইটুকু ভূমিকা করতে চাই যে, শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন—দেবদেবীরা মানুষের কল্পিত নন, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁরাও আছেন ও মানুষের কাছে নিজের নিজের রূপ ধরে আসেন যদি মানুষ তাঁদের দর্শন চায়। আরো লিখেছিলেন যে, ঃ তিনি নিজে কৃষ্ণ তথা কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। লিখে শেষের দিকে এই মন্তব্য করেছিলেন ঃ

The Lila of the Gopis seems to be conceived as something which is always going on in a divine Gokul and which projected itself in an earthly Brindavan and can always be realised and its meaning made actual in the soul..... These questions and the speculations to which they have given rise have no indispensable connection with the spiritual life. There what matters is the contact with Krishna and the growth towards the Krishna consciousness, the presence, the aspiration, the spiritual relation, the union in the soul and till that is reached, the aspiration, the growth in bhakti and whatever illumination one can get on the way. To one who has had these things, lived in the presence, heard the voice, known Krishna as Friend or Lover, Guide, Teacher, Master or, still more, has had his whole consciousness changed by the contact, or felt the presence within him, all such questions have only an outer and superficial interest So also one who had had contact with the inner Brindavan and the *lila* of the Gopis, made the surrender and undergone the spell of the joy and the beauty or even only turned to the sound of the flute, the rest hardly matters. But from another point of view if one can accept the historic reality of the incarnation, there is this great spiritual gain that one has a *point d'appui* for a more concrete realisation in the conviction that once at least the Divine has visibly touched the earth, made the complete manifestation possible, made it possible for the divine supernature to descend into this evolving but still very imperfect terrestrial nature. (2.12.46)

(ভাবার্থ ঃ মনে হয়, গোপীদের প্রেমলীলা কল্পিত হয়েছে এক নিত্য বৃন্দাবনে যার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে আমাদের প্রাকৃত গোকুলে—তাই এ-সত্যকে চিরদিনই উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এ-সব জল্পনাকল্পনার সঙ্গে আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। আসল কথা, চাইতে হবে কৃষ্ণচেতনার সঙ্গে সংযোগ তথা তার ফলে মানবিক চেতনার বিকাশ কৃষ্ণের দর্শন তাঁর সঙ্গে আন্তর আদানপ্রদান আত্মিক মিলন। এ-মিলন না হওয়া পর্যন্ত নিরন্তরই চাইতে হবে ভক্তির ক্রমোন্মেষ—এ-উন্মেষের পথে যতটা পারা যায় আলোর পাথেয় আহরণ করে। যার এই সব আত্মিক লাভ হয়েছে সে পেয়েছে তাঁর দর্শনের উপজীব্য শুনেছে তাঁর সম্ভাষণ চিনেছে তাঁকে বন্ধু বলত দিশারি গুরু প্রভু অন্তর্যামী বলে—সর্বোপরি, যার সমগ্র চেতনা তাঁর স্পর্শে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তার কাছে তার সব তথ্যই বাহ্য। কেননা যে নিত্যবৃন্দাবনে গোপী-লীলার সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছে কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে পেয়েছে পরমানন্দ, দেখেছে তাঁর রূপবাণ বা শুধু সাড়া দিয়েছে তাঁর বাঁশির ডাকে—তার আর কী প্রার্থনীয় থাকতে পারে? তবু একদিক দিয়ে বলা চলে যে, কৃষ্ণাবতারের ঐতিহাসিকতাকে যদি কেউ সত্য বলে মেনে নেয় তাহলে তার এই একটা মস্ত আত্মিক লাভ হয় যে সে একটি প্রত্যক্ষ ভিত্তিমূলের পরে দাঁড়াতে পেরে পৌঁছয় এই গভীর নৈশ্চিত্যে যে অন্তত একবার ভগবান প্রত্যক্ষ নবতনু ধরে পৃথিবীতে নেমেছিলেন, পেরেছিলেন নিজের পূর্ণিমাপ্রকাশকে সম্ভব করে দিব্য পরা প্রকৃতিকে অবতীর্ণ করতে এই ক্রমবিকশমান খুঁতে-ভরা বসুন্ধরায়।')

(ক্রমশঃ)

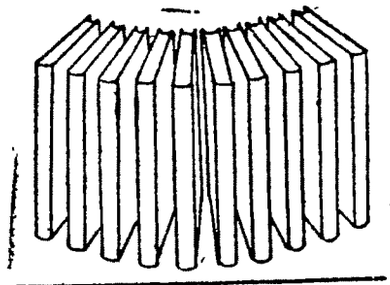

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অন্তর্মনা : গত শুক্রবার ২০এ ডিসেম্বর অপরাহ্নে কবি হরপ্রসাদ মিত্রের লেক টাউনের বাসভবনে সাহিত্যের লেখক-পাঠকের একটি আসরের সূচনা হয়। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুশীল রায় শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ, শ্রীশিবাজী গুপ্ত এবং অন্যান্য লেখক ও অধ্যাপক কবিতা-পাঠে ও আলোচনায় যোগ দেন। হরপ্রসাদ মিত্রের এক গুচ্ছ কবিতা-বিন্যাসের গভীর নাটকীয় আবেদনটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

নেপালী ভাষার সরকারী স্বীকৃতি লাভ

সাহিত্য আকাদেমী সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, নেপালী ভাষাকে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এর ফলে এখন থেকে নেপালী ভাষায় রচিত পুস্তকাদিও আকাদেমী কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবশ্য নেপালী সরকারী ভাষা হিসেবে পূর্ব থেকেই স্বীকৃত ছিল। এ-রাজ্যের মধ্যে দার্জিলিং জেলাতেই নেপালী ভাষাভাষীর সংখ্যা সর্বাধিক। ঐ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ কিছুকাল পূর্বেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন নেপালী ভাষার সর্বভারতীয় স্বীকৃতির জন্য। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টার ফলেই আকাদেমী বর্তমান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার অভিযান

রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের সমাজ শিক্ষা শাখার উদ্যোগে ২৪ পরগণা জেলার পনেরোটি ব্লকে মোট ৬০টি সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রে যাঁরা শিক্ষকতা করবেন, তাঁদের সকলকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী এখন পর্যন্ত কুচবিহার বর্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এই ধরনের সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

শিশু-সাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোমের জন্ম-জয়ন্তী

শিশু-সাহিত্যিক স্বর্গত যামিনীকান্ত সোমের ৯০তম জন্ম-জয়ন্তী নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে সুসম্পন্ন হয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা কার্যালয়, ৮০নং বৈষ্ণবপাড়া লেন হাওড়ায় অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন রমেশ দাস। 'হাওড়া বার্তা' সম্পাদক ডঃ শম্ভুচরণ পাল এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ধ্রুববিকাশ দাস শিশিবকুমার মজুমদার প্রসেনজিৎ বসু প্রমুখ সুধীবৃন্দ স্বর্গত সোমের স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতির জন্যও এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

'শতরূপা'র উদ্যোগে গুণীজন সম্বর্ধনা

ত্রৈমাসিক 'শতরূপা'র উদ্যোগে কলকাতার ইনফরমেশন ব্যুরোয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ডঃ রমা চৌধুরী সরযূ দেবী কানন দেবী অমলাশঙ্কর ও উৎপলা সেনকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শঙ্করপ্রসাদ মিত্র। যুগান্তর সম্পাদক সুকমলকান্তি ঘোষ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ অধ্যাপক হরিপদ ভারতী ও বাণী রায় প্রমুখ সুধীবৃন্দ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

'কৃষ্টি' আয়োজিত সাহিত্য আলোচনা সভা :

গত ১৫ ডিসেম্বর বারুইপুরের ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন হল-এ 'কৃষ্টি' সাহিত্য-সংস্থা আয়োজিত সাহিত্য সন্ধ্যায় কবিতা পাঠ এবং আলোচনার ব্যবস্থা হয়। কবিতার দুর্বোধ্যতা এবং গল্প-কবিতার সীমার প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান আলোচনা হয়। আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন কবিতা সিংহ শেখর বসু কল্যাণ সেন রত্নেশ্বর হাজরা পরেশ মন্ডল অশোক চট্টোপাধ্যায় রণজিৎ মজুমদার নির্মলেন্দু গৌতম উত্তমকুমার দাশ সুনীলকুমার প্রমুখ কবি ও কথাসাহিত্যিক। আধুনিক কবিতা আবৃত্তি করে শোনান মৈত্রেয়ী দেব।

মন্ট্রিল-এ আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মেলা

আগামী বৎসর মে মাসের মাঝামাঝি (১৫ — ১৯) মন্ট্রিল নগরীতে একটি গ্রন্থ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে যোগাযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে এ জন্য সর্বশ্রেণীর ব্যক্তি ও সংস্থা এই অনুষ্ঠানে যাতে যোগদান করেন সেজন্য উদ্যোক্তাগণ বিশেষ আগ্রহী। প্রকাশক মুদ্রক শিল্পী লিটারেরী এজেন্ট পত্র-পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন বলে আশা করা যায়। এসম্পর্কে যোগাযোগের ঠিকানা—মিঃ রেজিন লা মেউর পাবলিক রিলেশনস ডিরেকটর মন্ট্রিল ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার ইউরোপীয়ান অফিস ৩৩৬-৩৪০ রু সন্ত-হনর প্যারিস ফ্রান্স।

'অনুবাদ' সম্পর্কে তথ্য

অনুবাদ সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তি তথা প্রকাশকগণ অনেক সময়েই নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যেমন অনুবাদ করার রাইট, দেনা-পাওনার প্রশ্ন উত্তরাধিকারী কে—ইত্যাদি। যে সমস্ত গ্রন্থের 'কপিরাইট'-এর সমস্যা নেই, সে সম্পর্কে অবশ্য এ-সবের কোন অসুবিধে দেখা যায় না। কিন্তু একেবারে হালফিলে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অনুবাদের বেলায় এ-সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই সমস্ত ব্যাপারে লেখকগণ তথা প্রকাশকগণকে সুপরামর্শ দেবার জন্য সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। শ্রীকুন্নপারামপিল পি পুন্নুস এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। তাঁর ঠিকানা—ষষ্ঠ সেকটর—৮০৬ রামকৃষ্ণপুরম নয়াদিল্লী—১১০০২২।

—জয়ংকার

নতুন বই

নন্দন কাননে—দীপককুমার সরকার। সুপ্রিয়া প্রকাশনী। ২ই বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা—৩। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

হিমালয়ে সেই কোন অনাদি অতীত থেকেই আমাদের কাছে এক অপার রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও তার দুরন্ত নদীর কোল জুড়ে ফসল ক্ষেত, কোথাও উত্তুঙ্গ শিখর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আবার কোথাও রয়েছে বন্ধুর উপত্যকা। হিমালয়ের প্রতিটি বাঁকে বাঁকেই দৃশ্যবদল। অপার রহস্য যেন ওৎ পেতে রয়েছে দুর্গম অভিযাত্রীদের চোখ ভোলাতে।

গাড়োয়ালের ভুন্দর নদীর তীরে আছে নন্দন কানন। এখানে সারা উপত্যকা জুড়ে বিচিত্র ফুলের সমারোহ। অথচ নন্দন কাননের কথাই তো জানতো না কেউ। ১৯৩১ সালে একে আবিষ্কার করা হয়। ১৯৩৬ সালে এই অঞ্চলেই শিখরা আবিষ্কার করেন পবিত্র তীর্থ হেমকুন্ড। তারপর থেকেই মানুষের বিরতিবিহীন পদযাত্রা চলেছে এর উদ্দেশ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করতে।

লেখক নন্দন কাননের পথে যেতে যা দেখেছিলেন আর যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করেছিলেন তার ভিত্তিতে এই বইখানি লিখেছেন। রহস্য রোমাঞ্চে ভরা এই ভ্রমণ কথা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে লিখেছেন দীপক-কুমার সরকার। সাবলীলগতিতে ভ্রমণ কাহিনী এগিয়ে চলেছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কোথাও এতটুকু গতিভঙ্গ হয়নি। এরই মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ স্থানের উচ্চতা, এক স্থান থেকে এক স্থানের দূরত্ব এমনি সব প্রয়োজনীয় তথ্যও জানাতে ভোলেন নি। ছাপা এবং প্রচ্ছদ ভালো।

রিক্ত বসন্ত (গল্প সংকলন)। বৈতালিক। জ্যোতি প্রকাশন ২-এ নবীনকুণ্ডু লেন কলকাতা ৯। ছয় টাকা।

কয়েকটি গল্পের সংকলন 'রিক্ত বসন্ত' লেখক বৈতালিক। গল্পগুলি পুরনো ছাঁদের। সমস্যা প্রেম বাৎসল্য দারিদ্র্য ইত্যাদি। 'রিক্ত বসন্ত' গল্পের সতী অনুপমের সম্পর্কের টানা-পোড়েন শেষ লগ্ন গল্পের মানসী-পরিতোষের বৃহৎ জীবন-বোধে উত্তরণ মাতৃত্বের 'অভিষেক' গল্পে প্রশান্তর দ্বিতীয় স্ত্রী নন্দিতার বাৎসল্য-বোধ ও স্বামীর প্রথম স্ত্রীর পুত্রের কাছে বিমাতার ভীতি থেকে সরে এসে পূর্ণ মাতৃত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া ইতিহাসের কান্না গল্পে সমীর-পলাশীর প্রেম সম্পর্ক গল্প রসপিপাসু সাধারণ পাঠকদের তৃপ্ত করবে। কোথাও কোথাও লেখক বস্তুভিত্তিক সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করলেও পাঠকচিত্ত তৃপ্ত থাকবে।

অকাল বোধন ও অন্যান্য গল্প (গল্প সংকলন)। শঙ্কর বসু। রায় এণ্ড চৌধুরী ৮।২ হেস্টিংস স্ট্রীট কলকাতা-১। সাত টাকা।

মোট বারোটি ছোট গল্পের সংকলন হল শঙ্কর বসু রচিত অকাল বোধন ও অন্যান্য গল্প নামের গ্রন্থটি। শঙ্কর বসু নতুন লেখক কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। বিষয়ে সমকাল ও একালের ভেঙে-পড়া মানুষ ও মানবতার কথা বলেছেন লেখক। আশ্চর্য ক্ষমতার কথা রয়েছে ভাতের উপাখ্যান গল্পে আছে জননী জনম দুখ হরতালের এক হপ্তা গল্পে। বলার ভঙ্গিতে কখনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচিত প্রতীকের প্রয়োগ কোথাও বা রূপকথার ঢঙে আধুনিক সর্বহারা মানুষের কাহিনী বলার চমৎকার প্রয়াস রয়েছে। গল্পের গতানুগতিক ফর্মকে ইনি ভাঙতে চাইছেন, কিন্তু বিষয়কে মানুষের মর্মের সঙ্গে গেঁথেই। সর্বকালের মানুষের বাঁচার কথা সাধারণ ক্ষুধা নয় ক্ষুধাকে ধরে বড় করে বাঁচার কথা, সেই সঙ্গে মরার করুণ চিত্রও এঁকেছেন লেখক। এ ব্যাপারে 'চাঁদের বিয়ে' জেলখানার মঙ্গল-সুল-মহিমের চরিত্রচিত্রময় গল্প 'অকাল বোধনের কথা মনে পড়ে। কিছু শব্দে 'ম্যানারিজম' অতিরিক্ত বাক্য ভেঙে ছোট করার প্রবণতা এবং পরিবেশ বর্ণনার আতিশয্য কমালে গল্পগুলি খাঁটি শিল্পের বন্ধন পেতো।

নিবেদন। শ্রীমিহির দাস। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

'নিবেদন' মিহির দাসের প্রথম কবিতার বই। প্রচুর টাকা খরচ করে বার করা প্রায় পৌনে দুশো পাতার এই বই। এতে ৪৪টি পদ্য (পদ্য শব্দটা সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি) এবং সাতটি গান আছে। পদ্যগুলি লেখার তারিখ একেবারে আধুনিককালের (১৯৭২ ৭৩ ৭৪)। তারিখ দেওয়া না থাকলে মনে হতো বেশ কয়েক যুগ আগের লেখা। বেশীর ভাগ লেখাই বিরাট আকারের ৭।৮ পাতার। তবুও এর মধ্যে 'ভিক্ষা লীলাবতী ছবি হলদিয়া আরেক দেখা লেখাগুলি ভালো লাগলো। 'নিবেদন' দেখে জানলাম কবি হলদিয়ার ইঞ্জিনীয়ার। তাই রচনাগুলির মধ্যে হলদিয়ার একটা সামাজিক অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিক দুর্বোধ্য কবিতার ওপর যাঁরা বিরূপ কিংবা আধুনিক কবিতার ওপর যাঁদের বিতৃষ্ণা তাঁদের এই বই ভালো লাগতে পারে।

সুরা-সাকী ও সাহিত্য—শ্রীরমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাকুলিয়া সিংভূম বিহার। চার টাকা।

মানুষের জীবন মন অধ্যাত্ম ভাষায় মানবিক প্রেমবোধ জড় জীবনের অতীত এক অমৃতময় জীবনস্বরূপকে সুরা-সাকী ও সাহিত্য গ্রন্থে যুগ্ম লেখক ব্যাখ্যা করেছেন। মোট পাঁচটি প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রচনাগুলি সুলিখিত ও নানা তথ্য ও তত্ত্বে যুক্তি-সম্মত-রূপ গ্রহণ করায় পাঠকদের জ্ঞান পিপাসা যথোচিত তৃপ্ত করার সহায়ক হয়েছে।

উৎস সুকান্ত—সম্পাদনা ঃ দেবযানী চক্রবর্তী। হায়দরপুর, মালদহ। দাম এক টাকা।

শীর্ণকায় এই পরিচ্ছন্ন রুচির পত্রিকাটিতে কিছু ভালো কবিতা চোখে পড়ল। লিখেছেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পরিতোষ খাঁ, অমিত গুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমল চক্রবর্তী অসীম বসু পুষ্পজিৎ রায়, দেবযানী চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন।

সাহিত্য চিন্তা—সম্পাদক ঃ কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩১১. গাঙ্গুলীবাগান, কলকাতা-৪৭। দাম দেড় টাকা।

সাহিত্য চিন্তার শারদীয় সংখ্যায় কিছু ভালো কবিতা এবং প্রবন্ধ রয়েছে। বিষ্ণু দে, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, রাম বসু শঙ্খ ঘোষ এবং সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতা ভালো লেগেছে। অচ্যুত গোস্বামী এবং ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধও উচ্চমানের।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অরণি—অসিতকুমার দত্ত। শিবপুর, হাওড়া-২। কুড়ি পয়সা।

আগমনী—শিশির কবিরাজ ও অর্ধেন্দু রাজ সম্পাদিত। দুবরাজপুর, বীরভূম। দাম ২৫ পয়সা।

পদক্ষেপ—সম্পাদনায় ঃ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল কাদের এবং বিমলেন্দু দত্ত।

সালার—মুর্শিদাবাদ। দাম উল্লেখ নেই। 'হিজল বিলের রাখালেরা' সৈয়দ সিরাজের গল্প এই সংখ্যার একটি বিশেষ আকর্ষণ। বিষ্ণু সামন্তের কবিতা ভালো লাগল।

সৈকত—সম্পাদক ঃ মাধব ভট্টাচার্য। সৈকত সরণী। বুইচা, নদীয়া। পঁচাত্তর পয়সা।

মাঠ ময়দান কাবলনা—আলি আকবর ও নন্দ চৌধুরী সম্পাদিত। পি-৮, শরৎ-চন্দ্র এভিনিউ। পোঃ দুর্গাপুর-৫। বর্ধমান। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

অঙ্গনা

মহীয়সী নারীর অন্তর্ধান

বাঙ্গালী যে সমস্ত মহিলা অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারিণী ছিলেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী তাঁদের অন্যতম। বাঙ্গালী হিসেবে যে কোন মহিলার কৃতিত্বই আমাদের গর্বের বস্তু। সুচেতা কৃপালনী কৃতিত্বের যে স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন সেদিক থেকে বিচার করে দেখলে আমরা তাঁকে আর শুধু বাংলার গৌরব হিসেবে মনে করে তাঁর বিরাটত্বকে সীমিত না করে তাঁকে সমগ্র ভারতেরই মহিলা সমাজের গৌরব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সুচেতা কৃপালনী উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন কিন্তু তাঁর উচ্চশিক্ষাই তাঁকে আত্মত্যাগ, দেশপ্রেমের মহান ব্রতে উজ্জীবিত করেছিল এমন নয়। দেশকে তিনি ভালবাসতেন সমস্ত অন্তর দিয়ে। দেশের উন্নতিকল্পে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুচেতা কৃপালনীর বিরাট অবদান দেশবাসীকে চমকিত করে। পরাধীন ভারতকে অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত তিনি অক্ষরে অক্ষরে এই সঙ্কল্পকে পালন করেছেন। তিনি শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জাতীয়তাবাদী নেত্রীই ছিলেন না সংগঠক ও প্রশাসকরূপে তিনি এক উজ্জ্বল কর্মদক্ষতার পরিচয় দেশবাসীর সামনে রেখে গেছেন।

সুচেতা কৃপালনীর ১৯০৮ সালে নদীয়া জেলায় এক ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হয়। বিয়ের আগে তাঁর পদবী ছিল মজুমদার। তাঁর পিতা ছিলেন পাঞ্জাবের প্রবাসী বাঙ্গালী ডাক্তার। সুচেতা মজুমদার বাল্যকালে পাঞ্জাবের লাহোর শহরেই লেখাপড়া আরম্ভ করেন। ১৯৩১ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম-এ পাশ করে তিনি ১৯৩১-৩৯ সাল পর্যন্ত কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনার নিযুক্ত হন।

সুচেতা মজুমদার ১৯৩৪ সালে বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় অসাধারণ সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনীর স[illegible] তাঁর বিয়ে হয়। সে সময় থেকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী আচার্য কৃপালনীর এক বিরাট সহায়করূপে কাজ করতে থাকেন। তখন থেকে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯৩৯ সালে তিনি রামমনোহর লোহিয়ার স্থলে কংগ্রেসের বৈদেশিক বিষয়ক সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে তিনি অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মহিলা দপ্তরে সম্পাদক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। অচিরেই তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে থাকেন এবং সব রকম কঠিন ও কঠোর কাজের জন্য প্রশংসিত হন। এ সময় থেকে পারিবারিক জীবন তুচ্ছ করে তিনি ঘনঘন কারাজীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।

১৯৪৫ সালে তিনি কস্তুরবা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর সংগঠন সম্পাদক ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে যখন নোয়াখালিতে হিন্দুদের ওপর চরম অত্যাচার হয় সুচেতা কৃপালনী প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ঐ জেলায় দাঙ্গাপীড়িত অসহায় নরনারী শিশুর সেবায় নিমগ্না হন। তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে শান্তির প্রতিমূর্তি হিসেবে আবির্ভূতা হন। সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ যাতে দেশকে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। ১৯৪৭ সালে উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সদস্যারূপে স্থান লাভ করেন এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি সদস্যারূপে কংগ্রেস সংগঠনের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। স্বামীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি একাত্মা ছিলেন। তাই ১৯৫১ সালে আচার্য কৃপালনীর কংগ্রেস পরিত্যাগের সঙ্গে তিনিও কংগ্রেস থেকে সরে আসেন। ঐ সাল থেকেই তিনি স্বামীর সঙ্গে কিষাণ মজদুর পার্টি গঠন করেন। এই দল গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সমাজতন্ত্রের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ১৯৫৭ সালে শ্রীমতী কৃপালনী আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন এবং ১৯৫৮ সালে আবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। বছর কয়েক একাজ করার পর তিনি ১৯৬০ সালে মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে ইন্টার ন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে জেনেভাতে গিয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালের ২রা অকটোবর কামরাজ প্ল্যান অনুযায়ী চন্দ্রভানু গুপ্তকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হয় এবং সে স্থানে সুচেতা কৃপালনী অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালের ৩ রা মার্চ পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন পরে ঐ বছর তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হন।

দেশের এই মহান নেত্রী ৬৭ বছর বয়সে ১ ডিসেম্বর দিল্লীতে পরলোকগমন করেন। তাঁর পরলোকগমনে সংগ্রামী, দেশপ্রেমিকা ও সমাজসেবীর এক বিরাট স্থান শূন্য হয়ে গেল।

টুকিটাকি :—

গ্রামদেশের মানুষেরা কাপড়-জামা কাচতে সাবান সোডা ছাড়া অন্য কোন রকম রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতে এখনও ঠিক অভ্যস্ত নয়। প্রকৃতি থেকে পাওয়া জিনিসই তাঁদের অন্যতম প্রধান ভরসা। জামা-কাপড়ে তাঁরা অজানা রং লাগলে সাবান-সোডার সঙ্গে বেশ কিছু পাতি লেবু কেটে নিয়ে তা সেদ্ধর পাত্রে দিয়ে দেয়। তাতে সহজেই কাপড়ের দাগ মিলিয়ে যায়।

ভুলবশতঃ এক পোশাকের রং অন্য পোশাকে লেগে গেলে তা সাবান দিয়ে ফোটাবার সময়ে খানকয় পাতি লেবুর টুকরো ফেলে ভাল করে সেদ্ধ করলে তা আপনিই উঠে যায়। অবশ্য রঙীন কাপড়ের রং বেশী সিদ্ধ করলে হালকা হয়ে যায় তবু অন্য রং লেগে যেসব কাপড় অব্যবহার্য হয়ে যায় তাকে আবার ব্যবহার করা চলে।

কাপড়ে তেল রং লাগলে চক বা ট্যালকম পাউডার গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্রমশঃ তা মাখখানে একটা ছোট বিন্দু করে আনলে তা কালির তেল শুষে নেয়। পরে ফোট ঝাড়ার ব্রাশ দিয়ে তা ঝেড়ে ফেললে কাপড়ের তেল রং অদৃশ্য হয়ে যাবে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত রোজ সকালে এক চক্কর বেড়িয়ে আসতে না পারলে হাঁফিয়ে ওঠেন। লাঠি ঠুকঠুক করে সেই পরিচিত বিলের ধারে এসে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একটু ঘাসের গন্ধ জলের গন্ধ শামুক পানার গন্ধ পাবার লোভে ছটফট করেন বঙ্কিমবাবু। কিন্তু ছেলে অমিয় কি বৌমা কি তার ছেলেমেয়েরা ঠিক উল্টো। তারা শহরের উদ্দামতা অস্থিরতা পছন্দ করে।

অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক-এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তার কথার প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাঁকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং অমিয়, তার স্ত্রী নীহার সবাই যেন কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। সংসারের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন যেন তিনি। তবু একসময় নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে অমিয় বা তার স্ত্রী নীহার নয়, তাদের বংশধরদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান বঙ্কিম দত্ত।

নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জড়িয়ে করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

(দশ)

বাবা যেন কি! এক এক সময় বোঝা যায়, এক এক সময় বাবাকে একেবারেই বোঝা যায় না। কিম্ভূত মনে হয় তখন। টুটুল ভাবে। যখন বোঝা যায় তখন তার মনে হয়, বাবার চেয়ে সহজ সাদাসিধে মানুষ এই পৃথিবীতে কেউ নেই। তখন একেবারে টুটুলের হাতের মঠোয় চলে আসে তার 'বাবু'।

আর মনে হয়, 'বাবু' তার বয়সের একটি তেরো-চোদ্দ বছরের বাচ্চা ছাড়া আর কিছু নয়। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে গল্প করতে টুটুলের কী যে ভাল লাগে না তখন!

আবার একটা সময় এমন গম্ভীর দেখায় মানুষটাকে!

মাথায় বড় বড় চুল।

তিন দিন চার দিন চলে যায় দাড়ি কামায় না। জ্বলজ্বল চেহারা নিয়ে চুপচাপ শোবার ঘরের মেঝেয় বা পুবের বারান্দায় নিজের মনে পায়চারি করে, আর কি যেন কেবল ভাবে।

বাবাকে তখন খুব খারাপ লাগে টুটুলের। ধারে কাছেও ঘেঁষে না।

আশ্চর্য, তখন বাবা ফুলগাছও দেখবে না, খাঁচার পাখির দিকেও মন দেবে না যা ছিপ নিয়ে কোথাও যে মাছটাছ ধরতে যাবে সে রকম কোনো ইচ্ছেও তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে না। যেন বাবার সব কটা ইচ্ছে একদম মরে যায়।

তারপর বাবা যে কি করবে, অবাক হয়ে ভাবতে হয়। মানে ঐ সময়টা। ভেবে ভেবে টুটুল কুলকিনারা পায় না।

অবশ্য তখন একটা ভয় মাঝে মাঝে টুটুল যা দেখে, মা-র সঙ্গে বাবার বেশ খিটিমিটি বেধে যায়।

এমনিতে বাবার ওপর মা খানিকটা বিরক্ত। টুটুল বোঝে।

কত বিদ্বান মানুষ। অথচ টাকা-পয়সা রোজগারের দিকে বাবার মন নেই।

যে জন্য এই সংসারে মার জোরটা কম। দাদুই সব।

টাকা-পয়সা দাদুর হাতে। দাদুর পেন্সনের টাকা। আবার দিল্লী থেকে কাকু যা পাঠায় তা-ও দাদুর নামে আসে। দাদুর কাছেই থাকে।

বাজার-টাজার যা হবে সব দাদু বলে দেয়। কাপড়-চোপড় রেশন রোজকার মাছ তরকারী ও মুদী দোকানের জিনিস থেকে আরম্ভ করে সামান্য সুঁই-সুতোটাও দাদু অনুমতি দেবে তারপর কেনা হবে। অনুমতি মানে কি—দাদুর কাছে টাকা চাওয়া।

এখন পদে পদে এটা-ওটার জন্য দাদুর কাছে গিয়ে হাত পাতা—মার ভীষণ অপছন্দ। অন্তত এই জন্য দাদুর সামনে মা কখনও গিয়ে দাঁড়ায় না। দরকার হলে রতনকে পাঠায়, ঝিকে পাঠায়। বা তাদের দু' ভাই-বোনকে যেতে হয়। রঞ্জুকে অবশ্য হাতের কাছে সব সময় পাওয়া যায় না। কাজেই টুটুল।

আর বাবা তো এ-সবের মধ্যে কোন-দিনই নেই। পর পর দু' হপ্তা যদি রেশনের মতন দরকারী জিনিসও ঘরে না আসে বাবা টুঁ শব্দটিও করবে না। যেন আসে খাব, না আসে উপোস থাকব এমন ভাব।

কিন্তু উপোস কি থাকে।

সময়মত ভাত চাই, জলখাবার চাই চা কফি। কফি না থাকে তো চা। দিনে আট-দশ বার চা চাই বাবার।

একটু আগে ঐ চা নিয়ে মা-র সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল।

দমদম মাছ ধরতে যাওয়া নিয়ে দাদুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবার পর মুখ ভার করে বাবা শোবার ঘরে কতক্ষণ একা একা পায়চারি করে। তারপর এক সময় রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে হাজির হয়। অর্থাৎ চা চাই।

মারও ঐ দমদমের ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ ছিল টুটুল পরে যা বুঝতে পেরেছে। বাবাকে দেখেও মা শব্দ করছিল না। মার মুখ ভার ছিল।

দাদুর সঙ্গে গল্প শেষ করে টুটুল ঠিক ঐ সময় রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—এই টুটুল, আমায় চা দিতে বলবি।

বাবার চোখ দেখে টুটুল ভয় পায়। থমথমে চেহারা। লাল চোখ এমনিতে। তখন যেন রক্তপলাশ চোখ দুটো। মা এদিকে পিছন ফিরে। আনাজ কোটা নিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত এমন একটা ভান করছিল কাজেই মার ওপর চটে গিয়ে টুটুলকে দেখে বাবা চায়ের জন্য গর্জন করে উঠল। মাও চুপ করে থাকেনি।

—এই টুটুল এখন চা হবে না বলে দাও। মা ঝিয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে গম্ভীর হয়ে উত্তর করল চিনি ফুরিয়ে গেছে। বিকেলে রেশন তোলা হবে তবে চিনি আসবে।

—খোলা বাজারে অঢেল চিনি পাওয়া যায়। মুদিখানায় বস্তা বস্তা চিনি সাজিয়ে রেখেছে। রতনকে পাঠিয়ে দিলে এখুনি দোকান থেকে চিনি নিয়ে আসতে পারে এক কেজি দু কেজি যত ইচ্ছে। দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে বাবা বলছিল।

—রতনকে অন্য কাজে পাঠান হয়েছে। মার গলার স্বরে আগের চেয়েও বেশি ঝাঁজ ফুটল তা ছাড়া ব্ল্যাকে চিনি কেনার জন্য কে গিয়ে বুড়োর কাছে পয়সা চাইবে?

টটুল যাবে। বাবা ধমক দিয়ে উঠেছিল।

—না টুটুল যাবে না। মা মুখ ফিরিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে বাবাকে দেখছিল। যেন বাবা এতটা আশা করেনি। একটু চা খাবে। কিন্তু এই ব্যাপারে টুটুলকেও সহযোগিতা করতে দিতে মা রাজী নয়। দাদুর কাছে গিয়ে ও যদি চিনির জন্য কটা পয়সা চাইত দাদু কি দিত না!

হয়তো দিত না। নিয়মের বাইরে একটা পয়সাও খরচ হবে দেখলে দাদু ভয়ানক চটাচটি করত। এই ভয়েই মা তাকে দাদুর কাছে পাঠাতে চাইছেন না। টুটুল বুঝল। কিন্তু তা হলেও বাবার চেহারা দেখে টুটুলের বুকের ভিতরটা কেমন ছটফট করে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে মাকে একটু অতিরিক্ত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল তার।

বাবা আর রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে না। টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে যায়। যেন রাগে ফেটে যাচ্ছে। মুখে কিছু বলছে না। তবে বারান্দা পার হবার সময় পাশেই দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করান মিট-সেফটার সামনে এক সেকেন্ড দাঁড়ায়। মিটসেফ-এর মাথায় ধোয়া কাপ-ডিসগুলি একটু আগে ঝি সাজিয়ে রেখেছে। বাবা তার মধ্যে থেকে বেছে ঠিক নিজের কাপটা তুলে নেয়। একটুখানি লতা ও ফুলের ছাপ দেওয়া সুন্দর জলপাই রঙের কাপটায় চা কফি খেতে বাবা ভালবাসে। কিন্তু হঠাৎ কি করল! কাপটা তুলে বাবা জোরে মেঝের দিকে ছুঁড়ে দিল। বেশ বড় একটা শব্দ হল। ভাঙ্গা কাপের টুকরো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। বিশ্রী শব্দটা শুনে খবরের কাগজটা হাতে নিয়েই দাদু দক্ষিণের বারান্দা থেকে ছুটে আসে। ঝি ও মা এক-সঙ্গে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেয়। বাবার পিছে পিছে যাচ্ছিল টুটুল। কাপের একটা ভাঙ্গা টুকরো তার পায়ের কাছে ছুটে আসে। আর একটু হলে তার পা কেটে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

কিন্তু কেউ কথা বলল না। জিনিসটা এক পলক দেখে সবাই বুঝে নিল। এক সেকেন্ডের মধ্যে ঝি ও মার মুখ আর রান্নাঘরের দরজার বাইরে দেখা গেল না। চটির চটাস চটাস আওয়াজ তুলে খবরের কাগজ হাতে দাদুও সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরের দিকে ফিরে যায়।

অন্ধকার প্রায় সরু প্যাসেজটার মাঝখানে কেবল বাবা দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা টুটুলকে দেখছিল।
টুটুল বাবাকে দেখছিল।
বাবার দু চোখ ছলছল করছে।

অর্থাৎ এতবড় একটা ঘটনা ঘটল। সবাই দেখল। কিন্তু কারো মুখ থেকে টুঁ আওয়াজটি বেরোল না এতে যেন বাবার অপমানটা বেশি লাগছিল। বাবার ঠোঁট কাঁপছিল। অভিমানে বাচ্চাদের ঠোঁট এমন করে কাঁপে। দেখে টুটুল হু-হু করে কেঁদে ফেলল। ওর কান্নার আওয়াজ ছিল না। দুদিকের গালের নরম মাংসে তুলতুলে দুটো ঢেউ উঠে ঠোঁট দুটো শুধু ফাঁক হয়ে থাকে আর সকালবেলার টলটলে শিশিরের মতন ফোঁটা ফোঁটা হয়ে জল পড়তে থাকে চোখ বেয়ে।

—তুই কাঁদছিস কেন। বাবা ছুটে এসে টুটুলের হাতটা মুঠোর মধ্যে টেনে নেয়। ছি, তোর কান্নার হয়েছে কি!

টুটুল কথা বলে না। হুসহুস করে কাঁদতে থাকে। হাত ছেড়ে দিয়ে ওর নেয়া-পাতি ডাবের মতন ছোট লম্বাটে মাথাটা বাবা বুকে চেপে ধরে। বাবার পেটের সঙ্গে লেপটে থাকতে ওর ভাল লাগে। চোখের জলটা এবার বন্ধ হয়। কান্নার ধমকটা ধিকিধিকি চলতে থাকে যদিও।

—না না তুমি কাঁদবে না মা তুমি তো কিছু করনি। বাবা তাকে বোঝায়। বাবার গায়ের গন্ধ শ্বাসভরে সে টানতে থাকে। গন্ধটা মিষ্টি লাগে। আর কারো শরীরে এমন মিষ্টি গন্ধ আছে কিনা সে জানে না। এবং তখুনি সে টের পায় তার মাথার চুলে চিবুক ডুবিয়ে দিয়ে বাবা নাক ঘষছে।—মা মামণি। ফিসফিসে গলায় আদর করে ডাকছে বাবা।

এই মুহূর্তে একটা কিছু বলতে হয়। এবং আর কোনো কথা খুঁজে পেল না সে। তাই বাবার মতন ফিসফিসে গলায় বলল এমন সুন্দর কাপটা ছিল তোমার। ওটা ভেঙ্গে গেল।

'তুমি কাপটা ভেঙ্গেছ' তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

—যাক গে ভেঙ্গেছে আপদ গেছে। বাবা তার ফুলোফুলো চুলে হাত বুলোয়। পরশু শ্যাম্পু করেছিল। তাই চুলটা এখনো ফুর-ফুরে। অল্প হাওয়ায় নড়াচড়া করে। বাবার নিশ্বাস পড়ে তার চুল নড়ছে সে টের পায়। আমি আর কোনোদিন চা খাব না। বাবা বলল এবং আরও ঘন করে শ্বাস ফেলল। কাপটা ভেঙ্গে গিয়ে ভালই হয়েছে টুটুল।

—ইস বাবাকে ছোট করে একটা ধাক্কা দিয়ে সে সরিয়ে দেয়। কেন তুমি চা খাবে না! জলপাই রঙের আরো দুটো কাপ রয়েছে আলমারিতে আমি বার করে দেব। তোমার চা না খাওয়ার হয়েছে কি। যেন ছোট ছেলেকে শাসন করছে। ডুবু বেঁকিয়ে রাগী চোখে টুটুল বাবার মুখের দিকে তাকায়। বিকেলে রেশন আসবে চিনি আসবে। আমি নিজের হাতে তোমাকে চা করে দেব।

—আচ্ছা তাই দেবে, তাই দিও তুমি চা করে দিলে আমি খাব তখন আমি 'না' করতে পারব না। এতক্ষণ পর বাবার মুখে হাসি ফুটল।

রেজিষ্ট্রি বিবাহ অফিস

মোট ১৬ টাকায় রেজিস্ট্রি বিবাহ

এন কে ঘোষ, জে-পি

ম্যারেজ অফিসার

১১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলি-৯, ফোন : ৩৫-৩০৪৮

বাবার মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আহ্লাদে বাবার কোমর জড়িয়ে ধরল সে। বাবাকে জয় করেছে। হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। এই উত্তেজনা অসামান্য। তাই চোখের কিনারে জল থাকা সত্ত্বেও টুটুলের সারা মুখে হাসি ভরে ওঠে।

—ওই দ্যাখো কে এসে দাঁড়িয়েছে তোমার পেছনে। টুটুন আঙুল দিয়ে দেখায়।

বাবা ঘাড় ফেরায়। বাবার লালচে চোখের মণি খুশীতে গোল হয়ে ওঠে। কাঁকুলিয়া রোডের গোপা। টুটুলের বন্ধু। লম্বা ছিমছাম শরীর। গলাটা সারসের মতন। ভীষণ ফরসা গায়ের রং। একটা লকেট ঝুলিয়ে এসেছে যে জন্য গলাটা আজ আরও বেশি লম্বা দেখাচ্ছে। সবুজে হলুদে ডোরা কাটা সাটিনের ফ্রক গায়ে। অন্যদিন স্কার্ট পরে আসে। না কি ফ্রকের জন্য ওকে অতটা চ্যাঙা দেখাচ্ছে টুটুন ভাবে। কদিনে চ্যাঙা হয়ে উঠে গোপা যেন সুন্দর হয়ে গেছে।

—ফ্লেমিঙ্গো। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবা গোপার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিন যা করে ও শরীরটা পিছনে গুটিয়ে নেয় গোপা। বাবার হাতে ধরা দিতে চায় না। শরীরটা গুটিয়ে নিয়ে ফিকফিক হাসে। আয়নার মতন ঝকঝকে মাড়ি। ছোট ছোট দাঁত ঝিনুকের সারি। গোপাকে দেখলেই বাবা ওই নামে ডাকবে। ফ্লেমিঙ্গো। শুনে গোপার চোখের পাতা একটুখানি বুজে আসে কিন্তু হাসি বন্ধ হয় না। —কদিন দেখিনি যে! বাবা শুধোয়।

—ফ্লু হয়েছিল। টলটলে চোখ তুলে বাবার দিকে তাকায় গোপা।

—আমারও কাল তাই হতে যাচ্ছিল রে গোপা। টুটুল প্রায় নেচে উঠল। স্কুলে যেতে পারিনি। নাক দিয়ে অনবরত জল আর হাঁচি যে জন্য স্কুলের পিকনিকটা মিস করলাম।

—আমাকে ক্যাপসুল খেতে হল। গোপা বলল। তবে না জ্বর ছাড়ল।

—আমি কিছুই খাইনি। না ট্যাবলেট না ক্যাপসুল। দাদু বুড়ো খেতে দেয়নি। কেবল আদা ফুটিয়ে গরম জল খাইয়েছে। টুটুল হি-হি করে হাসে।

—আদা জল ভাল। গোপা বলল ক্যাপসুল খেয়ে আমার কেমন গা-বমি করছিল। বিচ্ছিরি।

—টুটুলের মোটেই ফ্লু হচ্ছিল না। স্রেফ সর্দি। পরশু খুব করে উনি মাথায় শ্যাম্পু মেখেছিলেন। ট্যারা চোখে বাবা টুটুলকে দেখে হাসে।

—ইস! টুটুলের ফলোফলো মাথার দিকে চোখ রেখে গোপা আফসোসে মরে যায়। দিন দিন ওর চুলটা এত সুন্দর হচ্ছে!

—এই, চোখ লাগাবি না! গোপার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে টুটুল চোখ পাকায়।

গোপা ফিক করে হাসে। বাবা হাসে। টুটুলও হাসে।

—এসো আমার ঘরে তোমার গান শুনব। বাবা গোপাকে ডাকে।

কোনটা। বাবার দিকে না তাকিয়ে গোপা টুটুলের দিকে চোখ ফেরায়। কোন গানটা গাইব রে টুটুল?

—ভজন। ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু। টুটুন বলার আগে বাবা বলে দেয়।

—ভীষণ ভালবাসে বাবা ওটা। টুটুল আস্তে বলে।

—ভীষণ ভাল গাইতে পারে যে ও ওটা। বাবা টুটুলের দিকে এক পলক তাকিয়ে পরে গোপাকে দেখে। তারপর হাসে।

তিনজন বাবার ঘরের দিকে এগোয়। বাবা আগে। ওরা দুজন পিছনে।

—গৌরী এসেছিল রে টুটুল? গোপা শুধায়। টুটুল উত্তর দেবার আগে টুটুলের বাবা মাথা নাড়ে।

—উঁহু, ফ্লেমিঙ্গোর মতন সাতসয়ালিও কদিন ধরে আসছে না।

বাবার কথা শুনে টুটুল ও গোপা শব্দ করে হাসে। তাদের আর একটি বন্ধু। একডালিয়া রোডের গৌরী। বাবা ওকে সাতসয়ালি বলে ডাকে। ওদের সব কটি বন্ধুর একটা করে পাখির নাম রেখেছে বাবা। ফার্ণ রোডের টুবলির নাম সোনালী ফেজান্ট। রিজেন্ট পার্কের রুমীর নাম ফটিক-জল রিচি রোডের চামেলিকে ডাকা হয় চন্দনা আর লেক গার্ডেন্স থেকে আসে টুটুলের আর এক বন্ধু ঝুমঝুম বাবা নাম রেখেছে বসন্ত বউরি।

ওরা খুশী হয়। একটুও রাগ করে না। টুটুলের ভাল লাগে। বাবা ভীষণ পাখি ভালবাসে। তাই তোদের পাখির নাম। বন্ধুদের বোঝায় টুটুল। আর তার বন্ধুরা যখনই এ-বাড়ি বেড়াতে আসবে বাবার পাখির খাঁচার কাছে ভিড় করে দাঁড়াবে।

আজ গোপা হতাশ হয়েছে।

—মেসোমশায় আপনার খাঁচায় একটাও পাখি নেই।

—দুটো উড়ে গেছে দুটো মরে গেছে। বাবা এদিকে ঘাড় ফেরায়।

—কদিন বাবা ফুলগাছের দিকে বেশি ঝুঁকেছিল রে গোপা। টুটুল বন্ধুকে বোঝায়। এখন আবার মাছ ধরার কথা ভাবছে। নতুন পাখি আনা হচ্ছে না।

—উঁহু, মাছ ধরতে কোথাও আর আমি যাচ্ছি নে শিগগির। হাঁটতে হাঁটতে বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে টুটুলকে দেখল। টুটুল বুঝল বাবার অভিমান। একটু আগে দাদুর সঙ্গে ঐ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

—আমি আবার পাখির দিকে মন দেব। বুঝেছ ফ্লেমিঙ্গো। বাবা গোপার সঙ্গে কথা বলে। বাবা আর ঘাড় ফেরায় না।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

জাতক চিন্তাগ্রস্থ ?

বিবাহ, মামলা, পরীক্ষা, পদোন্নতি ব্যবসা, ইত্যাদি যে কারণেই হোক যদি
মেষ বা তুলা রাশি, সামবার জন্ম হয় তবে রৌপ্যের আংটীতে কুঠারের ছবি আঁকাইয়া ধারনে মনোবাসনা সফল হইতে পারে।

আপনার জানতে হোলে জন্মবার, রাশি জানান, দক্ষিণা স্বতন্ত্র

তান্ত্রিক ধীরেন্দ্রনাথ

দেবনাথ ভবন পোঃ পানিহাটী, ২৪ পরগনা

ঘরের দিকে এগোতে থাকে। গোপা শোনে। গোপাকে উদ্দেশ করে বাবা বলল ' কাল গড়িয়াহাটের মোড়ে একটা নতুন পাখিঅলা এসেছিল। দেখলাম ওর কাছে কিছু মুনিয়া ও টিয়ে রয়েছে সঙ্গে একটা কালীশ্যামা ও একটা কাজলগোবী ছিল। আজ আবার দেখতে পেলে ' কাজলগোবী ও কালীশ্যামা পাখি দুটোকে নিয়ে আসব।

—ইস, কী ভাল না হয় তা হলে! খুশী হয়ে গোপা হাততালি দিল। কাজলগোবী পাখি আমি কোনোদিন দেখিনি। তুই দেখেছিস টুটুল?

হাসি হাসি মুখ করে টুটুল মাথা নাড়ল। না সে দেখেনি। কিন্তু তার বুকের ভিতর দুরদুর করছিল। নতুন দুটো পাখি কিনতে বেশ কটা টাকা লাগবে। বাবা কোথায় টাকাটা পাবে সে বুঝতে পারছিল না। এই নিয়ে কি মার সঙ্গে আবার ঝগড়াঝাটি শুরু হবে। তার ভয় করছিল।

—তাই আনুন মেসোমশায় আজই পাখি দুটো কিনে আনুন। লম্বা গলাটা আর একটু উঁচু করে ধরে গোপা বলল খাঁচা দেখতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

বাবাকে উস্কে দিচ্ছে এই মেয়ে। টুটুল মনে মনে রাগ করল। কিন্তু এই মুহূর্তে মুখ ফুটে কিছু বলার জো নেই। পাখির নামে বাবা নতুন করে উছলে উঠবে জানা কথা। এখন দিন কতক পাখি ছাড়া বাবা আর কিছু ভাববেই না হয়তো।

—আমাদের সবাইকে একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যাবেন মেসোমশায় বলেছিলেন অনেক রকম পাখি এসে সেখানে বাসা বাঁধে। কোনটা কোন পাখি আমাদের চিনিয়ে দেবেন। মনে আছে? আদুরে গলায় গোপা বলল।

—মনে আছে বৈকি। বাবা ঘাড় নাড়ে। টুটুল অবাক হয়। হাঁটা থামিয়ে বাবা ঝপ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গোপার চোখে চোখ রেখে কথা বলছে। উৎসাহে বাবার মুখটা আকাশ প্রদীপের মতন দপদপ করে জ্বলছে। একটু আগে বাবার চেহারাটা কী ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল টুটুলের মনে পড়ল। এমন ছেলেমানুষ হয়ে যায় না বাবা এক এক সময়। কবে জানি টুটুলের বন্ধুদের একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে পাখি দেখাতে বেড়াতে নিয়ে যাবে বাবা বলছিল। গোপা ঠিক মনে রেখেছে। আর মনে পড়িয়ে দিতে বাবা এখন নেচে উঠল। —এই তো দেখতে দেখতে ঠান্ডা পড়ে যাবে। এটা আশ্বিন মাস। হাত নেড়ে বাবা গোপাকে বোঝায় সেই কোথায় মঙ্গোল থেকে তিব্বত থেকে আরো কত দূর দূর ঠান্ডার জায়গা থেকে ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসবে কলকাতায়—কিছু ঠাঁই নেবে। আলিপুর চিড়িয়াখানায় কিছু বোটানিকস-এ। নিশ্চয় নিয়ে যাব। দল বেঁধে সবাই একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাব আলিপুর যাব। খুব আমোদ করে পাখি দেখা যাবে।

বেজায় খুশী গোপা। বড় বড় চোখ করে টুটুলকে দেখে। গলাটা আরও লম্বা উঁচু দেখায় মেয়ের তখন। যেন তাতে করে আরও বেশি ফ্লেমিঙ্গো ফ্লেমিঙ্গো মনে হয়। ফ্লেমিঙ্গো পাখির মতন সরু টানটান দুটো ঠ্যাং। ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে। তা না হলে হোক না বন্ধু মনে মনে টুটুল একদম গোপাকে সহ্য করতে পারে না।

তিনজন বাবার ঘরে ঢুকল। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গোপা গলা ছেড়ে গান আরম্ভ করল।

টুটুলের মুখের ভিতরটা তেতো তেতো লাগছিল।

আর তখন ভয়ংকর অস্বস্তি নিয়ে বঙ্কিমবাবু নিচে বারান্দায় পায়চারি করছেন। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছেন। রাস্তার দিকে তাঁর চোখ দুটো। লোকজন অফিস কাছারী করতে চলে গেছে অনেকক্ষণ। এই তল্লাটে চাকুরিজীবীর সংখ্যাই বেশি। আর বঙ্কিমবাবুর মতো যারা রিটায়ার করেছে তাঁরা তো আছেনই। তাঁরা কিন্তু এই সময় রাস্তায় বেরোন না। অনেক বেলা হয়েছে। রোদ তেতে উঠেছে।

কিছুক্ষণ আগেও প্রাইভেট গাড়ি ট্যাকসি ও রিকসার বেশ কিছু ছুটোছুটি ছিল এখন একটা গাড়িও চোখে পড়ে না। রিকসা না। রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা।

অম্বুজা-নিলয়ের ঠিক উল্টোদিকে ওধারের ফুটপাথটা জুড়ে প্রকান্ড একটা অশ্বত্থবটের ছায়া পড়েছে। রোজই পড়ে এই সময়। মাঝে মাঝে ঘূর্ণির মতন ছোট ছোট বাতাসের পাক উঠে রাস্তার শুকনো পাতা ও খড়কুটো এদিক-ওদিক উড়িয়ে—ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু নাতির দেখা নেই কেন। এতটা বেলা হল? ও কি সারাদিন সেলুনে বসে চুল কাটছে। বঙ্কিমবাবু নিজের মনে বিড়-বিড় করল। তাঁর কপালের চামড়া কুঁচকে থাকে।

—বৌমা! অস্বস্তি নিয়ে তিনি ওপরের দিকে তাকান। পুত্রবধূকে ডাকেন।

দোতলার বেলিঙ থেকে নীহার গলা বাড়িয়ে দেয়।

—তুমি কি আর একবার রতনকে পাঠাবে। ঘাড়টা বেঁকিয়ে রেখে বঙ্কিমবাবু শুধান।

—একবার ও ঘুরে এসেছে, পাড়ার সেলুনে খোকনকে দেখতে পেল না। নীহার বলল।

—আবার পাঠাও আবার পাঠাও। হয়তো এদিকের সেলুন ফাঁকা না পেয়ে তোমার ছেলে মার্কেটের ওদিকের কোনো দোকানে চলে গেছে। রুষ্ট উত্তপ্ত গলায় বলল বঙ্কিমবাবুর। কি আশ্চর্য! নিজের মনে গজগজ করতে থাকেন তিনি। মার্কেটের সেলুনে চুল কাটতে গেলেও তো এত দেরি হবার কথা নয়। এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল। কি ব্যাপার অ্যাঁ।

নীহার রতনকে ডাকতে ভিতরে চলে গেল। রেলিঙের পাশে পুত্রবধূকে আর দেখা যায় না। ক্লান্ত হয়ে বঙ্কিমবাবু বেতের চেয়ারটায় বসে পড়েন। তাঁর ঠোঁট দুটো তখনও নড়ছিল। —অ্যাঁ তোমরা করবে ছেলেকে মানুষ! এই তোমাদের দায়িত্ববোধ। বাপ ঘরে বসে নিশ্চিন্ত মনে রবি ঠাকুরের গান শুনছে। রোগা ছিপছিপে মেয়েটা আরও দু-তিন দিন এসেছে। টুটুলের বন্ধু। যেন কাঁকুলিয়া রোড থেকে আসে। সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে যাতায়াত থাকবেই। কিন্তু তুমি সন্তানের জন্মদাতা এতটা বেলা হল তোমার ছেলে ঘরে ফিরছে না এটা কি তোমার গান শোনার সময়! একবার নিচে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে তোমার কি উচিত না ছেলের খোঁজ করা। না কি ভেবেছে এটাও আমার কর্তব্য। এই রোদের মধ্যে বুড়ো বয়সে রাস্তায় বেরিয়ে নাতিকে আমি এখন খুঁজতে যাব!

চাপা রাগ অভিমান ও আক্রোশের উত্তেজনা নিয়ে বঙ্কিমবাবু কাঠ হয়ে চুপ করে বসে থাকেন। চোয়াল দুটো ক্রমশ কঠিন হতে থাকে। ঠোঁটের নড়াচড়া থেমে যায়।

(ক্রমশঃ)

রাণীধূপ
প্রস্তুত করুন—কাকার প্রডাক্টস

•ঘড়ি•
•জড়োয়া গহনা•
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪, ডালহৌসী সেকোয়ার ইস্ট
কলিকাতা-১

বিজ্ঞানের কথা

বিশ্বের খাদ্য সংকট

'পৃথক পৃথক দেশে অরো তীব্র ঘাটতির নজির ইতিহাসে আছে, কিন্তু এমন সংকট-জনক খাদ্য-পরিস্থিতি সারা বিশ্বে এমন ব্যাপক আকার আর কখনো ধারণ করেছে কিনা সন্দেহ।'

কথাগুলো বলা হয়েছে রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ এ ও) মূল প্রতিবেদনে। এমন খোলাখুলি ও সরাসরি স্বীকৃতি জাতি-সঙ্ঘের এই তৎপর সংস্থাটির পক্ষ থেকেও আগে কখনো পাওয়া যায়নি।

মাত্র কিছুকাল আগেও বিশ্বব্যাপী খাদ্য-সঙ্কটের কথা বলা হলে এই সংস্থার ঝুলি থেকে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ পরিসংখ্যান বেরিয়ে আসত। শোনা যেত সার, কীট-নাশক ওষুধ ও উচ্চফলনশীল ধান ইত্যাদি সম্পর্কিত নানা কথা। কিন্তু এখন আর শোনা যায় না। সবুজ-বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, একথা এখন বিনা প্রতিবাদেই মেনে নেওয়া হয়। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকের উজ্জ্বল আশাবাদ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত, এখন শুধু শোনা যাচ্ছে সঙ্কট ও বিপর্যয়ের কথা। আর এই প্রেক্ষাপটেই নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রোমে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন।

কেন এই বিপর্যয়, এই সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি? গলদটা কোথায়? ১৯৭২ সালে ছ'টি উপমহাদেশে একসঙ্গে আব-হাওয়া বিরূপ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সাহেল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফলন ছিল নিম্নমুখী। দুই দশকেরও বেশি সময়কালের মধ্যে বিশ্বে দানা-শস্যের উৎপাদনে প্রচলিত হারে বছরে ২৫ মেগাটন বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক, বরং ৩০ মেগাটনের ঘাটতি দেখা দিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৭২ সালের আগেও ফলন ভালো ছিল না, কিন্তু সেজন্য কোমরের রশি টান করা ছাড়া আর কিছু করা হয়নি। কিন্তু ১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল পরিমাণ গম আমদানী করল। আর এমনই অশুভ যোগাযোগ, কানাডা ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র ঠিক এই সময়েই তাদের বাড়তি গমের পরিমাণে বড়োরকমের একটা ছাঁটাই ঘটাবার কাজে হাত দিয়ে বসল।

অতএব অবধারিতভাবেই দেখা দিল বিশ্বের মজুদ খাদ্যে মন্দা। গত তিন বছরের মধ্যে বিশ্বের মজুদ গমের পরিমাণ কমেছে ৪৯ থেকে ২১ মেগাটনে।

আর বার্লি জোয়ার ভুট্টা ইত্যাদি মোটা দানাশস্যের বেলায় কমেছে ৫৬ থেকে ৩২ মেগাটনে। চালের মজুদ কমেছে অর্ধেকেরও বেশি—৯-১ থেকে আশঙ্কাজনক ৩-৭ মেগা-টনে।

খারাপ ফলন ও শূন্য শস্যাগার—১৯৭২ সালের এই দুর্ভাগ্যজনক যোগাযোগের ফল অবধারিতভাবেই মূল্যবৃদ্ধি। কিন্তু এই ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালেই উন্নত দেশগুলোতে অন্যদিকে চলছিল একটা অর্থনৈতিক বাড়বৃদ্ধির অবস্থা। মুদ্রাস্ফীতি চরমে উঠছিল। পণ্যের বাজারে ফাটকাবাজীর উদ্দেশ্য নিয়ে দরকষাকষিহীন কেনা বেচা চল-ছিল। দানাশস্যের ঘাটতির ব্যাপারটা তার ফলে আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং দানাশস্যের দাম হয়ে ওঠে আকাশছোঁয়া।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, থাইল্যান্ডের যে সাদা চালের দাম ১৯৭২ সালের জানু-য়ারিতে ছিল মার্কিণী মুদ্রায় প্রতি টন ১৩১ ডলার, ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে হয়েছে ৬৩০ ডলার। অর্থাৎ, প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি। একই সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে রপ্তানীকৃত জোয়ারের দাম বেড়েছে প্রায় দেড়গুণ, গমের দাম প্রায় দুগুণ।

ফল যা হবার তাই হল, যদিও বছরের পর বছর সবুজ বিপ্লবের প্রবক্তাদের মুখে কখনো শোনা যায়নি যে এমনটি হতে পারে। দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। আজকের দিনে দুর্ভিক্ষ চলছে খরাপীড়িত ইথিওপিয়ায়, বন্যাপীড়িত

বাংলাদেশে, পশ্চিম আফ্রিকার সাহেল-এ। দুর্দশাপীড়িত ভারতে। বছরের পর বছর খাদ্যশস্যের মজুদ নিম্নতম মাত্রায় থেকেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খাদ্য-সাহায্যের প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশি ঠিক তখনই তা কমানো হয়েছে (১৯৭০ সালে ১৪ মেগাটন থেকে ১৯৭৩ সালে ৭ মেগাটনে), গমের দাম বেড়েছে প্রায় তিনগুণ আর চালের দাম প্রায় পাঁচগুণ—ফলে দরিদ্র দেশগুলির এখন আর খাদ্য আমদানী করার সংস্থান নেই বললেই চলে।

যে নগরে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই রোমে প্রাচীনকালে নগর-তোরণের কাছে অধিষ্ঠিত থাকতেন দুই মাথাওলা এক দেবতা—জেনাস (শান্তির সময়ে এই দেবতার মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হত)। এই জেনাসের মতোই বিশ্বের খাদ্য-সংকট হচ্ছে দুই মাথাওলা এক বিভীষিকা। একটি মাথা দুর্ভিক্ষ, অপরটি স্থায়ী অপুষ্টি। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেব অনুসারে, ১৯৭০ সালে ৯৭টি উন্নতিশীল দেশের মধ্যে ৬১টি দেশ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম খাদ্য উৎপাদন বা আমদানী করেছিল। সংস্থার হিসেবে আরো প্রকাশ, খুব কম করে ধরলেও বিশ্বের ৪৬ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। একটু ছেড়ে দিয়ে হিসেব করলে এই সংখ্যাটি দাঁড়ায় অন্ততপক্ষে ১০০ কোটি (বিশ্বের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪০০ কোটি)।

*

আমরা যারা এই লেখা লিখছি বা এই লেখা পড়ছি—সম্ভবত আমাদের কারোই ক্ষুধার অভিজ্ঞতা নেই। বড়ো জোর, আচমকা কোথাও আটকে গেলে বা কোনো বে-জায়গায় গিয়ে পড়লে, একবেলা কি একদিন হয়তো না খেয়ে থাকতে হয়। আর তখনই টের পাই পেটের ভেতরে কী যেন মোচড় দিয়ে উঠছে, কেমন যেন একটা চিনচিনে যন্ত্রণা। একবেলা বা একদিন না খেয়ে থাকাটাই তখন কষ্টকর মনে হয়। এবার যদি কল্পনা করা যায় যে এই কষ্ট দিনের পর দিন সমানে ভোগ করে যেতে হচ্ছে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস—তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়?

আর স্থায়ী অপুষ্টিও কিছু কম নয়। স্থায়ী অপুষ্টি মানে ক্ষুধা নিয়ে থাকা—বছরের পর বছর, বছরের পর বছর। এত দীর্ঘকাল ক্ষুধা নিয়ে থাকা যে পেটের যন্ত্রণা হওয়াটাই হয়ে ওঠে স্বাভাবিক অবস্থা। কদাচিৎ কখনো যদি ভরাপেট খাবার জুটে যায় তো সেই স্মৃতি বাচ্চাছেলের সার্কাসের যাওয়ার স্মৃতির মতো জ্বলজ্বল করে।

স্থায়ী অপুষ্টি মানে এ-ভিটামিনের ঘাটতির দরুন অন্ধ হয়ে যাওয়া। লৌহের ঘাটতির দরুন রক্তাল্পতার ভোগা ঘেরিবেরি বিকেট ও আরো অজস্র ব্যাধির অবশ্য শিকার হওয়া।

স্থায়ী অপুষ্টি মানে সন্তানদের বাড়-বৃদ্ধি না হওয়া—শুধু শরীরের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকেও। সন্তানদের জড়-বুদ্ধি হওয়া।

স্থায়ী অপুষ্টি মানে শরীরের প্রতিরোধ-ক্ষমতা না থাকা—তখন ম্যালেরিয়া বা কলেরা বা এমনকি সর্দিকাশিতেও প্রাণ হারানো।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেব অনুসারে বিশ্বের ৪৬ কোটি মানুষ রয়েছে এই স্থায়ী অপুষ্টির অবস্থার মধ্যে।

*

তাহলে এই হচ্ছে খাদ্য-সংকটের চেহারা—দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে ভারত ও সাহেল বিশ্বের শস্যভাণ্ডার প্রায় শূন্য, বিশ্বের তাবৎ অধিবাসীর মধ্যে প্রতি আটজনের একজন অপুষ্টির শিকার। কিন্তু বিশ্বের এই খাদ্য-সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না। তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে অনেকগুলো অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত সংকট—যেমন, জনসংখ্যার সংকট, তেল সংকট, মূল্য পরিশোধের সংকট, সার সংকট শক্তি সংকট, এবং তদুপরি নিউক্লিয়র যুদ্ধের আশঙ্কা।

জনসংখ্যার সংকটের কথাই ধরা যাক। ১৮৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ১০০ কোটি, ১৯২০ সালে ২০০ কোটি, ১৯৬০ সালে ৩০০ কোটি, ১৯৭৫ সালে হবার কথা ৪০০ কোটি। ষাটের দশকে ভাবা গিয়েছিল সবুজ বিপ্লবের ফলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধিটা আর কোনো সমস্যা থাকছে না—মানুষের সংখ্যা বাড়ুক, ফলন তার চেয়েও আরো একটু বেশি। তারপরেই ছবিটা উল্টে গিয়েছে—মানুষের সংখ্যা হতো বাড়ছে ফলন তার চেয়েও কম। ১৯৬৯ সাল থেকেই মাথা-পিছু লভ্য খাদ্যের পরিমাণে ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

জন্মের হার এই হারে যদি চলতে থাকে তাহলে প্রতি বছর আরো সাড়ে-সাত কোটি মানুষের জন্য খাদ্যসংস্থান থাকা দরকার।

শহরের মানুষকে খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় গ্রামের মানুষের ওপরে। শহরে মানুষের সংখ্যা যতো বাড়ে, নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও ততো বাড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৪ শতাংশ মানুষ বাস করে শহরে, এমনকি ভারতেও ২০ শতাংশ।

তদুপরি আছে পরিবেশ নোংরা হওয়ার সংকট। বাতাসে আবর্জনা, নদীর জলে ময়লা সমুদ্রের জলে তেল।

আছে যুদ্ধাস্ত্র শিল্প বজায় থাকার সংকট। ধনী দেশ এখনো যুদ্ধাস্ত্র শিল্পে প্রতি বছর ১৬০ শত কোটি ডলার খরচ করে চলেছে সে-জায়গায় কৃষিতে খরচ করছে মাত্র ১৫০ কোটি।

*

সংকট আরো আছে—শক্তির, সারের সম্পদের।

তেলের দাম অসম্ভব চড়া তার ফলে শক্তির সংকট। যেসব ভূখণ্ড দেশে নিজস্ব তেল নেই তারা মার খাচ্ছে তিনভাবে—(১) তেল কিনতে গিয়েই বিদেশী মুদ্রা খরচ হয়ে যাচ্ছে (২) বিদেশী মুদ্রার অভাবে সার ট্রাক্টর ইত্যাদি কেনা সম্ভব হচ্ছে না (৩) সবুজ বিপ্লবে যে কৃষি-ব্যবস্থা চালু থাকা দরকার তার জন্য চাই প্রচুর শক্তির যোগান—তেলের দাম চড়ে যাবার ফলে তা বন্ধ।

অধিক ফলনের জন্য চাই উত্তরোত্তর অধিক মাত্রার সার। জৈব সারের ব্যবহার ক্রমশ কমছে, সে-জায়গায় চাহিদা বাড়ছে কৃত্রিম সারের। যেমন ফসফেট সারের কথা উল্লেখ করা চলে। প্রকৃতি-জগতে এই সারটির যোগান অতি সামান্য—একমাত্র উত্তর আফ্রিকার সীমাবদ্ধ এলাকায়। অন্যদিকে নাইট্রোজেন-ঘটিত সার উৎপাদন করতে হলে চাই প্রচুর শক্তি ও উচ্চমাত্রার প্রাবৃত্তিক প্রক্রিয়া। ফলে এখনকার এই শক্তি-সংকটের কালে নাইট্রোজেনঘটিত সার উৎপাদন করাটা উন্নত দেশগুলির একচেটিয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর সম্পদের সংকট তো আছেই, যেমন তেলের ব্যাপারে ও ফসফেট সারের ব্যাপারে। অন্যদিকে অসম বণ্টনের দরুনও। আমেরিকার একজন নাগরিক ধাতু ব্যবহার করে ভারতের একজন কৃষকের চেয়ে ৫০০ গুণ বেশি। এ-অধিকার সে কেন পাচ্ছে?

*

আরো একটি বড়ো সংকট—জলের সংকট। স্বাভাবিকভাবেই জলসেচ হয় আমাদের এই গ্রহের এমন সমস্ত জমি ইতিমধ্যেই আবাদী হয়ে গিয়েছে। কাজেই চাষের জমি যদি বাড়াতে হয় তাহলে জলসেচ-ব্যবস্থার ব্যাপক আয়োজন করা দরকার। ১৯৭০ সালে বিশ্বে চাষের জমি ছিল ৭৪ কোটি হেক্টর (২-৪৭ একরে এক হেক্টর) খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৮৫ সালে হবার কথা ৯০ কোটি হেক্টর। এজন্য জলসেচের ব্যবস্থাও বর্তমানের চেয়েও তিনগুণ বাড়ানো দরকার। উচ্চ ফলনের জন্য অবশ্যই চাই উচ্চ পরিমাণ জল ও সার।

এই বাড়তি জল সংগ্রহ করা উচিত বৃষ্টিপাত থেকে। কিন্তু বর্তমানে যা হচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করা হচ্ছে মাটির তলা থেকে। ভবিষ্যতেও তাই হবে। এতে সংকটকে আরো নানাদিক থেকে বাড়িয়েই তোলা হয়।

*

সবশেষে জমির সংকট। বর্তমানে ভুখা মানুষের চাপে এলোপাথাড়ি জমি চাষ করা হচ্ছে—পাহাড়ের কিনার, অরণ্য, কোনো কিছুই বাদ থাকছে না। তার অবধারিত ফল—প্রচুর ক্ষয়, জমির পুষ্টিনাশ এবং অনেক ক্ষেত্রে খরাও।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ঘোষিত লক্ষ্য—১৯৮৫ সালের মধ্যে চাষের জমি ২০ শতাংশ বাড়িয়ে তোলা। এতগুলো সংকটের মধ্যে তা সম্ভব হবে কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

(বিশ্বের খাদ্য-সংকটের ভয়াবহতার কথা বিচার করে লণ্ডনের বিখ্যাত 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার ৭ই নভেম্বর সংখ্যাটিতে এ-বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই লেখার সমস্ত তথ্য এই বিশেষ সংখ্যা থেকে নেওয়া।)

—অয়স্কান্ত

অদৃশ্য জট

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

এত লোকের বৌ মরে রমেনের বৌ মরতে পারে না? কথায় বলে ভাগ্যবানের বৌ মরে। কিন্তু তার কি আর সেই ভাগ্য হবে? ট্যাকসিতে বসে বসে রমেন সেই কথাই ভাবছিল। সকাল থেকেই মেজাজটা খিঁচড়ে ছিল রমেনের। পরশু রাত্তির থেকে আরতির সেই যে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু হয়েছে তাতে বাড়ীতে থাকাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পরশু সকালে নাকি সমীর এসে বলে গেছে যে সে রমেনদাকে তৃপ্তির সঙ্গে সিনেমা-হলে ঢুকতে দেখেছে। ব্যাস! আর যায় কোথায়। রমেন রাত্তিরে বাড়ী ফিরতেই আরতি তাকে চেপে ধরেছে।

—তুমি নাকি তৃপ্তিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছ?

—কে বলল? রমেন প্রশ্নটায় হকচকিয়ে গেলেও সে মুখে কষ্ট করে হাসি টেনে বলেছে।

—সমীর যে বলে গেল।

—আরে সমীরকে জানো না। ও একটা ভাহা মিথ্যেবাদী।

—ও যে মিথ্যেবাদী একথা তো তুমি আগে কোন দিন বলনি।

রমেন গায়ের পাঞ্জাবী ছাড়তে ছাড়তে বলেছে, এ আর বলার কী আছে। বলার সুযোগ হয়নি তাই বলিনি। না হলে সবাই জানে ও একটা মিথ্যেবাদী।

আরতি আর নিজের রাগ গোপন রাখতে পারে নি। রমেন যে মিথ্যে কথা বলছে তা ওর ফ্যাকাশে মুখ দেখেই সে বুঝতে পেরেছে।

—সবাই মিথ্যেবাদী। আর তুমি ধর্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির!

রমেন এতদিন এই কৌশলটা শিখে ফেলেছে যে মিথ্যে কথা বলতে হলে বেশ দাপটের সঙ্গে বলতে হয়। মিনমিনে ভাবে বললেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা। আর যদি কখনো ধরা পড়ার মত অবস্থা হয় তাহলে দাপটের সঙ্গেই তা অস্বীকার করতে হয়। সে একটু চেঁচিয়েই বলল, মুখ সামলে কথা বল।

—কেন মুখ সামলে কথা বলব কেন? আমি কি তোমার স্বভাব জানি না?

—কী জানো তুমি? রমেন আরতির দিকে এগিয়ে গেল।

—সরিয়ে নাকি? তুমি তাও পার। আরতি ভয়ে পিছিয়ে গেল।

—কী জানো তুমি আমার স্বভাবের?

—তোমার কাছে অত ঘন ঘন মেয়েরা কেন আসে তাকি আমি বুঝি না ভেবেছ?

—তারা আমার কাছে গান শিখতে আসে।

—হ্যাঁ গান যে কত শেখে তা আমার জানা আছে। তারা আসে তোমার মাথা খেতে।

—ভদ্রঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে মুখ সামলে কথা বল।

—ভদ্রঘরের মেয়ে! সব জানা আছে। ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েগুলো পর-পুরুষের সঙ্গে ঘোরে। সিনেমা দেখে; থিয়েটার দেখে। ভদ্রঘরের মেয়েরা এসব করে?

—তারা তোমার মত গাঁইয়া না। সবাই ভদ্র শিক্ষিত—

—তাহলে তাদের একজনকে বিয়ে করলেই পারতে। আমার মত একটা অশিক্ষিত গাঁইয়া মেয়েকে বিয়ে করার কী দরকার ছিল?

রমেন আর আরতিকে ঘাঁটাতে সাহস তাই করতাম। কিন্তু তা তো আর বলা চলে না। সুতরাং সে অন্য প্রসঙ্গ তুলল, এত রাতে চেঁচামেচি না করলে চলছে না? পাড়ার লোকে শুনলে কি বলবে? তাছাড়া ও-ঘরে ছেলেরা রয়েছে তারাই বা কী ভাববে?

—পাড়ার লোকে কিছু জানে না ভেবেছ? তাদের চোখ নেই? তারা সব জানে।

—কী জানে তারা?

—তোমার কীর্তি-কলাপ।

রমেন আর আরতিকে ঘাঁটাতে সাহস পায় নি। কী বলতে কী বলে ফেলবে কে জানে? সে রণে ভঙ্গ দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। বাথ রুমের দিকে যেতে যেতে সে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, দুরন্তার সংসারের নিকুচি করেছে। সারাদিন খেটে-খুটে এসে কোথায় বাড়ীতে দু দণ্ড বিশ্রাম

করব। তা নয়। ঘ্যানর ঘ্যানর সুরু হয়ে গেল।

তারপর বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে সে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আরতি এতই রেগেছিল যে সে তাকে খেতেও ডাকে নি, নিজেও খায় নি। সে মেঝেতে আঁচল পেতে শুয়ে থেকেছে। খাটে শোয় নি।

কিন্তু আরতি সেই যে পরশু থেকে অন্নজল ত্যাগ করেছে সেইটেই রমেনের পক্ষে একটু অস্বস্তিকর। আরতি রান্না করে ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়েছে, রমেনের জন্যও রেঁধেছে। কিন্তু সে নিজে না খেলে রমেন অন্তত প্রকাশ্যে খায় কী করে? সুতরাং বাধ্য হয়ে তাকে এমন ভান করতে হয়েছে যেহেতু আরতি দু দিন না খেয়ে আছে তাই সেও খায় নি। আসলে সে দু কেজাই বাইরে থেকে ভালো করে সাঁটিয়ে এসেছে। কী করবে? না খেয়ে সে থাকতে পারে না। বৌর জন্য সে উপোস করতে পারবে না। তার শরীর খারাপ হলে কে দেখবে? তাকে সারা দিন অফিসে চাকরি করতে হয়, তারপর গানের টিউশনি করতে হয়। সুতরাং তার কি না খেয়ে থাকলে চলে? কিন্তু বাড়ীতে তো আর তা প্রকাশ করা চলে না। সুতরাং বাড়ীতে সে সর্বদা গম্ভীর। ছেলে দুটো বড় হয়েছে। একজন ক্লাস টেনে পড়ে আর একজন নাইনে। তারা বাবা-মার এই ঝগড়ায় এতই অভ্যস্ত যে তারা এটাকে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হিসেবে ধরে নিয়েছে। সুতরাং তারাও চান করে ভাত খেয়ে যথারীতি স্কুলে চলে গেছে। আরতি ছেলেদের খাইয়ে-দাইয়ে রমেনের জন্য ভাত বেড়ে রেখে রান্নাঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়েছে। তারপর ঘরে গিয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে থেকেছে। রমেন কাল আরতিকে বলেছিল, এ রকম করলে তোমার শরীর তো আরও খারাপ হবে। ডাক্তার তোমাকে উপোস করতে একদম বারণ করেছে না। কিন্তু আরতি তার কথায় কান দেয় নি। রমেনও যে আরতি উপোস করায় খুব চিন্তিত তা নয়। নেহাৎ বলতে হয় তাই বলা। তাছাড়া আরতির পেটে আছে মারাত্মক আলসার। যদি এই উপোস করায় তা আরও বেড়ে যায় তাহলে রমেনই বিপদে পড়বে। তাহলে কে রমেনকে অফিসের ভাত রেঁধে দেবে? কেই-বা ছেলেদের স্কুলের ভাত দেবে? আরতি শয্যাশায়ী হলে তখন আবার রমেনকে রাঁধুনী রাখতে হবে। সে আবার এক খরচের ব্যাপার। তাছাড়া রাঁধুনী যোগাড় করাও কঠিন। তার উপর ডাক্তার পথ্যের খরচ তো আছেই। তাই রমেন আরতিকে তার রোগটার কথা ভেবে উপোস করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু আরতিকে পরশু রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত জল-স্পর্শ করানো যায় নি। এবং আরতি যে উপোস করে আছে তাতে এতটুকু সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই।

জীবনের উপর ঘেন্না ধরে গেছে রমেনের। এখন তার মনে হয় আরতিকে বিয়ে করাটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে। কিন্তু যে অবস্থায় সে আরতিকে বিয়ে করে তখন এ ছাড়া তার আর অন্য পথ ছিল না। একদিন আরতির বাবা-মা তাদের বাড়ীতে রমেনকে আশ্রয় না দিলে আজকের রমেন কোথায় ভেসে যেত। ছোটবেলা থেকে রমেনের লেখাপড়ার দিকে মন ছিল না। তার ঝোঁক ছিল গানের দিকে। তার ব্যবসায়ী বাবার হাতে সে জন্য তাকে বার কয়েক মার খেতে হয়েছে। ক্লাস টেনে বার দুয়েক ফেল করার পর একদিন তার বাবা বলেছিল কাল থেকে তুই আমার দোকানে বসবি। লেখাপড়া তোর কোনদিন হবে না। আমি ইস্কুল থেকে তোর নাম কাটিয়ে দেব। লেখাপড়ার প্রতি রমেনের যে খুব আগ্রহ ছিল তা নয়। তবে বাবার কাপড়ের দোকানে বসতে হবে শুনে তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তার এত সাধের গান শেখার কী হবে? সে বাড়ী ছেড়ে পালাল। তার ছ বছর বয়সে মা মারা যাওয়ায় বাড়ীর প্রতি এমনিই তার খুব আকর্ষণ ছিল না। সারা দিন বাইরে বাইরেই কাটাত। তার উপর বাবা যখন তাকে কাপড়ের দোকানে আটকে ফেলার ব্যবস্থা করছিল তখন সে পালানো ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পায় নি। সে বাড়ী থেকে পালিয়ে তিন-চারখানা গ্রামের পরে তার মায়ের এক সইয়ের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই সইয়েরই মেয়ে আরতি। আরতির বয়স তখন কত আর হবে? চোদ্দ কি পনেরো। সেই বয়সেই আরতি রমেনের গান শুনে তার প্রেমে পড়ে গেল। সেদিন আরতি বাড়ীর সকলের অমতে চালচুলো-হীন রমেনকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। তিন বছর মায়ের সইয়ের বাড়ীতে থাকবার পর একদিন আরতি ও রমেন সকলের অজান্তে গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে পা বাড়িয়েছে। সেদিন আরতি রমেনের সঙ্গে প্রায় এক বস্ত্রেই বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে। তারপর একটানা দশ-বার বছর রমেনকে সংসারের জন্য কি না করতে হয়েছে। ওষুধ কোম্পানীর ক্যানভাসারের চাকরি, ইনসিওরেন্সের দালালী লটারীর টিকিট বিক্রি সবই করেছে। অবশেষে আট-দশ বছর হল আরতির এক পিসতুতো দাদার দয়ায় একটা বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকরী পেয়েছে। চাকরীটা ভালোই। মাইনে-পত্তরও ভালো দেয়। রমেনের কয়েকটা প্রমোশনও হয়েছে। এত দিনে সংসারে সে স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পেয়েছে। কিন্তু স্বচ্ছলতা যদি বা এল সুখ রমেনের ভাগ্যে জোটে নি। ছেলে দুটি লেখাপড়ায় খুব ভালো হয় নি। আরতি প্রায়ই অনুযোগ করে, তুমি ছেলেদের দিকে নজর দিচ্ছ না। কিন্তু সে কী করবে? রমেন তাদের জন্য প্রাইভেট টিউটর রেখে দিয়েছে। কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। ছেলেরা বাপ-মায়ের খুব একটা বাধ্য হয় নি। আগে মন্টু-নান্টু আরতির কথা শুনত। এখন যত বড় হচ্ছে তত বেআদব হচ্ছে। রমেনের পক্ষে ছেলেদের দিকে নজর দেবার সময় নেই। সে সকাল নটার মধ্যে অফিসে বেরিয়ে যায়। তারপর অফিস ছুটির পর গানের টিউশনি করে বেড়ায় মাঝে মাঝে ফাংশন-টাংশনেও যায়। সুতরাং প্রায়ই তার ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। সে যখন বাড়ী ফেরে তখন ছেলেরা ঘুমোয়। ছুটি-ছাটার দিনেও যে সে ছেলেদের দিকে একটু নজর দেবে তার সময় পায় না। তার গুণগ্রাহীরা সকাল থেকেই বৈঠকখানায় ভিড় জমায়। অবশ্য তার যে খুব ইচ্ছে করে তাও নয়। সে বুঝে গেছে যে ছেলেরা তাকে রোজগার করে খাওয়াবে সে আশা খুবই কম। তাছাড়া ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য করারও তার কোন ক্ষমতা নেই। একদিন ছেলেদের নিয়ে পড়াতে বসলে তার বিদ্যে ছেলেদের সামনে জাহির হয়ে যাবে। তাই সে ছেলেদের জন্য মাষ্টার রেখে দিয়েই খালাস।

আরতির ক্রমাগত অসুস্থতাও রমেনের মানসিক শান্তি অনেকখানি কেড়ে নিয়েছে। আরতির তো একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে। আজ পেটে আলসার, কাল নানাবিধ জটিল স্ত্রী-রোগ। রোগে ভুগে ভুগে আরতির চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে। ফলে মধ্য তিরিশেই আরতির শরীর থেকে সমস্ত লাবণ্য ঝরে গেছে। রোগে ভুগে ভুগে আরতির মেজাজটাও সর্বদা তিরিক্ষে হয়ে থাকে। এক সময় আরতি রমেনের গানের বড় ভক্ত ছিল। এখন গান তার দু চোখের বিষ। আরতির আর একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। সে ক্রমে ক্রমে সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠছে। রমেনের যে অভাব তা তার মেটাবার সাধ্য নেই। রমেন তা নিশ্চয়ই অন্য কোনভাবে মেটাবার ব্যবস্থা করেছে, এ ধারণা তার বদ্ধমূল হয়েছে। তাই রমেনের কাছে কোন মেয়ে এলেই সে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। ভালো করে কথা পর্যন্ত বলে না। তৃপ্তি সম্বন্ধে অনেক দিন ধরেই আরতির মনে সন্দেহ জেগেছিল। সমীর সেই সন্দেহটাই উসকে দিয়ে গেছে।

ট্যাকসিতে বসে বসে রমেন ভাবছিল এর পর যেদিন সমীরের সঙ্গে তার দেখা হবে সেদিন সে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবে। রমেন তাকে বলে দেবে যে সে যেন তার ব্যক্তিগত বিষয়ে কখনও মাথা গলাতে না আসে। এমনিতে ছেলেটা ভালোই। গানটান শেখার একটু বাতিক আছে। সেই সূত্রেই রমেনের বাড়ীতে আসা তারপর নিয়মিত আসতে আসতে সে আরতি মন্টু-নান্টুদের খুব পরিচিত হয়ে গেছে। সংসারের যে কাজগুলো আরতি রমেনকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে না সমীরকে দিয়ে সে সেগুলো করিয়ে নেয়। তাদের পরিবারের একজন প্রকৃত হিতৈষী সমীর। সুতরাং রমেন তার উপর খুব রাগ করতে পারে না। কিন্তু সে যদি বোকার মত আরতিকে তার সম্বন্ধে সব কথা বলে দিয়ে তার পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে তাহলে রমেন কিছুতেই তা

বরদাস্ত করবে না। তাই সে সমীরকে বলবে তুমি আমার বাড়ীতে যেমন আসছো এসো। কিন্তু আমার প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে কোন আলোচনা তুমি তোমার বৌদির সঙ্গে করতে পারবে না। আর তৃপ্তিকেও সে সাবধান করে দেবে যেন সে পারতপক্ষে রমেনের বাড়ীতে না যায়। বাইরে যা দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার ঠিকই হবে। বাড়ীতে যাওয়ার দরকার কি? কোন দিন রমেনের অনুপস্থিতিতে তৃপ্তি যদি তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় তাহলে আরতি হয়তো তাকে এমন কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দেবে যা তৃপ্তির মত শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে। এমন কি রমেনের উপস্থিতিতেও শুনিয়ে দিতে পারে। আরতি কি তাকে ভয় করে নাকি?

ট্যাক্সি তৃপ্তিদের বাড়ীর সামনে এসে থামতেই রমেন নেমে পড়ল। বেলা তখন প্রায় বারটা হবে। কড়া নাড়তেই তৃপ্তির বাবা দরজা খুলে দিলেন। তৃপ্তিকে ধারে-কাছে কোথাও দেখা গেল না। তাঁর মুখে কোন ভাবান্তর নেই।

—তৃপ্তি নেই?

—আছে।

—কোথায়?

—বোধ হয় নিজের ঘরে।

একদিন রমেন এ বাড়ীতে গানের টিউটর হয়ে ঢুকেছিল। এখন আর তৃপ্তি গান শেখে না। কিন্তু রমেনের সঙ্গে এ বাড়ীর যোগাযোগ আছে। রমেন তৃপ্তিকে বিভিন্ন ফাংশনে গাওয়াতে নিয়ে যায়। রেডিওতে চান্স করে দেবে বলেছে। তৃপ্তির চাকরীর জন্যও সে নাকি চেষ্টা করছে। সুতরাং তৃপ্তির বাবা-মা রমেনের প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞ।

রমেন তৃপ্তির ঘরে ঢুকতেই তৃপ্তি উঠে বসল।

—ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

—না এমনি শুয়েছিলাম। তৃপ্তি বুকের আঁচল ঠিক করছিল।

রমেন তৃপ্তির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সে দেখতে খুব সুন্দর নয়। কালো। মুখশ্রীও খুব ভালো নয়। চেহারাটা খেয়ে আর ঘুমিয়ে বেশ মুটিয়েছে।

—কী ব্যাপার! একেবারে সিল্কের পাঞ্জাবী পরে?

রমেনের সাজ-সজ্জাটা আজ একটু বেশীই হয়ে গেছে। সিল্কের পাঞ্জাবী, ফাইন ধুতি। আবার মুখে-ঘাড়ে পাউডারও দিয়েছে। সে হাসতে হাসতে বলল, কেন আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি নাকি? আমি সিল্কের পাঞ্জাবী পরতে পারি না?

তৃপ্তি মুখ টিপে হাসছিল। সে রমেনকে খেপিয়ে এক ধরনের আনন্দ পাচ্ছিল।

—না আপনি বুড়ো হয়েছেন তাতো বলিনি। আমি বলছিলাম হঠাৎ সকালেই এত সাজগোজ—

—ইচ্ছে হল পরলাম। এর পর বুড়ো হলে তো আর পরতে পারব না। জানো আমার বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয় নি। আমার যে অত বড় দুটো ছেলে আছে কেউ বিশ্বাস করবে?

—হঠাৎ এত বেলায়? তৃপ্তি চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে শুধোল।

—চলে এলাম। বেলা কোথায়? রবিবার বারোটা বেলা নাকি!

—বৌদি কেমন আছেন?

তৃপ্তির সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল কিন্তু আরতির প্রসঙ্গ ওঠায় কি রকম মিইয়ে গেল। সে বিরস মুখে বলল, ওই একই রকম।

তৃপ্তিকে নিয়ে আরতির সঙ্গে তার যে এত ব্যাপার হয়ে গেছে তা সে এখানে বলতে চায় না। যদি বলতে হয় তাহলে তৃপ্তিকে বাইরে বলবে। এখানে বলাটা ঠিক হবে না।

এমন সময় তৃপ্তির মা এ ঘরে ঢুকলেন।

—কেমন আছেন মাসীমা?

—আর বাবা আমাদের থাকা আর না থাকা। তা তুমি আর আসো না কেন?

রমেন মনে মনে ভাবল, যে কারণে আসা সেটা যদি বাইরেই হয়ে যায় তাহলে আর আসার দরকারটা কি? কিন্তু তা তো আর বলা যায় না।

—একদম সময় হয় না মাসীমা। তারপর আরতির শরীরটা খুবই খারাপ। ওর জন্য ডাক্তারের কাছে প্রায়ই ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।

এরই মধ্যে তৃপ্তির বাবা এ ঘরে এসে ঢুকলেন। ভদ্রলোককে সর্বদাই চিন্তিত মনে হয়। বোধ হয় মেয়ের এত বয়স হয়ে গেল, এখনও বিয়ে দিতে পারছেন না এ চিন্তাটাই তাঁকে সর্বদাই অন্যমনস্ক করে রাখে।

—মাসীমা একটু কফি খাবো।

—হ্যাঁ বাবা। নিশ্চয়ই। এখনই করে আনছি।

তৃপ্তির মা এ-ঘর থেকে চলে গেলেন।

—আমার ইন্টারভিউর কী হল? তৃপ্তি শুধোল।

—কিসের ইন্টারভিউ! রমেন মনে করতে পারল না।

—বাহ্! এর মধ্যেই ভুলে গেলেন! আপনি বলেছিলেন না যে আপনাদের অফিস থেকে আমার ইন্টারভিউয়ের চিঠি আসবে?

ওহ্! রমেনের এতক্ষণে কথাটা মনে পড়ল। আসলে সে এত লোককে এত প্রতিশ্রুতি দেয় যে সব মনে রাখাই তার পক্ষে কঠিন। আর সেগুলো মনে রাখার চেষ্টাও সে করে না। তৃপ্তি তার বাবার সামনে কথাটা তুলে তাকে খুব লজ্জায় ফেলে দিয়েছে।

—তোমার ইন্টারভিউয়ের চিঠি দিন দশ পনেরোর মধ্যে আসবে।

রমেন মনে মনে বলল, কাঁচকলা। তার অফিসে এখন লোকই নেবে না। তৃপ্তিকে সে মিথ্যে কথা বলেছিল। তৃপ্তিও সেই ভরসায় তার হাতে এ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিল। সে এ্যাপ্লিকেশন রমেনের বাড়ীতে এখনও পড়ে আছে। যাই হোক, দিন পনেরো বাদে আবার একটা মিথ্যে কথা তাকে বানিয়ে বলতে হবে। অপাততঃ চলুক তো।

—সত্যিই, নাকি সেই রেডিওর মতো হবে?

রেডিওর ব্যাপারটা নিয়ে রমেন সত্যিই খুব লজ্জায় পড়েছে। সে তৃপ্তির জন্য সত্যিই চেষ্টা করেছিল। এমন কি অডিশনে কে কে থাকবে তারও খোঁজ সে নিয়েছিল। তাদের ধরার ব্যবস্থাও সে করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃপ্তি অডিশনে উত্তীর্ণ হতে পারে নি অথচ সে তৃপ্তিকে আশ্বাস দিয়েছিল যে তার রেডিও প্রোগ্রাম পাওয়া একেবারে অবধারিত। চিঠি এল বলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চিঠি আর আসে নি।

—আরে না না। তুমি অত সন্দেহ কর কেন বল তো? আমি কি তোমার জন্য চেষ্টা করি না?

রমেন অবশ্য রেডিওর ব্যাপারে এখনও চেষ্টা ছাড়ে নি। অন্ততঃ তার মুখ রক্ষার জন্য তৃপ্তির রেডিওতে একটা প্রোগ্রাম করে দিতেই হবে।

—না আপনি তো চেষ্টা করেনই। কিন্তু আমার কপালটা দেখতে হবে তো।

এমন সময় তৃপ্তির মা একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি ও এক কাপ কফি এনে রমেনের সামনের টেবিলে রাখলেন।

—আবার এত সব আয়োজন করতে গেলেন কেন মাসীমা।

—কী আর এমন আয়োজন করেছি। তুমি তৃপ্তির জন্য যা করছ আমরা তার তুলনায় কী করতে পারছি।

—আমি আর তৃপ্তির জন্য কী করতে পেরেছি বলুন। আগে তৃপ্তির একটা কিছু হোক। তারপর খাওয়াবেন।

—হওয়া না হওয়া সে তো পরের কথা। তুমি তো চেষ্টা করছ।

রমেন এবার সত্যি লজ্জা পেল। একটা মিষ্টি মুখে পুরতে পুরতে সে ভাবল তৃপ্তির জন্য অফিসে একবার বলবে নাকি?

তৃপ্তির বাবা সারাক্ষণই চুপচাপ বসেছিলেন। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালে রমেনের কি রকম অস্বস্তি হয়। ভদ্রলোক কি বুঝে ফেলেছেন যে সে মিথ্যে কথা বলছে?

—চঞ্চল বাড়ী নেই? রমেন হঠাৎ তাঁকেই প্রশ্ন করল।

—আছে ধারে কাছে কোথাও। ছুটির দিন তো।

তৃপ্তির বাবা কথাটা শেষ করেই অকারণে তাঁর বাঁ-হাতের উপর ডান হাতটা বোলাতে লাগলেন।

আসবার সময় তৃপ্তির মা বললেন, ওর চাকরিটা যাতে হয় একটু দেখো বাবা। উনি তো রিটায়ার করছেন কয়েক মাস পরেই। তারপর একা চঞ্চলের আয়ে যে কী করে চলবে!

—এবার তৃপ্তির একটা বিয়ে দিয়ে দিন।

রমেন কথাটা বলে তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

—চেষ্টা কি আর করছি না। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ এ বাজারে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কী কঠিন! উনি তো মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে ভাবতে রাতে ঘুমোতেই পারেন না।

তৃপ্তির মা সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তৃপ্তি অবশ্য আরও খানিকটা এগিয়ে দিল। ওদের বাড়ী ঢুকতে গেলে একটা প্যাসেজ পেরিয়ে যেতে হয় সেই প্যাসেজ-টুকু তৃপ্তি রমেনকে এগিয়ে দিল।

রমেন গলা নামিয়ে বলল, কাল বিকেলে দেখা হচ্ছে তো?

তৃপ্তি ঘাড় নাড়ল।

—কোথায় মনে আছে তো?

—আছে। তৃপ্তি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

তৃপ্তিদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রমেন হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দেড়টা বেজে গেছে। এখন আর বাড়ীতে গিয়ে কী হবে? সেখানে তো কেউ তার জন্য ভাত বেড়ে বসে নেই। আরতির রাগ এত সহজে পড়বে মনে হয় না। তার চেয়ে সে বাইরে কোথাও খেয়ে নেবে। তারপর সে টিউশনি করতে চলে যাবে। রবিবার বিকেলে তার তিনটে টিউশনি থাকে।

তারপর, যা হয়, একদিন আরতির রাগ পড়ল। কদিন আর মানুষ না খেয়ে থাকতে পারে? ফলে আরতি আবার অন্নজল গ্রহণ করতে বাধ্য হল। তবে তার আগে রমেনকে অনেক সাধাসাধি করতে হল। তৃপ্তির সঙ্গে সিনেমা দেখার কথাটা সে স্বীকার করল না বটে। কিন্তু সে আরতিকে কথা দিল যে বাড়ীতে সে তার কোন ছাত্রী আনবে না। আরতিকে ভবিষ্যতে সে কখনও অবহেলা করবে না। আরতি যদিও জানত যে রমেনের এসব প্রতিশ্রুতি কথার কথা মাত্র তথাপি স্বামীর উপর কতদিন আর রাগ পুষে রাখা যায় এই ভেবে সে রমেনের অপরাধ সাময়িক-ভাবে মার্জনা করতে রাজী হল।

কিন্তু মুস্কিল হল আরতির অসুখ নিয়ে ওর অসুখটা ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করল। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। যা খায় তাই বমি হয়ে যায়। শেষে এমন হল যে আরতির পক্ষে সংসারের কাজ-কর্ম করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। রমেন চোখে অন্ধকার দেখল। চট করে কাজের লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। সে বাধ্য হয়ে তার বিবাহিতা বোনকে নিয়ে এল। বাড়ী থেকে পালিয়ে আসার পর এই বোনের সঙ্গেই তার একমাত্র সম্পর্ক ছিল।

বোনকে নিয়ে আসার ফলে সংসারের কাজ-কর্ম দেখা একজন লোক হল ঠিকই কিন্তু আরতির যন্ত্রণার তো উপশম হল না। একটা লোক যদি পেটের যন্ত্রণায় সারাক্ষণ চেঁচাতে থাকে তাহলে কতক্ষণ আর তার থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা যায়? রমেন যতক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকে ততক্ষণ সে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। কিন্তু বাড়ীতে এলেই আরতির কান্না আর চিৎকার তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। রমেন ভেবেছিল যে ডাক্তার আরতিকে দেখছে তার ওষুধ খেয়েই ওর রোগ সেরে যাবে। কিন্তু তাতেও যখন হল না তখন সেই ডাক্তার নিজেই বলল, হাস-পাতালে দিন। হাসপাতালে দেওয়া মানেই তো এক ঝামেলা। অমুককে ধরো তমুককে ধরো। অমুক ডাক্তারকে দেখাও তবে সিট পাবে। রমেন এত সব করে কখন? তাই সে দিনকতক অপেক্ষা করেছিল যদি আরতির পেটের ব্যথাটা এমনিই কমে যায়। কিন্তু তা কি হয়। রমেনের বোন সর্বক্ষণ তার কানের কাছে বলতে লাগল, বৌদিকে তুই হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। না হলে বৌদি বাঁচবে না। একদিন তো সমীর বাড়ীতে এসে শুনিয়েই গেল, আপনি কি বৌদিকে মেরে ফেলতে চান? দেখছেন না বৌদি কাটা পাঠার মত ছটফট করছেন। সে কথা শুনে আরতি চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, ও তো তাই চায়।

এসব শুনে রমেনের পক্ষে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব হল না। সে একে ধরে তাকে ধরে আরতির জন্য হাসপাতালে একটা সিটের ব্যবস্থা করে ফেলল। ফ্রি-বেড হল না। পেয়িং-এ হল কিছু খরচ হবে। তা আর কী করা যাবে? এই যে চারপাশ থেকে অভিযোগ উঠেছে যে সে আরতির জন্য কিছু করছে না তা তো বন্ধ হবে।

আরতিকে যে ডাক্তার দেখছিলেন সেই ডাক্তার দাস একদিন রমেনকে বললেন, অপারেশন করতে হবে।

রমেন ভাবল আরও খরচের ধাক্কা। কিন্তু উপায় কি?

সে আরতির জন্য কেবিন ভাড়া করল। দুজন নার্স রাখল চব্বিশ ঘন্টার জন্য।

অপারেশনের দিন বাধ্য হয়েই তাকে অফিস থেকে ছুটি নিতে হল। কখন কী প্রয়োজন হয়। অন্তর থেকে খুব একটা তাগিদ না এলেও সমাজে বাস করতে গেলে কতকগুলো কাজ তো করতেই হয়।

অপারেশন রুমে নিয়ে যাবার আগে আরতি একবার তার হাত চেপে ধরে বলে-ছিল, বড্ড ভয় করছে।

রমেন মুখে অভয়ের হাসি আনবার চেষ্টা করে বলেছিল, ভয়ের কী আছে?

আরতিকে অপারেশন রুমে নিয়ে যাবার পর সে বাইরে অনেকক্ষণ পায়চারি করল। পরপর কয়েকটা সিগারেটও খেল। রমেনের বোন আর সমীরও এসেছিল। কিছুক্ষণ থাকার পর ওরা চলে গেছে। রমেন একাই থেকে গেছে। সমীর যাবার সময় বলে গেছে, প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।

রমেন বলেছে, আচ্ছা।

অপারেশন শেষ হবার পর অজ্ঞান আরতিকে কেবিনে নিয়ে যাবার বেশ কিছু-ক্ষণ পর রমেনকে ডাক্তার দাস ডেকে পাঠালেন।

রমেন ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার দাস তাঁর সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন।

রমেন আরতির ব্যাপারে যতটা না উদ্বিগ্ন তার চেয়ে এই চিন্তায় আরও উদ্বিগ্ন হচ্ছিল যে এই ঝামেলার হাত থেকে সে কত তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে পারে। তার টিউশনিতে নিয়মিত যাওয়া হচ্ছে না। তৃপ্তির সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও রাখা যাচ্ছে না। অফিসও কামাই করতে হচ্ছে। কিন্তু এসব কথা তো আর ডাক্তারকে বলা যায় না। তাই সে মুখে যতটা সম্ভব উদ্বেগ ফুটিয়ে তুলে বলল, অপারেশন কেমন হল ডাক্তারবাবু? বিপদ কেটে গেছে তো?

ডাক্তার দাস সিগারেট টানতে টানতে বললেন, আমাদের তরফ থেকে যা করার করেছি। কিন্তু বিপদ কেটেছে বলতে পারছি না।

—তার মানে? ও বাঁচবে না?

ডাক্তার দাস একটা কাগজে কী লিখতে লিখতে বললেন, এখনই ওর প্রাণ সংশয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু আমরা যা ভেবে-ছিলাম রোগটা তার চেয়েও মারাত্মক।

রমেন হতবুদ্ধির মত ডাক্তার দাসের দিকে তাকিয়েছিল।

—আলসার না?

—না। প্রথমে আমাদের তাই মনে হয়ে-ছিল। কিন্তু স্টমাক ওপেন করার পর দেখা গেল রোগটা ক্যানসার।

রমেনের দু-কান দিয়ে ডাক্তার দাসের কথাগুলো আর ঢুকছিল না। কয়েক মিনিটের জন্য সে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

—আপনি কয়েক দিন পর ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। এখানে ও রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। তবে দেরী করবেন না। এ্যাডভান্সড স্টেজ। দেরী করলে রোগী বাঁচবে না।

ডাক্তার দাসের সঙ্গে কথা-বার্তা শেষ করে রমেন রাস্তায় এসে দাঁড়াল। আরতি যে তাকে এ-রকম বিপদে ফেলে দেবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। তার মনে হল আরতি চক্রান্ত করে তাকে বিপদে ফেলবার জন্য এ কঠিন রোগ বাধিয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগের পক্ষে সে মন থেকে খুব একটা সায় পেল না। বরং আরতি যে আর বেশী দিন বাঁচবে না এই চিন্তাটাই তাকে এক ধরনের মুক্তির আশ্বাস এনে দিল।

সে একটা ট্যাকসিতে উঠে বসল। তৃপ্তির তার জন্য এসপ্ল্যানেডে একটা বিশেষ জায়গায় অপেক্ষা করার কথা আছে।

ট্যাকসিতে যেতে যেতে রমেন ভাবল তৃপ্তিকে এই সুখবরটা দিতে হবে। রমেনের বাড়ীতে এরপর থেকে সে যথেচ্ছ যেতে পারে। এতদিন তাদের যে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করতে হত তার আর বিশেষ প্রয়োজন হবে না। আরতি তাদের অল্প কিছু দিনের মধ্যে মুক্তি দিয়ে যাবে। কিন্তু সত্যিই মুক্তি কি? তাহলে বুকটা এত ভারী লাগছে কেন? চোখের কোণ দুটো হঠাৎ জ্বালা করছে কেন? কেন আরতির নিঃসাড় দেহটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে? আরতির শীর্ণ পাণ্ডুর মুখটা বারবার মনে পড়ছে কেন? সে ধাঁধায় পড়ে গেল।

রমেন ট্যাকসির ড্রাইভারকে ট্যাকসি ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে যেতে বলল।

প্রশান্ত দাঁ

ক্রিকেটের রাজা সোবার্স

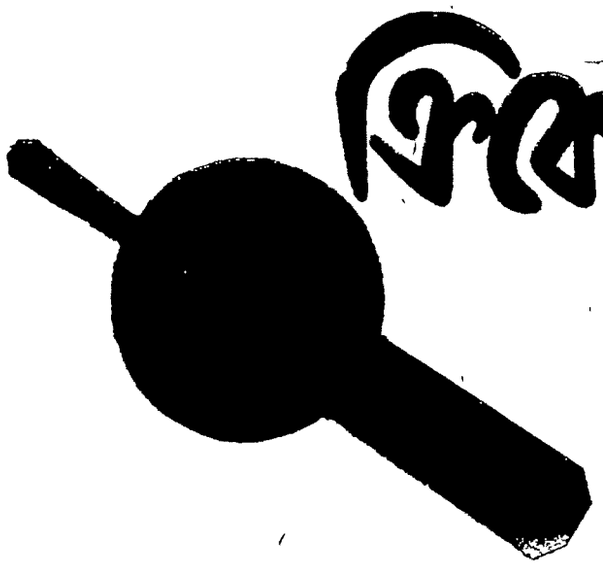

নিদাঘ মধ্যাহ্নে বারবাডোজের পুলিশ মাঠে অনুশীলনরত ইস্পাতের মত কঠিন এক কৃষ্ণকায় কিশোরের ক্রীড়া নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে পুলিশ ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় ফরম্যান তাকে তাদের সঙ্গে নেট প্র্যাকটিসের সুযোগ দেন। কিন্তু এত অল্পবয়সী ছেলেকে পুলিশ চাকুরীতে নিয়োগ আইন বিরুদ্ধ বলে সোবার্সকে পুলিশ ব্যান্ড-পার্টিতে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। মুশকিল হল দরিদ্র কিশোর কোন বাজনাই বাজাতে জানে না। অবশেষে ব্যান্ড লীডার তার হাতে বিউগিল দিয়ে বলেছিলেন—এই যন্ত্রটা বাজানো খুব সহজ। চেষ্টা কর' নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এই কিশোর কোনদিন ভাল বিউগিল বাজাতে পারে-নি তাই তার সতীর্থরা তাকে রসিকতা করে বলত—'ওয়ার্ল্ডস ওয়ার্স্ট মিউজিসিয়ান'।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বার বছর বয়সের সোবার্সের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় নাবিক পিতার মৃত্যু হয়। সোবার্স পড়াশুনায় কোনদিনই মেধাবী ছিল না। তার ওপর অভাবের তাড়নায় তাকে লেখাপড়া ছাড়তে হয়েছিল অনেক আগেই।

সেদিন পিতৃহীন বালক সোবার্সের অবস্থা নিমজ্জিত মানুষের মত অসহায় হলেও সে একেবারে ভেঙে পড়েনি। সবভুলে ক্রিকেটকে জীবন-মন্ত্র করে নিয়মিত আটঘন্টা করে অনুশীলন চালিয়েছে।

একদিনের ঘটনা চোদ্দ বছরের বালকের জীবনে নতুন অভিজ্ঞতার আলো জেবলে দিল। বারবাডোজের অন্যতম সেরা দল এম্পায়ার বনাম পুলিস দলের খেলা। এই দলের অধিনায়ক পৃথিবী বিখ্যাত খেলোয়াড় এভারটন উইকস। ছ জন আউট হবার পর নিগ্রো ছেলেটি ব্যাট করতে আসে। একদিক থেকে বল করছিলেন ফাস্ট বোলার উইলিয়ামস। কয়েকঘন্টা অতিক্রান্ত। তাকে আউট করে কার সাধ্য। এতটুকু অপরিচিত ছেলের দৃঢ়তা ও খেলার কায়দাকানুন দেখে উইলিয়ামস মুগ্ধ হলেও মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এই ভেবে যে অজ্ঞাত একব্যক্তি ছেলে কিনা তার মত নামজাদা বাঘা বোলারকে ঘন্টার পর ঘন্টা হিমসিম খাওয়াচ্ছে। বল করতে করতে থেমে গিয়ে উইলিয়ামস উইকেট রক্ষককে কি যেন এক ইঙ্গিত করলেন। তারপর অনেক দূর থেকে দৌড়ে এসে উঁচু লাফ দিয়ে মাটি ঠুকে বাম্পার বল দিলেন। ছেলেটি দু পা পেছিয়ে গিয়ে হুক করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বল গিয়ে সরাসরি আঘাত করে তার চোয়ালে। চোয়াল ফেটে চৌচির। রক্তে সাদা জামা লাল। অচৈতন্য ছেলেটিকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

জ্ঞান ফিরে এলে ছেলেটি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। চোয়াল অসম্ভব ফুলে গেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করে কেন তার এমন হল? যথার্থ ব্যাটে বলে হলে তার চোয়ালে না লেগে বলটি নির্ঘাত মাঠের সীমানার বাইরে যেতে পারত। আসলে ক্রিকেটের সব কায়দা তার করায়ত্ত নয়। ক্রিকেটের সব রহস্য তার জানা নেই। কিন্তু চেষ্টা করলে মানুষের অজানা ত কিছু থাকতে পারে না। এইভাবে উইলিয়ামসের বাম্পার বলের আঘাত স্থিরচিত্ত ক্রিকেটপ্রিয় ছেলেটিকে নতুন শিক্ষা-দান করে।

মুখের ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় ঐ ছেলেটির পক্ষে বিউগিলে ফুঁ দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। একদিন ব্যান্ডলিডার স্বয়ং তার মুখের অবস্থা দেখে তাকে পুলিস ব্যান্ডপার্টি থেকে নিষ্কৃতি দিলেন। ছেলেটিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারণ বিউগিল বাজাতে তার একেবারে ভাল লাগত না।

'ওয়ার্ল্ডস ওয়ার্স্ট মিউজিসিয়ান' ও ক্রিকেটে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই ছেলেটির নাম গ্যারি সোবার্স। জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৮শে জুলাই।

ষোল বছরের নগণ্য বিউগিল বাদক ব্যান্ডপার্টি থেকে মুক্তি পেয়ে পুরোপুরি ক্রিকেটে আত্মনিয়োগ করে। ১৯৫২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরকারী ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে বারবাডোজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সোবার্সের প্রথম আবির্ভাব। এক বছর পর মাত্র সতেরো বছর বয়সে লেফট শ্লো আর্ম বোলার হিসেবে সোবার্স ১৯৫৩-৫৪ সালে স্বদেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একটি টেস্টে আহত বোলার ভ্যালেন্টাইনের জায়গায় স্বদেশীয় দলের পক্ষে প্রথম টেস্ট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করেন। এই খেলায় তিনি ৮১ রাণে ৪ উইকেট পান। এবং এক ইনিংসে নট আউট থেকে ৪০ রাণ সংগ্রহ করেন। জীবনের প্রথম টেস্টের পরিসংখ্যান তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও সোবার্সের ক্রীড়ানৈপুণ্যে উইকস ও ওরেল সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

কিছুকাল পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচের প্রাক মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এক নিদারুণ সংকটের মুখোমুখি হয়। সমস্যা ষপেনিং ব্যাটম্যানকে ঘিরে। অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণকারী দুই ফাস্ট বোলার লিন্ডওয়াল ও কিথ মিলারকে চ্যালেঞ্জ জানাতে যখন সবাই পেছপা তখন সোবার্স এগিয়ে এলেন। এবং সূচনার প্রথম পনের মিনিটের মধ্যে এই দুই দুর্ধর্ষ বোলারকে প্রচন্ড মার মেরে ৪৩ রাণ করেন।

সোবার্সের জন্ম ১৯৩৬ সালে ২৮শে জুলাই ব্রিজটাউনে। সোবার্স একজন সহজাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। সোবার্স জীবনে কোনদিন কারুর কাছে ক্রিকেটের পাঠ নেননি। বারবাডোজের অনুকূল পরিবেশ, স্বকীয় প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা সোবার্সের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। অন্যদিকে সোবার্স অধ-

বসায়ের অনন্য নজীর। এই পিতৃহীন নাবালক নিদারুণ অভাব অনটনের মধ্যেও প্রত্যহ আট ঘন্টা অনপ্রশীলন থেকে বিরত হয়নি। বিশ্ববন্দিত এই ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জীবনের প্রথম পর্যায় সোনালী সফলতায় উজ্জ্বল ছিল না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬টা, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪টা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪টা, মোট ১৪টা টেস্ট ম্যাচ খেলেও পরবর্তীকালে বহু বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী খেলোয়াড় কোন টেস্ট সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। তখন বিশ্ববিশ্রুত ডব্লিউ. রয়ী—ওয়াল্সকট ওরেল ও উইকসের স্বর্ণযুগ। ঐ সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলে স্থান করে নেওয়া যে কি দুরূহ কাজ তা ক্রিকেট রসিকরা সহজেই অনুমান করতে পারেন।

সোবার্সের ক্রিকেট জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৫৭-৫৮ সালে স্বদেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। কিংস্টনে এক ইনিংসে নট আউট ৩৬৫ রাণ করে তিনি টেস্টে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ করার যে বিশ্বরেকর্ড গড়েন তা আজও অম্লান। টেস্ট ম্যাচে সোবার্সের এই প্রথম সেঞ্চুরী এর পরে ৪র্থ টেস্টে (জর্জটাউন) উভয় ইনিংসে অপরাজিত ১২৫ রান ও ১০৯ রান করে টেস্টে উপর্যুপরি তিন ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন। স্মরণ করা যেতে পারে ইতিপূর্বে লেন হাটনের ৩৬৪ রাণ ছিল এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণের বিশ্ব রেকর্ড। এই সময় থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত নদীর স্রোতের মত সোবার্স একের পর এক নয়া নজীর রচনা করেছেন যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি এক ওভারে সর্বাধিক ছক্কা মারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন সোয়ানসি মাঠে আয়োজিত ১৯৬৮ সালে নটিংহামের পক্ষে গ্ল্যামারগণের বিরুদ্ধে এম এ ন্যাসের বলে। ছ বলে তিনি ছটি ছক্কা মেরে ৩৬ রাণ করেন। যদিও ইতিপূর্বে আরও অনেকেই এই গৌরবের অধিকারী। তবুও ক্রিকেটের নিয়মে এক ওভারে এর চেয়ে বেশী রাণ তোলার ব্যবস্থা নেই। টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে সর্বাধিক রাণের নতুন রেকর্ড গড়ার বিরল কৃতিত্বও সোবার্সের। তাঁর সংগ্রহ ৯৩টি টেস্ট ম্যাচে মোট ৮০৩২ রাণ। ইতিপূর্বে ৮৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলার সূত্রে ৭২৪৯ রান ছিল ওয়ালি হ্যামন্ডের সর্বোচ্চ রাণের রেকর্ড। সোবার্স অনেক আগেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার পর একক ৭৫১৯ রান সংগ্রহ করে হ্যামন্ডের নজীরকে মুছে দিয়েছেন। আরও অনেক আগে মুছে দিয়েছেন স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ৫২টি টেস্টে মোট ৬৯৬৯ রাণের রেকর্ডকে। টেস্ট খেলায় দুর্লভ ডাবল খেতাব অর্থাৎ ১০০০ রাণ ও ১০০ উইকেট অনেকেই লাভ করেছেন। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে খেলে নিজের নামের পাশে ডাবল খেতাব জুড়ে দিয়েছেন একমাত্র সোবার্সই। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় তাঁর সংগ্রহ ৩২১৪ রাণ এবং ১২০টি উইকেট। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সোবার্সের রাণ ২৭০০০ এর বেশী। উইকেট পেয়েছেন ১০০০ হাজারের অধিক। আর ডাবল খেতাব লাভের তালিকায় সোবার্স ২৩৫টি উইকেট পেয়ে শীর্ষস্থানাধিকারী। ক্রিকেট পরিসংখ্যানের কিতাবে নয়া রেকর্ড রচনায় সোবার্সের যুগ শুরু হয় ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে। সবদিক থেকে এত বেশী নজীর রচনা ইতিপূর্বে আর কোন ক্রিকেটার করেন নি। উইকেট কীপার না হয়েও তিনি কেবল টেস্ট ক্রিকেটে শতাধিক ক্যাচ ধরেছেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। অলরাউন্ডারকুলে তিনি হলেন প্রথম সারির। তার এক সিরিজে অলরাউন্ডার-এর অভাবনীয় সাফল্য দেখা যায় ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ১৯৬১-৬২ সালে মোট ৪২৪ রাণ (গড় ৭০-৬৬) এবং মোট ২৩ উইকেট (গড ২০-৫৬)। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মোট ৭২২ রাণ (গড় ১০৩-১৪) এবং মোট ২০ উইকেট (গড় ২৭-২৫)। ১৯৫৭-৫৮ সালে কিংস্টনে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে তার ক্রিকেট জীবনে সর্বাধিক বাউন্ডারী (৩৪টি) মারেন। স্মরণ থাকতে পারে এই রাণ সংখ্যা এক ইনিংসে তার সর্বাধিক রাণ অপরাজিত ৩৬৫-র মধ্যে। টেস্টে সোবার্সের সেঞ্চুরীর সংখ্যা ২৬।

জুটিতে উল্লেখযোগ্য রাণের মধ্যে প্রথমেই বিধৃত করতে হয় ১৯৫৭-৫৮ সালে কিংসটনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হান্ট ও সোবার্সের ২য় উইকেটের জুটিতে ৪৪৬ রাণ। এই ৪৪৬ রাণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ক্রিকেটে যে কোন উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রাণ এবং ২য় উইকেটের জুটিতে বিশ্বরেকর্ড রাণের (৪৫১ রাণ) থেকে মাত্র ৫ রাণ কম। ১৯৫৯-৬০ সালে ব্রিজটাউনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪র্থ উইকেটের জুটিতে সোবার্স এবং ওরেলের সংগ্রহ ৩১৯ রাণ। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে এই রাণ সংখ্যা ৪র্থ উইকেটে জুটির বিশ্ব রেকর্ড রাণের থেকে মাত্র ১২ রাণ কম। নার্স-এর জুটিতে ৫ম উইকেটে ২৬৫ রাণ, ১৯৬৬-তে ষষ্ঠ উইকেটে ২৮৪ অপরাজিত। ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সপ্তম উইকেটে জুলিয়েনের জুটিতে অপরাজিত ১৫৫ রাণ করেন। একটি টেস্ট সিরিজে যারা উল্লেখযোগ্য মোট রান (৮০০ রানের ভিত্তিতে) করেছে সেই ৭ জনের তালিকায় সোবার্সের স্থান পঞ্চম। এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ গড়ের রেকর্ড। ৮২৪ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮, অপরাজিত—২বার। এক ইনিংসে সর্বাধিক রান অপরাজিত ৩৬৫, সেঞ্চুরী ৩, এবং গড় (১৩৭-৩৩) পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮)।

সোবার্স যথার্থ ন্যাটা খেলোয়াড়। লেফট আর্ম স্পিন বোলার হিসেবেই তাঁর খ্যাতি। তবে তিনি ইচ্ছামত ফাস্ট মিডিয়াম বোলিংকে চায়নাম্যানে রূপান্তরিত করতে পারেন। একজন বোলারের জীবনে এই দ্বিবিধ গুণের সমন্বয় সোবার্স ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ে না। সোবার্স খাঁটি ন্যাটা। ব্যাটও করেন বাঁহাতে। পেশাদারী ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর খ্যাতি জগৎজোড়া। অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ড, ইংল্যান্ডের সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার ও কাউন্টি ক্রিকেট লীগের পেশাদারী খেলায় সোবার্সের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশী। চলতি বছরের আগস্ট মাসে ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে তার ৮৩ মিনিটে অপরাজিত ১৩২ রান এবছরের ক্রিকেট মরশুমে দ্রুততম সেঞ্চুরী। সোবার্স ১৯৬৮ সাল থেকে একনাগাড়ে ইংলিশ কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশিপে বাকিংহামশায়ার দলের হয়ে খেলেছেন।

অধিনায়ক হিসেবেও সোবার্স সফল। ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের উত্তরসূরী হয়ে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে এক সময় বিশ্বের ক্রিকেট দরবারে সেরা প্রতিপন্ন করেছিলেন।

সোবার্স প্রথম অধিনায়ক নির্বাচিত হন ১৯৬৪-৬৫ সালে কিংসটনে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্টে ২৯ বছর বয়সে। প্রথম টেস্টে টসে জয়ী হয়ে ১৭৯ রানে সোবার্স দলকে বিজয়ের পথে এগিয়ে দেন। এই টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২—১ খেলায় জয়লাভ করে। সোবার্স ৩৯টি টেস্টে অধিনায়কত্ব করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। কেবল সোবার্সএর অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলার ফলাফল দাঁড়ায় : জয় ৯, হার ১০ এবং ড্র ২০।

টেস্টের টসে সোবার্সের ২৭টি জয়লাভ বিশ্বরেকর্ড হয়ে আছে। আর ভাবতে আশ্চর্য লাগে যাদুকরের মত তিনি দুটি টেস্ট সিরিজের পাঁচটি করে মোট দশটি টেস্টেরই টসে জেতেন। প্রথমটি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭১-৭২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'ওরেল ট্রফি' ও 'ইংল্যান্ডের বিপক্ষে 'উইসডেন ট্রফি' বিজয়ী হয়। বিশ্ব একাদশ ও কমনওয়েলথ দলের অধিনায়কত্বের আহ্বান সোবার্সকে সসম্মানে ক্রিকেটের স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ১৯৬৯ সালে সোবার্স অস্ট্রেলিয়ান মহিলা প্রুডেন্স-এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

সোবার্স সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার। তাঁর ঘটনাবহুল সৃষ্টিশীল অসাধারণ ক্রিকেট জীবন এই অল্পপরিসরে ধরে রাখা অসম্ভব। ১৯৭৪ সালে উইসডেন বর্ষ পঞ্জিকা এই মহানায়কের জীবন কেন্দ্রিক চল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক ক্রোড়পত্র প্রকাশিত করেও সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরতে পারে নি। এত দীর্ঘ স্থান উইসডেন বর্ষ পঞ্জিকায় আর কোন খেলোয়াড়কে দেওয়া

।দ্র ৪৯

অজিত কুমার রায়

টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রিকেট খেলার প্রচলন বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিক ইংরেজরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে তাঁদের জাতীয় খেলা ক্রিকেটের প্রচলন করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিবাসীদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি এই খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৯৫ সালে ইংল্যাণ্ডের এক ক্রিকেট দল প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করেছিল। এরপর দু' দেশের মধ্যে সফর করেছিল। এরপর দু' দেশের মধ্যে সফর বিনিময় শুরু হয়। ১৯২৩ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের কনস্ট্যান্টাইন (পরবর্তী কালে লর্ড কনস্ট্যান্টাইন) লর্ডস মাঠে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তারই ফলে ১৯২৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট খেলার সুযোগ লাভ করে। এই সময় থেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট খেলা সুরু করে। বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে আজ তাদের মোট টেস্ট খেলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫১। ১৯২৮ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে কনস্ট্যান্টাইন ১০০০ রান এবং ১০০ উইকেট নিয়ে যে 'ডাবল' করেছিলেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সফরকারী দলের পক্ষে অন্য কোনও খেলোয়াড় এতোটা পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট দলে কেবল শ্বেতাঙ্গরাই অধিনায়ক হতেন তখন অর্থাৎ ১৯৩৪-৩৫ সালে কৃষ্ণাঙ্গ কনস্ট্যান্টাইন কিংসটনে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে শেষ টেস্টে শ্বেতাঙ্গ অধিনায়ক জর্জ গ্র্যান্টের অনুপস্থিতিতে দলের নেতৃত্ব করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এর মধ্যে ১৯২৯-৩০ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান জর্জ হেডলী। তাঁর সমকক্ষ ব্যাটসম্যান তখন বিশ্ব-ক্রিকেট আসরেও কম ছিল। তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সিরিজেই চারটি সেঞ্চুরীসহ মোট ৭০৩ রান করে হেডলী যে রেকর্ড করেন, তা ভেঙেছেন ১৯৭১-এ ভারতের সুনীল গাভাসকার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে খেলে। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে হেডলীর ২৭০ নট আউট স্বদেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ছিল। অবশ্য এই রেকর্ডের অধিকারী আজ লরেন্স রো, যাঁর ৩০২ রান আজও তাঁর দেশের পক্ষে দেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জেতে ১৯২৯-৩০ সালে আর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৩০-৩১ সালে। দুটি জয়ের মূলেই ছিল জর্জ হেডলীর অনবদ্য ব্যাটিং।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবির্ভূত হলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত 'ত্রয়ী'—সাবলীল ভঙ্গিমার ব্যাটসম্যান ওবেল অক্লান্ত রানসংগ্রহকারী উইকস্ আর ব্যাকফুট-বিশারদ দীর্ঘদেহী ওয়ালকট। তিনজনই ছিলেন কীর্তিমান। এই বিখ্যাত 'ত্রয়ী'র তিনজনেই দু'বার এক ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন—প্রথমবার ভারতের বিপক্ষে কিংসটনে এবং দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পোর্ট অফ স্পেনে ওবেল ১৯৫০ সালে নটিংহামে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২৬১ রান করে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড করেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে উইকস্ পর পর পাঁচটি টেস্ট ইনিংসে সেঞ্চুরী করে বিশ্ব-রেকর্ড করেন। এর পরেও ১৯৫৬ সালে তিনি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পর পর তিনটি টেস্ট ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে উইকস্ ৭৭৯ রান করে ভারতের বিপক্ষে একটি সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সর্বোচ্চ মোট রান-সংখ্যার রেকর্ডের অধিকারী হন। ওয়ালকট দুটি বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী—১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনি এক সিরিজে দুটি টেস্টের উভয় ইনিংসে পৃথক পৃথক সেঞ্চুরী করে বিশ্ব-রেকর্ড করেন এবং ঐ সিরিজেই মোট ৫টি সেঞ্চুরী করে একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরীর বিশ্ব-রেকর্ড করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ঐ সিরিজে ওয়ালকটের মোট ৮২৭ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে এক সিরিজে মোট সর্বাধিক রানের রেকর্ড।

'রহস্যময়' স্পিনার রামাধীন এবং ন্যাটা বোলার ভ্যালেনটাইনের জুটি ১৯৫০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম 'রাবার' জয়ে সাহায্য করে। ১৯৫৭ সালে রামাধীন বার্মিংহামে ১২৯ ওভারে ৭৭৪টি বল করে একটি টেস্টে একজন বোলারের পক্ষে সর্বাধিক মোট বল করার বিশ্ব-রেকর্ড করেন। ন্যাটা স্পিনার ভ্যালেনটাইন তাঁর প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৮টি উইকেট দখল করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ডেনিস এ্যাটকিনসন এবং উইকেটরক্ষক ডিপেইজা ৭ম উইকেটের জুটিতে ৩৪৭ রান সংগ্রহ করার সূত্রে কেবল টেস্ট ক্রিকেটে নয় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটেও ৭ম উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক রানের বিশ্ব-রেকর্ড করেন। ১৯৫৮ সালে কিংসটনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে যে ৭৯০ রান করে তা তাদের পক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ঢাকাতে পাকিস্তানেরই বিরুদ্ধে তাদের এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন ৭৬ রানের রেকর্ড করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের ক্রিকেট খেলার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলি হল বারবাডোস ত্রিনিদাদ গায়না এবং জ্যামাইকা। এই স্থানগুলির মধ্যে দূরত্ব অনেক এবং এর অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালীতেও পার্থক্য আছে। এই চারটি অঞ্চলের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে অনৈক্য ছিল। কেবল ব্যক্তিগত নৈপুণ্য থাকলেই ক্রিকেট খেলায় জয়লাভ করা যায় না, প্রয়োজন দলগত ঐক্যেরও। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন শ্বেতাঙ্গ অধিনায়কই এই দলগত অনৈক্য দূর করতে পারেননি। ১৯৬০-৬১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। এবার অধিনায়ক কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ ফ্রাঙ্ক ওরেল। যাদুকর ওরেল তাঁর স্বভাব-গুণে দূর করলেন দলগত অনৈক্য। জন্ম নিল খাঁটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। পাঁচ বছর ধরে যে টেস্ট ক্রিকেট মাঠে মন বসাকাষি ধীরগতির ব্যাটিং এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী ওভারের চাপে পড়ে দর্শকদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছিল, তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন ওরেল। খেলোয়াড়ী মনোভাব আর চোখজুড়োনো ব্যাটিং দিয়ে

দর্শকদের ভুলিয়ে দিলেন টেস্ট খেলার তিক্ত স্মৃতি। ওরেল আর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বেনডের সক্রিয় সহযোগিতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলাটি শেষ হল অকল্পনীয় 'টাই'-তে, অর্থাৎ উভয় দলেরই মোট রান-সংখ্যা সমান হল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১—২ ফলাফলে সিরিজে পরাজিত হলেও, বিদায়কালে ওরেল এবং তাঁর দলের খেলোয়াড়রা মেলবোর্ণের অগণিত জনসাধারণের কাছে পেলেন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন এবং বিজয়ীর সম্মান। অতুলনীয় সম্মান পেলেন ওরেল। ব্রিসবেনের অতুলনীয় 'টাই'-এর স্মারকরূপে তাঁর জীবিতাবস্থাতেই শুরু হল অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলার জন্যে 'দি স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ট্রফি।' 'দি স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল' নাম হল ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের। ১৯৬৪ সালে 'নাইটহুডে'র সম্মান লাভ করার জন্য। ওরেল এই খেতাব লাভ করেছিলেন ক্রিকেট খেলার সেবার জন্যে।'

ওরেলের দলের কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন—সোবার্স কানহাই হ্যাণ্ট বুচার নার্স হল আর গিবস। ন্যাটা ব্যাটসম্যান সোবার্স ১৯৫৮ সালে কিংসটনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩৬৫ (নট আউট) করে টেস্ট খেলার এই ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব-রেকর্ড করেন। কেবল ন্যাটা স্পিনাররূপে টেস্ট খেলা শুরু করে সোবার্স ক্রমশঃ বিশ্বের সেরা অলরাউণ্ডারদের মধ্যে একজন হলেন। আত্মপ্রকাশ করার কয়েক বছরের মধ্যেই পরাক্রান্ত ব্যাটসম্যান, ন্যাটা ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার ন্যাটা 'চায়নাম্যান' বোলার আর অব্যর্থসন্ধানী শর্টলেগ আর স্লিপ-ফিল্ডাররূপে গারফিল্ড সোবার্স বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার হয়ে উঠলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মিশ্র চীনজাতীয় বোলার এডি এ্যাচং বাঁ হাতে যে গুগ্‌লি আর লেগ-স্পিন বোলিং-এর প্রবর্তন করেন সেটাই পরবর্তীকালে 'চায়নাম্যান' নামে পরিচিতি — করে। টেস্টে ভারতের বিপক্ষে এক ই সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ডধারী (২৫৮) রোহন কানহাই ১৯৫৮-৫৯ সালে তাঁর আসন স্থায়েমী করে নেন। ক্রিকেটের সব-জানা স্ট্রোকের সঙ্গে নিজস্ব উদ্ভাবিত স্ট্রোক যোগ করে কানহাই এই সময় থেকেই এ্যাডভেঞ্চারাস তথা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটিংয়ের প্রতীক হয়ে ওঠেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে জীবনের প্রথম টেস্টেই তিনি সেঞ্চুরী করেছিলেন। তিনি দায়িত্বশীল অথচ আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ইনিংসের গোড়াপত্তন করার সমস্যা দূর করলেন। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং-কৌশলে বেলিস বুচারও কোন অংশে কম ছিলেন না। দুর্ভাগ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের। জীবনের শেষ টেস্টে চমৎকার ব্যাটিং করে সেঞ্চুরি নার্স ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে করলেন ২৫৮ রান। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের থেকে বাদ পড়ে গেলেন তিনি। নার্সের ২৫৮ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ওরেলের দলে ছিলেন সর্বকালের সেরা বোলারদের অন্যতম দুজন—ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল এবং অফ-স্পিনার ল্যান্স গিবস। ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েসলী হল লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে 'হ্যাট-ট্রিক' করেন—তাঁর দেশের পক্ষে প্রথম 'হ্যাট-ট্রিকে'র নজির। ফাস্ট বোলার হলের তীব্র গতির বোলিং বারবার টেস্ট ম্যাচের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাঁর দুরন্ত বোলিং বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যাটসম্যানদের বিব্রত করেছে। ল্যান্স গিবস এ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীতে প্রথম এবং একমাত্র 'হ্যাট-ট্রিক' করার কৃতিত্ব লাভ করেন। নিখুঁত লেংথ আর লোভনীয় অথচ বিপদজনক 'ফ্লাইট'-এর অধিকারী গিবসের মোট টেস্ট উইকেটের সংখ্যা ২৬৫।

১৯৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলের জন্যে অনুমোদন করলেন 'উইসডেন'-এর শতবর্ষপূর্তির স্মারক হিসেবে উইসডেনের প্রকাশকমণ্ডলীর তরফ থেকে প্রদত্ত 'উইসডেন' ট্রফি। জীবনের শেষ টেস্ট সিরিজে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কর্ণধার হয়ে দলকে এগিয়ে দিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবার সম্মানলাভের পথে। ফাস্ট বোলার হলের সঙ্গে দৈত্যাকার ফাস্ট বোলার চার্লি গ্রিফিথ যোগ দেওয়াতে এই জুটি টেস্ট ক্রিকেটের বিখ্যাত ফাস্ট বোলারদের জুটির মধ্যে অন্যতম হলেন। গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৬৫ সালে ২—১ ব্যবধানে পরাজিত করে লাভ করলেন বিশ্বক্রিকেটের সেরা দল হবার সম্মান এবং সেই সঙ্গে 'দি স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ট্রফি'।

১৯৭২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লরেন্স রো সৃষ্টি করলেন এক বিশ্ব-রেকর্ড। তাঁর প্রথম টেস্ট ম্যাচেই নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে রো দুটি ইনিংসে যথাক্রমে রান করলেন ২১৪ আর ১০০ নট আউট। ঐ সিরিজেই 'ন্যাটা কানহাই' কালিচরণ টেস্ট জীবন শুরু করলেন প্রথম দুটি টেস্ট ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরী করে অবশ্য কালিচরণের দুটি সেঞ্চুরী লরেন্স রো-র মত একই টেস্টে হয়নি।

১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল—এই ছ বছরে উপর্যুপরি ৫টি টেস্ট সিরিজে বাবার জয়ের ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বে-সরকারীভাবে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছিল। এই পাঁচটি টেস্ট সিরিজে বারবাজয়ী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট দলের নেতৃত্ব দেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (২টিতে) এবং গারফিল্ড সোবার্স (৩টিতে)। এই ছ বছরকে (১৯৬২-৬৭) টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ১৯৬৮ সাল থেকে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপর্যয় সুরু হয়। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ সাল—এই সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যে ৯টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে সেগুলোর ফলাফল নৈরাশ্যজনক ঃ—জয় ১ (ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭৩ সালে), হার ৫ এবং ড্র ৩।

টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

(১লা মে, ১৯৭৪ পর্যন্ত)

বিপক্ষ	খেলা	জয়	পরাঃ	টাই	অমীঃ
ইংল্যাণ্ড	৪৬	১৯	২১	০	২৬
অস্ট্রেলিয়া	৩৫	৬	১৯	১	৯
ভারত	২৮	১২	১	০	১৫
নিউজিল্যাণ্ড	১৪	৫	২	০	৭
পাকিস্থান	৮	৪	৩	০	১
মোট ঃ	১৫১	৪৬	৪৬	১	৫৮

খেলার জগতে মেয়ে

কাবাডি 'বাঘিনী' মণিকা নাথ

—৭১ সালে বাঘা যতীন সব পেয়েছির আসরের সদস্যারূপে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজ দেখতে এসে কাবাডি খেলার ওপর আগ্রহ বাড়ে। সেই সময় আমাকে অনেকে কাবাডি খেলতে উৎসাহ দেন। তখন থেকেই বিধিমতভাবে কাবাডি খেলা শুরু করি।'

সেদিন ময়দানে কলকাতা কাবাডি এসোসিয়েশনের তাঁবুতে কথা হচ্ছিল বাংলার কুশলী মেয়ে-কাবাডি খেলোয়াড় মণিকা নাথের সঙ্গে। পাকা এথলীট-সুলভ শারীরিক গঠন মেয়েটির। নিবাস যাদবপুরের বাঘা যতীন কলোনি। এ বছরই স্কুল ফাইনাল দেবে প্রান্তিকপল্লী বালিকা বিদ্যালয় থেকে। বাবা শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র নাথ স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক। মণিকার এক বোন ও এক ভাই আছে।

মণিকা বলে, সাঁতার বা অন্য খেলায় আমি তেমন উৎসাহ পাই না। ছোটবেলা

থেকেই প্রতিবেশী সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে হাডু-ডু খেলতে সুরু করি। দলের মধ্যে বেশ নামও হয়ে যায়। খেলাধুলায় উৎসাহী অনেকেই বলতেন কাবাডি সংস্থায় যোগ দিতে। কিন্তু বাড়ীতে এসব খেলাধুলার ব্যাপারে কড়ারকম বাধা-নিষেধ থাকায় সে সময় যোগ দিতে পারি নি। তবে কাবাডি এসোসিয়েশনের সচিব শ্রীসলিল সেনের চেষ্টায় আর শ্রীসলিল ঘোষের (মামা) প্রশিক্ষণের ফলে যথাক্রমে বাড়ীর অনুমতিও পাওয়া গেল আর কাবাডি খেলায় কিছুটা রপ্ত হওয়া গেল।

—খেলা দেখে বুঝেছি তুমি যেরকম সপ্রতিভ তাতে অন্য যেকোন খেলাতেই হয়ত সুনাম অর্জন করতে পারতে। তা সেসব দিকে না গিয়ে কাবাডিতে এলে কেন?

—প্রথমতঃ এ আমাদের দেশী খেলা। দ্বিতীয়তঃ অন্য সব খেলায় দামী দামী সাজ-সরঞ্জাম লাগে, শিখতেও অনেক খরচ খরচা দিতে হয়। আমাদের মত সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে অত টাকা ব্যয় করা কি সম্ভব? তাছাড়া দেখুন না, এই খেলায় শরীর সুস্থ রাখতে অতি সাধারণ ডাল ভাত তরকারি হলেই চলে—তাও তো উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না।

—তুমি কি অন্য কোন খেলাই খেলনি?

—না তা নয়। দৌড় ঝাঁপ—মানে এথলেটিকসে নামি বিশেষ করে উচ্চ আর দীর্ঘ লম্ফনে। তবে কাবাডিই সব চেয়ে ভাল লাগে।

মণিকা '৭১-এ কাবাডি শিখতে আরম্ভ করলেও '৭২-এর জুনে হায়দরাবাদে নিখিল ভারত কাবাডি প্রতিযোগিতার আসরে ওর ক্রীড়া চাতুর্য আর আক্রমণাত্মক খেলার তেজ দেখে বিচারকরা ওকে 'কাবাডি বাঘিনী' উপাধিতে ভূষিত করেন। কাবাডি খেলোয়াড়ের শরীর আর মন যে কতখানি সচেতনতার শৃঙ্খলে বাঁধা থাকে তা মণিকার খেলা দেখলে বোঝা যায়। ও যখন বিপক্ষ এলাকায় হানা দেয় তখন—ওর নিজের কথায় বলি—একদিকে নিজে খুব সতর্ক থাকি যাতে কেউ আমায় কোনভাবে ধরতে না পারে। বিপক্ষের প্রতি খেলোয়াড়ের ওপর খরদৃষ্টি রাখি, ওরা কি করতে চায় কিভাবে আমার ওপর আক্রমণ চালাতে চায়, তা বোঝবার চেষ্টা করি। আবার একই সঙ্গে বিপক্ষদের ব্যূহে দুর্বলতা কোনখানে তাও খুঁজি। সুযোগের অপেক্ষা করি। সুযোগ পাওয়া মাত্র বিদ্যুৎগতিতে মেরে দিয়ে আসি। কাবাডি খেলায় নিজের তৎপরতা অনেকটা তারে রাখা বিদ্যুতের মত। তৈরী অথচ স্তব্ধ রাখতে হয়। যেমন সুইচ টিপলেই বিদ্যুৎপ্রবাহ সুরু হয়, তেমনি সুযোগ পেলেই সমগ্র শক্তি ও প্রতিভাকে তড়িৎগতিসম্পন্ন করে দিতে হয়। তাহলেই সাফল্য। তাই বুঝতেই পারছেন এজন্য শরীর ও মনকে কতখানি সচেতন সপ্রতিভ ও মজবুত রাখতে হয়। বস্তুত যেমন কথায় বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, তেমনি আমাদের অনেক গ্রামীণ খেলা তেমন গুরুত্ব পায় না। বিদেশী খেলার প্রয়োজন এখন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তার জন্য দেশী খেলাকে অবজ্ঞা করার প্রয়োজন কি? বিশেষ করে এই কাবাডির মত খেলা যখন সহজে ছেলে-মেয়েদের দেহ মজবুত ও মনকে সপ্রতিভ করে তোলে। সারা দেশে সহজ শরীর গঠনের কাজে এ খেলার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। ভারতের সর্বত্র এখন কাবাডিই অন্যতম প্রধান গ্রামীণ খেলার স্থান নিয়েছে।

যাইহোক পশ্চিম বাংলায় কাবাডি খেলা প্রায় তেরো বছর বন্ধ থাকার পর '৭২ সালে নতুন করে নতুন সাজে সুরু হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ কাবাডি সংস্থা গত কয়েক বছর যাবৎ রাজ্যে সুসংগঠিতভাবে কাবাডি (ছেলে ও মেয়েদের) লীগ ও নক আউট প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে।

'৭২-এ পশ্চিম বাংলার কাবাডি দল নতুন করে জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। মণিকাও সেই প্রথম বাংলা দলে স্থান পায়। জানুয়ারীতে হায়দরাবাদে আসর বসে। ঐ বছরই জুনে ওখানে যে নিখিল ভারত কাবাডি প্রতিযোগিতা হয় তাতেই মণিকা 'কাবাডি বাঘিনী' খেতাব জয় করে। বিচারকরা এক বাক্যে বাংলার এই মেয়েটির ক্রীড়া-কুশলতার তারিফ করেন। ৭২—৭৩ মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মানও পায় এই মেয়েটি। এছাড়া ৭৩-এর অকটোবরে নাগপুরের দিঘরাসে আয়োজিত গোল্ড কাপ ট্রফিতে কলকাতা খোখো ও কাবাডি ক্লাবের পক্ষ হয়ে মণিকা খেলতে যায় (ঐ ক্লাবেরই ও সদস্যা)। ওই আসরে পাঁচটি রাজ্য থেকে প্রায় সত্তরজন কুশলী মেয়ে খেলতে এসেছিল। মণিকাকেই বিচারকরা শ্রেষ্ঠ চৌকশ খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি দান করেন। ঐ আসরে চূড়ান্ত খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাবার পর বাংলার দল মহারাষ্ট্রের কাছে নামমাত্র ব্যবধানে পরাজিত হয়। সাধারণতঃ খেলা চলে ৩৫ মিনিট। কিন্তু এই খেলাটি চলেছিল ঝাড়া নব্বই মিনিট ধরে। এই বছরই কলকাতার কাবাডি ক্লাবের হয়ে মণিকা বোম্বাইয়ে খেলবার সুযোগ পায়। ৭৩-এ জয়পুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাবাডিতে বাংলা দল তৃতীয় স্থান পায়। মণিকা এ দলে ছিল। '৭৪ সালে আসানসোলে আয়োজিত জাতীয় আসরে বাংলা রাণার আপ হয়। বলাবাহুল্য মণিকা এবারের দলেও ছিল।

মণিকা বলে বাড়ীর কেউই আমার খেলার ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু ক্রমেই তার ক্রীড়াপ্রতিভার স্ফুরণ দেখে বাড়ীর বাধা-নিষেধ শিথিল হয়ে যায়।

—এ খেলাটা তো মারাত্মক, জখম-টখম হবার আশঙ্কা আছে?

—কে বললে? আপনাদের ফুটবল ক্রিকেটের মত মোটেই নয়। এ খেলায় শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য বাড়ে, জখম মোটেই হয় না। আনাড়িরা সব খেলাতেই জখম হতে পারে, শুধু কাবাডি কেন?

—এই খেলার জন্য বিশেষ ধরণের খাবার খেতে হয় না?

—না না। সাধারণ গৃহস্থের ডাল ভাত তরকারীই যথেষ্ট। (কিন্তু তাই বা পাওয়া যাচ্ছে কই, বলুন?) দামী খাবারের দরকারই হয় না।

—সবই কি কাবাডি খেলা খেলতে পারবে?

—কেন পারবে না? যারা কোন খেলা খেলতে পারে না বা পায় না—তারাও কাবাডি খেলতে পারে। নিয়মকানুন খুব সোজা। ক্রমে ক্রমে শারীরিক সক্ষমতা আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে হয়। ও দুটো জিনিস খেলতে খেলতেই হয়। আগেই বলেছি দেহ ও মনের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সচল রাখতে হবে, যাতে যেমনি চিন্তা অমনি কাজ হয়। প্রতিপক্ষ হানাদারের দুর্বল অংশ জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আক্রমণ করতে হবে। তারপর দেখুন, দলের সব কজনকেই সচকিত থাকতে হবে যে কোন মুহূর্তে প্রতিপক্ষ হানাদারকে ধরায় সঙ্গীকে সাহায্য করার জন্য। দলগত সংহতির গুরুত্ব খুবই। সেই সঙ্গে খেলোয়াড়দের একক বৈশিষ্ট্যেরও খুব প্রয়োজন। এক এক খেলায় মাত্র একজনের চেষ্টায় নিশ্চিত হার জয়ে পরিণত হতে দেখা যায়।

—এ খেলায় রাগারাগী মাথা-গরম হতে পারে ত?

—মোটেই না। এ ও অন্যসব খেলারই মত। মাথা-গরম করলেই নির্ঘাৎ হার। সাতজন খেলোয়াড়কেই মনেপ্রাণে একাত্ম হয়ে খেলতে হবে। উত্তেজনায় ফেটে পড়লে চলবে না।

এদেশে অফিস পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েদের কাবাডি দল গঠন হলে খুব ভাল হয়, বলে মণিকা। অন্যান্য রাজ্যে এই ধরনের ব্যবস্থা আছে। ও সব জায়গায় বাস্কেটবল হকি ভলিবল দলের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী—বেসরকারী অফিসে কাবাডি দলও রয়েছে বা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশ ভাগের দুর্ভাগ্যজনিত দিনে মণিকাদের পরিবারকে ঢাকার আদিবাস ছেড়ে আসতে হয়। ও বলে আমার জন্ম কলকাতায়।

মণিকার ইচ্ছে নাচ-গান শেখে। বলে—'অবশ্য গান আমি এখনই দিদিকে শেখাই।' লেখাপড়া শিখে ও চায় ভবিষ্যতে ভাল চাকরী পেতে। ভাল কথা, গত দু মরশুম পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তন মণিকার ক্রীড়া প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ওকে ক্রীড়াবৃত্তি দিয়েছে।

—অনয়

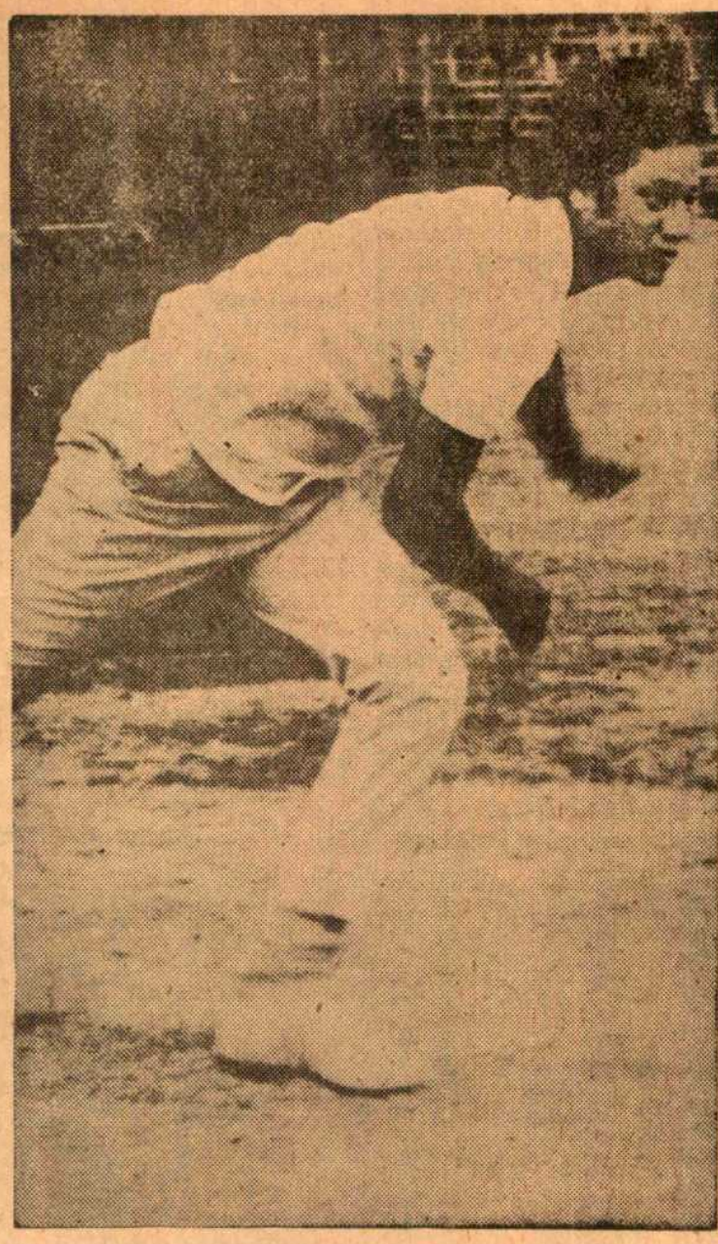

মাঠের নায়ক

সুব্রত গুহ

ত্যাগ শব্দটি আস্তে আস্তে অভিধান থেকে যখন অপসৃয়মাণ সেই মুহূর্তে, যদি কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থের অনেক ওপরে ওঠে, দেশের বৃহত্তর কল্যাণে সরে দাঁড়ান, জায়গা করে দেন অন্যকে তা হলে ঐ ঘটনাটি আর শুধুমাত্র ঘটনাই থাকে না, নিঃসন্দেহে ইতিহাস হয়ে পড়ে।

ভারতীয় ক্রিকেটে ঠিক এমনি একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন বাংলার এক তরুণ। নাম সুব্রত গুহ। ঘটনাটি বছর পাঁচেক আগের (১৯৬৯)। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের প্রথম ক্রিকেট টেস্ট। স্থান বোম্বাই, ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়াম। চূড়ান্ত দলে সুব্রত ছিলেন। খেলা শুরু হওয়ার মিনিট ত্রিশেক আগে সুব্রত পিচে হাত বুলিয়ে এসে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচক-মণ্ডলীর সভাপতি বিজয় মার্চেন্টকে বললেন : 'স্যার, আমার বদলে ভেঙ্কটরাঘবনের বলই মনে হয় এই উইকেটে বেশী কার্যকর হবে, ভারতীয় ক্রিকেট তথা জাতির স্বার্থে আমার বদলে ব্র্যাবোর্ণ টেস্টে ভেংকটকে নিন।' বিনম্র সামান্য কটি কথা। মুগ্ধ হয়ে গেলেন বিজয় সুব্রতর সিংহ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে। এ যুগে এমন ছেলেও আছে?

আছে কি নেই বাংলার সুব্রত গুহ বোধ হয় বিজয় মার্চেন্টকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সুব্রত গুহ চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড়। প্রতিষ্ঠা বোলার হিসাবে ছলেও, ব্যাটিং সামর্থ্যও রীতিমত বুক ফুলিয়ে বলবার মত বৈ কি! সর্বভারতীয় ক্রিকেটে ব্যাটে-বলে সমান সার্থক এমন বঙ্গসন্তান সম্ভবতঃ আর নেই। এক সময় ভারতবাসী বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গালীরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম সাঁটে ব্যানার্জির শূন্যস্থানে সুব্রতকে দেখে। সুব্রত মিডিয়াম পেস বোলার এবং আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান। সবল হাতে দুরন্ত গতিতে বল করেন, ব্যাটও চলে শাণিত অসির মত।

উইকেট আর রানের খতিয়ানে সুব্রত গুহের ক্রিকেটের কোলাটি দস্তুর মতো ভারী। প্রতিনিধিত্বমূলক ক্রিকেট আসরে প্রথম আবির্ভাব ১৯৬০—৬১ সালে কোচবিহার ট্রফির মাধ্যমে। বালীগঞ্জ জগবন্ধু স্কুলের ছাত্র হিসেবে তিনি বাংলা স্কুল দলভুক্ত হন (লেখাপড়ায় হাতেখড়ি দিল্লীর একটি মন্টেসরীতে এবং পরে গোরক্ষপুরে)। রণজি ট্রফিতে প্রথম খেলেন ১৯৬৫ সালে। বলাবাহুল্য বাংলার হয়ে। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতি, আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা। ওড়িশার বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম ম্যাচে পেলেন আটটি উইকেট। আসামের বিরুদ্ধে সাতটি এবং বিহারের বিরুদ্ধে পেলেন চারটি উইকেট। দলীপ ট্রফিতে ঐ বছরের প্রথম খেলায় রান করলেন চল্লিশ, উইকেট দুটি। রণজির ফাইনালে সুব্রত সেবার পেয়েছিলেন আটটি (৭+১)

উইকেট। জীবনে প্রথম যে বিদেশী দলের বিরুদ্ধে সুব্রত খেলেন, তা হল ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৯৬৬)। হায়দরাবাদে আয়োজিত সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের পয়লা নম্বর বোলার হিসাবে মোট এগারোটি (৪+৭) উইকেট পেলে দেশময় হৈ-হৈ পড়ে যায়। কলকাতায় ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টেস্টে দ্বাদশ ব্যক্তিরূপে তাঁর নির্বাচন নিঃসন্দেহে তারই ফলশ্রুতি। মাদ্রাজ টেস্টেও নির্বাচিত ১৫ জনের মধ্যে তাঁর স্থান হয়েছিল।

সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠার সূত্রে ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলে অনায়াসেই তাঁর স্থান মিলে যায়। কাউন্টি ম্যাচে সারে, ল্যাংকাশায়ার এবং হ্যাম্পশায়ারের বিরুদ্ধে চারটি করে উইকেট পান সুব্রত। এম সি সির বিরুদ্ধে তিনটি এবং ইয়র্কশায়ারের পাঁচ-পাঁচটি উইকেট পান তিনি লীডসের প্রথম টেস্টে কোন উইকেট তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। এর পরই তাঁর হাঁটুতে (কার্টিলেজ) অপারেশন হয়। বলাবাহুল্য মাস কয়েকের জন্য তিনি অশক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৬৮-৬৯ সালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে দলীপ ট্রফির খেলায় সাতটি উইকেট পান (৪+৩)। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত ১৮১টি উইকেট পেয়েছেন সুব্রত গুহ। ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্টে সব দাঁড়ালেও কানপুর, দিল্লী ও কলকাতা টেস্টে ভারতীয় দল থেকে তিনি বাদ পড়েন নি। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টে দুটি উইকেটও পেয়েছিলেন। ভারত সফরকারী নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টেই অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের তালিকায় সুব্রতর নাম ছিল। এর আগে '৬৮ সালে রণজি ট্রফির খেলায় বিহারের দশটি উইকেট পান তিনি দু ইনিংসে। সেমিফাইনালে মহীশূরের সাতটি (৩+৪) উইকেট তো পেয়েছিলেনই তদুপরি ৭৫ রানও করেছিলেন। এক সময় বাংলার ছটি উইকেট পড়ে গিয়েছিল ১২৭ রানে। সপ্তম উইকেট জুটিতে অম্বর রায় এবং সুব্রত রান ১৫৭র কোঠায় টেনে তোলেন। তারপর বল হাতে নিয়ে সুব্রত যখন সংহার মূর্তি ধরলেন, কুড়ি রানে মহীশূরের ২য় ইনিংসের ছটি উইকেট চুরমার হোল ভেঙ্গে, তখন দৃশ্যপটে আবির্ভাব ঘটলো বালখিল্য বাহিনীর। ম্যাচ মাঠেমারা যাওয়ার দাখিল। ঐ ছটি উইকেটের মধ্যে চারটিই ছিল সুব্রতর।

১৯৬৯-৭০ শেষের দিকে সুব্রতর পক্স হোল। অস্ট্রেলিয়া টুর আর হোল না, হোল না ৭১ সালে ইংল্যান্ড যাওয়াও। ৭০-৭১ সালে রণজি ট্রফির খেলায় রাজস্থানের বিরুদ্ধে জয়পুরে বাংলার সুব্রত পাঁচটি উইকেট পেয়েছিলেন। ৭২-৭৩-এ আসামের বিরুদ্ধে ২৮ রানে ৭টি এবং বিহারের বিরুদ্ধে প্রতি ইনিংসে পাঁচটি করে মোট দশটি উইকেট লাভ করেন। ঐ মরশুমেই জামসেদপুরে এম সি সির বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দলে বোলার হিসেবে চারটি উইকেট পান। সুব্রত একবার ট্রায়াল খেলায় দুশো রান করেছিলেন। উইকেট পেয়েছিলেন ৪টে। সনটা সম্ভবতঃ ১৯৬৫। ঘরোয়া ক্রিকেট লীগে সর্বপ্রথম খেলেন ফ্রেন্ডস এ সিতে তারপর টালিগঞ্জ অগ্রগামী, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মোহনবাগান ঘুরে বর্তমানে ইস্টবেঙ্গলে

পারিবারিক জীবনে সুব্রত খুব সুখী। স্ত্রী নীলম গুজরাট-কন্যা। সুব্রত স্টেট ব্যাংকের (পার্ক স্ট্রীট শাখা) অফিসার। স্ত্রীর জার্নালিজমের দিকে খুব ঝোঁক। বোম্বের ইংরেজী কাগজে নিয়মিত লেখেন। কিন্তু সুখের সাগরে ডুবে থেকেও সুব্রত বোধহয় পরিপূর্ণ সুখী নন। সুখী হতেন যদি এই মুহূর্তে মা-বাবা বেঁচে থাকতেন।

বাবা সুরঞ্জন গুহ এবং মা বিভাবতী সুব্রতের শৈশবেই লোকান্তরিত হয়েছেন। ঢাকা ক্লিমপুরের আদি বাসিন্দা। সুররঞ্জনবাবু ছিলেন মস্ত বড় ক্রীড়ানুরাগী মানুষ। নর্দার্ণ রেলের চীফ একাউন্টস অফিসার এবং পরবর্তী পর্বে ফিনানসিয়াল অ্যাডভাইসার ছিলেন তিনি। ছেলে মেয়ের মধ্যে 'সু' সবচেয়ে ছোট বলে সংসারে আদরও ছিল সবচেয়ে বেশী। আদর এখনও অব্যাহত আছে। পরম স্নেহে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছেন সুব্রতকে তাঁর অগ্রজ সুবিমল গুহ, প্রায় পিতৃস্নেহে।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দমদম বিমানঘাঁটি থেকে বাসযোগে হোটেলে যাবার মুখে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়েরা। বাসের সিটের একধারে অ্যানডি রবার্টসকে দেখা যাচ্ছে। পাশেই বসে ল্যান্স গিবস। নাগপুরের খেল সেরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল সোমবার সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে।

ফিরোজ শাহ্ কোটলা মাঠে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ডিভিয়ান রিচার্ডস প্রচণ্ড মারে বেদীর বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়েছেন। রিচার্ডস শেষ পর্যন্ত ১৯২ রান করে অপরাজিত থাকেন।

খেলাধূলা

দর্শক

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

দিল্লীর ফিরোজ শাহ্ কোটলা মাঠে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৭ রানে জিতে ২-০ খেলায় এগিয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ্য ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এই নিয়ে বার ইনিংস জয়ী হল—ভারতের মাটিতে বার এবং স্বদেশে ২বার।

আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারত ক্রিকেট খেলার সব বিভাগেই—ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং এবং দল পরিচালনায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। খেলায় তাদের আন্তরিকতারও যথেষ্ট অভাব ছিল।

অধিনায়ক মনসুর আলি এবং গাভাস্কার আহত থাকায় দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত হননি। বিকল্প অধিনায়ক ভেঙ্কটরাঘবন টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাট করার প্রথম সুযোগ পেয়েও ভারত ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—প্রথম দিনে ২০ রানের মাথায় তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটা উইকেট খুইয়ে ৪ রান করেছিল। পার্থসারথি শর্মা তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ৫৪ রান করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৭৮ (৭ উইকেটে)। ফলে তারা ভারতের প্রথম ইনিংসের ২২০ রানের থেকে ১৫৮ রানে এগিয়ে যায়। অধিনায়ক লরেড ৮৭ মিনিট খেলে ৭১ রান করেছিলেন। তাঁর ৭১ রানে ছিল ৬টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার বাউন্ডারী। নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ভিভিয়ান রিচার্ডস ২৩৬ মিনিট খেলে তাঁর ১১৮ রানে ১৪টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার বাউন্ডারী করে এইদিন অপরাজিত ছিলেন।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ৪৯৩ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৭৩ রানে এগিয়ে যায়। ভিভিয়ান রিচার্ডস ১৯২ রান করে শেষপর্যন্ত নটআউট থেকে যান। তাঁর এই ১৯২ রানে ছিল ২০টা বাউন্ডারী এবং ৬টা ওভার-বাউন্ডারী। ৮ম উইকেটের জুটিতে বয়েস এবং রিচার্ডস দলের ১২৪ রান তুলেছিলেন যা ভারতের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ৮ম উইকেট জুটির রেকর্ড রানে পরিণত হয়। পূর্ব রেকর্ড ছিল ৯০ রান (কানহাই এবং ওরেল জামাইকা ১৯৬২)। বয়েস তাঁর ৬৮ রানে ৯টা বাউন্ডারী এবং দুটো ওভার বাউন্ডারী করেছিলেন। রিচার্ডস ভারতীয় স্পিন বোলারদের পিটিয়ে তক্তা করে দিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে খেলার বাকি সময়ে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের পাঁচটা উইকেট খুইয়ে ২৩৯ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলার এই অবস্থায় ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ভারতের আরও ৩৪ রানের প্রয়োজন ছিল। তাদের হাতে দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট জমা ছিল।

চতুর্থ দিনে ৫০ মিনিটের খেলায় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৬ রানের মাথায় পড়ে যায়। এইদিন তারা বাকি পাঁচ উইকেটে মাত্র ১৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে ভারত এক ইনিংস ও ১৭ রানে হেরে যায়। চতুর্থ দিনে ভারতের পাঁচটা উইকেটের মধ্যে প্রবীণ স্পিন বোলার গিবস একাই ৩টে উইকেট নিয়েছিলেন—ওভার ৮ মেডেন ৪ রান ৯ এবং উইকেট ৩। দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় গিবসের বোলিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ওভার ৭০ মেডেন ৩৫ রান ১১৬ এবং উইকেট ৮।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ২২০ রান (সুধীর নায়েক ৭৮ বিশ্বনাথ ৩২ পার্থসারথি শর্মা ৫৪ রান। অ্যান্ডি রবার্টস ৫১ রানে ৩; জুলিয়েন ৩৮ রানে ২; গিবস ৪০ রানে ২ এবং উইলেট ৩০ রানে ২ উইকেট)।

ও ২৫৬ রান (ইঞ্জিনিয়ার ৭৫, বিশ্বনাথ ৩৯ এবং শর্মা ৪৯ রান। গিবস ৭৬ রানে ৬ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৯৩ রান (কালিচরণ ৪৪ রিচার্ডস নট আউট ১৯২ লরেড

৭১ রান জুলিয়েন ৪৫ এবং বয়েস ৬৮ রান। সোলকার ৪৩ রানে ২ এবং প্রসন্ন ১৪৭ রানে ৪ উইকেট)

কলকাতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ডিসেম্বর ২৭ তারিখে কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা শুরু হচ্ছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মস্ত সুবিধে তারা ২-০ খেলায় এগিয়ে তৃতীয় টেস্ট খেলার আসরে নামবে। ইতিপূর্বে ইডেনে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে তিনটি টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার ফলাফল : ১৯৪৮-৪৯ সালে খেলা ড্র ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে জয়ী এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৪৫ রানে জয়ী। ইডেনে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট খেলার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রেকর্ড নীচে দেওয়া হল :

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬১৪ (৫ উইঃ ডিক্লে) ১৯৫৮-৫৯

ভারত : ৩২৫ (৩ উইকেটে) ১৯৪৮-৪৯

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩৬৬ রান ১৯৪৮-৪৯

ভারত : ১২৪ রান ১৯৫৮-৫৯

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৫৬—রোহন কানহাই ১৯৫৮-৫৯

ভারত : ১০৬ মুস্তাক আলী ১৯৪৮-৪৯

সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৬টি) :

১৯৪৮-৪৯ সালে উইকস ১৬২ রান ও ১০১ রান এবং ওয়ালকট ১০৮ রান। ১৯৫৮-৫৯ সালে কানহাই ২৫৬ রান বুচার ১০৩ রান এবং সোবার্স নট আউট ১০৬ রান।

ভারত (১টি) :

১৯৪৮-৪৯ সালে মুস্তাক আলী ১০৬ রান।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ফলাফল ১৯৭৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত

ভারতের

স্থান	খেলা	জয়	হার	ড্র
ভারত	১৫	০	৮	৭
ওঃ ইণ্ডিজ	১৫	৯	৬	৮
মোট :	৩০	৯	১৪	১৫

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান

(দলগত)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ) নিউ দিল্লী ১৯৫৮-৫৯

ভারত : ৬৫৪ নিউদিল্লী ১৯৪৮-৪৯

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংস)

ভারত : ৯৮ ত্রিনিদাদ ১৯৬২

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২১৪ ত্রিনিদাদ ১৯৭০-৭১

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান

(ব্যক্তিগত রান)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৫৬ রোহন কানহাই কলকাতা ১৯৫৮-৫৯

ভারত : ২২০ সুনীল গাভাস্কার ত্রিনিদাদ ১৯৭০-৭১

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান

(ব্যক্তিগত রান)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৭৭৯ (গড় ১১১-২৮) এভার্টন উইকস ১৯৪৮-৪৯

ভারত : ৭৭৪ (১৫৪-৮০)—সুনীল গাভাস্কার ১৯৭০-৭১

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারত : ৯টি (১০২ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৯টি (৯৫ রানে)—জে নোরিগা ত্রিনিদাদ ১৯৭০-৭১

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ভারত : ১১টি (২৩৫ রানে)—বি এস চন্দ্রশেখর, বোম্বাই ১৯৬৬-৬৭

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১১টি (১২৬ রানে)—ওয়েসলি হল, কানপুর ১৯৫৮-৫৯

একটি সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ভারত : ২৭টি (গড় ২৯-২২)—সুভাষ গুপ্তে, ১৯৫৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩০টি (গড় ১৭-৬৬)—ওয়েসলি হল ১৯৫৮-৫৯

সেঞ্চুরী

ভারত : ২৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৪

টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১৬২ ও ১০১ : এভার্টন উইকস, কলকাতা, ১৯৪৮-৪৯

১২৪ ও ২২০ : সুনীল গাভাস্কার ত্রিনিদাদ, ১৯৭০-৭১

ডাবল সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (৩টি) :

২৫৬ রোহন কানহাই, কলকাতা ১৯৫৮-৫৯ ২৩৭ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, জামাইকা ১৯৫৩ ২০৭ এভার্টন উইকস, ত্রিনিদাদ, ১৯৫৩

ভারত (২টি) :

২২০ সুনীল গাভাস্কার ত্রিনিদাদ, ১৯৭০-৭১ ২১২ দিলীপ সরদেশাই কিংস্টন, ১৯৭০-৭১

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

পার্থে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জিতে ২-০ খেলায় এগিয়ে গেছে। উভয় দেশের এই ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট সিরিজের আর চারটি খেলা বাকি আছে। বর্তমানে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল খেলা, ২১৬ অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮৪, ইংল্যান্ডের জয় ৭০ এবং খেলা ড্র ৬২।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল টসে জিতে ইংল্যান্ডকে প্রথম ব্যাট করতে দেন। পেস বোলারদের দাপটে এবারও ইংল্যান্ড কাবু হয়ে পড়ে—২০৮ রাণের মাথায় প্রথম ইনিংস শেষ হয়। উইকেট-কিপার অ্যালেন নট ইংল্যান্ড দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬১ রাণ করেন। খেলার বাকি সামান্য সময়ে অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না-খুইয়ে ১ রাণ করে।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৫২ (৪ উইকেটে)। হাতে ৬টা উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ১৪৪ রানে এগিয়ে যায়। রস এডওয়ার্ডস ৭৯ রান এবং ডগ ওয়ালটার্স ১০৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। অসমাপ্ত ৫ম উইকেটের জুটিতে এডওয়ার্ডস এবং ওয়ালটার্স ১৭০ রান তুলে দেন। দ্বিতীয় দিনের শেষ বলে (বব উইলসের) ৬ রান করে ওয়ালটার্স সেঞ্চুরী (১০৩) পূর্ণ করেন। ওয়ালটার্সের ১০৩ রান করতে ১৩১ মিনিট সময় লাগে। তাঁর ১০৩ রানে ছিল ১১টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী।

তৃতীয় দিনে চা-পানের এক ঘন্টা আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৪৮১ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২০৮ রানের থেকে ২৭৩ রানে এগিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেন রস এডওয়ার্ডস (১১৫ রান)। ওয়ালটার্স তাঁর গত দিনের ১০৩ রানের মাথায় আউট হয়ে যান। খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ১০২ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২৯৩ রানের মাথায় শেষ হলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১ রান তুলতে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং এক উইকেট খুইয়ে ২৩ রান তুলে ৯ উইকেটে জয়ী হয়।

পাঁচ দিনের বরাদ্দ খেলা চতুর্থ দিনেই শেষ হয়ে যায় এবং ৮ম উইকেটের জুটিতে ইংল্যান্ডের দুই বোলার ফ্রেড টিটমাস এবং ক্রিস ওল্ড দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করে ৬৬ রান না তুললে ইংল্যান্ডের ইনিংস পরাজয় হত। বর্ষীয়ান স্পিন বোলার ফ্রেড টিটমাস দলের সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন এবং ফাস্ট বোলার ক্রিস ওল্ড ৪৩ রান করেন। অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলার জেফ টমসন দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ১৩৮ রানে ৭টা উইকেট পান (৪৫ রানে ২ এবং ৯৩ রানে ৫)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ২০৮ রান (ডেভিড লয়েড ৪৯ এবং অ্যালান নট ৫১ রান। গিলি ৪৮ রানে ২, টমসন ৪৫ রানে ২ ওয়াকার ৪৯ রানে ২ এবং ওয়ালটার্স ১৩ রানে ২ উইকেট)

ও ২৯৩ রান (কাউড্রে ৪১, ফ্রেড টিটমাস ৬১ এবং ক্রিস ওল্ড ৪৩ রান। গিলি ৫৯ রানে ২, টমসন ৯৩ রানে ৫ এবং ম্যাসেট ৩২ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : (রেডপাথ ৪১, গ্রেগ চ্যাপেল ৬২, রস এডওয়ার্ডস ১১৫ এবং ডগ ওয়ালটার্স ১০৩ রান। উইলিস ৯২ রানে ২ ওল্ড ৮৫ রানে ৩, টিটমাস ৮৪ রানে ২ এবং আরনল্ড ২৯ রানে ২ উইকেট)

ও ২৩ রান (১ উইকেটে)।

স্লেট থেকে বলছি

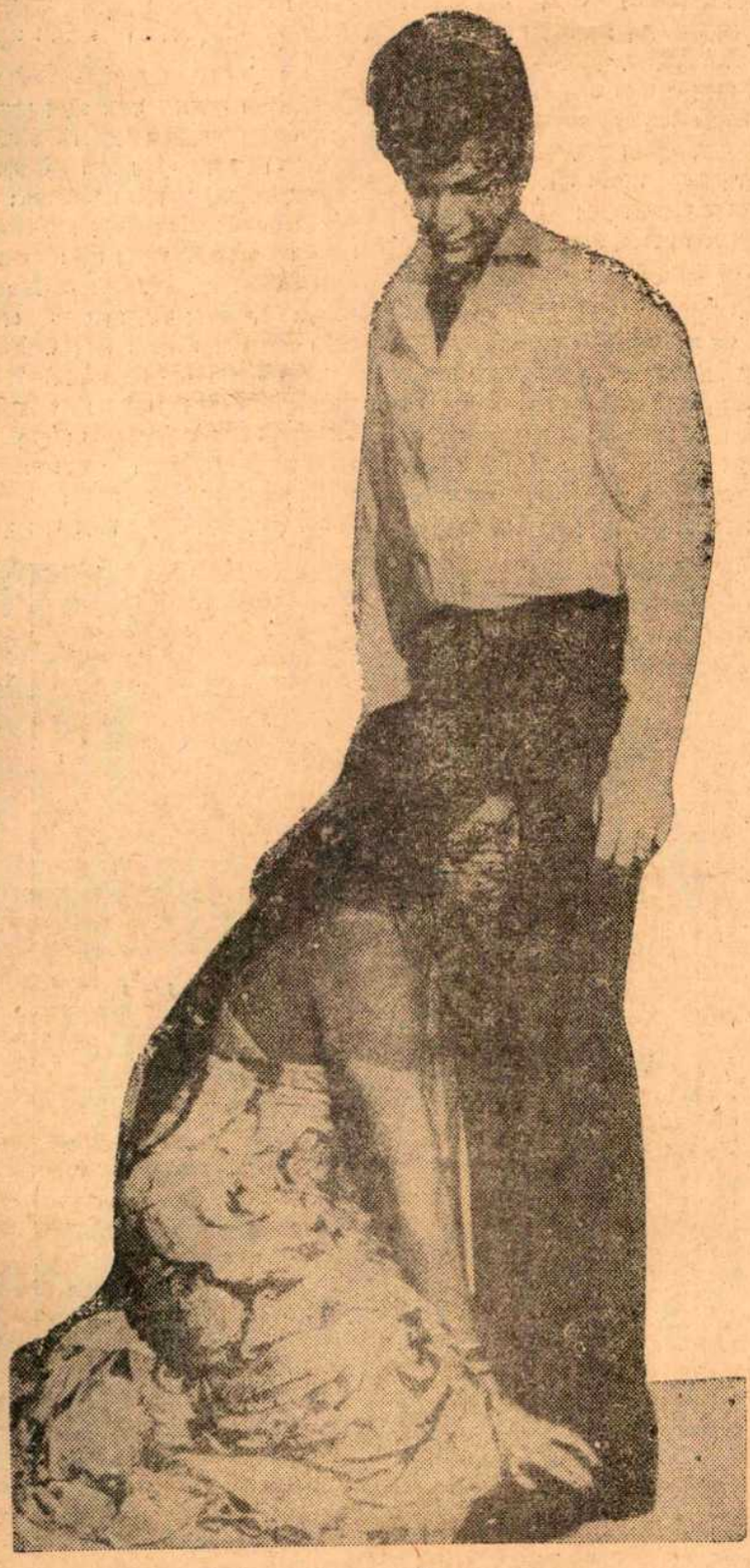

বিদাই / জীতেন্দ্র ও লীলা চন্দ্রভারকর

চারদিক ঘুরে দেখলাম। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন.. দেখে মনে হল, যেন ছুতোর তৈরী কাঠের কুঞ্জবন। দেখলুম, ওরা ঢোকো ঢোকো ঠেঙ্গো ঢালে চলেছে, বুকে পিঠে চ্যাপটা। পা ফেলছে খিট খুট শব্দে। বোধকরি চৌকুনি নূপুর পরেছে পায়ে, তৈরী সেটা তেঁতুল কাঠে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ!

এই হচ্ছে তাসের দেশ। এখানে রাজপুত্র আর সদাগর পুত্রকে দেখা যাচ্ছে। ওরা এইমাত্র এসে উপস্থিত হয়েছে, এই নতুন দেশে। রাজপুত্রের বক্তব্য হচ্ছে ..এক ডাঙ্গা থেকে দিলেন পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ সমুদ্রে, ভেসে উঠলেম আরেক ডাঙ্গায়। এতদিন পর মনে হচ্ছে জীবনের নতুন পর্ব শুরু হল।

রাজপুত্র ঃ ব্যাঙের আরাম এঁদো কুয়োর মধ্যে। এটা বুঝলে না, উঠে এসেছি মরণের তলা থেকে। যম আমাদের ললাটে নতুন জীবনের তিলক পরিয়ে দিলেন।

রাজপুত্রের সব কিছুতেই যেন অবিশ্বাস। তাঁর মনে হচ্ছে এ সবটাই কেমন যেন কাল্পনিক। এটা বানানো। এটা উপর থেকে চাপানো এদের দেশের পণ্ডিতদের হাড়ে-গড়া খোলস। আমরা এসেছি কি করতে—খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে।

সদাগরপুত্র ঃ আমরা সদাগর মানুষ, যা পষ্ট দেখি তার থেকেই দর যাচাই করি। আর যা দেখতে পাওনা তারই ওপর তোমাদের বিশ্বাস। আচ্ছা, দেখা যাক, ছাইয়ের মধ্য থেকে আগুন বেরোয় কিনা। আমার তো মনে হয়, ফুঁ দিতে দিতে দম ফুরিয়ে যাবে। ঐ দেখো, দেখো না, এই দিকেই আসছে—এ যেন মরা দেহে ভূতের নৃত্য।

কাঠের প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠলে দেখা যায় ঐ আসছে। আসছে তাসের দল। ঠিক এই মুহূর্তে তাসের দলের সেই গান যেন আমার কানে ভেসে আসছে...

তোলোন নামোন
পিছন সমান।
বাঁয়ে ডাইনে
চাইনে চাইনে।
বোসোন ওঠোন
ছড়ান গুটোন।
উল্টো-পাল্টা
ঘূর্ণি চালটা—
বাস্! বাস! বাস!

ব্যাপারটা রীতিমত দেখার মতো। লাল উর্দি, কালো উর্দি, উঠছে পড়ছে, শুচ্ছে বসছে, একেবারে অকারণে। ভারী অদ্ভুত। গুহার সামনে দাঁড়িয়েছিল রাজপুত্র আর সদাগর পুত্র। ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। পেছনে তখন কাঠের তৈরী আবস্ট্রাকট ফর্মে চারিদিক। প্ল্যাটফরমের নীচের দিকে তাসের দল। ছক্কা পাঞ্জার সঙ্গে রাজপুত্র আর সদাগরপুত্রের বাক্য বিনিময় ইত্যাদি ইত্যাদি। সদাগর পুত্রের হঠাৎ হঠাৎ হাসি দেখে ছক্কা পাঞ্জা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত।...একি ব্যাপার! হাসি!..লজ্জা নেই তোমাদের! হাসি!...নিয়ম মানো না তোমরা। হাসি!

রাজপুত্র ঃ হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু তোমরা যা করছিলে তার অর্থ নেই যে।

ছক্কা ঃ অর্থ? অর্থের কি দরকার। নিয়ম।...

না, ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে ছবি করার কথা ভাবলে অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নিয়ে ছবি করার কথা ভাবা যায় না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক শুধু ব্যতিক্রম নন। সাহসীও বটে। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ যে ফর্মে লেখা আছে সেইভাবে চিত্রনাট্য ভাবা হয় নি। ভাবা হয়েছে অন্যভাবে। সেটা ঠিক এখনই বিস্তারিত করতে চান না শ্রীগুহ। তবে এটা বললেন স্পষ্টই—রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'-এর যে ইন্টারপ্রিটেশান তাই থাকছে। তার থেকে একচুল নড়ার চেষ্টা নেই।

গত সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে এছবির শুটিং শুরু হয়েছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। ফ্লোরে গিয়েছিলাম। একটা বিরাট অংশ জুড়ে 'তাসের দেশ', এক নতুন দেশের সেট নির্মাণ করা হয়েছে। টুকরো ফ্রেম। অ্যাবস্ট্রাকট ফর্ম। মাঝামাঝি দৃশ্যপট আঁকা। প্রধান সহকারী শঙ্কর ভট্টাচার্য আমাকে সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন। উপরোক্ত যে দৃশ্যটি বর্ণনা করা হয়েছে সেটা দেখা গেল। দেখা গেল পরিচালক প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। নতুন শিল্পীদের নিয়ে কাজ করছেন, সুন্দরভাবে ট্যাকল করছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ ছবির চরিত্রগুলি রূপায়িত করছেন যাঁরা তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই নতুন, বড়জোর একটা কি দুটো ছবিতে কাজ করেছেন। যেমন রাজপুত্রের ভূমিকায় সন্তু মুখোপাধ্যায়—সম্প্রতি তপন সিংহের 'রাজা' ছবিতে কাজ করেছেন। সদাগর পুত্র উজ্জ্বল সেনগুপ্ত উমাপ্রসাদ মৈত্রর 'জয় বাংলাদেশ' এবং অগ্রদূতের 'সোনার খাঁচা' ছবিতে অভিনয় করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

কে বি চিত্রলক্ষ্মী পিকচার্সের ব্যানারে নির্মীয়মান এই ছবির আলোকচিত্রশিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত। শিল্পনির্দেশক ঃ সুধেন্দু রায়। নৃত্যনির্দেশক ঃ অসিত চট্টোপাধ্যায়। কস্টিউম ডিজাইনার ঃ নিতাই ঘোষ। রূপসজ্জা ঃ অনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনা করবেন ঃ অমিত বসু। এছবির সঙ্গীত পরিচালক, পরিচালক শ্রীগুহ নিজেই। গত মাসে এ ছবির অনেকগুলি গান রেকর্ড করা হয়। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন ঃ ঋতু গুহ, সুমিত্রা সেন, গীতা সেন, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, সুশীল মল্লিক এবং গীত-বিতানের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

ছবিটি তোলা হচ্ছে কলারে। আর্থিক সাহায্য দান করেছেন ভারত সরকারের সংস্থা ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন।

গত ন' তারিখ সকাল সাড়ে ন'টার সময় টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর স্কোরিং-এর সামনে দেখি নামী দামী অনেক লোকের মেলা। এগিয়ে যেতেই পরিচালক ইন্দর সেনের সঙ্গে দেখা। তিনি সহাস্যে জানালেন, আজ 'অসময়'-এর শুভসূচনা। গান রেকর্ড করা হবে। কে কে গাইছেন? মান্না দে ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালক কে? আনন্দশঙ্কর। তখনও মান্না দে এসে পৌঁছন নি। সকলের অধীর প্রতীক্ষা চলছে। আমি স্কোরিং-এ প্রবেশ করে দেখি অ্যারেঞ্জার মুলকী ভীষণ ব্যস্ত। কখনও পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান কখনও সেতারবাদকের সামনে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছেন। একসুরে বাঁধার চেষ্টা করছেন। জানা হল নজরুলগীতি। প্রচলিত সুরে গাওয়া হবে।

অভিনেতা স্বরূপ দত্তর সঙ্গে দেখা। তিনি এছবির অন্যতম প্রধান চরিত্রের অভিনেতা। বিমল করের লেখা উপন্যাস 'অসময়' অনেকেই পড়েছেন। 'অবিনকে মনে পড়ছে। হ্যাঁ এই অবিন রূপায়িত করবেন স্বরূপ। 'মোহিনী' অপর্ণা সেন। বলতে গেলে মোহিনী এই উপন্যাসের কেন্দ্রচরিত্র। শচিপতির ভূমিকায় দীপঙ্কর দেকে দেখা যাবে। ইত্যবসরে দীপঙ্কর এসে উপস্থিত হয়েছেন। এলেন বসন্ত চৌধুরী—তিনি জ্যাঠামশাইর চরিত্রে রূপ দেবেন। আরেকটি বিশেষ নারী চরিত্র 'আয়না'র ভূমিকা রূপায়িত করবে মহুয়া রায়চৌধুরী। মহুয়া আসতে পারেনি ওর টেস্ট পরীক্ষা চলছে। একটু বিলম্বে এসে পৌঁছলেন ছবির অন্য দুই

আখরী ডাকু / বিনোদ খান্না

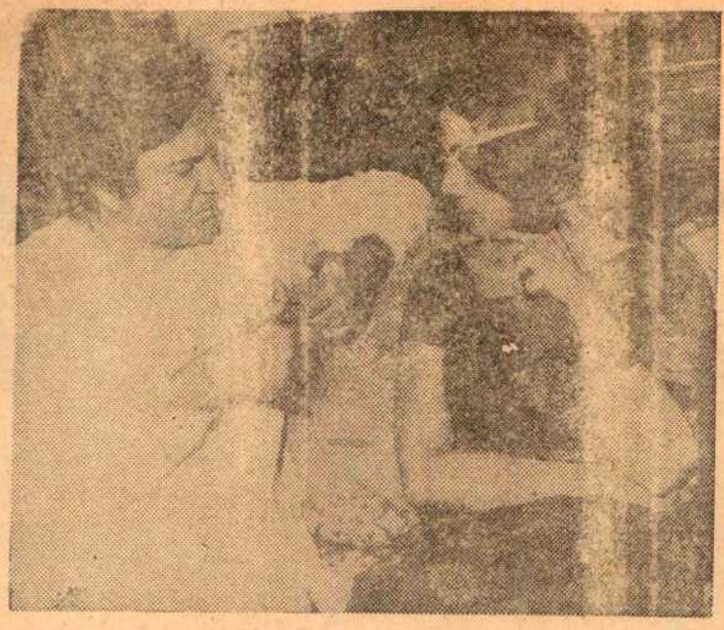

যেই চোখের সেটে / উত্তম/বাসবী। ফটো : অমৃত

তাসের দেশ / উজ্জ্বল সেনগুপ্ত / শন্তু মুখার্জি

ফুলশয্যা / সাবিত্রী / অলোকা / ফটো : অমৃত

নির্বাচিত শিল্পী কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় এবং চিন্ময় রায়।

আপনজন চিত্রের এই প্রথম চলচ্চিত্র 'অসময়'। এর শুটিং কবে থেকে। ইন্দর, মোটামুটি একটা পরিকল্পনা জানালেন। জানুয়ারী মাসেই শুরু করব। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী কলকাতায় ইনডোর-আউটডোর চলবে। মার্চ মাসে একটানা বেশ কিছুদিন আউটডোর শুটি করার ইচ্ছে আছে। লোকেশন এখনও ফিকস-আপ করা হয় নি।.....

এ ছবি নির্মিত হতে চলেছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের আর্থিক সহযোগিতায়। যেমন হয়েছে 'কোরাস'...।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

দক্ষিণ শহরতলীতে একটি কারখানায়, সম্প্রতি পরিচালক স্বদেশ সরকার তাঁর নতুন ছবি 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ'-এর দৃশ্যগ্রহণ করলেন। এই হচ্ছে প্রথম পর্যায়ের দৃশ্যগ্রহণ। অংশগ্রহণ করলেন, শিল্পীদের মধ্যে—দীপঙ্কর দে এবং অনুপকুমার। ক্যামেরায় : কৃষ্ণ চক্রবর্তী। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এই ছবির নায়কাদ্বয় হলেন সন্ধ্যা রায় এবং আরতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : রবি ঘোষ, চিন্ময় রায় এবং উৎপল দত্ত। ইতিমধ্যে কয়েকখানা গান রেকর্ড করা হয়েছে। সঙ্গীত-পরিচালক : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌতম কথাচিত্রমের পতাকা তলে নতুন ছবি 'বৈশাখী ঝড়'-এর শুটিং আরম্ভ হয়েছে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভএ। রাজকুমার মৈত্রের কাহিনী অবলম্বনে অধীর ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন নাবিক গোষ্ঠী। ছবির নায়ক : দীপঙ্কর দে। নায়িকা : রাজশ্রী বসু। প্রযোজনা : শ্রীদেব রায়।

জুপিটার প্রোডাকসন্সের প্রথম চলচ্চিত্র প্রয়াস 'ফুলশয্যা'। কাহিনী : তপোদ্রু গঙ্গোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য-পরিচালনা : সারথী। চিত্রগ্রহণ : বিজয় দে। শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র। সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়। চলতি সপ্তাহ থেকে শুটিং শুরু হয়েছে। চলবে একটানা সাতাশদিন। বেশীর ভাগ অংশ তোলা হবে স্টুডিওর বাইরে। প্রথম দুদিন শুটিং হয় লাউডন স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। আনন্দবেদনার এই ছবি। নায়ক : সুরেন্দ্র। নায়িকা : সাবিত্রী চট্টো-

ধর্মাত্মা / হেমামালিনী / ফিরোজ খান

পাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় : অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, অনুপকুমার, অসীমকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলকা গাঙ্গুলী, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন রায়চৌধুরী বাবলু সমাদ্দার প্রভৃতি। একটি বিশেষ ভূমিকায় : মাধবী মুখোপাধ্যায়। সুর-সংযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন : অসীমা ভট্টাচার্য।

অনতিবিলম্বে আরো একটি নতুন ছবি শুরু হচ্ছে। 'কামনার সুখ দুঃখ'। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা এই নামে বই উপন্যাস অবলম্বনে মঙ্গল চক্রবর্তীর চিত্রনাট্যে পরিচালনা করতে উদ্যোগী হয়েছেন রতীশ সরকার। ইনি মঙ্গলবাবুরই সুযোগ্য সহকারী। এটি তাঁর প্রথম স্বাধীন চিত্রপরিকল্পনা। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে এই ছবির প্রধান তিনটি চরিত্র রূপায়িত করবেন : দীপংকর দে, আরতি ভট্টাচার্য এবং সোমা দে।

ইন্দর সেনের পরিচালনায় আরো একটি ছবি শুরু হবে খুব শিগ্‌গিরই। 'লাল তারাই'। শ্রীপৃথ্বীরাজের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক নিজে। চা-বাগানের পট-ভূমিকায় দৃশ্য বিস্তার করা হয়েছে। প্রধান চরিত্রে রূপ দেবেন শমিত ভঞ্জ। বিশে ডিসেম্বর শুভ সূচনা হয়েছে, সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে। গান রেকর্ড করা হয়েছে। সংগীতপরিচালক দিলীপ রায়। গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠ দেবেন : মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, হৈমন্তী শুক্লা এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ইউনাইটেড মিশনের প্রথম নিবেদন 'ময়না' ফ্লোরে আসতে বেশী দেরী নেই। প্রস্তুতি চলছে। কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় এই মর্মে জানিয়েছেন। ছবির নামভূমিকা রূপায়িত করবেন : সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। নায়ক কে তা এখনো স্থির হয়নি। গান রেকর্ড করা হয়েছে, দু' খানা। সুরারোপ করেছেন : অনুপম মুখোপাধ্যায়। গেয়েছেন : আরতি মুখোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ রায়ের আগামী ছবি কি? এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেল রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' চিত্রায়িত করবেন। এ ছবির নায়িকা চরিত্র রূপায়ণের জন্য নতুন মুখ নেবেন। গত সপ্তাহে কয়েকজনের টেস্ট নেওয়া হয়েছে। ফলাফল এখনো জানা যায় নি।

— তপন সিংহ মহাশয় তাঁর আগামী ছবি স্থির করে ফেলেছেন। 'হারমোনিয়াম'। মিউজিকাল কমেডি করার ইচ্ছে তাঁর। স্বরচিত কাহিনী এবং চিত্রনাট্য। ছবির ভূমিকালিপিতে চেনা-অচেনা মুখের সমাবেশ ঘটবে। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সংগীতগ্রহণের মাধ্যমে এ ছবির শুভ সূচনা হবে।

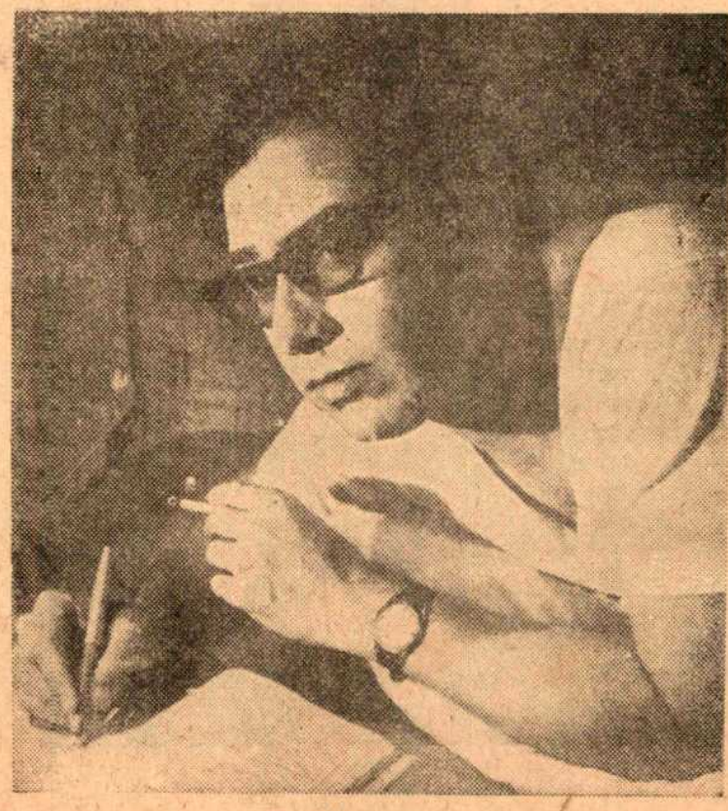

ছুটির ঘন্টা / দিলীপ রায়

সত্যজিৎ রায়ের রঙীন ছবি
সোনার কেল্লা
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

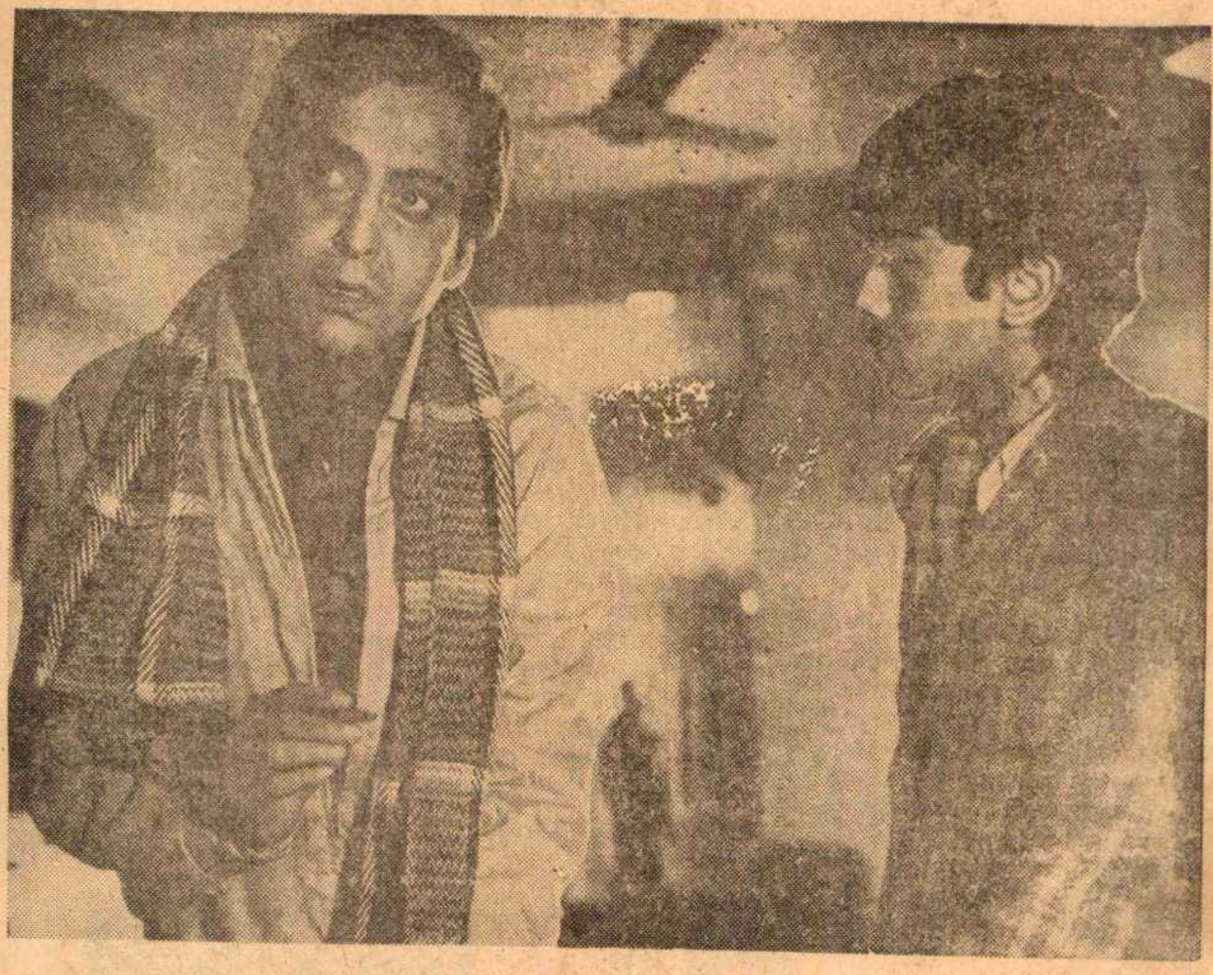

বায়োস্কোপিক

আমি আর সুকুমার, আমরা এই দুজন দাঁড়িয়ে আছি সেই সকাল সাতটা থেকে। সুকুমার তার ক্যামেরা নিয়ে, ভাবখানা যেন সে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, দাঁড়িয়ে পরপর দুটি সিগ্রেট পোড়াল। শীতের সকাল, সুকুমার গলায় ঠিকই স্কার্ফটার জড়িয়ে রেখেছে, বায়োস্কোপের কাভারেজ বলে এমন স্বদেশী কসমো তো কিছু নয়, ঠান্ডা লাগলেই গলা খুকখুক, তখন অ্যান্টিবায়োটিক টেনে টেনে ধন্দুমার, বরং সে বড়ই অস্বস্তিকর, অতএব...

টালিগঞ্জ অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে, নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর মাথায় গোটা রাত ধরে যে হিম ঝরে পড়েছিল, এখন রোদ্দুর যত উঁক হবে আকাশের হাতছানিতে সে হিম বাষ্পের আকারে ঊর্ধ্বগামী, যেন ডানা মেলা পাখীর মত মহাশূন্যে গা ভাসাবে। এরই মধ্যে সংসার সীমান্তের বায়োস্কোপের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সূচনা। স্টুডিওর ফটক ডিঙিয়ে একে একে সব গাড়ি ঢুকছে, আর তা থেকে নামছেন ছবির কলাকুশলী আর শিল্পীরা। উবু হয়ে রোদ পোয়াতে বসা দ্বারোয়ানরা শরীরের আলস্য ঝেড়ে, তীর বেগে ঠেলে উঠে, স্যালুট ঠুকে ঠুকে আবারো রোদে গা এলিয়ে...এই হচ্ছে ব্যাপার।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে মিডিল-টোন; ছবিতে মিডিল-টোন না থাকলে রস থাকে না, রূপটা কোন গতিকে টিকে থাকে মাত্র। বায়োস্কোপের বড় ভাই মিডিল-টোন। ওটা রাখুন, সব বজায় রইল, কিন্তু ওটা ফেলে দিন দেখবেন চকচকে ভাবটা অন্তর্হিত। খাঁটি কথা। সংসার সীমান্তে দাঁড়িয়ে আমার ভাবনা এখন মিডিল-টোন নিয়ে। এই যে গল্পটা ফেঁদেছিলেন একজন কবি-কথাকার, কি আশ্চর্য, মাঝখানে কতগুলো বছর চলে গেল, পৃথিবী থেকে অনেকগুলো রকেট উঠে চাঁদের বুকে মানুষ নামা-ওঠা করিয়ে আবার ফিরে এল, গল্পটি কিন্তু অম্লানই রয়ে গেল এই যে এই মুহূর্ত পর্যন্ত, এই যে এখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি—এই অনুপল পর্যন্ত। যে-যার সীমান্তে এখনও আমরা প্রতিপক্ষের দিকে, যেন রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সোনালি কোন স্বপ্ন দেখার প্রত্যাশায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র কি-জানি কি ভেবেছিলেন, একজন বেশ্যে, আর এক ব্যাটা চোর, ত্রিভুবনে ওদের অস্তিত্বের খাতিরে কবি মানুষ কত মমতার সংগে এমন সব লিখলেন যে এখনও, বিড়ম্বিত ভাগ্য আমি, আমরা ঈর্ষার সংগে ভাবি—আসলে আমিই অঘোর, সামাজিক ভুজ্জ-পাঞ্জায় আমি এক ঠেঁটো চোর, অহর্নিশি মালের সন্ধানে কলকাতার গলিতে-গলিতে ঘুরপাক খাই—ওটা উনি নিশ্চিত আমাকে ভেবেই সেদিন লিখেছিলেন। অঘোরের কত প্রেস্টিজ, শেষ পর্যন্ত সিনেমার পর্দায় এসে গেল, কত তরিবৎ আদর আপ্যায়ন করে বেশ্যে রজনী আর ছিঁচকে চোর অঘোরকে

সেলুলয়েডে এনে ফেলা হচ্ছে, অতএব হরিপদ কেরানী আর নয়—অঘোর চোর হওয়াই ভাল। ন্যাঃ, ভাল আর কি আপদ-মস্তক হয়েই আছি যে!

—কী? সুকুমার সপ্রশ্নে ভ্রূ-ভঙ্গী করল—কি বিড়বিড় করছ?

রঞ্জনের খ্যাক খ্যাক হাসি, শালা যেন ধূর্ত এবং ফচকে শেয়াল, বললে—নিজের ফিউচার ভেবে ইয়ে করছিলাম। চল, চা খাওয়া যাক। খাবে?

—নাঃ, এখন না, পরে। সুকুমার নিজের ক্যামেরার লেন্সে যেন নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখছে।

—আচ্ছা সুকুমার, তোমরা তো ফটো তোলো, ছবির মিডল-টোন গায়েব হয়ে গেলে ইমেজটা কিরকম দাঁড়ায়?

সুকুমার অবাক। ভাবখানা, প্রাতঃকালে বায়োস্কোপের খবর করতে এসে রঞ্জনের শালা যত বাজে হেঁয়ালী। এখন টোন নিয়ে পড়ছে, কিছু পরে দু'পাঁচটা ট্যাকা হাওলাত চাইবে। একেবারে নিশ্চিত। সুকুমার বিষম বিরক্ত হওয়ার ভঙ্গী করে বলল—ওসব এখন থাক।

তবে থাক। আমার বয়েই গেছে। তুমি চিরকাল লেন্স, ফোকাস আর অ্যাপারচার নিয়েই থাকো। দুনিয়ার প্রেস ফটোগ্রাফাররা সবাই এক নয়, কিন্তু আমি আর আমরা কয়েকজন এক। ভাওয়াল সন্ন্যাসী আর অঘোর—আমার কাছে সবই এক কিস্তির মাল। ইতালীতে জন্মালে মিকেলেঞ্জোলো আন্তনিয়নি হয়ত আমিই হতাম, কলকাতায় জন্মে অপরাধ। প্রকৃত অঘোর হয়েও সেই হরিপদ হয়ে আছি। কেন? ব্যাটা স্লাই ফক্স! কিছুতেই জীবনের মিডিল-টোন নিয়ে বাক্য বলবে না। আসলে ভয়ের চোটে অস্থির; বলে যদি ফ্যাসাদ হয়! আরে কত ফ্যাসাদ হবে? যে সমাজে এখন আছি, এটা কি? বানান ভুল হল? মরুক গে। আদি-গঙ্গার ধারে বেউশ্যা পাড়ায় ওই জিনিসটি কিন্তু নেই। অর্থাৎ মিডিল-টোন। চোরের আবার, বেশ্যার আবার জীবন, তায় মিডিল-টোন। যত ফালতু কথা। বেড়েক ভাই, বেড়েক ভাই, লম্পট চোলাইটানা বদমায়েস যেন কাপ্তেনটি সবাই। অথচ বাস্তবে দেখ, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী চাপিয়ে তাতে ইন্টিমেট টেলে গন্ধ মো মো করে আমরা, না না, আমরা নই, বাবুরা সবাই আদি-গঙ্গার জল তরতাজা রুপোলী ইলিশ মাছ দর করছে। ছবি তোলো সুকুমার, তোমার ক্যামেরা বর্তে যাবে হে.....

স্টুডিওতে কার মাথায় যেন কাক ইয়ে করে দিয়ে গেছে, তাই নিয়ে কত হাসাহাসি। প্রাতঃকাল একি কান্ড! একজন ছুটে গেল মেকআপ ঘরের দিকে। দু-তিনজন রূপ-কার, তারা খেটখেটে হয়রান। প্রথমে একগাদা মেয়ের মেকআপ, তারও পর রয়েছে নায়ক নায়িকা। সাত সকালে ক্যান্টিনে আঁচ পড়েছে, চা আর কফির কাপ হাতে হাতে ঘুরছে,

রাগ-অনুরাগ ঃ রঞ্জিৎ মল্লিক / অপর্ণা সেন

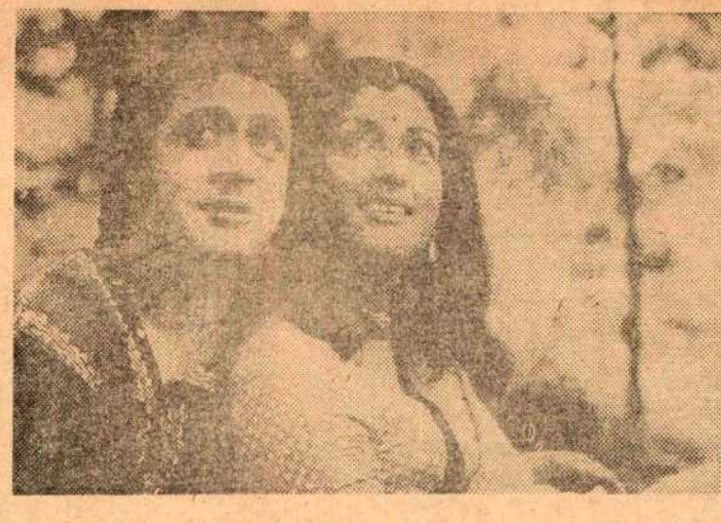

সবাই এক লহমায় উষ্ণ হতে চায়, শীতের জড়তা কাটিয়ে টান টান শরীর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, কিন্তু সব চাইলেই কি আর পাওয়া যায়?

অথচ মাত্র কয়েকটা দিন আগে পর্যন্ত, এখন আপাতত যেখানে কালিঘাটের সেই বারবনিতাদের বস্তিটা, প্রধানত খোলার চালে ছাওয়া, আচমকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ওটা আগাছা জঙ্গলে ভরা স্টুডিওরই একটা মাঠ ছিল। কার্পেন্ট্রি বিভাগের কর্মীরা করাত আর বাটালি দিয়ে কাঠের কাজ করত আর হ্যাঁ-পাখীরা জঙ্গলের গাছ-গাছালির ডালে শীতের সকালে কিছু না কিছু রোদ পুইয়ে হুস হুস খাদ্যের সন্ধানে টালা থেকে টালিগঞ্জের আকাশে উড়ত—সে মাঠের কি বিচিত্র রূপান্তর। একদিন আমি ওখানে গিয়ে অবাক। আরে বাহ, তরুণ মজুমদার তার সহকর্মী-দের নিয়ে, দেখি, ওখানে দাঁড়িয়ে। পাশে শিল্প-নির্দেশক উঃ, রবি চাটুজ্যে, সবাই শলা-পরামর্শ করে সংসার সীমান্ত বায়োস্কোপের সেট তৈরী করছেন। এখানে রজনী থাকবে। আর ব্যাটা চোর অঘোর চুরির দায়ে একদিন পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে পালাতে ঠেলে উঠবি তো ওঠ, সটান রজনীরই ঘরে—এই মাগী, টুঁ শব্দ করবি তো পেট একদম ফাঁসিয়ে দেব।

আতঙ্কে রজনীর চোখ দুটি স্থির।

অর্জুন ঃ স্বরূপ দত্ত / রাজশ্রী বসু।
পরিচালনা—ইন্দর সেন। ফটো ঃ অমৃত।

চোরের হাতে ধারাল লম্বা একটা ছুরি; লম্ফর কাঁপা কাঁপা আলোয় সেটা ঝিলিক হানছে।

ব্যস! যাকে বলে জীবনের মিডিল-টোন, সেলুলয়েডের ফিতেয় মিনিটে নব্বুই ফুট ছাপ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলতেই থাকল।

সাদা অ্যাম্বাসেডর গাড়িটা দৌড়ে এসে ঝুপ করে ব্রেক কষে স্থির হয়ে দাঁড়াল স্টুডিওর লনে। নামলেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি। কব্জি উল্টে কে যেন ঘড়ি দেখলেন। কাটা মিলিয়ে সৌমিত্র এসেছেন শট্ দিতে, প্রসন্ন মুখে। গাড়ি এক্ষুনি ফেরৎ যাবে। গিয়ে ওঁর ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পৌঁছাবে। প্রোডাকশন চীফ দিলীপ ব্যানার্জি, আদতে একজন পাক্কা মাউন্টেনীয়ার, শক্ত পায়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন, সৌমিত্র চ্যাটার্জিকে মৃদু হাসিতে অভ্যর্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে একজন দৌড়ে গেল, এক পেয়ালা গরম কফি চাই.....

সৌমিত্র পাক্কা দেড় ঘন্টা নিলেন। মুখে রং চাপড়ালেই অভিনেতা হওয়া যায় না, অঘোরের রূপসজ্জা নিতে দেড় ঘন্টা সময় লেগেই থাকে, কি করা!

আসল খেলাটা তরুণবাবুর। এটা যদি বায়োস্কোপের গল্প হয়, এই সংসার সীমান্ত, বাবারে, কত হ্যাপা এই কাহিনীতে। সাবেক ব্যাপারটা স্মরণ হয় এখন আমার। কত তাবড় পরিচালক এই গল্পের ওপর কাজ করেছেন। ঋত্বিক ঘটক, রাজেন তরফদার ছাড়া আরও কতিপয়। ঋত্বিক ঘটকের মুখে একদিন এর স্ক্রীন-প্লে শুনেছিলাম, আরিপ্‌বাপ্, শুনে আমার চক্ষুস্থির, এটার নাম বায়োস্কোপ? রাস্টিক, ছন্নছাড়া, বাউন্ডুলে ফেরেব্বাজ অঘোর শালা স্বপ্ন দেখে—রজনীকে বে করে ব্যাটা গেরস্থ হয়েছে, স্বপ্নবৃত্তান্ত আগুনের হল্কার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে ঠেলে আকাশমুখো, আমি চেয়ার উল্টে মাটিতে পড়ে যাই আর কি।

অথচ তরুণ মজুমদার বায়োস্কোপে কত মিষ্টি মধুর কিশোর প্রাণের প্রেম-প্রণয়ের গল্প বলেন, আহা, আর সেই মানুষটি যাহা সংসার সীমান্তে হেঁটে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন, আমার কি ধন্দ! বুকের পাটা নিশ্চিত ইয়াব্বড়, নইলে এ-গল্পে ছবি করা আর আঙুলে বে-মক্কা রক্তমুখী নীলা ধারণ সে প্রায় একই ব্যাপার।

আজনবী / জীনৎ আমান / পরিচালনা : শক্তি সামন্ত

তরুণ মজুমদার চিত্রনাট্য লিখে-টিখে প্রায়ই যেতেন কালিঘাটের ওই বেশ্যে পল্লীতে। নিপাট ভদ্দরলোক, হুট হুট গাড়ি থেকে নেমে গলিতে ঢুকতেই পল্লী-বাসিনীদের মধ্যে কি দারুণ কমোশান—এটা কে-রে বাপ? পুলিশ নয় তো? দেখ দিকি লোকটি কার ঘরে সেঁধুল? মতলবটা কি?

একদিন তরুণবাবু গল্প করছিলেন, বুঝলেন, ওখানে যাওয়াটা মানে জিনিসটা ভালভাবে বুঝে নেবার দরকার ছিল। গোড়ার দিকে ওরা খুব সন্দেহের নজরে দেখত, আমি, আমার সহকারী মিলে একদল মানুষ, ওদের ঘাবড়ে যাবারই কথা। সমাজে ওরা শুধু বঞ্চনার দিকটাই দেখেছে, ওরা প্রতারিত, পরে ওদের সে ভয়টা ভাঙল আমরা বুঝিয়ে বললাম গল্পের দিকটা, ছবির ব্যাপারটা, বলা বাহুল্য ওরা খুশী। তারপর থেকে সবরকম সহযোগিতা পাওয়া গেছে ওদের কাছ থেকে। এইভাবে প্রথমের সেই হার্ডলটা আমি, আমরা উত্তীর্ণ হয়ে গেছি.....

সেট সাজানো হচ্ছিল। তরুণ মজুমদার দাঁড়িয়ে তদারক করছিলেন। বস্তির উঠোনে স্তূপীকৃত জিনিসপত্র। মেয়েরা একদল। তরুণবাবু বলেছিলেন, আপনারা যে-যার ঘর পছন্দ করে নিন। তারপর সাজিয়ে ফেলুন নিজের পছন্দমাফিক।

পদ্ম, গোলাপী বসন-যাইহোক এঁরা শিল্পী কেবল বায়োস্কোপের বারবনিতা সাজা অর্থাৎ প্রিটেন্ড করা, ন্যায্যভাবে প্রিটেন্ড করতে পারলে অভিনেতা একদিন শিল্পী হয়ে যান—এটাই তো থিয়োরী, তাও আবার সজ্ঞানে। দেখি মেয়েরা শাড়ী গাছকোমর বেঁধে নিজের নিজের ঘর সাজাচ্ছেন সযত্নে। হল পরিপাটি বিছানা। দেয়ালে পারা খসা আয়না ঠাকুর দেবতার ছবি। খানকতক এরোটিক ছবি। সস্তার স্নো পাউডার আলতার শিশি শাড়ি রা

ব্রাউজ, সায়া। আর হ্যাঁ, দিশী মদের বোতল। সিঙ্গল রিডের হারমোনি ফেঁসে যাওয়া তবলা। আর যত সাংসারিক দ্রব্য—সিল-ভারের ঘটি বাটি থেকে শুরু করে ঘোড়ার নাল-টি পর্যন্ত। দেহ নিয়ে বেসাতি কত মানুষ আসে-যায়, কত হাসি কান্না মাতলামো প্রতিশ্রুতি এবং আশাভঙ্গ—আদি-গঙ্গার জলে পবিত্র আর নোংরা জল যেমন মিলে-মিশে একাকার, কালি কালি কলকাতাবালী, ওগো ফটোওয়ালা সুকুমার, জীবনের মিডিল-টোন এখানে জন্মের মত নির্বাসিত হল তো খানকতক ফটো তুলে রাস্তার মোড়ের হোর্ডিং-এ টাঙিয়ে দাও, কেল্লা ফতে হয়ে যাবে.....

—বসো রঞ্জন, বসো সুকুমার। স্নিগ্ধ আপ্যায়ন তরুন মজুমদারের—জগদীশ, এদের চা দাও—বলে তনুদা কাজে ডুবে গেলেন। এই বায়োস্কোপটা তনুদাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। জীবনের মস্ত বড় একটা রিয়ালিটী নিয়ে এর পত্তন। বহুল পঠিত গল্প। সবাই ওৎ পেতে আছে। উনি গিয়েছিলেন দিল্লীতে। সেখানে গিয়ে শুনলেন, সত্যজিৎ রায় এখন রাজধানীতে। তনুদা সোজা চলে গেলেন সত্যজিৎবাবুর কাছে। দু'জনের মধ্যে গাঢ় প্রীতির সম্পর্ক। আলোচনা হল শুধু সংসার সীমান্ত নিয়েই। তনুদার কিছু কনফিউশান ছিল, আলোচনায় সেটা দূর হল। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে তনুদা দেখলাম খুবই সচেতন, স্পষ্ট করেই বললেন আমি যে ধরনের গল্পে ছবি করি এটা তা নয়, এটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের গল্প, সুতরাং আমায় খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

ঠিকই! এটা একটা ডিপারচার। তনুদা কিন্তু ঠিকই উৎরে দেবেন বলে প্রত্যয় হচ্ছে। ওঁর প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস আছে। মেকারের আত্মবিশ্বাসই ফিপটি পার্সেন্ট ছবিকে এগিয়ে রাখে, এ-দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি।

এবার এদিকে দেখুন, অদূরে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর বসে দুটি বারবনিতা উকুন বাছছে। সৌমিত্র সহাস্যে—জানেন তো মানুষ উকুন বেছে মেরে ফেলে আর একটা প্রাণী খেয়ে ফেলে—

পাদপূরণ : বাঁদর, বাঁদর।

সৌমিত্র লাঞ্চ সেরে সেটে এসেছেন। মাথার ওপর শীতের সূর্য দ্রুত পশ্চিম দিকে চলছে। হাতে দামী সিগ্রেট জ্বলছে।

ক্যামেরায় বসেছেন তনুদা। আরি-ফ্লেকস ক্যামেরা, লিফ্ট দিয়ে আপাদ-মস্তক মোড়া। আসল ক্যামেরাম্যান রেজা সন্ধ্যা রায়ের মুখে দু' কিলো লাইট ফেলছে—ফুল টাইট ফুল টাইট—

দুখী ইলেকট্রিশীয়ান আলো তৎক্ষণাৎ ফুল টাইট করে দিল। সূর্যের আলোর সঙ্গে কৃত্রিম আলো পাঞ্চ করা হচ্ছে। ওটা ককটেল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

উঠোনে বারবনিতার কেউ বাঘবন্দি খেলছে কেউ পোষা বেড়ালটি জাপ্টে আদর করছে, ট্রানজিস্টার রেডিওতে চটুল হিন্দী গান গাক গাক করে বাজছে, একটা মেয়ে টাইট জিনস পরে হিন্দী বাদ্যের সঙ্গে নাগাড়ে নাচছে, রজনী তখন রান্না চাপিয়েছে সবে। বসে বসে শিল-নোড়ায় বাটনা বাটছে ঘষ ঘষ শব্দে।

হেনকালে অঘোরের আগমন।

দিব্য সাজগোছটি করে রীতিমত বাবু-বাবু ভঙ্গীতে সঙ্গে এনেছে একটা উপহার—জেল্লাদার একখন্ড শাড়ি, সাত সকালেই চোলাইটি টেনে চক্ষুটি রঙিন করে তবে এসেছে মেয়ে মানুষের সান্নিধ্যে—

লেববাবা, কথা কয় না যে ?

রজনী চোখ তুলে দেখে সেই দুরমুশ-মুখো হাড়হাবাতে শয়তানটি আবার এসেছে। বেউশ্যাকে যে ঠকায় সে মানুষ? সে আস্ত একখন্ড জানোয়ার।

অঘোর মিটি মিটি হাসে।

বলে—চিনতে পারলি নে? আমি রে আমি!

বাক্য শেষও হয় না, সট করে মুখটা ঈষৎ বাঁ-কাতে সরিয়ে নেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে বেরিয়ে যায় একটা ফ্যাই মিসাইল—নোড়া নোড়া, আই বাবাগো—কি র‍্যা খুন করবি নাকি?

এই খন্ড দৃশ্য। আমরা দাঁড়িয়ে শালা মাথার ওপর একটা কাক তখন থেকে জ্বালাতন করছে কা-কা-কা, একজন ধাঁ করে আধলা ছুঁড়ে মারল, মর শ্যালা মর শ্যালা-সাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার বললে—হাই ফ্রিকোয়েন্সীতে সব্বার আগে শালা কাগের ডাক রেকর্ড হয়ে যায়, ডায়লাগ ট্র্যাকের তেইশটা বাজিয়ে দিয়ে যায় হুস হুস.....

সৌমিত্র মোড়ার ওপর আরাম করে বসলেন। সপ্রশ্নে তাকালেন আমার দিকে—দেশলাই আছে?

—কী?

—কালা নাকি? তোমার কাছে দিয়াশলাই আছে?

—আছে।

—দাও আর সিগ্রেট চেয়ো না, পাবে না আর মাত্র একটা আছে—

—তুমি বিলিতি সিগ্রেট খাচ্ছো? মিস্যায় ধরবে যে!

—ধরুক।

একটা মেয়ে নিজের বুকের আঁচল সামলাচ্ছে। একজন দেখি শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে, এঃ, বেটা বকধার্মিক, যত শালা পারভার্ট.....

সুকুমার নিজের ব্র্যান্ড থেকে সন্তর্পণে একটা সিগ্রেট বের করে ধরাল। আমি চার-মিনারে মজে আছি। বেশ্যা বাড়িতে...। মাতালরা বাংলাকে বেঙ্গল বলে। এক পাঁট বেঙ্গলে নাকি চাঁদিন নেশা থাকে? একদিন টেনে দেখতে হবে। বৌ-কে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েই অবশ্য। ভদ্দরলোক তো, আসলে আস্ত একজন অঘোর অথচ স্পিরিচুয়াল প্রেপিটজ করেই জীবনটা গেল। কিছু সাধ আহ্লাদ মিটিল না এই সংসার সীমান্তে.....

অদূরে সন্ধ্যা রায় তাঁর চাইনীজ হেয়ার ড্রেসার নিয়ে বসে আছেন। বাংলাটা ভাল বোঝে। কারণ কে যেন একটা রসাত্মক ডায়লাগ ছেড়েছিল, ওমা দেখি মুচকি মুচকি হাসছে চৈনিক রমণী। যাব্‌বাবা।

তখন আমি সৌমিত্রকে : হ্যাভ ইউ এভার বীন টু এ ব্রথেল?

সৌমিত্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আমাকে আই-নো হোয়াট ব্রথেলস আর!

অর্থাৎ সোজা এড়িয়ে গেল। আরে বাবা, ওরা বায়োস্কোপের হিরো সাংবাদিক-দের কি-ভাবে ট্যাকল করতে হয় সে বিদ্যেটা ওদের ভালভাবে রপ্ত করা আছে।

সৌমিত্র : এই, কে আছিস, আমার ইয়েটা নিয়ে আয়!

ইয়েটা এল।

দেখলাম অ্যাস্টাসিড, এক চামচ ডায়োজল খেলেন। যেন সট খাচ্ছে। এঃ!—তুমি কিন্তু এটা লিখবে না। নাঃ। লিখব না। লিখলাম কি।

তনুদা বিরক্ত। সকাল থেকে চেঁচিয়ে গলা ঈষৎ ভেঙেছে। কাকে যেন বললেন—আর পারছি না। এই প্রভু তুমি হেঁকে বল তো—আপনারা উকুন মারুন, উকুন মারুন—

অমনি খাটিয়ার মেয়ে দুটি উকুন মারার অভিনয় করতে আরম্ভ করল, থাকলে তো ছাই মারবে। শাড়িটা সরে সেতেই স্তন দেখা গেল। একজন মৃদু কাশল, মেয়েটি সতর্ক হলো। আবার উকুন মারতে আরম্ভ করল।

সৌমিত্র বললেন—পার্টটা স্বতন্ত্র। ভাল লাগছে না মন্দ লাগছে বলতে পারব না করে যাচ্ছি আন্তরিকভাবে—এই পর্যন্ত বলতে পারি। তবে একটা কথা, প্রায় এক মাসের ওপর এই সেটে আমার কাজ বুঝতেই পারছ তারপরের এক বছর আর মহিলাদের দিকে তাকাব না। মানে তাকাতে পারব না।

ক্যামেরা সন্ধ্যা রায়ের ওপর তখন নিঃশব্দে ট্র্যাক হচ্ছে। তনুদা নিজেই দেখছি অপারেট করছেন, রজনীর ক্রুদ্ধ ভঙ্গি, দৃপ্ত চাউনি কপাল থেকে চুল সরিয়ে নিতে বললেন তনুদা—সন্ধ্যা সরিয়ে দাও, ভাল লাগছে না...

টালিগঞ্জে সন্ধ্যা হতে আরম্ভ করেছে। পাখীরা তাদের ডানায় রোদের তাপ ঝেড়ে ফিরে ফিরে আসছে। গাছের তলায় সংসারের মানুষেরা সব জটলা করছে, ওরা না সরলে এরা ফেরে কি করে? ওরা ওদের সীমান্তে মানুষেরা মানুষের সীমান্তে মাঝখানে এক টুকরো সংসার, সবাই ওখানে যেতে চায় ভালবাসা পেতে চায় দিনের কর্মক্লান্তি মুছে নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিতে চায়, প্রিয়জনকে দুবাহুর আলিঙ্গনের মাঝে ধরতে চায়—এই সেই সংসার হয়ত সঙ সাজাই সার অথবা আরও বড় আরও মহৎ কিছু.....

—রঞ্জন মজুমদার

নাটমঞ্চ

ব্রেখটের ভালোমানুষ

বেরটোল্ট ব্রেখটের নাট্যসাহিত্য কি তার নাটকের অভিনয় বাংলাদেশে নতুন নয়। তবু তার নাটকের বাস্তব পরিবেশন আমাদের নতুন করে উদ্দীপিত যে করে, নান্দীকারের ভালোমানুষ দেখে সে কথা আবার নতুন করে মনে হোল।

বিদেশী নাটক ভাষান্তরিত করে এদেশের মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে পরিবেশন করা খুবই দুরূহ কাজ সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তার কুশীলবকে একেবারে আমাদের নিত্যদিনের দেখা চেনা মানুষের পোষাকে, ভাবনায়, মানসিক গঠনে সাজিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে, আমাদের তাদের সঙ্গে একাত্ম করে দেবার চেষ্টা করা এবং তা অনেকাংশে সার্থক করে তোলা ব্যাপারটা বড় কম কথা নয়।

এব্যাপারে অর্থাৎ নাটকের বাংলা রূপান্তর, গীতরচনা ও তার নির্দেশনার ব্যাপারে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকাংশে সার্থক। বিশেষ করে এর রূপান্তরে। যেখানে ব্রেখট উপস্থিত, কিন্তু তার চরিত্ররা স্বরূপে উপস্থিত নন, অথচ অজিতেশবাবু তাদের আশ্চর্যভাবে বাঙালী করে উপস্থাপিত করেছেন।

সাধারণত মানুষ সৎ থেকে জীবন-যাপন করতেই চায়। নিরীহ, পরের প্রতি সহানুভূতিশীল সাদামাটাভাবে উদার এমন মানুষকেই আমরা ভালোমানুষ বলে থাকি। কিন্তু স্বার্থ ছাড়া নিরঙ্কুশ ভালোমানুষ কি সত্যি সম্ভব? বোধহয়—না। মানুষ দোষে গুণে জড়িয়ে। তাই স্বার্থ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ এসবও তার নিত্যসঙ্গী। এর থেকে পুরোপুরি কোন মানুষেরই উত্তরণ সম্ভব নয়।

আবার অতি ভালোমানুষ থাকাও সম্ভব নয়। প্রয়োজনে তাকে কঠোর হতে হয়।

ভালোমানুষের নায়িকা বেশ্যাও প্রথমে সৎ, পরের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতে চেয়েছিল তার ঘৃণ্য পেশা ছেড়ে। কিন্তু চেনা অচেনা, আত্মীয় অনাত্মীয় কেউই তাকে তা থাকতে দেয় নি। ফলে তাকে বাধ্য হয়েই এক সময় দ্বিতীয় রিপুর আশ্রয় নিয়ে অন্যদের শোষণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কঠোর হতে হয়েছিল। কিন্তু সমাজ কি তা মেনে নেয়?

মূল নাটকের স্রষ্টা ব্রেখট সমস্ত নাটকেই প্রচ্ছন্নভাবে রূপকের ভাষায় তার ইঙ্গিত রেখে গেছেন। যেটাকে ব্যঙ্গ বলেও ধরে নেওয়া চলে।

আর এটাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। এখানেই তিনি অন্য নাট্যকারদের চেয়ে ভাবনায় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চিহ্নিত।

ভালোমানুষ নাটকের কয়েকটি চরিত্রে সুধীন মুখোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, পশুপতি বসু এবং দীপালি চক্রবর্তী

অভিনয়ে দর্শককে আগাগোড়া যিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন তিনি এ নাটকের কেন্দ্রবিন্দু কেয়া চক্রবর্তী অভিনীত দ্বৈত চরিত্রটি। কোনও অভিনেত্রীর পক্ষে পাশাপাশি দুটি চরিত্র—নারী এবং পুরুষ, কোমল এবং রুক্ষ—সমান গুরুত্বে ফুটিয়ে তোলা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ঝটিতি কণ্ঠস্বর ও মেজাজ পাল্টে কয়েকটি দৃশ্যে অভিনয় আমাদের নির্বাক করে রেখেছে। আর সেই অভিনয় নাটকের শেষ পর্যায়ে (যখন শান্তার দেহে মাতৃত্ব পরিস্ফুট, লোকের চোখে সে সন্দেহের পাত্র—সেই সময়কার হঠাৎ পরিবর্তন, কণ্ঠস্বর পাল্টে নারী বা পুরুষ হওয়া কি অন্তরালে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়া) যেন দর্শককে নাটকের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলে। শুধু মনে হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠে একটু অতি নাটকীয় করে ফেলেছেন তিনি অভিনীত চরিত্রটিকে। 'কমার্শিয়াল' নামক শব্দটি এক্ষেত্রে প্রযুক্ত বা প্রতিবন্ধক না হলে এসম্পর্কে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই।

দ্বিতীয় ভালো লাগা চরিত্র রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। এমন স্বচ্ছন্দ অভিনয় স্টেজে

রবিরশ্মি

রবীন্দ্র সংগীতের চার বৎসরের পাঠক্রম **সাগর সেনের** তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী সহযোগে স্বরসাধনা, স্বরলিপি লিখন/পঠন বিভিন্ন পর্যায়ের /চয়ের নির্বাচিত রবীন্দ্র সংগীতের বিশেষ গায়ন পদ্ধতি যত্নসহকারে শেখানো হয়। ছোট ছেলে/মেয়ে-দের জন্য শিশু বিভাগ।

শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারী থেকে শুরু

যোগাযোগ **ননী উপাধ্যায়** সম্পাদক

৪৯নং মহানির্বান রোড কলিঃ-২৯

বুধ/শনি (বিকাল) ও রবিবার (সকালে)

সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষ করে নেচে গান গাওয়ার দৃশ্যটি।

আর মুগ্ধ করেছে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। ছোট্ট, প্রায় গুরুত্বলুপ্ত চরিত্র। কিন্তু নির্বিকার ভালোমানুষের মত তিনি তাকে সারাক্ষণ মঞ্চে উপস্থাপিত করে গেছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—যাঁরা এ নাটকের বলা যায় ব্যালেন্স, তাদের অভিনয় স্বচ্ছন্দ। তাঁদের কস্টুম ও চেহারা অনুযায়ী চরিত্র রূপায়ণ দর্শনীয়।

অন্যান্য টাইপ চরিত্রগুলি কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ফলে নাটকের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে, বস্তুত নাটকের অপরিহার্য অঙ্গই হয়ে গেছেন। এতগুলি বিচ্ছিন্ন চরিত্রকে এমনভাবে গ্রথিত করা নির্দেশকের মুন্সিয়ানারই পরিচায়ক। তবে এতগুলি চরিত্রের কখনও কখনও একত্র সন্নিবেশের ক্ষেত্রে একটু যেন জট পাকিয়ে গেছে। ক্ষেত্রবিশেষে আবার এঁদের প্রতীকীতে চিহ্নিত হয়ে ফ্রিজ হয়ে যাওয়া দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ছোট্ট একটি চরিত্রে পুলিশ আনন্দ চক্রবর্তী চরিত্রটি একটু বাড়াবাড়ি ও ব্যঙ্গাত্মক হলেও আনন্দ দিয়েছে।

গানগুলির কথা এবং তার গ্রন্থি বিস্মিত হয়ে শুনবার মত। বিশেষ করে 'জল নেবে?' এবং আটটি ঘোড়ার গান। কিন্তু সুর এবং পরিবেশনের দিক থেকে আশ্চর্য করেছেন কেয়া চক্রবর্তী তাঁর 'আমি যখন মেয়ে থাকি' গানটিতে।

তবে গানগুলি একটু দীর্ঘ এবং একটানা হওয়াতে (তার ওপর বড় বেশী রিপিটেশন) একটু ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। ফলে এবং নাটকের কতকগুলি ক্ষেত্রে কিঞ্চিদধিক সংলাপ ও দৃশ্য দীর্ঘায়িত হওয়াতে নাটকের কম্প্যাক্টনেস রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়েছে বলে বিশ্বাস। ঠিক যেন এক নিশ্বাসে দেখতে পারলুম না বলে একটু খেদ মনের কোথায় রয়ে যায়।

তবু এই নাটক, এই 'ভালোমানুষ'এর সামগ্রিকভাবে পরিবেশন, এর বক্তব্যের গভীরতা বা ইঙ্গিতময়তা অনুপ্রাণিত করে, একথা অকপটে বলা যায়।

বৃহত্তর দর্শককে এ নাটক আনন্দ এবং ভাবনার খোরাক দিতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই।

রূপসজ্জা (শক্তি সেন) এবং নেপথ্য সঙ্গীত (আনন্দ শঙ্কর) নাটকের পক্ষে সহায়ক। শম্ভু ভট্টাচার্যের নৃত্য পরিকল্পনায় পুনরাবৃত্তি থাকলেও অভিনবত্ব আছে।

নাটকের শেষাংশ যেখানে এনে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, সেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্যের পরের দৃশ্যে নাট্যকার অজিতেশবাবু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ব্রেখটের মত তিনিও এই নাটকের সঠিক কি পরিণতি হবে বা হওয়া উচিত বলতে পারছেন না। অর্থাৎ বাকিটুকু তিনি দর্শকদের বিচারবোধ এবং মানসিকতার ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

আমার মনে হয়, এই ভূমিকাটুকুর কোন অবকাশ ছিল না। কারণ অনিবার্য পরিণতির পর সহজাতভাবেই দর্শকদের মনে পরবর্তী দৃশ্য বা অদৃশ্য ঘটনা গড়ে ওঠে।

কলকাতায় হিন্দী নাট্যোৎসব

কলকাতার সুখ্যাত নাট্যসংস্থা অনামিকার উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর '৭৪ পর্যন্ত কলামন্দিরে এক হিন্দী নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এতে কলকাতার দল ছাড়াও দিল্লী, বারাণসী, জয়পুর ইত্যাদি স্থান থেকে সুখ্যাত নাট্যদল যোগদান করবেন।

হিন্দী নাটক পরিবেশন ছাড়াও উৎসবের বিভিন্ন দিনে এঁরা নাটকের ওপর বিশেষ আলোচনা সভারও ব্যবস্থা করেছেন। এতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সুখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক, সমালোচক অংশ গ্রহণ করবেন।

ভ্রমর থিয়েটার ফোরামের নাট্যসাহিত্য সম্মেলন

গত ৮ই ডিসেম্বর স্টুডেন্টস হল, কলিকাতায় ভ্রমর থিয়েটার ফোরামের ১ম বার্ষিক নাট্যসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। স্বাগতম জানান শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক - সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রধান অতিথি নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত 'নাটক কি ও কেন?' এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। সুদীপ্ত বসু সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে রূপমঞ্চ সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় নাট্যশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ দেন। অধ্যাপক শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য দৃশ্যকাব্যের উপেক্ষিত অংশ প্রহসন নিয়ে আলোচনা করেন। সবশেষে মূল সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর সভাপতির ভাষণে প্রত্যেকের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রাক্তন ফোরাম সভাপতি শ্রীঅমলশঙ্কর রায়।

এ সপ্তাহের ছবি

মজবুর : সুচিত্রা নিবেদিত 'মজবুর' ছবিটি ২৭শে ডিসেম্বর থেকে লাইটহাউস, ম্যাজেস্টিক প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। পরিচালনা : রবি ট্যান্ডন, সঙ্গীত : লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল, অভিনয়ে : অমিতাভ বচ্চন, প্রাণ, পরভীন বার্বি, সুলোচনা প্রভৃতি।

পাথর অউর পায়েল : হরমেশ মালহোত্রা পরিচালিত ডাকাতির এক রহস্যঘন কাহিনী 'পাথর অউর পায়েল' ৩রা জানুয়ারী থেকে হিন্দ ও অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। সঙ্গীত : লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল, অভিনয়ে : ধর্মেন্দ্র, হেমা মালিনী, অজিত, বিনোদ খান্না প্রভৃতি।

আজনবী : সামন্ত এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত 'আজনবী' ছবিটি গত ২৭শে ডিসেম্বর থেকে জ্যোতি ও অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। কাহিনী : গুলশান নন্দা, পরিচালনা : শক্তি সামন্ত সঙ্গীত : আর ডি বর্মন অভিনয়ে : রাজেশ খান্না জীনত আমন যোগিতাবলী প্রেম চোপড়া প্রভৃতি।

'এক যে ছিল রাজকুমারী' : রুশ ভাষা থেকে বাংলাভাষায় রূপান্তরিত 'রূপকথার' ছবিটি এলিট প্রেক্ষাগৃহে বড়দিনের অন্যতম আকর্ষণ।

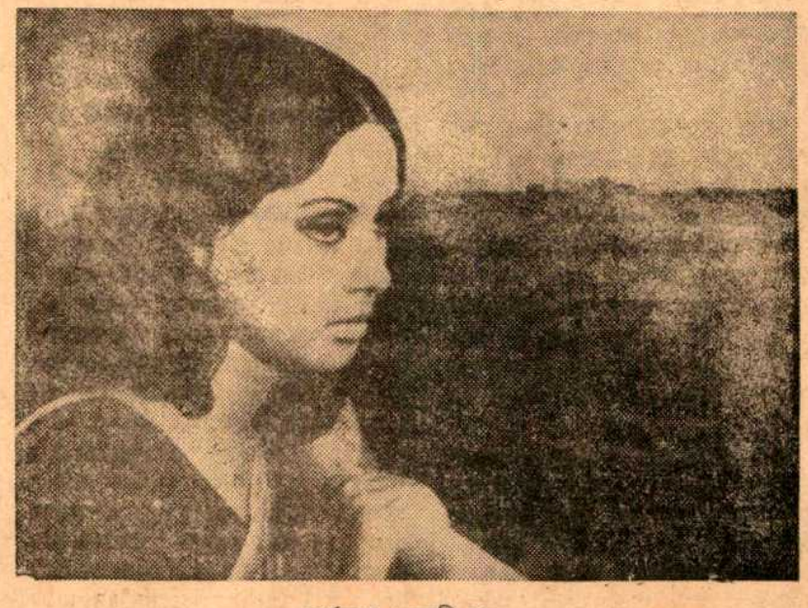

সূর্যকন্যা / জয়শ্রী রায়

কোরাস

প্রযোজনা ঃ **মৃণাল সেন প্রোডাকসন্স পরিচালনায়, আঙ্গিকে এবং অভিনয়ে মৃণাল সেনের নব-ভাবনার ছবি**

মৃণাল সেন যখনই কোন ছবি করেন, দর্শক তাতে সব সময়ই নতুন কিছু ভাবনা প্রত্যাশা করেন। তার একটা প্রধান কারণ শ্রীসেনের ভাবনা এবং প্রচেষ্টা সর্বদাই 'রিয়েলিটি' ভিত্তিক।

এর প্রমাণ আমরা আগে পেয়েছি ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১ এবং পদাতিকে। 'কোরাস'কে সেদিক থেকে পূর্ববর্তী ছবি-গুলিরই অনুসারী বলা যায়। কোরাসে তিনি সেই সব সমস্যা যা তিনি আগের তিনটি ছবিতেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, এখানেও তিনি তারই আর এক দিককে ফ্যান্টাসীর মোড়কে তুলে ধরেছেন।

রিয়েলিটিকে ফ্যান্টাসীর মাধ্যম করে দেখানো চলচ্চিত্র শিল্পে নতুন না হলেও, বলতে বাধা নেই, মৃণাল সেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ এবং মাধ্যম মারফৎ তা আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। ফ্যান্টাসী এবং রিয়েলিটি সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

মৃণাল সেন সব সময়ই স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত এবং গতানুগতিকতা বর্জিত ছবি করে থাকেন। সেই কারণেই তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অসীম। এবং বলতে বাধা নেই, মতভেদ থাকলেও আমরা সর্বদাই তাঁর ছবির গুণগ্রাহী।

কোরাস ছবিতে ছকে বাঁধা কাহিনী না থাকলেও আছে বঞ্চিত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতার টুকরো টুকরো ঘটনা—অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা কোরাসের মতই এক সূত্রে গাঁথা হয়ে একটা বাস্তবভিত্তিক কাহিনীর আকার নিয়েছে। যেখানে শোষিত এবং শাসককে স্পষ্ট আলাদা করে চিহ্নিত করা আদৌ কষ্টকর নয়। এবং সে কাহিনীকে ফ্যান্টাসীর আড়ালে সেলুলয়েডে পরিবেশন করাও কম কৃতিত্বের নয়। মৃণাল সেন সেখানে সার্থক সন্দেহ নেই।

এ ছবিতে হয়তো টেকনিক্যাল গিমিক বেশী ব্যবহৃত হয়েছে, তবুও তিনি কলকাতা-৭১এর মত কোরাসেও একাত্ম হতে পেরেছেন। এ ছবির দুঃসাহসিক বক্তব্যের উপস্থাপন করার ব্যাপারে ও ছবির লক্ষ্যপথ পরিক্রমায় শ্রীসেনের বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনা আমাদের ভাল লেগেছে। এমনকি কাহিনীর খামতিও (মৃণাল সেন ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়) তিনি ঢেকে দিয়েছেন তাঁর বলিষ্ঠ চিত্রনাট্য দিয়ে।

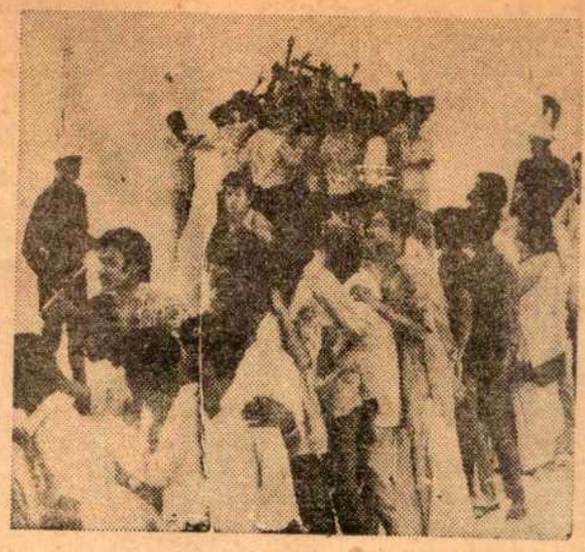

তবে কিছু কিছু প্রতীকী দৃশ্য, বিশেষ করে প্রথমে দেবতা, পরে মুস্কিলআসান এবং শেষে জোকারের আবির্ভাব সাধারণ দর্শকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। শেষ দৃশ্যের আগে কাঁটাতারের বেড়ার ধারে চেয়ারম্যানের ভয়াত আকৃতিও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কিন্তু শহরে, গ্রামে, শিল্পাঞ্চলে ৩০ হাজার চাকুরীর পোষ্টারটি ইদানীংকালের ভয়াবহ বেকারত্বের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অভিনয়—উৎপল দত্ত (চেয়ারম্যান), শেখর চট্টোপাধ্যায় (শ্রমিক নেতা), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (জোতদার), সুপান্থ ভট্টাচার্য (গ্রামের ছেলে), গীতা সেন, স্নিগ্ধা মজুমদার, মুনমুন সেন, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, ননী গাঙ্গুলী, সুব্রত সেনশর্মা, নির্মল ঘোষ ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (সাংবাদিক) এঁদের মিলিত 'কোরাস' সহজে মন থেকে মুছে যাবার নয়। এছবির অন্যতম আকর্ষণ কে-কে-মহজনের বিস্ময়কর আলোকচিত্রগ্রহণ। টেকনিকাল গিমিক থাকলেও, ওঁর প্রতিটি ফ্রেমে দেখা গেছে কাহিনীর বাস্তবতা রূপায়ণের সার্থকতা। গঙ্গাধর নস্করের সম্পাদনাও ছবিটিকে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। গানের সুরে প্রশান্ত ভট্টাচার্য এবং আবহসঙ্গীতে আনন্দশঙ্কর ছবিকে আরো আকর্ষণীয় করতে সাহায্য করেছেন।

মৃণাল সেনের ছবি

বিদেশী ছবি

পোলিশ ছবি 'ইলুমিনেশন' : এবারের পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি (এই সমালোচকের মতে) 'ইলুমিনেশন' মূলত গবেষকের চরিত্র চিত্রণ হলেও নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

ইলুমিনেশনের বোধকরি সঠিক বাংলা তর্জমা হয় না। অন্তত এই ছবির মূল বক্তব্য থেকে আমার তাই মনে হয়েছে।

এমন একটি আলোক রেখা, যা আপনিই প্রজ্জ্বলিত এবং অনির্বাণ—এই অর্থে ইলুমিনেশন অথবা এমন সেই আলোক শিখা—আমরা যাকে জ্ঞান বলি বা দর্শনশাস্ত্র যাকে অদৃশ্য সেই মানবিক আকাঙ্ক্ষা অথবা সূক্ষ্ম চেতনা বলে।

এ-ছবির ভাষ্যকার একে বলেছেন—দার্শনিক জ্ঞান, মানবিক প্রকৃতির বিশ্লেষণ

ইলুমিনেশনের দৃশ্য

এবং সামগ্রিক জীবনের একটা খণ্ড অথচ প্রতীকী চিত্র। এর সঙ্গে একদম বর্তমান কালের বিজ্ঞান চর্চা ও ভিন্ন দৃষ্টিকোণে জীবনকে নিয়ে গবেষণার কথাও এতে বলা হয়েছে। অনিবার্যভাবেই তাই এর মধ্যে ধর্ম, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, সমাজ, সামাজিক চেতনা বোধ ইত্যাদিও এসে পড়েছে।

যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, আমাদের বিদ্যা ও বোধের পরিণতির মূল্যায়ন যার অন্তরালে 'সত্য' নামক কথাটির অস্তিত্ব বিদ্যমান।

ছবিতে গল্পটা দুটি স্তরে বলা হয়েছে। ফ্রান্সিসজেক নামক সেই বিশিষ্ট ছেলেটির বাল্যকাল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত একটি প্রাদেশিক ছোট সহরে কাটে। তখন সে প্রকৃতিকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে দেখেছে। তখন তার চোখে বিস্ময়। তার পরে সে বড় শহরে এসে কলেজের পড়াশুনা শুরু করলে এবং কালক্রমে ফিজিকসে ডকটরেট হোল।

প্রথম বয়সে যে কৌতূহল এবং চেতনা সুপ্ত ছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেটা ক্রমশ উদগ্র হোল। তখন তার একটাই প্রশ্ন, এই জীবন এই দেহ—এর পরে কি?

ডকটরেট হওয়ার পর গবেষণার কাজে লিপ্ত হোল, সেখানেও তার সেই এক কৌতূহল। কাকে যেন সে ধরতে চায়, স্পষ্ট করে অনুভব করতে চায়। সেটা কি? তারই নাম কি 'সত্য'?

সাধারণ মানুষ, তার দৈনন্দিন জীবনযাপন, তার কামনা বাসনা, গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া অস্তিত্ব-লুপ্ত চেতনা, যৌন জীবন থেকে প্রকৃতি—সবার মধ্যেই সে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইল।

গবেষণার পর বাস্তব জীবন, যেখানে রূঢ়তা অভাব বোধ তাকে বাধ্য করল শিক্ষিত হয়েও অতি তুচ্ছ কাজ করতে, যেখানে তার পক্ষে মানিয়ে নেওয়া কষ্টকর, যেখানে 'কমন' মানুষেরা তাকে এড়িয়ে চলত সে সাধারণ মানুষের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া তাদের চেনা লোক নয় ভেবে। যে যেন তার অস্তিত্ব, নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে ফেলবে সেখানে। অথচ সে যখন গভীর নিষ্ঠা নিয়ে ফিজিকস পড়েছে, তার ওপর গবেষণা করেছে, তখন সে ভেবেছিল এর মধ্যে পরম সত্য এবং জীবনবোধের মূল সূত্রটি ছড়িয়ে আছে। তাকেই সে আবিষ্কার করার জন্য স্থিরচিত্ত।

বাস্তব জীবনে এসে সে যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তাহলে কোন্ জীবনটা সত্য! এই যৌন ভিত্তিক স্থূল অতি সাধারণ জীবন—যা পৃথিবীর অধিকাংশ লোক মেনে চলে—নাকি যাকে সে বিশ্বাস করে, সেই এসবের ঊর্ধ্বের জীবন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় তার চেয়ে বয়সে বড় যে মেয়েটি তাকে উত্তেজনার মুহূর্তে সঙ্গ দিয়ে ঘর বেঁধেছিল এবং বাস্তব জীবনে এসে আটপৌরে সংসার পেতে তাকে একটি সন্তান উপহার দিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল—এই জীবনই কি শেষ কথা মানুষের কাছে? এটা যেমন তার কাছে কৌতূহলের তেমনি তার কাছে আর এক বিস্ময় তার এক বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু। যে পাহাড়ে চড়তে চেয়েছিল বলে তার এই মর্মান্তিক পরিণতি।

এই দুটি ঘটনাই তার কাছে সমান বিস্ময়ের। তাহলে জীবনের গূঢ় রহস্য কোথায় নিহিত?

জীবনধারণের জন্য সে কারখানায় চাকরি করেছে। ভেবেছে এটাই সাধারণ মানুষের কাছে শেষ কথা। কিন্তু সেই বিশ্বাসেও একদিন চিড় খেয়েছে। কালক্রমে জটিলতার জীবন থেকে। মস্তিষ্কের কোষ থেকে তার সেই অবাস্তব অথচ দুরারোগ্য ব্যাধিটাকে আবর্তে পড়ে সে উত্তরণ চেয়েছে সেই দূর করার জন্য সে বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হয়েছে। তার চেতনার গ্লাস থেকে সে মুক্তি পায়নি।

সুজানিল কেমো ইণ্ডাষ্ট্রিজ
গণেশনগর, চিঞ্চওয়াড,
পুণা-১৯
EXPRESSO/686 B

ঠগিনী

প্রযোজনা : ছায়াছবি প্রোডাকসন্স

কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয় এবং আঙ্গিকে রমনীয় ছবি

গ্রাম থেকে গ্রামে বিভিন্ন নামে, নতুন সাজে যে মেয়েটি মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়, বিয়ের বাসরে লাজনম্র বধূ সেজে, পরে গয়না গাটি আত্মসাৎ করে ভোর হবার আগেই পালিয়ে যায় যে চতুর মেয়েটি—যার সংগী হোল তারই বাপ এবং তাদেরই আশ্রিত এক পুরুষ—লোকে তাকে ঠগিনী বলে।

কিন্তু সত্যিই কি লোক ঠকানো তার পেশা?

সে তো ভুলতে পারে না তার নিজের অতীত। যখন তাকে বিয়ে না করে বিয়ের আসর থেকে বর উঠে গিয়েছিল, বরকর্তার কঠিন নির্দেশে। অপরাধ, তার বাবা বন্ধুকে উপকার করার জন্যে যে টাকা তাকে ঋণ দিয়েছিল (বিয়ের আগেই তো ফিরিয়ে দেবে এই শর্তে), যথাসময়ে তা ফেরৎ না পাওয়ায় শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল তার বাবা অফিসের ক্যাশ ভাঙ্গতে এবং খবর পেয়ে বিয়ের আসরে পুলিশ এসেছিল।

সেই অপমান, সেই স্মৃতিই তাকে তাড়না করে বেড়িয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে নির্দয়ভাবে অন্যকে ঠকাতে।

কিন্তু ভাগ্যের বিবর্তনে সেই মেয়েই শেষপর্যন্ত এক বাসরে প্রেমের ফাঁদে বন্দী হোল। সেই প্রথম বিয়ের আসরে পলকে দেখে ভালো লাগা পুরুষের হাতেই সে হার মানল। ঠগিনী ধরা পড়ল।

মোটামুটি এই ঠগিনীর গল্পাংশ। চিত্রনাট্যকার, পরিচালক তরুণ মজুমদার সর্বদাই ভিন্ন স্বাদের কাহিনীকে পর্দায় উপস্থাপিত করেন। সুবোধ ঘোষের কাহিনীও তাই তাঁর হাতে পড়ে প্রাণ পেয়েছে।

অভিনয়ে নামভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায়। বাবা এবং আশ্রিত বন্ধুর ভূমিকায় উৎপল দত্ত ও রবি ঘোষ এক কথায় সুন্দর।

অন্যান্য ভূমিকায় অনুপকুমার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, চিন্ময় রায়, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, তপন চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনায় দুলাল দত্ত এবং শিল্পনির্দেশনায় সুনীতি মিত্রর কাজ পরিচ্ছন্ন।

—চিত্রদূত

একদিন একটি রোগীর মৃত্যু তার মনের মধ্যে আবার ঝড় তুলল। সে নিয়ম বাঁধা জীবনের অস্তিত্ব অস্বীকার করবার জন্য পাগল হয়ে উঠল। তার মনে হোল, এই শৃংখলাবদ্ধ জীবনই মানুষের সর্বনাশের মূল। সে সব কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল।

কিন্তু তাতেই কি তার প্রশ্নের উত্তর নিহিত? এর উত্তরের জন্য সে ধর্মযাজকের কাছে গেল। সে তাকে যীশুর কথা বলল, ধর্মের কথা বলল, দর্শনের গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথাও বিস্তারিতভাবে শোনাল। কিন্তু তার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি কোথায়? চার্চের পরিবেশ তাকে অবলম্বন করে আত্মসমর্পণ, কোন কিছুর মধ্যেই সে তার জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেল না।

কোথাও শান্তি না পেয়ে সে আবার তার সংসারে ফিরে এলো, আবার নতুন করে সে পড়াশুনায় মন দিল এবং জীবনটাকে শৃংখলাবদ্ধ করে নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করল। সেই সময়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় মত্ত সেখানে হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ ফেটে পড়তে সহসা তার চেতনা ফিরে এলো এবং তখনই তার মনে হোল যে সে একটা সমাজের মধ্যে বাস করে, অর্থাৎ সে একজন সমাজবদ্ধ মানুষ তাই স্বভাবতই এই সমাজের প্রতি তার কিছু মানবিক দায়িত্বও রয়েছে। এই সত্য তার মধ্যে উদয় হতেই তার দেহ থেকে তার 'বোধ' নামক শত্রুটা বেরিয়ে এল। এবং তখনই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল দেহ এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্যেকার দ্বিধা বা পার্থক্যটা কি। তবু জীবনের মধ্যপথ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার মনের কাছে তার সেই প্রশ্নটা থেকেই যায়—জীবনের সেই গূঢ় রহস্যটা কি, কোথায়ই বা তার অস্তিত্ব।

সাধারণত এমন মেজাজের বই দেখে আমরা অভ্যস্ত নই। কিন্তু একবার যদি কেউ তা আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে, তবে এই দার্শনিক প্রশ্নটা কি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় দর্শকদের মনেও আলোড়ন সৃষ্টি করে না?

ছবি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, যেন ভারতীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েই পরিচালক (রুজটফ্ জানুসি) এই ছবিটি করেছেন।

নায়কের চরিত্রে স্ট্যানিস্ল লাটাল্লোর অভিনয় অসাধারণ।

—শা, র, চ

শতবর্ষের স্মরণীয়

কবি রাজকৃষ্ণ রায় ও বীণা থিয়েটার

কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের জন্ম ১৮৪৯ খৃঃ। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৫ মার্চ রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি স্টার থিয়েটারের সংগে যুক্ত ছিলেন। ১১ মার্চ তাঁর মৃত্যুতে স্টার থিয়েটার বন্ধ রাখা হয়। অভিনেতা হিসেবেও রাজকৃষ্ণ রায় খ্যাত ছিলেন। কেবলমাত্র রচনাশক্তির ওপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল লেখক তখন রাজকৃষ্ণ রায় ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। পাঠ্যপুস্তক

ত্রয়োদশ সংস্করণ বাহির হইল!

জেনারেল প্রিন্টার্স ম্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

COMMON WORDS

: অসংখ্য ছবির সাহায্যে শব্দজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবোধের ব্যবস্থাসহ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য অভিনব সচিত্র ইংরেজি-বাংলা অভিধান :

॥ দাম : চার টাকা ॥

: জেনারেল বুকস্ : এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

রচনা করে অনেকে অবশ্য জীবিকা নির্বাহ করতেন। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নেপথ্য কণ্ঠের প্রবর্তন রাজকৃষ্ণ রায়ই প্রথম করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 'বীণা' নামে কবিতা মাসিক প্রকাশ করেন এবং বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। বসুমতী থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা হয়। ২৭ খানা নাটক তিনি রচনা করেন।

৩৮, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায়ের স্বত্বাধিকারীত্বে বীণা থিয়েটার গড়ে ওঠে। ১০ ডিসেম্বর চন্দ্রহাস নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং শরৎ কর্মকার চরিত্রে নিজে অভিনয় করেন। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর নিজস্ব প্রযোজিত নাটকের স্ত্রী চরিত্রে পেশাদার অভিনেতাদেরই নিয়োগ করতেন। অল্পবয়সী সুন্দর সুন্দর কিশোর বালকদের অভিনয়ের উপযোগী শিক্ষা দিয়ে নিতেন। প্রাচীনপন্থীরা রাজকৃষ্ণ রায়ের এই ব্যবস্থাকে খুবই অভিনন্দিত করেন। কিন্তু পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যেখানে সবাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনেত্রীদের নিয়োগ করতেন—সেক্ষেত্রে বীণা থিয়েটারে স্ত্রী চরিত্রে পুরুষদের অভিনয় বেশীরভাগই সমর্থন করতেন না। ফলে রাজকৃষ্ণবাবুকে বিরুদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়।

রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ চরিত্র বেঙ্গল থিয়েটারে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। চন্দ্রহাস নাটকের পর রাজকৃষ্ণবাবু বীণা থিয়েটারে প্রহ্লাদ নাটকের উপযোগী শিল্পী সংগৃহীত না হওয়াতে রাজকৃষ্ণবাবু অক্ষয়-কালী কোঁয়ারের শরণাপন্ন হন। আর্য নাট্য-সমাজ নামে অক্ষয়বাবুর একটি নাট্য প্রতিষ্ঠান ছিল। অক্ষয়বাবু তাঁর সভ্যদের নিয়ে বীণা থিয়েটারে যোগদান করলেন। ১৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো প্রহ্লাদ চরিত্র। হিরণ্যকশিপু চরিত্রে রাজ-কৃষ্ণ রায়ের অভিনয়ের সবাই প্রশংসা করলেন। এই সময় পা ভেঙে রাজকৃষ্ণ রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ন্যাশনাল থিয়েটারের হিঙ্গুল খাঁ বীণা থিয়েটারের নাটকের সুরে সংযোজনা করতেন। ভণ্ড দলপতির দণ্ড, কুমার বিক্রম, হরিদাস ঠাকুর, ভ্রান্তি বিলাস প্রভৃতি নাটক অভিনীত হবার পর কলি-কাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে ১৮৮৮ খৃঃ ২৬ অকটোবর ন্যাশনাল কংগ্রেস নাম দিয়ে রাজকৃষ্ণবাবু স্বাধীনতার জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে যে নাটক মঞ্চস্থ করেন তা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বীণা থিয়েটার রাজকৃষ্ণ রায়ের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। উপেন্দ্রনাথ দাস এই সময় বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন করে নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার গঠন করে বীণা থিয়েটারে 'দাদা ও আমি' নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন ৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। রচনা ও পরিচালনা ছাড়া উপেন-বাবু অভিনেতারূপেও দেখা দেন।

শরৎ সরোজিনী ও সধবার একাদশী নাটকও উপেনবাবু মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু উপেনবাবু কিছুতেই তার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন না। কবি রাজকৃষ্ণ রায় ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং আর্য নাট্য-সমাজের সহযোগিতায় তাঁর 'মীরাবাঈ' নাটক মঞ্চস্থ করেন ৪ আগস্ট ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। মীরাবাঈ চরিত্রে শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসীকে প্রথমে নির্বাচন করা হয়। রাজকৃষ্ণ রায় এবার স্ত্রী চরিত্র অভিনেত্রীর নির্বাচনকে সমর্থন করেন। কিন্তু কাদম্বিনী মঞ্চে অবতীর্ণা হতে অস্বীকার করেন। তাছাড়া রাজকৃষ্ণ রায় মীরাবাঈ নাটকে ভিন্নধর্মী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। মীরাবাঈ চরিত্রে শরৎকুমার কর্মকারকে নির্বাচন করে তার সঙ্গীতাংশ নেপথ্যে কাদম্বিনীকে দিয়ে গাওয়াবার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন রিহার্সেল চলে। শেষ পর্যন্ত মত পরিবর্তন করে তিনকড়ি দাসীকেই নির্বাচন করেন মীরাবাঈ চরিত্রে।

পরীলীলা হিরন্ময়ী শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা প্রভৃতি নাটক অভিনীত হবার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় আর আর্য নাট্য-সমাজের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় স্টার থিয়েটারে যোগ-দান করেন। স্টার থিয়েটারের একদল শিল্পী নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সিটি থিয়েটার নাম দিয়ে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৬ মে বীণা থিয়েটারে চৈতন্যলীলা নাটক নিয়ে অভি-বাদন জানান। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সিটি থিয়েটার বীণা থিয়েটারে অভিনয় করেন। এর পর সেইটি থিয়েটারে কিছুদিন বীণা থিয়েটারে অভিনয় করেন।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যায় সূর্য / দেবরাজ রায় / রাজশ্রী বসু

শতাব্দীর সংলাপ দেখে আমি মুগ্ধ
—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বরূপার পাশে
বয়েজ ওন হল
সেই উচ্চপ্রশংসিত অসাধারণ নাটক
শতাব্দীর সংলাপ
১লা বুধ, শনি, রবি ৩-১৫ ও ৬-৮৫
বৃহঃ ৬-৪৫
নাটক ও নির্দেশনা ॥ রাখাল দাশ
হলে টিকেট / রূপমায়ার অভিনয়

প্যাট্রী, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বেকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোর্সেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক ঃ
সম্পৎ সেলস্ প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

উদয়শঙ্করের নৃত্য অলঙ্কার

জলসা

বিদেশে ভারতীয় শিল্পের সমাদর প্রসঙ্গে : উদয়শঙ্কর

আপনি প্রায় ১৯বার আমেরিকা গেছেন, গেছেন ইউরোপের নানা দেশে। ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীতের ঐশ্বর্যের প্রতি এদেশের বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আপনি খুলে দিয়েছেন এবং সেই ঐতিহ্যকে আজও অনাহত রেখেছেন রবিশঙ্কর, আলি আকবর। কিন্তু স্বাধীনতা পাবার পর এদেশের আরো অনেক শিল্পী ওদেশে গেছেন। যাবার পথ এখন আগের চেয়ে প্রশস্ত। কিন্তু আংশিকভাবে কিছু সাধুবাদ নিয়ে আসা ছাড়া কোনো ব্যাপক বিপুল, সুদূরপ্রসারী ফল এ'রা সৃষ্টি করতে পারছেন না কেন?' কয়েক দিন আগে এক ঘরোয়া আলোচনায় উদয়শংকরকে প্রশ্ন করেছিলাম।

'এটা শিল্পীদের দোষ নয়' উচ্ছল আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠলেন নৃত্যগুরু। আমাদের পরে যাঁরা ওদেশে গেছেন, এবং এখনও যাঁরা যাচ্ছেন শিল্পী হিসাবে তাঁরা যে কোনো দেশেরই সম্পদ। কিন্তু কোনো শিল্পে মাস্টার হওয়া এক জিনিস আর সেই শিল্পের মর্মের বার্তাকে অন্যের, বিশেষ করে সেই বিশেষ দেশের শিল্প ও সাধনা সম্বন্ধে যাঁদের মনে কোনো সংস্কার বা ধারণা গড়ে ওঠেনি তাঁদের অন্তরে পেঁছে দেবার ক্ষমতাটা আর এক জিনিস। প্রথমটির মত দ্বিতীয়টিও আর একটি আর্ট। এ আর্ট না শিখে বিদেশে সাংস্কৃতিক অভিযানে বেরোনোটা পন্ডশ্রম, শিল্পী যতই উঁচু মানের হোন না কেন?'

'কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'নিশ্চয়ই। কোনো দেশের নাচ বা গান দিয়ে অন্য দেশের মানুষকে জয় করবার সিক্রেসী কি জান? প্রথমেই পান্ডিত্যের অভিমান এবং সংস্কারের গোঁড়ামো থেকে মনকে মুক্ত করে এই সাদা সত্যটুকু সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে—আওয়ার এইম ইজ নট টু টিচ বাট টু মেক দেম ফিল দ্য বিউটি অফ ইনট্রোভার্ট ওয়েলথ অফ আওয়ার আর্ট।' এই ধ্যানই গুরুর মত পথ দেখিয়ে যথাযথ প্রকাশের ফর্মটি বাতলে দেয়।

আমার আগে অনেক ওস্তাদ ওদেশে গেছেন। কিন্তু নিজেদের বাঁধাধরা প্রকাশ-রীতি সম্বন্ধে এ'রা এত নাক উঁচু যে আপন জিদেই এ টু জেড তাঁরা ডেমনস্ট্রেট করে যান, ক্ল্যাসিক্যাল গানে অনভ্যস্ত কানে সেটা ভাল লাগছে কি লাগছে না সে সম্বন্ধে গ্রাহ্য না করে। এটা আমি এক ধরনের স্বার্থপরতা বলেই মনে করি। মনে করি এটা অপরের ধৈর্যের ওপর টরচার করা হচ্ছে। আমাদের দেশের শ্রোতা বা দর্শকদেরই যদি তুমি এ টু জেড উচ্চাংগ সঙ্গীত অথবা কথাকলির দীর্ঘ বিলম্বিত নৃত্য দেখাও তারাই কি সেটা সহ্য করবেন? না, করা সম্ভব? কারণ এখনকার মানুষের ফাস্ট লাইফ। প্রতিদিনের সমস্যাও অন্তহীন। তাই আমি প্রথম যখন ওদেশে বাবাকে (আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব) নিয়ে যাই ওঁকে বুঝিয়ে বলেছিলাম যে খুব অল্প সময়ের বৃত্তে রাগের একেবারে ভেতরের কথাটি ওদের অন্তরে পেঁছে দিতে হবে।

উনি শুধু শিশুর মত সরলই ছিলেন না, খুব স্পোর্টিংও ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাজী। বললেন, আমায় কতক্ষণ বাজাতে হবে বাবা? আমি বললাম ১৫ মিনিট। তারপর ওঁকে বোঝালাম ওরা কি চায়? ওরা রিদমের ভক্ত, রেঞ্জ, ভল্যুম এসবের বৈচিত্র্য ওদের কিভাবে অভিভূত করে। বাবা ঠিক সেইভাবেই ১৫ মিনিটের কম্পাসে তাঁর প্রেজেনটেশনের ফর্ম তৈরী করে নিলেন—দি রেজাল্ট ওয়াজ ট্রিমেন্ডাস। এরপর এনকোর্স আফটার এনকোর। বাবাকে একাধিকবার ২ ঘন্টার মতও বাজাতে হয়েছে এ্যান্ড দে এনজয়েড এভরি মোমেন্ট। তাই বলছিলাম যা বলতে চাই সেটা কিভাবে বলব তার ওপরই ফেলিওর অথবা সাকসেস নির্ভর করে।' একটু থেমে মৃদু হেসে শঙ্কর বললেন, 'কিন্তু তার আগে যাদের কাছে শোনাবে বা দেখাবে তাদের রুচি ও প্রকৃতির প্রতি সম্ভ্রমশীল হতে হবে। ধর কোনো প্রণয়িনী যদি তার কোনো অরুচিকর পাণিপ্রার্থীর কাছে যান, তিনি যান নিজের উগ্রতাকে এতটুকুও না কমিয়ে। কিন্তু যখন তিনি মনের মানুষের কাছে যান, তখন নিজেকে খানিকটা বল্লভের মেজাজমাফিক করে গড়ে নেন না কি?

আমাদের দেশের শিল্পীরা প্রতিভা অথবা শক্তিতে যথার্থই বড়। কিন্তু উপযুক্ত গাইডেন্স শো-ম্যানশিপ অথবা লিডারশিপএর অভাবে তাঁদের যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছেন। এটা খুবই আফশোষের কথা। তাছাড়া গভর্ণমেন্ট যেভাবে এ'দের পাঠাচ্ছেন দ্যাট ইজ অলসো নট দি রাইট ওয়ে।' প্রথমেই শিখতে এবং শেখাতে হবে হোয়াট টু গিভ এ্যান্ড হাউ টু গিভ।' 'এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—অনেকেরই ধারণা শুধু নয় দৃঢ়বিশ্বাস আপনি, রবিশংকর—আপনারা ওদেশে পপুলার হবার জন্য ভারতীয় নৃত্য ও সংগীতে খানিকটা পাশ্চাত্য ঢং এনে ফেলেছেন। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যটা জানতে ইচ্ছে করে।'

'এ ধরনের মন্তব্যে আমার হাসি পায়—আবার দুঃখও হয় এই কথা ভেবে যে হাউ ইগনোরেন্ট তার উই এ্যাবাউট আওয়ার আর্ট এ্যান্ড কালচার—ও'দের আর্টে আমাদের হস্তক্ষেপ ও'রা বরদাস্ত করবেন কেন? দে হ্যাভ দি মাস্টার আর্টিস্টস অফ দেয়ার আর্ট। আর একটা কথা। দে নো দেয়ার আর্ট হাট উই ডু নট নো আওয়ার আর্ট। ইন্ডিয়ান আর্ট ধ্বনি তুলে যাঁরা হৈ হৈ করেন ইন্ডিয়ান আর্ট বস্তুটিকে তাঁরাই সবচেয়ে কম চেনেন। এটা আমার জীবনে বহু পরীক্ষিত সত্য। (স্থানাভাবে উদয়শংকরের বলা উদাহরণগুলি দেওয়া গেলো না)। এইটুকু শুধু জোর গলায় বলতে পারি—আমি যদি ইন্ডিয়ান ডান্সের নামে ওয়েস্টার্ন ডান্স পরিবেশন

করতাম আমি এদেশে ঢুকতে পারতাম না। কিংবা রবু যদি ইণ্ডিয়ান মিউজিকের স্ট্রাকচারকে বিকৃত করে ওয়েস্টার্নাইজড করত তবুও ওদেশে ঢুকতে পারত না। ইট ইজ হিজ গ্রেট এ্যাচিভমেন্ট দ্যাট হি হ্যাজ বিন এবল টু কনভিন্স দেম অফ দি গ্রেটনেস অফ আওয়ার মিউজিক।'

'রবিশংকর ছোটবেলা থেকে আপনার সঙ্গে বহুবার ওদেশে গেছেন, ও'দের মেজাজ রুচি সবকিছুর সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু আপনি? আপনার আগে এ ক্ষেত্রে এরকম ত কোনো পূর্বসূরী ছিলেন না?'

'দেয়ার ইউ আর অ্যাণ্ড ইট ইজ রিয়েলি এ ভেরি টাচিং স্টোরি। প্রথম আমেরিকা যাই থুব সম্ভব ১৯২২ অব্দে। প্রথমে একটা জেদ ছিল আমাদের নাচ আমাদেরই স্পিরিট আর টেকনিককে ওদের ভাল লাগাতেই হবে। আমার স্বপ্ন বিফল হয়নি। শুনলে আশ্চর্য হবে নিউ ইয়র্কে কার্নেগী হলকে ওরা টেম্পেল অফ ওয়েস্টার্ন মিউজিক বলেই জানতেন। ওখানে কোনো দিনও নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়নি। ভাবতে আজও ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতায় সারা মন নত হয়ে আসে যে আমি একজন ভারতীয় শিল্পী। এই ট্রেডিশন ভেঙে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছি। আমি আর আমার ট্রুপই সর্বপ্রথম এই নৃত্য পরিবেশন করে।

আমেরিকানরা স্বভাবতই উচ্ছ্বাসী ও শিল্পপ্রিয় জাত। ওদের হৃদয় সকল শিল্পের আবেদনে সহজেই সাড়া দেয়, দুলে ওঠে। আর কোনো বস্তুকে গ্রহণ করলে ওরা মূল্য দেয় হিসেব না করেই। আমাদের নাচ সম্বন্ধে নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত সমালোচক জন মার্টিন তাঁর বিরাট উচ্ছ্বসিত সমালোচনার এক জায়গায় লিখেছিলেন: 'সারটেনলি নো বডি হ্যাজ টু নো এনিথিং এবাউট দি হিন্দু ডান্স টু এনজয় হিমসেল্ফ। ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং শংকর হ্যাজ হ্যাড এ কিন সেন্স অফ হাউ টু প্রেজেন্ট হিজ আর্ট টু দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্লড, কিপিং ইট অলওয়েজ ইন ট্রু ট্রেডিশন...এ্যারেঞ্জিং হিজ কমপোজিশনস উইথ এ ফুল এ্যাওয়ারনেস অফ হোয়াট দি ওয়েস্টার্ন মাইণ্ড উইল বি এবল টু গ্র্যাসপ অফ ইট। উই ক্যান লার্ণ ইট ফ্রম শংকরস ক্রিয়েশন।'

এই ধরনের অকৃপণ উচ্ছ্বাস পেয়েছি শিকাগো, লস এঞ্জেলস এবং স্টেটের প্রায় সকল বিদগ্ধ সমালোচকের কাছে। আই ওয়াজ সিওর অফ মাই কালচারাল কংকোয়েস্ট অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড। কেন জান? তখন আমরা পরাধীন ভারতের শিল্পী। ইউরোপে সকলেই হীনচক্ষে দেখতেন আমার দেশবাসীকে। আমাদের নেতা গান্ধী জহরলাল সুভাষকে জেলে পুরেছে। ভেতরটা জ্বলেপুড়ে যেতো। আর ভাবতাম ওদের বোঝাতেই হবে যে সংস্কৃতির জগতে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি। দেশের ওপর একটা করুণ কাতর টান অনুভব করতাম। এ্যাণ্ড থ্যাংক গড দ্যাট আই হ্যাভড মাই কান্ট্রি দ্যাট সিনসিয়ারিটি ওয়ারকড মিরাকেল্। ক্রিটিশরা যত অত্যাচার করছে তত পাগল হয়ে উঠছি সারা পৃথিবীকে ভালবাসাতেই হবে আমার দেশকে। এই প্রেরণাই আমার অবিশ্বাস্য সার্থকতায় পৌঁছে দিয়েছিল। ১৯২২ থেকে ১৯৬৮ অবধি ক্রমাগত (প্রায় ৪২ বার সারা পৃথিবী এবং ১৯ বার আমেরিকা) ঘুরেছি।

প্রাক্ স্বাধীনযুগে ওরা আমাদের নাচ ভালবাসত কারণ এর মধ্যে জানবার বোঝবার মুগ্ধ হবার মত প্রচুর সম্পদ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর ওরা খোলাখুলিভাবে ভারতীয় নৃত্য শিখতে চাইল—না চেয়ে পারেনি বলে এর আবেদনে ওদের হৃদয়ে বিপ্লব ঘটে গিয়েছে বলে। আমার জীবনব্যাপী সাধনার এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? ওরা যখন শক্তির বলে ভারত জয়ের নেশায় পাগল, আমি পাগল ওদের জয় করতে আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতির বলে। এ্যাণ্ড আই কেম্ আউট সাক্সেসফুল।'

কোন্ দেশের অ্যাপ্রিশিয়েশন আপনাকে অভিভূত করেছে?'

'সকল দেশেরই। তবে আমরা আবেগপ্রবণ জাত। তাই আমেরিকায় মাইকেল শেখভ্ (সুবিখ্যাত নাট্যকার চেকভের শিল্পী ভাই) এর মন্তব্য আমি আজও ভুলতে পারিনি। আমার গজাসুর নৃত্য দেখার পর কেউ বললেন ওয়াণ্ডারফুল। কেউ বললেন স্টারিং কিন্তু মাইকেল শেখভ বললেন—'সারা নাচটিতে পার্বতীর সঙ্গে অসুরটা তাণ্ডবনৃত্যে কি কাণ্ডটা করে চলেছিল। কিন্তু মহাদেব তার মধ্যেও নিশ্চল নির্বিকার ধ্যানমগ্ন। দি হোল ড্রামাটিক ক্লাইমেকস ওয়াজ দেয়ার। আর একবার কাইজিলার হঠাৎ আমার শো-এ এসে তবলায় আওয়াজ শুনে বলেছিলেন দি কান্ট্রি দ্যাট ক্যান ক্রিয়েট সাচ এ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট কান্ট্রি ইজ ওয়াণ্ডারফুল—ও'দের 'বলেবণী শক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

আসের দেশ প্রযোজনায়—ত্রিবেণী: সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে ত্রিবেণী নিবেদিত 'তাসের দেশ'—এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান, সুমিত্রা সেন ও সাধন গুহর সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনার শিল্পসম্মত ভারসাম্যের কারণে।

কণ্ঠসঙ্গীতে রাজপুত্রের ভূমিকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুই টপ স্টার দেবব্রত বিশ্বাস ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমন্বয় এক আকর্ষণীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল। এতে তাসের দেশের রাজপুত্রের বিদ্রোহী প্রাণোচ্ছলতা, প্রথার বিরুদ্ধে প্রাণের অভিযানকে ত পেয়েছিই। উপরি পাওনা হিসেবে পেয়েছি দুই শিল্পীর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রাজপুত্রের ছবিটি।

আর এক আকর্ষণ হরতনীর ভূমিকায় সুমিত্রা সেনের গান।

সাংবাদিকতার পরিপ্রেক্ষিতে টেক্কানীর ভূমিকায় সুমিত্রা-দুহিতা ইন্দ্রাণী সেনের গান কণ্ঠ ও পরিবেশন দক্ষতায় সারা প্রেক্ষাগৃহকে চমকিত করেছে।

শৈলেন মুখোপাধ্যায় তাঁর উচ্চ মানেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। একক-সঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শক্তিব্রত দাস এবং স্নিগ্ধা কোলেও।

সম্মিলিত গানগুলি সুসংহত হয়েছে সুমিত্রা সেনের সুযোগ্য পরিচালনায়।

নৃত্যে রাজপুত্র ও হরতনীর ভূমিকায় সাধন গুহ ও পলি গুহ প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশেই পূর্ণ করেছেন যদিও এখানে নাচের চেয়ে অভিনয়ের ভূমিকাই মুখ্য। তাপস সেনের আলো, ননী দাশগুপ্তের সজ্জা শুচিব্রত দেবের মঞ্চ রূপায়ণ এবং প্রদীপ ঘোষের ঘোষণা অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সার্থকতার সহায়ক।

যন্ত্রসঙ্গীতে প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চিত্ত মুখোপাধ্যায়, খোকন সেনগুপ্ত, ঘনশ্যাম পাইন, দুর্বাদল চট্টোপাধ্যায়, স্বপন অধিকারী রবীন্দ্র চিন্তার ভাবানুসারী আবহসঙ্গীত রচনায় ছন্দসৌষ্ঠব রেখেছেন।

—চিত্রাঙ্গদা

হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভা দেখতে হলে আজই কিনুন দীপককুমার সরকারের দু'খানি রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী।

রূপতীর্থ রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড ৬·৫০

নন্দন কাননে ৫·৫০

পরিবেশক: ক্লাসিক প্রেস ॥ ৩।১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে [illegible]য় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১২/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 3rd January, 1975
Phone 55-5231 (14 lines)

নতুন
ফরমূলায়
সুন্দর প্যাকে

কুকমী
গুঁড়া মশলা

হ'লো সেই আসল
জিনিষ যার পেছনে
রয়েছে ১২৫ বছরের
অভিজ্ঞতা

১। সর্বাধুনিক মশলা প্রযুক্তি বিদ্যার ফল নতুন প্যাকে আরও উন্নত ধরনের কুকমী গুঁড়া মশলা।
২। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের গবেষণা।
৩। বাজারের অন্যান্য পাঁচটা গুঁড়া মশলা থেকে কুকমী গুঁড়া মশলা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ও খাদ্যপ্রাণ ভরপুর।

আমাদের
অন্য কোন ব্র্যাণ্ড ও
ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)
২২৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৩-০৯২৪ ফ্যাক্টরী—কাশীপুর

iaa/KCD-74

27 JAN 1975

এক নতুন
অনুপম পাউডার!

সুপার ৭৭৭

সোনালী রঙের একমাত্র
কাপড় ধোয়ার ডিটারজেন্ট পাউডার

সুপার ৭৭৭ করে
"সুন্দর সাদা!"

* অন্যান্য দামী ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার পাউডারের থেকে দাম অনেক কম।
* জল যে রকমই হোক—
কাপড় ধোয়া হয় চমৎকার।
* সাদা করার জন্যে নীল বা অন্য কিছু মেশাবার প্রয়োজন নেই।

পয়সা বাঁচান,
বেশী সাদা করুন

Shilpi-DM 10/74 BEN

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ১০৲
গৌরাঙ্গ পরিজন ১২৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
হিমালয়ের পথে পথে ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
অশান্ত ঘূর্ণি ১০৲
কলঙ্ক কথা ৮৲
ছিন্নপত্র ৭৲ ময়ূরমহল ৭॥০
ঝড় ১২৲ নিশিপদ্ম ৭॥০
নীলতারা ৭॥০ নূপুর ৬৲
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ১২৲
সেই মরুপ্রান্তে ১৩৲
কোমল গান্ধার (১ম) ১০৲
কোমল গান্ধার (২য়) ৯৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিযান ৯৲ যোগভ্রষ্ট ৯৲
সন্দীপন পাঠশালা ৯৲
সংকেত ৭৲ উত্তরায়ণ ৭৲
রচনাবলী (৫ম) ২০৲
রচনাবলী (৬ষ্ঠ) ২০৲

জরাসন্ধ
লৌহকপাট (অখণ্ড) ২৫৲
ছায়াতীর্থ ৭৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৮৲

আশাপূর্ণা দেবী
যার যা দাম ৭৲
উড়োপাখী ৮৲

কালিদাস রায়
School Pocket Dictionary - 5.00

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপরাজিত ১৫৲ আরণ্যক ১০৲
আদর্শ হিন্দু হোটেল ৮৲
দেবযান ১০৲
দৃষ্টি প্রদীপ ৮৲
বিভূতি রচনাবলী (৪র্থ) ২০৲
" " (৫ম) ২০
" " (৬ষ্ঠ) ২০৲
" " (৯ম) ২০
" " (১২শ) ২০

সৈয়দ মুজতবা আলী
বড় বাবু ১০৲ টুনিমেম ১২
পছন্দ সই ৯৲ রাজাউজীর ১০৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (১ম) ২০৲

সুমথনাথ ঘোষ
বনরাজিনীলা ১০৲
নীলাঞ্জনা ৯৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
নগর পারে রূপনগর ২৫
স্বয়ংবৃতা ৮৲
শতরূপে দেখা ২০৲

নলিনীকান্ত সরকার
দাদাঠাকুর ৮৲

বিমল মিত্র
একক দশক শতক ২০৲
সখী সমাচার ৮৲
কলকাতা থেকে বলছি ৮৲
বেনারসী ৮৲ কুমারী ব্রত ৬৲
শ্রেষ্ঠ গল্প ৮৲ স্ত্রী ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
বহ্নিবন্যা ১৩৲ দহন ও দীপ্তি ৮৲

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
ঠাকুরদার ঝুলি ৭॥০

প্রমথনাথ বিশী
কেরী সাহেবের মুন্সী ১৫৲
ভূদেব রচনাসম্ভার ১২৲

নীরদ সি, চৌধুরী
বাঙালী জীবনে রমণী ১২৲

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৩৲

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

১৯৭৫ কেমন যাবে ও ভৃগুজাতক পঞ্জিকা ৪৲

বাজারে এই ধরণের কয়েকটি বই বেরিয়েছে। আমাদের প্রকাশিত বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য ভৃগুজাতকের বইটি কিনবার সময় দুটি জিনিস লক্ষ্য করতে অনুরোধ করছি। (১) বইটির শেষদিকে এক বছরের পঞ্জিকা দেওয়া আছে এবং (২) বইটির পিছন দিকে লেখকের ছবি দেওয়া আছে। সহৃদয় ক্রেতারা অবশ্যই এই দু'টি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেবেন।

অনিলেন্দ্রনাথ মিত্রের (মামাবাবু)

ব্যাডমিণ্টন ৪॥ ব্যাডমিণ্টন ও তার নিয়মকানুন ৫॥

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২ ফোন ঃ ৩৪-৩৪১২
৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ৫৩-৮৭৯১

সবচেয়ে সাদা করার জন্যে

টিনোপাল®

সিন্থেটিক ও ব্লেনডেড কাপড়ের জন্যে

টিনোপাল-এস

সুতীর কাপড়ের জন্যে

টিনোপাল

● টিনোপাল সুইজারল্যাণ্ডের সীবা গায়গী লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
সুত্রে গায়গী লিঃ পোঃ অঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ৪০০ ০২০

১৪ বর্ষ

অমৃত

৩৪ সংখ্যা

ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

Friday, 3rd January, 1975 শুক্রবার ১৯ পৌষ ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	মীশুর পুতুল	(গল্প)	শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
১৪	পুনশ্চ		শ্রীক্ষণপলক
১৫	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৭	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১৬	দেশে বিদেশে		পুণ্ডরীক
১৮	গোয়েন্দা বাঁধা		শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
২০	সাপ	(কবিতা)	শ্রীপ্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
২০	ওভারহেড লাইন	(কবিতা)	শ্রীপরেশ মণ্ডল
২০	সহজীবন	(কবিতা)	সামসুল হক
২০	নারকীয়তা ১৯৭২	(কবিতা)	শ্রীপরেশ মণ্ডল
২১	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২৫	যুবক-যুবতী		শ্রীঅমর দাশ
২৭	চিঠিপত্র		
২৯	গোয়েন্দা বাঁধার সমাধান		

অফিস এবং ইন্‌জিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

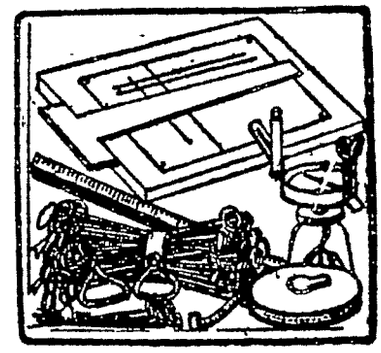

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক স্টেশনারী স্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন ঃ ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪

গ্রাম ঃ ভ্যারাপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া

পরিবেশক ঃ কার্মলিন প্রডাক্টস (স্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকএ মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক ঃ কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.

ফোন ঃ ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAN—KCD-74

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন ঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

মৃগজয়ন্তীবর্ষ তৃতীয় সংখ্যার লেখকসূচী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বঙ্গদর্শন/সূচনা) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনা) হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ), রমা চৌধুরী (রসেশ্বর দর্শন), রমেন্দ্রনাথ মল্লিক (গীতি-কবিতার আলোকে রামমোহন), সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (শিবাজী ও তাঁর রাজ্যাভিষেক) ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক (বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু), অপূর্ব সান্যাল (টেম্পেস্ট সমালোচনা ও রবীন্দ্রনাথ) বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (মহাকবি মিলটন) জয়ন্তকুমার দাস (ডব্লু বি ইয়েটস্), ধীরেন্দ্র দেবনাথ (রবীন্দ্র-উপন্যাস জীবনভাবনার সূত্রসন্ধান), শিবদাস চক্রবর্তী (গ্রন্থসমালোচনা)।

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র । প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

মহাত্মা শিশিরকুমারের

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

নিমাই সন্ন্যাস

(নাটক) ২য় সংস্করণ ২·০০

নরোত্তম চরিত

৩য় সংস্করণ ২·০০

লর্ড গৌরাঙ্গ

(২২টি খণ্ডে) (ইংরাজী) প্রতি খণ্ড ৩·০০

নরোত্তম চরিত

(হিন্দী) ২·০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ *পত্রিকা ভবন*

—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩০	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে	শ্রীদিলীপকুমার রায়
৩২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	শ্রীজরৎকারু
৩৪	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৩৬	রান্না করে দেখুন	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৩৭	শেষ বিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪১	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৩	অদৃশ্য ভট (গল্প)	শ্রীসুবন্ধু ভট্টাচার্য
৪৭	ক্রিকেটের রাজা সোবার্স	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৪৯	টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	শ্রীঅজিতকুমার রায়
৫১	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅমর
৫৩	মাঠের নায়ক	শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫	খেলাধুলা	শ্রীদর্শক
৫৭	প্রেক্ষাগৃহ : ফ্লোর থেকে বলছি	স্টুডিও সংবাদদাতা
৫৯	স্টুডিও সংবাদ	
৬১	বায়োস্কোপিক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬৫	নাট্যমঞ্চ	
৬৭	চিত্র সমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৬৮	বিদেশী ছবি	শ্রী শা, র, চ
৬৯	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৭১	জলসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীনির্মল সাহা

সাহিত্য সংসদ -এর

অভিধান গ্রন্থমালা

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সংশোধিত

SAMSAD STUDENT'S ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

ছাত্রদের অহরহ ব্যবহারের যোগ্য সহজ বহনীয় শব্দকোষ।
[মজবুত সাধারণ বাঁধাই ১১.০০। বোর্ড বাঁধাই ১৪.০০]

SAMSAD ENGLISH- BENGALI DICTIONARY

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ। শব্দের উচ্চারণ ইংরেজি ও বাঙলায় প্রতি শব্দের ব্যুৎপত্তি। [বোর্ডে মজবুত বাঁধাই ২৫.০০]

SAMSAD BENGALI- ENGLISH DICTIONARY

অর্ধলক্ষাধিক শব্দ ও শব্দসমষ্টি। পূর্ণাঙ্গ অভিধান। [বোর্ডে মজবুত বাঁধাই ১৬.০০]

সংসদ বাঙ্গলা অভিধান

তৃতীয় সংস্করণ। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীদীনেশ ভট্টাচার্য সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ কোষগ্রন্থ। [বোর্ডে মজবুত বাঁধাই ১৫.০০]

সিগ্নেট সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯

শীঘ্রই প্রকাশিত হয়েছে
গ্রন্থ সাহেবার ১ম অংশ

জপজী মূল্য—১-২৫ পঃ

অনুবাদ : কবি অমল চক্রবর্তী
প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা

কুমারেশ ঘোষের

॥ রঙ্গ-ব্যঙ্গের নাটক ॥

ম্যানিয়া (ছেলেদের)	৩.৫০
ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল (মেয়েদের)	৪.০০
চক্র (ছেলেমেয়েদের)	২.৫০
যম (বড়দের)	২.৫০
বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস (ঐ)	যন্ত্রস্থ

গ্রন্থ - গৃহ
৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

RUPA PAPER BACKS

NOVELS

Knut Hamsun	
GROWTH OF THE SOIL	5.00
HUNGER, 3rd Edition	5.00
PAN	2.50
Thomas Mann	
THE TRANSPOSED HEADS AND THE BLACK SWAN 2 novels in 1 volume	3.50
Ivo Andric	
THE VIZIER'S ELEPHANT 1) Zeko 2) Anika's time 3) The Vizier's Elephant 3 novels in 1 volume	6.00
Bimal Jyoti Das	
THE ROSE & THE LILY	7.00
Anita Desai	
CRY, THE PEACOCK	5.00
Anais Nin	
CHILDREN OF THE ALBATROSS and THE FOUR CHAMBERED HEART 2 novels in 1 volume	4.50
Goethe	
KINDRED BY CHOICE	4.00
THE SUFFERINGS OF YOUNG WERTHER	2.50
Will Durant	
TRANSITION	4.75
John Cowper Powys	
ALL OR NOTHING	3.00
Rene Puissesseau	
SOMEONE WILL DIE TONIGHT IN THE CARIBBEAN	2.50
Johan Bojer	
THE GREAT HUNGER	3.00

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 012

Also at:
Allahabad : Bombay : Delhi

সম্পাদকীয়

নববর্ষ

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই অমৃতের সকল শুভানুধ্যায়ীদের। নতুন বৎসর সকলের জীবনে আনুক নতুনতর সম্ভাবনা ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ। দুঃখ দৈন্য ও হতাশার স্মৃতি জীর্ণ পাতার মতো মিলিয়ে যাক পুরাতনের বিস্মৃতির অতলে। অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব গোটা পৃথিবীতেই অনেক ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের ছায়াকে করেছে গাঢ়তর। গরীব দেশগুলো তো বটেই সচ্ছল দেশগুলোও এই সংকট থেকে মুক্ত নয়। তবুও মানুষের অগ্রগতির প্রচেষ্টার বিরাম নেই। সে চেষ্টা সামলে চলবে না। কারণ এগিয়ে না যাওয়ার অর্থ হল পিছিয়ে পড়া। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষকে যে-ক্ষমতা এনে দিয়েছে তাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে সুন্দরতর ও বাসযোগ্য করতে হবে।

ঔপনিবেশিকতার বন্ধনে আবদ্ধ দেশগুলোতে মুক্তিসংগ্রাম অব্যাহত চলেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পর্তুগালের মতিগতি পরিবর্তন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে পর্তুগালে চলছিল একনায়কতন্ত্রী শাসন। নিজের দেশের জনতার কণ্ঠরোধ করেই তারা ক্ষান্ত থাকে নি। আফ্রিকায় ছিল তাদের বিরাট উপনিবেশ। পর্তুগালে একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা দখলের পরই আফ্রিকায় উপনিবেশের মুক্তিদানের সংকল্প তাঁরা ঘোষণা করেন। গিনি-বিসাউ মুক্ত হয়েছে; মোজাম্বিকের মুক্তি আসন্ন। অ্যাঙ্গোলাও মুক্ত হবে। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে নতুন পর্তুগীজ সরকার ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। পর্তুগীজ বিদেশমন্ত্রী ভারতে মৈত্রী সফরে আসবেন শিগগিরই।

এদিকে আমাদের এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চলছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে। আমাদের দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অনেক দূর প্রসারিত। ভারতবর্ষ তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে যে আগ্রহের পরিচয় দিয়েছে তার ফলেই শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠায় ও যত্নে পরমাণু বিস্ফোরণ গত বৎসরের একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রতিবেশীদের আশংকা দূর করার জন্য ভারত সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, শান্তিপূর্ণ কাজেই এই শক্তি ব্যবহার করা হবে, অস্ত্র নির্মাণ করা হবে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি কার্যত পূব ও পশ্চিম উভয়ই মেনে চলছে বলতে হবে। দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র রাশিয়া এবং আমেরিকা বার বার নিজেদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করে উত্তেজনা হ্রাস করছে। চীনও আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে আগ্রহী। এ সবই আগামী বছরের পক্ষে আশার কথা। তবে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা হল দারিদ্র্য ব্যাধি এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এই কাজে সমৃদ্ধ দেশগুলোর সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। কিন্তু এখনও সমৃদ্ধ দেশগুলোর বিবেক জাগ্রত হয়েছে বলে মনে হয় না। আমেরিকা তো সাফ বলে দিয়েছে যে সে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য রাষ্ট্রসংঘ তহবিলে কিছু দিতে পারবে না। যদি দিতে হয় সে নিজে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করে দেবে নয়তো নিজের পছন্দমত সংস্থার মারফৎ। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করাতেই আমেরিকা এত খড়্গহস্ত। রাষ্ট্রসংঘ যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং যাঁদের হাতে ভিটো তাঁরা যদি এভাবে রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে অসহযোগিতা করে তাহলে এই বিশ্বসংস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। তা সত্ত্বেও ভারত ও এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দারিদ্র্য, জনসংখ্যার চাপ কিংবা খাদ্যাভাব যে কোনো সমস্যা সমাধানেই আজ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আগের চেয়ে বেশী দরকার। নতুন বছরে সেই সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে, এই আশাই আমরা করব।

যীশুর পুতুল

বীরেন্দ্র দত্ত

মাঝে মাঝে সশব্দ বর্ষণসহ গত তিন দিন বেশ ঝড় বয়ে গেছে। ফিন ফিনে পাতলা কাগজের মত উড়াল কিছু মেঘে এই সকালে বৃষ্টিও হতে পারে, কিন্তু জমাট চাপা দিগন্তজোড়া সাদা মেঘে চারপাশ থমথমে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই কবিতার তাই মনে হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর গিরিশংকরের গজগজ কণ্ঠস্বর কানে এল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। পাশে শুয়ে-থাকা স্বামী দেবেশকে দেখেই মনে মনে বিড়বিড় করল, 'বড়দিভাই কি আজ এখনো ওঠেন নি?' ঘড়ির দিকে তাকাল। এখন সাতটা।

গিরিশংকর আবার চীৎকার করলেন, 'ব্যাপারটা কী? আমাকে এখুনি বেরুতে হবে চা টা তার আগে পাবো না?' এই বয়সেও বাড়ির সকালের দুধ-আনা বাজার দোকান সব নিজে করেন গিরিশংকর। সব সেরে চা-টা ঠিক সময়ে ওঁর চাই।

'কেন চেঁচাচ্ছ সকালবেলা? কে তোমার চাকরাণী আছে যে এমন সাত সকালে প্রত্যেক দিন চা যুগিয়ে যাবে মুখের সামনে? বাইরে গিয়ে খেয়ে নাও। যোগমায়া দেবী চাপা কণ্ঠে শাসন করলেন স্বামীকে। 'যতো বুড়ো হচ্ছ ভীমরতি হচ্ছে তোমার। পোড়া সংসারের হাল দেখছ না। নাকি কানা?

কবিতা দরজা খুলে বাইরে এল। পুরনো জীর্ণ দোতলা বাড়ি। ড্যাম্পের ভ্যাপসা গন্ধ সকালের আবছা অন্ধকারে মিশে কবিতার মুখ চোখ ঢেকে দিল। দোতলার বারান্দা ধরে একটু এগোতেই পাশে মেজদিভাই-এর ঘর চোখে পড়ল। দরজা আধ-ভেজানো। তিন মেয়েকে সামনে নিয়ে চা খাচ্ছে। মেঝের ভাঙ্গা কাপ তোবড়ানো বাটি ছড়ানো। বিছানায় মেজভাসুর নেই, বোধ হয় ভোর হতেই জোর করে তুলে কোন কাজে পাঠিয়ে দিয়েছে বাইরে মেজদিভাই। কবিতার খারাপ লাগল। গতকাল রাত্রের তুমুল ঝগড়ার জের সকাল থেকেই শুরু হয়েছে। এখন কিছু বলতে যাওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া নিত্যনৈমিত্তিক ছোট-বড় ঝগড়ায় নিয়ম হয়ে গেছে কেউ কারোর ঘরে ঢোকে না, কথা বলাও প্রায় বন্ধ, বললেও ঘুরিয়ে। অন্তত কবিতা বছর চারেক আগে এ বাড়ির বউ হয়ে ঢোকার পর থেকেই দেখছে।

নীচে নামার সিঁড়ির কাছে এল কবিতা। সিমেন্ট বাঁধানো সরু সিঁড়ি। জলের ছিটে লেগে মোটা শ্যাওলা-ধরা। দেয়াল থেকে হাত সরিয়ে নিল। বালি ঝুরঝুর করছে। নীচে থেকে মুখ ধুয়ে উঠে আসছে মনু—বড় ভাসুরের মেয়ে। চোখাচোখি হল।

মা ওঠেন নি এখনো?

কাল রাত থেকে যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না।

ও। কবিতা গলায় শব্দ করল। বাবা চা চাইছেন তাই ভাবছি বড়দিভাই তো অনেক আগে ওঠেন, কি হল? একটু থেমে বলল, ঠিক আছে আমি দেখছি। নীচে নেমে এল কবিতা।

গিরিজাশঙ্কর বেরিয়ে এলেন বাইরে। বাইরে যাবার জন্যেই তৈরী হয়েছেন।

আপনি একটু বসুন, আমি চা করে দিচ্ছি। কবিতা শ্বশুরের দিকে না তাকিয়েই বলল।

থাক মা, বাড়ির নিয়ম যখন বদলাচ্ছে তখন যে যার নিজের মত করেই বদলে নিক। আমি এবার থেকে চা-ট বাইরেই খেয়ে নেব। প্রায় আশি বছরের শক্ত-সমর্থ বৃদ্ধ এক অদ্ভুত অভিমানে দৃপ্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন কবিতাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই। গায়ের লোম, মাথার চুল গোঁফ সব শাদা। কবিতা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শ্বশুরের চেহারা, চলে-যাওয়া দেখল।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে খুড়শ্বশুরের একমাত্র ছেলের বউ বাণী। দেখে মনে হল উঠেছে অনেকক্ষণ। কবিতা আড়চোখে একবার দেখে নিল। কথা বলল না। কবিতাকে নোংরা হিংসে করে সেজদিভাই। তাই খুব দরকার না হলে কথা বলে না। বাণী রান্নাঘরে ঢুকল।

বৌমা। যোগমায়া দেবী ডাকলেন।

আমায় বলছেন? কবিতা শাশুড়ীর ঘরের দিকে একটু এগোল।

তোমায় নয় তো কাকে? থামলেন, যোগমায়া দেবী। মেজবৌমা তো দেখলুম উঠেছে অনেক ভোরে। কমলকে চা করে খাওয়ালো, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিজেও খেল। শ্বশুরকে একটু দিতে পারল না? একটু থেমে যেন নিজের মনেই বললেন, আমি যে আর তেমন চলাফেরা করতে পারি না। পারলে ছেলের বউদের তোয়াক্কা করতুম নাকি?

থাক মা, সকালে আর এ সব নিয়ে কথা তুলবেন না। কবিতার কণ্ঠস্বর চাপা, ভয়ার্ত। রান্নাঘরে সেজদিভাই যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। এখন শাশুড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেই আরও কথা তৈরী হবে, গড়াতে গড়াতে ছড়িয়ে পড়বে স্রোতের মত। তাই কবিতা দ্রুতপায়ে কলঘরের দিকে এগোল। আজ ওকেই এখুনি রান্নাঘরে ঢুকতে হবে।

কলঘরে কবিতার মুখ ধোয়ার শব্দ হতেই বাণী এক ফাঁকে বেরিয়ে এল বাইরে। যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি ত্রস্তপায়ে ওপরে উঠে এল।

এই শোন। মেজবৌ শান্তা ডাকল বাণীকে। ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, মা কি বলছিলেন?

তুমি নাকি ভোরে উঠে চা করেছ? শ্বশুরকে দাও নি?

'মাকে কে বলল?

কে আবার। আমার মনে হয় ও-ই তোমায় দেখে গিয়ে লাগিয়েছে'

কিন্তু আমার তো দেওয়ার কথা নয়? কেন, ওঁদের বিনি আদরের বড়বউ তিনি গেলেন কোথায়? তিনিই তো সব সেবাযত্ন করেন! তাঁকে বলছেন না কেন? হুঃ, আদেখলেপনা আর কত দেখব। চোয়াল শক্ত করে থামল শান্তা। তা ছাড়া সংসারের চা-চিনি-দুধ কোথায়? কোত্থেকে দেব? সংসারের জন্যে টাকা ঢালব, আবার নিজেদেরটাও দেব! আমি দিই নি বলে কত কথা। আমি নাকি পয়সা জমাই! না থাকলে আমার মেয়েগুলোকে দেখবে কে?

থাক মেজদিভাই। ঝগড়ার মধ্যে যেও না, ভালো লাগে না।

ঝগড়া আমি করেছি? তুমি তো দেখেছ, কাল বিকেল থেকে আমাকে কি না বলেছে!

থাক না, চুপ করে যান। একটু উৎকর্ণ হল বাণী। ছোট আসছে বোধ হয়। ওকেই তো মা বলছিলেন। একটু থেমে বলল, আমি ছাদে যাই। বলেই বাণী অদৃশ্য হল।

শান্তা গজ গজ করছে, সব সমান। বাইরে ভাল, ভিতরে কি তা জানা আছে। শান্তার ঠোঁটে শ্লেষের হাসি। আমরা খারাপ মুখের ওপর সব বলে ফেলি, এই যা।

কবিতা শুনছে কি শুনছে না বোঝা গেল না। নির্বিকারভাবে ঘরে ঢুকে জানালার সামনে দাঁড়াল।

তেতলার সবটাই ছিল ছাদ। চিলেকোঠা ঘরও ছিল না। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, শোয়া-বসা-পড়াশুনোর জায়গা পায় না বলে একখানা ঘর করোগেটের ছাদ ঢেকে তৈরী করল বড় ছেলে নিখিলেশ। দেখাদেখি মেজ-জায়ের চাপে পড়ে কমলেশও ঘর করে নেয়। ওদের কাকার ছেলে সরোজ। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাকা-কাকিমা অনেকদিন হল মারা গেছেন। সরোজও কবিতাদের ঘরের ছাদে একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছে। ওদের পুরনো ঘরটা নীচের তলায়।

ছাদের ঘরে ঢুকেই বাণী বলল, জান তো, সকাল থেকেই আবার লাগছে।

সরোজ প্রেসের কম্পোজিটর। বাঁধা মাইনের কাজ ছাড়াও ওভার টাইম হিসেবে ঠিকে কাজও করে। বেরুবে বলে থমথমে আকাশ দেখছিল। বলল দেখ তো, ছাতা নিয়ে বেরুব?

হঠাৎ মাথা গরম হল বাণীর। তুমি কিছু বলছ না যে।

কি বলব?

এ বাড়ি ছাড়বে না? বাড়ি করার তো মুরোদ নেই, একটা ফ্ল্যাট কেনারও তো চেষ্টা করতে পার!

হাসল সরোজ। মশা আবার পাখি! প্রেসের কম্পোজিটার, তার আবার ফ্ল্যাট কেনা! বাজারটা দেখেছ? সংসারই চলে না' একটু থেমে চোখের দৃষ্টি চশমার পুরু লেন্সে রেখে তাকাল বাণীর দিকে। বিশ্রী ভেঙানোর মত মুখভঙ্গি করে বলল, এ বাড়িটা ছাড়ো, আর অন্যে ভোগ করুক। ছাড়লেই বেওয়ারিশ তখন? সরোজের চোয়াল-ভাঙা রুক্ষ বুড়োটে মুখ কেমন হঠাৎ স্রেন বহু-দিনের জমা বিরক্তিতে ভয়ংকর হয়ে গেল। তোমাদের ওই মেয়েলি ঘ্যানঘ্যানানি শুনিও না যত্তো সব—।

বাণী সরে গেল সরোজের কাছ থেকে। জানালায় মুখ চেপে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। দু চোখের পাতা ভিজে, ভারী। অসহায় অভিমান সামলে যেন নিজের মনেই বলল, 'ছোট ভাইয়ের মত নির্বিকার হতে চাইছ? আগে ছোট ভাইয়ের মত উপায় করতে শেখ, তবে হবে। সংসারে যাদের হাতে প্রচুর টাকা থাকে, তাদের নির্বি-কার হওয়া সাজে।' থামল বাণী। 'কি আছে, ছোট ভাইয়ের মত লেখা-পড়াও শেখনি।'

এরপরেই একটা ধমকের শব্দ কানে এল কবিতার। সরোজ চেঁচিয়ে উঠেছে। তার-পরের কোন কথা শোনা গেল না। তিন তলায় সরোজের ঘরটা ঠিক কবিতাদের ঘরের ওপরে বলেই এতক্ষণ স্পষ্ট কথাগুলো কানে আসছিল। বাণীকে অদ্ভুত লাগে। কিছুতেই সহ্য করতে পারে না ওদের। কবিতা আপন মনে হাসল। সিঁড়িতে সেজ-ভাসুরের পায়ের শব্দ ক্রমশ নামছে। কবিতা পিছন ফিরল। উপুড় হয়ে শুয়ে-থাকা দেবেশের দিকে চোখ পড়ল। মানুষটা যেমন সমস্ত বিষয়ে নির্বিকার, এর শোয়া-ঘুমোনও তেমনি। এখনি তো উঠবে, মুখ-হাত ধুয়ে চা হল কি হল না জেনে নিয়ে বেরিয়ে যাবে বাইরে। পুরনো বাড়ির দেয়াল কত পুরনো হল, কত ঘুণ ধরেছে, একদিনও তা দেখে না। পুরুষ মানুষ বুঝি এই রকমই ভাল? চার বছর ধরে দেখছে মানুষটাকে। কবিতা হাসল। দেবেশের হাতের শক্ত মুঠি বুক পিঠে দুই ঠোঁটে চোখ বুলোল। নাকের নীচে সিঁদুরে লেপটে আছে, আঙুলের ডগায়ও। চকিতে নিজের ঠোঁটে আঙুল বোলালো। কি ভেবে পরার কাপড় বদলাতে লাগল। এখনি রান্নাঘরে ঢুকবে।

কবিতা উনুন সাজিয়ে কাগজ জ্বেলে ধরিয়ে দিয়েছে, মনু সামনে এসে দাঁড়াল। 'ছোট্‌কাকিমা, আঁচটা উঠলে বোলো, মা আসবে।'

'দরকার কি? মায়ের যখন এত শরীর খারাপ।' একটু থামল কবিতা। 'বরং তুমি এসো এক সময়ে। আবার তোমারও তো কলেজ, টিউশনি—'

'তাতে কি? আচ্ছা মাকে আমি বারণ করছি। তুমি বরং আমাকে ডেকো। ছাদে আছি। একটা দিন তো!'

'তাই ডাকব।'

মনু চলে গেলে কবিতা আনাজ কুটতে বসল বাইরে। চুন-বালি খসেপড়া দেয়াল, ড্যাম্প-শ্যাওলায় নোংরা, ফেটে চৌচির মেঝেয় ঘুপসি রান্নাঘর। উনুন জ্বললে বসা যায় না। বাইরেও ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে, মেজ-জা শান্তা পায়ে শব্দ তুলে সামনে এসে দাঁড়াল।

'ছোট, বলে রাখি, বড়দিভাই রাঁধলে আমি এখানে খাব না, আমার ছেলেমেয়েরাও না।'

কবিতা আচমকা প্রস্তাবে কি বলবে ভেবে পেলো না। নির্বিকার তাকিয়ে রইল শান্তার দিকে।

'তুমি রাঁধছ?'

'হ্যাঁ।'

'তবে এই যে শুনলাম, বড়দি রাঁধবেন। সেজ বলছিল। তা যদি হয়, আমি ঘরে স্টোভ জ্বেলে রেঁধে নিচ্ছি। এই বলে গেলুম।' যেমনভাবে এসেছিল, সেই ভাবেই দৃষ্টির আড়াল হল শান্তা। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, পিছু পিছু বাণীও অদৃশ্য হল।

এমন ঝগড়া নতুন নয়। বছর চারেক আগে এ বাড়িতে প্রথম ঢোকার কদিনের মধ্যেই কবিতা বুঝেছিল। দিনের পর দিন নিত্য নতুন অভাবের মধ্যে ক্রমশ ভাঙতে ভাঙতে চার ছেলে মেয়ে নিয়ে বড়জা ব্যতি-ব্যস্ত। মেজজা শান্তার তিন মেয়ে। বড়-জার সঙ্গে মেজজার সম্পর্ক তেমন সহজ নয়। মেজ ভাসুর কমল সামান্য মাইনের চাকরী করত। ইউনিয়নের গোলমালে হঠাৎ চাকরী চলে যেতে বেশ কিছুদিন বেকার থাকার পর এখন কিছু ফাটকা

করেন। কবিতা নিজের বুদ্ধিতেই আন্দাজ করেছিল, দেবেশও দাদার স্মাগলিং-এর কথা ওকে বলেছে। বেশ কিছু কাঁচা টাকা হাতে আসে মেজজা বাড়িতে তো নয়ই, কাউকেই বুঝতে দেয় না। কোথায় যেন জমি কিনেছে। সেজ বাণী এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে কোনরকমে সংসার চালায়। বাপের বাড়ির সচ্ছল পরিবেশে আদুরে ছোট মেয়ে ছিল বাণী। তারই স্মৃতি এই ধ্বংসে যাওয়া শ্বশুর বাড়িতে দুর্ভিক্ষের মত সেজ-জায়ের স্বভাবের মধ্যে কি তৈরী করে দিয়েছে? অহংকার, দম্ভ দেমাক? নাকি ভয়ংকর অসহিষ্ণুতার মধ্যে নোংরা হিংসা?

কবিতা সচেতন হল। বাঁ হাতের আঙুলটা হঠাৎ একটু কেটে গেল। ডান হাত দিয়ে কেটে যাওয়া জায়গাটা চেপে ধরে কবিতা চারপাশ দেখল। বেলা হয়েছে তবু বাড়ির থমথমে পরিবেশ এতটুকু সরে নি। দেবেশ এখনো ঘুমাচ্ছে। হাসল কবিতা। ভাইদের মধ্যে এমন সুখী কিসে? বি-কম পাশ সুন্দর দেখতে, ব্যাঙ্কের চাকরী—এ সবের মধ্যেও দেবেশ নিজের স্ত্রী ছাড়া বাড়ি আর বাড়ির বাইরে অদ্ভুত নির্বিকার। কাল বিকেলে অফিস-ফেরত অমন নোংরা ঝগড়া, গোলমালের মধ্যেও।..

শান্তা। শৈলজা শান্তার ঘর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। সাবানদানিটা ভুল করে কলঘরে রেখে এসেছি দীপু ওটা মাখল। ও জানে ওর গায়ে নোংরা ঘা আছে। সারা বাড়ি ছড়াবে।

কি যা তা বলছেন বড়দি? ও কেন মাখতে যাবে? ও তো নিজের সাবান নিয়ে কলঘরে ঢুকেছে, আমি দেখেছি।'

আমি কি মিথ্যে বলছি? শৈলজার কণ্ঠস্বর শান্ত সংযত।

কি জানি। কাকে যে বিশ্বাস করি।'

শান্তার বলার ভঙ্গিতে শৈলজা চাপা সূক্ষ্ম অপমান বোধ করল। মেয়েকে জিজ্ঞেস করে দেখ। তারপর বলবে। নতুন দামী সাবানটা এবার ফেলেই দিতে হবে। ধীর পায়ে নিজের ঘরে ঢুকল শৈলজা।

আমরাও দামী সাবান ব্যবহার করি। শৈলজা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হতেই শান্তা ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখটায় এসে ডাকল, দীপু। তাড়াতাড়ি নীচে আয় তো। বছর পনেরোর রোগা লম্বা দীপু দোতলায় এসে দাঁড়াতেই শান্তা চড়া গলায় বলল তুই আজ বিকেলে কার সাবান মেখে গা ধুয়েছিস?'

দীপু থতমত খেল প্রথমটা। আমাদের সাবানের টুকরোটা ঝাঁঝরির মধ্যে পড়ে গেছে। জ্যাঠাইমারটা একবার নিয়েছিলুম।

যেন ধাক্কা খেল শান্তা। কেন নিতে গেছিস? লজ্জা করে না তোর? বলতে বলতে দীপুর সামনে এগিয়ে এল। ঠাস করে একটা চড় কসাল গালে' তোরা কি সাবান মাখতে পাস না। এমন হা-ঘরে বৃত্তি কেন?'

'আর মারছেন কেন মেজদিভাই। এত বড় মেয়ে!' কবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল।

'থাক ছোট আমার মেয়েদের এত আদর দেখাতে এসো না। কথা তো আমাকেই শুনতে হচ্ছে।'

কবিতা কথা বলল না। দীপু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই শৈলজার ঘর। কোন শব্দ নেই। এমন নিরাসক্ত নীরবতা যেন ব্যঙ্গ করছে শান্তাকে। 'আর কোনদিন যদি ওদের জিনিসে হাত দিস মেরে ফেলব।' থামল শান্তা। 'ভাল সাবান মেখে ফুলেল-ফুলেল হয়ে ছাদে দাঁড়াতে চাও? ঝুনুর মত ছেলে ধরার শখ হচ্ছে বুঝি? যেমন দিদি!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল শৈলজা। 'যা তা কথা বোলো না মেজ। নিজের মেয়েকে শাসন করছ করো আমার মেয়েকে নিয়ে নোংরা কথা বোলো না।'

'নোংরা কথা? আমার মেয়ে গায়ে ঘা বলে দশটা কথা শুনিয়ে গেলেন আর নিজের মেয়ের ভিতরে ঘা শুধু হয়েছে। মজুতে সারা বাড়ি।' চেঁচিয়ে উঠল শান্তা গজগজ করল। 'সামান্য একটু সাবান মেখেছে তাতে এত—ছিঃ।'

'মেজবৌমা সন্ধ্যেবেলায় এত চেঁচাচ্ছ কেন?' যোগমায়াদেবী নীচ থেকে চীৎকার করে উঠলেন। 'তোমরা কি কেবল ঝগড়াই করে যাবে?'

'কে ঝগড়া করছে দেখে যান। আপনি তো আমাকেই শুধু ঝগড়া করতে দেখেন।'

শৈলজা ভিতরে কাঁপছে থরথর। 'ঝগড়া আমি করতে আসিনি মেজ। কিন্তু আমার মেয়ের সম্বন্ধে তুমি কোন কথা বলবে না।'

'কেন মারবেন নাকি? শ্বাশুড়ী-বৌ মিলে বুঝি তাই করবেন।'

'ভদ্রভাবে কথা বলো মেজ।'

'ভদ্রতা আর শেখাতে এসো না। বংশের খবর নিলেই বোঝা যেত। কে কত ভদ্র তা জানা আছে বলতে বলতে নিজের ঘরে ঢুকল শান্তা। ছোট মেয়ে নীপা কি করছিল ঘরে। কোণে কাঁচের প্লেট পড়ে টুকরো হয়েছে। শান্তা বেগে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল 'কি করছিস রে এখানে?'

'দিদি একবার পেনটা চাইছিল।' ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে নীপার।

'পেন চাই? একটা জিনিসও আজকাল রাখা যাবে না তোদের জন্যে। বেরো এখান থেকে।' বলেই ঘাড় ধরে ঠেলে দিল শান্তা নীপাকে। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল চৌকাঠে। ঠোঁট কেটে গেছে। তারই ওপর একটানা মারতে লাগল পিঠে: যেন শুধু শৈলজাকে নয় সারা বাড়ির বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ জানিয়ে শাসন করছে শান্তা।

এরই মধ্যে যোগমায়াদেবী ওপরে উঠে এসেছেন। 'ও কি করছ বৌমা মেয়েটা যে মরে যাবে!'

'আপনাকে বলতে হবে না যান!'

'তা বলে এমন করে মারবে অকারণ। এতো দেখতে পারি না।'

'দেখতে হবে না। আমরা এখান থেকে চলেই যাবো। আমরা চোর মিথ্যেবাদী।' মেয়েকে মারতে মারতে হাঁপাচ্ছে শান্তা। কথার শেষদিকে কেঁদেই ফেলল। শ্বাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দরজা বন্ধ করল। শব্দ করে খিল দিল।...

কাল সারা রাত কিছু খায়নি শান্তা। আনাজ কুটতে কুটতে কবিতার কথাটা মনে পড়ল আজও সেই ঝগড়ার জের জীইয়ে রাখতে চাইছে। কি হবে কে জানে! সিঁড়িতে মনুর নীচে নামার পদশব্দ কানে এল। কবিতা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

দুপুরে নিখিলেশ খাওয়া-দাওয়ার পর শৈলজার সামনে এসে বসল। শৈলজা বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল।

'শৈল দেখেছ দিনের পর দিন আমাদের সংসারটা কেমন নীচে নেমে যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে কি নেমেই তো গেছে।'

'অথচ আমাদের শেষ ঝুনু হওয়া পর্যন্ত বাড়িটা কি হাসিখুশি ছিল।'

'মেজটা তো আর থাকতে দেবে না। খুব পয়সা জমাচ্ছে তো!'

'কিন্তু শান্তার কথাই ভাবো। পিঠোপিঠি ঝুনু দীপু সবোজের মেয়ে কণা। যখন তখন ওদের নিয়ে তোমরা একসংগে কি না করতে! ঝুনুটা তো শান্তার কাছেই দিনরাত পড়ে থাকত।' একটু থামল নিখিলেশ। 'এই বছর বারো-তেরোর মধ্যে কেমন সব বদলে গেছে। তুমিই কি ভাবতে পারতে মেজ তোমার সংগে এমন ঝগড়া করবে? সংসারটায় এমন পচা পাঁকের গন্ধে টেকা যাবে না।' নিখিলেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ----- ১৪'00
২। গুল বাগিচা----৩'৫০. ৩। কাব্য আমপারা--৪'00
৪। পূবের হাওয়া----২'00. ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি--২'00
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

শৈলজা পাশ ফিরে শুল। 'আমার আর ভাবতে ভাল লাগে না।'

'আসলে তুমিও ভয়ংকর অধৈর্য হয়ে পড়েছ! অসহিষ্ণুতা দুঃখ যন্ত্রণা রাগে আমরা প্রত্যেকেই কোথায় নামছি দেখেছ?' নিখিলেশ উত্তেজিত কিন্তু ক্লান্ত।

'হবো না! দুটো ছেলের কিছু করতে পারলে তুমি? মেয়ে দুটোরও তো বিয়ে দিতে হবে! কাপড়ের দোকানে বসে আমায় সারাজীবন তুমি কি দিতে পেরেছ বল।'

নিখিলেশ একেবারে চুপ করে গেল। এ অভিযোগ তো দশ-বারো বছর ধরে ক্রমাগত অনেকবার করেছে শৈলজা। কিছুই দিতে পারেনি বরং ঘুণধরা মেরুদাঁড়া নিয়ে নিখিলেশ অনেক নুয়ে পড়ছে।

পাশের ঘরে শান্তা মেঝেয় বসে কমলেশের সদ্য আনা দশ টাকার এক হাজার নোট গুণছিল মন দিয়ে।

আগের কোন কথার জের টেনেই কমলেশ বলল 'সামান্য সাবান নিয়ে ঝগড়াটা তুমি না বাড়ালেই পারতে!'

'তোমার মেয়েই তো যত নষ্টের গোড়া!'

'তা ওকে তো একটা ভাল সাবান কিনে দিতে পারো। বরং ওদের থেকে দামী কিনলে তোমরও মান থাকত। বুঝিয়ে দিতে ওদের যে, তুমিও এসব কিনতে পার!'

টাকা গোনা শেষ করে শান্তা দম ফেলল এবার। কমলেশের দিকে তাকিয়ে বলল 'তোমার বুদ্ধি তো? এই রকমই! একটা ভাল সাবান কেনো সঙ্গে সঙ্গে ওদের চোখ টাটাবে। বলবে পয়সা হয়েছে সংসারে আরও পয়সা ঢাল। শ্বশুরমশাই তো অভাবে হলেই চাইবেন! ভাল উপায় করছ যখন। দেখছ আমি কত চেপেচুপে থাকছি। একটুও বুঝতে দি ওদের?' গলা ফিসফিস করল শান্তার।

স্ত্রীর যুক্তি অকাট্য বুঝতে পেরে কমলেশ সস্তা দামের সিগারেটটা সুখ টান দিয়ে বাইরে তাকাল।

দুপুরেও ফিরতে পারেনি সরোজ। প্রেসের বাঁধা কাজ ছাড়াও ঠিকে কাজও করে ও অন্যান্য প্রেসে। টাকা দরকার তাই বাড়িতে সুস্থির হতে পারে না। বাণীর একটি মাত্র ছেলেকেই প্রেসের কাজ শেখাচ্ছে বলে বাবা সঙ্গে নিয়ে যায়। বাণী একা-একা ঘরে শুয়ে করে তার ঘর হবে একটা বারান্দা থাকবে সেখানে বসে বসে শুধু রাস্তা দেখবে, নিজের মত করে ঘর গুছোবে প্রচুর টাকা জমাবে—এসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল এমন নিথর দুপুরে।

কবিতা শ্বশুর-শাশুড়ী আর স্বামীকে খাইয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছে। একটু পরে ও নিজের ঘরে এল। দরজা বন্ধ করতেই দেবেশ ওর দিকে তাকাল।

'কি ব্যাপার বলতো! সব কেমন চুপচাপ। তুমি একেবারে খাটতে খাটতে কেমন হয়ে গেছ!'

'তোমার এসব জেনে লাভ কি? তোমার তো আর ছেলেপুলে নেই যে এসব ভাবতে হবে!'

'তা না থাক এমন একটা গ্র্যান্ড বউ তো আছে!'

'হ্যাঁ তার থেকেও বড় আড্ডা আছে!'

'কিন্তু বউয়ের সঙ্গে এমন দুপুরে আড্ডা আহ—' বলেই হাতের নাগালের মধ্যে কবিতা আসতে ধরে টেনে আনল কাছে। 'এই আমার কাছে কিছুক্ষণ থাকো তো।'

কবিতা ঠিক করে রেখেছিল দেবেশের সঙ্গে ঝগড়া করবে। পারল না। হেসে ফেলল। 'ছাড়।'

'পাগল। আর ছাড়ি! আজ সারা দুপুর তুমি-আমি এক।'

'কি হবে? সাহস তো নেই।'

'থাকলে কি হত? সেই তো নিজের ছেলেটাকে নিয়েই ঝগড়ায় নেমে পড়তে। তার থেকে যতদিন না হয়।' দেবেশ কবিতাকে জড়িয়ে ধরে থাকল।

'না-না।' কবিতা দেবেশের বুকে মুখে লুকোল। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ। 'কে?' কবিতা ছিটকে সরে এসে ঘরের মেঝেয় দাঁড়াল।

'আমি পাপু ছোটকাকীমা। ছোটপিসির চিঠি এসেছে বিলেত থেকে। কাল সকালে প্লেনে দমদম পৌঁছচ্ছে। চিঠিটা দেখ।'

পাপু বড় ভাসুরের বড় ছেলে। কবিতা ওর সবচেয়ে প্রিয় কাকিমা। তাই চিঠি নিয়েই ওর কাছে এসেছে। কবিতা দরজা খুলল। পাপুর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। কবিতাকে চিঠিটা দিয়েই চলে গেল। কবিতা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি খুলে সামনে মেলে ধরল।

'আবার এই সংসারে আসছে বাচ্চা নিয়ে বিলিতি নান্তুটা!' দেবেশ হাসতে হাসতে বলল 'ওহ্ এবার তো হোলি খেলা হবে সারা বাড়ি!' ছোট বোন নান্তুর কথা ভেবে দেবেশ শব্দ করে হেসে উঠল।

চিঠির দিকে চোখ রেখেই কবিতা বলল, 'আসুক না। ছোড়দির বছর তিনেকের ছেলেটা নাকি দারুণ হয়েছে। আমরা তো কেউ দেখিইনি এক ফটো ছাড়া। আহ, এলে যা মজা হবে না!' বলতে বলতে যেখানটায় খবর আছে নান্তুর নতুন একটা বাচ্চা হবে এখন দুমাস সেখানেই কবিতা আরও গভীর মনোযোগী হল।

পরের দিন সকালের দিকে নান্তুদের প্লেন দমদমে আসতেই দেরী করল বেশ। ওরা যখন ট্যাকসি নিয়ে বাড়ির সামনে এসে থামল তখন বেলা হয়ে গেছে পুরুষরা নিজেদের কাজে বাইরে। শৈলজার দুই মেয়ে মনু ঝুনু আজ বেরোয়নি ওরা আসবে বলে। শান্তা আর বাণীর মেয়েরা স্কুলে চলে গেছে নিয়মমাফিক। শ্বশুরমশাই এই বয়সেও কোথায় যেন হিসেবের খাতা লেখেন বেরিয়ে গেছেন। গাড়ির শব্দ পেয়েই মনু ঝুনু নীচে নেমে এল। [illegible] অনেক দেরী হয়ে গেল কিন্তু তোমাদের!' মনু গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল।

'আর বোলো না যা ওয়েদার! প্লেন ল্যান্ড করতে খুব ট্রাবল হয়েছে।' বলতে বলতে ট্যাকসির দরজা খুলল নান্তু। আগেই ছিটকে বেরিয়ে এল বুবাই। 'বুবাই আস্তে নামো।' ভিতর থেকে বিকাশ চেঁচিয়ে উঠল।

'ইস কি সুন্দর দেখতে হয়েছে ছেলে। এই এদিকে এসো।' বলেই মনু হাত ধরে কাছে টানল। বুবাই বড় বড় চোখে মনুর দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ সপ্রতিভ উৎসুক দৃষ্টি নাক তীক্ষ্ণ দু চোখের ওপর টানা কালো ভুরু ঘন পাতায় ঢাকা দৃষ্টি গভীর। নিষ্পাপ। গাল ফোলা। মাথায় এক ঝাঁকড়া চুল বুবাইয়ের। বয়সের অনুপাতে একটু বেশী লম্বা চেহারা। ঠিক মোমের পুতুলের মত! হাসি-হাসি অথচ দুষ্টুমিতে ভরা মুখ!

বিকাশ মনুর দিকে একবার তাকাল শোন এদের নিয়ে যাও। আমি মালপত্তর আনার ব্যবস্থা করি। তা ছাড়া কলকাতার অফিসে খুব জরুরী কিছু কাজ সারতে বেশ দেরী হবে। এখানে এবেলা খাবো না। বাবাকে বোলো।'

নান্তু বলল 'তুমি এই ট্যাকসিতেই চলে যাও। তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা কোরো।'

'পিসেমশাই একেবারে কিছু না খেয়ে যাবেন! মনু বলল।

'থাক থাক ওসব পরে হবে।' বলতে বলতে ব্যস্ততায় বিকাশ গাড়ির মধ্যে ঢুকে বসল। গাড়ির ভিতর থেকেই নান্তুকে বলল 'দেরী হলে ভেবো না।' ছেলের দিকে তাকাল 'বুবাই একটুও দুষ্টুমি করবো না কিন্তু!'

বুবাই একদম করবে না জানাবার মত করে ঘাড় নাড়ল। হাত নাড়ল বাবাকে বিদায় দেওয়ার। গাড়ি দ্রুত অদৃশ্য হল।

'কি, আমার কোলে আসবে তো?' মনু তাকাল বুবাই এর দিকে।

'আসবে না আবার' ওর আপন-পর চেনা-অচেনা একটুও নেই। ওইটাই তো আমাকে ভাবায় মনু। নীচু হয়ে সামান্য কিছু মালপত্তর গোছাতে গোছাতে নান্তু বলল।

বুবাই ততক্ষণে মনুর কোলে। মা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাতেই বুবাই বলল 'মা দেখ আমি কেমন কোলে উঠেছি বুড়োছেলে।'

হেসে উঠল মনু-ঝুনু দুজনেই। পুক বলল তুমি বুড়ো ছেলে?' মনু বুবাইর গাল টিপে জিজ্ঞেস করল।

'ওই যে আমি বার বার ওকে বলি এখন তুমি বুড়ো ছেলে কোলে উঠতে নেই!' নান্তু হাসছে।

'এসো পিসিমণি।' ঝুনু দুটো ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে ওদের নিয়ে ওপরে এলো।

ঘিরে ধরল সবাই। বারান্দার ভাঙা অন্ধকারে নান্তু বসতেই এগিয়ে এল

শৈলজা কবিতা। শান্তা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। পাশে বাণী। যোগমায়াদেবী ছোট মেয়ে আসবে জেনে আগে থেকেই তক্তপোষে এসে বসেছিলেন। নান্তু প্রণাম করতেই টেনে পাশে বসালেন। ছেলে তো খুব বড় হয়েছে তোর!' যোগমায়াদেবী বললে।

'শ্বশুর দেশের ছেলে মা। কি সুন্দর দেখতে দেখেছেন?' কবিতা হাসতে হাসতে মনুর কোলে বসানো বুবাইয়ের মাথার ঝাঁকড়া চুলে বিলি কাটল।

'ওকে নামিয়ে দাও না মনু। কতক্ষণ ওভাবে রাখবে! বুবাই নেমে পড়ো দিদির কষ্ট হচ্ছে না।'

'তোমার কষ্ট হচ্ছে? বুবাই মনুর চিবুক ধরে টানল।

না-না কষ্ট হবে কেন! মনু আদর করল বুবাইকে।

'দেখেছ মায়ের সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি!' বুবাই জিভে জড়িয়ে বলল কথাগুলো। শব্দ করে হেসে উঠল সবাই। 'ইস কি কথা শিখেছে ছেলেটা। শৈলজা হাসতে হাসতে বলল।

'বলবেন না বৌদি ওর কথায় আমি তো ঝালাপালা।'

'দেখ কেমন একটুও চেনা-অচেনা মানে না!' কবিতা বলল। 'খুব ভাল!' বুবাই ততক্ষণে লজ্জায় মনুর কাঁধে মুখ লুকিয়েছে।

'ঠাকুরঝি তোমরা কথা বলো তোমার ছেলেকে একটু সাজাই।' কি বিচ্ছিরী দেখাচ্ছে। এই মনু এদিকে এসো তো ওকে নিয়ে।'

বুবাই এরা সব তোমার দিদি। ওই দেখ ও'রা মামীমা। এ হচ্ছে দিদা। মনে থাকবে।

পাখির মত তাকাল বুবাই। তুমি তো বলেছ মাম্মি ছবি দেখিয়েছ। কতবার বলবে? চটপটে কথায় শব্দ করে হেসে উঠল সবাই। কথায় কণ্ঠস্বরে মুখভঙ্গিতে কেমন মায়া জড়ানো। ঠিক যেন কেউ মুখস্থ করিয়ে দিয়েছে ব্যাটাকে। যোগমায়াদেবী হাসতে হাসতে বললেন।

'না মা। ও নিজেই কোত্থেকে শিখেছে।' নান্তু বলল।

কবিতার ঘরে এলো ওরা। বিছানার ওপর বসালো বুবাইকে।

কবিতা জিজ্ঞেস করল বুবাই তোমাকে কে বেশী ভালবাসে খু-উব!

'মাম্মি-বাপ্পি দুজনেই' বলেই বড় বড় চোখে তাকাল কবিতার দিকে।

'আর একটা ভাই আসবে ঠিক এই রকম' বলে বড় মোমের পুতুলটা সামনে রাখল কবিতা। তখন তোমাকে ভালবাসবেই না!

গম্ভীর হল বুবাইয়ের মুখ পুতুলটাকে দেখল, নিল না। হঠাৎ বলল আসুক না এলে ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব নীচে।'

'ওরে গুন্ডা!' ঘরের উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে শৈলজার দুই ছেলে ঢুকল। খুব কথা শিখেছিস। পাপু বলল। পাড়ায় আড্ডা দিচ্ছিল ও।

'কেন হবে না! কোন বাড়ির রক্ত আছে দেখতে হবে তো।' মনু বলল 'দাদা তুমিও তো এরকম ছিলে, মা বলেন?'

ঝুনু বলল 'ছোটকাকিমা একে নিয়ে ছাদের করে যাবো?'

'বেশ তো একটু সাজিয়ে দিচ্ছি তোমরা নিয়ে যাও আমি পরে যাচ্ছি।' কবিতা দ্রুত পাউডারের পাফ ঘষে চুল আঁচড়ে বুবাইকে সামান্য সাজিয়ে দিল।

বুবাইকে নিয়ে ওরা কবিতার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুবাই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হাঁটছে। টলতে টলতে ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। পাশেই শান্তার ঘর। দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়ল ওঘরে। মনু-ঝুনু থমকে দাঁড়াল। কি ভাবল। মেজকাকিমার ঘরে ঢোকা বারণ। কথাও বলে না। পাপু দরকারে বাড়ি ঢুকেছিল। ও নীচে নেমে গেল। মনু-ঝুনুও ঘরের মধ্যে মেজকাকিমাকে দেখে সরে গেল ওখান থেকে। দোতলার বারান্দা থেকে নান্তু নীচে কলঘরে গেছে।

বুবাই ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে শান্তাকে দেখছে। শান্তা আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে ডালা খুলে কি দেখছিল। বুবাই ঢুকেছে বুঝতে পারেনি।

'তুমি কে?' বুবাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল। 'এত গম্ভীর কেন, আমার সঙ্গে কথা বলছ না যে?'

শান্তা পিছন ফিরল। 'আরে! এসো এসো।'

'না আগে বল তুমি কে?' বুবাই স্থির দাঁড়িয়ে হঠাৎ গোমড়া মুখের ভঙ্গি নকল করেই বলল 'মুখটা এরকম করে আছ কেন?'

'আমি তোমার মেজমামিমা।' বলেই এগিয়ে এসে বুবাই-এর হাত ধরল। 'তুমি আমার ঘরে আসছ না, তাই মন খারাপ। তোমার ওপর ভীষণ রেগে গেছি। দুষ্টু ছেলে।' একটু আদর করল শান্তা।

'তোমার এত পুতুল! আমাকে দেবে?'

'কি করবে নিয়ে, ভেঙে ফেলবে।'

বুবাই তাকাল শান্তার মুখের দিকে। 'ওটা দেবে? ওই যে লাল মতন।' বুবাই কাচের ওপর দিয়ে চকচকে লাল রঙের বটুয়াটা দেখাল। ওটায় শান্তা সারা মাসের যাবতীয় খরচ রাখে।

'তোমায় সব দেব। আগে তোমার নাম বল।' শান্তা বুবাইকে কোলে তুলে নিতে চাইল।

বুবাই উঠল না। দু'হাত দিয়ে শান্তাকে ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'আমার নাম বুবাই, বাবার নাম বাপ্পি, মার নাম মাম্মি।' বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দালানে।

'এই, এই ছেলে সিঁড়ির দিকে যেও না। পড়ে যাবে!'

শান্তার কণ্ঠস্বর শুনে মনু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুবাই ওদের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শৈলজা নীচে রান্নাঘরে ঢুকেছে। ঝুনু বোধহয় ছাদে। নিমেষের মধ্যে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে এলো মনু।

'বোসো, তোমার সঙ্গে গল্প করব।' মনু বুবাইয়ের চিবুকে ঠোঁট বুলাল।

'আমার সঙ্গে খেলবে?' মনুর চিবুক ধরে টানল বুবাই। বাপ্পি আমার সঙ্গে যেমন খেলে, তেমনি।'

'কি রকম?' মনু অবাক। দু'চোখে বিস্ময়ের ভান।

'আচ্ছা, তুমি আমার মা হয়ে যাও, আমি আমার বাবা।'

বেশ। আমি তোমার মা।'

'আমি বাপি।'

'তারপর?'

'তুমি এবার আমাকে বল, কি আজ ফিরতে এত দেরী হল কেন?'

'কি আজ ফিরতে এত দেরী হল কেন?'

বুবাই চুপ করে বসে রইল অন্য দিকে মুখ করে। নিজের জামার পকেট হাত বুলোচ্ছে। কিছু যেন বের করে রাখবে সামনে টেবিলে।

মনু অবাক হয়ে দেখছে বুবাইকে। কথা বলছে না দেখে মনু বলল, 'কই, বুবাই তুমি কথা বল?'

'দূর, তুমি কিছু জান না। আমি বুবাই নাকি! আমি তো বাপি। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকব। তারপর তুমি মাম্মি। আমায় জড়িয়ে ধরলে তবে তো বলব, আহ্ ছাড়ো।' তোমার সঙ্গে খেলব না, তুমি কিছু জান না!'

মনুর চোখ বড়। 'উঃ কি দস্যি ছেলে তুমি। চল, তোমার মাকে সব বলছি!' বলেই মনু হো-হো করে হাসতে হাসতে বুবাইকে কোলে নিয়ে ছাদে চলল। ছোট-পিসি এইমাত্র নীচে স্নান সেরে ছাদে গেছে।

গড়ানো দুপুরে খাওয়া শেষ হল সকলের। কবিতা বুবাইকে কাছে নিয়ে একটু শুয়ে পড়ল। শান্তা-বাণীর মেয়েরা এখনো স্কুল থেকে ফেরেনি। প্লেন-জার্নির ক্লান্তিতে নান্তু এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে সিঁড়ির পাশের ঘরে। বুবাইকে চাপড়াতে চাপড়াতে কবিতা সামান্য তন্দ্রার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়ে।

বুবাই চোখ বুজিয়ে পড়েছিল একটুও ঘুমোয়নি। আস্তে আস্তে কবিতার সদ্য-কেনা চকচকে জুতো দুপাটি পা গলিয়ে উঠে পড়ল। শোবার আগে কবিতা মোমের পুতুলটা বুবাইকে খেলতে দিয়েছিল। বুবাই মাথার কাছে রাখা পুতুলটা হাতে নিল। কিছু সময় দেখল পুতুলটা। সারা মুখে কয়েক ঘা চড় মারল। এক সময় এখানে-ওখানে টিপে তুবড়ে দিল। শেষে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে চেপে তার ওপর বসল। পুতুলটা নিয়ে কিছুক্ষণ খেলার পর নিজের খেয়ালেই ভেজানো দরজা খুলে বারান্দায় এলো। শান্তার ঘরের দরজা আধখোলা। পায়ের জুতোয় অসুবিধে হচ্ছে বলে দরজার সামনে ফেলে রেখে ঘরে ঢুকল। একা শান্তা শুয়ে ঘুমে অচেতন। বুবাই আলমারীর ডালা খুলে এক হাতে একটা ঘোমটা দেওয়া বউয়ের মূর্তি নিল। আর এক হাতে লাল বটুয়াটা। টলতে টলতে বেরিয়ে এসে নীচে নামার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে ফিরে এল। শৈলজা গভীর ঘুমে অচেতন। ছাদের ঘরে মনু-মনু শুয়ে। শৈলজার ঘরে খোলা তাকে পুতুলগুলো নাড়ল। নিজের মনে খেলা করল কিছুক্ষণ। একসময়ে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল ওর ফেলে-রাখা কবিতার নতুন জুতো-জোড়া। দু'হাতে নিয়ে সিঁড়ি ধরে ছাদে উঠে এল। বাণীর ঘরটা সোজা দূরে দেখা যাচ্ছে। বুবাই আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঢুকল। বাণীর সাজানো ট্রাঙ্কগুলোর ওপর একটা নতুন ফ্রক। দু'হাতে জুতো সমেত ওটা ধরতে গিয়ে দু'হাতের জুতো ট্রাঙ্কের পিছনে শব্দ করে পড়ে গেল। বাণীর ঘুম ভাঙলো না। বাণীর মেয়ে কণার ফ্রক। একটা হাতে হাত গলিয়ে বুবাই আবার টলতে টলতে এখানে-ওখানে খেলতে খেলতে নীচে নেমে এল। বারান্দার বেড়ালটাকে তাড়াল ঠেলে ঠেলে, বারান্দার এমাথা থেকে ওমাথা ঘুরে ঘুরে। কবিতার ঘরে ঢুকল আবার। হাতে-পায়ে বড় ফ্রকটা জড়িয়ে যাচ্ছে বলে টেনে টেনে কোনরকমে খুলেই ছুঁড়ে ফেলে দিল তক্তপোষের নীচে। বাইরে কোন বাড়ির ছাদে বুঝি পাখি ডাকার একটানা শব্দ। বুবাই শব্দ শুনতে শুনতে বেরিয়ে এল আবার। ছাদে উঠতে লাগল নিজের খেয়ালে।

নীচে থেকে ওপরে ওঠার শেষ ধাপে দীপুদের স্কুল থেকে ফেরার পায়ের শব্দ। পিছন ফিরতে যেতেই বুবাই ছাদে ওঠার কয়েক ধাপ সিঁড়ির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল আচমকা।

'এই, এই, পড়ে গেল।' দীপু চেঁচিয়ে উঠল। ততক্ষণে বুবাই দোতলার বারান্দায় পড়ে গেছে সশব্দে উপুড় হয়ে। ককিয়ে কেঁদে উঠল।

দীপু দৌড়ে গিয়ে বুবাইকে কোলে তুলে নিল। ঘুম ভেঙে গেছে শৈলজার, শান্তারও। কবিতা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এত জোর শব্দ আর কান্নায় ছাদ থেকে দৌড়ে এল মনু-মনু বাণী।

'ইস্ রক্ত পড়ছে যে!' কবিতা দৌড়ে এসে বুবাই-এর কপাল চেপে ধরল। 'বেশ ছড়ে গেছে!'

'কি করে পড়ল?' শান্তা যেন দীপুকে জিজ্ঞেস করছে।

'দাঁড়াও ছোট, একটু তুলো নিয়ে আসি।' শৈলজা ত্রস্ত পায়ে ঘরে ঢুকল।

বাণী দৌড়ে গেল। 'একটু জল দিতে হবে।'

'নীচে নামবে কেন, আমার ঘরে আছে দেখ।' কবিতা বুবাইকে বুকে চেপে ধরে বাণীকে বলল। বুবাইয়ের দিকে তাকাল।

'শুধু তুলোয় হবে কি!' কবিতা যেন বিড় বিড় করল।

'দাঁড়াও, দেখি আমার ঘরে একটু বার্ণল আছে', শান্তা ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

মনু খুঁচিয়ে দেখল কাটা জায়গাটা। হ্যাঁ, বার্ণলেই হয়ে যাবে, সামান্য ছড়ে গেছে।

'ছোটপিসি কোথায়?' নীপা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'থাক, ওকে আর ডেকোনা। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আচমকা ডাকলে খারাপ হবে।' শৈলজা তুলো চেপে ধরে শান্তার মেয়েকে বলল।

শান্তা আরও ঘন হল কবিতার। 'বড়দি, আপনি তুলোটা চাপুন, আমি ব্যান্ডেজটা বেঁধে দি। ছোট, তুমি ধরে থাক।'

নীচে থেকে যোগমায়া দেবী চেঁচালেন, 'কি হল ওপরে।'

'কিছু না মা।' বাণী নীচে নামার সিঁড়ির কাছে ঝুঁকে উত্তর দিল।

'ইস, কখন উঠে বেরিয়ে এসেছে বুঝতেই পারিনি। কি দস্যি ছেলে!' কবিতা বলল।

'তোমার ঘরেই শুইয়ে দাও ছোট।' শৈলজা বলল।

'না আমি শোব না। আমার কিছু হয়নি।' বুবাই শৈলজার দিকে তাকাল। চোখের গোড়ায় জল। ফর্সা তুলতুলে নরম চিবুক, গাল থেকে যেন এখুনি রক্ত ফেটে বেরুবে!

'দেখ ছেলের কথা দেখ। আবার হাসছে!' বলতে বলতে কবিতা ওকে নিয়ে ঘরে এল। 'বস এখানে।' বিছানায় বসিয়ে দিল। হঠাৎ মেঝের কোণে দৃষ্টি পড়ল, 'আরে, এ-জামাটা কার, কে নিয়ে এল!'

মনু সামনে দাঁড়িয়েছিল। অবাক হয়ে বলল, 'এটা তো সেজকাকীমার মেয়ের ফ্রক!'

ততক্ষণে বাণী ছাদের ঘর ঘুরে এসে কবিতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'এই নাও ছোট, তোমার জুতো!' এই প্রথম নতুন করে কবিতার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল বাণী ওর সঙ্গে।

'আমার জুতো! কোথায় ছিল?' কবিতা অবাক।

'আমার ঘরে।' হাসল বাণী। 'উঃ, কি ছেলে, আমার ঘরে কখন গিয়ে ফেলে রেখে এসেছে!' বুবাইয়ের দিকে তাকাল বাণী। বুবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে বাণীকে। একসময়ে ঘরে ঢুকে কবিতার জুতোজোড়া মেঝেয় রাখল কণা, বাণীর মেয়ে। হাত বাড়িয়ে বাণী কবিতার হাত থেকে কণার ফ্রকটা হাসতে হাসতে নিল। 'চলি ভাই।' বলে বাণী চলে গেল।

কিছু পরেই পাশের ঘরে শান্তা বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে আলমারীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠল। আলমারীর সমস্ত জিনিসপত্তর তছনছ। লাল বটুয়াটা নেই। ধড়াস করে উঠল শান্তার বুকের ভিতরটা। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। চেঁচিয়ে উঠল, 'দীপু, আলমারীর ডালা কেন খোলা?'

'আমি জানি না তো মা, এইমাত্র এলাম তো স্কুল থেকে।' নীচে কলঘর থেকে দীপু চেঁচাল।

শৈলজা হঠাৎ এসে দাঁড়াল শান্তার ঘরের সামনে। 'মেজ, একবার আমার ঘরে এসো।'

শান্তা বিরক্তি এবং বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকালো অনেকদিন দুজনের কথা বন্ধ। কেউ কারোর মুখের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত কাল বিকেল থেকে। হঠাৎ কি এমন হল? 'কেন?'

'দেখে যাও, তোমার পুতুল আর ব্যাগ কোথায়।'

শান্তা অবাক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে শৈলজার পিছু পিছু ওর ঘরের সামনে দাঁড়াল। দেখল, শান্তার বউ-পুতুলটা শৈলজার ঘরের তাকে আর একটা বউ-পুতুলের পাশে বসানো। যেন খেলতে খেলতে সাজিয়ে রেখেছে। দুটো বউয়ের মাঝখানে লাল বটুয়াটা।

'যাও, নিয়ে এস। সব বুবাইয়ের কীর্তি।' শৈলজা হাসছে।

শান্তা হাসতে হাসতে শৈলজার ঘরে ঢুকল। পুতুল আর বটুয়া হাতে নিয়ে বলল 'উহুঁ সারা দুপুর এই করেছে ও। সকালেই আমাকে এই দুটো চাইছিল। আর ঘর তো একেবারে তছনছ। দেখবে এসো!' শৈলজাকে সঙ্গে নিয়ে শান্তা নিজের ঘরে ঢুকল।

কবিতার বুকের মধ্যে গভীর হয়ে শুয়েছিল বুবাই। হঠাৎ উঠে বসল। 'আমি বাপ্পির কাছে যাবো।'

'কেন? তোমার বাপ্পি তো এখনো ফেরেনি! শুয়ে পড়।' কবিতা টানল বুবাইকে।

'বাপ্পির সঙ্গে খেলব একটু।'

'এই তো, আমার সঙ্গে খেলো, কি খেলবে?' কবিতা উঠে বসল।

'তুমি বাপ্পির খেলা জান?'

'শিখিয়ে দাও।'

বুবাই সরে বসল। 'বেশ, তুমি বড়-মামিমা হয়ে যাও!'

'হয়েছি, এবার কি হবে?'

'আমি মেজমামিমা। আমরা খুব গম্ভীর। একটিও কথা বলবে না কিন্তু!' সুন্দর সরল ভঙ্গি করে কথা বলতে নিষেধ করল বুবাই কবিতাকে।

দুজনেই চুপ। কবিতা মিটমিট করে দেখছে বুবাইকে।

হঠাৎ বুবাই বলল, 'এবার তুমি বল, 'তুমি এত গোমড়া-মুখ কেন?' তুমি বড়, তুমি আগে বলবে!'

'এত গোমড়া-মুখ কেন?' কবিতা বুবাই-এর কথা বলার ভঙ্গি নকল করল।

'তুমি এত গোমড়া-মুখ কেন, রাগ হয়েছে?' বুবাই কবিতার দিকে তাকাল।

কবিতা শব্দ করে হেসে উঠল। বুবাইও। বুবাইকে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে।

ঘরদোর গুছিয়ে এসে জানলার ফাঁক দিয়ে শৈলজা-শান্তা বুবাই-এর খেলাটা দেখছিল এতক্ষণ। দেখতে দেখতে দুজনেরই মনে পড়ে যাচ্ছিল, খুব ছোট-বেলায় ঝুনু-দীপু-কণা ওদের মা-দের ন্যাকড়া নিয়ে এরকম খেলত। এক সময়ে শৈলজা-শান্তার দৃষ্টি বিনিময় হতেই হেসে উঠল। ওদের দুজনকে দেখেই লজ্জায় বুবাই কবিতার কোলে মুখ লুকোল।

সন্ধ্যের বেশ কিছুটা পরে নীচে গিরিশংকরের ঘরে সবাই হৈ-চৈ করে কথা বলছিল। বুবাইয়ের কথার ওরা হাসিতে ভরপুর। এক সময়ে বুবাইয়ের খোঁজ পড়ল। গিরিশংকর নীচে থেকে বললেন, 'ছোটবৌমা, দাদুভাইকে একবার এখানে নিয়ে এসো তো!'

কিন্তু বুবাইকে হঠাৎ যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আগেও শান্তার ঘরে দীপু-নীপা-কণাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে খেলছিল। কোথায় গেল। দীপু নীপার কাছে রেখে ছাদে চলে গিয়েছিল। পাশের ঘরে ঝুনুর গলা পেয়ে নীপা বুবাইকে কখন একা রেখে ছাদে গেছে। তারপর? নীচে সবাই রান্না নিয়ে ব্যস্ত! কোথায় গেল! ছাদে উঠে এল কবিতা। ছাদের ঘরে নেই। দোতলায় খুঁজল। নেই।

'কোথায় গেল তাহলে!' কবিতা নীচে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল।

'কোথায় আবার যাবে?' যোগমায়া দেবী বললেন, 'ওপরেই আছে, দেখ।'

'বাইরে বেরিয়ে যায়নি তো?' নান্তু বলল, 'এই আমার ছেলে, কি যে দুরন্ত। চেনা-অচেনা নেই তো—আরো ভয়।'

বাইরে যাবে কি করে? আমরা তো বসে আছি এখানে! ঠিক আছে, আমি দেখছি।' গিরিশংকর দোতলায় এলেন। নান্তুকে যে ঘরটায় থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেই সব সময় তালা দিয়ে রাখা ঘরটায় কি ভেবে ঢুকলেন। মনু বিছানা করেছে নান্তুদের। তক্তপোষের ওপর বড় চাদর-ঢাকা বিছানা করেছে। বেডকভার মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে। হঠাৎ কি খেয়াল হল, ঝোলানো চাদরটা তুললেন। বুবাই শুয়ে আছে চিত হয়ে। অঘোর ঘুমে অনড়।

'এই তো!' কবিতা উল্লাসে স্বগতোক্তি করল। 'এখানে শুয়েছে কখন?'

'ডাকো সকলকে।'

সকলে এলো। বুবাই আরাম করে শুয়ে আছে। মোমের ডল-পুতুলের মত হাসি-হাসি মুখ, চিবুক। দুটো হাত দু-পাশে টান টান করে ছড়ানো। এক পায়ের ওপর আর এক পা রাখা, জোড়া। কপালে ছড়ে-যাওয়া লাল দাগ।

'ঠিক যীশুর মত। দেখুন বড়দিভাই!' কবিতা শব্দ করে হেসে উঠল।

'ঘুমোবে না, সারা দুপুরটা জই-জই করেছে!' শান্তা শৈলজার দিকে তাকাল।

'ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও না ছোট-বৌদি। সন্ধ্যায় যা খেয়েছে, আর খাবে না, জাগবেও না।'

কবিতা তুলে বিছানায় যত্ন করে শুইয়ে দিল।

খাওয়া-দাওয়ার পরও নান্তু, বিকাশ, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ঘিরে ভাসুর-জায়েরা হৈ-হৈ করে গল্প করছে এখনো। কবিতা এক ফাঁকে নিজের ঘরে এলো। দেবেশ বিছানায় শুয়ে। কবিতা দরজায় খিল দিল। আলো না নিভিয়েই দেবেশের থেকে সামান্য দূরত্ব রেখে শুয়ে পড়ল।

'তোমার আদরের পুতুলটা এমন দুমড়ে-মুচড়ে গেল কি করে?' দেবেশ মিটমিট করে তাকাল কবিতার দিকে।

'বুবাইটা রাগে এমন করেছে। খেলতে দিয়েছিলাম।'

'আর একটা কিনবে তো?' খুক খুক করে হাসল দেবেশ।

'বুবাইটা কি রকম দুষ্টু দেখলে তো! আর কি কথা!' কবিতা প্রসঙ্গ ঘোরালো। 'পাপু, মেজদিভাই এর বড় মেয়ে সেজ-ভাসুরের মেয়ে কণাও নাকি এরকম ছিল!'

'বাচ্চা ছেলে যত দুরন্ত হয় ততই ভাল। যে-কোন বাড়ির চেহারাই বদলে দেয়।'

নীচে থেকে সমবেত হাসির শব্দ কানে এল ওদের।

'তাই তো দিয়েছে!'

'আজ বাড়ি ফিরে বুঝেছি।'

'কিন্তু বেশী দিন থাকবে না। নন্দাই তো মাস তিনেকের কাজ হয়ে গেলেই চলে যাবে। তারপর?'

'তোমার খুব কষ্ট হবে তো?'

মাথার দিকের দেয়ালের সুইচে হাত রাখল কবিতা; আলো নিভল। অনেক ঘনিষ্ঠ হল দেবেশের। কানে কানে বলল, 'জ্ঞানপাপী!'

দেবেশ জড়িয়ে ধরল কবিতাকে। কয়েক মুহূর্ত স্থির অনড় হয়ে চুমু খেল। 'আর ক'মাস অপেক্ষা কর।' হাঁপাচ্ছে দেবেশ।

'ন্না।' কবিতা ব্রা খুলল আস্তে আস্তে। জামাও। ফিস ফিস করে বলল, 'আর একদিনও না।'

দেবেশ অভ্যস্ত হাতে মাথার বালিশের নীচে হাত ঢুকোল কিছু একটা নেওয়ার জন্যে। কবিতা শক্ত হাতে বাধা দিয়ে দেবেশের শরীরের সঙ্গে লেগে থাকল।

কবিতা এই মুহূর্তে বুঝতে পারছে, সারা বাড়ির ওদের ঘর ছাড়া প্রত্যেক ঘরে আলো জ্বলছে। ঠিক এমনটি ওর বিয়ের পর কোনদিন দেখেনি কবিতা।

পুনশ্চ

ইংরেজ আমলের কথা ছেড়ে দিলেও বড় দিন ও ইংরেজী নববর্ষ আজ আমাদের সামাজিক জীবনেও কিছু কম রেখাপাত করেনি। এই ক্রিসমাস ও নিউ ইয়ার্স ডেতে হিন্দু বাঙ্গালীবাবুরা একমাত্র গীর্জায় যাওয়া ছাড়া আর সব কিছুই বোধ হয় সাড়ম্বরে করে থাকেন। সন্দেশ-রসগোল্লা ফেলে এ-সময়টা সকলে কেক-পেস্ট্রি খান এবং প্রিয়জনকে খাওয়ানো ও উপহার দেওয়াটা যেন একটা অপরিহার্য সামাজিক প্রথা হিসাবেও গণ্য করে থাকেন। এছাড়া কার্ড-বিনিময়, দোকানপাটে কাগজের ফুল, মালা ও আলোকসজ্জা ছেলেমেয়েদের মাথায় কাগজের রঙিন টুপি পরানো, সেন্টা ক্লজের মোজা-ভর্তি খেলনা-খাবার কিনে দেওয়া বেশ চল হয়ে গেছে। এর উপর এ সময় উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বায়স্কোপ, থিয়েটার ও সার্কাস দেখার প্রাচুর্য তো আছেই। এ-শুধু পয়সাওয়ালা লোকদের মধ্যেই নয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মেহনতি জনগণকেও এই বড়দিন নানাভাবে আজও আকৃষ্ট করে থাকে। বিশেষ করে পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের হোটেলগুলিতে মদের ফোয়ারা ওড়ে।

এই বড়দিন সম্পর্কে ১৩২২ সালের 'মালঞ্চ' পত্রিকা থেকে একটি নিবন্ধ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। নিবন্ধটি উক্ত পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ'র মধ্যে প্রকাশিত হয়।

।বড়দিন।

বড়দিন আসিতেছে। বড়দিন খৃষ্টান ইংরেজের বড়দিন—আমাদের নিতান্ত ছোট-দিন তা যে নয়। শীতকালে আমোদপ্রমোদ এদেশে জমে ভাল; তবা শীতে বড় দিনে ১০।১২ দিনের বড় ছুটি। এই সময় অবস্থাপন্ন অনেকেই প্রমোদ ভ্রমণে বাহির হন। কলিকাতার বাহিরের বাঙ্গালীরা অনেকেই রাজধানী কলিকাতায় আসেন—কলিকাতার থিয়েটার, সার্কাস, বায়স্কোপ সব বেশ জমিয়া উঠে, আয়ও যথেষ্ট হয়। পরিবার-পরিজন-বিরহিত যাহারা শহরে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করেন, তাঁহারা কপি কড় ইসুটি কমলালেবু ও নূতন গুড়ের সন্দেশাদি সহ গৃহে যান। গৃহের পরিজন-বর্গ ও গৃহে সুলভ বহু পিষ্টক-মিষ্টান্নাদিতে ইঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করেন। গৃহে গৃহে প্রায় পূজার মতনই বড়দিনের ঘটা আরম্ভ হয়।...

যিশুখৃষ্টের জন্মোৎসবের দিনকেই খৃষ্টানরা খৃষ্টমাস বলিয়া থাকেন। সেই খৃষ্টমাসই যে এদেশে বড়দিন বলিয়া কথিত, একথা বলাই বাহুল্য। তবে এ-দিনের নাম 'বড়দিন' কেন হইল? খৃষ্ট-মাসের যে অর্থ, তার সঙ্গে 'বড়দিন' কথার অর্থের কোনও সঙ্গতি নাই। তবে এই উৎসবের তারিখকে বড়দিন নাম দেওয়া হইল কেন? প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কি ইহার কোন উত্তর দিবেন? আমরা প্রত্নতত্ত্ববিৎ নই, তবে মোটা-মুটি যেমন বুঝি, তেমন একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

ঠিক বড়দিনের সময়েই সূর্যের উত্তরায়ন আরম্ভ হয়—দিন পলে পলে বড় হইতে থাকে। ছেলেবেলায় সব ভূগোলে পড়িয়াছি, ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে (একেবারে ঠিক যিশুখৃষ্টের জন্মতারিখে —খৃষ্টমাসের দিনে) সূর্যদেব বিষুবরেখার দক্ষিণ মর্কট ক্রান্তিতে স্থিতির পর ধীরে ধীরে উত্তরে আসিতে থাকেন অর্থাৎ সাধু জ্যোতিষী ভাষায় তাঁর 'উত্তরায়ন' আরম্ভ হয়। আজকালকার ভূগোলে আবার দেখিতে পাই সেদিন ২৫শে নয়, ২১শে ডিসেম্বর। তবে এদেশের পঞ্জিকাকারগণ এ সম্বন্ধে স্থির মত—তাঁরা বরাবরই লিখিতেছেন ১১ই পৌষ হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। কিন্তু ১১ই পৌষের সঙ্গে ২১শে ডিসেম্বরের মিল কখনও হয় না। ২৫শের সঙ্গে কখনও মেলে কখনও মেলে না। ৯ই হইতে ১১ই পৌষের মধ্যে বড়দিন পড়ে। এখন ঠিক উত্তরায়ণ যে কবে আরম্ভ হয়, তা কেমন করিয়া বলিব? সূর্যের যদি প্রাণ ও জ্ঞান থাকে তবে তিনিই বোধহয় সব-চেয়ে ঠিক জানেন, ঠিক বলিতে পারেন।

যাহাই হউক আগে আগে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখই বিলাতী উত্তরায়ন আরম্ভের দিন বলিয়া ধরা হইত। এই দিন হইতে দিন বড় হইতে আরম্ভ হয় তাই ইহার নাম 'বড়দিন' হইয়াছে—এরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই মত আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হইবার পর এদেশে যে খৃষ্টমাসের এই নাম হইয়াছে, এবং ইংরেজদের তৎকালীন দেশীয় কর্ম্ম-চারিগণই যে এই উৎসবকে এই আখ্যা দিয়াছেন একথা সহজেই বুঝা যায়। এদেশে উত্তরায়ন আরম্ভের কোনও উৎসব নাই। ইংরেজের তৎকালীন দেশীয় কর্ম্ম-চারিগণ যে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বড় পণ্ডিত ছিলেন—পঞ্জিকা দেখিয়া উত্তরায়নের হিসাব করিয়া তার সঙ্গে এই উৎসবের কোনও সম্বন্ধ আছে মনে করিয়া ইহাকে 'বড়দিন' নাম দিয়াছেন এরূপ মনে করা কঠিন। জ্যোতিষ ও ভূগোলবিদ্যা যাঁহারা কিছু আলোচনা না করিয়াছেন এখনও দেখিতে পাই উত্তরায়ন বলিয়া একটা কথা বা তাহার ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহারা বড় কম জানেন ও বুঝেন। ঠিক এই সময় হইতেই যে দিন বাড়িতে থাকে এটা ধরাও বড় সহজ নয়। পৌষের শেষ বা মাঘের প্রথম হইতেই সকলে অনুভব করিতে থাকেন হ্যাঁ দিন কিছু বড় হইতেছে বটে।

উত্তরায়ন এবং তার জন্য দিবাভাগের কালবৃদ্ধির সঙ্গে বড়দিন নামের কোনও সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে করার তেমন যুক্তিযুক্ত কারণ কিছু দেখিতে পাই না। তবে খৃষ্টমাসের নাম 'বড়দিন' কেন হইল, তাহার একটি উত্তরও বেশ আছে। আমাদের যেমন দুর্গোৎসব খৃষ্টানদেরও তেমনি 'খৃষ্টমাস' সবচেয়ে বড় ধর্ম্মোৎসব। এদেশে খৃষ্টানদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি উৎসব আমরা দেখিতে পাই। ১ম খৃষ্টমাস, ২য় গুডফ্রাইডে, বা ইস্টার। যিশুখৃষ্টের জন্ম এবং মৃত্যু ও স্বর্গারোহণ—এই দুইটি ঘটনাই খৃস্টানদের পক্ষে বিশেষ দুইটি স্মরণীয় দিন। তাঁহার জন্ম তারিখে খৃষ্ট-মাস উৎসব হয়। তারিখ ও তিথি লইয়া একটা বড় জটিল হিসাবে গুডফ্রাইডে ও ইস্টারের দিন ঠিক হয়। প্রতি বৎসর ২১শে মার্চ্চ বা তার পরে যে পূর্ণিমা তার পরের রবিবার হইল ইস্টার তার আগে যে শুক্রবার তাহা হইল গুডফ্রাইডে।

গুডফ্রাইডে তারিখে যিশু ক্রুশদণ্ডে প্রাণদান করিয়া মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং তার তৃতীয় দিনে তিনি কবর হইতে উঠিয়া ভৌতিক দেহেই স্বর্গারোহণ করেন। এই দুইটি ঘটনা লইয়াই গুডফ্রাইডে এবং ইস্টার উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

যাহা হউক ইস্টার অপেক্ষা খৃস্টমাসের উৎসব অনেক বড় উৎসব। ইহার বড় দিন আর খৃস্টানদের নাই। তাই মনে হয় খৃষ্টান ইংরেজ কোম্পানীর দেশীয় কর্ম্ম-চারিগণ এই দিনকে সাহেবদের বড়দিন নাম দিয়াছিলেন। এবং সেই নামই আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে—বরাবর চলিবে বলিয়াই মনে হয়।

বড়দিন নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। তবে আমরা জোর করিয়া কিছুই বলিতে পারি না।...

—কলকে

এই বাংলার খবর

ছাত্র-যুব ঐক্য

এই বাংলার চার ছাত্র-যুব নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য আর নুরুল ইসলামকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া। তাঁরা দিল্লি গেলেন এই মাসের ১৮ তারিখে। আর ১৯ তারিখেই কলকাতায় খবর এসে পৌঁছালো যে তাঁদের বিরোধ মিটে গেছে। ঐ দুদিন দিল্লিতে এই চার তরুণ নেতা দফায় দফায় দেবকান্তবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তা ছাড়া কথাবার্তা বলেন নিজেদের মধ্যেও। এই সব আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয়, রাজ্য কংগ্রেসের যুব আর ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার ফয়সালা করবেন চারজনের একটি কমিটি। প্রিয়-সুব্রত-প্রদীপ-নুরুল, এই চারজনই থাকবেন এই কমিটিতে। এঁদের কথা মেনে চলতে হবে সকলকে। যদি কেউ এই কমিটির কথা অমান্য করেন তবে ধরে নেওয়া হবে যে তাঁরা দলবিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছেন। বিরোধ মীমাংসার শর্তের মধ্যে আরো রয়েছে ছাত্র পরিষদের উপদেষ্টা কমিটিতে লক্ষ্মীকান্ত বসুকে ঠাঁই দেওয়ার প্রস্তাব। তেমনই আনন্দমোহন বিশ্বাস জায়গা পাবেন যুব কংগ্রেসের উপদেষ্টা পরিষদে। তা ছাড়া বারিদবরণ দাস আর সোমেন মিত্র রাজ্য যুব কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হবেন।

দিল্লিতে সফল আলোচনার শেষে চার তরুণ নেতা যান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে তাঁরা জানান যে, এখন থেকে তাঁরা এক হয়ে কাজ করবেন পশ্চিম বাংলার উন্নতির জন্যে। রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাড়তি সাহায্যের দাবি জানান। রাজধানীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা জানালেন, নিচের তলায় বিরোধ মেটাবার জন্যে এরপর তাঁরা যাবেন জেলায়-জেলায়। আসছে বছরের গোড়ায় পাঁচ হাজার ছাত্র আর যুব কর্মী নিয়ে একটা শিবির হবে। তারপর তাঁরা চেষ্টা করবেন রাজ্যে এমন একটা পরিবেশ গড়ে তুলতে যাতে বিভিন্ন প্রগতিশীল আর গণতান্ত্রিক শক্তি শান্তিতে পাশাপাশি থাকতে পারে। কলকাতায় ফিরে এসে চার নেতা বললেন, এখন থেকে তাঁরা মিলেমিশে কাজ করবেন। গঠনমূলক কাজের ভিত্তিতে তাঁরা এই ঐক্যকে মজবুত করে তুলবেন। কাউকে সংগঠনের বাইরে রাখা হবে না, কাউকে অখুশি রাখা হবে না। যাঁর যেমন গুরুত্ব, তিনি তেমন গঠনমূলক কাজের দায়িত্ব পাবেন।

আচমকা নির্বাচন?

কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর হানাহানিতে রাজ্যে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল, সুতরাং এখন এই হানাহানি মিটে যাওয়ায় শাসক দলের সকলেই খুশি। তবে অনেকে মনে করছেন, লোকসভা, এমন কি বিধানসভার নির্বাচনও আসছে বছরের গোড়াতে হতে পারে বলেই এমন চট করে কংগ্রেসী ছাত্র-যুব ঐক্য [illegible]। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী অবশ্য সে-কথা অস্বীকার করেছেন, কিন্তু আচমকা নির্বাচন হতে পারে এমন জনরব প্রবল। ক'দিন আগে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয়ে গেল কলকাতায়। ঐ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, আসছে বছরের গোড়ায় নির্বাচন হতে পারে বলে সি পি এমের ধারণা। এদিকে একটি খবরে দেখা যাচ্ছে, এপ্রিলে লোকসভার নির্বাচন হতে পারে বলে রাজ্য কংগ্রেস সম্ভাব্য প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েও আলাপ-আলোচনা সুরু করে দিয়েছেন। লোকসভার সদস্যপদের জন্যে মনোনয়ন বর্তমান সব সদস্যের মিলবে না, অনেক তরুণ নেতা মনোনয়ন পেতে পারেন, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ লোকসভায় যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, এই সব কথা শোনা যাচ্ছে।

আচমকা নির্বাচনের জনরব জোরদার হয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধনের উদ্যোগ সুরু হওয়ায়। এই সংশোধনের কাজ সুরু করার জন্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ীই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার এস এস শর্মা জেলাশাসক আর বিভাগীয় কমিশনারদের এক বৈঠক ডেকে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আসছে পয়লা জানুয়ারি থেকে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ সুরু হবে। শেষ হতে লাগবে এক মাস। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে অনুসন্ধান করে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে। সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করতে লাগবে আরো মাস পাঁচ-ছয়। তবে নতুন ভোটার তালিকা তৈরির চেয়ে বড় কাজ নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস। প্রতি দশ বছর অন্তর লোকগণনার শেষে এই পুনর্বিন্যাস করাটাই নাকি সংবিধানের নির্দেশ। সেই কাজও পশ্চিম বাংলায় সুরু হচ্ছে।

পরীক্ষার নতুন পদ্ধতি

পশ্চিম বাংলা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ঠিক করেছেন, তাঁরা পরীক্ষা নেওয়ার নতুন পদ্ধতি চালু করবেন। এগার ক্লাসের জায়গায় দশ ক্লাসের ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিও চালু হবে। এতদিন হায়ার সেকেন্ডারি বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে পাস করতে হতো। নতুন ব্যবস্থায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে প্রতিটি গ্রুপে শতকরা ৩৪ ভাগ নম্বর পেতে হবে। এইরকম গ্রুপ থাকবে চারটি: ভাষা (৪০০ নম্বর), বিজ্ঞান (৩০০), ভারত ও তার মানুষ (২০০) এবং কর্মশিক্ষা (১০০)। তবে একটি গ্রুপের প্রতিটি বিষয়ে কম করে শতকরা ২০ ভাগ নম্বর না পেলে ঐ গ্রুপে পাস করা যাবে না। কোনো গ্রুপ বা বিষয়ে অকৃতকার্য হলে সেই গ্রুপ বা বিষয়ে আবার পরীক্ষা দেওয়া যাবে। তা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষাও চালু হবে। এই পরীক্ষা নেবেন বাইরের পরীক্ষকরা। ১৯৭৬ সাল থেকে এই নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া সুরু হবে।

দশ ক্লাসের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ক্লাসের আগে মাঝের দুবছরের জন্যে যে ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্যক্রম চালু করা হবে তার তদারকি কে করবে তা অবশ্য এখনও ঠিক হয় নি। এই পাঠ্যক্রম স্কুলেই পড়ানো হবে, না কি কলেজে, তাও ঠিক হয় নি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অবশ্য চাইছেন, এই পাঠ্যক্রম তদারকির দায়িত্ব তাঁদের হাতেই দেওয়া হোক।

দেশে বিদেশে

সংসদের শীত অধিবেশন

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন পূর্ব-নির্দিষ্ট তারিখেই সমাপ্ত হল। এবারকার এই ছয় সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনের মত ঘটনাবহুল অধিবেশন অতীতে আর কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই ছয় সপ্তাহের বৈঠকের প্রায় সবটাই জুড়ে ছিল লাইসেন্স কেলেঙ্কারি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রসঙ্গ। সি-পি-আই বাদে অন্য বিরোধী দলগুলি যে প্রসঙ্গটিকে সরকারের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে রেলমন্ত্রী ললিত-নারায়ণ মিশ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর তার প্রমাণ বিরোধীপক্ষ শেষ পর্যন্ত দিয়ে গেছেন। লাইসেন্স কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গে সি-বি-আই রিপোর্ট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র দেখার অধিকার অনিচ্ছুক সরকারের কাছ থেকে আদায় করেই বিরোধী সদস্যরা ক্ষান্ত থাকেন নি, ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে ললিতনারায়ণ মিশ্রের আচরণ সম্পর্কে নতুন করে পার্লামেন্টারি তদন্তের দাবি তুলে তাঁরা সরকারের উপর চাপ শেষ পর্যন্ত বজায় রেখে গেছেন। অধিবেশনের শেষের দিকে বিরোধী সদস্যরা ললিতনারায়ণের বিরুদ্ধে পর পর আরও দুটি অভিযোগ এনে তাঁরা তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। একটি অভিযোগ হচ্ছে এই যে, ১৯৭১ সালে তিনি সিঙ্গাপুর থেকে পলিয়েস্টার তন্তু আমদানি করার জন্য একটি দাগী ফার্মকে লাইসেন্স মঞ্জুর করেছিলেন। দ্বিতীয় অভিযোগটি হল, কুশী পরিকল্পনায় তিনি ভারত সেবক সমাজের তহবিলের অপব্যবহার করেছিলেন।

বিতর্কগুলি মুলতুবি রয়েছে এবং বিরোধী সদস্যরা যে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনেও এইসব বিতর্কের জের টানতে ছাড়বেন না তার যথেষ্ট আগাম ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।

তুলমোহন প্রসঙ্গের পাল্টা চাল হিসাবে কংগ্রেস ও সি-পি-আই অধিবেশনের শেষের দিকে নির্দলীয় সদস্য রামনাথ গোয়েঙ্কার বিরুদ্ধে অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ এনে বিরোধী সদস্যদের নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেস পক্ষ থেকে বলা হয়, যে শ্রীগোয়েঙ্কা জালজুয়াচুরি করে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের টাকা নিয়েছেন এবং তুলমোহন রামের চেয়ে তিনি অনেক বড় কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত। আরও অভিযোগ করা হয় যে শ্রীগোয়েঙ্কা কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে আর্থিক সাহায্য করছেন এবং বলে বেড়াচ্ছেন, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া হলে তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবেন। বিরোধী সদস্যরা বলেন যে, সংসদের কোন সদস্য যদি সংসদের বাইরে কোন কাজের জন্য অভিযুক্ত হন এবং তাঁর সেই আচরণ সম্পর্কেও যদি সংসদে আলোচনা করতে হয় তাহলে অশোক সেন ও তায়ের হোসেনের মত কংগ্রেস সদস্যের আচরণ নিয়েও আলোচনা করতে হয়। বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত অভিযোগে অশোকবাবুর পাসপোর্ট আটক করা হয়েছে এবং তায়ের হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

*

নির্বাচনের বাজনা ?

সরকারিভাবে বারবার অস্বীকার করা সত্ত্বেও লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলছেই। নির্বাচন কমিশন অবশ্য ইতিমধ্যে জানিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসের কাজ সমাপ্ত করে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে ১৯৭৫ সালের জুলাই মাস এসে পড়বে। তা যদি হয় তাহলে পুনর্বিন্যাস্ত নির্বাচন কেন্দ্রের ভিত্তিতে নির্বাচন করা ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের আগে সম্ভব হবে না। রাজ্যসভায় এন জি গোরে ও অন্যান্য কয়েকজন সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে আইন, বিচার ও কোম্পানিবিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সরোজিনী মহিষী বলেছেন লোকসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আচমকা নির্বাচন করার কোন সিদ্ধান্ত সরকার নেন নি। এ সম্পর্কে বাইরে যেসব কথাবার্তা চলছে সেগুলি নিছক জল্পনা-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আচমকা নির্বাচন যাতে করা যায় সেজন্য সরকার সংবিধান সংশোধন করে নির্বাচন কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস কমিশনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছেন, এই রটনাও ডঃ মহিষী অস্বীকার করেছেন।

সরকারি এই অস্বীকৃতি সত্ত্বেও যেসব রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক অকাল নির্বাচনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে চাইছেন না তাঁদের ধারণা, এ ব্যাপারে আইনের বাধাটা অলঙ্ঘনীয় হবে না। যেমন এটা লক্ষ্য করা হয়েছে যে, নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস্ত কেন্দ্রগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে, একথা আইনে বলা হলেও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২১ নম্বর ধারায় এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম করার ক্ষমতাও নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া আছে। তাছাড়া, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যদি আগামী মার্চ মাসে নির্বাচন ডাকার প্রয়োজন অনুভব করেন তাহলে আইন অনুসারে ফেব্রুয়ারি মাসে নোটিশ দিলেই চলবে, এত আগে থেকে তাঁর হাতের অস্ত্র দেখাবার কোন দরকার নেই।

শ্রীমতী গান্ধী অকস্মাৎ লোকসভার নির্বাচনের ডাক দিতে পারেন, একথা যাঁরা মনে করছেন তাঁরা তাঁদের অনুমানের সপক্ষে অনেকগুলি ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন। যেমন, প্রথমে নারোরাতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, তারপর রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের যেসব শিক্ষাশিবির হচ্ছে সেগুলি নির্বাচনের প্রস্তুতি বলে মনে হচ্ছে। দশ লক্ষ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তার সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্কটা স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়াই খোলাখুলিভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রতি পোলিং বুথ পিছু যাতে অন্তত দুজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই দশ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হচ্ছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শেষে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী যে সমাপ্তি ভাষণ দিয়েছেন তার কয়েকটি কথাও এদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ ভাষণে তিনি কংগ্রেস এম-পিদের নিজের নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে উদ্যোগী হতে পরামর্শ দিয়েছেন। এটাকেও নির্বাচনের প্রস্তুতির লক্ষণ বলে গণ্য করা হচ্ছে।

*

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য

দিল্লিতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ দুই দেশের মধ্যে নতুন বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য-চুক্তি চালু আছে তাতে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ভারত ও বাংলাদেশ পরস্পরের কাছ থেকে যে পণ্য আমদানি করবে তার দাম তারা শোধ করে দেবে পরস্পরের কাছে সমমূল্যে পণ্য রপ্তানি করে। কথা ছিল এভাবে দুই দেশের মধ্যে মোট ৬০ কোটি টাকা দামের পণ্যের সুষম লেনদেন হবে। কিন্তু ঐ দুটি আশার কোনটিই পূর্ণ হয় নি। চলতি বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ এই বছরই শেষ হবে। অথচ এর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের পরিমাণ ১৬ কোটি টাকার অঙ্ক ছাড়ায় নি। বাংলাদেশও তার পণ্যের দ্বারা আমদানি-করা ভারতীয় পণ্যের দাম শোধ করতে পারে নি।

এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবার দুই দেশের মধ্যে যে নতুন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হল সেটা অনেক বেশি বাস্তবতা-সম্মত। এই নতুন চুক্তিতে স্থির হয়েছে যে, বাণিজ্য হবে অবাধে বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায়। অর্থাৎ, পাউন্ড স্টার্লিং বা ডলারের অঙ্কে উভয় দেশের মধ্যে দেনাপাওনার পরিমাণ স্থির করা হবে।

দুই দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীই আশা প্রকাশ করেছেন যে নতুন চুক্তিতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।

২২-১২-৭৪ —পুণ্ডরীক

পটভূমি

বিধানসভা কি থাকছে ?

মন্ত্রিসভার কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ডাক দেবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। খবরটা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পেয়েছি। তবে একথা এখন পর্যন্ত জানা যায় নি যে, এই পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন কিনা? কিন্তু ঐ গোপন শলাপরামর্শের সময় তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলি অবশ্য শুনেছিলেন।

কথা শুনলে কি হয়, সিদ্ধার্থবাবুর 'মুড' বোঝা এক অসাধ্য সাধনা। কারণ, গত কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেছে ক্ষণে ক্ষণে কারণে বা অকারণে তাঁর 'মুড' বা কথার পরিবর্তন হয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞমহল অবশ্য বলবেন, এটাই হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতি। এই স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ না করলে তিনি ভারসাম্য বজায় রেখে দলের নেতার পদে থাকতে পারতেন না। উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে নয়। মাস দুই আগে তিনি হঠাৎ তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কাছে গিয়ে বললেন ঃ না, আর পারা যাচ্ছে না। মন্ত্রিসভাকে একটু 'স্ট্রীম লাইন' করা উচিত। তা না হলে কাজ এগুচ্ছে না। ঐ সহযোগী মন্ত্রী-মহোদয় ধরে নিলেন সিদ্ধার্থবাবু তাঁর পরামর্শ চাইছেন রাত জেগে তিনি তাঁর পরামর্শ একটুকরো কাগজে লিখে খামে 'সীল' করে তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর দু'মাস কেটে গেলো খামের কোন পাত্তা নেই। ঐ সহযোগীর সঙ্গে পরে মুখ্যমন্ত্রীর বেশ কয়েকবার গোপনে দেখা হয়েছে। কিন্তু কোন সময়ে তিনি এ-প্রশ্ন আর তোলেননি। ফলে মন্ত্রীর পক্ষেও 'সীল'-করা খামের ভাগ্যে কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে প্রশ্ন করারও সাহস হয়নি।

এবার হয়তো মনে করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর কিছুটা সাহস হবে। কারণ, কংগ্রেসের ভেতরের ছাত্র ও যুবদের মতপার্থক্য ঘুচে গেছে বলে বাইরে ঘোষণা করা হচ্ছে। সামনে হয়তো বা পার্লামেন্টের নির্বাচন। অতএব এই সময় রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন যদি করিয়ে নেওয়া যায় তাহলে অনেকদিক থেকে সুফল পাওয়া যেতে পারে। যেমন, (১) অন্ততঃ নির্বাচনকে সামনে দেখতে পেয়ে কংগ্রেসী ছাত্র ও যুবরা এক হয়ে লড়বে। নচেৎ দুই দলের লড়াই-এর মধ্যে কংগ্রেস দিনের পর দিন তলিয়ে যাচ্ছিল। (২) নতুন নির্বাচন হয়ে গেলে অনেক ঝড়তি-পড়তি বাদ যাবে। তাহলে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধে দূর হয়ে যাবে এবং (৩) এ-কারণটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবচেয়ে বেশী জরুরী। তিনি সুযোগ পেলেই স্থায়ীভাবে দিল্লী চলে যেতে চাইছেন। গত দু'বছর ধরে চেষ্টা করে তিনি কিছু করতে পারেননি। পার্লামেন্টের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য বিধানসভার 'ইলেকশন' হলে মুখ্যমন্ত্রী অনায়াসেই লোকসভার প্রার্থী হতে পারবেন। এবং এখানকার কংগ্রেসী নেতারা তাঁর বদলে অন্য কাউকে নেতা নির্বাচনের সুযোগ পাবেন। এর ফলে ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধার্থবাবুকে জোর করে পশ্চিমবাংলায় আটকে রাখতে পারবেন না।

আসলে মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তার এটা হচ্ছে 'পজিটিভ সাইড'; আর 'নেগেটিভ' দিক হচ্ছে, সত্যি সত্যি যদি ছাত্র ও যুবদের মধ্যে মিল হয়ে গিয়ে থাকে (যা তাঁরা বলছেন), তাহলে এদের মধ্যে সমবেতভাবে যে-শক্তির সঞ্চার হবে, প্রয়োজন হলে সেই শক্তি যে-কোন মন্ত্রী এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকেও পর্যদস্ত করতে পারে। বিশেষ করে বর্তমানের ছাত্র ও যুবদের মধ্যে সবাই যে সিদ্ধার্থবাবুর অনুগামী তা বলা চলে না।

মুখ্যমন্ত্রীকে বারংবার বলতে শোনা গেছে, না আর নয়, আমি চলে যেতে চাই। আপনারা নেতা নির্বাচন করুন। গত দু' বছরে গোপন শলাপরামর্শ বা প্রকাশ্য সভায় তিনি এ-কথা বহুবার বলেছেন। মাঝখানে তাঁর এই উক্তির কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল। আবার সম্প্রতি তিনি এ-কথা বলতে শুরু করেছেন। কিছুদিন আগে নাকি তিনি এক মন্ত্রী বন্ধুর কাছে প্রাণের কথা শোনাতে গিয়ে তিনজন নেতার নাম করে বলেছেন এই তিনজনের মধ্যে আপনারা একজনকে বেছে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করুন।

আবার কেন অন্য লোককে মুখ্যমন্ত্রী করার পরামর্শ সিদ্ধার্থবাবু দিচ্ছেন? এই প্রশ্নটা এখন রাজনীতিবিদদের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে পার্লামেন্টের নির্বাচন এলে তিনি কি একা পঃ বঙ্গ থেকে সরে গিয়ে দিল্লীর জন্য প্রার্থী হবেন? না, রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিয়ে অন্য লোককে তিনি নিজে নেতার পদে বসিয়ে চাবিকাঠি হাতে রাখতে চান?

তবে তিনি যাই করুন না কেন, বর্তমানের এই সকল সহকর্মীদের নিয়ে তিনি যে চলতে পারছেন না তা পরিষ্কার। এবং এটা যেমন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সংগঠনের ব্যাপারেও। বিশেষ করে জানুয়ারী মাস শেষ হওয়ার আগেই বিচারপতি ওয়াংচুর রিপোর্ট বেরিয়ে যাবে। ফলে অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠবে। তথ্যাভিজ্ঞমহল আরো মনে করছেন, এর পরে কমপক্ষে মন্ত্রিসভার বিশেষ দুই সদস্যকে নিয়ে একত্রে প্রশাসন চালানো সম্ভব নয়। অতএব এঁদের বিদায় দিতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন এসে যাবে। অর্থাৎ মন্ত্রী করা বা বাদ দেওয়ার ব্যাপারে দর কষাকষি আরও হয়ে যাবে।

তবে কথা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যি সত্যি রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেবার পরামর্শ দেন, তাহলে মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন কেন আসবে? এ-প্রশ্ন আসার একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও এম এল এ পুরো টার্ম চালিয়ে যেতে চাইছেন। যাহোক, এটা আজ রাজনীতিবিদদের মনে হচ্ছে আসছে জানুয়ারী মাসটা রাজ্যের রাজনীতির ক্ষেত্রে বেশ উত্তেজনার সময় হয়ে উঠবে। এ-সময় সবদিক থেকে ব্যস্ত হবার মত কতকগুলি ঘটনা যে ঘটতে চলেছে, তার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

—কৌটিল্য

ডঃ স্নেহলতা বসু, এম.বি.বি.এস
ডঃ এস. এম. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬.
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বর্ণচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬.টাকা পাঠালে ডাকমাশুল ফ্রি

গোয়েন্দা ধাঁধা

ডোরাকাটা ফিতে ।।

শার্লক হোম্‌স্‌ ॥

স্যার আর্থার কোনাল ডায়াল

সাতসকালে মেয়েটা দৌড়ে এল দেশের বাড়ী থেকে শার্লক হোমসের ডেড়ায়। চোখ রগড়াতে রগড়াতে ওয়াটসনকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকল হোম্‌স্‌। শুরু হল সেই রোমাঞ্চকর ভয়ংকর কাহিনী।

মেয়েটার নাম হেলেন। ওর যমজ-বোনের নাম জুলিয়া। ওদের জন্ম ভারতবর্ষে। মা বিধবা হবার পর ফের বিয়ে করে স্টক মোরানের অতি প্রাচীন রয়লট পরিবারের শেষ বংশধর ডাক্তার রয়লটকে।

ডাক্তার রয়লট পড়ন্ত জমিদার বংশের বাড়ী আঁকড়ে পড়ে না থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন পশার জমাতে। কিন্তু চন্ডাল স্বভাবের জন্যে শেষ পর্যন্ত জেল খেটে ফিরতে হয়। বিয়ে করেন জুলিয়া আর হেলেনের মা-কে।

ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেল যমজ বোনের মা। মারা যাবার আগেই তার বিপুল সম্পত্তি লিখেপড়ে দিয়েছিল ডাক্তারকে। শুধু সুদই পাওয়া যেত শ'খানেক পাউন্ডের মত। একটা সর্ত ছিল উইলে। মেয়েদের বিয়ে হলে কিছু টাকা দিতে হবে তাদের। অর্থাৎ সৎমেয়েদের বিয়ে দিলে লোকসান বি-পিতার-ই।

স্টক মোরানে ফিরে আসার পর থেকেই দিনে দিনে আরো উগ্র হয়ে উঠল ডাক্তারের মেজাজ। পুলিশ-কোর্ট পর্যন্ত দৌড়োতে হয় গোটা দুই মামলার নিষ্পত্তি করবার জন্যে। কারও সঙ্গে মিশতেন না ডাক্তার। কেউ মিশতেও চাইত না। বন্ধু বলতে ছিল একদল ভবঘুরে বেদে। কাঁটাঝোপভর্তি বাগানে বেদেদের থাকতে দিয়েছিলেন ডাক্তার। মাঝে মাঝে নিজেও থাকতেন ওদের তাঁবুতে। কখনো-সখনো বেদেদের সঙ্গে হাওয়া হয়ে যেতেন দিন-কয়েকের জন্যে।

ডাক্তারের আরো একটা বিটকেল সখ হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে। ভারতবর্ষ থেকে জন্তু জানোয়ার আমদানী করেন। বাগানের মধ্যেই একটা চিতা আর একটা বেবুনকে পোষেন। যত হিংস্র জীবের সঙ্গেই তাঁর ওঠাবসা—মানুষের সঙ্গে নয়।

বছর দুই আগে বিয়ের ঠিক হল জুলিয়ার। ডাক্তার বাধা দিলেন না। কিন্তু তারপর থেকেই প্রতি রাত্রেই একটা শিস শুনতে পেত জুলিয়া। শব্দটা শুধু জুলিয়ার কানেই আসত রাত তিনটে নাগাদ—হেলেন শুনতে পেত না। অথচ দুই বোন শোয় পাশাপাশি ঘরে। প্রথমে হেলেনের ঘর, তারপর জুলিয়ার ঘর, সবশেষে ডাক্তারের ঘর। তিন ঘরের জানলার সামনে লন এবং দরজার সামনে টানা বারান্দা। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার পথ নেই।

আওয়াজটা যদি লন থেকেই আসবে তো হেলেন শুনতে পায় না কেন? প্রতি রাত্রে জুলিয়ার ঘুম ভেঙে গেছে শিসের শব্দে। সেই সঙ্গে নাকে ভেসে এসেছে ভারতীয় চুরুটের কড়া গন্ধ—ও-বাড়ীতে শুধু ডাক্তারই খান ভারতীয় চুরুট। প্রতি রাতে তিনিও তাহলে জেগে ওঠেন শব্দ শুনে?

বিয়ের ঠিক সাত দিন আগে এক রাতে বিকট চীৎকার শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল হেলেন। জুলিয়ার চীৎকার, একটা মৃদু শিসের শব্দ এবং পরক্ষণেই ঝনঝন শব্দে যেন একরাশ বাসন পড়ার আওয়াজ শুনেই তেড়েমেড়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। টানা বারান্দায় পা দিয়ে দেখল আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে জুলিয়ার ঘরের দরজা। ভেতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল জুলিয়া। চোখমুখ আতংকে যন্ত্রণায় বিকৃত। আচ্ছন্নের মত ডাক্তারের দরজা দেখিয়ে বোধহয় ডাক্তার ডাকতেই চাইল। শেষ মুহূর্তে শুধু বলল দুটি কথা—'কী ভয়ংকর! ডোরাকাটা ফিতে!'

মারা গেল জুলিয়া। করোনারের তদন্তে মৃত্যুর কারণ বার করা গেল না। দরজা-জানলাও ভেতর থেকে বন্ধ। অথচ নিশীথ রাতের নিষ্ঠুর নাটক প্রাণ হরণ করে নিয়ে গেল তার।

এবার এসেছে হেলেনের পালা। দিন পনেরো আগে বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছে হেলেন। ডাক্তার এবারও আপত্তি করেননি। কিন্তু কাল রাতেই আবার শোনা গেছে সেই ভয়ংকর শিসের শব্দ। নিজের ঘরে মিস্ত্রী লেগেছে বলে পাশেই জুলিয়ার ঘরে শুতে হয়েছিল হেলেনকে। শিসের শব্দ শুনেই রাত ফুরোতে না ফুরোতে দৌড়ে এসেছে শার্লক হোমসের কাছে—বাঁচবার তাগিদে।

হোমস সব শুনে গম্ভীরকণ্ঠে বললে—'আমি আপনাদের জমিদারবাড়ীটা গিয়ে দেখতে চাই। ডাক্তারের অবর্তমানে তাঁর ঘরটাও দেখতে চাই। ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

'পারবো।'

'তবে নির্ভয়ে বাড়ী যান। শার্লক হোমস আপনাকে রক্ষা করবে।'

হেলেন বিদায় হতে না হতেই মূর্তিমান ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল ঠিক যেন একটা মানব-দানব—ডাক্তার রয়লট স্বয়ং। শাসিয়ে গেল হোমসকে, সৎ-মেয়ের প্যান-প্যানানি শুনে যদি তাঁর পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে আসে হোমস—তাহলে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে তবে ছাড়বেন।

বিদ্রূপ হাসি হেসে ডাক্তারকে বিদায় করল হোমস। যথাসময়ে এল স্টক মোরানে সঙ্গে ওয়াটসন। ডাক্তারের অবর্তমানে হেলেন ওদের নিয়ে গেল প্রথমে নিজের ঘরে। হোমস লক্ষ্য করল, সে ঘরে মিস্ত্রী না লাগালেই চলত। অর্থাৎ হেলেনকে কায়দা করে সরানো হয়েছে জুলিয়ার ঘরে।

জুলিয়ার ঘরে ঢুকে হোমস তাজ্জব হয়ে গেল তিনটে অদ্ভুত জিনিস দেখে। ইঁদুর গলবার মত একটা ঘুলঘুলি রয়েছে ডাক্তারের ঘর আর জুলিয়ার ঘরের মাঝের দেওয়ালে। কেন? ঘুলঘুলি তো থাকে বাইরের দেওয়ালে বাইরের বাতাস ঘরের ভেতরে আনার জন্যে।

দ্বিতীয়তঃ, একটা দড়ি ঘুলঘুলির হুক থেকে ঝুলছে বিছানার ওপর পর্যন্ত।

তৃতীয়তঃ, জুলিয়ার খাটটা মেঝেতে আংটা দিয়ে আটকানো।

এবার ডাক্তারের ঘর। ঘরের মধ্যে একটা সিন্দুকের ওপর এক কাপ দুধ দেখে চমৎকৃত হল হোমস—'কী ব্যাপার? সিন্দুকের মধ্যে বেড়াল জাতীয় চিতা নেই তো? কিন্তু এক কাপ দুধে কি বেড়াল বা চিতার পেট ভরে?' বিছানার পাশে রাখা ডগায়-ফাঁসওলা একটা চাবুক দেখে শুধু ভুরু কোঁচকালো। সবশেষে আসনপিঁড়ি হয়ে মেঝেতে বসে আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করল ঘরের একমাত্র চেয়ারের বসবার কাঠটা।

আসবার সময়ে বললে—'গভীর জলের মামলা। ঘরের জানলায় মোটা শিক। বাইরে থেকে ঢোকা সম্ভব নয়। সুতরাং বিপদ আছে ঘরের মধ্যেই।'

সেই রাতেই ভাঙা জমিদারবাড়ীতে ফের আবির্ভূত হল শার্লক হোমস আর ওয়াটসন। পকেটে রিভলবার, হাতে বেত আর দেশলাই মোমবাতি নিয়ে শিবনেত্র হয়ে বসে রইল আংটা দিয়ে আটকানো খাটের ওপর। হেলেনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নিজের ঘরে।

নিশুতি রাতে শোনা গেল শিসের আওয়াজ। নাকে ভেসে এল গরম ধাতু আর পোড়া তেলের গন্ধ। অর্থাৎ লণ্ঠন

জ্বলছে। ঘুলঘুলিতে দেখা গেল আলোর ঝলক। সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত শব্দ—যেন কেটলী থেকে স্টীম বেরুচ্ছে।

লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দেশলাই জ্বালল হোমস। পরক্ষণেই পাগলের মত সপাং সপাং করে বেত মেরে চলল ঝুলন্ত দড়িটার ওপরে। সেই সঙ্গে আতংক-বিহ্বল চীৎকার — 'ওয়াটসন! ওয়াটসন! দেখতে পাচ্ছো না?'

বন্ধুবরের ভয়ে পাংশু মুখ ছাড়া ওয়াটসন আর কিছুই দেখতে পেল না। তবে বেত মারা বন্ধ হতেই কানে ভেসে এল একটা লোমহর্ষক চীৎকার। রক্তজল করা সেই মরণ চীৎকার শোনা গেল ডাক্তারের ঘরে।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল হোমস। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকল ডাক্তারের ঘরে। দেখল, চেয়ারে বসে ডাক্তার রয়লট। বিস্ফারিত চোখ ঘুলঘুলির দিকে নিবদ্ধ। নিথর দেহে প্রাণ নেই।

কপাল ঘিরে রয়েছে শুধু একটা হলদে ফিতে। তাতে বাদামী ডোরা। সহসা সেই অদ্ভুত পাগড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল রুইতনের মত একটা চ্যাপটা মোটা কুৎসিত মাথা।

বলুন তো কার মাথা?

অদ্রীশ বর্ধণ

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ২৯ পাতায়)

২'টি ফসফোমিন টনিক...

ফসফোমিন আয়রন

মেয়েদের জন্যে আয়রন টনিক

ফসফোমিন আয়রন শরীরে আয়রন বাড়াবার এক অতিরিক্ত উপায় যা রক্তকে লাল করতে আর শরীরে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দিন নিন মেয়েদের জন্যে তৈরী এক আয়রন টনিক — ফসফোমিন আয়রন।

ফসফোমিন ভিটামিন

পরিবারের সকলের জন্যে ভিটামিন টনিক

ফসফোমিন-এ আছে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন আর পুরো মাত্রায় মিসারোফস্‌ফেট্‌স যা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে ২'টি ফসফোমিন টনিক

ফসফোমিন টনিক খিদে বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যোগায় আর প্রফুল্ল করে তোলে।

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS LTD. ©ই আর স্কুইব ও সন্স ইনকর্পোরেটেড রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী লাইসেন্সধারী প্রতিনিধি এস. সি. এল.

Shilpi SC 8A/74 ben

কবিতা

সাপ ॥

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তোমার রক্তে এক সাপ আছে।
আমি যতোবার
ভেবেছি এখন থেকে শান্ত খেলা হবে—
স্তব্ধ হ্রদের মতো তুমি ছড়াবে একেলা
একদিন দুদিন আমি নৌকো ক'রে যাবো।

দু'এক মুহূর্ত তুমি হয়তো বা প্রকৃতির মতো
গাছ-ফুল-জলের আড়ালে
নিজেকে ঢেকেছো,
দু'এক মুহূর্ত কোনো শব্দ করোনি।
কিন্তু তার পরে তুমি একটু একটু বিষ
উগ্‌রে দিয়েছো। তুমি সমস্ত ছোবল
আমাকে লক্ষ্য করে বাড়িয়ে রেখেছো।

আমি এরকম প্রেম বুঝতে পারি না।

তোমার রক্তে এক সাপ আছে।
তোর কুণ্ডলীর আস্ফালন থেকে
কোনোদিন মুক্ত হবো না।।

সহজীবন ॥

সামসুল হক

স্মৃতির শস্যের গন্ধ চুরি ক'রে মনীষার স্বেদ তাকে
ডমরুর মতোন বাজায়
ডমরুর শব্দের জরায়ু থেকে সুন্দরের অধিকার রক্তমাংসহ নেমে আসে
স্বপ্নের শস্যের ক্ষেতে লাঙলের ঠোঁটে তীক্ষ্ণ বেজে ওঠে
কৃষাণীর করোটির শাঁখ
সে-সময় স্বর্গের চিতার ছাই মানুষের অভিকর্ষে
যন্ত্রধাস্যের অবয়বে নেমে
ঈশ্বরের পরিত্যক্ত জন্মের শহর ঘিরে জননীর চোখে
ঠায় পাহারায় থাকে

এখন স্মৃতি ও স্বপ্ন খরার জ্যোৎস্নায় শিশুদের নীল অশ্রুর
উপরে ফুটে আছে
সহজীবনের জন্যে প্রস্তুত মেধা ও শ্রম দগ্ধ পুকুরের
মাঝখানে চলে যায়

ওভারহেড লাইন ॥

পরেশ মণ্ডল

না
ভিস্যুভীয়স না
কিংবদন্তীর 'নগ্‌গর' না
তুমি
ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের ওপরে
ওভারহেড লাইন
তোমার চোখ চোখ নয়
সমুদ্র
সমুদ্র নয়
রাইফেলের ছটন্ত গুলি

এভারেস্টের মাথায় চড়ে
যখন নিশান পুঁততে যাচ্ছে
তুমি
রুমাল উড়িয়ে
বিদায় জানালে
জাহাজের বাঁশি বেজে উঠল।

নারকাণ্ডা ১৯৭২ ॥

পরেশ মণ্ডল

এখানে নৈঃশব্দ্য এখানে হিমালয়
হিমালয়ের এই বুকের মৌনতায়
সুন্দর নারকাণ্ডা
দিগন্তজোড়া বরফের শাদা
পাইনের গভীর সবুজ ছড়ানো
বড্ড ভালো লাগছে
তবু যেন একটুখানি কিন্তু রয়ে গেছে
কেননা
তোমার ভর্ৎসনা নেই।
ভারতবর্ষ
বলতে ইচ্ছে করছে
তোমাকে আমি ভালোবাসি
এখানে প্রশান্তি এখানে হিমালয়।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দু ভাই। ভবনাথ বড়। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতার ছোট আদালতে ওকালতী পরীক্ষা দেওয়া দেবনাথের হল না। পরে বিদেশে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরেছেন।

আষাঢ় মাস। এবারে রথের সঙ্গে ঈদ ও রবিবার জুড়ে গিয়ে কাছারি তিন দিন বন্ধ। মাদার ঘোষ হারু কন্টু এবং হিমচাঁদ গড়মণ্ডলে চললো রথের মেলা দেখতে। হারুর মতলব আবার শুধু রথ দেখা নয় থিয়েটারের সিন আঁকার কত দূর কী হল তাও একবার সরেজমিনে দেখে আসা।

এদিকে পুজো প্রায় আসি আসি। হারু সরকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিহার্শালের লোক ডেকে বেড়াচ্ছে। ছোট কর্তা বরদাকান্ত জলচৌকিতে বসে ফর্দের ছড়ছুট ধরিয়ে দিচ্ছেন। দেবনাথ বাড়ি আসছেন। সঙ্গে বিস্তর মালপত্তর—কলকাতা থেকে কেনাকাটা করে নিয়ে আসছেন।

কতকাল পরে ভরা বিলে নেমেছেন বলে দেবনাথের রোমাঞ্চ লাগে। এই পথটাই বেশী চালু। বিল ভেঙ্গে গাঙ-খাল পাড়ি দিয়ে নপাড়া স্টেশনে ট্রেন ধরা, আবার ট্রেন থেকে নপাড়ায় নেমে বাড়ি যাওয়া। শুকনোর সময়টা হাঁটতে হাঁটতে পায়ের নাল ছিঁড়ে যেত। বর্ষার সময়টা মজা, এই আজকের মতন।

এই অকুল সমুদ্রে লাইট হাউস বানিয়ে দিয়েছিলেন চাঁদুবাবু। যার পোষাকী নাম চন্দ্রকান্ত ঘোষ।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নেবা নাকি?

দেবনাথ বললেন, দাও চাট্টি—

নয়না, পুঁটি, তারাবাইন টোরাকই-হরকয়লা মাছ। বঁটকন্দাজ পাত্রের অভাবে গামছা পেতে ধরল—শানকিতে মাছ তুলে এক শানকি ঢেলে দিল গামছায়। আরও কয়েকটা দিতে যাচ্ছে দেবনাথ আপত্তি করে উঠলেন ঃ উঁহু, আর নয়। কুচোমাছ কোটা-বাছা করবে কে এত? পৌঁছুতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে—ঘরে কি আছে না-আছে তাই কিছু সম্বল করে যাওয়া। কত দিতে হবে, বলো।

দাও যা হয়। হাট-বাজার নয় টোঙে এসে মাছ চাইলে, দরদাম কি করতে যাব? যেমন খুশি দিয়ে দাও।

দেবনাথ বললেন আমি বাইরে থাকি, দরদাম কিছু জানি নে। মাঝি, তুমিই বলে দাও উচিত দাম কি হতে পারে।

গামছার মাছ মাঝি একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখল। বলে সিকি একটা দিয়ে দেন বাবু—

গেঞ্জি খুলে দেবনাথ বললেন, টাকার ভাঙানি হবে তো?

টোঙের মানুষ ঘাড় নাড়ল ঃ উঁহু, বিলের মধ্যে কেনাবেচা কোথায়? তা ছাড়া পয়সাকড়ি কিছু হলেই সঙ্গে সঙ্গে অমনি ঘাড়ি রেখে আসি।

দেবনাথ বললেন, খুচরো চার আনা তো হচ্ছে না—আনা দুই হতে পারে। এক কাজ করো অর্ধেকগুলো মাছ তুলে নাও তুমি।

যা দেওয়া হয়েছে, আবার তা তুলতে যাবো কেন? যা আছে দিয়ে যাও। বাকি পয়সা যে দিন হয় দিয়ে যেও। না দিলেই বা কী?

ঘাটে ডিঙি লাগল। ভর সন্ধ্যাবেলা। বাড়ির লাগোয়া উলুক্ষেত হাটখোলা ও আমবাগান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সামান্য কয়েকখানা ধানক্ষেত পার হয়ে গিয়ে। শুকনোর সময় একদৌড়ে গিয়ে ওঠা যায়। এখন ভাঙা-পথে অনেকখানি ঘুরে প্রায় অর্ধেক গ্রাম চক্কোর মেরে বাড়ি পৌঁছতে হবে। দেবনাথ চললেন বরকন্দাজ দুজন নৌকো আগলে রইল।

নতুন মণ্ডপে ছেলেপুলের ভিড়। প্রতিমা চিত্তির হচ্ছে—দু-পাশে দুই জ্বলন্ত-লণ্ঠন, আলোয় অনেক দূর অবধি উদ্ভাসিত হয়েছে। কমল-পুঁটিও সেখানে — সকলের আগে কমল দেখেছে, বাবা বাবা করে ছুটতে ছুটতে এসে সে বাপের হাত ধরল। মণ্ডপের সামনে এসে দেবনাথ মুহূর্তকাল দাঁড়ালেন। চার কারিগর কাজে লেগে আছে—রাজিব-পুরের পালেদের চারজন।

দেবনাথ বললেন, এখনো সারা হয় নি? চালাচিত্তির ধরোই নি, দেখতে পাচ্ছি।

মাতব্বর কারিগর বলে, যত রাতই হোক হাতের কাজ সারা করে বেরুব। দিনমানে কাজ আমাদের গাঁয়ে ভটচাজ্জি-বাড়িতে। সন্ধ্যেয় আবার আসব এসে চালাচিত্তির ধরব। চার হাতে কাজ—কদিন লাগবে? হয়ে যাবে সময়ের মধ্যে। এক বাড়ি তো নয়, সব বাড়ি সমানভাবে সামাল দিয়ে বেড়াচ্ছি।

হাটবার আজ কৃষময় আর মাহিন্দার অটলকে নিয়ে ভবনাথ হাটে চলে গেছেন। রীতিমতো ওজনদার কেনাকাটা—সেই কারণে শিকে-বাঁক ধামা-ঝুড়ি গেছে। বাড়িতে মানুষ কিলবিল করছে। আত্মীয়কুটুম্ব অনেক এসেছেন আরও কেউ কেউ আসবেন। দেখে দেবনাথ বড় খুশি—এমন নইলে যজ্ঞি-বাড়ি কিসের? পায়ের গোড়ায় ঢিবঢাব প্রণাম করছে অধিকাংশই দেবনাথ চেনেন না। বিদেশে পড়ে থাকেন না-চেনা আশ্চর্য নয়। কিন্তু ভবনাথ চিরকাল দেশে ঘরে থেকেও তো চিনতেন না—ছোটকর্তার ফর্দ অনুযায়ী নেমন্তন্ন পাঠিয়েছিলেন, আসবার পথে চেনা-জানা হয়েছে। উমাসুন্দরী ভবনাথের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন ঃ অমুকের অমুক ইনি। আর দেবনাথ বয়স বুঝে প্রণাম করছেন। না করলে ফিরে গিয়ে নিন্দেমন্দ করবে ঃ দেখ দুটো পয়সা রোজগার করে বলে ঘাড় আর নীচু হয় না মোটে। এক বৃদ্ধার পায়ের ধুলো নিতে গেলে ফোকলা মুখ নাচিয়ে না-না-করতে করতে তিড়িং করে তিনি পিছিয়ে গেলেন ঃ কী সর্বনাশ, পায়ে হাত পড়লে পাপ হবে, হিসাব মতন তুমি যে খুড়ো আমার।

উমাসুন্দরী বললেন, বয়েসে তবু তো কত ছোট—

ওটা কি বললে কেষ্টর মা, সাপটা ছোট বলে বিষ তার কি কম হয়ে থাকে?

হিরন্ময় শিশুবরকে নিয়ে নৌকোয় মালপত্র আনতে ছুটল। দুজনে কি হবে—চাষীপাড়া থেকে শিকে-বাঁকসহ আরও কটিকে জুটিয়ে নিল সঙ্গে। তিনটে কাপড়ের বান্ডিল দুমদাম করে রোয়াকে এনে ফেলল। কপালের ঘাম মুছে হিরন্ময় বলে কলকাতার দোকানের যত কাপড় কাকা বেচেছেন সমস্ত তুলে এনেছেন।

দেবনাথ হাসতে হাসতে বলেন, নতুন কাপড় পরে পুজো না দেখলে পুজো আবার কিসের? কিন্তু সকলের জন্য তো হয়ে উঠল না—বাছাই বিবেচনা করে দিতে হবে। অগ্নিমূল্য হয়েছে—ল্যাট্টু ধুতি এই সেদিন চোদ্দ-পনের আনা জোড়া ছিল পাঁচ সিকের কমে তা ছাড়তে চায় না। বেশি মাল নিচ্ছি বলে শেষটা তিন আনায় রফা হল। এ রকম

হলে লোকে তো কাপড় পরা ছেড়ে দিয়ে সেকালের মতন গাছের বাকল পরবে।

তরঙ্গিনী ঘরে ঘরে ডেকে বেড়ান : ওঠো, ঢেঁকশালে চলো। চিঁড়ে কোটা হবে আর কখন? এখন তো পর পর আসতে থাকবে। গোলমালে ঘটে উঠবে না। কলসি কলসি ধান ভেজানো হল, নামাতে হবে তো সেটা।

তরঙ্গিনীর মাথায় জট নড়ে। রাতের এখনো কী হয়েছে—টেমী ধরে ঘরে ঘরে ডেকে তুলছেন। শীত-শীত লাগছে বেশ, আঁচলের মুড়ো ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। এখন শীত ভানা-কোটা শুরু হয়ে গেলে, শীত উড়ে পালাবে। ষষ্ঠীর দিন থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো অবধি ঢেঁকির পাড় পড়তে নেই। কত লোক আসবে, কাজকর্ম করবে—খই-চিঁড়ের বিস্তর খরচ। গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে থাকলে হবে কেন?

ওঠবে বিনি ওঠো বড়বউ, উঠে এসো বসন্তর মা। বলি তিন কলসি ধান ভিজিয়েছ কাল মনে আছে সে কথা?

শুধু ওই এক বাড়ি নয়, বাড়ি বাড়ি এমনি। ঢ্যা-কুচকুচ ঢ্যা-কুচকুচ—সব ঢেঁকি-শালে শোন, শেষ রাত্রি থেকে পাড় পড়ছে।

গ্রাম গুলজার। নিত্যিদিন মানুষ এসে পড়ছে। পুজোর সময় বরাবরই আসে এমনি। বাইরে কাজকর্মে থাকে ছুটি পেয়ে তারা বাড়ি আসে। অন্যান্য বছর পুজো ছিল না, তবু এসেছে—পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, সেটা বড় কম কথা নয়। পুজো বলে এবারে অতিরিক্ত ভিড়। গাঁয়ের মানুষ ছাড়াও ভিন্ন জায়গার মানুষ পুজো দেখবার ইচ্ছায় কুটুম্ববাড়ি আসছে। জোড়া তালতলার ঘাটে যখন-তখন ডিঙি ডোঙা এসে লাগে, জুতো হাতে নিয়ে নেমে পড়ে মানুষ। আবার নাগবগোপ থেকে দেড় ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটেও আসছে সব। চিঠি লেখা আছে অমুক দিন যাচ্ছি। সময় আন্দাজ করে পাকা রাস্তার উপর লোক বসে থাকে। খালি-হাতে কেউ আসে না, কাপড়-চোপড় মিষ্টি-মিঠাই ফরমাসের টুকিটাকি থাকবেই—সেই সমস্ত মজুর বয়ে নিয়ে যাবে। বাড়ির ছেলেপুলে ঘন ঘন হরি-তলা অবধি চলে যায়। ফিরে এসে বলে, নাঃ এলো না আজকে। হঠাৎ মোড় ঘুরে মানুষটি দেখা দিল, পিছনের লোকের মাথায় বোঁচকা-বুঁচকি। এয়েছে এয়েছে—করতে করতে খুচরো এটা-ওটা মানুষটির হাত থেকে নিয়ে ছেলেপুলেরা দৌড় দিল, বাড়িতে আগে আগে গিয়ে খবরটা দেবে। উনুনের আগুন নেভে না আজকাল আর এক খাওয়া মিটতে না মিটতে আবার চড়ে যায়। বউগুলো খেটে খেটে সুখ করে নিচ্ছে। গ্রামের দিন আজকাল ফুড়ুত করে যেন উড়ে চলে যায়, টেরই পাওয়া যায় না। রাত্রে ঘুমে যখন চোখ বন্ধ জড়িয়ে আসে যেখানে হোক একটা মাদুর নিয়ে গড়িয়ে পড়ে, পলকে রাত কাবার হয়ে যায়।

হাটে কেনাকাটার খুব ধুম। সব বাড়ি থেকে হাট করতে যাচ্ছে, ভাল মাছটা শাকটা কেনার জন্য কাড়াকাড়ি। নিতান্ত গরীব মানুষটাও ট্যাঁকের অবস্থা ভুলে বসে আছে : আহা দেশে ঘরে থাকে না, কদিনের তরে এসেছে—নিজেরা খাই না-খাই ওদের পাতে কিছু ভালমন্দ যাতে পড়ে দেখতে হবে বইকি।

এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় চলতে-ফিরতে কত রকম টানের কথা কানে এসে ঢোকে। দত্ত-বাড়ির বউটা খাস কলকাতার মেয়ে—এলুম-গেলুম হলুম বলে কথা বলে। চারি সুরি ফুন্টি মেয়েগুলো হেসে কূল পায় না। ওরা আরও জুড়ে দেয় : গেলুম হলুম হালুম-হুলুম। বলে আর হেসে লুটোপুটি খায়। তেমনি এসেছেন উত্তর বাড়িতে যজ্ঞেশ্বরের শালা—ঢাকার বাসিন্দা তিনি। বললেন, ওয়ান থনে আইতে বড় কষ্ট। জয়নাদটা পাড়ায় এসে সেই টানের অনুকরণ করে আর লোক হাসিয়ে মারে।

নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন লেগেই আছে, কোন বাড়ি কোন দিন বাদ নেই। তোমার জামাইর নেমন্তন্ন পশ্চিমবাড়ি আবার তোমার বাড়িতেই ঐদিন স্বাস্থিক পালের ভাগনি দুটো বাবাদি থেকে এসেছে। তাদের নেমন্তন্ন দিয়ে বসে আছ। চিরদিন তো থাকতে আসে নি, পুজো কাটিয়ে টেনেটুনে আর হয়তো পাঁচ-সাতটা দিন রাখা যাবে। অতএব দেরী করে রয়ে-সয়ে করার জো নেই সময়ে বেড় পাবে না। তাড়াহুড়ো না করলে হাতনেয় বসিয়ে দুটো ভাত খাওয়ানো ঘটে উঠবে না।

আহ্নিক বৈরাগীর গলা পাওয়া যায় ভোরবেলা এক-একদিন। মায়ের পিছন পিছন মায়ের দু-কাঁধে দু হাত রেখে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। পূববাড়িতে এসেছেন, বাড়ির সকলে এখনো ওঠে নি। উঠানে দাঁড়িয়ে বৈরাগী আগমনী ধরেছেন।

ওঠো গো মা গিরিরাণী
ঐ এলো নন্দিনী তোর—
(ও মা) বেহুঁশ হয়ে রইলি পড়ে
এমনি বিষম ঘুম-ঘোর।

তরঙ্গিনী রান্নাঘরে গোবর দিচ্ছিলেন। ন্যাতা হাতে দ্রুত বেরিয়ে দাওয়ায় দাঁড়ালেন। শুনতে শুনতে দু চোখে জল টলমল করে ওঠে। মব পোড়ারমুখী গিরিরাণী মেনকা—মা মেয়ে এসে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে, ঘুম তবু দু-চক্ষু ছাড়ে না।

বাইরের উঠানের ওদিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। ষষ্ঠীর দিন চঞ্চলা আসবে—সুরেশ নিয়ে আসবে দুটো দিন বাকী তার এখনো। হিসাবের বাইরেও তো সংসারে কত জিনিস ঘটে। কী কারণে, ধরো সুরেশের অফিস আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ গিয়ে পড়ে অবাক করে দেবে সেই জন্য ধরো। যুগলে এসে হাজির।

গান শেষ করে বৈরাগী চাল-কাঁচকলা-পয়সা বিদায় নিয়ে আর এক বাড়ি গেল। তরঙ্গিনী নিশ্বাস ফেলে আবার গোবর লেপার কাজে গিয়ে লাগলেন।

দেবেন্দ্র চক্রবর্তী এসে উপস্থিত—দেবনাথ যাকে মিতে-মিতে করেন, কাজেম গুরুর পাঠশালায় যার সঙ্গে পড়তেন। সে-বারে দেখা হয় নি, মেয়ের বাড়ি ছিল সে তখন। মাঝে সে এসে খবর নিয়ে গেছে, ঘাড়ে পুজো পড়েছে এঁদের পুজোর সময় দেবনাথের না এসে পরিত্রাণ নেই। হিসাব করে দেবী-চতুর্থীর দিন সে পূববাড়ি এসে পড়ল। কালো রোগা লম্বা আকৃতি — সব মিলিয়ে প্রায় এক তালগাছ। হেঁটে আসছে—পা একখানা এখানে, পরের খানা ফেলল হাত পাঁচ-ছয় এগিয়ে। মানুষের পা এত দীর্ঘ কী করে হয়—সন্দেহ জাগে দুই পায়ে দুই রণপা লাগিয়ে ছুটছে। ছুটুক আর যা-ই করুক হুড়ুপ-গুড়ুপ আওয়াজ তুলে হুঁকোটানার বিরাম নেই। কষে এক-একটা দম দিয়ে যাবতীয় ধোঁয়া মখাভ্যন্তরে পুরে ফেলছে, ছেড়ে দিচ্ছে ক্ষণ পরে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে আগ্নেয়গিরির ধূম-উদ্গীরণের মতো। ঠোঁটের উপরে গোঁফ আছে এবং নিম্নে সামান্য দাড়ি—সেগুলোর কালো রঙ তামাকের ধোঁয়ায় জ্বলে জ্বলে কটা হয়ে গেছে। হুঁকোই বা কী! আয়তনে বিপুল ডোবা খালের নীচের দিকটা সূক্ষ্ম হতে হতে একেবারে সূচিমুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কালো কুঁদ আবলুস কাঠের নলচে নিয়মিত তেল মাখানোর গুণে আদ্যন্ত ঝিকমিক করে, হাত থেকে পিছলে যাবে শঙ্কা হয়। নলচের গলায় বাঁধা রয়েছে হুঁকো আর ঝাঁঝরি-কাটা টিনের চাকতি। হুঁকো থাকায় যন্ত্রতন্ত্র টাঙিয়ে রাখা চলে। আর কলকের আগুন ঝাঁঝরি চাপা দিয়ে দেয়া ফলে আগুন উড়ে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে না।

দেবেন চলল তো তার শখের হুঁকোও চলল সঙ্গে সঙ্গে। এক কলকে শেষ হয়ে গেলে পথের মাঝেই উবু হয়ে বসে নতুন এক ছিলিম সেজে নেবে। যতক্ষণ জাগ্রত আছে হুঁকো টানা লহমার তরে কামাই না যায়। রাতেবেলা ঘুমানোর সময় চাল কি বেড়ার সঙ্গে হুঁকো টাঙিয়ে রাখে—কিন্তু ঘুম আছে নাকি পোড়া চোখে? তামাকের পিপাসায় তড়িঘড়ি উঠে পড়ে। কুটুম্ব বাড়ি গিয়ে সাজা তামাক সঙ্গে সঙ্গে পেলো তো ভাল, নয়তো নিজেই লেগে যাবে — মান টানিয়ে ভদ্র হয়ে বসে থাকার ধকল সইবে না। মোকদ্দমার সাক্ষী দিতে কাঠগড়ায় উঠেছে হুঁকো বাঁহাতে ঝুলোনো। মাঠেঘাটে বনেবাদাড়ে যেখানেই যাক, হুঁকো ছাড়া দেবেন নেই। রথের বাজারে পোড়া মাটির খেলনা-হুঁকো পাওয়া যায়—লোকে গল্প রটিয়েছে জন্মের সময় দেবেন নাকি অমনি এক সেট হুঁকো মুঠোয় নিয়ে মাতৃগর্ভ থেকে পড়েছিল। এবং যেদিন সে শ্মশানের মহাযাত্রায় যাবে, পড়সিস্বজনেরা ঠিক করে রেখেছে জ্বলন্ত চিতায় মড়ার সঙ্গে শখের হুঁকো-কলকে এবং কিছু তামাক-টিকে দিয়ে দেবে। অচেনা পরলোকে গিয়ে তামাকের অভাবে গোড়াতেই চোখে অন্ধকার না দেখে।

যাকগে, যা হচ্ছিল। সোনাখড়ি পূব-বাড়ি দেবেন এসে উপস্থিত। কাঁধে যথা-রীতি ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে চটি গলায় চাদর মুখে হুঁকো। ব্যাগ খুলে পুঁটুলিতে বাঁধা পাশার সরঞ্জাম বের করতে করতে ক্ষুব্ধ স্বরে বলে রোশেখ মাসে এসেছিলে তখন আমি রেণুর বাড়ি গোঁসাইগঞ্জে। নমাস

ছ'মাসের পথ নয়—কাক পক্ষীর মুখে একটু খবর পেলে হামলা দিয়ে এসে পড়তাম।

সভয়ে তাকিয়ে দেবনাথ বলেন, ও কি মিতে হুক পাতছ সকালবেলা এখন—

দেবেন বলে এখনই ভাল হে। কাজের বাড়ি জমে উঠতে উঠতে আমাদের এক-বাজি দু-বাজি সারা হয়ে যাবে তার মধ্যে।

দেবনাথ হেসে বলেন এক বাজিতে মানায় না—দু-বাজি! আব্বা বলিহারি যাই।

দেবেন বলছে, উঁ, তোমার সঙ্গে কত দিন বসি নি! তখন তো পাশা তোমার হুকুমের গোলাম। হাঁক পেড়ে বললে ছ-তিন-নয়—তাই পড়ল। বললে, কচে বারো—ঠিক তাই। এখন কি রকম।

ভাব চটে গেছে মিতে পাশা আমায় ভুলে গেছে। ছুঁই নি পাশা কত দিন—সময়ই নেই।

সেকালের দুই পরম সুহৃদ, পাশা এবং দেবেন চক্রবর্তী—তাদের সামনে পেয়ে কাজের দায়িত্ব যতই থাক দেবনাথ না বলতে পারলেন না। পাশা তিনটে তুলে নিয়ে দু-হাতে রগড়ে নিলেন একবার। হাত শুড় শুড় করছে দান ফেলবার জন্য। বললেন, দুজনে কি হবে? খেড়ি কই?

এসে পড়বে। সাজিয়ে নিই আগে, কাতার দিয়ে আসবে। ঠেলে কুল পাবে না।

সত্যি তাই। একে দুয়ে বেশ কিছু মানুষ। হারু সরকার কোন দিকে ছিল—সরো সরো করতে করতে মানুষজন ঠেলে দেবনাথের খেড়ি হয়ে বিপরীতে বসে গেল। দেবেনের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর বসলেন। ঝন্টু অক্ষয় ভুলো শ্যামাপদরাও খেলে ভাল, কিন্তু হিরন্ময়ের জুড়ি ও সমবয়সী হয়ে কাকামশায়ের সঙ্গে খেলা চলে না। খেলা দেখছে তারা চতুর্দিক ঘিরে জুত দিচ্ছে, কলহ ও কথা-কাটাকাটি করছে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছে মাঝেমধ্যে।

দেবনাথ সুবিধা করতে পারছেন না। চর্চা নেই তো বটেই তার উপর লোকজন মিনিটে মিনিটে এসে মনোযোগে বাধা ঘটাচ্ছে। হাজু ময়রার ফর্দটা কার কাছে চন্ডীপাঠের কথা পাকা হয়ে গেছে তো? হ্যাজাকের ম্যান্টল না থাকে তো কেশবপুরে লোক যাচ্ছে—নিয়ে আসুক। ইত্যাকার হরেক প্রশ্ন ভবনাথের। অক্ষক্রীড়া ব্যসন বিশেষ—অগ্রজ গুরুজন হয়ে নিজে তিনি এই আসরে আসতে পারেন না লোকমুখে ঘন ঘন প্রশ্ন পাঠাচ্ছেন।

ঘাড় তুলে দেবনাথ একবার নজর ঘুরিয়ে দেখে আঁতকে উঠলেন : আসে সর্বনাশ, ক্লাবের মানুষ সব কটি যে এখানে। তাড়াতাড়ি সারো মিতে। দাদা গরম হচ্ছেন—ঘন ঘন লোক পাঠানোর মানেটা তাই।

এতক্ষণ যজ্ঞিবাড়ির হুঁকোয় চলছিল এইবারে দেবেন নিজের হুঁকো নামিয়ে নিয়ে সাজতে বসল। ফরমায়েসি কলকে, হিমালয় গিরি বোধহয় ঢোকানো যায়—সেই কলকে কানায় কানায় তামাকে ভরতি করল। অতএব বলে দিতে হয় না, দেবেন চক্কোত্তি এইবারে বেরিয়ে পড়বে—পথ হাঁটবে।

দেবনাথ বললেন, এক্ষুনি কেন মিতে? পাকশাক করো এখানে ওবেলা যেও।

মালসা থেকে ঘুঁটের আগুন কলকের উপর তুলে ভুড়ুক-ভুড়ুক কয়েকটা টান দিয়ে দেবেন বলল, খাজনার তিনটে টাকা দেবো-দেবো করে হরিশ কুণ্ডু আজ চার-পাঁচ মাস ঘোরাচ্ছে—তার বাড়ি হয়ে যাবো এখন। দেবী ঘটস্থাপনা হয়ে গেলে তারপরে আর টাকা বের করবে না—ছুতো পেয়ে যাবে।

ছক-গুটি পাশা ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল আজ কিছু হল না, তাড়াহুড়োর জিনিস নয়। মচ্ছব মিটেমেটে যাক—

দেবনাথ সোৎসাহে বলেন, কোজাগরী রাত্রে পঞ্জিকার বিধান রয়েছে—

থাকবে তুমি সেই অবধি?

দেবনাথ বললেন কালীপুজোর পরেও আছি। ভাই-দ্বিতীয়ায় দিদির হাতের ফোঁটা নিতে হবে এবার, ঐজন্যে তিনি আসবেন।

একগাল হেসে দেবেন বলল পাকা হয়ে রইল কিন্তু মিতে। নিশি-জাগরণ অক্ষক্রীড়া চিপিটক-নারিকেলোদক ভক্ষণ — শাস্ত্রের বিধান অক্ষরে অক্ষরে মানব আমরা। আমার খেড়ি আমি নিয়ে আসব, তোমার খেড়ি তুমি ঠিকঠাক করে ফেল এর মধ্যে। কেমন?

দুর্গাপুজো সকলের সেরা। পুজো মাত্র নয় উৎসব—দুর্গোৎসব। এদিকে-সেদিকে কিছু খুচরো পরবও আছে। দুর্গাপুজো দেরীতে—কার্তিক মাসে। খুচরোরা এবারে আগে এসে যাচ্ছেন।

তিরিশে আশ্বিন, সংক্রান্তির দিন। মন্ডপে প্রতিমা রং চিত্তির হচ্ছে ওদিকে বিলের ধান বনের মধ্যেও একটুকু ব্যাপার। এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ-খাওয়ানো। এক হাঁটু কাদা ভেঙে বুড়ো-মানুষ ভবনাথ নিজেই বিলে চলে গেলেন, সঙ্গে শিশুবর। এ পুজোর পুরুত বলতে হবে শিশুবরকেই।

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে,
মা-লক্ষ্মী গর্ভে বসে,
সাধ খাও মা সাধ খাও—

এই হল মন্তোর। মন্তোর বলে শিশুবর ক্ষেতের ধারে এক ফেরো দুধ ঢেলে দেবে। ধানের ভিতরের দুধ, শস্যের যা আদি অবস্থা—সেটা যেন খুব ভাল হয় এই কামনা। দুধ দিয়ে তারপর বাতাসা ছড়িয়ে দেবে, অর্থাৎ চালের স্বাদ যেন মিষ্টিও হয়। শিশুবর চাষ-বাসও করে—অতএব ক্ষেত হল তার মেয়ে। গর্ভবতী মেয়েকে আপনজনেরা সাধ খাওয়ায় না—ক্ষেতকে মা ডেকে শিশুবর সাধ খাওয়াচ্ছে দেখুন।

সংক্রান্তির রাত ভাল করে না পোহাতেই আবার এক পরব। গারসি। পোহাতি-তারা আকাশে। বাদুড়ের ঝাঁক কালো কালো ছায়া ফেলে বাসায় ফিরছে। তরঙ্গিনী উঠে ডাকাডাকি করছেন: ওঠো সব। কমলকে তুলে বসিয়ে দিলেন: ওঠ রে, গারসি করবি নে?

সবাই উঠেছে সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো বলে বাছাবাছি নেই। শরিক বংশীধরের বাড়িতেও উঠে গেছে, শুধুমাত্র সিধু বাদ। দক্ষিণের ঘর ও দালানের মাঝে ভিটার উঁচু খানিকটা ফাঁকা জায়গা—'বারান্দা' নামে জায়গাটুকুর পরিচয়। আপনা আপনি একটা কাঁঠাল চাবা জন্মেছে আর কয়েকটা কৃষ্ণকলি ফুলের গাছ। গারসি করতে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি ঐ একটা জায়গায় এসে সব জমল।

আশ্বিনে রেঁধে কার্তিকে খায়,
যে বর মাগো সেই বর পায়—

ছড়া কেটে বিনো পুকুরঘাটে দৌড়ল ঘটি নিয়ে। শ্রীতকর্মে জলটা শুধু টাটকা লাগে আর সমস্ত বাসি। রাতদুকু পোহালেই যে দিন, তার মধ্যে উনুনে আগুন দেওয়া যাবে না—চিঁড়ে-মুড়ি বাসি-পান্তা খেয়ে সব থাকবে। খিলের উপরে গ্রাম বলে এরই মধ্যে বেশ শীত-শীত ভাব। এক আঁটি পাটকাঠি নিয়ে মাহিন্দার অটল এসে গেল—খালি গা-হাত-পা দেহের উপর আবরণ বলতে হাঁটুর উপরে তোলা এক চিলতে কাপড়। ভুর-ভুর করে কাঁপছে সে। বড়গিন্নি বললেন জড়িয়ে আয়রে গায়ে একটা কিছু—

অটল অবহেলায় উড়িয়ে দিল : কিছু লাগবেনে না ঠাকরুণ। জাড় আর কতক্ষণ?

কমল পুঁটিকে বলে, সিগারেট খাবো আমিন দেখিস।

পুঁটি বলে, আমিও—

কমল অবাক হয়ে বলে, সে কী রে, তুই যে মেয়েছেলে।

আজকে অত মেয়েছেলে বেটাছেলে নেই। গেল-বছর খাইনি অসুখ ছিল বলে। জানলার উপরে চুপচাপ বসেছিলাম।

কমলের স্ফূর্তি মিইয়ে গেল। দিদিটাও খাবে—তবে আর পুরুষমানুষ হয়ে কী হল ধুস!

আপনার পরিবারের সবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য
হাওড়া সমবায়িকা

বিনো জল নিয়ে ফিরেছে। হলুদ-বাটা সর্ষে-বাটা মেথি-বাটা তেল ঘি বাটতে-বাটিতে। কুলগাছের নতুন পাতা একটা বাটিতে বেটে রেখেছে। কাজলপাতায় কাজল পরানো। মুঠোখানেক কাঁচা তেঁতুল। থরে-থরে সমস্ত কুলোয় সাজিয়ে নিমি কাঁঠাল-তলার ঐখানটা এনে রাখল।

পাটকাঠির কাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘটির জলে হাত ধুয়ে নিয়ে আগুনে হাত সেঁকছে সবাই. পা সেঁকছে। কাঁচা তেঁতুলগুলো পাটকাঠির আগুনে পোড়ায়—খোলার নিচে ক্ষীরের মতন হয়ে গেছে। এবারে তেলে-হলুদবাটায় মিশিয়ে রগড়ে রগড়ে গায়ে মাখে, মেথি তেঁতুলপোড়া ইত্যাদি মাখে। ঘি-ও মাখে ঈষৎ। মাথার চুলে কিন্তু মেখো না খবরদার। চুল সাদা হয়ে যাবে। এক-ফোঁটা এই যে কমলবাবু, রাতাবাতি যে পাকাচুলে বুড়ো হয়ে গেছে দেখবে।

পাটকাঠির এক-এক টুকরো ভেঙে সকলকে দিচ্ছে—এক মুখে তার আগুন। ফকফক করে টানছে কমল যাকে বলেছিল সিগারেট খাওয়া। খেতে হয় এই রকম—গারসির বিধি। সর্বসমক্ষে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করা—কী মজা কী মজা। কিন্তু কশি পেয়ে যাচ্ছে যে বড্ড।

ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলা। পয়লা কার্তিক আজ—আহ্লাদ ও মা বগলা আজ থেকে টহলদারি ধরলেন। বৈশাখ আর কার্তিক বছরের মধ্যে এই দুটো মাস প্রভাতী গাইতে হয়। গাইছেন আজ আগমনী গান। কদিন পরে বিসর্জনী—মানুষ কাঁদাবেন বিসর্জন গেয়ে গেয়ে। দুর্গোৎসব চুকেবুকে যাওয়ার পর হরিকথা, কৃষ্ণকথা—বরাবরকার যে সমস্ত গান। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আওয়াজ আসে নতুন বাড়ির ওদিক থেকে—সাতসকালে জল্লাদের দল হা-ডু-ডু খেলায় নেমেছে। ভোরের এই খেলাধুলো গারসিরই অঙ্গ—গারসির দিন এমনি দৌড়ঝাঁপের খেলা খেলে। শীতকাল আসছে—গারসি করলে হাত-পা ফাটার ভয় থাকে না।

আজই আবার সন্ধ্যাবেলা ওপাড়ার শশধর দত্তমশায়ের উঠানে আকাশপ্রদীপ আকাশে চড়ে বসবেন সকাল হলে ভুঁয়ে নামবেন। পুরো কার্তিক জুড়ে প্রদীপের এই ওঠা-নামা। আগে চাঁদুবাবু করতেন, তিনি গত হবার পর আজ ক'বছর শশধর ধরেছেন।

কলকাতায় থাকার দরুন কালিদাসটা নাস্তিক হয়ে পড়েছে জিনিসটা বাপের উদ্ভট খেয়াল বলে মনে করে সে। দু-ভায়ে হাসি-তামাসা চলে—কালিদাস বলে, সারারাত ধরে এক পিদিম তেল পুড়িয়ে গুচ্ছের মুরা পোকা আকাশ থেকে নামিয়ে আনা। এছাড়া আর কোন মুনাফা নেই।

আছে রে আছে। হিসাবি মানুষ বাবা হুট করে কিছু করেন না, পিছনে গভীর মতলব থাকে। এই আমাদের ভাইদের নামের ব্যাপারে দেখ। দাদার নাম ছিল হরিদাস আমার নাম নারায়ণ দাস, তেল কালিদাস। সেই কতকাল আগে ভেবেচিন্তে বাবা নামকরণ করেছেন।

নামকরণের গূঢ় তাৎপর্য নারায়ণ দাস পিতৃ মুখে শুনেছে, ভাইকে সে বুঝিয়ে দিল: ওরে হরি ওরে নারায়ণ, ওরে কালি—ছেলেদের শশধর হরবকত তো ডাকবেন, ভগবানকেও অমনি ডাকা হয়ে যাবে। বিনি খাটনিতে আপনাআপনি পুণ্য-লাভ। এতদূরে অবধি তলিয়ে দেখেন উনি—ইহলোক-পরলোক কোন দিকে দৃষ্টি এড়ায় না। এই আকাশপ্রদীপ চালু করার মধ্যে পারলৌকিক তদ্বির। মহালয়ার পার্বণশ্রাদ্ধ নিতে স্বর্গীয় কর্তারা পিতৃ-লোক থেকে এখন ভূলোকে নেমে পড়েছেন—বুড়োমানুষরা অনভ্যাসে হোঁচট না খান সেই জন্যে তেল পুড়িয়ে আলো দেখানো। বয়স হয়েছে শশধরের—অচিরে উনিও ঐ স্বর্গীয়দের দলে গিয়ে পড়বেন। আলো-টালো দেখিয়ে ওঁদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ খাতির জমিয়ে রাখছেন।

প্রতিমা চিত্তির সারা হতে চতুর্থী অবধি লেগে গেল। চালচিত্রে এখনো হাত পড়েনি—দুই কারিগর দুই পাশ দিয়ে ঘোর বেগে লেগে গেল। রাজার শিরে রাজছত্র ধরে—সেই রকম খানিকটা। আধেক গোলাকার জায়গাটুকুতে নানান পৌরাণিক ছবি—ঠিক মাঝখানে দেবী দুর্গার মাথার উপরে মহেশ্বর, ডাইনে-বাঁয়ে পর পর ব্রহ্মা বিষ্ণু রামরাজা দেবর্ষি নারদ সমুদ্রমন্থন দক্ষযজ্ঞ দশমহাবিদ্যা। সর্বশেষ দুই প্রান্তে দেবী রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করছেন। নাগাল পায় না বলে প্রতিমার সামনে ভারা বেঁধে নিয়েছে সেখানে বসে কাজ করছে।

বেলগাছের গোড়ায় মাটির বেদী—বোধনতলা। কাঁচা বেদীতে এবারের ঘট-স্থাপনা। মা যদি করুণা করে বছর বছর এমনি আসেন, ইটে-গাঁথা পাকা বেদী হতে পারবে। ঢাক বাজে ঢোল বাজে। বড় পাল-মশাই নিশিথরাত্রে কখন প্রতিমার মুখে ঘামতেল মাখিয়ে গেছেন—ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি এসে পার্বতীর মুখ-খানা হাসিতে যেন ঝিকমিক করছে। কলা-বউকে স্নান করিয়ে আনল নতুন পুকুর থেকে, পুকুর কাটা সার্থক। শুধু এক পুরবাড়ির পুজো কে বলে গ্রাম জুড়ে পুজো লেগে গেছে। বাড়ি বাড়ি আলপনা, চৌকাঠের মাথায় সিঁদুর। সন্ধ্যা হলে ধূপ জ্বালিয়ে দেয় প্রতিটি ঘরে সন্ধ্যা দেখায় গাল ফুলিয়ে শঙ্খ বাজায় মেয়ে-বৌরা। কত মানুষ এসে পড়েছে ছোট গ্রামে মানুষ কিলবিল করছে। আসার তবু কামাই নেই এখনো। এ-হে ও-হো হাঁক পেড়ে পালকি আসে ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে গরুর গাড়ি আসে ধুজি ঠকঠকিয়ে জোড়া-তালগাছতলায় ডোঙা-ডিঙি এসে লাগে। আর কাজকর্ম ফেলে তরঙ্গিণী ক্ষণে ক্ষণে বাইরের উঠানের হুড়কোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। না সুরেশ-চঞ্চলা নয়-ষষ্ঠী পার হয়ে যায়, মেয়ে-জামাই চিঠিপত্র বন্ধ করে আছে।

ফুল—অনেক তো ফুল চাই। ফুলের শখ আর কজনের। সব ফুলে আবার পুজোও হয় না। গাঁদা দোপাটি টগর. কৃষ্ণ-কলি অপরাজিতা জবা ঝুমকোজবা পদ্ম স্থলপদ্ম—কার বাড়ি কী আছে দেখে রাখো। তিন-চার দিনের পুজো তার উপরে এত মানুষের অঞ্জলি—গাঁয়ের ফুলে কুলোবে না, গড়ভাঙা মাদারডাঙা সাগর-দত্তকাটি অবধি ফুল খুঁজে বেড়াতে হবে।

(ক্রমশঃ)

গ্রাম্য বন্ধুদের জন্যে

ওকাসা গ্রহণ করুন বিশ্ববিখ্যাত বলবর্ধক টনিক ট্যাবলেট যা আপনাকে ৬৪ বায়োকেমিকাল, ১০ টি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও ৬টি খনিজ উপাদানের মাধ্যমে নতুন শক্তি এনে দেবে।

ওকাসা টনিক ট্যাবলেট

(পুরুষের জন্য—"রূপালী")।

এবার সব ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

OKASA, CO. PVT. LTD.
12 Sunbow Street,
P. Box No. 398,
Bombay 400 001.

যুবশক্তি যুবতী

যুবহতাশা

শিখা দাস

যৌবন বলতেই আমরা মনে করি তারুণ্যে ভরপুর প্রাণচাঞ্চল্যে সজীব জীবনকে। কিন্তু আজকের যুবক-যুবতীরা সত্যিই কী সুখী? মনে হয় না। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা হতাশ, শিক্ষা সম্বন্ধে আস্থা-হীন, বেকারীর অন্ধকারে দিশেহারা। যা চায় তা এরা পাচ্ছে না। হাত পা বিচারবুদ্ধি শিক্ষা সব আছে কিন্তু করার মতো বেঁচে থাকার মতো অবলম্বন নেই। দেখা যাক এই হতাশা সম্বন্ধে এদের নিজেদের ধারণা কি।

শ্রীমান সুভাষ রায়ের সঙ্গে কথা হল। খড়দহের ছেলে। বাবা ফায়ার সার্ভিসে সামান্য চাকরী করেন। নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম কলেজ থেকে বি-কম পার্ট ওয়ান পাশ করেছে। তারপর আর পড়া হয়নি।

—পড়াশুনা ছেড়ে দিলে কেন?

—সংসারের টাকায় আর কুলোচ্ছে না। বাবার হোটেলে আর কত দিন চালাব?

—পরীক্ষা দেওয়ার আর ইচ্ছে নেই?

—পরীক্ষা দিয়ে আর কি হবে বলুন? হয়তো রাতভোর পড়াশুনা করে যা লিখব সেই পরীক্ষক পড়েই দেখবেন না, টুকলি হিসাবে জিরো বসিয়ে দেবেন।

—পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমার এ ধারণা হল কেন?

—পরীক্ষা তো এখন লটারী খেলা। 'ফি' জমা দিয়ে টিকিট কাটলাম কপালে লাগলে পাশ আর না হয় ফেল। এবার পার্ট ওয়ানে একই জিনিস লিখে কেউ পাশ আবার কেউ ফেল করেছে। নিজে মুখস্থ করে লিখে নকল লেখার বলি হয়েছে মানে ফেল। এই পরীক্ষায় আস্থা কি? পড়াশুনা করে কি হবে?

—কেন? তা নাহলে তো চাকরীবাকরী জুটবে না কিছুই করতে পারবে না।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কোন দাম আছে? যার টাকা আছে সেতো কোন পরীক্ষা না দিয়েই সার্টিফিকেট কিনতে পারে। এ পড়াশুনায় পেটের ভাত জুটবে না। কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে গেলে দেখতে পাবেন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বি-এ এম-এ পাশ করে ভেরান্ডা ভাজছে।

—তুমি চাকরীর চেষ্টা করছ না?

—হাসালেন। আজ পর্যন্ত হাজার তিনেক দরখাস্ত করেছি. পিয়নের কাজ থেকে শুরু করে কেরানী পদের জন্য। কোন সাড়া পাইনি। টাইপিং জানি, স্টেনোর কাজ শিখছি তবু নয়।

—এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ কোন সাহায্য করছে না?

—ঐ আর এক গ্যাড়াকল। লোক না থাকলে দশবছরেও একবার কল পাবেন না!

—ছোটখাটো ব্যবসা করলে ক্ষতি কি?

—টাকা কোথায় পাব? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে স্বনির্ভর প্রকল্প অনুসারে দরখাস্ত করেছি ব্যাঙ্কে গিয়েছি—বরাতে কিছুই জোটেনি।

—তবে এভাবে চুপচাপ বসে জীবনটাকে শেষ করবে?

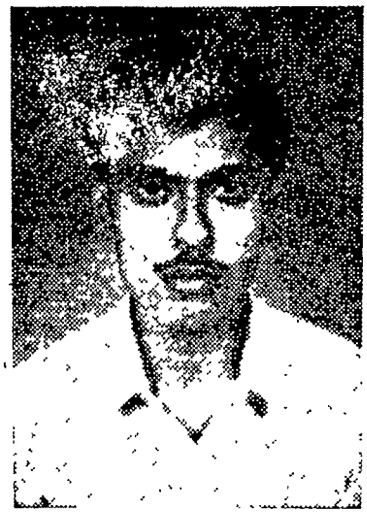

সুভাষচন্দ্র রায়

—আর কিছুই ভালো লাগে না। চাকরীর আশা ছেড়ে দিয়েছি। দরখাস্তও আর বেশী করি না। বাড়ীতে বসে থাকতে লজ্জা লাগে। পালিয়ে পালিয়ে রাস্তায় ঘুরে-বেড়াই। টাইপিং প্র্যাকটিশ এখনো ছাড়িনি। ওদিকে চাকরীর ঊর্ধ্বতন বয়ঃসীমাও শেষ হয়ে এলো।.....কি যে হবে!

বেকারী সুভাষকে গ্রাস করে ফেলছে। হতাশা তাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিস্পৃহ করেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সবিতা রায়ের সঙ্গে কথা হল। দাদার সংসারে সে গলগ্রহ হয়ে আছে। সংসারে অভাব অনটন—অসুস্থ মা বাবা—নানা ঝামেলা। লেখাপড়া শিখেছে চুপচাপ অথর্ব হয়ে সব হজম করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

—আমার একটা চাকরী করে দিন না।

—পড়াশোনা শেষ হোক সুযোগ সুবিধা হলে নিশ্চয়ই জানাব।

—এতদিন পড়াশোনা নিয়ে ছিলাম। ইউনিভার্সিটি যেতাম হৈ-চৈ করে সময় কেটে যেত। এখন?

—কিছুদিন ইনটারভাল.....তারপর

—মরে যেতে ইচ্ছে করে। বেঁচে থেকে—পরের অনুগ্রহ.....ভালো লাগে বলুন?

—এতো ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

—এখনো মুষড়ে যাইনি। আশায় আশায় বি-টি কলেজে ভর্তি হয়েছি। যখন শুনলাম অনেক দাদা দিদি চার পাঁচ বছর পাশ করে বসে আছেন তখন আর পড়ার উৎসাহ পাচ্ছি না।

চোখেমুখে তার বিমর্ষভাব। চলতি সমাজের বিরুদ্ধে দীর্ঘশ্বাস জানিয়ে সে অভিশাপ জানাল। তবে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনেও সব আশা সে ছেড়ে দেয়নি। রাতের তপস্যা যদি কোনক্রমে দিন এনে দিতে পারে।

বেকারীর হতাশা যেমন বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েদের ঘিরে ফেলেছে তেমনি যারা কিছু একটা করছে তারাও সে কাজে সন্তুষ্ট নয়। জীবন সংগ্রামের তীব্রতায় আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। মুখে তাই হতাশার সুর.....কি করলাম এতো পড়াশুনা করে?

তরুণ অধ্যাপক শ্রী আর চক্রবর্তী। তিনি জানালেন—'কি আর বলব বলুন সারা মাস পড়িয়ে সময়মতো মাইনে পাই না। পেটের জন্য আবার ছাত্র পড়াতে হয়।'

—কেন এখন তো আপনাদের স্কেল ভালো.....

—ওসব কাগজকলমেই রয়ে গেছে, বাস্তবে দূর অস্ত্...তাছাড়া

—তাছাড়া কি?

—অসহ্য, পড়ানোর ইচ্ছে থাকলেও পরিবেশ নেই। ছেলেরা জ্ঞান হজম করতে চায় না। না পড়েই অরা পাশ করবে।

আর এক যুবক তরুণ ভাদুড়ী, বি-ই। বর্তমান পেশা—কেরানীগিরি।

—আপনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এখন এই লাইনে এলেন?

—খেতে হবে তো। এঞ্জিনিয়ারের চাকরী জুটলো না—যেটা পেলাম.....

—আপনার কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে না?

—প্রথম প্রথম একটু কেমন লাগতো। এখন মানিয়ে নিয়েছি। তবে ভাবি এত খরচ-পত্র করে উৎসাহ নিয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কি করলাম।

ভিক্টোরিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ষোড়শী শ্যামলী বসুও পড়াশোনায় তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না।—'পাশ করে তো হাপিত্যেশ হয়ে বসে থাকতে হবে—বেকারের খাতায় নাম বাড়িয়ে।' কথা প্রসঙ্গে সে জানাল আমাদের সমাজে মেয়েদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। নানা নিষেধ এবং সীমার মাঝে তাদের আটকে রাখার জন্য তারা ক্রমে ক্রমে নিরুৎসাহ ও হতাশ হয়ে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি কি মনে কর আমাদের দেশের মেয়েরা পরাধীন।'

—অনেকাংশে। তাদের বেলায় শুধু নিষেধের ডোর। শাসনের বেড়াজাল। ছেলেদের মতো আড্ডা জমাতে পারবে না, প্রাণ খুলে মিশতে পারবে না ইচ্ছামতো সিনেমায় যেতে পারবে না আরো কত কি? একটা ছেলের সঙ্গে কথা বললেই অমনি কানাঘুষো শুরু হয়ে গেল।

—আমাদের সমাজ সম্বন্ধে তোমার প্রচন্ড বিক্ষোভ?

—নয় কেন? পদে পদে ছেলেদের সঙ্গে আমাদের কম্পিটিশান করে বাঁচতে হচ্ছে কিন্তু সে তুলনায় আমরা সুযোগ পাচ্ছি কই।

হেসে বললাম—তাহলে আপনার ছেলে-বন্ধুজনিত হতাশাও রয়েছে। মুচকি হেসে সে বিদায় নিল।

সন্ধ্যা যায়। বয়স হয়েছে। যৌবন তো চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু আমাদের সমাজের নানা চাহিদা মিটিয়ে তার জন্য পাত্র জুটছে না। কি যেন না পাওয়ার বেদনায় সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সোদপুরের অমিয় চক্রবর্তী পাঁচ বছর বি-এস-সি পাশ করে ঠায় বসে আছে। তার মার মুখে জানতে পারলাম সে এখন মানসিক বিকারগ্রস্ত।

স্বপন সেন—শিক্ষিত বেকার। প্রেম করেছে। প্রেমিকাকে এখনই বিয়ে না করলে সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। অথচ চাকরী নেই নিরাপদ একটা আশ্রয় নেই' তার করুণ জিজ্ঞাসা—'জানেন অনেক চেষ্টা করছি। অবশেষে ভালোবাসাটুকুও হারাতে হবে?'

তন্দ্রা ব্যানার্জি—বি-এ বি-টি। চাকরী নেই। সামান্য টিউশনী করে। বাবা রিটায়ার্ড। তার জিজ্ঞাসা—'সংসারে কিছু তো দেওয়া দরকার, কি করি বলুন তো?'

সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শিখা দাস। ভাল পরীক্ষা দিয়েও 'ব্যাক' পেয়েছে। খেটেখুটে পরীক্ষা দিয়েও তার ভরসা নেই। সব জায়গায় হ-য-ব-র-ল। বয়সও বসে থাকবে না। জীবনের কি কোন শখআহ্লাদ নেই। স্বাধীনভাবে এগুলো মেটাতে তার একটা চাকরী চাই। হেসে বললাম—বাড়ীতে বলুন না একেবারে পার্মানেন্ট চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতে।

—সে চেষ্টাও হচ্ছে। তবে কালো মেয়ের বিয়ে হওয়া কি কম কথা। কালো কারো পছন্দই হতে চায় না। তারপর রাজপুত্তুরদের বায়না আর দাবীর বহর দেখলে তো চক্ষু ছানাবড়া!

কী এক সমাজে বাস করছি আমরা। চারিদিকে এত দীর্ঘশ্বাস!

—অমর দাশ

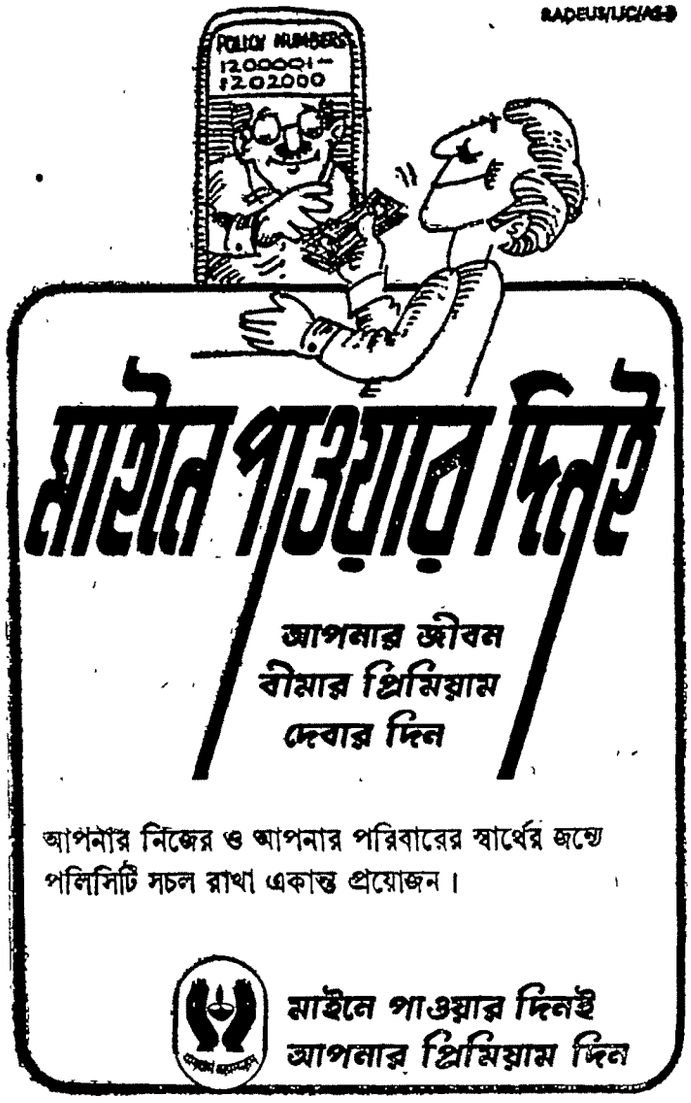

চিঠিপত্র

চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী প্রসঙ্গে

১৩৮১ বঙ্গাব্দের ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ফেলো রয়েল সোসাইটি অব আর্টস (লন্ডন) ও প্রধান অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ হেরম্বচন্দ্র কলেজ কলিকাতা মহাশয় প্রকাশিত চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়েছি। শিষ্টাচার ও রুচির দায়ে বর্তমান পত্রলেখক শ্রীমুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদর্শিত পথে তাঁর চিঠির উত্তর দিতে অনিচ্ছুক। অমৃত-এর পাঠকদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক কিছু বক্তব্যই কেবল উপস্থিত করছি :

(১) শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'শাশ্বত' নামে কোনো পত্রিকা আজ পর্যন্তও তাঁর চোখে পড়েনি। অথচ দেখা যাচ্ছে 'শাশ্বত' পত্রিকায় (১৩৭৮ সালের ২য় সংকলন) প্রকাশিত প্রবন্ধটির (চন্দ্রকেতুগড়ের স্বর্ণমুদ্রা : গৌরীশংকর দে) প্রথম বাক্য 'সুপ্রাচীন চন্দ্রকেতুগড় আজ আর পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না'—সম্পূর্ণ চেহারা নিয়ে ১৩৮১ সালের ৩রা আশ্বিনের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী : নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়) আত্মপ্রকাশ করেছে এবং প্রবন্ধের প্রথম বাক্য রূপে। না। এই তিন বছর পরেও বাক্যটির একটুও বয়েস বাড়ে নি একটুও চেহারা পাল্টায় নি এই ক' বছরের শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার ছোঁয়া একটুও লাগে নি। অথচ শ্রীমুখোপাধ্যায় নাকি পত্রলেখকের প্রবন্ধটি চোখেই দেখেন নি। এই ক্ষেত্রে এই ধারণাই করে নিতে হয় যে হয় নির্মলেন্দুবাবু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, নয় তো আমার লিখিত বাক্যটি চলৎশক্তিসম্পন্ন। শ্রীমুখোপাধ্যায় আলোচ্য বাক্যটিকে 'একটি সাধারণ ভাববাহী বাক্য' বলে বর্ণনা করেছেন। তবু, অতীব বিস্ময় জাগে—'এই একটিমাত্র অত্যন্ত সাধারণ ভাববাহী বাক্য-এর লোভও কেন তিনি সম্বরণ করতে পারলেন না। শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'জানি না অমৃত-এর লক্ষাধিক পাঠকের মধ্যে কয়জন এ পত্রিকার সন্ধান রাখেন।' তা সত্যি। 'শাশ্বত'-এর মতো মফঃস্বলের একটি লিটল ম্যাগাজিনের পাঠক-সংখ্যা সীমাবদ্ধ। আর সত্যি সীমাবদ্ধ বলেই নির্মলেন্দুবাবুদের মতো লেখকেরা নির্ভয়ে ওই সব অখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রকাশিত লেখার কিছু কিছু অংশ বাক্য অনায়াসে নিজের বলে চালিয়ে দিতে পারেন (ক্বচিৎ উদ্ধৃতি দিয়ে, হামেশাই উদ্ধৃতি না দিয়ে) বিশেষত যদি পত্রিকাটি কয়েক বছর আগেকার হয়। স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিনে লেখা নেয়ার সময় এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এ রকম অভ্যাসের কথা হয়তো নির্মলেন্দুবাবুও শুনে থাকবেন।

(২) চন্দ্রকেতুগড়ের খনামিহিরের ঢিপি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত মন্দিরটি যে গুপ্তযুগের অনেকেই এ-কথা বলেছেন। যিনি এই উৎখনন পরিচালনা করেছিলেন সেই অধ্যাপক কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামীর মতে তাই :

> Chandraketugarh And Its Archaeslogical Importance: K G Goswami, Indian Museum Bulletin, July, 1966, p. 44).

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

> studies in Museum and Museology in India: D P Ghosh (p. 51).

এবং শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলার মঠ মন্দির মসজিদ শারদীয় গল্প-ভারতী পৃঃ ৭৮) একই মত ব্যক্ত করেছেন।

> Archaeslogical Survey of India, Government of India,

প্রকাশিত

> 'Archaeslogical Remains, Monuments And Museums

গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৮১ পৃষ্ঠাতেও বলা হয়েছে যে উক্ত মন্দিরটি গুপ্তযুগের। সর্বজনবরেণ্য অতিসতর্ক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতেও উক্ত মন্দির গুপ্তযুগে নির্মিত

> "reference may be made to the ruins of a big Temple at Chandraketugarh (Berachampa in the 24 Parganas Dt.) of the Gupta period".—History of Ancient Bengal: R. C Majumdar, p 612

চন্দ্রকেতুগড়ের মন্দিরের গঠন ও মন্দির অঞ্চলে প্রাপ্ত্য পুরাদ্রব্য পরীক্ষা করেই এই সব বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। নির্মলেন্দুবাবুর মতে তবু নাকি কোনো বস্তুগত প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নি। পাল্টা প্রমাণ উপস্থিত না করে বিশেষজ্ঞদের সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে 'কল্পনাধর্মী অনুমান' ও 'গর্হিত অপরাধ' বলা ইতিহাস-চর্চার লক্ষণ নয়। যুক্তি-প্রমাণ ব্যতিরেকে এই ধরনের মোটা দাগের দায়িত্বহীন মন্তব্য পাঠকসাধারণের পক্ষে কেবল বিভ্রান্তিকর নয় ক্ষতিকরও বটে।

(৩) চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী প্রসঙ্গে 'দশচূড়' কথাটি ব্যবহার করার জন্য শ্রীমুখোপাধ্যায় বর্তমান পত্র-লেখককে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু এই কথাটি শুধু বর্তমান পত্রলেখকই ব্যবহার করেন নি, আরো অনেকে করেছেন। ব্যবহার করেছেন 'রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী (ঐতিহাসিক কালের প্রারম্ভে চব্বিশ পরগণা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মাঘ—চৈত্র ১৩৭৩, পৃঃ ২৮৯)। নির্মলেন্দুবাবুর সহজে ভুলে যাওয়ার গুণ আছে বলেই পত্রলেখককে এ-রকম বিদ্রূপ করতে সাহসী হতেন না। কেননা তিনি তাঁর পূর্ব প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে নিজেই 'দশচূড় যক্ষিণী'র কথা উল্লেখ করেছেন ('বত্রগর্ভা আটঘরা' 'অমৃত' ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ পৃঃ ২৮৮ ও বিদ্যাধরীর প্রত্নতাত্ত্বিক পটভূমি' হেরম্বচন্দ্র কলেজ পত্রিকা ১৯৭৩—৭৪ পৃঃ ৫৪)। তাহলে পত্র-লেখকের প্রতি নিক্ষিপ্ত শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিদ্রূপ বুমেরাং হয়ে তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছে না কি?

(৪) শ্রদ্ধেয় আনন্দকুমার স্বামীর পুস্তকটির নাম—'যক্ষস্' না লিখে বর্তমান পত্রলেখক যক্ষ লিখেছিলেন—এই অপরাধে শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'কুমারস্বামীর পুস্তকের প্রচ্ছদপটের সঙ্গেও তাঁর (বর্তমান পত্রলেখকের) পরিচয় নেই।' নির্মলেন্দুবাবু ১৩৮১ সালের ২০ অগ্রহায়ণের চিঠিতে বানগড় ও চন্দ্রকেতুগড়ের খননকার্যের পরিচালক অধ্যাপক কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামীর নাম লেখেন 'কুঞ্জবিনোদ গোস্বামী' একে আর ছাপার ভুল বলে চালাবার উপায় নির্মলেন্দুবাবুর নেই। কেননা ৩০শে নভেম্বর (১৯৭৪) তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় (পৃঃ ৩৭৮) তাঁর 'জাদুঘর থেকে চুরি' শীর্ষক যে চিঠিখানি প্রকাশিত হয়েছে তাতেও আছে 'কুঞ্জবিনোদ গোস্বামী।' দেশ ও অমৃত নিশ্চয়ই একই প্রেসে ছাপা হয় না। নির্মলেন্দুবাবুর এই ধরনের নামোল্লেখের জন্য বর্তমান পত্রলেখক কিন্তু তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কোনো অসৌজন্যসূচক মন্তব্য করছেন না।

(৫) তাঁর নামের আগে প্রতিবার কেন বর্তমান পত্র-লেখক শ্রী ব্যবহার করেন নি তার জন্য নির্মলেন্দুবাবু বর্তমান পত্রলেখককে সৌজন্য সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু 'সৌজন্য-বিদ্যার অধ্যাপককে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা : বিখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দকুমার স্বামীর নাম তিনি দুবার কেবল 'কুমার স্বামী বলে উল্লেখ করলেন কোন সৌজন্য-শাস্ত্র অনুযায়ী? শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর চিঠির এক জায়গায় শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ শেখার জন্য শিশুবোধ বাংলা ব্যাকরণের আশ্রয় নিতে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। নির্মলেন্দুবাবুর নামের আগে কেন আমি বারবার শ্রী ব্যবহার করিনি তার কারণ জানতে হলে নির্মলেন্দুবাবুরও ওই ব্যাকরণেরই আশ্রয় নিতে হবে; কেননা তাঁর মতো 'মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগ-প্রধানকে' সর্বনামের ব্যবহার শেখাবার ধৃষ্টতা আমার নেই।

(৬) নির্মলেন্দুবাবু লিখেছেন : 'চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী' প্রবন্ধের রচয়িতার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সরকারী বেসরকারী ও বিদেশী বিদ্বৎকুলের কিছু স্বীকৃতি লাভে ধন্য হয়েছে।' তাঁর এই স্বীকৃতিতে আমরা তাঁর দেশবাসীরাও ধন্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা অত্যন্ত অপ্রিয় অথচ চরম সত্য জানালে বোধহয় কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে। ১৯৭২ সালের ২৭শে অকটোবর তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখিত 'নিমজ্জিত নগরী হরিনারায়ণপুর' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে-সব আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছিলো তার

একটি হলো 'সূর্যমূর্তির পাটপীঠ পাল ভাস্কর্য' (পৃঃ ৯২২)। ওই প্রবন্ধেই লিখিত ছিল 'সূর্য মূর্তির ভগ্নাংশ' (পৃঃ ৯২৩)। ওই আলোকচিত্র ও ওই মূর্তির পরিচয়-জ্ঞাপক লেখা দেখে বর্তমান পত্র-লেখক বিস্মিত স্তম্ভিত ও মর্মাহত হন। কেননা মূর্তিটি (ভগ্ন সূর্যমূর্তি) আদৌ হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত নয়। এই ভগ্ন-মূর্তি নির্মলেন্দুবাবু সংগ্রহ করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম থেকে (মূর্তিটি সংগ্রহ করার সময় নির্মলেন্দু-বাবুর সঙ্গে ছিলেন বর্তমান পত্র-লেখক এবং হাবড়া প্রফুল্লনগরবাসী শ্রীপ্রবীর ঘোষ)। বর্তমান পত্র-লেখক শ্রীমুখো-পাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্ষতি করতে চাননি বলে 'অমৃত' সম্পাদককে চিঠি না দিয়ে প্রবন্ধ-লেখককে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দেন। এই চিঠির উত্তরে নির্মলেন্দুবাবু বর্তমান পত্র-লেখককে যে চিঠি দেন তাতে লেখেন, "সূর্য মূর্তি" (প্রস্তর) সম্পর্কে ভুল হয়েছে— অসাবধানতাবশত অন্য ছবি চলে গেছে।" ধরা যাক অসাবধানতাবশত ছবি ছেপেছেন কিন্তু প্রবন্ধের ওই লিখিত অংশটুকু? তারো চেয়ে বড়ো কথা ১৯৭২ সালের অকটোবরের পরেও 'অমৃত'-এর পাতায় দীর্ঘ বহু প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেছেন; কিন্তু আজ অবধি কোথাও তো তিনি স্বল্পতম শব্দ ব্যয় করেও ভুল স্বীকার করেন নি! 'অমৃত' পাঠকগণ ক্ষমা করবেন উক্ত আলোকচিত্র অসাবধানতাবশত নয়, ইচ্ছাকৃতভাবেই ছাপা হয়েছে (সাধারণ বুদ্ধি এই কথাই বলে)। আর তাহলে বলতে হয় নির্মলেন্দুবাবু সত্যকে বিকৃত করার অপরাধে অপরাধী। প্রত্ন-চর্চা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি দেশের স্বার্থে ইতিহাসের স্বার্থে আপন বিবেকের স্বার্থে সৎ ও দায়িত্বশীল হবেন এঁদের উপরে নির্ভরশীল সাধারণ পাঠক এমন আস্থাই পোষণ করেন। সাধারণ মানুষের এই সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যারা রাতারাতি খ্যাতি, উন্নতি ও জাগতিক সুযোগ সুবিধার মোহে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এক অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরাদ্রব্য অন্য অঞ্চলে প্রাপ্ত বলে চালিয়ে দেন তাঁরা অপরাধী। এরকম কাজ করে শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 'অমৃত'-এর মতো একটি সম্ভ্রান্ত পত্রিকার পৃষ্ঠা কলুষিত করেছেন অতি নিন্দনীয় ভাবে প্রতারিত করেছেন 'অমৃত'-এর লক্ষাধিক অতীত-জিজ্ঞাসু পাঠকদের। যদি 'অমৃত' সম্পাদক ও 'অমৃত'-এর পাঠকগণ প্রমাণ চান তবে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের পত্রের আলোক-চিত্র হাজির করতে বর্তমান পত্র-লেখক রাজী আছেন। উপরোক্ত ঘটনায় সন্দেহ জাগে : শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রকাশিত অন্য প্রবন্ধগুলিতেও এই ধরনের ব্যাপার আছে কি না! সেই বিচার ও পরীক্ষার ভার প্রতিষ্ঠিত প্রত্নতাত্ত্বিক ও বিশেষজ্ঞদের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। প্রত্নচর্চার ক্ষেত্রে এ-হেন অসাধুতা করেও যদি কেউ সরকারী বেসরকারী ও বিদেশী বিদ্বৎ-কুলের স্বীকৃতি লাভ করেন, তবে এই কথাই বলতে হয় স্বর্গীয় কথাশিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট ব্রজ-মাস্টারের দিন আজো শেষ হয় নি।

গৌরীশংকর দে
বিভাগীয় প্রধান ইতিহাস
শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয় হাবড়া
২৪ পরগণা।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

৮ নভেম্বর '৭৪ সংখ্যায় 'অমৃত'-এ প্রকাশিত অমল সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' শীর্ষক চিঠিটি পড়লাম। শরৎচন্দ্রের নাম রবীন্দ্রনাথ সর্ব-প্রথম কবে শুনেছেন—এ নিয়ে সেনগুপ্ত মহাশয়ের মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে জেনে আমি তার নিরসনে প্রয়াসী হলাম।

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে মুদ্রিত পুস্তক-গুলির মধ্যে 'বড়দিদি'-ই সর্বপ্রথম। ১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম দুই সংখ্যায় এই উপন্যাসের লেখকের নাম মুদ্রিত হয়নি শেষের সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয়। আর শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'। রবীন্দ্রনাথ যে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' পড়েই তাঁর সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে উঠেন তার বিশেষ প্রমাণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সঙ্গী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কিছু উক্তি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই, যা থেকে সেন-গুপ্ত মহাশয়ের উত্থাপিত তর্কবহুল বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে মনে করি।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর থেকে কলকাতা আসার সময় বিভূতিভূষণ ভট্টের কাছ থেকে দু'খানি গল্পের খাতা সঙ্গে এনেছিলেন। ঐ দু'খানি খাতার এক-খানিতে ছিল 'বোঝা' 'সুকুমারের বাল্য কথা' 'কাশীনাথ' 'অনুপমার প্রেম' প্রভৃতি গল্প: অপরখানিতে ছিল 'কোরেল' 'চন্দ্রনাথ' 'বড়দিদি' প্রভৃতি। ১৯০৭ সাল। 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের ভার তখন সরলা দেবীর উপর ন্যস্ত ছিল। সৌরীন্দ্রমোহন সেই সময় সরলা দেবীর হাতে 'বড়দিদির' কপি দিয়ে ওটি পড়তে বললেন। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্র-মোহনের নিজস্ব উক্তি হোল—

'আমার কাছে ছিল শরৎচন্দ্রের লেখা বড়দিদির কপি। সরলা দেবীকে সেটি পড়তে দিলাম। পড়ে তিনি বিমুগ্ধ হলেন, বললেন—চমৎকার। এটি দাও ভারতীতে ছাপাতে। এক সংখ্যায় শেষ না করে তিন চার সংখ্যায় শেষ করো। লেখকের নাম প্রথমে চেপে রাখো—শেষের সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশ করো—Commercial stunt .... বুঝলে! লোকে ভাববে রবীন্দ্রনাথের লেখা। এ-লেখার জোরে আমাদের দেবীর খেশারৎ হয়ে যাবে'খন।' ('শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য')।

'বড়দিদি' পড়ে সেই সময় অনেকের মনে এই ধারণা হয় যে, ওটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গল্পটি পড়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন এবং লেখক সম্বন্ধে গভীর আগ্রহের কথা শুনে সৌরীন্দ্রমোহন, অবনীন্দ্রনাথ ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং শরৎ-চন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎ-চন্দ্রকে সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে এনে বাংলা-দেশের প্রকাশ্য সাহিত্যসভায় হাজির করার জন্য অনুরোধ জানান। সৌরীন্দ্রমোহনের কথায়, 'রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—যেমন করে পারো তাঁকে আনাও সৌরীন..... তাঁকে ধরে এনে লেখাও! বাংলাদেশে এঁর জোড়া লোক পাবে না।' ('শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য')।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'বড়দিদি' থেকেই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় লাভ হয়, 'পণ্ডিতমশাই' থেকে নয়।

মাবিদবরণ ঘোষ
চুঁচুড়া।

(২)

অমৃত পত্রিকার ৮ নভেম্বর '৭৪ সংখ্যার চিঠিপত্রের পৃষ্ঠায় শ্রীঅমল সেনগুপ্তের উত্থাপিত রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণটি 'ভারতী' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'শরৎ-চন্দ্রের জীবন রহস্য' নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'বৈশাখের (১৩১৪) ভারতী ছেপে বেরুলো ভাদ্র মাসে।'

'বড়দিদির শেষাংশে শরৎচন্দ্রের নাম ছাপা হলো—লেখক পরিচয়ে।'

'ভারতী (১৩১৪) বেরুবামাত্র মণিলাল (গঙ্গোপাধ্যায়) আমাকে বলেন, 'বড়দিদি' গল্প নিয়ে শৈলেশচন্দ্রের (বঙ্গ দর্শনের তৎকালীন সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার) রবীন্দ্রনাথকে অনুযোগ করার কথা। অবনীন্দ্রনাথ নিলেন শরতের পরিচয় এবং আমাকে বললেন—চলো তো কবির কাছে। লেখকের পরিচয় পাবার জন্য তিনি আকুল। রবীন্দ্রনাথের কাছে তখুনি গেলুম... সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ও মণিলাল। মণিলাল বললেন—আসামীকে এনেছি, কবিদা। এর জন্যই শৈলেশবাবু এসে আপনাদের সঙ্গে মান অভিমান করছিলেন। 'ভারতী'র 'বড়-দিদি' গল্পটি এঁরই বন্ধু শরৎ চাটুজ্জের লেখা। ইনিই গল্পটি ভারতীতে ছাপিয়ে-ছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে। আমি বললুম তার কথা—'

উক্ত পুস্তকের ২০-২৩ পৃষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্যের স্পষ্ট সমর্থন ও অমলবাবুর প্রশ্নের উত্তর ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিবরণ সুন্দর লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং 'কবিতীর্থের' বিবরণ ভুল ধারণা সঞ্জাত লেখকের স্মৃতিকথা হিসাবে মনে করা যেতে পারে। ইতি

দিব্যেন্দু সাহা
শ্রীরামপুর, হুগলী।

মহিলারা এখনও সেই তিমিরে

৯ঠা অকটোবর 'অমৃত'তে প্রকাশিত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'মহিলারা এখনও সেই তিমিরে'-এর ওপরে লেখা চিঠিটা পড়ে আমি কিন্তু পত্রপ্রেরকের সঙ্গে একমত হতে পারি নি। আমাদের দেশে ছেলেরা সংসারে এমনভাবে মানুষ হন যেখানে সাংসারিক কাজে মহিলারাই তাদের দূরে সরিয়ে রাখেন। স্বভাবতঃই ছোটবেলা থেকে কোন কাজ না করার অভ্যাসে বড় হয়ে অধিকাংশই এসব কাজ করতে পারেন না। তাছাড়া অনেক পুরুষেরই ধারণা সংসারের কোন কাজ মানে মেয়েলিপনা। সুতরাং সে কাজ করতে গেলে পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য আমি সব পুরুষের বেলায়ই এ-কথা প্রযোজ্য বলছি না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। তবে তাদের সংখ্যা এত স্বল্প যে হিসেবের বাইরে। সে হিসেবে আমি শ্রীমতী চৌধুরীর সঙ্গে একমত যে অধিকাংশ পরিবারে মহিলারা এত কাজ করেও ঠিক ঠিক মূল্য আদায় করতে পারছেন না।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরী করলে মহিলাদের বাইরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাজটিও নিপুণভাবে সমাধা করতে হয়। তবেই মেয়েরা গৃহলক্ষ্মী কথাটি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। স্ত্রী চাকুরী করলে ইজিচেয়ারে পা তুলে আরামে না বসলেও ছুটির দিনে নিয়মমাফিক আড্ডা, ক্লাব অথবা অন্য কিছু থাকলে বাদ দিয়ে স্ত্রীর কাজে সাহায্য করেন কম স্বামীই। উপরন্তু অনেক স্বামী চাকুরীজীবী স্ত্রীদের বলেন, মেয়ে যখন হয়েছো বাইরের চাকরীবাকরী যাই কর না কেন ঘরের কাজ তোমাদের করতেই হবে। এ প্রসঙ্গে আমার প্রতিবেশীনীর একটি আক্ষেপ তুলে দিচ্ছি। তাঁর স্বামী প্রায়ই বলেন, জামা-কাপড় কাচাকাচি এসব তোমাদেরই কাজ। চাকুরীজীবী মহিলাদের স্বামীর এ রকম উক্তিটি নিঃসন্দেহে খুবই দুঃখজনক।

আধুনিক অনেক মহিলারা শ্বশুর-বাড়ীর প্রতি যতই দরদ দেখান না কেন একান্নবর্তী পরিবারে স্বামীর রোজগার অধিক থাকলে তাঁরা একান্নবর্তী পরিবারের ততটা পক্ষপাতী থাকেন না। এ ব্যাপারে পুরুষেরা যদি দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দেন তবে মহিলারা কি একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে পৃথক হতে পারেন? সমগ্র পুরুষ-সমাজকে শ্রীমতী চৌধুরীর একই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বিচার করা ঠিক হয় নি। তবুও তিনি যে আমাদের গৃহিণীদের নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

বাণী সেনগুপ্তা
কাল-৩৭

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

সাপের।

বেকার স্ত্রীটের ঘরে বসেই হোলেনের মুখের কথা শুনে মনে মনে হোমস বুঝে নিয়েছিল, নিশ্চয় ডাক্তার আর জুলিয়ার ঘরের মধ্যে একটা ঘুলঘুলি আছে। তাই চুরুটের গন্ধ পেয়েছিল জুলিয়া। শিসের আওয়াজটাও ভেসে এসেছিল জুলিয়ার ঘরেই—হেলেনের কানে তা পৌঁছোয় নি।

হোমসের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মত ক্ষিপ্র হলেও যুক্তিনির্ভর। তাই মনে মনেই হিসেব করে দেখলে, ডাক্তার বোধহয় এমন একটা বিষ দিয়ে মেয়েকে মেরেছেন (টাকার লোভে) যে-বিষ কবোনারের রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা যায় না। ডাক্তারের ভারতীয় জন্তু জানোয়ার পোষার সখ আছে শুনে এবং বেদেদের সঙ্গে ওঠাবসা আছে জেনে সন্দেহ হল—সাপের কামড় নয় তো? সাপের দাঁতের দুটো ছোট্ট ফুটো কে আর দেখছে! শিস দিয়ে কি এই সাপকেই বোজ লেলিয়ে দেওয়ার পর ডেকে নেওয়া হয়েছে ঘুলঘুলি দিয়ে? তারপর সত্যি সত্যিই একদিন কামড়েছে জুলিয়াকে?

জমিদারবাড়ী এসে প্রমাণ পেল হোমস। জুলিয়ার খাট মাটির সঙ্গে আটকানো—যাতে নড়াতে না পারে। সাপ যাতে ঘুলঘুলি থেকে নেমে আসতে পারে—তাই দড়িটাও ঝুলছে সেখান থেকে। দুধের লোভ দেখিয়ে শিসের আওয়াজ শুনিয়ে সাপটাকে ফিরিয়ে আনতেন ডাক্তার—ফাঁসওলা চাবুক দিয়ে টেনে নিয়ে বন্ধ করে রাখতেন সিন্দুকের মধ্যে। ঝনঝন শব্দটা সিন্দুক বন্ধ করার শব্দ—বাসন পড়ার নয় চেয়ার পরীক্ষা করে দেখল হোমস—তার ওপর দাঁড়ানোর চিহ্ন রয়েছে। অর্থাৎ চেয়ারে দাঁড়িয়ে সাপটাকে ঘুলঘুলি দিয়ে কন্যা-নিধনে পাঠাতেন ডাক্তার।

ভারতবর্ষের অতি-বিষাক্ত আডার সাপ; শার্লক হোমসের বেত খেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে গিয়ে কামড়েছে ডাক্তারকেই—দশ সেকেন্ডের মধ্যে খতম হয়েছেন মহাপাপিষ্ঠ ডাক্তার রয়লট।

তার মানে, এ-মামলার অন্যতম হত্যা-কারী শার্লক হোমস স্বয়ং!

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে

অমৃত (২৯-১১-৭৪) সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হোসেন মুরশিদের এক পত্রের এই মন্তব্য—'তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) মৃত্যুর পর চল্লিশ দশকের শেষ দিকে এবং পুরো পঞ্চাশ দশক রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা আরো হ্রাস পায়'—তথ্যসিদ্ধ নয়। বরং আমাদের স্মৃতি উল্টো কথারই সাক্ষ্য দেয়। সে সময়কার সিনেমা সঙ্গীত কিম্বা আধুনিক গানগুলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। হয়তো একালের মত এত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সেকালে ছিলেন না। কিম্বা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনের সংখ্যাও এত ছিল না। কিন্তু অন্যান্য গানগুলি যে একালের মতো এতখানি অধঃপতিত যে ছিল না, তার কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থায়ী প্রভাব। আর একথা তো সর্বজনবিদিত যে, গোটা চল্লিশ দশক জুড়ে যে সঙ্গীতশিল্পী সম্পূর্ণ একক-ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তিনি পঙ্কজকুমার মল্লিক। সন্তোষ সেনগুপ্তের কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যেতে পারে—এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একক ও নিঃসঙ্গ পথিক। মুক্তি আলোছায়া অভিজ্ঞান অধিকার ডাক্তার প্রভৃতি ছায়াছবিতে পঙ্কজ-কুমারের আশ্চর্য কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত-গুলি সাধারণের কানে পৌঁছে যাচ্ছিল এবং লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছিল। সঙ্গীতপরিচালনাকালে তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে তো গ্রহণ করেই ছিলেন, এমন কি টাইটেল মিউজিকে এবং স্বীয় আরোপিত সুরে রবীন্দ্রপ্রভাবকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। কানন দেবী ও কে এল সায়গলের কণ্ঠস্বরকেও তিনি এই কাজে ব্যবহার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আকাশ-বাণীর একদা জনপ্রিয় সঙ্গীতশিক্ষার আসরে নিরলস প্রচার করে চলেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের।

সুচিত্রা মিত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীগণ স্বমুখে স্বীকার করেছেন তাঁদের শিল্পীজীবনে পঙ্কজকুমার মল্লিকের প্রভাবের কথা।

ছবি রায়
কলকাতা-৩৭।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(কুড়ি)

শ্রীঅরবিন্দের এই লিপিকার হেমপ্রভা আমার মনে শুধু যে এক গভীর আলোড়ন এনেছিল তাই নয়, আমার মূঢ় ধারণার নিরসন করেছিল যে শ্রীঅরবিন্দ কোনো কীর্তির কৈলাসবাসী হতে চান। কৈশোরে আমার অন্তরে প্রথম এ যবনের আলোড়ন আসে যখন 'কথামৃতে' পড়ি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী : 'ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।' শ্রীঅরবিন্দের এ-পত্রটির মধ্যে আমি শুধু যে তাঁর বীর্যের স্পন্দন শুনেছিলাম তাই নয়, হৃদয় আমার উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রেমে। পরে তাঁর সাবিত্রীতে পড়েছিলাম এই দীপ্ত প্রেমের উচ্ছলন—ভাগবতী বাণী :

> Ask not the imperfect fruit,
> the partial prize.
> Only one boon, to greaten
> thy sprit demand;
> Only one joy,
> to raise thy kind desire.

চাহিও না কখনো এ-জীবনে
অপরিণত ফল,
অপূর্ণ কীর্তির সিদ্ধি।
চাহিও কেবল এ-ধরায়
আত্মার প্রসার তব।
একটি পরম বর শুধু
করিও কামনা—তব
সাথী মানবের উন্নয়ন।

এই-ই চিরদিন চেয়ে এসেছে শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রেমিক অন্তরাত্মা। তাই তিনি আমাকে লিখেছিলেন তাঁর একটি প্রাণস্পর্শী গভীরদর্শী পত্রে* : ইংলন্ড থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর থেকে আমার যোগ চিরদিনই হয়ে এসেছে ঐহিক তথা পারমার্থিক। .....আমি বম্বেতে আপলো বন্দরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার নানা আত্মিক উপলব্ধি হয়েছিল কিন্তু কোনো মাটিছাড়া উপলব্ধি নয়...আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল যে, সৃষ্টির সবই ব্রহ্মে অনুস্যূত†,...

আমার যোগে ঐহিকতা ও পারমার্থিকতা দুই-ই পাশাপাশি ঠাঁই পেয়ে এসেছে।..... এই দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি থেকেই আমি আমার 'লাইফ ডিভাইন' ও 'সাবিত্রী' টীকাখি। ভগবানকে পেতে হবে অবশ্যই, কিন্তু তাঁকে ভালোবেসে তাঁর সেবা করা কর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁকে জানতে ও চিনতে চাওয়া শুধু বুদ্ধির মাধ্যমে নয় আত্মিক অনুভূতির আলোয়—আমার পূর্ণযোগে এ-সবই চাই। তুমি যদি কৃষ্ণপ্রেমের এ-নির্দেশ মানো যে, তোমাকেও চলতে হবেই হবে এই জ্ঞান কর্ম ভক্তির সমন্বয়-পথে—তাহলে সংসারবিমুখ পারমার্থিকতা তোমারও স্বধর্ম হতে পারে না।.....তুমি চিরদিনই গুরুবাদে বিশ্বাস করে এসেছ : আমি তাই বলতে চাই—তুমি গুরুর দেশনা (guidance) মেনে এখন ভগবানের করুণায় পূর্ণ নির্ভর কোরো কৃতকৃত্য হতে আর বিশ্বাস রেখো আমার অটল স্নেহে .....

এই বিশ্বাস ও নির্ভর আমার মনে আরো দৃঢ়মূল হয়েছিল গুরুদেবের অতি মানস-প্রত্যয়ের মন্ত্রময়ী লিপিকার—যার প্রেম, বীর্য ও ঐকান্তিকতার ত্রিবেণীসঙ্গমে আমি যেন স্নান করে নির্মল হয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, তাঁর বিশাল হৃদয়ের অমল আলোর স্পর্শে আমার নানা কুতর্কের অন্ধকার মিলিয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল—ধন্য আমি যে, এহেন মহামহিমার্ণব স্রষ্টা গুরুর অপার স্নেহগঙ্গায় অবগাহন করে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছি তাঁর উদার আদর্শকে—যে-আদর্শ পরে তিনি কবিতায়ও ফুটিয়ে তুলেছিলেন সাবিত্রী-তে অশ্বপতির চিত্রায়ণে (৩. ২) :

> His single freedom could not
> satisfy.
> Her light, her bliss he asked
> for earth and men
> into the darkness of the
> suffering world.

শুধু আপনার একেলার আত্মসুখী
মুক্তি তাঁর
ছিল না ইপ্সিত আর—চাহিলেন
তিনি তারিণীর
আলোক আনন্দরথ মর্ত্যের ও
মর্ত্যবাসী তরে—
আর্তা ধরণীর যুগ-অন্ধকার ঘুচাতে
সাধনে।

(একুশ)

কিন্তু মানুষের চেতনার রূপান্তর সম্বন্ধে গুরুদেবের অপরূপ নিশ্চয়োক্তি আমাকে অভিভূত করার ফলে অতিমানস সম্বন্ধে তাঁর নানা বাণীতে আমি সাড়া দিলেও সে-বাণী আমার বুকের তারে বেজে ওঠে নি—বলতে পারি নি মন মুখ এক করে : 'অতিমানসলোকেই আমি চিরাশ্রয় চাই, আমার ইষ্ট বলে বরণ করতে চাই অতিমানস অনামীকে।' এর একটা প্রধান কারণ—আমি আশৈশব নানা বৈষ্ণব পরমভাগবতকে আমার প্রেমের প্রণামী নিবেদন করার ফলে আমার সংস্কার গড়ে উঠেছিল রূপোৎসবী কৃষ্ণমুখী হয়ে। তাই আমি অচিন্ত্য অতিমানসলোকের মহামহীয়ান দেবদেবকে ডাকতে পারি নি সর্বান্তঃকরণে গাইতে পারি নি তাঁর অবোধ্য অপার সত্তার উচ্ছ্বসিত গুণগান। কৃষ্ণের ব্যক্তিরূপের বহুরূপী বৈচিত্র্যই আমার মনকে রঙিয়ে তুলেছিল। ব্যক্তিরূপ—ব্যক্তিরূপ—এই-ই তো তৃষ্ণার জল, চোখের আলো বুকের নিশ্বাস। শিব দুর্গা কালী তাঁদের ছবিও আমার প্রাণের পটে প্রেমের রেখায় রঙে আঁকতে পেয়েছিলাম বলেই আমি সাড়া দিতাম দেব-দেবীদের ডাকে। গঙ্গার তো কথাই নেই। ঐতিহাসিক টয়েনবি তাঁর আত্মজীবনী EXPERIENCES-এ লিখেছেন (১৪৭ পৃঃ)

> "I believe that the true end of Man is self sacrificing love; that love is divine; that it is the only God that we know from experience".

: অর্থাৎ, যে-প্রেম শুধু সব হারাতে ভয় না পেয়ে চলে একটানা আত্মোৎসর্গের দুরন্তসারে সে-প্রেম স্বরূপে দেবতা—কেবল এই দেবতাকেই আমরা জানি, চিনি অপরোক্ষ অনুভবে।

গঙ্গার দৈবী সত্তা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটিই আমি প্রতিধ্বনি করতে চাই : যে তিনি শুধু আকাশের দেবদুহিতা নন, মর্ত্যেরও মাতা পতিতপাবনী, অন্নদাতারিণী, আনন্দসুরধুনী। তাঁকে ভালোবেসে পূজা করে এসেছি আশৈশব—পুণ্যসলিলা বলে তার আদরকে জগন্মাতার ঘুমপাড়ানি কোল বলে। কৈশোরে একটি গান আমাকে মুগ্ধ

---

* SRI AUROBINDO' LETTERS — FOURTH SERIES ,,P 28-33
২৮-৪-৪৯

† শ্রীঅরবিন্দ বারবারই সমর্থন করেছেন উপনিষদের মহাকাব্য : 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—বিরক্ত বৈরাগীদের মায়াবাদ যে, 'জগৎ মিথ্যা'—এ-বাণীতে তিনি কোনদিনই সাড়া দেন নি।

করত : যে শেষের দিনে যখন অন্তর্জলী হব তখন

'অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে অর্ধ অঙ্গ রবে স্থলে
কেহবা লিখিবে ভালে কৃষ্ণনামাবলী।
(মূল গানটিতে ছিল কালীনামাবলী)

আমার একটি কামনা আমি বহুবারই ঠাকুরকে নিবেদন করেছি চোখের জলে—যার প্রাণকাড়া রূপ দিয়েছিলেন আমার পিতৃদেব, গঙ্গাপূজারী দ্বিজেন্দ্রলাল (সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে গেয়) :

পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে
বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথী! জাহ্নবি! সুরধুনি!
কলকল্লোলিনি! গঙ্গে!

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে : কৃষ্ণ তো গঙ্গার মতন প্রত্যক্ষ দেবতা নন—জগতে কোথাও তো তাঁকে দেখা যায় না—তাঁর বিগ্রহকে তো বলা চলে না মূর্ত কৃষ্ণ, যেমন গঙ্গাকে বলা চলে মূর্তিমতী নিস্তারিণী। এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর বুদ্ধির কাছে মেলে না, কিন্তু যার হৃদয়ে তিনি একবারও উঁকি দিয়েছেন যে শুনেছে তাঁর অকূল বাঁশি সে ধ্রুবপ্রত্যয়ের আখরে আনন্দের অবাধ উচ্ছ্বাসে :

ওরা হাসে.....কলভাষে ...
ওরা জানে না, তাই হাসে.....
ওরা জানে না.....তাই মানে না.....
আমি জানি.....তাই মানি.....
আমি অন্তরে তব বাঁশরী শুনেছি তাই
বঁধু আমি জানি—
তুমি আজো ডাকিলেই আসো.....
আজো বাঁশিসুরে ভালোবাসো.....
ডাকি আঁখিজলে যেই কোথা তুমি?'
সেই করুণায় নেমে আসো.....
তুমি নয়ন মুছাতে আসো.....
তুমি করো বুকে বুকে যুগে যুগে
গান বঁধু.....
তাই আজো তব রবে সুখে দুখে
ঝরে মধু.....
দুখ-বাদলে তোমায় জানি.....
সুখ-কিরণে তোমাকে জানি...
বঁধু, বিরহে তোমায় জানি. ....
মধু মিলনে তোমায় জানি.....
আমি জীবনে তোমায় জানি.....
স্বামী মরণে তোমায় জানি।.

---

*কয়েক বৎসর আগে হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে আমি একটি গান বেঁধেছিলাম :

এসো কাছে.....আরো কাছে.....
শুনি তোমার জলের মুক্তিনূপুর বাজে
যারা বলে : তুমি শুধুই জলের ঢেউ মা,
তারা প্রাণ-অতলে তোমার কোলের
ডাক শোনে নি কেউ মা!

শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে কৃষ্ণের বাণী পেয়েছিলেন, দেখেছিলেন তাঁকে সর্বত্র—'তেন সর্বমিদং ততম'। তাঁর বর্ণনা পড়লে মনে আসে গীতার 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'—যিনি কৃষ্ণকে সবখানেই দেখেছেন এমন মহাত্মা সুদুর্লভ। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এমনি মহাত্মা পূর্ণকৃষ্ণোপলব্ধি করে। তাই তিনি আমার কৃষ্ণসংস্কারকে শুধু যে সমর্থন করেছিলেন তাই নয় আমাকে একাধিকবার লিখেছিলেন যে, আমার কৃষ্ণলাভ হোক এ তিনিও চান। সর্বান্তঃকরণে—শুধু তাই নয়, ১৯৩৩ সালে মে মাসে আমাকে লিখেছিলেন জোরালো সুরেই :

"I am prepared to take you the whole way myself."

শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে প্রস্তুত।)

কৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি আরো জোর দিয়ে লিখেছিলেন একটি বিখ্যাত দীর্ঘপত্র মনীষী শ্রীসঞ্জীব রাওয়ের প্রশ্নের উত্তরে। এ-প্রশ্নটি তাঁর কাছে আমি দাখিল করেছিলাম রাওসাহেবের চিঠি পাঠিয়ে। বন্ধুবর প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি কৃষ্ণচেতনাকে সত্য বলে মানলেও জানতে চান—কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বা গোপীদের আত্মহারা প্রেমলীলা ঐতিহাসিক সত্য, না শুধু প্রতীক মাত্র অথবা সাধু বা ভক্তের মনগড়া গল্পগাথা বা মূর্তি গড়ার সনাতন উচ্ছ্বাস? আমি আমার পত্রে শুধু এইটুকু জুড়ে দিয়েছিলাম যে, আমি মানি বৈষ্ণবদের বাণী যে প্রতি হৃদয়ই এক একটি গোপী হৃদয়—যদি অবশ্য সে কৃষ্ণকে মধুরভাবে বরণ করে তাঁর পরম মিলন চায় নিত্যবৃন্দাবনে।

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন রাওসাহেবের প্রতি প্রশ্নের খুঁটিয়ে উত্তর দিয়ে। কিন্তু সে-সব উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। কেবল এইটুকু ভূমিকা করতে চাই যে, শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন—দেবদেবীরা মানুষের কল্পিত নন, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁরাও আছেন ও মানুষের কাছে নিজের নিজের রূপ ধরে আসেন যদি মানুষ তাঁদের দর্শন চায়। আরো লিখেছিলেন যে, : তিনি নিজে কৃষ্ণ তথা কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। লিখে শেষের দিকে এই মন্তব্য করেছিলেন :

"The Lila of the Gopis seems to be conceived as something which is always going on in a divine Gokul and which projected itself in an earthly Brindavan and can always be realised and its meaning made actual in the soul..... These questions and the speculations to which they have given rise have no indispensable connection with the spiritual life. There what matters is the contact with Krishna and the growth towards the Krishna consciousness, the presence, the aspiration, the spiritual relation, the union in the soul and till that is reached, the aspiration, the growth in bhakti and whatever illumination one can get on the way. To one who has had these things, lived in the presence, heard the voice, known Krishna as Friend or Lover, Guide, Teacher, Master or, still more, has had his whole consciousness changed by the contact, or felt the presence within him, all such questions have only an outer and superficial interest. So also one who had had contact with the inner Brindavan and the *lila* of the Gopis, made the surrender and undergone the spell of the joy and the beauty or even only turned to the sound of the flute, the rest hardly matters. But from another point of view if one can accept the historical reality of the incarnation, there is this great spiritual gain that one has a *point d'appui* for a more concrete realisation in the conviction that once at least the Divine has visibly touched the earth, made the complete manifestation possible, made it possible for the divine supernature to descend into this evolving but still very imperfect terrestrial nature. (2.12.46)

(ভাবার্থ : মনে হয়, গোপীদের প্রেমলীলা কল্পিত হয়েছে এক নিত্য বৃন্দাবনে যার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে আমাদের প্রাকৃত গোকুলে—তাই এ-সত্যকে চিরদিনই উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এ-সব জল্পনাকল্পনার সঙ্গে আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। আসল কথা, চাইতে হবে কৃষ্ণচেতনার সঙ্গে সংযোগ তথা তার ফলে মানবিক চেতনার বিকাশ কৃষ্ণের দর্শন তাঁর সঙ্গে আন্তর আদানপ্রদান আত্মিক মিলন। এ-মিলন না হওয়া পর্যন্ত নিরন্তরই চাইতে হবে ভক্তির ক্রমোন্মেষ—এ-উন্মেষের পথে যতটা পাবা যায় আলোর পাথেয় আহরণ করে। যার এই সব আত্মিক লাভ হয়েছে সে পেয়েছে তাঁর দর্শনের উপজীব্য, শুনেছে তাঁর সম্ভাষণ চিনেছে তাঁকে বন্ধু, বল্লভ দিশারি গুরু প্রভু অন্তর্যামী বলে—সর্বোপরি, যার সমগ্র চেতনা তাঁর স্পর্শে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তার কাছে আর সব তথাই বাহ্য। কেননা যে নিত্যবৃন্দাবনে গোপীলীলার সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছে কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে পেয়েছে পরমানন্দ দেখেছে তাঁর রূপরাগ বা শুধু সাড়া দিয়েছে তাঁর বাঁশির ডাকে—তার আর কী প্রার্থনীয় থাকতে পারে? তবু একদিক দিয়ে বলা চলে যে, কৃষ্ণাবতারের ঐতিহাসিকতাকে যদি কেউ সত্য বলে মেনে নেয় তাহলে তার এই একটা মস্ত আত্মিক লাভ হয় যে সে একটি প্রত্যক্ষ ভিত্তিমূলের পরে দাঁড়াতে পেরে পৌঁছয় এই গভীর নৈশ্চিত্যে যে অন্তত একবার ভগবান প্রত্যক্ষ নরতনু ধরে পৃথিবীতে নেমেছিলেন, পেরেছিলেন নিজের পূর্ণিমাপ্রকাশকে সম্ভব করে দিব্য পরা প্রকৃতিকে অবতীর্ণ করতে এই ক্রমবিকশমান খুঁতে-ভরা বসুন্ধরায়।')

(ক্রমশঃ)

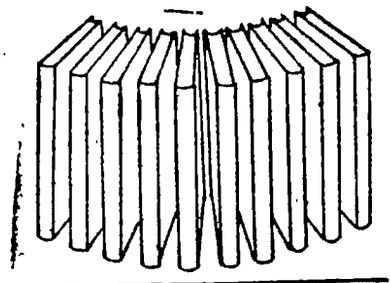

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অন্তর্মনা : গত শুক্রবার ২০এ ডিসেম্বর অপরাহ্নে কবি হরপ্রসাদ মিত্রের লেক টাউনের বাসভবনে সাহিত্যের লেখক-পাঠকের একটি আসরের সূচনা হয়। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুশীল রায় শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ, শ্রীশিবাজী গুপ্ত এবং অন্যান্য লেখক ও অধ্যাপক কবিতা-পাঠে ও আলোচনায় যোগ দেন। হরপ্রসাদ মিত্রের এক গুচ্ছ কবিতা-বিন্যাসের গভীর নাটকীয় আবেদনটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

নেপালী ভাষার সরকারী স্বীকৃতি লাভ

সাহিত্য আকাদেমী সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, নেপালী ভাষাকে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এর ফলে এখন থেকে নেপালী ভাষায় রচিত পুস্তকাদিও আকাদেমী কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবশ্য নেপালী সরকারী ভাষা হিসেবে পূর্ব থেকেই স্বীকৃত ছিল। এ-রাজ্যের মধ্যে দার্জিলিং জেলাতেই নেপালী ভাষাভাষীর সংখ্যা সর্বাধিক। ঐ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ কিছুকাল পূর্বেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন নেপালী ভাষার সর্বভারতীয় স্বীকৃতির জন্য। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টার ফলেই আকাদেমী বর্তমান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার অভিযান

রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের সমাজ শিক্ষা শাখার উদ্যোগে ২৪ পরগণা জেলার পনেরোটি ব্লকে মোট ৬০টি সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রে যাঁরা শিক্ষকতা করবেন, তাঁদের সকলকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী এখন পর্যন্ত কুচবিহার বর্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এই ধরনের সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

শিশু-সাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোমের জন্ম-জয়ন্তী

শিশু-সাহিত্যিক স্বর্গত যামিনীকান্ত সোমের ১৯তম জন্ম-জয়ন্তী নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে সুসম্পন্ন হয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা কার্যালয়, ৮০নং বৈষ্ণবপাড়া লেন হাওড়ায় অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন রমেশ দাস। 'হাওড়া বার্তা' সম্পাদক ডঃ শম্ভুচরণ পাল এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ধ্রুববিকাশ দাস শিশিবকুমার মজুমদার প্রসেনজিৎ বসু প্রমুখ সুধীবৃন্দ স্বর্গত সোমের স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতির জন্যও এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

'শতরূপা'র উদ্যোগে গুণীজন সম্বর্ধনা

ত্রৈমাসিক 'শতরূপা'র উদ্যোগে কলকাতার ইনফরমেশন ব্যুরোয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ডঃ রমা চৌধুরী সরযূ দেবী কানন দেবী অমলাশঙ্কর ও উৎপলা সেনকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শঙ্করপ্রসাদ মিত্র। যুগান্তর সম্পাদক সুকমলকান্তি ঘোষ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ অধ্যাপক হরিপদ ভারতী ও বাণী রায় প্রমুখ সুধীবৃন্দ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

'কৃষ্টি' আয়োজিত সাহিত্য আলোচনা সভা :

গত ১৫ ডিসেম্বর বারুইপুরের 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন হল'-এ 'কৃষ্টি' সাহিত্য সংস্থা আয়োজিত 'সাহিত্য সন্ধ্যায় কবিতা পাঠ এবং আলোচনার ব্যবস্থা হয়। কবিতার দুর্বোধ্যতা এবং গল্প-কবিতার সীমার প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান আলোচনা হয়। আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন কবিতা সিংহ শেখর বসু কল্যাণ সেন রত্নেশ্বর হাজরা পরেশ মন্ডল অশোক চট্টোপাধ্যায় রণজিৎ মজুমদার নির্মলেন্দু গৌতম উত্তমকুমার দাশ সুনীলকুমার প্রমুখ কবি ও কথাসাহিত্যিক। আধুনিক কবিতা আবৃত্তি করে শোনান মৈত্রেয়ী দেব।

মন্ট্রিল-এ আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মেলা

আগামী বৎসর মে মাসের মাঝামাঝি (১৫ — ১৯) মন্ট্রিল নগরীতে একটি গ্রন্থ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সহযোগিতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে [illegible] শ্রেণীর ব্যক্তি ও সংস্থা এই অনুষ্ঠানে যাতে যোগদান করেন সেজন্য উদ্যোক্তাগণ বিশেষ আগ্রহী। প্রকাশক মুদ্রক শিল্পী লিটারেরী এজেন্ট পত্র-পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন বলে আশা করা যায়। এসম্পর্কে যোগাযোগের ঠিকানা—মিঃ রেজিন লা মেউর পাবলিক রিলেশনস ডিরেক্টর মন্ট্রিল ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার ইউরোপীয়ান অফিস ৩৩৬-৩৪০ রু সন্ত-হনর প্যারিস ফ্রান্স।

অনুবাদ সম্পর্কে তথ্য

অনুবাদ সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তি তথা প্রকাশকগণ অনেক সময়েই নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যেমন অনুবাদ করার রাইট, দেনা-পাওনার প্রশ্ন উত্তরাধিকারী কে—ইত্যাদি। যে সমস্ত গ্রন্থের 'কপিরাইট'-এর সমস্যা নেই, সে সম্পর্কে অবশ্য এ-সবের কোন অসুবিধে দেখা যায় না। কিন্তু একেবারে হালফিলে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অনুবাদের বেলায় এ-সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই সমস্ত ব্যাপারে লেখকগণ তথা প্রকাশকগণকে সুপরামর্শ দেবার জন্য সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণপারামপিল পি পুন্নুস এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। তাঁর ঠিকানা—ষষ্ঠ সেকটর—৮০৬ রামকৃষ্ণপুরম, নয়াদিল্লী—১১০০২২।

—জয়ংকার

নতুন বই

নন্দন কাননে—দীপককুমার সরকার। সুপ্রিয়া প্রকাশনী। ২ই বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা—৩। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

হিমালয়ে সেই কোন অনাদি অতীত থেকেই আমাদের কাছে এক অপার রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও তার দুরন্ত নদীর কোল জুড়ে ফসল ক্ষেত, কোথাও উত্তুঙ্গ শিখর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আবার কোথাও রয়েছে বন্ধুর উপত্যকা। হিমালয়ের প্রতিটি বাঁকে বাঁকেই দৃশ্যবদল। অপার রহস্য যেন ওৎ পেতে রয়েছে দুর্গম অভিযাত্রীদের চোখ ভোলাতে।

গাড়োয়ালের ভুন্দর নদীর তীরে আছে নন্দন কানন। এখানে সারা উপত্যকা জুড়ে বিচিত্র ফুলের সমারোহ। অথচ নন্দন কাননের কথাই তো জানতো না কেউ। ১৯৩১ সালে একে আবিষ্কার করা হয়। ১৯৩৬ সালে এই অঞ্চলেই শিখরা আবিষ্কার করেন পবিত্র তীর্থ হেমকুন্ড। তারপর থেকেই মানুষের বিরতিবিহীন পদযাত্রা চলেছে এর উদ্দেশ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করতে।

লেখক নন্দন কাননের পথে ক্ষেত্রে ও [illegible] অভিজ্ঞতা [illegible] সম্পর্ক

করেছিলেন তার ভিত্তিতে এই বইখানি লিখেছেন। রহস্য রোমাঞ্চে ভরা এই ভ্রমণ কথা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে লিখেছেন দীপক-কুমার সরকার। সাবলীলগতিতে ভ্রমণ কাহিনী এগিয়ে চলেছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কোথাও এতটুকু গতিভঙ্গ হয়নি। এরই মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ স্থানের উচ্চতা, এক স্থান থেকে এক স্থানের দূরত্ব এমনি সব প্রয়োজনীয় তথ্যও জানাতে ভোলেন নি। ছাপা এবং প্রচ্ছদ ভালো।

রিক্ত বসন্ত (গল্প সংকলন)। বৈতালিক। জ্যোতি প্রকাশন ২-এ নবীনকুণ্ডু লেন কলকাতা ৯। ছয় টাকা।

কয়েকটি গল্পের সংকলন 'রিক্ত বসন্ত' লেখক বৈতালিক। গল্পগুলি পুরনো ছাঁদের। সমস্যা প্রেম বাৎসল্য দারিদ্র্য ইত্যাদি। 'রিক্ত বসন্ত' গল্পের সতী অনুপমের সম্পর্কের টানা-পোড়েন শেষ লগ্ন গল্পের মানসী-পরিতোষের বৃহৎ জীবন-বোধে উত্তরণ মাতৃত্বের 'অভিষেক' গল্পে প্রশান্তর দ্বিতীয় স্ত্রী নন্দিতার বাৎসল্য-বোধ ও স্বামীর প্রথম স্ত্রীর পুত্রের কাছে বিমাতার ভীতি থেকে সরে এসে পূর্ণ মাতৃত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া ইতিহাসের কান্না গল্পে সমীর-পলাশীর প্রেম সম্পর্ক গল্প রসপিপাসু সাধারণ পাঠকদের তৃপ্ত করবে। কোথাও কোথাও লেখক বস্তুভিত্তিক সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করলেও পাঠকচিত্ত তৃপ্ত থাকবে।

অকাল বোধন ও অন্যান্য গল্প (গল্প সংকলন)। শঙ্কর বসু। রায় এন্ড চৌধুরী ৮।২ হেস্টিংস স্ট্রীট কলকাতা-১। সাত টাকা।

মোট বারোটি ছোট গল্পের সংকলন হল শঙ্কর বসু রচিত অকাল বোধন ও অন্যান্য গল্প নামের গ্রন্থটি। শঙ্কর বসু নতুন লেখক কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। বিষয়ে সমকাল ও একালের ভেঙে-পড়া মানুষ ও মানবতার কথা বলেছেন লেখক। আশ্চর্য ক্ষমতার কথা রয়েছে ভাতের উপাখ্যান গল্পে আছে জননী জনম দুখ হরতালের এক হপ্তা গল্পে। বলার ভঙ্গিতে কখনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচিত প্রতীকের প্রয়োগ কোথাও বা রূপকথার ঢঙে আধুনিক সর্বহারা মানুষের কাহিনী বলার চমৎকার প্রয়াস রয়েছে। গল্পের গতানুগতিক ফর্মকে ইনি ভাঙতে চাইছেন, কিন্তু বিষয়কে মানুষের মর্মের সঙ্গে গেঁথেই। সর্বকালের মানুষের বাঁচার কথা সাধারণ ক্ষুধা নয় ক্ষুধাকে ধরে বড় করে বাঁচার কথা, সেই সঙ্গে মরার করুণ চিত্রও এঁকেছেন লেখক। এ ব্যাপারে 'চাঁদের বিয়ে' জেলখানার মঙ্গল-সুল-মহিমের চরিত্রচিত্রময় গল্প 'অকাল বোধনের' কথা মনে পড়ে। কিছু শব্দে 'ম্যানারিজম' অতিরিক্ত বাক্য ভেঙে ছোট করার প্রবণতা এবং পরিবেশ বর্ণনার আতিশয্য কমালে গল্পগুলি খাঁটি শিল্পের বন্ধন পেতো।

নিবেদন। শ্রীমিহির দাস। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

'নিবেদন' মিহির দাসের প্রথম কবিতার বই। প্রচুর টাকা খরচ করে বার করা প্রায় পৌনে দুশো পাতার এই বই। এতে ৪৪টি পদ্য (পদ্য শব্দটা সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি) এবং সাতটি গান আছে। পদ্যগুলি লেখার তারিখ একেবারে আধুনিককালের (১৯৭২ ৭৩ ৭৪)। তারিখ দেওয়া না থাকলে মনে হতো বেশ কয়েক যুগ আগের লেখা। বেশীর ভাগ লেখাই বিরাট আকারের ৭।৮ পাতার। তবুও এর মধ্যে ভিক্ষা লীলাবতী ছবি হলদিয়া আধেক দেখা লেখাগুলি ভালো লাগলো। 'নিবেদন' দেখে জানলাম কবি হলদিয়ার ইঞ্জিনীয়ার। তাই রচনাগুলির মধ্যে হলদিয়ার একটা সামাজিক অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিক দুর্বোধ্য কবিতার ওপর যাঁরা বিরূপ কিংবা আধুনিক কবিতার ওপর যাঁদের বিতৃষ্ণা তাঁদের এই বই ভালো লাগতে পারে।

সুরা-সাকী ও সাহিত্য—শ্রীরমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাকুলিয়া সিংভূম বিহার। চার টাকা।

মানুষের জীবন মন অধ্যাত্ম ভাষায় মানবিক প্রেমবোধ জড় জীবনের অতীত এক অমৃতময় জীবনস্বরূপকে সুরা-সাকী ও সাহিত্য গ্রন্থে যুগ্ম লেখক ব্যাখ্যা করেছেন। মোট পাঁচটি প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রচনাগুলি সুলিখিত ও নানা তথ্য ও তত্ত্বে যুক্তি-সম্মত-রূপ গ্রহণ করায় পাঠকদের জ্ঞান পিপাসা যথোচিত তৃপ্ত করার সহায়ক হয়েছে।

উৎস সুকান্ত—সম্পাদনা : দেবযানী চক্রবর্তী। হায়দরপুর, মালদহ। দাম এক টাকা।

শীর্ণকায় এই পরিচ্ছন্ন রুচির পত্রিকাটিতে কিছু ভালো কবিতা চোখে পড়ল। লিখেছেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পরিতোষ খাঁ, অমিত গুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমল চক্রবর্তী অসীম বসু পুষ্পজিৎ রায়, দেবযানী চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন।

সাহিত্য চিন্তা—সম্পাদক : কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩১১, গাঙ্গুলীবাগান, কলকাতা-৪৭। দাম দেড় টাকা।

সাহিত্য চিন্তার শারদীয় সংখ্যায় কিছু ভালো কবিতা এবং প্রবন্ধ রয়েছে। বিষ্ণু দে, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, রাম বসু শঙ্খ ঘোষ এবং সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা ভালো লেগেছে। অচ্যুত গোস্বামী এবং ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধও উচ্চমানের।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অরণি—অসিতকুমার দত্ত। শিবপুর, হাওড়া-২। কুড়ি পয়সা।

আগমনী—শিশির কবিরাজ ও অর্ধেন্দু রাজ সম্পাদিত। দুবরাজপুর, বীরভূম। দাম ২৫ পয়সা।

পদক্ষেপ—সম্পাদনায় : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল কাদের এবং বিমলেন্দু দত্ত।

সম্ভার—মুর্শিদাবাদ। দাম উল্লেখ নেই। 'হিজল বিলের রাখালেরা' সৈয়দ সিরাজের গল্প এই সংখ্যার একটি বিশেষ আকর্ষণ। বিষ্ণু সামন্তের কবিতা ভালো লাগল।

সৈকত—সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য। সৈকত সরণী। বুঁইচা, নদীয়া। পঁচাত্তর পয়সা।

মাঠ ময়দান কারখানা—আলি আকবর ও নন্দ চৌধুরী সম্পাদিত। পি-৮ শরৎ-চন্দ্র এভিনিউ। পোঃ দুর্গাপুর-৫। বর্ধমান। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

অঙ্গনা

মহীয়সী নারীর অন্তর্ধান

বাঙ্গালী যে সমস্ত মহিলা অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারিণী ছিলেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী তাঁদের অন্যতম। বাঙ্গালী হিসেবে যে কোন মহিলার কৃতিত্বই আমাদের গর্বের বস্তু। সুচেতা কৃপালনী কৃতিত্বের যে স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন সেদিক থেকে বিচার করে দেখলে আমরা তাঁকে আর শুধু বাংলার গৌরব হিসেবে মনে করে তাঁর বিরাটত্বকে সীমিত না করে তাঁকে সমগ্র ভারতেরই মহিলা সমাজের গৌরব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সুচেতা কৃপালনী উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন কিন্তু তাঁর উচ্চশিক্ষাই তাঁকে আত্মত্যাগ, দেশপ্রেমের মহান ব্রতে উজ্জীবিত করেছিল এমন নয়। দেশকে তিনি ভালবাসতেন সমস্ত অন্তর দিয়ে। দেশের উন্নতিকল্পে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুচেতা কৃপালনীর বিরাট অবদান দেশবাসীকে চমকিত করে। পরাধীন ভারতকে অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত তিনি অক্ষরে অক্ষরে এই সংকল্পকে পালন করেছেন। তিনি শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জাতীয়তাবাদী নেত্রীই ছিলেন না সংগঠক ও প্রশাসকরূপে তিনি এক উজ্জ্বল কর্মদক্ষতার পরিচয় দেশবাসীর সামনে রেখে গেছেন।

সুচেতা কৃপালনীর ১৯০৮ সালে নদীয়া জেলার এক ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হয়। বিয়ের আগে তাঁর পদবী ছিল মজুমদার। তাঁর পিতা ছিলেন পাঞ্জাবের প্রবাসী বাঙ্গালী ডাক্তার। সুচেতা মজুমদার বাল্যকালে পাঞ্জাবের লাহোর শহরেই লেখাপড়া আরম্ভ করেন। ১৯৩১ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম-এ পাশ করে তিনি ১৯৩১-৩৯ সাল পর্যন্ত কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন।

সুচেতা মজুমদার ১৯৩৪ সালে বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় অসাধারণ সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সে সময় থেকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী আচার্য কৃপালনীর এক বিরাট সহায়করূপে কাজ করতে থাকেন। তখন থেকে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯৩৯ সালে তিনি রামমনোহর লোহিয়ার স্থলে কংগ্রেসের বৈদেশিক বিষয়ক সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে তিনি অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মহিলা দপ্তরে সম্পাদক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। অচিরেই তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে থাকেন এবং সব রকম কঠিন ও কঠোর কাজের জন্য প্রশংসিত হন। এ সময় থেকে পারিবারিক জীবন তুচ্ছ করে তিনি ঘনঘন কারাজীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।

১৯৪৫ সালে তিনি কস্তুরবা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর সংগঠন সম্পাদক ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে যখন নোয়াখালিতে হিন্দুদের ওপর চরম অত্যাচার হয় সুচেতা কৃপালনী প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ঐ জেলায় দাঙ্গাপীড়িত অসহায় নরনারী শিশুর সেবায় নিমগ্না হন। তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে শান্তির প্রতিমূর্তি হিসেবে আবির্ভূতা হন। সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ যাতে দেশকে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। ১৯৪৭ সালে উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সদস্যারূপে স্থান লাভ করেন এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি সদস্যারূপে কংগ্রেস সংগঠনের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। স্বামীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি একাত্মা ছিলেন। তাই ১৯৫১ সালে আচার্য কৃপালনীর কংগ্রেস পরিত্যাগের সঙ্গে তিনিও কংগ্রেস থেকে সরে আসেন। ঐ সাল থেকেই তিনি স্বামীর সঙ্গে কিষাণ মজদুর পার্টি গঠন করেন। এই দল গঠন করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সমাজতন্ত্রের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ১৯৫৭ সালে শ্রীমতী কৃপালনী আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন এবং ১৯৫৮ সালে আবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। বছর কয়েক একাজ করার পর তিনি ১৯৬০ সালে মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে ইন্টার ন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে জেনেভাতে গিয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালের ২রা অকটোবর কামরাজ প্ল্যান অনুযায়ী চন্দ্রভানু গুপ্তকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হয় এবং সে স্থানে সুচেতা কৃপালনী অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালের ৩ রা মার্চ পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন পরে ঐ বছর তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হন।

দেশের এই মহান নেত্রী ৬৭ বছর বয়সে ১ ডিসেম্বর দিল্লীতে পরলোকগমন করেন। তাঁর পরলোকগমনে সংগ্রামী, দেশপ্রেমিকা ও সমাজসেবীর এক বিরাট স্থান শূন্য হয়ে গেল।

টুকিটাকি :—

গ্রামদেশের মানুষেরা কাপড়-জামা কাচতে সাবান সোডা ছাড়া অন্য কোন রকম রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতে এখনও ঠিক অভ্যস্ত নয়। প্রকৃতি থেকে পাওয়া জিনিসই তাঁদের অন্যতম প্রধান ভরসা। জামা-কাপড়ে তাঁরা অজানা রং লাগলে সাবান-সোডার সঙ্গে বেশ কিছু পাতি লেবু কেটে নিয়ে তা সেদ্ধর পাত্রে দিয়ে দেয়। তাতে সহজেই কাপড়ের দাগ মিলিয়ে যায়।

ভুলবশতঃ এক পোশাকের রং অন্য পোশাকে লেগে গেলে তা সাবান দিয়ে ফোটাবার সময়ে খানকয় পাতি লেবুর টুকরো ফেলে ভাল করে সেদ্ধ করলে তা আপনিই উঠে যায়। অবশ্য রঙীন কাপড়ের রং বেশী সিদ্ধ করলে হালকা হয়ে যায় তবু অন্য রং লেগে যেসব কাপড় অব্যবহার্য হয়ে যায় তাকে আবার ব্যবহার করা চলে।

কাপড়ে তেল রং লাগলে চক বা ট্যালকম পাউডার গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্রমশঃ তা মাঝখানে একটা ছোট বিন্দু করে আনলে তা কালির তেল শুষে নেয়। পরে কোট ঝাড়ার ব্রাশ দিয়ে তা ঝেড়ে ফেললে কাপড়ের তেল রং অদৃশ্য হয়ে যাবে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

সব ঘরেরই ঘরোয়া কথা...

"অফিসে সবাই জানতে চায়, আমি ক্যান্থারাইডিন মাখি কেন। আমি বলি, মেখে আরাম পাই, আর কেন। আসল কথা, এতে আমার চুল ওঠা বন্ধ হয়। কিন্তু তা বলি কি ক'রে? সবাই তো ভাববে বুড়িয়ে যাচ্ছি।"

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশবিন্যাসে পরিপাটি পরিবারের ঘরোয়া রহস্য

বেঙ্গল কেমিক্যালের সেরা উৎপাদন

U-BC-8 BEN

রান্না করে দেখুন

টোম্যাটো টোম্যাটো এবং টোম্যাটো ॥

শীতের সকালে বাজারে গেলে টুকটুকে লাল পাকা টোম্যাটো দেখে প্রতি গৃহিণীর মন খুশিতে ভরে যায় এবং নানা রকম পদ রান্না করে প্রিয়জনদের খাওয়াতে ইচ্ছে করে। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও শীতের বাজারে টোম্যাটোর লাল হাসি দেখা দিয়েছে—তবে দামের প্রশ্নে সকলের আয়ত্তের মধ্যে আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবু আজ টোম্যাটো দিয়ে রান্না করা যায় এমন কয়েকটি পদের কথা বলব—এর মধ্যে যে টোম্যাটোর জেলির কথা বলেছি তা তৈরী করে যত্ন করে রাখলে এক বছরও স্থায়ী হতে পারে। প্রচুর ভিটামিনে ভরপুর পাকা টোম্যাটো বাচ্চারা কাঁচাই নুন দিয়ে খেয়ে নেয়—বড়রাও খেতে পারেন—নুনের সঙ্গে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নেবেন খারাপ লাগবে না।

স্টাফড টোম্যাটো ইন গ্রেভি :

স্টাফড টোম্যাটো : উপকরণ : মাঝারি মাপের গোল পাকা অথচ শক্ত টোম্যাটো ৬টি রুই অথবা ভেটকি মাছ ২০০ গ্রাম পেঁয়াজ একটি রসুন ২ কোয়া আদা এক টুকরো এক চা চামচ চিনি নুন আন্দাজ মতো লঙ্কার গুঁড়ো আধ চা চামচ একটু গরম মশলা এক-আঁটি পুদিনা পাতা ভাজবার জন্যে বাদাম তেল বা ভেজিটেবল ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। মাছ সেদ্ধ করে কাঁটা বেছে মিহি করে শিলে বেটে নিন। ২। পেঁয়াজ আদা রসুন ও গরম মশলা বেটে রাখুন পুদিনা পাতা বেছে ধুয়ে কুচিয়ে নিন। ৩। টোম্যাটো ধুয়ে নিয়ে ওপরের দিকের খানিকটা অংশ এমনভাবে চিরে নেবেন যাতে আলাদা না হয়ে যায়। ৪। এবারে একটা চায়ের চামচ দিয়ে টোম্যাটোর ভেতরের শাঁস ও বিচি বার করে নিন—এগুলি গ্রেভি রান্নার সময় ব্যবহার করতে পারেন। ৫। কড়াইয়ে তেল বা ঘি গরম করে পেঁয়াজ আদা ও রসুন বাটা ভাল করে কষে নিন। ৬। মাছ লঙ্কার গুঁড়ো নুন ও চিনি তার মধ্যে দিয়ে নাড়তে থাকুন। ৭। জলীয় ভাব মরে শুকিয়ে এলে নামিয়ে নিন। পুদিনা পাতা ও গরম মশলা মেশান। ৮। পুরটা ঠান্ডা হয়ে গেলে খুব সাবধানে টোম্যাটোগুলির মধ্যে এমনভাবে ভরে ফেলুন যাতে দুটো অংশ ভেঙে আলাদা না হয়ে যায়। খুব বেশি ভরবেন না। টোম্যাটোর ওপরের অংশটা ঢাকনা বন্ধ করার মতো বন্ধ করে একটু চেপে দিন। ৯। কড়াইয়ে ঘি বা তেল গরম হলে একটি বা দুটি টোম্যাটো আস্তে আস্তে ছাড়ুন, ঢাকনার দিকটা ওপরে থাকবে। এমনভাবে তেল বা ঘি দেবেন যাতে টোম্যাটোর আধখানা অংশ ডুবে থাকে। ১০। চামচে করে কড়াইয়ের গরম ঘি তুলে টোম্যাটোর ওপরের অংশে দিতে থাকুন। ১১। খুব সাবধানে খুন্তি দিয়ে একবার উল্টে ওপর দিকটা নীচে করে দিন ও থালায় নামিয়ে রাখুন।

গ্রেভি : উপকরণ : পেঁয়াজ একটি টোম্যাটোর শাঁস একটুখানি দই অর্ধ কাপ ধনে পাতা এক আঁটি আদা এক টুকরো রসুন ২ কোয়া ২ চা চামচ চিনি ১ চা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো অল্প গরম মশলা ২টি তেজপাতা নুন হলুদ ও লঙ্কার গুঁড়ো আন্দাজ মতো ১০০ গ্রাম তেল বা ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। পেঁয়াজ রসুন আদা গরম মশলা বেটে নিন ও ধনে পাতা কুচিয়ে রাখুন। ২। ঘি গরম হলে তেজপাতা ছাড়ুন। ৩। সুগন্ধ বার হলে ওতে গরম মশলা ছাড়া অন্য সব পেষা মশলা নুন হলুদ লঙ্কার গুঁড়ো ও টোম্যাটোর শাঁস ছাড়ুন। ভালভাবে কষা হয়ে হয়ে গেলে দই ও চিনি দিন। ৪। ভালভাবে ফুটে ঘন হয়ে এলে নামিয়ে গরম মশলা ও ধনে পাতা দিন। ৫। এখন আগের পুরভরা টোম্যাটোগুলি একটি চিনেমাটির সুপ ডিশে সাজিয়ে রাখুন এবং ওপর থেকে গরম গরম গ্রেভি ঢেলে পরিবেশন করুন। একটু কাশ্মিরী লঙ্কার গুঁড়ো বা খাওয়ার লাল রঙ দিলে গ্রেভিটা সুন্দর লাল রংয়ের হবে।

ক্রীম অফ টোম্যাটো সুপ :

উপকরণ : পাকা লাল বড় সাইজের টোম্যাটো ৬টি নুন আন্দাজ মত এরারুট ১ টেবিল চামচ, বাদাম তেল এক টেবিল চামচ দুধ এক কাপ। **প্রস্তুত প্রণালী :** ১। এরারুটে বাদাম তেল ও দুধ মিশিয়ে ভাল করে ফেঁটিয়ে রাখুন। ২। টোম্যাটো টুকরো টুকরো করে কেটে একটি এলুমিনিয়ামের বা স্টেনলেস স্টীলের পাত্রে উনুনে বসান। ৩। বেশ নরম হয়ে এলে পাতলা কাপড় দিয়ে রসটা ছেঁকে বার করে নিন। ৪। এরারুট গোলা উনুনে বসিয়ে সমানে নাড়তে থাকুন এবং গরম হয়ে গেলে ওতে টোম্যাটোর রস মেশান এবং ভাল করে ফুটলে নামিয়ে মচমচে করে সেঁকা পাঁউরুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

টোম্যাটোর কালেরি :

উপকরণ : ৪টি পাকা টোম্যাটো চাকা চাকা করে কেটে রাখতে হবে, বেসন নুন ২টি কাঁচা লঙ্কা কুচোনো অল্প কালো জিরে ভাজার জন্যে তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। বেসনে একটু তেলের ময়ান দিয়ে জলে গুলে নিন—খুব পাতলাও হবে না আবার খুব ঘনও হবে না। ২। এই মিশ্রণে নুন কাঁচা লঙ্কা কালো জিরে মিশিয়ে ভাল করে ফেঁটিয়ে নিন। ৩। টোম্যাটোর এক একটি টুকরো ওই গোলায় ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ভাজুন এবং চাটনি সহযোগে গরম গরম পরিবেশন করুন।

টোম্যাটোর জেলি :

উপকরণ : পাকা টোম্যাটো ১ কেজি চিনি লেবুর রস। **প্রস্তুত প্রণালী :** ১। টোম্যাটো টুকরো টুকরো কেটে চার কাপ জল দিয়ে অল্প আঁচে বসান। ২। টোম্যাটো ভালভাবে গলে গেলে সমস্ত রসটা পাতলা কাপড়ে ঢেলে নিয়ে একটি এলুমিনিয়ামের ডেকচির ওপর এক রাত টাঙিয়ে রাখবেন—সকালে রস তৈরী করলে সন্ধ্যা অবধি টাঙিয়ে রাখলেও চলবে। এমনভাবে কাপড়ের পুঁটলিটা টাঙাবেন যাতে সমস্ত রস পাত্রের মধ্যে পড়ে। যতটা রস নিজে থেকে বার হবে ততটাই জেলি প্রস্তুতের জন্যে লাগবে—পুঁটলি টিপে রস বার করবেন না। ৩। প্রতি দেড় কাপ রসে এক কাপ চিনি দিয়ে জ্বাল দিন। ৪। এর মধ্যে জ্বাল দিতে দিতেই রসটা একবার ছেঁকে নেবেন যাতে চিনির ময়লা বেরিয়ে যায়। ৫। প্রতি এক কাপ রসের জন্যে এক বড় চামচ করে লেবুর রস হিসেব করে নিন এবং লেবুর রসটা ছেঁকে নিয়ে টোম্যাটোর রসে মেশান ও জ্বাল দিতে থাকুন। ৬। একটি কাঁচের ডিশে ফোঁটা ফোঁটা রস ফেলে দেখুন ঠান্ডা হলে জমে যাচ্ছে কি না। যদি জমে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ নামিয়ে নেবেন। ৭। পরিষ্কার ও শুকনো চওড়া মুখের ভালো ঢাকনা দেওয়া শিশি বা বোতলে গরম জেলি ভরে ফেলুন। ঠান্ডা হয়ে গেলে শিশির ঢাকনা বন্ধ করবেন। ৮। একদিন পরে মোম গলিয়ে শিশির ভেতর ঢেলে দিন এবং মোম ঠান্ডা হয়ে জমে গেলে শিশির ঢাকনা বন্ধ করবেন।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত রোজ সকালে এক চক্কর বেড়িয়ে আসতে না পারলে হাঁফিয়ে ওঠেন। লাঠি ঠুকঠুক করে সেই পরিচিত ঝিলের ধারে এসে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একটু ঘাসের গন্ধ জলের গন্ধ শামুক পানার গন্ধ পাবার লোভে ছটফট করেন বঙ্কিমবাবু। কিন্তু ছেলে অমিয় কি বৌমা কি তার ছেলেমেয়েরা ঠিক উল্টো। তারা শহুরের উদ্দামতা অস্থিরতা পছন্দ করে।

অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তার কথার প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং অমিয়, তার স্ত্রী নীহার সবাই যেন কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। সংসারের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন যেন তিনি। তবু একসময় নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে অমিয় বা তার স্ত্রী নীহার নয়, তাদের বংশধরদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান বঙ্কিম দত্ত।

নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। কী হয় দাদু সারা জীবন জজিয়তি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

(দশ)

বাবা যেন কি! এক এক সময় বোঝা যায়, এত এক সময় বাবাকে একেবারেই বোঝা যায় না। কিম্ভূত মনে হয় তখন। টুটুল ভাবে। যখন বোঝা যায় তখন তার মনে হয়, বাবার চেয়ে সহজ সাদাসিধে মানুষ এই পৃথিবীতে কেউ নেই। তখন একেবারে টুটুলের হাতের মঠোয় চলে আসে তার বাবু।

আর মনে হয়, বাবু তার বয়সের একটি তেরো-চোদ্দ বছরের বাচ্চা ছাড়া আর কিছু নয়। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে গল্প করতে টুটুলের কী যে ভাল লাগে না তখন!

আবার একটা সময় এমন থমথমে ভারি দেখায় মানুষটাকে!

মাথায় বড় বড় চুল।

তিন দিন চার দিন চলে যায় দাড়ি কামায় না। জঙ্গল জঙ্গল চেহারা নিয়ে চাপ শোবার ঘরের মেঝেয় বা পুবের বারান্দায় নিজের মনে পায়চারি করে, আর যেন কেবল ভাবে।

বাবাকে তখন খুব খারাপ লাগে টুটুলের। ধারে কাছেও ঘেঁষে না।

আশ্চর্য, তখন বাবা ফুলগাছও দেখবে না, খাঁচার পাখির দিকেও মন দেবে না যা ছিপ নিয়ে কোথাও যে মাছটাছ ধরতে যাবে সে রকম কোনো ইচ্ছেও তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে না। যেন বাবার সব কটা ইচ্ছে একদম মরে যায়।

তারপর বাবা যে কি করবে, অবাক হয়ে ভাবতে হয়। মানে ঐ সময়টা। ভেবে ভেবে টুটুল কুলকিনারা পায় না।

অবশ্য তখন একটা ভয়, মাঝে মাঝে টুটুল যা দেখে, মা-র সঙ্গে বাবার বেশ খিটিমিটি বেধে যায়।

এমনিতে বাবার ওপর মা খানিকটা বিরক্ত। টুটুল বোঝে।

কত বিদ্বান মানুষ। অথচ টাকা-পয়সা রোজগারের দিকে বাবার মন নেই।

যে জন্য এই সংসারে মার জোরটা কম। দাদুই সব।

টাকা-পয়সা দাদুর হাতে। দাদুর পেন্সনের টাকা। আবার দিল্লী থেকে কাকু যা পাঠায় তা-ও দাদুর নামে আসে। দাদুর কাছেই থাকে।

বাজার-টাজার যা হবে সব দাদু বলে দেয়। কাপড়-চোপড় রেশন রোজকার মাছ তরকারী ও মুদী দোকানের জিনিস থেকে আরম্ভ করে সামান্য সুঁই-সুতোটাও দাদু অনুমতি দেবে তারপর কেনা হবে। অনুমতি মানে কি—দাদুর কাছে টাকা চাওয়া।

এখন পদে পদে এটা-ওটার জন্য দাদুর কাছে গিয়ে হাত পাতা—মার ভীষণ অপছন্দ। অন্তত এই জন্য দাদুর সামনে মা কখনও গিয়ে দাঁড়ায় না। দরকার হলে রতনকে পাঠায়, কিকে পাঠায়। বা তাদের দু ভাই-বোনকে যেতে হয়। রঞ্জুকে অবশ্য হাতের কাছে সব সময় পাওয়া যায় না। কাজেই টুটুল।

আর বাবা তো এ-সবের মধ্যে কোনদিনই নেই। পর পর দু হপ্তা যদি রেশনের মতন দরকারী জিনিসও ঘরে না আসে বাবা টুঁ শব্দটিও করবে না। যেন আসে খাব, না আসে উপোস থাকব এমন ভাব।

কিন্তু উপোস কি থাকে।

সময়মত ভাত চাই, জলখাবার চাই চা কফি। কফি না থাকে তো চা। দিনে আট-দশ বার চা চাই বাবার।

একটু আগে ঐ চা নিয়ে মা-র সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল।

দমদম মাছ ধরতে যাওয়া নিয়ে দাদুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবার পর মুখ ভার করে বাবা শোবার ঘরে কতক্ষণ একা একা পায়চারি করে। তারপর এক সময় রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে হাজির হয়। অর্থাৎ চা চাই।

মারও ঐ দমদমের ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ ছিল টুটুল পরে যা বুঝতে পেরেছে। বাবাকে দেখেও মা শব্দ করছিল না। মার মুখ ভার ছিল।

দাদুর সঙ্গে গল্প শেষ করে টুটুল ঠিক ঐ সময় রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—এই টুটুল, আমায় চা দিতে বলবি।

বাবার চোখ দেখে টুটুল ভয় পায়। থমথমে চেহারা। লাল চোখ এমনিতে। তখন যেন রক্তপলাশ চোখ দুটো। মা এদিকে পিছন ফিরে। আনাজ কোটা নিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত এমন একটা ভান করছিল কাজেই মার ওপর চটে গিয়ে টুটুলকে দেখে বাবা চায়ের জন্য গর্জন করে উঠল। মাও চুপ করে থাকেনি।

—এই টুটুল এখন চা হবে না বলে দাও। মা ঝিয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে গম্ভীর হয়ে উত্তর করল চিনি ফুরিয়ে গেছে। বিকেলে বেশন তোলা হবে তবে চিনি আসবে।

—খোলা বাজারে অঢেল চিনি পাওয়া যায়। মুদিখানায় বস্তা বস্তা চিনি সাজিয়ে রেখেছে। রতনকে পাঠিয়ে দিলে এখুনি দোকান থেকে চিনি নিয়ে আসতে পারে এক কেজি দু কেজি যত ইচ্ছে। দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে বাবা বলছিল।

—রতনকে অন্য কাজে পাঠান হয়েছে। মার গলার স্বরে আগের চেয়েও বেশি ঝাঁজ ফুটল তা ছাড়া ব্যাকে চিনি কেনার জন্য কে গিয়ে বুড়োর কাছে পয়সা চাইবে?

টুটুল যাবে। বাবা ধমক দিয়ে উঠেছিল।

—না টুটুল যাবে না। মা মুখ ফিরিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে বাবাকে দেখছিল। যেন বাবা এতটা আশা করেনি। একটু চা খাবে। কিন্তু এই ব্যাপারে টুটুলকেও সহযোগিতা করতে দিতে মা রাজী নয়। দাদুর কাছে গিয়ে ও যদি চিনির জন্য কটা পয়সা চাইত দাদু কি দিত না!

হয়তো দিত না। নিয়মের বাইরে একটা পয়সাও খরচ হবে দেখলে দাদু ভয়ানক চটাচটি করত। এই ভয়েই মা তাকে দাদুর কাছে পাঠাতে চাইছেন না। টুটুল বুঝল। কিন্তু তা হলেও বাবার চেহারা দেখে টুটুলের বুকের ভিতরটা কেমন ছটফট করে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে মাকে একটু অতিরিক্ত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল তার।

বাবা আর রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে না। টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে যায়। যেন রাগে ফেটে যাচ্ছে। মুখে কিছু বলছে না। তবে বারান্দা পার হবার সময় পাশেই দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করান মিট-সেফটার সামনে এক সেকেন্ড দাঁড়ায়। মিটসেফ-এর মাথায় ধোয়া কাপ-ডিসগুলি একটু আগে ঝি সাজিয়ে রেখেছে। বাবা তার মধ্যে থেকে বেছে ঠিক নিজের কাপটা তুলে নেয়। একটুখানি লতা ও ফুলের ছাপ দেওয়া সুন্দর জলপাই রঙের কাপটায় চা কফি খেতে বাবা ভালবাসে। কিন্তু হঠাৎ কি করল! কাপটা তুলে বাবা জোরে মেঝের দিকে ছুঁড়ে দিল। বেশ বড় একটা শব্দ হল। ভাঙ্গা কাপের টুকরো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। বিশ্রী শব্দটা শুনে খবরের কাগজটা হাতে নিয়েই দাদু দক্ষিণের বারান্দা থেকে ছুটে আসে। ঝি ও মা এক-সঙ্গে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেয়। বাবার পিছে পিছে যাচ্ছিল টুটুল। কাপের একটা ভাঙ্গা টুকরো তার পায়ের কাছে ছুটে আসে। আর একটু হলে তার পা কেটে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

কিন্তু কেউ কথা বলল না। জিনিসটা এক পলক দেখে সবাই বুঝে নিল। এক সেকেন্ডের মধ্যে ঝি ও মার মুখ আর রান্নাঘরের দরজার বাইরে দেখা গেল না। চটির চটাস চটাস আওয়াজ তুলে খবরের কাগজ হাতে দাদুও সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরের দিকে ফিরে যায়।

অন্ধকার প্রায় সরু প্যাসেজটার মাঝখানে কেবল বাবা দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা টুটুলকে দেখছিল।
টুটুল বাবাকে দেখছিল।
বাবার দু চোখ ছলছল করছে।

অর্থাৎ এতবড় একটা ঘটনা ঘটল। সবাই দেখল। কিন্তু কারো মুখ থেকে টুঁ আওয়াজটি বেরোল না এতে যেন বাবার অপমানটা বেশি লাগছিল। বাবার ঠোঁট কাঁপছিল। অভিমানে বাচ্চাদের ঠোঁট এমন করে কাঁপে। দেখে টুটুল হু-হু করে কেঁদে ফেলল। ওর কান্নার আওয়াজ ছিল না। দুদিকের গালের নরম মাংসে তুলতুলে দুটো ঢেউ উঠে ঠোঁট দুটো শুধু ফাঁক হয়ে থাকে আর সকালবেলার টলটলে শিশিরের মতন ফোঁটা ফোঁটা হয়ে জল পড়তে থাকে চোখ বেয়ে।

—তুই কাঁদছিস কেন। বাবা ছুটে এসে টুটুলের হাতটা মুঠোর মধ্যে টেনে নেয়। ছি, তোর কান্নার হয়েছে কি!

টুটুল কথা বলে না। হুসহুস করে কাঁদতে থাকে। হাত ছেড়ে দিয়ে ওর নেয়া-পাতি ডাবের মতন ছোট লম্বাটে মাথাটা বাবা বুকে চেপে ধরে। বাবার পেটের সঙ্গে লেপটে থাকতে ওর ভাল লাগে। চোখের জলটা এবার বন্ধ হয়। কান্নার ধমকটা ধিকিধিকি চলতে থাকে যদিও।

—না না তুমি কাঁদবে না মা তুমি তো কিছু করনি। বাবা তাকে বোঝায়। বাবার গায়ের গন্ধ শ্বাসভরে সে টানতে থাকে। গন্ধটা মিষ্টি লাগে। আর কারো শরীরে এমন মিষ্টি গন্ধ আছে কিনা সে জানে না। এবং তখুনি সে টের পায় তার মাথার চুলে চিবুক ডুবিয়ে দিয়ে বাবা নাক ঘষছে।—মা মামণি। ফিসফিসে গলায় আদর করে ডাকছে বাবা।

এই মুহূর্তে একটা কিছু বলতে হয়। এবং আর কোনো কথা খুঁজে পেল না সে। তাই বাবার মতন ফিসফিসে গলায় বলল এমন সুন্দর কাপটা ছিল তোমার। ওটা ভেঙ্গে গেল।

তুমি কাপটা ভেঙ্গেছ' তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

—যাক গে ভেঙ্গেছে আপদ গেছে। বা[illegible] তার ফুলোফুলো চুলে হাত বুলোয়। পরশু শ্যাম্পু করেছিল। তাই চুলটা এখনো ফুর ফুরে। অল্প হাওয়ায় নড়াচড়া করে। বাবা নিশ্বাস পড়ে তার চুল নড়ছে সে টের পায়। আমি আর কোনোদিন চা খাব না। বা[illegible] বলল এবং আরও ঘন করে শ্বাস ফেল[illegible] কাপটা ভেঙ্গে গিয়ে ভালই হয়েছে টুটু[illegible]

—ইস বাবাকে ছোট করে একটা ধা[illegible] দিয়ে সে সরিয়ে দেয়। কেন তুমি চা খা[illegible] না! জলপাই রঙের আরো দুটো কাপ কু[illegible] আলমারিতে আমি বার করে দেব। তো[illegible] চা না খাওয়ার হয়েছে কি। যেন 'ছে[illegible]লেকে শাসন করছে' ভুরু বেঁকিয়ে র[illegible] চোখে টুটুল বাবার মুখের দিকে তা[illegible] বিকেলে বেশন আসবে চিনি আসবে। [illegible] নিজের হাতে তোমাকে চা করে দেব।

—আচ্ছা তাই দেবে, তাই দিও তু[illegible] করে দিলে আমি খুব তখন আমি না' ক[illegible] পারব না। এতক্ষণ পর বাবার মুখে [illegible] ফুটল।

রেজিষ্টি বিবাহ অফিস
মোট ১৬ টাকায় রেজিস্ট্রি বিবাহ
এন কে ঘোষ জে পি
ম্যারেজ অফিসার
১১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলি-৯ ফোন : ৩৫ ৩০৪৮

বাবার মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আহ্লাদে বাবার কোমর জড়িয়ে ধরল সে। বাবাকে জয় করেছে। হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। এই উত্তেজনা অসামান্য। তাই চোখের কিনারে জল থাকা সত্ত্বেও টুটুলের সারা মুখে হাসি ভরে ওঠে।

—ওই দ্যাখো কে এসে দাঁড়িয়েছে তোমার পেছনে। টুটুন আঙুল দিয়ে দেখায়।

বাবা ঘাড় ফেরায়। বাবার লালচে চোখের মণি খুশীতে গোল হয়ে ওঠে। কাঁকুলিয়া রোডের গোপা। টুটুলের বন্ধু। লম্বা ছিম-ছাম শরীর। গলাটা সারসের মতন। ভীষণ ফরসা গায়ের রং। একটা লকেট ঝুলিয়ে এসেছে যে জন্য গলাটা আজ আরও বেশি লম্বা দেখাচ্ছে। সবুজে হলুদে ডোরা কাটা সাটিনের ফ্রক গায়ে। অন্যদিন স্কার্ট পরে আসে। না কি ফ্রকের জন্য ওকে অতটা চাঙ্গা দেখাচ্ছে টুটুন ভাবে। কদিনে চাঙ্গা হয়ে উঠে গোপা যেন সুন্দর হয়ে গেছে।

—ফ্লেমিঙ্গো। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবা গোপার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিন যা করে ও শরীরটা পিছনে গুটিয়ে নেয় গোপা। বাবার হাতে ধরা দিতে চায় না। শরীরটা গুটিয়ে নিয়ে ফিকফিক হাসে। আয়নার মতন ঝকঝকে মাড়ি। ছোট ছোট দাঁত ঝিনুকের সারি। গোপাকে দেখলেই বাবা ওই নামে ডাকবে। ফ্লেমিঙ্গো। শুনে গোপার চোখের পাতা একটুখানি বুজে আসে কিন্তু হাসি বন্ধ হয় না। —কদিন দেখিনি যে! বাবা শুধোয়।

—ফ্লু হয়েছিল। টলটলে চোখ তুলে বাবার দিকে তাকায় গোপা।

—আমারও কাল তাই হতে যাচ্ছিল রে গোপা। টুটুল প্রায় নেচে উঠল। স্কুলে যেতে পারিনি। নাক দিয়ে অনবরত জল আর হাঁচি যে জন্য স্কুলের পিকনিকটা মিস করলাম।

—আমাকে ক্যাপসুল খেতে হল। গোপা বলল। তবে না জ্বর ছাড়ল।

—আমি কিছুই খাইনি। না ট্যারলেট না ক্যাপসুল। দাদু বুড়ো খেতে দেয়নি। কেবল আদা ফুটিয়ে গরম জল খাইয়েছে। টুটুল হি-হি করে হাসে।

—আদা জল ভাল। গোপা বলল ক্যাপসুল খেয়ে আমার কেমন গা-বমি করছিল। বিচ্ছিরি!

—টুটুলের মোটেই ফ্লু হচ্ছিল না। স্রেফ সর্দি। পরশু খুব করে উনি মাথায় শ্যাম্পু মেখেছিলেন। ট্যারা চোখে বাবা টুটুলকে দেখে হাসে।

—ইস! টুটুলের ফুলোফুলো মাথার দিকে চোখ রেখে গোপা আফসোসে মরে যায়। দিন দিন ওর চুলটা এত সুন্দর হচ্ছে!

—এই, চোখ লাগাবি না! গোপার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে টুটুল চোখ পাকায়।

গোপা ফিক্ করে হাসে। বাবা হাসে। টুটুলও হাসে।

—এসো আমার ঘরে তোমার গান শুনব। বাবা গোপাকে ডাকে।

কোনটা। বাবার দিকে না তাকিয়ে গোপা টুটুলের দিকে চোখ ফেরায়। কোন গানটা গাইব রে টুটুল?

—ভজন। ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু। টুটুন বলার আগে বাবা বলে দেয়।

—ভীষণ ভালবাসে বাবা ওটা। টুটুল আস্তে বলে।

—ভীষণ ভাল গাইতে পারে যে ও ওটা। বাবা টুটুলের দিকে এক পলক তাকিয়ে পরে গোপাকে দেখে। তারপর হাসে।

তিনজন বাবার ঘরের দিকে এগোয়। বাবা আগে। ওরা দুজন পিছনে।

—গৌরী এসেছিল রে টুটুল? গোপা শুধায়। টুটুল উত্তর দেবার আগে টুটুলের বাবা মাথা নাড়ে।

—উঁহু, ফ্লেমিঙ্গোর মতন সাতসয়ালিও কদিন ধরে আসছে না।

বাবার কথা শুনে টুটুল ও গোপা শব্দ করে হাসে। তাদের আর একটি বন্ধু। একডালিয়া রোডের গৌরী। বাবা ওকে সাতসয়ালি বলে ডাকে। ওদের সব কটি বন্ধুর একটা করে পাখির নাম রেখেছে বাবা। ফার্ণ রোডের টুবলির নাম সোনালী ফেঝান্ট। বিজেন্ট পার্কের রুমীর নাম ফটিক-জল রিচি রোডের চামেলিকে ডাকা হয় চন্দনা আর লেক গার্ডেন্স থেকে আসে টুটুলের আর এক বন্ধু ঝুমঝুম বাবা নাম রেখেছে বসন্ত বউরি।

ওরা খুশী হয়। একটুও রাগ করে না। টুটুলের ভাল লাগে। বাবা ভীষণ পাখি ভালবাসে। তাই তোদের পাখির নাম। বন্ধুদের বোঝায় টুটুল। আর তার বন্ধুরা যখনই এ-বাড়ি বেড়াতে আসবে বাবার পাখির খাঁচার কাছে ভিড় করে দাঁড়াবে।

আজ গোপা হতাশ হয়েছে।

—মেসোমশায় আপনার খাঁচায় একটাও পাখি নেই।

—দুটো উড়ে গেছে দুটো মরে গেছে। বাবা এদিকে ঘাড় ফেরায়।

—কদিন বাবা ফুলগাছের দিকে বেশি ঝুঁকেছিল রে গোপা। টুটুল বন্ধুকে বোঝায়। এখন আবার মাছ ধরার কথা ভাবছে। নতুন পাখি আনা হচ্ছে না।

—উঁহু, মাছ ধরতে কোথাও আর আমি যাচ্ছি নে শিগগির। হাঁটতে হাঁটতে বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে টুটুলকে দেখল। টুটুল বুঝল বাবার অভিমান। একটু আগে দাদুর সঙ্গে ঐ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

—আমি আবার পাখির দিকে মন দেব। বুঝেছ ফ্লেমিঙ্গো। বাবা গোপার সঙ্গে কথা বলে। বাবা আর ঘাড় ফেরায় না।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

জাতক চিন্তাগ্রস্থ ?

বিবাহ, মামলা, পরীক্ষা, পদোন্নতি ব্যবসা, ইত্যাদি যে কারণেই হোক যদি
মেষ বা তুলা রাশি, লগ্নবাবু জন্ম হয় তবে রৌপ্যের আংটীতে কুঠারের ছবি আঁকাইয়া ধারণে মনোবাসনা সফল হইতে পারে।

আপনার জানতে হোলে জন্মবার, রাশি জানান, দক্ষিণা স্বতন্ত্র

তান্ত্রিক ধীরেন্দ্রনাথ

'দেবনাথ ভবন' পোঃ পানিহাটী, ২৪ পরগণা

ঘরের দিকে এগোতে থাকে। গোপা শোনে। গোপাকে উদ্দেশ করে বাবা বলল কাল গড়িয়াহাটের মোড়ে একটা নতুন পাখিওলা এসেছিল। দেখলাম ওর কাছে কিছু মুনিয়া ও টিয়ে রয়েছে সঙ্গে একটা কালীশ্যামা ও একটা কাজলগৌরী ছিল। আজ আবার দেখতে পেলে কাজলগৌরী ও কালীশ্যামা পাখি দুটোকে নিয়ে আসব।

—ইস, কী ভাল না হয় তা হলে! খুশী হয়ে গোপা হাততালি দিল। কাজলগৌরী পাখি, আমি কোনোদিন দেখিনি। তুই দেখেছিস টুটুল?

হাসি হাসি মুখ করে টুটুল মাথা নাড়ল। না সে দেখেনি। কিন্তু তার বুকের ভিতর দুরদুর করছিল। নতুন দুটো পাখি কিনতে বেশ কটা টাকা লাগবে। বাবা কোথায় টাকাটা পাবে সে বুঝতে পারছিল না। এই নিয়ে কি মার সঙ্গে আবার ঝগড়াঝাটি শুরু হবে। তার ভয় করছিল।

—তাই আনুন মেসোমশায় আজই পাখি দুটো কিনে আনুন। লম্বা গলাটা আর একটু উঁচু করে ধরে গোপা বলল খাঁচা দেখতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

বাবাকে উস্কে দিচ্ছে এই মেয়ে। টুটুল মনে মনে রাগ করল। কিন্তু এই মুহূর্তে মুখ ফুটে কিছু বলার জো নেই। পাখির নামে বাবা নতুন করে উছলে উঠবে জানা কথা। এখন দিন কতক পাখি ছাড়া বাবা আর কিছু ভাববেই না হয়তো।

—আমাদের সবাইকে একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যাবেন মেসোমশায় বলেছিলেন অনেক রকম পাখি এসে সেখানে বাসা বাঁধে। কোনটা কোন পাখি আমাদের চিনিয়ে দেবেন। মনে আছে? আদুরে গলায় গোপা বলল।

—মনে আছে বৈকি। বাবা ঘাড় নাড়ে। টুটুল অবাক হয়। হাঁটা থামিয়ে বাবা ঝপ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গোপার চোখে চোখ রেখে কথা বলছে। উৎসাহে বাবার মুখটা আকাশ প্রদীপের মতন দপদপ করে জ্বলছে। একটু আগে বাবার চেহারাটা কী ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল টুটুলের মনে পড়ল। এমন ছেলেমানুষ হয়ে যায় না বাবা এক এক সময়! কবে জানি টুটুলের বন্ধুদের একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে পাখি দেখাতে বেড়াতে নিয়ে যাবে বাবা বলেছিল। গোপা ঠিক মনে রেখেছে। আর মনে পড়িয়ে দিতে বাবা এখন নেচে উঠল। —এই তো দেখতে দেখতে ঠান্ডা পড়ে যাবে। এটা আশ্বিন মাস। হাত নেড়ে বাবা গোপাকে বোঝায় সেই কোথায় মঙ্গোল থেকে তিব্বত থেকে আরো কত দূর দূর ঠান্ডার জায়গা থেকে ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসবে কলকাতায়—কিছু ঠাঁই নেবে আলিপুর চিড়িয়াখানায় কিছু বোটানিকস-এ। নিশ্চয় নিয়ে যাব। দল বেঁধে সবাই একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাব আলিপুরে যাব। খুব আমোদ করে পাখি দেখা যাবে।

বেজায় খুশী গোপা। বড় বড় চোখ করে টুটুলকে দেখে। গলাটা আরও লম্বা উঁচু দেখায় মেয়ের তখন। যেন তাতে করে আরও বেশি ফ্লেমিঙ্গো ফ্লেমিঙ্গো মনে হয়। ফ্লেমিঙ্গো পাখির মতন সরু টানটান দুটো ঠ্যাং। ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে। তা না হলে হোক না বন্ধু মনে মনে টুটুল একদম গোপাকে সহ্য করতে পারে না।

তিনজন বাবার ঘরে ঢুকল। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গোপা গলা ছেড়ে গান আরম্ভ করল।

টুটুলের মুখের ভিতরটা তেতো তেতো লাগছিল।

আর তখন ভয়ংকর অস্বস্তি নিয়ে বঙ্কিমবাবু নিচে বারান্দায় পায়চারি করছেন। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছেন। রাস্তার দিকে তাঁর চোখ দুটো। লোকজন অফিস কাছারী করতে চলে গেছে অনেকক্ষণ। এই তল্লাটে চাকুরিজীবীর সংখ্যাই বেশি। আর বঙ্কিমবাবুর মতো যারা রিটায়ার করেছে তাঁরা তো আছেনই। তাঁরা কিন্তু এই সময় রাস্তায় বেরোন না। অনেক বেলা হয়েছে। রোদ তেতে উঠেছে।

কিছুক্ষণ আগেও প্রাইভেট গাড়ি ট্যাকসি ও রিকসার বেশ কিছু ছুটোছুটি ছিল এখন একটা গাড়িও চোখে পড়ে না। রিকসা না। রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা।

অম্বুজা-নিলয়ের ঠিক উল্টোদিকের ওধারের ফুটপাথটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থবটের ছায়া পড়েছে। রোজই পড়ে এই সময়। মাঝে মাঝে ঘূর্ণির মতন ছোট ছোট বাতাসের পাক উঠে রাস্তার শুকনো পাতা ও খড়কুটো এদিক-ওদিক উড়িয়ে—ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু নাতির দেখা নেই কেন। এতটা বেলা হল? ও কি সারাদিন সেলুনে বসে চুল কাটছে। বঙ্কিমবাবু নিজের মনে বিড়-বিড় করল। তাঁর কপালের চামড়া কুঁচকে থাকে।

—বৌমা! অস্বস্তি নিয়ে তিনি ওপরের দিকে তাকান। পুত্রবধূকে ডাকেন।

দোতলার রেলিঙ থেকে নীহার গলা বাড়িয়ে দেয়।

—তুমি কি আর একবার রতনকে পাঠাবে। ঘাড়টা বেঁকিয়ে রেখে বঙ্কিমবাবু শুধান।

—একবার ও ঘুরে এসেছে পাড়ার সেলুনে খোকনকে দেখতে পেল না। নীহার বলল।

—আবার পাঠাও আবার পাঠাও। হয়তো এদিকের সেলুন ফাঁকা না পেয়ে তোমার ছেলে মার্কেটের ওদিকের কোনো দোকানে চলে গেছে। রুষ্ট উত্তপ্ত গলার স্বর বঙ্কিমবাবুর। কি আশ্চর্য! নিজের মনে গজগজ করতে থাকেন তিনি। মার্কেটের সেলুনে চুল কাটতে গেলেও তো এত দেরি হবার কথা নয়। এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল। কি ব্যাপার আঁ!

নীহার রতনকে ডাকতে ভিতরে চলে গেল। রেলিঙের পাশে পুত্রবধূকে আর দেখা যায় না। ক্লান্ত হয়ে বঙ্কিমবাবু বেতের চেয়ারটায় বসে পড়েন। তাঁর ঠোঁট দুটো তখনও নড়ছিল। —আঁ তোমরা করবে ছেলেকে মানুষ! এই তোমাদের দায়িত্ববোধ। বাপ ঘরে বসে নিশ্চিন্ত মনে রবি ঠাকুরের গান শুনছে। রোগা ছিপছিপে মেয়েটা আরও দু-তিন দিন এসেছে। টুটুলের বন্ধু। যেন কাঁকুলিয়া রোড থেকে আসে। সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে যাতায়াত থাকবেই। কিন্তু তুমি সন্তানের জন্মদাতা এতটা বেলা হল তোমার ছেলে ঘরে ফিরছে না এটা কি তোমার গান শোনার সময়! একবার নিচে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে তোমার কি উচিত না ছেলের খোঁজ করা। না কি ভেবেছে এটাও আমার কর্তব্য। এই রোদের মধ্যে বুড়ো বয়সে রাস্তায় বেরিয়ে নাতিকে আমি এখন খুঁজতে যাব!

চাপা রাগ অভিমান ও আক্রোশের উত্তেজনা নিয়ে বঙ্কিমবাবু কাঠ হয়ে চুপ করে বসে থাকেন। চোয়াল দুটো ক্রমশ কঠিন হতে থাকে। ঠোঁটের নড়চড়া থেমে যায়।

(ক্রমশঃ)

রাগাধুপ
প্রস্তুত কারক—কাকার প্রডাক্টস

ঘড়ি
জড়োয়া গহনা
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪, কলেজস্ট্রীট মার্কেট ২য় তল
কলিকাতা-১

বিজ্ঞানের কথা

বিশ্বের খাদ্য সংকট

'পৃথক পৃথক দেশে আরো তীব্র ঘাটতির নজির ইতিহাসে আছে, কিন্তু এমন সংকট-জনক খাদ্য-পরিস্থিতি সারা বিশ্বে এমন ব্যাপক আকার আর কখনো ধারণ করেছে কিনা সন্দেহ।'

কথাগুলো বলা হয়েছে রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ এ ও) মূল প্রতিবেদনে। এমন খোলাখুলি ও সরাসরি স্বীকৃতি জাতি-সঙ্ঘের এই তৎপর সংস্থাটির পক্ষ থেকেও আগে কখনো পাওয়া যায়নি।

মাত্র কিছুকাল আগেও বিশ্বব্যাপী খাদ্য-সংকটের কথা বলা হলে এই সংস্থার ঝুলি থেকে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ পরিসংখ্যান বেরিয়ে আসত। শোনা যেত সার, কীট-নাশক ওষুধ ও উচ্চফলনশীল ধান ইত্যাদি সম্পর্কিত নানা কথা। কিন্তু এখন আর শোনা যায় না। সবুজ-বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, একথা এখন বিনা প্রতিবাদেই মেনে নেওয়া হয়। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকের উজ্জ্বল আশাবাদ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত, এখন শুধু শোনা যাচ্ছে সংকট ও বিপর্যয়ের কথা। আর এই

প্রেক্ষাপটেই নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রোমে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন।

কেন এই বিপর্যয়, এই সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি? গলদটা কোথায়? ১৯৭২ সালে ছ'টি উপমহাদেশে একসঙ্গে আব-হাওয়া বিরূপ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সাহেল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফলন ছিল নিম্নমুখী। দুই দশকেরও বেশি সময়কালের মধ্যে বিশ্বে দানা-শস্যের উৎপাদনে প্রচলিত হারে বছরে ২৫ মেগাটন বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক, বরং ৩৩ মেগাটনের ঘাটতি দেখা দিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৭২ সালের আগেও ফলন ভালো ছিল না, কিন্তু সজনা কেমারে রশি টন করা ছাড়া আর কিছু করা হয়নি। কিন্তু ১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল পরিমাণ গম আমদানী করল। আর এমনই অশুভ যোগাযোগ, কানাডা ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র ঠিক এই সময়েই তাদের বাড়তি গমের পরিমাণে বড়োরকমের একটা ছাঁটাই ঘটাবার কাজে হাত দিয়ে বসল।'

অতএব অবধারিতভাবেই দেখা দিল বিশ্বের মজুদ খাদ্যে মন্দা। গত তিন বছরের মধ্যে বিশ্বের মজুদ গমের পরিমাণ কমেছে ৪৯ থেকে ২১ মেগাটনে।

আর বার্লি জোয়ার ভুট্টা ইত্যাদি মোটা দানাশস্যের বেলায় কমেছে ৫৬ থেকে ৩২ মেগাটনে। চালের মজুদ কমেছে অর্ধেকেরও বেশি—৯-১ থেকে আশঙ্কাজনক ৩-৭ মেগা-টনে।

খারাপ ফলন ও শূন্য শস্যাগার—১৯৭২ সালের এই দুর্ভাগ্যজনক যোগাযোগের ফল অবধারিতভাবেই মূল্যবৃদ্ধি। কিন্তু এই ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালেই উন্নত দেশগুলিতে অন্যদিকে চলছিল একটা অর্থনৈতিক বাড়বৃদ্ধির অবস্থা। মুদ্রাস্ফীতি চরমে উঠছিল। পণ্যের বাজারে ফাটকাবাজীর উদ্দেশ্য নিয়ে দরকষাকষিহীন কেনা বেচা চল-ছিল। দানাশস্যের ঘাটতির ব্যাপারটা তার ফলে আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং দানাশস্যের দাম হয়ে ওঠে আকাশছোঁয়া।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, থাইল্যান্ডের যে সাদা চালের দাম ১৯৭২ সালের জানু-য়ারিতে ছিল মার্কিণী মুদ্রায় প্রতি টন ১৩১ ডলার, ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে হয়েছে ৬৩০ ডলার। অর্থাৎ, প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি। একই সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে রপ্তানীকৃত জোয়ারের দাম বেড়েছে প্রায় দেড়গুণ, গমের দাম প্রায় দুগুণ।

ফল যা হবার তাই হল, যদিও বছরের পর বছর সবুজ বিপ্লবের প্রবক্তাদের মুখে কখনো শোনা যায়নি যে এমনটি হতে পারে। দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। আজকের দিনে দুর্ভিক্ষ চলছে খরাপীড়িত ইথিওপিয়ায়, বন্যাপীড়িত

বাংলাদেশে, পশ্চিম আফ্রিকার সাহেল-এ। দুর্দশাপীড়িত ভারতে। বছরের পর বছর খাদ্যশস্যের মজুদ নিম্নতম মাত্রায় থেকেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খাদ্য-সাহায্যের প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশি ঠিক তখনই তা কমানো হয়েছে (১৯৭০ সালে ১৪ মেগাটন থেকে ১৯৭৩ সালে ৭ মেগাটনে), গমের দাম বেড়েছে প্রায় তিনগুণ আর চালের দাম প্রায় পাঁচগুণ—ফলে দরিদ্র দেশগুলির এখন আর খাদ্য আমদানী করার সংস্থান নেই বললেই চলে।

যে নগরে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই রোমে প্রাচীনকালে নগর-তোরণের কাছে অধিষ্ঠিত থাকতেন দুই মাথাওলা এক দেবতা—জেনাস (শান্তির সময়ে এই দেবতার মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হত)। এই জেনাসের মতোই বিশ্বের খাদ্য-সংকট হচ্ছে দুই মাথাওলা এক বিভীষিকা। একটি মাথা দুর্ভিক্ষ, অপরটি স্থায়ী অপুষ্টি। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেব অনুসারে, ১৯৭০ সালে ৯৭টি উন্নতিশীল দেশের মধ্যে ৬১টি দেশ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম খাদ্য উৎপাদন বা আমদানী করেছিল। সংস্থার হিসেবে আরো প্রকাশ, খুব কম করে ধরলেও বিশ্বের ৪৬ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। একটু ছেড়ে দিয়ে হিসেব করলে এই সংখ্যাটি দাঁড়ায় অন্ততপক্ষে ১০০ কোটি (বিশ্বের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪০০ কোটি)।

*

আমরা যারা এই লেখা লিখছি বা এই লেখা পড়ছি—সম্ভবত আমাদের কারোই ক্ষুধার অভিজ্ঞতা নেই। বড়ো জোর, আচমকা কোথাও আটকে গেলে বা কোনো বে-জায়গায় গিয়ে পড়লে, একবেলা কি একদিন হয়তো না খেয়ে থাকতে হয়। আর তখনই টের পাই পেটের ভেতরে কী যেন মোচড় দিয়ে উঠছে, কেমন যেন একটা চিনচিনে যন্ত্রণা। একবেলা বা একদিন না খেয়ে থাকাটাই তখন কষ্টকর মনে হয়। এবার যদি কল্পনা করা যায় যে এই কষ্ট দিনের পর দিন সমানে ভোগ করে যেতে হচ্ছে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস—তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়?

আর স্থায়ী অপুষ্টিও কিছু কম নয়। স্থায়ী অপুষ্টি মানে ক্ষুধা নিয়ে থাকা—বছরের পর বছর, বছরের পর বছর। এত দীর্ঘকাল ক্ষুধা নিয়ে থাকা যে পেটের যন্ত্রণা হওয়াটাই হয়ে ওঠে স্বাভাবিক অবস্থা। কদাচিৎ কখনো যদি ভরাপেট খাবার জুটে যায় তো সেই স্মৃতি বাচ্চাছেলের সার্কাসের যাওয়ার স্মৃতির মতো জ্বলজ্বল করে।

স্থায়ী অপুষ্টি মানে এ-ভিটামিনের ঘাটতির দরুন অন্ধ হয়ে যাওয়া। লৌহের ঘাটতির দরুন রক্তাল্পতার ভোগা বেরিবেরি রিকেট ও আরো অজস্র ব্যাধির সহজ শিকার হওয়া।

স্থায়ী অপুষ্টি মানে সন্তানদের বাড় বৃদ্ধি না হওয়া—শুধু শরীরের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকেও। সন্তানদের জড় বুদ্ধি হওয়া।

স্থায়ী অপুষ্টি মানে শরীরের প্রতিরোধ-ক্ষমতা না থাকা—তখন ম্যালেরিয়া বা কলেরা বা এমনকি সর্দিকাশিতেও প্রাণ হারানো।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেব অনুসারে বিশ্বের ৪৬ কোটি মানুষ রয়েছে এই স্থায়ী অপুষ্টির অবস্থার মধ্যে।

*

তাহলে এই হচ্ছে খাদ্য-সঙ্কটের চেহারা—দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে ভারত ও সাহেল বিশ্বের শস্যভান্ডার প্রায় শূন্য, বিশ্বের তাবৎ অধিবাসীর মধ্যে প্রতি আটজনের একজন অপুষ্টির শিকার। কিন্তু বিশ্বের এই খাদ্য-সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না। তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে অনেকগুলো অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত সংকট—যেমন, জনসংখ্যার সংকট, তেল সংকট, মূল্য পরিশোধের সংকট, ঋণ সংকট শক্তি সঙ্কট, এবং তদুপরি নিউক্লিয়র যুদ্ধের আশঙ্কা।

জনসংখ্যার সঙ্কটের কথাই ধরা যাক। ১৮৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ১০০ কোটি, ১৯২০ সালে ২০০ কোটি, ১৯৬০ সালে ৩০০ কোটি, ১৯৭৫ সালে হবার কথা ৪০০ কোটি। ষাটের দশকে ভাবা গিয়েছিল সবুজ বিপ্লবের ফলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধিটা আর কোনো সমস্যা থাকছে না—মানুষের সংখ্যা বাড়ুক, ফলন তার চেয়েও আরো একটু বেশি। তারপরেই ছবিটি উল্টে গিয়েছে—মানুষের সংখ্যা যতো বাড়ছে ফলন তার চেয়েও কম। ১৯৬৯ সাল থেকেই মাথাপিছু লভ্য খাদ্যের পরিমাণে ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

জন্মের হার এই হারে যদি চলতে থাকে তাহলে প্রতি বছর আরো সাড়ে-সাত কোটি মানুষের জন্য খাদ্যসংস্থান থাকা দরকার।

শহরের মানুষকে খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় গ্রামের মানুষের ওপরে। শহরে মানুষের সংখ্যা যতো বাড়ে, নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও ততো বাড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৪ শতাংশ মানুষ বাস করে শহরে, এমনকি ভারতেও ২০ শতাংশ।

তদুপরি আছে পরিবেশ নোংরা হওয়ার সঙ্কট। বাতাসে আবর্জনা, নদীর জলে ময়লা সমুদ্রের জলে তেল।

আছে যুদ্ধাস্ত্র শিল্প বজায় থাকার সংকট। ধনী দেশ এখনো যুদ্ধাস্ত্র শিল্পে প্রতি বছর ১৬০ শত কোটি ডলার খরচ করে চলেছে সে-জায়গায় কৃষিতে খরচ করছে মাত্র ১৫০ কোটি।

*

সঙ্কট আরো আছে—শক্তির, সারের সম্পদের।

তেলের দাম অসম্ভব চড়া তার ফলে শক্তির সংকট। যেসব ভুখা দেশে নিজস্ব তেল নেই তারা মার খাচ্ছে তিনভাবে—(১) তেল কিনতে গিয়েই বিদেশী মুদ্রা খরচ হয়ে যাচ্ছে, (২) বিদেশী মুদ্রার অভাবে সার ট্রাক্টর ইত্যাদি কেনা সম্ভব হচ্ছে না (৩) সবুজ বিপ্লবে যে কৃষি-ব্যবস্থা চালু থাকা দরকার তার জন্য চাই প্রচুর শক্তির যোগান—তেলের দাম চড়ে যাবার ফলে তা বন্ধ।

অধিক ফলনের জন্য চাই উত্তরোত্তর অধিক মাত্রার সার। জৈব সারের ব্যবহার ক্রমশ কমছে, সে-জায়গায় চাহিদা বাড়ছে কৃত্রিম সারের। যেমন ফসফেট সারের কথা উল্লেখ করা চলে। প্রকৃতি-জগতে এই সারটির যোগান অতি সামান্য—একমাত্র উত্তর আফ্রিকার সীমাবদ্ধ এলাকায়। অন্যদিকে নাইট্রোজেন-ঘটিত সার উৎপাদন করতে হলে চাই প্রচুর শক্তি ও উচ্চমাত্রার প্রাযুক্তিক প্রক্রিয়া। ফলে এখনকার এই শক্তি-সংকটের কালে নাইট্রোজেনঘটিত সার উৎপাদন করাটা উন্নত দেশগুলির একচেটিয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর সম্পদের সঙ্কট তো আছেই, যেমন তেলের ব্যাপারে ও ফসফেট সারের ব্যাপারে। অন্যদিকে অসম বণ্টনের দরুনও। আমেরিকার একজন নাগরিক ধাতু ব্যবহার করে ভারতের একজন কৃষকের চেয়ে ৫০০ গুণ বেশি। এ-অধিকার সে কেন পাচ্ছে?

*

আরো একটি বড়ো সংকট—জলের সংকট। স্বাভাবিকভাবেই জলসেচ হয় আমাদের এই গ্রহের এমন সমস্ত জমি ইতিমধ্যেই আবাদী হয়ে গিয়েছে। কাজেই চাষের জমি যদি বাড়াতে হয় তাহলে জলসেচ-ব্যবস্থার ব্যাপক আয়োজন করা দরকার। ১৯৭০ সালে বিশ্বে চাষের জমি ছিল ৭৪ কোটি হেক্টর (২-৪৭ একরে এক হেক্টর) খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৮৫ সালে হবার কথা ৯০ কোটি হেক্টর। এজন্য জলসেচের ব্যবস্থাও বর্তমানের চেয়েও তিনগুণ বাড়ানো দরকার। উচ্চ ফলনের জন্য অবশ্যই চাই উচ্চ পরিমাণ জল ও সার।

এই বাড়তি জল সংগ্রহ করা উচিত বৃষ্টিপাত থেকে। কিন্তু বর্তমানে যা হচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করা হচ্ছে মাটির তলা থেকে। ভবিষ্যতেও তাই হবে। এতে সংকটকে আরো নানাদিক থেকে বাড়িয়েই তোলা হয়।

*

সবশেষে জমির সংকট। বর্তমানে ভুখা মানুষের চাপে এলোপাথাড়ি জমি চাষ করা হচ্ছে—পাহাড়ের কিনার, অরণ্য, কোনো কিছুই বাদ থাকছে না। তার অবধারিত ফল—প্রচুর ক্ষয়, জমির পুষ্টিনাশ এবং অনেক ক্ষেত্রে খরাও।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ঘোষিত লক্ষ্য—১৯৮৫ সালের মধ্যে চাষের জমি ২০ শতাংশ বাড়িয়ে তোলা। এতগুলো সংকটের মধ্যে তা সম্ভব হবে কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

(বিশ্বের খাদ্য-সংকটের ভয়াবহতার কথা বিচার করে লন্ডনের বিখ্যাত 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার ৭ই নভেম্বর সংখ্যাটিতে এ-বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই লেখার সমস্ত তথ্য এই বিশেষ সংখ্যা থেকে নেওয়া।)

—অয়স্কান্ত

অদৃশ্য জট

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

এত লোকের বৌ মরে রমেনের বৌ মরতে পারে না? কথায় বলে ভাগ্যবানের বৌ মরে। কিন্তু তার কি আর সেই ভাগ্য হবে? ট্যাকসিতে বসে বসে রমেন সেই কথাই ভাবছিল। সকাল থেকেই মেজাজটা খিঁচড়ে ছিল রমেনের। পরশু রাত্তির থেকে আরতির সেই যে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু হয়েছে তাতে বাড়ীতে থাকাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পরশু সকালে নাকি সমীর এসে বলে গেছে যে সে রমেনদাকে তৃপ্তির সঙ্গে সিনেমা-হলে ঢুকতে দেখেছে। ব্যাস! আর যায় কোথায়! রমেন রাত্তিরে বাড়ী ফিরতেই আরতি তাকে চেপে ধরেছে।

—তুমি নাকি তৃপ্তিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছ?

—কে বলল? রমেন প্রশ্নটায় হকচকিয়ে গেলেও সে মুখে কষ্ট করে হাসি টেনে বলেছে।

—সমীর যে বলে গেল।

—আরে সমীরকে জানো না। ও একটা ডাহা মিথ্যেবাদী।

—ও যে মিথ্যেবাদী একথা তো তুমি আগে কোন দিন বলনি।

রমেন গায়ের পাঞ্জাবী ছাড়তে ছাড়তে বলেছে, এ আর বলার কী আছে। বলার সুযোগ হয়নি তাই বলিনি। না হলে সবাই জানে ও একটা মিথ্যেবাদী।

আরতি আর নিজের রাগ গোপন রাখতে পারে নি। রমেন যে মিথ্যে কথা বলছে তা ওর ফ্যাকাশে মুখ দেখেই সে বুঝতে পেরেছে।

—সবাই মিথ্যেবাদী। আর তুমি ধর্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির!

রমেন এতদিন এই কৌশলটা শিখে ফেলেছে যে মিথ্যে কথা বলতে হলে বেশ দাপটের সঙ্গে বলতে হয়। মিনমিনে ভাবে বললেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা। আর যদি কখনো ধরা পড়ার মত অবস্থা হয় তাহলে দাপটের সঙ্গেই তা অস্বীকার করতে হয়। সে একটু চেঁচিয়েই বলল, মুখ সামলে কথা বল।

—কেন মুখ সামলে কথা বলব কেন? আমি কি তোমার স্বভাব জানি না?

—কী জানো তুমি? রমেন আরতির দিকে এগিয়ে গেল।

—মারবে নাকি? তুমি তাও পার। আরতি ভয়ে পিছিয়ে গেল।

—কী জানো তুমি আমার স্বভাবের?

—তোমার কাছে অত ঘন ঘন মেয়েরা কেন আসে তাকি আমি বুঝি না ভেবেছ?

—তারা আমার কাছে গান শিখতে আসে।

—হ্যাঁ গান যে কত শেখে তা আমার জানা আছে। তারা আসে তোমার মাথা খেতে।

—ভদ্রঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে মুখ সামলে কথা বল।

—ভদ্রঘরের মেয়ে! সব জানা আছে। ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েগুলো পর-পুরুষের সঙ্গে ঘোরে। সিনেমা দেখে; থিয়েটার দেখে। ভদ্রঘরের মেয়েরা এসব করে?

—তারা তোমার মত গাঁইয়া না। সবাই ভদ্র শিক্ষিত—

—তাহলে তাদের একজনকে বিয়ে করলেই পারতে। আমার মত একটা অশিক্ষিত গাঁইয়া মেয়েকে বিয়ে করার কী দরকার ছিল?

রমেন আর আরতিকে ঘাঁটাতে সাহস তাই করতাম। কিন্তু তা তো আর বলা চলে না। সুতরাং সে অন্য প্রসঙ্গ তুলল, এত রাতে চেঁচামেচি না করলে চলছে না? পাড়ার লোকে শুনলে কি বলবে? তাছাড়া ও-ঘরে ছেলেরা রয়েছে তারাই বা কী ভাববে?

—পাড়ার লোকে কিছু জানে না ভেবেছ? তাদের চোখ নেই? তারা সব জানে।

—কী জানে তারা?

—তোমার কীর্তি-কলাপ।

রমনে আর আরতিকে ঘাঁটাতে সাহস পায় নি। কী বলতে কী বলে ফেলবে কে জানে? সে রণে ভঙ্গ দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। বাথ রুমের দিকে যেতে যেতে সে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, দুত্তোর সংসারের নিকুচি করেছে। সারাদিন খেটে-খুটে এসে কোথায় বাড়ীতে দু দণ্ড বিশ্রাম

করব। তা নয়। ঘ্যানর ঘ্যানর সুরু হয়ে গেল।

তারপর বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে সে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আরতি এতই রেগেছিল যে সে তাকে খেতেও ডাকে নি, নিজেও খায় নি। সে মেঝেতে আঁচল পেতে শুয়ে থেকেছে। খাটে শোয় নি।

কিন্তু আরতি সেই যে পরশু থেকে অন্নজল ত্যাগ করেছে সেইটেই রমেনের পক্ষে একটু অস্বস্তিকর। আরতি রান্না করে ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়েছে, রমেনের জন্যও রেঁধেছে। কিন্তু সে নিজে না খেলে রমেন অন্তত প্রকাশ্যে খায় কী করে? সুতরাং বাধ্য হয়ে তাকে এমন ভান করতে হয়েছে যেহেতু আরতি দু দিন না খেয়ে আছে তাই সেও খায় নি। আসলে সে দু বেলাই বাইরে থেকে ভালো করে সাঁটিয়ে এসেছে। কী করবে? না খেয়ে সে থাকতে পারে না। বৌর জন্য সে উপোস করতে পারবে না। তার শরীর খারাপ হলে কে দেখবে? তাকে সারা দিন অফিসে চাকরি করতে হয়, তারপর গানের টিউশনি করতে হয়। সুতরাং তার কি না খেয়ে থাকলে চলে? কিন্তু বাড়ীতে তো আর তা প্রকাশ করা চলে না। সুতরাং বাড়ীতে সে সর্বদা গম্ভীর। ছেলে দুটো বড় হয়েছে। একজন ক্লাস টেনে পড়ে আর একজন নাইনে। তারা বাবা-মার এই ঝগড়ায় এতই অভ্যস্ত যে তারা এটাকে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হিসেবে ধরে নিয়েছে। সুতরাং তারাও চান করে ভাত খেয়ে যথারীতি স্কুলে চলে গেছে। আরতি ছেলেদের খাইয়ে-দাইয়ে রমেনের জন্য ভাত বেড়ে রেখে রান্নাঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়েছে। তারপর ঘরে গিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থেকেছে। রমেন কাল আরতিকে বলেছিল, এ রকম করলে তোমার শরীর তো আরও খারাপ হবে। ডাক্তার তোমাকে উপোস করতে একদম বারণ করেছে না। কিন্তু আরতি তার কথায় কান দেয় নি। রমেনও যে আরতি উপোস করায় খুব চিন্তিত তা নয়। নেহাৎ বলতে হয় তাই বলা। তাছাড়া আরতির পেটে আছে মারাত্মক আলসার। যদি এই উপোস করায় তা আরও বেড়ে যায় তাহলে রমেনই বিপদে পড়বে। তাহলে কে রমেনকে অফিসের ভাত রেঁধে দেবে? কেই-বা ছেলেদের স্কুলের ভাত দেবে? আরতি শয্যাশায়ী হলে তখন আবার রমেনকে রাঁধুনী রাখতে হবে। সে আবার এক খরচের ব্যাপার। তাছাড়া রাঁধুনী যোগাড় করাও কঠিন। তার উপর ডাক্তার পথ্যের খরচ তো আছেই। তাই রমেন আরতিকে তার রোগটার কথা ভেবে উপোস করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু আরতিকে পরশু রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত জলস্পর্শ করানো যায় নি। এবং আরতি যে উপোস করে আছে তাতে এতটুকু সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই।

জীবনের উপর ঘেন্না ধরে গেছে রমেনের। এখন তা মনে হয় আরতিকে বিয়ে করাটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে। কিন্তু যে অবস্থায় সে আরতিকে বিয়ে করে তখন এ ছাড়া তার আর অন্য পথ ছিল না। একদিন আরতির বাবা-মা তাদের বাড়ীতে রমেনকে আশ্রয় না দিলে আজকের রমেন কোথায় ভেসে যেত। ছোটবেলা থেকে রমেনের লেখাপড়ার দিকে মন ছিল না। তার ঝোঁক ছিল গানের দিকে। তার ব্যবসায়ী বাবার হাতে সে জন্য তাকে বহু কয়েক মার খেতে হয়েছে। ক্লাস টেনে বার দুয়েক ফেল করার পর একদিন তার বাবা বলেছিল কাল থেকে তুই আমার দোকানে বসবি। লেখাপড়া তোর কোনদিন হবে না। আমি ইস্কুল থেকে তোর নাম কাটিয়ে দেব। লেখাপড়ার প্রতি রমেনের যে খুব আগ্রহ ছিল তা নয়। তবে বাবার কাপড়ের দোকানে বসতে হবে শুনে তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তার এত সাধের গান শেখার কী হবে? সে বাড়ী ছেড়ে পালাল। তার ছ বছর বয়সে মা মারা যাওয়ায় বাড়ীর প্রতি এমনিই তার খুব আকর্ষণ ছিল না। সারা দিন বাইরে বাইরেই কাটাত। তার উপর বাবা যখন তাকে কাপড়ের দোকানে আটকে ফেলার ব্যবস্থা করছিল তখন সে পালানো ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পায় নি। সে বাড়ী থেকে পালিয়ে তিন-চারখানা গ্রামের পরে তার মায়ের এক সইয়ের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই সইয়েরই মেয়ে আরতি। আরতির বয়স তখন কত আর হবে? চোদ্দ কি পনেরো। সেই বয়সেই আরতি রমেনের গান শুনে তার প্রেমে পড়ে গেল। সেদিন আরতি বাড়ীর সকলের অমতে চালচুলোহীন রমেনকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। তিন বছর মায়ের সইয়ের বাড়ীতে থাকবার পর একদিন আরতি ও রমেন সকলের অজান্তে গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে পা বাড়িয়েছে। সেদিন আরতি রমেনের সঙ্গে প্রায় এক বস্ত্রেই বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে। তারপর একটানা দশ-বার বছর রমেনকে সংসারের জন্য কি না করতে হয়েছে। ওষুধ কোম্পানীর ক্যানভাসারের চাকরি, ইনসিওরেন্সের দালালী লটারীর টিকিট বিক্রি সবই করেছে। অবশেষে আট-দশ বছর হল আরতির এক পিসতুতো দাদার দয়ায় একটা বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকরী পেয়েছে। চাকরীটা ভালোই। মাইনে-পত্তরও ভালো দেয়। রমেনের কয়েকটা প্রমোশনও হয়েছে। এত দিনে সংসারে সে স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পেয়েছে। কিন্তু স্বচ্ছলতা যদি বা এল সুখ রমেনের ভাগ্যে জোটে নি। ছেলে দুটি লেখাপড়ায় খুব ভালো হয় নি। আরতি প্রায়ই অনুযোগ করে, তুমি ছেলেদের দিকে নজর দিচ্ছ না। কিন্তু সে কী করবে? রমেন তাদের জন্য প্রাইভেট টিউটর রেখে দিয়েছে। কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। ছেলেরা বাপ-মায়ের খুব একটা বাধ্য হয় নি। আগে মন্টু-নান্টু আরতির কথা শুনত। এখন যত বড় হচ্ছে তত বেআদব হচ্ছে। রমেনের পক্ষে ছেলেদের দিকে নজর দেবার সময় নেই। সে সকাল নটার মধ্যে অফিসে বেরিয়ে যায়। তারপর অফিস ছুটির পর গানের টিউশনি করে বেড়ায় মাঝে মাঝে ফাংশন-টাংশনেও যায়। সুতরাং প্রায়ই তার ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। সে যখন বাড়ী ফেরে তখন ছেলেরা ঘুমোয়। ছুটি-ছাটার দিনেও যে সে ছেলেদের দিকে একটু নজর দেবে তার সময় পায় না। তার গুণগ্রাহীরা সকাল থেকেই বৈঠকখানায় ভিড় জমায়। অবশ্য তার যে খুব ইচ্ছে করে তাও নয়। সে বুঝে গেছে যে ছেলেরা তাকে রোজগার করে খাওয়াবে সে আশা খুবই কম। তাছাড়া ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য করারও তার কোন ক্ষমতা নেই। একদিন ছেলেদের নিয়ে পড়াতে বসলে তার বিদ্যে ছেলেদের সামনে জাহির হয়ে যাবে। তাই সে ছেলেদের জন্য মাষ্টার রেখে দিয়েই খালাস।

আরতির ক্রমাগত অসুস্থতাও রমেনের মানসিক শান্তি অনেকখানি কেড়ে নিয়েছে। আরতির তো একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে। আজ পেটে আলসার, কাল নানাবিধ জটিল স্ত্রী-রোগ। রোগে ভুগে ভুগে আরতির চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে। ফলে মধ্য তিরিশেই আরতির শরীর থেকে সমস্ত লাবণ্য ঝরে গেছে। রোগে ভুগে ভুগে আরতির মেজাজটাও সর্বদা তিরিক্ষে হয়ে থাকে। এক সময় আরতি রমেনের গানের বড় ভক্ত ছিল। এখন গান তার দু চোখের বিষ। আরতির আর একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। সে ক্রমে ক্রমে সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠছে। রমেনের যে অভাব তা তার মেটাবার সাধ্য নেই। রমেন তা নিশ্চয়ই অন্য কোনভাবে মেটাবার ব্যবস্থা করেছে এ ধারণা তার বদ্ধমূল হয়েছে। তাই রমেনের কাছে কোন মেয়ে এলেই সে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। ভালো করে কথা পর্যন্ত বলে না। তৃপ্তি সম্বন্ধে অনেক দিন ধরেই আরতির মনে সন্দেহ জেগেছিল। সমীর সেই সন্দেহটাই উসকে দিয়ে গেছে।

ট্যাকসিতে বসে বসে রমেন ভাবছিল এর পর যেদিন সমীরের সঙ্গে তার দেখা হবে সেদিন সে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবে। রমেন তাকে বলে দেবে যে সে যেন তার ব্যক্তিগত বিষয়ে কখনও মাথা গলাতে না আসে। এমনিতে ছেলেটা ভালোই। গানটান শেখার একটু বাতিক আছে। সেই সূত্রেই রমেনের বাড়ীতে আসা তারপর নিয়মিত আসতে আসতে সে আরতি মন্টু-নান্টুদের খুব পরিচিত হয়ে গেছে। সংসারের যে কাজগুলো আরতি রমেনকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে না সমীরকে দিয়ে সে সেগুলো করিয়ে নেয়। তাদের পরিবারের একজন প্রকৃত হিতৈষী সমীর। সুতরাং রমেন তার উপর খুব রাগ করতে পারে না। কিন্তু সে যদি বোকার মত আরতিকে তার সম্বন্ধে সব কথা বলে দিয়ে তার পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে তাহলে রমেন কিছুতেই ত

বরদাস্ত করবে না। তাই সে সমীরকে বলবে তুমি আমার বাড়ীতে যেমন আসছো এসো। কিন্তু আমার প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে কোন আলোচনা তুমি তোমার বৌদির সঙ্গে করতে পারবে না। আর তৃপ্তিকেও সে সাবধান করে দেবে যেন সে পারতপক্ষে রমেনের বাড়ীতে না যায়। বাইরে যা দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার ঠিকই হবে। বাড়ীতে যাওয়ার দরকার কি? কোন দিন রমেনের অনুপস্থিতিতে তৃপ্তি যদি তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় তাহলে আরতি হয়তো তাকে এমন কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দেবে যা তৃপ্তির মত শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে। এমন কি রমেনের উপস্থিতিতেও শুনিয়ে দিতে পারে। আরতি কি তাকে ভয় করে নাকি?

ট্যাকসি তৃপ্তিদের বাড়ীর সামনে এসে থামতেই রমেন নেমে পড়ল। বেলা তখন প্রায় বারটা হবে। কড়া নাড়তেই তৃপ্তির বাবা দরজা খুলে দিলেন। তৃপ্তিকে ধারে-কাছে কোথাও দেখা গেল না। তাঁর মুখে কোন ভাবান্তর নেই।

—তৃপ্তি নেই?

—আছে।

—কোথায়?

—বোধ হয় নিজের ঘরে।

একদিন রমেন এ বাড়ীতে গানের টিউটর হয়ে ঢুকেছিল। এখন আর তৃপ্তি গান শেখে না। কিন্তু রমেনের সঙ্গে এ বাড়ীর যোগাযোগ আছে। রমেন তৃপ্তিকে বিভিন্ন ফাংশনে গাওয়াতে নিয়ে যায়। রেডিওতে চান্স করে দেবে বলেছে। তৃপ্তির চাকরীর জন্যও সে নাকি চেষ্টা করছে। সুতরাং তৃপ্তির বাবা-মা রমেনের প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞ।

রমেন তৃপ্তির ঘরে ঢুকতেই তৃপ্তি উঠে বসল।

—ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

—না এমনি শুয়েছিলাম। তৃপ্তি বুকের আঁচল ঠিক করছিল।

রমেন তৃপ্তির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সে দেখতে খুব সুন্দর নয়। কালো। মুখশ্রীও খুব ভালো নয়। চেহারাটা খেয়ে আর ঘুমিয়ে বেশ মুটিয়েছে।

—কী ব্যাপার! একেবারে সিল্কের পাঞ্জাবী পরে?

রমেনের সাজ-সজ্জাটা আজ একটু বেশীই হয়ে গেছে। সিল্কের পাঞ্জাবী, ফাইন ধুতি। আবার মুখে-ঘাড়ে পাউডারও দিয়েছে। সে হাসতে হাসতে বলল, কেন আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি নাকি? আমি সিল্কের পাঞ্জাবী পরতে পারি না?

তৃপ্তি মুখ টিপে হাসছিল। সে রমেনকে খেপিয়ে এক ধরনের আনন্দ পাচ্ছিল।

—না আপনি বুড়ো হয়েছেন তাতো বলিনি। আমি বলছিলাম হঠাৎ সকালেই এত সাজগোজ—

—ইচ্ছে হল পরলাম। এর পর বুড়ো হলে তো আর পরতে পারব না। জানো আমার বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয় নি। আমার যে অত বড় দুটো ছেলে আছে কেউ বিশ্বাস করবে?

—হঠাৎ এত বেলায়? তৃপ্তি চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে শুধোল।

—চলে এলাম। বেলা কোথায়? শনিবার বারোটা বেলা নাকি!

—বৌদি কেমন আছেন?

তৃপ্তির সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল কিন্তু আরতির প্রসঙ্গ ওঠায় কি রকম মিইয়ে গেল। সে বিরস মুখে বলল, ওই একই রকম।

তৃপ্তিকে নিয়ে আরতির সঙ্গে তার যে এত ব্যাপার হয়ে গেছে তা সে এখানে বলতে চায় না। যদি বলতে হয় তাহলে তৃপ্তিকে বাইরে বলবে। এখানে বলাটা ঠিক হবে না।

এমন সময় তৃপ্তির মা এ ঘরে ঢুকলেন।

—কেমন আছেন মাসীমা?

—আর বাবা আমাদের থাকা আর না থাকা। তা তুমি আর আসো না কেন?

রমেন মনে মনে ভাবল, যে কারণে আসা সেটা যদি বাইরেই হয়ে যায় তাহলে আর আসার দরকারটা কি? কিন্তু তা তো আর বলা যায় না।

—একদম সময় হয় না মাসীমা। তারপর আরতির শরীরটা খুবই খারাপ। ওর জন্য ডাক্তারের কাছে প্রায়ই ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।

এরই মধ্যে তৃপ্তির বাবা এ ঘরে এসে ঢুকলেন। ভদ্রলোককে সর্বদাই চিন্তিত মনে হয়। বোধ হয় মেয়ের এত বয়স হয়ে গেল, এখনও বিয়ে দিতে পারছেন না এ চিন্তাটাই তাঁকে সর্বদাই অন্যমনস্ক করে রাখে।

—মাসীমা একটু কফি খাবো।

—হ্যাঁ বাবা। নিশ্চয়ই। এখনই করে আনছি।

তৃপ্তির মা এ-ঘর থেকে চলে গেলেন।

—আমার ইন্টারভিউর কী হল? তৃপ্তি শুধোল।

—কিসের ইন্টারভিউ। রমেন মনে করতে পারল না।

—বাহ্। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন! আপনি বলেছিলেন না যে আপনাদের অফিস থেকে আমার ইন্টারভিউয়ের চিঠি আসবে?

ওহ্! রমেনের এতক্ষণে কথাটা মনে পড়ল। আসলে সে এত লোককে এত প্রতিশ্রুতি দেয় যে সব মনে রাখাই তার পক্ষে কঠিন। আর সেগুলো মনে রাখার চেষ্টাও সে করে না। তৃপ্তি তার বাবার সামনে কথাটা তুলে তাকে খুব লজ্জায় ফেলে দিয়েছে।

—তোমার ইন্টারভিউয়ের চিঠি দিন দশ পনেরোর মধ্যে আসবে।

রমেন মনে মনে বলল, কাঁচকলা। তার অফিসে এখন লোকই নেবে না। তৃপ্তিকে সে মিথ্যে কথা বলেছিল। তৃপ্তিও সেই ভরসায় তার হাতে এ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিল। সে এ্যাপ্লিকেশন রমেনের বাড়ীতে এখনও পড়ে আছে। যাই হোক, দিন পনেরো বাদে আবার একটা মিথ্যে কথা তাকে বানিয়ে বলতে হবে। অপাততঃ চলুক তো।

—সত্যিই, নাকি সেই রেডিওর মতো হবে?

রেডিওর ব্যাপারটা নিয়ে রমেন সত্যিই খুব লজ্জায় পড়েছে। সে তৃপ্তির জন্য সত্যিই চেষ্টা করেছিল। এমন কি অডিশনে কে কে থাকবে তারও খোঁজ সে নিয়েছিল। তাদের ধরার ব্যবস্থাও সে করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃপ্তি অডিশনে উত্তীর্ণ হতে পারে নি অথচ সে তৃপ্তিকে আশ্বাস দিয়েছিল যে তার রেডিও প্রোগ্রাম পাওয়া একেবারে অবধারিত। চিঠি এল বলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চিঠি আর আসে নি।

—আরে না না। তুমি অত সন্দেহ কর কেন বল তো? আমি কি তোমার জন্য চেষ্টা করি না?

রমেন অবশ্য রেডিওর ব্যাপারে এখনও চেষ্টা ছাড়ে নি। অন্ততঃ তার মুখ রক্ষার জন্য তৃপ্তির রেডিওতে একটা প্রোগ্রাম করে দিতেই হবে।

—না আপনি তো চেষ্টা করেনই। কিন্তু আমার কপালটা দেখতে হবে তো।

এমন সময় তৃপ্তির মা একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি ও এক কাপ কফি এনে রমেনের সামনের টেবিলে রাখলেন।

—আবার এত সব আয়োজন করতে গেলেন কেন মাসীমা।

—কী আর এমন আয়োজন করেছি। তুমি তৃপ্তির জন্য যা করছ আমরা তার তুলনায় কী করতে পারছি।

—আমি আর তৃপ্তির জন্য কী করতে পেরেছি বলুন। আগে তৃপ্তির একটা কিছু হোক। তারপর খাওয়াবেন।

—হওয়া না হওয়া সে তো পরের কথা। তুমি তো চেষ্টা করছ।

রমেন এবার সত্যি লজ্জা পেল। একটা মিষ্টি মুখে পুরতে পুরতে সে ভাবল তৃপ্তির জন্য অফিসে একবার বলবে নাকি?

তৃপ্তির বাবা সারাক্ষণই চুপচাপ বসেছিলেন। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালে রমেনের কি রকম অস্বস্তি হয়। ভদ্রলোক কি বুঝে ফেলেছেন যে সে মিথ্যে কথা বলছে?

—চঞ্চল বাড়ী নেই? রমেন হঠাৎ তাঁকেই প্রশ্ন করল।

—আছে ধারে কাছে কোথাও। ছুটির দিন তো।

তৃপ্তির বাবা কথাটা শেষ করেই অকারণে তাঁর বাঁ-হাতের উপর ডান হাতটা বোলাতে লাগলেন।

আসবার সময় তৃপ্তির মা বললেন, ওর চাকরিটা যাতে হয় একটু দেখো বাবা। উনি তো রিটায়ার করছেন কয়েক মাস পরেই। তারপর একা ছেলের আয়ে যে কী করে চলবে!

—এবার তৃপ্তির একটা বিয়ে দিয়ে দিন।

রমেন কথাটা বলে তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

—চেষ্টা কি আর করছি না। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ এ বাজারে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কী কঠিন! উনি তো মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে ভাবতে রাতে ঘুমোতেই পারেন না।

তৃপ্তির মা সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তৃপ্তি অবশ্য আরও খানিকটা এগিয়ে দিল। ওদের বাড়ী ঢুকতে গেলে একটা প্যাসেজ পেরিয়ে যেতে হয় সেই প্যাসেজ-টুকু তৃপ্তি রমেনকে এগিয়ে দিল।

রমেন গলা নামিয়ে বলল, কাল বিকেলে দেখা হচ্ছে তো?

তৃপ্তি ঘাড় নাড়ল।

—কোথায় মনে আছে তো?

—আছে। তৃপ্তি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

তৃপ্তিদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রমেন হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দেড়টা বেজে গেছে। এখন আর বাড়ীতে গিয়ে কী হবে? সেখানে তো কেউ তার জন্য ভাত বেড়ে বসে নেই। আরতির রাগ এত সহজে পড়বে মনে হয় না। তার চেয়ে সে বাইরে কোথাও খেয়ে নেবে। তারপর সে টিউশনি করতে চলে যাবে। রবিবার বিকেলে তার তিনটে টিউশনি থাকে।

তারপর, যা হয়, একদিন আরতির রাগ পড়ল। কদিন আর মানুষ না খেয়ে থাকতে পারে? ফলে আরতি আবার অন্নজল গ্রহণ করতে বাধ্য হল। তবে তার আগে রমেনকে অনেক সাধাসাধি করতে হল। তৃপ্তির সঙ্গে সিনেমা দেখার কথাটা সে স্বীকার করল না বটে। কিন্তু সে আরতিকে কথা দিল যে বাড়ীতে সে তার বোন ছাড়া আনবে না। আরতিকে ভবিষ্যতে সে কখনও অবহেলা করবে না। আরতি যদিও জানত যে রমেনের এসব প্রতিশ্রুতি কথার কথা মাত্র তথাপি স্বামীর উপর কতদিন আর রাগ পুষে রাখা যায় এই ভেবে সে রমেনের অপরাধ সাময়িক-ভাবে মার্জনা করতে রাজী হল।

কিন্তু মুস্কিল হল আরতির অসুখ নিয়ে ওর অসুখটা ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করল। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। যা খায় তাই বমি হয়ে যায়। শেষে এমন হল যে আরতির পক্ষে সংসারের কাজ-কর্ম করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। রমেন চোখে অন্ধকার দেখল। চট করে কাজের লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। সে বাধ্য হয়ে তার বিবাহিতা বোনকে নিয়ে এল। বাড়ী থেকে পালিয়ে আসার পর এই বোনের সঙ্গেই তার একমাত্র সম্পর্ক ছিল।

বোনকে নিয়ে আসার ফলে সংসারের কাজ-কর্ম দেখা একজন লোক হল ঠিকই কিন্তু আরতির যন্ত্রণার তো উপশম হল না। একটা লোক যদি পেটের যন্ত্রণায় সারাক্ষণ চেঁচাতে থাকে তাহলে কতক্ষণ আর তার থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা যায়? রমেন যতক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকে ততক্ষণ সে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। কিন্তু বাড়ীতে এলেই আরতির কান্না আর চিৎকার তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। রমেন ভেবেছিল যে ডাক্তার আরতিকে দেখছে তার ওষুধ খেয়েই ওর রোগ সেরে যাবে। কিন্তু তাতেও যখন হল না তখন সেই ডাক্তার নিজেই বলল, হাস-পাতালে দিন। হাসপাতালে দেওয়া মানেই তো এক ঝামেলা। অমুককে ধরো তমুককে ধরো। অমুক ডাক্তারকে দেখাও তবে সিট পাবে। রমেন এত সব করে কখন? তাই সে দিনকতক অপেক্ষা করেছিল যদি আরতির পেটের ব্যথাটা এমনিই কমে যায়। কিন্তু তা কি হয়। রমেনের বোন সর্বক্ষণ তার কানের কাছে বলতে লাগল, বৌদিকে তুই হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। না হলে বৌদি বাঁচবে না। একদিন তো সমীর বাড়ীতে এসে শুনিয়েই গেল, আপনি কি বৌদিকে মেরে ফেলতে চান? দেখছেন না বৌদি কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছেন। সে কথা শুনে আরতি চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, ও তো তাই চায়।

এসব শুনে রমেনের পক্ষে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব হল না। সে একে ধরে তাকে ধরে আরতির জন্য হাসপাতালে একটা সিটের ব্যবস্থা করে ফেলল। ফ্রি-বেড হল না। পেয়িং-এ হল কিছু খরচ হবে। তা আর কী করা যাবে? এই যে চারপাশ থেকে অভিযোগ উঠেছে যে সে আরতির জন্য কিছু করছে না তা তো বন্ধ হবে।

আরতিকে যে ডাক্তার দেখছিলেন সেই ডাক্তার দাস একদিন রমেনকে বললেন, অপারেশন করতে হবে।

রমেন ভাবল আরও খরচের ধাক্কা। কিন্তু উপায় কি?

সে আরতির জন্য কেবিন ভাড়া করল। দুজন নার্স রাখল চব্বিশ ঘন্টার জন্য।

অপারেশনের দিন বাধ্য হয়েই তাকে অফিস থেকে ছুটি নিতে হল। কখন কী প্রয়োজন হয়। অন্তর থেকে খুব একটা তাগিদ না এলেও সমাজে বাস করতে গেলে কতকগুলো কাজ তো করতেই হয়।

অপারেশন রুমে নিয়ে যাবার আগে আরতি একবার তার হাত চেপে ধরে বলে-ছিল, বড্ড ভয় করছে।

রমেন মুখে অভয়ের হাসি আনবার চেষ্টা করে বলেছিল, ভয়ের কী আছে?

আরতিকে অপারেশন রুমে নিয়ে যাবার পর সে বাইরে অনেকক্ষণ পায়চারি করল। পরপর কয়েকটা সিগারেটও খেল। রমেনের বোন আর সমীরও এসেছিল। কিছুক্ষণ থাকার পর ওরা চলে গেছে। রমেন একাই থেকে গেছে। সমীর যাবার সময় বলে গেছে, প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।

রমেন বলেছে, আচ্ছা।

অপারেশন শেষ হবার পর অজ্ঞান আরতিকে কেবিনে নিয়ে যাবার বেশ কিছু-ক্ষণ পর রমেনকে ডাক্তার দাস ডেকে পাঠালেন।

রমেন ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার দাস তাঁর সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন।

রমেন আরতির ব্যাপারে যতটা না উদ্বিগ্ন তার চেয়ে এই চিন্তায় আরও উদ্বিগ্ন হচ্ছিল যে এই ঝামেলার হাত থেকে সে কত তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে পারে। তার টিউশনিতে নিয়মিত যাওয়া হচ্ছে না। তৃপ্তির সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও রাখা যাচ্ছে না। অফিসও কামাই করতে হচ্ছে। কিন্তু এসব কথা তো আর ডাক্তারকে বলা যায় না। তাই সে মুখে যতটা সম্ভব উদ্বেগ ফুটিয়ে তুলে বলল, অপারেশন কেমন হল ডাক্তারবাবু? বিপদ কেটে গেছে তো?

ডাক্তার দাস সিগারেট টানতে টানতে বললেন, আমাদের তরফ থেকে যা করার করেছি। কিন্তু বিপদ কেটেছে বলতে পারছি না।

—তার মানে? ও বাঁচবে না?

ডাক্তার দাস একটা কাগজে কী লিখতে লিখতে বললেন, এখনই ওর প্রাণ সংশয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু আমরা যা ভেবে-ছিলাম রোগটা তার চেয়েও মারাত্মক।

রমেন হতবুদ্ধির মত ডাক্তার দাসের দিকে তাকিয়েছিল।

—আলসার না?

—না। প্রথমে আমাদের তাই মনে হয়ে-ছিল। কিন্তু স্টমাক ওপেন করার পর দেখা গেল রোগটা ক্যানসার।

রমেনের দু-কান দিয়ে ডাক্তার দাসের কথাগুলো আর ঢুকছিল না। কয়েক মিনিটের জন্য সে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

—আপনি কয়েক দিন পর ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। এখানে ও রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। তবে দেরী করবেন না। এ্যাডভান্সড স্টেজ। দেরী করলে রোগী বাঁচবে না।

ডাক্তার দাসের সঙ্গে কথা-বার্তা শেষ করে রমেন রাস্তায় এসে দাঁড়াল। আরতি যে তাকে এ-রকম বিপদে ফেলে দেবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। তার মনে হল আরতি চক্রান্ত করে তাকে বিপদে ফেলবার জন্য এ কঠিন রোগ বাধিয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগের পক্ষে সে মন থেকে খুব একটা সায় পেল না। বরং আরতি যে আর বেশী দিন বাঁচবে না এই চিন্তাটাই তাকে এক ধরনের মুক্তির আশ্বাস এনে দিল।

সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। তৃপ্তির তার জন্য এসপ্ল্যানেডে একটা বিশেষ জায়গায় অপেক্ষা করার কথা আছে।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে রমেন ভাবল তৃপ্তিকে এই সুখবরটা দিতে হবে। রমেনের বাড়ীতে এরপর থেকে সে যথেচ্ছ যেতে পারে। এতদিন তাদের যে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করতে হত তার আর বিশেষ প্রয়োজন হবে না। আরতি তাদের অল্প কিছু দিনের মধ্যে মুক্তি দিয়ে যাবে। কিন্তু সত্যিই মুক্তি কি? তাহলে বুকটা এত ভারী লাগছে কেন? চোখের কোণ দুটো হঠাৎ জ্বালা করছে কেন? কেন আরতির নিঃসাড় দেহটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে? আরতির শীর্ণ পাণ্ডুর মুখটা বারবার মনে পড়ছে কেন? সে ধাঁধায় পড়ে গেল।

রমেন ট্যাক্সির ড্রাইভারকে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে যেতে বলল।

প্রশান্ত দাঁ

ক্রিকেটের রাজা সোবার্স

নিদাঘ মধ্যাহ্নে বারবাডোজের পুলিশ মাঠে অনুশীলনরত ইস্পাতের মত কঠিন এক কৃষ্ণকায় কিশোরের ক্রীড়া নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে পুলিশ ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় ফরমান তাকে তাদের সঙ্গে নেট প্র্যাকটিসের সুযোগ দেন। কিন্তু এত অল্পবয়সী ছেলেকে পুলিশ চাকুরীতে নিয়োগ আইন বিরুদ্ধ বলে সোবার্সকে পুলিশ ব্যান্ডপার্টিতে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। মুশকিল হল দরিদ্র কিশোর কোন বাজনাই বাজাতে জানে না। অবশেষে ব্যান্ড লীডার তার হাতে বিউগিল দিয়ে বলেছিলেন—এই যন্ত্রটা বাজানো খুব সহজ। চেষ্টা কর। নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এই কিশোর কোনদিন ভাল বিউগিল বাজাতে পারে-নি তাই তার সতীর্থরা তাকে রসিকতা করে বলত—'ওয়ার্ল্ডস ওয়াস্ট মিউজিসিয়ান'।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বার বছর বয়সের সোবার্সের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় নাবিক পিতার মৃত্যু হয়। সোবার্স পড়াশুনায় কোনদিনই মেধাবী ছিল না। তার ওপর অভাবের তাড়নায় তাকে লেখাপড়া ছাড়তে হয়েছিল অনেক আগেই।

সেদিন পিতৃহীন বালক সোবার্সের অবস্থা নিমজ্জিত মানুষের মত অসহায় হলেও সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি। সবভুলে ক্রিকেটকে জীবন-মন্ত্র করে নিয়মিত আটঘন্টা করে অনুশীলন চালিয়েছে।

একদিনের ঘটনা চোদ্দ বছরের বালকের জীবনে নতুন অভিজ্ঞতার আলো জ্বেলে দিল। বারবাডোজের অন্যতম সেরা দল এম্পায়ার বনাম পুলিস দলের খেলা। এই দলের অধিনায়ক পৃথিবী বিখ্যাত খেলোয়াড় এভারটন উইকস। ছ জন আউট হবার পর নিগ্রো ছেলেটি ব্যাট করতে আসে। একদিক থেকে বল করছিলেন ফাস্ট বোলার উইলিয়ামস। কয়েকঘন্টা অতিক্রান্ত। তাকে আউট করে কার সাধ্য। এতটুকু অপরিচিত ছেলের দৃঢ়তা ও খেলার কায়দাকানুন দেখে উইলিয়ামস মুগ্ধ হলেও মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এই ভেবে যে অজ্ঞাত একব্যক্তি ছেলে কিনা তার মত নামজাদা বাঘা বোলারকে ঘন্টার পর ঘন্টা হিমসিম খাওয়াচ্ছে। বল করতে করতে থেমে গিয়ে উইলিয়ামস উইকেট রক্ষককে কি যেন এক ইঙ্গিত করলেন। তারপর অনেক দূর থেকে দৌড়ে এসে উঁচু লাফ দিয়ে মাটি ঠুকে বাম্পার বল দিলেন। ছেলেটি দু পা পেছিয়ে গিয়ে হুক করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বল গিয়ে সরাসরি আঘাত করে তার চোয়ালে। চোয়াল ফেটে চৌচির। রক্তে সাদা জামা লাল। অচৈতন্য ছেলেটিকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

জ্ঞান ফিরে এলে ছেলেটি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। চোয়াল অসম্ভব ফুলে গেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করে কেন তার এমন হল? যথার্থ ব্যাটে বলে হলে তার চোয়ালে না লেগে বলটি নির্ঘাত মাঠের সীমানার বাইরে যেতে পারত। আসলে ক্রিকেটের সব কায়দা তার করায়ত্ত নয়। ক্রিকেটের সব রহস্য তার জানা নেই। কিন্তু চেষ্টা করলে মানুষের অজানা ত কিছু থাকতে পারে না। এইভাবে উইলিয়ামসের বাম্পার বলের আঘাত স্থিরচিত্ত ক্রিকেটপ্রিয় ছেলেটিকে নতুন শিক্ষা-দান করে।

মুখের ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় ঐ ছেলেটির পক্ষে বিউগিলে ফুঁ দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। একদিন ব্যান্ডলিডার স্বয়ং তার মুখের অবস্থা দেখে তাকে পুলিস ব্যান্ডপার্টি থেকে নিষ্কৃতি দিলেন। ছেলেটিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারণ বিউগিল বাজাতে তার একেবারে ভাল লাগত না।

'ওয়ার্ল্ডস ওয়াস্ট মিউজিসিয়ান' ও ক্রিকেটে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই ছেলেটির নাম গ্যারি সোবার্স। জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৮শে জুলাই।

ষোল বছরের নগণ্য বিউগিল বাদক ব্যান্ডপার্টি থেকে মুক্তি পেয়ে পুরোপুরি ক্রিকেটে আত্মনিয়োগ করে। ১৯৫২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরকারী ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে বারবাডোজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সোবার্সের প্রথম আবির্ভাব। এক বছর পর মাত্র সতেরো বছর বয়সে লেফট শো আর্ম বোলার হিসেবে সোবার্স ১৯৫৩-৫৪ সালে স্বদেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একটি টেস্টে আহত বোলার ভ্যালেন্টাইনের জায়গায় স্বদেশীয় দলের পক্ষে প্রথম টেস্ট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করেন। এই খেলায় তিনি ৮১ রাণে ৪ উইকেট পান। এবং এক ইনিংসে নট আউট থেকে ৪০ রাণ সংগ্রহ করেন। জীবনের প্রথম টেস্টের পরিসংখ্যান তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও সোবার্সের ক্রীড়ানৈপুণ্যে উইকস ও ওরেল সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

কিছুকাল পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচের প্রাক মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এক নিদারুণ সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। সমস্যা ষপেনিং ব্যাটম্যানকে ঘিরে। অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণকারী দুই ফাস্ট বোলার লিন্ডওয়াল ও কিথ মিলারকে চ্যালেঞ্জ জানাতে যখন সবাই পেছপা তখন সোবার্স এগিয়ে এলেন। এবং সূচনার প্রথম পনের মিনিটের মধ্যে এই দুই দুর্ধর্ষ বোলারকে প্রচন্ড মার মেরে ৪৩ রাণ করেন।

সোবার্সের জন্ম ১৯৩৬ সালে ২৮শে জুলাই ব্রিজটাউনে। সোবার্স একজন সহজাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। সোবার্স জীবনে কোনদিন কারুর কাছে ক্রিকেটের পাঠ নেননি। বারবাডোজের অনুকূল পরিবেশ, স্বকীয় প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা সোবার্সের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। অন্যদিকে সোবার্স অধ্য-

ঘসায়ের অনন্য নজীর। এই পিতৃহীন নাবালক নিদারুণ অভাব অনটনের মধ্যেও প্রত্যহ আট ঘণ্টা অনপ্রশীলন থেকে বিরত হয়নি। বিশ্ববন্দিত এই ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জীবনের প্রথম পর্যায় সোনালী সফলতায় উজ্জ্বল ছিল না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬টা, অস্ট্রেলিয়া বিপক্ষে ৪টা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪টা, মোট ১৪টা টেস্ট ম্যাচ খেলেও পরবর্তীকালে বহু বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী খেলোয়াড় কোন টেস্ট সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। তখন বিশ্ববিশ্রুত ডবলিউ ত্রয়ী—ওয়ালকট ওরেল ও উইকসের স্বর্ণযুগ। ঐ সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলে স্থান করে নেওয়া যে কি দুরূহ কাজ তা ক্রিকেট রসিকরা সহজেই অনুমান করতে পারেন।

সোবার্সের ক্রিকেট জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৫৭-৫৮ সালে স্বদেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। কিংস্টনে এক ইনিংসে নট আউট ৩৬৫ রাণ করে তিনি টেস্টে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ করার যে বিশ্বরেকর্ড গড়েন তা আজও অম্লান। টেস্ট ম্যাচে সোবার্সের এই প্রথম সেঞ্চুরী এর পরে ৪র্থ টেস্টে (জর্জটাউন) উভয় ইনিংসে অপরাজিত ১২৫ রান ও ১০৯ রান করে টেস্টে উপর্যুপরি তিন ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন। স্মরণ করা যেতে পারে ইতিপূর্বে লেন হাটনের ৩৬৪ রাণ ছিল এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণের বিশ্ব রেকর্ড। এই সময় থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত নদীর স্রোতের মত সোবার্স একের পর এক নযা নজীর রচনা করেছেন যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি এক ওভারে সর্বাধিক ছক্কা মারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন সোয়ানসি মাঠে আয়োজিত ১৯৬৮ সালে নটিংহামের পক্ষে গ্ল্যামারগণের বিরুদ্ধে এম এ ন্যাসের বলে। ছ বলে তিনি ছটি ছক্কা মেরে ৩৬ রাণ করেন। যদিও ইতিপূর্বে আরও অনেকেই এই গৌরবের অধিকারী। তবুও ক্রিকেটের নিয়মে এক ওভারে এর চেয়ে বেশী রাণ তোলার ব্যবস্থা নেই। টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে সর্বাধিক রাণের নতুন রেকর্ড গড়ার বিরল কৃতিত্বও সোবার্সের। তাঁর সংগ্রহ ৯৩টি টেস্ট ম্যাচে মোট ৮০৩২ রাণ। ইতিপূর্বে ৮৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলার সূত্রে ৭২৪৯ রান ছিল ওয়ালি হ্যামণ্ডের সর্বোচ্চ রাণের রেকর্ড। সোবার্স অনেক আগেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার পর একক ৭৫১৯ রান সংগ্রহ করে হ্যামণ্ডের নজীরকে মুছে দিয়েছেন। আরও অনেক আগে মুছে দিয়েছেন স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ৫২টি টেস্টে মোট ৬৯৬৯ রাণের রেকর্ডকে। টেস্ট খেলায় দুর্লভ ডাবল খেতাব অর্থাৎ ১০০০ রাণ ও ১০০ উইকেট অনেকেই লাভ করেছেন। কিন্তু কোন একটি বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে খেলে নিজের নামের পাশে ডাবল খেতাব জুড়ে দিয়েছেন একমাত্র সোবার্সই। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় তাঁর সংগ্রহ ৩২১৪ রাণ এবং ১২০টি উইকেট। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সোবার্সের রাণ ২৭০০০ এর বেশী। উইকেট পেয়েছেন ১০০০ হাজারের অধিক। আর ডাবল খেতাব লাভের তালিকায় সোবার্স ২৩৫টি উইকেট পেয়ে শীর্ষস্থানাধিকারী। ক্রিকেট পরিসংখ্যানের কিতাবে নয়া রেকর্ড রচনায় সোবার্সের যুগ শুরু হয় ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে। সর্বদিক থেকে এত বেশী নজীর রচনা ইতিপূর্বে আর কোন ক্রিকেটার করেন নি। উইকেট কীপার না হয়েও তিনি কেবল টেস্ট ক্রিকেটে শতাধিক ক্যাচ ধরেছেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। অলরাউন্ডারকুলে তিনি হলেন প্রথম সারির। তাঁর এক সিরিজে অলরাউন্ডার-এর অভাবনীয় সাফল্য দেখা যায় ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ১৯৬১-৬২ সালে মোট ৪২৪ রাণ (গড় ৭০-৬৬) এবং মোট ২৩ উইকেট (গড ২০-৫৬)। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মোট ৭২২ রাণ (গড় ১০৩-১৪) এবং মোট ২০ উইকেট (গড় ২৭-২৫)। ১৯৫৭-৫৮ সালে কিংস্টনে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে তার ক্রিকেট জীবনে সর্বাধিক রাউন্ডারী (৩৪টি) মারেন। স্মরণ থাকতে পারে এই রাণ সংখ্যা এক ইনিংসে তার সর্বাধিক রাণ অপরাজিত ৩৬৫-র মধ্যে। টেস্টে সোবার্সের সেঞ্চুরীর সংখ্যা ২৬।

জুটিতে উল্লেখযোগ্য রাণের মধ্যে প্রথমেই বিধৃত করতে হয় ১৯৫৭-৫৮ সালে কিংসটনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাণ্ট ও সোবার্সের ২য় উইকেটের জুটিতে ৪৪৬ রাণ। এই ৪৪৬ রাণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেটে যে কোন উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রাণ এবং ২য় উইকেটের জুটিতে বিশ্বরেকর্ড রাণের (৪৫১ রাণ) থেকে মাত্র ৫ রাণ কম। ১৯৫৯-৬০ সালে ব্রিজটাউনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪র্থ উইকেটের জুটিতে সোবার্স এবং ওরেলের সংগ্রহ ৩১৯ রাণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে এই রাণ সংখ্যা ৪র্থ উইকেটে জুটির বিশ্ব রেকর্ড রাণের থেকে মাত্র ১২ রাণ কম। নার্স-এর জুটিতে ৫ম উইকেটে ২৬৫ রাণ, ১৯৬৬-তে ষষ্ঠ উইকেটে ২৮৪ অপরাজিত। ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সপ্তম উইকেটে জুলিয়েনের জুটিতে অপরাজিত ১৫৫ রাণ করেন। একটি টেস্ট সিরিজে সর্বা উল্লেখযোগ্য মোট রান (৮০০ রানের ভিত্তিতে) করেছে সেই ৭ জনের তালিকায় সোবার্সের স্থান পঞ্চম। এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ গড়ের রেকর্ড। ৮২৪ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮, অপরাজিত—২বার। এক ইনিংসে সর্বাধিক রান অপরাজিত ৩৬৫, সেঞ্চুরী ৩, এবং গড় (১৩৭-৩৩) পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮)।

সোবার্স যথার্থ ন্যাটা খেলোয়াড়। লেফট আর্ম স্পিন বোলার হিসেবেই তাঁর খ্যাতি। তবে তিনি ইচ্ছামত ফাস্ট মিডিয়াম বোলিংকে চায়নাম্যানে রূপান্তরিত করতে পারেন। একজন বোলারের জীবনে এই দ্বিবিধ গুণের সমন্বয় সোবার্স ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ে না। সোবার্স খাঁটি ন্যাটা। ব্যাটও করেন বাঁহাতে। পেশাদারী ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর খ্যাতি জগৎজোড়া। অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ড, ইংল্যান্ডের সেন্ট্রাল ল্যাংকাশায়ার ও কাউন্টি ক্রিকেট লীগের পেশাদারী খেলায় সোবার্সের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশী। চলতি বছরের আগষ্ট মাসে ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে ল্যাংকাশায়ারের বিরুদ্ধে তাঁর ৮৩ মিনিটে অপরাজিত ১৩২ রান এবছরের ক্রিকেট মরশুমে দ্রুততম সেঞ্চুরী। সোবার্স ১৯৬৮ সাল থেকে একনাগাড়ে ইংলিশ কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশিপে বার্কিংহামশায়ার দলের হয়ে খেলেছেন।

অধিনায়ক হিসেবেও সোবার্স সফল। ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের উত্তরসূরী হয়ে তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে এক সময় বিশ্বের ক্রিকেট দরবারে সেরা প্রতিপন্ন করেছিলেন।

সোবার্স প্রথম অধিনায়ক নির্বাচিত হন ১৯৬৪-৬৫ সালে কিংসটনে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্টে ২৯ বছর বয়সে। প্রথম টেস্টে টসে জয়ী হয়ে ১৭৯ রানে সোবার্স দলকে বিজয়ের পথে এগিয়ে দেন। এই টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২—১ খেলায় জয়লাভ করে। সোবার্স ৩৯টি টেস্টে অধিনায়কত্ব করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। কেবল সোবার্সএর অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার ফলাফল দাঁড়ায় : জয় ৯, হার ১০ এবং ড্র ২০।

টেস্টের টসে সোবার্সের ২৭টি জয়লাভ বিশ্বরেকর্ড হয়ে আছে। আর ভাবতে আশ্চর্য লাগে যাদুকরের মত তিনি দুটি টেস্ট সিরিজের পাঁচটি করে মোট দশটি টেস্টেরই টসে জেতেন। প্রথমটি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭১-৭২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'ওরেল ট্রফি' ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে 'উইসডেন ট্রফি' বিজয়ী হয়। বিশ্ব একাদশ ও কমনওয়েলথ দলের অধিনায়কত্বের আহ্বান সোবার্সকে সসম্মানে ক্রিকেটের স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ১৯৬৯ সালে সোবার্স অস্ট্রেলিয়ান মহিলা প্রুডেন্স-এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

সোবার্স সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার। তাঁর ঘটনাবহুল সৃষ্টিশীল অসাধারণ ক্রিকেট জীবন এই অল্পপরিসরে ধরে রাখা অসম্ভব। ১৯৭৪ সালে উইসডেন বর্ষ পঞ্জিকা এই মহানায়কের জীবনকেন্দ্রিক চল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক ক্রোড়পত্র প্রকাশিত করেও সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরতে পারে নি। এত দীর্ঘ স্থান উইসডেন বর্ষ পঞ্জিকায় আর কোন খেলোয়াড়কে দেওয়া

[ক্রমশ]

অজিত কুমার রায়

টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রিকেট খেলার প্রচলন বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিক ইংরেজরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে তাঁদের জাতীয় খেলা ক্রিকেটের প্রচলন করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিবাসীদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি এই খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৯৫ সালে ইংল্যাণ্ডের এক ক্রিকেট দল প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করেছিল। এরপর দু' দেশের মধ্যে সফর বিনিময় শুরু হয়। ১৯২৩ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের কনস্ট্যাণ্টাইন (পরবর্তী কালে লর্ড কনস্ট্যাণ্টাইন) লর্ডস মাঠে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তারই ফলে ১৯২৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট খেলার সুযোগ লাভ করে। এই সময় থেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট খেলা সুরু করে। বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে আজ তাদের মোট টেস্ট খেলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫১। ১৯২৮ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে কনস্ট্যাণ্টাইন ১০০০ রান এবং ১০০ উইকেট নিয়ে যে 'ডাবল' করেছিলেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সফরকারী দলের পক্ষে অন্য কোনও খেলোয়াড় এতোটা পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট দলে কেবল শ্বেতাঙ্গরাই অধিনায়ক হতেন তখন অর্থাৎ ১৯৩৪-৩৫ সালে কৃষ্ণাঙ্গ কনস্ট্যাণ্টাইন কিংসটনে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে শেষ টেস্টে শ্বেতাঙ্গ অধিনায়ক জর্জ গ্র্যাণ্টের অনুপস্থিতিতে দলের নেতৃত্ব করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এর মধ্যে ১৯২৯-৩০ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান জর্জ হেডলী। তাঁর সমকক্ষ ব্যাটসম্যান তখন বিশ্ব-ক্রিকেট আসরেও কম ছিল। তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সিরিজেই চারটি সেঞ্চুরীসহ মোট ১৩ রান করে হেডলী যে রেকর্ড করেন, তা ভেঙেছেন ১৯৭১-এ ভারতের সুনীল গাভাসকার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে খেলে। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ডলীর ২৭০ নট আউট স্বদেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ছিল। অবশ্য এই রেকর্ডের অধিকারী আজ লরেন্স রো, যাঁর ৩০২ রান আজও তাঁর দেশের পক্ষে দেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জেতে ১৯২৯-৩০ সালে আর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৩০-৩১ সালে। দুটি জয়ের মূলেই ছিল জর্জ হেডলীর অনবদ্য ব্যাটিং।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবির্ভূত হলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত 'ত্রয়ী'—সাবলীল ভঙ্গিমার ব্যাটসম্যান ওরেল অক্লান্ত রানসংগ্রহকারী উইকস্, আর ব্যাকফুট-বিশারদ দীর্ঘদেহী ওয়ালকট। তিনজনই ছিলেন কীর্তিমান। এই বিখ্যাত 'ত্রয়ী'র তিনজনেই দু'বার এক ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন—প্রথমবার ভারতের বিপক্ষে কিংসটনে এবং দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পোর্ট অফ স্পেনে ওরেল ১৯৫০ সালে নটিংহামে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২৬১ রান করে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড করেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে উইকস্ পর পর পাঁচটি টেস্ট ইনিংসে সেঞ্চুরী করে বিশ্ব-রেকর্ড করেন। এর পরেও ১৯৫৬ সালে তিনি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পর পর তিনটি টেস্ট ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে উইকস্ ৭৭৯ রান করে ভারতের বিপক্ষে একটি সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সর্বোচ্চ মোট রান-সংখ্যার রেকর্ডের অধিকারী হন। ওয়ালকট দুটি বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী—১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনি এক সিরিজে দুটি টেস্টের উভয় ইনিংসে পৃথক পৃথক সেঞ্চুরী করে বিশ্ব-রেকর্ড করেন এবং ঐ সিরিজেই মোট ৫টি সেঞ্চুরী করে একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরীর বিশ্ব-রেকর্ড করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ঐ সিরিজে ওয়ালকটের মোট ৮২৭ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে এক সিরিজে মোট সর্বাধিক রানের রেকর্ড।

'রহস্যময়' স্পিনার রামাধীন এবং ন্যাটা বোলার ভ্যালেনটাইনের জুটি ১৯৫০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম 'রাবার' জয়ে সাহায্য করে। ১৯৫৭ সালে রামাধীন বার্মিংহামে ১২৯ ওভারে ৭৭৪টি বল করে একটি টেস্টে একজন বোলারের পক্ষে সর্বাধিক মোট বল করার বিশ্ব-রেকর্ড করেন। ন্যাটা স্পিনার ভ্যালেনটাইন তাঁর প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৮টি উইকেট দখল করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ডেনিস এ্যাটকিনসন এবং উইকেটরক্ষক ডিপেইজা ৭ম উইকেটের জুটিতে ৩৪৭ রান সংগ্রহ করার সূত্রে কেবল টেস্ট ক্রিকেটে নয় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটেও ৭ম উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক রানের বিশ্ব-রেকর্ড করেন। ১৯৫৮ সালে কিংসটনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে যে ৭১০ রান করে তা তাদের পক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ঢাকাতে পাকিস্তানেরই বিরুদ্ধে তাদের এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন ৭৬ রানের রেকর্ড করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের ক্রিকেট খেলার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলি হল বারবাডোস ত্রিনিদাদ গায়ানা এবং জ্যামাইকা। এই স্থানগুলির মধ্যে দূরত্ব অনেক এবং এর অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালীতেও পার্থক্য আছে। এই চারটি অঞ্চলের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে অনৈক্য ছিল। কেবল ব্যক্তিগত নৈপুণ্য থাকলেই ক্রিকেট খেলায় জয়লাভ করা যায় না, প্রয়োজন দলগত ঐক্যেরও। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন শ্বেতাঙ্গ অধিনায়কই এই দলগত অনৈক্য দূর করতে পারেননি। ১৯৬০-৬১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। এবার অধিনায়ক কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। যাদুকর ওরেল তাঁর স্বভাবগুণে দূর করলেন দলগত অনৈক্য। জন্ম নিল খাঁটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। পাঁচ বছর ধরে যে টেস্ট ক্রিকেট মাঠে মন কষাকষি, ধীরগতির ব্যাটিং এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী ওভারের চাপে পড়ে দর্শকদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছিল, তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন ওরেল। খেলোয়াড়ী মনোভাব আর চোখজুড়োনো ব্যাটিং দিয়ে

দর্শকদের ভুলিয়ে দিলেন টেস্ট খেলার তিক্ত স্মৃতি। ওরেল আর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বেনডের সক্রিয় সহযোগিতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলাটি শেষ হল অকল্পনীয় 'টাই'-তে, অর্থাৎ উভয় দলেরই মোট রান-সংখ্যা সমান হল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১—২ ফলাফলে সিরিজে পরাজিত হলেও বিদায়কালে ওরেল এবং তাঁর দলের খেলোয়াড়রা মেলবোর্ণের অগণিত জনসাধারণের কাছে পেলেন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন এবং বিজয়ীর সম্মান। অতুলনীয় সম্মান পেলেন ওরেল। ব্রিসবেনের অতুলনীয় 'টাই'-এর স্মারকরূপে তাঁর জীবিতাবস্থাতেই শুরু হল অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলার জন্যে 'দি স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ট্রফি।' 'দি স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল' নাম হল ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের। ১৯৬৪ সালে 'নাইটহুডের' সম্মান লাভ করার জন্য। ওরেল এই খেতাব লাভ করেছিলেন 'ক্রিকেট খেলার সেবার জন্যে।'

ওরেলের দলের কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন—সোবার্স কানহাই হান্ট বুচার নার্স হল আর গিবস। ন্যাটা ব্যাটসম্যান সোবার্স ১৯৫৮ সালে কিংসটনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩৬৫ (নট আউট) করে টেস্ট খেলার এই ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব-রেকর্ড করেন। কেবল ন্যাটা স্পিনাররূপে টেস্ট খেলা শুরু করে সোবার্স ক্রমশঃ বিশ্বের সেরা অলরাউণ্ডারদের মধ্যে একজন হলেন। আত্মপ্রকাশ করার কয়েকবছরের মধ্যেই পরাক্রান্ত ব্যাটসম্যান, ন্যাটা ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার ন্যাটা 'চায়নাম্যান' বোলার আর অব্যর্থসন্ধানী শর্টলেগ আর স্লিপ-ফিল্ডাররূপে গারফিল্ড সোবার্স বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার হয়ে উঠলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মিশ্র চীনজাতীয় বোলার এডি এ্যাচং বাঁ হাতে যে গুগলি আর লেগ-স্পিন বোলিং-এর প্রবর্তন করেন সেটাই পরবর্তীকালে 'চায়নাম্যান' নামে পরিচিতি লাভ করে। টেস্টে ভারতের বিপক্ষে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ডধারী (২৫৬) রোহন কানহাই ১৯৫৮-৫৯ সালে তাঁর আসন কায়েমী করে নেন। ক্রিকেটের সব-জানা স্ট্রোকের সঙ্গে নিজস্ব উদ্ভাবিত স্ট্রোক যোগ করে কানহাই এই সময় থেকেই এ্যাডভেঞ্চারাস তথা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটিংয়ের প্রতীক হয়ে ওঠেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে জীবনের প্রথম টেস্টেই তিনি সেঞ্চুরী করেছিলেন। তিনি দায়িত্বশীল অথচ আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ইনিংসের গোড়াপত্তন করার সমস্যা দূর করলেন। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং-কৌশলে বেসিল বুচারও কোন অংশে কম ছিলেন না। দুর্ভাগ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের। জীবনের শেষ টেস্টে চমৎকার ব্যাটিং করে সেমুর নার্স ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে করলেন ২৫৮ রান। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের থেকে বাদ পড়ে গেলেন তিনি। নার্সের ২৫৮ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ওরেলের দলে ছিলেন সর্বকালের সেরা বোলারদের অন্যতম দুজন—ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল এবং অফ-স্পিনার ল্যান্স গিবস। ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েসলী হল লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে 'হ্যাট-ট্রিক' করেন—তাঁর দেশের পক্ষে প্রথম 'হ্যাট-ট্রিকে'র নজির। ফাস্ট বোলার হলের তীব্র গতির বোলিং বারবার টেস্ট ম্যাচের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাঁর দুরন্ত বোলিং বিভিন্ন প্রতিযোগী ব্যাটসম্যানদের বিব্রত করেছে। ল্যান্স গিবস এ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীতে প্রথম এবং একমাত্র 'হ্যাট-ট্রিক' করার কৃতিত্ব লাভ করেন। নিখুঁত লেংথ আর লোভনীয় অথচ বিপদজনক 'ফ্লাইট'-এর অধিকারী গিবসের মোট টেস্ট উইকেটের সংখ্যা ২৬৫।

১৯৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলের জন্যে অনুমোদন করলেন 'উইসডেন'-এর শতবর্ষপূর্তির স্মারক হিসেবে উইসডেনের প্রকাশকমণ্ডলীর তরফ থেকে প্রদত্ত 'উইসডেন' ট্রফি। জীবনের শেষ টেস্ট সিরিজে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কর্ণধার হয়ে দলকে এগিয়ে দিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবার সম্মানলাভের পথে। ফাস্ট বোলার হলের সঙ্গে দৈত্যাকার ফাস্ট বোলার চার্লি গ্রিফিথ যোগ দেওয়াতে এই জুটি ক্রিকেটের বিখ্যাত ফাস্ট বোলারদের জুটির মধ্যে অন্যতম হলেন। গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৫ সালে ২—১ ব্যবধানে পরাজিত করে লাভ করলেন বিশ্বক্রিকেটের সেরা দল হবার সম্মান এবং সেই সঙ্গে 'দি স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ট্রফি'।

১৯৭২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জর্জ রো সৃষ্টি করলেন এক বিশ্ব-রেকর্ড। তিনি প্রথম টেস্ট ম্যাচেই নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে রো দুটি ইনিংসে যথাক্রমে রান করেন ২১৪ আর ১০০ নট আউট। ঐ সিরিজে 'ন্যাটা কানহাই' কালিচরণ টেস্ট জীবন শুরু করলেন প্রথম দুটি টেস্ট ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরী করে। অবশ্য কালিচরণের দুটি সেঞ্চুরী লরেন্স রো-র মত একই টেস্টে হয়নি।

১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল—এই ছ বছর উপর্যুপরি ৫টি টেস্ট সিরিজে হারার জন্য ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বে-সরকারীভাবে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করেছিল। এই পাঁচ টেস্ট সিরিজে হারা-জয়ী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট দলের নেতৃত্ব [illegible] ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (২টিতে) এবং গারফিল্ড সোবার্স (৩টিতে)। এই ছ বছরকে (১৯৬২-৬৭) টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ১৯৬৮ সাল থেকে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপর্যয় সুরু হয়। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ সাল—এই সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৯টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে সেগুলোর ফলাফল নৈরাশ্যজনক :—জয় ১ (ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭০ সালে), হার ৫ এবং ড্র ৩।

টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

(১লা মে, ১৯৭৪ পর্যন্ত)

বিপক্ষ	খেলা	জয়	পরাঃ	টাই	অম
ইংল্যান্ড	৬৬	১৯	২১	০	২[illegible]
অস্ট্রেলিয়া	৩৫	৬	১৯	১	[illegible]
ভারত	২৮	১২	১	০	১[illegible]
নিউজিল্যান্ড	১৪	৫	২	০	[illegible]
পাকিস্তান	৮	৪	৩	০	[illegible]
মোট :	১৫১	৪৬	৪৬	১	৫[illegible]

খেলার জগতে মেয়ে

কাবাডি 'বাঘিনী' মণিকা নাথ

—৭১ সালে বাঘা যতীন সব পেয়েছির আসরের সদস্যারূপে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজ দেখতে এসে কাবাডি খেলার ওপর আগ্রহ বাড়ে। সেই সময় আমাকে অনেকে কাবাডি খেলতে উৎসাহ দেন। তখন থেকেই বিধিমতভাবে কাবাডি খেলা শুরু করি।'

সেদিন ময়দানে কলকাতা কাবাডি এসোসিয়েশনের তাঁবুতে কথা হচ্ছিল বাংলার কুশলী মেয়ে-কাবাডি খেলোয়াড় মণিকা নাথের সঙ্গে। পাকা এথলীট-সুলভ শারীরিক গঠন মেয়েটির। নিবাস যাদবপুরের বাঘা যতীন কলোনি। এ বছরই স্কুল ফাইনাল দেবে প্রান্তিকপল্লী বালিকা বিদ্যালয় থেকে। বাবা শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র নাথ স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক। মণিকার এক বোন ও এক ভাই আছে।

মণিকা বলে, সাঁতার বা অন্য খেলায় আমি তেমন উৎসাহ পাই না। ছোটবেলা

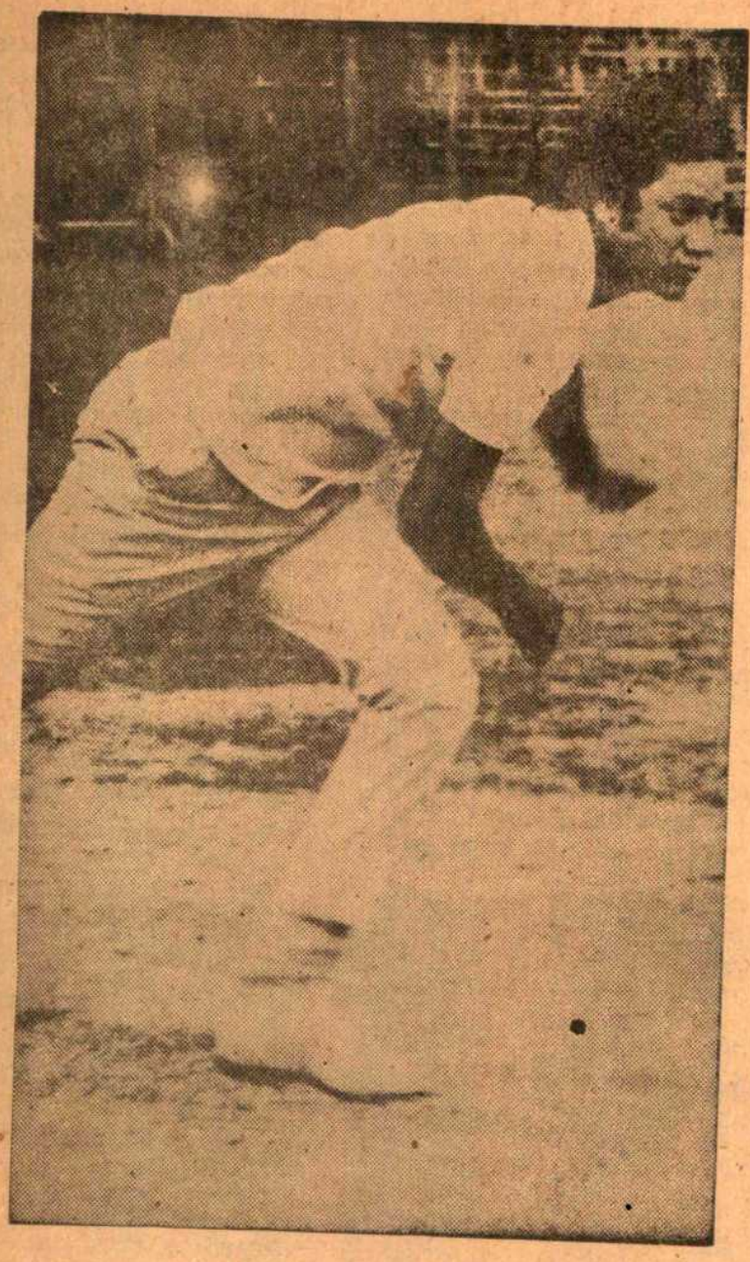

মাঠের নায়ক

সুব্রত গুহ

ত্যাগ শব্দটি আস্তে আস্তে অভিধান থেকে যখন অপসৃয়মাণ সেই মুহূর্তে, যদি কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থের অনেক ওপরে ওঠে, দেশের বৃহত্তর কল্যাণে সরে দাঁড়ান, জায়গা করে দেন অন্যকে তা হলে ঐ ঘটনাটি আর শুধুমাত্র ঘটনাই থাকে না, নিঃসন্দেহে ইতিহাস হয়ে পড়ে।

ভারতীয় ক্রিকেটে ঠিক এমনি একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন বাংলার এক তরুণ। নাম সুব্রত গুহ। ঘটনাটি বছর পাঁচেক আগের (১৯৬৯)। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের প্রথম ক্রিকেট টেস্ট। স্থান বোম্বাই, ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়াম। চূড়ান্ত দলে সুব্রত ছিলেন। খেলা শুরু হওয়ার মিনিট ত্রিশেক আগে সুব্রত পিচে হাত বুলিয়ে এসে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচক-মণ্ডলীর সভাপতি বিজয় মার্চেন্টকে বললেন ঃ 'স্যার, আমার বদলে ভেঙ্কটরাঘবনের বলই মনে হয় এই উইকেটে বেশী কার্যকর হবে, ভারতীয় ক্রিকেট তথা জাতির স্বার্থে আমার বদলে ব্র্যাবোর্ণ টেস্টে ভেংকটকে নিন।' বিনম্র সামান্য কটি কথা। মুগ্ধ হয়ে গেলেন বিজয় সুব্রতর সিংহ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে। এ যুগে এমন ছেলেও আছে?

আছে কি নেই বাংলার সুব্রত গুহ বোধ হয় বিজয় মার্চেন্টকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সুব্রত গুহ চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড়। প্রতিষ্ঠা বোলার হিসাবে হলেও, ব্যাটিং সামর্থ্যও রীতিমত বুক ফুলিয়ে বলবার মত বৈ কি! সর্বভারতীয় ক্রিকেটে ব্যাটে-বলে সমান সার্থক এমন বঙ্গসন্তান সম্ভবতঃ আর নেই। এক সময় ভারতবাসী বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গালীরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম সুটে ব্যানার্জির শূন্যস্থানে সুব্রতকে দেখে। সুব্রত মিডিয়াম পেস বোলার এবং আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান। সবল হাতে দুরন্ত গতিতে বল করেন, ব্যাটও চলে শাণিত অসির মত।

উইকেট আর রানের খতিয়ানে সুব্রত গুহের ক্রিকেটের ঝোলাটি দস্তুর মতো ভারী। প্রতিনিধিত্বমূলক ক্রিকেট আসরে প্রথম আবির্ভাব ১৯৬০—৬১ সালে কোচবিহার ট্রফির মাধ্যমে। বালীগঞ্জ জগবন্ধু স্কুলের ছাত্র হিসেবে তিনি বাংলা স্কুল দলভুক্ত হন (লেখাপড়ায় 'হাতেখড়ি দিল্লীর একটি মন্টেসরীতে এবং পরে গোরক্ষপুরে)। রণজি ট্রফিতে প্রথম খেলেন ১৯৬৫ সালে। বলাবাহুল্য বাংলার হয়ে। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতি, আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা। ওড়িশার বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম ম্যাচে পেলেন আটটি উইকেট। আসামের বিরুদ্ধে সাতটি এবং বিহারের বিরুদ্ধে পেলেন চারটি উইকেট। দলীপ ট্রফিতে ঐ বছরের প্রথম খেলায় রান করলেন চল্লিশ, উইকেট দুটি। রণজির ফাইনালে সুব্রত সেবার পেয়েছিলেন আটটি (৭+১)

উইকেট। জীবনে প্রথম যে বিদেশী দলের বিরুদ্ধে সুব্রত খেলেন, তা হল ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৯৬৬)। হায়দরাবাদে আয়োজিত সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের পয়লা নম্বর বোলার হিসাবে মোট এগারোটি (৪+৭) উইকেট পেলে দেশময় হৈ-হৈ পড়ে যায়। কলকাতায় ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টেস্টে দ্বাদশ ব্যক্তিরূপে তাঁর নির্বাচন নিঃসন্দেহে তারই ফলশ্রুতি। মাদ্রাজ টেস্টেও নির্বাচিত ১৫ জনের মধ্যে তাঁর স্থান হয়েছিল।

সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠার সূত্রে ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলে অনায়াসেই তাঁর স্থান মিলে যায়। কাউন্টি ম্যাচে সারে, ল্যাংকাশায়ার এবং হ্যাম্পশায়ারের বিরুদ্ধে চারটি করে উইকেট পান সুব্রত। এম সি সির বিরুদ্ধে তিনটি এবং ইয়র্কশায়ারের পাঁচ-পাঁচটি উইকেট পান তিনি। লর্ডসের প্রথম টেস্টে কোন উইকেট তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। এর পরই তাঁর হাঁটুতে (কার্টিলেজ) অপারেশন হয়। বলা-বাহুল্য মাস কয়েকের জন্য তিনি অশক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৬৮-৬৯ সালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে দলীপ ট্রফির খেলায় সাতটি উইকেট পান (৪+৩)। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত ১৮১টি উইকেট পেয়েছেন সুব্রত গুহ। ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্টে সব দাঁড়ালেও কানপুর, দিল্লী ও কলকাতা টেস্টে ভারতীয় দল থেকে তিনি বাদ পড়েন নি। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টে দুটি উইকেটও পেয়েছিলেন। ভারত সফরকারী নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টেই অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের তালিকায় সুব্রতর নাম ছিল। এর আগে '৬৮ সালে রণজি ট্রফির খেলায় বিহারের দশটি উইকেট পান তিনি দু ইনিংসে। সেমি-ফাইনালে মহীশূরের সাতটি (৩+৪) উইকেট তো পেয়েছিলেনই তদুপরি ৭৫ রানও করেছিলেন। এক সময় বাংলার ছটি উইকেট পড়ে গিয়েছিল ১২৭ রানে। সপ্তম উইকেট জুটিতে অম্বর রায় এবং সুব্রত রান ১৫৭র কোঠায় টেনে তোলেন। তারপর বল হাতে নিয়ে সুব্রত যখন সংহার মূর্তি ধরলেন, কুড়ি রানে মহীশূরের ২য় ইনিংসের ছটি উইকেট চুরমার হোল ভেঙ্গে, তখন দৃশ্যপটে আবির্ভাব ঘটলো বালখিল্য বাহিনীর। ম্যাচ মাঠেমারা যাওয়ায় দাখিল। ঐ ছটি উইকেটের মধ্যে চারটিই ছিল সুব্রতর।

১৯৬৯-৭০ শেষের দিকে সুব্রতর পক্স হোল। অস্ট্রেলিয়া টুর আর হোল না, হোল না ৭১ সালে ইংল্যান্ড যাওয়াও। ৭০-৭১ সালে রণজি ট্রফির খেলায় রাজস্থানের বিরুদ্ধে জয়পুরে বাংলার সুব্রত পাঁচটি উইকেট পেয়েছিলেন। ৭২-৭৩-এ আসামের বিরুদ্ধে ২৮ রানে ৭টি এবং বিহারের বিরুদ্ধে প্রতি ইনিংসে পাঁচটি করে মোট দশটি উইকেট লাভ করেন। ঐ মরশুমেই জামসেদপুরে এম সি সির বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দলে বোলার হিসেবে চারটি উইকেট পান। সুব্রত একবার ট্রায়াল খেলায় দুশো রান করেছিলেন। উইকেট পেয়েছিলেন ৪টে। সনটা সম্ভবতঃ ১৯৬৫। ঘরোয়া ক্রিকেট লীগে সর্বপ্রথম খেলেন ফ্রেন্ডস এ সিতে তারপর টালিগঞ্জ অগ্রগামী, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মোহনবাগান ঘুরে বর্তমানে ইস্ট-বেঙ্গলে

পারিবারিক জীবনে সুব্রত খুব সুখী। স্ত্রী নীলম গুজরাট-কন্যা। সুব্রত স্টেট ব্যাংকের (পার্ক স্ট্রীট শাখা) অফিসার। স্ত্রীর জার্ণালিজমের দিকে খুব ঝোঁক। বোম্বের ইংরেজী কাগজে নিয়মিত লেখেন। কিন্তু সুখের সাগরে ডুবে থেকেও সুব্রত বোধহয় পরিপূর্ণ সুখী নন। সুখী হতেন যদি এই মুহূর্তে মা-বাবা বেঁচে থাকতেন।

বাবা সুরঞ্জন গুহ এবং মা বিভাবতী সুব্রতের শৈশবেই লোকান্তরিত হয়েছেন। ঢাকা ক্রিমপুরের আদি বাসিন্দা। সুররঞ্জন বাবু ছিলেন মস্ত বড় ক্রীড়ানুরাগী মানুষ. নর্দার্ণ রেলের চীফ একাউন্টস অফিসার এবং পরবর্তী পর্বে ফিনানসিয়াল অ্যাডভাইসার ছিলেন তিনি। ছেলে মেয়ের মধ্যে 'সু' সবচেয়ে ছোট বলে সংসারে আদরও ছিল সবচেয়ে বেশী। আদর এখনও অব্যাহত আছে। পরম স্নেহে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছেন সুব্রতকে তাঁর অগ্রজ সুবিমল গুহ. প্রায় পিতৃস্নেহ।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দমদম বিমানঘাঁটি থেকে বাসযোগে হোটেলে যাবার মুখে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়েরা। বাসের সিটের একধারে অ্যানড্রি রবার্টসকে দেখা যাচ্ছে। পাশেই বসে ল্যান্স গিবস। নাগপুরের খেলা সেরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল সোমবার সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে।

ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ডিভিয়ান রিচার্ডস প্রচণ্ড মারে বেদীর বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়েছেন। রিচার্ডস শেষ পর্যন্ত ১৯২ রান করে অপরাজিত থাকেন।

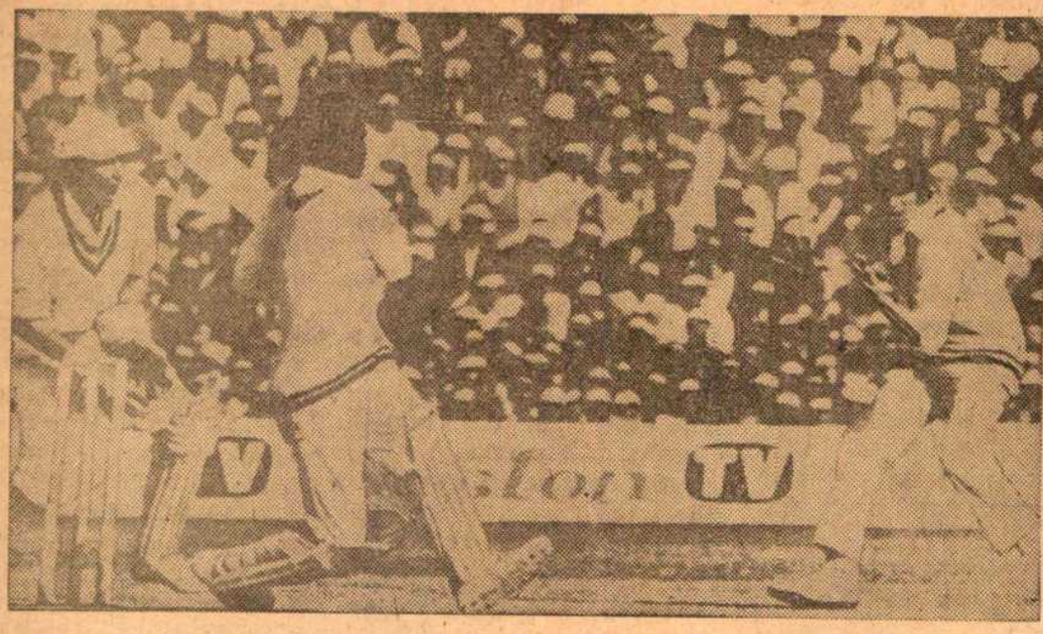

CALCUTTA UNIVERSITY

খেলাধূলা

দর্শক

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও রানে জিতে ২-০ খেলায় এগিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য ভারতের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এই নিয়ে ইনিংস জয়ী হল—ভারতের মাটিতে এবং স্বদেশে ২বার।

লোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারত খেলার সব বিভাগেই—ব্যাটিং বোলিং এবং দল পরিচালনায় শোচনীয় পরিচয় দিয়েছে। খেলায় তাদের কতারও যথেষ্ট অভাব ছিল।

নায়ক মনসুর আলি এবং গাভাস্কার থাকায় দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত হননি। অধিনায়ক ভেঙ্কটরাঘবন টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাট থম সুযোগ পেয়েও ভারত ব্যাটিংয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—প্রথম দিনে নের মাথায় তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটা উইকেট খুইয়ে ৪ রান করেছিল। পার্থসারথি শর্মা তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ৫৪ রান করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৭৮ (৭ উইকেটে)। ফলে তারা ভারতের প্রথম ইনিংসের ২২০ রানের থেকে ১৫৮ রানে এগিয়ে যায়। অধিনায়ক লরেড ৮৭ মিনিট খেলে ৭১ রান করেছিলেন। তাঁর ৭১ রানে ছিল ৬টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার বাউন্ডারী। নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ভিভিয়ান রিচার্ডস ২৩৬ মিনিট খেলে তাঁর ১১৮ রানে ১৪টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার বাউন্ডারী করে এইদিন অপরাজিত ছিলেন।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ৪৯৩ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৭৩ রানে এগিয়ে যায়। ভিভিয়ান রিচার্ডস ১৯২ রান করে শেষপর্যন্ত নটআউট থেকে যান। তাঁর এই ১৯২ রানে ছিল ২০টা বাউন্ডারী এবং ৬টা ওভার-বাউন্ডারী। ৮ম উইকেটের জুটিতে বয়েস এবং রিচার্ডস দলের ১২৪ রান তুলেছিলেন যা ভারতের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ৮ম উইকেট জুটির রেকর্ড রানে পরিণত হয়। পূর্ব রেকর্ড ছিল ৯০ রান (কানহাই এবং ওরেল জামাইকা ১৯৬২)। বয়েস তাঁর ৬৮ রানে ৯টা বাউন্ডারী এবং দুটো ওভার বাউন্ডারী করেছিলেন। রিচার্ডস ভারতীয় স্পিন বোলারদের পিটিয়ে তক্তা করে দিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে খেলার বাকি সময়ে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের পাঁচটা উইকেট খুইয়ে ২৩৯ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলার এই অবস্থায় ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ভারতের আরও ৩৪ রানের প্রয়োজন ছিল। তাদের হাতে দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট জমা ছিল।

চতুর্থ দিনে ৫০ মিনিটের খেলায় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৬ রানের মাথায় পড়ে যায়। এইদিন তারা বাকি পাঁচ উইকেটে মাত্র ১৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে ভারত এক ইনিংস ও ১৭ রানে হেরে যায়। চতুর্থ দিনে ভারতের পাঁচটা উইকেটের মধ্যে প্রবীণ স্পিন বোলার গিবস একাই ৩টে উইকেট নিয়েছিলেন—ওভার ৮ মেডেন ৪ রান ৯ এবং উইকেট ৩। দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় গিবসের বোলিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ওভার ৭০ মেডেন ৩৫ রান ১১৬ এবং উইকেট ৮।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ২২০ রান (সুধীর নায়েক ৪৮ বিশ্বনাথ ৩২ পার্থসারথি শর্মা ৫৪ রান। অ্যান্ডি রবার্টস ৫১ রানে ৩; জুলিয়েন ৩৮ রানে ২; গিবস ৪০ রানে ২ এবং উইলেট ৩০ রানে ২ উইকেট)।
ও ২৫৬ রান (ইঞ্জিনিয়ার ৭৫, বিশ্বনাথ ৩৯ এবং শর্মা ৪৯ রান। গিবস ৭৬ রানে ৬ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৯৩ রান (কালিচরণ ৪৪ রিচার্ডস্ নট আউট ১৯২ লয়েড

মঞ্চের থেকে বলছি

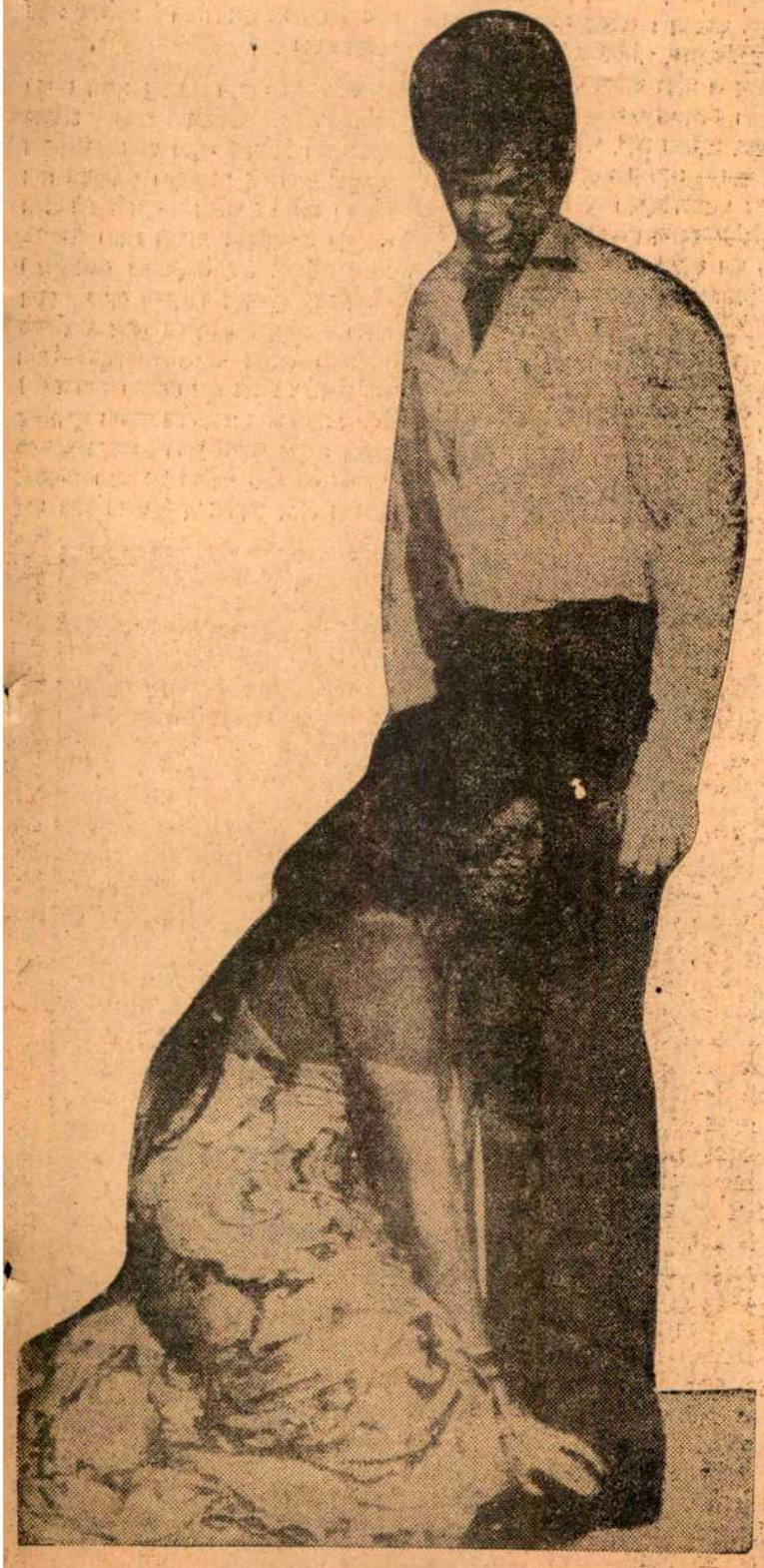

বিদাই / জীতেন্দ্র ও লীলা চন্দ্রভারকর

চারিদিক ঘুরে দেখলাম। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন..দেখে মনে হল, যেন ছুতোর তৈরী কাঠের কুঞ্জবন। দেখলুম, ওরা ঠোকো ঠোকো কেঠো চলে চলেছে, বুকে পিঠে চাপটা। পা ফেলছে খিট্ খুট শব্দে। বোধকরি চৌকুনি নূপুর পরেছে পায়ে, তৈরী সেটা তেঁতুল কাঠে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ!

এই হচ্ছে তাসের দেশ। এখানে রাজপুত্র আর সদাগর পুত্রকে দেখা যাচ্ছে। ওরা এইমাত্র এসে উপস্থিত হয়েছে, এই নতুন দেশে। রাজপুত্রের বক্তব্য হচ্ছে...এক ডাঙ্গা থেকে দিলেন পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ সমুদ্রে, ভেসে উঠলেম আরেক ডাঙ্গায়। এতদিন পর মনে হচ্ছে জীবনের নতুন পর্ব শুরু হল।

রাজপুত্র ঃ ব্যাঙের আরাম এ'দো কুয়োর মধ্যে। এটা বুঝলে না, উঠে এসেছি মরণের তলা থেকে। যম আমাদের ললাটে নতুন জীবনের তিলক পরিয়ে দিলেন।

রাজপুত্রের সব কিছুতেই যেন অবিশ্বাস। তাঁর মনে হচ্ছে এ সবটাই কেমন যেন কাল্পনিক। এটা বানানো। এটা উপর থেকে চাপানো এদের দেশের পণ্ডিতদের হাড়ে-গড়া খোলস। আমরা এসেছি কি করতে—খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপে যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে।

সদাগরপুত্র ঃ আমরা সদাগর মানুষ, যা পষ্ট দেখি তার থেকেই দর যাচাই করি। আর যা দেখতে পাওনা তারই ওপর তোমাদের বিশ্বাস। আচ্ছা, দেখা যাক, ছাইয়ের মধ্য থেকে আগুন বেরোয় কিনা। আমার তো মনে হয়, ফুঁ দিতে দিতে দম ফুরিয়ে যাবে। ঐ দেখো, দেখো না, এই দিকেই আসছে—এ যেন মরা দেহে ভূতের নৃত্য।

কাঠের প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠলে দেখা যায় ঐ আসছে। আসছে তাসের দল। ঠিক এই মুহূর্তে তাসের দলের সেই গান যেন আমার কানে ভেসে আসছে...

তোলোন নামোন
পিছন সমান।
বাঁয়ে ডাইনে
চাইনে চাইনে।
বোসোন ওঠোন
ছড়ান গুটোন।
উল্টো-পাল্টা
ঘূর্ণি চালটা—
বাস্! বাস! বাস!

ব্যাপারটা রীতিমত দেখার মতো। লাল উর্দি, কালো উর্দি, উঠছে পড়ছে, শুচ্ছে বসছে, একেবারে অকারণে। ভারী অদ্ভুত। গুহার সামনে দাঁড়িয়েছিল রাজপুত্র আর সদাগর পুত্র। ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। পেছনে তখন কাঠের তৈরী অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে চারিদিক। প্ল্যাটফরমের নীচের দিকে তাসের দল। ছক্কা পাঞ্জার সঙ্গে রাজপুত্র আর সদাগরপুত্রের বাক্য বিনিময় ইত্যাদি ইত্যাদি। সদাগর পুত্রের হঠাৎ হঠাৎ হাসি দেখে ছক্কা পাঞ্জা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত।...একি ব্যাপার! হাসি!...লজ্জা নেই তোমাদের! হাসি!...নিয়ম মানো না তোমরা। হাসি!

রাজপুত্র : হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু তোমরা যা করছিলে তার অর্থ নেই যে।

ছক্কা : অর্থ? অর্থের কি দরকার। চাই নিয়ম।...

না, ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে ছবি করার কথা ভাবলে অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নিয়ে ছবি করার কথা ভাবা যায় না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক শুধু ব্যতিক্রম নন। সাহসীও বটে। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ যে ফর্মে লেখা আছে সেইভাবে চিত্রনাট্য ভাবা হয় নি। ভাবা হয়েছে অন্যভাবে। সেটা ঠিক এখনই বিস্তারিত করতে চান না শ্রীগুহ। তবে এটা বললেন স্পষ্টই—রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'-এর যে ইন্টারপ্রিটেশান তাই থাকছে। তার থেকে একচুল নড়ার চেষ্টা নেই।

গত সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে এছবির শুটিং শুরু হয়েছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। ফ্লোরে গিয়েছিলাম। একটা বিরাট অংশ জুড়ে 'তাসের দেশ', এক নতুন দেশের সেট নির্মাণ করা হয়েছে। টুকরো ফ্রেম। অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম। মাঝামাঝি দৃশ্যপট আঁকা। প্রধান সহকারী শঙ্কর ভট্টাচার্য আমাকে সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন। উপরোক্ত যে দৃশ্যটি বর্ণনা করা হয়েছে সেটা দেখা গেল। দেখা গেল পরিচালক প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। নতুন শিল্পীদের নিয়ে কাজ করছেন, সুন্দরভাবে ট্যাকল করছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ ছবির চরিত্রগুলি রূপায়িত করছেন যাঁরা তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই নতুন, বড়জোর একটা কি দুটো ছবিতে কাজ করেছেন। যেমন রাজপুত্রের ভূমিকায় সন্তু মুখোপাধ্যায়—সম্প্রতি তপন সিংহের 'রাজা' ছবিতে কাজ করেছেন। সদাগর পুত্র, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, উমাপ্রসাদ মৈত্রের 'জয় বাংলাদেশ' এবং অগ্রদূতের 'সোনার খাঁচা' ছবিতে অভিনয় করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

কে বি চিত্রলক্ষ্মী পিকচার্সের ব্যানারে নির্মীয়মান এই ছবির আলোকচিত্রশিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত। শিল্পনির্দেশক : সুধেন্দু রায়। নৃত্যনির্দেশক : অসিত চট্টোপাধ্যায়। কস্টিউম ডিজাইনার : নিতাই ঘোষ। রূপসজ্জা : অনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনা করবেন : অমিত বসু। এছবির সঙ্গীত পরিচালক, পরিচালক শ্রীগুহ নিজেই। গত মাসে এ ছবির অনেকগুলি গান রেকর্ড করা হয়। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন : ঋতু গুহ, সুমিত্রা সেন, গীতা সেন, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, সুশীল মল্লিক এবং গীত-বিতানের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

ছবিটি তোলা হচ্ছে কলারে। আর্থিক সাহায্য দান করেছেন ভারত সরকারের সংস্থা ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন।

গত ন' তারিখ সকাল সাড়ে ন'টার সময় টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও'র স্কোরিং-এর সামনে দেখি নামী দামী অনেক লোকের মেলা। এগিয়ে যেতেই পরিচালক ইন্দর সেনের সঙ্গে দেখা। তিনি সহাস্যে জানালেন, আজ 'অসময়'-এর শুভসূচনা। গান রেকর্ড করা হবে। কে কে গাইছেন? মান্না দে ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালক কে? আনন্দশঙ্কর। তখনও মান্না দে এসে পৌঁছন নি। সকলের অধীর প্রতীক্ষা চলছে। আমি স্কোরিং-এ প্রবেশ করে দেখি অ্যারেঞ্জার মুলকী ভীষণ ব্যস্ত। কখনও পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান কখনও সেতারবাদকের সামনে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছেন। একসুরে বাঁধার চেষ্টা করছেন। জানা হল নজরুলগীতি। প্রচলিত সুরে গাওয়া হবে।

অভিনেতা স্বরূপ দত্তর সঙ্গে দেখা। তিনি এছবির অন্যতম প্রধান চরিত্রের অভিনেতা। বিমল করের লেখা উপন্যাস 'অসময়' অনেকেই পড়েছেন। 'অবিনকে মনে পড়ছে। হ্যাঁ এই অবিন রূপায়িত করবেন স্বরূপ। 'মোহিনী' অপর্ণা সেন। বলতে গেলে মোহিনী এই উপন্যাসের কেন্দ্রচরিত্র। শচিপতির ভূমিকায় দীপঙ্কর দেকে দেখা যাবে। ইত্যবসরে দীপঙ্কর এসে উপস্থিত হয়েছেন। এলেন বসন্ত চৌধুরী—তিনি জ্যাঠামশাইর চরিত্রে রূপ দেবেন। আরেকটি বিশেষ নারী চরিত্র 'আয়না'র ভূমিকা রূপায়িত করবে মহুয়া রায়চৌধুরী। মহুয়া আসতে পারেনি ওর টেস্ট পরীক্ষা চলছে। একটু বিলম্বে এসে পৌঁছলেন ছবির অন্য দুই

অপরী ভানু / বিনোদ খান্না

সেই চোখের সেটে / উত্তম/বাসবী। ফটো : অমৃত

তাসের দেশ / উজ্জ্বল সেনগুপ্ত / শন্তু মুখার্জি

[illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] : [illegible]

নির্বাচিত শিল্পী কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় এবং চিন্ময় রায়।

আপনজন চিত্রমের এই প্রথম চলচ্চিত্র 'অসময়'। এর শুটিং কবে থেকে। ইন্দর, মোটামুটি একটা পরিকল্পনা জানালেন। জানুয়ারী মাসেই শুরু করব। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী কলকাতায় ইনডোর-আউটডোর চলবে। মার্চ মাসে একটানা বেশ কিছুদিন আউটডোর শুটিং করার ইচ্ছে আছে। লোকেশন এখনও ফিকস-আপ করা হয় নি।.....

এ ছবি নির্মিত হতে চলেছে ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের আর্থিক সহযোগিতায়। যেমন হয়েছে 'কোরাস'...।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

দক্ষিণ শহরতলীতে একটি কারখানায়, সম্প্রতি পরিচালক স্বদেশ সরকার তাঁর নতুন ছবি 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ'-এর দৃশ্যগ্রহণ করলেন। এই হচ্ছে প্রথম পর্যায়ের দৃশ্যগ্রহণ। অংশগ্রহণ করলেন, শিল্পীদের মধ্যে—দীপঙ্কর দে এবং অনুপকুমার। ক্যামেরায় : কৃষ্ণ চক্রবর্তী। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এই ছবির নায়কদ্বয় হলেন সন্ধ্যা রায় এবং আরতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : রবি ঘোষ, চিন্ময় রায় এবং উৎপল দত্ত। ইতিমধ্যে কয়েকখানা গান রেকর্ড করা হয়েছে। সঙ্গীত-পরিচালক : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌতম কথাচিত্রমের পতাকা তলে নতুন ছবি 'বৈশাখী ঝড়'-এর শুটিং আরম্ভ হয়েছে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভএ। রাজকুমার মৈত্রের কাহিনী অবলম্বনে অধীর ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন নাবিক গোষ্ঠী। ছবির নায়ক : দীপঙ্কর দে। নায়িকা : রাজশ্রী বসু। প্রযোজনা : শ্রীদেব রায়।

জুপিটার প্রোডাকসন্সের প্রথম চলচ্চিত্র প্রয়াস 'ফুলশয্যা'। কাহিনী : তুপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য-পরিচালনা : সারথী। চিত্রগ্রহণ : বিজয় দে। শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র। সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়। চলতি সপ্তাহ থেকে শুটিং শুরু হয়েছে। চলবে একটানা সাতাশদিন। বেশীর ভাগ অংশ তোলা হবে স্টুডিওর বাইরে। প্রথম দুদিন শুটিং হয় লাউডন স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। আনন্দবেদনার এই ছবি। [illegible] : [illegible] নায়িকা : সাবিত্রী চট্টো-

ধর্মপত্নী / হেমামালিনী / ফিরোজ খান

পাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় : অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, অনুপকুমার, অসীমকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলকা গাঙ্গুলী, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরেন রায়চৌধুরী বাবলু সমাদ্দার প্রভৃতি। একটি বিশেষ ভূমিকায় : মাধবী মুখোপাধ্যায়। সুর-সংযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন : অসীমা ভট্টাচার্য।

অনতিবিলম্বে আরো একটি নতুন ছবি শুরু হচ্ছে। 'কামনার সুখ দুঃখ'। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা এই নামে বই উপন্যাস অবলম্বনে মঙ্গল চক্রবর্তীর চিত্রনাট্যে পরিচালনা করতে উদ্যোগী হয়েছেন রতীশ সরকার। ইনি মঙ্গলবাবুরই সুযোগ্য সহকারী। এটি তাঁর প্রথম স্বাধীন চিত্রপরিকল্পনা। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে এই ছবির প্রধান তিনটি চরিত্র রূপায়িত করবেন : দীপংকর দে, আরতি ভট্টাচার্য এবং সোমা দে।

ইন্দর সেনের পরিচালনায় আরো একটি ছবি শুরু হবে খুব শিগ্‌গিরই। 'লাল তারাই'। শ্রীপৃথ্বীরাজের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক নিজে। চা-বাগানের পট-ভূমিকায় দৃশ্য বিস্তার করা হয়েছে। প্রধান চরিত্রে রূপ দেবেন শমিত ভঞ্জ। বিশে ডিসেম্বর শুভ সূচনা হয়েছে, সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে। গান রেকর্ড করা হয়েছে। সংগীতপরিচালক দিলীপ রায়। গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠ দেবেন : মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, হৈমন্তী শুক্লা এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ইউনাইটেড মিশনের প্রথম নিবেদন 'ময়না' ফ্লোরে আসতে বেশী দেরী নেই। প্রস্তুতি চলছে। কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় এই মর্মে জানিয়েছেন। ছবির নামভূমিকা রূপায়িত করবেন : সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। নায়ক কে তা এখনো স্থির হয়নি। গান রেকর্ড করা হয়েছে, দু' খানা। সুরারোপ করেছেন : অনুপম মুখোপাধ্যায়। গেয়েছেন : আরতি মুখোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ রায়ের আগামী ছবি কি? এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেল রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' চিত্রায়িত করবেন। এ ছবির নায়িকা চরিত্র রূপায়ণের জন্য নতুন মুখ নেবেন। গত সপ্তাহে কয়েকজনের টেস্ট নেওয়া হয়েছে। ফলাফল এখনো জানা যায় নি।

তপন সিংহ মহাশয় তাঁর আগামী ছবি স্থির করে ফেলেছেন। 'হারমোনিয়াম'। মিউজিকাল কমেডি করার ইচ্ছে তাঁর। স্বরচিত কাহিনী এবং চিত্রনাট্য। ছবির ভূমিকালিপিতে চেনা-অচেনা মুখের সমাবেশ ঘটবে। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সংগীতগ্রহণের মাধ্যমে এ ছবির শুভ সূচনা হবে।

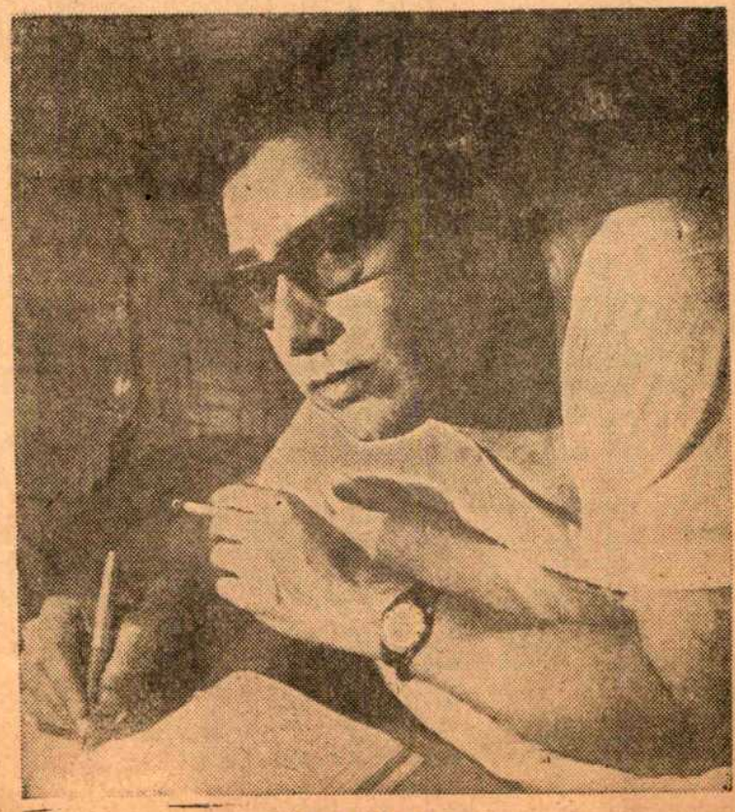

ছুটির ঘন্টা / দিলীপ রায়

সত্যজিৎ রায়ের রঙীন ছবি
সোনার কেল্লা
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

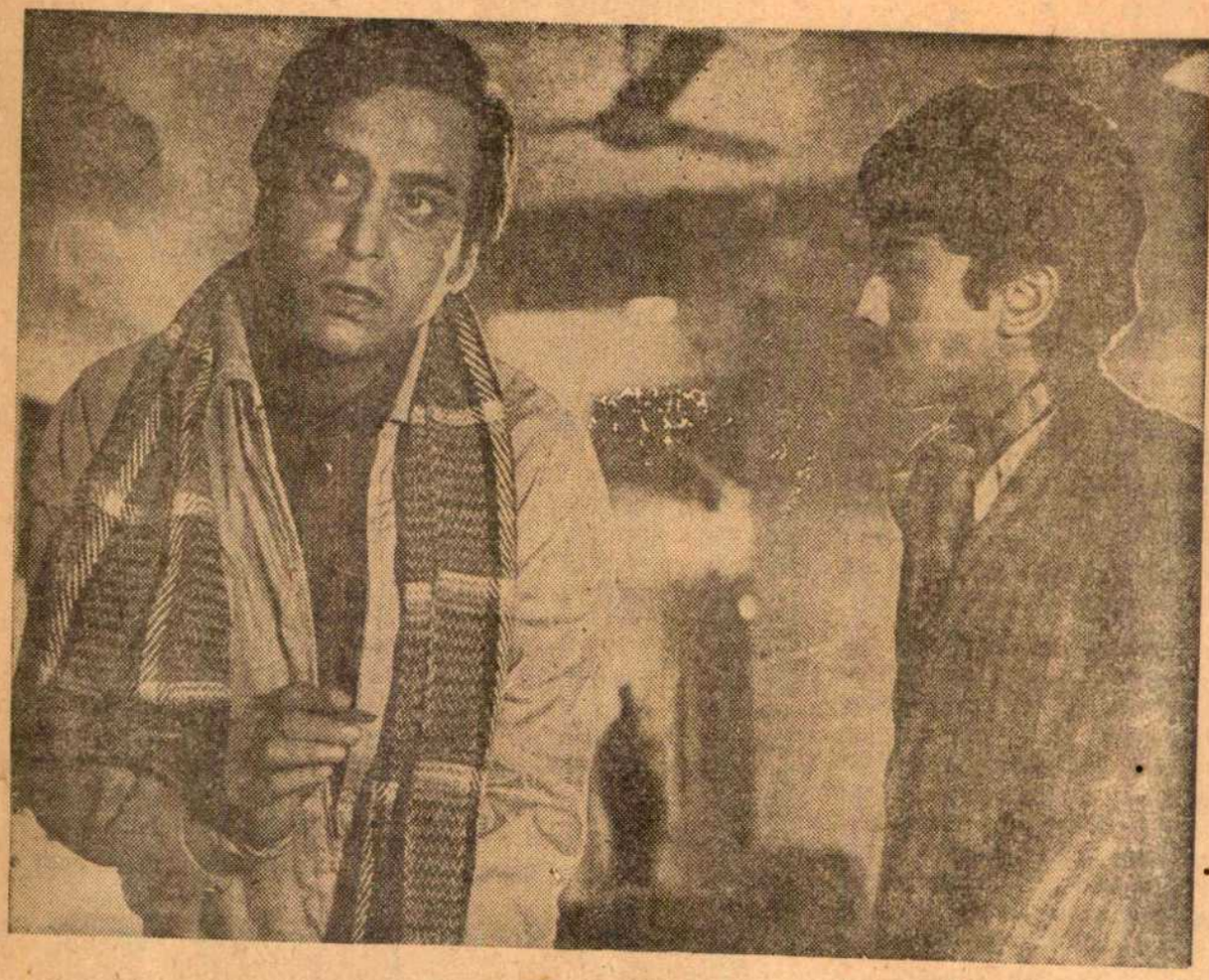

বায়োস্কোপিক

আমি আর সুকুমার, আমরা এই দুজন দাঁড়িয়ে আছি সেই সকাল সাতটা থেকে। সুকুমার তার ক্যামেরা নিয়ে, ভাবখানা যেন সে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, দাঁড়িয়ে পরপর দুটি সিগ্রেট পোড়াল। শীতের সকাল, সুকুমার গলায় ঠিকই কম্ফোর্টার জড়িয়ে রেখেছে, বায়োস্কোপের কাভারেজ বলে এমন স্বদেশী কম্মো তো কিছু নয়, ঠান্ডা লাগলেই গলা খুকখুক, তখন অ্যান্টিবায়োটিক টেনে টেনে ধুন্ধুমার, বরং সে বড়ই অস্বস্তিকর, অতএব...

টালিগঞ্জে অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে, নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর মাথায় গোটা রাত ধরে যে হিম ঝরে পড়েছিল, এখন রোদ্দুরে যত উষ্ণ হবে আকাশের হাতছানিতে সে হিম বাষ্পের আকারে ঊর্ধ্বগামী, যেন ডানা মেলা পাখীর মত মহাশূন্যে গা ভাসাবে। এরই মধ্যে সংসার সীমান্তের বায়োস্কোপের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সূচনা। স্টুডিওর ফটক ডিঙিয়ে একে একে সব গাড়ি ঢুকছে, আর তা থেকে নামছেন ছবির কলাকুশলী আর শিল্পীরা। উবু হয়ে রোদ পোয়াতে বসা দ্বারোয়ানরা শরীরের আলস্য ঝেড়ে, তীর বেগে ঠেলে উঠে, স্যালুট ঠুকে ঠুকে আবারো রোদে গা এলিয়ে...এই হচ্ছে ব্যাপার।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে মিডিল-টোন; ছবিতে মিডিল-টোন না থাকলে রস থাকে না, রূপটা কোন গতিকে টিকে থাকে মাত্র। বায়োস্কোপের বড় ভাই মিডিল-টোন। ওটা রাখুন, সব বজায় রইল, কিন্তু ওটা ফেলে দিন দেখবেন চকচকে ভাবটা অন্তর্হিত। খাঁটি কথা। সংসার সীমান্তে দাঁড়িয়ে আমার ভাবনা এখন মিডিল-টোন নিয়ে।

এই যে গল্পটা ফেঁদেছিলেন একজন কবি-কথাকার, কি আশ্চর্য, মাঝখানে কতগুলো বছর চলে গেল, পৃথিবী থেকে অনেকগুলো রকেট উঠে চাঁদের বুকে মানুষ নামা-ওঠা করিয়ে আবার ফিরে এল, গল্পটি কিন্তু অম্লানই রয়ে গেল এই যে এই মুহূর্ত পর্যন্ত, এই যে এখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি—এই অনুপল পর্যন্ত। যে-যার সীমান্তে এখনও আমরা প্রতিপক্ষের দিকে, যেন রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সোনালি কোন স্বপ্ন দেখার প্রত্যাশায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র কি-জানি কি ভেবেছিলেন, একজন বেউশ্যে, আর এক ব্যাটা চোর, ত্রিভুবনে ওদের অস্তিত্বের খাতিরে কবি মানুষ কত মমতার সঙ্গে এমন সব লিখলেন যে এখনও, বিড়ম্বিত ভাগ্য আমি, আমরা ঈর্ষার সঙ্গে ভাবি—আসলে আমিই অঘোর, সামাজিক ছক্কা-পাঞ্জায় আমি এক ঠেঁটো চোর, অহর্নিশি মালের সন্ধানে কলকাতার গলিতে-গলিতে ঘুরপাক খাই—ওটা উনি নিশ্চিত আমাকে ভেবেই সেদিন লিখেছিলেন। অঘোরের কত প্রেস্টিজ, শেষ পর্যন্ত সিনেমার পর্দায় এসে গেল, কত তরিবৎ আদর আপ্যায়ন করে বেউশ্যে রজনী আর ছিঁচকে চোর অঘোরকে

সেলুলয়েডে এনে ফেলা হচ্ছে, অতএব হরিপদ কেরানী আর নয়—অঘোর চোর হওয়াই ভাল। ন্যাঃ, ভাল আর কি আপদ-মস্তক হয়েই আছি যে!

—কী? সুকুমার সপ্রশ্নে ভ্রূ-ভঙ্গী করল—কি বিড়বিড় করছ?

রঞ্জনের খ্যাক খ্যাক হাসি, শালা যেন ধূর্ত এবং ফচকে শেয়াল, বললে—নিজের ফিউচার ভেবে ইয়ে করছিলাম। চল, চা খাওয়া যাক। খাবে?

—নাঃ, এখন না, পরে। সুকুমার নিজের ক্যামেরার লেন্সে যেন নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখছে।

—আচ্ছা সুকুমার, তোমরা তো ফটো তোলো, ছবির মিডল-টোন গায়েব হয়ে গেলে ইমেজটা কিরকম দাঁড়ায়?

সুকুমার অবাক। ভাবখানা, প্রাতঃকালে বায়োস্কোপের খবর করতে এসে রঞ্জনের শালা যন্ত্র বাজে হেঁয়ালী। এখন টোন নিয়ে পড়ছে, কিছু পরে দু'পাঁচটা ট্যাকা হাওলাত চাইবে। একেবারে নিশ্চিত। সুকুমার বিষম বিরক্ত হওয়ার ভঙ্গী করে বলল—ওসব এখন থাক।

তবে থাক। আমার বয়েই গেছে। তুমি চিরকাল লেন্স, ফোক্যাস আর অ্যাপারচার নিয়েই থাকো। দুনিয়ার প্রেস ফটোগ্রাফাররা সবাই এক নয়, কিন্তু আমি আর আমরা কয়েকজন এক। ভাওয়াল সন্ন্যাসী আর অঘোর—আমার কাছে সবই এক কিস্তির মাল। ইতালীতে জন্মালে মিকেলেঞ্জোলো আন্তনিয়ানি হয়ত আমিই হতাম, কলকাতায় জন্মে অপরাধ। প্রকৃত অঘোর হয়েও সেই হরিপদ হয়ে আছি। কেন? ব্যাটা শ্লাই ফক্স। কিছুতেই জীবনের মিডিল-টোন নিয়ে বাক্য বলবে না। আসলে ভয়ের চোটে অস্থির; বলে যদি ফ্যাসাদ হয়! আরে কত ফ্যাসাদ হবে? যে সমাজে এখন আছি, এটা কি? বানান ভুল হল? মরুক গে। আদি-গঙ্গার ধারে বেউশ্যে পাড়ায় ওই জিনিসটি কিন্তু নেই। অর্থাৎ মিডিল-টোন। চোরের আবার, বেশ্যার আবার জীবন, তায় মিডিল-টোন। যত ফালতু কথা। বেড়েক ভাই, বেড়েক ভাই, লম্পট চেলাইটানা বদমায়েস যেন কাপ্তেনটি সবাই। অথচ বাস্তবে দেখ, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী চাপিয়ে তাতে ইন্টিমেট ঢেলে গন্ধে মো মো করে আমরা, না না, আমরা নই, বাবুরা সবাই আদি-গঙ্গার জলে তরতাজা রুপোলী ইলিশ মাছ দর করছে। ছবি তোলো সুকুমার, তোমার ক্যামেরা বর্তে যাবে হে.....

স্টুডিওতে কার মাথায় বেশি কাজ ইয়ে করে দিয়ে গেছে, তাই নিয়ে কত হাসাহাসি। প্রাতঃকালে একি কাণ্ড! একজন ছুটে গেল মেকআপ ঘরের দিকে। দু-তিনজন রূপ-কার, তারা খেটে খেটে হয়রান। প্রথমে একগাদা মেয়ের মেকআপ, তারও পর রয়েছে নায়ক নায়িকা। সাত সকালে ক্যান্টিনে আঁচ পড়েছে, চা আর কফির কাপ হাতে হাতে ঘুরছে,

রাগ-অনুরাগ : রঞ্জিৎ মল্লিক / অপর্ণা সেন

সবাই এক লহমায় উষ্ণ হতে চায়, শীতের জড়তা কাটিয়ে টান টান শরীরে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, কিন্তু সব চাইলেই কি আর পাওয়া যায়?

অথচ মাত্র কয়েকটা দিন আগে পর্যন্ত, এখন আপাতত যেখানে কালিঘাটের সেই বারবনিতাদের বস্তিটা, প্রধানত খোলার চালে ছাওয়া, আচমকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ওটা আগাছা জঙ্গলে ভরা স্টুডিওরই একটা মাঠ ছিল। কার্পেন্ট্রি বিভাগের কর্মীরা করাত আর বাটালি দিয়ে কাঠের কাজ করত আর হ্যাঁ পাখীরা জঙ্গলের গাছ-গাছালির ডালে শীতের সকালে কিছু না কিছু রোদ পুইয়ে হুস হুস খাদ্যের সন্ধানে টালা থেকে টালিগঞ্জের আকাশে উড়ত—সে মাঠের কি বিচিত্র রূপান্তর। একদিন আমি ওখানে গিয়ে অবাক। আরে বাহ্, তরুণ মজুমদার তাঁর সহকর্মী-দের নিয়ে, দেখি, ওখানে দাঁড়িয়ে। পাশে শিল্প-নির্দেশক উঃ, রবি চাটুজ্যে, সবাই শলা-পরামর্শ করে সংসার সীমান্ত বায়োস্কোপের সেট তৈরী করছেন। এখানে রজনী থাকবে। আর ব্যাটা চোর অঘোর চুরির দায়ে একদিন পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে পালাতে ঠেলে উঠবি তো ওঠ, সটান রজনীরই ঘরে—এই মাগী, টুঁ শব্দ করবি তো পেট একদম ফাঁসিয়ে দেব।

আতঙ্কে রজনীর চোখ দুটি স্থির।

অভিনেতা [illegible] / রঞ্জশ্রী বসু।
পরিচালনা [illegible]।

চোরের হাতে ধারাল লম্বা একটা ছুরি; লম্ফর কাঁপা কাঁপা আলোয় সেটা ঝিলিক হানছে।

ব্যস! যাকে বলে জীবনের মিডিল-টোন, সেলুলয়েডের ফিতেয় মিনিটে নব্বুই ফুট ছাপ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলতেই থাকল।

সাদা অ্যাম্বাসেডর গাড়িটা দৌড়ে এসে ঝুপ করে ব্রেক কষে স্থির হয়ে দাঁড়াল স্টুডিওর লনে। নামলেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি। কব্জি উল্টে কে যেন ঘড়ি দেখলেন। কাটা মিলিয়ে সৌমিত্র এসেছেন শট্ দিতে, প্রসন্ন মুখে। গাড়ি এক্ষুনি ফেরৎ যাবে। গিয়ে ওঁর ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পৌঁছাবে। প্রোডাকশন চীফ দিলীপ ব্যানার্জি, আদতে একজন পাক্কা মাউন্টেনীয়ার, শক্ত পায়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন, সৌমিত্র চ্যাটার্জিকে মৃদু হাসিতে অভ্যর্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ বৌ করে একজন দৌড়ে গেল, এক পেয়ালা গরম কফি চাই.....

সৌমিত্র পাক্কা দেড় ঘন্টা নিলেন। মুখে রং চাপড়ালেই অভিনেতা হওয়া যায় না, অঘোরের রূপসজ্জা নিতে দেড় ঘন্টা সময় লেগেই থাকে, কি করা!

আসল খেলাটা তরুণবাবুর। এটা যদি বায়োস্কোপের গল্প হয়, এই সংসার সীমান্ত, বাবারে, কত হ্যাপা এই কাহিনীতে। সাবেক ব্যাপারটা স্মরণ হয় এখন আমার। কত তাবড় পরিচালক এই গল্পের ওপর কাজ করেছেন। ঋত্বিক ঘটক, রাজেন তরফদার ছাড়া আরও কতিপয়। ঋত্বিক ঘটকের মুখে একদিন এর স্ক্রীন-প্লে শুনেছিলাম, আরিপ্‌বাপ্‌, শুনে আমার চক্ষুস্থির, এটার নাম বায়োস্কোপ? রাস্টিক, ছন্নছাড়া, বাউন্ডুলে ফেরেব্বাজ অঘোর শালা স্বপ্ন দেখে—রজনীকে বে করে ব্যাটা গেরস্থ হয়েছে, স্বপ্নবৃত্তান্ত আগুনের হুল্কার মধ্যে গুরপাক খেতে খেতে মেলে আকাশমুখো, আমি চেয়ার উল্টে মাটিতে পড়ে যাই আর কি।

অথচ তরুণ মজুমদার বায়োস্কোপে কত মিষ্টি মধুর কিশোর প্রাণের প্রেম-প্রণয়ের গল্প বলেন, আহা, আর সেই মানুষটি যাহা সংসার সীমান্তে হেঁটে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন, আমার কি ধন্দ! বুকের পাটা নিশ্চিত ইয়াব্বড়, নইলে এ-গল্পে ছবি করা আর আঙুলে বে-মক্কা রক্তমুখী নীলা ধারণ সে প্রায় একই ব্যাপার।

অঞ্জনী / জীনিং আমন / পরিচালনা : শক্তি সামন্ত

তরুণ মজুমদার চিত্রনাট্য লিখে-টিখে প্রায়ই যেতেন কালিঘাটের ওই বেউশ্যে পল্লীতে। নিপাট ভদ্দরলোক, হুট হুট গাড়ি থেকে নেমে গলিতে ঢুকতেই পল্লী-বাসিনীদের মধ্যে কি দারুণ কমোশান—এটা কে-রে বাপ্? পুলিশ নয় তো? দেখ দিকি লোকটি কার ঘরে সেঁধুল? মতলবটা কি?

একদিন তরুণবাবু গল্প করছিলেন, বুঝলেন, ওখানে যাওয়াটা মানে জিনিসটা ভালভাবে বুঝে নেবার দরকার ছিল। গোড়ার দিকে ওরা খুব সন্দেহের নজরে দেখত, আমি, আমার সহকারী মিলে একদল মানুষ, ওদের ঘাবড়ে যাবারই কথা। সমাজে ওরা শুধু বঞ্চনার দিকটাই দেখেছে, ওরা প্রতারিত, পরে ওদের সে ভয়টা ভাঙল আমরা বুঝিয়ে বললাম গল্পের দিকটা, ছবির ব্যাপারটা, বলা বাহুল্য ওরা খুশী। তারপর থেকে সবরকম সহযোগিতা পাওয়া গেছে ওদের কাছ থেকে। এইভাবে প্রাঘমের সেই হার্ডলটা আমি, আমরা উত্তীর্ণ হয়ে গেছি.....

সেট সাজানো হচ্ছিল। তরুণ মজুমদার দাঁড়িয়ে তদারক করছিলেন। বস্তির উঠোনে স্তূপীকৃত জিনিসপত্র। মেয়েরা একদল। তরুণবাবু বলেছিলেন, আপনারা যে-ঘর হর পছন্দ করে নিন। তারপর সাজিয়ে ফেলুন নিজের পছন্দমাফিক।

পদ্ম গোলাপী বসন-যাইহোক এঁরা শিল্পী কেবল বায়োস্কোপের বারবনিতা সাজা অর্থাৎ প্রিটেন্ড করা, ন্যায্যভাবে প্রিটেন্ড করতে পারলে অভিনেতা একদিন শিল্পী হয়ে যান—এটাই তো থিয়োরী, তাও আবার সজ্ঞানে। দেখি মেয়েরা শাড়ী গাছকোমর বেঁধে নিজের নিজের ঘর সাজাচ্ছেন সযত্নে। হল পরিপাটি বিছানা। দেয়ালে পারা খসা আয়না ঠাকুর দেবতার ছবি। খানকতক এরোটিক ছবি। সস্তার স্নো পাউডার আলতার শিশি শাড়ি তা

নাট্যমঞ্চ

ব্রেখটের ভালোমানুষ

বেরটোল্ট ব্রেখটের নাট্যসাহিত্য কি তার নাটকের অভিনয় বাংলাদেশে নতুন নয়। তবু তার নাটকের বাস্তব পরিবেশন আমাদের নতুন করে উদ্দীপিত যে করে, নান্দীকারের ভালোমানুষ দেখে সে কথা আবার নতুন করে মনে হোল।

বিদেশী নাটক ভাষান্তরিত করে এদেশের মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে পরিবেশন করা খুবই দুরূহ কাজ সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তার কুশীলবকে একেবারে আমাদের নিত্যদিনের দেখা চেনা মানুষের পোষাকে, ভাবনায়, মানসিক গঠনে সাজিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে, আমাদের তাদের সঙ্গে একাত্ম করে দেবার চেষ্টা করা এবং তা অনেকাংশে সার্থক করে তোলা ব্যাপারটা বড় কম কথা নয়।

এব্যাপারে অর্থাৎ নাটকের বাংলা রূপান্তর, গীতিরচনা ও তার নির্দেশনার ব্যাপারে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকাংশে সার্থক। বিশেষ করে এর রূপান্তরে। যেখানে ব্রেখট উপস্থিত, কিন্তু তার চরিত্ররা স্বরূপে উপস্থিত নন, অথচ অজিতেশবাবু তাদের আশ্চর্যভাবে বাঙালী করে উপস্থাপিত করেছেন।

সাধারণত মানুষ সৎ থেকে জীবন-যাপন করতেই চায়। নিরীহ, পরের প্রতি সহানুভূতিশীল সাদামাটাভাবে উদার এমন মানুষকেই আমরা ভালোমানুষ বলে থাকি। কিন্তু স্বার্থ ছাড়া নিরঙ্কুশ ভালোমানুষ কি সত্যি সম্ভব? বোধহয়—না। মানুষ দোষে গুণে জড়িয়ে। তাই স্বার্থ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ এসবও তার নিত্যসঙ্গী। এর থেকে পুরোপুরি কোন মানুষেরই উত্তরণ সম্ভব নয়।

আবার অতি ভালোমানুষ থাকাও সম্ভব নয়। প্রয়োজনে তাকে কঠোর হতে হয়।

ভালোমানুষের নায়িকা বেশ্যাও প্রথমে সৎ, পরের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতে চেয়েছিল তার ঘৃণ্য পেশা ছেড়ে। কিন্তু চেনা অচেনা, আত্মীয় অনাত্মীয় কেউই তাকে তা থাকতে দেয় নি। ফলে তাকে বাধ্য হয়েই এক সময় দ্বিতীয় রিপুর আশ্রয় নিয়ে অন্যদের শোষণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কঠোর হতে হয়েছিল। কিন্তু সমাজ কি তা মেনে নেয়?

মূল নাটকের স্রষ্টা ব্রেখট সমস্ত নাটকেই প্রচ্ছন্নভাবে রূপকের ভাষায় তার ইঙ্গিত রেখে গেছেন। সেটাকে ব্যঙ্গ বলেও ধরে নেওয়া চলে।

আর এটাই তার স্বকীয়তা। এখানেই তিনি অন্য নাট্যকারদের থেকে [illegible]

ভালোমানুষ নাটকের কয়েকটি চরিত্রে সুধীন মুখোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, পশুপতি বসু এবং দীপালি চক্রবর্তী

অভিনয়ে দর্শককে আগাগোড়া যিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন তিনি এ নাটকের কেন্দ্রবিন্দু কেয়া চক্রবর্তী অভিনীত দ্বৈত চরিত্রটি। কোনও অভিনেত্রীর পক্ষে পাশাপাশি দুটি চরিত্র—নারী এবং পুরুষ, কোমল এবং রুক্ষ—সমান গুরুত্বে ফুটিয়ে তোলা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। বিশেষ করে স্ফটিত কণ্ঠস্বর ও মেজাজ পাল্টে কয়েকটি দৃশ্যে অভিনয় আমাদের নির্বাক করে রেখেছে। আর সেই অভিনয় নাটকের শেষ পর্যায়ে (যখন শান্তার দেহে মাতৃত্ব পরিস্ফুট, লোকের চোখে সে সন্দেহের পাত্র—সেই সময়কার হঠাৎ পরিবর্তন, কণ্ঠস্বর পাল্টে নারী বা পুরুষ হওয়া কি অন্তরালে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়া) যেন দর্শককে নাটকের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলে। শুধু মনে হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠে একটু অতি নাটকীয় করে ফেলেছেন তিনি অভিনীত চরিত্রটিকে। 'কমার্শিয়াল' নামক [illegible] এক্ষেত্রে প্রযুক্ত বা প্রতিবন্ধক না হলে এসম্পর্কে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই।

দ্বিতীয় ভালো লাগা চরিত্র রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। এমন স্বচ্ছন্দ অভিনয় স্টেজে

রবিরশ্মি

রবীন্দ্র সংগীতের চার বৎসরের পাঠক্রম **সাগর সেনের** তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী সহযোগে স্বরসাধন। স্বরলিপি লিখন/পঠন বিভিন্ন পর্যায়ের /ঢংয়ের নির্বাচিত রবীন্দ্র সংগীতের বিশেষ গায়ন পদ্ধতি যত্নসহকারে শেখানো হয়। ছোট ছেলে/মেয়েদের জন্য শিশু বিভাগ।

শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারী থেকে শুরু
যোগাযোগ ননী উপাধ্যায় সম্পাদক
৪৯নং মহানির্বাণ রোড কলিঃ-২৯
বুধ/শনি (বিকাল) ও রবিবার (সকালে)

সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষ করে নেচে গান গাওয়ার দৃশ্যটি।

আর মুগ্ধ করেছে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। ছোট্ট, প্রায় গুরুত্বলুপ্ত চরিত্র। কিন্তু নির্বিকার ভালোমানুষের মত তিনি তাকে সারাক্ষণ মঞ্চে উপস্থাপিত করে গেছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—যাঁরা এ নাটকের বলা যায় ব্যালেন্স, তাঁদের অভিনয় স্বচ্ছন্দ। তাঁদের কস্টুম ও চেহারা অনুযায়ী চরিত্র রূপায়ণ দর্শনীয়।

অন্যান্য টাইপ চরিত্রগুলি কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ফলে নাটকের সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে, বস্তুত নাটকের অপরিহার্য অঙ্গই হয়ে গেছেন। এতগুলি বিচ্ছিন্ন চরিত্রকে এমনভাবে গ্রথিত করা নির্দেশকের মুন্সিয়ানারই পরিচায়ক। তবে এতগুলি চরিত্রের কখনও কখনও একত্র সন্নিবেশের ক্ষেত্রে একটু যেন জট পাকিয়ে গেছে। ক্ষেত্রবিশেষে আবার এঁদের প্রতীকীতে চিহ্নিত হয়ে ফ্রিজ হয়ে যাওয়া দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ছোট্ট একটি চরিত্রে পুলিশ আনন্দ চক্রবর্তী চরিত্রটি একটু বাড়াবাড়ি ও ব্যঙ্গাত্মক হলেও আনন্দ দিয়েছে।

গানগুলির কথা এবং তার গ্রন্থি বিস্মিত হয়ে শুনবার মত। বিশেষ করে 'জল নেবে?' এবং আটটি ঘোড়ার গান। কিন্তু সুর এবং পরিবেশনের দিক থেকে আশ্চর্য করেছেন কেয়া চক্রবর্তী তাঁর 'আমি যখন মেয়ে থাকি' গানটিতে।

তবে গানগুলি একটু দীর্ঘ এবং একটানা হওয়াতে (তার ওপর বড় বেশী রিপিটেশন) একটু ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। ফলে এবং নাটকের কতকগুলি ক্ষেত্রে কিঞ্চিদধিক সংলাপ ও দৃশ্য দীর্ঘায়িত হওয়াতে নাটকের কম্প্যাক্টনেস রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়েছে বলে বিশ্বাস। ঠিক যেন এক নিশ্বাসে দেখতে পারলুম না বলে একটু খেদ মনের কোথায় রয়ে যায়।

তবু এই নাটক, এই 'ভালোমানুষ'এর সামগ্রিকভাবে পরিবেশন, এর বক্তব্যের গভীরতা বা ইঙ্গিতময়তা অনুপ্রাণিত করে, একথা অকপটে বলা যায়।

বৃহত্তর দর্শককে এ নাটক আনন্দ এবং ভাবনার খোরাক দিতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই।

রূপসজ্জা (শক্তি সেন) এবং নেপথ্য সংগীত (আনন্দ শঙ্কর) নাটকের পক্ষে সহায়ক। শম্ভু ভট্টাচার্যের নৃত্য পরিকল্পনায় পুনরাবৃত্তি থাকলেও অভিনবত্ব আছে।

নাটকের শেষাংশ যেখানে এনে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, সেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্যের পরের দৃশ্যে নাট্যকার অজিতেশবাবু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ব্রেখটের মত তিনিও এই নাটকের সঠিক কি পরিণতি হবে বা হওয়া উচিত বলতে পারছেন না। অর্থাৎ বাকিটুকু তিনি দর্শকদের বিচারবোধ এবং মানসিকতার ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

আমার মনে হয়, এই ভূমিকাটুকুর কোন অবকাশ ছিল না। কারণ অনিবার্য পরিণতির পর সহজাতভাবেই দর্শকদের মনে পরবর্তী দৃশ্য বা অদৃশ্য ঘটনা গড়ে ওঠে।

কলকাতায় হিন্দী নাট্যোৎসব

কলকাতার সুখ্যাত নাট্যসংস্থা অনামিকার উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর '৭৪ পর্যন্ত কলামন্দিরে এক হিন্দী নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এতে কলকাতার দল ছাড়াও দিল্লী, বারাণসী, জয়পুর ইত্যাদি স্থান থেকে সুখ্যাত নাট্যদল যোগদান করবেন।

হিন্দী নাটক পরিবেশন ছাড়াও উৎসবের বিভিন্ন দিনে এঁরা নাটকের ওপর বিশেষ আলোচনা সভারও ব্যবস্থা করেছেন। এতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সুখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক, সমালোচক অংশ গ্রহণ করবেন।

ভ্রমর থিয়েটার ফোরামের নাট্যসাহিত্য সম্মেলন

গত ৮ই ডিসেম্বর স্টুডেন্টস হল, কলিকাতায় ভ্রমর থিয়েটার ফোরামের ১ম বার্ষিক নাট্যসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। স্বাগতম জানান শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক - সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রধান অতিথি নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত 'নাটক কি ও কেন?' এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। সুদীপ্ত বসু সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে রূপমঞ্চ সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় নাট্যশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ দেন। অধ্যাপক শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য দৃশ্যকাব্যের উপেক্ষিত অংশ প্রহসন নিয়ে আলোচনা করেন। সবশেষে মূল সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর সভাপতির ভাষণে প্রত্যেকের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রাক্তন ফোরাম সভাপতি শ্রীঅমলশঙ্কর রায়।

এ সপ্তাহের ছবি

মজবুর : সুচিত্রা নিবেদিত 'মজবুর' ছবিটি ২৭শে ডিসেম্বর থেকে লাইটহাউস, ম্যাজেস্টিক প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। পরিচালনা : রবি ট্যান্ডন, সংগীত : লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল, অভিনয়ে : অমিতাভ বচ্চন, প্রাণ, পরভীন বার্বি, সুলোচনা প্রভৃতি।

পাথর অউর পায়েল : হরমেশ মালহোত্রা পরিচালিত ডাকাতির এক রহস্যঘন কাহিনী 'পাথর অউর পায়েল' ৩রা জানুয়ারী থেকে হিন্দ ও অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। সঙ্গীত : লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল, অভিনয়ে : ধর্মেন্দ্র, হেমা মালিনী, অজিত, বিনোদ খান্না প্রভৃতি।

আজনবী : সামন্ত এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত 'আজনবী' ছবিটি গত ২৭শে ডিসেম্বর থেকে জ্যোতি ও অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। কাহিনী : গুলশান নন্দা, পরিচালনা : শক্তি সামন্ত সঙ্গীত : আর ডি বর্মন অভিনয়ে : রাজেশ খান্না জীনত আমন যোগিতাবলী প্রেম চোপড়া প্রভৃতি।

'এক যে ছিল রাজকুমারী' : রুশ ভাষা থেকে বাংলাভাষায় রূপান্তরিত 'রূপকথার' ছবিটি এলিট প্রেক্ষাগৃহে বড়দিনের অন্যতম আকর্ষণ।

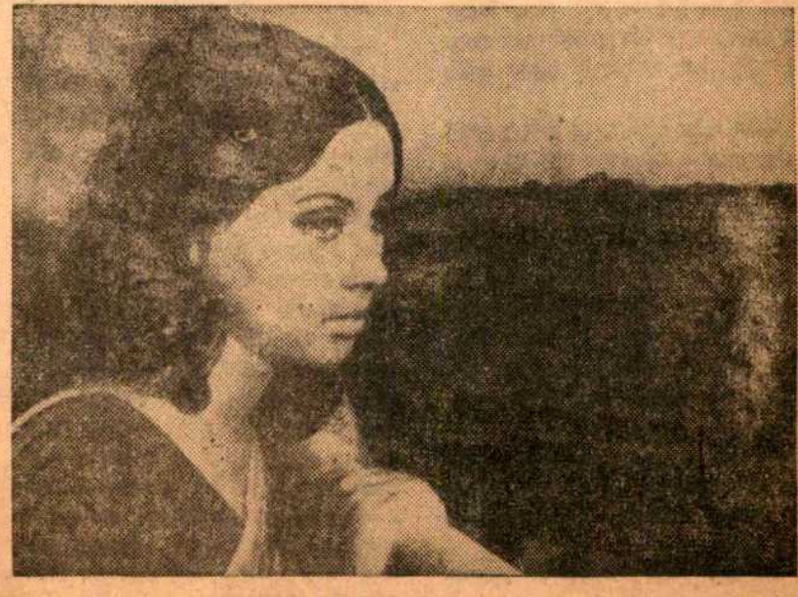

সূর্যকন্যা / জয়শ্রী রায়

কোরাস

প্রযোজনা : মৃণাল সেন প্রোডাকসন্স পরিচালনায়, আঙ্গিকে এবং অভিনয়ে মৃণাল সেনের নব-ভাবনার ছবি

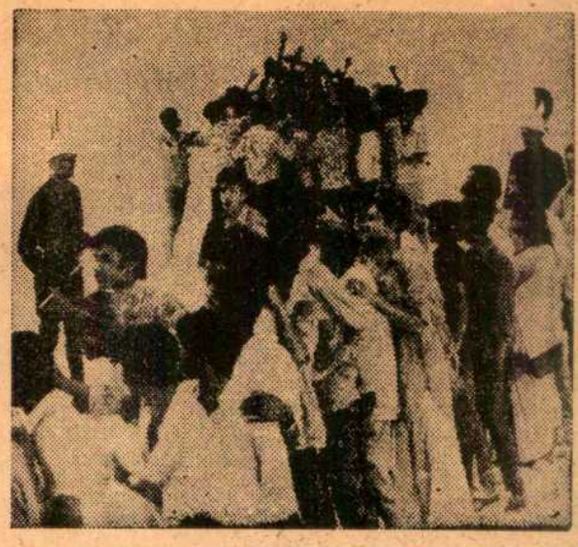

মৃণাল সেন যখনই কোন ছবি করেন, দর্শক তাতে সব সময়েই নতুন কিছু ভাবনা প্রত্যাশা করেন। তার একটা প্রধান কারণ শ্রীসেনের ভাবনা এবং প্রচেষ্টা সর্বদাই 'রিয়েলিটি' ভিত্তিক।

এর প্রমাণ আমরা আগে পেয়েছি ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১ এবং পদাতিকে। 'কোরাস'কে সেদিক থেকে পূর্ববর্তী ছবি-গুলিরই অনুসারী বলা যায়। কোরাসে তিনি সেই সব সমস্যা যা তিনি আগের তিনটি ছবিতেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, এখানেও তিনি তারই আর এক দিককে ফ্যান্টাসীর মোড়কে তুলে ধরেছেন।

রিয়েলিটিকে ফ্যান্টাসীর মাধ্যম করে দেখানো চলচ্চিত্র শিল্পে নতুন না হলেও, বলতে বাধা নেই, মৃণাল সেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ এবং মাধ্যম মারফৎ তা আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। ফ্যান্টাসী এবং রিয়েলিটি সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

মৃণাল সেন সব সময়ই স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত এবং গতানুগতিকতা বর্জিত ছবি করে থাকেন। সেই কারণেই তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অসীম। এবং বলতে বাধা নেই, মতভেদ থাকলেও আমরা সর্বদাই তাঁর ছবির গুণগ্রাহী।

কোরাস ছবিতে ছকে বাঁধা কাহিনী না থাকলেও আছে বঞ্চিত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতার টুকরো টুকরো ঘটনা—অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা কোরাসের মতই এক সূত্রে গাঁথা হয়ে একটা বাস্তবভিত্তিক কাহিনীর আকার নিয়েছে। যেখানে শোষিত এবং শাসককে স্পষ্ট আলাদা করে চিহ্নিত করা আদৌ কষ্টকর নয়। এবং সে কাহিনীকে ফ্যান্টাসীর আড়ালে সেলুলয়েডে পরিবেশন করাও কম কৃতিত্বের নয়। মৃণাল সেন সেখানে সার্থক সন্দেহ নেই।

এ ছবিতে হয়তো টেকনিক্যাল গিমিক বেশী ব্যবহৃত হয়েছে, তবুও তিনি কলকাতা-৭১এর মত কোরাসেও একাত্ম হতে পেরেছেন। এ ছবির দুঃসাহসিক বক্তব্যের উপস্থাপন করার ব্যাপারে ও ছবির লক্ষ্যপথ পরিক্রমায় শ্রীসেনের বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনা আমাদের ভাল লেগেছে। এমনকি কাহিনীর খামতিও (মৃণাল সেন ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়) তিনি ঢেকে দিয়েছেন তাঁর বলিষ্ঠ চিত্রনাট্য দিয়ে।

তবে কিছু কিছু প্রতীকী দৃশ্য, বিশেষ করে প্রথমে দেবতা, পরে মুস্কিলআসান এবং শেষে জোকারের আবির্ভাব সাধারণ দর্শকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। শেষ দৃশ্যের আগে কাঁটাতারের বেড়ার ধারে চেয়ারম্যানের ভয়াত আকুতিও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কিন্তু শহরে, গ্রামে, শিল্পাঞ্চলে ৩০ হাজার চাকুরীর পোস্টারটি ইদানীংকালের ভয়াবহ বেকারত্বের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অভিনয়—উৎপল দত্ত (চেয়ারম্যান), শেখর চট্টোপাধ্যায় (শ্রমিক নেতা), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (জোতদার), সুপান্থ ভট্টাচার্য (গ্রামের ছেলে), গীতা সেন, স্নিগ্ধা মজুমদার, মুনমুন সেন, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, ননী গাঙ্গুলী, সুব্রত সেনশর্মা, নির্মল ঘোষ ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (সাংবাদিক) এঁদের মিলিত 'কোরাস' সহজে মন থেকে মুছে যাবার নয়। এছবির অন্যতম আকর্ষণ কে-কে-মহজনের বিস্ময়কর আলোকচিত্রগ্রহণ। টেকনিকাল গিমিক থাকলেও, ওঁর প্রতিটি ফ্রেমে দেখা গেছে কাহিনীর বাস্তবতা রূপায়ণের সার্থকতা। গঙ্গাধর নস্করের সম্পাদনাও ছবিটিকে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। গানের সুরে প্রশান্ত ভট্টাচার্য এবং আবহসংগীতে আনন্দশঙ্কর ছবিকে আরো আকর্ষণীয় করতে সাহায্য করেছেন।

মৃণাল সেনের ছবি

বিদেশী ছবি

পোলিশ ছবি 'ইলুমিনেশন' : এবারের পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি (এই সমালোচকের মতে) 'ইলুমিনেশন' মূলত গবেষকের চরিত্র চিত্রণ হলেও নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

ইলুমিনেশনের বোধকরি সঠিক বাংলা তর্জমা হয় না। অন্তত এই ছবির মূল বক্তব্য থেকে আমার তাই মনে হয়েছে।

এমন একটি আলোক রেখা, যা আপনিই প্রজ্জ্বলিত এবং অনির্বাণ—এই অর্থে ইলুমিনেশন অথবা এমন সেই আলোক শিখা—আমরা যাকে জ্ঞান বলি বা দর্শনশাস্ত্র যাকে অদৃশ্য সেই মানবিক আকাঙ্ক্ষা অথবা সূক্ষ্ম চেতনা বলে।

এ-ছবির ভাষ্যকার একে বলেছেন—দার্শনিক জ্ঞান, মানবিক প্রকৃতির বিশ্লেষণ এবং সামগ্রিক জীবনের একটা খণ্ড অথচ প্রতীকী চিত্র। এর সঙ্গে একদম বর্তমান কালের বিজ্ঞান চর্চা ও ভিন্ন দৃষ্টিকোণে জীবনকে নিয়ে গবেষণার কথাও এতে বলা হয়েছে। অনিবার্যভাবেই তাই এর মধ্যে ধর্ম, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, সমাজ, সামাজিক চেতনা বোধ ইত্যাদিও এসে পড়েছে।

যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, আমাদের বিদ্যা ও বোধের পরিণতির মূল্যায়ন যার অন্তরালে 'সত্য' নামক কথাটির অস্তিত্ব বিদ্যমান।

ছবিতে গল্পটা দুটি স্তরে বলা হয়েছে। ফ্রান্সিসজেক নামক সেই বিশিষ্ট ছেলেটির বাল্যকাল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত একটি প্রাদেশিক ছোট সহরে কাটে। তখন সে প্রকৃতিকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে দেখেছে। তখন তার চোখে বিস্ময়। তার পরে সে বড় শহরে এসে কলেজের পড়াশুনা শুরু করলে এবং কালক্রমে ফিজিকসে ডকটরেট হোল।

প্রথম বয়সে যে কৌতূহল এবং চেতনা সুপ্ত ছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেটা ক্রমশ উদগ্র হোল। তখন তার একটাই প্রশ্ন, এই জীবন এই দেহ—এর পরে কি?

ডকটরেট হওয়ার পর গবেষণার কাজে লিপ্ত হোল, সেখানেও তার সেই এক কৌতূহল। কাকে যেন সে ধরতে চায়, স্পষ্ট করে অনুভব করতে চায়। সেটা কি? তারই নাম কি 'সত্য'?

সাধারণ মানুষ, তার দৈনন্দিন জীবনযাপন, তার কামনা বাসনা, গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া অস্তিত্ব-লুপ্ত চেতনা, যৌন জীবন থেকে প্রকৃতি—সবার মধ্যেই সে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইল।

গবেষণার পর বাস্তব জীবন, যেখানে রূঢ়তা অভাব বোধ তাকে বাধ্য করল শিক্ষিত হয়েও অতি তুচ্ছ কাজ করতে, যেখানে তার পক্ষে মানিয়ে নেওয়া কষ্টকর, যেখানে 'কমন' মানুষেরা তাকে এড়িয়ে চলত সে সাধারণ মানুষের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া তাদের চেনা লোক নয় ভেবে। যে যেন তার অস্তিত্ব, নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে ফেলবে সেখানে। অথচ সে যখন গভীর নিষ্ঠা নিয়ে ফিজিকস পড়েছে, তার ওপর গবেষণা করেছে, তখন সে ভেবেছিল এর মধ্যে পরম সত্য এবং জীবনবোধের মূল সূচি ছড়িয়ে আছে। তাকেই সে আবিষ্কার করার জন্য স্থিরচিত্ত।

বাস্তব জীবনে এসে সে যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তাহলে কোন্ জীবনটা সত্য! এই যৌন ভিত্তিক স্থূল অতি সাধারণ জীবন—যা পৃথিবীর অধিকাংশ লোক মেনে চলে—নাকি যাকে সে বিশ্বাস করে, সেই এসবের ঊর্ধ্বের জীবন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় তার চেয়ে বয়সে বড় যে মেয়েটি তাকে উত্তেজনার মুহূর্তে সঙ্গ দিয়ে ঘর বেঁধেছিল এবং বাস্তব জীবনে এসে আটপৌরে সংসার পেতে তাকে একটি সন্তান উপহার দিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল—এই জীবনই কি শেষ কথা মানুষের কাছে? এটা যেমন তার কাছে কৌতূহলের তেমনি তার কাছে আর এক বিস্ময় তার এক বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু। যে পাহাড়ে চড়তে চেয়েছিল বলে তার এই মর্মান্তিক পরিণতি।

এই দুটি ঘটনাই তার কাছে সমান বিস্ময়ের। তাহলে জীবনের গূঢ় রহস্য কোথায় নিহিত?

জীবনধারণের জন্য সে কারখানায় চাকরি করেছে। ভেবেছে এটাই সাধারণ মানুষের কাছে শেষ কথা। কিন্তু সেই বিশ্বাসেও একদিন চিড় খেয়েছে। কালক্রমে জটিলতার জীবন থেকে। মস্তিষ্কের কোষ থেকে তার সেই অবাস্তব অথচ দুরারোগ্য ব্যাধিটাকে আবর্তে পড়ে সে উত্তরণ চেয়েছে সেই দূর করার জন্য সে বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হয়েছে। তার চেতনার গ্রাস থেকে সে মুক্তি পায়নি।

ইলুমিনেশনের দৃশ্য

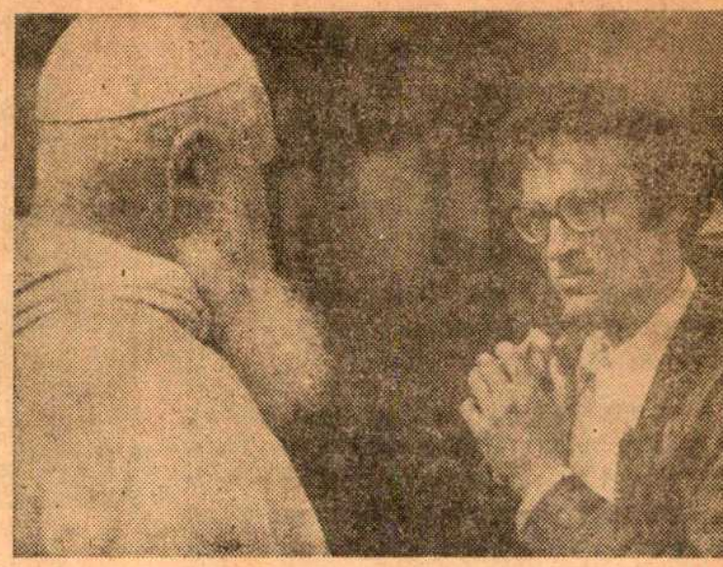

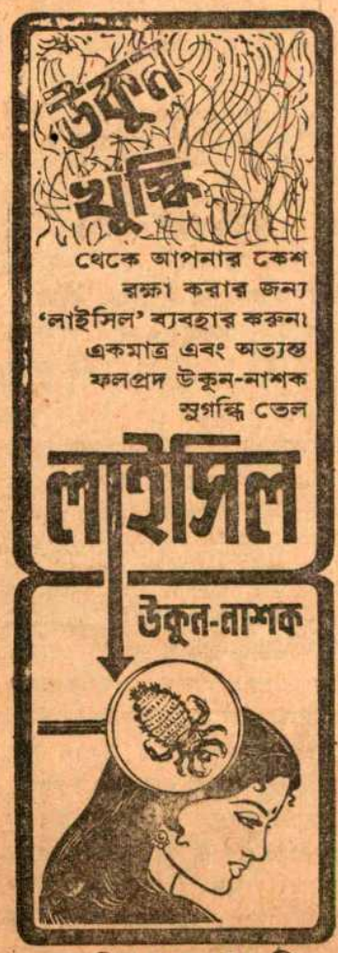

সুজানিল কেমো ইণ্ডাস্ট্রিজ
গণেশনগর, চিঞ্চওয়াড,
পুণা-১৯
EXPRESSO/686 B

ঠগিনী

প্রযোজনা : ছায়াছবি প্রোডাকসন্স
কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয় এবং আঙ্গিকে রমনীয় ছবি

গ্রাম থেকে গ্রামে বিভিন্ন নামে, নতুন সাজে যে মেয়েটি মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়, বিয়ের বাসরে লাজনম্র বধূ সেজে, পরে গয়না গাটি আত্মসাৎ করে ভোর হবার আগেই পালিয়ে যায় যে চতুর মেয়েটি—যার সংগী হোল তারই বাপ এবং তাদেরই আশ্রিত এক পুরুষ—লোকে তাকে ঠগিনী বলে।

কিন্তু সত্যিই কি লোক ঠকানো তার পেশা?

সে তো ভুলতে পারে না তার নিজের অতীত। যখন তাকে বিয়ে না করে বিয়ের আসর থেকে বর উঠে গিয়েছিল, বরকর্তার কঠিন নির্দেশে। অপরাধ, তার বাবা বন্ধুকে উপকার করার জন্যে যে টাকা তাকে ঋণ দিয়েছিল (বিয়ের আগেই তো ফিরিয়ে দেবে এই শর্তে), যথাসময়ে তা ফেরৎ না পাওয়ায় শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল তার বাবা অফিসের ক্যাশ ভাঙ্গতে এবং খবর পেয়ে বিয়ের আসরে পুলিশ এসেছিল।

সেই অপমান, সেই স্মৃতিই তাকে তাড়না করে বেড়িয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে নির্দয়ভাবে অন্যকে ঠকাতে।

কিন্তু ভাগ্যের বিবর্তনে সেই মেয়েই শেষপর্যন্ত এক বাসরে প্রেমের ফাঁদে বন্দী হোল। সেই প্রথম বিয়ের আসরে পলকে দেখে ভালো লাগা পুরুষের হাতেই সে হার মানল। ঠগিনী ধরা পড়ল।

মোটামুটি এই ঠগিনীর গল্পাংশ। চিত্রনাট্যকার, পরিচালক তরুণ মজুমদার সর্বদাই ভিন্ন স্বাদের কাহিনীকে পর্দায় উপস্থাপিত করেন। সুবোধ ঘোষের কাহিনীও তাই তাঁর হাতে পড়ে প্রাণ পেয়েছে।

অভিনয়ে নামভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায়। বাবা এবং আশ্রিত বন্ধুর ভূমিকায় উৎপল দত্ত ও রবি ঘোষ এক কথায় সুন্দর।

অন্যান্য ভূমিকায় অনুপকুমার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, চিন্ময় রায়, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, তপেন চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনায় দুলাল দত্ত এবং শিল্পনির্দেশনায় সুনীতি মিত্রর কাজ পরিচ্ছন্ন।

—চিত্রদূত

একদিন একটি রোগীর মৃত্যু তার মনের মধ্যে আবার ঝড় তুলল। সে নিয়ম বাঁধা জীবনের অস্তিত্ব অস্বীকার করবার জন্য পাগল হয়ে উঠল। তার মনে হোল, এই শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনই মানুষের সর্বনাশের মূল। সে সব কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল।

কিন্তু তাতেই কি তার প্রশ্নের উত্তর নিহিত? এর উত্তরের জন্য সে ধর্মযাজকের কাছে গেল। সে তাকে যীশুর কথা বলল, ধর্মের কথা বলল, দর্শনের গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথাও বিস্তারিতভাবে শোনাল। কিন্তু তার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি কোথায়? চার্চের পরিবেশ তাকে অবলম্বন করে আত্মসমর্পণ, কোন কিছুর মধ্যেই সে তার জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেল না।

কোথাও শান্তি না পেয়ে সে আবার তার সংসারে ফিরে এলো, আবার নতুন করে সে পড়াশুনায় মন দিল এবং জীবনটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা করল। সেই সময়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় মত্ত সেখানে হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ ফেটে পড়তে সহসা তার চেতনা ফিরে এলো এবং তখনই তার মনে হোল যে সে একটা সমাজের মধ্যে বাস করে, অর্থাৎ সে একজন সমাজবদ্ধ মানুষ তাই স্বভাবতই এই সমাজের প্রতি তার কিছু মানবিক দায়িত্বও রয়েছে। এই সত্য তার মধ্যে উদয় হতেই তার দেহ থেকে তার 'বোধ' নামক শত্রুটা বেরিয়ে এল। এবং তখনই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল দেহ এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্যেকার দ্বিধা বা পার্থক্যটা কি। তবু জীবনের ব্রহ্মপ্রশ্ন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার মনের কাছে তার সেই প্রশ্নটা থেকেই যায়—জীবনের সেই গূঢ় রহস্যটা কি, কোথায়ই বা তার অস্তিত্ব।

সাধারণত এমন মেজাজের বই দেখে আমরা অভ্যস্ত নই। কিন্তু একবার যদি কেউ তা আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে, তবে এই দার্শনিক প্রশ্নটা কি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় দর্শকদের মনেও আলোড়ন সৃষ্টি করে না?

ছবি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, যেন ভারতীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েই পরিচালক (রুজটফ জানুসি) এই ছবিটি করেছেন।

নায়কের চরিত্রে স্ট্যানিস্ল লাটাজোর অভিনয় অসাধারণ।

—শা, র, চ

শতবর্ষের স্মরণীয়

কবি রাজকৃষ্ণ রায় ও বীণা থিয়েটার

কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের জন্ম ১৮৪৯ খৃঃ। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৫ মার্চ রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি স্টার থিয়েটারের সংগে যুক্ত ছিলেন। ১১ মার্চ তাঁর মৃত্যুতে স্টার থিয়েটার বন্ধ রাখা হয়। অভিনেতা হিসেবেও রাজকৃষ্ণ রায় খ্যাত ছিলেন। কেবলমাত্র রচনাশক্তির ওপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল লেখক তখন রাজকৃষ্ণ রায় ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। পাঠ্যপুস্তক

ত্রয়োদশ সংস্করণ বাহির হইল!

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

COMMON WORDS

: অসংখ্য ছবির সাহায্যে শব্দজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবোধের ব্যবস্থাসহ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য অভিনব সচিত্র ইংরেজি-বাংলা অভিধান :

॥ দাম : চার টাকা ॥

: জেনারেল বুকস্ : ৫-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

রচনা করে অনেকে অবশ্য জীবিকা নির্বাহ করতেন। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নেপথ্য কণ্ঠের প্রবর্তন রাজকৃষ্ণ রায়ই প্রথম করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 'বীণা' নামে কবিতা মাসিক প্রকাশ করেন এবং বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। বসুমতী থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা হয়। ২৭ খানা নাটক তিনি রচনা করেন।

৩৮, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায়ের স্বত্বাধিকারীত্বে বীণা থিয়েটার গড়ে ওঠে। ১০ ডিসেম্বর চন্দ্রহাস নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং শরৎ কর্মকার চরিত্রে নিজে অভিনয় করেন। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর নিজস্ব প্রযোজিত নাটকের স্ত্রী চরিত্রে পুরুষ অভিনেতাদেরই নিয়োগ করতেন। অল্পবয়সী সুন্দর সুন্দর কিশোর বালকদের অভিনয়ের উপযোগী শিক্ষা দিয়ে নিতেন। প্রাচীনপন্থীরা রাজকৃষ্ণ রায়ের এই ব্যবস্থাকে খুবই অভিনন্দিত করেন। কিন্তু পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যেখানে সবাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনেত্রীদের নিয়োগ করতেন—সেক্ষেত্রে বীণা থিয়েটারে স্ত্রী চরিত্রে পুরুষদের অভিনয় বেশীরভাগই সমর্থন করতেন না। ফলে রাজকৃষ্ণবাবুকে বিরুদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়।

রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ চরিত্র বেঙ্গল থিয়েটারে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। চন্দ্রহাস নাটকের পর রাজকৃষ্ণবাবু বীণা থিয়েটারে প্রহ্লাদ নাটকের উপযোগী শিল্পী সংগৃহীত না হওয়াতে রাজকৃষ্ণবাবু অক্ষয়-কালী কোঁয়ারের শরণাপন্ন হন। আর্য নাট্য-সমাজ' নামে অক্ষয়বাবুর একটি নাট্য

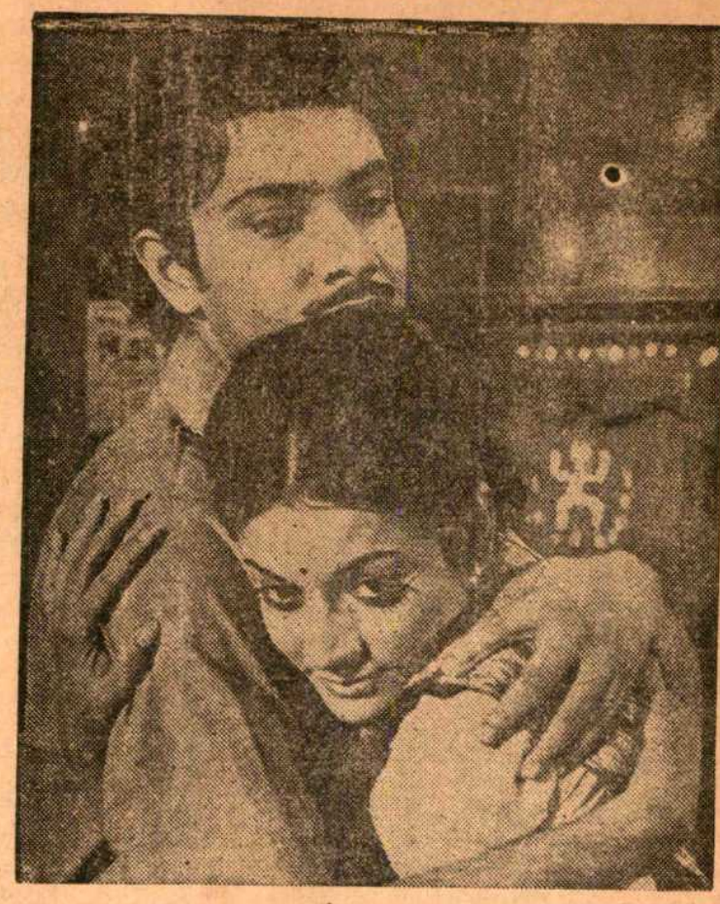

সত্যেন্দ্র সূর্য / চন্দ্ররাজ রায় / রাজশ্রী বসু

প্রতিষ্ঠান ছিল। অক্ষয়বাবু তাঁর সভ্যদের নিয়ে বীণা থিয়েটারে যোগদান করলেন। ১৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো প্রহ্লাদ চরিত্র। হিরণ্যকশিপু চরিত্রে রাজকৃষ্ণ রায়ের অভিনয়ের সবাই প্রশংসা করলেন। এই সময় পা ভেঙে রাজকৃষ্ণ রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ন্যাশনাল থিয়েটারের হিঙ্গুল খাঁ বীণা থিয়েটারের নাটকের সুর সংযোজনা করতেন। ভণ্ড দলপতির দণ্ড, কুমার বিক্রম, হরিদাস ঠাকুর, ভ্রান্তি বিলাস প্রভৃতি নাটক অভিনীত হবার পর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে ১৮৮৮ খৃঃ ২৬ অকটোবর ন্যাশনাল কংগ্রেস নাম দিয়ে রাজকৃষ্ণবাবু স্বাধীনতার জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে যে নাটক মঞ্চস্থ করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বীণা থিয়েটার রাজকৃষ্ণ রায়ের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। উপেন্দ্রনাথ দাস এই সময় বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন করে নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার গঠন করে বীণা থিয়েটারে 'দাদা ও আমি' নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন ৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। রচনা ও পরিচালনা ছাড়া উপেনবাবু অভিনেতারূপেও দেখা দেন।

শরৎ সরোজিনী ও সধবার একাদশী নাটকও উপেনবাবু মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু উপেনবাবু কিছুতেই তার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন না। কবি রাজকৃষ্ণ রায় ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং আর্য নাট্য-সমাজের সহযোগিতায় তাঁর মীরাবাঈ নাটক মঞ্চস্থ করেন ৪ আগষ্ট ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। মীরাবাঈ চরিত্রে শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসীকে প্রথমে নির্বাচন করা হয়। রাজকৃষ্ণ রায় এবার স্ত্রী চরিত্র অভিনেত্রীর নির্বাচনকে সমর্থন করেন। কিন্তু কাদম্বিনী মঞ্চে অবতীর্ণা হতে অস্বীকার করেন। তাছাড়া রাজকৃষ্ণ রায় মীরাবাঈ নাটকে ভিন্নধর্মী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। মীরাবাঈ চরিত্রে শরৎকুমার কর্মকারকে নির্বাচন করে তার সঙ্গীতাংশ নেপথ্যে কাদম্বিনীকে দিয়ে গাওয়াবার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন রিহার্সেল চলে। শেষ পর্যন্ত মত পরিবর্তন করে তিনকড়ি দাসীকেই নির্বাচন করেন মীরাবাঈ চরিত্রে।

পরীলীলা হিরন্ময়ী শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা প্রভৃতি নাটক অভিনীত হবার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় আর আর্য নাট্য-সমাজের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় স্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। স্টার থিয়েটারের একদল শিল্পী নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সিটি থিয়েটার নাম দিয়ে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৬ মে বীণা থিয়েটারে চৈতন্যলীলা নাটক নিয়ে অভিবাদন জানান। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সিটি থিয়েটার বীণা থিয়েটারে অভিনয় করেন। এর পর সেইটি থিয়েটার কিছুদিন বীণা থিয়েটারে অভিনয় করেন।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

শতাব্দীর সংলাপ দেখে আমি মুগ্ধ
—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
বয়েজ ওন হল বিশ্বরূপার পাশে
সেই উচ্চপ্রশংসিত তাসাদরণ নাটক
শতাব্দীর সংলাপ
১লা বুধ, শনি, রবি ৩-১৫ ও ৬-৪৫
বৃহঃ ৬-৪৫
নাটক ও নির্দেশনা ॥ রাখাল দাশ
হলে টিকেট / রূপমায়ার অভিনয়

প্যাট্রী, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বেকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোরেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সাপং সেলিনিকন প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

উদয়শঙ্করের নৃত্য অলঙ্কার

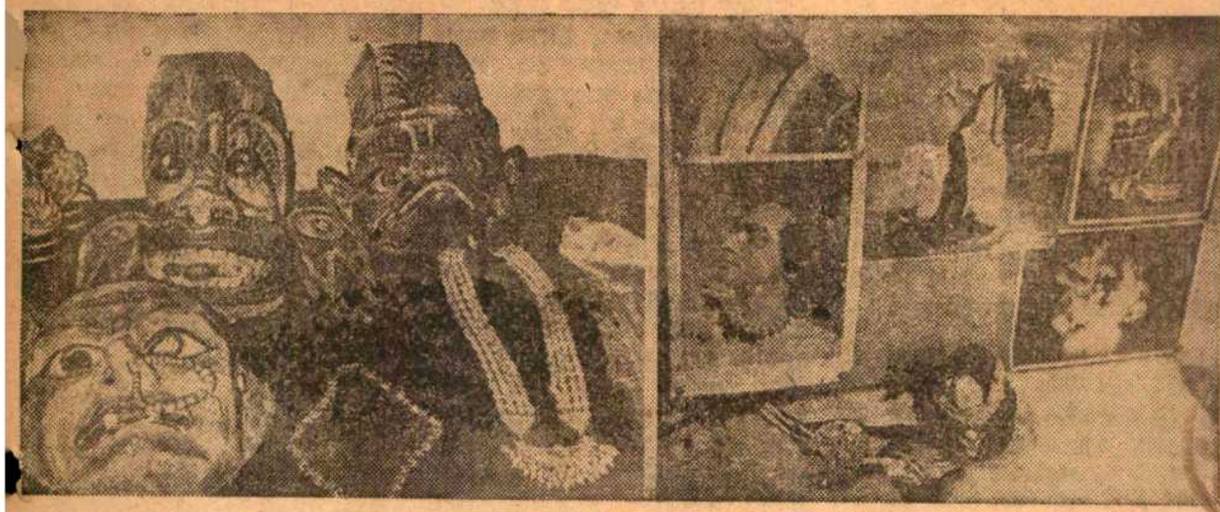

জলসা

বিদেশে ভারতীয় শিল্পের সমাদর প্রসঙ্গে : উদয়শঙ্কর

আপনি প্রায় ১৯বার আমেরিকা গেছেন, গেছেন ইউরোপের নানা দেশে। ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীতের ঐশ্বর্যের প্রতি এদেশের বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আপনি খুলে দিয়েছেন এবং সেই ঐতিহ্যকে আজও অনাহত রেখেছেন রবিশঙ্কর, আলি আকবর। কিন্তু স্বাধীনতা পাবার পর এদেশের আরো অনেক শিল্পী ওদেশে গেছেন। যাবার পথ এখন আগের চেয়ে প্রশস্ত। কিন্তু আংশিকভাবে কিছু সাধুবাদ নিয়ে আসা ছাড়া কোনো পক্ক বিপুল, সুদূরপ্রসারী ফল এঁরা সৃষ্টি করতে পারছেন না কেন?' কয়েক দিন আগে এক ঘরোয়া আলোচনায় উদয়শংকরকে প্রশ্ন করেছিলাম।

'এটা শিল্পীদের দোষ নয়' উচ্ছল আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠলেন নৃত্যগুরু। আমাদের পরে যাঁরা ওদেশে গেছেন, এবং এখনও যাঁরা যাচ্ছেন শিল্পী হিসাবে তাঁরা যে কোনো দেশেরই সম্পদ। কিন্তু কোনো শিল্পে মাস্টার হওয়া এক জিনিস আর সেই শিল্পের মর্মের বার্তাকে অন্যের, বিশেষ করে সেই বিশেষ দেশের শিল্প ও সাধনা সম্বন্ধে যাঁদের মনে কোনো সংস্কার বা ধারণা গড়ে ওঠেনি তাঁদের অন্তরে পৌঁছে দেবার ক্ষমতাটা আর এক জিনিস। প্রথমটির মত দ্বিতীয়টিও আর একটি আর্ট। এ আর্ট না শিখে বিদেশে সাংস্কৃতিক অভিযানে বেরোনোটা পন্ডশ্রম, শিল্পী যতই উঁচু দরের হোন না কেন?'

'কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'নিশ্চয়ই। কোনো দেশের নাচ বা গান করে অন্য দেশের মানুষকে জয় করবার প্রচেষ্টা কি জান? প্রথমেই পাণ্ডিত্যের অভিমান এবং সংস্কারের গোঁড়ামো থেকে মনকে মুক্ত করে এই সাদা সত্যটুকু সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে—আওয়ার এইম ইজ নট টু টিচ বাট টু মেক দেম ফিল দ্য বিউটি অফ ইনট্রোভার্ট ওয়েলথ অফ আওয়ার আর্ট।' এই ধ্যানই গুরুর মত পথ দেখিয়ে যথাযথ প্রকাশের ফর্মটি বাতলে দেয়।

আমার আগে অনেক ওস্তাদ ওদেশে গেছেন। কিন্তু নিজেদের বাঁধাধরা প্রকাশ-রীতি সম্বন্ধে এঁরা এত নাক উঁচু যে আপন জিদেই এ টু জেড তাঁরা ডেমনস্ট্রেট করে যান, ক্ল্যাসিক্যাল গানে অনভ্যস্ত কানে সেটা ভাল লাগছে কি লাগছে না সে সম্বন্ধে গ্রাহ্য না করে। এটা আমি এক ধরনের স্বার্থপরতা বলেই মনে করি। মনে করি এটা অপরের ধৈর্যের ওপর টরচার করা হচ্ছে। আমাদের দেশের শ্রোতা বা দর্শকদেরই যদি তুমি এ টু জেড উচ্চাংগ সঙ্গীত অথবা কথাকলির দীর্ঘ বিলম্বিত নৃত্য দেখাও তারাই কি সেটা সহ্য করবেন? না, করা সম্ভব? কারণ এখনকার মানুষের ফাস্ট লাইফ। প্রতিদিনের সমস্যাও অন্তহীন। তাই আমি প্রথম যখন ওদেশে বাবাকে (আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব) নিয়ে যাই ওঁকে বুঝিয়ে বলেছিলাম যে খুব অল্প সময়ের বৃত্তে রাগের একেবারে ভেতরের কথাটি ওদের অন্তরে পৌঁছে দিতে হবে।

উনি শুধু শিশুর মত সরলই ছিলেন না, খুব স্পোর্টিংও ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাজী। বললেন, আমায় কতক্ষণ বাজাতে হবে বাবা? আমি বললাম ১৫ মিনিট। তারপর ওঁকে বোঝালাম ওরা কি চায়? ওরা রিদমের ভক্ত, রেঞ্জ, ভলাম এসবের বৈচিত্র্য ওদের কিভাবে অভিভূত করে। বাবা ঠিক সেইভাবেই ১৫ মিনিটের কম্পাসে তাঁর প্রেজেনটেশনের ফর্ম তৈরী করে নিলেন—দি রেজাল্ট ওয়াজ ট্রিমেন্ডাস। এরপর এনকোর্স আফটার এনকোর। বাবাকে একাধিকবার ২ ঘন্টার মতও বাজাতে হয়েছে এ্যান্ড দে এনজয়েড এভরি মোমেন্ট। তাই বলছিলাম যা বলতে চাই সেটা কিভাবে বলব তার ওপরই ফেলিওর অথবা সাকসেস নির্ভর করে।' একটু থেমে মৃদু হেসে শঙ্কর বললেন, 'কিন্তু তার আগে যাদের কাছে শোনাবে বা দেখাবে তাদের রুচি ও প্রকৃতির প্রতি সম্ভ্রমশীল হতে হবে। ধর কোনো প্রণয়িনী যদি তাঁর কোনো অরুচিকর পাণিপ্রার্থীর কাছে যান, তিনি যান নিজের উগ্রতাকে এতটুকুও না কমিয়ে। কিন্তু যখন তিনি মনের মানুষের কাছে যান, তখন নিজেকে খানিকটা বল্লভের মেজাজমাফিক করে গড়ে নেন না কি?

আমাদের দেশের শিল্পীরা প্রতিভা অথবা শক্তিতে যথার্থই বড়। কিন্তু উপযুক্ত গাইডেন্স শো-ম্যানশিপ অথবা লিডারশিপএর অভাবে তাঁদের যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছেন। এটা খুবই আফশোষের কথা। তাছাড়া গভর্ণমেন্ট যেভাবে এঁদের পাঠাচ্ছেন দ্যাট ইজ অলসো নট দি রাইট ওয়ে।' প্রথমেই শিখতে এবং শেখাতে হবে হোয়াট টু গিভ এ্যান্ড হাউ টু গিভ।' 'এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—অনেকেরই ধারণা শুধু নয় দুচুবিশ্বাস আপনি, রবিশংকর—আপনারা ওদেশে পপুলার হবার জন্য ভারতীয় নৃত্য ও সংগীতে খানিকটা পাশ্চাত্য ঢং এনে ফেলেছেন। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যটা জানতে ইচ্ছে করে।'

'এ ধরনের মন্তব্যে আমার হাসি পায়—আবার দুঃখও হয় এই কথা ভেবে যে হাউ ইগনোরেন্ট তার উই এ্যাবাউট আওয়ার আর্ট এ্যান্ড কালচার—ওঁদের আর্টে আমাদের হস্তক্ষেপ ওঁরা বরদাস্ত করবেন কেন? দে হ্যাভ দি মাস্টার আর্টিস্টস অফ দেয়ার আর্ট। আর একটা কথা। দে নো দেয়ার আর্ট বাট উই ডু নট নো আওয়ার আর্ট। ইণ্ডিয়ান আর্ট ধ্বনি তুলে যাঁরা হৈ হৈ করেন ইণ্ডিয়ান আর্ট বস্তুটিকে তাঁরাই সবচেয়ে কম চেনেন। এটা আমার জীবনে বহু পরীক্ষিত সত্য। (স্থানাভাবে উদয়শংকরের বলা উদাহরণগুলি দেওয়া গেলো না)। এইটুকু শুধু জোর গলায় বলতে পারি—আমি যদি ইণ্ডিয়ান ডান্সের নামে ওয়েস্টার্ন ডান্স পরিবেশন

করতাম আমি ওদেশে ঢুকতে পারতাম না। কিংবা রবু যদি ইণ্ডিয়ান মিউজিকের ক্যারাকটারকে বিকৃত করে ওয়েস্টার্নাইজড করত তবুও ওদেশে ঢুকতে পারত না। ইট ইজ হিজ গ্রেট এ্যাচিভমেণ্ট দ্যাট হি হ্যাজ বিন এবল টু কণভিন্স দেম অফ দি গ্রেটনেস অফ আওয়ার মিউজিক।'

রবিশংকর ছোটবেলা থেকে আপনার সঙ্গে বহুবার ওদেশে গেছেন, ওঁদের মেজাজ রুচি সবকিছুর সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু আপনি? আপনার আগে এ ক্ষেত্রে এরকম ত কোনো পূর্বসূরী ছিলেন না?'

'দেয়ার ইউ আর অ্যাণ্ড ইট ইজ রিয়েলি এ ভেরি টাচিং স্টোরি। প্রথম আমেরিকা যাই খুব সম্ভব ১৯২২ অব্দে। প্রথমে একটা জেদ ছিল আমাদের নাচ আমাদেরই স্পিরিট আর টেকনিককে ওদের ভাল লাগাতেই হবে। আমার স্বপ্ন বিফল হয়নি। শুনলে আশ্চর্য হবে নিউ ইয়র্কে কার্নেগী হলকে ওরা টেম্পেল অফ ওয়েস্টার্ন মিউজিক বলেই জানতেন। ওখানে কোনো দিনও নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়নি। ভারতে আজও ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতায় সারা মন নত হয়ে আসে যে আমি একজন ভারতীয় শিল্পী। এই ট্রেডিশন ভেঙে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছি। আমি আর আমার গ্রুপই সর্বপ্রথম এই নৃত্য পরিবেশন করে।

• আমেরিকানরা স্বভাবতই উচ্ছ্বাসী ও শিল্পপ্রিয় জাত। ওদের হৃদয় সকল শিল্পের আবেদনে সহজেই সাড়া দেয়, দুলে ওঠে। আর কোনো বস্তুকে গ্রহণ করলে ওরা মূল্য দেয় হিসেব না করেই। আমাদের নাচ সম্বন্ধে নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত সমালোচক জন মার্টিন তাঁর বিরাট উচ্ছ্বসিত সমালোচনার এক জায়গায় লিখেছিলেন : 'সারটেনলি নো বডি হ্যাজ টু নো এনিথিং এবাউট দি হিন্দু ডান্স টু এনজয় হিমসেল্ফ। ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং শংকর হ্যাজ হ্যাড এ কিন সেন্স অফ হাউ টু প্রেজেন্ট হিজ আর্ট টু দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, কিপিং ইট অলওয়েজ ইন টু ট্রেডিশন...এ্যারেঞ্জিং হিজ কমপোজিশনস উইথ এ ফুল এ্যাওয়ারনেস অফ হোয়াট দি ওয়েস্টার্ন মাইণ্ড উইল বি এবল টু গ্রাসপ অফ ইট। উই ক্যান লার্ণ ইট ফ্রম শংকরস ক্রিয়েশন।'

এই ধরনের অকৃপণ উচ্ছ্বাস পেয়েছি শিকাগো, লস এঞ্জেলস এবং স্টেটের প্রায় সকল বিদগ্ধ সমালোচকের কাছে। আই ওয়াজ সিওর অফ মাই কালচারাল কংকোয়েস্ট অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড। কেন জান? তখন আমরা পরাধীন ভারতের শিল্পী। ইউরোপে সকলেই হীনচক্ষে দেখতেন আমার দেশবাসীকে। আমাদের নেতা গান্ধী জহরলাল সুভাষকে জেলে পুরেছে। ভেতরটা জ্বলেপুড়ে যেতো। আর ভাবতাম ওদের বোঝাতেই হবে যে সংস্কৃতির জগতে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি। দেশের ওপর একটা করুণ কাতর টান অনুভব করতাম। এ্যাণ্ড থ্যাংক গড দ্যাট আই হ্যাভড মাই কান্ট্রি দ্যাট সিনসিয়ারিটি ওয়ারকড মিরাকেল। ব্রিটিশরা যত অত্যাচার করতে তত পাগল হয়ে উঠেছি সারা পৃথিবীকে ভালবাসাতেই হবে আমার দেশকে। এই প্রেরণাই আমার অবিশ্বাস্য সার্থকতায় পৌঁছে দিয়েছিল। ১৯২২ থেকে ১৯৬৮ অবধি ক্রমাগত (প্রায় ৪২ বার সারা পৃথিবী এবং ১৯ বার আমেরিকা) ঘুরেছি।

প্রাক্ স্বাধীনযুগে ওরা আমাদের নাচ ভালবাসত কারণ এর মধ্যে জানবার বোঝবার মুগ্ধ হবার মত প্রচুর সম্পদ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর ওরা খোলাখুলিভাবে ভারতীয় নৃত্য শিখতে চাইল—না চেয়ে পারেনি বলে এর আবেদনে ওদের হৃদয়ে বিপ্লব ঘটে গিয়েছে বলে। আমার জীবনব্যাপী সাধনার এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? ওরা যখন শক্তির বলে ভারত জয়ের নেশায় পাগল, আমি পাগল ওদের জয় করতে আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতির বলে। এ্যাণ্ড আই কেম আউট সাকসেসফুল।'

কোন্ দেশের অ্যাপ্রিশিয়েশন আপনাকে অভিভূত করেছে?'

'সকল দেশেরই। তবে আমরা আবেগপ্রবণ জাত। তাই আমেরিকায় মাইকেল শেখভ্ (সুবিখ্যাত নাট্যকার চেকভের শিল্পী ভাই) এর মন্তব্য আমি আজও ভুলতে পারিনি। আমার গজাসুর নৃত্য দেখার পর কেউ বললেন ওয়াণ্ডারফুল। কেউ বললেন স্টারিং কিন্তু মাইকেল শেখভ বললেন—সারা নাচটিতে পার্বতীর সঙ্গে অসুরটা তাণ্ডবনৃত্যে কি কাণ্ডটা করে চলেছিল। কিন্তু মহাদেব তার মধ্যেও নিশ্চল নির্বিকার ধ্যানমগ্ন। দি হোল ড্রামাটিক ক্লাইমেক্স ওয়াজ দেয়ার। আর একবার কাইজিলার হঠাৎ আমার শো-এ এসে তবলার আওয়াজ শুনে বলেছিলেন দি কান্ট্রি দ্যাট ক্যান ক্রিয়েট সাচ এ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট কান্ট্রি ইজ ওয়াণ্ডারফুল—ওঁদের বিস্ময়কর শক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

তাসের দেশ প্রযোজনায়—ত্রিবেণী : সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে ত্রিবেণী নিবেদিত 'তাসের দেশ'—এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান সুমিত্রা সেন ও সাধন গুহের সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনার শিল্পসম্মত ভারসাম্যের কারণে।

কণ্ঠসঙ্গীতে রাজপুত্রের ভূমিকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুই টপ স্টার দেবব্রত বিশ্বাস ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমন্বয় এক আকর্ষণীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল। এতে তাসের দেশের রাজপুত্রের বিদ্রোহী প্রাণোচ্ছলতা, প্রথার বিরুদ্ধে প্রাণের অভিযানকে ত পেয়েছিই উপরি পাওনা হিসেবে পেয়েছি দুই শিল্পীর বিজয় দৃষ্টিকোণে রাজপুত্রের ছবিটি।

আর এক আকর্ষণ হরতনীর ভূমিকায় সুমিত্রা সেনের গান।

সাংবাদিকতার পরিপ্রেক্ষিতে টেক্কাদানীর ভূমিকায় সুমিত্রা-দুহিতা ইন্দ্রাণী সেনের গান, কণ্ঠ ও পরিবেশন দক্ষতার সার প্রেক্ষাগৃহকে চমকিত করেছে।

শৈলেন মুখোপাধ্যায় তাঁর উচ্চ মার্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একক-সঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শক্তিব্রত দাশ এবং স্নিগ্ধা কোলেও।

সম্মিলিত গানগুলি সুসংহত হয়েছে সুমিত্রা সেনের সুযোগ্য পরিচালনায়।

নৃত্যে রাজপুত্র ও হরতনীর ভূমিকায় সাধন গুহ ও পলি গুহ প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশেই পূর্ণ করেছেন যদিও এখানে নাচের চেয়ে অভিনয়ের ভূমিকাই মুখ্য। তাপস সেনের আলো, ননী দাশগুপ্তের সজ্জা শুচিব্রত দেবের মঞ্চ রূপায়ণ এবং প্রদীপ ঘোষের ঘোষণা অনুষ্ঠানের সার্থকতার সহায়ক।

যন্ত্রসঙ্গীতে প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চিত্ত মুখোপাধ্যায়, খোকন সেনগুপ্ত, ঘনশ্যাম পাইন, দুর্বাদল চট্টোপাধ্যায়, স্বপন অধিকারী রবীন্দ্র চিন্তার ভাবানুসারী আবহ সঙ্গীত রচনায় ছন্দসৌষ্ঠব রেখেছেন।

—চিত্রাঙ্গদা

হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভা দেখতে হলে আজই কিনুন দীপককুমার সরকারের দুখানি রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী।

রূপতীর্থ রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড ৬.৫০

নন্দন কাননে ৫.৫০

পরিবেশক : ক্লাসিক প্রেস ॥ ৩।১এ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও সংকর্ষক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. WB/NC-13
Gram: AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 3rd January, 1975
Phone 55-5231 (14 lines)

29 JAN 1975

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল—

ঈশানচন্দ্র দে ও বেনুচন্দ্র দাস প্রণীত

ইঞ্জিনীয়ারিং ড্রইং শিক্ষা ১২

এই বইয়ের বিশেষত্ব :—

• ইঞ্জিনীয়ারিং ড্রইং শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ বাংলা ভাষায় লেখা আদর্শ বই। • অঙ্কন-পদ্ধতি, প্রমাণসহ ব্যাখ্যা অতি সহজ সরলভাবে দেওয়া হয়েছে—যা এ যাবৎ প্রকাশিত কোন বইয়ে নেই। • কোনও অবাস্তব পরিভাষা ব্যতিরেকে, ইংরেজীতে অভ্যস্ত শিক্ষার্থী বা শিক্ষক কারও পক্ষেই বুঝতে কষ্ট হবে না। • বিভিন্ন অবস্থানে সরলরেখা, তল, ঘনবস্তুর অভিক্ষেপ সহজভাবে ব্যাখ্যা করায় যে কোন শিক্ষার্থী অন্যের সাহায্য ছাড়াই পাঠাভ্যাস করতে পারবে। • অসংখ্য প্রশ্ন ও তার সমাধান করে দেওয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের সুবিধা হবে। • মেকানিক্যাল ড্রইং-এর জন্য এই বই থেকেই সাহায্য পাওয়া যাবে। • এই বইয়ের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নতুন এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে সকল ড্রইং-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেজন্য বিশেষ কঠিন ড্রইং-ও অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হবে। • একমাত্র এই বইয়ে First Angle এবং Third Angle—উভয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন ড্রইংএর সমাধান দেওয়া আছে।

'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান'—সেই রক্তরাঙা কাহিনী

শৈলেশ দে'র

আমি সুভাষ বলছি

তৃতীয় খণ্ড ২০·০০

প্রথম খণ্ড (৬ষ্ঠ) সংস্করণ ২০·০০ * দ্বিতীয় খণ্ড (৩য় সংস্করণ) ২০·০০

"আমি সুভাষ বলছি" বইটির প্রতি খণ্ডের মূল্য অগ্রিম পাঠালে রেজিঃডাকে বই পাঠানো হবে। ডাকমাশুল আমরা বহন করব।

প্রখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক চিরঞ্জীব-এর অদ্বিতীয় নতুন খেলার বই

জয় থেকে জয় ক্রিকেটে ১২

ভারতের টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুরু ১৯৩২ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে। কিন্তু টেস্টে জয়যাত্রা সুরু ১৯৫২ সালে মাদ্রাজের চাঁপকে বিজয় হাজারের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তখন থেকে ভারত এ পর্যন্ত জিতেছে ১৯টি টেস্ট, কখনও বিদেশে, কখনও নিজেদের দেশে। এই গ্রন্থে প্রতিটি জয়ের বল-টু-বল ধারাবিবরণী—সাথে প্রতিটি ইনিংস-এর স্কোর বই। ...ভারতের টেস্ট জয় নিয়ে এ ধরনের প্রামাণিক গ্রন্থ ইংরেজীতে তো নেই-ই, কোন ভারতীয় ভাষায় আজও লেখা হয়নি। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে আর আছে সর্বশেষ তিন সিরিজের বিজয়ী ভারতীয় খেলোয়াড়দের পরিচয়, ক্রিকেটের রাজা রণজি সম্পর্কে সুদীর্ঘ রচনা। ১৯৩২ সাল থেকে এ পর্যন্ত যে প্রায় দেড়শো ভারতীয় টেস্ট খেলেছেন তাঁদের প্রত্যেকের বোলিং ও ব্যাটিং হিসাব ছাড়াও নানা পরিসংখ্যান—সঙ্গে কুড়ি পাতার ছবির এলবাম।

প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা কাশীকান্ত মৈত্রের শ্রেষ্ঠতম রচনা

রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি ২০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোনঃ ৩৪-৮৩৫৬

টিকিট চেকারদের মদত দিন —

তাঁরা আপনার পয়সার অপচয় বন্ধ করছেন

কারণ তিনি যত বেশি বিনা টিকিটের যাত্রী ধরবেন, ভাড়া ও জরিমানা বাবদ ততো বেশি অর্থ তহবিলে জমা পড়বে। এবং সঙ্গে সঙ্গে রেলের কামরায় বাড়তি ভীড়ও কিছুটা কমবে।

আর এ সবের অর্থ রেলের ক্ষতির পরিমাণ কমবে এবং বাড়তি আয়ের রাস্তাও সুগম হবে।

উপরন্তু, বাড়তি আয় মানেই আপনার জন্যে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা।

কাজেই টিকিট চেকারদের মদত দিন, কেননা তাঁরা আপনার স্বার্থেই কাজ করছেন।

বিনা টিকিটে ভ্রমণ—
সৎ মানুষদেরই ক্ষতি করে

INDIAN RAILWAYS পূর্ব রেলওয়ে

TCP/BR.277

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩০	আজ ভোরে (কবিতা)	শ্রীমৃগাঙ্ক রায়
৩০	সোনার শেকড় তুললে হাতে (কবিতা)	শ্রীবর্ণজিৎ দেব
৩০	যেদিকে, দুচোখ যায় (কবিতা)	শ্রীদেবী রায়
৩১	শেষবিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৩৫	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৩৬	বন্যা কবে দেখুন	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৩৭	রূপসীর খাতা	শ্রীবরবর্ণিনী
৩৮	আর্থিক প্রসঙ্গ	শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৩৯	সংশয় (গল্প)	শ্রীশান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়
৪২	পুনশ্চ	শ্রীক্ষপণক
৪৩	প্রদর্শনী	শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়
৪৪	যামিনী কৃষ্ণমূর্তি	শ্রীসন্ধ্যা সেন
৪৮	সেকালের সঙ্গীতগুণী	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৫১	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅমর
৫২	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান	
৫৩	দেশবিদেশের খেলা	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৪	খেলাধুলা	শ্রীদর্শক
৫৬	বায়োস্কোপিক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬০	নাট্যমঞ্চ	নাট্য সমালোচক
৬২	চিত্র সমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৬৫	ফ্লোর থেকে বলছি	স্টুডিও সংবাদদাতা
৬৬	স্টুডিও সংবাদ	
৬৭	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা	শ্রীঅভিজিত
৬৯	বিদেশী ছবি	শ্রীশা, ব, চ
৭০	বাংলা দেশের ছবি	আনোয়ার আহমদ
৭২	বিবিধ সংবাদ	

প্রচ্ছদ : অমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে বহুচিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮.

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

ষষ্ঠ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে ॥

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ:—অপরূপ তাঁর জীবনালেখ্য অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। বহুচিত্রসহ ৮.

সাধনা

বসুমতী:—এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাঙ্গলায় আর দেখি নাই।।

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬-

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না, ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকএ মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.

ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

সম্পাদকীয়

ত্রিপুরায় সাহিত্য সম্মেলন

ত্রিপুরার অন্যতম গৌরব বাংলাভাষার প্রতি তার প্রাক্তন নৃপতিবর্গের আন্তরিক অনুরাগ। বাংলাই ছিল তার সরকারী ভাষা, দরবারে স্বীকৃত বাণী। সে-সময়ে বাংলার স্বীকৃতি ছিল না বৃটিশ ভারতে। ত্রিপুরাধিপতিদের কাছে সে কারণে বাংলাভাষীদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শনও পাওয়া যায় ত্রিপুরা রাজদরবারের বিভিন্ন দলিলপত্রে। এই ত্রিপুরায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনায়। ত্রিপুরার আতিথ্য গ্রহণ করেছিল সারা ভারতে ছড়ানো বাংলাভাষীদের প্রতিনিধিরা।

সাহিত্যের সম্মেলন সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ। তার চেয়েও বেশী এর দ্বারা জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা। বাংলাভাষা তার যোগ্য সমাদর এখনও পায় নি। পশ্চিম বাংলায় এখনও বাংলা সরকারী ভাষার স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত। ত্রিপুরা অবশ্য বাংলাকে সরকারীভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে বাংলাভাষার যে নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা ও গরিমা আমরা ভারতবর্ষের বাংলাভাষীরা সে মর্যাদা উপার্জন করে এনে দিতে পারি নি আমাদের মাতৃভাষাকে। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠালগ্নে তার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলার বাইরে অন্য ভাষাভাষীদের সামনে বাংলাভাষার পরিচয় তুলে ধরা। আজকের ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে পারস্পরিক মিলন ও ভাবগত ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। কেননা অত্যন্ত দুঃখের হলেও একথা সত্য যে ভাষাগত বিরোধ ভারতের বুক থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নি। প্রায়ই তার দুঃখজনক দৃষ্টান্ত আমাদের হতাশার কারণ হয়ে ওঠে। ভারতের বাংলাভাষীরা সংখ্যার দিক থেকে হিন্দীর পরেই। দুটি রাজ্যের প্রধান ভাষা বাংলা—একটি পশ্চিমবঙ্গ এবং দ্বিতীয় হল ত্রিপুরা। এ ছাড়াও আসামে এবং সুদূর আন্দামানে বাংলাভাষীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। সুতরাং ভাষা হিসাবে বাংলার প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব নিতে হবে বাংলা ও বাংলার বাইরের বাংলাভাষীমাত্রেই। ত্রিপুরার স্থান তব মধ্যে অগ্রগণ্য।

সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং তার উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মেলনে চিত্তাকর্ষক আলোচনা হয়েছে। কবি ও সাহিত্যিকরা ভাষাকে সুন্দর করেন, তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন নতুন বাকভঙ্গিতে, স্মরণীয় উপমায় গদ্যের ঋজুতায়। কিন্তু সাহিত্য ছাড়াও ভাষার অন্য প্রয়োজন আছে যা ব্যবহারিক। সাহিত্য শাখার সভাপতি শংকর এই দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইংরেজি আজ পৃথিবীর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ভাষারূপে স্বীকৃতি পেয়েছে শুধু তার কবিতা বা কথাসাহিত্যের জন্য নয়, এই ভাষার প্রকাশক্ষমতা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের সার্থকতাও তার জনপ্রিয়তার কারণ। বাংলাকেও আজ ভাষা হিসাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রতিদিনের প্রয়োজন অনুযায়ী তার শব্দব্যবহারকে বোধগম্য ও গ্রহণীয় করে তুলতে হবে। সরকারী কাজে ইংরেজির ব্যবহার এখনও বেশ পাকাপোক্তভাবেই রয়েছে ভারতে। ইংরেজির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন করা হয়তো ঠিক হবে না। কিন্তু বাংলাকে তার পাশাপাশি প্রতিদিনের কাজে, সরকারী দলিলপত্রে বিজ্ঞপ্তিতে, আদালতে অবশ্যই স্থান দিতে হবে। নইলে বাংলা যে একটি আধুনিক শক্তিশালী এবং প্রকাশক্ষম ভাষা তার প্রমাণ হবে কি করে?

সাহিত্য সম্মেলন পাঠক ও লেখকদের মধ্যে সংযোগস্থাপনের সুযোগ এনে দেয়। সাহিত্যের মূল আদর্শ সর্বমানবিকতা, সর্বজনীনতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব। বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এই চিরন্তন আদর্শ বিশ্বের সমক্ষে তুলে ধরে গেছেন। এই আদর্শ একালের সাহিত্যিকদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত। বহু ভাষাভাষীর দেশ আমাদের। পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা এবং দ্রাবিড় উৎকল-বঙ্গ আমাদের দেশের ভাষা বৈচিত্র্যের পরিচয় তাদের নামের মধ্যেই বহন করে নিয়ে চলেছে। ভাষাগত সংহতি এবং ভাবগত ঐক্যই হল তার আদর্শ। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন সেই আদর্শেরই প্রতীক। বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে এভাবেই সর্ব ভারতীয় ঐক্যের ও ভাবগত সংহতির বাণী প্রচারিত হোক।

সর্পদংশন

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

'তিলতুলসী গ্রামের সনাতন ঘোড়ুই-এর ছোট ছেলে ভজন ঘোড়ুইকে সাপে কাটল।'

কথা হচ্ছিল অনিবার্যভাবেই দেশের হালচাল নিয়ে। দিনকাল এমনই পড়েছে যে ইদানীং এ-ছাড়া আর কোনো কথা নেই। বয়স এবং অবস্থা নির্বিশেষে যে কোনো আড্ডাতেই যে কোনো বিষয়ে কথা সুরু হয়ে কথার টানে টানে শেষ পর্যন্ত ঐ এক হা-হুতাশের কোবাস। আর পার যাচ্ছে না। এর শেষ কোথায়—। মূল্যবৃদ্ধি নামক সেই বিকট এবং বিরাট দৈত্যটা দিনে দিনে ক্রমেই বিরাটতর আকৃতি ধারণ করছে, এবং তার বিস্তীর্ণ করতলের মধ্যে সাধারণ অসাধারণ সব মানুষ, মন্ত্রী উপমন্ত্রী কোর্ট কাছারি পুলিশ মিলিটারী আইন-কানুন শাসন ব্যবস্থা—সব কিছুই যেন কতিপয় খেলনা। কোনো কিছুতেই তার কোনো মাথা-ব্যথা নেই, যখন খুশী যেমন খুশী সে খেলে যাচ্ছে আপন খেয়ালে—।

এর ওপর আছে আর এক উপসর্গ। বর্ধিত মূল্যেও কোনো জিনিস খোলা বাজারে পাওয়ার উপায় নেই। দুধ ঘি মাখন দালদা ময়দা সুজি পাউরুটি বিস্কুট বেবি-ফুড কেরোসিন এমন কি সাবান টুথপেস্ট দাড়ি কামাবার ব্লেড মায় বাণ্ডিল ব্যাণ্ডের সিগারেট পর্যন্ত চলে গেছে দৃষ্টির আড়ালে। আকাশ ছোঁয়া দামের ওপর আবার অতিরিক্ত কিছু ধরে দিলেই তবে সে-সবের নাগাল পাওয়া যায় অন্যথায় আছে ঘন ঘন লোড শেডিং। আলো নেই পাখা নেই—। জীবনযাপন যে এমন এক দুর্বিসহ নরক যন্ত্রণা, তা বোধহয় এর আগে কোনোদিন মানুষ এমন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে নি।

আমাদের মধ্যে হিতেন প্রথম থেকেই চুপচাপ ছিল। কথায় কথায় আমরা যতই ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম, মুখ দিয়ে ছুটছিল কথার ফোয়ারা—প্রায়শই যা শালীনতা ও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে সামনের টেবিলে প্রবল মুষ্টাঘাত, ততই যেন হিতেন আরো নির্বিকার ও উদাসীন হয়ে উঠছিল। না, তাও নয়—। তার দুই ঠোঁটে এমন একটা আলগা হাসি খেলা করছিল, তার দু

চোখের তারায় অশ্রান্ত কৌতুক—। আমাদের অনির্দিষ্ট লক্ষ্য রাগটা একটা লক্ষ্যস্থল খুঁজে পাচ্ছিল যেন। এ-সব কথায় হিতেনের এত মজা পাওয়ার কি আছে!

আমাদের মধ্যে প্রণবেশ হঠাৎ বলে উঠল, 'তা হিতেন একেবারে চুপচাপ কেন? না গেঁয়ো সরল বোকা চাষীদের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ হচ্ছে দু' পয়সা। তাই আর এ-সব বিষয় ভাল লাগছে না—'

প্রণবেশের কথায় আমরা প্রত্যেকেই যেন প্রতিশোধ নেওয়ার সুখ অনুভব করলাম এবং ঠা ঠা করে হেসে উঠলাম সশব্দে।

হিতেন আমাদের বন্ধু। কিন্তু বন্ধু-হলেও আমাদের আড্ডার নিয়মিত অংশীদার নয়। সে রাজ্য সরকারের দপ্তরে চাকরী করে। মফঃস্বলে মফঃস্বলেই তার কাজ। এখন আছে বাঁকুড়া না বর্ধমান জেলার কোথায় বি-ডি-ও হিসেবে। ব্লক ডেভেলপ-মেন্ট অফিসার—বেশ গালভরা ডেজিগনেশন। ছুটি-ছাটায় বাড়ি ফিরলে আমাদের আড্ডায় আসে মাঝে মধ্যে। বলার চেয়ে শোনেই বেশী। মধ্যে মধ্যে কর্মসূত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার গল্প-টল্প শোনায়।

প্রণবেশের কথায় হিতেনের ঠোঁট থেকে সেই আলগা হাসিটুকু কে যেন ন্যাতা বুলিয়ে মুছে নিল। নিভে গেল চোখের তারায় সেই কৌতুকের ঝিলিকটুকুও। আমাদের সেই সমস্বর ঠা ঠা করা হাসি মিলিয়ে যেতে যেতেই দেখলাম ওকে কেমন যেন অসহায় আর নিরাবলম্বের মত দেখাচ্ছে। সে জনে জনে আমাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর বলতে চাইছে কি যেন।

হাসি থামলেও হাসির রেশ মিলোতে একটু সময় নিল। ততক্ষণ মুখ চুন করে রইল হিতেন তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না ভাই সে সব কিছু নয়। তোদের কথা শুনতে খারাপও লাগছে না। তবে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই, গ্রামের মানুষের দুঃখ দুর্দশা চাক্ষুষ দেখতে পাই—'

বাধা দিয়ে সুকুমার বলল, 'তাই বলে আমাদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনে তুই হাসবি?'

'না, না—। হাসি নি ঠিক—' তাড়াতাড়ি বলল হিতেন, 'গ্রামের ঐ মানুষগুলো যে কি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে আছে তা ভাবাই যায় না। সেই তুলনায় তোদের ঐ ঘি দুধ মাছ মাংস না পাওয়ার দুঃখ, আলো না জ্বলা বা ফ্যান না ঘোরার কষ্ট এত সামান্য আর ইনসিগনিফিক্যান্ট যে—মানে—আমার কাছে কথাগুলো খুব হাস্যকর লাগছিল। এক মুঠো ভাত বা এক ফালি ন্যাকড়ার জন্য মানুষ যে কি করতে পারে আর পারে না, সে সব কথা শুনলে তোদের ঐ নিজেদের দুঃখ-টুঃখগুলোকে নিছক বিলাসিতা বলে মনে হবে।'

হিতেনের কথার সুরে এক ধরনের বিষণ্ণতা ছিল অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ছিল যা আমাদের অন্তরকেও স্পর্শ করল। হিতেনকে আমরা বরাবরই খুব নরম মনের ছেলে বলে জানি। দেখলাম এখনও সে একটুও পাল্টায় নি। ক্ষণেক নীরবতার পর আমাদের মধ্যেই কে যেন বলল, 'বল না। গ্রামের ঐসব মানুষগুলোর দুঃখ কষ্টের কথা কিছু বল না। শুনি—'

'শুনবি?—' চকচকে চোখে তাকাল হিতেন। তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তাহলে তিলতুলসী গ্রামের সনাতন ঘোড়ুই-এর ছোট ছেলে ভজন ঘোড়ুই-এর কথাই বলি। শোন—'

হিতেন বলতে আরম্ভ করল।

তিলতুলসী গ্রামের সনাতন ঘোড়ুই-এর ছোট ছেলে ভজন ঘোড়ুইকে সাপে কাটল। তখন রাত পুইয়ে এসেছে, পোয়াতি তারা জ্বলজ্বল করছে আকাশে। অন্ধকারের ঘোর কাটে নি, কিন্তু ঠান্ডা বাতাসে এক রকমের ভিজে ভিজে ভোর ভোর গন্ধ। ভজন ঘুম চোখে দরজার আগল খুলে বাইরের দাওয়ায় বেরুল। গ্রামে দিন সুরু হয়ে যায় শহরের ঢের আগে। পুরোপুরি আলো ফোটার আগেই গ্রামের মানুষদের দিনের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়।

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাত-পা টান টান করে আড়মোড়া ভাঙল ভজন, তখনও দু' চোখের দৃষ্টি পাতলা ঘুমের পর্দায় আচ্ছন্ন। তারপর ডান-পাখানা বাড়িয়ে দাওয়া থেকে উঠোনে ফেলতেই ভজনের সারা শরীরের ভেতর দিয়ে একটা ঠান্ডা শিরশিরানি যেন স্রোতের মত বয়ে গেল। কি যেন পড়েছে পায়ের তলায়, ভিজে ভিজে ঠান্ডা পিছল—। যেন সহজাত প্রবৃত্তির বশেই চকিতে পাখানা টেনে তুলে নিল সে, তারপর সদ্য ঘুমের ঘোর কাটা চোখে তাকিয়ে দেখতে চাইল বস্তুটা কি। ততক্ষণে ঠিক মাথার ওপরেই যেন একটা প্রবল হিস-হিস শব্দ আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইছে। দু' চোখ তুলে সেই আবছা অন্ধকারে ভজন তাকিয়ে দেখল লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে এক কালনাগিনী, দুলছে হিল হিল করে সামনে পেছনে। দশাসই পুরুষের হাতের পাঞ্জার মত বিশাল চক্র হিম ঠান্ডা বরফের কুচির মত নিষ্পলক দুটো চোখ, দু' চোখের মাঝখানে খড়ম চিহ্ন—সব সেই ভোর রাতের তারার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল ভজন। যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল সে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল দুলুনি থামিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল সেই যমের দোসর। ভজন চকিতে চেতনা ফিরে পেল। বুঝল ছোবল দেয়ার আগে তার কপাল লক্ষ্য করে তাক করছে সাপটা। আত্মরক্ষার তাগিদেই ভজন পেছন দিকে লাফ দিল একটা, সেই সঙ্গে তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা চিৎকার—বিকট এবং মর্মান্তিক। আর সঙ্গে সঙ্গেই সপাৎ করে একখানা চাবুকের মত নেমে এল সাপটা। ভজন অনেকটা পেছিয়ে যাওয়ার দরুন ছোবলটা পড়ল তার বাঁ পায়ের পাতায়।—

ভজনের সেই অমানুষিক চিৎকারে বাড়ির সকলেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হুড়মুড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সবাই। ভজনের বাপ সনাতন, ওপরের দুই দাদা—পবন আর বৃন্দাবন বউ ঝিরা, মা মোক্ষদা। সবাই ছুটে এসে দেখল ভজন এলিয়ে পড়েছে দাওয়ার ওপর, আর সাপটা যেন চরম প্রতিহিংসা আর আক্রোশের বশে তখনও তার পায়ের পাতা কামড়ে ধরে আছে আর মাথাটা অল্প কাত করে ভজনের শরীরে ঢেলে দিচ্ছে তার ভান্ডারে সঞ্চিত প্রাণঘাতী বিষের শেষ বিন্দুটুকুও। হৈ হৈ করে উঠল সকলে। সকলেই অপ্রস্তুত ছিল। ভজনের দুই দাদা লাঠি আন শড়কি আন বলে হাঁকাহাঁকি করতে লাগল, কিন্তু কে যে আনবে কেউ কোনো দিশা পেল না। ইতিমধ্যে বাড়ির মেয়েরা হাউ মাউ করে মরাকান্না জুড়ে দিয়েছিল। তখন সেই অতি ভয়ঙ্কর আর সুন্দর সাপটা যেন বিরক্ত হয়েই ভজনের পায়ের পাতা ছেড়ে দিয়ে সর সর করে মসৃণ গতিতে এঁকেবেঁকে কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ততক্ষণে ভজনের মুখ থেকে গাঁজলা ভাঙ্গা সুরু হয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভজনের শরীরে মৃত্যুর চিহ্নগুলো খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল। এর মধ্যেই সারা তিলতুলসী গ্রামে খবর চাউড় হয়ে গিয়েছিল। ফলে সনাতন ঘোড়ুইএর উঠোনে থই থই করছে মানুষ। বৃন্দাবন আর পবন মেয়েদের শাড়ির পাড়গুলো ফ্যাস ফ্যাস করে ছিঁড়ে ভজনের বাঁ পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ফেরতার পর ফেরতা বাঁধন দিয়েছিল খুব কষে, জনকয়েক চলে গেছে দুখানা গ্রাম পরে যে বাজুবন্ধ গ্রাম, সেখান থেকে সাপের বিষ ঝাড়তে ওস্তাদ নামকরা অঘোর গুণীনকে ডেকে আনতে। কিন্তু সবাই জানে অঘোর গুণীন আসা পর্যন্ত টিকবে না ভজন। এর মধ্যেই দাওয়ায় শোয়ান ভজনকে দেখাচ্ছে যেন এইমাত্র একটা নীলকালির পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে এল সে। কপাল থেকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত ঘন নীল হয়ে গেছে শরীরটা, ঠোঁটে আর গালে ফেকো শুকিয়ে উঠেছে, দুই চোখ ওল্টানো। ভজনের মা মোক্ষদা ডাক ছেড়ে কাঁদছে, বউ বাসনালতা ফিট হয়ে গিয়েছিল প্রথমেই—এখনও জ্ঞান ফেরে নি—কারা যেন ওর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফেরানর চেষ্টা করছে, জলের স্রোতে ভাসছে তার আলুথালু চুল। দুই দাদা ঘন ঘন চোখ মুছছে কোঁচার খুঁটে। উপস্থিত কেউই চোখের জল চেপে রাখতে পারছে না। আজকের সকালটা কি মারাত্মক হয়েই না দেখা দিল ঘোড়ুই পরিবারে। অমন জল-জ্যান্ত জোয়ান মন্দ মানুষটা দেখ দেখ করে কাঠ হয়ে গেল।

অঘোর গুণীন যখন এসে পৌঁছুল তখন দিনের প্রথম রোদের ছোঁয়ায় মাঠঘাট সোনালী। সে এসেছে গরুর গাড়িতে যারা ডাকতে গিয়েছিল তাদেরই সঙ্গে। অঘোর গুণীন

গরুর গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি অকুস্থলে এসে হাজির হল। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, চেহারাটা দড়ির মত পাকান আর লম্বা, একরাশ কালোজিরের মত চুলের ঢল উঁচু করে ফোলান ঝাঁপান, নিয়ম মতই সে গাঁজায় দম দিয়ে বেরিয়েছে এই সাত-সকালেই—যতটা না নেশার তাগিদে তার চেয়ে বেশী আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। ফলে অঘোর গুণীনের ভাঁটার মত গোল চোখ দুটো টকটকে লাল। তাকে দেখলে তার ক্ষমতার ওপর একটা ভয় মেশান আস্থা জন্মে।

অঘোর গুণীন দাওয়ায় শোয়ান ভজনের কাছে এসে দুটো লাল টকটকে চোখ পাকিয়ে তাকাল তার দিকে, তারপর কোমর ভাঁজ করে ঝুঁকে পড়ে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল। অবশেষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ বিকৃত করে বলল, 'বড় জ্বর লাগে কেটেছে গো। সাক্ষাৎ মাতা বিষহরির আপনকার কণ্ঠের অলমকার—সেই কালনাগিনী বিষ ঢেলেছে। সে বিষের কাটান দেয় এমন গুণীন কোথা—'

ভজনের বুড়ি মা মোক্ষদা সমানে চিল চিৎকার করে মড়াকান্না কেঁদেছে এতক্ষণ। কেঁদে কেঁদে হেঁদিয়ে গিয়ে সদ্য সে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। এখন সে হঠাৎ আবার একটা বুকচেরা চিৎকার করে কেঁদে উঠে পাগলের মত ছুটে এসে অঘোর গুণীনের দু পা একসঙ্গে জড়িয়ে ধরল, 'দে বাবা দে। আমার ব্যাটার পরানডা ফিরায়ে দে—'

তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে নিতে নিতে অঘোর গুণীন বলল, 'দাঁড়াও মা জননী। নেড়ে চেড়ে বিষের রকম ডে এটটু দেখে নি—'

সে উবু হয়ে ভজনের পাশে বসল। ভজনের অসাড় হাত পা ভাঁজ করল খুলল, এর মধ্যেই শক্ত হয়ে উঠেছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। চোখের পাতা টেনে খুলে দেখল, মণি দুটো মার্বেল গুলির মত কঠিন নিশ্চল। এক গোছা চুল ধরে সামান্য টানতেই গোছাশুদ্ধ উপড়ে এল হাতের মধ্যে। মুখ ভিরকুটি করে অঘোর গুণীন বলল, 'মাতা বিষহরির আপনকার হাতে ঢেলে দেয়া বিষ তালুতে গিয়ে ঠেকেছেন। আমার তেমন ক্ষ্যামতা নেই গো মাতা বিষহরির আপনকার অভিলাষ খণ্ডন করি—'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল অঘোর গুণীন, চারপাশে তাকাল ভাঁটার মত চোখ ঘুরিয়ে, তারপর গরুর গাড়ির দিকে পা বাড়াল।

ভজনের বড় ভাই পবন ছুটে এসে পথ-রোধ করে দাঁড়াল, 'তাহলে কোনো আশাই নাই গুণীন!'

'আশার কথা কি গো কত্তা—' অঘোর গুণীন ওর মধ্যেই হুলদেটে দাঁত বার করে হাসল, 'মাতা বিষহরি আপনকার অমকে যারে টেনে নেন তারে ফেরান কার বাপের সাধ্যি—'

অঘোর গুণীন জবাব দিয়ে চলে যেতেই আবার রোল উঠল কান্নার। এবারে শুধু বাড়ির লোকেরাই নয়। কাঁদলো আরো অনেকে। প্রতিবেশীরা, ভজনের বন্ধু-বান্ধব—অনেকেরই চোখের জল আর বাগ মানল না। হাউমাউ করে কাঁদতে সুরু করল অনেকে, আর যেহেতু কান্না অতি ছোঁয়াচে রোগ, কারো চোখই আর শুকনো রইল না। ওরই মধ্যে মুখে মুখে ভজনের প্রশংসা—কত ভাল ছেলে ছিল ভজন, কেমন মান্য করত বয়স্ক-দের, কত উদার ছিল তার মন। ভাল মানুষদের ভগবান বেশীদিন থাকতে দেয় না পৃথিবীতে, টেনে নেয় নিজের কাছে।

সাপে কাটা মড়া পোড়াতে নেই। নদীতে ভাসিয়ে দিতে হয় কলার মান্দাসায় করে। উদ্দেশ্য—যদি তেমন ওস্তাদ গুণীনের হাতে পড়ে হয়ত মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হতে পারে। আসলে সাপে কাটা রোগী নাকি প্রকৃতপক্ষে মরে না, দেহযন্ত্রের কলকব্জাগুলো বন্ধ হয়ে যায় মাত্র। বিষের ক্রিয়া কাটিয়ে দিতে পারলেই আবার চালু হয়ে যায় সব। এছাড়া লক্ষ্যীন্দর বেহুলার উপখ্যানও এব্যাপারে একটা নজীর হয়ে আছে। সুতরাং ভজনের দাদারা এবং বন্ধু-বান্ধব চোখ মুছতে মুছতেই কলার মান্দাসা তৈরীর কাজে হাত দিল। জনা দুই বাগান থেকে কেটে এনে গোটা কয়েক কলাগাছের ধড় ফেলল উঠোনে। থিতিয়ে পড়া কান্নার রোল আবার প্রবল হয়ে উঠল। ঘোড়ুইদের উঠোনে এখন অনেক মানুষ। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী—পুরো তিলতুলসী গ্রামখানাই যেন এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। কারো বাড়িতে আজ হাঁড়ি চড়ে নি, বাসি চুলোয় গোবরের পোঁছ পড়ে নি, দাওয়া নিকোনো হয় নি। ঘরে ঘরে আজ অরন্ধনের পালা। শোকের কালোছায়া।

ঠিক এই সময় একজন সন্ন্যাসীকে ঘোড়ুই বাড়ির উঠোনে দেখা গেল—

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে গ্রন্থমালা

Rabindranath Tagore: THE CENTRE OF INDIAN CULTURE

বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ও আদর্শ সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা মার্চ ১৯১৯। মূল্য ১-০০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম**

প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী। শ্রীনন্দলাল বিহারী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক চিত্রালংকৃত। মূল্য ২-০০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **আশ্রমের রূপ ও বিকাশ**

'আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা', 'আশ্রমের শিক্ষা' এবং 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' এই তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রে শোভিত। মূল্য ১-২৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **বিশ্বভারতী**

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের অধিক কাল শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সংগ্রহ। মূল্য ২-৫০ টাকা।

অজিতকুমার চক্রবর্তী ॥ **ব্রহ্মবিদ্যালয়**

১৩১৮ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ইতিহাস। মূল্য ১-৮০ টাকা।

উইলিয়াম পিয়রসন ॥ **শান্তিনিকেতন-স্মৃতি**

শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের আদিযুগের বিদেশী শিক্ষাব্রতীর বিচিত্র স্মৃতিকথা। শ্রীমুকুল দে কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রে ভূষিত। শ্রীঅমিয়কুমার সেন কর্তৃক অনূদিত, মূল্য ২-৫০ টাকা।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস ॥ **আমাদের শান্তিনিকেতন**

শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম যুগের আলেখ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রে অলংকৃত। মূল্য ৫-০০ টাকা।

SANTINIKETAN 1901-1951

A chronicle in pictures of the poet's school with two introductory essays by Rabindranath Rs. 8-50; 11 00.

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা-১৬

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

হঠাৎ আমাদের ভেতর থেকে রাজীব অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করল, 'দূর। শুনতে চাইলাম গ্রামের মানুষের অভাব অনটন দুঃখ কষ্টের কথা, আর হিতেন কিনা ফেঁদে বসল কি এক সাপে কাটার কেচ্ছা—'

যদিও হিতেনের বর্ণনার গুণে শুনতে খারাপ লাগছিল না, বস্তুতঃ গ্রামবাংলার একখানা জীবন্ত চিত্রই যেন ফুটে উঠছিল চোখের সামনে, তবু ভেতরে ভেতরে হিতেনের গল্পের অপ্রাসঙ্গিকতা আমাদের প্রত্যেককেই পীড়া দিচ্ছিল। ধান ভানার কথা বলতে গিয়ে হিতেন একি শিবের গাজন গাইতে সুরু করল। এখন রাজীবের এই অসহিষ্ণুতার সমর্থনে আমাদের মধ্যে অনেকেই বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক। গ্রামের মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা বলবি বলে তুই একি এক সাপখোপের গল্প সুরু করলি হিতেন। আর যদি বলিস সাপ বাঘ বা কুমীরের মুখে প্রাণ দেওয়াটাও একরকমের দুঃখ, তাহলে বলব সে ত বরাবরের দুঃখ, সকলেরই জানা, তোর মুখ থেকে আর নতুন কি শুনছি—'

যতক্ষণ আমরা কথা বললাম হিতেন চুপ করে সব শুনল আর জন জনে আমাদের মুখের দিকে তাকাল। ওর দুই ঠোঁটে সেই পুরোনো হাসিটাই আবার ফিরে এসেছে—মৃদু স্মিত সহিষ্ণু অথচ কোথায় যেন একটু ব্যঙ্গের মিশেল। আমাদের বলা শেষ হলে সে আস্তে আর সংক্ষেপে বলল, 'সবটা শোন, তারপর যা বলার আছে বলিস।'

অপারক ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাজীব বলল, 'বেশ। তবে বল।' হিতেন আবার সুরু করল।

কখন যে সেই সন্ন্যাসী ঘোড়ুই বাড়ির উঠোনে এসে ঢুকেছে লক্ষ্য করে নি কেউ। আসলে সেখানে এখন মেলার মত ভিড়, আশপাশ গাঁ থেকেও এসে জুটেছে কিছু মানুষজন, তার ওপর এই রকম একটা শোকাবহ দুর্ঘটনা—কে আর কাকে লক্ষ্য করে। সন্ন্যাসীর চেহারাটা বেশ মানানসই। অনেকটা লম্বা, ধুলো ময়লা সত্ত্বেও গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা, টানা টানা চোখের দৃষ্টি যেন কাছের সব কিছু ছাড়িয়ে চলে গেছে কোথায় দূরে, খাড়া নাক, পরনে গেরুয়া, মাথায় জটাজুট, কাঁধে ঝোলা। আর সকলের থেকে মাথায় অনেকটা উঁচু সন্ন্যাসী দু'একজনকে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে এখানে? ভিড় কিসের? কাঁদছে কেন সকলে?'

কেউ কেউ জবাব দিয়েছে, 'সর্প দংশন গো ঠাকুর, সর্প দংশন। অঘোর গুণীন জবাব দে গেছে। বাঁচার আশা নাই—'

পুনে সন্ন্যাসী অস্থিরভাবে ভিড় ঠেলে এসে পৌঁছেছে দাওয়ার কাছে যেখানে তখনও ভজনের নিষ্প্রাণ দেহ শোয়ান, 'আমাকে একটু দেখতে দাও—'

ততক্ষণে সকলেরই নজর কেড়ে নিয়েছে সন্ন্যাসী। সকলেই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়েছে তাকে। সন্ন্যাসী ভজনের কাছে এসে খুব নজর করে দেখল তাকে অনেকক্ষণ, তারপর চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'এর অভিভাবক কে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

ভজনের দুই দাদা পবন আর বৃন্দাবন হাত জোড় করে সামনে এগিয়ে এল।

সন্ন্যাসী বলল, 'আমি এর চিকিৎসা করব। আমার কাছে সাপে কাটার ওষুধ আছে। একটু কাটা ছেঁড়া করতে হবে। আপত্তি নেই ত আপনাদের?'

বৃন্দাবন জোড় হাতেই বলল, 'আপনার যেমন খুশী করেন ঠাকুর, শুধু আমার ভায়ের পরানডা ফিরায়ে এনে দেন—'

স্মিত মধুর হাসল সন্ন্যাসী, 'প্রাণ ফেরা না ফেরা তাঁর ইচ্ছে আমি শুধু আমার কাজ করে যাব।'

সন্ন্যাসী আসন পিঁড়ি হয়ে বসল দাওয়ায় ভজনের পাশে। কাছেই নামিয়ে রাখল ঝোলা। ঝোলার ভেতর থেকে অনেক কিছু বার করল। হামানদিস্তে অজানা কোনো গাছের মোটা শিকড় খানিকটা, একখানা ঝিনুক, ধারাল ঝকঝকে ছুরি। ছুরি দিয়ে শিকড়ের বেশ খানিকটা কেটে নিয়ে হামানদিস্তের মধ্যে ফেলে থেঁতো করল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তারপর সেই থেঁতো করা শিকড় থেকে রসটুকু নিংড়ে নিল ঝিনুকে। এইসব হয়ে গেলে শুরু হল অপারেশন। ছুরি দিয়ে বেশ খানিকটা চিরল শরীরের কয়েকটা জায়গা। দু'পায়ে দুই ডিম, উরুতে, হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলো, কুচকির কাছে। তারপর একটা স্পুনার দিয়ে ঝিনুকের সেই রস ফোঁটা ফোঁটা চালান করে দিল শরীরের মধ্যে ঐ সব চেরা জায়গাগুলো দিয়ে। খানিকটা থ্যাতলান শিকড় হাঁ করিয়ে জিভে ঘষে দেওয়া হল ভজনের। মন্ত্র নয় তন্ত্র নয়, কোনো অলৌকিক ক্ষমতার ভান নয়—সন্ন্যাসী একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও সার্জনের মত পরপর সব কাজগুলো করে গেল।

এরপর শুরু হল অপেক্ষা। ইতিমধ্যেই খবর চাউড় হয়ে গিয়েছিল স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে এক দেবদূত সন্ন্যাসীর বেশে ভজনকে পুনর্জীবন দিতে। মুখ থেকে মুখে পল্লবিত হয়ে হয়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল। হাটলে নাকি মাটিতে ছায়া পড়ে না সন্ন্যাসীর, হঠাৎ দেখলে আগুনের শিখা বলে ভ্রম হয়, প্রতি প্রশ্বাসে তার মৃগনাভির সুগন্ধ। কে নাকি সন্ন্যাসীর জটা থেকে খসে যাওয়া এক গাছা চুল কুড়িয়ে পেয়েছে, তুলে দেখে সোনার তার। মুখে মুখেই একটা কিংবদন্তীর সৃষ্টি হতে চলেছে। এখন আশেপাশের সব গ্রাম থেকেও মানুষ স্রোতের মত চলে আসছে তিলতুলসী গ্রামের ঘোড়ুই বাড়ির উঠোনে। উদ্দেশ্য, কোনোভাবে ঐ অলৌকিক সন্ন্যাসীর কৃপাভাজন হওয়া। নানা জনের নানা রকম প্রার্থনা। কোনো বন্ধ্যা নারী চায় সন্তান হওয়ার ওষুধ, কোনো পুরুষের কামনা বিরূপা রমণীকে বশ করার মন্ত্র। ওর মধ্যেই লাঠি হাতে ঝুঁকে ঝুঁকে চলেছে কোমর ভাঙ্গা এক বুড়ি, ক্ষীরো নাপতেনী। তোমার আবার কি চাই গো ঠাকমা—এ প্রশ্নের উত্তরে খরখরে কাঁপা গলায় সে বলল, 'আতি যাচ্ছি ভগবানের খোঁজে। খোঁজ পেলে একবার সে বেটাকে শুধিয়ে দেখব তার আক্কেলটা কি। তারপর মুয়ে মারব মুড়ো ঝাঁটার বাড়ি পাঁচ কুড়ি পাঁচবার—'

ঘোড়ুই বাড়ির উঠোনে অত মানুষের ভিড়, কিন্তু কোনো গোলমাল নেই। সন্ন্যাসী ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছে চুপ করে থাকতে, আর সব মানুষ যেন মন্ত্রমুগ্ধভাবে নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। দাওয়ায় শোয়ান রয়েছে প্রাণহীন ভজনের কালিবর্ণ দেহ, পাশে আসন পিঁড়ি ভাবে টান টান হয়ে বসে আছে সন্ন্যাসী—আগুনের মত তার গায়ের রঙ। সন্ন্যাসীর চোখের একাগ্র দৃষ্টি ভজনের মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে, একটু দূরেই উবু হয়ে হাত জোড় করে গরুড় পক্ষীর ভঙ্গীতে বসে আছে ভজনের দুই দাদা পবন আর বৃন্দাবন, আরো খানিকটা দূরে থেকে ঘের দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের দঙ্গল। সকলের চোখেই উৎকণ্ঠা কৌতূহল। সত্যিই কি ভজন বাঁচবে? সত্যিই কি পারবে সন্ন্যাসী মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের মত অসাধ্য সাধন করতে? সত্যিই কি সন্ন্যাসী স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক ছদ্মবেশী দেবদূত? না আর এক ভণ্ড জুয়াচোর বুজরুক—

প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর প্রথম শুভ লক্ষণ দেখা গেল। ভজনের শরীরের সেই ঘোর কালিমা যেন ফিকে হয়ে এল একটু, তার নিস্তব্ধ বুকে দেখা দিল ক্ষীণ স্পন্দন। অতি ক্ষীণ, বোঝা যায় না প্রায়, তবু কারো কারো চোখে পড়ল, আর ফিসফিস কানাকানি করে সেই কথা ছড়িয়ে পড়ল সকলের মধ্যেই। কেউ বিশ্বাস করল কেউ করল না, তবু রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল সবাই। মনে মনে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস এতদিনে চোখের সামনে একটা অতিপ্রাকৃত ঘটনা দেখা যাবে, দেখা যাবে এমন কিছু যা সচরাচর ঘটে না, যে ঘটনা সাধারণ মানুষের

আয়ত্তের বাইরে, দৈব ঘটনার মত যা অস্বাভাবিক অসাধারণ অভিনব—

প্রথম প্রাণের স্পন্দন দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাসী নিজের হাতের মধ্যে ভজনের শিথিল করজিটা তুলে নিয়েছিল, তার চোখ মুখ যেন চকচক করে উঠেছিল আসন্ন সাফল্যের আনন্দ আর উত্তেজনায়। নিজের হাতের মধ্যে ভজনের হাতখানা ধরে ঠায় বসে রইল সে। তবে এতক্ষণের বসে থাকা আর এখনকার বসে থাকার মধ্যে তফাৎ আছে। এতক্ষণ সে বসেছিল পাষাণের মত, নিশ্চল, যেন ধৈর্য সহিষ্ণুতা আর তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি, তার মুখে কোনো ভাবের বিকাশ ছিল না, নির্বিকার নিরাসক্ত নিরুত্তাপ। আর এখন সে তাকিয়ে আছে নিমীলিত নয়ন ভজনের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে, চোখ দুটো জ্বলছে দু' টুকরো অঙ্গারের মত, হাতের মধ্যে ধরা ভজনের করজিতে সে শুনতে পাচ্ছে ফিরে আসা প্রাণের অস্ফুট পায়ের শব্দে। বিপুল উত্তেজনায় একটু সামনে ঝুঁকে পড়েছে সন্ন্যাসী, তার হাবভাবে ফুটে উঠেছে তীর পবান ধনুকের টান টান ভঙ্গী। এখন দৃষ্টিগোচরভাবেই ভজনের সর্বাঙ্গের সেই কালিমা অনেকটা কেটে গেছে, বাকিটাও কেটে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি—প্রবল ঝড়ে আকাশ থেকে যেমন উড়ে যায় কালো মেঘ। চোখ মুখ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, এবং তাকিয়ে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ভজনের বুক নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ধীরে ধীরে উঠছে নামছে উঠছে নামছে, উঠছে—

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভজন প্রথম চোখ খুলল। অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'মা'—

জঙ্গলের আগুনের মত কথাটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। চোখ মেলেছে। ভজন। কথা বলেছে। মরামানুষ প্রাণ ফিরে পেয়েছে তিলতুলসী গ্রামে। সাক্ষাৎ ভগবান নীচে নেমে এসে নিজের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে ভজনের প্রাণ। স্রোতের মত লোক ছুটল আশেপাশের গাঁ থেকে তিলতুলসী গ্রামের উদ্দেশ্যে। ঘোড়ুই বাড়ির উঠোনে জড়ো হওয়া মানুষগুলো অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল সন্ন্যাসীর চরম স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষায়, আপন আপন দুঃখ কষ্টের কথা বলে নিদান দেয়ার জন্য। তাদের বুঝি ঠেকিয়ে রাখা যায় না আর।

শান্তভাবে সন্ন্যাসী বলল, 'এবারে একে ঘরের ভেতরে নিয়ে চল।'

ভজনের দুই দাদা আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব মিলে ধরাধরি করে ভজনকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। পেছন পেছন গেল সন্ন্যাসীও। নিজের হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে লাগিয়ে দিল আগল। বিছানায় ভজনকে শোয়ান হলে সন্ন্যাসী অল্প গলা খাঁকারি দিয়ে এই প্রথম একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলল, 'দেখ বাপু, তোমাদের একটা ভুল ধারণা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তোমরা সকলেই ভাবছ আমি বুঝি কোনো মন্ত্র তন্ত্রের জোরে সাপে কাটা মড়াকে বাঁচিয়ে তুলেছি। সত্যি কথা শোন—মন্ত্রতন্ত্র বলে কিছু নেই। সব বুজরুকি আর ধাপ্পা। ওকে বাঁচিয়েছে দ্রব্যগুণ। আমার ঝোলায় যে শিকড় ছিল, যার রস ওর শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছি, তাই ওকে ফিরিয়ে এনেছে যমের মুখ থেকে।' একটু থামল সন্ন্যাসী, তারপর ভরাট গম্ভীর গলায় বলল, 'তবে এ ওষুধের কার্যকারিতা বড় জোর ঘণ্টা চার পাঁচ। চার পাঁচ ঘণ্টা পরে আবার ও আস্তে আস্তে ঢলে পড়বে। তার আগেই ওকে বড় জাম বাটির তিন চার বাটি পান্তাভাত কচলানো জল খেতে দেবে। তাহলে আর ভয় নেই। ঐ পান্তাভাতের জলই ওর শরীরের বাকি বিষটুকু ধুয়ে বার করে নিয়ে আসবে বাইরে। বুঝেছ। জল দেয়া ভাত হলে চলবে না। সত্যিকারের বাসি পান্তা ভাত হওয়া চাই।

উপস্থিত সকলেই ঘন ঘন ঘাড় নাড়ল। ভজন এতক্ষণে পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। সে সঠিক বুঝতে পারছে না কিছু, শুধু জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসী বলল 'এবারে আমি যাব। কিন্তু সোজা পথে ত যাওয়া যাবে না। লুকিয়ে পালাবার ব্যবস্থা করে দাও—'

ভজনের দুই দাদা চতুর হাসি হাসল। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস পরামর্শ করে সন্ন্যাসীকে বলল, 'এ'জ্ঞে একটু অপেক্ষা করেন আপনি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবেন।'

ভজনের দুই বন্ধু পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। তারপর সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো নেয়ার ধুম লেগে গেল। সবাই নীচু হয়ে বার বার চরণ স্পর্শ করতে লাগল সন্ন্যাসীর। তখনও ভজনের উঠে বসার মত ক্ষমতা হয়নি। তা সত্ত্বেও বৃন্দাবন সন্ন্যাসীকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল তার বিছানার পাশে। ভজন অক্ষম দুর্বল হাত বাড়িয়ে কোনো রকমে সন্ন্যাসীর পা ছুঁয়ে সেই হাত নিজের কপালে ঠেকাল।

মিনিট দশেক পরে সন্ন্যাসী সকলের সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ছাঁচতলায় ছই-দেয়া পর্দা লাগান গরুর গাড়ি অপেক্ষা করছিল। এদিকে সব চুপচাপ নিথর। নিঃসাড়ে সন্ন্যাসী গাড়ির ছই-এর মধ্যে ঢুকে গেলে পর্দা ফেলে দেয়া হল। ভজনের এক বন্ধু গাড়োয়ান। জিভ আর টাগরায় আলগোছে শব্দ তুলে আর দুটো গরুর পেটে হালকা লাথি মেরে মেরে সে খিড়কির দোর পেরিয়ে গাড়ি এনে ফেলল বাইরের খোলা মাঠের রাস্তায়। তারপর ছোটাল দুদ্দাড়।

হিতেন থামতেই রাজীব চটাস চটাস শব্দে হাততালি দিয়ে উঠল, 'বাঃ ভাই বাঃ! দারুন রূপকথা শোনালি একখানা।'

আমরা কেউ সরবে কেউ নীরবে সমর্থনসূচক হাসি হাসলাম।

স্মিত হাসি হেসে হিতেন বলল, 'গল্পটা তোদের রূপকথা বলে মনে হচ্ছে?'

'রূপকথা নয়! সাপে-কাটা মড়া সন্ন্যাসীর কৃপায় পুনর্জীবন পেয়ে আবার সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল। এর চেয়ে ভাল রূপকথা আর কি হয় আধুনিক কালে?'

একটু চুপ করে রইল হিতেন। চকিতে যেন একখানা চলতি মেঘের ছায়া পড়ল তার সদা হাসি-খুশী মুখখানার উপর। যেন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে হিতেন বলল, 'ভজন কিন্তু বাঁচেনি—'

হঠাৎ যেন একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটে গেল ঘরের মধ্যে। আমরা সব চুপ। বেলুনের মত কেঁপে ওঠা হালকা মেজাজ আমাদের যেন আলপিনের খোঁচা খেয়ে চুপসে গেল। কে যেন বলল অস্ফুটে, 'বাঁচেনি? সেকি? কেন?—'

হিতেন বলল, 'বাঁচবে কি করে। পান্তা ভাত পাওয়া গেল না যে।'

আবার আমরা চুপচাপ। সবশেষে সমীর অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠল, 'দূর! তা হয় নাকি কখনও। গাঁ-দেশে বলে প্রত্যেক বাড়িতেই পান্তা ভাত থাকে—'

এক নজর সমীরকে দেখল হিতেন। একটু ম্লান হাসল 'সন্ন্যাসীরও সেই রকম ধারণা ছিল। তাই অতি সহজে বিধান দিয়েছিল পান্তা ভাত-কচলান জল খাওয়ার। কিন্তু রাত্রের উদ্বৃত্ত ভাতে জল ঢেলে দিলেই ত তবে সকালে পাওয়া যায় পান্তা ভাত। তিল তুলসী আর আশেপাশের দশ-বিশখানা গ্রামের প্রায় সব মানুষই ভাতের মুখ দেখেনি গত দেড়-দু' মাসের মধ্যে। পান্তা করার মত সংস্কৃতি ভাতের ত প্রশ্নই ওঠে না কেবলে—'

চকিতে হিতেনের গল্পের সমগ্র তাৎপর্যটা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। এক দীনা-হীনা রমণী পরিধানে চিরবাস রুক্ষ কেশপাশ জটাভার নয়নে শোকাশ্রু ওষ্ঠে বিলাপ—কোলে তার সর্পদষ্ট শিশুসন্তান আত্মীয় বিয়োগ প্রকোপে প্রগাঢ় নীল। বঙ্গ আমার জননী আমার—।

এই বাংলার খবর

টিকিট নিয়ে খেলা

ক্রিকেট টেস্ট খেলার টিকিট নিয়ে খেলা কলকাতায় প্রতিবারই জমে, দেশের অন্যান্য প্রান্তেও জমে। তবে এ-বছর কলকাতায় যেমন জমেছে তেমন আর কোথাও বা কখনও জমে নি বলে অনেকেই মনে করছেন। ইডেনের সীমিতসংখ্যক আসনের টিকিট সকলের হাতে পৌঁছতে পারে না, তাই হাহাকার প্রতিবারই দেখা দেয়। কিন্তু এবার ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের টিকিট বণ্টনের ব্যাপারটা একটা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে পৌঁচেছে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রথম অভিযোগ, টিকিটের বণ্টন ঠিক মতো হয় নি। ক্লাবগুলো তাদের 'কোটা' অনুযায়ী টিকিট পায় নি, বিধানসভার সদস্য বা মন্ত্রীরাও সকলে হিসেব অনুযায়ী টিকিট পান নি। দ্বিতীয় অভিযোগ জালিয়াতির। দৈনিক টিকিট বিক্রি কয়েক বছর যাবৎ বন্ধ। তাই রাজ্য সরকার সাধারণ দর্শকদের জন্যে লটারি করে কিছু টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করেন। সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে রাজ্য জুড়ে বিক্রি করা হয় কুপন। অভিযোগ উঠেছে, সেই কুপন অনেক জায়গায় জাল হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি কুপনে দেখা গেছে একই নম্বর। তার ওপর লটারি-বিজয়ী শ' পাঁচেক লোক প্রথমে টিকিট পান নি। অভিযোগ, লটারি-বিজয়ীদের মধ্যে অন্তত শ' পাঁচেক লোক টিকিট নিতে আসবেন না, এই আশায় কুশলী কর্মকর্তারা এই টিকিট সরিয়ে ফেলেন। পরে অবশ্য তাঁদের জন্যে বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হয়।

জালিয়াতির অভিযোগ টিকিট নিয়েও। খেলা শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই জাল টিকিট ধরা পড়তে শুরু করে। প্রথম তিন দিনে মোট চারশ'রও বেশি জাল টিকিট ধরা পড়ে। যারা এইভাবে জাল টিকিট নিয়ে মাঠে ঢুকেছিল তাদের সকলকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তা ছাড়া মাঠের আশপাশে কালোবাজারে টিকিট বিক্রির অভিযোগেও গ্রেপ্তার হয়েছে কিছু লোক। কলকাতা পুলিশের ধারণা, টিকিট নিয়ে এই জাতিযাতির সঙ্গে একাধিক গোষ্ঠী জড়িয়ে আছে। জাল টিকিট এবং জাল কুপন নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। টিকিট বণ্টনের গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্যেও রাজ্য সরকার স্বরাষ্ট্র সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন। টিকিট বিলি সম্পর্কে নানা অভিযোগ কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বা সি বি আইয়ের কাছেও পৌঁচেছে বলে প্রকাশ। তারাও এ-বিষয়ে খোঁজখবর করছে।

ধান ভানা কল

চলতি বছর ধান-চাল সংগ্রহের অভিযান সফল করতে রাজ্য সরকার যে নতুন পথ ধরার চেষ্টা করেছিলেন সেটা আপাতত রুদ্ধ হয়ে গেছে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে। ঠিক হয়েছিল ধান ভানা কলগুলোর ওপর লেভি বসিয়ে দেড় লাখ টনের মতো চাল সংগ্রহ করা হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে চাল কল আইন সংশোধন করে প্রথমে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয় এবং পরে বিধানসভায় বিল পাস করিয়ে ওটি যথারীতি আইনেও পরিণত করা হয়। আদালত প্রথমে নির্দেশ দেন নতুন আইন প্রয়োগ স্থগিত রাখতে এবং শেষ পর্যন্ত তা অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।

হাইকোর্টের এই রায় রাজ্য সরকারকে ফেলেছে এক সংকটে। ধান-চাল সংগ্রহের অভিযান এমনিতেই যথেষ্ট জোরদার নয়, তার ওপর সংগ্রহ-নীতির একটা খুঁটি এইভাবে ধসে পড়েছে। খাদ্য-মন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে, তাঁরা এর ফলে খুব একটা উদ্বিগ্ন নন। বিভিন্ন চাল কল আর চাষীরা যদি ঠিকমতো লেভি দেন তবে সংগ্রহের লক্ষ্য (পাঁচ লাখ টন) পূরণ করতে বিশেষ অসুবিধে হবে না। কিন্তু তা হলেও ধান ভানা কলগুলো নিয়ে কী করা যায় সে বিষয়ে সরকার ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দেন নি। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও পরামর্শ করা হচ্ছে। অর্ডিন্যান্স জারির আগেও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি নেওয়া হয়েছিল।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, রাজ্য সরকার গোটা রাজ্যের সব ধান ভানা কল নিজের হাতে নিয়ে নেবেন। এই প্রস্তাব নিয়ে সলা-পরামর্শ চলছে, কিন্তু কোনো পাকা সিদ্ধান্ত হয় নি। ইতিমধ্যে ধান ভানা কল সম্পর্কে রাজ্য সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছেন। যে-সব ধান ভানা কলের লাইসেন্স নেই সেগুলো আটক করে 'সীল' করে দেওয়া হবে। আর কোনো নতুন ধান ভানা কলকে লাইসেন্সও দেওয়া হবে না। তা ছাড়া রাজ্য সরকার আরো ঠিক করেছেন, ধান ভানা কলগুলোকে বাজার থেকে ধান কিনতে দেওয়া হবে না। কারণ তারা যদি ধান কিনতে বাজারে নামে তবে ধানের দর চড়ে যাবে, ফলে সংগ্রহের কাজে অসুবিধে হবে।

রাজ্যের যোজনা

পশ্চিমবাংলা সরকারের ইচ্ছে, ১৯৭৫-৭৬ সালে অর্থাৎ পঞ্চম যোজনার দ্বিতীয় বছরে যোজনার জন্যে বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বাড়ানো হোক। এই রাজ্যের সামনে নানা সমস্যা, তাই উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্যে আরো বেশি অর্থলগ্নী করা খুবই জরুরি। চতুর্থ যোজনার শেষ বছরে এই খাতে লগ্নীর পরিমাণ ছিল ৯০ কোটি টাকা। পঞ্চম যোজনার প্রথম বছরে ঐ অঙ্ক বাড়িয়ে করা হয় ১৫০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার অবশ্য চেয়েছিলেন পঞ্চম যোজনায় আরো বেশি টাকা লগ্নী করতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সায় মেলে নি। তাই পাঁচ বছরে মোট ৭৫০ কোটি টাকা লগ্নীর প্রস্তাব নিয়েই রাজ্য সরকারকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই হিসেব অনুপাতেই প্রথম বছরের জন্যে বরাদ্দ হয় ১৫০ কোটি টাকা।

কিন্তু আগামী আর্থিক বছরে এই বরাদ্দ বাড়বে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। যদি বরাদ্দ বাড়াতে হয় তবে দিল্লীর কাছ থেকে যোজনা খাতে আরো বেশি সাহায্য পাওয়া দরকার। কিন্তু যোজনা কমিশন প্রথম বছরের তুলনায় সাহায্যের পরিমাণ বাড়াতে তেমন উৎসাহী নন। এ-ব্যাপারে দিল্লীর কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের কথাবার্তা চলছে। কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ যদি না-বাড়ে তবে যোজনার আকার বাড়াতে গেলে রাজ্য সরকারকে নিজস্ব সূত্রে আরো টাকাকড়ি জোগাড় করতে হবে। গত ক' বছরে কর আদায়ের ব্যবস্থার উন্নতি করে আর নতুন কর বসিয়ে সরকার বেশ কিছু আয় বাড়িয়েছেন। ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে নতুন কর বসানো হয় ২৪ কোটি টাকার মতো। বিক্রয়কর বাবদ বাড়তি আদায় হয় ১৩ কোটি টাকা। স্বল্প সঞ্চয় বাবদ আয়ও বেশ বেড়েছে। এর পর রাজ্য সরকারের পক্ষে নিজস্ব সূত্রে আরো বেশি

অমৃত

পাঠকবর্গের কাছে
অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই
আগামী সংখ্যা থেকেই পাবেন
একটি করে প্রথম শ্রেণীর গল্প,
সিরিজে প্রথম গল্প লিখছেন
কথাসাহিত্যে যিনি অতুলনীয়, সেই

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

এর সঙ্গে পাবেন
অভারতীয় হয়েও বাঙলা ভাষায় যাঁর দক্ষতা
যে কোন প্রথম শ্রেণীর বাঙালী লেখকের সমকক্ষ, সেই

ফাদার দ্যতিয়েন-এর
রোজনামচা

তাছাড়া থাকছে

ফ্যাশান মডেলদের
সচিত্র সাক্ষাৎকার এবং অন্যান্য
নিয়মিত আকর্ষণীয় ফিচার

টাকা সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়। তাই রাজ্য যোজনার আকার বাড়বে কিনা তা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণের ওপর।

১৯৭৪-৭৫ সালের যোজনায় রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান চাষবাসের ওপর। আগামী বছরেই যাতে পশ্চিমবাংলা খাদ্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার জন্যে রাজ্য সরকার সচেষ্ট। বছরে ৯৫ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের একটা কর্মসূচী যোজনা কমিশনের কাছে পেশ করা হয়েছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণে খরচ হবে সাড়ে ষোল কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি

বিদ্যুতের যোগান বাড়াতে না-পারলে যে বিদ্যুৎ সঙ্কটের কোনো সমাধান নেই, এই কথাটা রাজ্য সরকার ক্রমশ বুঝতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে। বিদ্যুৎ বেশন ব্যবস্থায় এখন শীতকালে কাজ চলছে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝেই তা বানচাল হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। যেমন সেদিন ব্যাণ্ডেলে উৎপাদন কেন্দ্রে একটি ইউনিট বিকল হওয়ায় কলকাতায় আবার দিন কয়েক লোডশেডিংয়ের পালা চললো। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ব্যাণ্ডেল আর সাঁওতালডিহিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছে। তা ছাড়া কোলাঘাটে তৈরি হচ্ছে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এইসব উদ্যোগের সঙ্গে তাল রেখেই কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লাইসেন্সের মেয়াদ ২০০০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই মেয়াদ ১৯৮০ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল।

সি ই এস সি যাতে নিজস্ব উৎপাদন বাড়িয়ে বৃহত্তর কলকাতার বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারে সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান এখন দৈনিক ২৫০ মেগাওয়াট মতো বিদ্যুৎ তৈরি করে। পঞ্চম যোজনার শেষে যাতে এই পরিমাণ ৬০০ মেগাওয়াট দাঁড়ায় তার জন্যে রাজ্য সরকার অনুমতি দেবেন। অবশ্য এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে বিদেশ থেকে বয়লার আর টারবাইন আমদানি করতে হবে। সি ই এস সি'র উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ পঞ্চম যোজনার হিসেবে ঠাঁই পায় নি। তাই এখন এজন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পৃথক-ভাবে অনুমতি নিতে হবে। সি ই এস সি এখন যে-সব বয়লার বা টারবাইনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে তার অনেকগুলোই পুরোনো হয়ে গেছে। তাই নতুন যন্ত্রপাতি আমদানির জন্যে এই প্রতিষ্ঠান বেশ কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছিল। এখন লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সেই কাজ সহজ হবে, কারণ প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি যোগাড় করা যাবে সহজে।

লঞ্চ ডুবি

চন্দননগরের কাছে গঙ্গায় লঞ্চডুবির ফলে সম্ভবত শ' খানেক লোক প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। লঞ্চটির নাম 'হিরন্ময়ী'। ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় নাগাদ লঞ্চটি চন্দননগরের বাণীঘাট থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। লঞ্চটিতে দু'শ'জন যাত্রী ধরে। কিন্তু ঐদিন অনেক বেশি পাঁচ আড়াইশ জন যাত্রী উঠেছিলেন বলে অভিযোগ। এইসব যাত্রী ছাড়াও ছিলেন লঞ্চের চালক এবং অন্যান্য কর্মী। স্রোতের চাপে লঞ্চে জল ঢুকতে শুরু করে এবং তলিয়েই যায়। বিপদ আসন্ন দেখে কয়েকজন যাত্রী জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করেন। তাঁদের অনেককে পরে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় বেশি নন। অন্তত ১৫০ জন যাত্রী জলে ডুবে প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পর প্রথম রাতে দমকল বাহিনী আর পুলিশের সহযোগিতায় গোটা বিশ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ফেরির ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঠিকাদারের লাইসেন্সও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। লঞ্চটিকে জল থেকে টেনে ডাঙায় তোলা হয়েছে।

৩০।১২।৭৪ —দেবদত্ত

পটভূমি

লোকসভার নির্বাচন আসন্ন

লোকসভার নির্বাচন আসছে। কয়েকটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনও আসছে। সম্ভবত ১৯৭৫ সালের এপ্রিলেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটার তালিকা সংশোধন ও নির্বাচন কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাসের কাজ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সকল রাজ্যেই এসে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোটারদের খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারীর মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরে কে ভোটার আছেন এবং এবং ইতিমধ্যে কেউ নতুন ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করছেন কিনা বা কারও নাম বাদ পড়েছে কিনা তাও কর্মীরা দেখবেন এবং নতুন নাম তালিকাভুক্ত করবেন।

ভোটার তালিকা সংশোধনের দ্রুততা দেখে নিশ্চয়ই মনে হওয়া স্বাভাবিক নির্বাচন খুব কাছে। কিন্তু প্রতি দশ বছর অন্তর নতুন লোকগণনার ভিত্তিতে কেন্দ্রের সীমানার পুনর্বিন্যাস আসন সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির প্রশ্নের আইনানুগ ব্যবস্থা কি দ্রুত নেওয়া সম্ভব হবে? নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ মনে করছেন তাও ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্ভব হবে। জানুয়ারীর ১৫ তারিখের পর সীমানা পুনর্নির্ণয়ক কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গে আসছেন। শুনছি, পশ্চিমবঙ্গের লোকসভায় আসন সংখ্যা বাড়ছে—৪০ থেকে ৪২ হবে এবং বিধানসভার আসন ১২ বা ১৪টি বাড়বে। অর্থাৎ ২৮০ থেকে মোট আসন ২৯৪ হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন যদি এপ্রিলেই হয় তার জন্য কংগ্রেস দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ বিভ্রান্ত, বিচলিত এবং অনৈক্যের রোগে দ্বিধাগ্রস্ত। রাজ্যের বড় বামপন্থী দল সি পি এম সরকারীভাবে বলছেন ১৯৭৫ সালে নির্বাচন হলে তারা নির্বাচন বয়কট করবেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে কি করবেন? তা এখনও অজ্ঞাত।

কিন্তু এই বয়কটের প্রশ্নে সি পি এম নেতৃত্ব ও রাজ্যের অনুগামী মহল দ্বিধাবিভক্ত। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত সি পি এম এবং ২০ জন লোকসভা সদস্যের বেশীর ভাগ জ্যোতির্ময় বসুর নেতৃত্বে সি পি এমের নেতাদের এই নির্বাচন বর্জন নীতি পরিত্যাগের জন্য চাপ দিচ্ছেন।

কর্মী মহল মনে করছেন যে নির্বাচনকে যদি রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে এতোদিন পার্টি বিবেচনা করে থাকে তবে এখন কেন বিগিং-এর ভয়ে পার্টি পার্লামেন্টারী লাইন থেকে সরে যাবে? বরং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা এবং কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অসারতা জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগ আসবে।

সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন বয়কটের কথা ভাবলেও অন্য রাজ্যে নির্বাচনে অংশ নেবে। রিগিং বা কংগ্রেসীদের নির্বাচনী জুলুম-এর ভয় কি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই আছে? অন্য রাজ্যে কি নির্বাচন ও অবাধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে? এই প্রশ্নের জবাব পার্টির নেতারা দিচ্ছেন না।

বামপন্থী ছোট ছোট দলগুলো অবশ্য সি পি এমের এই নির্বাচন বয়কট নীতিতে বিশ্বাসী নন। তারা নির্বাচনে অংশ নেবে।

সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা আরও বৃদ্ধি করবে। নির্বাচনে আসন ভিত্তিক বোঝাপড়া হবে। সি পি আইর হাতে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি লোকসভার আসন আছে। এটা এবার কংগ্রেসের সহযোগিতায় বাড়িয়ে ১২।১৩টি করার জন্য সি পি আইর গভীর আশা। কিন্তু সি পি আইকে এতোগুলো আসন কংগ্রেস ছাড়বে কি?

১৯৭১ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ১৩ জন নির্বাচিত হন। পরে বাংলা কংগ্রেসের দুইজন কংগ্রেসে যোগ দেন। বাকী আসনগুলোর মধ্যে সি পি এম পেয়েছিল ২০টি, আর এস পি একটি, সোস্যালিষ্ট পার্টি একটি এবং সি পি আই তিনটি।

কংগ্রেসের নবীন ও প্রবীণরা ১৯৭২ সালের বিধানসভায় অভূতপূর্ব নির্বাচনী সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যের লোকসভার ভবিষ্যৎ নির্বাচনে খোলা মাঠে গোল দেওয়ার আশায় উৎফুল্ল। তাই শুনছি কয়েকজন মন্ত্রীসহ অন্তত দুই ডজন এম এল এ এবং ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠীর প্রথম সারির কয়েকজন নেতা লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়াতে আগ্রহী।

শুনছি, দুইজন বর্তমান এম-পি এবার লোকসভার টিকিট পাচ্ছেন না। দুইজন রাজ্যসভার সদস্য যাঁরা এখন কেন্দ্রের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁরা লোকসভায় দাঁড়াচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং বিরোধী দলগুলোর অনৈক্য ও সাংগঠনিক দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন নির্বাচন নিশ্চয় কংগ্রেসের অনুকূলে।

কিন্তু গ্রামবাংলার মানুষের মানসিকতা কি পরিচয় দেবে? খাদ্যাভাব, জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, চোরাকারবার দুর্নীতি এবং বেকার সঙ্কট গ্রামবাংলার মানুষকে যে বিক্ষোভের লক্ষণ আছে তার প্রতিকারে কংগ্রেস ও সরকারকে কিছু ভাবতে হবে, কাজও করতে হবে। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে পাওয়ার আর না পাওয়ার যে ঝগড়া ও বেষারেষি কংগ্রেসীদের মধ্যে আছে তা দূর করার দাওয়াই কংগ্রেসকে স্থির করতে হবে। যারা গত দুই বছরে কিছু পেয়েছে সেও তাতে সন্তুষ্ট নয় সে আরও পেতে চায়। আর যারা কিছুই পায় নি তারা সামান্য কিছু পাওয়ার আশায় লাইন লাগিয়ে বসে আছে। এই লোভ ও প্রত্যাশার মধ্যেই কংগ্রেসের ঝগড়ার বীজ নিহিত।

কাজেই কংগ্রেসকেও সময় থাকতে নিজের সংগঠনকে জোরদার করা ও ভ্রষ্টাচারীদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে জয় নিশ্চিত হবে।

—চাণক্য

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

আগরতলা অধিবেশন

সম্প্রীতি ও সংহতির সেতুবন্ধনে যে অনুভূতি প্রোজ্জ্বল তাইতো বিভিন্ন ভাষার প্রাচীর ডিঙিয়ে সব মানুষের চিত্তলোকে ঢেউ তোলে। সাহিত্যের সবুজ পাতায় যে জীবন স্বপ্নের আভাস তাকে নিয়ে তো আলপনা আঁকে প্রতিটি পিয়াসী মন। বাংলা মাটির স্পন্দন তাই নিখিল ভারতের শিল্প-সম্পদ। বাংলা ভাষা প্রসার ও বিকাশের উদ্দীপ্ত প্রেরণা থেকে জন্ম হোলেও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কিন্তু এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে সমগ্র জাতির প্রাণ-সত্তা চিরন্তন সত্যের দীপ্তিতে ভাস্বর। এই বিহ্বলতাতেই তো মানুষ খণ্ড দেশ কালের বাইরে আপন চিত্তের অধিকারকে উপলব্ধি করেছে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪৭তম অধিবেশন সম্প্রতি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ত্রিপুরার ঐতিহাসিক রাজধানী শহর আগরতলায়। তিনদিনব্যাপী এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন উপলক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূজারী ও অনুরাগী-বৃন্দের যেন একটি প্রাণচঞ্চল সমাবেশ হয়েছিল। সেই মুহূর্তগুলোতে আগরতলা রূপ নিয়েছিল একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

ভারতের বিভিন্ন স্থানেই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন তার বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছে। এবারে যে ত্রিপুরায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এর একটা বিশেষ মাহাত্ম্য এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের গভীরে যাঁরা ডুব দিতে পেরেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে ত্রিপুরা বাংলা ভাষার একটি অন্যতম তীর্থ। এই রাজ্যের পবিত্র ভূমিতেই বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ত্রিপুরার সঙ্গে এই সম্মেলনের যোগ অতল অন্তরের। তাই ত্রিপুরায় সে অতিথি হয়ে আসেনি। এ তার নিজের ঘরেই ফিরে আসা।'

এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের ৪৭তম অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রিপুরার অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বাংলা সাহিত্য ও ভাষার প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধে উদ্দীপিত হয়েই ত্রিপুরা বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এই অধিবেশন এখানে আহ্বান করেছেন। তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের যেসব সাহিত্য-সেবীরা ত্রিপুরার ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে এসে সমবেত হয়েছেন। শ্রীসেনগুপ্ত আশা করেন ত্রিপুরাবাসীর অনেক দুঃখ যন্ত্রণা এইসব সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে ভাষা পাবে এবং তাতে যোগসূত্রটি হবে আরো দৃঢ়তর।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে সাম্প্রতিক সাহিত্যের সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন এই সংস্থার লক্ষ্য হবে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি এবং অন্যদিকে প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারের চেষ্টা। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্কের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন 'ত্রিপুরার কাছে বাংলা ভাষার অশেষ ঋণ। ত্রিপুরার প্রাক্তন নৃপতিরা এই একটি মাত্র রাজ্যে সুদূর অতীত কাল থেকেই বাংলা ভাষাকে দরবারের ভাষারূপে মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। বৃটিশ আমলে বাংলা ভাষার কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল না দুয়োরানীর মতো রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে জীর্ণ পাতার কুটিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল তার বাস। ইংরেজের সেই একচ্ছত্র আধিপত্যের দিনেও ত্রিপুরার রাজভাষা ছিল জনগণেরই ভাষা। সরকারী কাজে যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা যায় এবং তা সহজবোধ্য ত্রিপুরা সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। বাংলা ভাষার যেখানে এই মহৎ সম্মান সেখানে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠান পরম গৌরবের। এ গৌরব আমাদের বাংলা ভাষার।'

যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর প্রোজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে বিংশ শতাব্দীর জীবন-চেতনায় বিস্তৃতি লাভ করেছে তাকে সেই দীপ্তিতেই ভাস্বর করে রাখতে হবে সাহিত্যিক শিল্পীদের। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য যে চিরন্তন রূপটি পেয়েছে তাকেই অটুট রাখার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের' এই সত্যটি যেন কোনরকমে বিস্মৃত না হয়। শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন—'আমি শুধু একথাই সাহিত্যিক

সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার

শঙ্কু মহারাজের

বিখ্যাত ভ্রমণ সাহিত্য

গঙ্গাসাগর

সাগর মেলায় যাবার আগে বইটি ভালো করে পড়ুন।

॥ দাম সাড়ে আট টাকা ॥

বিমল মিত্রের — বিখ্যাত উপন্যাস

আমি ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের — সর্বাধুনিক উপন্যাস

পাওনাই পরিচয় ৫৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অশনি সংকেত ১০৲

মহাশ্বেতা দেবীর

অজানা ৪॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী অমনিবাস

১ম খণ্ড ১৫৲ ৩য় খণ্ড ১০৲ ৪র্থ খণ্ড ১৪৲ ৫ম খণ্ড ১৫৲

অমর সাহিত প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা—৯

শিল্পীদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে, আমাদের সাহিত্যের মানবিকতার মহান উত্তরাধিকার যেটা তারা বহন করে চলেন। পাশ্চাত্যের কোন কোন মহলের উদ্ভট চিন্তা ও রীতিনীতির ব্যর্থ অনুকরণ করে এদেশে সাহিত্য সৃষ্টি করলে তা জনসাধারণ প্রত্যাখ্যান করবে। দেশের মানুষের সমস্যা তার আশা আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনের সার্থক প্রতিফলন চাই সাহিত্যে। ধার করা চিন্তা বা আইডিয়া স্থায়ী সাহিত্যের উপাদান হোতে পারে না। শুধুমাত্র চমক সৃষ্টি কিম্বা সস্তা মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য না রেখে আমাদের সাহিত্যিকরা জীবনের গভীর সত্য উদ্ঘাটন করুন তাঁদের রচনায়। সে সত্য যদি কঠিন হয় তবু তা সত্যই। যেন আমরা তা পড়ে বলতে পারি—'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম সে কখনো করে না বঞ্চনা।'

অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৫৯ বছরের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন গোটা ভারতবর্ষের চিন্তায় বাঙালী যে মগ্ন ও বিভোর তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে'র নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম গ্রহণের মধ্যেই।

আজকের বিভ্রান্তি ও সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন 'আমাদের যুগে যা দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী শোচনীয় সততার দৈন্য। নতুন কাল আমাদের কাছে প্রাচুর্যের আশ্বাস যেমন এনেছে তেমনি এনেছে সত্যভ্রষ্টতার প্রলোভন। আত্মবিক্রয়ের এমন সুযোগ কলম বেচার এমন চড়া দামের বাজার এদেশে আগে কোনদিন ছিল না; কলম কিনে যারা পুষে রাখে তেমন সব বড় বড় মহাজন পয়সার প্রতিপত্তি থেকে অরো অনেক কিছুর টোপ ছড়িয়ে বসে আছে। সাহিত্য সংস্কৃতির আবহাওয়া তার জন্যে যে যথেষ্ট দূষিত একথা অস্বীকার না করেও কিন্তু হতাশাকে প্রশ্রয় দিতে যেন আমরা প্রস্তুত না হই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র আশা পোষণ করেছেন—'তবু আজকের দিনের সামাজিক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও আলোড়নের মধ্যে ন্যায় ও কল্যাণের অভিমুখে যেসব স্রোত বইছে একদিন তারা জয়যুক্ত হবে বলেই আশা করি।.. শুধু দেহের প্রয়োজন আর ক্ষুধার দাসত্বে অধিকাংশ মানুষের আবদ্ধ থাকার কলঙ্ক সেদিন মানুষের জীবনে ও সমাজে থাকবে না।.....ক্ষোভ ও অভিযোগ যে সাহিত্যের প্রাণ সে সাহিত্য সেদিন আপনা থেকে স্তব্ধ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই 'যাহারা তোমার বিষাইতে বায়ু নিভাইছে তব আলো। তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো?' এ অর্থ প্রশ্ন সেদিন হবে নিরর্থক কিন্তু 'এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়'—কি 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভরভসে ধন গৌরবে নবযৌবন বরষা।'—কিম্বা, 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী'-এর আবেদন নষ্ট হয়ে যাবে মানুষের মন ও প্রকৃতির এমন মৌলিক পরিবর্তন হোতে পারে বলে তো মনে হয় না। সেই উজ্জ্বল ভাবীকালের স্বপ্ন আমাদের বর্তমান দুর্যোগের অমানিশা অতিক্রম করবার সাহস দিক।'

প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক শংকর বাংলাকে আরো বাস্তবধর্মী ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তার ধারণা আজকের এই বিভ্রান্তিকর যুগে শুধুমাত্র গল্প কবিতা উপন্যাস নাটকে ভাষাকে আটকে রাখলে তাকে অটুট রাখা মুস্কিল হয়ে উঠবে।

শ্রীশংকর তাই আবেগদীপ্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান, 'আসুন আমরা বাংলাকে শুধু সাহিত্যের ভাষা নয় সাধারণ মানুষের শিক্ষা রুজি রোজগার আনন্দ ও মুক্তির ভাষা হিসেবে গড়ে তুলি। এই ব্যাপারে সরকারের দ্বারস্থ হয়ে কোন লাভ নেই। তাদের এসব ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই বিশেষ কিছু করবার ক্ষমতাও নেই। যা কিছু করবার তা দেশের শিক্ষক শিল্পী সাহিত্যিক চলচ্চিত্রকার সাংবাদিক নাট্যকার গায়ক বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ী এবং ভাষাপ্রেমিকদের করতে হবে। ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার আত্মরক্ষার এই একমাত্র পথ এবং বাংলার লেখকরা এ বিষয়ে সমস্ত ভারতকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

এ দিনের প্রধান অতিথি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের কথা গভীরতার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বঙ্গভাষাভাষী রাজ্য ত্রিপুরা পশ্চিম বাংলার সহোদরা স্থানীয়মাত্র নয়, সর্বতোভাবেই তার যমজভগিনীস্বরূপা। সঙ্গীত কলা কৃষ্টি সাহিত্য ও জীবনচর্যায় উভয়ের মনের তার একসূত্রে বাঁধা। একই সুখ-দুঃখ আশা-উদ্দীপনা সুপ্রাচীন কাল থেকে উভয়কে একত্র বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।'

সমাপ্তিতে শ্রীসেনগুপ্ত বলেন—জীবনের স্বপ্ন কোনদিন স্তব্ধ হবে না; কল্পনার মহাকাশও জ্যোতিহীন হয়ে যাবে না আলো। বিজ্ঞান তাতে দেবে সমীক্ষার দীপ্তি, দর্শন যোগাবে ভাবের দ্যোতনা ইতিহাস আনবে সজাগ বস্তুবোধ। এই ত্রিশক্তির মিলিত প্রভাবে যে নতুন সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করবে তা হবে সত্যিকার জাতীয় ঐশ্বর্য এবং বঙ্গভারতী আবার বরণীয় হবেন তার গৌরবে।

সম্মেলনের কাব্যশাখার প্রধান অতিথি শ্রীমণীন্দ্র রায় বলেন আজকের এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে কবিতার ভূমিকাটুকু কি হোতে পারে তা সত্যি ভাববার কথা। আজকের কবিদের কাছে আমাদের কি প্রত্যাশা সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'কেবল যা আছে তাই নয় যা হোতে পারে হওয়া উচিত তার কথাও তাঁরা বলবেন। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস কবির কাছে এই উত্তরাধিকার রেখে গেছে। আজকের কবিকেও সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে চলবে না।'

সম্মেলনের শেষ দিনে ইতিহাস শাখার অধিবেশন হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বাংলাদেশের হাই-কমিশনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের কাউন্সিলের অধ্যাপক ডাঃ সিরাজুল ইসলাম। ডাঃ ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। বাঙালীর ইতিহাস মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার চেয়েও পুরনো।

সভাপতি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর ভাষণে ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সঙ্গীত শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র ছিলেন প্রধান অতিথি।

সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে চারটি পুরস্কার ঘোষণা করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এবং সংস্থার সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ পুরস্কার প্রদান করেন পুরস্কার পেয়েছেন : যুগান্তর পুরস্কার : ডাঃ রণেন্দ্রনাথ দেব; অমৃত পুরস্কার : শ্রীক্ষীরোদ দেববর্মা; বিশ্বরূপা পুরস্কার : শ্রীনিখিল ভট্টাচার্য; শেফালী নন্দী স্বর্ণপদক : শ্রীমতী করবী দেববর্মন।

নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ১৯৭৪-৭৫ সালের নব-নির্বাচিত পরিচালক সমিতি। সম্মেলন সভাপতি : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। সহ-সভাপতি : শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পাটনা) শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল (লখনৌ) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (নয়াদিল্লী) শ্রীইন্দ্রকুমার রায় (ত্রিপুরা)। সাধারণ কর্মসচিব : শ্রীরঞ্জিত ঘোষ (নয়াদিল্লী)। কোষাধ্যক্ষ : শ্রীভবেশ মজুমদার (নয়াদিল্লী)। সম্মিলনী সম্পাদক : শ্রীসুনীলময় ঘোষ (কলকাতা), পরিষদ পত্রিকারক : শ্রীশশাঙ্কমোহন কর (এলাহাবাদ)। এছাড়া আরো ৪৭জন সদস্য বিভিন্ন স্থান থেকে পরিচালক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

দিলীপ-মৌলিক

নবকলি

অভিজাত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা
ফ্ল্যাট জি/৪, এল, আই, জি/হাউজিং এস্টেট
৩৭, বেলগাছিয়া রোড, কলি-৩৭
পৌষ সংখ্যা শীঘ্রই বেরুচ্ছে। বৈশাখ বিশেষ অনুবাদ সংখ্যারূপে বেরুবে।
লেখা পাঠান। স্টলে পাওয়া যায়।
প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ, বাঃ গ্রাহক ২ টাকা

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দু ভাই। ভবনাথ বড়। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতার ছোট আদালতে ওকালতী পরীক্ষা দেওয়া দেবনাথের হল না। পরে বিদেশে জমিদারী সেরেস্তায় ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরেছেন।

আষাঢ় মাস। এবারে রথের সঙ্গে ঈদ ও রবিবার জুড়ে গিয়ে কাছারি তিন দিন বন্ধ। মাদার ঘোষ হারু ঝন্টু এবং হিমচাঁদ গড়মণ্ডলে চললো রথের মেলা দেখতে। হারুর মতলব আবার শুধু রথ দেখা নয় থিয়েটারের সিন আঁকার কত দূর কী হল তাও একবার সরেজমিনে দেখে আসা।

এদিকে পুজো প্রায় আসি আসি। হারু সরকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে লিহার্শালের লোক ডেকে বেড়াচ্ছে। ছোট কর্তা বরদাকান্ত জলচৌকিতে বসে ফর্দের ছাড়ছুট ধরিয়ে দিচ্ছেন। দেবনাথ বাড়ি এলেন।

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গ্যারসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনী সুর বেজে উঠল।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হিরু বলে, জল্লাদকে বলো মা। পাইতক্কের কোথায় কি, সমস্ত তার জানা। মিষ্টি-মুখে বললে জান কবুল করবে, তেমনটি আর কাউকে দিয়ে হবে না।

সে কথা সত্যি, তবু উমাসুন্দরী ঈষৎ ইতস্তত করেন ঃ দায়িত্বের কাজ। যতই হোক, এক ফোঁটা বালক ছাড়া কিছু নয়।

হিরন্ময় নিজেই জল্লাদকে ডাকিয়ে বলে, ভোরবেলা ফুল তুলে আনতে হবে। বুঝলি জল্লাদ, ভারটা তুই নে।

জল্লাদ বিনা প্রশ্নে ঘাড় নেড়ে দিল ঃ আচ্ছা—

বড় দায়িত্বের কাজ রে। গ্রাম সুদ্ধ মানুষ পুষ্পাঞ্জলি দেবে, আর পুজোও এক নাগাড় চার দিন ধরে। ফুল বিস্তর লাগবে।

বুক চিতিয়ে জল্লাদ বলল, লাগুক না—

তোর দলবল সব রয়েছে—বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসুক, কাউকে ফুল তুলতে না দেয়। একটা ফুলও নষ্ট না হয় যেন। তোর উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি তা হলে।

কথা জল্লাদ মনে গেঁথে নিয়েছে, হুঁ বলে অন্যমনস্কভাবে সে জবাব দিয়ে দিল।

প্রহর রাত হতে চলল, নতুন বাড়িতে মগ্ন হয়ে তবু সে বসে বসে থিয়েটারের মহলা দেখছে। কলকাতার প্লেয়ারমশায়রা এসে গেছেন—তাজ্জব ব্যাপার! মন্ডপের প্রতিমার চেয়ে এঁরাই আপাতত বড় আকর্ষণ।

কমলও আছে। বছরের এই ক'দিন বাধাবন্ধ নেই, এই রাত্রি অবধি বাড়ির বাইরে আছে তাই। অনভ্যাসে অস্বস্তি লাগছে, চুপিচুপি একবার সে বলল, উঠবে না জল্লাদ-দা?

আজকেও পড়বি নাকি?

ক্ষুরধার ব্যঙ্গের হাসি জল্লাদের মুখে। বলে, যা যা আছিস কেন এতক্ষণ? ভাল ছেলে তুই, বাড়ি গিয়ে বই নিয়ে বোস্‌গে। একলা যেতে পারবি নে বুঝি, পদা গিয়ে পথ দেখিয়ে আসছে।

কমল মরমে মরে যায়। ভাল ছেলে বলে রব উঠে গেছে, এর চেয়ে লজ্জার কাণ্ড সংসারে আর হতে পারে না। তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বলে, বাড়ি যেতে কে চাচ্ছে? ফুল নষ্ট না হয়, পাড়ায় ঘুরে বলে আসতে হবে না? গড়ভাঙা মাদারডাঙাতেও তো যেতে হবে।

জল্লাদ বলল, আমি ভার নিয়েছি, পুজোর আগে ফুল ঠিক পৌঁছে যাবে। তা বলে ফকির-বোষ্টমের মতন বাড়ি বাড়ি ফুল কুড়োতে যাচ্ছি নে।

মাথায় কোনো মতলব নিয়েছে ঠিক, খুলে বলছে না। নিত্যসঙ্গী পদা মনে করিয়ে দিল ঃ ফুলের তো অনেক দরকার—

বেনারসী শাড়ী
ইস্টিয়ান
মিল্ক হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

অনেকই আসবে।

নিঃসংশয় জবাব দিয়ে একটুখানি ভেবে জল্লাদ বলল, হরিবোল দিয়ে কচ্ছপ জড় করব না। বেশি লোকের গরজ নেই। তুই যাবি, আমি তো আছিই। আর আংটা-মারা মরদ একটা-দুটো, ভাল ধুজি মারতে পারবে যারা। ঝড়ুকে তো দেখছি নে। ঝড়ু গেল কোন চুলোয়?

ঝড়ু বসে ছিল না, কলাপাতা-কাটার দলের মধ্যে সে। লগির মাথায় কাস্তে বেঁধে সারা দিনমান তারা পাতা কেটে বেড়িয়েছে। হাত-পা ধুয়ে খানিকটা ভদ্র হয়ে এবারে নতুন বাড়ি রিহার্শালের জায়গায় যাচ্ছে। পথে দেখা। জল্লাদ বলে, পাতা কাটছিস বেশ করছিস। ফুল তোলার কাজেও দুটো-তিনটে দিন আয় দিকি। তোর পাতারও অনেকখানি তাতে আসান হয়ে যাবে। পোহাতি তারা উঠলে তে-মাথার ডুমুরতলায় এসে দাঁড়াবি, পদা ডেকে-ডুকে এনে হাজির করবে। ওখান থেকে এক সঙ্গে সব বেরিয়ে পড়ব।

ঝড়ু ইতস্তত করে বলে, দিনমানে খোঁজ পড়ে না—রাত্রে বেরুনো বড় মুশকিল। আজামশায় এক লহমা ঘুমোয় না। আওয়াজ একটু পেয়েছে কি, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠবে।

পদা বলল, বেরুতে কোনো মশায় দিতে চায় না। তবু বেরুই। দুয়োর খুলেই চোঁচা দৌড়—তখন আর কে পাত্তা পাচ্ছে? ফিরে এসে গন্ডগোল—

জল্লাদ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, গন্ডগোল আবার কি? দুটো কথার বকাবকি খুব বেশি তো দু-ঘা ঠেঙানি।

ঝড়ু বলে, মোটে দু-ঘা? তেমনি পাত্তোরই বটে।

না হয় দশ ঘাই হল। মেরে ফেলবে না তো। পেল্লাদ মাস্টার মশাইর হাতে-পায়ে নিত্যি দু-বেলা খাচ্ছি—ঘরের মারই বা ভয় করতে যাবে কেন?

জল্লাদ ভ করে না বটে। মুখের মিছা বাগাড়ম্বর নয়, এ বাবদে তার ভূরি প্রমাণ অভিজ্ঞতা। পাঠশালায় ও ঘরে উঠতে পেটায় তাকে, বসতে পেটায়, সে দৃক্‌পাত করে না।

ঝড়ু দেখেছে সে জিনিস। প্রসঙ্গ যখন উঠে গেল, অন্তরঙ্গ সুরে সে বলে গায়ে তোমার যেন সাড় লাগে না জল্লাদ-দা। দেখেছি, দেখে অবাক হয়ে যাই।

নেই বলে সাপের বিষ থাকে না বে, মনে করলেই হল লাগছে না। আরও এক কায়দা আছে, শোঁ-ও-ও করে নিশ্বাস টেনে বুকের মধ্যে বাতাস ভরে নিবি। মারতে আসছে—না-হক ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে পড়ে অনেকে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শান্ত ভাবে ততক্ষণ নিশ্বাস টেনে যাবি তুই। ভিতরে বাতাস ঢুকে গেলে ব্যথা লাগে না। ফুটবলে, দেখিস নে এত লাথি মারছে ভিতরে বাতাস বলে লাথি গায়ে বসতে পারে না।

নিজের বেলা জল্লাদ এই কৌশলই নিয়ে থাকে, সকলে চাক্ষুষ দেখে। মার-গুতোন খাবার সময় একেবারে চুপচাপ থাকে—চেঁচায় না, কাঁদে না, পালাতে যায় না। প্রহারকর্তা ক্লান্ত হয়ে এক সময় মার বন্ধ করে, জল্লাদও নিশ্চিন্তে পূর্বকর্মে লেগে যায় তখন।

বরাবর এই রকম হয়ে আসছে। ছোঁড়াটাকে মেরে শাসন করা যাবে না, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে বুঝে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও মারে—মেরে বেশ হাতের সুখ পাওয়া যায়। খাসা একখানা ক্ষেত্র পাওয়া গেছে, যত খুশি সেখানে নির্বিবাদে মার চালানো যায়—হেলাফেলায় তেমন জিনিস ফেলে রাখতে যাবে কেন?

ভাল ছেলে ইত্যাদি গালি খাওয়ার পরেও কমল এ তাবত সঙ্গ ছাড়ে নি, পিছু পিছু চলেছে। অধ্যবসায়ে প্রীত হয়ে জল্লাদ হঠাৎ সদয় কণ্ঠে বলল, যাবি তুই সত্যি সত্যি?

ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিল, সেই জল্লাদই আবার এখন ভরসা দিচ্ছে: ভাল ছেলে তা কি হয়েছে, ভাল বলে বুঝি ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে। ভাবিস নে তুই—এই বেড়াল বনে গিয়ে বনবেড়াল হয়। তেমাথার ডুমুরতলায় চলে যাবি, আমরা সব থাকব।

নিজেই আবার খেয়াল করে বলছে, একলা যেতে ভয় করবে তোর—অভ্যেস তো নেই। বাড়ি থেকে নিয়ে আসব। টরের তলায় দাঁড়িয়ে শেয়াল ডাকব, টিপি-টিপি বেরিয়ে আসিস।

ভাল ছেলে হলেই অপদার্থ হয় না, কায়দা পেয়েছে তো কমলও সেটা প্রমাণ করে ছাড়বে। তরঙ্গিণীকে বলে রাখল, পুজোর ফুল তুলতে যাবে সে। পুজোর নামে মা কিছু বলবেন না, জানে। জল্লাদের নামগন্ধও করল না। ঘরে মেয়েলোক ঠাসা, মেজেয় ঢালা-বিছানা পড়েছে। মেয়েরা থাকলেই কুচোকাচা কিছু থাকবেই, শেষ রাত্রি থেকে ট্যাঁ-ভ্যাঁ লেগে যায়। এসো-জল বসো-জল আত্মীয় কুটুম্বে পুজো বাড়ি গিজ-গিজ করছে। বাইরে বাড়ি পুরুষরা যে যেখানে পারে মাদুর বিছিয়ে গড়িয়ে পড়ে, মেয়েরা ভিতর বাড়িতে। পোহাতি তারার সঙ্গে তরঙ্গিণী উঠে পড়েন, বারো-মেসে অভ্যাস। পুজোর উদ্বেগে এখন তো চোখের ঘুম একেবারে হরে গেছে। উঠে তরঙ্গিণী দরজা খুলে বাইরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কমলও উঠে বসে শেয়াল-ডাকের প্রতীক্ষা করছে।

(তেরো)

আকাশে তারা, রাত্রি আছে এখনো। পাখপাখালি ডাকছে। ডুমুরতলার আঁধারে আরও চারজন—কাঁধে ধুজি, হাতে ঝুড়ি। ঝুড়ি ভরে ফুল নিয়ে আসবে। জল্লাদ ও কমল এসে যোগ দিল। জল্লাদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে—হেঁসো দা, কাস্তে।

গ্রাম পথে বেরিয়েছে সকলে মিলে। রাতের বেলা বেরুনো কমলের এই প্রথম—পুজোর নামে এতদূর হতে পারল। পড়তে শিখেছে এখন কমল, পড়ার বড় ঝোঁক। হাতের কাছে যা পায়, পড়ার চেষ্টা করে। শব্দ করে না, চোখ দিয়ে পড়ে যায়। নিতান্তই যদি না বোঝে, মনে মনে কষ্ট

রেজিষ্ট্রি বিবাহ অফিস
মোট ১৬ টাকায় রেজিস্ট্রি বিবাহ
এন কে ঘোষ, জে-পি
ম্যারেজ অফিসার
১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলি-৯, ফোন: ৩৫-৩০৪৮

আপনার পরিবারের সবার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য
হাওড়া সমবায়িকা

পায়—ভাণ্ডারে কত কি জিনিস, তাকে যেন ধরতে ছুঁতে দিচ্ছে না। গল্প একটা পড়ে ফেলে নিজেকে সেই গল্পের মধ্যে দাঁড় করায়। এই যেমন মনে হচ্ছে আমুন্ডসেনের মতো মেরু বিজয়ে চলেছে। অথবা শিবাজীর মতন দুর্গ-আক্রমণে। ডান দিকে বাঁ-দিকে ক্ষেতের বেড়া,—বেড়ার জিওল ও ভেরেন্ডার কচাগুলো সৈন্যদলের মতন সেলাম ঠুকে সারিবন্দি অ্যাটেনসনে দাঁড়িয়ে আছে যেন। নতুন বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়ে সমুদ্দুর-পুকুরের পাড় (সমুদ্র নয়, সুমুখ-দুয়ার থেকে সমুদ্দুর হয়েছে। প্রহ্লাদ মাস্টারমশায় একদিন বলছিলেন)। পুকুর-পাড় ধরে যাচ্ছে তারা। হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে—গাছের পাতা নড়ছে, পুকুরের জল কাঁপছে। পথ সংক্ষেপ হবে বলে এর উঠান ওর কানাচ ধরে যাচ্ছে এক এক সময়। মানুষজন বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, ঘর-বাড়িও। পাখিরাই কেবল জেগেছে—উড়ছে না তেমন, কিচিমিচি করছে। আম-কাঁঠালের বাগান, তরিতরকারির ক্ষেত, খেজুর বাগান একটা খড়বন আড়াআড়ি পার হয়ে সুঁড়ি পথে পড়ল। আশশ্যাওড়া, ভাঁট, কাল-কাসুন্দে আর যাদুর জঙ্গল দুধার দিয়ে এঁটে ধরেছে। বিশাল বাঁশ বাগান একটা, অন্ধকার বাঁশতলা দিয়ে পথ। বাঁশের পাতায় আওয়াজ তুলে শিয়াল চলে গেল রাস্তার এধার থেকে ওধারে। হেই, হেইও কেডা তুমি? কনে যাবা? —জল্লাদ অকারণ হাঁক পাড়ছে। জন্তু-জানোয়ার সাপখোপ যা থাকে, মানুষের গলা পেয়ে সরে যাবে। ঝড়ু এর মাঝে গান ধরল হঠাৎ। গানে ভয় কাটে। নাথ, রাম কি বস্তু সাধারণ, ভূভার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ—গানের ভিতরে রামের নাম। রাম নামের বিশেষ সুবিধা, ভূতও ত্রিসীমানায় থাকবে না। এবং ফাঁকতালে খানিকটা পুণ্যার্জনও হয়ে যাচ্ছে।

ঝড়ু একবার বলে উঠল, এখনো রাত পোহানোর নাম নেই, কত রাত থাকতে আনলি রে পদা?

পদা কিছু বলল না, জবাবটা জল্লাদই দিল ঃ রাত যেমন আছে, রাতের কাজও রয়েছে। পা চালিয়ে চল্।

আগে আগে জল্লাদই জোর পায়ে চলল। মতলবটা পদাও পুরোপুরি জানে না, প্রশ্ন করে ঃ যাচ্ছি কোথায় রে?

চৈতন মোড়লের বাড়ি।

যেতে যেতে জল্লাদ বিশদ করে বলে, মোড়ল বাড়ির নিচে ডোঙা রেখেছে। আনকোরা নতুন ডোঙা, এই বছরের বানানো। ঘাস কেটে এনে টেমি ধরে ধুলো অনেকক্ষণ ধরে। চাইলে তো দেবে না, না চেয়ে নিয়ে বেরুব।

নতুন বাড়ির রিহার্শাল থেকে বেরিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল তারপরেও জল্লাদ একাকী গ্রাম চক্কোর দিয়েছে। চৈতনের ডোঙাটা পছন্দ করেছে সেই সময়, ঐ ডোঙা কাজে নেবে। বিল-কিনারায় চৈতনের বাড়ি, বিলের মাটি তুলে বাড়ির জমি উঁচু করেছে, চতুর্দিকে বেশ একটা পরিখার মতন হয়েছে। ডোঙা সেখানে।

ঝড়ু বলল, এতজনে আমরা উঠলে ডোঙা তো ডুবে যাবে।

জল্লাদ বিরক্ত হয়ে বলে, বসতে কে বলছে। ডোঙায় চড়ে নবাবি করবি, সেই জন্যে বুঝি এসেছিস? ডাঙায় তোল ডোঙা, উপুড় করে মাথায় নিয়ে নে। এতজনে সেই জন্যে আমরা।

মাথার দিকটা ভারী বলে জল্লাদ নিজে সেই দিকে মাথা ঢুকিয়েছে, পিছনে অন্যেরা। পদা সকৌতুকে বলল, মানুষে ডোঙায় চড়ে যায়, সেই ডোঙা আমাদের উপর চড়ে চলেছে।

সকলের আগে জল্লাদ—ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে বাঁক নিচ্ছে, যেতে হবে সকলকে।

অধীর কণ্ঠে ঝড়ু বলে, নিয়ে চললি কোথা বল দিকি?

রহস্য ভাঙে না জল্লাদ। সংক্ষেপে বলে, চল্ না—

নিঃশব্দ পথ। সোনাখড়ি ছেড়ে মাদার-ডাঙায় ঢুকছে। ঢিবির উঁচুতে উঠল, নেমে গিয়ে এক্তার-বক্তারের দীঘি। রাতও শেষ হয়ে এসেছে, ফিকে অন্ধকার। তারারা নিভে আসছে, ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া। দীঘির কিছু নেই, নামেই শুধু দীঘি। কার এক্তার-বক্তার কেউ জানে না। নলখাগড়া, হোগলা, চেঁচো, ঘন সতেজ সবুজ কচুরি-পানা আর মালি ঘাস। হঠাৎ মনে হবে উর্বর ফসলের ক্ষেত একটা। নজর দূরে ফেললে পদ্মবন চোখে পড়বে। বড় বড় পদ্মপাতা জলের খানিকটা উপরে উল্টানো ছাতার মতন, জায়গাটা ঢেকে দিয়েছে একেবারে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে পদ্ম এখনো পাপড়ি বন্ধ, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শতদল হয়ে ফুটবে।

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

আচমকা নির্বাচনের জল্পনা

দিল্লিতে একটি টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার টি স্বামীনাথন যে প্রামাণ্য অভিমত দিয়েছেন তাতে এটা পরিষ্কার যে, লোকসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন ডাকার পথে সংবিধানের দুরতিক্রম্য বাধা আছে। শ্রীস্বামীনাথন বলেছেন যে ১৯৭১ সালের জনগণনার হিসাব অনুযায়ী নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসের কাজ এপ্রিলের আগে শেষ করা যাবে না। এখনই নির্বাচন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। সংবিধানের সংশোধন এমনভাবে করতে হবে যাতে যে ১৬টি রাজ্যে ইতিমধ্যে নির্বাচন কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস হয়ে গেছে সে সব রাজ্যে নতুন নির্বাচন কেন্দ্রের ভিত্তিতে এবং যেসব রাজ্যে পুনর্বিন্যাসের কাজ বাকি থাকবে সে সে রাজ্যে পুরান নির্বাচন কেন্দ্রের ভিত্তিতে ভোট নেওয়া যায়।

কিন্তু এভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভিত্তিতে নির্বাচন করাও সংবিধানসম্মত হবে কিনা সে প্রশ্ন তুলেছেন সংগঠন কংগ্রেসের নেতা এস এন মিশ্র। মোরারজী দেশাই মনে করেন, আচমকা নির্বাচন করা আদৌ সম্ভবপর হবে না। সি-পি-এম নেতা জ্যোতির্ময় বসু বলেছেন যে, পরে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে মনে করে প্রধানমন্ত্রী আচমকা নির্বাচন ডাকতে পারেন। শ্রীবসু রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন প্রধানমন্ত্রীকে আচমকা নির্বাচন ডাকার অনুমতি না দেন। অপরপক্ষে, ভারতীয় লোকদল নেতা চরণ সিং ও রাজনারায়ণ বলেছেন যে, অবিলম্বে লোকসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচন করা উচিত এবং ইতিমধ্যে কেন্দ্রে একটি নির্দলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা উচিত কেননা তাঁরা মনে করেন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে অবাধ ও ন্যায্য নির্বাচন হবে না। জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন, আচমকা নির্বাচনের জন্য তিনি তৈরি আছেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের হাইকমান্ডের সূত্র থেকে জানান হয়েছে ক্ষেত্রবিশেষে বাছবিচার করে কংগ্রেস সি-পি-আই-এর সহযোগিতা গ্রহণ করে যাবে এবং আগামী নির্বাচনেও এই নীতি চালু থাকবে। সম্প্রতি কংগ্রেস দলের ভিতরে এবিষয়ে জোরালো প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন গুজরাটের প্রাক্তন পি-এস-পি নেতা ও বর্তমানে কংগ্রেসের সদস্য ডাঃ অমৃল দেশাই। কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া সম্প্রতি যখন গুজরাট সফরে গিয়েছিলেন তখন গুজরাটের সি-পি-আই নেতা সুবোধ মেহতা কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে একই মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। এটা কি করে সম্ভব হল সেই প্রশ্ন তুলে ডঃ দেশাই কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আই-এর সম্পর্কের বিষয়টি বিচার করার জন্য এ-আই-সি-সির অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব করেছেন। আর একজন কংগ্রেস এম-পি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সি-পি-আই-এর প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি যে দুটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন সেগুলি ছাপিয়ে কংগ্রেস এম-পিদের মধ্যে বিলি করেছেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির ভিত্তিতে তার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য সি-পি-আই যদি প্রস্তাব দেয় তাহলে সে প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি থাকতে পারে না।

চুয়াত্তরের চ্যালেঞ্জ

১৯৭৪ সাল শেষ হওয়ার প্রাক্কালে বোম্বাইয়ে ব্যবসায়ীদের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, এটা ছিল একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের বছর। সরকার যে অন্যায় রাজনৈতিক দাবি ও চাপ ঠেকাতে সক্ষম এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য তাঁরা যে এমনকি অপ্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও ইচ্ছুক বিদায়ী বছরে তাঁরা সে প্রমাণ রেখেছেন। ১৯৭৪-এর 'ব্যালান্স শীট' উপস্থিত করে তিনি জমার অঙ্কে এইসব সাফল্যের উল্লেখ করেন : প্রশাসনিক ব্যয় কমান হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি আটকান গেছে, ঘাটতি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে এবং অত্যাবশ্যক জিনিসের সরবরাহ বাড়ান গেছে।

এইসব সাফল্য সত্ত্বেও চুয়াত্তরের চ্যালেঞ্জের বেশ কিছু জের যে ১৯৭৫ সালের জন্য তোলা থাকবে বছরের শেষে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলির ফলে মুনাফার বাজারে টান পড়ার ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। চাহিদার অভাবে মন্দার লক্ষণও কতকটা প্রকট হয়ে উঠছে।

বছরের শেষে অর্থনীতির আকাশে আর একটি বিপদের মেঘ জমে উঠছিল। বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির চারটি কিস্তি পাওনা হয়েছে। সরকারের ঘাটতি আয়ত্তে রেখে এই বাড়তি মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীদের কিভাবে দেওয়া যাবে কেন্দ্রীয় সরকার সেটা ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তাঁদের প্রাপ্য আদায়ের জন্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি করছেন।

বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদুল্লাহ সেদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এ সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি বাতিল করে একটি আদেশ জারি করেছেন।

ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী ফৌজের সহযোগী, চরমপন্থী ও বিদেশী শক্তিসমূহের বেতনভুক শত্রুর চরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলাদেশের বৈরী শক্তিগুলি যে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে এই ঘোষণা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই ঘোষণার প্রসঙ্গে ঢাকায় সরকারিভাবে বিশেষ করে সেদেশে যে হিংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালান হচ্ছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে যে এযাবৎ পাঁচজন পার্লামেন্ট সদস্য সহ হাজার পাঁচেক আওয়ামী লীগ কর্মীকে খুন করা হয়েছে।

ভারত-পর্তুগাল সম্পর্ক

পর্তুগীজ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মারিও সোরেসের ভারত সফরের মধ্য দিয়ে এই দুই দেশের ভিতর একটা নতুন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস সূচিত হল। পর্তুগালের পুরান সরকারকে উৎখাত করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ঔপনিবেশিক নীতিকেও বিসর্জন দিয়ে সেদেশের নতুন সরকার ভারতের সঙ্গে একটা নতুন ও স্বাভাবিক সম্পর্কের অধ্যায়ে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। গোয়া, দমন ও দিউ-এর উপর পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বজায় রাখার জেদ ধরে ডাঃ সালাজার একতরফাভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। সে-দেশের নতুন সরকার অবশেষে গোয়া, দমন ও দিউয়ের উপর ভারতের অধিকারের বাস্তব সত্যটা স্বীকার করে নিয়েছেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব স্বরণ সিংহের সঙ্গে পর্তুগীজ পররাষ্ট্রসচিব ডঃ মারিও সোরেসের আলোচনায় স্থির হয়েছিল, দুই দেশের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে গোয়ার ভারতভুক্তিকে মেনে নেওয়া হবে।

ডাঃ সোরেসের এই ভারত সফরের প্রাক্কালে পর্তুগীজ সরকার রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাঁদের ১৩ বছরের পুরান অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। গোয়া সম্পর্কেই লিসবন ভারতের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ নালিশ করেছিল। পুরান ঐ অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে আজকের লিসবন সরকার ভারতের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ আরও সুগম করলেন। ডাঃ সোরেস তাঁর এই সফরকে 'শান্তি ও আপোষের যাত্রা' বলে অভিহিত করেছেন।

—পুণ্ডরীক

২৯-১২-৭৪

গোয়েন্দা ধাঁধা

বউ উধাও ॥ শার্লক হোমস্ ॥

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

গোয়েন্দা হওয়ার ঝকমারি অনেক। বিশেষ করে আইবুড়ো গোয়েন্দার। বউ হারালেও বউকে খুঁজে আনতে হয়—বউয়ের মর্যাদা না বুঝেও।

বেচারা শার্লক হোমস্-কেও এই জোয়াল কাঁধে বইতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কেলেংকারীর কথা কে না জানে। আরেকবার প্রায় একই ঘটনা-ঘটল লর্ড সাইমনের বিয়ের পর।

কি বিশ্রী ব্যাপার! ঢি ঢি পড়ে গেল সারা লন্ডন শহরে। তারপরেই অবশ্য দরদে বুক উথলে উঠল যখন লেডী সাইমনের জামাকাপড় পাওয়া গেল একটা লেকে। আচারে! বিয়ের পরেই বিপত্নীক!

ঘটনাটা গোড়া থেকে না বললে জমবে না। লর্ড সাইমন ইংল্যাণ্ডের সেইসব জমিদার-তনয় যাদের বংশের নামের ডাকেই গগন ফাটে, কিন্তু তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। মাঝখানে খুব হিড়িক উঠেছিল, আমেরিকার টাকাওলা মেয়েদের পটিয়ে বিয়ে করে ফেলা এবং মোটা বরপণ নিয়ে নতুন করে কাপ্তেনি করা।

লর্ড সাইমন তার ব্যতিক্রম নন। লন্ডনের কাগজে কাগজে এই নিয়ে ঝালমশলা মুড়িয়ে মত জিভে জল ঝরানো খবর ছাপা হল অনেকবার। কনের বাবার নাকি টাকা গুণে শেষ করা যায় না—খনির মালিক তো। মেয়েটারও কেবল ডানা দুটো নেই—বাদবাকী অবিকল পরীর মতই। কিন্তু এইসব দেখে কোনক্রমে ভোলা উচিত হয়নি লর্ড সাইমনের ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফালতু কথায় কান না দিয়ে ঝটপট বিয়েটা সেরে ফেললেন লর্ড মহাশয়। বয়স তাঁর কম। হুকুম করার জন্যেই জন্মেছেন—হুকুমমাফিক কাজ করিয়ে নিতেও জানেন। বিয়েটাও একটা হুকুম। সুতরাং বউ-বেচারীকেও আশা করেছিলেন সেবাদাসীর মত খাটাবেন—দরকার মত মোচড় মেরে টাকাও বার করে নেবেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! বিয়ে সেরে বাড়ী পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল বউ! লর্ড সাইমন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ঘরভর্তি লোক তখন একপেট খিদে নিয়ে বসে আছে খাবার টেবিলে—কনেবউ এসে বসলেই মুরগীর ঠ্যাং চিবোবে—এমন সময়ে খবর এল কনে উধাও!

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে গেল। পুলিশ মানে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড। যার চেহারা খর্বকায় নেউলের মত। বেজায় চটপটে। বেজায় ধুরন্ধর। বেজায় প্র্যাকটিক্যাল। অনুমান-কনুমানের ধার ধারে না। সে এসে দেখলে ফ্লোরা মিলার বলে একটা নাচুনে মেয়ে এসে বাড়ীতে হামলা জুড়েছিল। লর্ড সাইমনকে নাকি এত সহজে সে হাতছাড়া করতে রাজী নয়। ফুর্তি করার সময়ে মনে ছিল না? ফ্লোরাকে নাকি ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হয় বাড়ী থেকে। তারপর সেই

ফ্লোরার সঙ্গেই নাকি লেডী সাইমনকে বাগানে পাশাপাশি হাঁটতে দেখা গেছে। সুতরাং কেসটা জলবৎ তরলম্। অর্থাৎ ফ্লোরাই গায়েব করেছে লেডী সাইমনকে। মেয়েরা ভারী হিংসুটে হয়। হবুবর পালালে বাঘিনী হতেও আপত্তি নেই। সুতরাং পাকড়াও ফ্লোরা মিলারকে।

প্রমাণ? লেসট্রেড অত কাঁচা ছেলে নয়। তাও জুটিয়ে ফেলল সাপেন্টাইন লেকের জল থেকে। লেডী সাইমনের পরিত্যক্ত জামা-কাপড় পাওয়া গেলেও অবশ্য লাশটা পাওয়া গেল না। তাই বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেবার জন্যে প্রতিবারের মত এবারও সখের গোয়েন্দার পায়ে তেল দেওয়ার জন্যে বেকার স্ট্রীটের আইবুড়ো মন্দিরে হাজির হল সরকারী গোয়েন্দা।

শার্লক হোমস্ তখন সব বিদেয় করেছে লর্ড সাইমনকে। কেসটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে নিয়ে মনে মনে সাজিয়েও ফেলেছে। সামান্য দুচারটে প্রশ্ন অবশ্য করেছিল। লর্ড সাইমন তার জবাবে বলেছেন, ফ্লোরা মানে তাঁর সদ্য উধাও বউয়ের মাথাটা বিয়ের আগে থেকেই একটু বেসামাল ছিল বলে মনে হয়। নইলে ফ্লোরার ভয়ে এ-ভাবে কেউ পালায়? ফ্লোরার সঙ্গে লটঘট ছিল কিনা? তা হ্যাঁ, একটু আধটু ছিল বইকি। বিয়ের আগে কার না থাকে? তাই বলে বাড়ী বয়ে বিয়ে ভণ্ডুল করতে আসবে? এত বড় স্পর্ধা? ফ্লোরাকেও বলিহারি যাই। বিয়ে করতে গেল হাসতে হাসতে। বরকে নিয়ে ফিরে এল মুখখানা ভোলাহাঁড়ির মত করে। গির্জের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাওয়ার সময়ে হাতের ফুলের তোড়াটা পড়ে গেল মেঝেতে। এক-

শুধু একটি
অবেদন
প্লাস

চটপট আর
নিশ্চিত আরাম
দেয়

SARABHAI CHEMICALS PRIVATE LIMITED

Shilal-CC-6A/74 Ben

জন গেঁইয়া টাইপের লোক তুলে দিলে হাতে। তারপরেই বাড়ী ফিরে এসে ওর বাপের বাড়ীর ঝি-কে ডেকে কি যে বলল ভগবান জানেন। একটা কথা শুধু কানে এসেছিল। কথাটা আমেরিকার চাষাড়ে লোকদের মধ্যেই চালু। কথাটার সারা মানে হল, আগের জিনিসের ওপর দাবী নিয়ে তা দখল করা।

ঝি-য়ের সঙ্গে গজর গজর করার পরেই হাওয়া হয়ে গেল ক্লারা। ব্যাপারটা সিরিয়াস। লর্ড সাইমনের ইজ্জৎ বলে একটা কথা আছে।

সব শুনে নিয়ে লর্ডকে বাড়ী ফেরৎ পাঠাল হোমস। তারপরেই ধূর্ত হাসি হেসে ঘরে ঢুকল লেসট্রেড।

ডঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডঃ এস. এম. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সুর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-১
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে অকমাশুল ফ্রি

অফিস এবং ইন্‌জিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

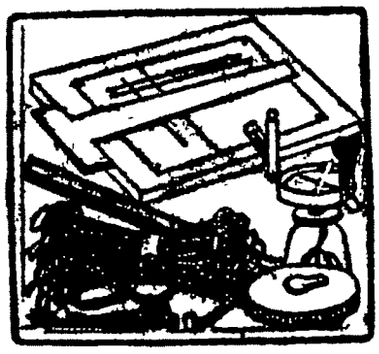

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক স্টেশনারী স্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম : অরারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : ক্যালিন প্রডাক্টস (স্টেশনারী বিভাগ)

সোল্লাসে বলল হোমস্—'আসা হোক! আসা হোক! কিন্তু কোটের হাতা ভিজে কেন বৎস?'

'সার্পেন্টাইনে জাল ফেলছিলাম যে।'

'জাল! সার্পেন্টাইনে। কেন?' চোখ কপালে উঠে গেল হোমসের।

'লেডী সাইমনের লাশ তোলার জন্যে।' হোমসের অজ্ঞতা দেখে অনুকম্পার সঙ্গেই বলল লেসট্রেড। সেই সঙ্গে বললে লেডীর জামাকাপড় পাওয়ার বৃত্তান্ত। এমন কি ফ্লোরা মিলার যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, তার প্রমাণ পর্যন্ত নাকি পাওয়া গেছে লেডীর পোশাকের পকেটে।

অতি তুচ্ছ প্রমাণ। একটুকরো ছেঁড়া কাগজ। তার ওপর পেন্সিল দিয়ে লেখা: 'একটু সামলে নিয়ে দেখা করো আমার সঙ্গে।

—এফ, এইচ এম।"

মোক্ষম প্রমাণ। ফ্লোরা মিলারকে ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়বে লেসট্রেড এই একটা প্রমাণের জোরে।

ভীষণ উৎসুক হয়ে কাগজটা হাত পেতে নিল হোমস্। দেখতে দেখতে চোখে মুখে ফুটে উঠল প্রচণ্ড কৌতুক। অট্টহাসি হেসে বললে—'সাবাস!'

'কিন্তু একী! আপনি উল্টো দিকে দেখছেন কেন?' আঁৎকে উঠল লেসট্রেড।

'উল্টো কোথায়? ঐটাই তো সোজা দিক হে! হোটেলের বিলের ছেঁড়া টুকরো তো! পেছনের হিসেবটাই আসল।'

'ও হিসেব আমিও দেখেছি। চৌঠা অগাস্টের তারিখ আর ঘরভাড়ার জন্যে ৮ শিলিং দেওয়া হয়েছে জেনে আমার লাভ? বেটটা যদিও চড়া—'

আরেক দফা অট্টহাসি হেসে হোমস বললে—'বৎস লেসট্রেড, শুধু একটা কথাই শুনে যাও। লেডী সাইমন বলে কেউ নেই, কোনোকালেই ছিল না।'

বিমূঢ় লেসট্রেড বিদেয় হতেই সুট করে বেরিয়ে পড়ল শার্লক হোমস। ওয়াটসন বেচারী বসে রইল একা একা। কিছুক্ষণ পরেই হোটেল থেকে লোকজন এসে পাঁচজনের খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল টেবিলে। ওয়াটসন বুঝল না কেন এই রাজসিক আয়োজন। তারও অনেকক্ষণ পরে হোমস্ ফিরে এসে বললে—'যাক, খাবার এসে গেছে! তাঁরাও এলেন বলে।'

'কারা?'

'লর্ড সাইমন এবং আরো দুজন।'

বলতে না বলতেই ঘরে ঢুকলেন লর্ড সাইমন। চোখ মুখ লাল। ভীষণ উত্তেজিত, বিচলিত এবং হতচকিত।

'কি বলছেন মশায়?' টেবিল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন লর্ড। 'আপনি ঠিক জেনে বলছেন তো?'

'ঠিকই বলছি।'

'কিন্তু এ সে সাংঘাতিক অপমান', ঠকাঠক ঠকাঠক শব্দে টেবিলে আঙুল বাজাতে লাগলেন লর্ড। পরক্ষণেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কটমট করে চেয়ে রইলেন দরজার দিকে।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন একজন ডানাকাটা পরী। পাশে একজন ছোটখাট চেহারার চটপটে লোক।

পরিচয় করিয়ে দিল শার্লক হোমস্—'মিষ্টার অ্যান্ড মিসেস ফ্রান্সিস হে মুলটন!'

'ক্লারা! বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছাড়লেন লর্ড।

ডানাকাটা পরীটি এগিয়ে এসে মিষ্টি হেসে বললে—রবার্ট, খামোকা রাগ করো না। ফ্রান্সিসের সঙ্গে অনেক আগেই গোপনে বিয়ে হয়ে গেছিল আমার। বাবা জানতেন না। ফ্রান্সিস গরীব ছিল বলে জানাইনি। কিন্তু ও পণ করেছিল আরো বড় খনির মালিক হয়ে এসে তবে আমাকে ঘরে নিয়ে যাবে। কিন্তু বছর খানেক পরেই খবরের কাগজে ওর নাম দেখলাম—খনি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তারপরেও অনেকদিন বসে থাকার পরেও যখন ও এল না, বাবার জেদে আমার দেহটা তোমাকে দেব ঠিক করলাম—মনটা নয়। তুমি বলো, আমি ঠিক করেছি না বেঠিক করেছি?'

'আমি চললাম।' কাঠের পুতুলের মত পা বাড়ালেন লর্ড।

'কোথায় যাবেন? খেয়েদেয়ে তারপর যাবেন।' বলল হোমস্।

'এর পরেও খাওয়া নামবে গলা দিয়ে?' বলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে উধাও হলেন লর্ড সাইমন।

বেচারা! নাকের ডগা দিয়ে ফস্কে গেল রাজকন্যা এবং আধখানা রাজত্ব। কিন্তু রহস্য সমাধানের সূত্রগুলো এখনো আপনার সামনে থেকে পালাতে পারেনি। সামনেই আছে। বলুন দিকি কী?

—অদ্রীশ বর্ধন

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৫২ পৃষ্ঠায়)

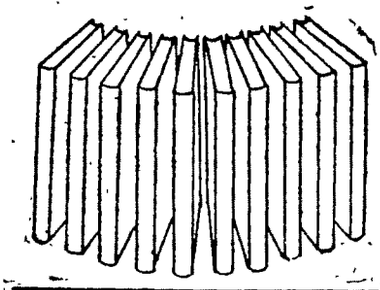

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সপ্তম জাতীয় গ্রন্থমেলা

সপ্তম জাতীয় গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়েছে হায়দরাবাদ নগরীতে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৭-১৬ তারিখ পর্যন্ত সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে এই গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য বারের মতো এবারও এই উপলক্ষ্যে ইংরেজী ও ভারতের সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৭৩ ও '৭৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিই কেবল এই প্রদর্শনীতে স্থান পাবে। গ্রন্থমেলায় প্রদর্শিত গ্রন্থগুলি পরে আবার আঞ্চলিক গ্রন্থ প্রদর্শনীতে স্থান পাবে, কাজেই এসব গ্রন্থ ফেরৎ দেওয়া হবে না। এই গ্রন্থমেলায় স্টল নিতে ইচ্ছুক প্রকাশকগণ ন্যাশনাল-বুক ট্রাস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, এ-৫, গ্রীণ পার্ক, নিউদিল্লী।

উদ্ভিদের সুরপ্রীতি

এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আচার্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ-জগৎ সম্পর্কে যে যুগান্তকারী তথ্য নিজেরই উদ্ভাবিত যন্ত্র-সমূহের সাহায্যে সংগ্রহ করেছিলেন, তা যথার্থই বিস্ময়কর। তারপর থেকে দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী তথা চিন্তাবিদ এসম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন এবং তার ফলে অনেক নতুন নতুন তথ্যও জানা গিয়েছে। সম্প্রতি পিটার টম্পকিনস এবং ক্রিস্টোফার বার্ড 'দি সিক্রেট লাইফ অব প্ল্যান্টস' নামে যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন, তা ইয়োরোপ-আমেরিকাতে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই লেখকদ্বয়ের মতে উদ্ভিদ-জগতের নিকট সুর ও সংগীত অত্যন্ত প্রিয়। কেবল তাই নয়, আচার্য জগদীশচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরা আরও বলছেন যে, উদ্ভিদ-জগৎ ভাব 'বিনিময়েও' সক্ষম। উদ্ভিদের স্মৃতি আছে ও সূক্ষ্ম অনুভবের শক্তিও আছে। মানুষ সঙ্গীতপ্রিয়, তাই মানুষের প্রতি উদ্ভিদের একটা বিশেষ ধরনের 'ব্যবহার' লেখকদ্বয় লক্ষ্য করেছেন। উদ্ভিদের জন্য যাদের হৃদয়ে সহানুভূতির অভাব আছে, বা সাধারণত উদ্ভিদের অনিষ্ট করে থাকে, অন্য পাঁচজন মানুষের মধ্য থেকে সে-রকম ব্যক্তিকে উদ্ভিদ 'চিহ্নিত' করতে সক্ষম। এজন্য তাঁরা একটি যন্ত্রও উদ্ভাবন করেছেন।

পরলোকে নাট্যকার হরিমদন গুরুং

নেপালী ভাষার প্রখ্যাত নাট্যকার হরিমদন গুরুং সম্প্রতি দার্জিলিং-এ পরলোকগমন করেছেন। তিনি ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অধীনে নাটক ও সঙ্গীত বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে বিশেষ কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি আধুনিক নেপালী ভাষার জনপ্রিয় লেখকগণের অন্যতম ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনীষীদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন

ডিসেম্বর মাসে (৯ই) এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় উপমহাদেশের আটজন জীবিত ও মৃত কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিল্পী ও শিক্ষাব্রতীকে সম্মানসূচক ডকটরেট দান করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী স্বর্গত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, স্বনামধন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও সাহিত্য-সমালোচক স্বর্গত ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, ডঃ মুহম্মদ কুদরৎ-ই

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা

সহৃদয় ক্রেতাদের অবগতির জন্য নিবেদন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি পুস্তকটি কাগজের বর্তমান দুষ্প্রাপ্যতার জন্য, বিক্রয়যোগ্য মাত্র ১,০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল্য-নির্ধারিত যাবতীয় প্রকাশনের মধ্যে, দ্রুত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, এ এক সর্বকালীন রেকর্ড। গুণগ্রাহী ক্রেতাদের সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁরা মনি-অর্ডার পোস্টাল অর্ডার বা ভি, পি.-যোগে অগ্রিম মূল্য পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ—আর কিছুদিনের মধ্যেই বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ (১,১০০ কপি প্রকাশিত হলে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁদের চাহিদা মেটানো হবে। শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি ও শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী রচিত বীরভূম জেলার পুরাকীর্তির, যথাক্রমে, বিক্রয়যোগ্য ৫,২৫০ এবং ৫,২৪০ কপির মধ্যে, ৯।১২।৭৪ তারিখে, অবশিষ্ট ছিল, যথাক্রমে, ৭০০ এবং ৩,৪৫০ কপি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাবতীয় প্রকাশনের ক্ষেত্রে, বাঁকুড়াজেলার পুরাকীর্তি, ইতিপূর্বেই ৪,৫৫০ কপি বিক্রীত হয়ে, এক অচিন্তিতপূর্ব রেকর্ডের সৃষ্টি করেছে। এই জনপ্রিয় পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার আগ্রহী ক্রেতারা আশা করি, অবিলম্বে নিজ নিজ কপি সংগ্রহ করবেন। কেননা, কলকাতা সমেত যে ১৩টি জেলার ২,২০০ কপি করে পুরাকীর্তি-পুস্তক এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়, সেগুলি মুদ্রিত হবার পূর্বে (কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি ছাড়া) পূর্ব-প্রকাশিত অন্য কোন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ না হওয়ারই সম্ভাবনা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়ের (৩৮, গোপালনগর রোড : কলকাতা—২৭) অধ্যক্ষের কাছ থেকে পাইকারী খরিদের ক্ষেত্রে পুস্তক ব্যবসায়ীরা ২০% কমিশন পাবেন। খুচরা ক্রেতারা এই বইগুলি পাবেন "নিউ সেক্রেটারিয়েট" ভবনে অবস্থিত সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্রে।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত—

শ্রদ্ধা, ডঃ হীরেন্দ্রলাল দে, অধ্যাপক আবদুল ফজল এবং কাজি মোতাহার হোসেন।

পরলোকে ওয়াল্টার লিপম্যান

স্বনামধন্য আমেরিকান সাংবাদিক ও লেখক ওয়াল্টার লিপম্যান গত ১১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। সাকুল্যে তিনি উনিশখানা বই লিখে গেছেন। তার মধ্যে তাঁর রচিত প্রথম বই 'এ প্রিফেস টু পলিটিক্স' বিগত অর্ধশতাব্দী কাল ধরেই একখানা জনপ্রিয় বই হিসেবে স্বীকৃত। 'টুডে অ্যান্ড টুমরো' নামে তাঁর কলামগুলি এক সময়ে আমেরিকার সমস্ত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর এইগুলিতে যে বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশিত হতো, তার দ্বারা অনেক সময় বিশ্ব-রাজনীতি পর্যন্ত প্রভাবিত হতো। তিনি ভারতের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন।

রুমানিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির আসর

কিছুদিন আগে রুমানিয়ার সরকারের আমন্ত্রণে একটি ভারতীয় শিল্পিগোষ্ঠী রুমানিয়া গিয়েছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে এই গোষ্ঠীতে ছিলেন প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত-শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, মাদ্রাজের ভারতনাট্যম শিল্পী শ্রীমতী কনক এবং ওড়িশার কত্থকশিল্পী শ্রীমতী রশী করণ। এই শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রেস কনফারেন্সে রুমানীয় বিদগ্ধজনের যে আলোচনাদি হয়, তা পরে বুখারেস্ট রেডিও থেকেও প্রচার করা হয়। একটি অনুষ্ঠানে অন্যান্য কবিদের রচনার সঙ্গে কাজি নজরুল ইসলামের 'ছাত্রদল' কবিতা থেকেও কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করা হয়।

—জয়ংকার

নতুন বই

সাগর দেখা। বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান বুকফ্রেন্ড। ৮।১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কোলকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

কোলকাতা মাঠের দুই প্রধানের মধ্যে অন্যতম প্রধান হোল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। শুধু কোলকাতা নয়, ভারতবর্ষের ক্রীড়া ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এক গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কোলকাতায় সিনিয়র ডিভিসন লীগ থেকে শুরু করে দিল্লী বোম্বাইয়ের ডুরান্ড, রোভার্স পর্যন্ত এর সাফল্যের ক্ষেত্র প্রসারিত।

বিনয়ভূষণ সেনগুপ্তের 'সাগর দেখা' গল্প বলার ভঙ্গিতে লেখা বহু গৌরবের অধিকারী ইস্টবেঙ্গল দলের ইতিহাস। লেখক বেশ সরসভাবেই ইস্টবেঙ্গল দলের জয়-পরাজয়ের সুখ-দুঃখের কথা আকর্ষণীয় করে উপস্থাপিত করেছেন। 'সাগর দেখা'-র সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় অংশ তা হোল ১৯২০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এক নজরে ইস্টবেঙ্গল দলের দীর্ঘদিনের ইতিহাস এই অংশে সহজেই দেখে নেওয়া যায়। দলের সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য—যেমন ১৯৫৩ সালে রাশিয়ায় কিয়েভ ডাইনামোর কাছে ১—১৩ গোলে পরাজিত হওয়া (সর্বকালের সবচেয়ে বড় পরাজয় হিসেবে লেখক চিহ্নিত করতে চেয়েছেন) 'ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে বিপক্ষ দলের আত্মঘাতী গোল' 'বিদেশী দলের সঙ্গে খেলার বিবরণ' 'দলে কোন্ খেলোয়াড় সবচেয়ে বেশী দিন খেলেছেন', 'দলের সবচেয়ে বেশী গোল দিয়েছেন' এমনি সব মূল্যবান তথ্যে বইখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ক্রীড়ারসিক পাঠকমাত্রেরই এটি সংগ্রহে রাখা দরকার। তবে একটা কথা বলার আছে, এই ধরনের খেলাধুলা সম্পর্কিত বইতে ছবির একটা অনিবার্য প্রয়োজন থাকে। বইখানিতে একখানিও ছবি নেই। ছবি থাকলে এবং প্রচ্ছদটিকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করলে ভালো হোত। ছাপা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

জন্মান্তরবাদ। হৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য। মহেশ লাইব্রেরী ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দু টাকা।

মানুষের জন্মান্তর নিয়ে অনেক দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়েছে। প্রত্যেকটি ধর্ম তাঁদের নিজ নিজ চিন্তানুযায়ী জন্মান্তর রহস্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন। শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য গীতা, হিন্দু শাস্ত্রাদি থেকে নানান বিষয় উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন, জন্মান্তরবাদের অন্তর্নিহিত সত্য। বস্তুত ধর্মীয় ভিত্তিতে 'জন্মান্তরবাদ'-এর পরিচয়দানই এ-গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্য। তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে আত্মার অবিনশ্বরত্ব, কর্মফল, পুনর্জন্ম, আত্মার ক্রমোন্নতি, বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়াম ম্যাডাম ডি এসপ্যারান্সের উক্তি উদ্ধৃত করে মানুষের জন্মান্তর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা যোগ করেছেন। গ্রন্থটি ধর্মজিজ্ঞাসু, দার্শনিক, অধ্যাত্মপ্রাণ ও সাধারণ পাঠকদের সার্বিক ঔৎসুক্য জাগাতে সক্ষম।

সূর্যমুখী সকাল চাই (কাব্য সংকলন)। তপন বিশ্বাস। সুবোধ বুক স্টল, ৭।১।২, বিধান সরণি, কলকাতা-৬। চার টাকা।

শ্রীতপন বিশ্বাস বয়সে তরুণ, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবও বেশী দিনের নয়। 'সূর্যমুখী সকাল চাই' গ্রন্থটি কবির প্রথম কাব্য সংকলন। কবি বস্তুজগতকে কবিতা থেকে বাদ দেননি, আবার শুধুমাত্র বাস্তব জগতের নীরস চিত্র রচনা করেই কাব্য বক্তব্য শেষ করেননি। কয়েকটি কবিতায় কবির কবি-ক্ষমতার পরিচয় আছে। কোন কোন কবিতায় আবেগ-উচ্ছ্বাস তীব্র হওয়ায় এবং সংযম না থাকায় ছন্দে, চিত্রকল্পে ও কাব্যের ভাষায় কিছু গতানুগতিকতা, ক্লান্তি, মন্থরতা, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটে গেছে। ছন্দ-ভাবনা সব কবিতায় নির্ভুল নয়। তবু প্রথম কাব্যগ্রন্থে কবির কিছু ক্ষমতার স্বাক্ষর আছে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কণ্ঠস্বর। সত্যরঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত। ১১।২, টেমার লেন, কোলকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

পত্রিকার চরিত্রে চমক সৃষ্টির প্রয়াস হয়েছে। সাফল্যের ব্যাপারটা বিতর্কিত। লিখেছেন—অমিতাভ চক্রবর্তী অমিতাভ চৌধুরী দিলীপ গুপ্ত এবং আরও কয়েকজন।

প্রগতি। মৃণাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৩৯বি, ডেপ্টিমিশন রোড। কোলকাতা-২৩। দাম তিন টাকা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কৃষ্ণ ধর গৌবাঙ্গ ভৌমিকের কবিতা নরেন্দ্রনাথ মিত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ দক্ষিণারঞ্জন বসুর গল্প এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সুখরঞ্জন চক্রবর্তী ভবতোষ দত্ত এবং দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ করার মতো।

আড্ডা। সম্পাদক রেখা চট্টোপাধ্যায়। ৭৩, শরৎ বোস রোড, কোলকাতা-২৬। দাম চার টাকা।

লিখেছেন রমা চৌধুরী শঙ্করপ্রসাদ মিত্র তপতী মুখোপাধ্যায় (রায়) ভোলানাথ শীল আশাপূর্ণা দেবী এবং আরও অনেকে। সাক্ষাৎকারগুলি উল্লেখ করার মতো।

পল্লীরূপা। নিখিলরঞ্জন মাইতি সম্পাদিত। ময়না, মেদিনীপুর। দাম দু' টাকা।

একক। শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত। ১০-৩সি নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট কোলকাতা-২৬। দাম দেড় টাকা।

লিখেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র সুশান্ত বসু অশোককুমার দত্ত অংকুর সাহা কৃষ্ণসাধন নন্দী চন্দন দাশগুপ্ত সাগর বসু এবং আরও অনেকে।

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-----১৪'00
২। গুল বাগিচা----৩'৫০. ৩। কাব্য আমপারা--৪'00
৪। পূবের হাওয়া----২'00. ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি--২'00
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৮৩৩ কলিকাতা-৯

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুরুদেবের এ-পত্রটি পড়ে আমার মন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল বিশেষ করে তাঁর শেষ ছত্রটির প্রসাদে। কারণ আমি বরাবরই কৃষ্ণকে পূর্ণাবতার মনে করতাম বলে বলতাম প্রায়ই তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বিভূতি স্মরণ করে যে, যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন সেখানে শেষরক্ষা হবেই হবে প্রেমের দিগ্বিজয়ে ধ্রুব নীতির প্রবর্তনে। ভরসাটি দিয়েছিলেন সঞ্জয় গীতার শেষে পুলকিত হয়ে—গেয়ে 'হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ'। আমার চিরদিনই মনে হয়েছে—কৃষ্ণের ভাগবত মহিমায় যারা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে অক্ষম তারা আজীবন একটি মহানন্দ থেকে বঞ্চিত থেকে যায় দেখতে না পেয়ে যে, একবার অন্তত ভগবান প্রত্যক্ষ মানুষী তনু ধরে পৃথিবীতে নেমেছিলেন, পেরেছিলেন শুধু নিজের পূর্ণিমা প্রকাশকে সম্ভব করে দিব্য পরা প্রাকৃতিকে অবতীর্ণ করতেই নয় —তাঁর অপরূপ রূপৈশ্বর্যের মাধ্যমে প্রেম জাগিয়ে আমাদের বিষণ্ণ ধরাধামে নিখুঁৎ আনন্দ-বৈকুণ্ঠের স্বর্ণদ্বার উদঘাটন করতে—

নেচে গেয়ে হৃদয় ছেয়ে
ফুল ফুটিয়ে কাঁটাবনে
অতুল হাসির অকূলবাঁশির
ঘরছাড়া প্রেম-উন্মাদনে।

বাইশ

আমি কৃষ্ণ ও গঙ্গা সম্বন্ধে লিখেছি যে, ছেলেবেলায়ই আমার মনে বিশ্বাস এসেছিল তেমনি সহজে 'নিশার ঘন আঁধার দিয়ে ঊষা যেমন নেমে আসে।' *এ উদ্ধৃতিটি পুরোপুরি সুপ্রযুক্ত হয়েছে কেবল কৃষ্ণের ক্ষেত্রে। কারণ আমার মনে নাস্তিক বুলির জটলা মেঘের মতন আস্তিক্যের আলোকে ঢেকে দিয়েছিল প্রথম দিকে (যেকথা আমার 'স্মৃতিচারণ'-এ বলেছি)। সে-আঁধারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতই ঊষার আলোর মতন নেমে এসেছিল কৃপারূপে, যে-আলো মাঝে মাঝে সংশয়ের বাদলে ম্লান হলেও মরিয়া-না-মরে-রামের মতনই ফের জেগে উঠত। কিন্তু গঙ্গার ক্ষেত্রে সংশয় আসে নি কোনোদিনই। পুরাণে আছে সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করার পর জন্ম নিয়েছিলেন হিমালয়ের ঘরণী মেনকার গর্ভে যুগল কন্যারূপে—উমা ও গঙ্গা—উভয়েই শিবের ঘরণী। ভেবে পার পেতাম না কৈশোরে। কিন্তু গঙ্গা শিবজায়া কি না এ-বিষয়ে ধাঁধায় পড়লেও তিনি যে দেবী এ-সম্বন্ধে মনে একবারও সংশয় আসে নি। পিতৃদেব ভক্তির গান বেঁধেছিলেন—কৃষ্ণ, শিব কালী গঙ্গা শ্রীচৈতন্য ও জন্মভূমি দেবিকাকে অর্ঘ দিয়ে। তাঁর মুখে এসব দেব দেবীর গানে আনন্দে বিভোর হয়ে তাঁর সঙ্গে দোয়ার দিতে দিতে অজ্ঞান্তেই হয়ে উঠেছিলাম প্রতিমাপূজারী—যার ফলে প্রতিমা দেখলেই প্রণাম করতে আনন্দ পেতাম। কিন্তু সব প্রতিমাকেই প্রণম্য বলে বরণ করলেও সবচেয়ে গভীর আনন্দ পেতাম কৃষ্ণ বিগ্রহকে গড় করে। বলেছি, শ্রীঅরবিন্দ ঠিকই ধরেছিলেন যে, কৃষ্ণ সংস্কার যার মজ্জাগত তার কাছে সুপ্রামেন্টালের অত্যধিক গুণগান করা নিষ্ফল। কিন্তু আশ্চর্য সহিষ্ণু হওয়া সত্ত্বেও তিনি অবশেষে আমাকে তিরস্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন আমি দেখেও দেখতে চাইনি বলে যে সুপ্রামেন্টাল কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী নন—পরিপূরক। একথা আমি খুশী মনেই মেনে নিয়েছিলাম সুপ্রামেন্টাল সম্বন্ধে তাঁর উদ্দীপক চিঠিটি পড়ে। কিন্তু বিদেহ সুপ্রামেন্টালকে আমার কৃষ্ণপূজারী মনে সশ্রদ্ধে ঠাঁই দিলেও ভালোবাসতে পারিনি যেমন পেরেছিলাম কৃষ্ণ ও গঙ্গাকে। এ-প্রত্যয়টির পুনরুক্তি করছি এই জন্যে যে পণ্ডিচেরি আশ্রমের আবহে কৃষ্ণ সুপ্রামেন্টালের নিচে স্থান পাওয়ার জন্যে আমি মনে সত্যিই গভীর বেদনা বোধ করতাম যার ফলে থেকে থেকে বুথে উঠে বলতাম : 'সুপ্রামেন্টাল আমার মাথায় থাকুন, কেবল কৃষ্ণ যেন থাকেন আমার হৃদয়ে।' পণ্ডিচেরি আশ্রমে শুনতাম প্রায়ই যে মানুষের চেতনার যতই বিকাশ হয় ততই সে অতীতের দিকে ফিরতে না চেয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগুতে চায়। শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত

> "We do not belong to the past dawns but to the noon of the future"

মন্ত্রটি আমি থিওরিতে সাদরেই বরণ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখতাম যে, কৃষ্ণই বার বার যেন উঁকি মেরে আমার দিকে চেয়ে হাতছানি দিতেন বিগত ঊষার অস্তাচল থেকে চিরন্তন নবারুণের মতন। মাঝে মাঝে নিজেকে নিশ্চন্ত করেই চুপি চুপি হাসতাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি রসাল কথিকা স্মরণ করে : এক কালীভক্ত ব্রাহ্মণকে এক পালোয়ান মোল্লা জোর করে কলমা পরিয়ে মুসলমান করে বলে : 'এখন থেকে বল্ আল্লা, আল্লা—কালী বললেই তোর মুণ্ডপাত করব।' বেচারী কী করে? বিমনা হয়ে জপ করে : 'আল্লা আল্লা আল্লা..... জগদম্বা..... আল্লা, হো আল্লা...জগদম্বা।' মোল্লা রেগে তাকে কাটতে যেতে সে করজোড়ে বলে : শেখজী, অপরাধ নেবেন না—আমি অপ্রাণ চেষ্টা করছি আল্লামন্ত্র জপ করতে, কিন্তু মা জগদম্বা আমার বুক ভরে আছেন, তিনি থেকে থেকে আল্লাকে ঠেলে বেরিয়ে পড়ছেন।' সুপ্রামেন্টাল আমার কাছে হয়ে উঠেছিল আল্লার মতন বিধর্মী এমন ইঙ্গিত করছি না, তবে কৃষ্ণ যে ঐ ব্রাহ্মণ বেচারীর মতন আমার বুক ভরে ছিলেন একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু তাবলে আমি সুপ্রামেন্টালের প্রতি অপ্রসন্ন একথা বললে আমার বুদ্ধিকে অযথা অপদস্থ করা হবে। সুপ্রামেন্টাল সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের উচ্ছ্বাসে থিওরিতে আমি সত্যিই সাড়া দিয়েছিলাম। তাই বিশ্বাস করেছিলাম যে তিনি নিশ্চয় অবতীর্ণ করাবেন এ-অজ্ঞাতপূর্ব নরদেবকে যাঁর আবির্ভাবে এ-ধূলিধামে মানুষের নবজন্ম না হোক চেতনার নববিকাশের পথ খুলে যাবে। তাছাড়া যে-নবারুণের স্বর্ণপ্রভায় মানুষ তার সুদুর্লভ ইষ্টের সঙ্গে কথালাপ করতে পারবে সে-উদয়কে কোন্ মূঢ় না বরেণ্য বলে মেনে বরণ করতে চাইবে? আর শুধু কথালাপই তো নয়—মানুষের রোগমুক্তি হবে, দুঃখশোকের নিবসন হবে—বারবার ওঠার পরে পড়তে হবে না আমরা অভীপ্সার পাখা মেলে উড়ে চলব মেঘলোকে

---

* চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে
দেখিস্ না মা।
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন
ভাবে বিভোর বামা।...
আয় মা এখন তারারূপে স্মিত মুখে
শুভ্রবাসে
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে ঊষা
যেমন নেমে আসে।
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

উত্তীর্ণ হয়ে তারালোকে—এমন-যে জাদুকর বরদাতা তাকে না চাইবে কোন্ অর্বাচীন? কেবল মুস্কিল এই যে আমাদের মনতরুর নানা শাখায় নানা রঙের নানা মেজাজের পাখী নীড় বাঁধে—যেকথা শুধু শ্রীঅরবিন্দ না মহামনীষী গেটেও বলতেন উঠতে বসতে। (গেটে তাঁর ZUR MORPHOLOGY-তে লিখেছিলেন :

> "Every living being is not a unity but a plurality. Even when it appears as an individual, it is the reunion of beings living and existing in themselves"

অর্থাৎ কোনো মানুষই একলা নয়—অনেকগুলি মানুষের সমাষ্টি—যদিও বাইরে থেকে দেখতে একলা মনে হয়।) ফলে কখনো এ-পাখীর গানের আস্থায়ীকে ও-পাখীর অন্তরা ঢেকে দিত—কখনো ও-পাখী এ-পাখীকে থামিয়ে গান শুরু করত। আমি তাই বারবার নিজেকে ধমকিয়েও শুধু যে সুপ্রামেন্টালের পায়ে গড় করতে পারতাম না তাই নয়, তাঁর কাছে হাতজোড় করতেও বাধত—মনে হত আগুনের ছবিকে কেমন করে আগুনের মান দিই? কৃষ্ণের সম্বন্ধে বেশি কিছু না জানলেও অন্তরে তাঁর বাঁশি শুনেছি শ্রদ্ধেয় ভক্তদের আত্মকথায় তাঁর নূপুরধ্বনি—কিন্তু সুপ্রামেন্টালের ছায়াপথের একটুকরো রশ্মিও যে আমার চলার পথে কখনো আলো ধরে নি, এমনকি চকিত আভাসও পাইনি আমার কল্পনার দূরবীনে বা বুদ্ধির অনুধানে।

একদা এই ধরনেরই একটি মন্তব্য করেছিল আমার এক প্রিয় গুরুভাই জে এ চ্যাডউইক ওরফে আর্জব বলেছিল : 'তুমি জানো দিলীপ শ্রীঅরবিন্দকে আমি কী গভীর শ্রদ্ধা করি, কিন্তু চমকে উঠতে হয় অতিমানস আলোর অবতরণ সম্বন্ধে তাঁর বাণী শুনে! সত্যিই কি এ-অলোক আবির্ভাব হবে আমাদের ম্লান পৃথিবীতে?

> ("Sri Aurobindo takes one's breath away, Dilip, but will the Supramental really take birth in this our dismal earth?")

চ্যাডউইকের কথা বলি এবার সংক্ষেপে। তার অসামান্য বুদ্ধি প্রতিভা—সর্বোপরি, আন্তরিকতা—আমাকে শুধু যে সাধনায় উৎসাহ দিত তাই নয়, জোগাত মনের শক্তি কবিতার প্রেরণা, স্বাধীন চিন্তার উদ্দীপনা। সে প্রায় দেড় বৎসর ছিল আমার পাশের ঘরে বরণীয় কমনীয় সতীর্থ হয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সে (কৃষ্ণপ্রেমের মতনই) য়ুরোপীয় সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে এসেছিল ভারতবর্ষে আত্মিক পথের দিশা খুঁজতে। যুদ্ধে আহত হয়ে সে দুর্বল ও ঈষৎ পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। আমাকে আরো বলেছিল যে, সে বেশিদিন বাঁচবে না বাঁচতে চায়ও না—কিন্তু এখানে থেমে একটু পিছিয়ে গিয়ে বলি—সে কীভাবে পন্ডিচেরিতে এসেছিল যার ফলে তার জীবন বিপুল মোড় নিয়েছিল—সে দীক্ষা নিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের যোগে। ছবিটা আঁকবার মত।

তেইশ

জে এ চ্যাডউইক আমার কাছে এসেছিল লখনৌ থেকে আমার বন্ধু শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি নিয়ে। ধূর্জটি সে সময়ে ছিল লখনৌয়ের অধ্যাপক। চ্যাডউইকও তাই, কাজেই ধূর্জটির সতীর্থ। ধূর্জটি লিখেছিল তার সম্বন্ধে যে, সে ভারতবর্ষে এসেছে জিজ্ঞাসু হয়ে—গীতার জিজ্ঞাসু যে ভগবানকে জানে না কিন্তু জানতে চায় ভগবততত্ত্ব অসামান্য বুদ্ধি.....ইত্যাদি।

চ্যাডউইক আমাকে বেশি কিছু খুলে বলেনি, কেবল বলেছিল যে সে অধ্যাত্ম সত্যের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—কিন্তু সে-সত্যের কোনো দিশা পায় নি। আমি জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল—শ্রীঅরবিন্দের নাম শুনে কয়েকটি বই কিনেছে কিন্তু পড়ে নি দেশে—ইংলন্ডে ফিরে পড়বে। আমি চ্যাডউইককে বলি শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম সম্বন্ধে অনেককেই শুধু দিশা নয় পথের পাথেয় দিয়েছেন কিন্তু তাঁর পূর্ণযোগ সহজ নয়। চ্যাডউইক বলেছিল—সে জানে হাড়ে হাড়ে যে, কোনো বড় প্রাপ্তির পথই সহজ নয়। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এমন কোনো পথের নির্দেশ পায়নি যে-পথে পদযাত্রা করা তার পক্ষে সম্ভবপর। কাজেই সে একটু নিরাশ হয়েই স্বদেশে ফিরে যাচ্ছি। শুনে আমি দুঃখিত হয়ে বলেছিলাম যে ভারতে এসে কোনো ধর্মজিজ্ঞাসু নিরাশ হয়েছে শুনলে আমার মন ব্যথিয়ে ওঠে তবে আমি জানি সময় না হলে ডাক এলেও শোনা যায় না। 'ডাক' বলতে কী বোঝায় জিজ্ঞাসা করাতে তাকে আমি শুধু বলেছিলাম যে, কোনো তীর্থপথে পদযাত্রা করতে যখন মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখনই বলা চলে যে যাত্রী ডাক শুনেছে সে-অচিন পথের পথিক হবার। বলে তাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম সে শ্রীমার কথা শুনেছে কিনা। সে 'না' বলে জানতে চাইল তাঁর কথা। উত্তরে আমি তাকে শ্রীমা সম্বন্ধে যা জানি বলে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সে রাজী আছে কিনা। সে পাল্টা প্রশ্ন করল : 'কিন্তু তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হবেন?' আমি বললাম : 'আমি তাঁকে বলে দেখতে পারি।' এ-সম্বন্ধে আমি অন্যত্র লিখেছি ফলিয়েই * তাই এখানে সেসব কথার পুনরুক্তি করব না—সংক্ষেপেই বলব যা বলার আছে।

চ্যাডউইক চলে গেলে শ্রীমাকে জানালে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন—আশ্রমের লাইব্রেরিতে। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কথালাপ বেশিক্ষণ হয়নি—বড়জোর আধ ঘণ্টা। কিন্তু চ্যাডউইক মুগ্ধ হয়ে পরে আমাকে বলল : 'আমি অভিভূত হয়েছি।'

* * *

কয়েকমাস বাদে সে বিলেত থেকে আমাকে লিখল যে, সে যোগার্থী হয়ে আসতে চায় পন্ডিচেরি। শ্রীমা রাজী হয়ে তাকে লিখতে বললেন সে আসতে পারে। আমার ফ্ল্যাটে দুটি বড় ঘর ছিল, আমার পাশের ঘরেই সে থাকবে স্থির হল।

ফলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। সে স্বভাবে কৃষ্ণপ্রেমের মতন মিশুক ছিল না, কিন্তু যেমন নম্র তেমনি স্নেহশীল। আমাকে সে ইংরাজী ছন্দ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করেছিল যখন সে চমৎকার কবি হয়ে ফুটে উঠল। তার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম দিকে দীর্ঘ পত্রালাপ করতেন য়ুরোপীয় দর্শন নিয়ে—পরে ইংরাজী ছন্দের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে। তার কবিতা আমার বিশেষ ভালো লাগত যদিও তার সব কবিতা আমার কাছে সুবোধ্য মনে হত না। অই সে আমাকে তার নানা কবিতার মর্ম বুঝিয়ে দিত—শেষে আমাকে বলেছিল যে ইংরাজী ছন্দে আমার কৃতিত্বে সে বিশেষ খুশী হয়েছে।

আমার সবচেয়ে ভালো লাগত যেসব কবিতা সে লিখেছিল শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা ও Lailia (লিলিয়া) নাম্নী এক ললিতার সম্বন্ধে। এসব কবিতা তার দেহান্তের পরে বিলেতে ছাপা হয়েছিল ১৯৪০ সালে। শ্রীঅরবিন্দ তার লিলিয়ার উদ্দেশে লেখা কবিতাগুলির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতেন। আমিও বারবার পড়তাম বিশেষ করে তার পদলালিত্য তথা ছন্দোমাধুর্যের জন্যে। তার অন্য নানা কবিতাকেও শ্রীঅরবিন্দ exquisite, exceedingly beautiful, very original .. .. ..

ইত্যাদি বিশেষণের শিরোপা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেসব কবিতা উদ্ধৃত করা এ-তর্পণে অবাস্তব হবে বলে শুধু তিনটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হল :

RED LOTUS
(SRI AUROBINDO'S CONSCIOUSNESS)

O puissant heart amidst whose raptured shrining
A nameless Love is garbed in Name's disguise!

হে মহিমময় প্রাণ—যার মহানন্দের মন্দিরে
উচ্ছলে নামের ছদ্মবেশে এক নামাতীত প্রেম!

That living Lotus petal by petal unfolding,
which through the mists of this AVIDYA looms,

সে-প্রাণ-উচ্ছল পদ্ম পর পর মেলে দল যার,
অবিদ্যামেঘের মর্মে অস্ফুট রূপশ্রী তার ভার।

(ক্রমশ)

---

* SRI AUROBINDO CAME TO ME ১ম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

চিঠিপত্র

অমৃত প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে 'অমৃত' যে অতুলনীয় একথা অনস্বীকার্য। শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অবশ্য পাঠক-পাঠিকা গোষ্ঠীর বিবেচনাধীন। সর্বশেষ সংযোজনের দিক থেকে 'যুবক-যুবতী' বিভাগটি সকলেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে, বিশেষ করে সুদূর পল্লীগ্রামের তরুণ তরুণীদের কাছ থেকে। বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে 'অমৃত' যেন বহুল প্রচারিত হয়ে গ্রামে গঞ্জের প্রতিটি মানুষের কাছে একটি সর্বাংগসুন্দর, সর্বজনপ্রিয় সার্থক সাহিত্য পত্রিকা হয়ে উঠুক—এই আশাতেই কিছু সংযোজনের আলোকপাত করছি।

পাঠক মাত্রই চান নতুন কিছু জানতে, শিখতে, দেখতে। আবার এই পাঠকদের মধ্যেই রয়েছে শ্রেণীভেদ। কেউ ভালবাসেন খেলাধুলা, কেউ হয়ত সিনেমা আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক সমালোচনা। অনেকের মধ্যে তেমনি হয়ত কেউ ভালবাসেন বিজ্ঞানের কথা। বিজ্ঞান বলতে আমি শুধু গবেষণা বা গবেষক অথবা নতুন কিছু উদ্ভাবনের কথা বলতে চাইছি না। এই গবেষণাগুলি কোথায় হয় এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলি কোথায় অবস্থিত (মূল কেন্দ্রের বহির্দৃশ্য চিত্রসহ) তার সামান্য পরিচিতি সকলেরই (বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীদের জানতে ইচ্ছে করে। 'বিজ্ঞানের কথা' নামক একটি বিভাগ যদিও অমৃতে রয়েছে। শহর কলকাতাবাসীরা কয়েকজনকে বাদ দিয়ে বাকী সবাই এবং গ্রাম বাংলার তরুণ ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের একটা নিদারুণ ইচ্ছে হয় এগুলি সম্পর্কে কিছু জানতে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আই আই ই এম, আই এ সি এস, দি রিজিওন্যাল ইনস্টিট্যুট অফ প্রিন্টিং টেকনলজি গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিট্যুট, বোস ইনস্টিটিউট, সাহা ইনস্টিট্যুট স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং পশ্চিমবাংলার বাহিরের অন্যান্য কেন্দ্রসমূহ। আশা করছি, বিভাগটি চালু হলে নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহে সংযুক্ত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী কেউ কেউ না কেউ এগিয়ে আসবেন তাদের প্রতিষ্ঠানকে সকলের চোখে তুলে ধরতে। একজন অনুরাগী পাঠক হিসাবে মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে এদিকটা চিন্তা করতে অনুরোধ রাখছি।

লোকনাথ ঘোষ,
পি জি হল
যাদবপুর, কলি-৭০০০৩২

গণটোকাটুকি

আমরা অমৃত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অমৃত পত্রিকায় যুবক যুবতীদের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাধারা কিরূপ সেটা জানবার যে প্রচেষ্টা আপনারা চালাচ্ছেন সেজন্য ধন্যবাদ জানাই।

গত ১১ই অকটোবরের সংখ্যায় 'গণটোকাটুকি' এই শিরোনামে যে বিভিন্ন মতামতগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে কোন ছাত্র, ছাত্রী বা শিক্ষকই ছাত্রসমাজকে দায়ী করেননি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান এই গণ-টোকাটুকির জন্য কারা দায়ী বা এর উৎস কোথায়? এ বিষয়ে শিক্ষক মলয় দাশগুপ্তের উক্তিটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য কেননা 'এই গণটোকাটুকির কারণ হল জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীনতা।' আর এই উদ্দেশ্যহীনতা আসছে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব থেকে। যার সংগে লেজুড় হিসেবে কাজ করছে শিক্ষা-ব্যবস্থার বার বার পরিবর্তন। এই দুইয়ের মিলিত ফল শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অশ্রদ্ধা, পরিশেষে অশান্তি।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যই যে অসদুপায়ের পথকে প্রশস্ত করেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। আর যারা (ছাত্ররা) বিনা পরিশ্রমে সাফল্যে বিশ্বাসী (নকলের মাধ্যমে) তারা সমাজের আবর্জনা বিশেষ। কিন্তু এইসব ছাত্র যারা নকলের মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী তারা শিক্ষাক্ষেত্রের একটা সামান্য অংশ জুড়েই রয়েছে। সেই জন্য তাদের নিয়ে যতটা ভয় তার চেয়েও ভয় বেশী শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ও আমাদের সরকারকে নিয়ে। এঁরা পুরানো ব্যাধিকে প্রশ্রয় দিয়ে দূরারোগ্য করবার চেষ্টায় আছেন। পুরানো এই কারণে যে নকলের আসল জন্ম বেশীদিন নয় (পূর্বে অল্প 'নকল' ছিল কিন্তু তা বর্তমানের মত এত বিস্তার লাভ করেনি।) যা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অন্যান্যদের সংগে একটা 'কমন' ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সনৎ মজুমদার
অমিতাভ ঘোষ
হালিসহর

(২)

গত ১৪ বর্ষ ২৩ সংখ্যা 'অমৃতে' যুবক যুবতী বিভাগে কৃষ্ণা সেনগুপ্ত 'গণটোকাটুকি' শীর্ষক আলোচনায় যে সমস্ত প্রশ্ন রেখেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য রাখছি। হরিপাল বিবেকানন্দ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হিসাবে। কৃষ্ণা সেনগুপ্ত প্রশ্ন রেখেছেন কেন এ রকম হচ্ছে? প্রথমেই বলে নিই বিগত দিনের যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে তা বর্তমান সমস্যাবহুল জীবনের সংগে সম্পর্কহীন অর্থাৎ অকেজো। বাস্তব বা জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন, নতুন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরী, পরীক্ষা-সংস্কার, বৎসরে স্কুল থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত তিন চারিটি পরীক্ষা গ্রহণ করা (কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার সংগে গ্রহণ করবে) কোর্স অনুযায়ী। পঠনপাঠন যথাসময়ে শেষ করা। যতদিন এগুলির ব্যবস্থা না হচ্ছে ততদিন এই গণটোকাটুকি বন্ধ করা একটা সমস্যা। টোকাটুকি করে পাশ করার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় পড়াশুনার নেশাও অন্তর্হিত হচ্ছে। কম পড়াশুনা করে টোকাটুকির জন্যই ছাত্ররা প্রস্তুত হচ্ছে। আসলে পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুতি নয়। বাৎসরিক বা টেস্ট পরীক্ষাগুলি বিশেষ করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রহণ ছাড়া আর কিছু নয় আর অধিকাংশ জায়গায় পরীক্ষাই হয় না। কর্তৃপক্ষ অধ্যাপকগণ ঝামেলা, অপমান প্রভৃতির ভয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যান। 'যা হচ্ছে হোক, যা ইচ্ছে করুক' এই মনোভাব নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তাই জাতির প্রয়োজনে এই টোকাটুকি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অথবা পরীক্ষা গ্রহণে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন প্রয়োজন. কর্মমুখী শিক্ষা এখন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

চঞ্চল সিংহরায়
মোহিয়া, হুগলী

"যৌনশিক্ষার অর্থনীতি"

১৩ ডিসেম্বরের 'অমৃত' পত্রিকায় উপরোক্ত নিবন্ধে শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়ের লেখার উপর নির্ভর করে শ্রীসমর ঘোষ যে বক্তব্য রেখেছেন একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে আমি সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলছি।

'জীববিজ্ঞান' ও 'জীবন বিজ্ঞান'—এই দুয়ের মধ্যে অর্থের তফাৎ কেমন কম, মূলগত তাৎপর্যের প্রভেদও খুব একটা বেশী নয়, (শ্রীঘোষ মহাশয় স্কুলের ছেলেদের নিশ্চয়ই বুৎপত্তিগত মানে বোঝাতে ব্যস্ত হবেন না।) এই কথাই শ্রীঘোষ মহাশয় স্বীকার করেছেন তার বক্তব্যের সমর্থনে প্রদত্ত বিবৃতির তৃতীয় অনুচ্ছেদে। অথচ তিনিই শান্তিলালবাবুর লেখাতে এই ভুল দেখাতে এবং বিকৃত তথ্য অবলোকন করে ঠিকই করেছেন। বিকৃত হাতে বোধ হয় কলম ধরেছেন এবং শান্তিলালবাবুর উপর যে মন্তব্য করেছেন তা দুর্ভাগ্যজনক।

এই কথাটা তো কেউ বোধ হয় ভুলে যান নি যদি আমরা কিছু দিন পিছনে ফিরে তাকাই—আমাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বক্তব্য। 'দেশে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং আনুসঙ্গিক যে সকল সমস্যা দেখা দিচ্ছে তাতে এখনকার ছেলেমেয়েদের এই বিষয়ে অবহিত করানোর জন্য স্কুলেই যৌনশিক্ষা দেয়া হবে। তবে সেটা জীবন বিজ্ঞান এই বিষয়ের নামেই শিক্ষা দেয়া হবে।' 'মোটামুটি মানে এই দাঁড়ায়, ঠিক সেই সময়েই চারিদিকে কত হই-চই। কাগজে পত্র-পুস্তিকায় কতো লেখালেখি—এই অমৃতেও বোধ হয় লেখা হয়েছিল। অথচ শ্রীসমর ঘোষ মহাশয় সেই সময় কোথায় ছিলেন, কেন প্রতিবাদ করেন নি, বুঝতে পারলাম না।

তাই দেখা যাচ্ছে, আলোচনার খাতিরে শ্রীঘোষ মহাশয় শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়কে যেভাবে আক্রমণ করেছেন, সেটা নিরাশাব্যঞ্জক করণ প্রথমে তিনি ভুল ধরেছেন, পরে আবার নিজেও একই কথা বলছেন এবং পুরো দোষটা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ঘাড়ে চাপিয়েছেন—এটা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রীসমর দোষ মহাশয়দের কথা ধার করেই আমি শেষ করছি, 'বিদ্যা বিনয় দান করে।'

অরুণাংশু পাল
কলকাতা

অমানুষ প্রসঙ্গে

অমৃতের ১৪ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ **বরাহনগর থেকে শ্রীমতী মিতালী ভট্টাচার্য** লিখেছেন কেন 'অমানুষ' ছবির আলোচনায় 'অঘোর দাবোগার' ভূমিকাভিনেতা অনিল চ্যাটার্জির নাম উল্লেখ করেন নি। শিল্পীর প্রতি চলচ্চিত্র পর্যালোচকের কোন বিদ্বেষ নেই। এটি একটি অসাবধানতার ঘটনা।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বাংলা ছবির যে সংকট চলছে তার থেকে বাংলা ছবিকে বাঁচাতে হলে আধুনিক সমালোচনা নয় বরং লেখার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দেওয়া দরকার। সুতরাং বিগত ছয় মাস ধরে 'অমৃত'র চলচ্চিত্র পর্যালোচক সব বাংলা ছবির মূল বক্তব্য এবং ছবির সঙ্গে জড়িত প্রায় প্রত্যেককেই তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। ওদের কাজের ভালো অংশের পাশে কেবল দুর্বলতার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বা আধুনিকভাবে প্রত্যেকটি দৃশ্য সামনে রেখে হিন্দী বা বিদেশী ছবির পর্যালোচনা করা সম্ভব। সংকটের দিনে বাংলা ছবিকে উৎসাহ দান করাই 'অমৃত'র একমাত্র উদ্দেশ্য। বিনীত

চিত্রদূত

অহীন্দ্র চৌধুরী প্রসঙ্গে

(লেখকের উত্তর)

বিগত ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪ তারিখের অমৃত পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক বিগত ১৫ নভেম্বর ও ১১ অকটোবর অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত আমার নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কিত রচনা প্রসঙ্গে যে পত্রাঘাত করেছেন তার উত্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সুধী পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। আমার রচনায় প্রকাশিত নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু দিবস 'রবিবার রাত ২-৩০টা, ৩রা নভেম্বর ১৯৭৪'—এই তথ্য অভ্রান্ত। ইংরেজী মতে রাত ১২টার পরবর্তী সময়ে গৃহীত হলেও বাংলা মতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময় পূর্ববর্তী তারিখেরই অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য 'রাত ২-৩০টা' বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৬ কার্তিক বাংলা তারিখটিও উল্লেখ করা উচিত ছিল।

'বাংলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র' পুস্তকের নামের 'বাংলা' কথাটির সঙ্গে 'র' কথাটি মুদ্রিত হওয়া কি তথ্যগত ভুল না মুদ্রণভ্রান্তি? তথ্যগত ভ্রান্তি আর মুদ্রণভ্রান্তির পার্থক্য অনুধাবন করার ক্ষমতা যারা অর্জন করেছেন—তারা কোন সময়ই বর্তমান পত্রলেখকের মত এমনি পত্রাঘাত করবেন না।

অমৃত পত্রিকায় 'নিজেকে হারায়ে খুঁজি' পুস্তকটির প্রকাশ তথ্যই আমি তুলে ধরেছিলাম। অন্য পত্রিকায় কবে কোন অংশ কখন প্রকাশিত হয়েছিল তা তুলে ধরতে চাইনি। এক্ষেত্রে যে ভুল হয়েছে পত্রলেখক সে ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হননি। অমৃত পত্রিকায় ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে রচনাটি প্রকাশিত হয়নি—হয়েছিল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে।

২। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতার নাম 'ঝাম্পালাল'-এর স্থানে মুদ্রণ-ভ্রান্তির জন্যই পান্নালাল প্রকাশিত হয়েছে। 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের স্থলে 'নবনাটক' মুদ্রণ আমার নিজের অসাবধানতাবশতঃও মুদ্রিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এবং 'সুলোচনা' চরিত্রের নাম যেখানে উল্লেখ আছে—নাট্য-সাহিত্য নিয়ে যাঁরা বিন্দুমাত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁরা যে এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হবেন না—তাঁদের সম্পর্কে এতটা খারাপ ধারণা আমার নেই।

১১ অকটোবরের বিহারীলাল লেখাটির তৃতীয় কলমে পরিষ্কার মুদ্রিত হয়েছে, 'শোভাবাজার রাজবাড়ীতে কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহ চরিত্রে চমৎকৃত করেন সকলকে—' এবং বিহারীলাল অভিনীত নাটক ও চরিত্রগুলির ক্ষেত্রেও 'মাধবাচার্য - মৃণালিনীর' পরিষ্কারভাবে মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার 'ভীমসিংহ - কৃষ্ণকুমারী'র স্থানে 'মৃণালিনী - কৃষ্ণকুমারী' মুদ্রিত হওয়া যে আমার অজ্ঞতাপ্রসূত নয়—মুদ্রণভ্রান্তি একথা পত্রলেখকের বক্তব্য আর আলোচ্য মুদ্রিত অংশ মিলিয়েই পাঠকসাধারণ অনুধাবন করতে পারবেন।

বিহারীলাল সম্পর্কে আমার ইতিপূর্বেকার গবেষণামূলক প্রবন্ধ যদি পত্রলেখক না পড়ে থাকেন, তবে আমার লেখা 'বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস' পুস্তকটির ২৯৩ পৃষ্ঠা পড়তে অনুরোধ করবো। সেখানে নির্ভুল এবং আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন। তাছাড়া বিহারীলালকে বিস্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে 'আমিই' সর্বপ্রথম নতুন করে উদ্ধার করি একথা বাংলাদেশের প্রত্যেক বিদগ্ধজনই জানেন। পত্রলেখক তাঁর অভিযোগে বিহারীলাল সম্পর্কে যে তথ্যগত ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন তার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিহারীলাল পিতামহের মৃত্যুর পর মাতুলালয়েই আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই এ সম্পর্কে

তরুণ কবি শ্রীইন্দ্রের

প্রথম কাব্য গ্রন্থ

কবির "শিল্পীর দৃষ্টি" কবিতা অবলম্বনে নিজ হাতে আঁকা প্রচ্ছদ

মুকুর মূল্য—চার টাকা

প্রাপ্তিস্থান : বৈকুণ্ঠ বুক হাউস
১৮৩, বিধান সরণী কলি-৬ ও অন্যত্র।

আমার পূর্বেকার মন্তব্য বজায় রেখেই বলছি ঃ বিহারীলালের পিতা ঝাম্পালাল চট্টোপাধ্যায় যখন মারা যান বিহারীলাল তখন মাতৃগর্ভে ছিলেন। পিতামহ হরলাল চট্টোপাধ্যায় বিহারীলালকে প্রতিপালন করেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তাঁর বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রস্তুত হবার সময় কেশবচন্দ্র সেনদের কলুটোলাস্থিত বাড়ীতে গিয়ে অনেকসময় পড়াশুনা করতেন। এই সময়ই পিতামহ হরলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। পিতামহের মৃত্যুর পর মাতুলালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় বিহারীলালকে। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ১৬ বছর বয়সে পড়শুনায় ইস্তফা দিয়ে 'গ্লাডস্টোন উইলী'র অফিসে চিঠিনবীশের কাজ গ্রহণ করতে হয়। বিহারীলাল সম্পর্কিত গিরিশচন্দ্র কিরণচন্দ্র দত্ত অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলীর তথ্যমূলক প্রবন্ধগুলি যদি পত্রলেখক পড়তেন তবে আমার উক্তির বিরুদ্ধে মন্তব্য করতেন না।

ঝাম্পালাল স্থলে পান্নালাল ভুলক্রমে মুদ্রিত হবার কথা এবং এমনি মুদ্রণ-ভ্রান্তির জন্য আমার বা অন্যান্য লেখকদের অসহায়তার কথা নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও তাঁর পত্রাঘাতের অন্তরালে যে হীনতা আমার কাছে প্রকটিত তাতেই বেদনাবোধ করছি।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

একটি আবেদন

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সম্বন্ধে আমি একখানা গবেষণামূলক গ্রন্থরচনায় হাত দিয়েছি। আচার্য সেনের মৃত্যুর পর বহু সাহিত্যপত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা বেরোয়। তারপর তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বের করে। এই সমস্ত উপাদান বাংলাদেশে সংগ্রহ করা কঠিন। এই পত্রিকার সাহিত্যরসিক - বিদগ্ধ পাঠকদের অনেকেই আচার্য সেন সম্বন্ধে উপাদানের খোঁজ রাখেন এ বিশ্বাস আমার আছে। সহৃদয় পাঠকদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি কারও কাছে কোন উপাদানের খোঁজ থাকে অথবা হাতের কাছে উপাদান থাকে তবে দয়া করে আমাকে নিম্নঠিকানায় জানালে অথবা পাঠিয়ে দিলে বাধিত ও উপকৃত হব।

হরলাল রায়
প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়
বাংলাদেশ

বেতার সংক্রান্ত প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। আপনার পত্রিকাটি বিপুলভাবে সর্বস্তরের মানুষের প্রতিই বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছে এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করছে তার ইঙ্গিত নিশ্চয়ই আপনারা পাচ্ছেন। ক্রীড়ামোদী, চলচ্চিত্রামোদী সাহিত্যমোদী প্রভৃতি নানা জনের মনের মত নানা বিষয়ক মনের খোরাক অদ্ভুতভাবে জুগিয়ে ধরছে। প্রতিটি মানুষের কাছেই 'অমৃত' অতুলনীয় এবং অদ্বিতীয়।

এ ধরনের এত সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা এযাবৎ প্রকাশ হয়নি। আরও বিশেষ করে বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত বঞ্চিত যুব সম্প্রদায়ের মোড় ফেরাবার এক নতুন রাস্তা এনে দিচ্ছে। কিন্তু একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং বিষয়টির ব্যাপারে চিন্তা করতে বিশেষ অনুরোধ করছি—সেটা হলো 'বেতার জগৎ বিষয়ক'। বেতার সংক্রান্ত অর্থাৎ শিল্পীদের সমালোচনা কিংবা তাদের নিজস্ব অভিমত যেমন (ছায়াছবিতে ওঁরা বলেন) এই ধরনের কোন রকম কিছু থাকলে খুব ভাল হয়। অমৃতের ব্যাপক প্রসার ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

অমৃত বিশ্বাস
হাওড়া

রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর বয়স

প্রবীরকুমার ঘোষের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০-১২-৭৪ সংখ্যায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত কাজী মুরশিদুল আরেফিনের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর বয়স' শীর্ষক চিঠিখানির উপর আমি কিছু বক্তব্য রাখছি।

তথ্য অনুযায়ী কাজী মুরশিদুল আরেফিন লিখেছেন, বিয়ের পরে কাদম্বরী দেবী মাত্র পনেরো বছর নয় মাসের মতো বেঁচেছিলেন। অথচ জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবী সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমাকে কত প্রভাতে কত দ্বিপ্রহরে কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে। কত বসন্তে কত বর্ষায় কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শতসহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে। যে আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধুলা, সতেরো বৎসরের সুখদুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না জানে না।.....' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ১৯৫ পৃষ্ঠায়) বিয়ের পরে যদি কাদম্বরী দেবী পনেরো বছর নয় মাসের মতো বেঁচে থাকেন (গত ২০-১২-৭৪ সংখ্যার পত্রলেখকের তথ্য অনুযায়ী লিখিত মতে) তাহলে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীর সাথে সতেরো বছর কেমন করে মেলামেশা করেছিলেন? আরও তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তারিতভাবে জানার ইচ্ছা রইল। বিশেষতঃ মৈত্রেয়ী দেবী যদি এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করেন তাহলে ভাল হয়। কারণ তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেক কথা তাঁকে বলতেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অনেক কিছু তাঁর বেশ ভালভাবে জানা আছে।

কার্তিক দত্ত
সম্পাদক ঃ 'শিশালাক্ষী'
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞানের কথা

২২ নভেম্বরের অমৃতে বিজ্ঞানের কথা প্রসঙ্গে 'মহাশূন্যে ঘরবাড়ী' বিষয়ক নিবন্ধে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তাতে বেশ কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। লেখক দয়া করে আলোকপাত করুন।

লেখক বলছেন, 'চন্দ্রের কক্ষে এমন দুটি স্থান আছে যেখানে পৃথিবী ও চন্দ্রের মিলিত মাধ্যাকর্ষণ স্থিরতা বজায় রাখে। অর্থাৎ কতকগুলো উপকরণ যদি এই নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হলে (?) তারা এই স্থিরতার দরুণ আঁটোসাঁটো হয়েই থাকে—কখনো আলগা হয়ে খসে পড়ে না। এই দুটি নির্দিষ্ট স্থানের অবস্থান চন্দ্রের ১২০ ডিগ্রী আগে ও পিছে।'

চন্দ্রের কক্ষের উপরে কোন উপকরণ স্থাপিত হলে মাসিক পরিক্রমাকালে চন্দ্র তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধাবে। তাহলে সে আঁটোসাঁটো হয়ে থাকবে কি করে?

চন্দ্রের ১২০ ডিগ্রী আগে ও পিছে কথাটি অর্থহীন। কারণ চন্দ্র আকাশে সঞ্চরমান জ্যোতিষ্ক। আবার কোন নির্ণয়ের জন্য কোনও স্থির রেখার সাপেক্ষে নির্দেশ থাকা দরকার। কোন বিন্দুর থেকে ১২০ ডিগ্রী আগে ও পিছে বললে কিছুই বোঝা যায় না।

জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বহরমপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

কবিতা

আজ ভোরে ॥ মৃগাঙ্ক রায়

কে তুমি এনেছ
ভোর
সোনার থালায়,
সুগন্ধে ভরেছ চারিদিক; আকাশের
গাঢ় নীল ফুলদানী
সাজিয়েছ
সদ্য ফোটা শাদা মেঘে।
কে তুমি
সিঁথিতে পরেছ সিঁদুর
আজ ভোরে।

তুমি কি জান না
আমি মূঢ় যুধিষ্ঠির
পাশায় হেরেছি সব—
ধনরত্ন রাজ্যপাট—
এবং নিজেকে। শুধু বাকি
বিদ্যুল্লতা দ্রৌপদী।
আর কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্র শেষ হলে
আবার সাজিয়ে এনো
ভোর
সোনার থালায়।

সোনার শেকড় তুললে হাতে ॥ রণজিৎ দেব

হাঁটতে গেলে সমুখ পথে-পথের বাঁধায় বিষম দুঃখ
নিঙড়ানো প্রেম রঙিন আঁচল বাইরে উড়ে ভেতর রুক্ষ
সোনার শেকড় তুলতুলে গা অশ্রুপাতে ঝর্ণা নামে
ভুলের প্রাচীর ক্রমেই গড়ে শান্তি কোথায় নিত্য ধামে।

যতই বলি রাজার কুমার রাজা আমার হাতের মুঠে
বাণী সেজে যে ঘুরছে পাশে তারই জন্যে বাবগ জুটে
মানুষ যখন আত্মমগন হৃদয় পলাশ ফোটে কি তখন
কিংবা যখন গুভীর কীট খুঁড়ছে বসে হৃদয়-কথন —
রাঙাধুলো উড়ে কি তখন এ মর জগৎ বিশ্ব-ধামে?

ঘর ছেড়ে আজ পরের ঘরে বসত বাড়ি নিজেই গড়ি
বাল্যকালের স্মৃতি-ছোঁয়ায় দারুণ ক্ষয়ে ধ্বংস করি
মৌন মিছিল চলছে হেঁটে পথের বাধায় চোখের জল
ভেতর কাঁপে ভূমিকম্পে বাইরে দানব সদল বল।

সোনার শেকড় তুললে হাতে অশ্রুপাতে ঝর্ণা নামে
ভুলের প্রাচীর ক্রমেই গড়ে শান্তি কোথায় নিত্যধামে?

যেদিকে, দুচোখ যায় ॥ দেবী রায়

ভেবেছি এতো যে ভালোবাসা
এতো যে মাংসল-যৌবন
চব্বিশ ঘন্টা পথে পথে ঘোরে;
দু পায়ে, মাড়িয়ে পথ, ভ্রূক্ষেপহীন
অনাবশ্যক হয়তো বা—
দরদস্তুর করে, হকার্স-কর্নারে।

নিঃস্ব চোখে চেয়ে আছি
তার চোখে যেন মৌমাছি
ইনি কি ভালোবাসেন ওঁকে
উনি কি ভালোবাসেন এঁকে...

শুধু কি আমার পড়ে-মরতে
জায়গা নেই, কোথাও?
বুকে আক্ষেপ বয়ে নিয়ে যেতে চাই
যেদিকে দু চোখ যায়
ইঙ্গিতে ইশারায়, সে জানায়;
'আমি-ই ভবিষ্যৎ', 'যেদিকেই যাও!'

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত রোজ সকালে এক চক্কর বেড়িয়ে আসতে না পারলে হাঁফিয়ে ওঠেন। লাঠি ঠুকঠুক করে সেই পরিচিত বিলের ধারে এসে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একটু ঘাসের গন্ধ জলের গন্ধ শামুক পানার গন্ধ পাবার লোভে ছটফট করেন বঙ্কিমবাবু। কিন্তু ছেলে অমিয় কি বৌমা কি তার ছেলেমেয়েরা ঠিক উল্টো। তারা শহরের উদ্দামতা অস্থিরতা পছন্দ করে।

অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তার কথার প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং। অমিয় তার স্ত্রী নীহার সবাবাই যেন কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। সংসারের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন যেন তিনি। তবু একসময় নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে অমিয় বা তার স্ত্রী নীহার নয়, তাদের বংশধরদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান বঙ্কিম দত্ত।

নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জজিয়তি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

(এগারো)

বেলার মনে বেলা বাড়ছে।

এই সময় চায়ের দোকানটা বন্ধ হয়ে যায়।

বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। ভাঁড়ে করে চা খাওয়া। দোকানের সামনে একটা রাধাচূড়া ফুলের গাছ। গাছতলায় কেরোসিন কাঠের দুটো প্যাকিং বাকস পাশাপাশি বিছান। বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়েই চা খায় বেশির ভাগ মানুষ। তবে যারা বসে খেতে চায়, তাদের জন্য কাঠের বাকস দুটো। দোকানের ভিতরে বসে চা খাবার ব্যবস্থা নেই। জায়গাও নেই। এইটুকুন একটা খুপরী।

যাক গে, দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে জায়গাটা আরও বেশি ফাঁকা হয়ে গেল। কেমন নিরিবিলি মনে হচ্ছিল।

না, রঞ্জু চা খাচ্ছিল না।

খাচ্ছে তার বাবার বন্ধু। যাঁর নাম রুদ্রেন্দু। আশ্বিনের দুপুরের মুখে এক একদিন এমন শুকনো খটখটে হাওয়া ছাড়ে। ধুলো ওড়ে এলোপাতাড়ি। গাছের পাতা ঝরে ঝুরঝুরে। হলুদ হয়ে আসা বা প্রায় শুকিয়ে যাওয়া মুড়মুড়ে রাধাচূড়ার পাতা রঞ্জুর কোলে মাথায় এবং রুদ্রেন্দুর কোলে মাথায় অফুরান ঝরে ঝরে পড়ছিল।

উঁহু, নিজের মাথায় বা গায়ে পাতা ঝরে পড়ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু বাবার বন্ধুর। যেন ওতে কিছু যায় আসে না। পড়ে পড়ুক। গাছের পাতা তো। তেমন কিছু খারাপ জিনিস না।

তাঁর নজর ছিল কেবল রঞ্জুর মাথার দিকে, কোলের দিকে পিঠের দিকে।

যতবার পাতা ঝরে পড়ছে ততবার রঞ্জুর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে রুদ্রেন্দু সব ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে তার কোলে পিঠেও একটা পাতা পড়ে থাকতে দিচ্ছিল না। চোখ আড় করে করে রঞ্জু দেখছিল। রুদ্রেন্দুর ডান দিকে বসেছে সে। বাঁ-হাতে ধরা মাটির ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে রুদ্রেন্দু একটু একটু করে চা খায়, তার সঙ্গে কথা বলে আর বেই না একটা দুটো কি এক সঙ্গে একমুঠো শুকনো পাতা রঞ্জুর গায়ে পড়ে অমনি ডান হাত বাড়িয়ে মেটে রংয়ের শুকনো হাড় বের হওয়া দুটো আঙুল সাঁড়াশীর মতন একত্র করে বেঁকিয়ে পাতাগুলি তুলে ফেলে দেয়।

দৃশ্যটা কেমন অদ্ভুত ঠেকে রঞ্জুর কাছে।

আনুষটাই তো অদ্ভুত। ভাবছিল সে।

ওপর থেকে, বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায়? একটুও না।

যতবার রঞ্জুর গায়ে কি মাথায় ওই মেটে রংয়ের হাড়সার শুকনো আঙুল দুটো ঠেকছিল, রঞ্জু শিউরে উঠছিল। সে টের পাচ্ছিল তার শিরদাঁড়া বেয়ে ইলেকট্রিক শক-এর মতন কিছু একটা যেন নেমে যাচ্ছে।

তবে জিনিসটা যে আস্তে আস্তে কমে আসছে তা-ও সে টের পাচ্ছিল।

এইতো এইমাত্র রুদ্রেন্দুর হাতটা তার হাঁটুর ওপর দু মিনিটের বেশি সময় বিছান ছিল। শিরদাঁড়া শিরশির করা ভাবটা আর হয়নি তখন রঞ্জুর এবং আগের মতন সে শিউরেও উঠল না।

চা খাওয়া শেষ হতে রুদ্রেন্দু মাটির ভাঁড়টা একদিকে ছুঁড়ে দিতে ফুটপাথের সিমেন্টে বাড়ি খেয়ে ফটাস্ শব্দ করে সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

—হি-হি বুড়ো বয়সে একটা বোমা ফাটালাম। বাবার বন্ধু ঘাড়টা অল্প কাত করে তার দিকে চেয়ে হাসে। মানে একটু রসিকতা করে। টের পেয়ে রঞ্জুও অল্প করে হাসে।

এত ভাল লাগছিল তার মানুষটাকে।

এই যে বেলার মনে বেলা বাড়ছে রঞ্জুর প্রায় খেয়ালই নেই। রুদ্রেন্দুর পাশে বসে সারাদিন গল্প শুনলেও যেন তার আশ মিটবে না।

এইজন্যই সে বেশি অবাক হচ্ছিল। অদ্ভুত লাগছিল বাবার ছেলেবেলার বন্ধুটিকে।

রঞ্জু ভাবল পৃথিবীতে তা হলে এখনও এমন একজন দুজন মানুষ আছে যাঁদের কাছে সারাদিন বসে থাকতে ভাল লাগে, আর কান পেতে তাঁদের গল্প কেবল শুনে যেতেই ইচ্ছে করে।

—এখন বাড়ি যাবে? রুদ্রেন্দু হঠাৎ প্রশ্ন করল।

—নাঃ। রঞ্জু মাথা নাড়ল।

—কিন্তু তোমার যে চুল কাটা হল না।

—থাক গে, কাল কাটব। রঞ্জু ঘাড় বেঁকায়।

কি ভেবে রুদ্রেন্দু হঠাৎ চুপ করে থাকে। তারপর পকেট থেকে বিড়ি বার করে। কিন্তু সেটা মুখে গুঁজতে গিয়ে থমকে যায়। দু আঙুলের ফাঁকে বিড়িটা ধরে রেখে এদিক ওদিক থাকায়। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম রঞ্জু তাঁকে পকেট থেকে বিড়ি বার করতে দেখল। কিন্তু বিড়িটা ধরাতে পারছে না। সঙ্গে নিশ্চয় দেশলাই নেই। চারদিকে তাকিয়ে আগুন খুঁজছে অনুমান করতে রঞ্জুর এক সেকেণ্ড দেরি হয় না। কাঠের বাকসটা ছেড়ে চট করে সে উঠে দাঁড়ায়।

—কি হল, উঠলে?

—না। রঞ্জু মাথা নাড়ে। বাড়ি যাচ্ছেন।

—চুল কাটতে?

—উঁহু।

—তবে কোথায় চললে?

—দেশলাই এনে দিচ্ছি আপনাকে।

—আরে কী পাগল, দেশলাই পাবে কোথায়, বোসো বোসো।

—ঐ তো ওদিকে একটা দোকান আছে। রঞ্জু আঙুল দিয়ে দেখায়। তারপর হাঁটতে থাকে।

—আরে শোন শোন! দেশলাই আনবে পয়সা নিয়ে যাও। রুদ্রেন্দু পিছন থেকে ডাকে।

—আমার কাছে আছে পয়সা। রঞ্জু ঘাড় ফেরায় না। ছুটতে থাকে।

অবাক লাগছিল মানুষটাকে আরও একটা কারণে। ছেলেবেলায় এই মানুষের সঙ্গে তার বাবা খেলাধুলো করত, সেই দেশের বাড়িতে। মফঃস্বলের একটা শহরের স্কুলে দুজন এক সঙ্গে পড়ত। ভেবে মনে মনে যেমন সে উত্তেজিত হচ্ছিল, গর্ববোধ করছিল তেমনি হুহু ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টার মতন আর একটা কথা মনে পড়ে রঞ্জুর সব উত্তেজনা উৎসাহ আর সেই সঙ্গে গর্বের ভাবটা নিভে গিয়ে একেবারে জল হয়ে যাচ্ছিল।

এর মূলে রয়েছে বুড়োটা। তার দাদু। এককালে জজ ছিল। তাই নিয়ে এখনও অহংকারের শেষ নেই।

কিন্তু ভীষণ ছোটলোক বুড়ো। নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল সে। হ্যাঁ ছোটলোক। তার বাবার বাবা যদিও। কিন্তু তা হলেও জোর গলায় সে বলতে পারে অত্যন্ত বাজে চরিত্রের মানুষ। এই বঙ্কিম দত্ত। এতকাল সে বুঝতে পারেনি। আজ বুঝল। আজ চেনা হয়ে গেল। বাজে, একেবারে বাজে লোক এই দাদুটা, মনটা ছোট দৃষ্টিটা একটেরে। তার মানে কি—আত্মসুখী। সেলফিস টু দি বোন। কেবল নিজের স্বার্থ নিজের সুখ, নিজের পরিবার ছেলেমেয়ে ব্যস, এ ছাড়া জগতের আর কিছু চিন্তা করতে বুড়োর বয়ে গেছে।

এরাই তো দেশের শত্রু। আসল শত্রু। এনিমি অব দা নেশন বলতে এদেরই বলা হয় না?

মাথাটা ঝিমঝিম করছিল রঞ্জুর।

সিগারেটটা পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেবার সুযোগ পেল সে এখন। এবার মনটা হালকা লাগল। পেভমেণ্ট ছেড়ে সে রাস্তায় নামল। এলোমেলো হাওয়ায় মাথার লম্বা চুলগুলি উড়ছে। তার সার্টের কলারটাও কাঁপছিল। এই মানুষটা সাধারণ নয়, দেখতেই এমন, কালো বাগা না-খাওয়া চেহারা আর তেমনি জামা-কাপড়ের দশা। কিন্তু এসব তাঁর আসল পরিচয় নয়। রঞ্জু মনে মনে বলল।

সেদিন তাদের বাড়িতে যখন গিয়েছিল একফোঁটা চিনতে পারেনি সে তাঁকে আশ্চর্য! যে জন্য এখন নিজেকে বোকা বোকা মনে হতে লাগল তার। বাবার ছেলেবেলাকার বন্ধু—ব্যস্ এই পর্যন্ত। এর বেশি কিছু চিন্তাই করেনি সে। কেন করেনি? নিজের ওপর রাগ পেতে লাগল তার কম না।

এমন কি ট্রাইয়্যাংগুলার পার্কের বেঞ্চে বসে যখন তিনি ভুট্টা খাচ্ছিলেন তখনও সে শুধু এই ধরে নিয়েছিল। বাবার এককালের বন্ধু। আলতো ফালতো এমন কত বন্ধুই তো থাকে লোকের।

কিন্তু একটু পরে বস্তির ছেলেটা দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগতে তিনি যখন তাকে কোলে তুলে নেন তখন তাঁকে আর তেমন একটা আলতো কালতো মানুষ বলে ভাবতে পারেনি রঞ্জু।

গরীব হতে পারেন, হয়তো চাকরি বাকরি নেই, বুঝি বেকার হয়ে পড়েছেন—কিন্তু তাঁর মনটা ভাল হার্টটা নরম, রঞ্জু চিন্তা করল।

তখন থেকেই একটু একটু করে মানুষটাকে তার ভাল লাগছিল।

ডাক্তারখ[illegible] ছিল না। তারা ভিতরে ঢুকতে [illegible] ছিল ছোপে একজন কম্পাউণ্ডার ছেলেটার মাথার একটুখানি জায়গা ছড়ে গেছে দেখে তক্ষনি তুলোয় করে ডেটল নিয়ে কাটা জায়গাটায় লাগিয়ে দেয় ও সেখানটায় এক টুকরা এড্‌হেসিভ এঁটে দেয়। তারপর ছেলেটার পিঠে আস্তে করে একটা থাপড় দিয়ে বলে যা বাড়ি পালা, কিচ্ছু হয়নি, আর দুষ্টুমি করবিনে। যেন মনে হল কম্পাউণ্ডার ছেলেটাকে চেনে। অসম্ভব কিছু না রঞ্জু ভাবল। ধারেকাছের বস্তিতে থাকে ছোঁড়া। আর ডাক্তারখানাও যখন এপাড়ারই।

পপুলার ফার্মেসী থেকে বেরিয়ে তারা রাস্তায় নামল।

ছেলেটা এতক্ষণ তাঁর কোলে চড়ে ছিল। এবার তিনি কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। —যা, বাড়ি যা। কম্পাউণ্ডারের মতন তিনিও অল্প একটু হেসে তার পিঠে আস্তে একটা চাপড় দেন। আর দুষ্টুমি করবিনে, ঐ করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলি, আজ একটুখানি কেটেছে, আর একদিন এমন বাঁদরামো করতে গেলে হয়তো মাথা ফেটে গিয়ে খুনটুন হয়ে যাবি। কি বল হে রঞ্জু! ঘাড় কাত করে রঞ্জু অল্প অল্প হাসছিল। ততক্ষণে তিনি রঞ্জুর নাম জেনে গেছেন এবং সে কোন্ ক্লাসে পড়ে তা-ও জিজ্ঞেস করেছেন।

যাই হোক কোল থেকে নেমে ছেলেটা কিন্তু নড়ছিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

—কি হল, বাড়ি যা। রাস্তা চিনে যেতে পারবি? আবার তিনি তার পিঠে হাত রাখলেন।

ছেলেটা ঘাড় কাত করল। বোঝা গেল বাড়ির রাস্তা চেনে। কিন্তু নড়বার নাম ছিল না। একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড় গুঁজে হাতের নখ খুঁটছে।

—এই ছোঁড়া! এবার রঞ্জু রেগে যায়। —এতক্ষণ ভুগিয়েছিস, মাথায় ওষুধটুষুধ লাগান হল, এখন আবার দাঁড়িয়ে আছিস কেন!

যেন রঞ্জুর ধমক খেয়ে একটু ভয় পেল ছোঁড়া, ঘাড় তুলে ড্যাবড্যাব করে তাকাল। আর তাকাল তো তাকিয়েই থাকল। বোবা। যেন কথা বলতে পারে না।

—কি হয়েছে বলবি তো, রঞ্জু আরও জোরে ধমক লাগায়।

ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাঁ করে ছেলের কান্না।

এবার তিনিও বিরক্ত হন। বাবার বন্ধুর মুখ দেখে রঞ্জু বুঝল।

—এই আমার দিকে তাকাও। কি হয়েছে তোমার? বাড়ি যাবে না! বিরক্ত হলেও গলার স্বরটা তাঁর কিন্তু কঠিন ছিল না শক্ত ছিল না। বরং যেন আদুরে আদুরে শোনাচ্ছিল। যে জন্য ভিতরে ভিতরে রঞ্জু আরও একটু চটে যায়।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

—ছেড়ে দিন তো। দাঁড়িয়ে থাকে থাকুক। চলুন আমরা এগোই। রঞ্জু প্রায় ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু তিনি নড়তে পারছিলেন না। ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন। রঞ্জু দেখল, এবার তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে ছেলেটার মুখের কাছে কানটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। কান্নার অস্পষ্ট হিজিবিজি গলায় ছেলেটা কিছু যেন বলল।

—কি হয়েছে কি বলছে! রঞ্জুর খানিকটা কৌতূহল হল।

—বলছে খিদে পেয়েছে। ঘাড় সোজা করে বাবার বন্ধু রঞ্জুর দিকে তাকাল।

—খিদে পেয়েছে বাড়ি গিয়ে খাক, আমরা কি করব। চলে আসুন আপনি। রঞ্জু ডাকল।

—এই, বাড়ি যা। বলে তিনি চলে আসছিলেন। ছেলেটা আবার কাঁদতে থাকে। তিনি আবার দাঁড়িয়ে পড়েন। কি চাইছিস পরিষ্কার করে বল না। এবার তিনি রুখে ওঠেন।

—দশটা নয়া দিন মুড়ি কিনে খাব।

কথাটা রঞ্জুও শুনল। ঘুরে গিয়ে ছেলেটাকে ভীষণ বড় করে একটা ধমক লাগায় সে। এক চাঁটি মারব মাথায়। পয়সা। এখনি ভিক্ষে করতে শিখে গেছে। যা ভাগ পয়সা নেই।

—আমার মনে হয় খিদে পেয়েছে ঠিকই। রঞ্জুর চোখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে রুদ্রেন্দু বললেন, না হলে কি এভাবে কাঁদে।

—কেন, বাড়ি চলে গেলেই পারে। রঞ্জু উত্তর করল।

—হয়তো বাড়ি গিয়ে দেখবে রান্না চাপেনি, রেশন আসেনি, বাজার-সওদা কিছু করা হয়নি। মিটমিট করে তিনি হাসছিলেন, অথচ এমন সুরে কথাটা বলছিলেন, রঞ্জু স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন আর কিছু প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না তার।

এবার আর রঞ্জুর দিকে কিন্তু তিনি তাকান না। ছেলেটার দিকে সম্পূর্ণ মুখ করে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে পয়সা বার করে গুণতে আরম্ভ করলেন। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা নাড়েন। যেন হিসেব করার পর অনেকটা নিজের মনে বলেন, উঁহু হবে না। দশ নয়া দিয়ে দিলে আমাকে ট্রেনে বাড়ি ফিরতে হবে। বাসের পয়সায় কুলোবে না। ট্রেনে গেলে আমাকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নামতে হবে। তা মানে তারপর পাক্কা সওয়া তিন মাইলের হাঁটা রাস্তা।

ছেলেটা ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়েছিল। বাঁ-হাতের খুচরো পয়সাগুলি ডান হাতের তেলোয় নিয়ে আবার তিনি হিসেব করতে আরম্ভ করেন।

—উঁহু, যা ভেবেছি দশ নয়া হয় না। আচ্ছা ঠিক আছে, পাঁচটা নয়া তুই নে। ঘাড় তুলে তিনি ছেলেটার মুখের দিকে তাকান। তারপর কি ভেবে থমকে যান। মাথাটা আস্তে নাড়েন।

—উঁহু, পাঁচ নয়া দিয়েই বা তুই কি করবি—দোকানে পাঁচ নয়া পয়সার মুড়ি দেয় না আমি জানি। যেমন আগুন-লাগা দাম হয়েছে না চিঁড়েমুড়ির!

—আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। এতটা সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রঞ্জু শুনছিল। পকেট থেকে চট করে একটা দশ নয়া তুলে ছেলেটার হাতে দিল সে। যা পালা মুড়ি কিনে খা-গে।

আর দাঁড়ায় না ছেলেটা। হাতে পয়সা পেয়ে পা-পা করে হাঁটে। যেন একটা মুড়ির দোকানের দিকেই এগোতে থাকে।

বাবার বন্ধু খুশি হয়। ঘাড় নামিয়ে রঞ্জুকে দেখে। —এসো, এইবেলা আমরা এগোই।

তখনও কি রঞ্জু চুল কাটার কথা ভাবছিল।—কোন্ দিকে যাবেন আপনি? হুট করে সে প্রশ্ন করল।

—একটু চা খাবার ইচ্ছে হচ্ছে। ধারে-কাছে দোকান আছে?

—আছে বৈকি। ঐ গলির মুখেই একটা দোকান। রঞ্জু আঙুল দিয়ে দেখায়।

তিনি সেদিকে একবার তাকান। তারপর মাথা ঝাঁকান।—নাঃ থাক। পয়সা শর্ট আছে। ভুলে গেছলাম। একটা ক্লান্ত হাসি নিয়ে তিনি আবার রঞ্জুকে দেখেন।

—তাতে কি! আমি পয়সা দেব। চলুন।

—না দরকার নেই। লজ্জায় পড়লেন তিনি। তুমি চুল কাটার পয়সা এনেছ।

—আজ আমি চুল কাটছিনে। কাল কাটব। আসুন। ঐ তো কাছেই দোকান।

আর আপত্তি করেন না। রঞ্জুর সঙ্গে তিনি হাঁটেন।

—আমি কিন্তু ঐ ছোঁড়াকে পয়সা দিতাম না। রঞ্জু এবার না বলে পারল না।

—কেন দিতে না। ওর যে খিদে পেয়েছিল।

—তা পাক। রঞ্জু মাথা ঝাঁকাল। অর্থাৎ তখনও সে তার স্বার্থপর আত্মসুখী দাদু বঙ্কিম দত্তর মতই কথা বলছিল। তখনও সে জানত না কার সঙ্গে সে হাঁটছে, কাকে কি বোঝাচ্ছে। বঙ্কিম দত্তর শেখান বুলি গড়গড় করে আউড়ে গেল সে। ভিক্ষে দিলে এরা আস্কারা পেয়ে যায়। যত বেশি ভিক্ষে দেওয়া হবে, তত দেশে ভিখিরির সংখ্যা বাড়বে। ভিক্ষে পেলে ওরা কোনো কাজ-কর্ম করতে চায় না পরিশ্রম করতে চায় না। স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। এভাবে ভিক্ষে দিয়ে দিয়ে গোটা দেশটাকে আমরা পঙ্গু বানিয়ে তুলছি।

—ইস, এই বয়সেই তুমি যে অনেক কিছু জেনে ফেলেছ হে। হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। মিটিমিটি হাসেন এবং এমন চোখ করে তার দিকে তাকান, রঞ্জু চমকে ওঠে। তার হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে ওঠে। না তখনও সে বুঝতে পারেনি ওই চোখ দুটোর মধ্যে কী। তবে একটা কিছু যে ছিল ক্রমেই সে সেটা বেশি করে টের পাচ্ছিল। চুপ করে থাকল সে।

—হুঁ, হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলেন, তোমার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিছুটা সত্য আছে। তবে কিনা একেবারে বাচ্চা তো, বছর তিন-চার বয়স ওর—ওই ছেলে আর কি কাজ করবে বলো। খিদে পেয়েছে। শুনে বুকটা কেমন করে উঠল।

বুকটা কেমন করে উঠল। শুনল রঞ্জু। সেজন্য ঘাড়টা একটু হেলিয়ে রুদ্রেন্দুর মুখটা আর একবার সে দেখল। তবে তার কথাও একেবারে মিথ্যে নয়, তিনি স্বীকার করছেন। ফলে রঞ্জু একটু উৎসাহবোধ করল।

—হ্যাঁ ওটা বাচ্চা ছেলে, কাজ করার বয়েস হয়নি আমি স্বীকার করি। কিন্তু আপনি দেখুন, রাস্তায় বেরোলেই কেবল ভিকিরি চোখে পড়ে। ভিকিরিতে ভিখিরিতে কলকাতা শহরটা কিলবিল করছে।

—হা-হা, এবার গলা ছেড়ে তিনি হাসলেন। বলেছ ভাল। মাছির মতন উঁহু, বেঙাচির মতন, উঁহু, উপমাটা ঠিক হল না হে বরং বলা যাক গুয়ের পোকার মতন কলকাতার পথেঘাটে ভিকিরি কিলবিল করছে। করবেই। গাঁয়ে কি আর ভিক্ষে জোটে। এখানে রাতদিন দামী দামী গাড়ি ছুটছে, চোখ মেলে তাকালেই বড় বড়

বাড়ি, কত খাবার দোকান হোটেল-রেস্তোরাঁ বায়োস্কোপ থিয়েটার আমোদ ফুর্তি—এখানে এখনও কিছু কিছু মানুষ অঢেল সুখে আছে জেনে দলে দলে ভিকিরিরা এসে জুটছে। তার ওপর শহুরে ভিকিরিরা তো আছেই—ঐ দুয়ে মিলিয়ে এই কিলবিলে চেহারা।

—দিন দিনই দেখছি ভিক্ষুক আর হা-ভাতের গুণ্টি বাড়ছে। মিনমিনে গলায় রঞ্জু বলল, কারণটা বুঝতে পাচ্ছি না। বাবার বন্ধুকে শুনিয়ে কতকটা নিজের মনে সে বলল। অর্থাৎ রুদ্রেন্দুর মতামতটা জানতে তার ভারি ইচ্ছে হল। ভিক্ষে দিলে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ার ব্যাপারটা তিনি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেন কিনা।

—হুঁ কারণ আছে বৈকি। রুদ্রেন্দু এবার আরও বড় করে হাসলেন। অবশ্য আকাশের দিকে মুখ করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর রুগ্ন হাতের মুঠো দুটো কেমন যেন ঐ সময় শক্ত হয়ে উঠতে দেখল রঞ্জু। এবং আকাশের দিক থেকে মুখটা নামিয়ে তিনি যখন রঞ্জুর দিকে তাকান, রঞ্জু ঐ চোখের মধ্যে এক সেকেন্ডের জন্য একটা বিদ্যুৎ-ঝলক খেলা করে উঠতে দেখল। আগুনটা নিভে যেতেই আবার টেনে টেনে হাসছিলেন যদিও তিনি। হুঁ, এত ভিক্ষুক কেন চারদিকে—খুব ভাল প্রশ্ন করেছ রঞ্জুবাবু—তা ভিক্ষুক তো বাড়বেই আমরা যে স্বাধীন হয়েছি, সাতাশ বছরের স্বাধীনতা, ইয়ারকি! কাজেই আমরা সাবালক হয়েছি, আমাদের কর্মক্ষমতাও আগের তুলনায় ঢের বেড়ে গেছে, আমরা ক'বছরে কত কাজ করে ফেলেছি তার একটা রেকর্ড রাখার দরকার তো—রেকর্ড হল এবা। ভিক্ষুক আর হাভাতে—ঐ যে বললাম, ফুটপাথের ধারে ধারে লোকের দরজায় দরজায় এবং সেসব জায়গায়ও যখন কিছু না জুটছে, তখন ডাস্টবিনের আশেপাশে গুয়ের পোকার মতন এসে কিলবিল করছে।

রঞ্জু স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখটা শুকিয়ে গেল। তিনি কি ঠাট্টা করছেন। কেমন খটকা লাগল মনে

হুঁ তখন তার মনে হয়েছিল ঠাট্টা। কিন্তু তারপর চায়ের দোকানের সামনে রাধাচূড়া গাছের নিচে কেরোসিন কাঠের বাকসটার ওপর বসে চা খেতে খেতে রুদ্রেন্দু অনেক কথা বললেন। রঞ্জু কান পেতে শুনল। চোখের পলক পড়ছিল না তার।

একটা মাছি বার বার নাকের কাছে উড়ে এসে জ্বালাতন করছিল। সেটাকে পর্যন্ত হাত দিয়ে তাড়াবার সময় ছিল না তার। এত মগ্ন হয়ে সে শুনছে।

ভিক্ষুকের প্রসঙ্গটা আর একবার ঘুরে এসেছিল। তখন রুদ্রেন্দুর চা খাওয়া প্রায় শেষ। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে লোকটা দুপুরের ভাত খেতে বাড়ি চলে গেছে। মাথার ওপর গাছের ডালে দুটো শালিক অনেকক্ষণ ধরে কিচকিচ করছিল। ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করে পিছনে বড় রাস্তায় একটা ট্রাম চলে যাবার পর ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর ছাড়া আর কিছু ছিল না চারদিকে।

সেই নিরিবিলি শূন্যতার মুহূর্তে রঞ্জুর চোখের দিকে চোখ রেখে ঠাট্টার গলায় আর একবার হা-হা করে তিনি হাসছিলেন।

—হুঁ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার জন্য বিনয় বাদল দীনেশ রক্ত দিয়েছিল, মাস্টারদা রক্ত দিয়েছিল, ক্ষুদিরাম কানাইলাল রক্ত দিয়েছিল। আজি যদি তারা ফিরে আসে আমাদের স্বাধীনতার চেহারাটা দেখতে চায়, আর কিছু না পারি ভিকিরি বেকার দিনের পর দিন উপোস থাকে, গাছতলায় রাত কাটায় এমন লাখ লাখ হতভাগ্য মানুষকে আমরা স্বচ্ছন্দে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারব। তারা খুশি হবে—কি বলো?

রঞ্জুর মুখে শব্দ ছিল না। রুদ্ধশ্বাস হয়ে কথাগুলি শুনছে।

(ক্রমশঃ)

বিবাহে রুচিশীল ও আকর্ষণীয় উপহার

বাঙালী জীবনে বিবাহ

শঙ্কর সেনগুপ্ত

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, ব্রহ্ম এবং সাঁওতাল, মুণ্ডা ওঁরাও, খেড়িয়া, লোধা, বাউরী, মহালী লেপচা, রাজবংশী, রাভা, কোচ টোটো ও কুর্মী মাহাতদের বিবাহের ইতিবৃত্ত। বাঙালীর জাতি শ্রেণী ও বর্ণপরিচয়, পঞ্জিকার শাসন, লগ্ননির্ণয়, ঘোটকবিচার, শয্যা-আচরণ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন, প্রজাপতি সংস্থা, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহের আইন এবং বিবাহের প্রথা ও পদ্ধতির বিবর্তনাদি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে সমাজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এই নতুন গ্রন্থটি প্রত্যেকটি শিক্ষিত বাঙালীর নিত্যসঙ্গী হবার যোগ্য। বিবাহিত-অবিবাহিত নারী এবং পুরুষের জানা নাজানা নানান তথ্য ও বিবরণ পাঠ করতে করতে যে আনন্দ পাবেন তা থেকেই আপনি আবার নতুন করে জানবেন বাঙালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৃত্তান্ত, জানবেন সুখী গৃহকোণ গড়ার কাহিনী। বিবাহের উপহারে এ গ্রন্থের নির্বাচন মানে প্রিয়জনের কাছে আপনার রুচি ও সংস্কৃতির নতুন প্রমাণ। যে সব যুবক-যুবতী বিবাহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁদের কাছে এ গ্রন্থ নতুন আলোর সন্ধান দিবে। যাঁদের হতে-হতেও বিবাহ হচ্ছে না তাঁরাও এ গ্রন্থ পাঠে জানতে পারবেন এমন অনেক তথ্য যা তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। চমৎকার প্রচ্ছদ। মূল্য ৩০৲

অন্যান্য বই

ডঃ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্তের	গীতগোবিন্দ ও জয়দেবগোষ্ঠী ১৫৲
শঙ্কর সেনগুপ্তের	বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি ২৫৲
ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়ের	লৌহ ও ইস্পাত ৯৲
দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের	উত্তররাঢ়ের লোকসঙ্গীত ৭৲
ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহার	ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান ৯৲
অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তীর	লোকায়ত বাংলা ৯৲

অন্যান্য বাংলা ও ইংরেজী বইর জন্য লিখুন

ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট কলিকাতা-১ ২৩-৬৩৩৪

রূপসীর খাতা

আবার সেই পুরনো আলোচনার জের টানছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত যতো জিনিস আছে তা দিয়ে কি ভাবে আমাদের রূপচর্চার কাজ চালানো যায় সেই আলোচনা। এবারে বলব, খুবই সাধারণ নিত্য কাজে লাগে এমন সব উপকরণের কথা।

প্রথমে আসা যাক চায়ের কথায়। ঠান্ডা চায়ের লিকার যে কাজে লাগতে পারে এ-সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদের নেই, কিন্তু লাগে। শ্যাম্পু করে মাথা ধোয়ার পর, চুলের ওপরটা চকচকে করার জন্য ও মসৃণ করার জন্য ঠান্ডা চায়ের লিকার দিয়ে শেষ ধোয়াটা ধুয়ে নিলে ভাল হয়। যাদের একটু তামাটে চুল তাদের পক্ষে আরও ভাল। তবে এসব সপ্তাহে ২।১ দিন করাই ভাল। এমনিতে সাধারণত শ্যাম্পুও একবার সপ্তাহে করা উচিত।

মুখের সৌন্দর্য অনেকটাই নির্ভর করে মুখের ত্বকের ওপর। তাই ত্বকের যতই সব-চেয়ে বেশী করা দরকার। মুখের ওপর নানা ধরনের ছোট ছোট দাগ দেখা যায় এগুলি হয়তো রণ থেকে হয়, কিম্বা লোমকূপে ময়লা জমে হয়, কিম্বা লোমকূপের থেকে তৈলাক্ত যে পদার্থ বের হয় তাই জমে হয়। এর জন্য সাধারণতঃ ক্লিনজিং মিল্ক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সব চেয়ে মজা এই যে, বাড়ীতে নিত্য তিরিশ দিন যে জিনিস আসে তা দিয়েও এসব যত্ন যথেষ্ট করা যায়। তাহল শশা ও আলু। শশা গোল গোল করে পাতলা করে কেটে মুখের ত্বকের ওপর রেখে ৫।৭ মিনিট চুপ করে শুয়ে থাকুন। তারপর আস্তে আস্তে সেগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখ ঘষে ফেলুন। এভাবে করলে মুখের ত্বকের ওপরের ময়লা বা ধুলো থাকলে তা আশ্চর্যভাবে উঠে আসবে। আর মুখ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আলু দিয়েও ঠিক এই প্রক্রিয়ায় মুখ পরিষ্কার করা যায়। আলু দিয়ে চুলের রঙও বদলান যায়। যাদের চুল খয়েরী বা ব্রাউন তাদের চুলে পাক ধরলে সেই চুলকে ওই রং-এ ধরে রাখার জন্য উপায় আছে। আলু ধোসা শুধু জলে ফুটিয়ে সেটা ছেঁকে একটা পাত্রে রাখুন। তারপর তুলো সেই জলে ভিজিয়ে সেই জল চুলের যে অংশে পাক ধরেছে তার উপর আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিতে হবে। এতে পাকা রং ব্রাউন হয়ে যাবে। তবে এই জল মুখের ত্বকে যেন না লাগে, সে বিষয়ে খুব সচেতন হবেন। আর এও মনে রাখতে হবে, অনেকের এই জল সহ্য হয় না, চামড়ায় এর ফলে ফুসকুরি দেখা দেয়। তাঁরা এটাও ব্যবহার করবেন না।

অলিভ তেলের যে কতো রকম উপকার তাতো অনেকবারই বলেছি। আরও কিছু জানাচ্ছি। অলিভ তেল বড় চামচের এক চামচ গরম করে তা আঙুলের ডগা দিয়ে নিয়ে চুলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিলে সুন্দর থোকা করা যায়। এবং এইভাবে গরম তেলে চুল ভিজিয়ে অন্তত ২।৩ ঘন্টা রাখতে পারলে আরও ভাল। তারপর শ্যাম্পু করে ফেলা যায়।

সমান পরিমাণ জল ও ভিনিগার (এই ধরুন বড় চামচের এক চামচ ভিনিগার এক কাপের কম জলে গুলে তাই দিয়ে) তুলোয় ভিজিয়ে মাথার চুলের গোড়ায় গোড়ায় ভাল করে ভিজিয়ে দিতে হবে। চুলের গোড়া ভিজিয়ে রাখলে খুস্কী নরম হয়ে থাকে, ফলে পরে শ্যাম্পু করলেই মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। ভিনিগার দিয়ে অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে।

ডিমের নানা অংশ নিয়ে কতো ভাবে যে উপকার পাওয়া যায় তাও বহুবার লিখেছি। আবার লিখছি। ডিমের সাদা অংশটা আলগা করে বার করে নিয়ে তাকে খুব ভাল করে ফেটিয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে মুখের ওপর চোখের নিচের কালো দাগে বেশ করে মেখে অন্তত ১০।১২ মিনিট রাখতে হবে। মনে রাখবেন, ডিমের সাদা অংশে গন্ধ কম হয়। মুরগীর ডিম ব্যবহার করাই সব সময় উচিত। এটা মুখের ওপর শুকিয়ে গেলে আঙুলের ডগা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে তুলে দিতে হয়। এতে চামড়ায় কোঁচকানো ভাব থাকে না, আর ত্বক উজ্জ্বল হয়। এবারে একটু জলে, (ধরুন আধ কাপ জলে) ১৫ ফোঁটা মতন গোলাপ জল দিয়ে দিন। সেই জল দিয়ে তুলো ভিজিয়ে মুখ মুছে ফেলুন। দেখবেন ম্যাজিকের মতন মুখের ত্বকের উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে।

তাহলেই দেখুন, আলু, শশা, অলিভ তেল ডিম ভিনিগার এসব কি ভীষণ প্রয়োজনে আসে। শুধু দরকার একটু ধৈর্য আর ব্যবহার করতে জানা। আমি আপনাদের যা জানাচ্ছি তা সবই বিদেশে ও দেশে বহু মেয়ে করে দেখেছেন ও ভাল ফল পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, আজকাল কেমিক্যাল দিয়ে তৈরী সামগ্রী ব্যবহার করে রঙের ও চেহারার বহু ক্ষতিও হতে দেখা গেছে। ভাল বিজ্ঞান-সম্মত জিনিস তো আজকাল পাওয়া মুস্কিল। তা পাওয়া গেলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু তা যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন ঘরের তৈরী খাঁটি জিনিসই সবচেয়ে ভালো। এই গুলি ব্যবহার করুন ফল ভাল হতে বাধ্য। তবে মনে রাখবেন এ আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ নয় যে ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাবেন। অন্ততঃ মাস দুই ব্যবহার করতে হবে। তার মধ্যেই দেখতে পাবেন ভালো ফল, এবং অন্যের মুখেও শুনতে পাবেন। যদি কারুর কোন প্রশ্ন থাকে জানাবেন, সাহায্য করতে পারলে খুশী হবো।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, যাঁদের ত্বকের কোন রকম অসুখ বা অসুবিধা আছে তাঁরা যেন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করান। তাঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করে তবে সব কিছু ব্যবহার করবেন। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে ত্বকের গোলমাল বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো অসুবিধে থাকলে তেল, ডিম ইত্যাদি জাতীয় জিনিস সহ্য হয় না। এসব ক্ষেত্রে, একটু বিচার-বিবেচনা করে ব্যবহার করবেন। অনেকের চামড়া এতো তৈলাক্ত যে তার ওপর তেলও বসে না। তবে সাধারণতঃ এসব জিনিস স্বাভাবিক মানুষের এ পর্যন্ত কোন ক্ষতি হতে দেখা যায় নি।

—বরবর্ণিনী

ত্রয়োদশ সংস্করণ বাহির হইল !

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

COMMON WORDS

ঃ অসংখ্য ছবির সাহায্যে শব্দজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবোধের ব্যবস্থাসহ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য অভিনব সচিত্র ইংরেজি-বাংলা অভিধান ঃ

॥ দাম ঃ চার টাকা ॥

ঃ জেনারেল বুকস্ ঃ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

আর্থিক প্রসঙ্গ

সালতামামি ও ময়নিহান

ঠিক সালতামামি নয় কারণ বিবরণ হলো পাঁচ বছরের—চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন পাঁচ বছরের (১৯৬৯-৭৪)। সুতরাং সালতামামি না বলে কি বলব পাঁচ-সাল তামামি? ঠিক করতে পারছি না। তবু জন-পরিচিত বলে 'সালতামামি' শব্দটিই ব্যবহার করলাম। আবার প্রশ্ন : চতুর্থ পরিকল্পনার হিসেবনিকেশের সঙ্গে ময়নিহানেরই বা সম্পর্ক কি? ময়নিহান কে তা সবাই জানেন তবে হয়ত কারো কারো ক্ষেত্রে তার পুরো পরিচয় জানা না থাকতে পারে। ড্যানিয়েল-প্যাট্রিক ময়নিহান রাষ্ট্রপতি নিকসনের সময় ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছিলেন। এখন আবার স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন। পেশায় ময়নিহান ঠিক কূট-নীতিবিদ নন—অধ্যাপক। হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং জন এফ কেনেডি স্কুল অফ গভর্নমেন্টের ফ্যাকালটি সদস্য। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস্ অ্যান্ড পোলিটিক্যাল সায়েন্সের অবৈতনিক ফেলো। বিশের অধিক সম্মানাত্মক উপাধিতে ভূষিত। ১৯৬৯ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি নিকসনের নির্দেশে যে 'পরিবার সাহায্য পরিকল্পনা' (ফ্যামিলি এ্যাসিস্ট্যান্স প্ল্যান) প্রণয়ন করেন তা বহু-বিতর্কিত এবং বিশ্ববিশ্রুত। বেঁচে থাকলে সামাজিক নিরাপত্তার পথিকৃৎ অটো ভন বিস্মার্ক'ও (১৮১৫-১৮৯৮) হয়ত উল্লসিত হয়ে উঠতেন। মূলত রাজনীতির ছাত্র হলেও ময়নিহান অর্থনীতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর মতে বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক দুঃখদুর্দশার মূল কারণ হলো মানব-আচরণের ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রাধান্য।

ময়নিহানের আরো আগের কথায়—অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনার হিসেবনিকেশে—আসা যাক। এই হিসেবনিকেশ এখনও শেষ হয়নি, তবে যতটুকু বিবরণ পাওয়া গেছে তার ওপরই কটাক্ষ—কঠোর মন্তব্য করলেও বাড়িয়ে বলা হয় না—করেছে ভারত সরকারেরই সংস্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

প্রতি বছর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থ-ব্যবস্থার ওপর একটি সমীক্ষা বা প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এ মাসের গোড়ায় বেরিয়েছে ১৯৭৩-৭৪ সাল বা চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বছরের প্রতিবেদন। প্রতি-বেদনটিতে দেখানো হয়েছে যে চতুর্থ পরি-কল্পনার শেষ বছরের প্রতিবেদন। প্রতি-বেদনটিতে দেখানো হয়েছে চতুর্থ পরি-কল্পনার মোট ব্যয় বর্তমান মূল্যস্তরের হিসেবে মোট ১০৯ কোটি টাকা কম হলেও মূল্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করলে ব্যয়-ঘাটতির পরিমাণ ৩৩৯৪ কোটি টাকা বলে ধরতে হবে। অর্থাৎ মোট ব্যয়-ঘাটতি হয়েছে ২১-৩ শতাংশ। দ্বিতীয়ত যদিও করভারবৃদ্ধি স্বদেশে-বিদেশে ধানসংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থসংস্থানের সবিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়েছে তবুও কিন্তু গড়ে মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তিন শতাংশ থেকে ৩-৫ শতাংশের মধ্যে। স্মরণ রাখতে হবে, চতুর্থ পরিকল্পনায় জাতীয় আয়-বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল গড়ে বার্ষিক ৫-৭ শতাংশ।

তৃতীয়ত পরিকল্পনাধীন পাঁচ বছরে পাইকারী মূল্যসূচক গড়ে ১০-৫ শতাংশ করে বৃদ্ধি পায়। এবং ভোগ্যপণ্যক্রেতা মূল্য-সূচক মাত্র শেষ বছরে (১৯৭৩-৭৪) একে-বারে লাফিয়ে ২৪-৩ শতাংশ বৃদ্ধি ঘোষণা করে। অতএব কার্যক্ষেত্রে ঐ সালে প্রাইস-ইনফ্লেশান বা মূল্যস্ফীতির হার ছিল ঐ ২৪-৩ শতাংশ।

চতুর্থত, পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারত সরকারের মোট দায় বা দেনার পরিমাণ ১৬৬৩৭ কোটি টাকা থেকে ২৩২৬৯ কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। শতাংশের হিসেবে বৃদ্ধির পরিমাণ হলো চল্লিশ।

পঞ্চমত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়ে বিপুল পরিমাণে এবং এক বছরের মধ্যেই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ২৬ লক্ষ থেকে ৩৫ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়।

এইবার হলো সমীক্ষা বা মন্তব্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুস্পষ্টভাবেই মন্তব্য করেছে যে এইরকম অসুস্থতার মূলে আছে সরকারী নীতি ও অপারগতা—বিশ্ব-পরিস্থিতি নয়। বিশ্ব-পরিস্থিতির দরুন যেটুকু দুঃখ-দুর্দশা তাকে মাত্র প্রান্তিক বা 'মারজিন্যাল' বলে বর্ণনা করা যায়।

সরকারী নীতি বা অপারগতা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটিতে দেখানো হয়েছে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অপ্রতুলতাই সম্প্রসারণের শ্লথ গতি ও বর্তমানের মন্দাবস্থার জন্যে দায়ী। মূল্যস্ফীতির মূলে আছে ঐ একই কারণ। 'আসল সঞ্চয় ও আসল বিনিয়োগের কোন সংক্ষিপ্ত পথ (সর্ট ওয়ে) নেই'—বলে প্রতিবেদনটিতে মন্তব্য করে বোঝানো হয়েছে যে রাজনৈতিক কারণে সরকার ইতিহাস-নির্দেশিত পথে পদসঞ্চার করতে অনিচ্ছুক বা অপারগ।

প্রতিবিধানে কি করতে হবে সে উপদেশ বা পরামর্শও প্রতিবেদনটিতে দেওয়া হয়েছে : আসল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সতর্ক করে বলা হয়েছে যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির নামে যেন মূল্যস্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা না করা হয়।

ময়নিহান :

বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত ময়নিহান মন্তব্য করেছেন : 'এ আর কিছু গোপন তথ্য নয় যে ভারতে উন্নয়ন-পরিকল্পনার কাজ ভালভাবে চলছে না। ১৯৪৭ সালে—স্বাধীনতা অর্জনের বছরে ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ টন, আর ঐ বছর জাপানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮ লক্ষ টন। পঁচিশ বছর পরে ভারতের ইস্পাত দাঁড়ায় ৬২ লক্ষ টনে, আর জাপানের ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ টনে।.....এই ব্যাপারে স্মরণ রাখতে হবে যে জাপানকে লোহা ও কয়লা—উভয়ই আমদানী করতে হয় ভারতকে যা করতে হয় না।' ময়নিহান উভয় দেশের মধ্যে জাতীয় আয়বৃদ্ধির তুলনাও করতে পারতেন—বলতে পারতেন ঐ সময়ের মধ্যে জাপানের মোট জাতীয় আয় ২০ গুণের বেশী (১৬০০ কোটি ডলার থেকে ৩২১০০ ডলার) বৃদ্ধি পেয়েছে আর ভারতের পক্ষে জাতীয় আয়কে দ্বিগুণ করাও সম্ভব হয়নি। যা হোক ময়নিহানের মতে এটা কোন ভাগ্যের বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয়—বললে চলবে না যে ওদের ভাগ্য ভাল বা জাপানীরা বেশী পরিশ্রমী। তফাৎ হলো উভয় দেশের অনুসৃত নীতির মধ্যে—জাপান সুচিন্তিত নীতি গ্রহণ করে কার্যকর করেছিল অর্থ-ব্যবস্থাকে সুস্থ-সবল করে তোলবার জন্যে, আর ভারত অর্থনীতি ও উন্নয়ন-পরিকল্পনার নামে রাজনৈতিক ভাবাদর্শেরই বেসাতি করেছে।

ময়নিহানের আরও বক্তব্য হলো : 'ভারত দরিদ্র হলেও স্বল্পোন্নত নয়। যে দেশে কুশলী কর্মী ও বিজ্ঞানীর সংখ্যা সর্বাধিক মোট জাতীয় আয়ের মাপকাঠিতে যে দেশের স্থান পৃথিবীতে দশম এবং যা সম্প্রতি আণবিকশক্তির সম্ভাবনাপূর্ণ হয়েছে তাকে স্বল্পোন্নত বা অনগ্রসর বলে অভিহিত করা যায় কি করে?'—এই হলো ময়নিহানের প্রশ্ন। সুতরাং উন্নত হয়েও ভারত দারিদ্র্য দূরীকরণে সমর্থ হয়নি শুধু অনুসৃত নীতির দরুন।'

ময়নিহানের সমীক্ষার সঙ্গে সকলে নিশ্চয়ই একমত হবেন না কিন্তু এতে যে চিন্তার বেশ কিছুটা খোরাক আছে তা অস্বীকার করা যায় কি? সঙ্গে সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমকালীন সমীক্ষার কথাও ভাবতে হবে।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

২০-১২-৭৪

স্নায়ুগুলোর ওপর যেন একটা কাঁকড়া বিছে হেঁটে বেড়াচ্ছে! শেষে যদি সব ভেস্তে যায়? কথা বলতে বলতে রেখার মুখের ওপর চোখ রাখল দিবাকর।

'অত উতলা হলে চলবে না। আমার মন বলছে লেগে যাবে। পরপর তিন দিন চার শালিখ দেখেছি। সবাই বলে চার শালিখ দেখলে চিঠি আসে।' দিবাকরের কথার উত্তর দিল রেখা।

ইডেনের বড় গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল রেখা আর দিবাকর। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। একটি অপরাহ্ন এক সঙ্গে কাটিয়ে এখন যে যার গন্তব্যে পা বাড়াবার পূর্ব মুহূর্তে শেষ-নাহি-যার সেই না-বলা কিছু কথা সেরে নিচ্ছিল দুজনে।

একখানা সেভেনটি নাইন-বি রুটের বাস এসে দাঁড়াল। রেখা উঠে বসল। বাইরে জানলার ধারে দিবাকর দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর গাড়িটা এক সময়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে দিবাকরের মনে হল, পৃথিবীতে এত ঘন ঘন রাত্রি হয় কেন? মাত্র বারো ঘণ্টা দিনের আলোতে পাহাড়ের মত জমে ওঠা জরুরী কথাগুলো শেষ করা যায় নাকি?

কাকজ্যোৎস্নায় আকাশ পৃথিবী ভাসছিল। গঙ্গার দিকে দৃষ্টি গেল দিবাকরের। নদীর ওপর একটি বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। থার্টি-সি বাসগুলো এত দেরী করে আসে যে মানুষের ধৈর্য হারিয়ে যায়।

আধ ঘণ্টা এধার ওধার পায়চারি করেও গাড়ির পাত্তা পাওয়া গেল না। রেখার সঙ্গে সেও যেতে পারতো ঘাটগাছির মোড় পর্যন্ত। কিন্তু ব্রেক-জার্নির জন্যে বাড়তি পাঁচটা পয়সা খরচা সেও কি কম কথা! যখন তার মানসিক অবস্থা পঞ্চমে তখনই, পরপর একসঙ্গে তিনখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। দিবাকর ধীরে-সুস্থে একটা গাড়িতে উঠে বসল।

'সবাই বলে চার শালিখ দেখলে চিঠি আসে'—রেখা কিছু আগেই কথাগুলো বলে গেছে তাকে, দিবাকরের মনে পড়ল। দেখাই যাক, শুধু একটা সংস্কার না কথাটা সত্যি।

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই চিঠি এসেছে। আর চাকরীটাও হয়ে গেছে দিবাকরের। অফিস থেকে জি পি ওর বড় ঘড়িটার নিচে এসে দাঁড়াল দিবাকর। আশ্বিনের অপরাহ্ন আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসছিল। শনিবারের ডালহৌসী পাড়া তায় আবার অনেক অফিসে কিসের যেন ছুটি। চাকরীর ফরম আর সাদা খাম বিক্রি করা ছেলেগুলোও উঠে গেছে।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে একটা সিগারেট ধরালো দিবাকর। তারপর ঘাড় উঁচু করে বড় ঘড়িটার দিকে তাকালো। লালদীঘির ধার দিয়ে একটা দুটো ট্রাম আসা-যাওয়া করছিল। চোখে কালো চশমা-পরা একটি মেয়েকে হঠাৎ দেখতে পেল সে। মেয়েটি তারই পাশে বড় থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাতঘড়ির দিকে আবার তাকালো দিবাকর। এখনও কুড়ি পঁচিশ মিনিট দেরী আছে। সে ভাবছিল, সামনে কোথাও গিয়ে একটু চা খেয়ে আসবে কিনা। হিসাব করছিল, যেতে আসতে পাঁচ মিনিট, চায়ের দোকানে ঢুকে অর্ডার দিয়ে চা খেয়ে দাম মেটাতে মেটাতে কম করেও দশ মিনিট। তাহলে মোট দাঁড়াল পনেরো মিনিট। তারপরও হাতে থাকছে পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময়।

প্যাট্রী, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোরেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সম্পৎ সেরামিক্স প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

কিন্তু এত ভাবনা আর অঙ্ক কষতে কষতেই তার পাঁচ মিনিট সময় নষ্ট হল। আর এখন এত 'ন্যারো মারজিনে' তার যাবার ইচ্ছে হল না। যদি দেরী হয়ে যায় আর তাকে দেখতে না পেয়ে রেখা ফিরে যায়? দিবাকর থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার কথা ভাবছিল।

সময় দেখা অথবা রাস্তা আর গাড়ি-ঘোড়া দেখার মাঝে মাঝে দু-একবার চোখা-চোখিও হয়ে গেল মেয়েটির সঙ্গে দিবাকরের। কিন্তু কালো চশমার কাচ ভেদ করে তার দৃষ্টি কোথায় দিবাকর বুঝতে পারছিল না। তার মনে হল, মেয়েটাও নিশ্চয়ই তার মতন কারোর জন্যে অপেক্ষা করছে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটাকে পা দিয়ে পিষে আবার একবার ঘড়ি দেখল দিবাকর। আর মিনিট পাঁচেক বাকি। এমন সময়ে সেই মেয়েটি থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দিবাকরকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি দিবাকর রায়!

মেয়েটির কথায় দিবাকর আশ্চর্য বোধ করল না। সে বলল, হুঁ, কিন্তু কেন বলুন তো? মেয়েটি বলল, আমার নাম সোহিনী। রেখা দত্ত আমার বন্ধু। আজকে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করার কথা ছিল তার? দিবাকর বলল, হুঁ। সোহিনী বলল রেখার হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে। আমাকে খবরটা পৌঁছে দিতে বলেছিল আপনার কাছে হয় টেলিফোনে না হলে এখানে সাক্ষাতে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়বেন ভাবিনি।

এবারে দিবাকরের আশ্চর্য হবার পালা। সে বলল, সেই তখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কিছু বলেন নি কেন? আশ্চর্য মানুষ তো আপনি! সোহিনী হাসল। তারপর বলল, বুঝতেই তো পারেন, কাকে বলতে কাকে বলব, লজ্জা লাগে না! দিবাকর সায় দিল, তা অবশ্য ঠিকই। চলুন তাহলে আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। তার থেকে আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আমিও ফিরে যাই।

ডালহৌসীর ফাঁকা ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সোহিনী বলল, আপনার চাকরীটা হওয়াতে রেখার খুশী যেন আর ধরে না। দিবাকর এবার আলতো করে সোহিনীকে দেখল। সোহিনী তখন তার চোখ থেকে কালো চশমাটাকে খুলে ফেলেছে। দিবাকরের ভাল লাগল সোহিনীকে!

কথার জের টেনে দিবাকর বলল, কিন্তু আপনি তো খুশী নন। সোহিনী বলল, যাঃ কি যে বলেন না! আজকের দিনে একজনের চাকরী হলে আর একজন কখনও অসুখী হয়? দিবাকর বলল, সত্যি বলছেন? সোহিনী উত্তর দিল, মিথ্যে বললে কিছু পাবো কি? দিবাকর হাসতে হাসতে বলল, আমার কিছু দেবার আছে তাহলে। সোহিনী আনমনে উত্তর দিল, জানি না।

কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের নির্জনতা শেষ হয়ে পথ এখন প্রশস্ত। চতুর্মুখী। দিবাকর সোহিনীকে জিজ্ঞাসা করল, রেখার হঠাৎ শরীর খারাপ হল কেন? কি হয়েছে ওর? সোহিনী অন্যমনে চলতে চলতে উত্তর দিল, ও কিছু নয়। তিন-চার দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে। ব্রড-ওয়ে ক্রসিং-এর কাছটায় এসে দিবাকর দাঁড়িয়ে পড়ল।

সোহিনী বলল, সন্ধ্যাটা সুন্দর। মনে হচ্ছে এই রাস্তাটা ধরে শুধু এগিয়ে চলতে! ট্রাফিক সিগন্যালটা দেখে নিয়ে দিবাকর বলল, গঙ্গার ধার পর্যন্ত আমরা হেঁটেই যাচ্ছি। বেশ কিছুটা পথ হাঁটা হয়ে যাবে আপনার। সোহিনী দিবাকরের মুখের ওপর তাকালো। রাস্তায় আলো থাকার জন্যে অন্ধকার জমাট ছিল না পরিচ্ছন্ন আভরণে ভদ্র একটি যুবাপুরুষকে তার ভাল লাগলো। অথচ একজন পরপুরুষ সম্বন্ধে কিছু ভাবতে তার লজ্জা হচ্ছিল। তাছাড়া মানুষটা যে তার বান্ধবীর!

পাশাপাশি পথ চলছিল সোহিনী আর দিবাকর। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার জন্যে মনের মধ্যে এক রকমের অস্বস্তি বোধ করছিল দিবাকর। এমন সময় স্টেডিয়ামের পাশ থেকে একটা লোক হাঁটছিল 'চা-আ' 'চা-আ' আওয়াজ তুলে। দিবাকর তাকে

স্নায়ু তন্ত্রীদের জন্যে
ওকাসা এবং ওকাসা বিশ্ববিখ্যাত বলবর্ধক টনিক ট্যাবলেট বা আলমাকে ৬টি বায়োকেমিকাল, ১০ টি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও ৬টি খনিজ উপাদানের মাধ্যমে নতুন শক্তি এনে দেবে।
ওকাসা
টনিক ট্যাবলেট
(পুরুষের জন্য—"কালী")
OKASA, CO. PVT. LTD.
12 Gunbow Street.
P.O. Box No. 398,
Bombay 400 001.

ডাকতে যেতেই সোহিনী বলল, এখানে কেন? আর একটু এগিয়ে কোথাও বসে খেলেই তো ভাল!

সহসা এমন একটা প্রস্তাবে নিজের কাছে নিজেই যেন কৈফিয়ৎ চাইছিল দিবাকর। তার মনে হল, অথচ এই কথাটা শোনার জন্যেই তাকে কি এতখানি পথ পায়ে ঠেলে আসতে হয়েছে? দিবাকর বলল, তাহলে নদীর ধারে কেন। আমরা যদি উজানে বয়ে যাই কিছুক্ষণের জন্যে! বাড়ি ফিরতে দেরী হবে না তো আপনার?

সোহিনী বলল, কি দরকার। থাক না আজ। তার থেকে গঙ্গার ধারে কোথাও—সোহিনীর শেষ না করা কথার শেষটুকু ধরে দিবাকর বলল, নদীর ধারের দোকানগুলো বড় অপরিষ্কার। নোংরা। সোহিনী খিলখিল করে হেসে উঠলো। দিবাকর লজ্জা পেল সে ভাবল, তার প্রস্তাবে সৌজন্য মাখানো সন্ধানী কোন ইঙ্গিত ছিল নাকি?

সোহিনী কিন্তু দিবাকরকে আবার বলল, তাহলে চলুন। কিন্তু দিবাকরের মনে হল, সোহিনীর কথায় কোথাও যেন একটা প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছার ভাব তার ব্যবহারের মাধুর্যে মিশে রয়েছে। সে বলল, ঠিক আছে। এতখানি পথ যখন এসেই গেছি তখন আবার উল্টো হেঁটে কি লাভ? নদীর ধারই ভালো।

নদীর প্রবাহে জীবনেরও একটা সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় বোধ হয়। অপরিচয়ের প্রাথমিক পর্ব শেষে সোহিনী এখন উচ্ছল। দিবাকর তার হাতঘড়িটার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চেষ্টা করল। সোহিনী তার হাত দিয়ে ঘড়িটাকে ঢাকা দিল!

সোহিনী এখন সম্পর্কের নিবিড়তায় দিবাকরের আরো কাছে। এখন রেখার সংগে দেখা-সাক্ষাতের ফাঁকে ফাঁকে সোহিনীর সংগেও দিবাকরের নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। সোহিনী আর রেখা প্রিয়বান্ধবী হয়েও ভিন্ন জীবন দর্শনে একে অপরের কাছ থেকে বহু দূরে সরে থাকে! চাকরীতে পাকাপাকিভাবে বহাল হওয়াতে দিবাকরও এখন আপন জীবন দর্শনে গরীয়ান এক পুরুষ! তার কাছে দুই নারীর সান্নিধ্য আর ভালবাসা আপাত পৃথক হলেও কোথায় যেন একই সুরে বাঁধা।

কিন্তু তবুও দিবাকর যেন একটা সমস্যার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। তার মনে হয়, এর থেকে কোন দিনও যদি সোহিনীর সংগে তার দেখা না হতো। মোটামুটি স্বচ্ছন্দ সংসার বেশ্যাদের। কিন্তু সোহিনীর? তার অভাব নিত্যসাথী। সে চাকরী করে। রেখা পড়ে। ওরা প্রতিবেশী। দিবাকরের সংগে রেখার পরিচয় আকস্মিক-ভাবে। এক প্রেক্ষাগৃহে। আজ সেই পরিচয় অনেক পরিক্রমার পর পরিণতির শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ-এ কফি হাউসের পাশে সোহিনীর সংগে দেখা করে দিবাকর এগিয়ে চলে ধর্মতলায় একমে ফার্নিচার্সের দোকানের কাছে। সেখানে রেখা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। অথবা অন্যদিন অন্য কোথাও। যেন আঁকাবাঁকা পথে নদীর মতন সাগরসংগমে।

অবশেষে সোহিনী একদিন নিজেকে সংশয় থেকে মুক্ত করে বলল, তুমি রেখাকে নিয়ে সংসারী হও। সুখী হও দিবাকর। দিবাকর মৃদু হেসে উত্তর দিল, আমি তো সবার চেয়ে সুখী। ম্লান হাসিতে মুখর হয়ে সোহিনী বলল, থাক, আর বলতে হবে না। 'সুখী'র সকল চিহ্নই তোমাতে প্রকট দেখতে পাচ্ছি।

কিছু সময় স্তব্ধ থেকে দিবাকর ধীরে ধীরে বলল, সংসারী হতে পারলাম না বলে তোমার পাশে আমি তো অসুখী নই! এই সংসার আমাদের জন্যে হয়ত নির্দিষ্ট ছিল না। যা ছিল না, এখনও নেই, অথবা কোন দিনও থাকবে না। তাকে নিয়ে মনে মনে গুমরে মরার থেকে আমাদের এই পাশাপাশি আর কাছাকাছি থাকাটুকুই থাকুক না সুখে ভরে। তুমি কি অসুখী হবে সোহিনী? মেঘ-ভরা নীল আকাশের মতন ডাগর চোখ মেলে দিবাকরকে দেখতে গিয়ে বুকে জমে থাকা কিছু বাষ্প হৃদয়ের উত্তাপে অশ্রু হয়ে সোহিনীর দু চোখ ভরিয়ে দিল।

সেই একই কথার প্রতিধ্বনি রেখার মুখেও। দিবাকর তুমি সোহিনীকে নিয়ে ঘর বাঁধ, ও তোমাকে ভালবাসে। মুগ্ধ চোখে দিবাকর তাকিয়েছে রেখার মুখের ওপর। তারপর বলেছে, আর তুমি আমাকে ঘৃণা কর, রেখা? দিবাকরের বুকে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কেঁদেছে রেখা। হয়ত ওই কান্না-টুকুই এই জীবনে তার পরম পাওয়া। অথবা এই কান্নাই জীবনে না-পাওয়ার যত গ্লানি ধুয়ে মুছে মিথ্যা যত দ্বিধা আর সংশয় থেকে তাকে মুক্তি দিতে চাইছিল।

অথচ রেখার ভালবাসা সোহিনীর নির্দয়তায় পিষ্ট নয়, অথবা সোহিনীর ভালবাসাও রেখার অনুগ্রহ পুষ্ট নয়। এই পৃথিবীর ভালবাসা থেকে সত্য সুন্দর একটি চিরায়ত পাঠের মতনই দিবাকর প্রত্যহের আশা-বেদনার আলোছায়া থেকে গ্রহণ করে নিতে পেরেছে, সংশয়ের আবরণে ঢাকা জীবন, জগৎ আর সংসারে নিঃসংশয়ে-সেও কোন ভুল করেনি। কিন্তু দিনগুলো চলতে চলতে কবে কখন হঠাৎ যেন সভ্যতার আজব-নগর ছাড়িয়ে তেপান্তরের মাঠের মধ্যে অপরাহ্নের প্রলম্বিত নিঃসঙ্গ ছায়া হয়ে ঘিরে ধরল তিনটি প্রাণীকে।

আসলে তিনটি ভীরু মন যেন ভুল করেছে ঈশ্বরের কাছে একটি প্রার্থনায়, 'তুমি' না 'সে'? আর সেই ভুল, সেই সংশয় আজ অভিশাপ হয়ে তিনটি নর-নারীর জীবনে সাজিয়ে দিয়েছে শূন্যতার ডালি। কফি হাউসের পাশে অথবা একমে ফার্নি-চার্সের দোকানের কাছে এখন দিবাকর, রেখা আর সোহিনীকে দেখা যায় না, জীবনের ওলোট-পালটে তারা আজ পরিণতমন সংশয়মুক্ত তিনটি নরনারী।

অপরূপ রূপের ছটা একটি ফোঁটা

শ্রী কুমকুম ডিলাক্স

চাপা আভায় নানা ধরণের রঙ মন কেড়ে নেয়। তরল পদার্থ। অনুমোদিত উপকরণ দিয়ে তৈরী বলে আপনার সব প্রত্যাশা পূরণ করে কুমকুম।

প্রস্তুতকারক:
শ্রী কসমেটিক্স
মুম্বাই-৩০০০৭০। টেলিগ্রাম: SHRICOSMO

পরিবেশক : প্রদীপ প্রতিষ্ঠান রামপুরিয়া মার্কেট
৮৬, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ফোন : ৩৪-০৭০৮

পুনশ্চ

বঙ্গদেশের রত্নস্বরূপ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই অন্যতম। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় বিবার্ট গ্রন্থ রচনা করেও প্রদান করা সম্ভব নয়। এবংবিধ ভাষণ যে অতিশয়োক্তি নয় তা বর্তমানের প্রকৃত বিদগ্ধজন মাত্রেই উপলব্ধি করবেন।

এই ডিসেম্বর মাসের ৬ই তারিখে ১৮৫৩ সালে, ২৪ পরগণার নৈহাটীতে হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রী তাঁর উপাধি। এককালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং অবিভক্ত বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ছিলেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ডি-লিট উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। ইংরেজী, সংস্কৃত, জার্মান, পালি ও তিব্বতীয় প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। নানা বিষয়ের রচনায় বঙ্গ-সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য নিবন্ধরাজি ও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কাঞ্চনমালা, ভারত মহিলা, মেঘদূত, বেণের মেয়ে বাল্মীকির জয়, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁর অসামান্য সাহিত্য-মাধুর্যের পরিচয় বিদ্যমান। তাঁর তিরোধান ঘটে ১৯৩১ সালের ১৭ই নভেম্বর।

১২৮৫ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত ৫ম বর্ষের 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'তৈলদান' নামক হালকা ধরনের একটি সরস অথচ তির্যক ভঙ্গীসম্পন্ন নিবন্ধ, যা সর্বকালের মানুষের উপযোগী, তা এখানে আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিলাম।

: তৈলদান :

তৈল যে কি পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ। বাস্তবিক স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে, তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে?

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান; যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে, সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা। তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকীলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না, বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে, তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্ব্বলভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গবর্ণর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ। তৈল নহিলে জগতের কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না; হাজার গুণ থাকুক, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্ত্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম ভক্তি; যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম প্রণয়; যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম মৈত্রী; যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য 'ফিলনথ্রপি'। যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম লয়েলটি; যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি, তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি। চাকর-বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি তাহার পরিবর্ত্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়। সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এই জন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্ব্বি দিয়া থাকে। এই জন্যই যখন দুই জনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নি নিবারণী শক্তি না থাকিত, তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে রাজায়-প্রজায় বিবাদ-বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পারে, সে সর্ব্বশক্তিমান, কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে সময় আছে, কৌশল আছে। তৈল দ্বারা অগ্নি পর্য্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্য্যন্ত তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিষ নয় যে, নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে, সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র। সময়—যে সময়ই হউক, তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না, তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্য্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট ১৷৹ পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না, একজন ইংরাজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০৲ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণ-তারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার তৈল আমার তৈল হইতে মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে, তাহার আরও মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে, তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দানের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর, বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাকটিকল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার। অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, বাছিয়া বাছিয়া কোন রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহ-নিষেকের কলেজ খোলা হয়।...

বাঙ্গালীর বল নাই বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা তৈল—বাঙ্গালীর যে কেহ কিছু করিয়াছেন, সকলই তৈলের জোরে বাঙ্গালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়; এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।...

শেষে মনে রাখা উচিত, এক তৈলে চাকাও ঘোরে আর তৈলে মনও ফেরে।

—ক্ষপণক

প্রদর্শনী

সলিল ভট্টাচার্যর ছবির প্রদর্শনী

কয়েক সপ্তাহ আগে এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস গ্যালারীতে সলিল ভট্টাচার্যের তেল-রং ছবির একটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। সলিলবাবু বহুদিন ধরে ছবি আঁকছেন এবং কলকাতা শহরে তার প্রদর্শনী করছেন। সুতরাং তাঁর ছবিতে নূনতম কারিগরী দক্ষতার একটা পরিচয় যে পাওয়াই যাবে এতো স্বাভাবিক। তিনি প্রায় সহজাত দক্ষতায় বর্ণলেপন করেন, বর্ণান্তর ঘটান ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্যকে তুলে ধরেন। সাবলীল হাতে রেখাংকন করেন। সলিলবাবু অবশ্য কারিগরী ক্ষমতার চেয়েও বেশী সৃজনীকৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর বর্ণচয়ন ও বর্ণ বিতরণ পদ্ধতি তাঁর সেই সৃজনীক্ষমতার পরিচয় দেয়। বর্ণান্তরধর্মী কিন্তু মূলতঃ দ্বিমাত্রিক বর্ণক্ষেত্রের উপর একান্ত রেখামাত্রিক রূপবন্ধের প্রক্ষেপ ঘটিয়ে তিনি সুন্দর নকশা সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর সে নকশা তৈরীর ক্ষমতাও তাঁর সৃজনীশক্তির পরিচয় দেয়।

কিন্তু চিত্রকলা তো একটি চারুশিল্প, এক একটি ছবি তো একটি ভূয়োদর্শনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। সেই রূপ সৃজনের জন্য কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন অবশ্যই আছে কিন্তু সে দক্ষতাই তো সব নয়। ছবি শুধুমাত্র নকশা নয় কোন গূঢ় উদ্দেশ্য দর্শনীয় করে তোলার নকশা।

সলিলবাবু নগ্ন-নারী ফুল ইত্যাদি বস্তুর প্রাতিস্বিক রূপকে যেভাবে ঋজু জ্যামিতিক রেখার সাহায্যে চিত্রায়িত করেছেন, যেভাবে তাদের শারীরসংস্থানকে দ্বি-মাত্রিক ক্ষেত্রে জ্যামিতিক আয়তক্ষেত্রের সমাহার হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে স্বতঃই আমাদের বিশ্লেষণী কিউবিজম-এর কথা মনে পড়ে। কিন্তু কিউবিষ্টরা রংকে কখনও আলো-আঁধারির প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেননি; রং তাঁদের কাছে বিশুদ্ধ রং—কখনও উজ্জ্বল কখনও ঘোর কখনও উষ্ণ কখনও বা শীতল। সলিলবাবু রংকে আলো-আঁধারি প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেছেন এবং এমনভাবে করেছেন যাতে বর্ণ-প্রেক্ষিত বা colompupective তৈরী হয়ে ছবির জমিতে একটা ত্রি-মাত্রিকতা এনে দিয়েছে। ওঁর বর্ণান্তর সংঘটনও সেই ত্রি-মাত্রিকতাকেই জোরদার করে। কিউবিষ্টরা কিন্তু চিত্রক্ষেত্রের এই মায়াবী ত্রি-মাত্রিকতাকে এড়াবার জন্যই রং-এর আলো-আঁধারী ধর্ম ও বর্ণান্তরকে তাঁদের অভিধান থেকে বাদ দিয়েছেন। এখন শিল্পী বলতে পারেন যে তাঁর ও কিউবিষ্টদের অন্বিষ্ট এক নয়; যে দাবী করতে পারতেন লাইয়োনেল ফাইনিনগার এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন শিল্পীরা। ফাইনিনগার এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি আপাতঃদৃষ্টে কিউবিষ্টদের সমগোত্রীয় হলেও এঁদের দুজনের কেউই কিউবিষ্ট নন। ইঁট পাথর লোহায় তৈরী নাগরিক স্থাপত্যের বিপরীত দিক থেকে নানাভাবে আলো পড়ে বস্তুতে - আলোতে - অন্ধকারে মিশে যে আলো-আঁধারি নকশা তৈরী হয় তার সাহায্যে মানুষ এবং প্রকৃতির রহস্যময় সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির প্রকাশের জন্যই তাঁরা এমন একটি রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন যা আপাতঃদর্শনে কিউবিষ্টদের মতন। হয়তো বা তাঁরা কিউবিষ্টদের কাজ থেকে প্রেরণাও পেয়েছিলেন। কিন্তু বহুধা বিভক্ত প্রাতিস্বিক রূপের একটা চিত্রসম্মত ধ্রুব রূপের সন্ধানে প্রাতিস্বিক রূপকে ভাঙ্গেনি যা কিউবিষ্টরা করেছেন। যে মুহূর্তে সলিলবাবু পুরুষ নারী ফুল ইত্যাদির প্রাতিস্বিক রূপকে কিউবিষ্ট কায়দায় চিত্রায়িত করেন সে মুহূর্তে কিউবিজমের দায়-দায়িত্ব তাঁর উপরে বর্তায়। নগ্ননারীর পারস্পরিক অবস্থানের বিবরণের মধ্য দিয়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি দিয়ে গল্প-বলার চেষ্টায় সলিলবাবু সে দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। এবং অন্য কোন দায়িত্ব নেননি।

আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পকলার অন্যতম দুর্বলতা এই যে আমরা হাতের কাছে পাওয়া ইউরোপীয় বা মার্কিণী শিল্পরীতির অনুকৃতি করি সেই রীতির পিছনে থাকা ভূয়োদর্শনের পরিচয় গ্রহণ না করেই।

শানু লাহিড়ীর ছবির প্রদর্শনী

কলকাতার চিত্ররসিকদের কাছে শানু লাহিড়ীর পরিচয় দেওয়া নিরর্থক। তিনি বহুদিন ধরে ছবি আঁকছেন এবং নিয়মিতভাবে সে সব ছবির প্রদর্শনী করে আসছেন। তেল-রংয়ের ছবিতে শ্রীমতী লাহিড়ীর দক্ষতা তর্কাতীত।

শানু লাহিড়ীর ছবির পৃথিবী একান্তভাবে নারীজগৎ। তাঁর ছবির পূর্ণযৌবনভারনম্রা নারীরা কখন একাকী কখনও বা একাধিকে একাকী বিলাসী-বিষাদে মগ্ন, কখনও বা কর্মহীন ক্লান্তিতে মদালসা বিশ্রামরত কখনও বা রিকশাচালকের পৃষ্ঠারূঢ়া। এঁদের যদিবা কোন সমস্যা থাকে সে সমস্যা কদাপি জাগতিক; এঁদের সমস্যাদি একান্তভাবে মনোজাগতিক। এঁদের যৌবন এঁদের আত্মসচেতন করে না। এঁদের যৌবন সৌন্দর্যের সমার্থক দূরে থেকে উপভোগ করার জন্য।

শ্রীমতী লাহিড়ীর রচনাশৈলী তাঁর নারীজীবন বিষয়ক ভূয়োদর্শনকে আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে। সেদিক থেকে বিচার করলে শ্রীমতী লাহিড়ী সার্থক শিল্পী।

শ্রীমতী লাহিড়ী মোটা দাগের সহজ বহতা ইলিপটিক্যাল রেখ রেখার সাহায্যে তাঁর ছবির রূপবন্ধগুলিকে চেহারা দেন এবং বর্ণান্তর মাত্রিক রংয়ের পুঞ্জের সাহায্যে চিত্রক্ষেত্র ভরাট করেন। মুক্তছন্দে তুলি চালনা করে বর্ণলেপন করেন। মুক্ত-অন্ত বহতা রেখা এবং বর্ণান্তরধর্মী রংয়ের মুক্তছন্দ বিন্যাসের গুণে ছবিতে এক ধরনের সহজিয়া লিরিসিজম দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। রূপবন্ধের অভিব্যক্তিকে এই লিরিসিজম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে। শ্রীমতী লাহিড়ীর বর্ণচয়ন এবং বর্ণবিতরণ পদ্ধতিও ছবির ইন্টিগ্রেশনে সাহায্য করে। উনি সাধারণতঃ দ্বন্দ্বমূলক উষ্ণ ও ঘোর বর্ণ ব্যবহার করেন না। উজ্জ্বল ও শীতল বর্ণই ওঁর ছবির প্রধান সম্বল। এবং উজ্জ্বল ও শীতল বর্ণকেও উনি সাধারণত মধ্যবর্তী বর্ণান্তরের ব্যবহারে পরস্পরের পরিপূরক করে নেন।

অনেকে ওঁর ছবির ফিগার ড্রইংয়ে ইলিপটিক্যাল রেখ রেখার ব্যবহারের ফলে গড়ে ওঠা মনুষ্যরূপের মধ্যে পটচিত্রের প্রভাব আবিষ্কার করেন। পটচিত্রে বিপরীতমুখী রেখার ব্যবহারে ঘনত্ব প্রকাশ করার যে রীতি দেখা যায় ওঁর ছবিতেও সেটা আছে। তবে উনি ইউরোপীয় কায়দায় বর্ণান্তরকেই ঘনত্ব প্রকাশের কাজে প্রধানতঃ ব্যবহার করেন। তাছাড়া শ্রীমতী লাহিড়ীর ছবির রেখার সঙ্গে পটচিত্রের রেখার চরিত্রের মিল কমই। পটচিত্রের রেখা ক্রমান্বয়ী অভঙ্গ এবং সযত্ন। শ্রীমতী লাহিড়ীর রেখা ভঙ্গপার্শ্ব এবং তার ক্রমান্বভঙ্গ ও পটচিত্রের মতন অত সযত্ন নয়, অর্থাৎ অনেক মুক্ত। শ্রীমতী লাহিড়ীর বর্ণক্ষেপণ পদ্ধতি এবং রেখাছন্দ যদি অন্য কোন ঐতিহ্যকে স্মরণ করায় তা হল আঁরি মাতিসের ঐতিহ্য। বস্তুত শ্রীমতী লাহিড়ী মাতিসের চৌহদ্দির বাইরে এক পা-ও বেরোননি।

—প্রণবরঞ্জন রায়

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি

সন্ধ্যা সেন

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, যাঁকে ডঃ রাধাকৃষ্ণান দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পৃথিবীর নানাদেশের রাষ্ট্রনেতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিভূদের কাছে পরিচিত করে দেবার সময় (বিশেষ অতিথিরূপে ছিলেন রাণী এলিজাবেথ) বলেছিলেন 'কুমারী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ইজ অ্যান আর্টিস্ট অফ গ্রেট ট্যালেন্টস হুজ সার্ভিসেস টু দি ক্ল্যাসিক্যাল ডান্স হ্যাভ বিন নোটেবল—'

এই নৃত্যশিল্পীর নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে লন্ডনের বিখ্যাত এক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন—'সি গিভস দিস এ্যানসিয়েন্ট এ্যান্ড হাইরেটিক আর্ট অ্যান ইমিডয়োসি এ্যান্ড এ বিউটি দ্যাট আর বেডিলি পারসেপটেবল'—সারা পৃথিবী তাঁর সৃষ্টির প্রশংসায় মুখর। ভারতের নানা অঞ্চল ও অন্যান্য মহাদেশের মন্তব্য পেশ করতে গেলে যামিনী কৃষ্ণমূর্তি সম্বন্ধে কিছু বলার অবকাশ পাওয়া যাবে না। শুধু দুটি মন্তব্যই উল্লেখ করলাম (একটি দার্শনিকের অপরটি বিদেশী সমালোচকের)—এই জন্য যে নিছক দেহসৌন্দর্যে অথবা ছন্দসুষমার বহিরংগ আকর্ষণে এঁদের আবেগ অবস্তুনির্ভর ভাবালুতায় হারাবার আশংকা নেই বলে।

রাধাকৃষ্ণান যামিনী কৃষ্ণমূর্তিকে শুধু প্রতিভাময়ীই বলেননি বলেছেন ক্লাসিক্যাল নৃত্যে তাঁর অবদান উল্লেখের যোগ্য।

নৃত্যশিল্পী আছেন অসংখ্য। লয়, তাল, মানে যাঁদের সাধনালব্ধ দক্ষতা মানুষকে বিস্মিত করবার মতই। কিন্তু নৃত্যের অন্তঃপুরের বার্তাটি 'সহৃদয়ে-হৃদয় সঞ্চারী' করে দিতে পারেন কোটিতে গোটিক শিল্পী যাঁরা বিধাতার দেওয়া সনন্দ নিয়ে এসেছেন। যামিনী কৃষ্ণমূর্তি সেই যুগচিহ্নিত শিল্পীদেরই একজন।— ভারত নাট্যমে তাঁর নিজস্ব অবদান কি, কোথায় কুচিপুরীর রংবাহারী মনোহারীতে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে নতুন কি রূপ দিয়েছেন সেই কথাটি জানবার

জন্য কান পেতেছি তাঁর নূপুরগুঞ্জিত ধ্বনিলোকে, ভাস্কর্য-সৌন্দর্যের নিশ্চল গতিরেখায়, দৃষ্টির ব্যঞ্জনায়।

যা পেয়েছিলাম আভাসে—তা স্পষ্ট হোলো শিল্পীর নিজের মুখের ভাষায়—'ভারতনাট্যম ইজ লিটারজিক্যাল এ্যান্ড ডিভোশ্যনাল; কুচিপুড়ী ইজ রোমান্টিক এ্যান্ড ওড়িসী ডান্স ইজ লিরিক্যাল এ্যান্ড ডেকরেটিভ।' ভারত নাট্যম পূজা পীঠের ভক্তিনত নৃত্য; কুচিপুরী প্রণয়বিহ্বল অভিসার আর ওড়িষী নৃত্য যেন অলংকৃত গীতিকাব্য।

শৈশব থেকে যে নৃত্য ছিলো স্বপ্নের মত মায়াময়ী যৌবনের মধ্যাহ্নে সেই নৃত্যের ধ্যান পৌঁছেছে আজ ধারনার সম্পূর্ণতায়। সেই পূর্ণতার প্রতিধ্বনিই যেন শোনা গেলো যামিনী কৃষ্ণমূর্তির ভাবগভীর কটি কথায়।

'আমার জন্ম মাদ্রাজে। আর সারা শৈশব কেটেছে চিদাম্বরম মন্দিরের একরকম প্রাঙ্গনেই। নৃত্য ও সংগীত ছিলো আমার রক্তে। হয়ত সেইজন্যই ভাল করে চেতনা জাগবার আগেই মন্দিরের গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্যমূর্তি আমায় টানত। মূর্তিগুলি সুন্দর বলেই নয়, প্রতিটি মূর্তিই অনন্য। ভাবে, ভাবনায় আর অনুভবেও। আমাদের দক্ষিণ দেশে পুজো হয় স্তোত্র গান দিয়েই। জানোত? পুজোর সময় গানের সংগে সংগে যখন আরতিদীপের শিখাগুলি থরথর করে কাঁপত সেই কম্পিত আলোয় মনে হোতো মূর্তিগুলি যেন নাচছে আর তার সংগে নেচে উঠছে মন্দিরের গায়ের অন্য মূর্তিরাও। মনে হোতো যেন দেবসভায় পৌঁছে গেছি। সেখানে শুধু নাচ আর নাচ। সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগত। আরতি থেমে যেতো কিন্তু থামত না আমার দেহের কাঁপন। আমার বাবা দার্শনিক মানুষ। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আমার মনের গতি। খুব আদর করে বলতেন—'তুমি সংসারের ঘরণী হবে না তোমায় হতে হবে মহাদেবের নৃত্য-সহচরী'—কথাগুলি আমার মর্মমূলে নাড়া দিয়েছিলো। আমি নাচের প্রেমেই পড়ে গেছি আর নটরাজের চরণে নিজেকে নিবেদন করে ফেলেছি চেতনার সেই উন্মেষলগ্নেই।

আমার খেলা ছিলো নাচ, চিন্তা ছিলো নাচ। ঘুমে-জাগরণে নাচই আমায় আচ্ছন্ন করে রাখত। সারা দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটত মন্দির-গাত্রের সেই নৃত্যসভায়। দেখতাম হাসি হতে পারে কত রকমের। নানান দেবমূর্তি। তাঁদের মুখে হাসি। কারো হাসি স্মিতসংহত। কারো হাসিতে রভসলীলায় হারিয়ে যাবার বিস্মৃতি। আবার কারো হাসিতে দেখতাম ধ্যানলীনতার প্রসন্নতা। কি হাসি? চাউনী? ভংগি? এসবের বৈচিত্র্যও বুঝি অন্তহীন। এইসব চাউনী, ভংগি ভাবের অনুকরণ করতে করতে অজ্ঞাতেই যেন এইসব মূর্তিগুলির সংগে একাত্ম হয়ে যেতাম।

আমার ভাবগতিক দেখে বাবা আর কালবিলম্ব না করে রুক্মিণী দেবীর কলা-ক্ষেত্রে আমায় ভর্তি করে দিলেন। ওখানের মেয়াদ শেষ করে গুরু এলাপ্পিলাই-এর কাছেও কোরিওগ্রাফির দীক্ষা নিয়েছি। ইনি বালাসরস্বতীর নৃত্যধারার শিল্পী।'

'একটা শুধু প্রশ্ন—ভারত নাট্যমে বালা সরস্বতী ও রুক্মিণী দেবী দুই ভিন্ন ধর্মী ব্যক্তিত্ব। দুজনের প্রকাশভংগী নৃত্য-চিন্তার ধর্ম আলাদা। একটা স্টাইলের শিক্ষায় অভ্যস্ত হওয়ার পর অন্যটিতে পদ-ক্ষেপ অনুভব অথবা নৃত্যভংগির জগতে কোনো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেনি?'

'ধরেছ। দ্বন্দ্বের সৃষ্টি যে একেবারেই করেনি এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তবে এ দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে উঠতে দেরী হয়নি। দুজনেই ভারত নাট্যমের সিদ্ধ-শিল্পী। তবে বালাসরস্বতী দেবদাসী বংশের। এ নৃত্যের ছন্দ শুধু তাঁর রক্তে নয়—মজ্জায়। আর রুক্মিনী দেবীর এ্যাপ্রোচ খুব স্কলারলি। একজনের নাচ সাগরের ঢেউ-এর স্বতঃস্ফূর্ত কল্লোল—ভাবের আবর্তন ঘটে দীপারতির মত। আর একজন নৃত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন সাধিকার দৃষ্টিতে, কান পেতে শুনতে চান তার ঐতিহ্যের স্পন্দন। আনন্দ ও জ্ঞান অনুভব ও প্রজ্ঞা খতিয়ে দেখতে গেলে এরা ত পরস্পরবিরোধী নয়। বরং পরস্পরের পরিপূরক। শিল্পীসত্ত্বা গড়ে তোলায় এ দুয়েরই দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন আছে।'

'সুন্দর বলেছেন। শিল্পীর যোগ্য কথা। এবার বলুন যা বলছিলেন—'

'চার বছরে কলাক্ষেত্রের শিক্ষা সমাপ্ত। ইতিমধ্যে নানা জায়গায় নৃত্যানুষ্ঠান করে চারদিকে একটু একটু নামডাকও হচ্ছিলো। কলেজের শিক্ষাও সমাপ্ত করে নিলাম। কারণ প্রতিটি রক্তকণায় তখন বাজছে মৃদংগের বোল। এমন সময় এলো যখন মনে হোলো আর সময় নেই। শুনতে পেলাম নটরাজের ভেরী, আর আমারও হোলো সাড়া দেয়া।'

আর একবার কথায় বাধা দেবার জন্য মাপ চাইছি।—শিক্ষাজীবনের সংগে সংগে মঞ্চজীবন সুরু করার ইতি-হাসও জানতে ইচ্ছে করছে।"

'ওঃ সিওর। প্রথম প্রথম স্কুলের নৃত্যনাট্যগুলিতে অংশ নিয়ে স্কুলে এবং বাইরেও বেশ কিছুটা নাম ও প্রতিষ্ঠা হোলো। এই প্রসংগেই মনে পড়ে কুমার-সম্ভবের কথা। ১৯৫৪ থেকে ৫৬ অব্দে মাদ্রাজের নানা সভায় অনুষ্ঠান করে যশের পরিধি বেড়ে গেলো। ১৯৫৮তে স্মরণীয় নৃত্যানুষ্ঠান রাষ্ট্রপতি ভবনে যার অন্য নাম ইণ্ডিয়ার হোয়াইট হাউস।'

'যে অনুষ্ঠানে অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের সংগে রাণী এলিজাবেথও উপস্থিত ছিলেন?'

'হ্যাঁ—সেই আমার নৃত্যজীবনে স্মরণীয় পটপরিবর্তন। স্বপ্ন যেন জীবনে এলো সত্য হয়ে। অনেক বিদগ্ধজন চিনলেন যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ও তাঁর ভারতনাট্যমকে। তারপর নেচেছি কোলকাতার ত্যাগরাজ হলে রসিকরঞ্জনী সভার অনুষ্ঠানে। সমালোচক ও রসিকসমাজের প্রশংসা এখানে পেলাম। তবে দর্শকদের বেশীর ভাগই দক্ষিণ-ভারতীয়। ব্যাপকভাবে সারা কোলকাতায় এবং ভারতেও শিল্পীখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হলাম ১৯৬২তে যখন জগদীশ চ্যাটার্জি (রবিশংকরজীর একাধারে কাজিন ব্রাদার ও সেক্রেটারী) আমায় একক নৃত্যে উপস্থিত করলেন সারা কোলকাতার রসিকসমাজে। এ ঋণ ভোলার নয়। তারপর ত কতবারই এসেছি কোলকাতায়। তানসেন সংগীত সম্মেলনে, বালিগঞ্জ মিউজিক কনফারেন্সে সনাতনবাবুর কনফারেন্সে।'

শতাধিক গীতিকবির পাঁচ শতাধিক আধুনিক গানের সংকলন
গীতিকার - পরিচিতিসহ

চার দশকের বাংলা গান ১৫৲

"সম্পাদক অরুণ সেন ও গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাংলা সংস্কৃতি ও সংগীত জগতের পক্ষে কল্যাণকর একটি যথার্থ প্রশংসনীয় কাজ করলেন।"
—নারায়ণ চৌধুরী (যুগান্তর, ৮-৯-৭৩)

আধুনিক গানের স্বরলিপি

গীতিকা ১ম খণ্ড ৪-০০ | গীতি-প্রতিমা ৬-০০

প্রকাশ ভারতী ১৩, রামধন মিত্র লেন, কলি-৪

'হ্যাঁ আমারও মনে পড়ছে তোমার নাচ প্রথম দেখেছি বালিগঞ্জ কনফারেন্সেই। কিন্তু ভারতনাট্যমের সঙ্গে কুচিপুরী দেখেছিলাম এ্যান্ড ইফ আই অ্যাম নট মিসটেকেন—ওরিষী নাচও।'

'রাইট আর ইউ। দিল্লীর অনুষ্ঠানের পর আমি কুচিপুরি গেলাম কুচিপুরী নাচ শিখতে। এ নাচ আমায় আকৃষ্ট করেছিলো এর রোমান্টিক আইডিয়ার জন্য। কুচিপুরী নৃত্যের আর এক আকর্ষণ এর বিদ্যুৎগতির আবেদন। এ যেন আলোর মত সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। মনোহর অভিব্যক্তি, পেলব মধুর দেহভঙ্গী, পদক্ষেপ সব মিলিয়ে যেন আমায় পাগল করে দিলো। আর ভারতনাট্যম শেখা ছিলো বলেই কুচিপুরী নৃত্য তুলে নিতে আমার দেরী হয়নি।'

'কুচিপুরী নৃত্যকে ত আপনিই গ্রাম থেকে মঞ্চে এনেছেন—যেমন ইন্দ্রাণী রহমান রসিকসমাজকে পরিচিত করেছেন ওড়িষী নৃত্যের আশ্চর্য রূপের সঙ্গে?'

'ঠিক তাই। তারপর যা বলছিলাম। কুচিপুরী নৃত্যের একাধারে শিল্পী গুরু ও অথরিটি ছিলেন বেদান্তম লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা। আমি শিখেছিলাম গুরু লক্ষণ শাস্ত্রীর কাছে। তাল, নৃত্য, ঐতিহ্য-গীতি-কাব্যিক সৌন্দর্য সব মিলিয়ে সঙ্গীত কুচিপুরী পুরোপুরিই ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য। এই নৃত্যকে আয়ত্ত করে যেদিন আমার নিজের নৃত্যভাষায় এর রূপান্তর ঘটালাম, সকলের দৃষ্টিপথে আনলাম এই নৃত্যের অন্তহীন সম্ভাবনা, নৃত্যশিল্পীর পক্ষে আপনাকে প্রকাশ করবার মত বিরাট ব্যাপ্তি—তখন মনে হোলো আমি সার্থক। অচেনা লোকের দ্বীপান্তরে যে শিল্প নির্বাসিত ছিলো বন্দিনী সীতার মত তার বন্ধনদশা মোচন করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে আমি শিল্পীর কর্তব্য কিছুটা পালন করতে পেরেছি ত।

ওড়িষী নৃত্য শিখেছি পঙ্কজ দাসের কাছে। ওড়িষী নৃত্যের ভাস্কর্য সৌন্দর্যের সঙ্গে গীতগোবিন্দের কান্তকোমল পদলালিত্য মিশে নৃত্যে এমন এক আবেগ সৃষ্টি করেছে যে যে-কোনো দেশের মানুষ মুগ্ধ হয়। না হয়ে পারে না বলে।

তবে কুচিপুরী ওড়িষী ভারতনাট্যম সকল নৃত্যেরই জাতি এক তফাৎ শুধু প্রকাশভঙ্গীর। বিষয়বস্তু একই। সেই কৃষ্ণ ও রাধার চিরন্তন প্রেম, বিরহ ও মিলন।'

'এবার বলুন ভারতনাট্যম কুচিপুরী অথবা ওড়িষী নৃত্যে আপনার নিজস্ব সৃষ্টি কি? কোন দিকটিতে আপনি জোর দিয়েছেন বেশী।'

'দেখ সাধক গীতিকারদের সঙ্গীত রচনার মধ্যেই যেন আমি এই বিরাট শিল্পকে দেখতে পেলাম। আমার সৃষ্টি কি? আমার নিজের নানান ধ্যান, ধারণা, কল্পনাকে আমি ভারতনাট্যমের আঙ্গিকেই রূপ দিয়েছি এ নৃত্যের ট্রেডিশনকে অক্ষুণ্ণ রেখে। অন্যভাবে বলা যায় চলমান চিন্তার ধারাকে প্রকাশ করেছি চিরন্তনের মর্যাদা-মণ্ডিত আধারে। এর আঙ্গিকের নকসা তথা ডাইমেনশ্যনাল ঐশ্বর্যকে নৃত্য, সঙ্গীত ও ছন্দের রেখায় ও সুরে উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছি। যেমন ধর আমি দেখাই রামায়ণ। এখানে আমি একাই একাধারে রাম রাবণ সীতা লক্ষ্মণ, আরো অসংখ্য চরিত্রের বিভিন্ন একসপ্রেশনকে রূপ দিই।'

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি পদ্মশ্রী পেয়েছেন কয়েক বছর আগে। তারও আগে ইনি অর্জন করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। বহু আন্তর্জাতিক উৎসবে ভারতীয় নৃত্য-শিল্পের প্রতিনিধিরূপে ইনি ভারতীয় নৃত্যের উন্নতমানের মর্যাদা রেখেছেন। ১৯৬৫তে ফার্স্ট কমনওয়েলথ আর্টস ফেস্টিভেলে যোগ দিতে গেছেন ইউনাইটেড কিংডাম। গেছেন নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া, বার্মা, ইউরোপের নানা দেশ এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ। লন্ডনে 'দি সানডে টাইমস' যামিনী কৃষ্ণমূর্তিকে অকৃপণভাবে অভিনন্দিত করেছেন। 'ইন্ডাকটিভ এ্যান্ড গড- লাইক যামিনী ইজ এ ওয়ান্ডারফুল ডান্সার, স্ট্রং, সাটল সিনুয়াস'। এ ছাড়া কানাডা (১৯৬৭) মস্কো, জার্মান, ফ্রান্সও জয় করে এসেছেন।

'ওদেশের নাচের ফর্ম ও শিল্পচিন্তার বৈশিষ্ট্য কি?'

'ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পচিন্তার অনেক মিল আছে। ওরা স্পর্শকাতর, সেন্সিটিভ, এস্থেটিক এবং সূক্ষ্ম শিল্পবোধসম্পন্ন।

জার্মানরা বেশী জোর দিয়ে থাকেন আঙ্গিকের উৎকর্ষ ও পান্ডিত্যের প্রতি।

লন্ডনের ব্যালে উন্নতমানের। মুভমেন্টসের ভারসাম্য, কঠিন ধাঁচের ভঙ্গিমা, টেকনিকের দৃঢ়বদ্ধতা। নৃত্যশিল্পীরা জীবনের সব ছেড়ে শুধু নাচে আত্মনিয়োগ না করলে এটা সম্ভব হয় না। এবং এ বিষয়ে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

'আপনি তো প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। সকল দেশের বিদগ্ধ-সমাজ আপনার সৃষ্টির বন্দনায় মুখর। কিন্তু আপনি কোথায় নেচে আনন্দ পেয়েছেন?'

'অফ কোর্স ইন্ডিয়া। কারণ এখানের দর্শকবৃন্দ ভারতনাট্যম অথবা যে কোনো নৃত্যের ফিলসফির সঙ্গে পরিচিত। তাই নাচ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করতে পারি দর্শকদের উপলব্ধি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অন্যান্য দেশে কি হয় জান? ভারতীয় নৃত্যের নানা দিক আছে ত? বহিরঙ্গ রূপসৃষ্টি নানা রাগ ও তালের গান-সঙ্গত, জমকালো সাজসজ্জা, মুভমেন্টসের বৈচিত্র্য—তথা এনটারটেনমেন্টসের দিকটি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। ভাবের গুরুত্ব বোঝেন না কি? বোঝেন। তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন। অন্য সবাই চাউনীর গভীরতা অভিব্যক্তির রকমারী প্রকাশ দেখে বোঝেন যে একটা কিছু চলছে। কিন্তু সেটা কি অত ডিটেলসএ বোঝেন না। তবে কি জান? ভারতীয় নৃত্যের এমন একটা বস্তু আছে যাকে বলা যায় সোলফিলিং—এ বস্তু আত্মাকে পূর্ণতার অভিসারী করে। প্রতিটি নৃত্যে লাস্য, কৌতুক, বেদনা সবই আছে কিন্তু মানবিক অনুভবের সীমা পেরিয়ে এটা পৌঁছেছে অনন্তের চরণে। আমাদের মান-অভিমান হাসি-কান্না সবই ত দেবতার সঙ্গে। শিল্পীর দেহের খাঁচায় বন্দী আত্মা পাখির মত ডানা ঝাপটাচ্ছে মুক্তি পাবার জন্য। এই মুক্তিতৃষার আনন্দ বেদনার চরম প্রকাশ আমাদেরই শিল্পে। এই কথাটির আভাস ওরা পায় আমাদের নাচে, গানে। আর এই অন্তরমুখীন শিল্পের ডাকে অজান্তেই ওদের চিত্ত দুলে ওঠে।

'এই অনামা তত্ত্বকেই দিলীপ রায় তাঁর অনন্যকরণীয় অভিব্যক্তিতে রূপ দিয়েছেন

গুপ্তের লেডিস্ ডায়েরী ১৯৭৫

আধুনিক, সুচারু এবং ভেনিটি ব্যাগে রাখার উপযোগী।

৪-২ ইঞ্চি ব্যাস, দুই রং-এ ছাপা ও স্পাইয়াল বাঁধাই। পার্স ও পকেটযুক্ত নানা রং স্ক্রীন-প্রিন্ট মোটা প্লাস্টিক কভারে আবৃত।
মূল্য প্রতি কপি ৬ টাঃ, ডাকমাশুল ও সেলস ট্যাক্স অতিরিক্ত।

গুপ্তের ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, প্ল্যানটারস্, টিম্বারম্যানস্ প্রভৃতি ডায়েরীও পাইবেন।

কথ-কথা ১।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৪৬২২

বিঃ দ্রঃ পাইকারীদের আকর্ষণীয় কমিশন দেওয়া হয়।

একটি গানে। তার একটি চরণ হোলো 'না জেনেও জানে সে আঁধারে উষাও নিশার অভিসারী, দিশাও তৃষার অভিসারী, সুধাও ক্ষুধার অভিসারী।'

ওয়াণ্ডারফুল। ভারতীয় সাধক ছাড়া এভাবে কেউ চিন্তা করতে পারেন? ভারতের শিল্প ও সাধনা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বালা সারস্বতী আমার এত প্রিয় কেন জান? এই স্পিরিচুয়ালিটি ও'র নাচে যেমনভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে এমন আর কারো নাচে নয়। আমি যখন স্টেজে এলাম রুক্মিণী দেবী তখন রিটায়ার করছেন। কিন্তু ও'র কম্পোজিশন বড় সুন্দর আর খুব হারমোনাইজড়।

আর উদয়শঙ্কর? কাগজে দেখেছি কানন দেবী উদয়শঙ্কর সম্বর্ধনায় বলেছিলেন, 'উদয়শঙ্কর হলেন নৃত্যের ভগবান' —এ কথায় আমার মনও খুব সায় দেয়। উদয়শঙ্কর নৃত্যলোকে একমেবাদ্বিতীয়ম ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় নৃত্যকে শিল্পমর্যাদায় তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে কোনো নৃত্যশিল্পীর কাছে উনি ভগবান। নৃত্যের এমন অনন্ত বিস্তার প্রতিদিনের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা থেকে আত্মার ঊর্ধ্বমুখী তৃষাকে নৃত্যের বিষয়বস্তু করা যায়, এ সত্য সম্বন্ধে তিনিই আমাদের সচেতন করেছেন। এমন ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট ভারতে ত নেই-ই সারা পৃথিবীতে কটা আছে সন্দেহ।'

'আপনার এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কি নৃত্য থেকেই পাওয়া?'

'নিশ্চয়ই। তবে নৃত্যের মধ্যে ফিলসফিকে খুঁজে নেবার দীক্ষা পেয়েছি আমার বাবা জে. কৃষ্ণমূর্তির কাছে। তিনি মস্তবড় দার্শনিক ও পণ্ডিত।'

আপনার নাচের আগে তাঁর ইনট্রোডাকশনেই একথা বোঝা যায়। আর একটা কথা। শিল্পকে জীবনের ব্রত করতে পারেন কারা? যাঁরা অসংসারী কারণ শিল্পলক্ষ্মী ঈর্ষাপরায়ণ কারো সঙ্গে ভাগাভাগিতে রাজী নন। বললাম—প্রশ্নের ভঙ্গীতেই।

রাইট।

'কিন্তু অর্থসমস্যাও একটা বড় জিনিস নয় কি?'

'অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা একটা বড় ফ্যাক্টর নিশ্চয়ই। বাট ইট ডিপেণ্ডস অলসো অন দি পার্সন—হাউ মাচ হি অর সি ক্যান স্ট্যাণ্ড। তবে আবার বলছি বাংলাদেশের অডিয়েন্সই সবচেয়ে এনলাইটেণ্ড—কারণ কসমোপলিটান সিটি হলেও খাঁটি ভারতীয় মনোভাব বাংলাদেশের তথা কোলকাতার শিল্পরসিকদের মধ্যেই বিদ্যমান। অবশ্য এর জন্য উদয়শঙ্করের অবদানের কাছেই আমরা ঋণী।' এই অবধি হোলো যামিনী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে ১৯৬৯ সালের ইণ্টারভ্যুর বিবরণ।

সম্প্রতি তিনি কোলকাতায় আসতে অনেকক্ষণ আলোচনা হোলো। দেখলাম অনেক বিষয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটেছে।

বর্তমান নৃত্য ও সঙ্গীতের ধারা প্রসঙ্গে শ্রীমতী কৃষ্ণমূর্তির মত হোলো গ্রামে তবু নৃত্যের ধারা অন্তত নিজস্ব মৌলিকতা বজায় রেখেছে। কিন্তু (কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে) শহরের নাচে ফিল্মের হাল্কা নাচের ছোঁয়া লেগে এর মর্যাদা ও গাম্ভীর্য অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রতিভাসমৃদ্ধ নৃত্যদক্ষ শিল্পীর সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তাঁরা কেউই গ্রেট পারসোনালিটি হয়ে উঠতে পারছেন না। কারণ একটু শিখেই মঞ্চে নেমে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হোলো কোনো ফিল্মে নামা অথবা ফিল্মে নৃত্যের পরিচালক হওয়া। যা শিখেছেন চর্চার অভাবে তার ক্ল্যাসিক্যাল ক্যারেকটার ডিস্টার্ড করছে আর কল্পনা রিক্ততার কারণে এসব নাচ দর্শকচিত্তে দীর্ঘস্থায়ী কোনো ইমেজ সৃষ্টি করতে পারছে না। আবার বলছি সৃষ্টিশীল শিল্পীরূপে আজও আমার আদর্শ উদয়শঙ্কর, বালা সরস্বতী ও শম্ভু রাও।'

'আপনার শিল্পীজীবন নিয়ে আপনি সুখী ত? প্রশ্ন করি।

'হ্যাপিনেস ইজ এ বিগ টার্ম। ইট ডিপেনডস আপন দি মেণ্টাল অ্যাটিচিউড অফ এ পার্সন। দেখ সুখ একটা মস্তবড় কথা। এটা নির্ভর করে শিল্পীর মানসিকতার ওপর'—গম্ভীরভাবে বললেন শ্রীমতী ভদ্রে! এটা কি এড়িয়ে যাওয়া কথা নয়? আপনার মানসিকতাটা কোন দিকে সেইটেই যে জানতে চাইছি'—চেপে ধরলাম।

এবার হেসে ফেললেন যামিনী—আর সে হাসিতে অজানা যামিনীও আলোকিত হোলো 'আমার মত সামান্য একটা মানুষ গতানুগতিক পথের বিপ্লবী হয়ে অচেনার অভিসারে যাত্রা করেছে—একথা বললে কি ছোট মুখে বড় কথা বলা হয় না? সবাই বলেন, আমি বিবাহ করিনি। জীবনের একটা দিক অসম্পূর্ণ ইত্যাদি।'

'আপনার মনের গাঁটছড়া ত নটরাজের সঙ্গেই বাঁধা হয়ে গেছে জ্ঞান হবার আগেই। তাঁর সঙ্গে ঘর করতে করতেই আপনি পূর্ণ থেকে পূর্ণতরর দিকে এগোচ্ছেন।'

'থ্যাংক ইউ। তোমার মনটা বড় আর্টিস্টিক। তাই শিল্পীর মনটি তুমি উপলব্ধি করতে পার। আর সেইজন্যই ত বারবার তোমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে এত ভালো লাগে। মনে হয় এ যেন নিজের মনটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা। আমার বেদনা জাগে কখন জান? যখন দেখি ভারতীয় নৃত্যে ফিলসফির দিকটিই অবহেলিত হচ্ছে। সামথিং মোর ইজ ওয়ানটিং—বিকজ ইট ইজ বিকামিং শ্যালো'। যামিনী হাসলেন—বিষণ্ণ হাসি।

যামিনীর নৃত্য প্রথম দেখেছিলাম ১৯৬৪তে তারপর ১৯৭০এ-৭৩এ এবং কমাস আগে কলাসংগমে।

প্রথমের দিকে বিভিন্ন তালে ছন্দায়িত পদক্ষেপ, দেহসৌন্দর্যের কাব্যময়তা, আবেগ-নিবিড় রোমান্স প্রেমবেদনার উচ্ছল ব্যঞ্জনা শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও পরিশীলিত শিল্পবোধের সঙ্গে মিলে যেন এক আশ্চর্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছিলো। সৌন্দর্যময়ীর এর চেয়ে সার্থক পরিণতি ভাবা যায় না।

এখন দেখলাম পদম-এ নটরাজের সৃষ্টি, স্থিতি সংহারের লীলা। একই অঙ্গে যেন লক্ষ লক্ষ ভাব ও রূপের অবিরাম আবর্তন ঘটছে। আগের দ্রুতলয় এখন কিছু বিলম্বিত। কিন্তু ভাবনায় ভারী হয়ে আসা স্থির ভঙ্গি, ঊর্ধ্বদৃষ্টি নিমীলিত ধ্যান নেত্র মনে করিয়ে দিলো যামিনী কৃষ্ণমূর্তি শুধু গ্রেয়িংই নন। ডাইনামিক পার্সোনালিটিও।

রামমোহন প্রচার সভা প্রকাশিত

আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্রুবনক্ষত্র রাজা রামমোহন। সূর্যকে বাদ দিয়ে যেমন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই, তেমনি রামমোহনকে বাদ দিয়ে আধুনিক ভারতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। একাধারে যিনি ছিলেন ভারত-পথিক ও বিশ্ব-পথিক, সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি রাধানগরকে বাদ দিয়ে রামমোহন চর্চা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এতকাল পরে সেই রাধানগরকে রামমোহন জীবনের পটভূমিকারূপে বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করা হল।

কল্যাণ ব্রহ্মচারী প্রণীত

ভারত পথিক রামমোহন ও রাধানগর

রাধানগরের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সম্বলিত ও একুশখানি হাফটোন চিত্র পরিশোভিত এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক শিক্ষায়তন, গ্রন্থাগার ও রামমোহন অনুরাগীদের পক্ষে অপরিহার্য। মূল্য : দশ টাকা।

পরিবেষক : জিজ্ঞাসা

৩৩, কলেজ রো, কলি—৯ ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা—২৯

সেকালের সঙ্গীতগুণী

বুলবুল না অর্ধনারীশ্বর ?

সেই চন্দননগরের জলসা থেকেই আরম্ভ করা যায়।

অনাথবাবুর সংগীতজীবনের প্রথম দিকের কথা। একই সঙ্গে তখন চলেছে তাঁর গান আর তবলার চর্চা। লছমী ওস্তাদের কাছে দুয়েরই তালিম নিচ্ছেন। গান, তবলা দুয়েরই আসর করছেন কলকাতায়। নাম-করা ওস্তাদদের সঙ্গে বাজাচ্ছেন। তাঁর তবলা সঙ্গতে সকলেই সন্তুষ্ট। সরোদী আমীর খাঁ ত তাঁকেই আসরে পেতে চান বেশি। তাঁর মধ্য লয়ের জমাটি বন্দিশের সঙ্গে অনাথবাবুর বাজনা তাঁর ভারি পছন্দ।

সেই সময়কার কথা। অনাথবাবু তখনো রায়গড় দরবারে যোগ দেননি। বয়স হবে ২৪।২৫ বছর। অর্থাৎ এখন থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি। ১৯২১।২২ সালের কথা।

চন্দননগরের পালপাড়া। সেখানকার শীল পরিবার ছিলেন ধনী এবং সংগীতের সখ্‌দার। মুজরো দিয়ে ভাল ভাল কলাবৎ-দের চন্দননগরের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। আসর বসাতেন তাঁদের সাজানো বিরাট হল-ঘরে। তাছাড়া এ-বাড়ির বীরেন্দ্রনাথ যন্ত্র-সংগীতের চর্চা করতেন। বীরেন্দ্রনাথের পিতা গানবাজনা ভালবাসতেন। এজন্যে ঘরোয়া হলেও বেশ ভাল আসর হত এখানে।

সেবারও এমনি একটি জলসার আয়োজন হয়েছিল। কলকাতা থেকে শীল-বাড়িতে গিয়েছিলেন কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী। সরোদী আমীর খাঁ, সেতারী এনায়েৎ খাঁ সারেঙ্গী ছোটে খাঁ সেতার-সুরবাহারী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল—এই ক'জন যন্ত্রী। আর গায়কদের মধ্যে শুধু অনাথনাথ বসু। দ্বৈতকণ্ঠের গানের জন্যে তখনই তাঁর বেশ নামডাক হয়েছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। তাঁরা সকলে বসেছেন জলসাঘরে। স্থানীয় দু'একজন গায়ক-বাদকও এসেছেন। হল শ্রোতায় পূর্ণ। আসর আরম্ভ করলেই হয় এখন।

কিন্তু একটা বাধা পড়েছে। শিল্পীদের মধ্যে বিশিষ্ট একজনই অনুপস্থিত। প্রধান তবলাবাদক এখনো এসে পৌঁছননি। তাঁর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন গৃহকর্তা, বীরেন্দ্রনাথের পিতা। সব শিল্পীরাও অপেক্ষা করছেন। আর শ্রোতারা অধৈর্য হয়ে উঠছেন। কিন্তু এখনো দেখা নেই তাঁর।

এমনি ভাবে কাটল আরো কিছুক্ষণ। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে? বেশ রাত হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত লজ্জিত অপ্রস্তুত বোধ করছেন বীরেন্দ্রনাথের পিতা। অথচ নিরুপায়।

তখন অনাথবাবু তাঁকে আলাদা ডেকে বললেন, 'আপনি মন খারাপ করবেন না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

গৃহস্বামী তখনো ভরসা পাচ্ছিলেন না।

'কি হবে? আমি ত কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। এত দেরী হয়ে গেছে যখন আর তাঁকে পাওয়া যাবে না। সন্ধ্যের আগেই তাঁর আসবার কথা ছিল।'

অনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানকার কোন তবলচী পাওয়া যাবে না?'

'তা পাওয়া যাবে না কেন? তবলা বাজিয়ে ত এই আসরেই রয়েছে, চন্দন-নগরের লোক। কিন্তু সে এত বড় ওস্তাদ-

অনাথ বসু

দের সঙ্গে বাজাতে সাহস করবে না। আর পারবেও না। এঁরা সবাই যন্ত্রী। এঁদের সঙ্গে বাজাবার মতন কেউ আমাদের জানা নেই।'

'আচ্ছা আমার গানের সঙ্গে বাজাতে কাউকে পাওয়া যাবে এখানে? শুধু ঠেকা দিতে পারলেই হবে।'

'তা হতে পারে।' বলে একজনকে অনাথবাবুর সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন।

'তাহলে আমি আগে একটু গেয়ে নিই।'

বলে অনাথবাবু আসর পত্তন করলেন।

প্রথমে ধরলেন একটি খেয়াল। তারপর সেই মিহি কণ্ঠে শোনালেন ঠুংরি। প্রথম গান থেকেই আসর জমে গেল। আর তাঁর দ্বৈতকণ্ঠের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল শ্রোতাদের।

গানের আসরের পর কিছুক্ষণের বিরতি। তারপর আবার আসর আরম্ভ হল।

অনাথবাবু এবার তবলা নিয়ে বসলেন। এবার শুধুই যন্ত্রসংগীত। রাত তখন দশটা বেজে গেছে।

আসরে এসেছেন তখনকার ক'জন শ্রেষ্ঠ বাদক। পাশাপাশি তাঁদের বাজনা শোনা যাবে—এ বড় কম সুযোগ নয়। এতক্ষণ যাঁদের জন্যে সবাই অপেক্ষা করে বসেছিলেন, এবার তাঁরা আশা পূরণ করলেন। শ্রোতাদের এ এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

এনায়েৎ খাঁর সেতার। আমীর খাঁর সরোদ। হরেন্দ্রকৃষ্ণের সেতার। ছোটে খাঁর সারঙ্গ। পরম আনন্দে শুনতে লাগলেন শ্রোতারা।

পর পর চার গুণীর বাজনায় সারারাত চলে গেল। তাঁদের সঙ্গে একদমে সঙ্গত করে গেলেন অনাথনাথ। তাঁরা একেকজন বাজাবার পর বিশ্রাম করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি অবিশ্রান্ত অক্লান্ত। আর নিছক ঠেকা দেয়া নয়। সেকালের ক'জন শ্রেষ্ঠ কলাকারের যোগ্য তবলাবাদন।

প্রত্যেক যন্ত্রীই খুসী হলেন তাঁর সঙ্গতে। তাঁরা সকলেই ত তাঁকে তবলা-বাদক বলে জানতেন। তাঁর সঙ্গে বাজিয়ে-ছেনও কলকাতার আসরে। সেজন্যে কোন অসুবিধাই তাঁদের হয়নি এখানে। বেশ মেজাজেই তাঁরা বাজিয়ে গেলেন।

আসর শেষ হল সকাল সাতটায়।

ওস্তাদদের তারিফ, শ্রোতাদের প্রশংসা আর গৃহস্বামীদের কৃতজ্ঞতায় সার্থক হলেন অনাথবাবু।

সেসব কি গৌরবের দিনই তাঁর গেছে। শুধু একেকটি এমন নাটকীয় আসর নয়, নিয়মিত, প্রথম শ্রেণীর কত আসরে বাজনা।

তখনকার কলকাতার দুটি বার্ষিক সম্মেলন—শঙ্কর উৎসব ও মুরারি সম্মেলন। সেসব বিরাট আসরেও তিনি তবলা সঙ্গত করেছেন নানা ওস্তাদদের গানবাজনায়। আসরে আসরে আর সেই দুটি সম্মেলনে যাঁদের সঙ্গে বাজিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সরোদী করামতুল্লা খাঁ, সেতারী এনায়েৎ খাঁ নানারীতির গায়ক (বাদকও) পশুপতিসেবক মিশ্র ও শিবসেবক মিশ্র, সরোদী আমীর খাঁ, সারঙ্গী ছোটে খাঁ, সারঙ্গী গৌরীশঙ্কর মিশ্র, খেয়াল ঠুংরি দাদরা গায়ক জমিরুদ্দিন খাঁ—তখনকার এমনি শ্রেষ্ঠ গুণীরা।

আমীর খাঁ ও ছোটে খাঁর যে গ্রামোফোন রেকর্ড আছে সেখানেও সঙ্গত করেছেন অনাথনাথ।

সেসময় কলকাতায় তাঁর গানের চেয়ে তবলায় নাম কিছু কম ছিল না। আর গানের

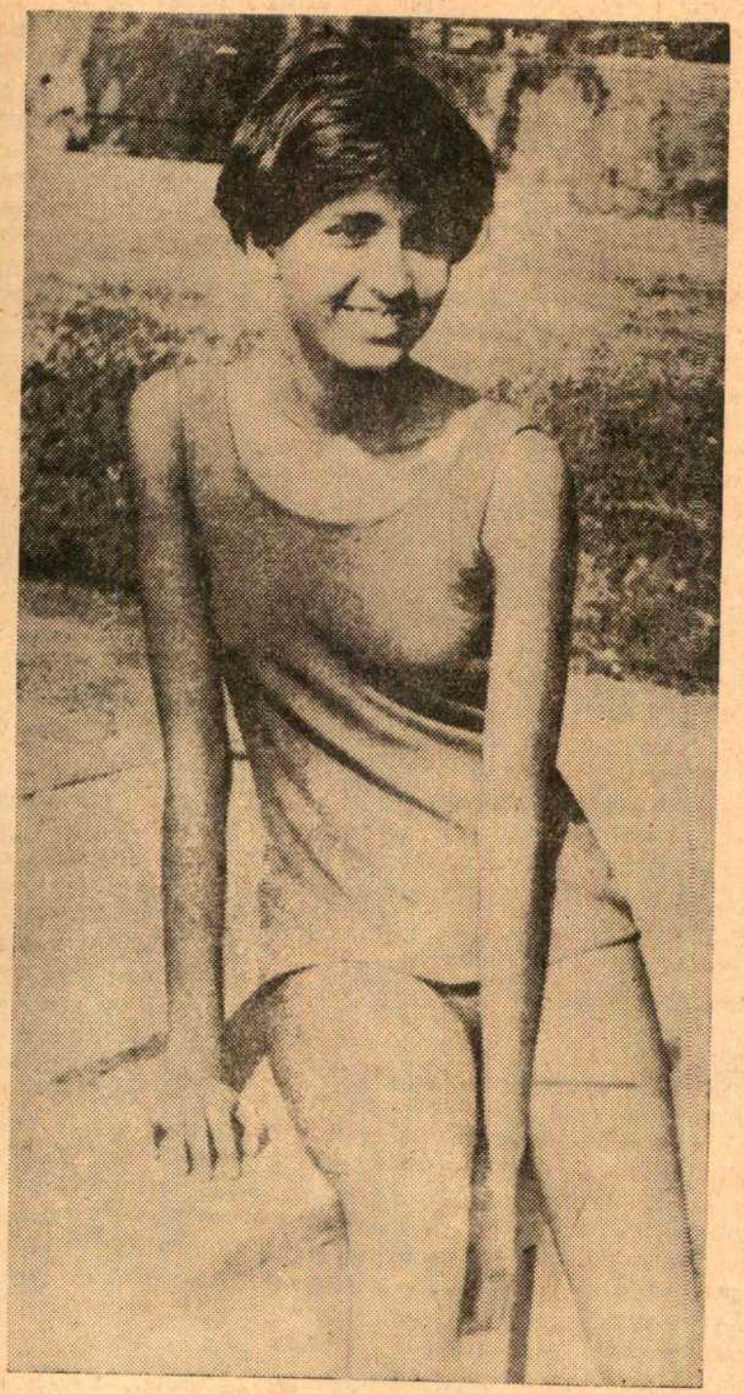

খেলার জগতে মেয়ে

স্কুলের সাঁতারু লোপামুদ্রা রায়

—তুমি ঠিক কবে থেকে সাঁতার কাটতে সুরু করলে?

—চার বছর আগে—১৯৭১ সালে। সেই বছরই বহুবাজার ব্যায়াম সমিতির প্রতিযোগিতামূলক আসরে যোগ দেয় লোপামুদ্রা। ঐ আসরে আর এক কিশোরী সাঁতারু অবন্তী গাঙ্গুলী প্রথম হয়। লোপামুদ্রা সাঁতারু মহলের নজর কাড়ে ১৯৭২-এ ক্যালকাটা স্পোর্টসের আয়োজিত এক মাইল সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করার সূত্রে। এর আগেও পরে শহরের নানা কেন্দ্রে আয়োজিত ক্লাব-সাঁতার প্রতিযোগিতার আসরে ছোটদের বিভাগে ফ্রি স্টাইল সাঁতারে এই ছোট্ট সপ্রতিভ মেয়েটি বেশ কিছু পদক সংগ্রহ করে আস্তে আস্তে স্কুল সাঁতারে প্রতিনিধিত্ব করার কুশলতা আয়ত্ত করে।

লোপার আর এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল—এবছর রাজ্যের বাছাই নির্ধারণের প্রতিযোগিতায় সিনিয়ার বিভাগে একশ দুশ এবং চারশ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে রাজ্যের সর্বভারতীয় কৃতি সাঁতারু নাফিসা আলীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে শেষ দুটি বিভাগে দ্বিতীয় ও প্রথমটিতে (অর্থাৎ একশ মিটারে) তৃতীয় স্থান লাভ করে। বলা বাহুল্য, নাফিসাই তিনটি বিভাগে বিজয়িনী হয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, লোপা তুলনায় খুব কম সময়ে সাঁতারে রপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রশ্নের উত্তরে ও বলে, 'আমার প্রশিক্ষক বেণীমাধব তালুকদার এবং নারায়ণ কুণ্ডুর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে আমি উৎসাহ পাই। প্রধানতঃ বেণী তালুকদারের দ্বারাই লোপা সাঁতারে অনুপ্রাণিত হয়েছে। একথা ও স্বীকারও করে শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই

সঙ্গে আছে ওর মার সস্নেহ লালন আর বাবার উৎসাহ। সে কথা পরে। আগে লোপার উন্নতির পর্যায় বলে নিই। ১৯৭৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং সেন্টারে অর্থাৎ সুভাষ সরোবর জলাধারে আয়োজিত রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতায় চোদ্দ বছরের অনূর্ধ বিভাগে এই কিশোরী একশ ও দুশ মিটার ফ্রি স্টাইলে রাজ্য রেকর্ড স্লান করে। ঐ বছর ঐ বয়ঃসীমা বিভাগে লোপা ক্লাব পর্যায়ের আসরে একশ মিটার ফ্রি স্টাইলে ১৯৬৯ সালে অনন্যা সেনের গড়া রেকর্ডও স্লান করে। জয়পুরে আয়োজিত জাতীয় সাঁতারের আসরে ও একশ মিটার (১৪ বছরের অনূর্ধ বিভাগে) ফ্রি স্টাইলে তৃতীয় স্থান পেলেও একশ মিটার রিলে সাঁতারে বাংলা দলের শীর্ষস্থান লাভে লোপার ভূমিকা স্বীকার করতেই হয়। '৭৩-এ ইন্দোরে আয়োজিত স্কুল ক্রীড়ার আসরেও লোপা বাংলা দলে স্থান পেয়েছিল, কিন্তু জয়পুরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দুর্ভাগ্যক্রমে লোপাকে ইন্দোরে অনুপস্থিত থাকতে হয়।

১৯৭৪-এ অর্থাৎ এবছর রাজ্য প্রতিযোগিতায় চোদ্দ বছরের অনূর্ধ বিভাগে লোপা একশ, দুশ ও চারশ মিটার ফ্রি স্টাইলে শীর্ষস্থান দখল করে। এ বছর রাজ্য স্কুল সাঁতারেও লোপা দুশ মিটার ফ্রি স্টাইলে রেকর্ড করে আর একশ মিটারে হয় দ্বিতীয়। এর আগে জেলা এবং আঞ্চলিক স্কুলের আসরেও প্রথম স্থান অধিকার করে লোপাই। এবার আগ্রায় আয়োজিত সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ায় বাংলার সাঁতারু দলে ঝুমা দে (অধঃ) অবন্তী গাঙ্গুলী, মৌসুমী রায় যূথিকা পাল এবং কেকা ঘোষের সঙ্গে লোপাও স্বাভাবিক কারণেই স্থান পায়। বাংলার মেয়ে সাঁতারুরাই এবার দলগত বিজয়ীর আখ্যা অর্জন করেছে। এই আসরেও বাংলার হিলে দল ৪×৪ একশ কিঃ মিঃ ফ্রি স্টাইল বিজয়ী হয়। লোপাও রিলেতে ছিল।

লোপামুদ্রা শিয়ালদহের লোরেটো ডে স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষা পাচ্ছে। ওর মা জানালেন, প্রায় প্রতি বছরই ক্লাসে প্রথম-দ্বিতীয় হয়, ওর পড়াশোনার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ চিন্তা নেই। নিজেই পড়াশোনা সময়মত সেরে রাখে। তবে পড়াশোনার চাপ তো কম নয়! তারওপর সাঁতারের জন্যে বাইরেও যেতে হয়—স্কুল কামাই হয়—তাই চিন্তা হয়। লোপা বলে স্কুলের টীচাররা কিন্তু আমাকে সাঁতারের জন্য খুব উৎসাহ দেন। লোপার বাবা—সুভাষ সরোবরের সহকারী ইঞ্জিনীয়ার—রমেন রায় বলেন, দেখছেন তো সাঁতারের জলাধার আমার বাড়ীর গায়েই। সুতরাং ওর পক্ষে নিয়মিত অনুশীলনের সমস্যা নেই। আর এই শহরে একমাত্র ফোর্ট উইলিয়ামের জলাধার বাদ দিলে এই সুভাষ সরোবর ছাড়া অন্য কোথাও আন্তর্জাতিক মাপের ৫০ মিটার দৈর্ঘের জলাধার নেই। উপরন্তু এর জলও পরিশ্রুত। এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং সেন্টারের পরিচালনায় সাঁতার প্রশিক্ষণ চলে। মেয়েকে ভাল সাঁতারু করার আকাঙ্ক্ষা আমারি কি কম, তবে ওর মা-ই মেয়ের সব কিছু সুখ-সুবিধার ওপর নজর রাখে।

শ্রীরায়ের আদিবাড়ী ঢাকা। সেখানকার মানুষ জলকে ভালবাসবে এ আর বেশী কথা কি?

লোপা বলে, এখানকার পুলে অনুশীলনের অভ্যাস করার ফলে অন্য পুলে সাঁতার কাটতে অসুবিধা হয়—ওসব জায়গার জল ভারী, আর বড্ড নোংরা, শ্যাওলাও খুব।

আগ্রায় এবার স্কুল সাঁতারের আসর হয়েছিল ২৫ মিটার পুলে। সত্যিই অবাক কাণ্ড। বারবার সাঁতার কেটে ঘুরবার সময় মাথাই ঘুরে যাচ্ছিল। স্কুল সাঁতারের জন্য কি আর একটু যত্নশীল হওয়া যায় না? ওখানে সাঁতার দিতে আমাদের দলের সবারই খুব অসুবিধে হয়েছে।

—এবার স্কুল সাঁতারে যা দেখলাম তাতে মনে হয় বাংলার ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা আরও নিষ্ঠার সঙ্গে মানোন্নয়নের চেষ্টা না করলে ভবিষ্যতে বাংলার শীর্ষস্থান হয়ত ত্রিপুরা কেড়ে নিতে পারে।

লোপা বলে, সাঁতার মরশুম শেষ হলে সাইক্লিং করি। এই সুভাষ সরোবর চক্কর দিই। তাছাড়া স্কুলে বাস্কেটবলও খেলি। এতে ব্যায়ামও হয় স্ফূর্তিও বাড়ে। লোপার হাঁব ছবি আঁকা আর স্টিকার জমান। নানা জায়গা থেকে পাথর সংগ্রহ করেছে অদ্ভুত ধরনের। লোপা ভারতীয় এবং বিদেশী নাচও শিখছে। এছাড়া গল্পের বই পড়াও তার নেশা। সবচেয়ে প্রিয় লেখিকা হচ্ছেন আগাথা ক্রিস্টি। গোয়েন্দা কাহিনী খুব ভাল লাগে।

আসার সময় জিজ্ঞাসা করি তোমার সাঁতারের লক্ষ্য কি?

উত্তর—এশীয় ক্রীড়ায় ভারতীয় দলের সদস্যরূপে স্বর্ণ জয়।

—অময়

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

হাসতে হাসতে বিয়ে করতে গেল ক্লারা, ফিরে এল মুখখানা বাংলা পাঁচ করে। কি ঘটেছিল মাঝখানে? না, হাত থেকে ফুলের তোড়া পড়ে গিয়েছিল গির্জের সিঁড়িতে—তুলে দিয়েছিল একজন গোঁইয়া চেহারার লোক। তারপরেই গোঁইয়া ভাষায় ঝি-কে বললে ক্লারা—আগের জিনিসের দাবী নিয়ে তা দখল করতে হবে। কি সেই জিনিস? না, একটা চিরকুট পাওয়া গেল ক্লারার পরিত্যক্ত পকেটে—তাতে অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে ক্লারাকে। চিরকুটটা ক্লারার পকেটে এল কখন? গির্জের মধ্যে ফুলের তোড়া হাতে তুলে দেওয়ার সময়ে নয় তো? গোঁইয়া চেহারার সেই লোকটার নামের আদ্যক্ষর এফ এইচ এম? সে চৌঠা অগাস্ট লণ্ডনের একটা দামী হোটেলে উঠেছিল সেখানকার দৈনিক ৮ শিলিং ৩ পেনী ভাড়াটাতেই পূর্ব প্রণয়ীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?

খোঁজ...খোঁজ...খোঁজ' লণ্ডনে এমন খানদানী হোটেল বলতে তো মাত্র আটটা: তার একটিতে এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন চৌঠা অগাস্ট—নামের আদ্যক্ষর এফ এইচ এম—অর্থাৎ ফ্রান্সিস হে মুলটন!

পরিষ্কার হয়ে গেল হেঁয়ালী! ক্লারার ঝি ক্লারার বিয়ের জামাকাপড় পুঁটলী পাকিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল সাপেন্টাইনে—পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে—ক্লারাকে অন্য পোশাকে পাচার করে [illegible]

দেশ বিদেশের খেলা

বিশ্বের দ্রুতগামী মানুষ

বিংশতিতম মিউনিখ অলিম্পিকের স্টপওয়াচে যে কয়টি প্রতিভা ধরা দিয়েছে তার মধ্যে ভ্যালেরি বোরজভের নাম নিঃসন্দেহে উল্লেখ করার মতো। ট্রাক এন্ড ফিল্ডে যে তিনজন স্বর্ণমুকুট লাভের সেরা প্রশংসা অর্জন করেছেন বোরজভ তাদের মধ্যে নিঃসংকোচে উজ্জ্বলতম। কারণ শত মিটার দৌড়ে প্রথম হওয়ার সূত্রে বোরজভ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী মানুষ।

দূর পাল্লার দৌড়ে সোভিয়েট রাশিয়ার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অনেককালের। পক্ষান্তরে স্বল্প পাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ দিনের ব্যর্থতার দুর্বল জায়গা সবল করার চেষ্টায় অনুসন্ধানের কাজ চলছিল রাশিয়ায় বহুদিন ধরে। প্রতিভাসম্পন্ন স্বল্পপাল্লার দৌড়বীরদের যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য কম্পিউটারের কষ্টিপাথরে ঘষে মেজে সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে বিচার চলছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকের খনন কার্যের মত ১৯৬৭ সালে এই অনুসন্ধানকার্যে রাশিয়া আবিষ্কার করে ভ্যালেরি বোরজভকে।

অলিম্পিকের শত মিটার ট্রাকে মার্কিণ আধিপত্য বহুযুগ ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত। শত মিটার দৌড়ে পনেরটি আসরের মধ্যে বারটির অধীশ্বর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকায় দীর্ঘ স্বর্ণ জয়ের এই ধারাবাহিকতায় ছেদ টানেন জার্মানীর আরধমন হ্যারি ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে। হ্যারি ঝড়ের বেগে দৌড়ে অনেককাল পর মার্কিণ প্রাধান্যে ফাটল ধরান। টোকিও ও মেকসিকোর পরের দুটি অলিম্পিকে স্বর্ণ জয় করে আমেরিকা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে।

মিউনিখে অনুষ্ঠিত পরের অলিম্পিকে বোরজভের কাছে পরাজিত হওয়ায় শত মিটার দৌড়ে পুনরায় মার্কিন যুগের অবসান ঘটে। বোরজভ একশ ও ছ'শ মিটার দৌড়ে আমেরিকার দৌড়বাজদের পেছনে ফেলে এক অসামান্য কীর্তি গড়ে স্বল্প পাল্লার দৌড়ে রুশ প্রাধান্য স্থাপন করেন। তিনি একশ মিটার দৌড়ে ১০·১ সেকেন্ডে ও দুশ মিটার দৌড়ে ২০ সেকেন্ডে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করেন। একশ মিটারে আমেরিকার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রবার্ট টেলর ১০·২ সেকেন্ডে ও দুশ মিটারে ল্যারি জ্যাক ২০ ২ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেন। ইতিপূর্বে পুরুষ বিভাগে স্বল্প পাল্লার দৌড়ে স্বিমকুট পেয়েছিলেন মার্কিণ তরুণ বব মরোই ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে।

বোরজভের সাফল্য বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। স্বদেশীয় অনুষ্ঠানে বোরজভ পয়লা নম্বর প্রতিযোগী। ১৯৭০ সালে লেলিনগ্রাডে আয়োজিত রুশ মার্কিণ আসরে তিনি বেন ভগন আইভরিকে পেছনে ফেলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। পরের বছর বোরজভ ক্যালিফোর্নিয়ায় শ্বেত ক্রীড়ায় মার্কিণ ছেলে জিম গ্রীণ ও জন মেরোকে হারিয়ে দিয়ে অবিচল আস্থায় স্বল্পপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার নব-জন্ম ঘটান।

জার্মানীর আরমান হ্যারির পর বোরজভ একমাত্র নবনায়ক যিনি মার্কিণ সাম্রাজ্য দ্বিতীয়বার বেহাত করলেন। কিন্তু পরের অলিম্পিকে কি বোরজভ এই রুশ প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন?

স্প্রিন্ট দৌড়ে বোরজভের সাফল্য অনভিপ্রেত নয়। জন্ম সাম্বোরে হলেও ছেলেবেলা কেটেছে উক্রেইনিয়ান শহরের শোভায়া কখোভকাতে। স্কুলের প্রথম পাঠের সঙ্গে এ্যাথলেটিকসের হাতেখড়ি প্রশিক্ষক বোরিস ভোইটাসের কাছে।

মঞ্চে অভিনীত সফল নাটকের পর্দার আড়ালে থাকে অনেক মানুষের অদৃশ্য হাতের স্পর্শ। অনেক ক্ষেত্রেই যাদের নাম থাকে অজ্ঞাত। মিউনিখ অলিম্পিক মঞ্চের নবনায়ক বোরজভের সাফল্যের অন্তরালের মানুষটির নাম আজ আর কারোর কাছেই অজ্ঞাত নয়। ইনি হলেন ভ্যালেনটিন পেট্রোভোস্কি। দূরদর্শী প্রশিক্ষক পেট্রোভোস্কির সাহচর্য বোরজভের কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত কেটেছে মাঠে ময়দানে অ্যাথলেটিকসের একাগ্র সাধনায়। গুরু শিষ্য হরিহরআত্মা। মাঠ থেকে খাবার টেবিল পর্যন্ত দুজনের মধ্যে নানান সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে। এবং তার সমাধানের প্রয়াসে অনেকটা সময় কাটে।

প্রখ্যাত প্রশিক্ষক ভ্যালেনটিন পেট্রোভোস্কি কীভ ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল কালচারের জীব বিজ্ঞানের শিক্ষক। পেট্রোভোস্কি বিজ্ঞানসম্মত যে সব কলা-কৌশল আয়ত্ব করেছেন তার সম্যক প্রয়োগ করেছেন বোরজভের ভেতর দিয়ে। তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় বোরজভ পেট্রোভোস্কির অনলস গবেষণার ফলশ্রুতি। বোরজভ স্বয়ং ফিজিক্যাল কালচারে অনুরাগী। তিনি কীভ ইনস্টিটিউটে গবেষণার কার্যে নিযুক্ত।

ভ্যালেরি বোরজভ ট্রাক এন্ড ফিল্ডে নিবেদিত প্রাণ। প্রত্যহ নির্দিষ্ট অনুশীলন ছাড়াও বনে জঙ্গলে সাগর সৈকতে বন্ধুর পার্বত্য পথে ছোটাছুটির বিরাম নেই। অবসর কাটে সাঁতার সঙ্গীত সাহিত্যের জগতে। বিরাশী কেজি ওজনের পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি লম্বা অধ্যবসায়ী বোরজভ এখন পরম আত্মবিশ্বাসে নিজেকে প্রস্তুত করছেন যাতে করে পরের অলিম্পিকে স্বল্পপাল্লার দৌড়ে রুশ সুনামকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

—প্রশান্ত দা

খেলাধূলা

দর্শক

ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল

নাগপুরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম মধ্যাঞ্চল দলের তিনদিনব্যাপী ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ৯৬ রানে জয়ী হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালের ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের এটা চতুর্থ জয়।

প্রথম দিনে চা-পানের কিছু পরেই মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ২৫৪ রানের মাথায় শেষ হয়। মধ্যাঞ্চলের ওপনিং ব্যাটসম্যান মূর্তি রাজন ২০৫ মিনিট খেলে ১০৪ রান করেন। তাঁর ১০৪ রানে ছিল ১৪টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পাডমোর ৮৯ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। প্রথম দিনের খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৫৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের ২০ মিনিট পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসের ৪৩৫ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে ১৮১ রানে এগিয়ে যায়। ফ্রেডেরিকস সেঞ্চুরী করেন (১২০ রান)। বর্তমান সফরে তাঁর এটা দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। দলের অধিনায়ক লয়েড ৬৭ মিনিটে ৮২ রান করে নটআউট থেকে যান। তিনি ৯টা বাউণ্ডারী এবং দুটো ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় মধ্যাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ২৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

অ্যাণ্ডি রবার্টস
টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম বলে উইকেট (সুধীর নায়েক) পান

রয় ফ্রেডেরিকস
সেঞ্চুরী (১০০ রান) করেন

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে খেলা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের ২৭০ মিনিট আগে মধ্যাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৮৫ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৯৬ রানে জিতে যায়। অফ স্পিনার পাডমোর ৪০ রানে ৪টে উইকেট পান। এই খেলায় তিনি মোট ১০টা উইকেট পান ১২৯ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে রবার্টসের ২০ রানে ৪টে উইকেটও উল্লেখযোগ্য।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মধ্যাঞ্চল : ২৫৪ রান (মূর্তি রাজন ১০৪ রান। পাডমোর ৮৯ রানে ৬ উইকেট)

ও ৮৫ রান (বেঞ্জামিন ১৮, হনুমন্ত ১৫ এবং দুরানী ১৫ রান। পাডমোর ৪০ রানে ৪ এবং রবার্টস ২০ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪৩৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ ফ্রেডেরিকস ১২০, কালিচরণ ৫৬ এবং লয়েড নটআউট ৮২ রান। দুরানী ১১৭ রানে ২ এবং ওগিরাল ১৮৬ রানে ৫ উইকেট।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

তৃতীয় টেস্ট খেলা

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা ২৭শে ডিসেম্বর শুরু হয়েছে। খেলা এখনও শেষ হয়নি। বরাদ্দ পাঁচ দিনের খেলার প্রথম তিন দিনের খেলা হয়েছে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অনুকূলেই খেলার গতি ঘুরে গেছে। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেট পড়ে ২০৬ রান উঠেছে। এখনো দুদিনের খেলা বাকি। ভারতের প্রথম ইনিংসের ২৩৩ রানের উত্তরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসে ২৪০ রান করে ৭ রানে এগিয়ে যায়।

ভারতের প্রথম ইনিংসের সূচনা মোটেই শুভ হয়নি। রবার্টসের প্রথম বলেই ভারতের ওপনিং ব্যাটসম্যান সুধীর নায়েক আউট হয়ে যান। টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে এইভাবে টেস্ট খেলার প্রথম দিনের প্রথম বলেই উইকেট পড়েছে ইতিপূর্বে মাত্র তিনবার। সুতরাং এটা একটা বিরল ঘটনা।

প্রথম দিনেই ভারতের প্রথম ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় শেষ হয় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১৪ রান করেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কড়া বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের দরুন ভারতীয় খেলোয়াড়রা খুবই মুস্কিলে পড়েছিলেন। ভারতীয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ

জি আর বিশ্বনাথ
প্রথম ইনিংসে ৫২ এবং অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট ৭৫ রান

৫২ রান করেছিলেন বিশ্বনাথ। নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় অংশুমান গাইকোয়াড় ৩৬ রান এবং মদনলাল ৪৮ রান করে ভারতের মুখ তবু কিছুটা রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৪০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা মাত্র ৭ রানে অগ্রগামী হয়। খেলার বাকি ২৫ মিনিট সময়ে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৮ রান করেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ফ্রেডেরিকস সেঞ্চুরী (১০০ রান) করেন। তিনি ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। ফ্রেডেরিকসের ১০০ রানের পরই মারের ২৪ রান উল্লেখযোগ্য। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটিংয়ে কি শোচনীয় ব্যর্থতা। দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৪০ রানে শেষ হলে খেলার হাওয়া ভারতের দিকে ঘুরে যায়।

তৃতীয় দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে রান দাঁড়ায় ২০৬ (৬ উইকেটে)। বিশ্বনাথ ৭৫ রান করে নটআউট আছেন। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় পরিত্রাতার ভূমিকা নেন ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এবং বিশ্বনাথ। ইঞ্জিনীয়ার ৬১ রান করে আউট হন।

তৃতীয় টেস্ট খেলার গতি উপস্থিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অনুকূলে বইছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

তিনদিনের খেলা

ভারত : ২৩৩ রান (বিশ্বনাথ ৫২, মদনলাল ৪৮, মনসুর আলী ৩৬ এবং অংশুমান গাইকোয়াড় ৩৬ রান। রবার্টস ৫০ রানে ৫ এবং হোল্ডার ৪৮ রানে ২ উইকেট)

ও ২০৬ রান (৬ উইকেটে। ইঞ্জিনীয়ার ৬১ এবং বিশ্বনাথ নটআউট ৭৫ রান। রবার্টস ৬০ রানে ২, উইলেট ৩০ রানে ২ এবং গিবস ৩৫ রানে ১ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৪০ রান (ফ্রেডেরিকস ১০০ এবং মারে ২৪ রান। মদনলাল ২২ রানে ৪, বেদী ৬৮ রানে ২, চন্দ্রশেখর ৮০ রানে ১ এবং ঘাউড়ি ২৮ রানে ১ উইকেট)

টেস্টের প্রথম বলে উইকেট লাভ

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অ্যাণ্ড্রু রবার্টস প্রথম দিনের (ডিসেম্বর, ২৭) প্রথম বলে সুধীর নায়েককে আউট করে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন টেস্ট খেলায়। এরকমের ঘটনা খুবই বিরল। রবার্টসকে নিয়ে এপর্যন্ত মাত্র চারজন বোলার টেস্ট খেলার প্রথম দিনের প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার নজির গড়েছেন। রবার্টসের আগে ১৯২৬ সালে ইংল্যাণ্ডের মরিস টেট ১৯৩৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার ই এল ম্যাককরমিক এবং ১৯৭১ সালে ভারতের সৈয়দ আবিদ আলী টেস্ট খেলার প্রথম দিনের প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার দুর্লভ গৌরব লাভ করেন।

কলকাতায় রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রয় ফ্রেডেরিকস প্রথম ইনিংসে ১০০ রান পূর্ণ করে মদনলালের বলে বিশ্বনাথের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়েছেন।

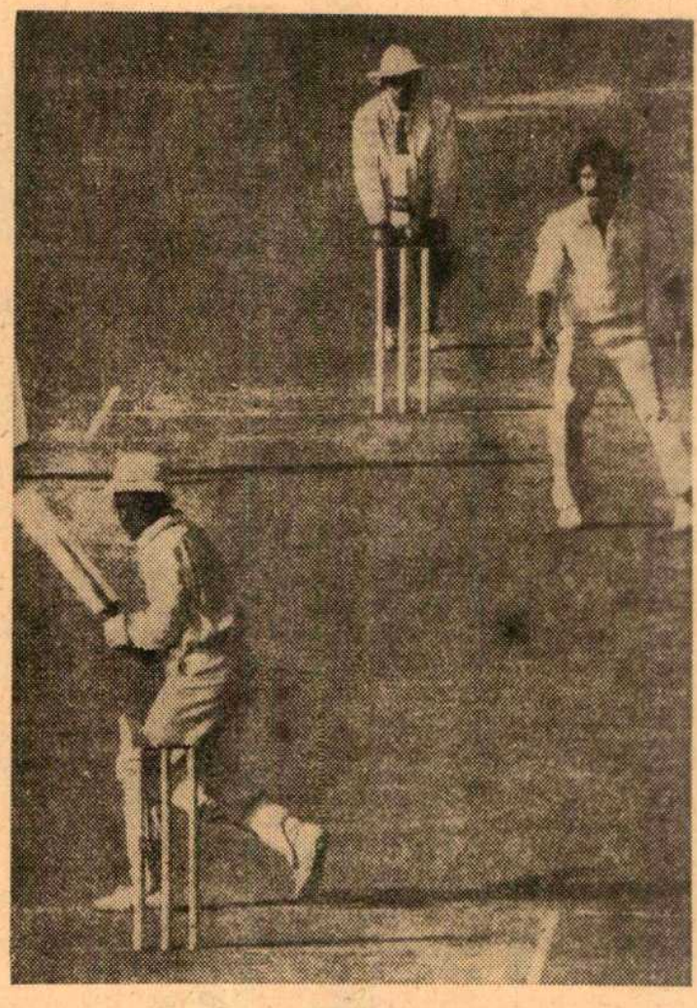

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রথম দিনের প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার ঘটনা এবং সেই সঙ্গে খেলার ফলাফল দেওয়া হল :

(১) ৩য় টেস্ট, লিডস, জুলাই ১০, ১৯২৬, বার্ডসলে (অস্ট্রেলিয়া) কট সাটক্লিফ ব মরিস টেট (ইংল্যাণ্ড) ০
খেলার ফলাফল অমীমাংসিত

(২) ১ম টেস্ট, ব্রিসবেন, ডিসেম্বর ৪, ১৯৩৬, ওয়ার্দিংটন (ইংল্যাণ্ড) কট ওল্ডফিল্ড ব, ম্যাককরমিক (অস্ট্রেলিয়া) ০
খেলার ফলাফল : ইংল্যাণ্ড ৩২২ রানে জয়ী

(৩) ২য় টেস্ট, ত্রিনিদাদ মার্চ ৬, ১৯৭১ ফ্রেডেরিকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) বোল্ড আবিদ আলি (ভারত) ০
খেলার ফলাফল : ভারত ৭ উইকেটে জয়ী

(৪) ৩য় টেস্ট, কলকাতা ডিসেম্বর ২৭ ১৯৭৪, সুধীর নায়েক (ভারত) কট মারে ব রবার্টস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ০
খেলার ফলাফল : ?

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭৪ সালের জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস, মহিলা বিভাগে পশ্চিমবাংলা এবং বালক বিভাগে মহারাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : সার্ভিসেস ৬৫—৬৩ পয়েণ্টে রেল দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : পশ্চিমবাংলা ৭২—৬১ পয়েণ্টে কর্ণাটককে পরাজিত করে।

বালক বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৯৫—৬৯ পয়েণ্টে কর্ণাটককে পরাজিত করে।

আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭৪ সালের ৩৬তম আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় দিল্লী পুরুষ বিভাগে, মহারাষ্ট্র (বি) মহিলা বিভাগে, তামিলনাড় বালক বিভাগে এবং মধ্যপ্রদেশ বালিকা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

রজনীগন্ধা
অমল পালেকর এবং বিদ্যা সিনহা

বায়োস্কোপবিত

পার্থপ্রতিম চৌধুরী, তরুণ দত্ত (এখন বোম্বেতে), সুশীল মুখার্জি, সুনীল ব্যানার্জি আর আমি ভবানীপুরে ইন্দিরা সিনেমা হলের দোতলার লবিতে বসে আড্ডা দিচ্ছি কিছুক্ষণ আগে ছায়াসূর্য ছবির ইভনিং শো আরম্ভ হয়েছে, ছবির রিপোর্ট সন্তোষজনক। ফলে আমরা সবাই খুব হাসিখুশী। শর্মিলা তখন আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিত। পার্থর সঙ্গে কি-যেন ব্যাপারে শর্মিলা একটা বাজি হেরেছে, আর সেই বাজির শর্তানুযায়ী শর্মিলা আমাদের চাইনীজ খাওয়াবে বলে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। আমরা হাউসে বসে আছি শর্মিলা ঠাকুরের অপেক্ষায়। ও এলে আমরা সবাই মিলে পার্ক স্ট্রীটে যাব এমন সময় মিঠু চ্যাটার্জি হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—পার্থদা, এই মাত্তর একটা কাবুলি (কাবুলীওলা) টিকিট কেটে ছবি দেখতে ঢুকল।

শুনে আমাদের সবার চক্ষুস্থির।
--সেকি রে

বিস্ময়ে পার্থর চোয়াল ঝুলে যাবার দাখিল। —যাঃ, কাবলি আমার ছবি দেখবে কোন দুঃখে! তুই ভুল দেখেছিস—

মিঠু চ্যাটার্জি সশব্দে প্রতিবাদ করল।

—না পার্থদা তুমি বিশ্বাস করো, আমি হলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ দেখি একটা কাবুলি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে প্রথমে এদিক-ওদিক কি-যেন দেখল, তারপর একটা টিকিট কিনে বোঁ করে হলের মধ্যে ঢুকে পড়ল অনেক্ষণ।

বোঝা গেল, মিঠু গুল দিচ্ছে না। কিন্তু তা-বলে এটাও বিশ্বাস করা শক্ত যে একজন কাবুলি এত ছবি থাকতে বেছে বেছে ছায়াসূর্য ছবি দেখতে আসবে! তপন সিংহের 'কাবুলীওয়ালা' ছবি হলেও সেটা খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হত। বা কোন সেকসসাইটিং হিন্দী ছবি হলেও! ছায়াসূর্য তো সে-ধরনের বায়োস্কোপ নয়।

আমরা অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলাম। তরুণ দত্ত ফস্ করে বলল—হ্যাঁরে পার্থ, ব্যাপারটা কিছু আন্দাজ করতে পারছিস!

পার্থ বিব্রত ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল। —উঁহু একদম না।

সুশীল মুখার্জি বলল—পার্থ, মনে হচ্ছে তোর ছবি লেগে গেছে। নইলে কাবুলে ছবি দেখে?

আমি বললাম—উল্টোও হতে পারে।

পার্থ ঘাবড়ে গিয়ে বলল—একবার খবর নেয়া যাক কাউণ্টারে, বুকিং ক্লার্ক বলতে পারবে—

সবাই তখুনি দুদ্দাড় নিচে নামা হলো।

বুকিং ক্লার্ক তখন টাকা গুনছিলেন। আমাদের প্রশ্নে চোখ বড় করে তাকিয়ে বললেন—কা-বু-লে? বলেন কি মশায়?

তরুণ বলল—কেন আপনি দেখেননি? আপনার কাছ থেকেই তো শুনলাম টিকিট কেটে হলে ঢুকেছে—

—আমি মশাই কারো মুখ দেখি না—ক্লার্ক গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন—যারা

টিকিট কেনে আমি শুধু তাদের হাত দেখি ফোকরটা ছোট্ট কিনা, মুখ দেখি না, বুঝেচেন?

তরুণ নির্বিবাদে ঘাড় নেড়ে বোঝাল পরিষ্কার।

তরুণ বুঝেছে দেখে বুকিং ক্লার্ক কথাটা টেনে ধরে বললেন—আর খাঁটি কথা যদি শুনতে চান তাহলে আরও খোলসা করে বলি; একবার এক পরমা সুন্দরী ভদ্রমহিলা টিকিট কিনতে এসেছিলেন। আমি কি তখন ছাই জানতুম যে পেছনে পরমা সুন্দরীর পতি পরম গুরু দাঁইড়ে রয়েছে। আমি মশাই এট্টুসখানি দেখেছি ভদ্রমহিলাকে গোপাল ফুল দেখতে কার না ভাল লাগে বলুন তারপর টিকিট বেচে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্য কাজে মন দিয়েছি তারপর সে মশাই কি কেলেঙ্কারী, আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সেই পতি পরম গুরু এসে আমায় ধরে কি যাচ্ছেতাই হেনস্থা। বলে কি যে আমি নাকি ও'য়ার পরিবারের দিকে কু-দৃষ্টি দিয়েচি। আরে মশাই ঘরে আমার এয়োস্ত্রিরি রয়েচে, পুত্র রয়েচে, কন্যে রয়েছে—তাদের ছেড়ে আমি অন্য এয়োস্ত্রিরির পানে তাকাব? ছিঃ। তা সে লোকটা মশাই আমার কথা আমলই দেয় না, ব্যাটা বলে আমি নাকি ড্যাব ড্যাব করে ও'য়ার দিকে চেয়েছিলুম। ঝাঁটা মার ঝাঁটা মার, আমার চরিত্তির অত খারাপ নয়। আর অতই যদি সন্দ-বাতিক তো পাটোচ্ছিলে কেন পরিবারকে টিকিট কাটতে? এই নিয়ে বিরাট গণ্ডগোল, হৈ-চৈ। তারপর সব্বাই মাঝে পড়ে ব্যাপারটা সামলে দিল। আর আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম যেন। তারপর শুনুন কি কাণ্ড। ক্যাশ মেলাতে গিয়ে দেখি হেঁড়ি শর্ট। দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেল। হয়েছে কি ওই মহিলা একশো টাকার নোট দিয়েছিল। তালে-গোলে বেশী দিয়ে ফেলেছি। ও আর পাওয়া গেল না। ব্যাটা যেরকম তড়পে গেছে আর আগ বাড়িয়ে গিয়ে ঘাঁটাতে সাহস হলো না। শেষে ঘর থেকে এনে ভর্তুকি দিয়ে ক্যাশ মেলাতে হল। মশাই সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, ইহজন্মে আর কারো মুখের পানে তাকাব না, হাত দেখব, ক্যাশ দেখব, টিকিট দেব ব্যাস।...তা হ্যাঁ, বলছেন একজন কাবুলে ঢুকেচে? মাথায় নির্ঘাৎ পোকা নড়েচে। নইলে এই বায়োস্কোপ দেখতে ঢোকে?

বলেই তার স্মরণ হলো ছবির পরিচালক স্বয়ং সমুখে দাঁড়িয়ে। জিভ কেটে তৎক্ষণাৎ—তাবলে ভাববেন না আমি ছবির নিন্দে করছি। বড় ভাল বায়োস্কোপ করেছেন। কাবুলি-রা বুঝতে পারবে না, তাই বলছি।

গেট-কীপার বলল—হ্যাঁ, এট্টা কাবুলে ঢুকেছে বটে। আমি ভেতরে বসিয়ে দিয়েছি ব্যাস। কেন? গণ্ডগোল আছে নাকি?

তরুণ তাড়াতাড়ি বলল—না, গণ্ডগোল কিছু নেই। আমরা শুনলাম তাই জিগ্যেস করছিলাম আরকি—

প্রেমের ফাঁদে/আরতি, শমিত

বলাইদাকে বায়োস্কোপের লাইনে সবাই চেনে। একবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দেখি বলাইদা গোটা আন্টেক কাবুলির সঙ্গে খুব জোর শলা-পরামর্শ করছে। কাবুলিরা খুব মনোযোগ দিয়ে বলাইদার কথা শুনছে।

বুঝলাম, একটা ভাল রকম কেস হচ্ছে।

পরে বলাইদার সঙ্গে অন্য একদিন দেখা হতে প্রশ্ন করলাম—হ্যাঁ বলাইদা স্টুডিওতে কাবুলি কেন?

বলাইদা মুখ বিরক্তির ভ্রূ-ভঙ্গি করে বলল—সে কথা শুনে আর কাজ নেই। যত্তসব সব থার্ডকেলাস ব্যাপার।

শুনে কাজ নেই বললে তো এ-বান্দা ছাড়বার পাত্র নয়, শুনতে আমায় হবেই। স্টুডিওতে নানা দেশের নানা মত এবং ধর্মের লোক হরদম দেখা যায়, কিন্তু কাবুলিদের কখনও দেখা যায় না। ওরা এদিকটা পানে বড় একটা মাড়ায় না। সেকি চোট্ হয়ে যাবার ভয়ে? কি জানি, আমি এর সাইকো-টা ঠিক বুঝতে পারি না। অথচ খোদ স্টুডিও পাড়াতেই ওদের একটা ড্যারা আছে। প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড ধরে দু-নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দিকে এগিয়ে গেলে বাঁ-হাতে কাবুলিদের বিরাট একটা আস্তানা চোখে পড়ে। ওদের পাশে থাকে একজন ওস্তাদ। ইয়াব্বড় একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে তার। লোকটা নল চালায়। কোথাও চুরি-চামারি হলে পুলিশের কাছে গিয়ে হয়রান না হয়ে এই ওস্তাদকে নিয়ে গেলে নাকি তৎক্ষণাৎ মুস্কিল আসান হতে পারে। মন্ত্রপূত চাল খাইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি বামালের সন্ধান স্রেফ টেলি-যোগে মক্কেলের হাতে পৌঁছে যাবে। তারপর আসামীকে ঘা-কতক দিতে পারলে মাল বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ? এছাড়া এই ওস্তাদ এবং তার পরিবার এমনও মন্তর জানে যে বুড়ো আঙুলের নখে হারানো ছেলের ছবি দেখিয়ে দিতে পারে।

রং নাম্বার/শমিত-মুন্নিতা

ওপরে (বাম দিকে) সেই চোখ/সুলতা-উত্তমকুমার। (ডান দিকে) মৌচাক/রঞ্জিত-উত্তমকুমার-সাবিত্রী। মাঝখানে (বাম দিকে) ছুটির ফাঁদে/অপর্ণা - সৌমিত্র-রবি ঘোষ। (ডান দিকে) সংসার সীমান্তে/শিউলি মুখার্জী - অরুণ মুখার্জী

কুলী বিধাতা/সোমা দে-মণ্ডল

কোরাস

একজন বলল, তার নাম মোশাই নখ-দর্পণ। কী খুব সামান্য। একবার পরখ করে দেখতে পারেন।

কাবুলিদের ডেরাটা সেই ওস্তাদের ঘরের পাশে বলে আমার মনে হয় এটা সে-রকম কোন আকস্মিক ঘটনা নয় রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ একটা ব্যাপার। তাবৎ কাবুলিরা নিঃসন্দেহে-ই শক্ত মানুষ। নইলে ধরুন কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে ওরা দেদার সুদে টাকা খাটায়; সময় মত সুদ আদায় করা সে তো বড় চাট্টি খানি কথা নয়! মশাই এমনও দেনদার এই পৃথিবীতে আছে যে তারা পাওনাদারের কাল ঘাম ছুটিয়ে দেবার অলৌকিক সব ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ কাবুলিদের তেরটা বাজিয়ে যে ব্যাটা আসলী টাকা, সুদের টাকা হাপিস করবার ক্ষমতা রাখে, সে তো মহাপুরুষ। আর সে-রকম বিপদ হলে কাবুলিরা নির্ঘাৎ ওই ওস্তাদের শরণাপন্ন হয়। নল-ফল চালিয়ে কাবুলিরা টাকা ঠিকই উদ্ধার করে নেয়। তাই মনে হয় ওস্তাদকে কাবুলিরাই ওখানে বসিয়েছে শুধু ওই জন্যেই।

আমি নাম করতে চাই না, একজন বিখ্যাত অভিনেতাকে আমি বহু দিন দেখেছি, তিনি চলেছেন আর তাঁর ডান-বাঁয়ে দুজন কাবুলিও চলেছে। ভদ্রলোক প্রাণ পণে ওদের বোঝাচ্ছেন। ওরা বুঝবেও। এবং পরক্ষণেই বলছে—সুদ দো সুদ। বলুন তো কি-কাণ্ড! উনি একদিন ক্যাল-কাটা মুভিটোন স্টুডিওতে একটা ছবির শুটিং করতে এসেছেন। ওরা গন্ধে গন্ধে ঠিক চলে এসেছে। এসে সেঁটে বসে আছে। প্যাক-আপ হলে উনি পেমেন্ট পাবেন এবং সর্বস্ব দিয়ে শুধু ট্যাক্সি ভাড়া নিয়েই হয়ত ওঁকে বাড়ি ফিরতে হবে।

স্টুডিওর দ্বারোয়ান তখন আমাদের সেই বৃদ্ধ চাচাজী, এখন রিটায়ার করে দেশে চলে গেছে ওফ, একটা ক্যারেকটার ছিল লোকটা। আর ছিল অদ্ভুত 'সেন্স অব হিউমার। চাচাজী থেকে থেকে এমন সব কাণ্ড করত যে হয় আমাদের পিলে চমকে যেত, অন্যথায় হাসতে হাসতে ভুঁয়ে লুটোপুটি খেতে হত। কাবুলি প্রসঙ্গে আসছি, তার আগে চাচাজীর ক্যারেকটারটা কি-রকম ছিল এটুকু আভাস দিয়ে রাখি এই বেলা।

স্টুডিওর গেটে প্রায়ই উমেদারদের ভিড় হয়। সবাই-ই ছবিতে পার্ট করতে চায়। সব ছেলে চায় উত্তমকুমার হতে। আর সব মেয়েই চায় সুচিত্রা সেন হতে। আর এই আগন্তুকদের সমস্ত ঝঞ্ঝাট এই চাচাজীকে-ই বরাবর পোয়াতে হয়। অর্থাৎ নানা রকম বোলচাল দিয়ে হটাতে হয়।

একদিন দুপুরে চাচাজী গেটের পাশে তার টুলে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। ভেতরে ছবির শুটিং হচ্ছে হঠাৎ একটি ছোকরা এসে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, ছবিতে হিরো হবার বাসনা নিয়েই সে অকুস্থলে হাজির।

চাচাজী তাকে দেখে ক্ষেপে লাল।

—তুহারকে ফিন আসতে মানা করলাম উ রোজ ফির আসল? তুহার শরম নৈ শে?

ছোকরাটি তার টেঁড়ি সামলাতে সামলাতে জবাব দিল—শরম নিশ্চয় আছে। তবে সেটা বন্ধুমহলে এখানে ছবিতে নামার ব্যাপারে তার কোন শরম-ফরম নেই। ছবিতে তাকে যে-কোন উপায়েই হোক নামতে হবে। নইলে বন্ধুদের কাছে তার মাথা কাটা যাবে—

চাচাজী অতএব আপ্তবাক্য দিল—তু অব মর। তুহার অব মরননাই চাহিয়ে।

ছোকরা দাঁত বের করে হেসে বলল—চাচাজী, তুমি বলেছিলে ছবিতে হিরো হতে গেলে টাকা লাগে? আমি সেই টাকা এনেছি। কড়কড়ে ক্রেঞ্চ নোট পনেরো হাজার টাকা—

—এ্যাঁ?!?

বিস্ময়ে চাচাজী তার টুল উল্টে পড়ে আর কি। —সে কিরে তুই টাকা নিয়ে এসেছিস? হিরো সাজবি বলে? তা টাকা পেলি কোত্থেকে?

টাকা সে পেলো কোত্থেকে—সে কথা ভেঙে বলার ব্যাপারে ছোকরার কোন উৎসাহ দেখা গেল না শুধু কৌতুকের ভঙ্গিতে চোখের ভুরু নাচাল বারকতক, তারপর বেশ রহস্য করে বলল—শুধু ক্যাশ নয় চাচাজী সঙ্গে আরও মাল আছে—

বলে সে হাতের রেশন-ব্যাগটা দেখিয়ে দিল। থলেটা যে বেশ ভারী তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দেখে চাচাজীর চক্ষু ছানাবড়া। কিছুক্ষণ সে ছোকরার দিকে তাকিয়ে রইল, ফ্যালফ্যাল করে।

—ব্যাগে কি?

—গয়না।

—এ্যাঁ! তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল চাচাজী।

ছোকরা তখন নির্বিকার ভঙ্গি করে বলল—ক্যাশ আর গয়না মিলিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা এনেচি চাচাজী। এবার বল এতে হবে আমার ছবি?

চাচাজী ততক্ষণে যেন ধাতস্থ হয়েছে। বললে—তুই বোস্, এই এখানে আমার এই টুলে।

ছোকরা অট্টহেসে বলল—ঘেবড়ে গেলে বুঝি?

চাচাজী প্রশ্ন করল—এসব গয়না পেলি কোথায়?

—কেন, মা-র আর ঠাম্মার মাল—

—সব ঝেড়ে আনলি বুঝি?

ছোকরা এবার এটু সলজ্জ ভঙ্গি করল।

চাচাজীর টেনশান তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।—শালা তোকে তো এবার পুলিশ ধরবে। তুই দেখছি আমারও কোমরে দড়ি ফেলবি—

—কেন আমার বাপের মায়ের আর ঠাম্মার জিনিস আমি এনেছি, পুলিশ ধরবে কেন?

চাচাজী বলল—তখন মালুম পাবি যখন ধরবে। বেশরম বাড়ি যা, এক্ষুনি বাড়ি চলে যা যদি বাঁচতে চাস। খবদ্দার কাউকে আর বলবি না যে তোর সঙ্গে এত মাল আছে। বললে—

—বললে কি হবে? কেড়ে নেবে?

চাচাজী ছোকরাকে তখন ব্রহ্ম-বাক্য দিল—না কেড়ে নেবে না, তোকে ঠিক এই-ভাবে মধুর মত চেটে নেবে—বলে মধুর চাটার ভঙ্গি করে দেখাল চাচাজী—শালা পালিয়ে যা, নইলে আমিই পুলিশে খবর দেব, দিয়ে তোকে হাজতে ঢোকাব—

ছোকরা শেষ পর্যন্ত বামাল সমেত বাড়ি ফিরেছিল চাচাজীর অন্তত সেই রেকমই রিপোর্ট।

সাত-সকালে ক'জন কাবুলিকে হঠাৎ স্টুডিওর মেটে ঘোরাঘুরি করতে দেখে চাচাজী তো অবাক।—ক্যা খবর খান সাহাব?

খান সাহেবরা আসল রহস্য কখনও উদ্ঘাটন করে না, কারণ তাতে পাখী উড়ে যাবার ভয় থাকে। হেসে জানাল—বেড়াতে এসেছে।

অথচ চাচাজী জানে শুধু-মুধু এরা বেড়াবার পাত্তর নয়, অভিসন্ধি নিশ্চিত জোর একটা কিছু আছে। —বৈঠ বৈঠ—

খাতির করে বসিয়ে এটা-সেটা চাপ দিতে শেষ পর্যন্ত কাবুলিরা কবুল করল —সুদের তরে এয়েছি চাচাজী। বাবুটা আমাদের কলজে হাল্কা করে দিচ্ছে।

—কৌন বাবু?

কাবুলিরা নাম বলল। শুনে চাচাজী শুধু বলল—সত্যনাশ!

কাবুলির দল গেটের মুখে ঠায় বসে রইল। ওরা জানত এক সময় না এক সময় সেই ভদ্রলোককে এই গেট পার হতেই হবে। তখন ওরা চেপে ধরবে। টাকা হাওলাৎ করবার সময় মনে ছিল না যে একদিন সুদ-সমেত সে-টাকা শোধ করতে হবে?

ঠিক যেন হাওয়ায় সে-খবর যথাসময়ে পেয়ে গেলেন আমাদের এই অভিনেতা ভদ্রলোক।

খবর শুনে তিনি শুধু হাসলেন মুচকি মুচকি। ওরা আদ্দর আদ্দি সাহস করে এয়েছে? বটে!

(দ্বিতীয় কিস্তি পরে)

—রঞ্জন মজুমদার

নাটমঞ্চ

গাধা নাটকের দৃশ্য

পপ থিয়েটারের গাধা

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পপ থিয়েটার প্রযোজিত নাটক 'গাধা' বলা যায় একেবারে হাল আমলের আমাদের সমাজ ব্যবস্থার 'প্রতিচ্ছবি' গাধা এখানে একটি চরিত্র। যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে বাস্তব অবস্থার দাস কিছু অস্থির চরিত্র।

নাটকের গোটা গল্পটাই বলা হয়েছে রূপকের আঙ্গিকে। সব কটি চরিত্রই তাই আমাদের আশে-পাশের হলেও আমরা তাদের চিনে নিতে পারি, তাদের নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করতে পারি।

তবে সংলাপ প্রধান নাটকের একটা অসুবিধা হোল সেখানে কুশীলব যত না প্রাধান্য পায়, তার চেয়ে বেশী প্রাধান্য পায় তার বক্তব্য। কিন্তু লক্ষণীয়, 'গাধা' নাটক সেদিক থেকে আশ্চর্য উতরে গেছে। গাধা তাই এখানে আধুনিক কালের চরিত্র হয়েই ধরা দিয়েছে।

গাধাকে নাটকের কেন্দ্রবিন্দু করে আজকের সমাজ ব্যবস্থার মানুষের নীতি-বোধ, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা, তার নিষ্ঠুরতা ও হঠকারিতার কথা যা বলা হয়েছে তাতে কতটা প্রকৃত বাস্তবতা আছে জানি না তবে সমকালের অস্থিরতা স্বার্থ-বোধ চতুর মানুষের ভূমিকা এবং সব শেষে মানবিকতার প্রতি যে একটা স্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ আছে একথা সত্য।

'গাধা' তাই আপাতে ব্যঙ্গ নাটক হয়েও ভাববার মত নাটক সন্দেহ নেই।

সংলাপ মাঝে মাঝে বিস্মিত করেছে। ক্ষেত্র বিশেষে তা যেমন অর্থবহ, তেমনি তীক্ষ্ণ ঝকঝকে। এ ব্যাপারে নাট্যকারের (মধুময় রায়) মুন্সীয়ানা অনস্বীকার্য।

তবে একটা কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই সংলাপ যেন বড় বেশী ডাইরেক্ট এবং অহেতুক বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। এটুকু পরিহার অর্থাৎ সেটা সরলীকরণ করলে বোধকরি নাটকের বক্তব্য আরও ইঙ্গিতবহ হোত।

গাধা নাটকের বড় সম্পদ এর টিম ওয়ার্ক বা সমষ্টিগত অভিনয়। যার ফলে সমগ্র নাটকটাই উপভোগ্য হয়েছে।

গভীর কথা হাল্কা চালে বলা যেমন সহজ নয়, তেমনি তাদের রূপদান তার চেয়েও দুরূহ। বলতে বাধা নেই সে ব্যাপারে নাটকের কুশীলবরা বহুলাংশেই সার্থক।

রাষ্ট্র সমাজ রাজনৈতিক চিন্তার চরিত্রকে নিয়ে শ্লেষাত্মক নাটক এখন আর নতুন কিছু নয়, তার ফলে বৈপ্লবিক কোন চেতনার সঞ্চার হয়েছে কিনা জানা নেই, তবে এমন নাটকের অবশ্যই প্রয়োজন আছে—একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। অবশ্য এটাও ঠিক ব্যঙ্গ ব্যঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা শোভন।

আর একটা কথা। সমাজ জীবনকে সচেতন করার প্রয়াস এক, আর মতের বিরুদ্ধে কোন কিছুকে অস্থিরতা দিয়ে বধ করার চেষ্টা অন্য। নাটকে বক্তব্য অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেটাই চূড়ান্ত নয় এটাও নাট্যকারের মনে রাখা দরকার।

নাটকের প্রারম্ভ দৃশ্য, যেখানে নেতাকে ঘিরে গড়ে ওঠা দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষ—সুপ্রযুক্ত। শেষ দৃশ্যটিও—যেখানে সে গুপ্ত রিপুর শিকার হোল—মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সুপ্রযুক্ত। দুটি দৃশ্যই নাটকের টোটাল এফেকটের সহায়ক হয়েছে।

অভিনয়ে প্রথমেই যে দুজনের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন যথাক্রমে গাধা ও রাষ্ট্রপ্রধানের চরিত্রাভিনেতা (প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকান্ত মুখার্জি)।

অন্যান্য ভূমিকায় প্রবীর ভট্টাচার্য, কান্তি চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য দেবাঞ্জন সুর, দিলীপ বিশ্বাস অরুণ বসাক, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণব মুখার্জি, গৌতম সাহা, নির্মল ভট্টাচার্য ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ রায় সুদিত সরকার, দলিব রায় (গাধার বিবেক), সুজিত সরকার এবং উর্বশী চরিত্রে মিতা মুখোপাধ্যায় সুন্দর।

মুরারী রায়চৌধুরী ও গণেশ মুখোপাধ্যায়ের নেপথ্য কণ্ঠসংগীত নাটকের গতিকে বেগবান করেছে।

অঙ্গিরার বিদ্রোহী 'সংবাদ'

অঙ্গিরা নাট্য সংস্থার নাটক 'বিদ্রোহী সংবাদের' পাত্রপাত্রী সর্বমোট তিনজন। ইন্দ্রাণী অতীন ও অসীম। ইন্দ্রাণী অভিনেত্রী, বেঁচে থাকার জন্যে সে এই পেশাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। অথচ তার মনের গভীরে বেদনা আছে, দ্বন্দ্ব আছে যন্ত্রণা আছে। যাকে সে ওপর থেকে হাসি দিয়ে আড়াল করে রাখতে চায়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে পুড়ে মরে। অসীমের প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ সত্ত্বেও সে তাকে কাছে পায় না নিজের মত করে। আবার তার বিদ্রোহী মন্ত্রেও সে নিজেকে সম্পূর্ণ দীক্ষিত করতে পারে না। অতীন সাংবাদিক। আপাতে সে সুখী, নিশ্চিন্ত জীবনের অধিকারী। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্য কথা বলার তার সাহস নেই। বেঁচে থাকার জন্যে সে তাই কমপ্রোমাইজ করেছে চাকরীর শর্তের সঙ্গে।

আর অসীম! সে স্পষ্টবাদী ভঙ্গুর সমাজের সব কিছু মিথ্যার সে মুখোশ খুলে দিতে চায়। তথাকথিত নিয়ম সে মানে না, রাজনৈতিক বিদ্রোহকেও তার মনে হয় চালাকি। যে কোন বন্ধনকে নীতি-বাক্যকে সে বলে মেকি ব্যাপার। তার কাছে জীবনের আসল অর্থ অন্য। সেই সমাজ, সেই চেতনা, সেই জীবনই তার কাম্য যেটা নিজস্ব জগৎ। আজীবন যার স্বপ্ন দেখে এসেছে সে।

আনজান মেহমান । সতীন্দ্র ভট্টাচার্য । অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

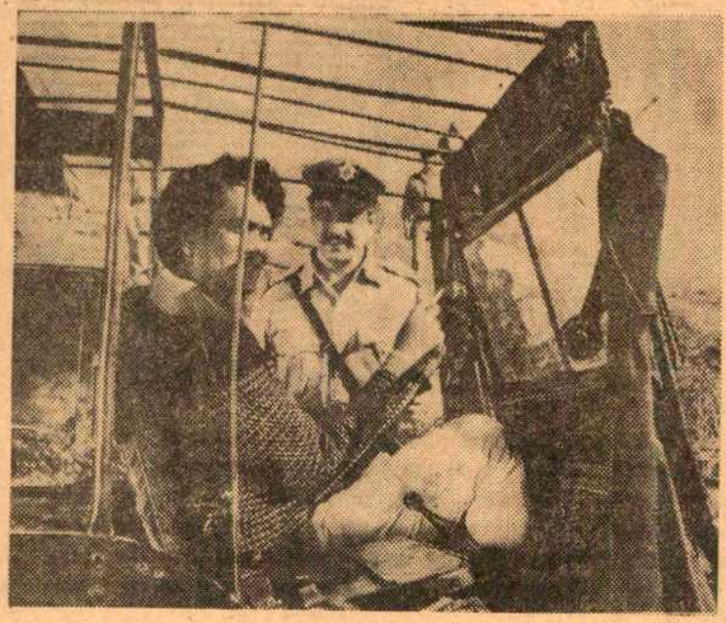

মোটামুটি তিনটে চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার, নির্দেশক ও অসীম চরিত্রের অভিনেতা (আশীষ দাশগুপ্ত) এই বক্তব্যই রাখতে চেয়েছেন।

সম্পূর্ণ নাটকটিই সংলাপনির্ভর। ফলে স্বভাবতই বিদ্রোহের কথা এবং সাধারণ জীবনের হাসি কান্নার সঙ্গে দর্শনও এসে পড়েছে। যা অনেক সময় রিপিটেশনের জন্য ক্লান্তিকরও মনে হতে পারে দর্শকদের কাছে।

কিন্তু গোটা নাটকটার মধ্যে এমন একটা টান রয়ে গেছে আগাগোড়া যে বসে দেখতে হয়। এটা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশেষ করে তিনটি মাত্র চরিত্র নিয়ে অভিনীত নাটকের ক্ষেত্রে।

এমনও হতে পারে, সেটা অভিনয়ের জন্যই সম্ভব হয়েছে, আবার এও হতে পারে যে সু-গ্রন্থনার জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছে। চলতি দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের মত ফ্লাশ ব্যাকে গল্পের অতীত অংশ জুড়ে দেওয়া ভাল লেগেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সব দৃশ্যগুলি দর্শক মনে কোন চমক সৃষ্টি করে না। এমন কি কংকাল থেকে অসীমে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্যটিও নয়। এ বিষয়ে আর একটু যত্ন নেওয়া আবশ্যক।

অসীমের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটি ফ্ল্যাট অভিনয়ের জন্য স-প্রাণ মনে হয়নি। অথচ হবার মত প্রচুর অবকাশ এবং সম্ভাবনা ছিল। তার চেয়ে এক হাতে কেরোসিনের টিন, অন্য হাতে হ্যারিকেন নিয়ে নায়কের পার্কে আসা এবং নায়িকার সঙ্গে বসে অন্তরঙ্গ কথা বলার দৃশ্যটি ভাল লেগেছে। সেখানে যেন কিছুটা কাব্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

চিঠি নিয়ে, চিঠির রহস্য নিয়ে এবং একটা সুখবর দিতে আসা নিয়ে নায়িকা ও সাংবাদিকের মধ্যে সংলাপ বিনিময় কোন কোন ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর মনে হয়েছে যদিও নায়িকার অভিনয়ের গুণে তা চাপা পড়ে গিয়েছে। তবু ঐ অংশের কিছু সংলাপ রি-এডিট করলে বোধহয় দৃশ্যগুলি আরো কম্প্যাকট হোত।

নায়কের অস্তিত্ব নাটকের সর্বত্রই সাধারণ ভাবনার পরিপন্থী। যে সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজের উপস্থিতি এবং বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেবার জন্য বদ্ধপরিকর—তার উপস্থাপনা সর্বত্র সমান মর্যাদা বা সমতা রক্ষার সহায়ক না হলেও চরিত্রটি নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন আশীষবাবু। তবে তাঁর বিপ্লবব্যঞ্জক সংলাপ আরো উদ্দীপক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতীনের চরিত্রে বাবুল দাশগুপ্ত প্রথম দিকে একটু আড়ষ্ট মনে হলেও শেষের দিকে তিনি তা অভিনয় দিয়ে ঢেকে দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে তাঁর কোর্টের দৃশ্যটি (প্রতীক) দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। তাঁর একটা বড় গুণ, তিনি যে অভিনয় করছেন না—তার চরিত্রটা লিভিং এটা তিনি আগাগোড়া মনে রাখার চেষ্টা করেছেন।

তবে তার সংলাপ অনেকাংশেই সাংবাদিকতা পেশার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল নয় অনেক ক্ষেত্রে নাট্যকারের স্ব-কল্পিত—এ কথাটি সবিনয়ে জানিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করছি।

ইন্দ্রাণীর চরিত্রে মায়া ঘোষ যেমন সুবলীল, তেমনি মুখর। তাঁর মাঝে মাঝে চরিত্র পাল্টে অন্য চরিত্রের রূপ দান বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। বিশেষ করে সেই ঝি চরিত্রটি। তিনি যে দক্ষ অভিনেত্রী তা এমনি কয়েকটি দৃশ্যেই স্ব-প্রমাণিত—অতি নাটকীয়তার ঝোঁক সত্ত্বেও।

কিন্তু অসীম সম্পর্কে তাঁর অতি-শয়োক্তি (সংলাপ মারফৎ) কোন কোন ক্ষেত্রে পুনঃপৌনিকতার দোষে দুষ্ট মনে হয়েছে। এমনি অনেক সংলাপকে ছেদন করলে নাটক পরিবেশনের সময় হয়তো সংক্ষিপ্ত হয়, তেমনি অন্যদিকে নাটকের বাঁধুনিও দৃঢ় হয়।

নাটকের বক্তব্য স্পষ্ট নয়—এ কথা ঠিক নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈপরিত্য লক্ষ্য করা গেছে। এমন অনেক সংলাপ আছে নাটকে স্থানবিশেষে আবার তাকেই অস্বীকার করা বা খণ্ডন করা হয়েছে। শেষ দৃশ্যে একটা পরিণতির ব্যাপার বোঝা যায়। কিন্তু সেটা কোন মত। মুষ্টিবদ্ধ জেহাদের না সামগ্রিক বিদ্রোহের। একথা নাটকে স্পষ্ট করে বলা হলে, এ নাটক বৈপ্লবিক বলে আখ্যায়িত হওয়া আদৌ বিস্ময়ের নয়। নাটকের কোথায় যেন একটা ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকিয়ে আছে। যাকে আরো একটু স্পষ্ট করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে সাহসিকতার সঙ্গে।

তাপস সেনের আলো সন্তুষ্ট করেনি। ট্রেনের দৃশ্যটি সেতু নাটকের সেই সাড়া জাগানো দৃশ্যটির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

এ নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বোধকরি তিমিরবরণের আবহসঙ্গীত। নাটকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার মত সুর রচনা ও প্রয়োগ ইদানিংকালে নজরে পড়েনি, যা এ নাটকের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। এমন এফেকটিভ মিউজিক একমাত্র বোধহয় তিমিরবরণের দ্বারাই সম্ভব।

মেটাল বকস অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয়

অপেশাদার নাট্য-গোষ্ঠীর শিল্পীরাও নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা থাকলে এবং অনুশীলনে যত্নবান হলে পেশাদারী পর্যায়ের অভিনয়ের দক্ষতা প্রদর্শনে যে সক্ষম তার স্বাক্ষর রাখলেন মেটাল বকস অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যেরা গত ৪ঠা ডিসেম্বর রবীন্দ্র-সদনে 'রাইফেল' নাটকের মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে। অভিনয়ে প্রশংসার দাবী রাখেন মধু গাঙ্গুলী বিশ্বনাথ বোস, সুনির্মল মুখার্জি, সুনীল ভট্টাচার্য, সুকুমার চ্যাটার্জি নির্মাল্য রায়, স্বপ্না মিত্র ও মায়া ঘোষ। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন কৃষ্ণ দত্ত, প্রলয় সান্যাল, প্রকাশ চ্যাটার্জি, রমেন দত্ত, নীরোদ সাহা, বিশ্বনাথ পাল, প্রবোধ ব্যানার্জি, প্রফুল্ল ভৌমিক প্রশান্ত সান্যাল সমরেন্দ্র গোস্বামী, চিত্তরঞ্জন তালুকদার, সত্য ব্যানার্জি, দুলাল ভট্টাচার্য, আরতি ঘোষ ও বেবী ঘোষ। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীভোলা দত্ত এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীসন্তোষ লাহিড়ী ও শ্রীপ্রাণেন সেন।

—নাট্য সমালোচক

সোনার কেল্লা

প্রযোজনা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগ

চিত্রনাট্য, পরিচালনা, অভিনয়ে ও আঙ্গিকে অনবদ্য ! ১৯৭৪-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি।

ছয় বছরের ছেলে মুকুল জাতিস্মর। ওর ধারণা তার শৈশব কেটেছে 'সোনার কেল্লা'র দেশে অর্থাৎ রাজস্থানে। সেখানে সে কেবল উট আর ময়ূর দেখেনি, বালির মধ্যে যুদ্ধ দেখেছে। মুকুলের বাবা ও মা ওর জন্যে চিন্তিত হয়ে, ডাক্তার হেমাঙ্গ হাজরার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওকে পরীক্ষা করে সন্দেহ করেন, পূর্বজন্মে মুকুল পশ্চিম রাজস্থানের বাসিন্দা হওয়ায়, সেখানকার কথা ওর মনে পড়ছে। ডাঃ হাজরা অবশেষে যোধপুর যাওয়া স্থির করলেন। ওখানে পৌঁছে শুরু করবেন মুকুলের সঙ্গে 'সোনার কেল্লা'র সন্ধান। রাজস্থানে রওনা হবার আগে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে, মুকুল জানায় পূর্বজন্মে তাদের বাড়ীতে অনেক মূল্যবান হীরা জহরত এবং মণিমুক্তা দেখেছে। আসলে ওর পিতা ছিলেন একজন মণিকার। সময়ে অসময়ে বাড়ীতে বসে মূল্যবান পাথরের বিলাস-দ্রব্য তৈয়ারী করতেন।

সাংবাদিকের ধারণা যে মুকুল 'গুপ্তধনের' কথা বলছে, সুতরাং পরদিন 'দৈনিক পত্রিকায়' রাজস্থানের মুকুলদের বাড়ীর গুপ্তধনের কথা প্রকাশিত হয়।

পাড়ার একটি ছেলেকে 'মুকুল' ভেবে দুই কুচক্রীর দ্বারা অপহৃত হয়, 'সোনার কেল্লা'র তথ্য অনুসন্ধানের জন্যে। পরে তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং অজ্ঞান অবস্থায় ওকে বাড়ীর কাছে ফেলে রেখে যায়। এজন্যে ছেলের বিপদের আশঙ্কা করে মুকুলের বাবা শখের গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরের শরণাপন্ন হন। উনি কাজের গুরুত্ব বুঝে খুড়তুতো ভাই তপসেকে নিয়ে যোধপুর রওনা হন। ইতিপূর্বে 'কাগজে' গুপ্তধনের সন্ধান করবার জন্যে মন্দার বোস ও অমিয়নাথ বর্মণ যোধপুরে রওনা হয়ে যান।

পথে বোস আর বর্মণ ডাক্তার হাজরার সঙ্গে দেখা করে মুকুলের সঙ্গে ভাব করে সোনার কেল্লা দেখানোর নাম করে মুকুলকে নিয়ে যাবার পথে ডাঃ হাজরাকে ধাক্কা মেরে এক কুচক্রী পাহাড় থেকে ফেলে দেয় এবং মুকুলকে নিয়ে সোনার কেল্লার পথে ট্রেন ধরে। যোধপুরে এসে ফেলু মিত্তির সার্কিট হাউসে ওঠে। সেখানেই মুকুলকে নিয়ে ডকটর হাজরার নামে দুই কুচক্রী বাস করছিল। ওরা বুঝলেন ফেলু মিত্তিরকে না মেরে ফেললে, তাদের আসল কার্য সিদ্ধি হবে না। দুই চক্রী হিপটোনাইস করে মুকুলের কাছ থেকে জেনে নেয়, জসলমীরে 'সোনার কেল্লা'র অবস্থিতি, কিন্তু ফেলু মিত্তির কম নন, জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলীর সহযোগিতায় মন্দার বোসকে জব্দ করেন ট্রেনে। যখন উনি 'ফেলু মিত্তির'কে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ডকটর হাজরার কামরায় গিয়ে আচমকা ভয় পেয়ে, ট্রেন থেকে পড়ে নিহত হন উনি। জসলমীর এসে ওরা দেখে, বর্মণ সাহেব মূল্যবান মণি-মুক্তোর খোঁজে মুকুলের পূর্বজন্মের বাড়ীর খোঁজ করছে। কিন্তু বেশী কিছু করবার আগে ওকে ধরা পড়তে হোল সখের ডিটেকটিভ ফেলু মিত্তিরের কাছে। এরপর সোনার কেল্লা আবিষ্কার করে ফেলুদা মুকুল ও তপসেকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হন।

সত্যজিৎ রায় ইতিপূর্বে নিজের লেখা কাহিনী নিয়ে কোন ছবি পরিচালনা করেন নি। 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবিটি ওর প্রথম শিশুচিত্র পরিচালনা আর সোনার কেল্লা হোল দ্বিতীয়। প্রথমটিতে উনি কাহিনীর সঙ্গে অনেক চমক সৃষ্টি করেছিলেন। চলচ্চিত্রের আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার অবকাশ নেই, এই কিশোরদের ছবিতে। তবুও উনি একটি সাধারণ অ্যাডভেনচারের অপূর্ব চলচ্চিত্রায়ন করেছেন। কাহিনীটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে উনি এবার খুব বেশী সিম্বল বা প্রতীকও ব্যবহার করেন নি। সারা ছবি জুড়েই পরিচালকের মাধুর্য ঘিরে আছে। প্রতি মুহূর্তেই চমক জাগে, পরবর্তী ঘটনা জানবার জন্যে। বিশেষ করে তিনটি দৃশ্যকেই সহজে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। যখন বর্মণ ট্রেনে মুকুলকে নিয়ে জসলমীর চলেছে সোনার কেল্লা দেখবার জন্যে, তখন ফেলু মিত্তিরের উঠে চড়ে ওদের পেছনে ধাওয়া, রাজস্থানের মরু-ভূমিতে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য। গভীর রাতে ট্রেনে সকলে ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে নীল আলো জেলে শোবার উদ্যোগ করতে, কুচক্রী মন্দার বোস ভোজালী হাতে ফেলু মিত্তিরকে হত্যা করার চেষ্টা প্রভৃতি, বিভিন্ন শট কম্পোজিসানে পরিচালকের অসাধারণ জ্ঞানের কথাই, স্মরণ করিয়ে দেয়। চলচ্চিত্রের প্রতিটি বিভাগের কাজেই ও'র প্রতিভার পরিচয় বহন করে। ছবিটির দৈর্ঘ্য কম হলে ভালো হোত।

অভিনয়ে মুকুল (কুশল চক্রবর্তী), তপসে (সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়), ফেলু মিত্তির (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়), জটায়ু (সন্তোষ দেব), মন্দার ঘোষ (কানু মুখোপাধ্যায়); বর্মণ (অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়), ডাক্তার হাজরা (শৈলেন মুখোপাধ্যায়), গোয়েন্দা কাহিনীর চরিত্রারোপে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য চরিত্রে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, হারীণ চট্টোপাধ্যায়, কেয়া চাটার্জি, শিউলি মুখার্জি, নিমাই ঘোষ প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন।

আলোকচিত্র গ্রহণে—সৌমেন্দু রায়, সম্পাদনায়—দুলাল দত্ত, শব্দ ধারণে—জে ডি ইরাণী, শিল্প নির্দেশনায়—অশোক বোস, তাঁদের প্রত্যেকের কাজই উচ্চাঙ্গের। পরিশেষে সত্যজিৎ রায়কে এ-জাতীয় শিশু-চিত্রের জন্যে ধন্যবাদ।

অংকুর

প্রযোজনা : ব্লেজ ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয় ও আঙ্গিকে ১৯৭৪এর শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করার পর বি এ পড়ার আগেই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে সূর্যকে কলেজ ছেড়ে বাবার ইচ্ছায় বিয়ে করে তার বালিকা বধূ সুরোকে ছেড়ে তাকে গ্রামে চলে যেতে হোল জমিদারীর কাজ তদারকির জন্য। ঠিক হোল সুরো প্রাপ্তবয়স্ক হলে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকবে।

কিছুদিন পরেই সেখানে সূর্য নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করে কাজ এবং সঙ্গীর অভাবে। বোধ হয় সেই জন্যই এবং নিজের অজানিতেই ক্রমে লক্ষ্মী নামে যে সদ্য বিবাহিতা সুন্দরী মেয়েটি তাদের বাড়িতে কাজ করে, তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে সে। প্রথমটা লক্ষ্মী অপ্রস্তুত হলেও সে সূর্যকে এড়াতে পারে না।

লক্ষ্মীর স্বামী বোবা ও কালা, এবং বেশ কিছুকাল ধরেই বেকার বলে, লক্ষ্মীর অনুরোধে সূর্য তাকে চালাকি করে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে গরুর গাড়ি চালাবার কাজ দিল। লক্ষ্মীর স্বামী দিনের শেষে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত, এসেই স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করত। একদিন হঠাৎ সে এক চুরির দায়ে ধরা পড়ে শাস্তি পাওয়ার লজ্জায় গ্রাম থেকে উধাও হয়ে গেল।

ফলে লক্ষ্মী অসহায় হয়ে পড়ায় সূর্য তাকে ভরসা দেয়। এবং বলে, প্রয়োজন হলে সে চিরদিনের দায়িত্ব নিতেও রাজী লক্ষ্মীর। কিন্তু লক্ষ্মী তাতে প্রমাদ গণে। কারণ, তার স্বামী ফিরে এলে? অথবা সূর্যর বাবা বা স্ত্রী যদি সহসা এখানে এসে উপস্থিত হয়?

কিন্তু সূর্য সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। সে তখন লক্ষ্মীর প্রতি অন্ধ প্রেমে আসক্ত। ব্যাপারটা নিয়ে এক সময় গ্রামে কানাকানি শুরু হোল। কিন্তু সূর্য নির্বিকার। দেওয়ালীর রাত্রে মাত্রাতিরিক্ত দেশী মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়া সূর্যকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা করার কথাও গ্রামের লোকের অজানা রইল না। কালক্রমে সেই কথা সূর্যর বাবা ও যুবতী স্ত্রীর কানে পেঁছিতেও দেরী হয় না।

সুরো গ্রামের বাড়ীতে পা দিয়েই লক্ষ্মীকে বিতাড়নের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। বাধ্য হয়ে তাই একদিন ফিরে যেতে হোল লক্ষ্মীকে তার পর্ণ কুটীরে।

সেখানে সহসা একদিন লক্ষ্মী আবিষ্কার করল যে সে মা হতে চলেছে। অথচ তার স্বামী দেশছাড়া। এ নিয়ে কানাকানি হলে সকলে সূর্যকেই সন্দেহ করবে।

কথাটা শুনে সূর্যও প্রমাদ গণে। সে লক্ষ্মীকে অনবরত অনুরোধ করে অঙ্কুরেই পেটের সন্তানকে নষ্ট করে ফেলতে। নইলে সে মুখ দেখাতে পারবে না লোকের কাছে। কিন্তু লক্ষ্মী তাতে রাজী হয় না।

হঠাৎ এক রাত্রে ওর স্বামী ফিরে আসতেই লক্ষ্মী প্রথমটা ভয় পেয়ে যায়। পরে মরিয়া হয়েই তাকে বলে যে, তার গর্ভে যে সন্তান বাড়ছে সে অবৈধ।

কিন্তু তার স্বামী সেকথা কানেই তোলে না। বরং সে খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কারণ, তারা আর এখন মাত্র দুজন নয়, তাদের মাঝে আরো একজন আসছে।

আর সেই সুখবর সূর্যর কাছে পেঁছে দিতে যেতেই সূর্য তাকে ভুল বোঝে এবং রাগে ফেটে পড়ে চাবুক দিয়ে তাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তোলে।

সেই অমানুষিক দৃশ্য দেখে সহ্য করতে পারে না লক্ষ্মী। তার নিরপরাধ স্বামীকে মারার জন্য সে সূর্যকে ধিক্কার দিয়ে স্বামীকে নিয়ে ফিরে যায় তার নিজের ঘরে।

এমন একটি গল্পকে কাব্যমণ্ডিত করে সেলুলয়েডে উপস্থাপিত করে আমাদের অবাক করে দিয়েছেন পরিচালক শ্যাম বেনেগাল। বলতে কি এমন বলিষ্ঠ পরিচালনা হিন্দী চিত্রজগতে বড় একটা দেখা যায় না। পরিচালক এ ছবিতে কোন গিমিক সৃষ্টি করেন নি, ফ্রিজ, স্টীল, মন্তাজ ইত্যাদিও ব্যবহার করেন নি, সহজ সরলভাবে গল্পটা বলে গেছেন মাত্র।

লক্ষ্মীর ভূমিকায় আশ্চর্য অভিনয় করেছেন সাবানা আজমী। সূর্যর চরিত্রের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে মূর্ত করে তুলেছেন নবাগত অনন্ত নাগ। লক্ষ্মীর স্বামীর চরিত্রে সাধু মেহের বিস্মিত করার মত অভিনয় করেছেন।

বনরাজ ভাটিয়ার আবহ সঙ্গীত ছবিকে প্রাণ দিয়েছে। সম্পাদনা, আলোক চিত্রগ্রহণ ও অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের।

বিদাই

প্রযোজনা : প্রসাদ প্রোডাকসন্স
বক্স অফিসের দিকে চেয়ে তোলা ছবি

একে একে সকলেই পার্বতীকে ছেড়ে চলে গেল। শোকে দুঃখে স্বামী যখন মারা যায় তখন ছেলে দুটি নাবালক, একমাত্র মেয়েটি (বোবা) ও খুবই ছোট।

তবু সব শোক ভুলে পার্বতী এক সময় দুঃখে-কষ্টে ছেলে-মেয়েদের যখন বড় করল, তখনও দেখলো কেউ যেন তার আপন নয়।

বড় ছেলে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে শহরে চলে গেল আত্মসুখের আশায়। মেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো পরিবারের সুনাম রক্ষার জন্য। আর ছোট ছেলে শহরে থেকে কলেজে পড়তে গিয়ে এক বড়লোকের মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলো। কিন্তু সেখানে বেশী দিন তারা থাকতে পারল না। বড়লোকের মেয়ে কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত নয় বলে। একদিন মেয়ের বাবা তাকে নিয়ে এলো নিজের কাছে। সঙ্গে নিয়ে এলো মেয়ের স্বামীকেও তাকে ছেড়ে মেয়ের থাকতে কষ্ট হবে বলে। নিঃস্ব রিক্ত পার্বতীর দুঃখ কেউ বুঝল না।

ক্রমে একদিন পুত্রবধূ পম্মা মা হলো। কিন্তু মাতৃভক্ত সুধাকর মার অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য সেই সন্তানকে পম্মার কাছে না রেখে নার্সের হাতে তুলে দিল দেখাশোনার জন্য। কারণ পম্মাও একদিন তাকে মার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল।

বিদাই। জীতেন্দ্র এবং লীনা চন্দ্রভারকর

কিন্তু পম্মা যখন মার মমত্ববোধের কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলো, তখন সুধাকরের মার অবস্থাও শোচনীয়।

এদিকে বড়ছেলেও একদিন সর্বস্ব খুইয়ে যখন পথের ভিখারী, তখন তার মাকে মনে পড়ল।

কিন্তু সেই মার কাছে যখন দুই ভাই-ই ফিরে এলো তখন সব শেষ। মা মৃত্যুশয্যায়।

মোটামুটি এই গল্প। কিছুটা চটুল কিছুটা আবেগপ্রধান। এক শ্রেণীর দর্শকের ভালই লাগবে।

জীতেন্দ্র (সুধাকর), সত্যেন্দ্র কাপুর (মধুকর) দুর্গা খোটে (পার্বতী), লীনা চন্দ্রভারকর (পম্মা) মোটামুটি ভালই অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় মদনপুরী, এ কে হাঙ্গল, অপর্ণা চৌধুরী জয়শ্রী টী আনোয়ার হুসেন ইত্যাদি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন বলা চলে।

প্রবীণ পরিচালক এল ভি প্রসাদ ভাবাবেগপূর্ণ কাহিনীটি পর্দায় রূপায়িত করার চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি।

লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুর মনোরঞ্জক। সুধেন্দু রায়ের শিল্প নির্দেশনা প্রশংসনীয়।

—চিত্রদূত

কহতে হ্যায় মুঝকো রাজা :
হিম্মতজিৎ। রেখা। অলকা

ফ্লোর থেকে বলছি

ছবির নাম 'ফুলশয্যা'। কিন্তু ফ্লোরে সেদিন ফুলও ছিল না শয্যাও ছিল না। আর এটা আদৌ বাড়ির শয়নকক্ষ নয়। বৈঠকখানা বলা যেতে পারে। এখানে এখন বেশ কিছু লোকজন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কাজ করছেন। ঘরের একদিকে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ঘরের একটা বেশ বড় অংশ আলো করা যাচ্ছে। লাউডন স্ট্রীটের এই বাড়ির সাজানো গোছানো ড্রইংরুমটি রীতিমত 'ফ্লোর'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। শুটিং হচ্ছে। আর্টিস্টরা রিহার্স করছেন। এই মুহূর্তে আর্টিস্ট বলতে ছবির নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং অলকা গাঙ্গুলী। 'সারথি' নামের পাড়ালে বেশ কয়েকজন তরুণ কলাকুশলী এবং শিল্পী এই ছবি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দেখলাম আর্টিস্টদের দৃশ্যটি বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন পরিচালক গোষ্ঠীর অন্যতম দুই কর্ণধার সর্বেন্দ্র এবং কাজল মজুমদার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সর্বেন্দ্র এই ছবির নায়ক। সে যাই হোক আপাতত..... সাইলেন্স.....সাইলেন্স...। চারিপাশে 'সায়লেন্স ঘোষিত হল। আর্টিস্টরা যে যার পজিশনে এলেন। পরিচালক গোষ্ঠী ফাইনাল মনিটর অর্থাৎ ফাইনাল রিহার্সাল দেখে নিতে চান। বেশ ভাল কথা। ক্যামেরাম্যান বিজয় দে ওরফে গুপীদা তৎক্ষণাৎ হাঁক ছাড়লেন 'অল লাইটস'। সঙ্গে সঙ্গে শুটিং জোন একেবারে আলোয় আলোয় ভরে গেল। ডে সিকোয়েন্স। ক্যামেরা তার প্রয়োজনমত মুখ এদিক ওদিক ঘোরাল। বলতে কি সুচন্দ্রা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন। এসে দেখেন ধীরা অলকা গাঙ্গুলী বই পড়ছেন। বই বন্ধ করে ধীরা মুখ তুলল। সুচন্দ্র জিজ্ঞাস করলে : বাবা কোথায়?

ধীরা : ও মা তুমি বুঝি জান না, বাবা তো আজ সকালেই একটা জরুরী মামলা নিয়ে দিল্লী চলে গেছেন।

সুচন্দ্রা আশ্চর্য : দিল্লী চলে গেছেন?

ধীরা : তুমি সব সময় অন্য কাজে ব্যস্ত থাকো। তা বাবাকে আজ প্রয়োজন ল কেন বলো ত।

সুচন্দ্রা : সব খবরই তুমি রাখ। বাবাকে আমার কেন প্রয়োজন সেটা তুমি জান না?

ধীরা : তুমি কি বলতে চাইছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

সুচন্দ্রা : না বোঝার ভান করলে কোনো কিছু বোঝা যায় না।

ধীরা : মানে?

সুচন্দ্রা : মানেটা তোমার শ্বশুর যাবার আগে তোমায় বলে যায়নি।

এত কথাবার্তা যে বলা হল আমিও কি ছাই অতশত মানে বুঝলাম। বুঝেও না বোঝার ভান করতে হচ্ছে। কেননা পরিচালক গোষ্ঠী ছবির গল্পটি ডিসক্লোস করতে চাইছেন না। কারণ গল্পের বাঁকে বাঁকে আছে চমক। চমকটা আগেভাগে বলে দিলে ছবি দেখতে বসে মজাটা পাওয়া যাবে না। এটা বোধকরি স্থিরসিদ্ধান্ত। তাই আপনারা শুধু এই জানবেন যে গল্প প্রধানত পাঁচজন যুবক এবং একজন যুবতীকে ঘিরে। পাঁচজন যুবক—পঞ্চ পান্ডব উল্লেখ করা হল। এই পঞ্চপান্ডব যথাক্রমে : সর্বেন্দ্র অনুপকুমার অসীমকুমার নির্মলকুমার এবং সতীন্দ্র ভট্টাচার্য। বিপরীতে একজন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করছেন : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ছায়া দেবী দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অমরনাথ মুখোপাধ্যায় মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় বাবলু সমাদ্দার প্রভৃতি। দুটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী। চিত্রনাট্য রচনা করছেন পরিচালক গোষ্ঠী। সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন অসীমা ভট্টাচার্য। ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের সঙ্গীত গ্রহণ সুসম্পন্ন হয়েছে। নেপথ্যে কণ্ঠদান করছেন মান্না দে ও হৈমন্তী শুক্লা।

জুপিটার প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে নির্মীয়মান এই ছবির শিল্পনির্দেশক

ইজিজ। রাজশ্রী বসু

সুনীতি মিত্র। সম্পাদক ঃ অমিয় মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপক প্রশান্ত পাট্টাদার।

সেদিন নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে এলাহি ব্যাপার। দুদিক থেকে দুটি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। স্টুডিওর একটি ফ্লোরের পাশে খানিকটা নীচু জমি আগে এখানে পুকুর ছিল এখন শুকিয়ে কাঠ—আলো করা হচ্ছে। বিরাট শুটিং জোন। চারিদিক দেখতে দেখতে দেখা হল পরিচালক শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতার সঙ্গে। শ্রীকান্ত বললেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা কাজ শুরু করব।

বেশ ঠান্ডা পড়েছে। চারিদিক উন্মুক্ত। সন্ধ্যে পার হয়ে এসেছে। ক্রমশঃ অন্ধকার হচ্ছে। শীতের রাত। স্টুডিওর লোকজন ছাড়া বাইরের লোকজন খুবই কম। ঠিক বিপরীতে মুক্ত আকাশের নীচে সেট ফেলে পরিচালক তরুণ মজুমদার 'সংসার সীমান্তে'র কাজ করছিলেন। হয়তো কিছু-সময় বিরতি ছিল। তাই তিনি ঘুরতে ঘুরতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সকলেই ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কেননা আলো করা হয়ে গিয়েছে। ক্যামেরাম্যান বিজয় ঘোষ গ্রীন সিগন্যাল পাবার অপেক্ষায় বসে আছেন। সমস্ত কলাকুশলীরাই অপেক্ষা করছেন।

দৃশ্যটা কি—এখানে দেখানো হবে নায়িকা বাসবী নন্দী বাংলাদেশের আগেকার পূর্ব পাকিস্থানের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে হচ্ছে। রাজাকাররা নায়িকাকে তাড়া করছে। নায়িকা দৌড়তে দৌড়তে এই এখান থেকে গড়াতে শুরু করবে।...শুনে তো আমার চক্ষুস্থির। বলে কি! ফিল্মের নায়িকারা ওপর থেকে এভাবে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়বে—অসম্ভব! তাও আবার এতটা দূরত্ব। এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ডামি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শ্রীকান্ত বললেন—সেসব ঠিকই। কিন্তু বাসবী নন্দী ডামি ব্যবহার করতে চান না। সরেজমিন তদন্ত করে তিনি নিজেই এরকম একটি দুরূহ শট দিতে সম্মত হয়েছেন। সকাল থেকে শুটিং করে একটুও ক্লান্ত নন। বরং উজ্জীবিত। নতুন করে মেক-আপ নিচ্ছেন। একেবারে অন্য সিকোয়েন্স তো। নায়িকার জীবনের অতীত ভাগ।... বলতে বলতে বাসবী এসে উপস্থিত হলেন। দেখা হলে কুশল প্রশ্ন-উত্তর বিনিময় হল। তিনি কথা বললেন, হাসলেন কিন্তু স্পষ্ট হল তাঁর মন পড়ে আছে সিকোয়েন্সে। হ্যাঁ খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই তিনি এগিয়ে গেলেন নিজের জায়গায়। নো রিহার্সাল। একেবারেই শটটি টেক করা হবে। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। দৃশ্যটি আরেকবার বুঝে নিলেন বাসবী। দেখে মুখে অসহনীয় অবস্থা ফুটিয়ে তুলে ছুটলেন। সামান্য কয়েক হাত দূরত্বে রাজাকাররা। বাসবী ছুটছেন ওরাও ছুটছে। এই-ভাবে একটুখানি জায়গা অতিক্রম করতে না

সূর্যকন্যা। জয়শ্রী রায়

করতে বাসবী পড়লেন। ঠিক যা চেয়েছিলেন পরিচালক। গড়াতে গড়াতে নীচে। 'কাট' ঘোষণার পরও বাসবী উঠছেন না। কি হল? সকলে পড়ি কি মরি করে এগিয়ে গেলেন। বাসবী মাথায় হাত দিয়ে তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। রক্ত ঝরছে। মাথায় সামান্য আঘাত পেয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি উঠে বসলেন। ফার্স্ট এড করা হল। রক্ত ঝরে ঝরুক শটটা কেমন হয়েছে জানতে চাইলেন বাসবী প্রথমেই। শ্রীকান্ত কি বলবেন আবেগে তার কন্ঠরোধ হয়ে আসছিল। তবু তিনি বললেন ঃ এ শটের দাম লাখ টাকা ...

ছবির নাম 'পরস্ত্রী'। জুবিলী ফিল্মসের পতাকাতলে নন্দিতা দাশগুপ্তের প্রযোজনায় তৈরী হচ্ছে। বিমল মিত্রের কাহিনী। সলিল দত্তের চিত্রনাট্য। নায়ক ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক মান্না দে। —স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

'রাজা'র শুটিং শেষ করে পরিচালক তপন সিংহ নতুন ছবির পরিকল্পনা করেছেন। ইতিমধ্যে প্রাথমিক কাজকর্ম সুসম্পন্ন। ছবির নাম 'হারমোনিয়াম'। বিষয়বস্তু, সিরিও কমিক। কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীসিংহ নিজেই। এ ছবিতে সঙ্গীতের ভূমিকা অসামান্য; অনেকগুলি গানও থাকছে। গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে শুভ সূচনা নির্ধারিত হয়েছে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে। শ্রীসিংহের তত্ত্বাবধানে কণ্ঠ দেবেন ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মান্না দে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ ঘোষাল হৈমন্তী শুক্লা তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিপ্ত ভট্টাচার্য। প্রতাপ আগরওয়াল ও আর জালান যথাক্রমে দার্জিলিং ও উড়িষ্যার দু খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর প্রযোজনায় এ ছ নির্মিত হতে চলেছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদ করছেন নামী অনামী অনেক শিল্পী। এ পর্যন্ত যাঁদের নাম পাওয়া গিয়েছে তাঁ হলেন ঃ কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমাংশু ব সন্তোষ দত্ত অরুণ মুখোপাধ্যায় ভীষ্ম গ ঠাকুরতা এবং সমিত ভঞ্জ। শোনা যা অনিল চট্টোপাধ্যায় ও আরতি ভট্টাচ দুটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করবেন। ছি

বন্দীবিধাতা। রুহী

গ্রহণ করবেন : বিমল মুখোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দেশনায় আছেন : সুনীতি মিত্র। সম্পাদনা করবেন : সুবোধ রায়।

প্রবীণ পরিচালক চিত্ত বসু অনেকদিন পর ছবি করবেন স্থির করেছেন। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা। জানুয়ারী মাস থেকে শুটিং শুরু হবে। মণি বর্মার কাহিনী ও চিত্রনাট্য। ছবির নাম এখনো স্থির হয়নি। সামাজিক কাহিনী। প্রধান তিনটি চরিত্রের শিল্পী : অনিল চট্টোপাধ্যায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপ রায়। আসলে এ ছবির নায়ক-নায়িকা—বারো।চৌদ্দ বছরের ছেলে-মেয়ে, নতুন মুখের সন্ধান মিলবে। ইকনমিক পিকচার্সের পতাকাতলে নির্মিত হবে। ছবির শুটিং প্রোগ্রাম চক-আউট করে ফেলা হয়েছে। জানুয়ারী মাসে টানা শুটিং।—আউটডোরে। প্রথমে উশ্রী ফলস-এ সেখান থেকে যশিডি হয়ে মান্দার হিলস-এ। ছবির বেশীর ভাগ অংশ তোলা হবে আউটডোরে। চিত্রগ্রাহক : বিভূতি চক্রবর্তী।

'বালক শরৎচন্দ্র' নামে একখানি ছবির কয়েকদিন শুটিং হল টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। ক্যাপ্টেন ঘোষের প্রযোজনায় এই ছবি নির্মিত হচ্ছে। রাজকুমার রায়চৌধুরীর চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন জয়ন্ত সাহা। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী : আনন্দ রায়চৌধুরী সুব্রতা ব্যানার্জি দেবু মুখার্জি বিউটি ব্যানার্জি মল্লিকা মজুমদার স্বাতী বিশ্বাস রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট) প্রদীপ কুন্ডু বরুণ দাশগুপ্ত বিদ্যুৎ গোস্বামী অনিমেষ চক্রবর্তী তরুণ সেনগুপ্ত বীরেন ভট্টাচার্য ভারতী দেবী জ্ঞানেশ মুখার্জি সঞ্চিতা মুখার্জি এবং সমীর লাহিড়ী। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকখানা গান রেকর্ড করা হয়েছে। কন্ঠদান করেছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হৈমন্তী শুক্লা। আলোকচিত্রশিল্পী : শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিথুন পিকচার্সের ব্যানারে পরিচালক সলিল রায় (যিনি 'জীবনরহস্য' নামে একখানি ছবি করেছেন) নতুন ছবি শুরু করবেন 'এলেম নতুন দেশে'। সম্ভবতঃ জ্যোতির্ময় রায়ের কাহিনী অবলম্বনে জ্ঞানেশ মুখার্জির চিত্রনাট্যে এই ছবি তৈরী হবে। নায়ক চরিত্র রূপায়িত করবেন সমিত ভঞ্জ। নায়িকা চরিত্র রূপায়িত করতে বম্বে থেকে যোগিতা বালী আসতে পারেন। ইতিমধ্যে এ ছবির গান রেকর্ড করা হয়েছে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে গেয়েছেন : আরতি মুখোপাধ্যায়।

—স্টুডিও-সংবাদদাতা

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

ডিম্পলের বোন সিম্পল রাজেশের বিপরীতে নায়িকা হয়েছেন এটা এখন বম্বের জোর খবর। সিম্পল যে এত সিম্পলি নায়িকা হবে এটা বম্বের ছবির জগতের কেউই স্বপ্নেও ভাবেননি। যাই হোক যেহেতু ডিম্পলের বোন—মাতামাতি চলছে। রাজেশ প্রেসের লোকজনকে বাড়িতে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। ছবি তোলাচ্ছে। শ্যালিকার জন্য জামাইবাবু লড়ে যাচ্ছেন। পাবলিসিটি অ্যাকাউন্টে জামাইবাবু ইতিমধ্যে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছেন। ফলে কাগজে সিম্পলের ছবি আর ইন্টারভিউ বেরোচ্ছে। পাঠক পাঠিকারা পড়ে ধন্য হচ্ছেন।

কিম্মি নামে একটি নতুন মেয়ে এসেছে বম্বের ছবির জগতে। এসেই টু-পিস পরে ছবি-টবি তুলে বিখ্যাত হবার চেষ্টা করছে। জানা গেল কিম্মী নৃত্য-পটিয়সী (কতজনকে নাচাবে কে জানে!) গোপীকিষণের ছাত্রী। লন্ডনে জন্মকর্ম। মাত্র তিন মাস আগে ভারতে এসেছে। এসেই নাচ শিখতে শুরু করেছে। (নাচাতে শুরু করেনি ভাগ্য!) সান-এন-স্যান্ড হোটেল থেকে কিম্মিকে আবিষ্কার করেছেন কয়েকজন তরুণ অভিনেতা। যেমন ড্যানি রমেশ শর্মা ঋষি কাপুর...। স্বাস্থ্যবতী নায়িকা হবার যোগ্যতা আছে কিনা প্রমাণিত হয়নি তবে যৌবন আছে। একটা ছবিতে কাজ করছে সাজিদ খানের বিপরীতে—'আওয়ারা জিন্দেগী'। অনেকের মতে কিম্মি যে কিমতি—সন্দেহ নেই।

একদা রাজেশের প্রেমিকা অঞ্জু মহেন্দ্র আর প্রেমে পড়তে চান না। অঞ্জুর মতে—প্রেমের ফাঁদে পড়তে চাই না। এই পৃথিবীতে সত্যিকারের প্রেম বলতে কিছু নেই। সত্যিকারের প্রেমের বদনাম করেন অনেকে। আমরা খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছি। জীবন চলেছে সেইভাবে।...উই আর অল মুভিং সো ফাস্ট উই হ্যাভ নো ভ্যালু ফর এনিথিং ইন লাইফ।

অভোসই বলুন আর যাই বলুন সায়রা মাঝে মাঝে গায়েব হয়ে যান। সে কি মশাই! এতবড় মেয়ে বলা নেই কওয়া নেই পালিয়ে যায়। আবার ফিরে আসে কোন্ মুখে। যে মুখ দেখে রাজেন্দ্র মজেছিল, শাম্মী দিওয়ানা হয়েছিল, ধর্মেন্দ্র মরিয়া হয়ে উঠেছিল, দিলীপ প্রথম দেখাতেই প্রেম নিবেদন করে বসেছিল এবং অবশেষে শহীদ হয়েছিলো। এই বিউটি কুইনকে ঘিরে বম্বের ছবির জগতে চাঞ্চল্য এখনো শেষ হয় নি। কেননা সায়রা তাঁর রূপযৌবনের পসরা নিয়ে আবার বাজার গরম করে দিয়েছেন। মাঝে অসুস্থ থাকার জন্য অনেক কিছু হাতছাড়া হয়েছে। সায়রা সেসব ফিরে পেতে চাইছেন। এমনকি, পুরোনো অ্যাসো-সিয়েশান। কিন্তু তা কি করে সম্ভব। রাজেন্দ্র'র আর সেই দিনকাল নেই। সে এখন টপ হিরো নয়, রীতিমত পড়তি অবস্থা। ও'র সঙ্গে প্রেম করে লাভ কি। করতে চাইলেও রাজেন্দ্রর সময় নেই। সে এখন নানারকম ব্যবসাপত্তর নিয়ে খুব খুব ব্যস্ত। ধর্মেন্দ্র'র হাতে এখন অনেক নায়িকা—অনেক গার্ল ফ্রেন্ড। হেমা'র সঙ্গে নীরব প্রেম, আশার সঙ্গে অর্থাৎ আশা সচদেবের সঙ্গে উদ্দাম প্রেম, শর্মিলার সঙ্গে প্রেম শুধু প্রেম নয় ইত্যাদি নিয়ে সে আছে। বেশ আছে। সেখানে শুধু শুধু নাক গলিয়ে লাভ নেই। সায়রা সাত পাঁচ ভাবছিলেন ঠিক এমন সময় ঘটনার গতি একদম ঘুরে গেল। মিসেস বিমল রায়ের

শতাব্দীর সংলাপ ভণ্ড সভ্যতার নগ্ন চিত্র —দর্পণ
বয়েজ ওন হলে রূপমায়া
শনি, রবি ও ছুটি ৩, ৬৸ বুহ ৬৸
শতাব্দীর সংলাপ
নাটক ও নির্দেশনা—রাখাল দাশ

ষ্টার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ফোন : ৫৫-১১৩৯
প্রতি বুহঃ ৬॥
শনি, রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥
কুনাল মুখার্জির নতুন নাটক
পরিচয়
• পরিচালনা : বঙ্কিম ঘোষ
• আলো : তাপস সেন
রূপায়ণে : বঙ্কিম, হরিধন, সতীন্দ্র, অমরনাথ, পঞ্চানন এবং শুভেন্দু ও শমিতা বিশ্বাস

শর্মিলা।রাজশ্রী বসু

'চৈতালী' ছবির অফার। শর্মিলার বদলে সায়রা। নায়ক ধর্মেন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো প্রেম নতুনভাবে সাড়া দিল। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে কাজ করছি বলো ত দুজনের মুখে ঘুরে ফিরে এককথা। এই কথাটা বোধকরি বাতাসে ভর করে পৌঁছে গিয়েছিল দিলীপের কানে। তা না হলে দিলীপ হঠাৎ 'চৈতালী'র শুটিংএ আসবেন কেন? এই নিয়ে গৃহযুদ্ধ। তারপর থেকে সায়রার ধারণা দিলীপ ও'কে সন্দেহ করে। অথচ সে নাকি তার পতিকে দেবতার মতো পুজো করে। প্রত্যহ দু'বেলা।

অমিতাভ'র সঙ্গে জয়ার এখন অনেকটা ফারাক। আগে ঠিক উল্টো ছিল। এখন অমিতাভ'র হাতে অনেক ছবি। জয়ার হাতে ছবির সংখ্যা খুব সামান্যই। কেউ কি এরকম ধারণা করতে পেরেছিলেন? মোটেই না। সকলে এই ধারণা করেছিলেন বউ'র পয়সায় বসে খেতে হবে, অমিতাভকে। সেসময় অমিতাভ'র সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল না। অনেকেই মনে করেছিলেন 'লম্বু হাওয়া' হয়ে যাবে—জয়ার জয়াকার চলছে, চলবে। চলল না। কারণ অহঙ্কারই পতনের মূল। জয়ার লম্বা-চওড়া লেকচার লম্বুজী পছন্দ করলেও বম্বের ছবির জগতের আর পাঁচজন পছন্দ করলেন না। আস্তে আস্তে জয়া হারিয়ে যাচ্ছেন। অমিতাভ, অমিতবিক্রমে এগিয়ে চলেছে। খুবই স্বাভাবিক এতে ও'দের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ঠিক থাকতে পারে না। এ'দের দুজনের মাঝখানে একটাই মুখ, ইদানীং স্পষ্ট—সে মুখটি হলো সঞ্জীবকুমারের।

বিখ্যাত পরিচালক বি আর ইশারা—রেহানা সুলতান, বি আর ইশারা রীণা রায় কেচ্ছা ইতি হয়েছে। এখন বাজারে জোর গুজব ইশারার প্রেমে পড়েছেন জীনত আমান। জিনি বেবী, এই নামেই ইশারা, জিনতকে ডাকাডাকি করেন। যখন তখন ও'র বাড়িতে আসেন। জিনত-এর শুটিং না থাকলে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে গল্প করেন। তাহলে 'প্রেমশাস্ত্র' আবার হবে নাকি?

রাজ কাপুর তাঁর আগামী ছবির জন্য নায়িকা খুঁজছেন। পরপর ছবিতে নতুন নায়িকা—যেমন ছেড়েছেন ডিম্পলকে। রাজের বিরাট পরিকল্পনা। বছরে দু'খানা ছবি করবেন। একটাতে হিরো ডাব্বু, আরেকটাতে চিন্টু যথাক্রমে রণধীর এবং ঋষি। একই নায়িকাকে দুটো ছবিতে নেবেন না। তাহলে ভাই ভাই সম্পর্ক থাকবে না। ভাই ভাই ঠাঁই হবে।

এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার বলরাজ সাহানীর পুত্র অজয় সাহানী'র মতো একজন নিপুণ অভিনেতা বম্বেতে স্থান করে নিতে পারছেন না। অজয়ের মধ্যে অনেক কিছুর অভাব আছে। 'ছবিতে কাজ দিন' মুখ ফুটে বলতে পারে না। তৈলসিঞ্চন করতে পারে না। গুল ঝড়তে পারে না। সার বুঝে অজয় অন্য ধান্দা করছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টা করছে।

—অভিজিত

বিদেশী ছবি

ইনহেরিট দি উইন্ড

সম্প্রতি ইউ. এস ইনফর্মেশন সার্ভিস যে ছবিটি নির্দিষ্টসংখ্যক দর্শককে উপহার দিলেন তার নাম 'ইনহেরিট দি উইন্ড'। পরিচালক প্রখ্যাত স্ট্যানলি ক্র্যামার। ছবিটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

বর্ণবৈষম্যের মত ধর্মান্ধতা এবং অন্ধ সংস্কার আজও পৃথিবীর অনেক স্থানেই রয়ে গেছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি মানুষ যে এখনও অনেক কিছু সংস্কার থেকেই মুক্ত হতে পারেনি এ কথাও সমান সত্য।

বরং বলা যায়, একদিকে যেমন মানুষ সভ্যতার আলোয় নিজেদের নতুন করে দেখতে শিখছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটছে, তেমনি আবার অন্যদিকে ধর্মান্ধতা, অন্ধ সংস্কার গোঁড়ামী এবং নিষ্ঠুরতা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে।

বৃহত্তর কোন যুদ্ধ বা সম্মিলিত ঐক্য প্রচেষ্টাও ঐসব জাতের মানুষকে শুভ-বুদ্ধির দিকে মুখ ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

যার ফলে মানুষের ভিতরে সেই আগের মতই হানাহানি, তারতম্যবোধ, আদিমতা রয়েই গেছে।

'ইনহেরিট দি উইন্ড' মানুষের অন্ধ বিশ্বাস এবং প্রাচীন সংস্কারের ওপর একটি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। ছবিটি সেইদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য।

ভগবানের নামে অন্ধ বিশ্বাসী এমন একটি সম্প্রদায়-অধ্যুসিত এক অঞ্চলের স্কুলে যে মাস্টারটি এলো যে প্রথমেই ছাত্র-ছাত্রীদের ম্যাপ এবং বইয়ের সাহায্যে বোঝাতে চাইল, আমরা ঈশ্বরবিশ্বাসী হই আর নাই হই না কেন, আসলে আমাদের পূর্বপুরুষ যে বাঁদর ছিলেন, অর্থাৎ আমরা যে সেই যুগ থেকে ধাপে ধাপে মানুষে রূপান্তরিত এবং ক্রমে সুসভ্য হয়েছি, ডারউইন সাহেব তা নানা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

যুব সমাজের কাছে এ কথাটা বিস্ময়ের এবং কৌতূহলজনক হলেও প্রাচীন মতে বিশ্বাসী ধর্মভীরু মানুষের তা মনঃপূত হোল না। তাঁরা বললেন, এ ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত করা। এমন শিক্ষা পেলে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিভ্রান্ত এবং ধর্ম-বিদ্বেষী হয়ে উঠবে।

সেটা ক্রমে আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়াল।

বস্তুত ছবিটিকে বিপ্লবাত্মক বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। কোর্টে দু'পক্ষের উকিলের কুসংস্কার ধর্মান্ধতা, অন্ধ সংস্কার এবং বিপরীত মত নিয়ে যুক্তি-তর্কের অবতারণা—যেখানে শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে (অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও বাইবেলে এতকাল পর্যন্ত যে ভুল ব্যাখ্যা হয়ে আসছিল তাকে খণ্ডন করা)—এই অংশের ধারালো এবং সাহিত্যরসপুষ্ট সংলাপ, প্রতিটি কথা দর্শককে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

মানুষের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার আজকের বিজ্ঞানের যুগে তার মূল্যায়ন যেন ছবিটিকে আলাদা একটি পর্যায়ে তুলে দিয়েছে।

এ ছবি ভারতীয়দের আরো ভালো লাগার কারণ, ধর্মান্ধতা এদেশ থেকে অনেকটা সরে গেলেও সংস্কারের শিকল এখনও আমাদের পায়ে পায়ে ঝঙ্কার তোলে।

ডারউইন সাহেবের থিওরী আমরা অনেককাল আগেই স্বীকার করে নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেই অনুপাতে আজও কি আমরা সংস্কারমুক্ত হতে পেরেছি?

ছবির শেষটুকু যেমন উত্তেজক তেমনি বিষণ্ণতায় ভরা। শিক্ষিত অথচ গোড়া সংস্কারাচ্ছন্ন উকিল যুক্তিতে হেরে গিয়েও যেন সত্যের কাছে মাথা নোয়াতে পারছেন না—এ বড় মর্মান্তিক।

সেই মানসিক দ্বন্দ্ব, পরাজয়ের গ্লানি আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে ফ্রেডরিক মার্চের অবিস্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে।

স্পেন্সার ট্রেসী অভিনয় করেছেন যুক্তিবাদে বিশ্বাসী উকিলের ভূমিকায়। তাঁর সে অভিনয় না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

যুগমানব কবীর। মাধবী চক্রবর্তী

বস্তুত বিষয়বস্তু ও তার বক্তব্য ছাড়া, এই দুজনের অভিনয়ই ছবিটির প্রধান সম্পদ।

গোর্কী সদনে চলচ্চিত্র উৎসব

গত ২৩শে ডিসেম্বর কোলকাতার গোর্কী সদনে সোভিয়েট কনসুলেট-এর কোলকাতা শাখার সাংস্কৃতিক বিভাগ ও সোভেকসপোর্ট ফিল্মের যুগ্ম উদ্যোগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়।

অনুষ্ঠানে ডঃ জে হেডরিচ, জি ডি আর কনসুলেট, ডঃ এফ কুরকা, চেক কনসুলেট মিঃ হেনরিক সজুকোওয়াস্কি পোলিশ কনসুলেট, মিঃ এল গুরোভ বুলগেরিয়ার ট্রেড কমিশনার মিঃ পজগাই, হাঙ্গেরীর ট্রেড কমিশনার এবং মিঃ এস কুজমেঙ্কো, কলিকাতাস্থ 'সোভেকসপোর্ট' ফিল্মের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন করেন কলিকাতাস্থ ইউ এস এস আর-এর কনসুলেট জেনারেল মিঃ জি. এ. ডিউলিন।

অমৃতবাজার পত্রিকার চলচ্চিত্র সম্পাদক ও বি এফ জে এ'র সভাপতি শ্রীনির্মল-কুমার ঘোষ (এন কে জি) অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং ভারতীয় দর্শন ও মানসিকতার সঙ্গে সাদৃশ্যের উল্লেখ করেন এবং এই ধরনের চলচ্চিত্র উৎসবের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে জোর দেন। তিনি বলেন, এতে উভয় দেশের মধ্য আত্মিক যোগ আরো সুদৃঢ় হবে এবং উভয়কে উভয়ের ঘনিষ্ঠভাবে চেনার সুবিধে হবে।

উৎসবের বিভিন্ন দিনে গণতান্ত্রিক জার্মান, চেকোশ্লোভাক পোলিশ, বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীর ছবি প্রদর্শিত হয়।

২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের অন্য আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের শিল্প এবং চলচ্চিত্রে অগ্রগতি সম্পর্কিত এক ছবির প্রদর্শনী।

—শাঃ রঃ চ

বাংলাদেশের ছবি

আপনারা যাঁরা আমার বাংলাদেশের ছবির খবরের পাঠক (দর্শক নন)—তাঁরা নিশ্চয় জানতে চান, এখন বাংলাদেশে মানে ঢাকায় সর্বমোট কটি ছবির কাজ চলছে।

কিন্তু নির্মাণাধীন ছবির মোট সংখ্যা আমি কেন যাঁরা ছবি নির্মাণ করেন তাঁরাও চট করে ঠিক ঠিক বলতে পারবেন না। তবুও আপনাদের সামনে মোটামুটি কিছু ছবির খবর তুলে ধরছি।

ধান্য মেয়ে একটি ছবির নাম। এ ছবির পরিচালক দুজন—বাবুল চৌধুরী ও হাসমত।

ছবির সঙ্গীত-পরিচালক সত্য সাহা এবং চিত্রগ্রহণে আছেন অরুণ রায়। ধান্য মেয়েতে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যথাক্রমে—কবিতা উজ্জ্বল, সুমিতা, জরিনা, জাবেদ, রহিম হাসমত প্রমুখ। ছবির কাজ—বিজ্ঞাপনের ভাষায় দ্রুত সমাপ্তির পথে। এ ছবির প্রযোজক ও পরিবেশক সঙ্গীতা ফিল্মস মধুমিতা মুভিজ।

শ্রীমতী চারশ বিশ : সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া পরিচালিত ও নির্মীয়মান একটি ছবির নাম। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক আনোয়ার কবীর। চিত্রগ্রহণ আমির হোসেন ও সংলাপ রচয়িতা মাহফুজ সিদ্দিকী।

শ্রীমতী চারশ বিশ ছবিতে যে সব শিল্পী অংশ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন অলিভিয়া আলমগীর চন্দনা ফতেহ-লোহানী রাজা মীপারা জামান রবিউল সহিফুদ্দিন ও রোজী সামাদসহ আরো অনেকে। এ ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশক নিশান ফিল্মস।

এক এ বেণু **আকাশ কুসুম** নামের একটি ছবির পরিচালনা করছেন। এ ছবির প্রযোজক আমীর আলী। ছবির নায়ক-নায়িকা ওয়াসীন ও নবাগতা সাগরিকা

তাল-বেতাল : একটি ছবির নাম। এ ছবির পরিচালক আজিজুর রহমান। সঙ্গীত-পরিচালক সত্য সাহা। এ ছবিতে আছেন সুচরিতা, শুভ্রা দে রোজী প্রমুখ।

ইবনে-মিজান তার নিজস্ব পদ্ধতিতে এবার **জীঘাংসা** নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এ ছবিতে মানে জীঘাংসায় আছেন জবা চৌধুরী ওয়াসিম সুচরিতা আনোয়ার হোসেন ফতেহ লোহানী খলিল ও জসীম প্রমুখ।

উল্লেখ্য সম্প্রতি ইবনে-মিজাম পরিচালিত একটি কপ্তা পচা এবং অতিসাধারণ ছবি ডাকু মনসুর মুক্তি পেয়েছে।

কামাল আহমেদ বহুদিন পরে একটি করে ছবি তৈরী করেন। এবার তিনি **উপহার** তৈরীতে মনোযোগী হয়েছেন। এ ছবির কাহিনীকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার।

উপহারে যাঁরা অর্থাৎ যে সব শিল্পী অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে রাজ্জাক কবরী মোস্তাফা সুলতানা হাসমত দারা সিকো ও টেলী সামাদ প্রমুখ।

ছবির সঙ্গীত-পরিচালক সুবল দাস এবং চিত্রগ্রহণে আছেন আবদুল লতিফ বাচ্চু। এ ছাড়া প্রযোজনা ও পরিবেশনায় আছেন সিকো ফিল্মস।

আকবর কবীর দীর্ঘদিন থেকে **মামা-ভাগ্নে** নামে একটি ছবি পরিচালনা করছেন। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক সুবল দাস, চিত্রগ্রহণ রেজা লতিফ প্রযোজনা বদল আহমেদ ও আনোয়ার মতিন।

বিজ্ঞাপনের ভাষায় মুক্তির মিছিলে বহুল আলোচিত ছবি। মামা-ভাগ্নেতে অভিনয়ে আছেন ববিতা জাফর ইকবাল সুপ্রিয়া ওয়াহিদা টেলি সামাদ রবিউল রেজাউল করিম রীটা নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

নায়িকা কবরীর ব্যক্তিগত অর্থে, অভিনয়ে ও পরিবেশনায় (শ্রীমতী পিক-চার্স) যে ছবিটি এখন নির্মাণাধীন রয়েছে সে ছবির নাম গুন্ডা। গুন্ডার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন আলমগীর কুমকুম। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক আলম খান এবং চিত্র-গ্রাহক আবদুল লতিফ বাচ্চু।

কবরী ছায়াছবি নিবেদিত গুন্ডা ছবিতে অভিনয় করবেন যথাক্রমে রাজ্জাক কবরী খলিল সুমিতা আশীষ রবিউল ফরিদ আলী ও লুৎফর প্রমুখ

উল্লেখ্য গুন্ডা ছবির নায়ক রাজ্জাকের নিজস্ব প্রযত্নে (রাজলক্ষ্মী প্রোডাকসন্স) এ ছবি দ্রুত সমাপ্তির পথে রয়েছে।

সীমারেখা : মামুন ফিল্মস-এর একটি ছবি। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক মনসুর আহমেদ।

নুরুল-হক বাচ্চু বহুদিন পর অর্থাৎ স্বাধীনতার পর এই প্রথম একটি ছবি পরিচালনা করছেন। ছবির নাম **জীবন-সাথী**।

এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক সত্য সাহা। চিত্রগ্রাহক খান আরিফুর রহমান। ছবির গীত ও সংলাপ লিখেছেন গাজী মাজহারুল আনোয়ার।

জীবন সাথীতে যে সব শিল্পী অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন যথা-ক্রমে শাবানা ওয়াসীম আলতাফ নাজনীন শাকিলা মঞ্জু দত্ত শর্বরী মায়া হাজারিকা খান জয়নুল প্রমুখ। ছবিটি রূপসা পিকচার্স প্রযোজিত ও পরিবেশিত।

আজিম চাঁদার খেল খেলে সম্প্রতি বেশ নগদ দুটো পয়সা অর্জন করেছেন। (অবশ্যই

সেটা সম্পূর্ণ আজিমের কৃতিত্ব নয় বরং বোম্বের ছবি 'বেনারসী বাবু'র কৃপায়। এখন আজিম 'প্রতিনিধি' বানাচ্ছেন। অবশ্য এখনও জানা যায়নি, আজিমের প্রতিনিধি ঢাকার কার মানে কোন বিদেশী ছবির প্রতিনিধিত্ব করছে।

আজিম দাবী করেছেন তার এ ছবি হবে বাংলাদেশের প্রথম রঙীন ছবি! কিন্তু আজিম হয়ত ভুলে বসে আছেন নিখোঁজ পরিচালক জহীর রায়হান দীর্ঘদিন আগেই রঙীন ছবি 'সংগম' তৈরী করেছেন। অতএব আজিমের পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত 'বাংলাদেশের প্রথম রঙীন ছবি'র দাবী হাস্যকর।

যাই হোক আজিমের এ ছবিতে অভিনয়ে অংশ নিচ্ছেন আজিমের অভিনেত্রী-স্ত্রী নায়িকা সুজাতা রাজ্জাক রোজী খলিল জসীম নারায়ণ চক্রবর্তী। চিত্রগ্রহণে আছেন রেজা লতিফ। সংগীতে সত্য সাহা।

অমর প্রেম : সুজনী কথা চিত্রের ছবি। পরিচালক ইমদাদ আলি। অভিনয়ে আছেন রাজ্জাক ও শাবানা। সংগীত পরিচালক সত্য সাহা।

নূর-উল-আলম চলো ঘর বাঁধি তৈরী করছেন। কবরী মেহফুজ শওকত আকবর যাবনী মীনু রহমান প্রমুখ এ ছবির শিল্পী।

আলমগীর কুমকুম মমতা তৈরী করছেন। ছবির সংগীত পরিচালক সত্য সাহা। অভিনয় করছেন কবরী আলমগীর মোস্তফা প্রমুখ।

রক্তের ডাক তৈরী করছেন এইচ আকবর। কবরী প্রবীর মিত্র শওকত আকবর সুমিতা প্রমুখ এ ছবি শিল্পী।

ইবনে মিজানের আরো একটি ছবি (জীবাংরা ছাড়া) রাজকুমার। ছবির নায়ক নায়িকা ওয়াসীম ও শাবানা। সংগীত মনসুর আহমেদ।

কালীদাসও পরিচালক হলেন। তার ছবি 'জানোয়ার'। জানোয়ারে যারা রয়েছেন : ওয়াসীম সুচরিতা মিনু রহমান প্রমুখ।

রুমী কিসলু পরিচালিত ছবি **আঁধার পেরিয়ে**। এ ছবির সংগীত পরিচালক আলম খান। অভিনয়ে রয়েছেন শাবানা রাজ্জাক ফারুক সুচরিতা খলিল প্রমুখ।

শিবলী সাদিক ...'জীবন নিয়ে জুয়া' লিখছেন। আবদুল্লাহ - আল - মামুন সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন। আবদুল লতিফ স্বচ্ছ ক্যামেরা চালাচ্ছেন এবং কবিতাকে নিয়ে 'বুলবুল আহমদ' জুয়ার প্রধান অংশীদার হচ্ছেন।

আরো যারা জীবন নিয়ে জুয়া খেলছেন তারা হলেন যথাক্রমে মিনু রহমান খলিল কবরী জামান এহসান নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ। ছবির প্রযোজক ও পরিবেশক বনলতা চলচ্চিত্র।

সূর্যাস্তের পর একটি ছবির নাম। পরিচালক ফজলুর রহমান বাবু। অভিনয়ে আছেন রানী সরকার অনিল প্রমুখ।

পিঞ্জর শাহজাহান চৌধুরী পরিচালিত। উজ্জ্বল কবিতা আনোয়ারা মুস্তফা আনোয়ার হোসেন সুভাষ দত্ত হাসমত টেলী সামাদ রানী সরকার এ ছবিতে অভিনয়ে অংশ নিচ্ছেন। সংগীতে খন্দকার নুরুল আলম।

মীর মোহাম্মদ হালিম পরিচালিত **সন্ধিক্ষণের** শাবানা ও ওয়াসীম এবং খান জয়নুল ও মোস্তফা অভিনয় করছেন।

মোঃ সাঈদ পরিচালিত **সাধু শয়তান**। নায়ক-নায়িকা রাজ্জাক ও শাবানা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন মোস্তফা খলিল মঞ্জুশ্রী খান জয়নুল প্রমুখ।

ত্রিরত্ন—খান আতাউর রহমান পরিচালিত। বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে 'ত্রিরত্নে' আছেন রাজ্জাক কবরী রোজী খান আতা খান জয়নুল প্রমুখ।

বিচার আজিজ মেহের পরিচালিত। ভূমিকালিপিতে আছেন সুচন্দা শাবানা ও জাফর ইকবাল প্রমুখ। সংগীত আনোয়ার পারভেজ।

স্মাগলার : পরিচালক শেখ আতাউর রহমান। সংগীত পরিচালক খোন্দকার নুরুল আলম। ভূমিকালিপিতে আছেন রাজ্জাক সুচরিতা সবিতা হাসান ইমাম প্রমুখ।

আনন্দ সংবাদ

কলকাতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারত ৮৫ রানে জয়ী হয়েছে।

(বিস্তৃত খবর আগামী সংখ্যায়)

কেন এমন হয় : পরিচালক অমলকুমার বোস। সংগীত পরিচালক কমল দাসগুপ্ত। চিত্রগ্রহণে সিরাজুল ইসলাম। রূপায়ণে কবিতা উজ্জ্বল প্রবীর মিত্র মোস্তফা প্রমুখ।

পরিণতি : পরিচালক এম ইয়াসিন। সংগীত সত্য সাহা। চিত্রগ্রহণে এম এইচ খান। রূপায়ণে কবিতা জাফর ইকবাল প্রবীর মিত্র শওকত আকবর হাসমত অলিপ সুচন্দা প্রমুখ।

বেলা শেষের গান : পরিচালক জীবন চৌধুরী। কবিতা উজ্জ্বল সুচন্দা আলতাফ রোজী আনোয়ার হোসেন অভিনীত।

নকল মানুষ : হাসমত পরিচালিত। সংগীত সুবল দাস। রূপায়ণে কবিতা, খসরু শওকত আকবর হাসান ইমাম আনোয়ারা খলিল হাসমত প্রমুখ।

অনেক দিন আগে : পরিচালক এফ কবীর চৌধুরী। ভূমিকায় আভেজ নবাগতা কল্পনা মাতিন প্রমুখ। সংগীত পরিচালক সুবল দাস।

ডাক পিওন : পরিচালক নাজমুল হুদা মিন্টু। সংগীত পরিচালক সুবল দাস। রূপায়ণে রাজ্জাক কবরী খান জয়নুল সুমিতা মেজবাহ দারাশিকো প্রমুখ।

উত্তরণ : পরিচালক ফজলুল হক। ভূমিকালিপিতে আছেন রহমান চিত্রা নাসিমা শবনম আনোয়ারা আনোয়ার প্রমুখ। সংগীত খান আতাউর রহমান, কাহিনী ওবায়েদ উল হক।

নীড়হারা : পরিচালক বাদল। রূপায়ণে মোস্তফা কবিতা ওয়াসীম ইনাম আহমদ ফরিদ আলী প্রমুখ।

মা ও মেয়ে : পরিচালনা : গোলাম নবী। রূপায়ণে : আনোয়ারা মিনু রহমান শওকত ওসমান কায়েম প্রমুখ।

শেষ মিলনের আশায় : পরিচালক সুজন। রূপায়ণে নার্গিস আনোয়ারা কারজানা প্রমুখ।

মালকা বানু : পরিচালনা ফয়েজ চৌধুরী। রূপায়ণে শাবানা জাভেদ আকবর প্রমুখ।

যখন বৃষ্টি এলো : পরিচালক এম এম শফি। বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'বাংলাদেশের প্রথম রঙীন ছবি!' অভিনয়ে আছেন ওয়াসীম অলিভিয়া রোজী প্রমুখ।

আলো তুমি আলেয়া : পরিচালক দিলীপ সোম। সংগীত সুবল দাস। ভূমিকালিপিতে আছেন রাজ্জাক কবিতা ফতেহ লোহানী দীন মোহম্মদ হাসমত প্রমুখ।

আজি জুর রহমান পরিচালিত **অপরাধ** ছবির সংগীত পরিচালক সত্য সাহা।

রঙ্গনায় এক্ষণ

১৩ই জানুঃ / সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ

অখ্যাত কবি সুকান্তর কবিতা থেকে

ঘনীভূত কথা

সংগীত / মুরারি মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা / পংকজ গুপ্ত

শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য

৭ই থেকে হলে টিকিট (৪—৮)

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।

মেরামতেরও সুবন্দোবস্ত আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্

৬৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

ফোন : ২৪-৪৭৯৩

সুলতানা জামানের প্রত্যাবর্তন :

দীর্ঘ দুবছর স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর নায়িকা সুলতানা জামান আবার চিত্রজগতে ফিরে আসছেন বলে খবরে প্রকাশ।

এ-ব্যাপারে সুলতানা জামানের বক্তব্য হলো, 'বিদায় নিতে চাইলেই কি আর বিদায় নেয়া যায়? চিত্রজগতের গণ্ডীর বাইরে পুরোপুরি চলে যেতে পারছি না। তাই আবার ফিরে আসতে চাচ্ছি।'

শেষ পর্যন্ত সুভাষ দত্ত :

অভিনেতা-পরিচালক সুভাষ দত্ত বেশ কিছুদিন ধরেই বেকার জীবনযাপন করছেন। আর সম্ভবতঃ তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি তার পুরাতন পেশায় অর্থাৎ (ছবি আঁকায়) ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, ছবির জগতে আসার আগে তিনি একজন কমার্শিয়াল শিল্পী হিসেবে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আরো উল্লেখ্য, সুভাষ দত্ত পরিচালিত শেষ ছবিটির নাম 'বলাকা মন'। ছবিটি কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

অলগা সমাচার

নায়িকা অলিভিয়ার ছোট বোন অলগা চিত্রজগতে আসছেন। এ-ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য সম্প্রতি জানা গেছে—

'যখন বৃষ্টি এলো' আমার প্রথম ও শেষ ছবি হিসেবে চিহ্নিত হবে।'—বলেছেন অলগা।

অলগা আরো বলেছেন, 'নায়িকা হবার ইচ্ছে আমার মোটেও নেই। শুধু দুলাভাই (অলিভিয়ার স্বামী, পরিচালক এস এম শফী)-এর একান্ত অনুরোধে মাত্র একটি ছবিতে (যখন বৃষ্টি এলো) অভিনয় করতে রাজী হয়েছি।'

উল্লেখ্য, অলগা একটি ফার্মে চাকুরী করেন।

জানা গেছে, অল্পদিনের মধ্যেই 'যখন বৃষ্টি এলো'র কাজ শুরু হবে।

—আনওয়ার আহম্মদ

বিবিধ সংবাদ

মিনার্ভা থিয়েটারের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের সূচনা

নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়া যেমন অভূতপূর্ব, তেমনি পরম গৌরবের। মিনার্ভা থিয়েটার সর্বপ্রথম সেই গৌরবের অধিকারী হোল। সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোন নাট্যমঞ্চ এত দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃতির ধারক, বাহক হবার সৌভাগ্য অর্জনে সমর্থ হয়নি অদ্যাবধি।

গত ৩০শে ডিসেম্বর '৭৪ সেই উৎসবের শুভ সূচনা হোল জর্জর দণ্ড পূজা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার প্রাঙ্গণে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

এছাড়া অনুষ্ঠানে শতবর্ষ উৎসবের সাফল্য কামনা করে ভাষণ দেন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূ দেবী, কালীশ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ অজিত ঘোষ এবং আরো কয়েকজন।

মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদের পক্ষ থেকে প্রখ্যাত নট কালী ব্যানার্জী অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে বিগত যুগের দুই খ্যাতনামা অভিনেত্রী রেণুবালা (সুখ) ও সন্তোষকুমারী দেবীকে মালাদান করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র মিনার্ভা থিয়েটারের বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে ও আসন্ন উৎসবের কর্মসূচী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন। কমিটির কার্যবিবরণী পাঠ করেন শ্রীপান্নালাল দাস। ধন্যবাদ দেন অনিমা ব্যানার্জী। উৎসব অনুষ্ঠানে সকল বক্তাই কোলকাতায় একটি জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ও সরকারের কাছে সহায়তার জন্য আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে শ্রীঅনন্ত ভারতী, তাপস সেন প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন।

মূল উৎসব আগামী ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ শুরু হয়ে বলে উদ্যোক্তারা স্থির করেছেন। উক্ত উৎসবের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর নাটক পরিবেশন ছাড়াও বাংলার নাট্য আন্দোলন নাট্য সাহিত্য নাটকের একাল ও সেকাল সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে কথা আছে।

—সুখী রাজপুত্র—

শিশু রংমহলের (সি এল টি) আমন্ত্রণে সঞ্জীব ট্রেণিং কোর, ঢাকুরিয়ার শিশুশিল্পীরা আগামী ১০ জানুয়ারী '৭৫ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় 'অবন মহলে' অস্কার ওয়াইল্ডের 'হ্যাপী প্রিন্স' অবলম্বনে সমীর ঘোষ রচিত 'সুখী রাজপুত্র' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন। নৃত্য পরিচালনা করবেন তপতী ঘোষাল।

বিচিত্রানুষ্ঠান : স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ-এর কমার্সিয়াল কারেণ্ট একাউণ্ট কালচারাল ক্লাব সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী। পুরস্কার বিতরণের পর মঞ্চস্থ হয় ভোলা দত্তের পরিচালনায় একাঙ্ক নাটক অলীকবাবু। সাধন গুহের পরিচালনায় নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেন সাধন গুহ ও পলি গুহ। অর্ঘ সেন ও বনানী ঘোষের সংগীত এবং পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষের গ্রন্থনায় রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

এছাড়া মান্না দে-র কণ্ঠসংগীত ও জহর রায়ের হাস্যকৌতুক উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্র - নজরুল - সুকান্ত সন্ধ্যা : পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক লায়ন্স রেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা আয়োজিত 'রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যা' একটি সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় গত শনিবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ শাখা ভবনে।

অনুষ্ঠানে সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেন নির্মাল্য বসু ও নীরেন সরকার কবিদের জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে।

সংগীত পরিবেশনে বিশেষ উল্লেখ-এর দাবী রাখেন নজরুলগীতিতে গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (শক্তি ঘোষের সুষ্ঠু তবলা সঙ্গত)। অন্যান্যদের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতে পরেশ ভট্টাচার্য, শ্যামলী রায়চৌধুরী, নজরুলগীতিতে রীতা চক্রবর্তী, অতীন চ্যাটার্জি, সুকান্তগীতিতে স্বপন দাস, বাঁশীতে স্বপন দে ও তবলা সঙ্গতে সুশান্ত চক্রবর্তী, প্রদীপ রায় ও পীযূষ ব্যানার্জি উল্লেখযোগ্য।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর ক-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

বিশ্বাসঘাতক ॥ নারায়ণ সান্যাল

এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা-কাহিনী। অপহৃত সম্পদের মূল্য দেড় হাজার কোটি টাকা। লাইনো টাইপে ছাপা।। ১২-০০

এই লেখকের : সোনার কাঁটা ॥ ৮.০০
আমি নেতাজীকে দেখেছি ॥ ১৫.০০
আমি রাসবিহারীকে দেখেছি ॥ ১৪.০০
কলিঙ্গের দেব-দেউল ॥ ১৩.০০

ফুটপাতের বাসিন্দা ॥ অসীম মুখোপাধ্যায়

গ্রামের মানুষ আজ গ্রাম ছেড়ে, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে কলকাতার ফুটপাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে সৃষ্টি হচ্ছে এক বিরাট সমস্যার —অর্থনৈতিক, সামাজিক। এই অনন্যসাধারণ সমস্যা সম্পর্কে এক সামগ্রিক আলোচনা এই গ্রন্থ। অজস্র সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এক সাংবাদিকের দীর্ঘ চার বছরের গবেষণার ফল। বহু ফটোগ্রাফ।। ১০-০০

হিমালয়ের ফুল ॥ বীরেন্দ্রনাথ সরকার

হিমালয়ের দুর্গম তুষার সীমায় ভ্রমণ করে লেখক বহু বিস্ময়কর দুষ্প্রাপ্য ফুল সংগ্রহ করে এনেছেন। এদের জীবনযাত্রা, জন্ম-মৃত্যুর অপরূপ রহস্য নিয়ে বিজ্ঞান-আশ্রয়ী এই গ্রন্থ পাঠককে অভিভূত করবে। ১৫খানি দুষ্প্রাপ্য ফুলের ফটোগ্রাফ।। ১৩-০০

"বইখানি মুগ্ধ করবে ভ্রমণবিলাসীদের। প্রলুব্ধ করবে উদ্যান-বিলাসীকে।" —ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

ভক্ত কবীর ॥ ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস

ভক্ত কবীরের অসামান্য জীবনকথা এবং দোঁহাসমষ্টির বাংলা অনুবাদ। ভক্তিসাহিত্যে এক অনুপম রসের পরিবেশন।। ১৮-০০

সৌরীন সেন
আখের স্বাদ নোনতা ॥ (যন্ত্রস্থ)
রেনিগেড ১৪.০০ দিল্লীতে এসেই ১২.০০

চাণক্য সেন
আমরা ভালো আছি, তোমরা ? ৭.৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
রত্নাকর গিরিশচন্দ্র
আসামী ঈশ্বর ৬.০০ বন্যাকন্যা ১৯.০০ চতুষ্ক ১৮.০০

ভারতে বিবাহের ইতিহাস ॥ ডঃ অতুল সুর ॥ ৮.০০
কয়েকটি মুহূর্ত ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৬.০০
বরফের রং লাল ॥ ব্রজমাধব ভট্টাচার্য ॥ ৮.০০
ওয়ান আপ টু ডাউন ॥ নিমাই ভট্টাচার্য ॥ ৬.০০
ভিয়েতনাম সম্পর্কে ॥ হো-চি মিন ॥ ৪.৫০
কালোটাকা চোরা পথ ॥ চিরঞ্জীব সেন ॥ ৬.০০
বীভৎসতা ও আমি ॥ আনন্দ ভট্টাচার্য ॥ ৬.০০

শঙ্খ প্রকাশন ॥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

১৭ জানুয়ারী ১৯৭৫

মূল্য ৬৫ পয়সা

ISOLY-I

আগ্‌ফা আইসোলি১

সকল মরশুমের জন্যে নিখুঁত ক্যামেরা

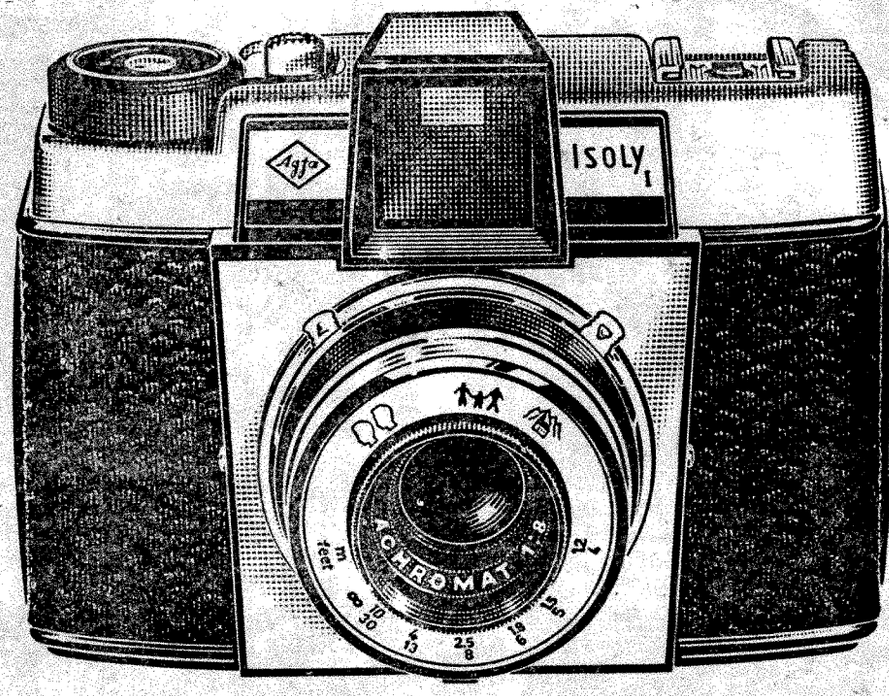

SIMCES/AG/35 ben.

আরো জানতে হলে আপনার নিকটতম আগ্‌ফা-গেভার্ট ডীলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটার:
আগ্‌ফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড
বোম্বাই • নিউ দিল্লী • কলকাতা • মাদ্রাজ

® ফোটোগ্রাফীর সরঞ্জাম নির্মাতা—আগ্‌ফা-গ্যাভার্ট, অ্যান্টওয়ার্প/লোভারকুসেনের রেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেডমার্ক।

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃফোন ৩৪-১৭৮২

সবচেয়ে সাদা করার জন্যে

টিনোপাল®

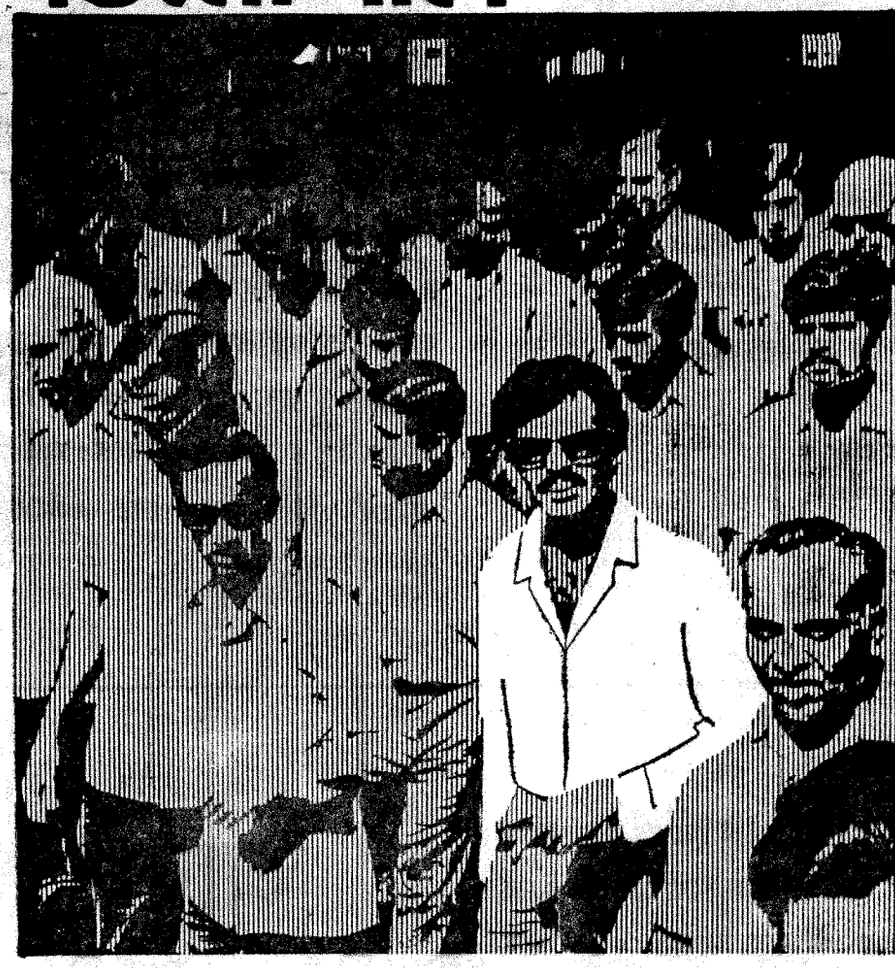

সিন্থেটিক ও ব্লেনডেড কাপড়ের জন্যে

টিনোপাল®-এস

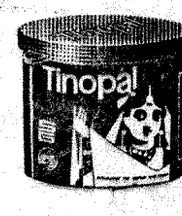

সুতীর কাপড়ের জন্যে

টিনোপাল®

• টিনোপাল সুইজারল্যাণ্ডের সীবা গায়গী লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
সুহৃদ গায়গী লিঃ পোঃ অঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ৪০০০২০.

১৪ বর্ষ

অমৃত

৩৬ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 17th January, 1975 শুক্রবার, ৩ মাঘ, ১৩৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৭	বকাসুর (গল্প)	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
৯	রোজনামচা	ফাদার দ্যতিয়েন
১১	নয়াদিল্লীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব	শ্রীনির্মল ধর
১৩	পটভূমি	কৌটিল্য
১৪	এই বাংলার খবর	শ্রীদেবদত্ত
১৬	দেশে বিদেশে	শ্রীপুণ্ডরীক
১৭	গোয়েন্দা ধাঁধা	শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
১৯	সেই সব মানুষ (উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২১	তোমার সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায় (কবিতা)	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় — বীরেন্দ্রনাথ সরকার

সব ফুল কিনে নাও ৮, গৌরীগঙ্গা ৯,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় — সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

ফেরারী অতীত ৭, একক প্রদর্শনী ৪,

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঘরের পথ ৬, সুখের আড়াল ৫·৫০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার আমার ৪,

নীল লোহিতের চোখের সামনে ৫,

আশাপূর্ণা দেবী

ভালবাসার মুখ ৫, তরঙ্গহীন ৫,

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক বোন পারুল ৬, বনকরবী ৬·৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত — চিরঞ্জীব সেন

মন জানে না ৭, রাশিয়ান রুবির রহস্য ৭,

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় — জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সরমা ও নীলকান্ত ৬, লাস্ট চ্যাপ্টার ৫॥

সাহিত্য সংস্থা : ১৮সি টেমার লেন কলি-৯

অচিন্ত্যকুমারের সমগ্র কবিতা

কবির এ পর্যন্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাবলীর অভিনব সংকলন। ২০·

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

কবির সমগ্র কবিতা সংকলন, ৬·।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য

অধ্যাপক সরোজমোহন মিত্র, এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট-এর গবেষণালব্ধ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১২-৫০·।

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

বনফুল রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত।

মানিক গ্রন্থাবলী

একাদশ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত।

প্রতিটি রচনাবলীর প্রতি খণ্ডের মূল্য ২০·। গ্রাহকদের ১৬·।

বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ

প্রথম খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত কয়েকখানি চিরায়ত উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য

বিমল মিত্র

চাঁদের দাম এক পয়সা ৮.

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনপদবধূ ৫. তীরভূমি ৫.

নগরনন্দিনীর রূপকথা ৬.

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

কাঠগোলাপের গন্ধ ৪.

শেষ বসন্ত ৬.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ঘূর্ণি ৪. পদসঞ্চার ৮.

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অনাগত ৬.

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপাসা ৫

সুধীরজন মুখোপাধ্যায়

আবছা আলোর জাল ৭.

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

ত্রয়োদশ সংস্করণ বাহির হইল !

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

COMMON WORDS

: অসংখ্য ছবির সাহায্যে শব্দজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবোধের ব্যবস্থাসহ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য অভিনব সচিত্র ইংরেজি-বাংলা অভিধান :

॥ দাম : চার টাকা ॥

: জেনারেল বুকস্ : এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

কিশোরদের উপযোগী কয়েকটি বই

সুকুমার রায়ের

আবোল তাবোল

নতুন পরিসাজ। সুকুমার রায়ের মূল ছবি ছাড়াও অন্য ছবি এঁকেছেন শ্রীসুব রায়। দু-রঙে ছাপা। [৩-০০]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভূত পুরাণ

মানুষের পুরাণ আছে, ভূতদের পুরাণ লিখলেন তারাশঙ্কর, ছবিও এঁকেছেন তিনি, ভারি সরস লেখা। [৪-০০]

শ্রীত্রিভঙ্গ রায়ের

রাঙাদির রূপকথা

রূপকথার চিরন্তন রসের প্লাবন ঘটেছে, লেখকের আঁকা বহু একবর্ণ ও রঙীন ছবি। [৫-০০]

নাট্যকার বাদল সরকারের

ছবির খেলা

ছবিতে ধাঁধাঁ, বুদ্ধির খেলা, জ্ঞান বাড়াবার সরস উপায়। বাংলায় একমাত্র বই। [২-০০]

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এক যে ছিল শেয়াল

ঠেঠকী ঢঙে লেখা অরণ্য জীবন, সঙ্গে লেখকের আঁকা বহু রঙীন ও একবর্ণ ছবি। [২-৫০]

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর

যুগে যুগে ভারত শিল্প

ভারতের শিল্পসমূহের সচিত্র ইতিহাস। [৭-০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা ৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
২২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	শ্রী দি মৌ
২৪	যুবক-যুবতী	শ্রীঅমর দাস
২৬	চিঠিপত্র	
২৯	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে	শ্রীদিলীপকুমার রায়
৩১	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৩৩	রূপসীর খাতা	শ্রীবরবর্ণিনী
৩৪	রান্না করে দেখুন	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৩৫	রূপচর্চা	শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ
৩৯	শেষ বিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৩	পুনশ্চ	শ্রীক্ষপণক
৪৪	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৬	ফেরেস্তা (গল্প)	সৈয়দ ইকবাল
৪৮	সেকালের সঙ্গীতগুণী	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৫১	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅময়
৫২	নবজন্মের রাণী	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৩	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান	
৫৪	খেলাধুলা	শ্রীদর্শক
৫৬	মাঠের নায়ক	শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৮	বায়োস্কোপিক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬৩	ফ্লোর থেকে বলছি	সংবাদদাতা
৬৫	নাটমঞ্চ	নাট্য সমালোচক
৬৭	স্যার চার্লি চ্যাপলিন	
৬৮	চিত্র সমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৭০	গিরিশযুগের শেষ শিখা নীরদাসুন্দরী	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৭১	জলসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

প্রেম অমৃত

শ্রীকরুণাসিন্ধু পালিত

বাংলা সাহিত্যে বিবাহে উপহারের একমাত্র বই। ভাষার ইন্দ্রজালে মধুরতম প্রেমের উপন্যাস।

পণ্ডিতদের মতে—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি।

নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি

নতুন বছর কেমন যাবে
চিন্তিত হচ্ছেন?
তাহলে আজই পড়ুন
১৯৭৫ কেমন যাবে?
লগ্ন ও রাশি অনুসারে
নিখুঁত বর্ষফল
দাম: চার টাকা

প্রকাশক:
রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-১

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটো ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকএ মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

সম্পাদকীয়

আছে বঞ্চিতের বেদনা

প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইন সমিতির অধিবেশনে। এই বিশ্বে যারা বঞ্চিত তাদের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের পরিধি কতটুকু? যারা দরিদ্র, অভুক্ত, অপুষ্টিজনিত রোগে মুমূর্ষু তাদের জন্য বিশ্বের সচ্ছল, সন্তুষ্ট, ভোগী রাষ্ট্রগুলো কী করছে? এই প্রশ্ন করার সময় আজ এসেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির বৃত্তান্ত সব সময়েই আমাদের শোনানো হচ্ছে। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে। তার হাতে তৈরি যন্ত্র দূর অন্তরীক্ষে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে হয়তো বা এই সৌরমণ্ডল ছেড়ে অনির্দেশ্য অনন্তে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু এই পৃথিবীতে মানুষের চরিত্র কি বদল হচ্ছে? এখনো কি এখানে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলো টাকার জোরে এবং অস্ত্রের জোরে নিজের দাপট দেখাচ্ছে না? আন্তর্জাতিক আইন তো তাদের খুশিমত ব্যবহার করা হয়। ছোট ও গরিব রাষ্ট্রের কথা কে শোনে?

একথা ঠিক যে স্নায়ুযুদ্ধের প্রবলতা এখন কমেছে। কিন্তু তা বলে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াবার মানসিকতা দূর হয়ে যায়নি। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারব, তাদের মধ্যে কি সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা চলছে। অস্ত্রের পাহাড় তৈরি করে রাখছে তারা। নিত্য নতুন মারণাস্ত্র নির্মিত হচ্ছে এবং একাজে বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রনায়কদের দাসবৃত্তি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। নতুন এলাকায় সামরিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। আমাদের প্রতিবেশী এলাকায় তা আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গেই লক্ষ্য করছি। এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির জন্য যত চেষ্টাই আমরা করি না কেন, শক্তিমান রাষ্ট্রগুলোর মনোমত না হলে তা করতে তারা দেবে না। আজকের দুনিয়ায় বিপদ হল এই ক্ষমতাবান এবং অঢেল বিত্তের অধিকারী এই রাষ্ট্রগুলোর অপরিসীম লোভ এবং মাতব্বরি দেখাবার প্রবণতা। আন্তর্জাতিক আইন তারাই নিজেদের খুশিমত পরিবর্তন করে, অন্যদের তা মানতে বাধ্য করে। যদি সত্যি সত্যিই সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মনেপ্রাণে তারা মেনে নিত, তাহলে আজ রাষ্ট্রসংঘের এই অথর্ব অবস্থা হত না। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো স্বাধীন হয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে নিজেদের বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে শুরু করায় পশ্চিমের বড়লোক ও ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোর মন রাষ্ট্রসংঘের ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছে। আমেরিকা তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ মারফত কোনো দেশকে সাহায্য দিতে সে নারাজ। যদি দিতে হয় সে নিজে বাছাই করে দেবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে। এ হল ক্ষমতাবানের দম্ভ। আন্তর্জাতিক চিন্তা বা মানসিকতা থেকে তা অনেক দূরে। পুরনো কালে অত্যাচারী জমিদাররা প্রজাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোর হাবভাবও সে রকম। পৃথিবীর বিপদ তারাই ডেকে আনে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ বাধাতেও দ্বিধা করে না তারা। এই শতাব্দীতে দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে এ কারণেই। এখানে ওখানে আঞ্চলিক যুদ্ধের পিছনেও একই ষড়যন্ত্র।

গরীব ও বঞ্চিত দেশগুলোর বেদনা তাই অসঙ্গত নয়। যাদের স্বাধীনতা ছিল না, নিজের দেশের সম্পদের ওপর ছিল না অধিকার, তারা আজ একে একে স্বাধীনতা লাভ করছে। তারা নিজেদের স্বাধীনতাকে সযত্নে ও সগৌরবে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, ব্যাধির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে পৃথিবীর সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগুলোর নিঃশর্ত সহায়তা কি তারা প্রত্যাশা করতে পারে না? এদের বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ ছিল ঔপনিবেশিক শাসন। সেই শাসন অপসারিত হলেও অর্থনৈতিক পরবশ্যতার জালে তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধেই প্রধানমন্ত্রী গান্ধী প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার ন্যায্যতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি চাই। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে চাই সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা এবং সংঘর্ষ-হীন পৃথিবী প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি।

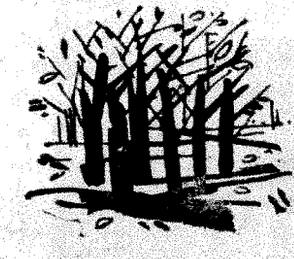

বকাসুর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নাম দেখে ভড়কাবার কিছু নেই। পৌরাণিক কি আজগুবী ভুতুড়ে গল্প নয়। গল্প একটি ঘড়ির এবং ত্রিকোণ একটি প্রেমের নাটকে তার সামান্য একটু ভূমিকার।

ঘড়িটা এখনো আছে। বাদামতলার মোড়ের সেই ঘড়িটা।

বাদামতলার নাম অবশ্য পাল্টেছে। যে রাস্তা দুটো সেখানে এসে মিলেছে তাদেরও নাম আর চেহারা। শুধু ঘড়িটাই সেই ভুলে-যাওয়া সেকালের সাক্ষী হয়ে এখনো নাজিরবাড়ির দেয়ালের কোণ থেকে দুদিকের দুই মুখের কাঁটা নেড়ে চলেছে। ঘড়িটার দিকে কেউ কি এখন চেয়ে দেখে? যে মানুষের স্রোত এখন সেখান দিয়ে বয়ে যায় তাদের সময়ই নেই বোধহয় ও ঘড়িতে সময় দেখবার। সারা দিন সেখানে ত মানুষ আর যানবাহনের অস্থির ঘূর্ণি পাক খাচ্ছে।

রাস্তা দুটোর নামই ত শুধু নয় চেহারা চরিত্র একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। নাম ছিল যার গোয়ালপাড়া রোড গোছের কিছু, রাজনীতির ওলট-পালটের পালায় এক অঙ্কের এক মন্ত্রীর জমকালো নামে সে এখন সম্ভ্রান্ত। তার বুকে এখন ট্রাম লাইন পাতা। আর পাঁচু দর্জির গলি এখন শুধু সভ্যভব্য নামই নেয় নি বহরেও রীতিমত বেড়ে গলি থেকে সদর রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখান দিয়ে পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে যারা এখন আসে-যায় তাদের সবারই প্রায় হাতে হাতঘড়ি আছে। মোড়ের বকাসুরকে দেখে নিজেদের ঘড়ি মিলিয়ে নেবার তাদের দরকার হয় না।

বকাসুর নামটাই তাদের কারুর জানা আছে কিনা সন্দেহ। ঘড়ির নাম বকাসুর একেবারে নেহাৎ আজগুবি অর্থহীন কিছু নয়। সে যুগে ও নামটা একেবারে অকারণে চালু হয় নি।

বাড়ি বলতে ও তল্লাটে একটি বাড়ি তখন নাম করবার মত। বেশীর ভাগ

খাপরা আর টিনের চাল কি বড় জোর এক-তলা দুখিনী চেহারায় নোনাধরা পাকা বাড়ির জটলার মধ্যে নাজিরবাড়িই দু রাস্তার জোড়ের মুখে চারতলা বাহারে মাথা তুলে থাকত দাঁড়িয়ে। সেই বাড়ির রাস্তার দিকের দুই ধারের কোণ থেকে যে দেয়াল-ঘড়িটা মুখ বাড়িয়ে থাকত সামনের দিকের একটু কারিকুরির জন্যে, ধারালো দুটো ঠোঁট সমেত সেটাকে সবশুদ্ধ বিকট একটা পাখির মাথার মত দেখাত। ঘড়ির দু দিকের দুটো ডালা যেন সেই বিদঘুটে মাথার দুই চোখ।

বকাসুর নামটা ওই থেকেই কারুর মাথায় এসেছিল নিশ্চয়। তারপর কিছুদিন চলেছিল মুখে মুখে।

সামনের ঠোঁটের দিকটা ভেঙে যাওয়ার দরুণ এখন অবশ্য ঘড়ির চেহারাটাই বদলে গেছে। বকাসুর নামটাই খাপ খায় না। কাউকে নামটা বললে তাই তার সঙ্গে ইতিহাসটাও বলে বোঝাতে হয়।

অমরকে অবশ্য ইতিহাস বলতে হয় নি।

নামটা বলবার পর কয়েক সেকেন্ড মাত্র ভুরু কুঁচকে বিমূঢ় হয়ে থেকে নিভা গম্ভীরভাবেই বলেছিল, নাজিরবাড়ির ঘড়িটার কথা বলছ ঃ ঠিক ওর তলায় দাঁড়াবো ? ঠিক দুটোর সময় ?

হ্যাঁ ঠিক দুটোর সময়। অস্থিরতাটা চাপবার চেষ্টা সত্ত্বেও গলাটা একটু কেঁপে-ছিল অমরের—দেরী করো না লক্ষ্মীটি। দুটো বাজবার পর বড় জোর আর পাঁচ মিনিটের বেশী অপেক্ষা করবার আমার উপায় নেই। ওর মধ্যে যদি না এসো...

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

অমর ওইটুকু বলেই থেমেছিল।

তাহলে আর দেখা হবে না। —অমরের থেমে যাওয়া কথাটা পূরণ করেছিল নিভা। তারপর যেন মুখস্থ পড়ার মত বলেছিল, ঠিক দুটো থেকে দুটো বেজে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত নাজিরবাড়ির ঘড়িটার তলায়। তার আগে গিয়েও লাভ নেই, তার পরেও না।

কাকে ফোন করছ? —দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে প্যাকেটটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করেছিল রমানাথ।

কাকে বুঝতে পারছ না? —ফোনটা কানে ধরে রেখেই বলেছিল নিভা।

তা পেরেছি। —জ্যাকেটটা হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে টাইটা আলগা করতে করতে বলে-ছিল রমানাথ,—তবে আমায় দেখে ফোনটা নামিয়ে রাখবে ভেবেছিলাম।

নামাতে চাইলে তোমায় দেখার আগেই ত পারতাম। একটু হেসে বলেছিল নিভা,—রাস্তায় তোমার গাড়ি থামা, বাইরের দরজায় তোমার ঢোকা এসব আওয়াজই ত পেয়েছি।

পেয়েও লুকোচুরির চেষ্টা করো নি। বাঃ চমৎকার চমৎকার! একটা সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বলেছিল রমানাথ।—কিন্তু অমরের তোমার মত সৎ-সাহস নেই কেন বলো ত? সে ত অনায়াসে যখন ইচ্ছে এখানেই আসতে পারে। আমি ত মানা করি নি।

তা করো নি। নিভা এবার ফোনটা নামিয়ে রেখে রমানাথের কাছের সোফাটাতেই গিয়ে বসে বলেছিল। কিন্তু তোমার এ উদারতাটা সে বিশ্বাস করে না মনে হচ্ছে, মানেটাও বুঝতে পারে না বোধহয়!

মানেটাও বুঝতে পারে না! জুতোর পর মোজা জোড়াও খুলতে খুলতে বলেছিল রমানাথ,—না বোঝবার ত কিছু নেই। আমাদের জটটা ছাড়াবার জন্যে আমি সোজা তাকে তোমার সঙ্গে প্রেম করবার সুযোগ দিচ্ছি।

তাতেই জট ছাড়বে? —নিভার গলাটা একটু যেন তীক্ষ্ণ শুনিয়েছিল।

অমরের সাহস থাকলেই ছাড়বে।—মোজা দুটো জুতোর মধ্যে রেখে সোফার পাশেই রাখা স্লীপার দুটোয় পা গলাতে-গলাতে বলেছিল রমানাথ,—অমরের সাহসই নেই বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। থাকলে এতদিনে তোমায় নিয়ে তার পালাবার চেষ্টা করা উচিত ছিল না?

এবার উঠে দাঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে রমানাথ আবার বলেছিল,—শুধু ফোনে গুজ গুজ করে কি হবে? এখনো ত সে তোমায় নিয়ে পালাতে পারে।

তাই এবার পালাবে! গলার স্বর চেষ্টা করেও নিভা আর হাল্কা রাখতে পারে নি,—কিন্তু আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে এত প্যাঁচালো প্ল্যানের কি দরকার আছে! সোজা আমায় ডাইভোর্স করলেই ত পারো। যা আমার বিরুদ্ধে বলবে আমি তার কোনোটায় প্রতিবাদ করব না।

ভুল! ভুল! নিভা এখনো তোমার ভুল ভাঙল না। —বাথরুমের দরজায় ফিরে দাঁড়িয়ে যেন করুণাভরে বলেছিল রমানাথ,—তোমায় কেন পালাতে দিতে চাই এখনো তুমি বুঝলে না ? পালাতে দিতে চাই, গিয়েও তোমায় ফিরে আসতে হবে বলে। আমি জানি অমরের কবিতার প্রেমের ফাঁকি গদ্যে ফেললেই ধরা পড়ে যাবে।

তাই যদি যায়,—নিভার গলার স্বর এবার স্পষ্ট একটু কৌতুকের—তাহলে আমি তোমার কাছেই ফিরে আসব মনে করো!

কেন আসবে না!—রমানাথও এবার হেসেছিল—তাই আসাই ত স্বাভাবিক সঙ্গত আর মধুর।

হ্যাঁ তোমার কাছে মধুর নিশ্চয়,—নিভার গলায় এখনো তিক্ততা যেন নেই,—হার-মানা এক হতভাগীকে সারা জীবন ঘৃণা আর দয়া করবার সুবিধের জন্যে।

না না নিভা! ও ত নেহাৎ সস্তা নীচ নাটকে মনের কথা ভাবছ। ফিরে এলে আমার কাছে তুমি হারানো দুর্লভের দাম নিয়ে আসবে। — একটু থেমে গলায় যেন ঠাট্টার সুর মিশিয়ে রমানাথ বলেছিল,—আমাকেও নতুন চোখে দেখতে পাবে হয়ত।

তা পাবার আশা নেই, কারণ ফিরে আমি আসব না।—বলে উঠে ঘর থেকে নিভা বেরিয়ে গিয়েছিল।

* * *

ফিরেই কিন্তু এসেছিল নিভা।

না, সময় সম্বন্ধে কোনো ভুল-ত্রুটির জন্যে নয়। প্রায় কাঁটায় কাঁটায় দুটো বেজে এক মিনিট হতে না হতে পাঁচু দর্জির গলি দিয়ে হেঁটেই এসে বকাসুরের নীচে দুটো পাঁচ নয়, তার পরও দুটো দশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল নিভা। ফিরে গিয়ে-ছিল অমরের দেখা না পেয়ে।

অমর কি তাহলে আসেই নি!

না, সেও ঠিকই এসেছিল গোয়ালা-পাড়ার দিক থেকে ট্যাকসিতে। দুটো থেকে দুটো পাঁচ পর্যন্ত ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল তারপর।

কি মীমাংসা এ রহস্যের?

মীমাংসা অসম্ভব অলৌকিক কিছু নয়।

বকাসুরের দু দিকের ছোট-বড় কাঁটার নির্দেশে প্রায় আট মিনিটের তফাৎ। ডান-দিকের ডালায় যখন দুটো, বাঁদিকে তখন দুটো বেজে আট।

কবিতার প্রেমের মানুষ অমর গদ্যের এ সত্যটুকু জানত কি না সেইটেই আসল রহস্য।

রোজা নামচা

ফাদার দ্যতিয়েন

বাংলাদেশ ঘুরে এলাম। হ্যাঁ, ওদেরই বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলা। সোনার বাংলা। সোনার বলতে জিনিসের দাম ঃ কমলালেবু দশ টাকা হালি; আপেল, কিশমিশ আঙুরের দর যথাক্রমে বত্রিশ, নব্বই আর একশো টাকা সের (কেজি ওরা বোঝে না); দাম শুনলেই খিদে মিটে যায়...। তবে আছে কলা, মুন্সিগঞ্জের লম্বা মোটা কলা ঃ স্বাদও ভালো, গন্ধও বেশ।

বাংলাদেশে তাহলে পা দিলাম, চব্বিশ বছরের এক স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে। সহজ হয় নি। শিয়ালদার গার্ড বলেছিল, বনগাঁ-র ট্রেন ছাড়বে না, তামার চোর নাকি দত্তপুকুরে কোথাও লাইনের তার কেটে দিয়েছে...আর হ্যাঁ বাসও অচল ঃ চালকেরা কি-যেন লাভের আশায় ধর্মঘট করে বসেছে।

ট্রেন তবু ছাড়ল—সুদীর্ঘ দেরিতে। সঙ্গে সঙ্গে উঠল লেনদেনকারীর ফৌজ-বাহিনী ঃ আপ ট্রেনে একশো সত্তর টাকা দিয়ে একশো রুপেয়া কিনে ওরা আবার ডাউন ট্রেনে একশো টাকা খরিদ করবে পঞ্চাশ রুপেয়ার দামে। টাকায়—সত্যই—টাকা আনে।

বঙ্গীয়েরা দাবি করে, ওদের—বিদেশে মুদ্রিত—একশো, দশ, পাঁচ আর এক টাকার নোট ভারতীয় নোটের চেয়ে অনে—ক সুন্দর।...তা হবে হয়তো!

না, আর যা-ই ভোগান্তি হোক না কেন তৈলসঙ্কটে ভুগতে হয় নি; বনগাঁ-র স্টেশন থেকে বর্ডার-অভিমুখী একমাত্র যান ঃ সাইকেল-রিকসা। ভাড়া ঃ ছ-টাকা, ইউ-নিয়নের নাকি নির্ধারিত দাম। চালক তবু নালিশ করে ঃ 'জানেন সাহেব, আপনারা ছিলেন যখন, ভালোই ছিল!... আহা! আমরা কোন্ জন্মে ছিলাম, বল তোমাদের ধনধান্যপুষ্পে ভরা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে?

...এখানে, ঐ ক্ষেতের ওপারে বহু-দিনের অব্যবহারে মরচে-ধরা রেললাইনের ধারে ছিল উদ্বাস্তুর শিবির। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তথাকথিত উন্নতি-শীল ভারত কত হাজার বাস্তুহারার তত্ত্বাবধান করেছিল—সারা দুনিয়াকে আশ্চর্য করে। এখনও কানে বাজে সেই ফরাসি সাংবাদিকের প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য ঃ 'লিমা-র ভূমিকম্পে বিদেশাগত সাহায্যের যে-অপচয় দেখেছি এখানে তার দশভাগের একভাগও দেখি নি!'

বর্ডার পার হওয়ার টেকনিক সহজ, যদিও জটিল (হ্যাঁ, জটিল আর কঠিন এক নয়!) আর সময়সাপেক্ষ ঃ এক থামুন, পাসপোর্ট দেখান চলুন; দুই, থামুন, পাসপোর্টে ছাপ মারতে দিন, চলুন; তিন থামুন, মাল খুলে দেখান (আর ঐ তিনটি পাটের সাড়ির রপ্তানির কৈফিয়ৎ দিতে ভুলবেন না যেন ঃ 'মায়ের জন্য একটা বোনের জন্য একটা, বৌদির জন্য একটা!' আইনী জবানিতে কথা বলবেন না, হৃদয়ের ভাষায় বলুন ঃ কাস্টমসের লোকগুলিও মানুষ মা-বোন-বৌদি ওদেরও আছে) তারপর বোঁচকা বন্ধ করে চলুন ঃ আপনি ভারত ছেড়েছেন বটে, শুধু বাংলাদেশে পৌঁছানো বাকি। টেকনিক এবার উল্টো ঃ মাল খুলে দেখান, ছাপ মারতে দিন, পাসপোর্ট দেখান।.....নিরপেক্ষ বিচারে স্বীকার করতে আমি বাধ্য হই ঃ ভারতীয় ছাপের চেয়ে বঙ্গীয় ছাপ অনেক বেশি স্পষ্ট—অনেক বেশি নতুনও বটে ঃ ওর বয়স মাত্র দু বছর। ছাপ ওরা একবারই মারবে; পাসপোর্টও মাল কিন্তু, যশোর অতিক্রম করার আগেই দেখবেন, চার চারবার ওরা চেক করেছে।

বাংলাদেশে আমার এই প্রথম ভ্রমণ বটে; তবে একদিন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে, এই বর্ডারই আমি পার হয়েছিলাম, ভারতীয় অফিসারের সস্মিত নীরব সম্মতিতে...যুদ্ধগ্রস্ত সেই বীরদেশে পদার্পণের আনন্দের লোভে—আর একটা ফুল তুলতে...আমার এক আরোগ্যাতীত পঞ্চমবর্ষীয়া প্রতিবেশিনী বান্ধবীর জন্য পুষ্পোপহার; সে তো নিজে গিয়ে সৈরিক আদিবাসের স্বাধীনতার সৌরভ আস্বাদন করতে পারবে না।.....ফুলটা ছিল একটা

লাফুস আর মেয়েটির নাম ছায়া ছায়ারাণী।

বর্ডারের ওপারেও (বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত) রিকসাওয়ালাদের একচেটে ব্যবসা। মজা কিন্তু এই যে, রিকসা না পেলেও চলবে! ট্যাকসিতেই চাপুন, তবে কিনা রিকসাওয়ালার ট্যাকসোটা আগে মিটিয়ে নিয়ে!...রূপসী ট্যাকসি, বিদেশিনী রকম জমকালো গাড়ি রাজ্যপাল ভবনের বাইরে আর দেখেছেন কটি? কোথায় আমাদের অ্যাম্বাসাডার, আমাদের ফিয়াট আমাদের স্ট্যান্ডার্ড?...শ্রমশিল্পে যে-দেশ যত কম উন্নত, তত বেশি উৎকণ্ঠ—আমদানি করা বলেই—তার যাবতীয় সামগ্রী।

আমার ডান পাশে ড্রাইভার মিয়া (অঘনশ্মশ্রুমণ্ডিত তার খুতনী মস্তকাবরণে আচ্ছাদিত তার কেশ!) আর বাঁ পাশে আরেক যাত্রী—সেই যিনি মায়ের জন্য, বোনের জন্য, বৌদির জন্য পাটের সাড়ি নিয়ে চলেছেন। রাস্তার দুধারে সারিবন্দী বনস্পতির ছায়ায় সরিষাক্ষেত্রের পীতবর্ণ পুষ্পের বাহার। বাঁ পাশের লোকটি বললেন 'শিরীষ গাছ!' পিছন থেকে নিঃসঙ্কোচ নারীকণ্ঠ সংশোধন করে বলল, 'শিশু!' অর্থাৎ শিংসপা। তা-ই হবে। মেয়েটি কলেজের ছাত্রী, বিজ্ঞানের ছাত্রী বাবার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সপ্তাহব্যাপী তীর্থ সেরে ফিরছে; মৃণালিনী তার নাম। দেখেছে কালীঘাট ও চিড়িয়াখানা, বেলুড় ও যাদুঘর...দেখেনি 'অশনি-সঙ্কেত'; ববিতাই নায়িকা জানলে দেখতে ভুলত না।

'এবার দেবদারু...' দেবদারুর প্রতি আমার কৌতূহল আছে : বাইবেলের অনুবাদে লেবাননের 'সিডার-কে' আমি দেবদারু বলেছি উদ্ভিদবিদ্যাগত কারণে নয়, শব্দার্থসঙ্গত কারণে : বৃহৎ বৃক্ষের উল্লেখ করতে হলে হিব্রুরা বলত 'ঈশ্বরের বৃক্ষ'।

যশোরের ফাতিমা-হাসপাতাল সকলেই জানে, ড্রাইভার মিয়া ভুল করল না। ঐ ফাতিমা কিন্তু হজরত আলির ভার্যা খাদীজা-সুতার নাম নয়; ফাতিমা হল পর্তুগালস্থিত এক তীর্থস্থান যেখানে নাকি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টজননী তিনজন নাবালক রাখালকে দর্শন দিয়েছিলেন।

দু সপ্তাহ আগে প্রেরিত আমার চিঠি ওরা পায় নি : কলকাতার দূতাবাসে তাঁরা তবে এপারের সঠিক খবরই দিয়েছিলেন : 'দুদিন লাগতে পারে, আট দিন লাগতে পারে নাও পৌঁছোতে পারে!' কি আর করি? অভুক্ত অবস্থায় বাংলাদেশ-বিমানের অফিস অভিমুখে পা বাড়ালাম। মিথ্যা কথা বলব না : পেট চনচন করছিল! মনে হচ্ছিল, প্রতিটি বাড়ি থেকে আসছে গরম গরম পিঁয়াজির গন্ধ (একেই কি বলে 'মিরাজ মৃগতৃষ্ণিকা, ঘ্রাণভ্রম...'); লোভ হচ্ছিল, যে-কোনো গেরস্তের দৌলতখানায়—অখণ্ড বঙ্গের চিরন্তনী প্রথামতো—প্রবেশ করে বলি : 'মাসিমা (অর্থাৎ কিনা খালা-আম্মা) খাব!'

কোনো দরকার পড়ল না : ফাতিমা হাসপাতাল থেকে আসছি যখন, আমি অবশ্যই ব্রাদার বুকারির কুটুম...আর কিছু বলতে হল না : এয়ার অফিসেই এল ওমলেট, এল টোস্ট এল অফুরন্ত ও অকৃত্রিম আদর : ব্রাদার বুকারিকে কিংবা ওঁর দূরতম সম্পর্কের কুটুম্বকে খাওয়ানোর মধ্যেই যে অনেক অনেক সোয়াব আছে। ব্রাদার দেবতুল্য মানুষ (মানে ফেরেস্তাতুল্য জীব!), কত মুমিনের কত বাচ্চা ভূমিষ্ঠ করেছেন তিনি কত অসুস্থকে সুস্থ করে তুলেছেন, একমাত্র আল্লাতালা তাঁর উচ্চতম জান্নাতে তার ইয়ত্তা রাখেন।

দেওয়ালের সঙ্গে কব্জির টাইম মেলাতে গিয়ে দেখি : ও মা, আধঘণ্টা স্লো!...ঘনি মিয়া সকৌতুকে বললেন : 'ভারত যা-ই করুক না কেন যতই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্ভাবন করুক না কেন, এক ক্ষেত্রে কিন্তু চিরকালের মতো সে পিছিয়েই থাকবে : ঐ হারিয়ে-যাওয়া আধঘণ্টা সে কোনো দিনই মেক আপ করতে পারবে না।' তারপর কি যেন ভেবে ইতস্তত করে ঘনি মিয়া জিগ্যেস করলেন : 'আচ্ছা সাহেব একটা প্রশ্ন করব? আপনি কাদের ভালোবাসেন বেশি, হিন্দুদের না মুসলমানদের?'... প্রশ্নটার জন্য আমি পুরোপুরি অপ্রস্তুত ছিলাম না, উত্তরটিও অজানা ছিল না : 'আচ্ছা ঘনি মিয়া কোনটা ভালো বলুন দেখি : বাপের বাড়ি না শ্বশুরবাড়ি?'

ঘনি মিয়া দুপাটি পান-রক্তিম দাঁত দেখিয়ে হেসে বললেন : 'সাহেবের মাথায় কিছু আছে!'

(ক্রমশ)

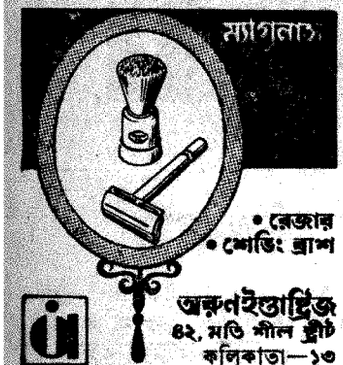

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

চিঠিপত্র ১১

একদা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সহকারী প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ১৩৮টি পত্র; পরিশিষ্টে ৫টি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ-কৃত শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের আলোচনা সংকলিত।
মূল্য ১০-০০, শোভন ১২-০০ টাকা।

●

পূর্ব-প্রকাশিত এবং বর্তমানে প্রাপ্তব্য
চিঠিপত্রের অন্যান্য খণ্ড

খণ্ড ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত ॥ ৩·০০
৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত ॥ ৩·০০
৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত ॥ ৫·০০
৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত ॥ ৩·০০
৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত ॥ ৫·৫০; শোভন ৭·০০
৯। হেমলতা দেবী ও তাঁর পরিবারের অন্যান্যকে লিখিত ॥ ৭·০০
১০। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত ॥ ২·৫০

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত ॥ ৫·০০
পথে ও পথের প্রান্তে। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত ॥ ২·০০
ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত ॥ ১·৫০
রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী। শ্রীমলিনা রায়-অনূদিত ॥ ৬·০০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট । কলিকাতা ১৬
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হলো গত ৩০ জানুয়ারী নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবার নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া গেছে। চিরাচরিত প্রথায় মন্ত্রীদের খুব একটা দেখা যায়নি ডায়াসে। পরিবর্তে অভিনেত্রী (যিনি এখন বিবাহসূত্রে দিল্লী-বাসী) সিমি শুভ মুহূরত অনুষ্ঠানের অনুকরণে মঞ্চের সামনে রাখা একটি ক্যামেরায় সিঁদুর লাগিয়ে মালা পরিয়ে উদ্বোধন করলেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ফুটে উঠেছিল সামনের পর্দায়। 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' থেকে শুরু করে 'অঙ্কুর' পর্যন্ত বহু ছবির অংশ বিশেষ বা স্থির চিত্রের মাধ্যমে। এই সুন্দর অনুষ্ঠানটির সাফল্যের পেছনে ছিলেন এন কৃষ্ণস্বামী। (এ পর্যায়ে কিন্তু বাংলার বড়ুয়া সাহেব, ঋত্বিক ঘটক মৃণাল সেন অনুপস্থিত। কেন বুঝলাম না।)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্যামেরার সামনে আরতি করছেন সিমি

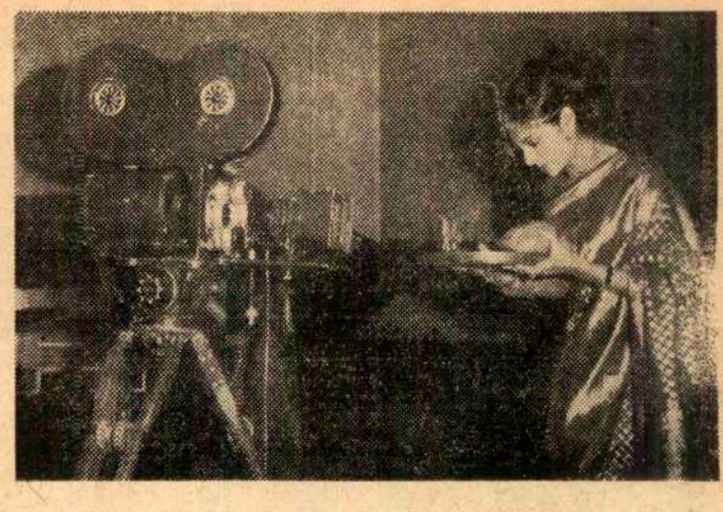

নয়াদিল্লীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

এর পরেই ডায়াসে এলেন বম্বের প্রবীণ অভিনেতা ডেভিড আব্রাহাম। তিনি একে একে জুরীদের সঙ্গে পরিচয় করালেন দর্শকদের। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, অপর্ণা সেন, বার্ট হানস্ট্রব ফ্রাঙ্ক কাপরা, শাদি আবদেল সালাম ও-টোবোকভ, ক্রিস্তফ জানুসি ফ্লোরেন্স ভার্সিনি নাগাসি ওসিমা প্রমুখ। ভারতীয় শিল্পীদের মঞ্চে ডাকা হলে একে একে সব দল বেঁধে হাজির হন বিনোদ খান্না, বিনোদ মেহরা শত্রুঘ্ন সিনহা, যোগিতাবালী, জিনত আমন, রেহানা সুলতান, রাধা সালুজা প্রেমা নারায়ণ মনোজকুমার, আই এস জোহর, প্রেমনাথ, কামিনী কৌশল, রাজ কাপুর ঋষি কাপুর ডাব্বু, শিবাজী গনেশন, যমুনা, ববিতা (বাংলাদেশ), কলকাতার উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী (অনিল চ্যাটার্জি সামনেই বসে ছিলেন মঞ্চে উঠলেন না কেন জানি না)। বিদেশীদের মধ্যে এসেছিলেন জিনা লোলাব্রিজিদা প্রফেসর ব্রোজিল, এ ব্রিস ওয়াল্টার স্কিন্ডার, রিনকার্ড হাফ (জার্মানী) গোপ সামতানি, আমির নাদেরি হাসান ঘোরবানি, মাইকেল র‍্যালফ, চার্লস কুপার ডেনিস পাওয়েল, মারী সিটন কনরাড রুকস, করিম সামার, নাতালিয়া বন্দরচুক নিকোলাস পাপাতোভ, করিমা মোখতার প্রমুখ তারকার উপস্থিতির বিচারে এবারের উৎসব অনেক বেশী গ্লামারাস মনে হতে পারে। কারণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে অশোকা হোটেলে যে নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন ইমপা তাকে এক বিরাট মেলার সঙ্গে তুলনা করা চলে। প্রায় এক হাজার নিমন্ত্রিত ছিলেন সেই রাত্রে। নৈশভোজের সঙ্গে কনভেনশন হলে নৃত্যগীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা যখন পানাহার সেরে ফিরেছি তখন রাত প্রায় দেড়টা। তখনও মেলা চলছে পুরোদমে।

মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে মার্কেটিং বিভাগের কাজও জোর কদমে চলছে দেখলাম। আমাদের কলকাতা থেকে এই বিভাগে দেখাবার জন্য আনা হয়েছে ছ'খানা ছবি। অন্যান্য ভাষায় আছে প্রায় তিরিশ-খানা ছবি। বিদেশের একাধিক সংস্থা এই বিভাগে অংশ নিচ্ছেন। ফ্রান্স, পোল্যান্ড, রাশিয়া চেকোশ্লাভাকিয়া প্রভৃতি দেশের বহু প্রতিনিধি এসেছেন এই বিভাগে অংশ নিতে। চারদিকের আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে এবারের উৎসবে ব্যবসায়ী মনোভাবটাই কাজ করছে বেশী।

•

উৎসব শুরু হবার পাঁচঘণ্টা আগেও ঠিক ছিল না উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা কলকাতার সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকতে পারবো কিনা! শুধু আমরা নই বিদেশী বহু ডেলিগেটরাও বিকেল পর্যন্ত তাঁদের নিমন্ত্রণপত্র হাতে পাননি! শুনতে পেলাম কেউ কেউ আবার ওয়াকআউট করবেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কলকাতার শিল্পী দলের অন্যতম প্রতিনিধি অনিল চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হতে বললেন—'আমাদের কার্ড নাকি কারা নিয়ে গেছে। এইতো একসট্রা কার্ড দিয়ে গেল কিছুক্ষণ আগে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য পরিচালক হাসান ইমানের হাতে দেখলাম ফেস্টিভ্যাল ডাইরেকটর জগৎ মুরারীর কার্ডখানা। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্ব থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপে অব্যবস্থার চূড়ান্ত আর কি! নয়াদিল্লীর পি-আই-বির এমনতরো কর্মকুশলতা এর আগের উৎসবেও দেখা যায়নি। কানাঘুষোয় শুনতে পাচ্ছি এই অব্যবস্থার পেছনেও নাকি স্বার্থান্বেষী কিছু আমলাদের যোগসাজস রয়েছে।

উৎসব সম্পর্কে কিছু লেখার আগে একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা বলে নিই। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সাংবাদিকদের জন্য যত বেশী সম্ভব ছবির বিশেষ প্রদর্শনী করার বন্দোবস্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব সাংবাদিকরা উৎসব কেন্দ্রে যান—তাঁদের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য থাকে বিদেশের ছবি দেখা। বিশেষ করে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ সত্য। সারা বছর ভালো ছবি আমাদের দেশে কটাই বা তৈরী হয়, কটাই বা বিদেশ থেকে আসে! সুতরাং এই ধরনের উৎসব সাংবাদিক ও সমালোচকদের একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় বিদেশী চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার।

উৎসবের আগে কলকাতায় উৎসব পরিচালক জগৎ মুরারী বলেছিলেন প্রতিযোগিতা ইনফরমেশন রেট্রোসপেকটিভ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে যত ছবি আসবে সাংবাদিকদের সেই সব ছবিগুলো দেখানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। ছবি এসেছেও কম নয়। প্রতিযোগিতা বিভাগে আছে পঁচশ-খানা ছবি। ইনফরমেশন ও রেট্রোসপেকটিভ বিভাগে অনেক (পঞ্চাশের বেশী) ছবির মধ্যে আছে রেড সাম (হাঙ্গেরী), অ্যামারকর্ড (ইতালী), এলভিরা মেডিগান, সুইডিশ লাভ স্টোরি, হ্যান্ডফুল অফ লাভ অফিস পার্টি, দি ম্যান হু গেভ আপ স্মোকিং (সবগুলিই সুইডেনের), হায়ারলিং (ইউ-কে), চ্যাপলিনের নখানা ছবি গড ফাদার, মার্ডার ইন সেন্ট একসপ্রেস (ইউ এস এ) ডয়রী অফ এ সিনবুজু থিফ, ক্রক ওয়ার্ক অরেঞ্জ (ইউ এস এ) ইত্যাদির মত কিছু বিখ্যাত বহু আলোচিত ছবি। মজার এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এইসব ছবিগুলো আগত সাংবাদিকদের দেখাবার কোনো বন্দোবস্ত হয়নি। সাংবাদিকরা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার ছবিগুলোই দেখতে পাবেন এটাই সিদ্ধান্ত। বহু বাকবিতণ্ডা অনুরোধ-উপরোধের পর মাঝে মধ্যে দু-একটা ছবি

বার্ট হানস্ট্রার সাংবাদিক সম্মেলন উৎসব পরিচালক জগৎ মুরারী ও বার্ট হানস্ট্রা

দেখাবার বন্দোবস্ত যদি কৃপা করে করেন তাহলে হয়তো বা সুযোগ হবে কিছু ছবি দেখার। নইলে প্রতিযোগিতার চব্বিশখানা ছবিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

দিল্লীর আর্টটি পাবলিক থিয়েটারে উৎসবের বিভিন্ন ছবি দেখানোর বন্দোবস্ত হয়েছে। উৎসবের মূল কেন্দ্র বিজ্ঞান ভবন। মন্ডলঙ্কার হলের প্রদর্শনীর অনেকটাই ফিল্ম সোসাইটি সদস্যদের জন্য নির্ধারিত। অথচ এই দুটি হলের জন্যও সাধারণের কাছে টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিজ্ঞান ভবনে দেখানো হচ্ছে ইনফরমেশন বিভাগের ছবিগুলো। এই প্রদর্শনীতে যাবার প্রবেশাধিকারও সাংবাদিকদের নেই। প্রতিযোগিতার ছবিগুলো দেখার জন্য সকাল ন'টা ও এগারটায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারাটা দিন তাই প্রায় নিষ্কর্মার মতো বসে থাকা। অথচ কলকাতা থেকে প্রায় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে দিল্লী এসেছিলাম ভালো কিছু ছবি দেখার জন্য।

সাতাশ তারিখ বিকালে পৌঁছেই একজন বন্ধুর কাছে যখন শুনলাম সাংবাদিকদের প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোনো বিভাগের ছবি দেখানো হবে না তখন এই প্রায় হাজার মাইল দৌড়ে আসা কেন—এমন প্রশ্ন এসেছিল মনে। আজ দুদিনে চারখানা ছবি দেখেছি। কোনোটাই তেমন ভালো লাগেনি। তবে সুইডেনের 'দি ম্যান হু গেভ আপস্মোকিং (ট্যাগ ড্যানিয়েলশন) ও বেলজিয়ামের 'উইল অফ দি উইসপ' (ফ্রান্স বায়েন্স) ছবি দুটোতে বক্তব্য ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় কিছু নতুনত্বের ছাপ পাওয়া যায়। প্রথম ছবিটি কমেডি ধাঁচে গড়া।

ছোটবেলা থেকেই বাবা ছেলেকে সিগারেট খাওয়া শিখিয়েছে নিজের হাতে। অথচ সে-ই মৃত্যুর সময় ছেলেকে বিশাল সম্পত্তি দেবার সময় উইল করে যায় যে চোদ্দ দিনের মধ্যে যদি ছেলে ধূমপান বন্ধ করতে না পারে তাহলে সে সম্পত্তি পাবে না। ছেলে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে। সিগারেটের নেশার বদলে মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করতে চায় বা অন্যকিছু, কিন্তু কিছুতেই সিগারেট সে ছাড়তে পারে না। নিজের পেছনেই নিজে গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয় এক সময়। শেষ মুহূর্তে সে সক্ষম হয় নেশা ছাড়তে। কিন্তু লোভী কাকা ভাইপোকে আবার সিগারেট খাওয়াবার জন্য নানা মতলব আঁটতে শুরু করে। কিন্তু সফল হন না তিনি। নায়কের পাশে তখন প্রেমিকাও হাজির। নুড কলোনীতে প্রেমের নেশায় তখন তারা মশগুল।

সরস ভঙ্গিতে পরিচালক ঘটনা ও দৃশ্যবিন্যাস করেছেন। কৌতুকের মেজাজ সারা ছবি জুড়ে। তবে নগ্ন দৃশ্যের আধিক্য চোখে লাগে। এবং বেশ কিছু দৃশ্য অতি সহজেই বাদ দেওয়া যেতো। অভিনয়ে প্রধান শিল্পী গুনার স্ভিনসন দারুন কাজ করেছেন।

বেলজিয়ামের 'উইল অফ দি উইসপ'-য়েও নগ্নদৃশ্যের বাড়াবাড়ি কম নেই। বেশীর ভাগই অহেতুক। নায়িকা ইভা কাস্তকে একটিবারও সম্পূর্ণ পোশাক পড়া অবস্থায় দেখা গেল না। ছবির এই দিকটা বাদ দিলে এ ছবিটাকে ভালো লাগে প্রয়োগ কৌশলের আধুনিকতায়। দ্রুত কাটিং, বর্তমান-অতীতের ইন্টারলগ কল্পনা আর বাস্তবের গরমিল সুন্দরভাবে বলেছেন পরিচালক বায়েন্স। তিনজন আফগান নাবিক আন্টায়ার্প বন্দরে নেমে একটি মেয়ের খোঁজ করে, যার সঙ্গে একদিন তারা মিলিত হয়েছিল। সারা শহর জুড়ে অপর একজন ভদ্রলোকের সহায়তায় সেই মেয়েটিকে খোঁজার কাহিনীই ছবির গল্প। সাজানো গল্প নয়। কাটা কাটা দৃশ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছেলেগুলোর চিন্তা আর অতীত নিয়ে তৈরী যেন। যে মেয়েটিকে খুঁজছে তারা পথপ্রদর্শক ভদ্রলোকের প্রেমিক সে। সুতরাং তারা মেয়েটিকে আর খুঁজে পেল না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে গেল বন্দরে। পরিচালক বায়েন্স অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে ঘটনা ও কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রতিযোগিতার অপর দুটো ছবি রুমানিয়ার 'দি প্রোডিগাল ফাদার' (আদ্রিয়ান পেত্রিশ্লিউ) ও যুগোশ্লাভিয়ার 'পার্তিসান' (স্তেভান জানকোভিক) চিরাচরিত সমাজতান্ত্রিক দেশের কাঠামোর তৈরী, বক্তব্যে ও উপস্থাপনায় দেশপ্রেমের জয়জয়কার।

আজ (১লা জানুয়ারী) আরও দুটো প্রতিযোগিতা বিভাগের ছবি দেখা হোল। ইন্দোনেশিয়ার 'হেয়ার আর ইওর মাদার' (হাস মানন) ছবিটাকে পাঁচমিশেলি বাংলা ছবির একটা সংস্করণ বলা যেতে পারে। সস্তা নাটক আর ঘটনার ঘনঘটায় ভারাক্রান্ত এ ছবি কোনো উৎসবের উপযোগী কিনা ভাববার বিষয়। ব্রাজিলের নব্যরীতির পরিচালক নেলসন পেরিয়েরা দস্ সান্তোস এর 'হাউ টেস্টি ওয়াজ মাই লিটল ফ্রেঞ্চম্যান' ষোড়শ শতাব্দীর পটভূমিকায় তৈরী। ব্রাজিলের এক ধরনের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, হিংসা-প্রেম-প্রতিহিংসা পর্তুগীজদের প্রতি তাদের আক্রোশ ইত্যাদি ঘটনা মিলিয়ে কাহিনীর বিস্তার। একজন ফরাসীকে পর্তুগীজ সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কেটে সবাই মিলে খায়। উপজাতীয় একধরনের ড্রামের শব্দ ব্যবহার করেছেন পরিচালক ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে—যা খুবই অর্থবহ। ছবির সকল চরিত্রই সম্পূর্ণ নগ্ন। সভ্যতার আলো তখনও সেখানে পৌঁছয়নি। দৃশ্যবিন্যাস ও ঘটনার বিশ্লেষণে পরিচালকের মুন্সিয়ানার ছাপ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ ছবি ইতিপূর্বে কান চলচ্চিত্র উৎসবের কর্তৃপক্ষ নাকি সব চরিত্রই নগ্ন'—এই অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

প্রতিযোগিতার বাইরে ইনফরমেশন বিভাগের কিছু ছবি ইতিমধ্যে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। যার মধ্যে আছে ফেলিনির 'অ্যামারকর্ড' জোসেফ স্টির্কের 'জেনিস' ত্রুফোর 'ক্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জ' হানস্ট্রার 'এপ এন্ড সুপার এপ।' ইতিমধ্যে ভালো ছবি দেখালেও সাংবাদিকদের সকল সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যাপার নিয়ে প্রায় সমস্ত সাংবাদিকের পক্ষ থেকে একটা দাবীপত্র পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে। দেখা যাক কি হয়।

—নির্মল ধর

আদর্শ, না নেতাদের অহমিকা সরকারকে চালায় ?

গত কয়েক দশকের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সভ্য সমাজের ঘোষিত নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করে কোন দেশেরই কোন সরকার পরিচালিত হয় না। বরং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীর যাঁরা নেতৃত্বে থাকেন, তাঁদের লিপ্সা হিংসা বা অহমিকা সরকার পরিচালনার ব্যাপারে প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মুখে সমাজবাদ, সাম্যবাদ বা ফ্যাসিবাদের ধ্বনি সরকারগুলি তুললেও বাস্তবে দেখা গেছে, সে দেশের কর্ণধারের সম্মানে বা অহমিকায় আঘাত লাগায় তিনি বা তাঁরা সারা দেশটাকে এক জরুরী পরিস্থিতির মধ্যে টেনে নিয়ে গেছেন। ফল হয়েছে সাংঘাতিক। লক্ষ লোকের জীবনহানি; কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস। তবে এই ঘটনা নতুন কিছু নয়; আদিমকাল থেকে এ ঘটে চলেছে। প্রাচীন সভ্য দেশ মিশরের এটা হচ্ছে ইতিহাস।

যাক গে, আসল কথায় আসা যাক। মহাভারত আলোচনায় অযথা আয়ু ক্ষয় করে লাভ নেই। সম্প্রতি ভারতের মাটিতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। পর্তুগালের বর্তমানের বৈপ্লবিক সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এসেছিলেন। পানজিম থেকে কয়েক মাইল দূরে পুরনো গোয়াতে সেন্ট জিভিয়াসের নশ্বর দেহ স্পর্শ করে তিনি ঘোষণা করে গেলেন, ভারত ও পর্তুগাল দুই বন্ধু রাষ্ট্র। সে সময়টা ছিল ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাস। কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখুন ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। তখনও যে পর্তুগাল এবং এই ভারত ছিল, এখনও তাই আছে। সেদিন পর্তুগাল সরকারের ক্ষমতায় ছিল সালাজার নামের এক ফ্যাসিস্ত। তার অহমিকায় আঘাত লেগেছিল। তাই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিতজীর শত অনুরোধ বিনা দ্বিধায় উপেক্ষা করে ঔপনিবেশিকতার অছিলায় গোয়া, দমন, দিউকে আটকে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। পরিণামে যা ঘটল, তা এই যে, ভারত ও পর্তুগালের মত দুই প্রাচীন দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব যায় ছিন্ন হয়ে। পর্তুগীজরা বা ভারতীয়রা কিন্তু তা চায়নি। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায়নি, সালাজার যা চেয়েছিল, সেইটেই হয়ে দাঁড়াল বড় কথা। আজ সেই সালাজার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেই, নেই তার অহমিকাও। তাই নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পেরেছে আনন্দ ও উৎসাহের ভেতর দিয়ে। বর্তমান সরকার স্বীকার করে নিয়েছে, গোয়া দমন দিউ-এর ওপর ভারতের সার্বভৌম অধিকার। তাঁরা বলেছেন, অ্যাঙ্গোলাকেও তাঁরা স্বাধীনতা দেবেন অতি সত্বর।

এবার অ্যাঙ্গোলা বা লিসবন ছেড়ে দেশে ফিরে আসি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত দুবার অর্থাৎ ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট প্রভাবান্বিত যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিলেন। কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট বামপন্থী পার্টিগুলির সমন্বয়ে যে সরকার গঠিত হলো, তাঁদের নীতি বা আদর্শ কি হতে পারে, সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সম্যক ধারণা ছিল। কিন্তু পার্টির নেতৃবৃন্দের মনে হয়েছিল, সাধারণ মানুষ বোধহয় তাঁদের নীতি ঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না। বত্রিশ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করার শপথ নিয়ে তাঁরা সরকার গঠন করেন। কিন্তু এই বত্রিশ দফার মধ্যে কোথাও দলে দলে হানাহানি, হত্যা বা মিল-মালিককে ঘেরাও করে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা জল না খেতে দেবার কথা ছিল না। অথচ যাঁরা ক্ষমতায় এলেন, তাঁদের মধ্যে কারোর কারোর ভেতর অহমিকা দেখা দিলো। তাঁরা এর সমর্থন জানালেন। ফল হলো যে-সরকার জনসাধারণের কিছু উপকার করতে পারতো, অচিরেই সে-সরকারের পরিসমাপ্তি ঘটলো। তারপর সিদ্ধার্থবাবুর মন্ত্রিসভার দিকে তাকিয়ে দেখুন। সতেরো দফা কার্যসূচীর কথা ঘোষণা করে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে একত্রে তাঁরা সরকার গঠন করেছিলেন, কিন্তু সেখানে ছাত্র-যুবদের মধ্যে লড়ায়ের কথা ছিল না। কিন্তু তাঁরা লড়ে চলেছেন। ইউনিয়ন দখলের নামে কর্মচারী-শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। কে কার কথা শোনে। অথচ নেতৃত্বে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের এসবের ব্যাপারে সমর্থন রয়েছে। কারণ তা না হলে নেতৃত্বে থাকা যায় না। কিন্তু ফল দাঁড়িয়েছে কী? সরকার কি তাঁর ঘোষিত নীতি নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছে? আসলে এখন কংগ্রেসের যে সকল নেতা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের অহমিকা বা ব্যক্তিগত ঈর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নীতি বা আদর্শের নাম করে সরকারকে পরিচালনা করে চলেছেন। এরই ফলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অশুভ শক্তি। এরই জন্য গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। তবে নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর জনসাধারণ ও আজকের সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক তফাত। তাঁরা সব বোঝেন। যেদিন তাঁরা সবাক ও সক্রিয় হয়ে উঠবেন, সেদিন কি ঘটবে, সে-কথা কি কেউ চিন্তা করতেই পারছেন না? তবে কেন এই উদাসীন সময়-ক্ষেপন!

কৌটিল্য

এই বাংলার খবর

চটকল ধর্মঘট

পশ্চিমবাংলার ৬২টি চটকলে প্রায় আড়াই লাখ শ্রমিকের ধর্মঘট যাতে না হয় তার জন্যে রাজ্য সরকারের সব চেষ্টা বিফল হলো। জানুয়ারীর ৬ তারিখ থেকে তাই আগের নোটিশ মতো ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে। এই ধর্মঘটের ব্যাপারে চটকল শ্রমিকদের সব ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাই এক কাট্টা। সিটু, এ আই টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি'র দুই গোষ্ঠী হিন্দ মজদুর সভা প্রভৃতি তো শ্রমিকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে বটেই, সেই সঙ্গে আছে আই এন টি ইউ সি। বরং এই শেষোক্ত সংস্থা যেন কোনো রকম আপসের বেশি বিরোধী। প্রকাশ, প্রস্তাবিত ধর্মঘট মার্চ অবধি পিছিয়ে দেওয়ার কথা তুলেছিল সিটু। কিন্তু আই এন টি ইউ সি সে-কথায় কান দিতে রাজি নয়।

চটকল মালিক আর শ্রমিকদের মধ্যে দাবিদাওয়া নিয়ে বিরোধ মীমাংসার জন্যে শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপালদাস নাগ অনেক চেষ্টা করেন। দফায় দফায় বৈঠক করেন দু' পক্ষের সঙ্গে। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগে চার তারিখ পর্যন্ত চলে এইসব আলাপ-আলোচনার পালা। শেষ মুহূর্তেও মীমাংসার একটা সূত্র পাওয়া যাবে, এই ছিল আশা। কিন্তু পাওয়া যায় নি। শ্রমিকেরা দশ-দফা দাবি আদায়ের ভিত্তিতে ধর্মঘটে নেমেছেন। তার মধ্যে প্রধান হলো দুটি—বোনাস এবং জীবন-যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি বাবদ দেয় ক্ষতিপূরণের হার। ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলো বার্ষিক বোনাস চেয়েছে শতকরা বিশ ভাগ। জীবন-যাত্রার ব্যয়ের সূচকের হিসেবে একটা গোলমাল আছে, এ-অভিযোগ শ্রমিকদের বহুদিনের। এই অভিযোগের ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে রাজ্য সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি সুপারিশ করেন সূচক সংখ্যার হিসেব সংশোধনের। কিন্তু সেই সংশোধিত হিসেবের ভিত্তিতে শ্রমিকদের পাওনা কতো হয় তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। চটকল শ্রমিকদের দাবি তাঁদের প্রত্যেকের মাসিক বাড়তি পাওনা ৫০ টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের লেবার ব্যুরোর (সিমলা) হিসেব অনুযায়ী ঐ পাওনা ১৬ টাকার বেশি দাঁড়ায় না। চটকল মালিকেরাও তাই ১৬ টাকার বেশি দিতে চান না। তাঁরা শতকরা বিশ ভাগ বোনাস দিতেও রাজি নন। ওদিকে শ্রমমন্ত্রী জানিয়েছেন, সিমলা ব্যুরোর রায় নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে অনিচ্ছুক।

কৃষি বিদ্যালয়

আগেকার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিভাগটিকে পৃথক করে নিয়ে তৈরি হয়েছে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। হরিণঘাটায় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং পাঠাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িঘর তৈরি করতে সব মিলিয়ে খরচ পড়বে ১৫ কোটি টাকা। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় এ বাবদ রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছেন তিন কোটি টাকা। আশা করা হচ্ছে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। গবেষণার ব্যাপারে সাহায্য করবেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ। মোট তিনশ একর জমি জুড়ে ছড়িয়ে থাকবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা। তা ছাড়া আরো সাতশ' একর মতো জমি সরকার তুলে দেবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজও হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ। বাড়িঘর তৈরি হলেই কলকাতার বেলগাছিয়া থেকে কলেজটি চলে আসবে হরিণঘাটায়। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে থাকবে পশুচিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞানের একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফ্যাকাল্টি।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বললেন, পশ্চিমবাংলায় কৃষির উন্নয়নে এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে বলে তিনি আশা করেন। তা যদি না হয় তবে গবেষণা অথবা কৃষি সম্প্রসারণের কাজ ঠিকমতো এগোতে পারবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে এই ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে জেনে তিনি খুশি। সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অন্বেষণ। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো একটা ভূমিকা রয়েছে—তাকে হতে হবে চাষবাস আর গ্রামের উন্নয়নের হাতিয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল ডায়াস বললেন, গ্রামের উন্নয়নই হলো রাজ্যের সমৃদ্ধির মূল কথা। পশ্চিমবাংলার মাটির নিচে অনেক জল রয়েছে। সেই জলকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে এই রাজ্যে চাষের ক্ষেতে সোনা ফলবে। তা হলে পশ্চিম-বাংলা শুধু নিজের প্রয়োজনই মেটাতে পারবে না, অন্যান্য রাজ্যের ঘাটতিও পূরণ করতে পারবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে

রাজ্য কংগ্রেসের যুব ও ছাত্রকর্মীদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ মিটে গেলেও শাসক দলের সকলেই যে এক সুরে কথা বলছেন তা নয়। একদল কংগ্রেসকর্মী পৃথক সভা করে কংগ্রেস এবং সরকারের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এইসব কংগ্রেসকর্মীর পুরোভাগে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রবীণ নেতা বিজয়সিংহ নাহার। জানুয়ারির ৫ তারিখে কলকাতায় এই গোষ্ঠীর কর্মীদের সভা হলো কুমার-সিংহ হলে। রাজ্যের নানা এলাকা থেকে প্রায় চারশ' কর্মী এই সম্মেলনে যোগ দেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়ে বিজয়বাবু বলেন, দুর্নীতিপরায়ণ কোনো মানুষের কংগ্রেসে ঠাঁই নেই। মন্ত্রী নেতা বা সরকারি কর্মচারী যাঁর বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হোক না কেন তাঁকে সামাজিক দিক থেকে 'একঘরে' করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়লে দেখা যাবে ভয়ের কিছু নেই। কারণ সৎ কংগ্রেসীরা জনসাধারণের সমর্থন পাবে। এই আন্দোলনের যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র হবে বিজয়বাবুর বাড়ি। নিজ নিজ এলাকায় অফিস খুলে ফেলার জন্যে বিজয়বাবু কর্মীদের আহ্বান জানান। যুব কংগ্রেস বা কংগ্রেস নামধারী কেউ সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম করলে সে বিষয়ে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে ঐসব অফিসে।

এই গোষ্ঠীর আহ্বায়ক হয়েছেন বিধানসভার সদস্য কৃষ্ণকুমার শুক্লা। এ-ছাড়া বিধানসভার আরো যে-সব সদস্য কুমার সিংহ হলের সভায় ভাষণ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাশীকান্ত মৈত্র এবং রথীন তালুকদার। শ্রীনাহার ও শ্রীশুক্লা এই আন্দোলনের কর্মসূচী ব্যাখ্যার জন্যে উত্তরবাংলা সফরে বেরুচ্ছেন। তবে তাঁদের এই

আন্দোলনের সঙ্গে জয়প্রকাশের আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানানো হয়েছে।

শুনানী শেষ

অবশেষে পাঁচজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী শেষ হলো। বিচারপতি কৈলাসনাথ ওয়াঞ্চু সব নথিপত্র বাকসবন্দী করে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি ফিরে গেলেন। সব কিছু বিবেচনা করে দেখে তিনি রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন জানুয়ারির শেষে। এই তদন্ত কমিশন গঠনের কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন সেই জুন মাসে। তারপর কমিশন গঠিত হয়ে প্রথম বৈঠক সুরু হয় জুলাইয়ে, শুনানী সুরু হতে-হতে সেপ্টেম্বর এসে যায়। তারপর আবার লম্বা ছুটি। ডিসেম্বরে অবশ্য একটানা বৈঠক করে শুনানীর পালা শেষ করে দেওয়া হলো। পাঁচ মন্ত্রীর মধ্যে গোবিন্দ নস্কর আর অজিত পাঁজার প্রসঙ্গ শেষ হয়েছিল আগেই। এই পর্বে শুনানী হলো সন্তোষ রায়, সুনীতি চট্টরাজ আর সীতারাম মাহাতোর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে।

সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর বোন গায়ত্রীকে নিজের প্রভাব খাটিয়ে সমাজকল্যাণ পরিষদে মুখ্য সেবিকার চাকরি পাইয়ে দেন। হলফনামায় সন্তোষবাবু জানিয়েছিলেন যে গায়ত্রী বি-এ পাস। পরে নতুন হলফনামা পেশ করে তিনি জানান যে, গায়ত্রী গ্র্যাজুয়েট নন। এইবার শুনানীর সময় সন্তোষবাবু বললেন, তাঁর ভুল হয়েছিল, তিনি ত্রুটি স্বীকার করছেন। গায়ত্রী বি-এ পাস করেছেন কিনা সে-বিষয়ে আগে তিনি বিশেষ খোঁজখবর করেন নি। তবে তাঁর পক্ষের কৌঁসুলি বলেন, গায়ত্রীর নিয়োগ অসঙ্গত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্য সন্তোষবাবু কোনো প্রভাব খাটান নি। এ সবই লোকের চোখে মন্ত্রী মশায়কে অপদস্থ করার চক্রান্ত।

সুনীতি চট্টরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর দাদা প্রবোধ চট্টরাজকে ব্যবসায়ের জন্যে সরকারি ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন নিজের প্রভাব খাটিয়ে। এই অভিযোগ সম্পর্কে শুনানী সুরু হওয়ার প্রথম দিনেই অভিযোগকারী সুরেন শেঠের কৌঁসুলি জানালেন যে, আগের দিন রাতে তাঁকে টেলিফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে তাঁকে হত্যা করা হবে। সুরেনবাবুও বলেন যে, তিনি প্রাণভয়ে সাক্ষ্য দিতে ভীত। কমিশনের তরফ থেকে তাঁদের অভয় দেওয়ার পর শুনানী সুরু হয়। অভিযোগকারীর কৌঁসুলি সুনীতিবাবুর স্ত্রী রাণুকে জেরা করেন। রাণু জানান, প্রবোধের আইরিনা রিফ্র্যাকটারি কোম্পানিতে তাঁর শেয়ার আছে তা তিনি এতদিন জানতেন না। সুনীতিবাবুও সেই কথা বলেন। তাঁর পক্ষের কৌঁসুলি অবশ্য প্রভাব খাটিয়ে প্রবোধকে টাকা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, সুনীতিবাবু কি হিটলার যে তিনি এইভাবে টাকা পাইয়ে দেবেন? বনমন্ত্রী সীতারাম মাহাতো তাঁর ভাইপো পদ্মলোচন মাহাতোকে বন দপ্তরে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন, এই অভিযোগ সম্পর্কে সীতারামবাবুর কৌঁসুলি বলেন, পদ্মলোচনকে নিয়ম লঙ্ঘন করে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি।

—দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

রাজনৈতিক হত্যা

বিহারের সমস্তিপুরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত ললিতনারায়ণ মিশ্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রায় সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সব সময়েই একজন বিতর্কিত মানুষ ছিলেন। পার্টির জন্য টাকা তোলার ব্যাপারে পটু বলে পরিচিত ললিতনারায়ণকে ঘিরে একটার পর একটা বিতর্ক উঠেছে। কিন্তু তিনি সেসব বিতর্কের ঝড় কাটিয়ে উঠে ক্রমে ক্রমে রাজনীতির পিছনের সারি থেকে একেবারে সামনের সারিতে চলে এসেছিলেন। ধাপে ধাপে তিনি এমন একটা পর্যায়ে উঠেছিলেন, যেখানে তিনি বিহারের রাজনীতির একজন মুখ্য নেতা ও জাতীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রীর নিকটতম আস্থাভাজনদের অন্যতম হয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে উপমন্ত্রী হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীতে প্রথম প্রবেশ করে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কাজ করে তাঁর কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে ন্যাশনাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকসন কর্পোরেশনের (তিনি কিছুকাল এই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন) ও ভারত সেবক সমাজের টাকা অপব্যবহার করার অভিযোগ এসেছে। কিন্তু ললিতনারায়ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর সমালোচকদের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। লাইসেন্স কেলেঙ্কারির ব্যাপারে সম্প্রতি সি পি আই ছাড়া অন্য বিরোধী দলগুলি তাঁর বিরুদ্ধে যে জেহাদ আরম্ভ করেছে, সেটিও যদি তিনি তাঁর অনুরূপভাবে কাটিয়ে উঠতে পারতেন, তাহলে ৫১ বছর বয়স্ক এই নেতার সামনে যে উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিহারের সমস্তিপুরে একটি নতুন রেল-লাইনের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আততায়ীর বোমা সেই সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

বোমায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিশ্র ও বিহার বিধান পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য সূর্যনারায়ণ ঝা-সহ তিনজন মারা গেছেন এবং ললিতনারায়ণের ভাই বিহারের কৃষিমন্ত্রী ডাঃ জগন্নাথ মিশ্র, বিহার বিধান পরিষদের সদস্য ও প্রাক্তন মন্ত্রী বালেশ্বর রাম, সংসদ সদস্য রামভগবৎ পাশোয়ান, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ও পুলিশের একজন ডি আই জি-সহ প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছেন।

স্বভাবতই ঘটনাটিকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে, বিহারের সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে এবং বিশেষ করে ললিতনারায়ণের বিরুদ্ধে সংসদের ভিতরে ও বাইরে যেসব সমালোচনা হচ্ছিল, সে-সবের সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক কতখানি।

এল এন মিশ্র

বিহার সরকারের অনুরোধে সি বি আই এই নিদারুণ ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করছে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি পাটনায় গিয়ে এই আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে, ঘটনাটি সম্পর্কে 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিস্তারিত তদন্ত' করান হবে। অনুসন্ধানকারীরা ইতিমধ্যে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে—সেদিন সমস্তিপুরের ঘটনাস্থলে একটি নয়, দুটি বোমা ফেটেছিল। সভামঞ্চের উপর যে বোমায় ললিতনারায়ণ ও আরও দুজন মারা গেছেন, সেটি ছাড়াও দ্বিতীয় আর একটি বোমা ফেটেছিল সভাস্থলের কাছেই উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসারের এই বাড়ির সামনে। এই দ্বিতীয় বোমাটির সূত্রে এবং ঐ অফিসারের স্ত্রী ও পুত্রের পরস্পরবিরোধী বিবৃতির ফলে তদন্তকারী অফিসারদের সন্দেহ রেলওয়ে কর্মীদের উপর গিয়ে পড়েছে। পাঁচজন রেলওয়ে কর্মীকে এই ঘটনা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল ঘটনাটি নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, সম্প্রতি যেসব শক্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে, তারা ঘৃণার আবহাওয়া সৃষ্টি করছে এবং হিংসায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। ঐ দূষিত আবহাওয়াই এই জঘন্য অপরাধকে ডেকে এনেছে। কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া তাঁর শোকবার্তায় বলেছেন, যে ফ্যাসিস্ট শক্তি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, তারই প্রথম বলি হলেন শ্রীমিশ্র। সি পি আই নেতা আরও খোলাখুলিভাবে বলেছেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর সহযোগীরা যে হিংসার রাজনীতি চালু করেছেন, ললিতনারায়ণের হত্যা হল তারই অনিবার্য পরিণতি। শ্রীডাঙ্গে বলেন যে, ললিতনারায়ণকে তাঁরা 'নিষ্পাপ' মানুষ বলে মনে না করলেও লাইসেন্স কেলেঙ্কারির সঙ্গে তাঁর সংস্রব আছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

অপরদিকে, জয়প্রকাশ নারায়ণ ললিতনারায়ণের শোকাবহ মৃত্যুর পিছনে ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটনের জন্য 'গভীরতর তদন্তের' দাবি তুলেছেন। সীমান্ত রক্ষীবাহিনী, সি আর পি ও স্থানীয় পুলিশসহ বিপুল পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যেও সভামঞ্চের নিচে কেউ কি করে বোমা রেখে যাতে পারে তা তিনি বুঝতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে জয়প্রকাশ এই ধরনের হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করে বলেছেন এতে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। অন্যান্য যেসব বিরোধী নেতা তদন্তের দাবি তুলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, বিরোধী দলগুলিকে শায়েস্তা করার জন্য ঘটনাটিকে ব্যবহার করা হতে পারে তাঁদের মধ্যে আছেন জনসঙ্ঘের এল কে আদজানি ও অটলবিহারী বাজপেয়ী, সি-পি-এম-এর ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, ভারতীয় লোক দলের রবি রায় প্রভৃতি।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, কংগ্রেসের উপরতলার নেতাদের মধ্যে একমাত্র যিনি এই তদন্তের দাবিতে সায় দিয়েছেন তিনি হলেন জগজীবন রাম।

—পুণ্ডরীক

গোয়েন্দা ধাঁধা

গোয়েন্দাবিবি

হিরোইন যখন পেত্নী হয়

ইন্দ্রনাথ রুদ্র

মেয়েছেলে জাতটা ভারি খারাপ। পুরুষগুলোর হাড় খাবে, মাস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে। মরবার পরেও নামতে চায়না ঘাড় থেকে। যেমন আমাদের শাওলী সেন।

শাওলী কিন্তু হেঁজিপেজি মেয়ে নয়। দস্তুরমত হিরোইন। উঠতি হিরোইন। ফলে চটকটা আরো বেশী ছিল। রসে টসটসে কালো আঙুরের মতই উঠতি হিরোইনদের মতই জীবনদর্শন চাঁচাছোলা, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মানে, দেহটাকে খাটিয়ে নাও, যখন তখন, কিন্তু উচ্চাশাকে রেখো উচ্চে।

এ-হেন রসবতী - জ্ঞানবতী - রূপবতী শাওলীই পার্ক স্ট্রীটের পার্টি থেকে বেরিয়ে হাওড়া পোলের ওপর থেকে ঝাঁপ দিল গঙ্গার জলে।

আত্মহত্যা নাকি? ভারী গোলমালে পড়ল অবনীবাবু—জাঁদরেল পুলিশ অফিসার—কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে প্রগাঢ় ভক্তি থাকার ফলে ঈষৎ কমেডীয়ান। তিনি দেখলেন যে মেয়ে পার্টির সমস্ত পুরুষকে নাচিয়েছে হেসেছে নিজেও নেচেছে; এমনকি পার্টির পর পাছে মদমত্ত পুরুষগুলো কামড়াকামড়ি করে তাকে নিয়ে, এই ভয়ে আধবুড়ো বেতো লেখক হেমাঙ্গ বোসকে নিয়ে ট্যাক্সির সন্ধানে বেরিয়েছে—সেই মেয়ে হঠাৎ জীবনের ওপর এত বীতরাগ হল কেন?

রহস্য জমে উঠল শাওলীর আস্তানায় গিয়ে। হোস্টেলে উঠেছিল মেয়েটা। কিন্তু পুলিশ পৌঁছোনোর আগেই কে যেন সেখানে পৌঁছেছিল। বাকস পেঁটরার লেবেল, অ্যালবাম বইয়ের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। মানে, যেখানে যেখানে শাওলীর পূর্বপরিচয় থাকা সম্ভব—সেসব সঙ্গে নিয়ে গেছে।

এ-আবার কিরে বাবা! মহাধাঁধায় পড়লেন অবনীবাবু। হত্যা-হত্যা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? কে এই শাওলী? নামটা নির্ঘাৎ সিনেমার নাম—বাপ মায়ের দেওয়া নয়।

স্টুডিওতে গেলেন সেই খোঁজেই। ইন্দ্রনাথও যাচ্ছিল স্টুডিওতে একটা গোয়েন্দা কাহিনী সম্পর্কে জ্ঞান দিতে। কাহিনীটা ওরই এক কীর্তি নিয়ে লেখা—'মোমের হাত'। রাস্তার মাঝেই অবনীবাবু পাকড়াও করলেন তাকে।

স্টুডিও গিয়ে বিস্তর খোঁজখবর। আসল খবরটা কিছুই জানা গেল না। শাওলী যেন হাওয়া থেকে আবির্ভূত হয়েছিল। এককালে যাত্রা করত—এইটুকুই শুধু জানা আছে। তারপর ফিল্মে এসে ওর বিউটিফুল বডিটা নিয়ে ভেল্কী দেখাতেই চড়চড় করে উঠতে লাগল ওপরে। 'মোমের হাত' ছবিতে হিরোইনের অফার পর্যন্ত পেয়ে গেল। কনট্রাক্ট সইও সাঙ্গ হল।

কিন্তু কোপদৃষ্টিতে পড়ল ইন্দুবালার। স্টুডিওর হর্তাকর্তাবিধাতা। তারও ইচ্ছে ছিল ঐ 'রোলটা' নেওয়ার। তাতে বিশেষ এক অ্যাকটরের সঙ্গে চুমু খাওয়াখায়ির ইচ্ছেটা মিটিয়ে নেওয়া যেত অভিনয়ের নাম করে।

ইন্দুবালাকে না জানিয়েই রোলটা দেওয়া হয়েছিল শাওলীকে। দিয়েছিল ইন্দুর ভাই শ্যামলাল। ওর আরও দুই ভাই হীরালাল আর মতিলালও স্টুডিওর মাতব্বর বিশেষ।

তবে কি কনট্রাকটটাই মত নষ্টের মূলে? স্ক্রিপ্ট কনফারেন্সে বসে ইন্দ্রনাথ রুদ্র যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেলে খুন হবে আরো তিনটে। শাওলীর কোনো প্রিয়জন প্রতিশোধ নেবে শাওলীর অকালমৃত্যুর। পাছে তার পরিচয় জানাজানি হয়ে যায় তাই সাততাড়াতাড়ি গিয়ে মুছে ফেলেছে সঙ্গে তার নামের যাবতীয় সম্পর্ক।

কে সে? ভাবতে না ভাবতেই টলতে টলতে পড়ে গেল শ্যামলাল। তার কোলিবিল ওষুধের মধ্যে পাওয়া গেল মারাত্মক সুরঞ্জন তল্ক বিষ—যা হাকিমরা প্রয়োগ করে রাত সারাতে।

ইন্দ্রনাথের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যে মরতে মরতে বেঁচে গেল হীরালাল। তারও কোলিবিল ওষুধে পাওয়া গেল সেই একই বিষ।

হীরালালের গাড়ীর স্টীয়ারিং হুইল ভেঙ্গে রেখে গেল রহস্যজনক এক আততায়ী। ঐ গাড়ী নিয়ে হীরালাল রাস্তায় বেরোলে নির্ঘাৎ মারা যেত রোড অ্যাকসিডেন্ট।।

কিন্তু হত্যাকারী যেন হাওয়ায় মিশে ছুটছে মৃত্যুর জন্যে চিহ্নিত মানুষগুলোর দিকে। ইন্দুবালার লেখা একটা চিঠিতে

ফাঁস হয়ে গিয়েছে তিন ভাইবোনের নীচ চক্রান্ত। ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে ইন্দুবালা হুকুম করেছিল ছোটভাইদের—কনট্রাকট যেন ক্যান-সেল করা হয়। দিদির কথা রেখেছিল ভাইরা। মিথ্যে করে প্যাঁচে ফেলেছিল শাওলীকে। দেহ দিয়েও তাই উচ্চাশাকে উচ্চে রাখতে পারেনি শাওলী। পার্টি শেষ হওয়ার পরেই শ্যামলালের মুখে সব জানতে পারার পর মন ভেঙে যায়—গঙ্গার বুকে জ্বালা জুড়োয়।

অবনীবাবু জীপ নিয়ে ছুটলেন ব্যান্ডেলে হীরালালের বাড়ীতে। বাড়ী পর্যন্ত আর যেতে হল না। মাঝপথেই তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তাড়া করলেন একজন পলাতক নকশালীকে। হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'একী! আপনি এখানে? তাই বলুন, আপনিই তাহলে—'

কথার শেষ ঐখানেই। ছুটে গিয়ে হীরা-লালের লাশ পেলেন অবনীবাবু। বুকে ছুরি। ধাবমান পদশব্দ ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে। তার আগে অবশ্য মাথার ওপর ডান্ডার ঘা খেয়ে সংজ্ঞাহীন দেখতে দেখতে জ্ঞান হারালেন অবনীবাবু।

হত্যাকারীর শ্রীমুখ কিন্তু দেখতে পেলেন না। সেই রাত্রেই খবর এল তিন চক্রান্ত-কারীর তৃতীয়জনও সুরঞ্জন তাল্ক মিশোনো জিন খেয়ে পরলোক যাত্রা করেছে—ইন্দু-বালাও আর বেঁচে নেই।

ঝটিকাবেগে হত্যা করে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল হত্যাকারী। কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্রও কম দুঁদে নয়। অবনীবাবু যখন মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে মুখে চাবি এঁটে বাজা বউয়ের মুখনাড়া খাচ্ছে খাটে শুয়ে শুয়ে—ঠিক তখনি ইন্দ্রনাথ এসে কানে কানে বলল হত্যাকারীর নাম আর ঠিকানা।

ভীষণ চমকে উঠলেন অবনীবাবু। অমনি টেলিফোন এল পলাতক সেই নক-শালীর কাছ থেকে। হত্যাকারীর পেছন পেছন সে ছুটেছিল রিভলবারটা হাতানোর জন্যে। পকেট থেকে একটা কার্ড পেয়ে আস্তানা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। সেখানে এলেই মিলবে শাওলী-রহস্যের সমাধান। হত্যা-কারী কোথায়? এই মুহূর্তে গঙ্গার তলায় অথবা কোনো আঘাটায়।

ইন্দ্রনাথ গিয়ে নিয়ে এল হত্যাকারীর ডাইরীটা। মর্মন্তুদ কাহিনী লেখা পাতায় পাতায়। ঢাকায় বাড়ী তার। বিয়ে করেছিল বড়লোকের ঘরের এক ডানাকাটা পরীকে। পরীটির একটি বিয়ের লাইসেন্স দরকার ছিল বলেই হাড়হাবাতে লোকটাকে ঘরজামাই করে রেখেছিল নিজের বাড়ীতে। শাওলী ওরফে শ্যামলী বোস তাদেরই মেয়ে?

দিবারাত্র পৌরুষহীন স্বামীকে যন্ত্রণা দিয়েও মন ভরত না বড়লোকের পরীর—তাই মেয়েটাকে দাঁতে পিষতো যখনতখন। সহ্য করতে পারল না ভদ্রলোক। পালিয়ে এল কলকাতায়। কিছুদিন মাথা খারাপ থাকার পর সুস্থ হয়ে প্রবেশ করল লেখার জগতে।

বেশ ছিল লোকটা। এমন সময়ে ধূম-কেতুর মত আবির্ভূত হল শাওলী। পার্টিতে দেখেই দুজনেই দুজনকে চিনতে পারল। কিন্তু কেউ কাউকে ধরা দিল না। পার্টির ঠিক পরেই শ্যামলালের মুখে শাওলী শুনল তার কপালভাঙার কাহিনী। রাস্তায় নেমে বাপকে বলল তার শোচনীয় ইতিহাস। মা মারা গেছে অনেকদিন। এবার হিরোইন হবার সাধও মিটল। তার পরেই গঙ্গায় গিয়ে এই নোংরা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল মেয়েটা।

পাগল হয়ে গেল তার বাপ। পণ করল তিন শয়তানকে যমের দুয়োর দেখিয়ে ছাড়বে। আগে গেল শাওলীর আস্তানায় প্রমাণগুলো নিশ্চিহ্ন করে এল নিজের হোটেলে। রাতের জন্যে সুরঞ্জন তাল্ক-য়ের গুঁড়ো সঞ্চয় করা ছিল হোটেলের ঘরে। সেই গুঁড়োই মিশিয়ে দিয়ে এল শ্যামলাল, হীরালালের ওষুধে আর ইন্দুবালার জিন-য়ে। হীরালালের গাড়ীও জখম করে-ছিল সে-ই। তাতেও যখন মারা গেল না, তখন ছুরি নিয়ে ওৎ পেতেছিল ব্যান্ডেলের রাস্তায়।

কাজ তার শেষ। কিন্তু মাথার মধ্যে কাঁকড়া বিছের কামড়গুলো আবার শুরু হয়েছে। এ-জীবনে যে সব পেয়েও বারবার হারিয়ে ফেলল—সেকি আবার পাগল হয়ে যাচ্ছে? শাওলী কি তাকে ডাকছে?

ডাইরী শেষ ঐখানেই। ইন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলে অবনীবাবুকে কিভাবে হত্যাকারীর হদিশ আবিষ্কার করেছিল সে।

ঠিক সেই সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে বুঝি নীরবে হেসে উঠল হেমাঙ্গ বোস আর শ্যামলী বোসের প্রেতাত্মা।

হে বুদ্ধিমান পাঠক, বুদ্ধিমতী পাঠিকা! বলুন দিকি ইন্দ্রনাথ কোন সূত্রবলে জানল হত্যাকারী কে?

অদ্রীশ বর্ধন

(সমাধান ৫৩ পৃঃ)

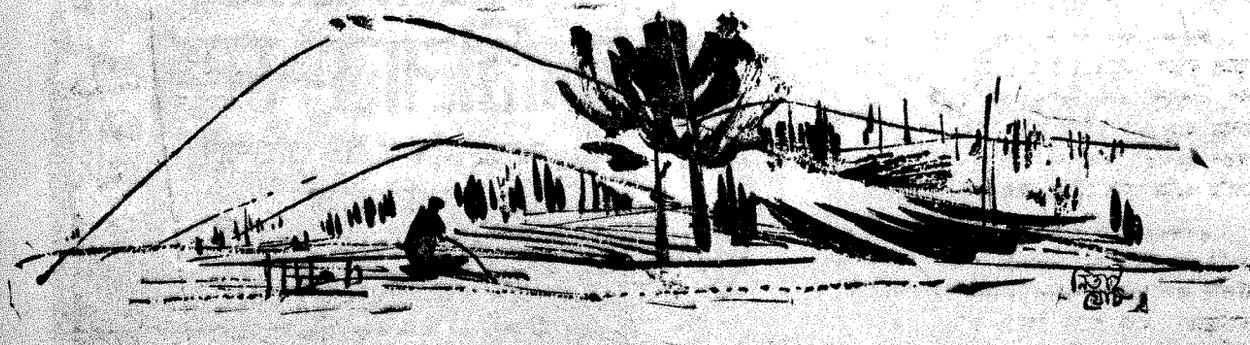

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দু ভাই। ভবনাথ বড়। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতার ছোট আদালতে ওকালতী পরীক্ষা দেওয়া দেবনাথের হল না। পরে বিদেশে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরেছেন।

এদিকে পুজো প্রায় আসি আসি। হারু সরকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিহার্শালের লোক ডেকে বেড়াচ্ছে। ছোট কর্তা বরদাকান্ত জলচৌকিতে বসে ফর্দের ছাড়ছুট ধরিয়ে দিচ্ছেন। দেবনাথ বাড়ি এলেন।

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গারসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনী সুর বেজে উঠল।

আর ছেলে ছোকরাদের আনন্দ দেখে কে। গ্রাম সুদ্ধ মানুষ পুষ্পাঞ্জলি দেবে। অতএব বিস্তর ফুল চাই। আর ফুল জোগাড় করতে হলে ভোররাত্রে দল বেঁধে বেরুতে হবে।

সেই কথা ভেবেই কত আনন্দ। সেই দলের পাণ্ডা জল্লাদ। কমলকেও সে সঙ্গে নিল। তারপর ভোর ভোর রাত্রে একদল গ্রামের ছেলে পথে বেরিয়ে পড়ল।

জল্লাদ দেমাক করে বলে, এক জায়গা থেকেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে।

সঙ্গীরা শিউরে ওঠে : পদ্ম তুলবে নাকি এই দীঘির?

জল্লাদ বলে দীঘি আর কোথা শুধুই তো পদ্মবন। যতখুশি তুলে নাও। ফকিরের ভিক্ষের মতন এর কানাচে ওর চাঁচতলায় ফুল তুলে তুলে ঘরব কেন রে? একখানে ঝুড়ি বোঝাই। শুধু ফুল কেন, পাতাও নেবো। বৃহৎকর্মে পদ্মপাতেও লোকে খেতে পারবে। গোড়া থেকেই আমি ভেবে রেখেছি ঘাবড়ে যাবি তোরা সেই জন্য বলিনি। আর বাবার কানে গিয়ে পড়লে তো আমাকে একচোট পিটুনি দিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে আটকাত।

ফ্যা-ফ্যা করে হেসে নিল খানিক। হাত তুলে জায়গা দেখিয়ে দেয় : উই যে চেঁতো বন, ঐখানে ডোঙা ফেলব। গরু ঘোড়া নেমে নেমে ঘাস খায় ধাপের মধ্যে দিব্যি শয়ালের মতন হয়েছে। কাল আমি হেঁটে দেখে গেছি ধরজি মেরে ডোঙা বেশ চালানো যাবে।

যথাস্থানে নিয়ে মাথার ডোঙা ফেলল। বর্ষার জল যত সামান্য আছে গাদই বেশি। জল্লাদ বলে পয়লা ক্ষেপে তিনজন। আর সব দাঁড়িয়ে থাক পরের ক্ষেপে যাবি। ভার বেশি হয়ে গেলে পাঁকে-কাদায় ধরবে, ঠেলে কূল পাওয়া যাবে না। আমি যাচ্ছি, বড়ু আসুক আর কে আসবি রে? ঝন্টু তুই বরঞ্চ আয়।

পদা বলল সাপটাপ আছে, নজর ফেলে সামাল হয়ে এগোবি।

এক্তার-বক্তারের দীঘির সাপের কথা সবাই জানে, বলে দিতে হয় না। শরবনের ধারে ভাঙা শামুকের গাদা-শামুক ভাঙা কেউটে মশায়রা আহারাদি সেরে উচ্ছিষ্ট ফেলে গেছেন। গরু ঘোড়া ঘাস খেতে নেমে প্রতি বছরই দুটো পাঁচটা কাটিঘায়ে ঘায়েল হয়।

জল্লাদ বলল সুভালাভালি ফিরে মা-মনসার দুধ-কলা দেবো, মানত করেছি। মনে মনে তোরাও সকলে আস্তিকস্য পড়ে নে, সাপে কিছু করতে পারবে না।

হেঁসো দা হাতে জল্লাদ ডোঙায় ঠিক মাথার উপরে হাঁটু গেড়ে বসেছে, ডাইনে বাঁয়ে হেঁসো চালিয়ে জঙ্গল ও দাম কেটে পথ করে দিচ্ছে। সাপ পড়লেও হেঁসোর মুখে কচাত করে দু-খণ্ড হয়ে যাবে। দু পাশে দুজন, বড়ু আর ঝন্টু ধরজি মেরে প্রাণপণ বলে এগুচ্ছে। একটু গিয়েই হুঁশ হল জল্লাদের : রাখ রাখ, আরও একজন চাই। পদ্মবনে গিয়ে ফুল তুলবার মানুষ কই? ধরজি ফেলে তোরা পারবি নে হেঁসো ছেড়ে আমিও না।

ঝড়ু বলল তিন মানুষের বোঝা এমনিই বেশি এর উপর আবার তো পদ্ম-ফুল পদ্মপাতার চাপান পড়বে।

জল্লাদ ডাঙায় তাকিয়ে দেখছিল। বলল, কমলটা আসুক এক ফোঁটা মানুষ—ওর আর ওজনটা কি। ওদের বাড়ির পুজো—ভালই হবে, নিজের হাতে ফুল তুলবে।

কাস্তে দিল কমলের হাতে : টুক-টুক করে কেটে যাবি কেটে সঙ্গে সঙ্গে ডোঙায় তুলে ফেলবি।

কী মজা কমলের। না কেটে ফুল-পাতা উপড়ে তোলাও যায়—উঁহু, উপড়াতে গিয়ে সরু হাল্কা ডোঙা কাত হয়ে ডুবে যেতে পারে। ডুববে জলে নয়, গাদের ভিতর। এক-মানুষ সমান গাদ এখানটা। জলে ডুবলে জেলে ডেকে জালাজ করে দেহটা অন্তত পাওয়া যায় — এখানে সেটুকুও নয় পাকাপাকি কবর। সেই এক

যুগে এত্তার-বত্তারের আমলে নিফুটি জল ছিল নিশ্চয়—লোকে স্নান করত সাঁতার কাটত, কলসি কলসি জল নিয়ে যেত বউ-ঝিরা, ছেলেপুলেরা জল কাঁপাত। তারপরে ক্রমশ দীঘি মজে-হেজে গিয়ে জঙ্গল ডেকে উঠল সাপের ভয়ে কেউ আর এ-মুখো হত না। বিশাল পদ্মবন গ্রীষ্মে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বর্ষার জল পড়লে পাতা গজিয়ে ওঠে। ভাদ্রে কলি ফুটতে শুরু হয়, পরিত্যক্ত দীঘি তারপর পদ্মে পদ্মে আলো হয়ে থাকে সারা দিনমান দূর থেকে পথিকজন দেখে যায়। আজকেই প্রথম পুজো উপলক্ষ্য করে দুঃসাহসী কয়েকটা গ্রামবালক পদ্মবনে ঢুকে লগি ঠেলছে, ফুল তুলছে।

আর ক্ষণে ক্ষণে জহ্লাদ সামাল দিচ্ছে কমলকে : ভাল ছেলে তুই, তা খাসা তো বোঁটা কাটছিস। ডুবে না মরিস সেই খেয়ালটা যেন থাকে। মুখ কাচুমাচু করতে লাগল, মায়া হল, তাই নিয়ে এলাম। সুভালাভালি ডাঙায় ফেরৎ নিয়ে তুলতে পারলে যে হয়।

কাল ষষ্ঠীর বোধন হয়ে গেছে। চারটে ঢাক ছিল তার উপর হাঁসাডাঙা থেকে এইমাত্র ঢোল-শানাই এসে পৌঁছল। মণ্ডপ জমজমাট। ছেলেপুলের ছুটোছুটি কলরবে তোলপাড় পড়ে গেছে। বড় বউ উমাসুন্দরী নেয়েধুয়ে মাথার চুল চূড়াকরে সামনের দিকে বেঁধে হেসে হেসে আদর-আপ্যায়ন করছেন সকলকে। নতুন পুকুরে কল্যাবউকে স্নান করিয়ে আনল। উমাসুন্দরী বলেন, সার্থক পুকুর কাটা, সার্থক পুকুর-প্রতিষ্ঠা।

ভিতর-বাড়িতেও ছুটোছুটি হাঁকডাক। তরঙ্গিনী ওদিকে। রান্নাঘরের সামনের উঠোনটুকু তকতকে গোবর-নিকোনো, সিঁদুর পড়লে প্রতিটি কণিকা তুলে নেওয়া যায়। আলু পটোল মিঠে কুমড়ো কাঁচকলা এনে ঢালল সেখানে, খান পাঁচেক বঁটি এনে ফেলল। মেয়েলোক বিস্তর জমেছে তাদেরই কতক বঁটি পেতে বসল। তরকারি কোটা ও গল্পগাছা চলছে। কুটনো কুটে বড় বড় ঝুড়ি-চাঙারিতে রাখছে ধুয়ে আনছে সে সব পুকুরঘাট থেকে। আর একদিকে কেঠো বারকোশ চাকি-বেলুন হাতা-খাঁবরি কড়াই-গামলা মেজে-ঘষে সাফ-সাফাই করে গাদা দিয়ে রাখছে। জল ঝরে গেলে ঘরে তুলে নেবে এর পর।

এ দিকের ব্যবস্থা সেরে তরঙ্গিণী রান্নার দিকে ছুটলেন। অনেক মানুষ খাবে, ছেলেপুলে বিস্তর তার মধ্যে। বাজনা খানিকটা নরম হলে খাই-খাই রোল উঠে যাবে, তখন আর দিশা করতে দেবে না। বাঁশে খাড়ে ঘর তুলতে ভবনাথের আলস্য নেই—রান্নাঘরের গায়েই এক চালাঘর উঠে গেছে ইতিমধ্যে—অস্থায়ী রান্নাঘর। চার উনুন সেখানে—রাবণের চুল্লি, এ কদিন দিনে ও রাত্রে কোন না কোন উনুন জ্বলছে। কখনো বা চার উনুন একসঙ্গে। গাঁয়ের ঝি-বউ একটিও বোধ হয় বাড়িতে নেই —কাপড়-চোপড় গয়নাগাটি পরে পুজো দেখতে এসেছে। বাড়ি থাকার গরজও নেই—খাওয়া সবশুদ্ধ আজ এখানে।

ঝড়ুর মা কি কাজে এদিকে একবার এসেছেন, চেয়ে চেয়ে তরঙ্গিণীর ছুটোছুটি দেখছেন। বললেন, পুজোর এত সোরগোল, ছোট বউ সেই রাঁধাবাড়া নিয়ে রান্নাঘরে পড়ে আছে।

তরঙ্গিণী বললেন কল্যাবউ নিয়ে যাচ্ছে তখন একবার গড় করে এসেছি। অঞ্জলির সময় আবার গিয়ে বসব। কি করব দিদি, এদিকে না থাকলেও তো চলে না।

ঝড়ুর মা খোশামুদি সুরে বলেন, তোমারই সার্থক পুজো ছোট বউ, মা জগদম্বা হাত পেতে তোমার অঞ্জলি নেবেন। যেমন মন, তেমনি ধন। এই মনের গুণেই ছোট ঠাকুরপোর এতখানি সুসার-পশার।

কাজের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গিণীর বুকের ভিতরে টনটন করে ওঠে, কাজ ফেলে মুহূর্তকাল পাঁচিলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান। পঞ্চমী ষষ্ঠী গিয়ে মহাসপ্তমী এসে গেল, মা দুর্গা ছেলেমেয়ে এপাশে ওপাশে নিয়ে মণ্ডপ আলো করে আছেন, তাঁর মেয়ে এলো না বোধ হয় আর। চঞ্চলা, সুরেশ এলো না—আর কবে আসবে? শাশুড়ির চক্রান্ত, সে আর বলে দিতে হবে না। বউকে চোখে হারান—বাড়ির বার হতে দিতে বুক চড়-চড় করে। স্বার্থপর, নিজেরটাই দেখেন শুধু, অন্যদের কেমন হচ্ছে সেটা একবার ভাবেন না। দিয়ে দেবেন শেষে একটা অজুহাত বাসের সিট পাওয়া গেল না। বলে দিলেই হল, বিয়ে দেওয়ার পর চঞ্চলা তো ওঁদের হয়ে গেছে—'পাঠাব না' স্পষ্টাস্পষ্টি না বলে ঘুরিয়ে বলে দেওয়া। লোকজনের ভিড় আর কাজকর্মের চাপে একদণ্ড নিরিবিলি হতে পারছেন না, দেবনাথকেও একটু কাছাকাছি পাচ্ছেন না যে মেয়ের কথা বলে মন কিছু হাল্কা করবেন।

চড়া রোদ। মণ্ডপে বেলোয়ারি-ঝাড় ঝলোনো ঝাড়ের গায়ে রোদ ঠিকরে পড়ছে। ঠাকুরমশায় গম্ভীর সুরে চণ্ডীপাঠ করছেন—সেদিকে লোক নেই, বুড়ো-বুড়ি গোনাগোনতি কয়েকজন। বলির বাজনা বেজে উঠতে সকলে রে-রে করে ছুটল। মণ্ডপের ভিতরে-বাইরে উঠানে সামিয়ানার নিচে লোকে লোকারণ্য। সন্ধিপুজোয় পাঁচ কুড়ি-পাঁচ পদ্ম লাগে—জোটানোর ভাবনা হয়েছিল, আর এখন দেখ পদ্মের পাহাড়, অঞ্জলি দিচ্ছে আস্ত এক এক পদ্ম নিয়ে। নিমন্ত্রিত অভ্যাগত গ্রামবাসী সকলে প্রসাদ পাবেন পুরোদস্তুর পাতা পেতে খাওয়ানো—লুচি তরকারি মিষ্টি মিঠাই। মণ্ডপের সামনে সামিয়ানার নিচে পুরুষরা, মেয়েরা ভিতর-বাড়ি। সোনাখড়ি গাঁয়ের মধ্যে আজ উনুন জ্বলবে না, মুক্তো-ঠাকরুন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এসেছেন।

সন্ধ্যা হতে না হতেই আলো। চতুর্দিকে আলো, আলোয় আলোয় দিনমান করে ফেলেছে। প্রতিমার দুপাশে বাতিদানে চারটে করে বাতি, মাথার উপর কাচের হাঁড়িতে বাতি জ্বলছে। হ্যালিং-লণ্ঠন ও হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে এখানে ওখানে। কারবাইডের আলো। আর আছে সরার আলো—কলার তেউড়ের মাথায় সরা বসিয়ে তুষে কেরোসিনে ধরিয়ে দিয়েছে, দাউদাউ করে জ্বলছে। দিনমান কোথায় লাগে। আরতির সময় চার চারটে ঢাকে তোলপাড়। মানুষজন ভেঙে এসে পড়েছে। ঢাক থামলে ঢোল আর মিষ্টি-মধুর শানাই। কাঁসর বাজছে ঢং-ঢঙাঢং ঢং-ঢঙাঢং। ধূপের ধোঁয়ায় মন্দির আচ্ছন্ন। এক হাতে পুরুত পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাচ্ছেন আর হাতে ঘন্টা নাড়ছেন.....

কলকাতার প্লেয়ার দুটি কর্ণ ও শকুনি মহালয়ার দিনে নয়—তার পরের দিনে পৌঁছে গেছে। কালিদাস নিয়ে এসেছে। এসে আর দেরি নয় ফুল রিহার্শাল সেই দিন থেকে। এবং সপ্তমীতে চুল-দাড়ি-গোঁফ পরে না নামা পর্যন্ত প্রতিদিন চলবে। বলে, সড়গড় করে নিই সকলের সঙ্গে—সকলকে বাজিয়ে দেখব, দূত-সৈনিকও বাদ থাকবে না। অতদূর থেকে কষ্ট করে এসে ধ্যাণ্টামো হতে দিচ্ছি নে।

মাদার ঘোষ হারু সরকারকে বলে, কি বলছে শুনেছ?

হারু বড়াই করে : ডরাইনে, হবে তাই। চার মাস একনাগাড় ঘোড়ার ঘাস কাটিনি আমরা।

(ক্রমশঃ)

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ----- ১৪'০০
২। গুল বাগিচা----৩'৫০, ৩। কাব্য আমপারা--৪'০০
৪। পূবের হাওয়া----২'০০, ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি--২'০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

তোমার সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কালাকাল কী বা দেবে ভবিষ্য-অধুনা
জানা আছে সব কিছু স্বাদের নমুনা।
তুমি যা বা দিতে পারো যা বা তুমি দেবে
আদ্যোপান্ত কুলোবে না কোনোই হিসেবে।
যখন যা করো তুমি তোমাতেই সাজে
অনুমানে আসে না তো বুদ্ধির আন্দাজে।
গণিতে প্রণীত নও তুমি অগণন
অনন্তের মাপে লাগে অনন্ত ওজন।
মস্তিষ্কের চলে না তো কোনো কারসাজি
বিজ্ঞানের তোপ দাগা হাউইয়ের বাজি।
তোমারই সর্বশক্তি দুর্ঘটঘটনী
শক্তিশেল দিয়ে আনো বিশল্যকরণী।
অভাজনে অকিঞ্চনে করো রাজ্যপাল
রাজ্যভ্রষ্ট ক'রে করো শ্মশানচণ্ডাল।
গিরি-মরু ক'রে তোলো সমুদ্র উদ্বেল
দুঃখের তো শেষ আছে, কৃপাই অঢেল।
নিরাশায় প্রার্থনায় আর যন্ত্রণায়
তোমার সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।।

তুমি বন্ধু, অহেতুক হৃদয়রঞ্জন
সমতায় প্রবাহিত, আবার কখন
দস্তানায় গুপ্ত রাখো প্রখর নখর
বন্ধু তুমি শত্রুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।
সর্বক্ষণ হননেচ্ছু করো অপমান
শেষে দেখি ধূলিতেই একত্র শয়ান।
দিবস উদ্ভ্রান্ত ক্লান্ত রজনী বধির
নিষ্ঠুর আঘাত দাও নিদ্রা যে গভীর।
যত হানো তত আনো অমৃতক্ষরণ
শূন্য ক'রে দিয়ে করো ন্যূনতা-পূরণ।
যত আনো পদে-পদে বিপদের দায়
তত দেখি পায়ে-পায়ে রেখেছ উপায়।
রাখো ক'রে হৃতধন দরিদ্রের মত
তোমার চিন্তনে থাকি তন্ময় সতত।
অশরণ আমরণ স্মরণ-আবেশ
শাস্তির তো শেষ আছে, ক্ষমাই অশেষ।
ব্যর্থতায় উপেক্ষায় আর অপেক্ষায়
তোমার সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কবি সুকান্ত-মূল্যায়ন সম্পর্কে অনুষ্ঠান

গত ২১ ও ২২ ডিসেম্বর পঃ বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে কবি সুকান্তকে নিয়ে সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়াসে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনি সুকান্তর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন সুকান্তকে স্মরণ করে আমরাই ধন্য হচ্ছি।

সুকান্তর কবিতা এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন শ্রীযুক্তা সরলা দেবী রাখাল ভট্টাচার্য অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য মোহিত আইচ অরুণাচল বসু ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এঁরা সবাই সুকান্তর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই এঁদের স্মৃতিচারণে সুকান্তর জীবনের বিভিন্ন দিকের শিক্ষাপ্রদ ও বেশ কিছু অলিখিত তথ্য প্রকাশ পায় এবং তাঁরা প্রচলিত কিছু ভ্রান্তিকর তথ্যও খণ্ডন করেন। এই স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধগুলি ভবিষ্যতে সুকান্ত-মূল্যায়ন বিষয়ে সহায়ক হবে।

সুকান্তের কবিতা প্রসঙ্গে প্রবন্ধ মারফৎ আলোচনা করেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য শ্রীঅরুণ মিত্র ডঃ সীতাংশু মৈত্র মণীন্দ্র রায় রাম বসু তরুণ সান্যাল। এঁদের প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় কবি সুকান্তের স্থান তাঁর কবিতায় বাস্তবতার নতুনত্ব যুগের প্রভাব আধুনিক কবিতায় সুকান্তের প্রভাব তাঁর ভাষা ছন্দ চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ মূলবান আলোচনা হয়। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যথাক্রমে তিনটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দেন।

কোন কোন মহলে সুকান্তকে অস্বীকার করবার আয়োজন চলেছে আর কোন কোন মহল তাঁকে সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাইছেন। এই দুই প্রবণতার বিরুদ্ধে এ অনুষ্ঠানের সমগ্র কর্মসূচী সোচ্চার ছিল।

মূল্যবান আলোচনা ছাড়াও সুকান্ত কবিতার আবৃত্তি ও গান পরিবেশন নৃত্য প্রদর্শন হয়। তাতে শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীঅজিত পাণ্ডে শ্রীসুবীর সেন শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরমেন ঘোষ অজয় দাস নতুন সংস্কৃতি আনন শম্ভু ভট্টাচার্য প্রেমব্রত মুখোপাধ্যায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ ঘোষ মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য নীলাদ্রিশেখর বসু প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন।

—দিঃ মোঃ

নতুন বই

Calcutta and Its Neighbourhood : (History of people and local from 1690 to 1857) by Reverend Father Janur Long. Indian Publications. 3 British Indian St. Calcutta-1. Price Rs. 32.

শহর কলকাতার পত্তন ঘটেছিল কিভাবে এবং কখন তা নিয়ে আজ আর কাউকে বিব্রত হতে দেখা যায় না। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন বন-জঙ্গলঘেরা এই প্রকৃতিতে মানুষের শত্রু ছিল হিংস্র বন্যচারী প্রাণী। ডাকাত আর দস্যুর ভয়ে সমস্ত অঞ্চল ছিল আতঙ্ক ও বিপদের প্রাণকেন্দ্র। তারপর একদিন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আসে ইংরেজ বণিক। উপযুক্ত বিবেচনা করে এখানে তারা গড়ে তোলে শহর, কলকাতা-সুতানুটি ও গোবিন্দপুর তিনখানি গ্রামকে কেন্দ্র করে। নির্মাণ করে ফোর্ট উইলিয়ম। সিরাজকে পলাশীর যুদ্ধে হারিয়ে ইংরেজ এদেশের শাসক হয়ে ওঠে। সে হল দু'শ বছরেরও বেশী সময়ের আগেকার ঘটনা।

তারপর কলকাতা এগিয়েছে কখনও দ্রুত লয়ে কখনও মন্থরভাবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রাণবিন্দু কলকাতা ভারতের সমস্ত শহরকে ম্লান করে গড়ে উঠেছিল বিদেশী ব্যবসায়ীদের স্বার্থে।

পুরোন কলকাতার বহু বিবরণ ছড়িয়ে আছে নানাভাবে, নানা স্থানে। সম্প্রতি শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত সেকালের বিশিষ্ট কলকাতাবাসী রেভারেন্ড লঙের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন। এই জাতীয় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ বেরিয়েছিল, কিন্তু অধুনা তা দুষ্প্রাপ্য।

রেভারেন্ড লঙ কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না, কর্মব্যপদেশে তাঁকে সেকালের বহু সমাজউন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত হতে হয়েছিল। এই কারণে সে সময়কার বিশিষ্ট বাঙালীদের সংস্পর্শে এসে বাঙালী সমাজকে জেনেছিলেন সামগ্রিকভাবে। কলকাতাকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন এবং জেনেছিলেন তারই সঠিক চিত্রণ ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে। কলকাতার মানুষ তার উন্নয়ন এবং শ্রীবৃদ্ধিকে রেভারেন্ড লঙ তুলে ধরেছেন পরিবেশ ভূপ্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে।

এই অসামান্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করে সম্পাদক মূল্যবান কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ ভূমিকায় প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কলকাতার ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি সুধীজনের প্রশংসা পাবেন। সমকালীন কলকাতার ছবি পেলে একালের পাঠক উপকৃত হতেন।

সিদ্ধসাধক তারাক্ষ্যাপা — ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়। নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৩৫+১০। মূল্য—ছয় টাকা।

এই ভারতভূমিতে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে জাতির কল্যাণকামনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। অধিকাংশ সিদ্ধসাধক দেশমাতৃকার কথা মনে রাখেন নি। তাঁদের ধ্যানধারণা নিখিলভুবনের আপামর সাধারণকে নিয়ে। এই গতানুগতিক নিয়মের আশ্চর্য ব্যতিক্রম ঘটেছে সিদ্ধসাধক শ্রীমৎ তারানাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের (তারাক্ষ্যাপা) জীবনে। তিনি বলতেন মাটি হলো মা। পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্যে আজন্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীবামদেবের একমাত্র সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য ও তৎস্থলাভিষিক্ত পীঠাধীশ এবং তারা সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক ব্রহ্মচারী তারানাথ ছিলেন প্রকৃতই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁর গোপন কার্যকলাপে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল দুর্ধর্ষ ইংরেজ সরকার। অধ্যাত্ম সাধনার শিখরে আরোহণ করেও যে দেশের পরাধীনতার জন্যে প্রাণ কাঁদতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তারা-

ক্ষ্যাপা। বাঘা যতীন থেকে শুরু করে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত সকলেই তারাক্ষ্যাপার সঙ্গে গভীর আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এই মহাপুরুষ ছিলেন একান্ত আত্মপ্রচারবিমুখ। তাই তাঁর জীবনকথা এ পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। এই অভাব পূরণ করেছেন ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় তারাক্ষ্যাপার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর।

'সিদ্ধসাধক তারাক্ষ্যাপা' গ্রন্থ ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মহাযোগী ও সিদ্ধসাধকদের অধ্যাত্ম জীবন এবং সাধনতত্ত্বের ভাবরাশি সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। তাছাড়া তারাক্ষ্যাপা ছিলেন প্রকৃতই তারামায়ের পাগল ছেলে। তাঁর জীবনকাহিনী সুগ্রথিত করে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য কর্ম। এই মহৎ কর্ম অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধা করে গ্রন্থকার আংশিক ভাবে পরিশোধ করেছেন তাঁর ঋণিঋণ।

গ্রন্থটিতে মোট উনত্রিশটি অধ্যায় আছে। এর মধ্যে পঁচিশটি অধ্যায়ে মহান সাধকের জীবনকাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভাষার লালিত্যে ভাবের গাম্ভীর্যে ঘটনা পরিবেশনার পারিপাট্যে সমগ্র গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয়েছে নিটোল গল্পের মতো। পাদটীকা অংশে সুপন্ডিত এবং সাধক গ্রন্থকার অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিশেষতঃ তন্ত্রসাধনার বহু বিষয় প্রাঞ্জল করে বর্ণনা করেছেন। এই বিশাল পরিচ্ছেদটি গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। 'পঞ্চদশ বিদ্যা' অধ্যায়ে গ্রন্থকার পরলোক ও জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের স্বরূপ সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন জিজ্ঞাসু পাঠকের সামনে। 'তারানাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' অংশে লেখক নেতাজী সুভাষের জীবনের এক অজ্ঞাত কাহিনী গবেষকদের সামনে এনে দিয়েছেন। ক্ষ্যাপাজী বলতেন 'জিহ্বা সংযত রাখিয়া মৌনী অর্থাৎ মুনি হতে হয়।' ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় এই আপ্তবাক্য স্মরণ রেখে গ্রন্থ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। যদি তিনি তা না করতেন তাহলে এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবনের আরো অজ্ঞাত কাহিনীর আস্বাদনে আমরা পরিতৃপ্ত হতে পারতাম। ক্ষ্যাপাজীর সাংকেতিক ভাষায় পত্রগুলির মর্মব্যাখ্যা থাকলে রসগ্রহণে সুবিধা হতো। যে গবেষণাগ্রন্থ তিনি রচনা করে গেলেন তার জন্যে দেশবাসী কৃতজ্ঞ থাকবে। সুন্দর ছাপা, সুন্দর বাঁধাই ও আকর্ষণীয় চিত্রসমূহের সংযোজনে এ গ্রন্থ সকলেরই সংগ্রহ করা উচিত।

—অমিয়কুমার মজুমদার

আরো বই

লালের ডালি (কাব্য সংকলন)। মুকুল ভট্টাচার্য। বুলবুল প্রকাশনী, ২, ওয়ালিউল্লা লেন, কলকাতা-১৬। তিন টাকা।

'লালের ডালি' গ্রন্থের কবি এখনো পরিণত ভাব, ভাবনা ও প্রকাশরীতির দক্ষতা নিয়ে আসতে পারলেন না, গ্রন্থ পড়ে বোঝা গেল। কিছু আবেগ-উচ্ছ্বাস, অনেক অবান্তর কথার জন্ম দিয়েছে এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে। ছন্দ সম্পর্কে এখনো ভাল জ্ঞান তৈরী হয়নি। আরও কিছুকাল লেখার পর, ছন্দ আধুনিক কবিভাবনা সম্পর্কে কিছুটা দক্ষতা অর্জনের পর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে উৎসুক হলে ভাল করতেন।

স্তব্ধ কৃতজ্ঞতা (কাব্য সংকলন)। সুকুমার দাশ। প্রকাশকামি ১৮৯ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-১। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রায় সবই গদ্য-কবিতার ঢঙে লেখা সুকুমার দাশ রচিত 'স্তব্ধ কৃতজ্ঞতা' গ্রন্থের কবিতাগুলি। গ্রন্থের নাম কবিতা নিয়ে মোট তেত্রিশটি ছোট-বড় কবিতা আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কবির আন্তরিকতা বাস্তব সমাজদৃষ্টি, জীবনভাবনা ও সমকালচেতনা কবিতাগুলিতে ওতপ্রোত। কয়েকটি কবিতা— যেমন, আমি, পুরস্কার, স্তব্ধ কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি ভাল লাগল। কিছু কবিতা কাঁচা। সংকলনভুক্ত না হলেই ভাল হত।

পরলোকের প্রাঙ্গণে। হৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

পরলোকতত্ত্বটিকে লেখক শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য সহজ সরল ও সরস ভাষায় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরলোকের প্রাঙ্গণে'র মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটির দুটি অধ্যায়—প্রথম অধ্যায়ে পরলোক ও পরলোকবাসীদের পরিচয় স্বভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের যোগ, পরলোকগমনে উপকার, পাশ্চাত্য দেশের অশরীরী কাহিনী, বিষয়-বাসনার আকর্ষণে বিদেহীর আবির্ভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মৃত্যু-র প্রকৃত অর্থ, সূক্ষ্মদেহী মানুষ ইত্যাদি প্রসঙ্গ সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। নেতাজী, বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণ ইত্যাদি মহামানবের ইহলোকবাস ও পরলোক জীবন সম্পর্কিত বেশ কিছু সংবাদ এতে আছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়, বাস্তব-অলৌকিকের ভাবনায় ইহলোক-পরলোকের বিষয় যাঁদের চিন্তিত করে, আলোচ্য গ্রন্থ তাঁদের বিষয়-ভাবনায় কিছু নতুন উপকরণ জোগাবে বলে মনে হয়।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

ত্রিবৃত্ত (জীবন সরকার সংখ্যা)। রণজিৎ দেব সম্পাদিত। ১' ত্রিবৃত্ত সরণী। কোচবিহার ৭৩৬১০১। দাম এক টাকা।

তরুণ কবি এবং গল্পকার জীবন সরকারের সাহিত্যকৃতি নিয়ে কোচবিহারের 'ত্রিবৃত্ত' পত্রিকার শারদ সংকলনটি প্রকাশ পেয়েছে। তরুণ এই লেখকটিকে নিয়ে বহু নামী লেখকই কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচিতি রেখেছেন এই পত্রিকার পাতায়। লেখক তালিকায় রয়েছেন—কৃষ্ণ ধর গৌরী আইয়ুব মৈত্রেয়ী দেবী সুশীল রায় সমীর রক্ষিত পরেশ সাহা শিশির ভট্টাচার্য কার্তিক লাহিড়ী অখিল দত্ত এবং আশিস লাহা। একটি তরুণ প্রতিভাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় 'ত্রিবৃত্ত' পত্রিকার প্রয়াস অনিবার্যভাবেই স্বীকৃতি পাবে।

কিন্নর কণ্ঠ (শারদ সংকলন)। সম্পাদক অভিজিৎ সেনগুপ্ত। বালুড়িয়া। বারাসাত। ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তরুণ কবিদের বেশ কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে। তরুণ সান্যালের কবিতাটি বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মতো। আরও কয়েকটি ভালো কবিতা লিখেছেন—রাম বসু গৌরাঙ্গ ভৌমিক দীপেন রায় এবং সত্য গুহ।

নৈবেদ্য। সম্পাদনা সুধীরকুমার দে এবং শ্রীমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৪৭, রাজবল্লভ সাহা লেন রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া। দাম এক টাকা।

শিশিরকুমার মাইতি এবং গৌতম ভট্টাচার্যের নিবন্ধ, বোম্বাবা বিশ্বনাথম এবং মুরারি মণ্ডলের গল্প এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। ছাপা পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদে একটা গ্রামীণ আমেজ আছে।

সেউটি। সম্পাদনা অশোক চন্দ। হিজলপুকুর। হাবড়া, ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটির শারদসংকলনে লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিকাশচন্দ্র দাস শুদ্ধসত্ত্ব বসু কালীকুমার চক্রবর্তী অমিতাভ দাশগুপ্ত হরপ্রসাদ মিত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যোগব্রত চক্রবর্তী বিপ্লব চন্দ এবং আরও অনেকে। বিকাশচন্দ্র দাশের প্রবন্ধটি ভালো লাগল। ছাপা ভালো। প্রচ্ছদে আরও যত্ন নেওয়া দরকার।

সাতপুরা—সম্পাদক : শ্যামল মুখোপাধ্যায়। ৩২১, পূর্ব ঘামাপুর। জব্বলপুর। মধ্যপ্রদেশ। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। মধ্যপ্রদেশের একমাত্র নিয়মিত সাহিত্য। ত্রৈমাসিক। বর্তমান সংখ্যাটি সুসম্পাদিত এবং আকর্ষণীয় রচনায় সমৃদ্ধ।

বহ্নিশিখা—সম্পাদক : তপনকুমার দাস এবং রামপ্রসাদ সরকার। মল্লিকপুর। গোবরডাঙ্গা। ২৪ পরগণা।

যুবক যুবতী

বাংলা নাটক ও সাহিত্য প্রসঙ্গে

বাংলা নাটক ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যুবসমাজ অনেক বেশী উৎসাহী। কলকাতা মফস্বলে শহরতলীতে এমনকি পাড়াগাঁয়ে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী নাটকের মহড়া দিচ্ছে। বাংলা নাটককে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, ভালো নাটকের জন্যে তাদের চেষ্টার বিরাম নেই। প্রতিনিয়ত চলছে পরীক্ষানিরীক্ষা। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে ক্রমেই। শারদ উৎসবে একই সঙ্গে একশ দেড়শ উপন্যাস কয়েকশ ছোট বড় গল্প এবং কবিতার সৃষ্টি সারা পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের তুলনায় এক বিস্ময়কর ঘটনা। কোন জাতির জীবনে সাহিত্য ও নাটকের অবদান অনস্বীকার্য। নাটক ও সাহিত্য তো সমাজেরই দর্পণ। জনগণের ধ্যানধারণা, জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার কাহিনী মূর্ত হয়ে ওঠে নাটক ও সাহিত্যে। তাই আজকের নাটক ও সাহিত্য প্রসঙ্গে যুবকযুবতীদের চিন্তাভাবনাও এড়িয়ে যাবার নয়। এই আলোচনায় আমরা এবিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারব।

শনিবারের বিকেল। ভবঘুরের মতো ময়দানের হাওয়া খেয়ে ঘুরছি। বিকেলের ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগান সত্যি আকর্ষণীয়! সারাদিনের কাজের চাপে হাঁপিয়ে ওঠা মানবমানবীরা চান একটু খোলামাঠে বসে মনের দুটো কথা বলে বোধকরি সীমার মধ্যে অসীমের আনন্দ পেতে। তরুণতরুণীদের ভিড় প্রচন্ড। কোথাও দল বেঁধে আড্ডা হাসিঠাট্টা চলছে আবার কোথাও জোড়া জোড়া কপোতকপোতী রঙিন স্বপ্নের জাল বুনে আগামীদিনের নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখছে। আমি একা। চারদিকে জোড় দেখেও কিন্তু খারাপ লাগছে না। মজার কথা এসব আড্ডা মজলিসে শুধু সস্তা প্রেম আর গভীর প্রেমের গল্পই হয় না; অনেককিছু সিরিয়াস আলোচনাও হয়। এমন একটা আসরে চলছে নাট্য আলোচনা। পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম কথাগুলো। বড় সুন্দর লাগছিল। একসময়ে তাদের পাশে বসেই পড়লাম।

শ্রীবিমল দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম-এ। হিন্দুস্থান ষ্টীলের হেড অফিসের কর্মী। বাংলা নাটক সম্পর্কে অত্যুৎসাহী। দীর্ঘদেহ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স। সুপুরুষ চোখেমুখে তাঁর দৃঢ়তার ছাপ। তাঁদের আলোচনার জের টেনে জিজ্ঞাসা করলাম আজকাল নাটকে যে সেক্স-প্রবণতা দেখছি এবিষয়ে আপনার মত কি?

বিমলবাবু স্বভাবশে বিনয়প্রকাশ করে জানালেন নাটক নিয়ে সামান্য পড়াশুনা করেছি আমার বক্তব্য কতদূর ঠিক হবে জানি না। বেশ কিছুদিন হল সিনেমা বা থিয়েটারে সেক্স-এর প্রয়োগ অতিরিক্তভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন নাটক যখন সমাজের দর্পণ আর সমাজে যখন সেক্স রয়েছে তখন এর প্রয়োগ কি শিল্পে কি সাহিত্যে চলতে পারে। আবার অনেকে বলছেন সেক্স অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সুতরাং এটা চলবে না।

—আপনি কোন্ দলে? জিজ্ঞাসা করি।

—আমার মতে অশ্লীল শিল্প বা সাহিত্য যা মানুষের সুপ্ত কামনা বাসনাকে জাগিয়ে তুলে মানুষের চরিত্র হনন করে তা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। বর্তমানে আমরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত হারিয়ে বসতে চলেছি। আমরা যেন যৌনচিত্রগুলির বা মঞ্চে নগ্ন দৃশ্যগুলির শিকার হয়ে পড়ছি। আজকাল প্রায়ই দেখা

অঞ্জু ব্যানার্জী

বিমল দত্ত

যায় বিজ্ঞাপনে (কি পত্রিকায় কি পোস্টারে) নৃত্যে মিস্—। এখানে নাটকের বিষয়বস্তু বা অভিনয় মুখ্য নয় কে নৃত্যে অংশগ্রহণ করবে সেটাই যেন মুখ্য।

—যুবমানসে এর প্রভাব কতখানি আপনার মনে হয়?

—আমাদের বয়সটাই এখন একটু...। তাই এসব যৌন আবেদন আদিম প্রবৃত্তির সুড়সুড়ি মনকে সহজেই কেড়ে নেয়। অথচ নগ্নতা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার একটা পণ্য। এই নগ্নদৃশ্যগুলিকে মূলধন করে প্রত্যেক ব্যবসায়ী কৃতকার্য হচ্ছেন যার ফলস্বরূপ 'এ' মার্কা ছবিগুলোর সামনে টিকিটের হুড়োহুড়ি। অবশ্য আবালবৃদ্ধবণিতা কারো টিকিট পেতে অসুবিধা হয় না। নিয়মমাফিক 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' কথাটা থাকলেই হল।

আচ্ছা বিমলবাবু যাঁরা ভালো নাটক করছেন তাঁরা এইসব নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে কি নিজেদের অসহায় বোধ করছেন?

—ভাল নাটক করে মানুষের মনে উন্নত রুচিবোধ জাগ্রত করার প্রাণপণ চেষ্টা অনেকেই করছেন। ভাল নাটকে ভিড় যে হচ্ছে না তাও নয়। কিন্তু সেক্সপ্রধান নাটকে অল্প-আয়াসেই যে ব্যবসায়িক সাফল্য আসে সে তুলনায় অনেক নাট্যগোষ্ঠীর অনেক ভালো নাটক মার খাচ্ছে। তাঁরা স্বভাবতই যেন অসহায় বোধ করছেন।

—তাহলে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? জিজ্ঞাসা করি।

এবার আমাদের আলোচনার নীরব শ্রোতা শ্রীগোপালমোহন মজুমদার মুখ খুললেন। 'রুচিসম্পন্ন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখের কথাকে ভাষা দিতে হবে এমনভাবে যাতে জনজীবনের সঙ্গে বাংলা নাটকের যোগসূত্র নিবিড় হয়। তখন সুস্থ নীতিবোধ গড়ে তুলতে অশ্লীল শিল্প ও সাহিত্য অন্তরায় হবে না। মানুষের জীবনের ঘটনাগুলোকে শিল্পমণ্ডিত করে প্রকাশ করতে পারলেই দর্শকের অভাব হবে না।'

—আপনি মঞ্চে বা চিত্রে অশ্লীলতা বলতে কি বোঝেন?

—দেখুন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' বা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকেও আপাতঃ-দৃষ্টিতে কিছু অশ্লীল ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। তবে কিন্তু ঐসব নাটক সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। এসব নাটকের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

—একটু বুঝিয়ে বলুন না, অনুরোধ করি।

বিমলবাবু এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার তিনি শুরু করলেন—ধরা যাক, ইদানিংকালে কোন নাটকে একটি অত্যাচারের দৃশ্য। সেখানে অত্যাচারী শোষিতশ্রেণীকে অতি নগ্ন কায়দায় অত্যাচার করছে। সেই দৃশ্য দেখে কিন্তু কোন যুবকের কামোন্মাদনা বৃদ্ধি পাবে না বরং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা প্রকাশ পাবে। এসব নাটকের উদ্দেশ্য সমাজের নগ্ন দিকটা উন্মোচিত করে তার বিরুদ্ধে যুবমানসকে সোচ্চার করা। অন্যদিকে তথাকথিত নৃত্যপ্রধান নাটকের উদ্দেশ্য পয়সা রোজগার করা।

বিমলবাবুর মুখেই জানতে পারলাম গ্রাম অঞ্চলে মফস্বলে নাট্যগোষ্ঠীর নানা সমস্যার কথা। তাঁরা ভালো নাটক করলেও প্রচারের অভাবে তেমন দর্শক পাচ্ছেন না। টাকার অভাব। কলকাতার হলে বই করা সম্ভব হচ্ছে না অন্যদিকে শহরতলীতে নাট্যপ্রদর্শনের তেমন ব্যবস্থা নেই। অথচ অনেক নাট্যগোষ্ঠী সম্ভাবনাময় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। তিনি জানালেন, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে সরকারের উচিত এইসব গ্রামীণ ছোট ছোট নাট্যগোষ্ঠীকে সুযোগ দেওয়া, সাহায্য করা।

অফিসে পাড়ায় আজকাল অনেক যুবক-যুবতীই ক্লাব পরিচালনা করছেন। নাটক করছেন লাইব্রেরী চালাচ্ছেন। অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব লাইব্রেরী এবং শহরতলীর বিভিন্ন লাইব্রেরীতে তাই পাঠকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। বাংলা সাহিত্যে যুব-সমাজের আগ্রহ লক্ষ্য করবার মতো। বিজয়পুরের শ্রীজীজা গোস্বামীর সঙ্গে আলাপ হল। বিশের কোঠায় বয়স। বি-এড পাশ করে বসে আছেন কয়েক বছর। এখন একমাত্র সঙ্গী বাংলা বই। নাটক, উপন্যাস, গল্প—সবই পড়েন তিনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা জীজা দেবী আজকের বাংলা সাহিত্যের প্রবণতা কোনদিকে? আপনার কি মনে হয়।

একটু গম্ভীর হয়ে জীজা দেবী জানালেন—এ আলোচনা অনেক সময়নির্ভর। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমাজের সত্যিকার দর্পণ হিসাবে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বাংলা নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে, কবিতায় আজকের মানুষের প্রেম, বিরহ, সুখদুঃখ নাগরিক জীবনের সমস্যা, যান্ত্রিকসভ্যতার কৃত্রিমতা—সব দিক নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। পল্লীবাংলার সমস্যা নিয়েও বই হচ্ছে।

—এসবের মধ্যে যুবমানসের প্রতিফলন লক্ষ্য করছেন?

—নিশ্চয়ই অনেক উপন্যাস বা গল্পের নায়ক কোন বেকার যুবক কিংবা শিক্ষিত যুবক-যুবতী। সমস্যাসংকুল জীবনে দিশে-হারা তারা। কেউ পথের নির্দেশ পাচ্ছে, আবার কেউ স্রোতে গা ভাসিয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন পরিবেশে মানসিক দ্বন্দ্ব সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক চিত্র, তার মধ্যে জীবনসংগ্রাম সবই থাকছে।

—ইদানীং সাহিত্যে 'সেকস'এর যে প্রবণতা লক্ষ্য করছি এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

—সেকস থাকাটাই খারাপ নয়, তার প্রকাশ শিল্পসম্মত হওয়া চাই। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি অশ্লীল সাহিত্যের বিরুদ্ধে।

—অশ্লীল সাহিত্য বলতে আপনি কি বোঝেন?

—আমি মনে করি সাহিত্য জনজীবনের অংশীদার। যে সাহিত্য জনগণকে বিপথ-গামী করে সে সাহিত্য সমাজের সঠিক দর্পণ নয়। মানুষের জীবনের ভাণ্ডার অফুরন্ত। সে ভাণ্ডার থেকে চয়ন করে শিল্পমণ্ডিত সাহিত্য রচনা কখনো অসম্ভব নয়। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, কিছু সাহিত্যিক সাহিত্য নিয়ে সস্তা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা জীবনের অন্ধকার দিকটার প্রকাশ এমনভাবে করছেন যে আমরা যেন 'সেকস'-এর ক্রীতদাস। জীবনে যেন আমরা 'সেকস' ছাড়া অন্য কিছু জানি না। তাঁদের সাহিত্য পড়ে রুচিবোধ গড়ে উঠছে না, বরঞ্চ আমরা অপসংস্কৃতির শিকারে পরিণত হচ্ছি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোবিন্দপুর গ্রামের সাধনা বোস কিন্তু এ মতের বিরোধী। তিনি জানালেন সাহিত্য হবে যুগোপযোগী। সমাজের তথাকথিত ভদ্রতার আবরু ভেদ করে সেই অন্ধকার দিকে আলোকপাত করা অশ্লীলতা নয়। বরঞ্চ এসব সাহিত্যিক অনেক ভালো কাজ করছেন। তাঁদের এই কীর্তি বিপ্লবাত্মক।

—বিপ্লবাত্মক? তার মানে?

—গতানুগতিক সাহিত্যের বেড়া ডিঙিয়ে এটা স্বতন্ত্র পথে চলছে, তাই এটা বিপ্লবাত্মক। সমাজের একশ্রেণীর লোক এসব কাজ করতে পারবেন, আর যখনই সাহিত্যে এর প্রকাশ হবে তখনই রব তুলবেন সাহিত্যে অশ্লীলতা চলবে না এটা অন্যায়।

—এ ধরনের সাহিত্য দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে আপনার মনে হয়?

—যুবসমাজ সমাজের এসব অন্ধকার দিকের প্রতি আরো সজাগ হবে। তথাকথিত 'ভদ্র' সমাজের প্রতি তাদের চরম ঘৃণাবোধ জন্মাবে। নিজেদের জীবনকে ঠিক পথে চালিত করতে পারবে।

বেলেঘাটার অমূল্য দাস জানালেন, বাস্তবে ঠিক হচ্ছে তার উল্টো। সাহিত্যে নাটকে এসবের প্রকাশ দেখে তারা নিজেরাই একসপেরিমেন্ট চালাচ্ছে। জীবনকে যথেচ্ছ-ভাবে ভোগ করার প্রবণতা বাড়ছে। সাহিত্যে নোংরা সেকস আমদানি করে যুবমানসকে সৃজনাত্মক চিন্তা থেকে সরিয়ে এনে বিপথে চালনা করা হচ্ছে।

নদীয়া জেলার সরাটী অঞ্চলের শ্রীইন্দ্র বিশ্বাস শিক্ষক মানুষ। গল্প, কবিতা লেখেন। তাঁর বিক্ষোভ সাহিত্যে আজ স্টার সিস্টেম চলছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ইত্যাদিতে গ্রামের ছেলেদের লেখার সুযোগ নেই।

—সাহিত্যে স্টার সিস্টেম বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন?

—অর্থাৎ নামকরা পরিচিত মহলের লেখক ছাড়া অন্যরা লেখার সুযোগ পাচ্ছে না। অনেক পত্রিকা অফিসে পাণ্ডুলিপি না পড়েই 'অমনোনীত' ফাইলে রাখা হয়। অথচ মুখে তাঁদের নবীন লেখকদের উৎসাহ দেওয়ার বুলি—!

আমি প্রশ্ন করি, সব পত্রিকা কি আর একরকম? অনেক পত্রিকায় নবীন অচেনা মুখের লেখা তো বেরোয়?

—সেটা নেহাৎ ভাগ্য। আমরা বুঝতে পারি না, স্টার সিস্টেম না ভাঙলে নতুন স্টার আসবে কোথেকে?

দুর্গাপুরের পরিতোষ হাজরা পল্লী-বাংলা এবং মফস্বলের ছোট পত্রিকার সমস্যার কথা জানালেন। তাঁর অভিযোগ সরকারী ঔদাসীন্যে কাগজগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ সে সব জায়গায় যুবক-যুবতীদের মনের কথা ছোট পত্রিকাতেই প্রকাশ পায়। আমার মনে হয় কলকাতার বড় পত্রিকাগুলো এবং সরকার যৌথভাবে চেষ্টা করে এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।

উত্তরপাড়ার সদ্যবিবাহিতা গৃহবধূ শ্রীমতী অঞ্জু ব্যানার্জি জানালেন এবার পুজো সংখ্যাগুলো ভালোই লেগেছে। তবে অনেক নামকরা সাহিত্যিকের রচনা পড়তে না পেয়ে খারাপ লেগেছে। ভালো নাটক, প্রবন্ধও পড়তে পারিনি। উপন্যাসেরই ছড়াছড়ি।

—আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে কি পড়তে?

—উপন্যাস, আর আধুনিক কবিতা।

—কেন বলুন তো?

—উপন্যাস আর আধুনিক কবিতা গতিশীল—নতুন নতুন পথ পরিক্রমা চলছে প্রতিনিয়ত। নতুন স্বাদ নতুন কথা নতুন-ভাবে বলা—কার ভাল না লাগে বলুন?

—প্রেমের কবিতা প্রেমের গল্প? হেসে জিজ্ঞাসা করি।

—সবারই ভাল লাগে, বিশেষ করে জীবনের এ সময়ে আপনারও ভাল লাগবে। বলে মুচকি হেসে বিদায় নিলেন।

—অমর দাশ

চিঠিপত্র

গ্রাম বনাম শহর

গত ২০-১২-৭৪এর 'অমৃত' সাপ্তাহিকে চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীকল্লোল সরকার 'ঝংকার' সম্পাদকের চিঠিখানি পড়লাম। চিঠিখানির মধ্যে শহরের অধিবাসীদের উপর যেন বিষোদ্গার করেছেন শ্রীসরকার। তিনি অনেক প্রশ্ন করেছেন অনেক দোষ দেখিয়েছেন অনেক কিছু বলেছেন। তার সব কিছুর উত্তর লিখতে হলে এই পত্র খুবই দীর্ঘ হয়ে পড়বে। কয়েকটি কথা না বলে অবশ্য পারা গেল না।

শ্রীসরকার যদি একটু চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের দেশটি শাসন করছেন গ্রামের অধিবাসীরা। শহরের অধিবাসীরা সেই সব শাসনকর্তাদের কৃপার পাত্র। লোকসভায় এবং রাজ্যের বিধানসভায় যাঁরা সভ্য আছেন তাঁদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। গ্রাম থেকেই বেশী সভ্য আসন দখল করে আছেন। অতএব তাঁরা যদি গ্রামের দিকে নজর না দেন তার ব্যবস্থা গ্রামবাসীরাই করতে পারেন।

শ্রীঅমর দাশ মহাশয় গ্রামাঞ্চল ঘুরে নৈরাশ্যজনক চিত্র দিয়েছেন ঠিকই তিনি যদি শহরের বস্তিতে বস্তিতে ঘোরেন তাহলে আরও ভয়ঙ্কর শোচনীয় চিত্র তুলে ধরতে পারবেন এবং তাই দেখে স্বয়ং কল্লোলবাবুরও হৃৎকম্প হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আজ শহরের ঘরে ঘরে টি-বি ক্যানসার আলসার হরেক রকম রোগের আস্তানা। কিন্তু কাকে দোষ দেব বলুন। শহরের যুবক-যুবতীরাও অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে।

স্বাধীনতার পর অনেক পরিকল্পনা হয়েছে অনেক বড় বড় শিল্প কল-কারখানা বসেছে। সেগুলি শুধু শহরের লোক দখল করে বসেনি গ্রামের লোকও সেখানে যথেষ্ট আছে। এই পরিকল্পনার জন্য যত ব্যয় হয়েছে গ্রামের অধিবাসীরাই তার বেশী ভোগ করেছে। বড় বড় জলাধার বাঁধ সেচ প্রকল্প নতুন রাস্তা নির্মাণ নতুন রেলপথ স্থাপন বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন এসব কি শহরবাসীদের জন্য! তাছাড়া গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চাষ আবাদের জন্য নানারূপ পরিকল্পনা উপদেশ শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি খরচ কিছু হচ্ছে না। কলকাতা শহরে একটি নতুন হাসপাতাল হয়েছে কি স্বাধীনতার পর? কিন্তু লোকসংখ্যা কতগুণ বেড়েছে তা সকলেই জানেন।

গ্রাম থেকে আগত এম-পি ও এম-এল-এগণ গত ২৫ বছরে গ্রামের জন্য ভূমি-

যুবক যুবতী

সংস্কার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ভূমিহীন কৃষকদের জমিদান ইত্যাদির আইন করেছেন। কিন্তু তবু কেন গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা স্বনামে বেনামে শত শত বিঘা জমি নিজেদের দখলে রেখেছেন? এটাও কি শহরবাসীর দোষ! গ্রামে ভূমিহীন চাষী জমি পাওয়ার জন্য আন্দোলন করছে এবং আমাদের গভর্নমেন্ট সে আন্দোলন সফল করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত শহরের কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য বড় বড় কারখানা ও কোম্পানীর অংশ দিয়ে দেবার জন্য আইন তৈরী হল না।

আজ যদি বলা যায় শহরের লোকের অর্থে গ্রামের লোক মজা লুটছে সেটা কি অন্যায় হবে। আয়কর বিভাগে দেখুন শুধু শহরের অবস্থাপন্ন চাকুরিজীবীরা কর দিয়ে ফতুর হচ্ছেন। কিন্তু গ্রামের বহু অবস্থাপন্ন কৃষক যাদের আয় শহরের চাকুরিজীবীদের থেকে বেশী মহানুভব সরকার বাহাদুরকে বন্ধাংগুলি দেখাচ্ছেন। আজ পর্যন্ত দেশে কৃষি আয়কর নেবার কথা কোন সভ্য বললেন না কেননা তাঁরা তো গ্রামের এম-পি এবং এম-এল-এ।

কল্লোলবাবু বলেছেন যে 'পত্রিকা মারফৎ কোন চাকুরীর বিজ্ঞাপন জেনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে আবেদন করলেও আমাদের বিশেষ কোন লাভ নেই। এই অবস্থা শহরের ছেলেদেরও। চাকুরী সকলে পায় না। কল্লোলবাবুর গ্রামের একজন বুড়ো দাদু বলেছেন—'মন্ত্রী বল এম-এল-এ বল সবার ত শহরেই আড্ডা। তাহলে আগে ত শহরের কথা। তবে ত গ্রাম। কিন্তু সত্যই কি শহরের উন্নতি হয়েছে? তাই যদি হত তাহলে কলকাতা একটা নরককুন্ড কেন?

কল্লোলবাবু জানাচ্ছেন—স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শিলান্যাস করলেন অথচ হাওড়া-আমতা ব্রডগেজ রেল লাইনের ভবিষ্যৎ কি! পাতাল রেল কোথায়! কলকাতার দ্বিতীয় হুগলী সেতুর কাজের অগ্রগতি কিরূপ! অতএব সেই প্রবাদটি মনে রাখা দরকার..... 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

কল্লোলবাবু লিখেছেন—'গ্রামের যুবক-যুবতীর মধ্যে শতকরা আশীজন যখন বুকের রক্ত ঢেলে ফসল ফলায় তখন গ্রামের সেই যুবক-যুবতীরা ঘরে বসে মাইলো চিবোয় সজনের পাতা সিদ্ধ করে খায় শালুকের মূল কাঁচা চিবোয় আর শহরে রেশনে চাল অথবা গম বাড়ানোর আবেদন মঞ্জুর হয় কেন?' উনি বোধ হয় জানেন না যে কলকাতার লোক পচা অখাদ্য আতপ চাল রেশনে পায়। গ্রাম বাংলার চাল চোরাপথে এসে কলকাতার লোকের পকেট ধসিয়ে নিয়ে যায়। এই চোরাচালানের জন্য কারা দায়ী? গ্রামের লোক নিশ্চয়। তার মধ্যে আছে জোতদার আর বড় বড় কৃষক। কেন গ্রামের জোতদাররা চাল মজুত করে গ্রামবাসীদের খেতে দেয় না? এর জন্য শহরের লোকের কি করার আছে!

শেষের দিকে কল্লোলবাবু অনেক প্রশ্ন করেছেন। যেমন—কেন গ্রামে ভাল মাস্টার আসে না? কেন গ্রামে একজন ভাল ডাক্তার আসে না? কেন গ্রামের যুবক-যুবতী (অধিকাংশ)-দের গায়ে পরনে জামা-কাপড় জোটে না? ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক 'কেন'র উত্তর উনি একটু চিন্তা করলেই পেয়ে যাবেন। শহরের বুকে লাখ লাখ টাকা খরচ করে যে পুজোগুলো হয়, তাতে কি শহরবাসীর আন্তরিক সাড়া আছে? অনেকের কাছে এই পুজোগুলি ভীতি স্বরূপ এবং এর থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেকে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে কেন এই পুজো! এর পিছনে কি কোনো কোনো রাজনৈতিক উস্কানি নাকি কিছু লোকের ফালতু রোজগারের মতলব?

একটা কথা আমরা ভুলে যাই। সেটা শুধু আমরা পাঠ্য-পুস্তকেই পড়ি কিন্তু কাজে লাগাই না—'সেলফ হেলপ ইজ দ্য বেস্ট হেলপ'—

জগতে কেউ কারো উন্নতি করাতে পারে না। মন্ত্রীদের বুলি নেতাদের বাণী ও উপদেশ—সব শুকনো কথা তাতে চিড়ে ভেজে না। নিজেদের উদ্যমই হল প্রকৃষ্ট পথ। আজ জাপান ইউরোপ আমেরিকা যে উন্নতি করেছে তা দেশবাসীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল নিজেদের উদ্যোগে। সরকারী উদ্যোগে নয়। আমাদের দেশে সরকারী উদ্যোগ মানে জনসাধারণের অর্থের অপচয়। কলকাতার স্টেট ট্রান্সপোর্ট তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

শিশিরকুমার পাল
আত্রা, পুরুলিয়া।

যুবহতাশা

গত ৩রা জানুয়ারী সাপ্তাহিক অমৃতে যুবক-যুবতী বিভাগে প্রকাশিত 'যুবহতাশা' নামক সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি পড়ে ভাল লাগল। কেন যুব মন হতাশায় ভরে যায়? এর জন্য কারাই বা দায়ী? এর সমাধানই বা কি? এসব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আরও সাক্ষাৎকারে রচনাটি পূর্ণাঙ্গ হলে আরও ভাল লাগত।

শ্রীমান সুভাষ রায়ের মন্তব্য পড়ে এইটুকু বুঝেছি তিনি এখন জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাহীন। বেকারীর অন্ধকারে দিশেহারা ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে অন্ধকার। পরীক্ষা? সে তো জুয়াচুরি! আর ওসব সার্টিফিকেট দিয়ে কিছু হবে না। সত্যি কথা বলতে কি শ্রীমান সুভাষ রায়ের মন্তব্য পড়ে মনে হলো এ যেন শুধু শ্রীমান সুভাষ রায়ের মন্তব্য নয় আমাদের সমাজের সামগ্রিক যুবক-যুবতীর মনের একটা নিখুঁত ছবি তিনি তাঁর মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বেশ পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যুব মনে এত হতাশা কেন? এজন্য দায়ী কারা? আমার মনে হয় এজন্য

আমাদের সমাজ অনেকাংশে দায়ী। এ সমাজকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে হবে। সমাজের কুচক্রী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে। পরিবেশকে সুন্দর শোভন আকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এবং সংগে সংগে সরকারকে (শুধু শহরে নয় গ্রামেও) নতুন কল-কারখানা বসাতে হবে। ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস শুরু চালু করতে হবে। তাহলে এর অনেকটা সমাধান আশা করা যায়। কারণ একটার সংগে অন্যটা অংগাংগীভাবে জড়িত। বেকারী ঘুচলে যুব মনের হতাশা অনেক কমে যাবে।

সবিতা রায় শ্যামলী বসু সন্ধ্যা রায় স্বপন সেন ও তন্দ্রা ব্যানার্জী সবাই হতাশার রোগে ভুগছেন। শ্রী আর চক্রবর্তী তাঁর পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। এসব পড়ে খুব দুঃখ লাগে। এঞ্জিনীয়ার তরুণ ভাদুড়ী একজন সামান্য কেরানী। ভিকটোরিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ষোড়শী শ্যামলী বসুর মতে মেয়েরা নাকি অনেকাংশে পরাধীন। তাঁর কথা অবশ্য কিছুটা সত্যি। এও সত্যি যে আমাদের সমাজ এখনও অবাধ মেলামেশার মত উপযুক্ত স্থান হয়ে ওঠেনি।

স্বপন সেন একজন শিক্ষিত বেকার। সে চায় পরিশ্রমের বদলে একটু মানুষ হয়ে বাঁচার অধিকার। কিন্তু তা তাঁর জীবনে হয়তো হয়ে উঠবে না। প্রেমিকাকে সে তার ভালবাসা হয়তো জানাতে পারবে না। জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করা তাঁর যেন কোন অধিকার নেই। কিন্তু কি দোষ তাঁর? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? অনেক জায়গায় দেখা গেছে প্রেমিকপ্রেমিকা হয়তো আত্ম-হত্যা করেছে। কারণ অবশ্য হতাশাই বেশী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ হতাশা আসে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ফলে।

সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শিখা দাসকে বিয়ের কথা বললে তিনি সমাজের রাজপুত্তুরদের কথা উল্লেখ করলেন। কথাটা অবশ্য ঠিক। যাঁরা বায়না আর দাবীর বহর নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তাঁরা তো এক একজন রাজপুত্তুরই বটে। আরও তিনি বললেন, আমাদের মত কালো মেয়ের বিয়ে হওয়া কি কম কথা!

ভাবতে অবাক লাগে কালো মেয়ের যে সৌন্দর্য থাকে লাবণ্য থাকে তারাও যে গৃহকর্মে নিপুণা নম্রস্বভাব ও চরিত্রগুণে সুন্দরী হয়ে উঠতে পারে একথা আমাদের সমাজের হয়তো কেউ ভেবে দেখেন না। পণ প্রথাও যুবতী মেয়েদের হতাশার আরও একটা কারণ।

কার্তিক দত্ত
সম্পাদক—'বিশালাক্ষী'
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

(২)

আপনাদের বহুল প্রচারিত ও বহুপঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লক্ষ্য করে যারপরনাই উল্লসিত হচ্ছি। পত্রিকায় যুবক-যুবতী বিভাগের সংযোজন নিঃসন্দেহে পত্রিকার বৈচিত্র্য তথা আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। ৩রা জানুয়ারী '৭৫ সংখ্যার 'যুবহতাশা' শিরোনামাযুক্ত লেখাটি মধ্যবিত্ত সমাজের যুবক-যুবতীদের এক বড় অংশের মনের প্রতিফলন একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তামাদী-হয়ে-যাওয়া বস্তা-পচা এই শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর সংগত কারণেই যুবক-যুবতীদের বিরূপতা আসা স্বাভাবিক। যে শিক্ষা বাঁচতে শেখায় না, যে শিক্ষা অর্জিত জ্ঞানকে হাতে-কলমে প্রয়োগে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না, সে শিক্ষা-ব্যবস্থায় আকাট মূর্খেরও পণ্ডিত বনে যাওয়ায় বাধা নেই, কিংবা যে শিক্ষা মানুষে মানুষে গড়ে তোলে ঘোর ব্যবধান—সে শিক্ষাকে শিক্ষা-শিক্ষা খেলা কিংবা নেশার রকমফের বলতে বাধা কি? যুবক-যুবতীদের জীবনের মূল্যবান কয়েকটা বছর এই নেশায় আটকে রেখে যখন বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তারা হয় স্বাভাবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে অথবা অদৃষ্টবাদের অসহায় শিকারে পরিণত হয়।

এ নেশায় মজলে 'পাড়ানির কড়ি' অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের সহজ সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা সীমিত জেনেও মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েদের এ নেশায় আসক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেননা এ খেলা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেয়। অনেকের কাছেই এই সোনালী ভবিষ্যতের ছবি মরীচিকার চেহারা নিলেও কেউ কেউ তো 'মামার জোর' ছাড়াই শুধুমাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদার হস্তে বিলিয়ে দেওয়া কয়েকখানা কাগজের জোরেই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই পাশ করার উপর মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়ে তথা তাদের গুরুজনদের এত ঝোঁক। তাই তারা তাদের সমস্ত ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে এই কাগজের দুচারটে হস্তগত করার দুরন্ত নেশায় মসগুল।

তাদের প্রয়াস বোধগম্য। কিন্তু নীতি-বাগীশ সেই সব রাজনীতিবিদগণ এবং সেই নিয়ম আঁকড়ে থাকা শিক্ষকমহাশয়রা কি লক্ষ্য করছেন না— তাঁরা কিভাবে ক্ষতি-সাধন করে চলেছেন যুবসমাজের তথা দেশের ভবিষ্যতের। এই শিক্ষার নিগড়ে বেঁধে রেখে একদিকে তাঁরা যুবজনের মনে বপণ করছেন হতাশার বীজ, অন্যদিকে তাদের করে তুলছেন নীতিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল। এই ভাবেই তাঁরা দেশের ভবিষ্যত নাগরিক তৈরীর কঠিন দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

স্কুলের শেষ পরীক্ষা 'স্কুল ফাইনাল' হল কি 'হায়ার সেকেণ্ডারী' থাকল তাতে কিছু আসে যায় না, যদি না তাতে ছাত্রদের সত্যিকারের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে। কিন্তু এর বদলে তারা যদি— কয়েকটা কাগজের লোভে সুবিধাভোগী নেশাগ্রস্ত অসামাজিক, অসহায় হয়ে সমাজের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে তার চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কিছু নেই। তাই শিক্ষার আমূল সংস্কারের আশু প্রয়োজন। এ পরিবর্তনের ধরণ কিরকম হওয়া দরকার সেটা সুধীসমাজ নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালই জানেন। তবু যদি তাঁরা দেখেও দেখব না, শুনেও শুনব না নীতি অনুসরণ করতে চান তো করুন। কিন্তু তাঁরা জেনে রাখুন, ইতিহাস কারো তোয়াক্কা করে না। ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাঁদের উঠতেই হবে।

রত্না সেনগুপ্তের 'মহিলারা এখনও সেই তিমিরে' এর ওপর লেখাটায় মেয়েদের কোলে ঝোল টানা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও— শ্রীমতী সেনগুপ্তার যুক্তি বাস্তবনির্ভর'— একথা মানতেই হবে।

অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিরাটী, কলিকাতা-৫১।

নেশা ও মাদকতা

'নেশা ও মাদকতা' শিরোনামা দেখে খুব ঔৎসুক্যের সংগে শ্রীঅমর দাশের 'নেশা ও মাদকতা' (অমৃত, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ 'যুবক যুবতী' বিভাগে : ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা) পড়তে শুরু করলাম। আশা ছিল, সমসাময়িক পটে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবনে বিভিন্ন সময়ে নেশা ও মাদকতা বিষয়ক যে সমস্ত ঘটনা ঘটে (অনেক ক্ষেত্রে মর্মান্তিক), তাদের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে কিছু জানতে পারব। কিন্তু রচনাটি পড়া শেষ করে মনটা হতাশায় ভরে গেল। আলোচনার বহুলাংশে শহর কেন্দ্রিকতা আবেগপ্রবণতা রয়েছে, অথচ যুক্তিপূর্ণ তথ্য কম এবং অসম্পূর্ণ।

প্রথমত :— শ্রীদাসের আলোচনার ভূমিকায়—কলকাতায় যুবক-যুবতীদের অবসর বিনোদের নয়নাভিরাম তীর্থভূমি-গুলোকে—'কৃষ্ণ সাগরের বালুকা বেলার' সংগে তুলনা করার কোন যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। কিংবা বাঁধ ভাঙা হাজার হাজার তরুণ সকলেই যে এই কম্পিত সাগরের পাড়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে এমন চিত্রও আমার সন্ধানি দৃষ্টিতে আমি কখন দেখিনি।

দ্বিতীয়তঃ :— শ্রীঅনিল হাজরা এবং অধ্যাপক শ্রীমজুমদার বোধহয় খবর রাখেন না অবাধ নেশা ও মাদকতার ফলে পশ্চিমী

মানুষও আজ নিয়ত ভুগছে অস্বস্তি ও অশান্তিতে। কারণ যুবক-যুবতীদের এই অবাধ নেশা ও মাদকতা থেকে আসছে অবাধ যৌন উপভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং সেখান থেকে তাদের (যুবক-যুবতীদের) মধ্যে আসছে চুরি ছিনতাই, নরহত্যা, আত্মহনন এবং যৌন রোগ। অবাধ উপভোগের ফলে যুবক-যুবতীদের যৌন রোগের বৃদ্ধির হিসাব হল ঃ নিউইয়র্কে পাঁচ-শ পারসেন্ট। সানফ্রান্সিসকোতে গত দু-বছরে ছ-গুণ বেড়েছে লজএঞ্জেলস-এর অবস্থা তথৈবচ (এই সব সংখ্যার মধ্যে আবার হিপ্পিরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ)। সুতরাং ওয়েষ্টার্ন সোসাইটিও আজ ইম-ব্যালান্সড্।

তৃতীয়ত ঃ—চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্র শ্যামল দাস, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের ছাত্রী সুস্তা সেনগুপ্তা এবং কুমারী রাধা সরকারের মন্তব্যে সত্যতা থাকলেও মেডিকেল কলেজের ডাক্তার সাহার মন্তব্যে শুধু অসত্য নয় আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণভাবে হেয় করার চেষ্টা হয়েছে। ডাক্তার সাহাকেই প্রশ্ন করি, কোথায় কবে দেখেছেন? — কোন প্রকৃত গরীব যুবক-যুবতী অভাবের (দৈন্যের) জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ড্রাগ, মেনড্রেকস এল, এস ডি, সোনারিল লেপ্টিন খায়? এবং ডাক্তার সাহার মনে রাখা উচিত ছিল যে আমাদের সমাজের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করে।

চতুর্থ ঃ— শ্রীমতী শুক্লা রায়ের বর্ণিত 'কিশলয়' ঠিক যেন হিন্দি ফিল্মের নায়ক। শ্রীমতী শুক্লা দেবী কি হিন্দি সিনেমার খুব ভক্ত? তবে শ্রীমতী রায়ের পরের মন্তব্য— 'হিন্দি সিনেমা, ইয়াংকি কালচার বন্ধুদের উস্কানি আর এসব ওষুধের সহজলভ্যতাই এইসব ছেলেদের নেশায় অভ্যস্ত করার জন্য দায়ী'—অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও মূল্যবান। যেমন বর্তমানে বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে সমস্ত হিন্দি ছবি প্রকাশিত হচ্ছে সেই সমস্ত ছবির সংখ্যাগত দিক ও গুণগত দিক এক করা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। বরং বলা যায় বোম্বে ফিল্ম নিশ্চিতভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে সংখ্যাগত দিকেই ঝুঁকে রয়েছে। বোম্বে ফিল্ম দর্শকদের (শতকরা ৬০ ভাগ-এর) মনের উপর এমন কতকগুলি পরিবেশ উপস্থাপিত করে চাপ সৃষ্টি করে যে তারা (উল্লিখিত দর্শকরা) সঠিক কোন পথ খুঁজে না পেয়ে ক্রমশঃ মনুষ্যত্বের অবলুপ্তি ঘটিয়ে নিম্ন অভিমুখে যেতে শুরু করে এবং অ্যামেরিকা এই বোম্বে ফিল্ম সংস্থাকে ব্যবসাগত দিকে লক্ষ্য রেখে যত স্থূল ধরনের ছবি দান করছে ততই তার ফল স্বরূপ আমাদের মধ্যে গড়ে উঠছে শ্রীমণ্ডল বা জগদীশবাবুর হতাশা সূচক মন্তব্য।

কল্লোল সরকার,
সম্পাদক, 'ঝংকার'
২৪ পরগণা।

রেজিষ্টি বিবাহ অফিস

মোট ১৬ টাকায় রেজিস্ট্রি বিবাহ

এন কে ঘোষ জে-পি

ম্যারেজ অফিসার

১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলি-৯ ফোন ঃ ৩৫-৩০৪৮

বনফুলের গল্প

সুসাহিত্যিকের হাতে পড়লে সাহিত্য যে কত সুন্দর, গভীরতাপূর্ণ ও অর্থবহ হয়, তার প্রমাণ পেলাম 'অমৃত'-এর বিনোদন সংখ্যায় প্রকাশিত বনফুলের 'ব্যবধান' শীর্ষক গল্পটির মধ্যে। গল্পটির জন্য শ্রদ্ধেয় বনফুলকে অশেষ ধন্যবাদ জানালাম ও তার সঙ্গে অমৃতের পাতায় প্রকাশের জন্য আপনাকেও আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। স্বল্প পরিসরে অত্যন্ত কম কথায় কত গভীর জিনিস ভাষা-নৈপুণ্যে কত সহজে প্রকাশ করা যায়—বনফুলের এই গল্পটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজকের বেশির ভাগ গল্প-লেখকদের দেখি বড্ড বেশি বকতে, ফেনিয়ে ফেনিয়ে এক কথা বার বার বলার মধ্যে আসল বক্তব্যটাই দেখি হারিয়ে যেতে। এবং এর ফলে পাঠকের মনে কোনই দাগ বসে না সাহিত্যের মাধ্যমে—পাঠককে দেখি যে-খেই ধরে সে এগোচ্ছিল তা থেকে বার বার হারিয়ে যেতে! পরে গল্প পাঠ করে নিজের মনে পাঠককে বলতে দেখি—'বাঁচা গেল, অনেক কষ্টে গল্পটা শেষ করা গেল।'

আজকের সমাজচিত্র বনফুল যেভাবে স্বল্প কথায় তাঁর এই 'ব্যবধান' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন তা' সত্যিই অতুলনীয়। মানুষ আজ তার মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আছে সামান্য কিছু অর্থের খাতিরে! মানুষের আজ কি অধোগতি! এভাবের গল্প সাহিত্যিকদের মারফৎ প্রকাশিত হোক্ সকল পত্র-পত্রিকায় বিশেষভাবে, যাতে এই কলমের খোঁচায় আজকের মানুষ তার হারানো বিবেক বা চেতনাকে ফিরে পায় ও সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে। 'পেন ইজ মাইটার দ্যান দ্য শ্যোর্ড' —একথাটা প্রমাণ করবার জন্য সাহিত্যিকরা যেন উঠে-পড়ে লাগেন, এটুকুই আমার বক্তব্য। সমাজকে বাঁচানোর গুরুদায়িত্ব তো তাঁদেরই।

বারিদবরণ ঘোষ,
'মাতৃমন্দির,' দাসপাড়া, চুঁচুড়া।

পুনশ্চ প্রসঙ্গে

গত ২০শে ডিসেম্বর '৭৪ সংখ্যার 'অমৃত'-তে—ক্ষপণক রচিত 'পুনশ্চ' শীর্ষক রচনায়—কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের রচিত শ্লোকগুলি পড়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বিস্মিত এই কারণে যে— আজ বিজ্ঞান ও সভ্যতার কল্যাণে আমরা অনেক নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছি। অনেক গুরুতর রোগও এখন উন্নত চিকিৎসার দ্বারা দূর করা যাচ্ছে। কিন্তু যখন এত আয়োজন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজন ছিল তখন সেই প্রাচীনকালেও, শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখার জন্য কি অপূর্ব বিধান ছিল।

কবিরাজ রামচন্দ্র মহাশয়ের রচিত শ্লোকগুলি অনুসরণ করলে কাউকে সহজে ডাক্তার ও ওষুধের সাহায্য নিতে হবে না বলে আমার ধারণা।

এ জাতীয় আরো রচনা 'অমৃত'র পাতায় দেখতে চাই এই দাবী জানিয়ে ও আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

মৃণাল বণিক,
দুর্গাপুর-৪ বর্ধমান।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

অমৃত-এর ১৪ বর্ষ ২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমল সেনগুপ্তের পত্রটি আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। শারদীয় অমৃত-এ প্রকাশিত শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধের বিবরণ সম্পর্কে শ্রীসেনগুপ্ত যে সংশয় প্রকাশ করেছেন তার জবাবে জানাই, শরৎচন্দ্রের ৫৭-তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 'শরৎ বন্দনা' নামে দেশব্যাপী যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সে সময় শরৎ বন্দনা কমিটির উদ্যোগে 'শরৎ বন্দনা' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রকে নিবেদিত সমকালীন সাহিত্যিকবৃন্দের শ্রদ্ধার্ঘ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়। সংকলন গ্রন্থটিতে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভারতী সম্পাদক সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়—তিনজনের প্রবন্ধেই 'বড়দিদি' ভারতীতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে তা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে কথার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের কালে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই জীবিত ছিলেন, এমন কি অসিতকুমার হালদারও। কখনও কেউই এ প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। সুতরাং, শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিবরণ যে সঠিক সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

সমীরকান্তি বিশ্বাস,
মহাকরণ ভবন, কলকাতা-১

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

TO MOTHER

Come on the wings of sleep
Grave or with a smile,
Come ere the hushed tide neap
Or tangling thoughts beguile

তন্দ্রার পাখায় এসো রমা,
নিথর বা মৃদুহাসিবরে,
যবে মৌন আনন্দলহরী
অশান্ত চিন্তারা ভ্রান্ত করে।

Out from a planet's gloom
All aspects call to thee,—
Life is our stirless tomb
Light on our darkened sea.

ধরার আঁধার দীর্ণ করি
প্রতি ভাব ডাকে মা তোমায় :
ভূগর্ভে—নিস্পন্দ প্রাণ যত,
আলোক—সিন্ধুর তমসায়।

শ্রীঅরবিন্দ শতমুখে প্রশংসা করতেন চ্যাডউইকের এক স্বপ্নপ্রতিমা লিলিয়ার উদ্দেশে লেখা কয়েকটি অপরূপ কবিতা যাকে ইংরাজীতে বলে dream come true তাই অবান্তর মনে হলেও এ-কবিতাগুচ্ছকে প্রেমের কবিতাকে বলা চলে আত্মিক (psychic) প্রেরণায় লেখা। আমি নিচে মাত্র তার একটি কবিতার শেষ স্তবকের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

Your name is fading music upon
my worship's mouth;
It spills in languorous fragrance
from lillies of the South;
It is the odorous night-flower
wherewith your locks are
bound, —
Or the moon-pale soul of roses
caught in a mesh of sound

লীয়মান মূর্ছনার মতন নামটি তোমার
কাঁপে পূজার অধরে আমার;
দক্ষিণে যে-লিলি ফোটে তার মন্থর
সুবাস ঝরে উচ্ছলসম্ভার;
ছড়িয়ে আছে সেই রজনীগন্ধার
সুগন্ধ তোমার কান্ত কুন্তলে :
কিম্বা গোলাপের পাণ্ডুর হিয়ার মতন
যে ধরা দেয় ঝঙ্কার অমলে।

চ্যাডউইকের সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা করতাম নানা ইংরাজ কবির কাব্য ছন্দ নিয়ে। ছন্দ যে অনিন্দ্যনীয় হয়ে ফুটেছিল শ্রীঅরবিন্দেরই দেশনায়—বিশেষ করে ইংরাজী কোয়ান্টিটেটিভ ছন্দে। এ-ছন্দের নানা মধুর মিড় (er phony) তার সূক্ষ্ম শ্রুতির কাছে ধরা দিত যার ফলে তার কবিতা এত প্রাণস্পর্শী তথা সুকুমার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কাব্যের গুণগানে এখানে সমাপ্তি টেনে ফিরে আসি স্মৃতিচারণে—কী ভাবে সে পুরোদস্তুর ইংরাজ হয়েও হিন্দু যোগের রসজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

তাকে তার আত্মীয়-স্বজন ক্রমাগত ডাকত বিলেত থেকে। কিন্তু সে প্রায়ই বলত :

"My die is cast, Dilip, I can't look back any more, for I don't find life in Europe worth while."

(আমার নিয়তি ফিরে চাইতে মানা করে আমাকে—পাশ্চাত্ত্য জীবন আমার কাছে মনে হয় না বরেণ্য)। তাকে পরম দিশা দিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম বাণী—সে প্রায়ই উদ্ধৃত করত তাঁর একটি চিঠি :

It is especially difficult for the Christian to be of a piece, because the teachings of Christ are on quite another plane from the consciousness of the inteliectual and vital man trained by the education and society of Europe —the latter, even as a minister or priest has never been called upon to practise what he preached in entire earnest. But it is difficult for human nature anywhere to think, feel and act from one centre of true faith, belief or vision. The average Hindu considers the spiritual life the highest, reverses the **sannyasi**, is moved by the bhakta; but if one of the family circle leaves the world for spiritual life, what tears, remonstrances, lamentations. It is almost worse than if he had died a natural death. It is not conscious mental insincerity—they will argue like Pundits and quote **shastra** to prove you in the wrong it is unconsciousness, a vital insincerity which they are not aware of and which uses the reasoning mind as an accomplice.

"That is why we insist so mucn on sincerity in the Yoga—and that means to have all the being consciously turned towards the one Truth—the one Divine. But that is, for human nature one of the most difficult of tasks, much more difficult than a rigid asceticism or a fervent piety. Religion itself does not give this complete harmonised sincerity—it is only the psychic being and the one-souled spiritual aspiration that can give it."

আর্জব প্রায়ই বলত গুরুদেব কী চমৎকার লেখেন—কী গভীর, ঋজু প্রাঞ্জল—কোথাও কি অস্পষ্টতার লেশও আছে? বলত : 'তিনি শুধুই আলো ঝরান তাপকে পাশ কাটিয়ে—ঠিক যেমন তাঁর আশ্চর্য ঋষিনেত্র!'

কিন্তু তবু ওর মুখে প্রায়ই বিষাদের ছায়া দেখতাম। জিজ্ঞাসা করলে হেসে উড়িয়ে দিত বলত : 'বিষাদ নয় দিলীপ, তবে জগতের যে-রূপশ্রী চোখে পড়ে দিনের পর দিন—আনন্দকে ঠাঁই দিই কোন্ কল্পনার আরামবাগে বলো তো?' বলে দেখিয়েছিল দুটি কবিতা (POEMS. 285-6) —শেষেরটির নাম 'শ্বেত বিহঙ্গ'। মিসটিক কবিতা—শেষের স্তবকে ছিল :

O running of Light in the
Silence,
O silvery morning star,
May the Dawn be the word-
less answer
Of a beauty no loss can mar.

(নিথরের বুকে তুমি কে আলো উধাও!
রূপালি প্রভাতী শুকতারার ঝঙ্কার!
উষা যেন হয় তব অপরূপ শ্রীর
অনির্বচনীয় সাড়া, নাই ক্ষয় যার।)

আর্জবের POEMS -এর প্রাক্‌কথনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বড় সুন্দর ভাষ্য দিয়েছেন তার দৃষ্টিভঙ্গির তথা প্রকাশসুষমার। তার শেষ দুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেই এ-অধ্যায়ের সমাপ্তি টানি :

"The mere literary critic will admire the delicate dream-like beauty of these poems, but, unless his insight is more than merely literary, he will go no deeper, for

---

* চ্যাডউইককে শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছিলেন 'আর্জব'। এই নামে তার ৩২৯টি কবিতা POEMS নামে লন্ডনে ছাপা হয়েছিল ১৯৫০ সালে—
John M. Watkins 21 Cecil Court London W.C. 2:
দার্শনিক বুদ্ধিবাদী মনীষীর যোগী ও কবিরূপে নবজন্ম হয়েছিল বলেই তার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।

they deal with the mysteries of the inner life and only he who can read their symbols will be able to penetrate to their heart. For Arjava, as shown in the poem entitled **Correspondences**, Nature was a shrine in which each form seen in the flickering firelight of the senses was a shadow of realities that lay within, shining in the magical light of the secret Moon which was the Master-Light of all his seeing, the central image of so many of his poems.

'In the midst of our personal sadness at his early departure let us remember that this Path is one which leads through many worlds and that, as Sri Krishna said, **nehabhikrama naso'sti**, for him who treads it there can be no loss of effort."

অর্থাৎ, যাঁরা কেবলমাত্র সাহিত্যের সমালোচক তাঁরা এ-স্বপ্নালু কবিতাগুচ্ছের গৌরব সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে পারেন কিন্তু যদি সাহিত্যের চেয়ে আরো গভীরের ডুবারি হতে না পারেন তাহলে ঐ পর্যন্তই হবে তাঁদের বোধের পরিধি—কেন না এ-কবিতাগুলির উপজীব্য—মানুষের আন্তর-জীবন, তাই যাঁরা প্রতীকের তাৎপর্যের অনুধ্যান করতে সক্ষম কেবল তাঁরাই শুনতে পাবেন এ-সব ভাবের অন্তর্গূঢ় বাণী। আর্জব প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মন্দিররূপে—যে-মন্দিরে ইন্দ্রিয়ের চঞ্চল-আলোয়-দেখা প্রতি রূপায়ণকেই দেখেছিলেন তিনি এক আন্তর সত্তার প্রতিবিম্বরূপে। তাই তিনি চাক্ষুষ করেছিলেন যে, প্রতি রূপই এক নিহিত চন্দ্রের প্রভায় দীপ্ত। এই অলোক চন্দ্রই ছিল তাঁর অন্তর্দর্শনের পরা প্রভা তাঁর নানা কবিতারই কেন্দ্রীয় প্রতিভাস।

তাঁর অকালমরণের জন্যে আমাদের ব্যক্তিগত বিষাদকে কাটিয়ে উঠতে হলে আমাদের মনে রাখা চাই যে, এ-জীবন বহু জগতের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে এসেছে। মনে রাখা চাই কৃষ্ণের অভয়বাণী যে, নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি— এ-পথের পথিকের কোনো প্রচেষ্টাই বিফল হতে পারে না।

(৬ই জুলাই ১৯৩৯)

(চব্বিশ)

১৯২৮ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত একটানা পণ্ডিচেরি থেকে মনে হল—আত্মীয়-স্বজনের ডাকে একবার কিছুদিনের জন্যে সাড়া দিলে মন্দ কি? এ আট বৎসরে শতাধিক বাংলা গান বেঁধেছিলাম সেগুলি কেবল আশ্রমের সীমিত চক্রের মধ্যে গেয়ে মন তৃপ্তি পাচ্ছিল না। তাই আরো চাইলাম সাড়া দিতে বাইরের বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে। এ-সাড়া চাওয়া মানে যে প্রশংসা চাওয়া তা জানতাম কিন্তু এ আট বৎসরে আমার মধ্যে অনেক মতিগতির রূপান্তর হলেও আমার কবি-সুরকার-সাহিত্যিক অভিমান বেশ সজাগ ছিল—আরো এই জন্যে যে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অনামী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদী কবিতা সমেত। শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন লিখে যে, প্রায় প্রতি শিল্পীর মধ্যেই ঘুপটি মেরে বসে থাকে এক গণনেতা যে চায় যশ, মান করতালি জয়ধ্বনি মালাতিলক। যে যোগী হতে চায় তার এসব চাওয়া চলবে না—কেন না তাকে চাইতে হবে শুধু ভগবানের সেবক হতে মানুষ বা শিল্পের বাহন হতে চাওয়া তার পক্ষে হবে পরধর্ম।

("Every artist—there are rare exceptions—has got something of the public man in him, in his vital physical parts, which makes him crave for the stimulus of an audience, social applause, satisfied vanity, fame etcetera. All that must go absolutely if he wants to be a yogi and his art a service not of man or his own ego but of the Divine."

কিন্তু আমি নিজেকে বোঝালাম যে আমি যখন স্বধর্মে আস্থিত যোগী (শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে আমাকে উপাধি দিয়েছিলেন "born Yogi"), যখন আমি কেবল ভাগবতী গীতিই গাই কবিতা ও গল্পেও শুধু ভাগবতী কথাই বলি তখন এত ভয় করার কী আছে—বিশেষ যখন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ রয়েছেন আমার রক্ষাকবচ? হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার'—ভোলা মন! চল তুই কপাল ঠুকে গান গেয়ে যা অনুক্ষণ।

মনে মনে জানতাম অবশ্য যে যোগপন্থী হয়ে ফের সামাজিক মেলামেশা গানবাজনার স্রোতে গা ভাসিয়ে চললে শেষটায় হয়ত দেখব—নীল মোহানায় না পৌঁছে অজান্তে এসে পড়েছি কোনো শূন্য হাটের আঘাটায়— কে বলতে পারে? মনের জোর? হায় রে, আমি কি স্বামী বিবেকানন্দ না রামতীর্থ? তবে এক ভরসা—ভুল-ভ্রান্তি অনেক করলেও ভাবের ঘরে চুরি করেছি খুব কম আর যখনি করেছি এমন মনঃকষ্ট পেয়েছি যে সে-সাজা ভুলিনি কোনোদিনই।

এই রকম বকম বকম করে শেষটা কুহু-ধ্বনি করে উঠলাম:

যে পেয়েছে গুরু তোমার আশিস প্রীতি,
প্রবাসেও সে তো রবে না একেলা আর:
যেথা যাবে পাবে তোমাকেই প্রাণে নিতি

বেসুরায়ও শুনি প্রেমের বাঁশি তোমার।

মনকে আশ্বাস দিলাম: 'ভোলা মন, ইংরেজী বাংলায় মিলিয়ে তুই তিন-চার শো কবিতা লিখেছিস—আর অভয় পেয়েছিস বলে গেয়েছিস আনন্দের রাগমালা—তবু ইতস্তত—যাবো কি যাবো না—পরীক্ষায় ফেল করলে কী গতি হবে...এই সব দুশ্চিন্তা? 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' বলেন নি কি ঠাকুর গীতায়?'

বলা বাহুল্য শ্রীঅরবিন্দও আশ্বাস দিলেন: মা ভৈঃ। ফল—সোজা কলিকাতা-প্রয়াণ—পিতৃতুল্য মেজমামা মহানন্দে ট্রেন ভাড়া পাঠালেন।

(পঁচিশ)

কলকাতায় এসেই পড়ে গেলাম গানের আবর্তে। এখানে গান ওখানে গান, সেখানে গান, রেডিও গ্রামোফোন সভা-সমিতি—ভাগ্যক্রমে সে সময়ে টেলিভিশন আসেনি এদেশে তাই রগ ঘেঁষে বেঁচে গেছি—এ হসনীয় পুতুল নাচে নাচতে হয়নি সেজেগুজে।

কিন্তু সত্যিই ভালো লাগত সেই সব আসরে গান গাইতে যেখানে শ্রোতারা শুধু গান শুনতে চান না গানের মাধ্যমে তাঁর কথা শুনতে চান যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন 'গানের ওপারে।' এই সব আসরে প্রায়ই গাইতাম 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম'—আর বিপুল সাড়া পেতাম উদ্বেল হৃদয়ের চোখের জলের, ভক্তির উচ্ছ্বাসের। তখন মনে মনে প্রণাম করতাম গুরুদেবকে—আর মন কেমন করত। তবু এমনিই মানুষের মন যে গুরুদেব সুদূর হলেও নানা শ্রোতা ও শ্রোত্রীর সাড়ায় আনন্দ পেতাম বৈকি। সাধে কি গুরুদেব সাবধান করে দিয়েছিলেন—জনগণমনের করতালি চেও না, গেয়ে চলো কিন্তু ঠাকুরকে উদ্দেশ করে—জনতার চিত্ত-রঞ্জন করতে, মঞ্চে উঠে মালা তিলকের পুরস্কার পেতে নয়। মন মাঝে মাঝে ধমকাত—কারণ আমি গুরুদেবের তিরস্কার অনেক সময়েই ভুলে যেতাম, সব বুঝেও অবুঝের মতন সেই সব ছোট সুখ আত্ম-প্রসাদ উচ্ছ্বাসে মনকে রঙিয়ে তুলতাম যাদের রং ধোপে টেঁকে না। দেখতাম নিজের মধ্যে দুটি রূপ পাশাপাশি ঘরকন্না করছে। এ বলছে: 'এসবই মায়ার খেলা' ও বলছে: 'কতকটা বটে কিন্তু জীবন তো শুধু নির্মায়িক বিজনতার পীঠ নয় নানা অশ্রু-হাসি আলোছায়া হারজিৎ উদয়-অস্তের রংগমঞ্চও বটে। আমরা চাই দুঃখকে পাশ কাটিয়ে একটানা সুখের কারবার চাই বিরহের আঁধারকে দাবিয়ে মিলনের দেয়ালি চাই ছায়াহীন আলো কাঁটাহীন গোলাপ বন্ধন-হীন মুক্তি। জীবনে সবই চলচঞ্চল তাই চাই এমন আনন্দধাম যেখানে চপলা অচলা প্রেম নিষ্কাম স্বপ্নও জাগরণের মরুতে ফুলবাগান বসায়। কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—আমি লিখতে বসেছি এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের স্মৃতিচারণ তাঁর কাছে কী পেয়েছি তার সুখবর দিতে—দুঃখ-সুখের দ্বৈতলীলার ব্যাখ্যা করে দার্শনিক উপাধি পেতে নয়। আমি জিজ্ঞাসু তীর্থযাত্রী মাত্র কেবল সদগুরুর কৃপায় দিশা পেয়েছি মায়া-কুঞ্জবাসী সোনার হরিণের পারে এক দিশারি পরশমণির যার ছোঁওয়ায় বিফলতার পতিত জমিতেও সোনা ফলে?

(ক্রমশঃ)

---

*শ্রীঅরবিন্দের এ চিঠিটি অনামী-তে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম সংস্করণে।

প্রাচীন রোমের পণপ্রথা

পণপ্রথা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও বেশ সাদৃশ্য আছে। পণ বলতে গেলে সাধারণত কন্যাপক্ষরা বিবাহ স্থির হলে পাত্রপক্ষকে নগদ টাকা সেই সঙ্গে চাহিদামত আরও কিছু দিয়ে থাকেন এরকমই মনে হয়। পণ-প্রথার রেওয়াজে কন্যাপক্ষ যেমন পাত্রপক্ষকে নগদ টাকার সঙ্গে আরও কিছু দেন তেমনি পাত্রপক্ষও অনেক সময় কন্যাপক্ষের চাহিদা পূরণ করে পাত্রের বিয়ে দেন। আমাদের আদিবাসী সমাজে অনেকের মধ্যে এখনও কন্যার পিতাকে যৌতুকস্বরূপ হাঁস মুরগী শস্য ছাড়া নগদ টাকা দিয়ে নিজের ছেলের বিয়ে দিতে হয়।

প্রাচীন রোমানদের মধ্যে পণপ্রথার সাধারণতঃ পাত্রীপক্ষকে বিয়ে স্থির করার সময়ে পাত্রপক্ষের সঙ্গে পণের ব্যাপারে কথা বলতে হতো। পাত্রপক্ষকে পণ দিতেন অধিকাংশক্ষেত্রে পাত্রীর পিতা পাত্রীর মাতা নয়তো পাত্রী নিজে। ডস অথবা পণ দেওয়া হতো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষের খরচের জন্য কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে রোমানদের মধ্যে নতুন এক রেওয়াজ দেখা যায় পণের টাকার অধিকারিণী হতেন পাত্রী নিজে। অবশ্য বিয়ের এই পণ দেওয়ার নিয়মের কড়াকড়ি সর্বত্র অপরিহার্য ছিল তা নয় তবে পণ বিয়ের সার্টিফিকেট বা প্রমাণ-স্বরূপ ছিল। এর দ্বারা অনেক সময়েই স্বামীর একমাত্র স্ত্রী এটাও প্রমাণিত হতো।

পাত্রীর পিতা পাত্রীর আত্মীয়-স্বজন অথবা পরিচিতজনের মধ্যে কেউ বিয়ের পাকা বন্দোবস্ত করতো তাকে বলা হতো প্রফেকটিসিয়া। পাত্রী নিজে বা তার মা যদি কন্যার বিয়ের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পণের কথাবার্তাও ঠিক করতেন তাকে বলতো অ্যাডভ্যানটিসিয়া। প্রফেকটিসিয়া ও অ্যাডভ্যানটিসিয়া চুক্তি ছাড়াও আর এক ধরনের চুক্তি ছিল তাকে বলা হতো রিসেপ-টিসিয়া। রিসেপটিসিয়াতে বিয়ের পণের কথাবার্তা পাকা করার সময়েই বিবাহবিচ্ছেদ হলে পণদাতাকে পণের সব টাকা ফেরত দিতে হবে এমন কথাও পাকাপাকি হতো।

পাত্রীপক্ষকে পণের টাকা ও অন্যান্য জিনিষ দেবার সময়ে তিনটে প্রথাকে অনুসরণ করা হতো। ডটিস্ ডেসিও পদ্ধতিতে পাত্রকে বিয়ের খরচাবাবদ টাকা দেওয়া হতো।

ডটিস ডিকসিওর নিয়ম অনুসারে মেয়ের বাবা-মা কিংবা পাত্রী নিজে পাত্র-পক্ষকে কাছে পণের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতেন। এইভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার নিয়ম শুরু হয় রোমের রাজা থিওডোসিয়াসের সময় থেকে। প্রতিজ্ঞাভংগকারীকে আইন-সংগত শাস্তি প্রদান করা হতো।

ডটিস্ প্রমিসিও চুক্তির সব নিয়মকানুন ছিল প্রায় ডটিস্ ডিকসিওর মত। তবে ডটিস্ ডিকসিওর থেকে তফাৎ ছিল যে পণদাতা তার চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে টাকা প্রদান করতে পারতেন। কখনো এই অর্থ চুক্তির অনেক পরে দিলেও কিছু হতো না। সম্রাট জাসটিনিয়ানের সময় থেকেই এই প্রথা অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছিল। জাসটিনিয়ানের সংবিধান অনু-যায়ী পণের অর্থ পুরোপুরি স্ত্রীর সম্পত্তি বলে গ্রাহ্য করা হতো। কিন্তু জাসটিনিয়ানের সংবিধান যখন বলবৎ ছিল না তখন প্রাচীন রোমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামীরা আত্মসাৎ করেছেন।

সম্রাট জাসটিনিয়ানের সময়ে বিয়ের পণের অর্থের অধিকারিণী ছিলেন পাত্রী নিজে। স্বামীরা স্ত্রীর এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধান (ম্যানেজারী) ছাড়া বিন্দুমাত্র খরচ করার অধিকারী ছিলেন না। স্ত্রীর সম্মতি থাকলে সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হতো। স্বামীর দেখাশোনার ফলে যদি সম্পত্তির কোন ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসান হতো তবে স্বামীকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হতো। বিবাহবিচ্ছেদের সময় স্ত্রীর সম্পত্তির প্রতিটি জিনিষ স্বামীকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিতে হতো। জাসটিনিয়ানের পরবর্তীকালে রোমের প্রচলিত আইনে দেখা যায় স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী জীবিত থাকলে সে স্বামীর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারিণী হতেন তবে স্ত্রীর মৃত্যু স্বামীর পূর্বে হলে তার সম্পত্তির অধিকারী হতেন স্ত্রীর উত্তরাধিকারীরা স্বামী পেতেন না। অবশ্য ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ক্ষেত্রে আইন অন্যরূপ ছিল। ব্যভিচারী স্ত্রী তার সম্পত্তির সবটুকুই স্বামীর নিকট খোয়াতেন। কোনরকম কোন চুক্তি না থাকলেও যদি বিবাহবিচ্ছেদ হতো তাহলে পণসম্পত্তির সমস্তটাই স্বামীকে সবক্ষেত্রেই ফেরত দিতে হতো। ডস্ অ্যাড্ভিনটিসিয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর আগে মৃত্যু ঘটলে তার উত্তরা-ধিকারীরা এই সম্পত্তি ফেরত পেতে পারতেন।

স্ত্রীর পণসম্পত্তি ছাড়াও অন্য কোন সম্পত্তি থাকলে তাকে বলা হতো প্যারা-ফারনা। এই সম্পত্তি স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীকে প্রদান না করলে স্বামীর নেবার কোন অধিকার ছিল না।

প্রাচীন রোমে স্ত্রীরা বিশেষ কতকগুলি সুবিধা পেতেন সম্পত্তি ভোগে। বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক পিতাই কন্যার বিয়ের পণের টাকা পাত্রপক্ষের হাতে না দিয়ে নিজের কন্যার নামে দিয়ে থাকেন। হঠাৎ কোনরকম অসুবিধায় যাতে কন্যা অর্থ-নৈতিক কষ্ট কাটিয়ে উঠতে পারে বা তার দরকারবাড়ীর প্রয়োজনে সে অর্থ যাতে বিবেচনা মত ব্যয় করতে পারে সে ব্যবস্থাতেই পণের টাকা কন্যার নামে দেওয়া হয়।

—অঞ্জলি চৌধুরী

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

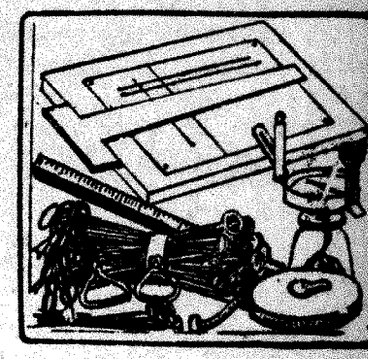

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম : অয়ারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কার্মেলিন প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

সব ঘরেরই ঘরোয়া কথা...

"ক্লাসের ছেলেরা জানে, মাথায় আমি কোনো কালে তেল মাখি না। কিন্তু সত্যি কথা বলব? আমি ক্যান্থারাইডিন মাখি, নইলে চুল উঠে-উঠে টাক পড়ে যাবে যে! ক্যান্থারাইডিন, তেলের মতো চটচটে নয়, তাই চুলে মাখলেও বোঝা যায় না। কিন্তু একথা ফাঁস ক'রে কাউকে আমার ওপর টেক্কা মারতে দেব না!"

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশবিন্যাসে পরিপাটি পরিবারের ঘরোয়া রহস্য

বেঙ্গল কেমিক্যালের সেরা উৎপাদন

U-BC-2 BEN

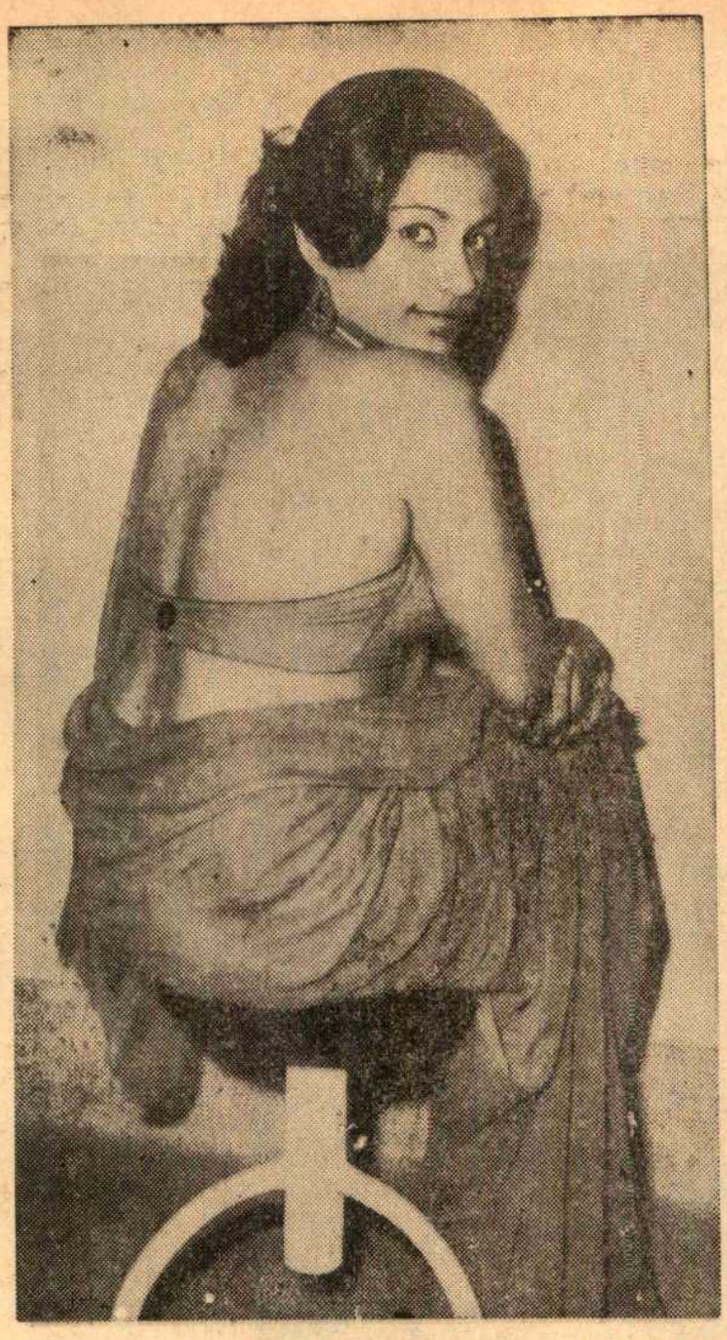

প্যারিস, রোম, নিউইয়র্ক ওয়াশিংটন লণ্ডন ঘুরে ফ্যাশন যখন আরব সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের মাটিতে এসে পৌঁছয়, তখন প্রায়শই পশ্চিমে নতুন ফ্যাশন, নতুন হুজুগ শুরু হয়ে যায়। কারণ ফ্যাশনের হাওয়া এদেশে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে কেটে যায় বারোটি মাস, পুরো একটি বছর। পুরো একটি বছর আগেই বর্তমানে কলকাতার বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার ইয়াসমিন আরিফ ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েছেন। ইরানের এই মহিলা ফ্যাশন ডিজাইনিং এর প্রফেশান গ্রহণ করেছেন অন্ততঃ পাঁচ বছর আগে। স্থানীয় একটি বিউটি পারলারে কাজ শিখতেন। সেখান থেকে সোজা স্টেটস্‌এ। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের ট্রেণিং। ট্রেণিং কমপ্লিট করে সেখানেও একটি বিউটি পারলারে কাজ করেছেন। বিউটি পারলারে অবশ্য তিনি ফ্যাশন ডিজাইন করেননি। বিউটিশিয়ান হিসেবে কাজ করেছেন। ফ্যাশন ডিজাইনার-এর ট্রেণিং শেষ করার পর বিউটিশিয়ানের ট্রেণিং নিয়েছেন এক বছর। তারপর হঠাৎ ভারতে কেন?

শ্রীমতী আরিফ হাসতে হাসতে বললেন দ্যাটস এ ভেরী নাইস কোশ্চেন .....কেন যে ভারতে এলাম তা আমি নিজেই জানি না। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার একজন ইণ্ডিয়ান বান্ধবী জুটে গিয়েছিল। সে আমায় অনুরোধ করল। আমিও চলে এলাম। ইচ্ছে আছে জানুয়ারী মাসে দেশে ফিরে যাব। এই এক বছর সময়ে আমি দেখলাম এখানে ফ্যাশন ডিজাইনিং এর বিরাট ফিল্ড। অনেক কাজ পড়ে আছে। বিশেষ করে কলকাতায়। এখানকার মেয়েরা মোটেই সচেতন নন। কি রকম ড্রেস করলে ভাল দেখাবে সেটা জানা নেই। কোন সময়ে কোন পোষাক পরলে ভাল দেখাবে তাও জানা নেই। রংয়েরও ফ্যাশন আছে।

রূপ সজ্জা

এ বছরে লাল তো ও বছরে কমলা, এ বছর কালো মোজা তো ও বছর সাদা লেস। আমরা অনেক সময় হাতেকলমেও কাজ করি। দরকার হলে করতে আপত্তি কি। তবে এ বিষয়ে যাঁরা বিখ্যাত পোষাকের দোকান চালান তাঁরাই উদ্যোগী হবেন। নিত্য নতুন কাট-ছাঁট, নতুন ফ্যাশনের প্রবর্তন, রীতিমত ক্রিয়েটিভ ব্যাপার। অনেকটা নেশার মত কাজ করি আমরা। আমাদের ইচ্ছে করে দেশে দেশে ঘুরে সব জায়গায় মেয়েদের দেখি।

ফ্যাশনের জন্ম ফ্রান্সে। আর সেই নবজাতক তৎক্ষণাৎই ছুটতে শুরু করে সারা ইউরোপে। প্যারিসের পরেই ফ্যাশনেবল বলে নাম আজকাল ইতালী এবং রোমের। অনেক ফ্যাশনের জন্ম আজকাল রোমেই হচ্ছে। জার্মাণীর মেয়েরাও ফ্যাশনের জন্যে তাকিয়ে থাকে ফরাসীদের দিকেই। আমেরিকার নিউ ইয়র্কেও ইদানীং নিত্য নতুন ফ্যাশন। ইউরোপের মেয়েরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে সাগর পারের এইদিকে।

লেটেস্ট ফ্যাশন কি?

ঃ গত কয়েক বছর ধরে ফ্যাশন চলছিল মিনি-র। জামার ঝুল ছোট হতে হতে এমন পর্যায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, যারপর আর যাওয়া যায় না। এক সময় আমেরিকায় বলা হত মিনি হাই, ম্যাকসি হাই। মানে হচ্ছে মিনি মিনি করে পাগলামি করা আর ঠিক হবে না। ফ্যাশন এখন একটু চেঞ্জ চাইছে। এ তো খুবই স্বাভাবিক। কারণ মিনি যতদূর যাবার গেছে আর কোথায় যাবে। কয়েক বছর আগে থেকে আমেরিকায় মিনি-র ঝুল বাড়তে শুরু করেছে। ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী ও লণ্ডনেও। আমরা যারা ফ্যাশন ডিজাইন করি তারা কিন্তু এতেও খুশী নই, ঝুল—আরো, আরো নামাতে চাইছি। ফ্রান্সে মিডি ফ্যাশন পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। মিডি অর্থাৎ

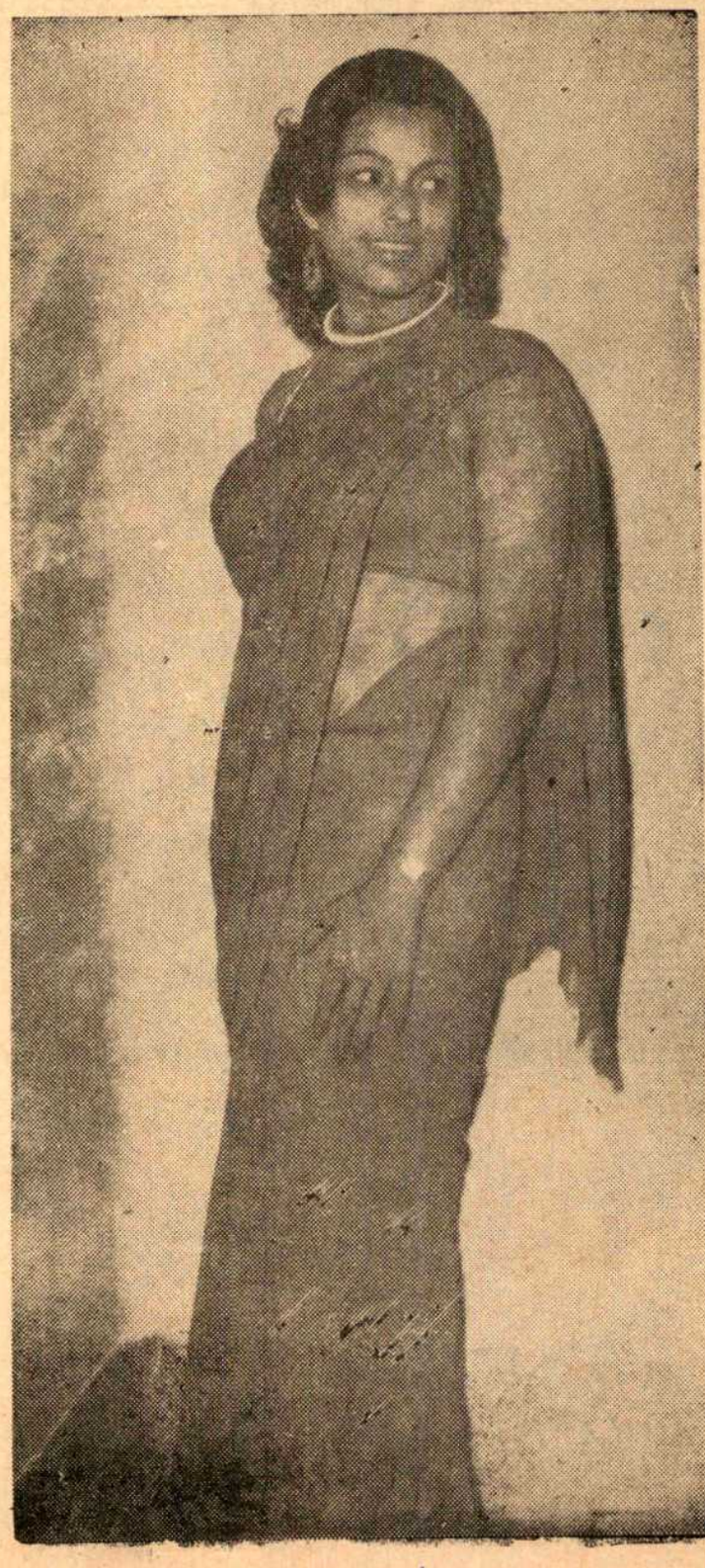

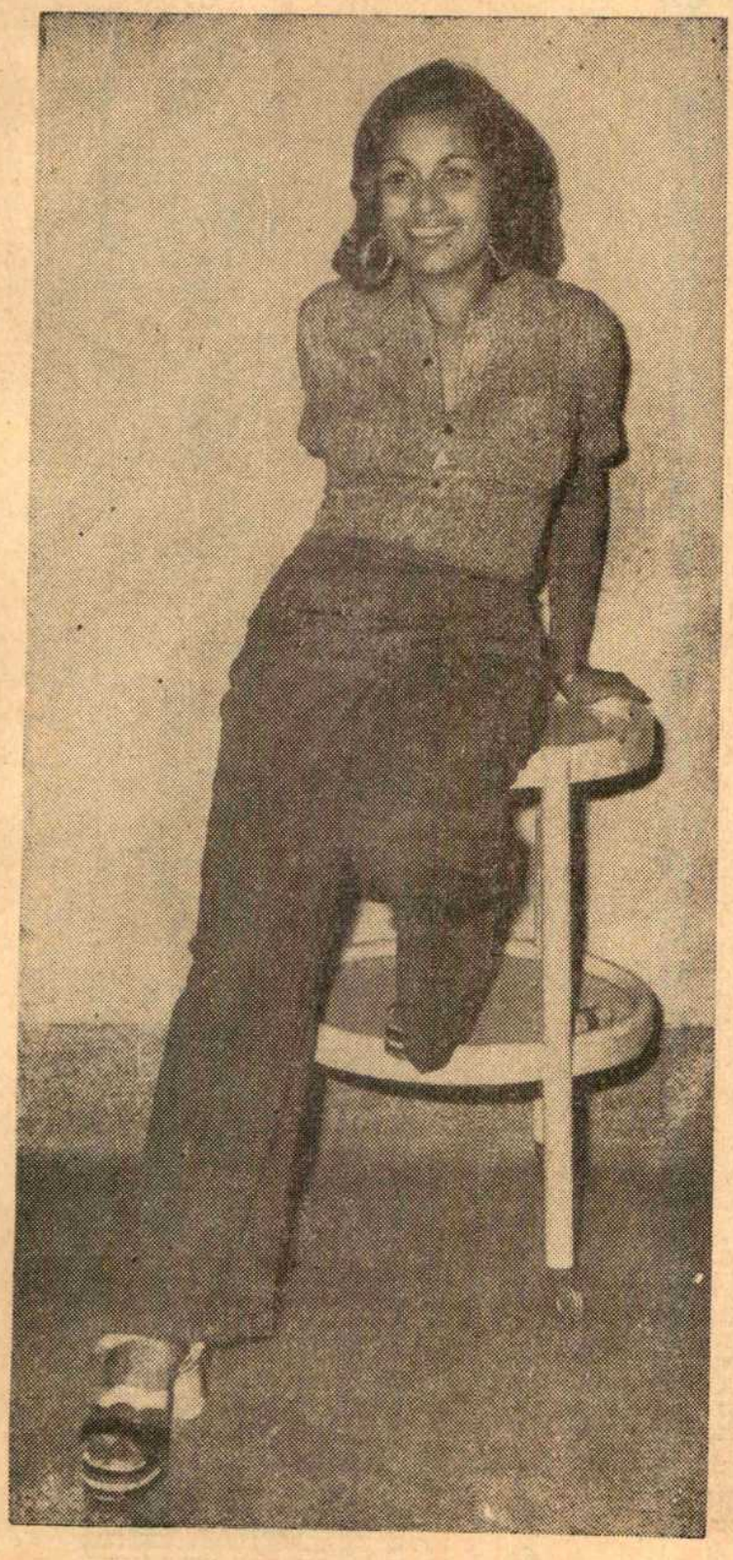

মিড্‌ল। এ রকম পোষাক এখানেও চলছে। বম্বে এবং দিল্লীতে তো তাই দেখেছি। ফ্যাশনের ব্যাপারে কলকাতা ভীষণ ব্যাকওয়ার্ড।

'মিডি' ফ্যাশন সম্পর্কে আরেকটু বলুন।

ঃ মিনি আর ম্যাক্সি বেশ কিছুদিন ধরে রাজত্ব করল। ম্যাক্সি যেন মেয়েদের সনাতন নারীত্ব আর মহিমাসুলভ ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। 'মিনি' দুষ্টুমি, সেক্সি ভাব আনে। এই চপলতা আর সেকস তো তারুণ্যের প্রতীক। ফ্যাশনের চিরাচরিত প্রশ্নের উত্তর বোধহয় 'মিডি'। মিডির জন্ম বেশী দিনের নয়। ইতিমধ্যেই এই মন-মোহন রংয়ের পোষাক জনপ্রিয় হয়েছে। আমার মতে মিডি হচ্ছে ভীষণ কম্ফোর্টেবল এবং এলিগ্যান্ট। এই নবতম পোষাক হচ্ছে হাঁটুর বেশ কিছুটা নিচে, পায়ের মাঝামাঝি —অনেকটাই তিরিশ দশকের মতন।

বিউটিশিয়ান হিসেবে আপনার কাছে পোষাক পরিচ্ছদের গুরুত্ব কতখানি।

ঃ শুধুমাত্র সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের পোষাক পরিচ্ছদ পরলেই হল না। তার জন্য চাই সুন্দর ফিগার। ফিট না করলে কোনো কিছুতেই ভাল লাগে না। স্লিম হতে হবে। প্রতিদিন ম্যাসাজ করাতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটাই নিজের ওপর নির্ভর করে। এইটি পার্সেন্ট নিজের ওপর। টুয়েন্টি পার্সেন্ট আমরা হেল্প করতে পারি। ডায়েটিংএর ব্যাপার সম্পূর্ণই নিজের ওপর। অনেকে আছেন ওয়েস্টার্ন প্রথায় ডায়েটিং করেন। সেটা মস্ত ভুল। ডায়েটিং করতে হবে একান্তভাবে ভারতীয়

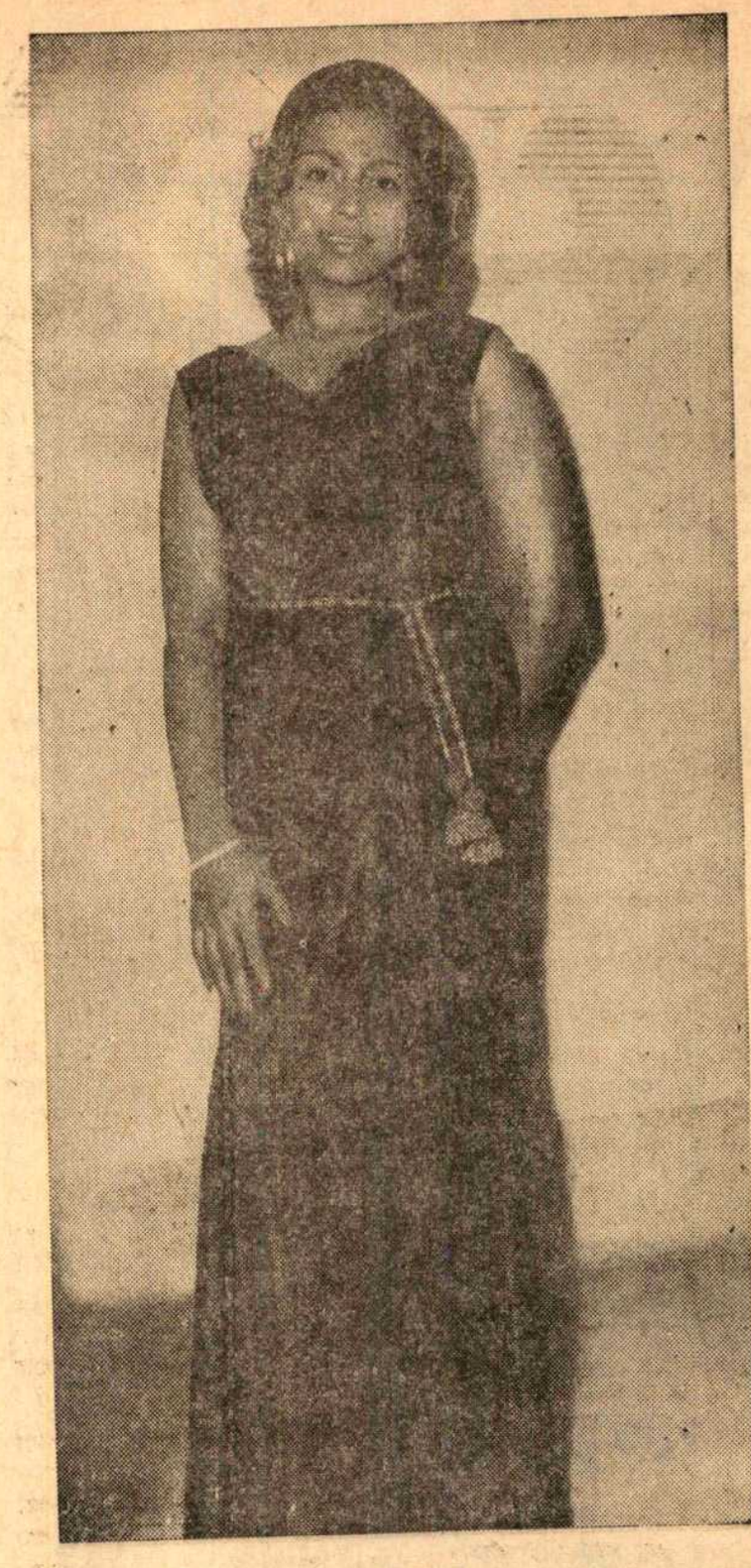

প্রথায়। এ-ছাড়া আছে ফিগারেট প্রথা। অনেকের ধারণা বয়সের ভার মেদের বাহুল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। অথবা গ্রন্থিগুলোই দৈহিক স্থূলতার জন্য দায়ী। ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই তা নয়। পৃথিবীর শতকরা আটানব্বুই জন লোক মোটা হয়ে যান প্রয়োজনাতিরিক্ত আহারের দরুন। পরিশ্রম আর গৃহীত খাদ্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। মেদবহুল অসুন্দর দেহকে সুন্দর করে তুলতে কিছু যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। 'হেল্থ ওয়াকার' এমনি একটি যন্ত্র। এর ওপরে পনেরো মিনিট হাঁটা মানে পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে এক ঘন্টা হাঁটার সামিল। ম্যাসেজ বেড-এর ওপর শুয়ে পড়লে আপনার স্নায়ুগুলো মোল্ড হবে। রোয়িং কাঁধ, হাত, বুক, পা আর তলপেটের ব্যায়ামের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। এর জন্য কষ্ট করে জলাশয়ে যাবার প্রয়োজন হয় না একটা ঘরে রাখা যন্ত্রের ওপর বসেই তা করা যায়। এমনকি প্রয়োজন মত জলের চাপ নিয়ন্ত্রিত করা চলে। 'ভাইব্রেটর বেল্ট'-এর ব্যবহার দেহে অনাবশ্যক মেদের বাহুল্য কমিয়ে দেয়। রোলার ব্যবহার করলে হাত, পা, উরু, পশ্চাৎদেশ তলপেট আর কোমরের মেদের বাহুল্য কমে যায়। সবশেষে স্টীম বাথ। এসবের সঠিক ব্যবহার হলে দেখতে ভালো লাগবে নিজেকে এবং পছন্দমত পোষাক-পরিচ্ছদ পরলে আপনাকে পরী না হোক বেশ দেখাবে। যথাসম্ভব ক্যাসুয়াল ড্রেস পরবেন। আমার বিশেষভাবে পছন্দ ইণ্ডিয়ান সিল্ক।

—স্বপনকুমার ঘোষ

রূপ সজ্জা

উপন্যাস

শেষবিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তার কথার প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং। অমিয়, তার স্ত্রী নীহার সবাই যেন কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। সংসারের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন যেন তিনি। তবু একসময় নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে অমিয় বা তার স্ত্রী নীহার নয়, তাদের বংশধরদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান বঙ্কিম দত্ত।

নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জজিয়তি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

সেদিন তার সঙ্গে বাবার বাল্যবন্ধু, যাঁর নাম রুদ্রেন্দু, দেখা হবার পর অদ্ভুত লাগছিল। যত দেখছিল ততই ভাল লাগছিল তাকে।

রঞ্জু ভাবল, পৃথিবীতে তাহলে এখনও এমন একজন দুজন মানুষ আছে যাঁদের কাছে সারাদিন বসে থাকতে ভাল লাগে আর কান পেতে তাঁদের গল্প কেবল শুনে যেতেই ইচ্ছে করে।]

।। বারো ।।

এই মানুষকে এক কাপ চা—কাপ কোথায় ভাঁড়, ছোট মাটির ভাঁড়ে একটুখানি চা খাইয়ে কি খুব বেশি কিছু করে ফেলেছে সে!

মোটেই না।

নিজের কাছে খারাপ লাগছে তার।

অন্তত সঙ্গে একটি কেক খাওয়ান উচিত ছিল না কি। ছোট দোকান হলেও কাচের বয়ামে বেশ বড় বড় কেক ছিল। সুজির বিস্কুটও যেন ছিল। সেই কখন, প্রায় সূর্য ওঠার আগে বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছেন। সব তো শুনল রঞ্জু। তারপর বাড়ি ফিরবেন বেলা কটায় তার ঠিক নেই। দমদম কি এখানে। খিদে পাওয়া স্বাভাবিক।

আর খিদে যে পেয়েছে, তখন ভুট্টা খাওয়া দেখেই রঞ্জু বুঝতে পেরেছিল।

হুঁ, খুবই খারাপ লাগছে তার। কাজেই এখন রঞ্জু মনে মনে ঠিক করল, কেবল দেশলাই না, বিড়ি যেমন খান সিগারেটও তিনি খান নিশ্চয়। সেই আমলে যাঁরা স্বদেশী-টদেশী করতেন তাঁরা নাকি একদম সিগারেট খেতেন না। যাঁদের স্মোক করার অভ্যেস থাকত তাঁরা বিড়ি টানতেন। যেমন পাতলা মিলের ধুতি না পরে মোটা খদ্দর পরতেন। আর খুব করে নাকি চরকা ঘোরাতেন। চরকা ঘুরিয়ে সুতো কাটতেন সারাদিন।

তিনি কোনোদিন চরকা ঘোরাননি।

তাঁর বাবা সতীশ বাড়ুয্যের ছিল চরকার সুতো কেটে স্বদেশী করার নেশা।

তাঁর বাবা সতীশ বাঁড়ুয্যের ছিল একেবারে ভিন্ন। বলে তিনি টিপে টিপে খুব হাসছিলেন। বেশ রগড় করে কথাগুলি বলছিলেন।

হুঁ, কথা প্রসঙ্গেই বোমা পিস্তলের সঙ্গে চরকা খদ্দর বিড়ি ইত্যাদি ব্যাপারগুলিও এসে গিয়েছিল। কান পেতে রঞ্জু শুনেছে। এসব কিছুই তার জানার কথা নয়। কবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার আগের ঘটনা। সে তখন জন্মায়ও নি।

শুনতে শুনতে সব কিছু স্বপ্নের মতন ঠেকছিল তার।

এখনও ঠেকছে।

ঠিক এই সময় এখন বেলা বারোটা বাজে, কর্নেল সম্পসনকে মারতে বিনয় বাদল দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়েছিল।

উঁহু, তাদের পরনে হেঁটো খদ্দরের ধুতি ছিল না মাথায় গান্ধী-ক্যাপ ছিল না। ছিল দামী ইউরোপীয়ান পোশাক। তা না হলে দারোয়ান গেট-এর কাছে আটকে দিত যে তিনজনকে।

স্বপ্নের ঘোর নিয়ে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যে রাস্তা ক্রশ করে রঞ্জু সিগারেট বিড়ির দোকানটার দিকে ছুটছে। দেশলাইয়ের সঙ্গে দুটো নতুন উইলস-ফ্লেক কিনে তাঁকে খেতে দেবে সে ঠিক করে ফেলল। নিশ্চয় তিনি আপত্তি করবেন না। এই সঙ্গে নিজের পকেটের সিগারেটটা সে দিতে পারত। দুমড়ে মুচড়ে গেছে। ওটা দেওয়া চলত না। পকেট থেকে ওটা ফেলে দিয়ে তার মনটা হালকা ঠেকছিল।

কিন্তু এই মানুষকে দশ নয়ার এক ভাঁড় চা ও দুটো উইলস-ফ্লেক খাওয়ান কি যথেষ্ট হল!

তাঁর জন্য আরও কিছু করতে পারলে রঞ্জুর ভাল লাগত। আরও কিছু করা উচিত।

তাই বলো। এখন জলের মতন জিনিসটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড জ্বালা আক্রোশ দুঃখ ও সেই সঙ্গে কুণ্ডলী পাকান ধোঁয়ার মতন রাশি রাশি গ্লানি জমতে লাগল। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। রুদ্রেন্দু খারাপ ছেলে, কুপথগামী। তার সঙ্গে অমিয়কে, সুপ্রিয়কে মিশতে দিও না। তা হলে এই দুটো ছেলেও গোল্লায় যাবে উচ্ছন্নে যাবে। তাদের লেখাপড়া হবে না। মানুষ বলে লোকের কাছে কোনোদিন পরিচয় দিতে পারবে না চিরকাল মাথা হেঁট করে চলতে হবে। সেই সঙ্গে বঙ্কিমবাবুও লোকের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। এমন যে কৃতী পুরুষ, ম্যাট্রিকে জেনারেল-স্কলার, ল' পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে মুন্সেফের চাকরি—হাজারে কটা ছেলে এমন হয় রঞ্জুও শুনেছে

বঙ্কিম দত্ত আগে মুন্সেফ ছিল পরে জজ হয়ে জজিয়তি করে—কাজেই এমন জ্ঞানী-গুণী নামী মানুষের সন্তান দুটি মূর্খ হয়ে থাকবে সতীশের ছেলে ও তার দলের আরও পাঁচটা বকে যাওয়া ছেলের সঙ্গে মিশে অমিয় সুপ্রিয় গোল্লায় যাবে, জীবনটাকে নষ্ট করবে, শুধু কি তাই বোমা পিস্তল নাড়াচাড়া করে পুলিশের খাতায় যদি একবার নাম ওঠে সেদিক থেকেও বঙ্কিমবাবুর নিজের কত ভয় কত অসুবিধে, সরকারী চাকরি তার পদোন্নতির পথ চিরকালের জন্য সীলড হয়ে যাবে—হয়তো চাকরিই থাকবে না। সুতরাং সাবধান সাবধান—বাড়ির ত্রি-সীমানায় রুদ্রেন্দুকে বা তার কোনো বন্ধুকে ঘেঁষতে দেবে না—

অমিয় ও সুপ্রিয়র ওপর সারাক্ষণ কড়া নজর রাখ। হুঁ, সুপ্রিয় এখনও বাচ্চা। তা হলেও তো ছেলে দুদিন পরেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে—চারদিকে যেমন বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানা আরম্ভ হয়েছে—সুতরাং রুদ্রেন্দুর সঙ্গে তো নয়ই, বাইরের কোনো ছেলের সঙ্গেই এদের দুজনকে মিশতে দেবে না। যতক্ষণ স্কুল স্কুলে—তারপর সারাক্ষণ ঘরে আটকে রাখ, দরজায় তালা দিয়ে রাখ। ঘরে বসে লেখাপড়া করুক কি গল্পের বই পড়ুক কি খেলাধুলো করুক বা পড়ে পড়ে ঘুমোক—যা খুশি করুক কিন্তু বাইরে ঘোরাফেরা নয়, কারো সঙ্গে মেলামেশা নয়।

কথাগুলি বলার সময় রুদ্রেন্দু যদিও হাসছিলেন। লজ্জায় দুঃখে রঞ্জুর মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল তার।

চা শেষ করে মাটির ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে তিনি ঠাট্টা করে বলছিলেন, 'আর একটা বোমা ফাটালাম হে'—ঠাট্টাটা কাকে? নিশ্চয় ঐ বুড়ো বঙ্কিম দত্তকে—কেননা এখনও রুদ্রেন্দুকে বুড়োর ভয়, রুদ্রেন্দু সেদিন তাদের বাড়ি যেতে বুড়ো যেমন চেহারা করেছিল। আর রঞ্জুর বাবা যখন রতনকে চা দিতে ডাকে—ওফ ভাবা যায় না, কী অভদ্র নির্লজ্জের মতন ব্যবহার করেছিল আশী বছরের লোকটা।

না এতকাল রঞ্জু প্রায় কিছুই জানত না! একটু-আধটু শুনেছিল, এই পর্যন্ত। এখন ভাল করে শুনল।

এখন সব জানল। এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে বুড়োকে তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে ক্ষুদিরাম কুপথগামী ছিল, তাই তোমাদের অত বড় হাইকোর্টের সামনে ঘটা করে আজ তার স্ট্যাচু বসান হয়েছে বুঝেছ দাদু। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিনয় বাদল দীনেশ উচ্ছন্নে গিয়েছিল গোল্লায় গিয়েছিল, আর তাই তাঁদের সম্মান দেখাতে তাঁদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ড্যালহৌসী স্কোয়ারের নাম পাল্টে এখন বিনয় বাদল দীনেশ বাগ করা হল, বি বি ডি বাগ। আর একটা ষণ্ডাগণ্ডা মূর্খ চাটগাঁয়ের মাস্টারদা সূর্য সেন—তার নামেও কলকাতায় রাস্তা হয়ে গেল। সেই গোল্লায় যাওয়া ছেলেদের একজন রুদ্রেন্দু, এমন কত কত বকাটে সেদিন—

—এই রঞ্জু!

থমকে দাঁড়াল সে।

ঝিকঝিকে রোদ্দুরে তিনটি মুখ।

তিন জোড়া চোখের পাতা কাঁপছে। ঠোঁটে হাসি। দ্রুত শ্বাস পড়ার দরুণ নাসারন্ধ্র স্ফীত হচ্ছে, সঙ্কুচিত হচ্ছে পরমুহূর্তে।

—কোথায় চললি দল বেঁধে সব। হাসতে গিয়ে রঞ্জু অবশ্য হাসতে পারল না। একটা অস্বস্তি দেখা দিল তার তাকানোর মধ্যে। যেন ঠিক এই সময় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হলে ভাল লাগত তার।

—কোথায় আবার যাব! তোর কাছে গিয়েছিলাম আর কি। তোকে খুঁজছি।

—বাড়ি গিয়েছিলি?

—হ্যাঁ, অমিত থুতনি ঝাঁকাল। শুনলাম তুই চুল কাটতে বেরিয়েছিস:

—কে বললে!

—কে আবার বলবে শোভেন মাথা ঝাঁকাল। দারোয়ানের মতন সারা দিন গেট আগলে বসে থাকে কে?

—অ দাদু, দাদু বলেছে!

—হ্যাঁ বলেছে মানে কি, দেখলাম ফায়ার হয়ে আছে বুড়ো তোর ওপর। পার্থ খুক করে হাসল। তোর কথা জিজ্ঞেস করতেই কেমন না গরম হয়ে উঠল। বললে কেন, কি দরকার ওকে এখন?

—তারপর!

—ঐ যা হোক একটা মিছে কথা তক্ষুনি বানিয়ে বলতে হল আর কি। শোভেন শব্দ করে হাসল।

—কি বলেছিলি! একটা ঢোক গিলে রঞ্জু মুচকি হাসল। এক সেকেন্ডের জন্য যদিও। তক্ষুনি আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

—বললাম একটা বই আছে ওর কাছে। ফেরত নিতে এসেছি।

—কি বই জিজ্ঞেস করল?

—না।

অমিত বলল, বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করবে কি। ছুঁচলো চোখ করে বুড়ো বার বার আমাদের মাথার চুল দেখছিল।

—তারপর। আবার একটা মুচকি হাসি রঞ্জুর ঠোঁটে উঁকি দিয়ে তখনই মিলিয়ে গেল। বলল, তোমরা এত বড় বড় চুল রাখ কেন তাই না?

—না, তা বলল না। মুখে বলল না, তবে যেমন করে না তিনজনের মাথার দিকে তাকাচ্ছিল — বুঝলাম বুড়ো আমাদের কাউকেই খুব একটা পছন্দ করছিল না।

—কেন তোদের তিনজনকেই তো দাদু চেনে, তোরা কিছু আজ নতুন যাস নি অম্বুজা নিবাসে।

—হ্যাঁ, চেনে তো বটেই। অমিত ঘাড় বেঁকাল। আমায় বলল তুমি ক্যাপ্টেন গুহর নাতি না! পার্থকে বলল, তুমি তো আমাদের বালিগঞ্জ পেলেসের বিখ্যাত মানুষ —মিনিস্টারের ভাইপো। শোভেনকে বলল তুমি ডকটর গাঙ্গুলীর ছেলে তোমাকেও আমি চিনি।

—মানে বাজিয়ে দেখল আর কি।

কদিন যাচ্ছিস না তোরা তাই চেহারার গোলমাল হচ্ছিল—বুড়ো হয়ে রোজই চোখের তেজ কমে আসছে কিনা।

—মানে তোর দাদুর কেবল ভয়, রঞ্জুর চোখে চোখ রেখে পার্থ হাসল। এই বুঝি রঞ্জু রকবাজ বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশে গেল। তাই না?

অস্পষ্টভাবে রঞ্জু মাথা নাড়ল।

—হুঁ তারপর কি বলল দাদু!

—বলে কি বাড়ি নেই, দু ঘন্টা আগে সেলুনে চুল কাটতে গেছে, এখনো ফেরার নাম নেই রাস্কেলটার।

—সেলুন ফাঁকা পেলে তো চুল কাটব! মিনমিনে গলায় রঞ্জু বলল।

—কেন এক্ষুনি চুল তোর কাটার হয়েছে কি। অমিত তার থুতনিটা নাচাল। খুব একটা বাড়ে নি তো তোর চুল। রঞ্জুর মাথায় হাত বুলোল সে।

—কি বলব আক্ষেপের সুরে রঞ্জুর। বুড়োর মাথায় পোকা ঢুকেছে। এখুনি আমাকে নেড়া না করে ছাড়বে না।

—ঐ বুড়োটুড়োরা এমন বলেই, বলল আর তুইও কিনা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিস নেড়া হয়ে যেতে, কী ছেলে রে বাবা। শোভেন অবাক হবার চেহারা করল।

—তা এখন কোথায় চললি শুনি? পার্থ ভুরু কুঁচকালো।

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রঞ্জু। সিগারেট-বিড়ির দোকানটা কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল চারের দোকান ঘন্টা দুয়েকের মত এই সময়টায় বন্ধ থাকে সে জানে, কিন্তু সিগারেট-বিড়ির দোকান—

—কি হল, পার্থ এবার রঞ্জুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়। তার চোখ অনুসরণ করে রাস্তার ওপারে বিড়ি-সিগারেটের দোকানটা দেখল সে। ওই দোকানে যাচ্ছিস নাকি! একটা ফ্লেকটেক খাওয়াবি?

—না ভাই, এখন আমি বাড়ি যাব। মিথ্যা কথা বলতে হল রঞ্জুর। তাছাড়া আমার সঙ্গে পয়সাও নেই।

—ভ্যাট শোভেন ধমক লাগাল। রঞ্জুর পাঞ্জাবীর পকেটে চাপড় মারে। এই তো অনেক পয়সা ঝনঝন করছে রে।

—মাইরি, চুল কাটার পয়সা। রঞ্জু কুঁকড়ে যায়, করুণ চোখে তাকায়। দাদু টায় টায় হিসেব করে দিয়েছে।

—ছেড়ে দে শোভেন। পার্থ বিরক্ত হয়। তারপর রঞ্জুর চোখে চোখ রাখে। অনুকম্পার দৃষ্টি পার্থর। আমরা খাওয়াব। খাবি? রঞ্জুর কাঁধ ধরে সে ঝাঁকুনি দিল।

রঞ্জু হঠাৎ কথা বলে না। লজ্জা পায়। পার্থ দুদিন তাকে সিগারেট কিনে খাইয়েছে অস্বীকার করবে কেমন করে। শোভেন একদিন খাইয়েছে। অমিত অবশ্য আজও খাওয়ায় নি। কিন্তু এই পর্যন্ত রঞ্জু কাউকে একটা চারমিনারও খাওয়াতে পারে নি। এমন গোনাগুনতি পয়সা আনে সে বাড়ি থেকে।

—আয়। পার্থ তার হাত ধরে টানতে গেল। আমি আজ আবার তোকে খাওয়াব। গোলডফ্লেক খাবি?

—না ভাই রঞ্জু অনুনয়ের চোখে পার্থর মুখটা দেখল। ভিড়ের জন্য চুল কাটা হল না। এখন বাড়ি না ফিরলে দাদু আস্ত রাখবে না।

—ওফ! তোর দাদুই তোর বারোটা বাজিয়ে দেবে দেখছি। পার্থ বলল।

—আমি হলে এমন দাদুকে চা-কফির সঙ্গে খুব করে শিলপিং ট্যাবলেট খাইয়ে সারাক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখতাম।

—এই বয়সে বেশী ট্যাবলেট খাওয়ালে —অমিত হেসে ফেলল, বুড়োকে আর চোখ খুলতে হবে না।

২'টি ফসফোমিন টনিক...

ফসফোমিন আয়রন

মেয়েদের জন্যে আয়রন টনিক

ফসফোমিন আয়রন শরীরে আয়রন বাড়াবার এক অতিরিক্ত উপায় যা রক্তকে লাল করতে আর শরীরে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। প্রত্যেক দিন নিন মেয়েদের জন্যে তৈরী এক আয়রন টনিক—ফসফোমিন আয়রন।

ফসফোমিন ভিটামিন

পরিবারের সকলের জন্যে ভিটামিন টনিক

ফসফোমিন-এ আছে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন আর পুরো মাত্রায় মিসারোফস্‌ফেট্‌স যা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পরিবারের সকলকে সবল ও সুস্থ রাখতে ২'টি ফসফোমিন টনিক

ফসফোমিন টনিক খিদে বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যোগায় আর প্রফুল্ল করে তোলে।

(ই. আর স্কুইব ও সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক ব্যবহারকারী)

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS LTD. লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারক

Shilpi SC 8A/74 ben

—না, খুলত চোখ পার্থ ঠোঁট মুখ বেঁকাল। আমি তাই চাইছিলাম। এমন একটা দাদু সারাক্ষণ শকুনের মতো কাঁধে চেপে থাকবে, এদিক-ওদিক ঘাড় ফেরাতে দেবে না সিনেমায় যেতে পারবে না লুকিয়ে এক-আধটা সিগারেট খাওয়া চলবে না—ভাবা যায়! আমি হলে এমন দাদুকে ঠিক মেরে ফেলতাম, নয়তো নিজে একদিন সুইসাইড করতাম।

অসহায় টলটল চোখে রঞ্জু পার্থকে দেখছিল। তার বন্ধুদের মধ্যে পার্থই সবচেয়ে সুখী। সারাক্ষণ ডাকচাপ দিতে, চোখে চোখে রাখতে দাদুটাদু বলতে কেউ নেই ওর। কাকা মিনিস্টার ব্যস্ত মানুষ। বাবার প্ল্যাস্টিক গুড্‌সের কারখানা। ব্যস্ত মানুষ। অনেক পয়সা ওদের। বালিগঞ্জ প্লেসের এতটা জমি জুড়ে রাজবাড়ির মতন বিশাল বাড়ি। ওদিক দিয়ে লোকে হাঁটলেই হাঁ করে তাকিয়ে পার্থদের বাড়িটা দেখে।

—শোন, এবার শোভেন রঞ্জুর কাঁধে হাত রাখল। একটা দারুণ ইমপর্টেন্ট কথা আছে তোর সঙ্গে, তাই তোকে খুঁজছিলাম।

—সেটা পরে হবে, আগে ওকে জিজ্ঞেস কর শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা ও দেখতে চায় কিনা। বেশ রাগের সুর পার্থর যেন রঞ্জুর দিকে তার আর তাকাতে ইচ্ছে করছে না। শোভেনের সঙ্গে কথা বলছে।

—হ্যাঁ, শোন, রঞ্জুর কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল শোভেন। আমরা এখন নান্টুদার কাছে যাচ্ছি এই তো এখানেই, রাসবিহারীর মোড়ে থাকেন—খুব একটা দূরে যেতে হবে না। নান্টুদা ফাইন্যাল খেলার টিকিট জোগাড় করে দেবেন, ভীষণ হাত আছে। তুই যদি যাস চলে আয় মুখ না দেখলে নান্টুদা কিছুতেই একস্ট্রা টিকিট দেবেন না—মানে আমি পার্থ আর অমিত গেলে ঐ তিনখানা টিকিটই শুধু আদায় করা যাবে। বলে তোর জন্য বাড়তি টিকিট আনা যাবে না। সবাইকে একসঙ্গে যেতে হচ্ছে।

একটা ধিকধিকি উৎসাহের আগুন রঞ্জুর চোখে উঁকি দিয়ে তখনি আবার নিবে গেল। যেন ইচ্ছে করে নিবে যেতে দিল সে। সিগারেটের দোকানটা এখনও খোলা আছে। আড়চোখে ওদিকটা দেখে আর একবার সে মাথা ঝাঁকাল। —এখন হয় না ভীষণ বেলা হয়ে গেছে, দাদু.....

—হোপলেস, ছেড়ে দে শোভেন। নাক চোখ কুঁচকে পার্থ গজরাতে থাকে।—একটি ঘরকুনো ছেলে হয়েছেন আমাদের ফ্রেন্ড। ভাবতেও বিচ্ছিরি লাগে। আয় অমিত, আমরা হাঁটি। শোভেন চলে আয়।

পার্থ আর দাঁড়াল না। অমিতকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটে।

রঞ্জু দুজনের পিছনটা দেখে। পার্থর গায়ে অরেঞ্জ কালারের গেঞ্জি। অমিতের ব্রাউন সার্ট। দুপুরের রোদে দুটো রঙ ভীষণ ঝকমক করছে চোখে লাগে, যেন এক মিনিটের বেশী ওদিকে তাকান যায় না।

—শোন! শোভেন মিটিমিটি হাসে। রঞ্জু ওদিক থেকে এদিকে চোখ ফেরায়। শোভেন ওদের দুজনের পিছনটা আর একবার দেখে নিয়ে রঞ্জুর চোখে চোখ রাখল। —এবার তোকে ইমপর্টেন্ট খবরটা বলতে হয়। খুব সিক্রেট। কাউকে বলবি নে। এটা বলবার জন্যই পার্থ ও আমি সেই সকাল থেকে তোকে খুঁজছি। মাঝখানে অমিতটা জুটে গেল। ওর সামনে বলা যায় না। তাই কায়দা করে পার্থ এখন ওকে ডেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

—কি খবর? রঞ্জুর চোখ গোল হয়ে উঠল। তবে কি নান্টুদার কাছ থেকে শীল্ড খেলার টিকিট আনার ব্যাপারটা বড় নয়, ভাবল সে, তার চেয়েও বড় জরুরী খবর শোভেন নিয়ে এসেছে! শোভেনের আপন পিসতুতো দাদা এই নান্টুদা। রাসবিহারী এভিনুর মোড়ে থাকেন। এককালে মোহনবাগান ক্লাবের কোচ ছিলেন। গত বছর তাদের চার বন্ধুকে লীগের খেলার চারখানা টিকিট দিয়েছিলেন। কি খবর শুনি? বার বার ইমপর্টেন্ট বলছিস। ঢোক গিলে ও সেই সঙ্গে একটু ফ্যাকাসে হয়ে উঠে রঞ্জু শোভেনকে দেখল।

—টুবলি পার্থকে চিঠি লিখেছে। শোভেন আর হাসে না। নীল খামে করে এত বড় এক চিঠি।

—টুবলি! আকাশ থেকে পড়ার চেহারা হল রঞ্জুর। মানে অমিতের সেকেন্ড বোনটা। ফিসফিসিয়ে বলল সে।

—হ্যাঁ রে। শোভেন ভেংচি কাটল। এমন ক্যাবলাপনা করিস না তুই এক এক সময়। যেন ফার্ণ রোডের টুবলিকে তুই কোনকালে দেখিস নি। চিনিস না।

—বাঃ চিনব না কেন! রঞ্জু আবার একটা ঢোক গিলল। কবে দিয়েছে চিঠি! কি লিখেছে?

—কাল বিকেলে। কি আবার লিখবে! লভ-লেটার লিখতে গিয়ে মেয়েরা কি লেখে জানিস না!

না, সে জানে না, কোনো মেয়ে তাকে আজও চিঠি লেখেনি। অসহায় চোখে রঞ্জু শোভেনকে দেখতে লাগল।

—সাবধান অমিতকে কিন্তু বলবিনে! শোভেন চোখ পাকাল।

—ধেৎ, ওকে বলব কেন। রঞ্জু মাথা নাড়ল। ওর আপন বোন যে।

—দু পৃষ্ঠা জুড়ে চিঠি। শোভেন দুটি আঙুল তুলে দেখাল। অনেক কিছু লিখেছে। পার্থ আমাকে সবটা খুলে দেখিয়েছে। ব্যাস্—কেমন মেয়ে, পার্থকে নিয়ে ইলোপ করতে চাইছে। বলছে আমরা দূরে কোথাও চলে যাব। সেখানে গিয়ে বিয়ে করব।

—ইস কী বিচ্ছিরি! রঞ্জু নাক সিঁটকাল। ভীষণ বাজে মেয়ে।

—সুপ্ল্যানাডের একটা মিষ্টির দোকানে উঁহু, কে সি দাশ নয়, এদিকটায় এলিটের পাশে সুইট হোম বলে একটা বেশ বড় নতুন দোকান হয়েছে, গত শুক্রবার পার্থ এলিটে একটা হিন্দী বই দেখে সবে বেরিয়েছে, টুবলি বুঝি ওদিকটায় ঘুরতে গিয়েছিল—ব্যাস্ রাস্তায় পার্থর সঙ্গে দেখা—দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে 'পার্থদা খাব।' পার্থ ওকে সুইট হোমে নিয়ে গিয়ে প্রায় সাত আট টাকা খরচ করে খাইয়ে দেয়। পয়সার তো অভাব নেই তার। আর টুবলিও খেতে আরম্ভ করলে থামতে চায় না।

—এত খাইয়েছিল বলেই ও আস্কারা পেয়েছে, আর পার্থকেও দুম করে চিঠি লিখতে সাহস পেয়েছে। রঞ্জু বলল।

—হুঁ, পার্থও তাই বলছে। শোভেন ঘাড় নাড়ল। এখন মুস্কিল কি ডোভার লেনের একটি মেয়ে—তুই দেখেছিস? শ্যামলা রং একটু রোগা, পিংকু নাম, ভাল নাম বুঝি বন্দনা—ও-ই হল পার্থর আসল গার্ল-ফ্রেন্ড। কাজেই এখন টুবলির চিঠির কি জবাব দেবে পার্থ ভেবে পাচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে কনসাল্ট করতে চাইছে আমার সঙ্গে তোর সঙ্গে।

—চিঠির জবাব না দিলেই হল। রঞ্জু প্রায় চোখ বুজে বলল, পার্থ ওটা ছিঁড়ে ফেলে দেবে, কি পুড়িয়ে ফেলবে—ব্যাস সেখানেই সব ফুরিয়ে যায়। এই নিয়ে এত ভাবনার কি আছে।

—হুঁ, তা পারে, পার্থও তাই বলছিল, কিন্তু চট করে তেমন কিছু সে করতেও যে পাচ্ছে না।

—কেন?

—বলছে গায়ের রঙটা ওর আগুনের মতন, হেলথটাও দুর্দান্ত ভাল। সেদিক থেকে পিংকু প্রায় কিছুই নয়। সেদিন মিষ্টির দোকানে খুব কাছাকাছি হয়ে বসেছিল তো দুজন, যতবার টুবলি কথা বলছিল কি হাসছিল কি বাদশাভোগ রাজভোগ ভেঙে মুখে পুরছিল ওর গালে চিবুকের দুপাশে গলার নিচে কাঁধের কাছে আঙুরের মতন বড় বড় ডিম্পল তৈরি হচ্ছিল, তৈরি হচ্ছিল ভাঙছিল আবার তৈরি হচ্ছিল।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস.ও
ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য · মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

পুনশ্চ

বিগত সংখ্যার 'পুনশ্চ'র মধ্যে আমরা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ও সেই সঙ্গে ৫ম বর্ষের (১২৮৫, চৈত্র) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা থেকে তাঁর 'তৈলদান' নামক একটি নিবন্ধ উদ্ধৃত করে দিই। এই ধরনের বহু সরস প্রবন্ধ যেমন তিনি লিখেছিলেন, তেমনি শিক্ষা সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে এবং ঐতিহাসিক বিষয় সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান নিবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন। উক্ত নিবন্ধগুলির মধ্যে 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত কলিকাতা সম্বন্ধে একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ এখানে আমরা প্রকাশ করলাম। নিবন্ধটির নাম 'কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে'। যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, সে সময় থেকে বর্তমান সময়ের কথা ধরলে, এর সঙ্গে আরও ৯২ বছর যোগ দিতে হয়।

।। কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে ।।

অদ্য মহানগরী কলিকাতার কতকগুলি প্রাচীন কথা পাঠকদিগকে উপহার দিব। যাহা বলিব, তাহা হয় প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি, না হয় কোন নব্য বা প্রাচীন গ্রন্থে পড়িয়াছি, নিজে তাহার সত্যতা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, সুতরাং কিছু কিছু ভুল হইবার সম্ভাবনা।...

এই যে কলিকাতা নামক স্থান এক্ষণে নানা অট্টালিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছেন, 'সিটি অফ প্যালেসেস' নাম দিলেও যথাযথ বর্ণনা হয় না, ভাবুন দেখি দুইশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৬৮৩ সালে ইহার কিরূপ অবস্থা ছিল। বাগবাজার হইতে খিদিরপুর পর্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগে তিনটি ছোট ছোট গ্রাম ছিল। যেখানে এইক্ষণে ফোর্ট উইলিয়ম বিরাজমান, সেখানে গোবিন্দপুর, লালদীঘি ও গঙ্গার মাঝখানে কলিকাতা, হাটখোলার উত্তর সমস্ত সুতানুটী। কলিকাতা বলিলে যেমন ঐ ক্ষুদ্র গ্রামটি বুঝাইত তেমনি একটি বৃহৎ পরগণাও বুঝাইত। সুতানুটী বলিলে একটি তালুকও বুঝাইত। একটি রাস্তা দিয়া এই তিনটি গ্রামে যাওয়া যাইত। সেইটি এখন চিৎপুর রোড। প্রতি গ্রামে দুই ঘর, এক ঘর করিয়া ভদ্রলোক, ঘর কত জেলিয়া, আর কত সোনারবেণে মাত্র বাস করিত। চিৎপুর রোডের অল্প দূরেই জলা-জঙ্গল ছিল। এমন কি, সময়ে সময়ে বাঘেরও দৌরাত্ম্য হইত। সেইরূপ গ্রাম এক্ষণে গঙ্গার ধারে দেখা যায় না। কোঠা-বাড়ী এক-একটা ছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু দোতলা কেবারেই ছিল না। কারণ, তখন নবাবের হুকুম ব্যতিরেকে কেহই দোতলা বাড়ী করিতে পারিত না এবং নবাবের হুকুম আনাইতে পারে, এইরূপ লোক এ তিন গ্রামে না থাকাই সম্ভব। ইহার মধ্যে আবার শুনিয়াছি, গোবিন্দপুর নূতন পত্তন। আন্দুলের দত্তচৌধুরী-বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি ঐ গ্রাম পত্তন করেন এবং এই হইতেই হাটখোলার দত্তদিগের উৎপত্তি হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হাটখোলার দত্তেরা হাটখোলায় আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ। সুতানুটীতে অনেক দিন হইতে একটি হাট ছিল, কিন্তু সে হাট কোন জন কর্তৃক স্থাপিত, জানিবার কোন উপায় নাই।

কলিকাতার নিকটে কালীঘাট বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ছিল, এবং চিৎপুর কালীর নিকট নরবলি হইত বলিয়া বহুকাল প্রসিদ্ধ ছিল। শুনিয়াছি, ইংরাজেরা যখন প্রথম মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, তখন তাঁহারা হাটখোলার ঘাটে জাহাজ লাগাইয়া একজন ধোবাসিয়া চাহিয়া পাঠান। হাটের লোকে ধোবাসিয়ার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ঐ হাটখোলার বসাকদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। বসাকেরা একজন ধোবা পাঠাইয়া দেন। তদবধি ধোবারা অনেকদিন ইংরাজদের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। তদবধি সেকালে কান্ত ধোবা বলিয়া একজন ইংরাজের অনুগ্রহে বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্যের সূত্রপাত হইতেই সুতানুটীতে ইংরাজদিগের কিছু না কিছু করিবার ছিল, কারণ নিজ হুগলীতে যখন ইংরাজদের খুব কারবার চলে, তখনও সুতানুটীর উপর তাঁহাদের বিলক্ষণ টান ছিল দেখা যায়। বোধহয়, চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের যেমন বরাহনগরে ছোটখাট একটি কুঠী ছিল, সুতানুটীতেও ইংরাজদের সেইরূপ অল্পবিস্তর কিছু করিবার ছিল। যখন মোগলদের সহিত যুদ্ধে ইংরাজকে হুগলীর ব্যবসা ফেলিয়া পলায়ন করিতে হয়, তখন তাঁহারা দিনকতক চানকে ও দিনকতক সুতানুটীতে ছিলেন। যাহা হউক, ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তাঁহারা কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই কয়েকখানি গ্রামের জমিদারী ক্রয় করিতে অনুমতি পান এবং ঐ সময়ে তাঁহারা লালদীঘি ও গঙ্গার মধ্যে পুরান কেল্লাটি নির্মাণ করেন এবং তদবধি কলিকাতায় তাঁহাদের ভরাভর হয়। তদবধি চার্নক সাহেব কলিকাতার সংস্থাপনকর্তা এবং তাঁহার সময় হইতেই ইংরাজদের চানকের বাগান ও আলীপুরের বেলভেডিয়ার উৎপত্তি। জব চার্নক সাহেবকে এদেশীয় লোকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তিনি এদেশীয় একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছিলেন। কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ গোরস্থানে তাঁহার গোর অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়।

১৬৯৮ সাল হইতে ১৭৫৭ পর্যন্ত কলিকাতার প্রথম যুগ বলিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা একটি সামান্য গ্রাম হইতে নগরের আকার ধারণ করে। ফরাসীদের হাতে যেমন ফরাসডাঙ্গা, ওলন্দাজদের হাতে যেমন চুঁচুড়া, দিনেমারদের হাতে যেমন শ্রীরামপুর একটি ছোটখাট সহর, ইংরাজদের হাতেও কলিকাতা তেমনি ছোটখাট সহর হইয়াছিল। পূর্বোক্ত চারিটি সহরেরই এই যুগের মধ্যে উৎপত্তি, তন্মধ্যে ফরাসডাঙ্গাই কিছু বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, কারণ ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ইউরোপ হইতে এ যুগের মধ্যে কেহ আর আইসেন নাই।

এই যুগে কলিকাতায় বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী লোক আসিয়া বাস করে এবং বহুসংখ্যক অট্টালিকা নির্মিত ও বাজার সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে চিৎপুর রোডের পশ্চিমে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাস হয়, এবং পূর্বে বড় বড় বাগান প্রস্তুত আরম্ভ হয়। জলা ও জঙ্গল কাটিয়া বাগান প্রস্তুত করা বড় সহজ ছিল না, প্রায়ই জলার মধ্যস্থলে পুষ্করিণী কাটিয়া সেই মাটি চারিদিকে ছড়াইয়া বাগানের জন্য জমি বাহির করিতে হইত।...এই সময়ের দুইটি বাগানের কিছু ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে—একটির নাম হালসী বাগান ও অপরটির নাম উমীচাঁদের বাগান। হালসীবাগান গোবিন্দরাম মিত্রের বাগান, উহা ইংরাজ জমিদারীর বাহিরে, কিন্তু গোবিন্দরাম মিত্রই বহুকাল অবধি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর ব্লাক জমিদার ছিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে যখন মহারাষ্ট্রখাত খনন হয়, তখন গোবিন্দরাম মিত্রের অনুরোধে ইংরাজেরা হালসীবাগান খাতভুক্ত করিয়া লন। মহারাষ্ট্রখাত এখনও কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির সীমা। অনেকে মনে করেন, বাগবাজারের খালই বুঝি মহারাষ্ট্রখাত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বাগবাজারের খালের একটু দক্ষিণে একটি খানা আছে, সেই খানা ক্রমে ক্রমে আসিয়া সারকিউলার রোডের পূর্বদিকের খানার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। এইখানা বরাবর বাগবাজারের খালের মুখ হইতে শিয়ালদহ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রখাত নামে অভিহিত ছিল। মহারাষ্ট্রখাত কলিকাতার চতুর্দিকে কখনই ছিল না। মহারাষ্ট্রখাত শেষ হইবার পরেই বহুবাজারের রাস্তা। ঐ রাস্তা তৎকালেও বিদ্যমান ছিল। উহা দ্বারা পূর্বদিক হইতে আসিয়া একেবারে পুরান কেল্লায় উঠা যাইত।...

তৎকালেও চৌরঙ্গি নামক স্থান ছিল এবং সেই স্থানেই সাহেবরা বাস করিতেন। কিন্তু সে চৌরঙ্গির সহিত এখনকার চৌরঙ্গির তুলনা হয় না। তখনকার চৌরঙ্গিতেও জলা ও জঙ্গল ছিল। তখন মহারাষ্ট্রখাতের মধ্যে অনেক জায়গায় চাষবাস হইত। এমন কি, ১৭৭৮ সালে যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস মহারাজা নবকৃষ্ণকে সুতানুটীর তালুকদারী প্রদান করেন, তখনও ঐ তালুকের মধ্যে অনেক জায়গায় চাষবাস হইত, কারণ, ঐ দলীলে চাষবাসের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

(আগামীবার সমাপ্য)

—ঋপক

বিজ্ঞানের কথা

আমাদের নিশ্বাসের বাতাস কি বিশুদ্ধ ?

বাতাসে এমন সমস্ত উপকরণ এমন প্রচুর পরিমাণে থাকতে পারে যা মানুষ ও তার পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে বাতাস দূষিত হয়ে গিয়েছে। দূষিত বাতাস দূষিত জলের মতোই জনস্বাস্থ্য বিপন্ন করে। আমাদের দেশে দূষিত জলের সমস্যা নিয়ে অনেক কথাবার্তা শোনা যায় অনেক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়ে থাকে. কিন্তু দূষিত বাতাসের সমস্যা এখনো পর্যন্ত তেমন আলোচিত নয়। অথচ ওয়াকিবহাল বিজ্ঞানীদের ধারণা ভারতে শিল্পায়নের সংগে সংগে বিশেষ করে কয়েকটি বড়ো শহরে বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছে এবং তা যাতে না হয় সেজন্য কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনেরও প্রয়োজন আছে। 'সায়েন্স টুডে' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা তুলতে চাই।

*

বাতাস আমরা খাই না। খাই খাদ্য, পান করি জল। কিন্তু প্রশ্বাসের সংগে বাতাসও আমরা শরীরের মধ্যে টেনে নিই। এমনিভাবে যা-কিছু আমরা শরীরের মধ্যে গ্রহণ করি—কি খাদ্য, কি পানীয়, কি বাতাস— পরিমাণের দিক থেকে বিচার করলে তাদের মধ্যে বাতাসের স্থানই কিন্তু সবচেয়ে ওপরে। স্পষ্ট হিসেবের মধ্যে আসা যাক। সারা দিনে-রাতে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিই মোট প্রায় ২২০০০ বার (তার মানে ঘন্টায় প্রায় ৯১৭ বার, মিনিটে প্রায় ১৫ বার বা মোটামুটি প্রতি চার সেকেন্ডে একবার)। আর সারা দিনে-রাতে শরীরের মধ্যে বাতাস টেনে নিই প্রায় ১৬ কেজি। ষোল কিলোগ্রাম! সারা দিনে-রাতে আমরা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি এই পরিমাণের চেয়ে কম। কাজেই বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আমাদের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবিষ্ট হয় যে-বাতাস তার বিশুদ্ধতা বজায় রাখাটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

দুঃখের কথা, আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সম্পর্কে তেমন সচেতনতা তৈরি হয়নি।

*

বাতাস দূষিত হয় কিসে? যদি বাতাসের সংগে মিশে থাকা ধুলো ও গ্যাসের পরিমাণ ক্ষতিকর রকমের বেশি হয়ে যায়। ব্যাপারটাকে একটু বিশদ করা যাক—বাতাসকে দূষিত করে তোলে যেসব গ্যাস ও ধুলো সেগুলো কী? কোথা থেকে আসে? মানুষের শরীরে কী ক্ষতি করে?

প্রথমে গ্যাসের কথা। বাতাসের সংগে মিশে থাকা ক্ষতিকর গ্যাস হতে পারে সালফার ডাই-অকসাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড, হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড, কার্সিনোজেনিক (যা থেকে ক্যানসার রোগ হতে পারে) হাইড্রোকার্বণ, কার্বণ মনোকসাইড ও অকসিডেন্ট।

সালফার ডাই-অকসাইডের উৎস সাধারণত হয়ে থাকে পাওয়ার হাউস, সালফিউরিক অ্যাসিডের প্ল্যান্ট, পেট্রোলিয়াম শিল্প, তৈল পরিশোধন ও গৃহস্থবাড়ির ব্যবহৃত জ্বালানী। বাতাসের সংগে এই গ্যাস শরীরে প্রবেশ করলে মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসে, গলা ও চোখ জ্বালা করে, শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগ দেখা দেয়।

হাইড্রোজেন সালফাইডের উৎস রেয়ন প্ল্যান্ট, পেট্রোলিয়াম শিল্প, ভূগর্ভস্থ নর্দমার মল, ট্যানিং শিল্প, রং উৎপাদন তৈল পরিশোধন। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—শ্বাসনালীর জ্বালাযন্ত্রণা ও বিবিধ পীড়া।

নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইডের উৎস—অ্যাসিড উৎপাদন, মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া, বিস্ফোরক পদার্থের কারখানা। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—জ্বালাযন্ত্রণা, ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের পীড়া।

হাইড্রোজেন ফ্লুরাইডের উৎস—সার শিল্প, রসায়ন শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—হাড়ের অসুখ, দাঁতের অসুখ, শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুখ।

কার্সিনোজেনিক হাইড্রোকার্বণের উৎস—জৈব রসায়ন শিল্প, যানবাহন ও মোটরগাড়ি। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—ক্যানসার।

কার্বণ মনোকসাইডের উৎস—জ্বালানী গ্যাস, মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত গ্যাস, খনি, ব্লাস্ট ফারনেস। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—বিষক্রিয়া, দুর্ঘটনা।

অকসিডেন্টের উৎস—বিশেষ পদ্ধতিতে জৈব উপকরণ থেকে উৎপন্ন ফটোরাসায়নিক সামগ্রী। মানুষের ওপরে ক্রিয়া—ফুসফুসের জ্বালাযন্ত্রণা।

অতঃপর ধুলোর কথা। ধুলো আসে খনি ও খাদ থেকে, পটারি ও সেরামিক কারখানা থেকে, কারখানার স্তূপ থেকে, পাওয়ার স্টেশন থেকে। বাতাসের সংগে এই ধুলো শরীরে প্রবেশ করলে শ্বাসপ্রশ্বাসের নানারকম পীড়া দেখা দেয়। ধাতুর গুঁড়োকেও এক ধরনের ধুলো বলা যেতে পারে, বাতাসের সংগে এই ধুলো শরীরে প্রবেশ করার ফল বিষক্রিয়া।

*

বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস ও ধুলোর যে বিবরণ পাওয়া গেল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে বাতাস দূষিত হয় শিল্পের প্রসার হওয়ার ফলে এবং একই এলাকায় একই সংগে অনেক শিল্প গড়ে ওঠার ফলে। শিল্পায়নের দিক থেকে ভারতের চারটি বড়ো শহরের নাম এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে—কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, কানপুর। এই শহরগুলোতে কল-কারখানা যেন জট পাকিয়ে আছে, ফলে অবস্থা প্রায় দম বন্ধ হওয়ার মতো আর শ্বাস-প্রশ্বাসের পীড়া প্রচুর। আর বিশেষ করে শীতকালে শহরগুলোতে ধোঁয়াশার (ফগ) দাপটে দারুন এক অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়।

এই চারটি শহরে বাতাসের গুণাগুণ পরখ করে দেখার দীর্ঘমেয়াদী এক কর্মসূচীর প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তারই সূচনা হিসেবে নাগপুরের কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে (সম্প্রতি যার নাম হয়েছে জাতীয় পরিবেশ ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণা ইনস্টিটিউট) এই চারটি শহরে কয়েকটি নির্বাচিত এলাকায় বাতাসের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়কাল ছিল ১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ। বাতাসে মিশে থাকে যে-সব ক্ষতিকর গ্যাস ও বাতাসে ভেসে বেড়ায় সেসব কণিকা সেগুলোর পরিমাপ নিয়ে যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছে তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

রাণীধূপ
প্রস্তুত করক-কাকার প্রডাক্টস

বোম্বাইয়ে সারা বছর ধরে অনুকূল বায়ুপ্রবাহ থাকে তবে তাপমাত্রার ওঠানামা যথেষ্ট। কল-কারখানা সবচেয়ে বেশি জট পাকিয়ে আছে যে চেম্বুর-ট্রম্বে এলাকায়, সেখানেই বাতাসও সবচেয়ে দূষিত—শহরের বাকি অংশের তুলনায় ছগুণ বেশি। গোটা শহরকে ধরলে বাতাসে সালফার ডাই-অকসাইডের পরিমাণ খুব বেশি নয়, কিন্তু টুকরো টুকরো অংশে কোথাও কোথাও অত্যধিক। অন্য তিনটি শহর সম্পর্কেও একই কথা।

সম্ভবত সামুদ্রিক পরিবেশ ও ভূগর্ভস্থ নর্দমার বোঝাই মলের দরুন বোম্বাইয়ের বাতাসে সালফাইডের মাত্রা কিছুটা বেশি।

বাতাসে ভেসে থাকা কণিকা ও ধুলোর মাত্রা এই চারটি শহরেই বিশ্বের অন্য যে-কোনো শহরের চেয়ে বেশি। পশ্চিমের বড়ো বড়ো শহরে সাধারণত এই মাত্রা হয়ে থাকে প্রতি ঘনমিটারে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম। আর বোম্বাইয়ে প্রতি ঘনমিটারে ২৩৮ মাইক্রোগ্রাম। দিল্লীতে প্রতি ঘনমিটারে ৭০০ মাইক্রোগ্রাম।

দিল্লীতে ধুলোর মাত্রা যেমন সবচেয়ে বেশি তেমনি তাপমাত্রার ওঠানামাও অনেক ঘনঘন, বিশেষ করে শীতের মাসগুলিতে। ফলে বাতাস দূষিত হওয়ার কারণগুলো আরো জোরালো হয়ে উঠতে পারে। দিল্লীর বাতাসে কোথাও কোথাও সালফার ডাই-অকসাইডের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত।

তুলনাগত বিচারে এই চারটি শহরের মধ্যে বাতাস সবচেয়ে দূষিত কলকাতায়। কলকাতার বায়ুপ্রবাহের বেগ অপেক্ষাকৃত কম, তাপমাত্রার ওঠানামা যথেষ্ট ঘনঘন। সালফার ডাই-অকসাইডের মাত্রা বিশেষ করে বিকেল ও সন্ধ্যার দিকে যথেষ্ট বেশি। মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত কার্বণ মনোক-সাইডের মাত্রা কলকাতার বাতাসে কতখানি তা বিশেষভাবে দেখা হয়েছে। তা হচ্ছে প্রতি শ লক্ষে ৩৫ ভাগ (যানবাহনের চলাচল এখন সবচেয়ে বেশি)। এদিক থেকে কল-কাতা রয়েছে যানবাহন চলাচল খুবই বেশি শহরের এমন সমস্ত শহরের সমস্থানে।

কলকাতা শহরের বাতাসে ধুলোর পরি-মাণ প্রতি ঘনমিটারে ৫৩০ মাইক্রোগ্রাম। কলকাতায় ধুলোর ঝড় ওঠে না, কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কাঁচা রাস্তায় যান-হন চলাচলের দরুণ এই ধুলোর উৎপত্তি।

আবহাওয়ার দিক থেকে কানপুর অনেকটা দিল্লীর মতো। বাতাস দূষিত হওয়ার কারণগুলোও এই দুই শহরে মোটা-মুটি একই রকম।

১৯৬৯ সালের অকটোবর থেকে উল্লি-খিত সংস্থাটি ভারতের নয়টি শহরে বাতাসের গুণাগুণ অবিরাম পরখ করার জন্য পর্য-বেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই নয়টি শহর হচ্ছে আমেদাবাদ, বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ জয়পুর, কানপুর, মাদ্রাজ ও নাগপুর।

এই নয়টি শহরের বাতাসে কী পরিমাণ সালফার ডাই-অকসাইড ও ভাসমান কণিকা আছে তার একটি পরিমাপ (১৯৭০ সালের) পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্রগুলো থেকে পাওয়া গিয়েছে।

সালফার ডাই-অকসাইডের মাত্রা (প্রতি ঘনমিটারে মাইক্রোগ্রাম): ১০-৬৬ (আমেদা-বাদ) ৪৭-১১ (বোম্বাই) ৩২-৮৮ (কল-কাতা), ৪১-৫৩ (দিল্লী), ৫-০৬ (হায়দ্রাবাদ) ৪-১৫ (জয়পুর), ১৫-৯৭ (কানপুর), ৮-৩৮ (মাদ্রাজ) ও ৭-৭১ (নাগপুর)।

বাতাসে ভাসমান কণিকার মাত্রা (প্রতি ঘনমিটারে মাইক্রোগ্রাম) : যথাক্রমে ৩০৬-৬, ২৫০-৮, ৩৪০-৭, ৬০১-১, ১৪৬-২ ৪৯৬-১, ৫৪৩-৫, ১০০-৯ ও ২৬১-৬।

আমাদের দেশে শহরগুলোর রাস্তায় যেসব মোটরগাড়ি চলে তার মধ্যে বেশ কিছু খুবই খারাপ অবস্থার। এই সমস্ত খারাপ অবস্থার মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত গ্যাসে কার্বণ মনোকসাইডের মাত্রাও হয়ে থাকে খুবই বেশি। মাপ নিয়ে দেখা গিয়েছে কখনো কখনো এই মাত্রা ৫-৫ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন মোটরগাড়ির নির্ধারিত মাত্রা হচ্ছে মাত্র ১-৫ শতাংশ।

কলকাতায় মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত গ্যাসে বাতাস যতোখানি দূষিত করা হয় তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে নিউইয়র্ক, শিকাগো, লণ্ডন, ওয়াশিংটন ইত্যাদি শহরের সঙ্গে—যদিও শেষোক্ত শহরগুলোতে মোটর-গাড়ির চলাচল কলকাতার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এদিক থেকে কলকাতার অবস্থা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মোটরগাড়ি থেকে নিঃসৃত গ্যাসে বাতাস দূষিত হলে তা ক্যানসার রোগের কারণ হতে পারে। কলকাতার রাস্তায় একমাত্র স্টেটবাসগুলো যে পরিমাণ ধোঁয়া ও কালি ছাড়তে ছাড়তে চলে তার সঙ্গে কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যে ক্যানসার রোগীর অনুপাত কষলে কিছু একটা সম্পর্ক বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কলকাতার মতো শহরের পক্ষে আরো মুশকিল, শহরের পরিকল্পনাহীন যথেচ্ছ বাড়বৃদ্ধি। এখানে বসত-এলাকার পাশেই গড়ে উঠেছে এমন সব কলকারখানা যার চিমনি থেকে বিষাক্ত গ্যাস নিঃসৃত হয়। অথচ কলকারখানা থেকে বসত-এলাকা অন্ততপক্ষে ৩০০ থেকে ৬০০ মিটার দূরে থাকা উচিত। অবস্থা দেখে মনে হয়, গোটা শহরটাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারলে তবেই একমাত্র এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

তবে আশার কথা, কলকাতা নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা মনে করেন এই দুরূহ-তম ও জটিলতম অবস্থা থেকে কলকাতার ও ভারতের অন্য যে কোনো শহরের মুক্তি সম্ভব। সেজন্য অবশ্যই চাই কড়াকড়ি আইন ও সুপরিকল্পিত পুনর্নির্মাণকার্য।

ঘর ঠাণ্ডা করার যন্ত্র

ঘরের বাতাস দূষিত করে

যাকে বলা হয় এয়ার-কণ্ডিশনার, বা বাতাস ঠাণ্ডা করার যন্ত্র সেটি ঘরে বসিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে আরামের নিশ্বাস নিতে নিতে এমন ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক যে দরজা-জানলা-আঁটা বাতানুকূল ঘরের বাতাস বুঝি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ। কথাটা ঠিক নয়। কানাডার দুই বিজ্ঞানী নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, এয়ার-কণ্ডিশনার বসানো ঘরের বাতাসে অ্যালুমিনিয়মের গুঁড়ো ভেসে বেড়ায়। এবং এই গুঁড়োর মাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিশেষ পীড়ার কারণ হতে পারে।

এয়ার-কণ্ডিশনার যন্ত্র তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়মে, এই কারণে যে অ্যালু-মিনিয়ম মরচেরোধী। তার ওপরে বাতাসের সংস্পর্শে এসে এই অ্যালুমিনিয়মের উপরেও একটা অকসাইড আস্তরণ পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেভাবেই হোক, এয়ার-কণ্ডিশনার থেকে নিঃসৃত বাতাসের সঙ্গে অ্যালুমিনি-য়মের ক্রিয়া ঘটে যায় এবং গুঁড়ো গুঁড়ো অ্যালুমিনিয়ম বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

—অয়স্কান্ত

মরিয়মকে অবাক করে ব্যাপারগুলো একে একে ঘটছিল; সংসারের হঠাৎ এ পরিবর্তন মরিয়মের অকল্পনীয়। মরিয়ম তো সংসারে ব্যাপার-স্যাপার ভালো করেই জানে, সেইতো ধেনু মোল্লার বড় মেয়ে আর মা-মরা সংসারে বড় মেয়েরা সংসার সম্বন্ধে একটু বেশী জানে।

মা ক' বছর হয় মারা গেছেন, ঠিক সে জানে না। তবে মার মুখ আজকাল স্বপ্নে সে এক এক রাতে এক-এক ধরনের দেখে। সঠিক কোনটি তার মার মুখ মরিয়ম ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

সংসারে নানা কাজ থেকে দুপুরে একটু অবসর পেলেই ভাবনার ঘোড়সাওয়ার তাকে ঝাপটে ধরে যেন মেঘে-মেঘে ভেসে চলে ঐ দুপুরবেলার অবসরে সে নানাকথা ভাবে, কখনো ভেবে আনন্দ লাগে, কখনো দুঃখ পায় কখনো আবার অন্য কথা ফেলে মার কথা ভাবতে তার ভীষণ ইচ্ছে হয়, মা'কে ভাবতে ভালো লাগে, তখন ভাবনার সঙ্গে ভাবনা ট্রেনের কামরার মত জুড়ে জুড়ে অনেকদূর পর্যন্ত চলে যায়। তবু কিন্তু তার ভালো করে মনে পড়ে না মায়ের মুখের আদল শুধু মনে পড়ে কোলাহল পাড়ার লোকদের জটলা।

বড়ভাইয়া নাকি তখন বেঁচে ছিল, সে ট্রাক একসিডেন্ট করে মারা যায় সেই ট্রাকটা চালাতো। ভাইয়া ট্রাকে করে হাসপাতাল থেকে মার মরা দেহ নিয়ে ফিরতে পাড়ার লোকরা এসে জড় হয়েছিল।

মরিয়ম অনেকের মুখে শুনেছে, মা নাকি খুব সুন্দরী ছিল সে নাকি মা'র মতোই হয়েছে। কিন্তু সে তো আজকাল কিছুতেই মা'র মুখটা স্মরণ করতে পারে না। মাকে ভাবতে গেলে মনে পড়ে কালো ধুমসো ট্রাকের কথা, আর অনেক লোকের জটলা-কোলাহল।

পুটির মা একদিন চুপিচুপি তাকে বলেছিল, মা নাকি ঘরেই মরে গিয়েছিল বড়ভাইয়া তবু সবার কথা অগ্রাহ্য করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সংসারের অভাব আর বাপজানের জ্বালাতনে তার মা নাকি আত্মহত্যা করেছিল। সংসারের অভাব অনটনের জন্য আত্মহত্যা করতে হয় তাদেরকে ফেলে ওমন করে মরে যেতে হয়। মা'র উপর মাঝে মাঝে তার ভীষণ রাগ হয়।

মা মরার পর ভাইয়া নাকি কেমন হয়ে পড়েছিল, সব কিছু যেন অবচেতনভাবে করছে, আসলে কিছুতেই যেন তার খেয়াল নেই। মা'র বড় আশা ছিল ছেলেকে মানুষ করার অথচ ভাইয়া পড়া-লেখা ছেড়ে বখে গেলো। কয়েকদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে ঘরে ফিরতে মা কিছু বল্লেই বিশ্রী গালাগাল দিত। মরার কিছুদিন আগে মা নাকি শুনেছিল ভাইয়া রহিম মুন্সির ড্রাইভার ছেলেটির সঙ্গে মদ খায়। সেদিন ভাইয়া ফিরতে মা ভীষণ রেগে তাকে চড় মারতে গেলে ভাইয়া ঢুল-ঢুল চোখে মার হাত মুচড়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে ছিল—হারামজাদী তুই আমার মা-না, তোর বাপের খাই না, তোর দাদার খাই না তুই কইবার ক্যারে, আমার যা ইচ্ছা করুম।

সেদিন থেকে মা নাকি ভাইয়ার সঙ্গে আর কথা বলতো না মরবার আগে পর্যন্ত বলেনি।

মা মরার পর ভাইয়া কাঁদেনি, ভাইয়ার চোখে নাকি কেউ জল দেখেনি, তবে পাগলের মত দৌড়-ঝাঁপ করেছে আর বার-বার কফিনের কাপড় সরিয়ে মার বুজে থাকা চোখের পাপড়ি হাত দিয়ে মেলে ফ্যাস-ফ্যাসে ভাঙ্গা গলায় বলেছে—মা মা, তুমি রাগ কইরো না, আমি তোমার পোলা, মা মা, ও মা, আমি তোমার পোলা।

তার কিছুদিন পরই ভাইয়া ট্রাক একসিডেন্ট করে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যায়। মরার আগেও নাকি রক্তাক্ত ঠোঁটে বিড়-বিড় করে বলছিল—মা, মা ও মা, আমি তোমার পোলা, তুমি রাগ কইরো না।

মা ভাইয়া মরার পর বেশ অনেক দিন গড়িয়েছে। তার বয়সও বেড়েছে, তেমনি অভাব-অনটন আগের চেয়ে তাদের সংসারে আরো শক্তভাবে পেঁচিয়ে ধরেছে। সংসারের এই অভাব-অনটনে মরিয়মও মাঝে-মধ্যে অসহ্য হয়ে উঠে কিন্তু মা'র কথা মনে পড়তে ভয় হয়, শত অভাবে ও নিজেকে সামলে নেয়, ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে উপোষ করে তবু মরার কথা চিন্তে করে না সে কথা ভাবলেই মা'র মরার কথা মনে পড়ে, ভয় হয়।

কিন্তু হঠাৎ দেশে যুদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গে বাপজানের সংসারে পরিবর্তন দেখে বার-বার সে অবাক হয়।

দেশের চতুর্দিকে তখন ভীষণ উত্তেজনা, মুক্তি যুদ্ধের নানা অদ্ভুত রাখা-ঢাকা খবর আর পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারে নানা খবর কাল-বৈশাখীর দমকা বাতাসের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

এমন দিনে প্রথম তার বাপজান আনলো দুবস্তা চাল এবং ঝুড়ি ভর্তি কাঁচা আনাজ, বেশ কাঁটা ডেগী মুরগী।

তার যে বাপজান বাড়ি বাড়ি আর মসজিদ মসজিদ ঘুরে সস্তায় তিন দিন ভাতের চাল জোটাতে পারতো না, সেই বাপজানকে হঠাৎ দুবস্তা চাল আর ঝুড়ি ভর্তি সব্জী আনতে দেখে মরিয়ম অবাক হয়ে বাপজানকে প্রশ্ন করেছিল—এগুন কে দিল বাপজান?

ধেনু মোল্লা হেসে আনন্দে গদ-গদ কণ্ঠে বলেছিল—ফেরেস্তা।

তারপর থেকে তাদের সংসারে খাওয়া-দাওয়ার অভাব ঘুচে যায়। তারপর কদিন যেতেই এক গাদা লাল-নীল দামী শাড়ি-ব্লাউজ তার সোনার কয়েক গোছা চুড়ি নিয়ে ফেরে।

মরিয়ম বর্ষায় ছল-ছল নদীর মত যৌবন মাখা দেহে শাড়িগুলো এলো-মেলো-ভাবে জড়িয়ে আবার প্রশ্ন করেছিল—বাপ-জান এগুন কে দিল? ধেনু মোল্লা মেয়ের প্রশ্ন এড়াতে বাইরের দিকে চলে যায়। তার পর মরিয়মকে আর চেনা যেত না তার ফর্সা সুন্দর দেহে রঙিন শাড়িগুলো তাকে যেন দ্বিগুণ সুন্দরী করে তুলে ছিল।

মরিয়ম কিন্তু তারপরও কয়েক বার অবাক না হয়ে পারে নি। যেমন সেদিন বিরাট সেগুন কাঠের পালঙ্ক লোক নিয়ে ধরা-ধরি করে ঘরে এনে তুলেছিল, অত বড় পালঙ্ক মরিয়ম জীবনে কখনো দেখেনি, তাই অবাক হয়ে বাপজানকে জিজ্ঞেস না করে পারেনি—বাপজান, এই পালঙ্কটাও ফেরাস্তায় দিছে? ধেনু মোল্লা শব্দ করে হেসে উঠে হাসি থামাতে-থামাতে বলে—হ্যাঁরে হ্যাঁ, ফেরেস্তায় দিছে। এবং এর পর যখন ধেনু মোল্লা ছেলে-মেয়েদের এনে তুলল বিরাট পাকা একতলা বাড়ীতে তখন মরিয়ম অবাক হয়েছিল দুধের মত সাদা রঙের সুন্দর সুন্দর পর্দাওয়ালা বাড়ী দেখে কথাটা অনেকক্ষণ চেপে রেখে শেষ পর্যন্ত আর চেপে রাখতে না পেরে বলে ফেলেছিল মরিয়ম—এ বাড়ীডায় আমরা থাকুম, এত বড় বাড়ী আমাগো কেডায় দিলো বাপজান?

ধেনু মোল্লা নতুন ঘরের জিনিষপত্র গোছ-গাছের ব্যস্ততায় ছোটা-ছুটি করতে করতে চেঁচিয়ে বলেছিল—কতবার কমুরে মুখপুড়ি, ফেরেস্তায় দিছেরে ফেরেস্তায়!

তারপর থেকে মরিয়ম ছোট ভাই-বোন-দের নিয়ে থাকলেও বিরাট বাড়ীটায় কেমন যেন একা একা মনে হয় তার।

বাপজান সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে। সে কাজ সেরে দুপুরের দিকে সাজতে বসে, সময় কাটাতেই যেন এস্তার শাড়ী-গয়না থেকে বেছে বেছে একটা পরে তারপর ঘুরে বেড়ায় ঘরে ঘরে। ঘুরে ঘুরে দেখে দেয়ালে টাঙ্গানো বিরাট বাঁধানো ছবিগুলো, হরিণের শিংওয়ালা মাথা, মাটিতে বিছানো কার্পেট আর দরজায় জানালায় টাঙ্গানো সুন্দর ফুল-পাতা আঁকা পর্দা ঘুরে ঘুরে এক সময় ক্লান্ত হয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে, দাঁড়িয়ে দেখে, বাইরে আশে-পাশে যতটুকু দেখা যায়। চতুর্দিকে কেমন যেন নির্জনতা একটু দূরে দূরে নিঃসঙ্গ সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলো পরস্পরের দিকে করুনভাবে চেয়ে যেন দাঁড়িয়ে। এমন নির্জনতা দেখে তার বার বার মনে পড়ে পুটির মা'র কাছে শোনা রাক্ষসের গল্প। দুপুরে পথে একটা লোকও দেখা যায় না বিশ্রামরত অজগরের মত এঁকে-বেঁকে শুয়ে থাকা কংক্রিট জমানো কালো রাস্তা কাঁপিয়ে হঠাৎ একদিক থেকে অন্যদিকে ছুটে যায় জলপাই রঙের ট্রাক, আর ট্রাক ভর্তি ঝুলন্ত গোঁপওয়ালা সৈন্যরা এদিক ওদিক, জানালায় জানালায় চোখ বুলিয়ে নিমিষে হারিয়ে যায়।

কখনো চোখে চোখ পড়লে মরিয়ম পর্দা ফেলে দেয়, জানালা থেকে সরে আসে।

দুপুরে ভীষণ গরমের জন্যে সেদিন ধেনু মোল্লা দুপুরেই বাড়ীতে ফিরে আসে।

খোলা দরজার বিরাট পর্দা সরিয়ে বৈঠকখানায় পা দিতেই তার চোখে পড়ে লাল কার্পেটের উপর মরিয়মের নীল শাড়ী পড়ে আছে। হঠাৎ ধেনু মোল্লার পা টলে উঠে, এলোমেলো পায়ে দৌড়ে মরিয়মের কামরায় গিয়ে ঢোকে সে, মরিয়ম কই।

মেঝেয় পাতা কার্পেটের কোণে হঠাৎ চোখ পড়ে তার। মরিয়ম চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বোতামহীন ব্লাউজের দু'পাল্লা দু'দিকে নুয়ে গেছে। ফর্সা বুক বাতাসের দোলে গাছের পাতার মত থির-থির করে কাঁপছে। আঁচড়ের অসংখ্য দাগ, ফুলে উঠেছে লাল আলপনার মত। কালচে হয়ে এসেছে ভীষণভাবে চেপে রাখা উরুর খাঁজে জমে থাকা রক্ত।

ধেনু মোল্লা মেয়ের দিকে আর তাকাতে পারে না, হাঁটুমুড়ে মেয়ের কাছে বসে পড়ে। কান্নায় ডুকরে ওঠা কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—মা বল মা, তোর এ অবস্থা কেডায় করলো? চুপ কইরা থাকিস না। বল মা, বল, আমি সৈন্যসাহেবগো দিয়া তার জান বাহির কইরা আনুম বল মা!

মরিয়ম অতি কষ্টে চোখ খুলে তাকাতে ধেনু মোল্লা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—বল মা, কেডায় করছে তোর এই অবস্থা।

মরিয়ম ক্লান্তির ভারে চোখের পাতা আবার বন্ধ করতে করতে মৃদু স্বরে বলে—ফেরেস্তা।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

বুলবুল, না অর্ধনারীশ্বর ?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নানা বৈচিত্র্যের সংবাদ আছে অনাথনাথের সঙ্গীতজীবনে। তাঁর মূল পরিচয় রাগসঙ্গীতের শিল্পী বলে। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি রীতিমত শিখেছেন। তার মধ্যে টপ্পা গান গাইতেন না আসরে। খেয়াল ঠুংরির চর্চাই প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গীতজীবনকে অধিকার করে রেখেছে। এই দুই অঙ্গেই তাঁর অন্তরের সাধন। দরবারে আসরে সম্মেলনে বেতারে খেয়াল ঠুংরির গুণীরূপেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। তা হলেও বাংলা গানের শিল্পী হিসেবেও তাঁকে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে দেখা গেছে। গ্রামোফোন রেকর্ডের কথা বলা হয়েছে আগে। আরো একটি জানাবার মতন ঘটনা আছে এ ব্যাপারে।

তখনো বিশের দশক চলেছে। বাংলায় চলচ্চিত্র জগতে নির্বাক ছবি হলেও সে সময় গৌরবের যুগ। ম্যাডান থিয়েটার প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীগুলির চিত্রায়নে বাঙ্গালী দর্শকদের চিত্তজয় করছেন। সে সময় ক্রাউন সিনেমায় দেখা দেয় তাঁদের 'কপালকুণ্ডলা'। দুর্গাদাস 'নবকুমার', প্রবোধ বসু 'কাপালিক', দানীবাবু শ্যামার কুলীন স্বামী পেসেন্স কুপার 'মতিবিবি'-রূপে মনে রাখবার মতন নির্বাক অভিনয় করেছিলেন—বিশেষ প্রথম তিন নাট্যশিল্পী। দীর্ঘকাল ধরে ছবিখানি প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রথমে শ্যামবাজারের ক্রাউন সিনেমায়। তারপর ভবানীপুরের এমপ্রেসে। তখন সেই বাক-হীন 'কপালকুণ্ডলা'র অগণিত দর্শকরা দুটি মধুর সঙ্গীত শোনবার সুযোগ পেতেন। সে এক অভিনব উপরিলাভ। নির্বাক যুগে সুরমুখরতার অ-পূর্বসৃষ্ট পরিবেশ। সেই গান দুখানি পরিবেশিত হত কাহিনীচিত্রের দুটি নাট্যক্ষণে। প্রথম দিকে যখন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে নবকুমারকে একা পরিত্যাগ করে যায় সহযাত্রীরা—তখন সেই গঙ্গাদৃশ্যের সঙ্গে পর্দার পাশ থেকে শোনা যেত উদাত্ত কণ্ঠে গঙ্গার স্তোত্র গান—দ্বিজেন্দ্রলালের অমর রচনা 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' আর শেষ দৃশ্যে, শ্মশানের গঙ্গাতীরে কপালকুণ্ডলার নিমজ্জনের পর সকরুণ বামা-কণ্ঠের গানে দর্শকদের চিত্ত ভাবাকুল হয়ে উঠত—'কোলে তুলে নে মা শ্যামা।' দুখানি গানই চিত্রনাট্যের যেন অঙ্গ হয়ে যায় অনুরূপ রসানুভবে, সঙ্গীতের অনুষঙ্গে। সেই অসংখ্য দর্শকদের অনেকেই জানতেন—এই দুই বিপরীত কণ্ঠে একই গায়ক এমন মনোহারী গান শোনাচ্ছেন। আর সে তরুণ শিল্পীর নাম অনাথনাথ বসু। তাবৎ শ্রোতাদের প্রশংসায় তিনি সেসময় ধন্য হতেন প্রতিদিন।

তাঁর ৬০ বছরের সুদীর্ঘ সঙ্গীতজীবনে এমনি অগণিত শ্রোতাদের তিনি বিভিন্ন আসরে মুগ্ধ করে এসেছেন। অনাথনাথের এই সঙ্গীত-ধারার উৎস কোথায় কিভাবে তার বিকাশ ও বিবর্ধন ঘটে, কেমন করে সেই আশ্চর্য প্রতিভার স্ফুরণ হয় স্বভাবের প্রেরণায় এবং আবাল্য,—সে বৃত্তান্তও রীতিমত নাটকীয়।

আর তা জানবার জন্যে যেতে হবে অনেক কাল পিছিয়ে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে। সেকালের অখণ্ড বাংলার খুলনা অঞ্চলে। কপোতাক্ষ নদীতীরের একটি গ্রাম-বসতিতে।

এক টাকায় বারোখানা গান। গ্রামোফোন রেকর্ড। কলের গান। কেনবার জন্যে নয় শুধু শোনার দাম। বারোখানা গান এক টাকায়।...

ঠিক ফেরিওলা নয়। গ্রামোফোনের ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী বলা যায়। একজনের কাছে থাকে গ্রামোফোন যন্ত্র। একটি বাকস, তার ওপর আটকানো চোঙ্গা। আর একজন রেকর্ড বাজাবার লোক। কালো চকচকে রেকর্ডের চাকতি। কলের হাতল ঘুরিয়ে সেই সব রেকর্ড সে বাজায়। লোকদের বুঝিয়ে দিতে পারে—কার গান, কেমন গান। টাকা দিয়ে শুনতে চাইলে এক একটি কলের গান বাজিয়ে শোনায়—এই হল লালচাঁদ বড়ালের গান। এবার শুনুন মানদাসুন্দরীর। এখন পান্নাময়ীর কীর্তন হবে।...

এমনি বারোখানি কলের গান কেউ কেউ শোনে এক টাকা দিয়ে। আর সেই সঙ্গে এক ক্ষুদে শ্রোতাও। দশ-এগারো বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে। সুশ্রী মুখ চোখ। একহারা গৌরবর্ণ চেহারা কলের গানের লোক দেখলেই সে থেকে যায় সঙ্গে সঙ্গে। যে টাকা দিয়ে রেকর্ড শোনে সেখানেই সে দাঁড়িয়ে যায়। সেই চোঙ্গার নীচে বাকস। তার ওপর ঘুরছে ঝকঝকে কালো রেকর্ডের চাকা তার মাঝখানেও ঘুরতে থাকে ছবিটি : ধবধবে শাদা কুকুর চোঙ্গার সামনে বসে গান শুনছে। ঠিক তেমনি চোঙ্গা আঁটা রয়েছে রেকর্ডের পাশেই, মুখ তার সরু থেকে হয়ে উঠেছে কত বড়। আর তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে সুন্দর এক একখানি গান। ছেলেটি এক মনে শুনে নেয় সেই সব কলের গান। লালচাঁদ বড়ালের 'ওরা কেমন মা তা কে জানে,' 'ধিনতা ধিনা পাকা নোনা'। মানদাসুন্দরীর 'আর কবে দেখা দিবি মা হর রমা'। পান্নাময়ীর 'শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী'। যত গান এদের কাছে আছে, সমস্ত তার শোনা চাই। যতক্ষণ না শুনতে পায়, দলটির সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। আর ইস্কুলে যাওয়া হয় না সেদিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। গান সব শোনে আর শিখে নেয় গুনগুন করে।

কপোতাক্ষ নদীর ধারে। খুলনা জেলার সেই অঞ্চলটিতে। খেসড়া আর রাড়ুলিতে। বাঁকা আর কাঠিপাড়ায়।

পাশাপাশি সেখানে চারখানি গ্রাম। লোকে একসঙ্গে তাদের নাম করে—রাড়ুলি, খেসড়া, বাঁকা, কাঠিপাড়া। গ্রাম চারটির প্রথম ইংরেজী অক্ষর নিয়ে অঞ্চলের একটি মাত্র ইস্কুলের নাম হয়েছে—আর কে বি কে ইনস্টিটিউশন। তারই এক ছাত্র ওই ছেলেটি। এ অঞ্চলের সবাই তাকে চেনে। অনাথ তার নাম। অনাথনাথ বসু। খেসড়ার দত্তবাড়ির ছেলে।

কি সুন্দর অনাথের গানের গলা। চমৎকার গাইতে পারে অতটুকু ছেলে। যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি শুনে শুনেই গান শিখে নেবার ক্ষমতা তার। ওই সব রেকর্ডের গান সে কেমন নকল করে গায়। তাছাড়া কীর্তনও গাইতে পারে কীর্তনীয়াদের মতন। কলের গানের 'ধিনতা ধিনা পাকা নোনা', 'আর কবে দেখা দিবি মা হর রমা' এসব গান অবিকল শুনিয়ে দেয়। আর আসরে শোনা কত কীর্তন...

অনাথদের পৈত্রিক বাস খলিশখালি গ্রামে। খেসড়া থেকে তিন ক্রোশ। কিন্তু সে থাকে মামার বাড়ি খেসড়ায়। শৈশবেই পিতৃহীন। তাই মামার বাড়িতেই একেবারে ছেলেবেলা থেকে মানুষ।

অনাথের দশ-এগার বছর বয়স হল, ১৯০৭।৮ সালের কথা। গ্রামোফোনের প্রথম যুগ তখন। তার ৬।৭ বছর আগে পত্তন হয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসা। সাধারণের ভাষায়—কলের গান। তার বহু জনপ্রিয় গায়ক লালচাঁদ বড়াল। তারপর গায়িকাদের মধ্যে আছেন মানদাসুন্দরী পান্নাময়ী। কৃষ্ণভামিনী।

তাঁদের রেকর্ড নিয়ে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের নানা জায়গায় দেখা যায়। কলকাতা থেকে অনেক দূরে দূরে পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায়। মফঃস্বল শহরে, গ্রামে পর্যন্ত। পল্লীবাসীদের কাছেও পৌঁছয় কলের গান।

গ্রামোফোনের এমনি ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীর আসে সেকালের খুলনা জেলাতেও। কপোতাক্ষর সেই অঞ্চলে। চারখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম নিয়ে ঘনিষ্ঠ একটি এলাকা—যদিও মাঝ দিয়ে কপোতাক্ষ বয়ে চলেছে।

নদীর এপারে রাড়ুলি বাঁকা, কাঠিপাড়া। ওপারে শুধু খেসড়া। খেয়া নৌকে পারাপার করে খেসড়া থেকে রাড়ুলি

চারটি গ্রাম যেন একটিমাত্র অঞ্চল। আর তার কেন্দ্র হল রাড়ুলি—বাংলার বরেণ্য সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ধারণভূমি। তাঁর পৈত্রিক বাসের গৌরবেই গরীয়ান এ পল্লী। বিজ্ঞান-চর্চা ও দেশসেবায় তখন উৎসর্গ করা প্রাণ প্রফুল্লচন্দ্রের। তিনি প্রধানত কলকাতা-নিবাসী বটে। কিন্তু গ্রামের সঙ্গে যোগও তাঁর নানাভাবে আছে। এ অঞ্চলের ওই একটি মাত্র উচ্চ বিদ্যালয় আর কে বি কে পত্তন হয় তাঁরই পৈত্রিক গৃহে। পরে তার নিজস্ব বাড়ি হয়েছিল। তাঁর পিতা হরিশ-চন্দ্রই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা।

রাড়ুলি বাঁকা কাঠিপাড়ার পড়ুয়ারা আসে আর কে বি কে-তে। তেমনি পারানির নৌকোয় খেসড়া থেকেও। অনাথ নামে ছেলেটিও এই ইস্কুলে আসে। তার আত্মীয় সম্পর্ক আছে প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে। হরিশ-চন্দ্র হলেন তার পিতা অপীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর পিসতুতো দাদা।

খেয়া পারাপার করে সে রাড়ুলিতে পড়তে আসে বটে। কিন্তু লেখাপড়ায় তার মন নেই একেবারে। গান তার সমস্ত মন কেড়ে নিয়েছে। গান শুনতে পেলে আর কিছু চায় না সে। আর যে গান শোনে, তা-ই মুখে মুখে শিখে নেয়। তারপর মিষ্টি গলায় যখন গাইতে থাকে, ভারি ভাল লাগে সকলের।

যত কলের গান এদিকে এসেছে, সবই সে শিখেছে। তা ছাড়াও গানের অভাব নেই এ অঞ্চলে। কীর্তনের খুবই চলন আর প্রভাব এদিকে। গোটা বৈশাখ মাসেই গ্রামে গ্রামে কীর্তনের আসর বসে যায়। বাইরে থেকে কীর্তনীয়ারা আসে বড় বড় কীর্তন আসরে। অনাথের মামার বাড়িতেও আসর হয়। তখন নবদ্বীপ কলকাতায় অনেক নাম-করা কীর্তনীয়ার গান শুনতে পায়। তা ছাড়া আছে শ্রাদ্ধ বাসরের কীর্তন। এ জন্যেও কলকাতা থেকে কীর্তনীয়া আনে অবস্থাপন্ন লোকেরা।

একবার কলকাতার বিখ্যাত কীর্তন গায়িকা হেমাঙ্গিনীও এসেছিলেন। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রথম আসেন তিনি, খেসড়ার কাছেই একটি গ্রামে। কিন্তু তারপর এত মজুরো আসতে লাগল আশ-পাশের গ্রাম থেকে যে তিনি বেশ কিছুদিন রয়ে গেলেন। রইলেন তিনি অনাথদের বাড়িতেই। খেসড়ায়। সেখান থেকেই কাছাকাছি গ্রামে হেমাঙ্গিনী কীর্তন গাইতে যেতেন। অনাথের জননীকে বলতেন—মা। অনাথকে বলতেন, 'আমার ছেলে তোমারই বয়সী। সেও গান গায়। তার নাম সতীশ। কলকাতায় গেলে তার সঙ্গে আলাপ করো।'

সেই হেমাঙ্গিনীর মুখে অনেক কীর্তন সেবার শুনেছিল অনাথ। পালা কীর্তনে হেমাঙ্গিনীর খুব নাম ছিল সেকালে।

তা ছাড়া অনাথের মামার বাড়িতেই কীর্তনের রীতিমত চর্চা। মেজ মামা অবিনাশ দত্ত একজন সখের কীর্তনীয়া।

এই সব সূত্রেই অনাথের ছেলেবেলা থেকে কীর্তনের সঙ্গে পরিচয়। কীর্তন সে তখন থেকেই গায়। আর এ গানের জন্যেও অঞ্চলের সকলেই তাকে জানে। অনেকেই ভালবাসে তার গান শুনতে। অবাক হয়ে ভাবে—অতটুকু ছেলের কি করে এমন সুললিত কণ্ঠ হল! লালচাঁদ বড়াল মানদাসুন্দরীর গান সে গাইতে পারে কি করে!

কিন্তু যারা তার বংশের কথা জানে তারা আশ্চর্য হয় না। খলিশখালি গ্রামের অপীন্দ্রকৃষ্ণ বসু হলেন অনাথের পিতা। তিনি ত একজন ভাল গায়ক। সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর এস্টেটে কাজও করতেন অপীন-বাবু। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরদের জমিদারী ছিল নোয়াখালিতেও। সেখানেই শায়েস্তা-নগরে অপীনবাবু চাকরীসূত্রে থাকতেন। আর তাঁর মৃত্যুও হয় শায়েস্তানগরেই, দিন-কয়েকের অসুখে। অনাথ তখন মাত্র ১৫ দিনের শিশু।

অপীনবাবু ভাল টপ্পা গাইতেন। হিন্দুস্থানী টপ্পা। রাগসঙ্গীতের চর্চা করতেন। তবে সঠিক জানা যায় না, কার কাছে তাঁর শিক্ষা। সৌরীন্দ্রমোহনের দরবারী গুণীদের কাছে শিখতে পারেন হয়ত।

অনাথের সঙ্গীতকণ্ঠ সেই উত্তরাধিকার-সূত্রেই পাওয়া। পিতার হঠাৎ মৃত্যুর জন্যে জন্মস্থান মামার বাড়িতেই সে থেকে যায়। সে পরিবারে তখন ওই একটিমাত্র ছোট ছেলে। তার ওপর সেকালের মামার বাড়ি। তাই বড় হতে থাকে রীতিমত আদরে-যত্নে। কোন শাসন বারণের বালাই নেই। যেন একটি মুক্ত পাখির জীবন।

খলিশখালির অপীনবাবু রাগসঙ্গীত গাইতেন। আর এখানে খেসড়ার বাড়িতে কীর্তনের চর্চা। সেই কীর্তনের সুরের মধ্যে অনাথ বড় হতে লাগল। আর শুনে শুনে গাইতে আরম্ভ করলে কীর্তন। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য রকমের গানও। যেমন লালচাঁদ বড়াল মানদাসুন্দরীর বাংলা টপ-খেয়াল। উত্তরজীবনে অনাথনাথের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল গুণী খেয়াল গায়ক বলে। তার সূত্রপাত সেই খেসড়া গ্রামে, কলের গানের জন্যে। আর সেই সঙ্গে গায়ক পিতার উত্তরাধিকারে।

সঙ্গত যন্ত্রের হাতেখড়িও ওই বাল্যকাল থেকেই। মেজ মামা অবিনাশ বাড়িতে কীর্তন গাইতেন। আর তাঁর সে গানের সঙ্গে খোল বাজাতে ব্রতী অনাথ। কীর্তনের সঙ্গে তার এই খোল বাজানোও শুনে শুনে নিজে শেখা। এই ছন্দ জ্ঞানও যেন তার সহজাত। গ্রামের উৎসবে পূজা-পার্বণে ঢাক-ঢোল বাজত। আর সেই ৯।১০ বছরের ছেলেটি তার নিখুঁত নকল করে অবাক করত সকলকে।

একই সঙ্গে গান আর সঙ্গতে উত্তর-কালে যিনি অসামান্য শিল্পী হয়েছিলেন—কপোতাক্ষর গ্রামাঞ্চলে এ সবই তার পূর্বা-ভাস। উষাকালের অর্ধস্ফুট কাকলি যেন।

কপোতাক্ষ তীরের একটি বন্ধনহীন বিহঙ্গ। এমনি করে বৃদ্ধি পায় দিন দিন। তার শুনে শুনে গান গাওয়া। সবই নিজে নিজে শেখা। স্বয়ং শিক্ষক। এমনি গান-বাজনার মধ্যে ১২-১৩ বছরের হয়ে ওঠে অনাথ।

তার গান শুনে অনেকেই সুখ্যাতি করে বটে। কিন্তু একজন শোনান অন্য রকম কথা। ওই বাঁকা গ্রামের সতীশ রায়। আর কে বি কে'র একজন শিক্ষক তিনি। তারও সঙ্গীতের সখ। বেহালা বাজান। গানও খুব ভালবাসেন। সেজন্যে অনাথকেও। কিন্তু কথা শোনান আর এক ধরনের

তাকে বলেন, 'ওরে অনাথ' তুই লেখা-পড়া ছেড়ে দে। তোর মামারা বৃথাই তোকে ইস্কুলে দিয়েছেন। লেখাপড়া তোর দ্বারা হবে না। গানই তোর হবে। তবে গান-বাজনা শেখ ভাল করে। আর এ গাঁয়ে থেকে কিছু করতে পারবি না। কল-কাতার মতন শহরে যা। তবে ভাল করে শিখতে পারবি।'

বালকের আশ্চর্য লাগত তাঁর এ ধরনের কথা। ঠিক বুঝতে পারত না কেমন করে তা সম্ভব। কোন উত্তর তার মুখে জোগাত না।

কিন্তু সতীশবাবু তাকে প্রায়ই বলতেন ওই রকম। আবার এক একদিন সাহস দিতেন, 'ভয় করিস নি। ভগবান ঠিক একটা উপায় করে দেবেন। কলকাতায় চলে যা, কলকাতায় চলে যা। এ গাঁয়ে পড়ে থাকলে তোর কিছু হবে না।'

১৩।১৪ বছরের বালক। ভাবতে পারে না, কি করবে। এ বিষয়ে পরামর্শও কারুর সঙ্গে করবার উপায় নেই। তবে মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই তোলপাড় করে সতীশবাবুর কথাগুলো।

এদিকে তার গান বাজনায় ঝোঁক বটে। কিন্তু আর একদিকে রীতিমত ডানপিঠে সে। আর তেমনি সাহসী। ভয়ডর কাকে বলে জানে না। যথেষ্ট বুদ্ধিমান, লেখাপড়ায় ভাল না হলেও তবু অনাথের ধারণার বাইরে ছিল, দূর কলকাতায় চলে যাওয়া। কলকাতার কথা সে আত্মীয়স্বজন অনেকের কাছেই অনেক শুনেছে। তাই কলকাতা তার মনে ছিল স্বপ্নের জগৎ হয়ে। সেখানে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব বোধ হত।

এমন সময় সেই অভাবিত ঘটনাই ঘটে গেল। আর কি আকস্মিক ভাবেই।

অনাথের বয়স তখন ১৪ বছর। স্টীমারে চেপে ও অঞ্চলে বেড়ানো আগে ত কতদিনই হয়েছে। কিন্তু সেদিন কি যে যোগাযোগের লগ্ন ছিল তার ভাগ্যে।

কপোতাক্ষ নদীতে নিয়মিত স্টীমার চলে। খুলনা থেকে সাতক্ষীরা। ফেরে

সাতক্ষীরা থেকে খুলনায়। খেসড়া রাড়ুলি থেকে খুলনা পৌঁছয় সন্ধ্যে সাতটায়।

দুরন্ত স্বভাব অনাথ মাঝে মাঝেই স্টীমারে চেপে বসে। ঘুরে আসে কাছাকাছি। এ লাইনের ইনসপেকটর তার খুবই জানা লোক। কীর্তন শুনতে তিনি বড় ভালবাসেন। অনাথকে দেখতে পেলেই তিনি বলেন গান শোনাতে। তিনি থাকলে স্টীমারে তার টিকিট লাগে না। ইচ্ছে মতন বেড়িয়ে আসে কপোতাক্ষর ওপর দিয়ে। তবে সে ওদিকে খুলনা পর্যন্ত যায় নি কখনো।

সেদিন স্টীমারে উঠতেই ইনসপেকটরের সঙ্গে দেখা।

'আজ তোর গান না শুনে ছাড়ছি না। চল্ আমার কেবিনে। আশ মিটিয়ে কেত্তন শুনব।'

কীর্তন-পাগল ভদ্রলোক অনাথের গান শুনতে বসলেন, হাতের কাজ সেরেই। ঘন্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল গানে গানে। অনাথের অনেক কীর্তন গাওয়া হল স্টীমারের কেবিনে কেবিনে।

তখন অনাথেরও সময়ের জ্ঞান ছিল না! হঠাৎ মনে হতেই বললে, 'এ কি? একেবারে খুলনা এসে যাবে যে? তাহলে আর আজ রাত্তিরে ত বাড়ি ফিরতে পারব না? সন্ধ্যের পর ওখান থেকে স্টীমার ফেরে না ত?'

ইনসপেকটর বললেন, 'তার জন্যে কি হয়েছে? আমি আজ রাতে কেবিনেই তোর থাকবার ব্যবস্থা করে দেব। কাল সকালে প্রথম স্টীমারেই বাড়ি চলে আসবি।'

খুলনা পৌঁছে, তিনি চলে গেলেন ডিউটির পরে। যাবার আগে কর্মচারীদের বলে অনাথের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। কেবিনে খাওয়ার পর রাতটা থাকবে। তারপর সকালে সেই স্টীমারেই ফিরে যাবে খেসড়ায়। গ্রীষ্মকাল। কোন অসুবিধা হবে না তার কেবিনে রাত্রিবেলা থাকতে।

বিকালের জলখাবার ভদ্রলোক আগেই তাকে খাইয়েছিলেন। রাতের খাওয়া অনাথ সেরে স্টীমার ঘাট থেকে বেড়াতে গেল রেল স্টেশনে। কাছেই।

আগে কখনো তার রেল গাড়ি চড়া হয়নি। মনে মনে বললে 'আজ রেল দেখে আসি।'

প্ল্যাটফর্মে তখন কলকাতা যাবার ট্রেণ দাঁড়িয়ে। দেখতে গিয়ে হঠাৎ রেলে চড়বার কথা মনে হয়ে গেল।

আর কিছু না ভেবেই অনাথ উঠে পড়ল গাড়িতে। সেটি সেকেণ্ড ক্লাস। একজন মাত্র যাত্রী ছিলেন কামরায়। একটু পরেই ট্রেণ চলতে আরম্ভ করে দিল।

কলকাতায় চলল যে!

যাক না! দেখি কি আছে বরাতে! সতীশবাবুর এতদিনের কথার আজ এসপার-ওসপার হোক।

১৪ বছরের গ্রাম্য ছেলে পাড়ি দিলে কলকাতায়। এই প্রথম রেলের যাত্রী। তাও বিনা টিকিটে। এক বস্ত্রে। সংগীহীন। পকেটে শুধু আনা তিনেক পয়সা। একমাত্র সম্বল —গান! আর সেই সতীশবাবুরই আর এক আশ্বাস—ভগবান ঠিক একটা উপায় করে দেবেন! ভয় করিসনি!

চলন্ত গাড়িতেই মাথায় পরিকল্পনা জাগতে লাগল। কি অবস্থায় পড়তে হবে ট্রেণের মধ্যে স্টেশনে কলকাতায়! কি করে আত্মরক্ষা সম্ভব! বিশেষ টিকিটের ব্যাপার।

সহযাত্রীই সংকটের সূচনা করলেন। সন্দিগ্ধ চোখে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'এদিকে কোথায় বাড়ি', 'কোন স্কুলে পড়' 'কতদূর যাচ্ছ' ইত্যাদি।

এ অঞ্চলের অনেক জায়গাই অনাথের জানা। নাম ধাম দিয়ে কোনক্রমে এসব প্রশ্ন-মালার জাল থেকে উদ্ধার পেলে।

তারপর আর একটি মোক্ষম জিজ্ঞাসা-- 'একা কলকাতায় যাচ্ছ কেন?'

'সেখানে গুরুজনের অসুখ। টেলিগ্রাম পেয়ে দেখতে যাচ্ছি। বাড়িতে আর কেউ নেই যাবার মতন।'

এমনি সব কথাবার্তার মধ্যে ভদ্রলোকের টিকিটখানি চেয়ে নিলে অনাথ। যেন এমনি দেখবার জন্যে। আর কথায় কথায় যেন অন্য-মনস্ক হয়েই মুখে পুরে দিলে।

খানিক পরেই ভদ্রলোকের খেয়াল হল। 'কই আমার টিকিট?'

'এই যে' বলে অপ্রস্তুত হয়েই মুখ থেকে বার করে দিলে টিকিটটা। কিন্তু তারই মধ্যে কাজ সিদ্ধ হয়েছে। টিকিটের খানিকটা মুখস্থ করে নিয়েছে, ভাগ্যক্রমে নম্বরের দিকটাই।

আরো ভাগ্যের কথা সারা রাতের মধ্যে কোন 'চেকার' গাড়িতে এল না।

সকালবেলা একেবারে শিয়ালদা স্টেশনে অগ্নিপরীক্ষার পালা! লোহার গেটের সামনে টিকিট দেখতে না পেয়ে রেল কর্মচারীর সঙ্গে যেতে হল খোদ স্টেশন মাস্টারের সামনে। তখনো জবরদস্ত ইংরেজ আমল। সালটা বোধহয় ১৯১১। সেকালের চলতি কথায়—শিয়ালদার সেই স্টেশন মাস্টার একজন 'লাল মুখ'।

কিন্তু তিনি মুখ বেশি লাল না করে কোমল কণ্ঠেই জানতে চাইলেন, 'টিকিট করো নি?'

'করেছিলুম। কিন্তু আর একজন যাত্রী টিকিটটা নিয়ে ভুলে মুখে দিয়ে ফেলে। তার খানিকটা কোনরকমে ফেরৎ পেয়েছি।'

বলে, টিকিটের সেই টুকরো পকেট থেকে বার করে দেখাল। সাহেব বিশ্বাস করলেন কিনা, কে জানে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন যাবে কোথায়?'

এতক্ষণ পরে অনাথের চোখে জল দেখা গেল। সত্যি সে নিজেই জানে না, এই অচেনা বিরাট শহরে যাবে কোথায়?

তাকে কাঁদতে দেখে সাহেব সহানুভূতির সঙ্গে জানতে চাইলেন, 'কলকাতায় তোমার আপনার লোক কেউ নেই?'

তা আছেন। মনে পড়েছে এক মামার কথা। তাঁর নাম ঠিকানা অনাথ সাহেবকে জানাল।

তখন সায়েব তার সঙ্গে লোক দিলেন, সেই ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্যে। সেই লোকের সঙ্গে বরাবর ট্রাম গাড়িতে এসে, মামার দেখাও পেয়ে গেল। কিন্তু তিনি তাকে দেখে আর বৃত্তান্ত শুনেই অগ্নিশর্মা— 'এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যা। আমি তোকে রাখতে পারব না।'

'বাড়ি আমি ফিরব না। গান শিখতে এসেছি। গান ভাল করে শিখবই। চলে যেতে আসিনি।' সুস্পষ্ট উত্তর। 'আমায় তাহলে ওই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। বলে তাঁকে এক মাসতুত ভগ্নীপতির নাম জানালে অনাথ। মামা রাজি হলেন।

ভবানীপুরে যদুবাবুর বাজারের কাছে আশ্রয় মিলল শেষ পর্যন্ত। কাঠপাড়া গ্রামের এই আত্মীয় অনাথকে কাছে রাখলেন বটে। কিন্তু নিজেই নানা অসুবিধার মধ্যে থাকতেন। অনাথও সব কষ্ট মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েই রয়ে গেল সেখানে।

ভগ্নীপতি ভরসা দিলেন, 'এখানে থাকো। আর ওস্তাদও খোঁজা যাক।'

কিন্তু নিঃসহায় নিঃসম্বল ছেলেটির জন্যে কোথায় পাওয়া যাবে ওস্তাদ? তবে সেই আত্মীয় তাকে জানাশোনা নানা জায়গায় নিয়ে যেতে লাগলেন। তার গান শুনুন সবাই। যদি কোন দিক থেকে সুরাহা হয়, সংগীতজীবনের কোন সুযোগ আসে। এই একমাত্র আশা।

অনাথের ভগবৎ-দত্ত সুকণ্ঠ আর রেকর্ড কীর্তনের আসর ইত্যাদি থেকে নিজে শেখা গান কাজে লাগল এবার। গান শুনে সকলেই সুখ্যাতি করতেন। আর মনোবল বাড়ত গায়কের। সেই সঙ্গে ভাঁজ করে ওস্তাদী গান শেখবার আশা, বড় গায়ক বলে প্রতিষ্ঠা পাবার আশাও মনে জেগে থাকত।

এমনি ভাবেই কলকাতায় তার দিন যায়।

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(ক্রমশঃ)

•ঘড়ি•
•জাড়োয়া গহনা•
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৫ জলহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

খেলার জগতে মেয়ে

খেলা থেকে গ্লাইডিংএ

জয়িতা ব্যানার্জি

বেথুন স্কুলের ছাত্রী থাকাকালেই জয়িতা ব্যানার্জী স্কুল এথলেটিকসে তার যোগ্যতা প্রমাণ করে। তারপর বেথুন কলেজে বি-এ ক্লাসের (পার্টওয়ান) ছাত্রী হিসেবে খেলাধূলা এবং সাঁতার চালাতে থাকে। এই সময় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরে যোগ দেবার সুযোগ পায়। এন-সি-সির নিজস্ব এয়ারউইং না থাকলেও জয়িতা ক্রীড়াকুশলতা ও ক্যাডেট হিসাবে যোগ্যতা প্রকাশের ফলে গ্লাইডিংয়ের সুযোগ পায়। মেয়েটি এরই মধ্যে আটবার গ্লাইডিং করেছে। জয়িতা বলে, গ্লাইডিংয়ের জন্যে আমরা আটজন বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে 'ইন্টারভিউ-এ' বাছাই হই। মেডিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমিই সর্বপ্রথম গ্লাইডার চালাবার সুযোগ পাই এবং এপর্যন্ত আটবার উড়তে পাই। 'গ্লাইডিং'-এ এন-সি-সির ক্যাডেটদের মধ্যে আমিই প্রথম সুযোগ পেয়েছি। ষাটটা ফ্লাইটে ট্রেনারের সঙ্গে উড়তে হবে। তারপর একা গ্লাইডার চালাবার সুযোগ পাব।

—গ্লাইডারে উড়তে তোমার ভয় হয় নি?

—গ্লাইডারে চড়া বা চালান সম্পর্কে অনেকরকম কথা শুনেছি। সবাই বলেন, এ খুব কঠিন কাজ। মাটি থেকে গ্লাইডার উড়ানোর ব্যবস্থা হয়। আমি আর প্রশিক্ষক গ্লাইডারে বসে থাকি। মাটি থেকে উইঞ্চের সাহায্যে গ্লাইডারটি আকাশে ৮০০ থেকে হাজার ফুট ওপরে তুলে দেবার পর গ্লাইডারটিকে পাইলটিং করে সাত থেকে দশ মিনিট ধরে আকাশে একটা চক্কর দিয়ে নামতে হয়। ব্যাপারটা বিমান চালানরই মত। উঠবার সময় আমার একটুও ভয় হয় নি। তবে গ্লাইডারের চারিদিক খোলা বলে পাশ দিয়ে জোর হাওয়া বয়। তাতে প্রথম প্রথম কিছুটা অস্বস্তি হত। এখন আর হয় না।

—তোমরা কতজন ইন্টারভিউ দিয়েছিলে?

—আমাদের কলেজের 'ইউনিট ফার্স্ট' বেঙ্গল গার্লস ব্যাটালিয়ন থেকে প্রায় ৪৫ জনকে পাঠান হয়েছিল। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর মেডিক্যাল পরীক্ষায় আটজন মনোনীত হই।'

—এরোমডলিং না করে গ্লাইডিং করতে অসুবিধা হয় নি?

—না সঙ্গে প্রশিক্ষক থাকায় অসুবিধা অনুভব করি নি। তবে আগে এরোমডলিং করা থাকলে গ্লাইডিংয়ের কলাকুশলতা বেশ কিছু জানা হয়ে যায়। তাতে সুবিধা হয়। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান যায়। এন-সি-সিতে শীঘ্রই এরোমডলিং সুরু হবে, এবং তাতে কিছু মেয়েকেও নেওয়া হবে।

—মেয়েদের মধ্যে একক গ্লাইডার নেই?

—না, এখনও পর্যন্ত নেই। মেয়েদের পক্ষে গ্লাইডিংয়ে প্রধান অসুবিধা দৈহিক উচ্চতা। আমাদের প্রায় অধিকাংশের উচ্চতাই ৫ ফুট ২ ইঞ্চির বেশী হয় না। অথচ কমপক্ষে দৈহিক উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি না হলে গ্লাইডারের ফ্রেমারে পা ছোঁয় না। তাতে যন্ত্র চালাতে একটু অসুবিধা হয়।

জয়িতা বলে, আমাদের প্রশিক্ষক টি কে মিত্র ছাত্রীদের প্রতি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন। কয়েকবার গ্লাইডিং করার পর কেমন যেন নেশা ধরে যায়। আকাশে উড়তে অপূর্ব লাগে। আমার ধারণা গ্লাইডিং বিমান চালানোর চেয়েও রোমাঞ্চকর। নামবার সময়ই সবচেয়ে থ্রিলিং লাগে। ঠিক ঠিক ভাবে ল্যান্ডিং করতে না পারলে কি পরিণাম হবে বুঝতেই পারছেন।

জয়িতা জানায়, ধীরেন মজুমদারের উদ্যোগে ও যাদবপুর ইউনিটের সিও অমিতাভ সেনের অনুমতিতে মেয়েরা এরোমডলিংয়েরও সুযোগ পায়। জয়িতা এপর্যন্ত তিনটি মডলিং করেছে। অবশ্য এরোমডলিংয়ের সাজসরঞ্জাম ও জার্মান ইঞ্জিন পাওয়া এখন খুবই দুরূহ ব্যাপার। এরোমডলিংয়ের প্রশিক্ষক এন সি হালদার ও এ চৌধুরী। জয়িতার ধারণা

এরোমডলিং আগে করলে গ্লাইডিং খুব সহজে শেখা যায়।

—তবে কথা হচ্ছে, এরোমডলিং ও গ্লাইডিং দুই-ই খুব ব্যয়সাধ্য। ব্যক্তিগত-ভাবে সবার পক্ষে তাই এই দুটি বিষয় শেখা সহজ হয় না। গ্লাইডারে ওড়া এখন খুবই সীমাবদ্ধ। কারণ, জ্বালানী তেলের দাম খুব বেড়েছে। এক ঘন্টা উড়তে ৪৫ টাকার মত ব্যয় হয়।

জয়িতা অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী বার্তা সম্পাদক ললিতমোহন ব্যানার্জির কন্যা।

বেথুন স্কুলে থাকতে জয়িতা ১৯৬৬তে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় পশ্চিম বাংলার সাঁতার দলে ছিল। পরের বছর রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতায় ছোটদের বিভাগে তৃতীয় হয়। ১৯৬৫তেও রাজ্য স্কুল সাঁতারে দক্ষতার নজীর রেখেছিল জয়িতা। এছাড়া কলকাতায় এবং রাজ্য সাঁতারের আসরে এই মেয়েটি বিভিন্ন বিভাগে পদক ও ট্রফি লাভ করে। জাতীয় স্কুল সাঁতারে চিৎ ও বুক সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এথলেটিকেও জয়িতা বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল। স্কুলের আসরে দৌড়, বর্শা ছোঁড়া ও সটপুট ছোঁড়ায় পদক জয় করে। ব্যাডমিন্টনে ১৯৭০-এ নবম শ্রেণীর ছাত্রী থাকাকালে জয়িতা স্কুল ও কলেজ ছাত্রীদের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের পরিচালিত শারীরিক সক্ষমতার প্রতিযোগিতায় জয়িতা 'টু স্টার সার্টিফিকেট লাভ করে। ১৯৭৩ ও '৭৪ ও কলেজ স্পোর্টসে বিজয়িনী হয়। এদিকে গানেও জয়িতার দক্ষতা আছে। ১৯৭২-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত প্রতি-যোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। ১৯৭১-এ জয়িতা এন-সি-সির রাজ্য শুটিং প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। জয়িতা এখন এন-সি-সিতে সার্জেন্ট পদে উন্নীত হয়েছে। আর যাদবপুরস্থ এয়ার স্কোয়াড্রনে এরোমডলিংয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এন-সি-সিতে মেয়েদের মধ্যে জয়িতাই প্রথম গ্লাইডার-চালিয়ে। নানারকম খেলাধুলা এবং সাঁতারে পটুত্বের ফলেই জয়িতা শরীর ও মনকে একটা সুসংবদ্ধ সপ্রতিভ শৃঙ্খলায় তৈরী করতে পেরেছে।

প্রসঙ্গতঃ জয়িতা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে সাঁতারই আমি খুব একাগ্রতার সঙ্গে অনুশীলন করতাম। আমার প্রশিক্ষকও আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে খুব আশা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ক্লাব সংগঠকদের বিরূপ ব্যবহারের ফলে আমি শেষপর্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাঁতারে ইতি দিই। আমার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঘিরে নানারকম গণ্ডগোল দেখা দিতে থাকায়, আমাকে বাধ্য হয়ে জল ছেড়ে একেবারে উঠে আসতে হয়।' আবহাওয়া হাল্কা করার জন্য বলি, তাতে তো ভালই হয়েছে। জল ছেড়ে একেবারে আকাশে ওড়ার ব্যবস্থায় যোগ দিয়েছে।

—তা বটে। কিন্তু, কি জানেন ছোটবেলা থেকেই জল আর সাঁতার আমার খুব ভাল লাগে। স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নেমে খুব 'থ্রিল' অনুভব করতুম।

প্রশ্নের উত্তরে জয়িতা বলে, ঠিকমত সুযোগ সুবিধা পেলে এদেশের মেয়েরাও জীবনের নানাদিকে পশ্চিমী মেয়েদের মত সুযোগ্য হতে পারে। বাবা আর মায়ের উৎসাহ আর সহযোগিতা পেয়েছি বলেই এতটা করতে পারছি। আমাকে সাঁতার শেখাবার ব্যবস্থা বাবাই করেন। আর মা যোগান উৎসাহ।

—ভবিষ্যতের ইচ্ছা কি?

—আশা করছি গ্লাইডিং আর এরোমডলিংএ ভাল করে রপ্ত হয়ে ক্রমে দক্ষ পাইলট হয়ে উঠতে পারবো।

—অময়

দেশ বিদেশের খেলা

নবজন্মের রাণী

আন্তর্জাতিক জিমনাস্টিকের আসরে সোভিয়েট রাশিয়ার একাধিপত্য সুপ্রাচীন। পুরুষ বিভাগে বিজয় পতাকা অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সগর্বে উড্ডীন থাকলেও মহিলা বিভাগে রুশ আধিপত্যের অবসান ঘটে। চেকোশ্লাভাকিয়ার ভেরা ক্রাসলাভোস্কার আবির্ভাবে রাশিয়ার সুদীর্ঘকালের প্রতি-ষ্ঠিত মহিলা জিমনাস্টিকের সাম্রাজ্য বেহাত হয়ে যায়।

এক দশক পর চেক তরুণী ভেরা স্বস্থানে অবিচল থেকে সংসার জীবনে প্রবেশ করে প্রতিযোগিতামূলক জিম-নাস্টিকস থেকে বিদায় নিলে রাশিয়া মহিলা বিভাগের হারানো শীর্ষাসনটি ফিরে পায়। মিনস্ক শহরে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় জিম-নাস্টিকসের আসরে সোভিয়েট রাশিয়ার মহিলা বিভাগে সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংগ্রহ করে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে। এই প্রতি-যোগিতায় ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে রাশিয়ার দুই নবাগতা তরুণী। এক-জনের নাম লুডমিলা তুরিশ্চেভা। অপর জনের নাম তামারা লাজকোভিচ। উভয়েই ৩৮—৮৫ পয়েন্ট সংগ্রহের সুবাদে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান। এই সময় তুরিশ্চেভা ছিলেন উত্তর ককেসাস অঞ্চলের গ্রোজনীর টিচার্স ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রী ও লাজাকোভিচ বাইলোরাশিয়ার ভিটেকস শহরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রী।

ইউরোপীয় জিমনাস্টিকসের এই প্রতি-যোগিতায় সমান পয়েন্ট অর্জনের ভিত্তিতে দুজনে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান হলেও ফ্রি একসারসাইজে সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট (৯—৯) পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ তুরিশ্চেভাকেই ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার প্রদান করেন। যুগোশ্লাভাকিয়ার লুবজানায় আয়োজিত বিশ্ব জিমনাস্টিকসের আসরেও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রায় দীর্ঘ এক দশকের হারিয়ে-যাওয়া স্বর্ণ আসনটি সযত্নে কুড়িয়ে আন-লেন লুডমিলা তুরিশ্চেভা। এই দিক থেকে তুরিশ্চেভাকে রুশ মহিলা জিমনাস্টিকসের নবজন্মের রাণী বলে অভিহিত করা যায়।

তুরিশ্চেভার আবির্ভাবে রাশিয়ার মহিলা জিমনাস্টিকসে নতুন যুগের জন্ম হয়। এবং তার প্লাস্টিক বাড়ির মত নমনীয় অথচ নিখুঁত সুন্দর অঙ্গসঞ্চালনের কাছে চেক তরুণীদের স্বর্ণযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তুরিশ্চেভাকে প্রাচীন রুশ তারকা লারিসা পেত্রিক লারিসা লাতিনিনা ইভানোভাদা তামারা মানিনা জিনাইদা ভরোলিন প্রমুখদের যোগ্য উত্তরসূরী বলে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়।

ইউরোপীয় জিমনাস্টিকসে সাফল্যকে স্মরণ করে মিউনিখ অলিম্পিকের প্রাক্কালে সোভিয়েট মুলুকের দুই নতুন প্রতিভা তুরিশ্চেভা ও লাজাকোভিচকে ঘিরে যে নয়া প্রত্যাশা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তা মিথ্যে প্রতিপন্ন হয় নি। আন্তর্জাতিক জিমনাস্টিক ফেডারেশনের মহিলা বিভাগের চেয়ারম্যান বার্থে ভিলানসেটের ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেছে অক্ষরে অক্ষরে। কিংবা রুশ

তুরিশ্চেভা

মহিলা জিমনাস্টিক দলের শিক্ষিকা এবং এককালের বিশ্বসেরা জিমনাস্ট লারিসা লাতিনিনার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে পরিপূর্ণভাবে।

মিউনিখ অলিম্পিকে রুশ মহিলা জিমনাস্টিক দলে তুরিশ্চেভা ও লাজাকোভিজ ছাড়া উঠতি প্রতিভাদের মধ্যে ছিলেন কোসছেল বুরদা ও করবুট। ৩৮০-৫০ পয়েন্ট পাওয়ার সূত্রে এই দল চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব অর্জন করে। দ্বিতীয় পূর্ব জার্মানী ৩৭৬-৫৫ পয়েন্ট লাভ করে এবং হাঙ্গেরী ৩৬৮-২৫ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

স্বর্ণকন্যা তুরিশ্চেভা ৭৭-০২৫ পয়েন্ট সংগ্রহের সুবাদে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান (হর্সভল্টে তৃতীয় ১৯-২৫০ আনইভেনবারে চতুর্থ ১৯-৪২৫ বিম ব্যালেন্সে পঞ্চম ১৮-৮০০ ও ফ্লোর একসারসাইজে দ্বিতীয় ১৯-৫৫০ পয়েন্ট)।

তুরিশ্চেভাকে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে পূর্ব জার্মানীর —কারিন জাঞ্জের কাছে। কারিন জাঞ্জ ৭৬-৮৭৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত মহিলা চ্যাম্পিয়নের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এ ছাড়া আনইভেনবার (১৯-৬৭৫) ও হর্সভল্টে (১৯-৫২৫) সর্বোচ্চ পয়েন্ট লাভ করে কারিন জাঞ্জ স্বর্ণপদক জয় করে শক্তিশালী রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে খর্ব করার চেষ্টা করেন। রুশ তরুণী লাসকোভিচ ৭৬-৮৫০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় হন।

গত এক দশকের মহিলা জিমনাস্টিকে রুশ ব্যর্থতাকে ভোলবার অভিপ্রায়ে সম্ভাবনাময় প্রতিভার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে প্রশিক্ষক ভ্লাদিশ্লাভ রাসটোরোটস্কি লুডমিলা তুরিশ্চেভাকে আবিষ্কার করেন। তখন গ্রোজনীর মেয়ে তুরিশ্চেভার বয়স মাত্র পনের। স্কুলের ছাত্রী তুরিশ্চেভা ঐ বয়সেই ইউ এস এস আর কাপ বিজয়ী। পরবর্তীকালে স্বীকৃতির সিঁড়ি বেয়ে একের পর এক সোনা কুড়িয়েছেন অলিম্পিকের আসর পর্যন্ত।

মিউনিখ অলিম্পিকের অবসানলগ্নে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন তুরিশ্চেভাকে —সব শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি লাভ করে আপনার অনুভূতি কেমন? বিনয়ী স্বল্পবাক রুশ তরুণী উত্তরে বলেছেন—আমার সাফল্য একক নয়। দলীয়। সতীর্থদের সাহায্য অনুপ্রেরণা না পেলে আমি এতটা এগিয়ে যেতে পারতাম না। তাই আজকে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি লাভের আনন্দ সতীর্থদের সঙ্গে সমান অংশে ভাগ করে নিতে চাই।

তুরিশ্চেভা মনে-প্রাণে খাঁটি ও আদর্শ জিমনাস্ট। দৈহিক নমনীয়তা ও নিখুঁত নির্ভুল অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে অসীম ধৈর্য ও একাগ্র নিষ্ঠা তুরিশ্চেভার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। ইভেন্ট অনুযায়ী দেহকে ইলাস্টিক রবারের মত স্বেচ্ছায় সুন্দর ভঙ্গীতে রূপদান করতে তুরিশ্চেভা অনন্যা।

তুরিশ্চেভার স্বপ্ন অবসর জীবনে তিনি এককালের খ্যাতনামা জিমন্যাস্ট ও বর্তমান রুশ দলের প্রশিক্ষক লারিসা লাতিনিনার মত জিমনাস্টিকের সাধনাতেই আত্মমগ্ন থাকবেন।

—প্রশান্ত দাঁ

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

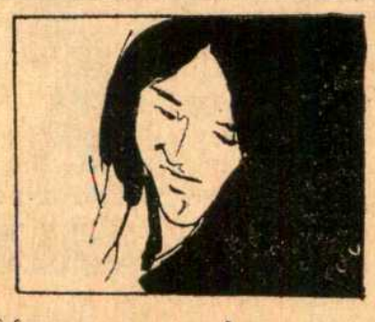

পার্টির শেষে শ্যামলাল বলেছিল শাওলীকে তার কপাল ভাঙার চক্রান্ত। তার আগে শাওলী কিছু জানত না। জানবার পর আর মরবার আগে একজনের সঙ্গেই তাকে ছুটে যেতে দেখা গেছে—সে হেমাঙ্গ বোস।

সুতরাং হেমাঙ্গ বোসই সেই প্রিয়জন যে সব শোনার পর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সরিয়ে দিয়েছে তিন চক্রান্তকারীকে; প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে হানা দিয়েছে শাওলীর হোস্টেলে।

দু নম্বর ক্লু—হেমাঙ্গ বোসের বাত।

কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট বিজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনসুর আলি খাঁ মাঠের দর্শকদের প্রতি প্রত্যাভিনন্দন জানাচ্ছেন। ফটো : অমৃত

খেলাধূলা

দর্শক

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

১ম দিন (ডিসেম্বর ২৭)

ভারতের প্রথম ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না-খুইয়ে ১৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

২য় দিন (ডিসেম্বর ২৮)

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৪০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা মাত্র ৭ রানে এগিয়ে যায়। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না-খুইয়ে ৮ রান সংগ্রহ করে।

৩য় দিন (ডিসেম্বর ২৯)

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৬ রান দাঁড়ায় (৬ উইকেটে)।

৪র্থ দিন (ডিসেম্বর ৩১)

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১৬ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৪৬ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় জয়লাভের জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরও ১৬৪ রানের দরকার ছিল। হাতে জমা ছিল ৭টা উইকেট এবং একদিনের পুরো খেলার সময়।

৫ম দিন (জানুয়ারী ১, ১৯৭৫)

বেলা ১১টা ৫৫ মিনিট সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ২২৪ রানের মাথায় শেষ হলে ভারত ৮৫ রানে জিতে যায়।

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারত ৮৫ রানে জিতেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতের এটা দ্বিতীয় জয় তথা ভারতের মাটিতে প্রথম জয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারতের প্রথম জয় ৭ উইকেটে, পোর্ট অব স্পেনের ২য় টেস্ট, ১৯৭০-৭১।

১৯৭৫ সালের শুভ ১ জানুয়ারী তারিখে ১২টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি সময়ে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাঙ্গালোরের প্রথম টেস্টে ২৬৭ রানে এবং দিল্লীর দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ১৭ রানে জয়লাভের সূত্রে বর্তমানে ২—১ খেলায় এগিয়ে মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামবে।

ভারতের এই ঐতিহাসিক জয়লাভে বিশ্বনাথ এবং চন্দ্রশেখরের অবদানই ছিল সবথেকে বেশী। দলের অতি সংকট সময়ে বিশ্বনাথ পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে প্রথম

কলকাতার তৃতীয় ক্রিকেট টেস্টে 'ম্যান অব দি ম্যাচ'—জি আর বিশ্বনাথ। তিনি ভারতীয় দলের পক্ষে উভয় ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেন—১ম ইনিংসে ৫২ এবং ২য় ইনিংসে ১৩৯ (উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান)। তাছাড়া তিনটে 'ক্যাচ' ধরেন—১ম ইনিংসে দুটো এবং ২য় ইনিংসে একটা (চন্দ্রশেখরের বলে কালিচরণকে)।

—ফটো : অমৃত

কলকাতার তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২য় ইনিংসে সহজেই ঘায়েল করে ভারতের জয়লাভের পথ প্রশস্ত করে দেন এই দুই বোলার—বি এস চন্দ্রশেখর এবং বি এস বেদী। শেষ ৫ম দিনে চন্দ্রশেখর ৪৪ রানে ৩টে এবং বেদী ১৫ রানে ৩টে উইকেট নিয়েছিলেন। —ফটো : অমৃত

ইনিংসে ৫২ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৯ রান করেছিলেন। তাছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে কালিচরণের 'ক্যাচ' লুফে ভারতের অনুকূলে খেলার মোড় ঘোরাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। বিশ্বনাথ ছিলেন 'ম্যান অব দি ম্যাচ'। ভারতের জয়লাভের পথে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। খেলার শেষ পঞ্চম দিনে তাঁরই বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিনজন নামকরা ব্যাটসম্যান পর-পর আউট হয়ে যান—১৬৩ রানের মাথায় লয়েড (৪র্থ উইকেট), ১৭৮ রানের মাথায় কালিচরণ (৫ম উইকেট) এবং ১৮৬ রানের মাথায় জুলিয়েন (৬ষ্ঠ উইকেট)। এই তিনজন খেলোয়াড়ের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে। এই দিন বেদীর বলে আউট হন মারে, গিবস এবং রবার্টস। হোল্ডার রান-আউট হন।

চতুর্থ দিনে পূর্ব দিনের অপরাজিত ৭ম উইকেট জুটি বিশ্বনাথ (৭৫ রান) এবং ঘাবড়ি (৫ রান) যখন দ্বিতীয় ইনিংস (খেলতে নামেন, তখন ভারতের রান ছিল ২০৬ (৬ উইকেট)। দলের এই সংকট-সময়ে শেষ পর্যন্ত ৭ম উইকেট জুটিতে বিশ্বনাথ এবং ঘাবড়ি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের অতি মূল্যবান ৯১ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। ঘাবড়ি ২৭ রান করে দলের ২৮৩ রানের মাথায় আউট হন। অপরদিকে বিশ্বনাথ ৩৭৫ মিনিট খেলে ১৩৯ রান করে আউট হন দলের ৩০১ রানের মাথায়। বিশ্বনাথের এই ১৩৯ রানে ছিল ২৩টা বাউণ্ডারী। টেস্ট খেলায় বিশ্বনাথের এটা তৃতীয় সেঞ্চুরী। বিশ্বনাথ তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ১৯৬৯-৭০ সালে কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরী (১৩৭ রান) করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশ্বনাথ ছাড়া আরও পাঁচজন খেলোয়াড়—লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, কৃলাপ সিং, আব্বাস আলি বেগ এবং হনুমন্ত সিং নিজ নিজ খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করলেও টেস্ট খেলায় তাঁরা দ্বিতীয় সেঞ্চুরী করতে পারেননি। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশ্বনাথকে নিয়ে যে ছয় জন খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র বিশ্বনাথই দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন।

চতুর্থ দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৩০৯ রানে এগিয়ে যায় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩১০ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৪৬ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলায় জয়লাভ করতে আরও ১৬৪ রানের প্রয়োজন। হাতে জমা ৭টা উইকেট এবং একদিনের সময়। এই সময়ে ৭ উইকেটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৬৪ রান সংগ্রহ করা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না। অপরদিকে বর্তমান টেস্ট সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতের শোচনীয় পরাজয় স্মরণ করে ভারতের অতি বড় গোঁড়া সমর্থকও এই তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতের জয় সম্পর্কে কল্পনা করতেও ভরসা পাননি। তবু অনুষ্ঠানে যাতে কোন ত্রুটি না থাকে, তার জন্যে শেষ পঞ্চম দিনের খেলায় অনেকেই মাঠে সঙ্গে এনেছিলেন শাঁখ, কাঁসর-ঘণ্টা, বিউগিল প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র।

শেষ পঞ্চম দিনে ভারতের জয়লাভের পথে খেলার মোড় ঘুরিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পরপর তিনজন প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান—অধিনায়ক লয়েড, কালিচরণ এবং জুলিয়েন চন্দ্রশেখরের বলে আউট হন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের তখন ৬টা উইকেট পড়ে ১৮৬ রান। পঞ্চম দিনে চন্দ্রশেখরের সেই সময়ের বোলিং পরিসংখ্যান ছিল : ওভার ৭'৪, মেডেন ০, রান ৩০ এবং উইকেট ৩। চন্দ্রশেখরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়লাভের সকল আশা নির্মূল করে দিয়েছিলেন। তাঁর পরে বেদী তিন-জনকে আউট করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২২৪ রানের মাথায় বেদীর বল খেলতে গিয়ে রবার্টস বোল্ড আউট হলে খেলা শেষ হয়ে যায়। ফলে ভারত ৮৫ রানে জয়ী হয়। ঘড়িতে তখন ১১টা বেজে ৫৫ মিনিট। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। জয়লাভের আনন্দে সারা মাঠ ফেটে পড়ে—কাঁসর-ঘণ্টা, শাঁখ এবং বিউগিল-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ওঠে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ২৩৩ রান (বিশ্বনাথ ৫২, মদনলাল ৪৮, গাইকোয়াড় ৩৬ এবং মনসুর আলি ৩৬ রান। রবার্টস ৫০ রানে ৫ এবং হোল্ডার ৪৮ রানে ২ উইকেট)

ও ৩১৬ রান (ইঞ্জিনীয়ার ৬১, বিশ্বনাথ ১৩৯ এবং ঘাবড়ি ২৭ রান। রবার্টস ৮৮ রানে ৩, হোল্ডার ৬১ রানে ৩ এবং উইলেট ৫১ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৪০ রান (রয় ফ্রেডেরিকস ১০০ এবং মারে ২৪ রান। মদনলাল ২২ রানে ৪ এবং বেদী ৬৮ রানে ২ উইকেট)

ও ২২৪ রান (কালিচরণ ৫৭ এবং রিচার্ডস ৪৭ রান। চন্দ্রশেখর ৬৬ রানে ৩ এবং বেদী ৫২ রানে ৪ উইকেট)

সোবার্সের 'স্যার' উপাধি লাভ

ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথ ১৯৭৫ সালের ইংরেজি নববর্ষে যাঁদের সরকারী খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে 'স্যার' উপাধি লাভ করেছেন এই দুজন ক্রীড়াবিদ—প্রখ্যাত দৌড়বীর ডাঃ রজার ব্যানিস্টার এবং সর্বকালের বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ চৌখস টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স।

১৯৫৪ সালে ডাঃ রজার ব্যানিস্টার সর্বপ্রথম ৪ মিনিটের কম সময়ে ১ মাইল দৌড় অতিক্রম করেন। ডাঃ ব্যানিস্টার

স্যার গারফিল্ড সোবার্স

সম্প্রতি ইংল্যান্ডের স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদ থেকে অবসর নিয়েছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্সের বর্তমান বয়স ৩৮। তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে গত বছর অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সোবার্সের বিবিধ বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এখানে উল্লেখ্য, সোবার্সকে নিয়ে এপর্যন্ত ৭ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় 'স্যার' উপাধি লাভ করেছেন—ইংল্যান্ডের তিনজন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিনজন এবং অস্ট্রেলিয়ার এক-জন। সোবার্সের আগে এই ৬ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় 'স্যার' উপাধি লাভ করেছেন—স্যার পেলহাম ওয়ার্ণার (ইংল্যান্ড), স্যার জন বেরী হবস (ইংল্যান্ড), স্যার ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), স্যার লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), স্যার লিওনার্ড হাটন (ইংল্যান্ড) এবং স্যার ফ্র্যাঙ্ক ম্যাগলিনি ওরেল (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)।

সোবার্সের টেস্ট পরিসংখ্যান

খেলা ৯৩ ইনিংস ১৬০ নট-আউট ২১ বার মোট রান ৮০৩২ (বিশ্ব রেকর্ড) এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৬৫ নট আউট (বিশ্ব রেকর্ড) গড় ৫৭ ৭৮ সেঞ্চুরী ২৬টা এবং ক্যাচ ১১০। বোলিং : বল ২১২৮৭ মেডেন ৯৭১ রান ৮০০৪ এবং উইকেট ২৩৫ (গড় ৩৪.০৫) এক ইনিংসে পাঁচটা করে উইকেট ছয় বার।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

মেলবোর্নে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। মাত্র ৮ রানের জন্যে অস্ট্রেলিয়া খেলায় জিততে পারেনি। পঞ্চম দিনের খেলা যখন শেষ হয়, তখন অস্ট্রেলিয়ার হাতে জমা ছিল দুটো উইকেট এবং জয়লাভের জন্যে দরকার ছিল মাত্র ৮ রানের।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৪ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৬ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না-খুইয়ে ৪ রান সংগ্রহ করে।

এখানে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে ১৬৬ রানে এবং দ্বিতীয় টেস্টে ৯ উইকেটে জয়লাভের সূত্রে ২—০ খেলায় (ড্র ১) এগিয়ে আছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ২৪২ রান (অ্যালান নট-৫২ এবং এডরিচ ৪৯ রান। লিলি ৭০ রানে ২, টমসন ৭২ রানে ৪ এবং ম্যালেট ৩৭ রানে ২ উইকেট)

ও ২৪৪ রান (অ্যামিস ৯০, লয়েড ৪৪ এবং গ্রিগ ৬০ রান। লিলি ৫৫ রানে ২, টমসন ৭১ রানে ৪ এবং ম্যালেট ৬০ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২৪১ রান (রেডপাথ ৫৫ এবং মার্শ ৪৪ রান। উইলিস ৬১ রানে ৫, গ্রিগ ৬৩ রানে ২ এবং টিটমাস ৪৩ রানে ২ উইকেট)

ও ২৩৮ রান (৮ উইকেটে। জি এস চ্যাপেল ৬১ এবং মার্শ ৪০ রান। গ্রিগ ৫৬ রানে ৪ এবং টিটমাস ৬৪ রানে ২ উইকেট)

আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্স

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ছাত্র বিভাগে বিদ্যাসাগর কলেজ (সান্ধ্য) এবং ছাত্রী বিভাগে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছেন ছাত্র বিভাগে বিদ্যাসাগর কলেজের (সান্ধ্য বিভাগ) বুদ্ধদেব দাস এবং গোপাল দাস (যুগ্ম-ভাবে)। এঁরা দুজনেই ১০ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছেন। ছাত্রী বিভাগে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের কুমারী সিক্তা গোস্বামী ১৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

প্রতিযোগিতার প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে এসে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ-সংলগ্ন ট্রাম লাইন অতিক্রম করতে গিয়ে বারাসত গভর্নমেণ্ট কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী ভারতী দাশ ট্রাম চাপা পড়ে মারা যান। তাঁর স্মরণে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড আগামী বছর থেকে তাঁর নামে ছাত্রী বিভাগে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন।

মাঠের নায়ক

তপন ভট্টাচার্য

'ছিলাম ফুটবলের গোলকীপার, হলাম শেষ পর্যন্ত ক্রিকেটের উইকেটকীপার। ফুটবল আমার ধাতে সইলো না। একদিন গুডবাই জানিয়ে ফুটবল মাঠ থেকে চলে এলাম। আজ মনে হচ্ছে ভুল করি নি, কারণ ক্রিকেট আমায় দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছে স্বীকৃতি দিয়েছে, দিয়েছে প্রতিষ্ঠা।'

কথা হচ্ছিল ময়দানের কালীঘাট তাঁবুতে বসে উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান তপন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। উইকেটরক্ষক হিসেবে ভাল, না ব্যাটসম্যান হিসেবে তপন বেশী কাজের তা নিয়ে তর্ক না তুলে এই মুহূর্তে বলা চলে যে, সার্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর নিরলস সাধনা চলছে। নিষ্ঠা একাগ্রতা এবং শান্ত সংযত চিন্তাধারা অটুট থাকলে তপন সার্থকনামা হবেনই।

একথা শুধু আমাদের মত মেঠো লোকের ধারণাই নয় ভারতের তথা দুনিয়ার অন্যতম কৃতী উইকেটরক্ষক ফারুক ইঞ্জি-নীয়ারের ধারণাও বটে। কলকাতায় সদ্য-সমাপ্ত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসে ফারুক এক ফাঁকে তপনকে দেখে গেছেন। তপনকে ওঁর ভাল লেগেছে। অথবা ঘুরিয়ে বলা যায়, ফারুকের চোখে পড়ে গেছেন তপন।

তপন ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৯ সালের পয়লা নভেম্বর পূর্ব কলকাতার ৪০বি অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জি লেনে (বেলেঘাটা)। দাদুর আমল থেকেই ওখানে বসবাস। মা এবং বাবা তাঁদের বড় ছেলে তপনকে ছেলেবেলা থেকেই খেলা-ধুলোয় উৎসাহ যোগাতেন। সন্তোষবাবু নিজেও এককালে ভাল ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন। খেলোয়াড় ছিলেন বলেই বোধহয় ছেলেকে খেলার মাঠে অতোটা উৎসাহ নিয়ে আর আশা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বলে তিনি ছেলের পড়াশুনোর ব্যাপারে কখনও রাশ ছাড়েন নি। তপন স্কুলের পড়া-শুনা করে নিজের পাড়ায় দেশবন্ধু স্কুলে। ১৯৬৬ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে ভর্তি হন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ওখান থেকে ১৯৭০ সালে ডিসটিংশন নিয়ে বি এস সি পাশ করার পর ল কলেজে।

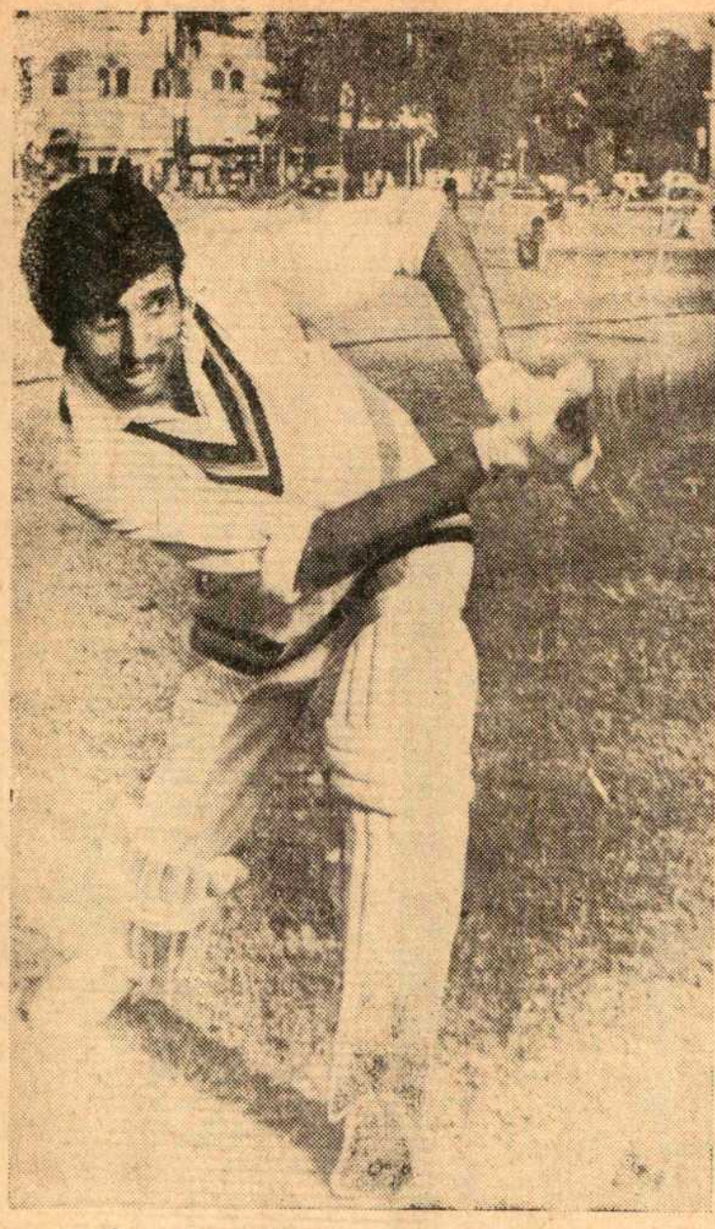

ফাইনাল ল' পরীক্ষাও তপনের ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

স্কুলে ফোর, ফাইভে পড়ার সময় থেকেই তপনের ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয়েছে। অবশ্য তখন ফুটবলও চলছিল পুরোদমে। কলকাতার মাঠে বেলেঘাটা ক্লাবের হয়ে বছর তিনেক গোলপোস্টের নীচে দাঁড়িয়েছেনও তিনি। দেশবন্ধু স্কুলের হয়ে ৬৫ সালে দিল্লীতে সুব্রত ট্রফিও খেলেছেন। কিন্তু এত দূর এগিয়েও ফুটবল তপন ছেড়ে দিলেন সরে দাঁড়ালেন ফুটবল মাঠ থেকে। শুরু হল সিরিয়াস ক্রিকেট।

ঘরোয়া ক্রিকেট লীগে খেলার আমন্ত্রণ পেলেন আজকের হিন্দুস্থান ইস্পাত কারখানার সুপারভাইজার (খিদিরপুর ডক) তপন ১৯৬৪ সালে নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউটের (জুনিয়ার ডিভিসন) মাধ্যমে। তার পরের বছর ১৯৬৬ সালে কোচবিহার ট্রফিতে বাংলা রাজ্য স্কুল দলে খেলার সুযোগ হল। সুযোগ হল খেলার পরের বছরের আসরেও। ১৯৬৬ সালে আন্তঃ আঞ্চলিক স্কুল ক্রিকেটে পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বোম্বাইয়ে উইকেটরক্ষক তথা ব্যাটসম্যানরূপে। নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউট থেকে চলে এলেন ৬৭ সালে ইষ্টবেঙ্গলে। ৬৯ সাল পর্যন্ত ঐ ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবেই রইলেন। পরের বছরে আমন্ত্রণ এলো মোহনবাগান থেকে। গেলেনও। কিন্তু সে শুধু এক বছরের জন্যই। ৭০ সালে আবার ফিরে এলেন ইষ্টবেঙ্গলে। ৭০ থেকে ৭৩ পর্যন্ত একটানা ঐ ক্লাবেই কাটলো জমজমাটভাবে। অবশেষে ৭৪ সালে কালীঘাট ক্লাবে এলেন সুখ্যাত কোচ সুনীল দাশগুপ্তের টানে।

ইতিমধ্যে তপন ১৯৬৮ সালে পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে খেললেন। সেমিফাইনালে সম্বলপুরের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৫৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২০ রান করেছিলেন তপন। অবশ্য ঐ রান তেমন কিছু মনে রাখার মত নয়

আজকের কালীঘাটের লম্বা চওড়া তাজা টসটসে ছেলে তপন ভট্টাচার্যের। তারচেয়ে তপনের ১৯৬৫-৬৬ সালের আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে আসামের বিরুদ্ধে ৭১ এবং ওড়িশার বিরুদ্ধে অপরাজিত ৩৫ রানের স্মৃতিই রমণীয়। ঐ স্মৃতির পাশে ৬৯ সালের স্মৃতিও তপনকে জড়িয়ে আছে। সে বছর লীগে কালীঘাটের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের উইকেটকীপার ছিলেন তিনি। ক্যাচ লুফেছিলেন পাঁচটি, ষ্ট্যাম্পড করেছিলেন দুজনকে। ১৯৭০ সালে মোহনবাগানের হয়ে ইষ্টার্ণ রেলের সঙ্গে নকআউট সেমিফাইনাল খেলায় ক্যাচ লুফেছিলেন তিনটি, ষ্ট্যাম্পড করেছিলেন দুজনকে।

চলতি মরশুমে তপন ইতিমধ্যেই দুটি সেঞ্চুরী করেছেন। প্রথমটি সিনিয়ার লীগে গ্রীয়ারের বিরুদ্ধে (১১৫)। অন্যটি সি সি বি'র বিরুদ্ধে (১২০ অপরাজিত)। গতবারও লীগে দুটি সেঞ্চুরী ছিল তার (এলবার্ট এবং দক্ষিণ কলকাতার বিরুদ্ধে)' ১৯৭৪-৭৫ সালে রণজি ট্রফি খেলার প্রথম সুযোগ তপন পেয়েছেন জোড়হাটে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আসাম। ১৯৭১-৭২ সালে আন্তঃ ইস্পাত প্রকল্প ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় (জামশেদপুর কিনান ষ্টেডিয়াম) তপন সেরা ব্যাটসম্যানের স্বীকৃতি পান টিস্কোর সঙ্গে হিন্দুস্থান ইস্পাতের খেলাকে কেন্দ্র করে। প্রথম ইনিংসে রান করেছিলেন ৭৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৮। ৭২-৭৩ সালেও আন্তঃ ইস্পাত ক্রিকেটে তিনি একই সম্মানে ভূষিত হন (সেরা ব্যাটসম্যান)। খেলা হয়েছিল সেবার ভিলাইয়ে।

তপনের সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে ক্রিকেট এবং ক্রিকেটের সেই কেতাবী মার পুল ও হুক। আর প্রিয় হচ্ছে লাউড কলারের পোশাক-পরিচ্ছদ। আদর্শ ফারুক ইঞ্জিনীয়ার।

'কিন্তু ফারুকের মত তো অফ-ড্রাইভ করতে পারো না তুমি?' আমি প্রশ্ন করি। 'সত্যিই পারি না, কোন দিন কোন বিষয়ে ফারুকের ধারে কাছেও বোধহয় যেতে পারবো না। তবে অফ ড্রাইভ করতে পারি না কেন জানেন? ছোটবেলায় পড়ে গিয়ে বাঁ হাতটা না আমার কম্পাউন্ড ফ্রাকচার হয়ে গিয়েছিল। বাঁ হাতটায় তাই জোর বড় কম পাই যে'—তপন নির্বিধায় উত্তর দেন।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

আরতি ভট্টাচার্য। ফটো : অমৃত

বায়োস্কোপিক

দেখাগৃহ

হ্যাঁ, যা নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেটা শেষ পর্যন্ত কেমন চমকপ্রদভাবে শেষ হল—সেটা শুনুন। পার্থপ্রতিমকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই হতভম্ভ হয়ে সেই সিনেমা হাউসের লবিতে দাঁড়িয়ে আছি। কাবুলীওয়ালা, শেষপর্যন্ত একজন কাবুলে তেড়ে-ফুঁড়ে এসে গ্যাঁটের পয়সা খর্চা করে পার্থ-পরিচালিত নিরেট বাংলা ছবি দেখতে ঢুকেছে এই সংবাদেই আমাদের অচৈতন্য হয়ে যাবার কথা, বায়োস্কোপের লোকেদের নার্ভ নিতান্তই একস্ট্রা স্ট্রং—তাই ঠ্যাঙ্গের ওপর ভর দিয়ে তখনও সটান দাঁড়িয়ে আছি, বিশেষ করে পার্থপ্রতিমের তো বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ার দাখিল, গেট-কীপার হাতের টর্চ ঘুরিয়ে আমাদের আশ্বস্ত করল। সে নিরাসক্ত কণ্ঠে বললে—অত ঘেবড়ে যাচ্ছেন কেন? এক্ষুনি ইন্টারভ্যাল হবে, তখন ব্যাপারটা বাজিয়ে নেবেন।

ইয়েস, দারুণ যুক্তিপূর্ণ কথা, এটা আমাদের কারো খেয়াল হয়নি।

ছবির সম্পাদক তরুণ দত্ত আমাদের সঙ্গেই ছিল। এক নম্বরের ছটফটে মানুষ। সে বললে—আমি বরং হাউসের ভেতরটায় একবার ঘুরে আসি। দেখি ব্যাটা বাস্তবিক কি করছে—

বলে আমাদের মতামতের অপেক্ষা না করেই ও হুট করে ঢুকে পড়ল হলের মধ্যে। আবার পরক্ষণেই বেরিয়ে এল। —আচ্ছা কোন রো-তে বসেছে দাদা, মানে কাবুলেটা?

গেট-কীপার বললে—ঢুকেই বাঁ দিকে থার্ড রো-তে চারটে চেয়ার ছেড়ে বসেছে। গিয়ে দেখুন আবার সটকে গেছে কিনা—

তরুণ কথাটা শুনেই ঢুকে পড়ল।

তারপর মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এল। উত্তেজনায় তার মুখটা থমথম করছে। বললে—হ্যাঁরে, বাস্তবিক একটা কাবুলে, বেশ পুরুষ্টু সাইজের। বসে বসে ছবি দেখছে একমনে।

ব্যস, আমাদের দফা নিকেশ।

—পার্থ, তুই কেলেঙ্কারী বাধিয়েছিস। বিমলমামাকে বলে ছবি এক্ষুনি আফগানিস্থানের জন্যে বুক করার ব্যবস্থা কর। সুন্দুর জানি কাবুলে তিন-চারটে ভাল ভাল সিনেমা-হল আছে। ওখানে রিলিজ হলে তোর ছবি **একেবারে গোল্ড মাইন হয়ে যাবে।**

আমরা এইসব নিয়ে বিস্তর হৈ-চৈ করছি, এই সময় সেখানে রবি ঘোষ নগদ এসে হাজির। পার্থর সে-ছবিতে রবিদা একটা চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিল। আর আমাদের সঙ্গে রবিদার রিলেশনটাও খুব গাঢ়। সেদিন রবিদার হাতে সম্ভবতঃ কোন কাজ ছিল না। তাই সন্ধ্যের ঝোঁকে ঝোঁকে হাউসে এসে হাজির। ভাবখানা, যাই এক পেট আড্ডা দিয়ে আসি। খুব একটা প্যাড়দারি (শব্দটা রবি ঘোষেরই সৃষ্টি। প্যাড়দার মানে প্রকাণ্ড বুদ্ধিজীবী। আঁতেল। আঁতেল টু দ্য ইনফিনিটি। প্যাড়দার তাকেই বলা চলবে যিনি ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মানুষজন পশু পক্ষী ঈশ্বর এবং শয়তানকে ক্রমাগত জ্ঞান দিয়ে বেড়াবে। অথচ ওই বস্তুটি ভুলেও কারো কাছ থেকে গ্রহণ করবে না।) ভঙ্গীতে।

আমরা জটলা করছি দেখে রবিদা জানতে চাইল—এখানে বিটোফেনের সেভেনথ সিম্ফনি বাজছে কেন?

পার্থপ্রতিম দ্রুত বলল—রবিদা, একটা কাণ্ড হয়েছে—

—কী কাণ্ড? প্রকাণ্ড না ছোট কাণ্ড?

—না না, ঠাট্টা নয়। একটা কাবলীওলা টিকিট কেটে আমার ছবি দেখতে ঢুকেছে—

—যাঃ।

—সত্যি বলছি।

—কখন?

—এই তো ইভনিং-শোতে—

শুনে রবিদা একটু চিন্তা করে বলল—এটা আমি জানতাম। বলে রবিদা একটু খুক খুক করে হাসল। তারপর বলল—এ-ছবিতে আমার আউটস্ট্যাণ্ডিং অভিনয়ের খ্যাতি এই কদিনে এত ছড়িয়েছে যে, কাবুলীওয়ালারা পর্যন্ত ছবি দেখতে ছুটে আসছে। এটা আমি গোড়াতেই জানতাম। এখন দেখবে, পাঞ্জাবী সিন্ধি, গুজরাটী মারাঠী তেলেগু তামিলনাড়ুর দর্শকেরা ছুটে আসবে প্রতিদিন। এ তো সবে কলির সন্ধ্যে—

রবিদা এমন বলল যে আমরা সবাই হেসে গড়াগড়ি। বাস্তবিক, কলকাতার শ্রেষ্ঠ প্যাড়দার যে স্বয়ং রবি ঘোষ—এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ইতিমধ্যে ইন্টারভ্যালের ঘণ্টা বাজল। দর্শকরা হুড়মুড় করে হল থেকে ফুটপাতের সব মালপত্র কেনবার জন্যে বেরিয়ে আসছে, এমন সময় লবির কোণার দিকে বেশ একটা হট্টগোল শোনা গেল। আমরা ছুটে গিয়ে দেখি, মাল ক্যাচ, একটি মাঝবয়সী লোককে একজন কাবলেওয়ালা ঠিকই চেপে ধরেছে, লোকটা কেঁউ কেঁউ করছে আর কাবলেটা তাকে যাচ্ছেতাই সব ডায়লাগ দিচ্ছে।

রবিদা তখন সবে অটোগ্রাফ দিচ্ছে দু-একটা। বলল—আমি ব্যাপারটা এই রকমই অনুমান করেছিলাম। ওই লোকটাকে ফলো করেই কাবলেটা হলে ঢুকেছে। নইলে মাথা-খারাপ, কাবলে কখনও বাংলা বায়োস্কোপ দেখে? হিন্দী বায়োস্কোপ ছেড়ে?

মজবুর/অমিতাভ বচ্চন/প্রবীণ বাবী

ক্রুদ্ধ কাবলে যা বলল তা হচ্ছে—মশাই এই লোকটা থাকে বালিগঞ্জে, আঠারোশো টাকা নিয়েছে সেই বছর দুয়েক আগে। তারপর থেকে আর দেবার নাম-গন্ধ নেই, শুধু ন্যাজে খেলাচ্ছে। তা আজ বাছাধনকে ধরেছি। ভেবেছিল সিনেমা হলে ঢুকে নজর এড়িয়ে হাওয়া দেবে, কিন্তু আমি পেছ ছাড়িনি, আঠার মত সেই তখন থেকে পেছনে লেগে আছি। দাও টাকা দাও—

লোকটা বলল—এঃ, সর্বক্ষণ যেন তোমার জন্যে টাকার আণ্ডিল সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে। ঢের দিয়েছি। আর পারব না। নিয়েছিলাম আঠারোশো, এই দু-বছরে দিয়েছি ছত্রিশশো, ব্যস—।

সঙ্গে সঙ্গে পক্ষে আর বিপক্ষে দু-দল লোক বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কাবুলের পক্ষ-সমর্থনকারীরা হেঁকে বলল—টাকা না দিলে আজ ছাল ছাড়িয়ে নেব, আর লোকটির সমর্থকেরা সাফ জানিয়ে দিল—একটা আধলাও আর নয়, তেমন চেষ্টা করলে চামড়া খুলে টান করে তাতে আজ ঢুগঢুগি বাজিয়ে তবে বাড়ি যাব। দেখি কার ক্ষমতা টাকা আদায় করে—

দু-দলে কাজিয়ে লেগে যায় আর কি! আমরা হাঁ হয়ে সব শুনছি। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এমন সময় হলের লাস্ট বেল বেজে উঠল। স্লাইড দেখানো শেষ, এবার মূল ছবি শুরু। দেখতে হল না, মুহূর্তে লবি ফাঁকা। মায় কাবলে সমেত। সে-ও হলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। নগদ পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে সিনেমা দেখার ওই এক হ্যাঙ্গামা, ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয়—ছবির শেষ পর্যন্ত না দেখলে মন ওঠে না, তা ছবি সে যতই মন্দ হোক না কেন!

একবার প্রদীপ ওরফে মঞ্জু দাশগুপ্তের সঙ্গে আমাকে কেওড়াতলা শ্মশানে পর পর দুদিন রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। না না, কোন সৎকার-টৎকার উপলক্ষে নয়, মঞ্জুদা প্রেম করে একটা মেয়েকে বিয়ে করতেই দুই বাড়িতে প্রচণ্ড হট্টগোল, মঞ্জুদার দাদা হচ্ছেন খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত, এই বিয়েতে তাঁর বিন্দুমাত্র মত ছিল না, তিনি যাঁহা সংবাদ পেলেন ছোটভাই রেজিস্ট্রী ম্যারেজ করেছে, ব্যস, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে স্ত্রীকে বললেন—তোমার আস্কারাতেই মঞ্জু এতদূর অধঃপাতে গেছে, দুম করে বিয়ে করেছে সে-ছেলে—

এমন সময় মঞ্জুদা হাসি-হাসি মুখে বাড়ি ঢুকছিল, পড়ল স্রেফ তোপের মুখে—গেট আউট, গেট আউট গেট আউট—

মঞ্জুদা হতভম্ব। —কে? আমি?

—ইয়েস তুমি। আমার অমতে বিয়ে করেছ শুনলাম; ইজ ইট এ ফ্যাক্ট?

মঞ্জুদা ইতঃস্ততঃ করে, ঘাড় চুলকে—মানে মতামতের কথা—

—অর্থাৎ আমার মতামতের কেয়ার না করেই বিয়ে করেছ। অতএব গেট আউট—

স্ত্রী যত বোকান আর ছি ছি কি করছ, সুকুমারদা তত ক্ষেপে যান—রেজিস্ট্রি করে

তিন পরী ছয় প্রেমিক
তিলক চক্রবর্তী /যাঁই বন্দ্যোপাধ্যায়

বিয়ে! ছিঃ। মঞ্জু ইউ ফিলজ গেট আউট, আমার ব্লাড প্রেশার চড়ে যাচ্ছে—

অতএব মঞ্জুদা আউট। সুকুমার দাশগুপ্ত তখন উত্তমকুমার মালা সিনহাকে নিয়ে 'সাথীহারা' ছবির শুটিং করছেন। আর মঞ্জু দাশগুপ্ত তখন 'অবাক পৃথিবী' ছবির সঙ্গে যুক্ত। ফিল্ম লাইনের সবাই এই উজ্জ্বল মেধাবী অক্লান্তকর্মী তরুণকুশলী মঞ্জু দাশগুপ্তকে ভালবাসত। সুচিত্রা সেন নিজের ছোটভাইয়ের মত স্নেহ করতেন মঞ্জুদাকে। উত্তমকুমার বিশেষ পছন্দ করতেন এই তরুণ যুবককে। তরুণকুমার ছিল মঞ্জুর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সবাই জানে—'অবাক পৃথিবী' ছবিটি তরুণকুমার নিজে প্রযোজনা করেছিল শুধু মঞ্জুকে চলচ্চিত্র শিল্পে একটা প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে। মঞ্জু নিজের পায়ে দাঁড়াক, নাম করুক, বড় হোক—এটা সবাই চেয়েছে কিন্তু মঞ্জুদা সেই সবাইকেই বোকা বানিয়ে, সবাইকেই বেদনায় মুহ্যমান করে একদিন পালিয়ে গেছে, সে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ, বারান্তরে বলব।

একেবারে বোল্ড আউট মঞ্জুদা। আমাদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিয়ের প্রসঙ্গটা একদম চেপে গিয়েছিল। হঠাৎ তরুণকুমারের মুখে ফাঁস হয়ে গেল। উত্তমকুমার মঞ্জুকে বলে দিয়েছিলেন, বিয়ে করে বৌ নিয়ে সোজা আমার বাড়িতে চলে আসবি।

মঞ্জুদা তাই-ই করেছিল। রেজিস্ট্রি

অঙ্কুর/শাবানা আজমি/ অমৃত ব্যাগ

রাজশ্রী বসু/ফটো : অমৃত

অফিস থেকে সোজা উত্তমকুমারের বাড়ি। গুরু দুজনকেই আশীর্বাদ করেছিলেন, গুরুপত্নী সোনার হার দিয়ে নতুন বৌয়ের মুখ দেখেছিলেন। তারপর হেভি খ্যাট। যাতে আমরা নাকি বাদ।

এসব খবর মঞ্জুদা বোল্ড আউট হওয়ার পর সব পাওয়া গেল। খোকন আমাকে বললে —মঞ্জুদার মেজাজ খুব খারাপ, সাবধানে কথা বলবে খোকা নইলে কপালে তোমার দুঃখু আছে।

পরদিন আমার শুটিং নেই। মঞ্জুদারা 'অবাক পৃথিবীর' শুটিং শেষ করে ল্যাবরেটরীতে এল। উত্তমকুমার ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

আমায় দেখে মঞ্জুদা ইসারায় কাছে ডাকল—কিরে, কি কচ্ছিস?

—স্রেফ আড্ডা।

—চল চা খাওয়া যাক।

চা খেতে খেতে আমি কিন্তু কিন্তু হয়ে প্রশ্ন করলাম—শুনলাম তুমি নাকি আলাদা হয়ে গেছ?

মঞ্জুদা আমার দিকে চমকে ফিরে তাকাল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—বুড়ো (তরুণকুমার) তাই বললে বুঝি?

আমি ইতঃস্তত করে বললাম—না, ঠিক বুড়োদা বলেনি, তবে এই রকম গুজব শুনছি। তা কোথায় আছ? বৌদি কোথায়?

—বৌদি? সে তার বাপের বাড়িতে আপাততঃ ফিরে গেছে। আর আমি একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় আছি পরপর ক'রাত?

—কোথায়?

—শ্মশানে!

—যাঃ!

—বাস্তবিক। বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে একরাত কাটিয়ে দেখ, তুই তো লেখার রসদ খুঁজিস, পেয়েও যেতে পারিস। ফার্স্টক্লাস জায়গা কিন্তু—

কাট-টু-কাট আমরা রাসবিহারীর আড্ডা সেরে রাত সাড়ে এগারোটায় শ্মশানমুখো।

মঞ্জুদা বললে—দাঁড়া, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। বলে পশ্চিম দিকের একটা পাঞ্জাবী হোটেলে আমাকে নিয়ে ঢুকল। বেশ গর্মাগর্ম তড়কা আর রুটী হলো দু-প্লেট। সর্দারজী মঞ্জুদার মুখের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—ভগবান তেরা ভালা করে মঞ্জু—

মঞ্জু সহাস্যে বলল—করবে করবে, সময় হলে ঠিকই করবে সর্দারজী, ঘাবড়াও মৎ।

সর্দারজী পয়সা নেবার পাত্তরই নয়। উল্টে সেদিনের গুরুমুখী খবরের কাগজটাই দিয়ে দিল। আর দিল দুটো নিমের দাঁতন।

এটা পাঞ্জাবী হোটেলের রেওয়াজ। রাত্রের খাবার খেলে ওরা খদ্দেরকে একটা করে নিমের দাঁতন দেয়। এখন ব্যবস্থা কি-রকম আর জানি না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা সেই নিশুতি জনবিরল রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এলাম শ্মশানঘাটে। আমার এমনিতেই গা ছমছম করছিল—হ্যাঁ মঞ্জুদা, ওখানে শোবে কোথায়?

—ব্যবস্থা আছে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন!

দেশবন্ধুর স্মৃতি স্তম্ভের বেদী তখন অন্ধকার। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে মাঝে মাঝে যেন জোনাকীর আলো ঝিলিক দিচ্ছে। মঞ্জুদা বললে—বোর্ডাররা শুয়ে বিড়ি টানছে। মহেন, এই মহেন—

ছোট করে হাঁক পাড়তেই কোথায় ছিল সেই লোকটা। অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো, যেন হানচ ব্যাক অফ নোতেরদম, কোটরাগত চোখ দুটো জ্বলছে যেন, গায়ে ছেঁড়া একটা শার্ট, পরনে ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট, যেমন কুঁজো তেমন কদাকার, ফ্যাঁস-ফেঁসে গলায় বললে—বাবু নাকি? সঙ্গে উটি কে?

—আমার বন্ধু। ...জায়গা ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ বাবু, দু আনা—

—এই নাও—বলে মঞ্জুদা ওকে দু-আনা পয়সা দিল। লোকটা মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারের আড়ালে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। হাতে দুটি আস্ত থান ইঁট।

—চলেন বাবু, শালাদের উৎপাতে জায়গা রাখবার উপায় নেই। যওসব।

গজগজ করতে করতে মহেন আমাদের বেদীতে নিয়ে এসে বলল—এই গঙ্গার ধারটাতে আজ শুয়ে পড়েন। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যাবে।

এতক্ষণে সব পরিষ্কার হলো। থান ইঁট দুটি আসলে হচ্ছে বালিশ। আর বালিশের ওয়াড় হচ্ছে খবরের কাগজ। বেদীতে অনেকগুলো লোক ততক্ষণে দিব্যি নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। আকাশে মরা জ্যোৎস্না। আদি গঙ্গার জলে সেই আলো বিদ্যুতের ঝিলিক হানছে।

মঞ্জুদা বলল--এখনও সব বোর্ডার এসে পৌঁছায়নি। যত রাত বাড়বে তত আমদানি হবে। এ-একটা বিচিত্র জগৎ। রঞ্জিত আমাকে এই জায়গাটার সন্ধান দিয়েছিল। এখানে এখন যারা শুয়ে আছে, তাদের মধ্যে সমাজের সব স্তরের লোক আছে। বটতলার উকিল, ভবঘুরে গায়ক, বেকার কবি ব্যর্থ প্রেমিক মাতাল বেশ্যার দালাল পকেটমার মস্তান সন্ন্যাসী লেখক সাংবাদিক গোঁসাদার গেরস্থ—ঘটনাচক্রে এখানে এসে সবাই রাত কাটাচ্ছে। আর ওই মহেন হচ্ছে এখানকার অলিখিত ঠিকাদার। ওকে চারটে পয়সা দিলেই তুমি এখানে একটা রাত স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারবে। অথচ সারাদিন কিন্তু কাউকেই এখানে দেখতে পাবে না—

—বিড়ি আছে এট্টা—হেঁড়ে গলায় আমাদের পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল—থাকলে দিন, দেশলাই আছে আমার কাছে—

মঞ্জুদা বল—না বিড়ি নেই।

লোকটা সংগে সংগে বলল—তা হলে বক্তৃতা না করে এখন শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে কথা হবে।

মঞ্জুদা হেসে বলল—সিগ্রেট আছে। দেবো?

অন্ধকারের মধ্যে থেকে শুধু একটা হাত বেরিয়ে এলো। মঞ্জুদার কাছ থেকে সিগ্রেট নিয়ে সে হাত যথাস্থানে ফিরে যাবার আগেই শোনা গেল--নিন, এবার রাত জেগে যত খুশী গপ্প করুন। দেশলাই দরকার হলে বলবেন, জেগেই রইলাম—

বাতাসে কটু তামাকের গন্ধ। মঞ্জুদা খাটো গলায় বলল—গাঁজা টানছে কেউ বোধহয়—

সংগে সংগে দূর থেকে ভেসে এলো উদাত্ত কণ্ঠ—ব্যোম ব্যোম শংকর, কাটা হবেন টংকর, যিস্কো খানা উস্কো পিনা,—মহাদেউকে প্রেসাদ বিনা--যাঃ শালা—

আর সেই কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে কলকণ্ঠ শোনা গেল—বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল...

অদূরে কে যেন হাসল—আমি মাত্তর পৌণে দুশো গজের মধ্যে শুয়ে আছি, একদিন এখান থেকে গড়াতে গড়াতে শালা ঠিকই নিজের চিতেয় গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠব। কাউকে কষ্ট করে আর বয়ে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে না। শুধু তোমরা দাদারা এট্টু হরিবোল আওয়াজটা দিয়ে দিও। তার বদলে আমি সব্বাইকে একনম্বর বাংলা মাল খাইয়ে দেব--

একজন চেঁচিয়ে জানতে চাইল—মুখাগ্নি?

—সেটা আগেই সেরে রেখেচি রে শালা, আমি অত কাঁচা মাল নইরে কানাই—

—আমি কানাই না ব্রাদার, আমি গুপী—

—ঠিক আছে গুপেদা, মুখাগ্নি নিয়ে তুমি শালা নিজে এখন ভেবে মর। কাল প্রাতঃকালে বাড়ি গিয়ে ওকম্মোটি যেন-তেন প্রকারে সমাধা করে তবে রাতে এখানে ফিরে এসো, বুয়েচ বাবা—

—বুয়েচি!

মঞ্জু বললে- এরা থাকে। আপন আপন সাধনার মার্গে। নিজের নিজের তপস্যার বিভোর হয়ে। নে শুয়ে পড়। চুপচাপ শুনে যা, দেখবি কোথা দিয়ে রাতটা কেটে গেছে।

পাশের একটা লোক, মঞ্জুদা ফিস ফিস করে বলল—ও হচ্ছে চোর। সারারাত এ-বাড়ি ও-বাড়ি চুরির চেষ্টায় ঘুরবে, সাকসেসফুল না হলে ঘুরে ঘুরে এখানে চলে আসবে। গেরস্থকে গালাগালমন্দ করে ভূত ভাগিয়ে দেবে। আর যদি ঘুরে না আসে তো বুঝতে হবে নিশ্চিত কারো সর্বনাশ করে নিজের ডেরায় ফিরে গেছে।

অন্ধকার ততক্ষণে চোখে সয়ে এসেছে। দেখি গায়ে কালো গেঞ্জি আর কালো হাফপ্যান্ট পরে একটা কুৎসিৎ দর্শন লোক বসে বসে খৈনি টিপছে। লোকটার পায়ের কাছে কয়েকটা ভারি ধাতব জিনিস মরা জ্যোৎস্নার আলোয় চিক চিক করছে। এরপর লোকটা, ঠিক যেন বিড়াল, নিঃশব্দ লঘু পদসঞ্চারে উঠে কোথায় যেন যাত্রা করল।

(চলবে)

—রঞ্জন মজুমদার

অর্জুন/রূপ দত্ত

ফের থেকে বলছি

দিনের বেলায় সিঁদুর দাও—রাতের বেলায় ুর মোছ। দিনের বেলায় ঘোমটা দাও—তর বেলায় খেমটা নাচো। প্রসাদের এই য়া-পাওয়ার মাঝখানে লতা একদিন ভেব করে—এই যে ঘর ঘরের বাহির হার প্রকাণ্ড ফটক পর্যন্ত তার অনেক কার ছড়িয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে মনের সেটা মেঘ হয়ে জমেছে! কখনও বৃষ্টি ছে কখনও হয়নি। কিন্তু ঝড় উঠেছে। ল ঝড়। সমাজের বাইরে আর মধ্যে সং-রের যে পাঁচিল ঝড়ে সেটা ভেঙে পড়বার ম হয়েছিল। মনে-প্রাণে ভেঙে ফেলতে ছিল লতা। সে চেয়েছিল সমস্ত গণ্ডী ে পরিপূর্ণভাবে নারী হতে। তা হয় রাখালবাবু লতাকে পুত্রবধূ ভাবতে তন যদি তার একটা ছেলে থাকত। এই শুনে লতার মন ভরে গিয়েছিল। জীবনের স্বাদ পেয়ে এইভাবে তার নের গতি পরিবর্তিত হতে চলেছিল। । যথাসময় প্রসাদ তাকে মনে করিয়ে —তুমি আমার কেপ্ট। বাঁধা মেয়ে। খী তাই করতে পারি। সোনাগাছি ত আর মুখ দেখতে আনা হয়নি।... ধরনের কথা শুনে এক একবার লতার বদ্রোহী হয়েছিল। প্রথম যখন শিমুল-—অসহ্য হয়ে লতা চলে গিয়েছিল। প্যাটরা নিয়ে রওনা দিয়েছিল াতার উদ্দেশ্যে। পথঘাট জানা নেই নেই। হাঁটতে হাঁটতে সে এসে য়েছিল একটা ভগ্নপ্রায় জীর্ণ পকার সামনে। তাকে অনুসরণ করতে প্রসাদ চলে এসেছিল। লতা রওনা পর প্রসাদ বুঝতে পেরেছিল ওর ল আসাটা ঠিক হল না। যদি া হয়ে যায় তাহলে আত্মসম্মান? কি বলবে? লতা সাজানো বউ? বেশ্যাকে এনে রেখেছে সে? সব ধুলায় মিশিয়ে যাবে যে! তাই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রসাদ লতাকে ফেরং স। লতার সরল মন এতসব বুঝে পারেনি। সে ভেবেছিল প্রসাদ তার ঝতে পেরে ছুটে এসেছে। তাছাড়া মাসের চুক্তিতে এসেছে। এভাবে চলে টাও তো সমীচীন নয়। প্রসাদ তো বুঝেছে সে তার বাঁধা মেয়েছেলে।

স্নোফকস ক্যাবারে /ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্ত উত্তমকুমার এবং পরিচালক দিলীপ মুখার্জি।
ফটো ঃ অমৃত

আজ এখানে তার এই যে সম্মান সেটা তো পাবার কথা ছিল না। প্রসাদের বউ সেজে থাকা—বেশ ভালই তো। কদিন পরেই তো আবার নিজেদের লোকজনের কাছে ফিরে যেতে হবে। ওই পরিবেশ ওই সমাজ থেকে সে তো কোনদিনই বেরিয়ে আসতে পারবে না। তাহলে এই দুদিনের জন্য প্রসাদের মন ভাঙ্গার কোন মানে হয় না। এই যে এখানকার সুন্দর মানুষজন তাকে কি সেইভাবে গ্রহণ করবে যখন জানতে পারবে বৃত্তান্ত।.....

লতা ফিরে আসে। লোহার ফটক পেরিয়ে আবার সেই বিরাট দরজা। দরজা খুললে ঘর। ঘরের মধ্যে পুরোনো আমলের সব আসবাবপত্র। দেওয়ালে বিরাট আকারের ছবি কাঁচের চারপাশে ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো। কাচগুলো ভেঙে গেছে। ধুলো জমে গিয়েছে। কিন্তু ছবিগুলো আছে। ছবিগুলো সব প্রসাদের পূর্বপুরুষের। পূর্বপুরুষের নীলরক্ত ওর গায়ে মিশে আছে। একদা এখানে এই ঘরে লাল রঙের ফরাসের ওপর প্রসাদের পূর্বপুরুষরা হয়তো অনেকটা এইভাবেই মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করেছে। মদের ফোয়ারা ছুটেছে। এখন আবার সেই একই দৃশ্য। প্রসাদ একটা নকশা কাটা পাঞ্জাবী পরে গায়ে চাদরটা

অপরূপ রূপের ছটা একটি ফোঁটা

চাপা আভায় নানা ধরণের রঙ মন কেড়ে নেয়। তরল পদার্থ। অনুমোদিত উপকরণ দিয়ে তৈরী বলে আপনার সব প্রত্যাশা পূরণ করে কুমকুম।

প্রস্তুতকারক:
শ্রী কসমেটিক্স
হুগলী, বোম্বাই-৪০০ ০৭০। টেলিগ্রাম: 'SHRICOSMO'

পরিবেশক ঃ প্রদীপ প্রতিষ্ঠান রামপুরিয়া মার্কেট
৮৬, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ফোন ঃ ৩৪-০৭০৮

হারমোনিয়াম/মহরতে প্রযোজক প্রতাপ আগরওয়াল অরুণ মুখার্জি মাঃ রাণা ভানু ব্যানার্জি শিউলি মুখার্জি অরুন্ধতী দেবী তপন সিংহ প্রতিমা ব্যানার্জি হেমন্ত মুখার্জি বাবুল আরতি ভট্টাচার্য স্বরূপ দত্ত সুমিতা সান্যাল আর এন জালান বাচ্চু আইচ সতোন চ্যাটার্জি ও ভীষ্ম গুহঠাকুরতা। ফটো ঃ অমৃত

জড়িয়ে ঢুলুঢুলু চোখে এগিয়ে এসে সোফায় বসে আয়েস করে। সামান্য দূরত্বে দাঁড়িয়ে লতা। প্রসাদ লতাকে কাছে ডাকে। লতা এগিয়ে আসে। এক হাতে মদের গ্লাস অন্য হাতে লতার নরম শরীর প্রসাদ এই মুহূর্তে নিজেকে হায়দ্রাবাদের নিজাম ভাবলেও ভাবতে পারে। মাথার ওপরে ঝাড় লণ্ঠন। চারিদিকে বড় বড় আয়না। ঘরের মধ্যে হালকা আলো। ক্যামেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।...

শিমুলতলায় যে বাড়িতে শুটিং করা হয়েছিল তারই ইনটিরিয়র—ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সেট ফেলা হয়েছে। হুবহু যেন ওই বাড়ির ইনটিরিয়র ডেকোরেশন। এই পরিবেশে পরিচালক বিজয় চট্টোপাধ্যায় 'বারবধূ' ছবির শুটিং করছেন। সুবোধ ঘোষের এই বিখ্যাত ছোট গল্প অবলম্বনে মঞ্চসফল নাটক ইতিমধ্যে কয়েকশো রজনী অতিক্রম করেছে। নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রভেদ অনেকখানি। এই ছবির চিত্রনাট্য ভাবা হয়েছে একেবারে অন্য অ্যাংগেল থেকে। নাটকের বিষয়বস্তু যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে চিত্রনাট্যে সেভাবে নয়। চিত্রনাট্যে লতার জীবন-তৃষ্ণা আর জীবন-যন্ত্রণার অনুচ্চারিত নাটক। নায়িকার মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রনাট্য বিস্তার লাভ করেছে চিত্রনাট্যে সেভাবে গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রনাট্য রচয়িতা। একটা ভাল ছবির চেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে। পরিচালকের কর্মপদ্ধতি দেখে এক একটা দৃশ্য যেন টুকরো টুকরো সট দেখে আমার এই মনে হয়েছে। এই ছবি 'বারবধূ' যে কোন শিল্প সচেতন দর্শকের মনে চিরস্থায়ী ছাপ রাখতে সক্ষম হবে।

প্রসাদের ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন সমিত ভঞ্জ। আমার ধারণা হচ্ছে এই ছবিতে সমিতকে দর্শকরা পছন্দ করবেন। অনেকদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে চরিত্র সৃষ্টি। লতার চরিত্রে রূপ দিতে বম্বে থেকে এসেছেন গীতা যিনি 'গরম হাওয়া' ছবিতে অসাধারণ কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন সম্প্রতি। হঠাৎ গীতাকে এই চরিত্রের জন্য সিলেকট করা হল কেন? পরিচালকের বক্তব্য—কলকাতার অনেক নায়িকাই লতা করার জন্য রাজী হল না। শর্মিলাকে যোগাযোগ করা হচ্ছিল। সেখানে ডেট প্রবলেম দেখা দিল। রেহানা সুলতানাকেও যোগাযোগ করা হয়েছিল ঠিক এই সময় 'গরম হাওয়া' মুক্তি পেয়েছে। দেখা হল। দেখেই গীতার জন্য অনুস যোগাযোগ। অ্যাপ্রোচ করতেই গীতা র না ডেট প্রবলেম। কিন্তু বাংলা সংলাপ উচ্চারণ—গীতা এখনো শিখ প্রথম যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অ ইম্প্রুভ করেছেন। তিনি আশা ডাবিং-এর সময় অর্থাৎ আরো দি মাসের মধ্যে বেশ ভাল করে রপ্ত নিতে পারবেন।

এই ছবির অন্যান্য চরিত্রের শিল্প মধ্যে আছেন— রবি ঘোষ শেখর চট্টোপ সুব্রত সেনশর্মা প্রবীর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী সাধনা রায়চৌধুরী শোভা মাস্টার দিবোন্দু এবং সোমা দে। এখানে একটা বিশেষ চরিত্রে অ করছেন। চরিত্রের নাম 'মমতা'। প্রসাদে নিঃসঙ্গ মেয়েটিকে ভালো লাগে। মম কোনো একটা দুর্ঘটনার পরিপ্রে শিমুলতলায় চেঞ্জ-এ আনা হয়েছিল। তার চোখ দুটি। একটা সময় প্রসাদকে সে ফিরিয়ে দিতে পা মমতার সান্নিধ্যে প্রসাদের মধ্যে এক রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যা এমন একটা চরিত্র যে এক এক গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে যার প্রকাশের চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক স্থিরতা প্র করে—তার ভূমিকা আলোচনার দাবী র

চিত্রগ্রহণ করছেন শক্তি বন্দ্যো শিল্পনির্দেশনা ঃ সুনীল সরকার। স করবেন ঃ গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। পরিচালক ঃ আনন্দশংকর। নজরুলের গান রেকর্ড করা হয়েছে। শুটিং শেষ হয়ে এসেছে।

—স্টুডিও সং

রঞ্জিত মল্লিক সংখ্যা

চুমকী

লিখছেন ঃ মৃণাল সেন, পূর্ণেন্দু পত্রী দীনেন গুপ্ত অরবিন্দ মুখোঃ, জ্ঞানেশ মুখোঃ, সুশীল মুখোঃ, অপর্ণা সেন, সুমিত্রা মুখোঃ, মিঠু মুখোঃ, রাজশ্রী বসু, উৎপল দত্ত, দীপঙ্কর দে শমিত ভঞ্জ, বসন্ত চৌধুরী, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, ওয়াহিদা রহমান, রেহেনা সুলতানা, হীনা কৌশর, দীপক গাঙ্গুলী, স্বপন ঘোষ, ভবানী সহ অনেকে এবং

উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

এ ছাড়াও থাকছে রঞ্জিতের প্রিয় ক্যামেরা ম্যান বন্ধুদের তোলা অনেক ছবি।

দাম ঃ ২·৫০ টাকা

জানুয়ারী ৩য় প্রকাশিত হবে

এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন ঃ

সম্পাদক ॥ চুমকী

১০৪বি, রায় বাহাদুর রোড, কলিঃ—৩৪

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত একটি বিশেষ লেখা লিখছেন—রঞ্জন মজুমদার

নাট্যমঞ্চ

অনুভবের উল্টোরথের ভেঁপু

নাটক কিংবা তার বক্তব্য নিয়ে পরীক্ষা-রীক্ষা বাংলায় নতুন কিছু না হলেও মাঝে ঝে এমন এমন নাটক দর্শকরা উপহার য় যা অনেক সময় রীতিমত চমকের ষ্ট করে।

ইদানিং বেশীর ভাগ নাটকেরই মূল ত্র অত্যন্ত সাম্প্রতিক। সেই রাজনৈতিক নাহানি কালোবাজারী স্মাগলার ওয়াগন কার বিভ্রান্ত চরিত্রভ্রষ্ট যুবসমাজ নেতাদের গচরিত্র চিত্রন এবং শাসক শ্রেণীর বচ্ছাচার পুলিশের ঘুষ খাওয়া ও নীরব কের ভূমিকা এবং ভঙ্গুর বাস্তব সমাজের চিত্র প্রায়শই ইদানিংকার নাটকে ন না কোনভাবে উপস্থিত থাকে। এবং নাটকেরই মূল ভূমিকা থাকে এদের খাস খুলে দিয়ে নির্মম কষাঘাত করা। ন কোন নাটকে ভয়ঙ্কর পরিণামের ও র্ষিয়ারী বা সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়।

কিন্তু 'উল্টোরথের ভেঁপু' সেদিক থেকে কে বিস্মিত এবং চমকিত করেছে। কে অবাক করেছে প্রথমত এ নাটকের লবদের সংলাপ। এমন বুদ্ধিদীপ্ত অথচ ময় সংলাপ সচরাচর দেখা যায় না কার-নির্দেশক দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত)।

অনুভব প্রযোজিত এই নাটকের মূল দুটি। এবং তাদের কল্পনায় থাপিত দুটি নারী চরিত্র।

এ নাটকের গল্পাংশ অতি সামান্যই। পুরনো বন্ধুকে ঘিরে তাদের একে রের কাছে মিথ্যা ভাষণের মাধ্যমে কর বিস্তার।

হঠাৎই এক সন্ধ্যার অন্ধকারে নাটকীয়-দুই বাল্যবন্ধুর মধ্যে দেখা হোল কাতার প্রায় নির্জন এক পার্কে।

পুনর্মিলনের প্রথম পর্যায়ে উভয়ের জীবনের রোমন্থন টুকরো টুকরো র আদান প্রদান।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিলিতি কোম্পানীর দস্থ কর্মচারী বন্ধুর প্রেমের এবং টি ম্যাজিস্ট্রেট রূপী বন্ধুর স্ত্রীর কাল্পনিক সংলাপ বিনিময়। এবং পর্যায়ে কার্যকারণে একে অপরের ধরা পড়ে যায়।

উল্টো রথের ভেঁপু নাটকের দৃশ্য

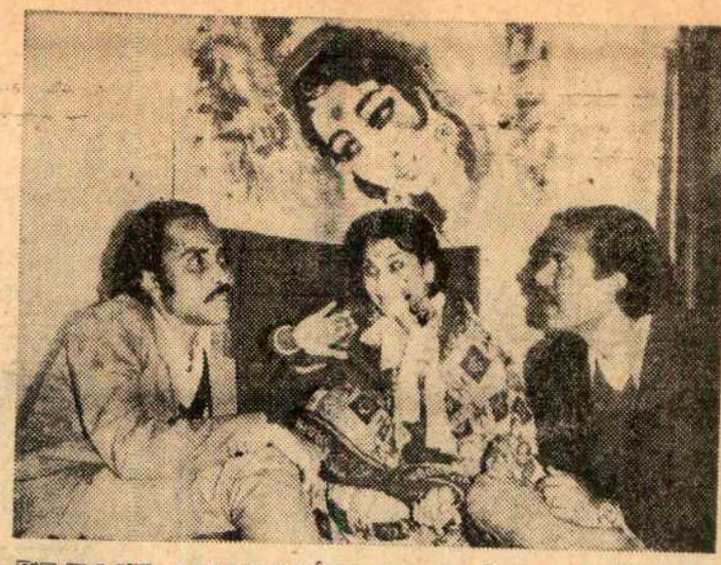

তখন দেখা গেল এতক্ষণ সংলাপ দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের যে সৌধ গড়ে তুলেছিল দুই বন্ধু তার সবটাই মিথ্যা। আসলে দুজনেই স্মাগলার।

মোটামুটি এই গল্প। কিন্তু মঞ্চে তার উপস্থাপনায় প্রচুর মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন নাট্যকার।

আর অভিনয়েও অবাক করেছেন মূল চরিত্রাভিনেতারা। বিশেষ করে শ্যাম (তাপস দত্তগুপ্ত) চরিত্রের অভিনেতার সাবলীল অভিনয় দর্শককে রীতিমত অবাক করেছে। তারপরেই নাম করতে হয় নীলুর (অসীম ভাদুড়ী) অভিনয়। বস্তুত এঁরা যে অভিনয় করেছেন একথা নাটকের কোথাও মনে হয়নি। একমাত্র শেষ দৃশ্য ছাড়া।

এরপরেই নাম করতে হয় দ্বৈত ভূমিকার (মালা ও রুণু) অভিনেত্রী গীতা ভট্টাচার্যর কথা। এর অভিনীত চরিত্রে একটু সিনেমার প্রভাব থাকলেও বলতে বাধা নেই অ-পেশাদার নাটকে এমন অভিনেত্রীর সচরাচর দেখা পাওয়া যায় না।

কিশোর শ্যাম (দেবাশীষ মজুমদার) ও কিশোর নীলু (অলক রায় ঘটক) একটি দৃশ্য হলেও ভালই করেছে। ফ্ল্যাশ ব্যাকটিও সুপ্রযুক্ত।

ফুলওয়ালা (মুকুরাম পাল) আইসক্রিম-ওয়ালার (ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়) নাটকে তেমন ভূমিকা না থাকলে তাদের উপস্থিতি নাটকের পক্ষে সহায়ক হয়। দুই ইন্সপেকটরের (যথাক্রমে শান্তজিৎ সেনগুপ্ত ও শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) আর একটু অনুশীলনের প্রয়োজন আছে।

নাট্যকারের সংলাপ ছাড়া আর যা ভাল লেগেছে তা হোল দুই বন্ধুর কাল্পনিক সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে যথাক্রমে তাদের কাল্পনিক প্রেয়সী ও বিলাসী মদ্যপ স্ত্রীর মঞ্চে বিচরণ। নাটকে এ এক নতুন পরীক্ষা সন্দেহ নেই।

আশাকরি সেই দৃশ্য কটি ভবিষ্যতে আরো চমকপ্রদভাবে উপস্থাপিত হবে।

এ নাটকের আর একটি বড় সম্পদ এর মঞ্চ সংস্থাপন। শিল্পী নিতাই ঘোষ সেখানে আশ্চর্য কল্পনাশক্তি ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর ফ্লেমিং-এর পরিকল্পনা অভিনব। পিন্টু বসুর আলো নাটকের সহায়ক হয়েছে। চিত্ত ভাদুড়ীর রূপসজ্জা চরিত্রানুগ। তবে সঙ্গীতের (রাজ্যেশ্বর ভট্টাচার্য) ভূমিকা আর একটু পরিবেশ অনুযায়ী হলে সেটা নাটকের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমার অনুমান।

অনুভবের এটি নতুন নাটক। আশা করবো এ নাটক ভবিষ্যতে আরো চমক নিয়ে দর্শকদের কাছে উপস্থিত এবং সমাদৃত হবে।

—নাট্যসমালোচক

মনস্বী প্রযোজিত

'যুধিষ্ঠির'

(মূল নাটক: অ্যালবেয়ার কামুর দি জাস্ট)
মুক্ত অঙ্গন * রবিবার ১৯শে জানুঃ
* সকাল ১০-৩০ মিঃ হলে টিকিট

ষ্টার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ফোন : ৫৫-১১৩৯
প্রতি বৃহঃ ৬॥
শনি, রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥
কুনাল মুখার্জির নতুন নাটক

পরিচয়

• পরিচালনা : বঙ্কিম ঘোষ
• আলো : তাপস সেন
রূপায়ণে : বঙ্কিম, হরিধন, সতীন্দ্র, অমরনাথ, পঞ্চানন এবং শুভেন্দু ও শমিতা বিশ্বাস

কোরাসের 'মজন্তালী সরকার'

কোরাস নাট্যগোষ্ঠীর 'মজন্তালী সরকার' নাটকে নির্দিষ্ট কোন ঘটনা নেই তবে আদ্য মধ্য অন্ত দিয়ে যেমন নাটককে বিভক্ত করা হয় তেমনি এতে কয়েকটি পর্ব আছে। যাকে এদের ভাষায় নাটকের উপস্থাপনার পরই বলা হয়েছে কৃষি পর্ব বাণিজ্য পর্ব এবং অন্তিম পর্ব।

নাটকের মূল চরিত্ররা বলা যায় একেবারে হাল আমলের। আর তার অন্তরালে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ নাটকটিকে আগাগোড়াই সুগার কোটেড করে রেখেছে।

নাটকের কুশীলব চাষী জোতদার মজুতদার ভণ্ডার অক্ষম শাসক কর্ণধার জজবাবু বিপ্লবী ছাত্র ইত্যাদি। মজন্তালী সরকারকে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে চতুর আত্মসর্বস্ব রাষ্ট্রীয় কর্ণধার রূপে। যে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন সমাজ বিরোধীদের হাতের পুতুল। সময় বিশেষে অসহায়।

সমগ্র প্রহসনটি নিবেদন করা হ
যাত্রাধর্মী অপেরার ঢঙে। পর্ব ভাগ ক
কৃষক শ্রমিক বা বিদ্রোহী নিয়ে
করা নতুন নয়। যাদের শোষক হি
জোতদার কালোবাজারী মুনাফাখোর
সরকারী যন্ত্রকেও বহু নাটকেই উপ
করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন পরিবেশে
অবস্থায়।

কিন্তু মজন্তালী সরকার নাটকে
উপস্থাপনা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। বেশ
হাল্কা চালে বক্তব্য বলা হয়েছে। প্র
কথক—খুড়ো ভাইপো। প্রকাশের
গান। গান দিয়ে মুখবন্ধ করে নানা চরি

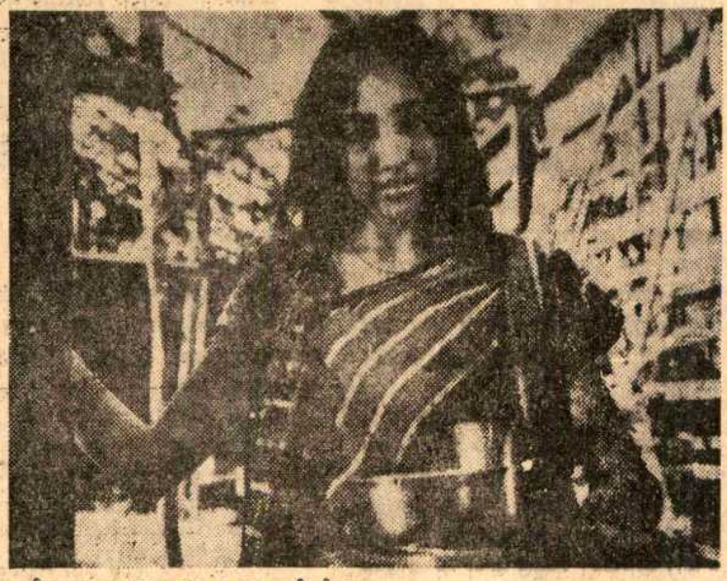

যুক্তি তক্কো আর গপ্পো/শাওলী মিত্র

স্বীকারোক্তি/সুমিত্রা মুখার্জি

টেনে এনে তাদের দিয়ে অভিনয় করানো হ
শোষিত এবং চরিত্রগুলির ভূমিকায়।
সংলাপ কখনো কখনো তীক্ষ্ণ এবং ব
ধর্মী হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে পুরনো
চটুল মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।
পরিহার করতে পারলে বোধহয় না
আবেদন আরও মর্মগ্রাহী হোত।

খুড়ো ভাইপোর গানেই তো সে
উচ্চকণ্ঠে বলে দেওয়া হয়েছে। অন্য
পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল কি?

অবশ্য একথাও ঠিক কিছু কিছু
হাল্কা হলেও দর্শকরা উপভোগ
তবে পেছনের পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ
কিন্তু নাটককে এগিয়ে দেবার পক্ষে স
হয়নি। তার জন্য হয়তো আলোকস
দায়ী।

অভিনয়ে মানব (তাপস চক্র
বলরাম চাষী (বাউল ঠাকুর—নাটকের
চালক) তেলবাবু (দীপক ঘোষ) জ
(অরুণ মন্ডল) এবং পুলিশ (দে
বিশ্বাস) অত্যন্ত মুন্সিয়ানার

সৈনিক : সুতপা কানুনগো, অঞ্জন দাস

দিয়েছেন। আর অবাক করেছেন ভাইপো (অলক নায়েক)। খুড়োর (বিলাস মুখার্জি) অভিনয়ও স-প্রাণ। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে তিনি সহজ হয়েও কেমন একটু আড়ষ্ট। গানটা আরও প্রাণবন্ত হলে তাঁর অভিনয়ও খুলতো।

মজন্তালী সরকার নাটকের মূল লক্ষ্য-চরিত্র হলেও ষ্টেজে তাকে খুব বেশী সময়ের জন্য উপস্থিত করা হয়নি। তাই অনেক সময় তার উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষিপ্ত হলেও সেটা যেন রাজার মাকে কুব্জা বলে গাল পাড়ার মতই থেকে গেছে। তবে মজন্তালী সরকারের (রঞ্জিত গাংগুলী) অভিনয় আমার ভাল লেগেছে। তার নির্দিষ্ট কোন চরিত্রকে অনুসরণ করার প্রয়াস তাই বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

তারক চ্যাটার্জি সুনীল দেবনাথ রঞ্জিত ঘোষ চন্দন দাশগুপ্ত ধ্রুব রায় (?) সুধাংশু সেন কমল বসু ঠাকুর শরদিন্দু আইচ সুধাময় গৌতম-এর অভিনয় মোটামুটি। ছাত্র দীপংকর বিশ্বাস ও কিষ্ট কুলী (শঙ্কর সরকার) আর একটু স্বাভাবিক হলে ভবিষ্যতে ভাল অভিনয় করবেন।

ছবিতে গানের একটা বড় ভূমিকা আছে। সুরে (দীপক চক্রবর্তী) কিছু মিশ্রণ থাকলেও সুর রচনা প্রশংসনীয়।

আলোর (দিলীপ মিত্র) কাজ কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল। রূপকারের ভূমিকা (প্রহ্লাদ পাল) সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে।

সবশেষে নিবেদন সামগ্রিকভাবে নাটকের গতি একটু মন্থর জজবাবুর বিচার দৃশ্য সুঅভিনীত হয়েও দর্শককে উৎকর্ণ করে না। আর নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট' সঙ্গীত সহ ঐ দৃশ্যটির অভিনয় মনকে খুব নাড়া দেয় নি। আর গানটির সঙ্গে শুধু লিপ দিয়ে আসল কণ্ঠকে নির্বাক রাখা হোল কেন? তাতে এদিক ওদিক হবারই সম্ভাবনা বেশী।

যন্ত্রসঙ্গীত মাঝে মাঝে খুবই ভাল।

স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটকটির রচয়িতা যথাক্রমে বাউল ঠাকুর ও উমানাথ ভট্টাচার্য।

নাট্যসমালোচক

এ সপ্তাহের ছবি

পিয়ালী পিকচার্স নিবেদিত 'মৌচাক' ছবিটি ১০ জানুয়ারী থেকে রূপবাণী অরুণা ভারতী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। কাহিনী—সমরেশ বসু, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অরবিন্দ মুখার্জী সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ, প্রধান ভূমিকায়—উত্তমকুমার সাবিত্রী চ্যাটার্জি রণজিৎ মল্লিক মিঠু মুখার্জি সুলতা চৌধুরী তরুণকুমার অনুপকুমার দুর্গাদাস ব্যানার্জি প্রভৃতি।

স্যার চার্লস চ্যাপলিন

পৃথিবীর কাছে আজও বিস্ময় যে ছোট-খাটো মানুষটি রূপক অর্থে ন্যুট হামসুনের 'হাঙ্গার' উপন্যাসের সেই ভ্যাগাবন্ড নায়ক চার্লি চ্যাপলিন পঁচাশি বছর বয়সে পদার্পণ করে ইংলন্ডেশ্বরীর ইচ্ছায় স্যার খেতাবে ভূষিত হলেন।

এই সঙ্গে আরো যে দুজন বিস্ময়কর ব্যক্তিকে ঐ খেতাবে সম্মানিত করা হোল তাঁরা হলেন যথাক্রমে ক্রিকেটের যাদুকর গারফিল্ড সোবার্স এবং রূপকথার মত রসিক পাঠক মহলে যার খ্যাতি সেই রস-সাহিত্যিক পি জি ওডহাউস।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজকীয় দরবারে এই স্যার উপাধি নববর্ষের উপহার হিসেবে বিতরণ করা হয় গত ১ জানুয়ারী।

গত ৬০ বছর ধরে পর্দায় প্রথমে মূক এবং পরে প্রায় নির্বাক এবং নির্বিকার অনবদ্য কৌতুক ও হাস্যরস পরিবেশনের জন্য চার্লি চ্যাপলিনকে উক্ত উপাধিতে অভিষিক্ত করা হোল। বিটেনের রাণী তাঁকে 'নাইট কমান্ডার অফ দি অর্ডার অফ দি ব্রিটিশ এম্পারর' খেতাব দিলেন তাঁকে।

যে চার্লি চ্যাপলিন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে রেখে গেছেন সেই সব হাসি কান্না বেদনা ব্যাঙ্গের কষাঘাত, পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের প্রতি মমত্ব তাদের মর্মবেদনা তাদের প্রতি সুখী মানুষের যে বঞ্চনা আর অবহেলার কথা স্বর্ণাক্ষরে—যিনি লক্ষ কোটি মানুষের মুখে নির্মল হাসি ফুটিয়েছেন। অন্যদিকে তাদের চোখে এনেছেন জল যাঁর সমকক্ষ প্রতিভার আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে পদক্ষেপ ঘটে নি সেই মানুষটিকে এই স্যার খেতাব দিয়ে তাঁকে গৌরবান্বিত করা হোল না স্যার খেতাবটিই সার্থকতার গৌরবে চিহ্নিত হোল তার বিচার করবেন পৃথিবীর লক্ষ কোটি চার্লি ভক্তরা।

তবু চার্লি চ্যাপলিন আমাদের মনের মণিকোঠায় সেই যাদুকর চার্লিই থেকে যাবেন চিরকাল।

রোটী

প্রযোজনা—আশীর্বাদ পিকচার্স

গতানুগতিক কাহিনীকেন্দ্রীক ও অভিনয়সমৃদ্ধ রমণীয় ছবি!!!

ছেলেবেলায় একটি 'রুটী'র জন্যেই মঙ্গল সিং তার মাকে হারালো। এর পরে দু'বেলা খাবার সংগ্রহের জন্যে ওকে একজন স্মাগলারের সংস্পর্শে আসতে হয়। যখন মঙ্গল সিং সেই স্মাগলারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করে, ঘটনাচক্রে মঙ্গল সিং আবার এক কুচক্রী ব্যক্তিকেও হত্যা করে, একখণ্ড 'রুটী'র জন্যে। এবার মঙ্গলসিং স্মাগলারের দলে ফিরে না গিয়ে সীমান্তবর্তী গ্রামে গিয়ে বাস করবার ইচ্ছা নিয়ে, এক অন্ধ দম্পতির বাড়ীতে ওঠে। তাঁদের একমাত্র পুত্র 'সুমনকুমারের' বন্ধুর পরিচয়ে। এই গ্রামেই মঙ্গল সিং 'বিজলী'র সঙ্গে পরিচিত হয় এবং গ্রামের জন্যে সর্বদাই সে আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। 'মঙ্গল' জানতো না সেই অন্ধ দম্পতির একমাত্র পুত্রকে (সুমন কুমার) রেলে মারপিঠ করে তাকে উঁচু পুল থেকে ফেলে দিয়ে তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

খুনের আসামীকে ধরবার জন্যে পুলিশ সেই সীমান্ত গ্রামে হাজির। স্মাগলাররাও তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে মঙ্গল সিংকে দলে ফিরিয়ে নেবার জন্যে এসেছে। অন্ধ দম্পতির ছেলে 'সুমনকুমার' পুল থেকে পড়ে যাওয়ায় পা হারিয়েছে। সুমনকুমার ফিরে এসে মার কাছ থেকে মঙ্গল সিং-এর সেবাশুশ্রূষার কথা জেনে, নিজেও সেবাশুশ্রূষা করে। কিন্তু মঙ্গল সিং বিজলীকে নিয়ে পালাতে গিয়ে প্রথমে কুচক্রীর গুলিতে এবং পরে পুলিশের গুলিতে দুজনেই চিরতরে পৃথিবীর মোহ কাটিয়ে চলে যায়।

পরিচালক মনমোহন দেশাই 'হাত কী সাফাই'এর কাহিনী এবং একাধিক বিদেশী ছবির প্রভাবকে এড়াতে পারেননি, এমন কী ছবির কলাকৌশলের কাজেও বিদেশী ছবির প্রভাব পীড়াদায়ক। অভিনয়ে—রাজেশ খান্না (মঙ্গল সিং), বিজলী (মমতাজ), অন্ধ দম্পতি (ওমপ্রকাশ ও নিরুপা রায়), সুমনকুমার (বিজয় অরোরা) পুলিশ অফিসার (সুজিতকুমার) এঁরা প্রত্যেকেই ভালো অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় জীবন, পিন্টু কাপুর জগদীপ জগদীশ রাজ পেন্টাল বিজু খোটে প্রবীণ পাল মাধু প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল ছবির বক্তব্যানুযায়ী সুর রচনা করেছেন এবং লতা ও কিশোরকুমারও সুন্দর গেয়েছেন গানগুলি। আলোকচিত্রগ্রহণে কে বৈকুণ্ঠ এবং সম্পাদনায় কমলাকর কারখানীসের কাজ প্রশংসনীয়। অন্যান্য কলাকৌশলের কাজও উচ্চাঙ্গের। পরিশেষে এদেশে কাহিনী বা সৎ সাহিত্যের অভাব নেই, সুতরাং সেদিকে পরিচালকের দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল।

মমতাজ

রাজেশ খান্না

কুয়াঁরা বাপ

প্রযোজনা : বালাজী আর্টস
দুর্বল চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
সত্ত্বেও কাহিনীর ভাবাবেগ
এবং মানবিক আবেদন মনকে
আকর্ষণ করে

এক রিকসাওয়ালা কায়ক্লেশে দিন চালায়, অর্থের অভাবে পড়শীর মেয়ে 'শিলা'কে বিবাহ করতে পর্যন্ত পারছে না। তার জীবনে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। একদিন খুব ভোরে মন্দিরে গিয়ে সিঁড়িতে একটি ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখতে পায়। তার মা বাবার খোঁজ করে মন্দিরের মধ্যে কোথাও দেখতে পায় না। ভয় পেয়ে 'বাচ্চা'কে সিঁড়িতে রেখে সে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পূজারী পথ আটকায়, এজাতীয় অবৈধ কাজ করা চলবে না বলে। চৌকীদারও সাফ জানিয়ে দেয় ঐ শিশুপুত্রকে বাড়ীতে নিয়ে না গেলে জেলে পুরে দেবে। অসহায় 'রিকসাওয়ালা' ওঁদের বোঝায় যার বিবাহ হয়নি সে কি করে বাপ হবে?

আসলে বিনোদ রাধার অবৈধ প্রণয়ের ফসল এই নিষ্পাপ শিশু অথচ রাধাকে নায়ক নিজের পত্নী হিসাবে স্বীকার করতে চায় না। তাই লজ্জায় দুঃখে মন্দিরের সিঁড়িতে বাচ্চাকে রেখে জলে ঝাঁপ দেয় রাধা। কিন্তু জেলেরা ওঁকে বাঁচিয়ে দেয়। ছুটে আসে মন্দিরে শিশুর খোঁজে, সেখানে না পেয়ে বিনোদের কাছে। বিনোদ তখন এ্যাকসিডেন্টে শয্যাশায়ী। রাধাই ওঁকে সেবা করে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে। বিনোদ এবার রাধাকে স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং ওঁরা ওদের একমাত্র সন্তানকে খুঁজে বেড়ায়। এদিকে রিকসাওয়ালা সেই শিশুকে মানুষ করে তোলে। 'পোলিও' হলেও, অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তার চিকিৎসা করে এবং মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে তাকে সত্যিকারের শিক্ষা দেয়। একদিন পুলিশের কাছে খবর পেয়ে আচমকা ছেলের মা ও বাবা তাকে ফিরিয়ে নিতে আসে।

হবুব

বিনোদ ও রাধা খুঁজে পায় তাঁদের হারানো ছেলেকে।

কাহিনী ও চিত্রনাট্যের দুর্বলতা মেহমুদের পরিচালনার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তবুও প্রথম চিত্রপরিচালক হিসাবে উনি কাহিনীর ভাবাবেগ ও মানবিক আবেদনকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য উনি ইচ্ছা করলে বম্বের তথাকথিত ছবির প্রভাবকে এড়াতে পারতেন। অভিনয়ে—রিকসাওয়ালা (মেহমুদ), বিনোদ (বিনোদ মেহরা) রাধা (ভারতী) শীলা (মনোরমা [দক্ষিণ] মাস্তান (ভূষণ তেওয়ারী) সঞ্জীবকুমার (ডাক্তার) শিশু পুত্র (ম্যাক্সে) সুন্দর অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায়—যোগিতাবালী ধর্মেন্দ্র হেমা মালিনী, অমিতাভ বচ্চন, বিনোদ খান্না প্রভৃতির অভিনয়ও ভূমিকানুযায়ী। নবাগত সঙ্গীত পরিচালক রাকেশ রোশনের সুর-রচনা মনোরম। কলাকৌশলের কাজ, বিশেষ করে আলোকচিত্রগ্রহণ (প্রভাকর) বেশ উচ্চাঙ্গের। —চিত্রদূত

নীরদা সুন্দরী

গিরিশ যুগের শেষ শিখা

বিগত মঙ্গলবার ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ বেলা ১১টা ৫ মিনিটে নির্বাপিত হয়ে গেল গিরিশ যুগের শেষ-শিখা নীরদাসুন্দরীর জীবনদীপ। ক্লাসিক মনমোহন মিনার্ভা আলফ্রেড স্টার নাট্যনিকেতন তদানীন্তন কালের প্রায় প্রতিটি রঙ্গশালায় বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করে নীরদাসুন্দরী খ্যাতি অর্জন করেন। নৃত্য গীত ও অভিনয়ে সমান দক্ষতা ছিল তাঁর। তিরিশ বছর পূর্বে মঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। আত্মীয়স্বজন ও উত্তরাধিকারীহীনা নীরদাসুন্দরীকে নিজ বাড়ীতে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন শান্তি গুপ্তা। শান্তি গুপ্তার শ্যামপুকুর স্ট্রীটস্থিত গৃহের একতলায় তিনি থাকতেন। নীরদাসুন্দরীর পরিচর্যার জন্য জয়া নামে একজন পরিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল। মৃত্যুর শেষ সময় পর্যন্ত জয়াই পরিচর্যা কাজে নিযুক্ত ছিল। তাছাড়া শ্রীমতী আশা ও শান্তি গুপ্তার পরিজনের মাঝেই নীরদাসুন্দরীর দেখাশুনা করতেন। আমৃত্যু সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করতেন বিশ্বরূপার কর্ণধার রাসবিহারী সরকার। বিগত ১৯৭৪-এর প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে শ্যামপুকুরের গৃহে গিয়ে প্রায় দু'শ' সাতজন সদস্যসহ আমরা অন্যান্যদের সঙ্গে নীরদাসুন্দরীকে অভিনন্দন জানিয়ে আসি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এমনি পুরোন যুগের শিল্পীদের প্রতি দেশবাসী, তথা জাতীয় সরকারকে অবহিত করে তোলা। কিন্তু পরম বেদনার কথা, কেউই এ-বিষয়ে তৎপর হননি।

নীরদাসুন্দরীর মৃত্যু-সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নাট্যশালা ও শিল্পীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থার বিজয় রায়, শ্যামল রায়চৌধুরী, সর্বজিৎ বসু, সুরেন্দ্রনাথ কাংকারিয়া ও অন্যান্য সভ্যগণসহ আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসি। বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার শোভাযাত্রা ও শবদাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। তাছাড়া বিশ্বরূপা, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার ও প্রতাপ মেমোরিয়ালের চতুর্মুখ থেকে শিল্পীর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এবং সংশ্লিষ্ট থিয়েটারগুলি ও-দিনের নাট্য-প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বলে জানা যায়।

নীরদাসুন্দরী নিজে বলতেন মৃত্যুর পূর্বে, যে তাঁর বয়স ১০২ বৎসর হয়েছিল। অনেকেরও তাই বিশ্বাস। তাহলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়েছিল বলেই ধরে নিতে হয় এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সখীর দলের মধ্য দিয়ে যখন তিনি ক্লাসিক থিয়েটারে সর্বপ্রথম যোগদান করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ২৬। যা অস্বাভাবিক। কারণ সখীর দলে যাঁরা প্রথম নামতেন, তাঁদের বেশীর ভাগের বয়সের সীমারেখা ১০ থেকে ১৬-র মধ্যেই সীমিত থাকতো। গিরিশচন্দ্রের দোললীলা ক্লাসিক থিয়েটারে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ মঞ্চস্থ হয়। দোললীলায় নীরদাসুন্দরীর সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা ছিলেন সখীর দলে তাঁদের মধ্যে সুশীলাবালা, ভুবনেশ্বরী ও বিনোদিনী (হাঁদি)-র কথা উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে সুশীলাবালাই বেশী খ্যাতি অর্জন করেন। দোললীলার সময় নীরদাসুন্দরীর বয়স আনুমানিক ১৫ বছরের বেশী ছিল না। তাই তাঁর জন্ম-সাল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হওয়াই স্বাভাবিক এবং ১০২ নয়, ৯১ বৎসর বয়সে নীরদাসুন্দরী পরলোকগমন করলেন। ক্লাসিকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নির্মলা নাটকে বাঁশরী এবং গুপ্তকথায় আধীরা। মিনার্ভায় ঝকমারি নাটকে দীপি এবং গিরিশচন্দ্রের গৃহলক্ষ্মীর ফুলিরূপেই নীরদাসুন্দরী প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কিন্নরী নাটকের নাম-ভূমিকায় নীরদাসুন্দরী বিস্ময়কর অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দেন। নীরদাসুন্দরী অভিনীত অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে ভাগ্যচক্র—হেনা, ক্লিওপেট্রা—চারমিয়ান, আহেরিয়া—কেতু, কালাপাহাড়—রঙিলা, রামানুজ—চম্পা, চিতরোদ্ধার—ময়না উর্বশী—চিত্রলেখা দুমুখো সাপ—অতসীবিবি সীতা—তুঙ্গভদ্রা ডাক্তার—মণিমালা, চিরন্তনী—মিস চ্যাটার্জি, ওথেলো—এমিলিয়া, ঝড়ের রাতে—মাসীমা, আঁধারে আলো — রঙ্গিণী, মা—অরবিন্দের মা, স্বর্ণলঙ্কা—সূর্পণখা আবুল হাসান দেবদাস—উমা দুসপুরুষ—সাতু যাত্রীপান্না—শীতলসেনী প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রে কৃষ্ণকান্তের উইল আর মানভঞ্জনের কথাই বলা চলে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নীরদাসুন্দরীর বহু অভিনয়ই আমি দেখেছি। সব অভিনয়ের কথা মনে নেই। তাছাড়া শেষের দিকে যেসব চরিত্রে তাঁকে দেখেছি, সেসব চরিত্রও মনে রেখাপাত করার মত খুব কমই ছিল। তুঙ্গভদ্রা, শীতলসেনী, সাতু—এই তিনটি চরিত্রের কথা ভুলবার নয়। কিন্নরী ও অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশংসা শুনেছি। গৃহলক্ষ্মীর ফুলির জন্য ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমর দত্ত ধর্মদাস সুর চুণীলাল দেব নৃপেন্দ্র বসু তারাসুন্দরী কুসুমকুমারী দানীবাবু অপরেশচন্দ্র শিশিরকুমার কঙ্কাবতী সরযূবালা ছবি বিশ্বাস জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতির সঙ্গে নীরদাসুন্দরী অভিনয় করেছেন। গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন আবার পরবর্তী গোষ্ঠীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। প্রায় ৫০ বছর নীরদাসুন্দরী মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ৫০ বছরে মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে বহুবার। তাই আর্থিক সঞ্চয় কিছুই ছিল না।

নীরদাসুন্দরীই গিরিশযুগের শেষ অভিনেত্রী ছিলেন। প্রাচীনাদের মধ্যে সন্তোষকুমারী (তেলেনা) ও ইন্দুবালা প্রভৃতিই বেঁচে আছেন। নাট্য-ইতিহাসের বহু উপাদান এঁদের কাছ থেকে আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। এঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপাদান সংগ্রহের একটি উৎস রুদ্ধ হয়ে গেল।

নাট্য সংগ্রহশালা তথা থিয়েটার আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা এবং গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সরকার আজও নিষ্ক্রিয় আর এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য অতীত সম্পদ যেমন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তেমনি নাট্য-ইতিহাসে নানান বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে। এ-বিষয়ে জাতীয় সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নীরদাসুন্দরীর প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

প্যাট্রা, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোর্সেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক ঃ
সম্পৎ সেরামিকস প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

আলোচনা

কলা সংগমের অনুষ্ঠান

কলাসংগমের তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে শিল্পশ্রীমণ্ডিত মঞ্চসজ্জা। ওপরে ঝোলানো বেলোয়াড় ঝাড়ের নকসার আলো শিল্পীদের আসনের দুপাশে নানারঙা ফুলের বাগানের দৃশ্যরচনা ও পুষ্পগুচ্ছের সারি দিয়ে মঞ্চের প্রান্তসীমা সৃষ্টি সব মিলিয়ে যেন পারস্য কবিদের গুলবাগিচায় পরিণত হয়েছিলো রবীন্দ্রসদন মঞ্চ।

সংগীতানুষ্ঠানের স্মরণীয় শিল্পী পণ্ডিত লালগুড়ি জয়রামন। এঁর বেহালা আগেও শুনেছি। কিন্তু সেদিনের মেজাজ মনে রাখবার মত। শিল্পী পরিবেশিত রাগগুলি হোলো যথাক্রমে চক্রবাকম্ মধুবন্তী মোহনম্ ও ধর্মবতী। শেষ করেছেন স্ব-রচিত একটি রাগ দিয়ে—যার সঙ্গে আদল আসে আমাদের জয়জয়ন্তীর। হিন্দুস্থানী সংগীতের মত এত উপাদান সম্ভার নেই, নেই শিরিকণার অফুরন্ত তানসম্পদ মীড়ের বাহার অথবা ছড়-টানার শব্দবৈচিত্র্য। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় ঢঙের ছোট ছোট তান বিস্তারের পরিসরগুলি যেন গীতিকবিতার রসে পরিপূর্ণ। গমকের মধ্যে হৃৎকম্পন সৃষ্টিকারী গর্জন ছিল না। ছিলো ওজস্ ও আকুতি আর এইখানেই ঘটেছিলো পাণ্ডিত্য ও শিল্পবোধের অপূর্ব সংহতি।

চক্রবাদমে স্বপ্রয়োগের চমক বিহ্বলতা মধুমন্তীর আলাপনে কল্পনার রঙিন ছটা মোহনমে বিভিন্ন রাগের মালা-গাঁথা এতগুলি মনোহারীত্বের সমন্বয় হলেন একাধারে স্রষ্টা ও শিল্পী জয়রাম। মৃদঙ্গ সঙ্গতকারী বিদ্বান ভেলোর রামবর্ধন কৃতিত্বের একটা বড় অংশীদার।

পণ্ডিত যশরাজ পরিবেশিত বেহাগ খাম্বাজ ও আড়ানা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। বিশেষ করে মন্দ্রসপ্তকে অনায়াসবিহারে ও রাগের ক্রম উন্মীলন শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

পরভীন সুলতানার পুরিয়া ধানেশ্রী ও বাগেশ্রী শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে কণ্ঠমাধুর্যের কারণে। কিন্তু খেয়ালের ভাবগাম্ভীরতা অথবা গাম্ভীর্যের অভাব এ অনুষ্ঠান মনে কোনো দীর্ঘস্থায়ী রেশ রাখতে পারে নি। ফৈয়াজ আহমেদ খান ও নিয়াজ আহমেদ খানের ইমনকল্যাণ রাগরূপ পরিবেশনার পরিপ্রেক্ষিতে নিখুঁত।

সরোদে আমজেদ আলি খাঁর হংসধ্বনি ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টি করে—তাল জাতের বাজ ও বাঁ হাতের সুরেলা টিপের সমন্বয়ে।

কলাসংগমের সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিল্পী ছিলেন যামিনী কৃষ্ণমূর্তি। এবার তাঁর দীর্ঘ তিন ঘন্টাব্যাপী ভারতনাট্যমে ভারতের এই সুপ্রাচীন মন্দির নৃত্যের ঐতিহ্য অনাহত রেখেও শিল্পীর প্রগতিশীল মনের অগ্রগতির ছন্দই যেন তাঁর নূপুরনিক্কনের মতই ধ্বনিত হয়েছিল। এর আগের নৃত্যানুষ্ঠানে শ্রীমতী যামিনী দেখিয়েছেন আঙ্গিক সমৃদ্ধি দেহলাবণ্য ও অনুশীলনীর সমন্বয়ে শিল্পী কোথায় পৌঁছতে পারেন। কিন্তু এবারের অনুষ্ঠানে শিল্পী আরও গভীর ভাবের ভাবুক। সেই জন্যই অন্তর্মুখীন সৌন্দর্যে প্রতিটি নৃত্য অপরূপ।

বর্ণম অংগের প্রেমগীতির নৃত্যরূপ নটভন্নারের ছন্দর নকসার অনুরূপ ধ্বনিতে নূপুরের উত্তর প্রত্যুত্তরের কাব্যসৌন্দর্য প্রতিটি মুহূর্তকে মুখর করে তুলেছিল।

পদম অংগে শিল্পী পেশ করলেন তাঁর নিজস্ব দুটি রচনা—শিবতাণ্ডব ও মহিষমর্দিনী। অভিনয় চাউনীর ভঙ্গীর ঘন ঘন রূপান্তর আর তাঁর দীর্ঘ দুটি হাতের সঞ্চালনের লাবণ্যে এই সৃষ্টিধর্মী নাচের বক্তব্যকে তিনি রসোত্তীর্ণ করেছেন। বিষয়বস্তুত গাম্ভীর্য সজ্জার শিল্পকৃতির পরিচ্ছদের বর্ণবাহার সব মিলিয়ে যেন পুরাণবর্ণিত দেবমূর্তি হয়ে ওঠেন। শিবতাণ্ডবে পুরুষের দৃপ্ত ওজস মহিষমর্দিনীতে নারীর সংগ্রামকঠোর রূপ আর রোমান্টিক নৃত্যে প্রণয়িনীর ললিতমুখর লাস্য কখনও নিশ্চল ভাস্কর্যসৌন্দর্যে কখনও গতিমুখরতায় কখনও সংগীত ও নৃত্যের মনোহর মিতালীতে আশ্চর্য রূপসৃষ্টিতে পৌঁছেছিল।

সংগ্রামী দুই তরুণ শিল্পী : দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট বাংলাদেশে অভাবের অন্ত নেই। কিন্তু প্রতিভার দৈন্য কোনদিনই ঘটে নি। প্রতি-

পশ্চিম বাংলার
শ্রী এবং শ্রীমতী রায় বলেন:

"আমরা বাপু সানরাইজ ছাড়া অন্য কোন মশলা কিনতে সত্যি করে ভরসা পাইনা। স্বাদের জন্য ছাড়াও স্বাস্থ্যের কথাও তো চিন্তা করতে হবে।"

দিনের সংগ্রামে লিপ্ত থেকেও আত্মবিকাশের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নি—এমনই দুই তরুণ শিল্পী হলেন গৌরাঙ্গ সাহা ও কালিদাস নাগ। একজন উচ্চাঙ্গ ও রাগ সঙ্গীতে অপরজন বাংলা গানের ধারা তথা রবীন্দ্রনাথ নজরুল অতুলপ্রসাদ ও লোক-সঙ্গীতকে নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করেছেন।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়াম হল ও রবীন্দ্র সদনে যথাক্রমে গৌরাঙ্গ সাহা ও কালিদাস নাগের একক প্রোগ্রাম শোনবার সুযোগ ঘটেছিল। গৌরাঙ্গ সাহা তাঁর সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান গীতাঞ্জলি এবং কালিদাস নাগ সঞ্চারিণীর তরফ থেকে নিবেদিত হয়েছেন।

২৫ মার্চ প্রথম গৌরাঙ্গবাবুর গান শুনে আশ্চর্য হন নি এমন একজন শ্রোতাও ছিলেন না। ইনি চানাচুর বিক্রী করে একাধারে জীবন জীবিকা ও সঙ্গীত সাধনা শুরু করেন। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর শিক্ষা একনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায়ের মিলিত শক্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রতে অনেকাংশে সার্থক হয়েছেন।

সেদিন তাঁর একক অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত। স্বসৃষ্ট সুর ও কথায় গাওয়া তাঁর রাগভিত্তিক বাংলা গানে একাধারে পাওয়া গেল তাঁর সাধনা ও ভাব-কল্পনার মধুর ছবিখানি। কিন্তু বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙেছে দ্বিতীয়ার্ধে। এখানে পরিবেশিত মালকোষ রাগে খেয়াল রাগশুদ্ধতায় সংযমে ও গাম্ভীর্যে যথার্থ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মানে প্রতিষ্ঠিত। এর পর একে একে দাদরা লাহরবা ও শ্যামাসঙ্গীতে তিনি বহুমুখী সঙ্গীত অনুশীলনীর স্বাক্ষর রেখেছেন। তবলা ও সারেংগী সঙ্গতে ছিলেন যথাক্রমে পুত্র সুজিত সাহা ও বাচ্চালাল মিশ্র।

আর এক স্বপ্নতন্ময় তরুণ কালিদাস নাগ। শিল্পীকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে শ্রীমতী কানন দেবী বলেন মধ্যবিত্ত ঘরের সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থেকেও সঙ্গীতসাধনায় আত্মনিয়োগ করে

আভি তো জী' লে
জয়া ভাদুড়ী ও ড্যানি

কালিদাস বাঙালীর সহজাত শিল্পপ্রবণতার উজ্জ্বল নজীর রেখেছেন।

প্রথম পর্যায়ে শ্রীনাগ নজরুলের ভাব-সঙ্গীত প্রেমসঙ্গীত ঝুমুর ও লোক-সঙ্গীতের নানান দিক মেলে ধরেন। এর পর লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের আসর উপভোগ্য হয়ে ওঠে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের নাচ ও গান দিয়ে। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন কালিদাস নাগ নৃত্য-পরিচালনায় আরতি মজুমদার ও ধূর্জটি সেন। মধুর কণ্ঠ ও পরিবেশনার আন্তরিকতায় কালিদাসবাবু সার্থক। কিন্তু স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পীদের কৃপণতা বেদনাদায়ক।

—চিত্রাঙ্গদা

সর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদ ঃ সর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের সাপ্তাহিক বৈঠকের সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন সাগর বন্দ্যোপাধ্যায় রঞ্জিৎ দে রঞ্জিৎ মুখার্জি দীপক নাগ অরুণ ভট্টাচার্য সুনীল পাল এবং আরো কয়েকজন। সংসদের কার্যালয় (৪০।১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট) বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এ কথা জানান সংসদ সভাপতি শ্রীহরিদাস ঘোষ।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

লক্ষ লক্ষ লোক আজ ব্যবহার করেন

লক্ষ লক্ষ লোক আজ
সাধনা দশন ব্যবহার করেন
কারণ অতি উৎকৃষ্ট
দাঁতের মাজন ব'লে
এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।
অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
সাধনা দশন বহুদিন ধরে
দেশের সর্বত্র প্রচুর সমাদর
লাভ করে আসছে।
সাধনা টুথ পেস্টও বহুগুণ-
বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও
উপকারী। যাঁরা পেস্ট পছন্দ
করেন তাঁদের অনুরোধেই
প্রস্তুত করা হয়েছে।

SD.5/70

সাধনা দশন

সাধনা টুথ পেস্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

30 JAN 1975

Regd. No. WB/NC-13
Gram · AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 17th January, 1975
Phone 55-5231 (14 lines)

শঙ্কু মহারাজ-এর সার্থক ভ্রমণ-কাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে তিন পর্বে সম্পূর্ণ

ব্রজপর্ব ১০৲ * বনপর্ব ১০৲ * মহাবন পর্ব ১২৲

ভক্তকবি শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকর রচনা করার পরে প্রায় আড়াইশো বছর কেটে গেছে, এই সুদীর্ঘ সময়ে কোন কবি কিংবা লেখক ব্রজ-পরিক্রমার ওপরে এমন প্রামাণ্য অথচ প্রাঞ্জল, তথ্যবহুল অথচ চিত্তাকর্ষক এবং সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন নি। লেখক শতাধিক সহযাত্রীর সঙ্গে সেই পুণ্য পরিক্রমা সমাপ্ত করে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। বহু আলোকচিত্র শোভিত।

সুভাষ সমাজদারের অপূর্ব সাহিত্য-কীর্তি

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮৲

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-সৃষ্টি

থৈ থৈ হাহাকার ১৮৲

নারায়ণ সান্যালের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০৲

চিরঞ্জীব সেনের নতুন রহস্যোপন্যাস

মিরানজিয়া রহস্য ১০৲

শক্তিপদ রাজগুরুর সার্থক উপন্যাস

গৌড়জনবধূ ১২৲

নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন ধ্রুপদী উপন্যাস

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০৲

আবদুল জব্বারের নতুন রচনা

জনপদজীবন ৮৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম রচনা

নীলাঙ্গুরীয় ১২৲

টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের প্রতিটি বিজয় অভিযান সম্পর্কে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ, প্রখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক চিরঞ্জীব-এর

জয় থেকে জয় ক্রিকেটে ১২৲

শৈলেশ দে'র

আমি সুভাষ বলছি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ

মূল্য প্রতি খণ্ড ২০.০০

কাশীকান্ত মৈত্রের

রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি ২০৲

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব (২য় সং) ২৫৲

ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের

নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা ৮৲

ডঃ জয়গুরু গোস্বামীর

চারণকবি

মুকুন্দদাস ২৫৲

মুকুন্দদাসের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যাবতীয় গান ও স্বদেশী নাটকের একত্র সংকলন।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃফোন ৩৪-১৭৮২

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪৯ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 18th April, 1975 শুক্রবার ৪ বৈশাখ, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৭	মাদার ইণ্ডিয়া (গল্প)	শ্রীমহাশ্বেতা দেবী
১২	এই বাংলার খবর	শ্রীদেবদত্ত
১৩	গোয়েন্দা ধাঁধা	শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
১৪	পটভূমি	শ্রীচাণক্য
১৫	দেশে বিদেশে	শ্রীপুণ্ডরীক
১৭	রোজ নামচা	ফাদার দ্যতিয়েন
১৯	সেই সব মানুষ (উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
২২	নিষ্ঠুর আলস্যে (কবিতা)	শ্রীমৃণাল বসুচৌধুরী
২২	এখানে কোন (কবিতা)	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
২২	জন্মান্তকে (কবিতা)	শ্রীগোবিন্দ আচার্য

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

মৃগাঙ্কর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বহুচিত্রে শোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে—৮

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা শ্রীসরিতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ:—অপরূপ তার জীবনালেখ্য অসাধারণ তার তপশ্চর্যা। বহুচিত্রসহ ৮

সাধনা

বসুমতী:—এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাঙ্গলায় আর দেখি নাই।।

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা ফ্যাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

গৌতমধারা—হাওড়া-এক

স্বদেশ ও সাহিত্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১০·০০
শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, রাজনীতি নারী মুক্তি ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলীর একমাত্র সংকলন।

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গল্প ৬·৫০
সম্পাদনা : জয়ন্ত জোয়ারদার
সত্তর দশকের সমাজতান্ত্রিক চীনের ছয়টি গল্পের সংকলন

নিগ্রো কবিতা ৫·০০
আফ্রিকা ও আমেরিকার কালো মানুষের কবিতা
বহু বিতর্কিত 'হারান মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধী মূর্তির লেখক সুবিমল মিত্রের নতুন গল্প গ্রন্থ

নাঙা হাড় জেগে উঠেছে ৫·০০

একমাত্র পরিবেশক : বুক মার্ক C/0 অগ্রণী বুক ক্লাব
এ-১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

৬ মে থেকে ২০ মে

সুলভ মূল্যে—শতকরা ১২½ টাকা বাদ দিয়ে—রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থ এবং বিশ্বভারতী প্রকাশিত অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। কবিপক্ষে সকলেই যাতে রবীন্দ্রনাথের দু-একখানা গ্রন্থ সুলভে কেনবার সুযোগ পান, তার জন্য এই উদ্‌যোগ। যে-কোন পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুযোগ পাবেন।

এজন্য পুস্তক বিক্রেতাগণ ২ মে থেকে অতিরিক্ত কমিশন পাবেন এবং এই কয়টি কেন্দ্রে পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার । কলিকাতা ১২

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ বিধান সরণী । কলিকাতা ৬

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯

জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো । কলিকাতা ৯

বিশ্বভারতী শিল্পসদন
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

দামোদর পুস্তকালয়
২৪ বিজয়চাঁদ রোড
বর্ধমান

ভারতী ভবন
গোবিন্দ মিত্র রোড
পাটনা ৪

চিঠিপত্র, অগ্রিম ও মফঃস্বল থেকে অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট । কলিকাতা ১৬ ॥ ফোন ৪৪-৯৮৬৮-৬৯

মফঃস্বল থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অর্ডার ডাকে, রেলে, সড়কপথে ও বিমানে ২৪ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করা হবে।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ অনুগ্রহপূর্বক মোট পুস্তকমূল্যের ২৫% অগ্রিম পাঠাবেন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
২৩	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	শ্রীউপগুপ্ত
২৬	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে	শ্রীদিলীপকুমার রায়
২৯	চিঠিপত্র	
৩২	পশ্চের কাজ	শ্রীঅজিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৬	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৩৭	রূপসীর খাতা	শ্রীবরবর্ণিনী
৩৮	রান্না করে দেখুন	শ্রীসুষমা মুখোপাধ্যায়
৩৯	শেষ বিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৩	পুনশ্চ	শ্রীকণক
৪৪	আর্থিক প্রসঙ্গ	শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৪৬	লাল টালি কালো হয় (গল্প)	কামাল হোসেন
৫১	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান	
৫২	খেলাধুলা	শ্রীদর্শক
৫৪	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅমর
৫৬	শর নিক্ষেপ	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৯	রজনী আলোয়	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬০	চিত্র সমালোচনা	শ্রীচিত্রদত্ত
৬৩	'অসময়' হাজারিবাগে	বিশেষ সংবাদদাতা
৬৫	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মল ধর
৬৭	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা	শ্রীঅভিজিৎ
৬৮	নাটমঞ্চ	নাট্য সমালোচক
৬৯	বিদেশী ছবি	শা র চ
৭০	স্মৃতিলীন-শিল্পী পরেশ ভট্টাচার্য	শ্রীসন্ধ্যা সেন

প্রচ্ছদ : শ্রীইন্দ্রাণী চৌধুরী

।। ছোটদের বই ।।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥
অমলের পাখি ৪-০০
বরণীয় মানুষ স্মরণীয় বিচার ৮-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥
কিশোর সঞ্চয়ন ৬-০০
চার মূর্তির অভিযান ৫-০০
টেনিদা দি গ্রেট ৫-০০
পটলডাঙ্গার টেনিদা ৪-০০
রামমোহন ৩-০০

ইন্দ্র চক্রবর্তী ॥
সুন্দরবনের মানুষ খেকো বাঘ ৪-০০

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ॥
শেক্সপিয়ার রচনা সম্ভার ৫-০০

মনোজ বসু ॥
ঝিলমিল ৫-০০, রাজার ঘড়ি ৩-০০
ভুলিনাই ৫-০০

জুল ভের্ন ॥
ডঃ অক্স এক্সপেরিমেন্ট ৮-০০
পৃথিবী থেকে চাঁদে ৮-০০
কালো হীরে ৬-০০, প্রলয়ংকর ৬-৫০
উইলহেম গুপ্তরহস্য ৬-০০
তিনটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ৬-৫০

রমেন্দ্র রায় ॥
ইয়েতির ডাক ৩-০০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥
কিশোর অমনিবাস ৬-০০

অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত সায়েন্স ফিকশান সংকলন ॥

ফ্যানটাস ৬·০০

গ্রন্থপ্রকাশ : C/O বেঙ্গল পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলি-১২

কুমারেশ ঘোষের ভ্রমণ কাহিনী

সবুজ রাশিয়ায়	৩.০০
নব্য তুর্কী সভ্য গ্রীস	২.০০
পথ চলাতেই আনন্দ	৫.০০
জাপান-জাপানী	৮.০০

গ্রন্থ গৃহ
৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

ডঃ দীপক দে-র পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণা গ্রন্থ

বঙ্কিম মূল্যায়ন ১০.

যৌন আচরণ নিয়ে যাঁরা উদার মতবাদ প্রচার করেন, তাঁরাও আপন স্ত্রীর বহু পুরুষচারিতা মেনে নিতে পারেন কিনা—এই জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে গড়ে উঠেছে এক উপন্যাস যা অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির দশখানার মধ্যে একখানা, নাম—

উদারপন্থী ৫.

কলকাতা দেখেছি ৩.

ঋতায়ন
২২।২এ শাঁখারীবাজার স্ট্রীট, কলিঃ ১

অফিস এবং ইন্‌জিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

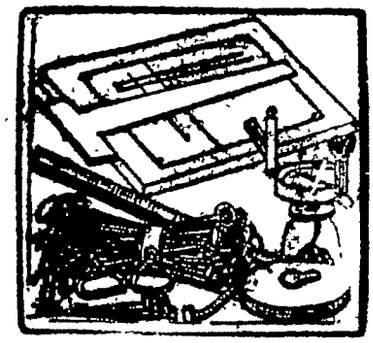

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ, খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ ১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৮
গ্রাম : ক্ষ্যাবপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কার্মেলিন প্রডাক্টস (ষ্টেশনারী বিভাগ)

সম্পাদকীয়

ঐতিহাসিক সম্পদ রক্ষা

যে-সমস্ত পুঁথিপত্র ও দলিল ইতিহাসের সামগ্রী হবার যোগ্য তার প্রতি যোগ্য সমাদর ও যত্ন না দেখালে উত্তরকালের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই অবহেলা আজ সর্বত্র। অজ্ঞতা তার অন্যতম কারণ হলেও তার সঙ্গে লোভী চক্রান্তকারীদের যোগসাজসও হয়ে দাঁড়িয়েছে দুশ্চিন্তার কারণ। যা ইতিহাসের উপকরণ বা যার একটি বিশেষ মূল্য আছে তেমন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি বা পুরনো দলিল সব দেশেই অত্যন্ত যত্নে রক্ষা করা হয়। গবেষকরা তা ব্যবহার করেন, শিক্ষার্থীরা তা থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারেন। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিটি নাকি কোনো বিদেশী সংগ্রাহক প্রচুর মূল্য দিয়ে কিনে দেশের বাইরে নিয়ে গেছেন। এই পাণ্ডুলিপিটির যে বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে তা বিদেশী সংগ্রাহক জানেন। কিন্তু আমাদের স্বদেশী বিক্রেতা কাঞ্চনমূল্যকেই ঐতিহাসিক মূল্যের চেয়ে বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। কয়েক বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিও কবির এক আত্মীয় লক্ষ টাকায় একজন আমেরিকান সংগ্রাহকের কাছে বিক্রী করতে চেয়েছিলেন। খবরের কাগজে সংবাদটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপির দেশান্তর যাত্রা স্থগিত থাকে। কিন্তু আমাদের সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আরও কত মূল্যবান দলিল যে বিনষ্ট ও পরহস্তগত হচ্ছে তার খোঁজ কে রাখে?

তামিলনাড়ু মহাফেজখানার অধীক্ষক চতুর্বেদী বদ্রীনাথ সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, সরকারী নির্বুদ্ধিতায় বিভিন্ন রাজ্যের মহাফেজখানায় বহু ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ নিয়মিতভাবে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও প্রাচীন দলিলপত্র সংরক্ষণে যথেষ্ট অবহেলা এবং অযত্ন দেখানো হচ্ছে। তার ফলে বৃটিশ আমলের বহু দলিলপত্র যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম, সেগুলো বাজে কাগজের মতো হয় ইঁদুরে কাটছে নয়তো বিক্রী করে ফেলা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি বা মধুসূদনের নিজের হাতে লেখার মূল্য যে দেশের মানুষ বুঝতে চায় না তাদের কাছে প্রাচীন দলিলের প্রাচীনত্ব বা ঐতিহাসিকত্ব তুলে ধরবে কে? মানুষের লোভ এত বেশী হয়ে উঠেছে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্দির থেকে অপরূপ সব বিগ্রহ ও মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ অসামান্য সব ভাস্কর্য নিদর্শন টাকার লোভে বিদেশী সংগ্রাহকদের কাছে পাচার করে দিতে এতটুকু দ্বিধা করছে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বাংলার অনুপম শিল্পকৃতির নিদর্শন বিষ্ণু মূর্তি দশ বছর আগে চুরি হয়ে গিয়েছিল। বহু চেষ্টায় সেই মূর্তিটি আমেরিকার বস্টন সংগ্রহশালা থেকে ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বিদেশীরা তা ফিরিয়ে দিয়ে এই মূর্তির মর্যাদাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোভী ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি দালালেরা এটি চুরি করবার সময় একটুও বিবেকের দংশন অনুভব করে নি এটাই আশ্চর্য। এভাবেই দক্ষিণ ভারতের মন্দির থেকে বিখ্যাত নটরাজ মূর্তি অপহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবেই খাজুরাহো, বেলুড় হালেবিদ থেকে শুরু করে খ্যাত-অখ্যাত বিভিন্ন মন্দির থেকে কত শিল্প নিদর্শন এই কালাপাহাড়দের হাতে বিনষ্ট ও অপহৃত হয়ে বিদেশে ধন-কুবেরদের হস্তগত হয়েছে।

এই দুর্বুদ্ধি ও অর্থলোভের ফলে আমাদের দেশের বহু সম্পদ, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য যাদের অত্যন্ত বেশী সেগুলো দেশ-বিদেশে চলে যাচ্ছে অথবা দেশেই নষ্ট হচ্ছে। মূর্তি বা পাণ্ডুলিপি পাচার করা যেমন অপরাধ তেমনি অপরাধ দলিল-দস্তাবেজ নির্বিচারে বিনষ্ট করা। সরকারী মহাফেজখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বৃটিশ আমলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমসাময়িক আমল থেকে অধুনিক কাল পর্যন্ত সরকারী দলিল তাতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। স্বাধীনতা লাভের পর এর গুরুত্ব কেন কমে গেল এবং কেনই বা গুদাম সাবাড় করার মতো করে নিয়মিত দলিলপত্র জঞ্জালের স্তূপে ফেলা হচ্ছে তা জানবার অধিকার জনসাধারণের নিশ্চয়ই আছে। এ সম্পর্কে এবং অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে সরকারকে অবশ্যই উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাহিত্য, শিল্প ও ইতিহাস সম্পর্কে যদি ওপর মহলে বোধ না থাকে তাহলে দেশের পক্ষে তা অগৌরবের কারণ। দীনদরিদ্র ভারত এখনও যে পৃথিবীতে আদৃত সে তার প্রাচীন ইতিহাসের কীর্তির কারণেই। সে ইতিহাসের নিদর্শন এবং তার উপকরণকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।

মাদার ইন্ডিয়া

মহাশ্বেতা দেবী

মাদার ইন্‌ডিয়ার বয়স আশি, রং তামাটে কালো, চুল কোঁকড়া, ছোট ছোট, সাদা। মুখের প্রত্যেকটি রেখা ফাটা ফাটা, যেন গঙ্গার জল সরে যেতে কাদার ওপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ কেঁচো চলে গেছে। ঘোলাটে চোখ দুটি মৃত নক্ষত্রের মত। যেন দুটি নক্ষত্র কবে মরে গেছে, পৃথিবী সে খবর রাখে না বলে মনে করে তারা দ্যুতিমান। শতচ্ছিন্ন একটি ডুংরি শরীরে দুফেত্তা দিয়ে পিঠের দিকে কাঁধের কাছে গেরো দেওয়া।

ওর নাম মাদার ইন্‌ডিয়া। সেই কত বছর আগে যখন কি একটা সিনেমার ছবি দেওয়ালে দেখা যেত, যখন ছেলেদের দুঃখে ও ফুটপাথে বসে রাত নেই, দিন নেই কাঁদত আর কাঁদত, তখন সিধু বলেছিল, তুই মাসি মাদার ইন্ডিয়া। সিধু ওকে এই ফুটপাথে জায়গা দিয়েছিল। কলকাতায় ফুটপাথে বাঁধা জায়গা পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। বছর বছর যারা দক্ষিণ থেকে আসে, তাদের তেমন জায়গা মেলে না।

তারা আজ এখানে, কাল ওখানে ভেসে ভেসে বেড়ায়। ও জায়গা পেয়েছিল সিধুর কল্যাণে। সিধু বলেছিল, আমি ওকে মাসি বলেছি, ও থাকবে। সিধু নেই, সিধু মরে গেছে। যাবার আগে ওকে নিজের প্যাকিং বাকসের কাঠ আর চটের ছাউনিটা দিয়ে গেছে।

সিধু ওর পেটের ছেলে নয়। কিন্তু পেটের ছেলেরা ওকে যা যা দেয়নি, পর হয়ে সিধু তা দিয়ে গেছে।

ঘরটুকু, জায়গাটুকু, নামটুকু।

ভাতের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল সিধু। ও নিজে রাখতে পারেনি। সিধুর মত চার-পাঁচজন ভিখিরি কাঙালীর জন্যে ও রান্না করত। বেলায় বাজার ঝেঁটিয়ে কপির পাতা, পালং পাতা, পাঁঠার মলনাড়ি নিয়ে আসত ও। তিনখানা ইট পেতে উনোন জেলে তাই দিয়ে অমৃত রেঁধে দিত কাঙালীদের। সামনের বাড়ির গিন্নি ওর কাছ থেকে ভিক্ষের চাল কিনে নিতেন। আশ্রিত পরিজনদের সেই চাল রেঁধে দিতেন।

তিনি জানতেন না, তাঁর ঝি ওকে নুন লঙ্কা হলুদ দিত। ঝির কোমরব্যথা ও ঝেড়ে দিত মাঝেমধ্যে।

তখন পেটভাতটা উঠে আসত। এখন বহুদিন ওঠে না। নতুন দিনের নতুন নতুন কাঙালী এখন ওর প্রতিবেশী। ওদের ভাত রাঁধে ফুলরা।

এখন ও গুলঘাস দেয়। কাঠগোলা থেকে কাঠের ঘেঁস অনেতে কোমর পিঠ ব্যথায় ভেঙে পড়ে। মাটি দিয়ে ঘেঁস মেখে ও বড় বড় গুল দেয়। এখনো এ পাড়ায় ঘরে ঘরে কয়লার রান্না। ঘুঁটের চেয়ে কাঠের গুলে ধোঁয়া কম হয়।

গুল শুকোতে দিয়ে ও প্যাকিংবাকসের সিংহাসনে বসে পাহারা দেয়। দেহটা খিদের আঁচে জ্বলে গেছে। ঘন দগ্ধ বনস্পতি। সেই সুদূর চিরতরে হারিয়ে যাওয়া শৈশবে ও ওর বাউলি বাবার সঙ্গে বনবিবির পুজো দিতে যেত। তিনখানা মাঠ, দুটো খাল পেরিয়ে। বাজে পোড়ো একটা অশ্বত্থ গাছ ও বছর বছর দেখত। বছর বছর বর্ষার জল পেলে পোড়া গাছের গোড়া থেকে কচি পাতা মুখে নিয়ে নতুন কচি ডাল বেরোত। তাতের দিনে সে পাতা শুকিয়ে যেত।

বাবা বলত, বট-অশ্বত্থ দেবাংশী গাছ। তাই মরেও মরে না, এ এক আশ্চর্য কথা।

ওর শরীর সেই গাছের মত জ্বলে গেছে। খিদের আগুনে। কিন্তু স্মৃতির জল পড়লে আজও বিগত, চিরতরে ফেলে আসা জীবনের কত কথার অঙ্কুর মাথা তোলে।

স্মৃতিতে ডুবে গেলে ওর মুখের রেখাগুলি ডুবে যায়, শান্ত হয়। ও জানেও না ওকে দেখলে তখন জরতী মনসা বুড়ির কথা মনে হয়। যেন খিদে-তেষ্টা-বার্ধক্য-দারিদ্র্যে জরজর কোনো মনসা শুধু দুটি পেটের ভাত, এক অঞ্জলা মাথার তেল লজ্জাহর একখানা কানিব জন্যে পুজোপ্রার্থী হয়ে বসে আছে। কেউ যাকে বোঝে না, সবাই যাকে, দূর হ চেংমুড়ি কানি, অলপাইয়া, অশুভটা বলে তাড়িয়ে দেয়। তাড়িয়ে দেয়, শুধু তাড়িয়ে দেয় বলে যার দুটি ভাতের কাঙালপনা ঘোচে না।

ওখন ওর চেহারা পাথর দেখায়। ঘোলাটে চোখ দুটিতে শুকনো কান্না ঠেলে উঠে আসে। তিন তিনটে ছেলে ছিল তার, সবাই ওর কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। কারা, কোন শ্রেষ্ঠতর শক্তি তাদের টেনে নিয়ে গেল ও আজও জানে না।

সে কি আজকের কথা? যেন কত কত যুগ হয়ে গেল শশী ধাড়া আর তার বউ পাতুলের অন্য লোকদের সঙ্গে মান্না বাবুদের জমি হাসিল করে আবাদী করতে আবাদে গিয়েছিল? শশী ধাড়ার বউ আগে যায়নি। ওর বাউলি বাপ যেতে দেয়নি। বলেছিল, কচিকাঁচা নে সেথা যায় কেউ? তা ছাড়া ওতে অধর্ম।

কেন? অধর্ম কেন?

জাননি!

জামাইয়ের মুখের দিকে করমচার মত লাল, শিয়ড়চাঁদা সাপের মত ক্রুদ্ধ দুটি চোখ তুলে ধরে গগন বাউলি বলেছিল এগারো বছর ধরে যারা অন্যত্তর ওদের জমি চাষ করে, তাদের উচ্ছেদ করে নাই গোলবদন মান্না? বারো বছরে দখল জন্মে তাই এগারো বছর কোকে লাগি। তারা এ জমি হাসিলে অগগে অধিকারী নয়? তারা তোমাদের ছেড়ে দিবে?

শশী ধাড়া মাথা নেড়ে অসহায় হেসে চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের জেদ ছাড়েনি। বলেছিল, মোদের উচ্ছেদ করতে লারবে গো। মোদের পিছনে বাবুরা আছে।

কিন্তু শশীর কথা ফলেনি। অনাবাদী বন্যভূমি বড় হিংস্র, যুধ্যমান, আক্রোশক। সে ভূমি যারা একবার হাসিল করে চাষ করেছে, তারপর উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাদের ক্রোধ অতি ভয়ংকর। তাদের সঙ্গে আর অরণ্যের, বাদার নোনাগাছের সঙ্গে শশীদের দীর্ঘদিন লড়তে হয়। তারপর, দীর্ঘায়িত এক রক্তোৎসব সাঙ্গ হলে বাতাসে আমনের গন্ধ ছড়াতে সুরু করেছিল। উচ্ছিন্ন মানুষদের মতই উচ্ছিন্ন অরণ্যও হার মেনে পিছু হঠে সরে গিয়েছিল।

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
সতীকান্ত গুহ

সে সব কথা ওর মনে পড়ে। ওর মনের উপর দিয়ে কে যেন শশী ধাড়া আর শশী ধাড়ার বউয়ের জীবনকথার পট খুলে ধরে আর টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। শশীর ঘরসংসার হয়েছিল, তিনটে কলবলে ছেলে। দেখে দেখে গগন বাউলি বলেছিল, এগারো বছরে তুলে দিবে বাপ। তুমি যেয়ে মোর ঘরে বস।

সত্যি সত্যি শশীদের যখন উচ্ছেদ করে দেয়, তখন গগন বাউলি বেঁচে নেই।

অনাবাদী বন্যভূমি হাসিল করে আবাদী করে তুলে, এগারো বছরে উচ্ছেদ হয়ে গেলে চিরকাল শশীরা লড়ে। এবারও লড়েছিল। হেঁসো বনাম বন্দুকের লড়াইয়ে চিরকাল শশীরা মরে। এবারও মরেছিল। শশীর বউও মরিয়া হয়ে হাতে হেঁসো নিয়ে বেরিয়েছিল। তারপর ও হাজতে যায়। হাজত থেকে বেরিয়ে যখন শাশুড়ির কাছে যায়, শাশুড়ি বলেছিল, আমার ছেলে নি। তোর বড়টাও বাপের সঙ্গে গেল, হেথা আইতে পাত্তিস। কিন্তুক তুই আইলে যন্তন্না বেস্তর। পুলুস পাছু ছাড়বে না।

তখনি শশী ধাড়ার বউ বুঝতে পারে ওকে কোটালে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এ হল মাতলায়, ষাঁড়াষাঁড়ির কোটাল। কোটালের টানে নদী সমুদ্রে হারায়। এ কোটাল ওকে ভাসিয়ে বৃহৎ পৃথিবীতে নিয়ে এসে ফেলে দিয়ে গেল। শশীদের লড়াইটা থেমেও থামেনি। তাই পুলিস হন্যে হয়ে পাপী-তাপীদের খুঁজে ফিরছিল। তাই হারাণ সামন্ত বলেছিল, একো জায়গা না কি দুনিয়ায়? তার জায়গা নি? চল্ আতের আঁধারে পলাই।

ওরা অনেকে এসেছিল। কলকাতার বুড়ি ছুঁয়ে কত কত জায়গায় যে নিয়ে ওদের গিয়েছিল গ্রাম্যবৃদ্ধ হারাণ। কত জায়গায় শশী ধাড়ার বউ ডাঙ্গা জমি হাসিল করেছিল, কত লক্ষ্মীমন্তের ধানখেতে ওর হাতে রোয়া ধানে আমন ফলেছিল, কতদিন পিঠ নিচু করে, শুধু পিঠ নিচু করে ভীষণ আক্রোশে ও শুধু ধান রুইত। কত আষাঢ়ের বিপত্তারিণী ব্রতের দিনে, কত শ্রাবণের লোটনষষ্ঠী ব্রতের দিনে, দুরন্ত ক্রোধে, ঝরোঝরো জলে ধান চারা নেড়ে দিত শশী ধাড়ার বউ। পউষে পউষলক্ষ্মী ব্রতের হিমেল বাতাসে সোনালী ধান কেটে তুলে দিত পরের উঠোনে, সব এখন গ্রামীণ পটুয়ার হাতে আঁকা অবহেলিত, অবমানিত পটের ছবির মত অস্পষ্ট চলমান ছবির মিছিল হয়ে গেছে।

কত কতবার এগারো বছর না হতেই নতুন খেতমজুর আসতে ওরা উদ্বিগ্ন হয়েছে তাও মনে পড়ে না। তবে শশী ধাড়ার বউয়ের বিগত জীবনের, বার বার উচ্ছিন্ন হবার কথা মনে করতে গেলে মনে পড়ে সুদূরে ও প্রাচীন শৈশবের কথা। বাউলি বাপ বনবিবি পুজো করতে যাচ্ছে। সঙ্গে মা-মরা একটা কালো মেয়ে। নৌকো চলেছে খাল বেয়ে, জলে গরান গাছের সবুজ ছায়া। মেয়েটা দেখছে জলফড়িং আশ্রয় খুঁজে যে পাতাটায় বসে, যে ভাসমান চলমান পাতায় সেটাই পিছলে ভেসে সরে যাচ্ছে। মনে পড়ে জলের সোঁদা এঁশো গন্ধ, বাপরে গায়ের তেলতামাকের গন্ধ।

আর মনে পড়ে ভাতের গন্ধ। ভাতের গন্ধের লোভ বড় অমানুষ বড় লক্ষ্মীছাড়া করে ফেলেছিল শশী ধাড়ার বউকে। শশী ধাড়া সেই যে বলেছিল, আমি যাই। তুই হেঁসো ছাড়িস না বউ, ওদের অসাধ্য কিছু নি।

শশী সেই যে হেঁসোটা ওর হাতে দিয়ে বড় ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল শশীর বউ হেঁসোটা আর ছাড়েনি। হাজতে যাবার আগে শাশুড়ির গোলপাতার চালে গুঁজে রেখে যায়। বেরিয়ে এসেই নিয়ে নিয়েছিল।

সেই হেঁসোটা পেটকাপড়ে, সঙ্গে দুটো উঠতি ছেলে নিয়ে শেষ বার উচ্ছেদ হওয়ার পর শশী ধাড়ার বউ মেদিনীপুর থেকে কলকাতা এসেছিল। মিছিল করবি চল্ বলে ওদের এনেছিল বাবুরা। তখন হারাণ বলেছিল ই খুব ভাল বাবু। অকম অকম ফেলাগ নে অকম অকম মিছিল করবি। উটি খেতে পাবি, পয়সা পাবি।

মিছিল কি বারাবুরে হয়?

শশী ধাড়ার বউ ধমকে উঠেছিল। মিছিল রোজ হয়নি, বুটি রোজ আসেনি কিন্তু ও ছেলেদের কথামত দেশে ফিরতেও রাজী হয়নি। বলেছিল, যে থুথু ফেলিছি, তা তুলে খাব? সেথা তোদের আছে কি?

হেথা কে আছে, কি আছে?

আর ভেসে বেড়াতে পারিনি রে! হেথা থাকব।

কি খাবি মা?

ব্যামন জুটবে।

ছেলেরা আর কিছু বলেনি। মার ওপর ওদের অসীম নির্ভর। শশী ধাড়ার বউ ছেলেদের মানুষ করেছিল ক্ষুধিত ও হিংস্র ভালবাসায়। ওর নাড়ীর বন্ধনে একদা যেমন, ওর ভালবাসার পাকেও এখন ওরা তেমনিই বন্দী ছিল। এত বড় ছেলেদের মার ওপর এত নির্ভরতা, এমন ভাসমান জীবনে কমই থাকে। শশীর বউ বলেছিল, তা বাদে—

কি, মা?

মরলে তোরা মোকে গঙ্গা দিবি। হেথা গঙ্গার দেশ।

তখনো ওরা এই ফুটপাথেরই এক কোণে থাকত। সিধু ওদের থাকতে বলেনি, নিজের ছাউনিতে আশ্রয়ও দেয়নি, আবার তাড়িয়েও দেয়নি। অন্য কাঙ্গালীদের বলেছিল, দেখনো। এরা বারাবুরে নয়। টেমপোরারি। চলে যাবে।

সেখান থেকে বেহালা বাজার। শশীর বউ দোকানে মশলা ঝাড়ত। ছেলেরা কাঠ-গোলায় কাঠ চেলা করত। সেখান থেকেই একদিন মাইক দিয়ে ডেকে কারা যেন ছেলে-দের নিয়ে গিয়েছিল। মেজ ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে ওর হাতে ছ-টা টাকা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, খাদ্য নে খুব গণ্ডগোল হতেছে মা! তাই পালে পালে অসচ্ছল মানুষ আসতেছে কেতা কোতা হতে। আমরাও যেতেছি।

শশীর বউ বলেছিল, হাংনামা জবর পাকলে পাইলে এস, অ বাপ হাংনামায় থেকনি।

তাই থাকি?

ছেলেরা ওর কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবার সেই এক পটের ছবি। মা দাঁড়িয়ে আছে বাস রাস্তায়, ছেলেরা হেসে ওর দিকে মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছে। পথে কাতারে কাতারে লোক।

তারপর সন্ধে হতে না হতে সব যেন চুপ, বোবায় ধরা, যেন শশী ধাড়ারা মরে যাবার পর পুলিসের চোখ এড়াতে বনে লুকিয়ে থাকার সময়কার মত নিঃশব্দ, যন্ত্রণাময়, জন্মবোবা মেয়ের গর্ভযন্ত্রণার মত প্রাণান্তিক, মূক।

রাতে কারা বিশৃঙ্খলে ফিরতে লাগল ছুটে ছুটে। কারা খবর আনল কোথায় গুলি চলেছে, চাষীরা পথ চিনত না বলে কোথা কোথা ছুটে গেছে, কোথায় গাড়ি করে লাশ সরিয়ে ফেলা হচ্ছে বলে চতুর্দিক ঘেরাও। নেড়ী কুকুর ছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণী বুটপরা পায়ের বেড়া পেরিয়ে ঢুকতে পারছে না। খুব গন্ডগোল।

সকলের মত শশীর বউ প্রথমে ভয় পায়নি। ও ছেলেদের নিয়ে নিজেও হাংগামায় পড়েছে। উদ্যত লাঠি বা ধাবমান বুট এড়িয়ে পালাতে হয়েছে ওকেও রাঢ়ে-গৌড়ে। ওর ছেলেরা পালাতে জানত।

কিন্তু ছেলেরা আর ফেরেনি। ও নিজে কি হেঁটে যায়নি সেই সব জায়গায়? কিন্তু সেখানে ত শুধু আকাশ ফুটো করে লাল লাল দালান বাড়ির পাঁচিল। নিরাপদ ধাড়া, লখিন্দর ধাড়ার খবর সেখানে কেউ দিতে পারেনি।

বাবুরা, তোমরা সকলে ফিরলে, আর নিরাপদ, আর লখিন্দ কেথা অইল?

ওর এ কথার জবাবও কেউ দিতে পারে নি। তখন শশী ধাড়ার বউয়ের মত অন্যদের নিয়ে বাবুরা আরেক মিছিল করতে চেয়েছে। কিন্তু সে মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই শশী ধাড়ার বউ সরে গিয়েছিল। দলের সবাই যে পথে চলেছে, সে পথ ছেড়ে অ নিরাপদো! অ লখিন্দো! কমনে গেলি হারামজাদারা? এই বলে, বুক চাপড়ে ও পথে পথে টাউর খেতে সুরু করে।

পটের ছবিতে সব পলায়মান, ছুটন্ত, মারীচী ক্ষিপ্রতায় সচল। শশী ধাড়ার বউ টাউর খেয়ে, ক্লান্ত-ডানা গুবরে পোকা যেমন চড়া আলোয় বিহ্বল হয়ে কাল্পিক মেরে ঘোরে

এবছরের শিশিরকুমার পুরস্কার বিজয়ী কবি ও প্রাবন্ধিক

হরপ্রসাদ মিত্র-র

অবিস্মরণীয় কবিতার বই

ঝাউয়ের শব্দ ৪৲

এবছরের আনন্দ পুরস্কার বিজয়ী সর্বপ্রিয়

শিবরাম চক্রবর্তী-র

কিশোর পাঠ্য গল্প সংগ্রহ

হাসি নিয়ে হৈচৈ ৩৲

এবছরের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত বই

ডঃ বৃন্দাবন বাগচী-র

আঁধারের আলো ৩৲

গীদ্য মোপাসাঁর ভাবান্তর/ইন্দুভূষণ দাশ

এক নায়ক অনেক নায়িকা ১০৲

অমিতাভ দাশগুপ্ত-র

সেই লোকটি ৭৲

সরোজপ্রভা কর-এর উপন্যাস

সুচরিতাসু ৬৲

জরাসন্ধ-র নতুন বই

নদীর এপার কহে ৮৲

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর নতুন গ্রন্থ

সাঁঝের বেলা ৮৲

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ॥ কলিকাতা—৯

তেমনি করে এ শহরের ফুটে, পথে, ময়দানে। কখনো বিয়েবাড়ির বাইরে ভোজের এঁটো খেতে তৎপর, কখনো বাতাসকে প্রশ্ন, ছেলে দুটো গেল কোথা?

বুঝি মরে গেছে একথা যে বলেছ, তাকেই শশী ধাড়ার বউ বলেছে, হেঁসো দে ফেড়ে ফেলে দেব। তখন অবশ্য ওর অজ্ঞানতে বহুদিন ওর হাত থেকে হেঁসো খসে পড়ে গিয়েছিল। শশী ধাড়ার বউয়ের তখন মনের অবস্থা বস্তুমাখা কাদার মত ঘোলাটে। কিন্তু 'মরে গেছে' এ কথা কানে গেলেই ও চমকে ওঠে। বাউলি বাপ বলত মত্তে না দেখলে মরেছে বলে মানি না। সেথা সন্দো আছে, সেথা এই মন্তরপড়া কানি ঘরের বাতায় বেঁদে থুই। য্যাতদিন কানি থাকে, ত্যাতদিন আশ।

সেই সময়ে একদিন, ঘুরতে ঘুরতে শশী ধাড়ার বউ আবার সিধুদের ফুটপাথে ফিরে এসেছিল। সিধু ওকে চিনতে পেরেছিল। বলেছিল। তোমার এমন দশা?

ভুরু কুঁচকে শশী ধাড়ার বউ বলেছিল, কেমন দশা?

এমন! ছেলেরা কোথা?

পাইলেছে।

রাগীধূপ
প্রস্তুত কারক:- ক্যাকার প্রডাক্টস্

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা যন্ত্রণা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন।

সিধুই ওকে আশ্রয় দেয়। শশী ধাড়ার বউ তখন স্বচ্ছন্দে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়। ওর পেট-আঁচলে পয়সা ছিল। পয়সা ও সিধুকে দিয়ে দেয়। কেন দেয়, তা ও নিজেও জানে না। ওর তখনকার সব আচরণের ব্যাখ্যা পরে ও নিজেই করে উঠতে পারেনি। তারপর, হাইড্র্যান্টের জলে স্নান করে, পেটে দুটি খেয়ে, একদিন ও সহসা স্বস্থ হল। আবার ফিরে এল সম্যক জ্ঞানে। কিন্তু মাঝের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ও যেমন হেঁসো, হাঁড়িপাতিল, মাথায় চিরুনি, গামছাখানা পথে পথে ফেলে এসেছে তেমনি, স্বভাবের সেই দুর্জয় রাগ, দুরন্ত আক্রোশ, অবাধ্য জেদও কোথাও ফেলে দিয়ে থাকবে।

সিধু বলল, শোকতাপে মাগী ভোঁ মেরে অয়েছে।

অন্য কাঙ্গালীরা বলল, তোর ত্যাত মায়া?

সিধু বিড়ি টেনে বলল, এক কতা, একন ও টেমপোরারি নয়। বারাবুরে ক্যাঙ্গালী। বাবাবুরে ক্যাঙ্গালীকে বাবা-বুরেরা ঠাঁই দিতে হবে। সে ফুটপাতরের যে নিয়ম।

তুই জানিস।

তা ভেন্ন উনি থাকলে মোদের সোম্‌সার টুকু দ্যাকে।

অন্য কাঙ্গালীরা বড় নিশ্চিন্ত হল। হ্যাঁ, কাঁথা-কানি-চট-কাগজ-পিসবোর্ডের চটি—হাঁড়ি-পাতিল টিনের মগ-তোলা উনুন-কেরাসিন কাঠের বাক্‌স—ওদের সংসারও দিনে দিনে কম ভারি হয় না।

বড় নিশ্চিন্ত হল ওরা। সিধু ওকে ঠাঁই দিচ্ছে স্বর্থপর বুদ্ধিতে এ কি কম আশ্বাসের কথা? যদি হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়েছে বলে সিধু ওকে ঠাঁই দিত, তা হলে সিধুকে ওরা বিশ্বাস করত কি করে?

সিধু আবার বিড়ি টেনে বলল, চ্যায়রা খানা দেখেছিস? একেবারে মাদার ইন্‌ডিয়ার মেকাপ।

সিধুই বলল, নুলোটা রাঁদত। তুমি যদি রাঁদ তবে ও বেরুতে পারে বেশি বেশি।

ভিখিরিদের রান্না একবার। কয়েকদিনেই শশী ধাড়ার বউ সে রান্না রাঁধতে শিখল। ভিক্ষের চাল সামনের বাড়িতে বেচে ভিখিরি-দের পয়সা দেবার ভার ও নিজে নিয়ে নিল। কয়েক দিনেই বাজার ঝেঁটিয়ে ও পচা টমেটো। কাঁপ পাতা, মুলো শাক, আধপচা আলু, পাঁঠার মলনাড়ী আনতে শিখল। একদিন, সিধু মরে যেতে ও যখন গুঁড়ি মেরে সিধুর চটের ঘরে ঢুকল, কেউ মানা করল না। ওর অধিকার আছে কি না সে প্রশ্ন তুলল না।

কেননা ততদিনে আদিগঙ্গার পাড় বাঁধা হয়ে গেছে, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করছে সি এম ডি এ, দেওয়ালের শ্লোগান ও শ্মশানের দেওয়ালের নাম মুছে গেছে। অনেক, অনেক দিন কেটে গেছে।

ঘরে ঢুকে ও একখানা বাখারির গায়ে দুটো ন্যাকড়া বাঁধল।

নতুন ঘরে ঢুকলি, পুজো দিবি না?—নুলো বলল। বলল, আমরা মিষ্টি খাব না?

ও কথা বলেনি। বাউলি বাপ বলত, য্যাতক্ষণ আশ থাকবে, কানি খুলবি না। কানিটুকু জেয়নকাটি। হটকারে একদিন মরা বলে যারে জান, সে ফিরে আসবে।

নেকড়া বেঁধে ও বলল যে খুলবে তারে আমি শেষ করে দেব।

কেন? ওতে কি আছে?

মোর ছেলেদের জেবন।

তারা আর আসে?

আসবে। মোরে গঙ্গাসই করবে।

গুল শুকোতে বসে ও শশী ধাড়ার বউয়ের জীবনটা রোজ পরিক্রমা করে। যেন ওর মনটা সূর্য। শশী ধাড়ার বউয়ের জীবনাকাশ সে সূর্যকে ঘুরে আসতেই হবে। কিন্তু এখন ও বোঝে জীবন শেষ হচ্ছে। সে সূর্যের দ্যুতি রোজ রোজ ম্লান হচ্ছে। সে সূর্য তাপ হারাচ্ছে।

এখন ওর প্রতিবেশী নতুন কাঙ্গালীরা। তারা ফিরে আসে সন্ধ্যায়। তখন ফুলেরা রাঁধে। সারাদিন ফুলেরা বাস স্টপে ঘোরে। মাঝে মধ্যে ওর কাছে এসে ওষুধ চায়। মেয়েটা নষ্ট, নোংরা। ও মেয়ে কাঙ্গালী-দের দেখতে পাবে না। কিন্তু ওই ফুলেরাই, ও উলঙ্গ হয়ে হাইড্র্যান্টের জলে স্নান করার পর, ওকে ডুরিটা পরিয়ে দেয় ঘাড়ে বেঁধে দেয় গেরো।

আজ গুলগুলো কুড়িতে তুলে ও বলল, অ ফুলেরা, মোক্ষদাকে ডেকে গুল নে যেতে বল।

তুমি যাবে নি?

না রে, শরীলটায় দিচ্ছে না।

সি কি। ওদের বাড়ি না যগ্যি হচ্ছে?

যগ্যি তুই খে গে যা।

ফুলেরা ভারি অবাক হল। ও যে যে বাড়িতে গুল দেয়, সে সে বাড়িতে বিয়ে শ্রাদ্ধ-পইতে-অন্নপ্রাশনে ওর একখানা পাত বাঁধা। সেই অবাধ নিমন্ত্রণে ও যাবে না?

ফুলেরা বলল, কাঁপতেছ কেন?

ঠান্ডা না বড্ড?

ঠান্ডা কোতা? দেখি?

জ্বর নেই, তবু শরীর কাঁপছে। ও বলল নয় তুই দে আয়, পয়সা নিস গুনে গুনে।

সাবু বাতসা খাবে?

ধুস।

ঝাঁপ ফেলে দিল ঘরে। শুয়ে পড়ল কুঁকড়ে। চট এতটুকু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে রইল। মনের ভেতর যেন নোনা খালের জল বইছে। গরান পাতা খসে খসে পড়ছে সে জলে। ও যেন আজ একটা পাতায় বসতে চাইছে বার বার। কিন্তু যে পাতাটায় বসতে যায়, সেটাই সরে সরে যায়।

কত পাতায় যে বসতে চাইছে ওর মন। শশী ধাড়ার সেই বেরিয়ে যাবার আগেকার উত্তেজিত, আবক্ত মুখ একটা পাতা। সে পাতাটা সরে গেল। বাউলি বাপ বলছে, কানিটুকু খুলিস না মা, তোর কাকা যাদের

মুখ থেকে নিশ্বাস ফিরবে। সে পাতাটাও সয়ে গেল। নোনা খালে এত স্রোত। মুর্শিদাবাদে সাঁওতাল দাওয়ালরা ধান কাটবে, ও ছেলেদের নিয়ে পালাতে পালতে জ্বলন্ত নুড়ো সাঁওতালদের ঝোপড়ি-তে গুঁজে দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেরা যে এখন বলছে, খেতে দেবে, টাকা দেবে, সোমত্তে হতে ফিরে আসব। এই পাতাটা স্রোত উপেক্ষা করে ঘুরে ঘুরে আসছে আর আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। ও গালাগালি দিয়ে বলল, ফিরে না এলে মোর গঙ্গা হয় না জানিস, মনে আখিস।

চমকে জেগে উঠল ও। সে কি, সেকথা তো ও বলেনি ছেলেদের? ও ত বলেছিল, হাংনামা জবব পাকলে পাইলে এস বাপ। অ বাপ, হাংনামায় থেক নি।

ও বলল, অ ফুল্লরা ডিবরিটা জেবলে দে।

ফুল্লরা ডিবরি জেবলে দিয়ে গেল।

সেই যে শুল ও বিছানা পেতে, আর উঠল না। পরদিন বেলা হল, রোদ উঠল। ফুল্লরা সারারাত ফষ্টিনষ্টি করে গঙ্গা নাইতে যাবার আগে চটটা তুলে বলল, অ মাসি আজও দেহ সুবিদে নয় না কি?

তারপর ও নিচু হতেই সব বুঝল।

ফুটপাতের কাঙালীরা, ঠিকে ঝি-রা মাথা নাড়ানাড়ি করল। সিধু বলত মাদার ইনডিয়া। কিন্তু নিজস কেন ভাগ্যমানী গেরোমানী ঘরের মানুষ ছিল। পড়ল আর নিশ্চুপে মরল নেকড়া-বাঁধা বাখারির দিকে শীর্ণ আঙুল ছড়িয়ে, এমন মরা ত ভিখিরি কাঙালী মরে না? বড়লোকরা এমন হঠাৎ মরে। মাসি বড় ঘরের মেয়ে ছিল।

ওর শবযাত্রায় পুলিশ গাড়ি আনল। সরকারী ব্যবস্থায় ওর সৎকার হল। গাড়িতে ডোমরা ওকে তোলার আগে ফুল্লরা আর অন্য কাঙালীরাই ওকে ধরধরি করে তুলে দিল।

ফুল্লরা বলল, কোতা নে যেয়ে জ্বালাবে হ্যাঁ গো।

কাঙালীরা বলল, কেন শুধোচ্ছিস?

মাগী অ্যাত গঙ্গা পেতে চেইছিল, ছেলেরা নিউদ্দিশ, তা ওরা কি শোশানে ওরে গঙ্গা দেবে?

কাঙালীরা বলল, ধুস গঙ্গার দেশে হলেই কি সকলে গঙ্গা পায়?

ফুল্লরার মাসির জন্যে সহসা বড় কষ্ট হল। কাঁদতে গিয়ে ফুল্লরা দেখতে পেল না গাড়িটা চলে যাচ্ছে, মাদার ইনডিয়ার পা দুটো খোলা দরজার ফোঁকে চিতিয়ে আছে, বিনা মৃতাচারে ছাই হবার জন্যে বেওয়ারিশ মড়া হয়ে চলে যাচ্ছে ও। আর মাদার ইনডিয়া দেখতে পেল না ওর শোকে কেমন বিবশ হয়ে কয়েকটি কাঙালী ও এক বহুসেবিকা ফুটপাথে বসে কর্মবিরতি ও অশৌচ পালন করছে।

অমৃত

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮২

প্রতি বছরের মত এবারও অমৃতের নববর্ষ সংখ্যা ৯ মে প্রকাশিত হবে।

এবার এক নতুন পরিকল্পনায় প্রকাশিত হচ্ছে অমৃতের এই নববর্ষ সংখ্যা। অমৃত এবার পনের বছরে পড়ছে। আমরা স্থির করেছি, গত ১৪ বছর ধরে যে সব বিখ্যাত লেখকের গল্প অমৃতে প্রকাশিত হয়েছে তারই ভেতর থেকে বেছে ৩৫টি শ্রেষ্ঠ গল্পের একটি সংকলন এ বছর উপহার দেব আমরা। আমাদের লেখকবৃন্দের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে একেবারে হাল আমলের প্রায় সমস্ত প্রখ্যাত লেখকেরই গল্প থাকবে এতে। এই সংখ্যাটির সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম; এবং অনেকেই এটি সংগ্রহ করে বাঁধিয়ে রাখতে উৎসাহী হবেন। বলা বাহুল্য এই সংখ্যাটি যদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তাহলে এর দাম কুড়ি টাকা হবে। কাজেই সেদিক থেকেও এর আকর্ষণ কম নয়।

এর সঙ্গে থাকছে বাঙলার একজন বিশেষ জনপ্রিয় লেখক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন একখানি উপন্যাস এবং রবীন্দ্র বিষয়ক নিবন্ধাদি।

বৃহদায়তন ও সুঅলঙ্কৃত

দাম ৪·৫০ পয়সা

এই বাংলার খবর

বেতন, ভাতার হার

রাজ্যের অধ্যাপক ও শিক্ষকদের বেতনহার সংশোধন এবং সরকারী কর্মচারীদের বাড়তি মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী প্রথম ঘোষণা করেন মার্চের তিন তারিখে। বাড়তি মহার্ঘভাতার পরিমাণ আট টাকা। অবশ্য তার অর্ধেক আবশ্যিক জমা প্রকল্পে সরকারের কাছে জমা থাকবে। সেটা পুষিয়ে দেওয়ার জন্যে মাসে চার টাকা করে আগাম দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাতেও সরকারি কর্মচারীরা খুশী হননি। তাঁরা আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাতে থাকেন। ঠিক এক মাস পরে, অর্থাৎ এপ্রিলের তিন তারিখে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় আবার ঘোষণা করলেন, ঐ চার টাকা আগামের বদলে মহার্ঘভাতা দেওয়া হবে মাসিক ১৬ টাকা হারে। তাছাড়া রাজ্য সরকারের পেন্সনভোগীদের মাসিক দশ টাকা হারে এড হক মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু কর্মচারী প্রতিনিধিদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়, এই ঘোষণাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁরা বলছেন, মহার্ঘভাতার ব্যাপারে বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

সংশোধিত বেতনহার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের খুশী করতে পারেনি। তাই ১৪ মার্চ পূর্ব ঘোষিত বেতনহার প্রথম সংশোধন করা হয়। তারপর তেসরা এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতনহার আবার সংশোধন করা হলো। পূর্ব ঘোষিত বেতনহারে মূল বেতনের সংগে মহার্ঘভাতা যুক্ত করার কথা ছিল। নতুন হারে মহার্ঘভাতা মূল বেতন থেকে পৃথক থাকছে। এছাড়া স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা পাবেন দুটি করে বাড়তি ইনক্রিমেন্ট। শিক্ষক এবং রাজ্য কর্মচারীদের এই সব বাড়তি পাওনা মেটাতে রাজ্য সরকারের খরচ হবে বছরে ২১ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ যেভাবে এই বাড়তি টাকার বন্দোবস্ত করেছেন তার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

বার্ণপুরে খুন

বর্ধমান জেলার বার্ণপুর এলাকায় এপ্রিলের দু' তারিখে দুদলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তিনজন নিহত ও ১৫ জন আহত হন। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। তবে সেই গুলিতে কেউ হতাহত হন নি। ঐ এলাকায় কারফিউ জারি করতে হয়। প্রকাশ, স্থানীয় খাটাল মালিকদের সংগে একদল যুবকের বচসার ফলেই গন্ডগোলের সূত্রপাত। কিছুদিন আগে থেকেই এই গোলযোগ চলছিল। সংঘর্ষের পর পুলিশ মোট ৭৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু কারফিউ জারি থাকা সত্ত্বেও একজন ছুরিকাহত হয়। রাজ্য বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ উঠলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বার্ণপুর হাংগামার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হীরাপুর থানার ও-সিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে। অবস্থা আয়ত্তে। ৬ তারিখে দুর্গাপুরে এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থবাবু বার্ণপুরের হাংগামার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, প্রতিক্রিয়াশীলেরা সি পি এমের সহায়তায় সারা রাজ্যে হাংগামা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের মানুষ এসব সহ্য করবে না। সি পি এমের রাজত্বে হিংসার আবহাওয়া বদলাবার জন্যে তাদের বহু জীবন আহুতি দিতে হয়েছে।

তেনুঘাটের জল

বিহারের তেনুঘাট বাঁধের ধরে-রাখা জল শেষ পর্যন্ত এই বাংলার বোরো চাষকে বাঁচাতে চলেছে। কিন্তু বিহার থেকে এই জল এ-রাজ্যের ক্ষেতে পৌঁছবার আগে দামোদর দিয়ে বেশ কিছু জল গড়িয়ে গেছে। তেনুঘাট থেকে জল না-পেলে এই রাজ্যের বোরো চাষ রীতিমতো মার খাবে, এ-কথা বিহার সরকারের মোটেই অজানা নয়। তা ছাড়া স্থানীয় চাহিদা মেটাবার পর জল তেনুঘাটে উদ্বৃত্ত রয়েছে। সেই জলই দাম দিয়ে (অবশ্য ঠিক জলের দরে নয়) পশ্চিম বাংলা সরকার কিনবেন। গত জানুয়ারীতে দিল্লীতে তেনুঘাটের জল নিয়ে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনা হয়। তাতে কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচমন্ত্রী জগজীবন রামও হাজির ছিলেন। নিয়মিতভাবে জল যোগাতে বিহার রাজি হয়। কিন্তু বিহার সরকার তবু গড়িমসি করতে থাকেন। এদিকে জলের অভাবে পশ্চিম বাংলায় কয়েক কোটি টাকার বোরো ফসল মাঠে মারা যাওয়ার উপক্রম হয়। পশ্চিম বাংলাকে তেনুঘাটের জল দেওয়া হবে কিনা তা স্থির করার ভার দেওয়া হয় বিহার সরকারের একটি কমিটিকে। ঐ কমিটির বৈঠকের পর এপ্রিলের পাঁচ তারিখে বিহার সরকার তেনুঘাট থেকে পশ্চিম বাংলাকে জল দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দেন। বিহারের মুখ্যসচিবের নির্দেশ পাওয়ার পর বাঁধ কর্তৃপক্ষ জানান যে, তাঁরা বোরো চাষের জন্যে পশ্চিম বাংলাকে এক লাখ ৭৭ হাজার একর-ফুট জল দেবেন। অবশ্য বোরো চাষের জন্যে জল লাগবে মোট প্রায় দুলাখ একর-ফুট। বাকিটা পাওয়া যাবে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের পাঞ্চেৎ জলাধার থেকে। এর ফলে বর্ধমান-হুগলিতে প্রায় পৌনে দুলাখ একর জমিতে বোরো ফসলের সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

৭।৪।৭৪ দেবদত্ত

গোয়েন্দা ধাঁধা

বুদ্ধিমান ঘোড়া আর বোকা চোর ॥

শার্লক হোমস ॥

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

চলন্ত ট্রেনে বসে ঘটনাটার আদ্যপান্ত ওয়াটসনকে বলল হোমস। ভারী রহস্যজনক ব্যাপার। ডার্টমুর জায়গাটা যেমন ফাঁকা তেমনি নির্বিবিলি। দু-চারটে স্বাস্থ্যনিবাস আছে স্বাস্থ্যকামীদের জন্যে। সিম্পসন বলে একটা লোক প্রায় আসত সেখানে। খুনের দিন এসেছিল সিলভার ব্লেজ যে আস্তাবলে আছে, সেইখানে। তখন সন্ধ্যে হতে চলেছে। মাংসের বাটি হাতে ঝি আসছে ট্রেনারের বাড়ী থেকে হান্টার ছোকরার জন্যে। রাত্রে আস্তাবল পাহারা দেবে হান্টার—খাবেও ঐখানে। এমন সময়ে সিম্পসন পাকড়াও করল ছুঁড়িকে। হাতে মাথামোটা ভারী লাঠি। মিঠে মিঠে বুলি ছেড়ে হাতে একটা দশ পাউন্ডের নোটও গুঁজে দিতে গেল। ভড়কে গিয়ে ঝি গিয়ে বলে দিলে হান্টারকে। সিম্পসন ততক্ষণে কাছে এসে গেছে। হান্টারকেও ঘুস দিয়ে জানতে চাইল সিলভার ব্লেজ সম্বন্ধে খবরাখবর।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল হান্টার। রেসের আগে এরকম ঘটনা আকছার ঘটে। তাই 'তবে রে' বলেই দৌড়োলো কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার জন্যে। ঝি মেয়েটিও ভোঁ দৌড় দিল বাড়ীর দিকে। যেতে যেতে দেখল জানলা দিয়ে ভেতরে মুণ্ড বাড়িয়ে রয়েছে সিম্পসন। হান্টার অবশ্য কুকুর নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল লোকটা ভেগে পড়েছে।

ট্রেনারের নাম স্ট্রেকার। খুব নাম আছে। ঝিয়ের মুখে সব শুনে অস্থির হলেন ভদ্রলোক। রাত একটার বর্ষাতি কাঁধে বেরিয়ে পড়লেন আস্তাবলের দিকে। বউকে বলে গেলেন মন চঞ্চল হয়ে আছে ঘোড়াদের জন্যে। একটু দেখে আসা যাক।

সেই হল তাঁর কালযাত্রা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেও মিসেস স্ট্রেকার বোঝেননি তিনি বিধবা হয়ে গেছেন। আস্তাবলে গেলেন স্বামীর খোঁজে। গিয়ে দেখেন তাজ্জব কাণ্ড! হান্টার ছোঁড়া বেহুঁশ। মাচায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে. আরো দুটো ছোঁড়া। আস্তাবলের দরজা খোলা। সিলভার ব্লেজ উধাও!

বেশ খানিকটা দূরে পাওয়া গেল গাছে ঝুলন্ত বর্ষাতি। একটু তফাতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে স্ট্রেকার। খুলি চূর্ণ কঠিন আঘাতে। হাতে একটা রক্তমাখা তীক্ষ্ণ ছুরি। বেশ খানিকটা কাটা দাগ। পাশে পড়ে সিম্পসনের পরিত্যক্ত গলাবন্ধ—তাতেও রক্ত লেগে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে আরো কয়েকটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল হোমস। স্ট্রেকারের হাতের ছুরিটাকে ডাক্তারী ভাষায় ছানিকাটা ছুরি বলে। খুব দামী আর খুব সূক্ষ্ম ধারালো ফলা। কিন্তু ফলা মোড়া যায় না। পকেটে নিয়ে যাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও স্ট্রেকার ছুরি নিয়ে দৌড়েছিলেন। তাড়াতাড়িতে নাকি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন—বললেন তাঁর বিধবা বউ।

স্ট্রেকারের পকেটে পাওয়া গিয়েছিল মোমবাতি দেশলাই আর কুড়ি গিনি দামের একটা মেয়েদের জামার ক্যাশমেমো। কুড়ি গিনি দামের জামা কি সাধারণ বউ-ঝি পরে? মিসেস স্ট্রেকারকে আচমকা শুধোলো হোমস—'অমুক পার্টিতে একটা ঝলমলে দামী পোশাক পরে আপনি গিয়েছিলেন না?'

'আজ্ঞে না' সাফ জবাব দিলেন স্ট্রেকার-গৃহিণী। 'আপনি আর কাউকে দেখেছেন।'

কর্ণেল রস হতাশ হলেন হোমসের পাগলাটে কথাবার্তা আর কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ানো দেখে। হোমস কিন্তু গ্রাহ্য করল না। বলল—'আমি একটু বেড়িয়ে আসি। নমস্কার।'

বলে ওয়াটসনকে নিয়ে পা বাড়াল জলার ভেতর দিকে। যেতে যেতে বললে—'বেদেরা ঘোড়া লুকোয়নি। ওরা পুলিশকে এড়িয়ে চলে। ফাঁকা জায়গাতেও ঘোড়া ঘুরছে না। ঘোড়ারা দল বেঁধে থাকে। কাজেই হয় যাবে কিংস পাইল্যান্ডে নয় কেপলটনে। কিংস পাইলান্ডে ঘোড়া যখন ফেরেনি—তখন কেপেলটনেই আছে। —ঐ দ্যাখো ঘোড়ার পায়ের ছাপ।'

আসবার সময়ে সিলভার ব্লেজ-য়ের পায়ের নাল সঙ্গে এনেছিল হোমস। পায়ের ছাপের সঙ্গে তা মিলে গেল। পাশেই দেখা গেল খ্যাবড়ামুখো এক সাবি জুতোর ছাপ। ঘোড়া আর মানুষ কিংস পাইল্যান্ডের দিকে কিছুটা এসে ফের ফিরেছে কেপলটনের দিকে।

চিহ্ন অনুসরণ করে একটা আস্তাবলের সামনে পৌঁছোলো দুজনে। পাহারাদার ছোকরা তেড়ে এল ওদের দেখে। তারপরেই বেরিয়ে এল আস্তাবলের মালিক। সে আরো রুক্ষ। এই মারে কি সেই মারে।

কিন্তু শার্লক হোমস কি মন্ত্র জানে? চোয়াড়ে লোকটার কানে কানে কি মন্ত্র বলতেই সাপের ফণা নেমে এল যেন। কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করে ঘুরতে লাগল হোমসের পেছন পেছন। উল্টে ধমক দিয়ে হোমস-ই বলে গেল রেসের দিন ঘোড়া যেন হাজির থাকে।

ফেরার পথে হোমস বললে—'ওয়াটসন, লোকটার পায়ে খ্যাবড়া জুতো লক্ষ্য করেছো?' কর্ণেল রসের কাছে গিয়ে বললে—'আমরা চললাম। আপনার ঘোড়া রেসে দৌড়োবে।'

কর্ণেল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেয়ে রইলেন। বেরোনোর পথে ভেড়ার পাল দেখে থামল হোমস। ছোকরাটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—'দিন কয়েকের মধ্যে তোমার ভেড়াদের অসুখ-বিসুখ করেনি?' অবাক হয়ে ছোকরা বললে—'করেছে বইকি। তিনটে ভেড়া খুঁড়িয়ে চলছে।' শুনে ভীষণ খুশী হল হোমস। গ্রেগরিকে ডেকে বললে—'ধ্বংস ভেড়াদের অদ্ভুত অসুখটা নিয়ে তলিয়ে ভেবো।'

'আর কিছু উপদেশ দেবেন?' গ্রেগরি বুঝল হোমস রহস্যের কিনারা করে ফেলেছে।

হোমস বললে—'কুকুরটার অদ্ভুত আচরণটা নিয়েও ভেবে দেখো।'

'কুকুর! সে তো রাতে চেঁচায়নি।'

'সেইটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার।'

নির্দিষ্ট দিনে একটা অন্য ঘোড়া সিলভার ব্লেজ-য়ের জায়গায় দৌড়ে বাজী জিতল। অন্য ঘোড়া মনে হল এই কারণে যে সিলভার ব্লেজ-য়ের যেখানে যেখানে সাদা দাগ থাকা উচিত সেখানে তা নেই।

হোমস কিন্তু বললে কর্ণেল রসকে—'মদ দিয়ে ধুয়ে দিন ঐ জায়গাগুলো। সাদা দাগ বেরিয়ে পড়বে। ঘোড়া যে লুকিয়ে রেখেছিল। সে পাকা জোচ্চোর। ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে এসেও লুকিয়ে রেখেছিল ভোল পালটে মাঠে নামাবে বলে। ঐ জন্যে সব আস্তাবল সার্চ করেও সিলভার ব্লেজ-কে দেখতে পায়নি গ্রেগরি।'

'কিন্তু স্ট্রেকারকে খুন করল কে?' শুধোলেন কর্ণেল রস।

'সে তো আমাদের সঙ্গেই রয়েছে।'

ক্ষেপে গেলেন কর্ণেল। হোমস তখন সিলভার ব্লেজরের পিঠ চাপড়ে বললেন—'ভারী বুদ্ধিমান ঘোড়া। স্ট্রেকার মেয়ে-মানুষের খপ্পরে পড়েছিল। তাই বিশ গিনির পোশাক কিনে দিতে হত। দেনায় ডুবে টাকার লোভে ঠিক করেছিল সিলভার ব্লেজ-য়ের পেছনের 'টেন্ডন' একটু চিড়ে দেবে গভীর রাতে। শুধু চোখে ধরা যাবে না। কিন্তু খোঁড়া হয়ে যাবে বিখ্যাত ঘোড়া। ঐ জন্যেই ছানিকাটা ছুরি আর মোমবাতি রেখেছিল সঙ্গে। তাড়া খেয়ে ফেলে যাওয়া সিম্পসনের গলাবন্ধ তুলে নিয়েছিল ঘোড়ার পা বাঁধবে বলে। কিন্তু ঘোড়াদের অদ্ভুত অনুভূতি ওদের অনেক বিপদ থেকে বাঁচায়। মাঠের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে গেল স্ট্রেকার—দাপাদাপিতে ছোকরাদের ঘুম ভেঙে যেতে পারে—এই ভয়ে। কিন্তু দুরভিসন্ধি আঁচ করে সিলভার ব্লেজ চাট মেরে খুলি গুঁড়িয়ে দিল ট্রেনারের—পড়বার সময়ে হাতের ছুরি আপনা থেকেই চিরে দিয়ে গেল দারুণ।

হে পাঠক হে পাঠিকা! আপনিও বড় বুদ্ধিমান নন। বলুন দিকি হোমস কি করে বুঝল কুকর্মের হোতা স্ট্রেকার স্বয়ং?

(সমাধান ৫১ পৃষ্ঠায়)

অদ্রীশ বর্ধন

পটভূমি

জেপি'র পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ

কংগ্রেসের দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে জয়প্রকাশের প্রবেশ ও প্রভাব ঘটছিল না। কিন্তু কংগ্রেসের একাংশ এক অভাবনীয় অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে জয়প্রকাশকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এই রাজ্যে তাঁর অনুগামীদের প্রভাব অত্যন্ত সীমিত। রাজ্যের বড় বাম দল সি পি এম পর্যন্ত জে পি-র আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছিল না। ফলে, ডান ও বাম কোনদিক থেকেই জয়প্রকাশের আন্দোলনের প্রতি সেরকম সাড়া আসছিল না। জনসাধারণের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ব্যক্তিগত প্রভাব কিছু থাকলেও তাঁর দল সংগঠন কংগ্রেসের এই রাজ্যে বিশেষ কোন প্রভাব নেই। জনসংঘ বা অন্য দলের প্রভাব খুব সীমিত। কাজেই জে পি-র চিন্তাধারা ও আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া খুবই বিঘ্নসংকুল হচ্ছিল। কিন্তু সেই সংযোগটি কংগ্রেসের অনুগামী ছাত্র ও যুবকদের একাংশের উগ্রতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল ২ এপ্রিল ১৯৭৫।

জয়প্রকাশজী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের সভায় প্রবেশ করতে পারেননি। বিক্ষোভ পরিণত হয়েছিল হাঙ্গামায়। এই পরিস্থিতিতে জয়প্রকাশজী সভায় প্রবেশ করার জন্য সচেষ্ট হননি। কংগ্রেস ও সি পি আই-র ছোট-বড় বহু নেতা, ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের অনেকেই এই ঘটনায় মর্মাহত না হয়ে বরং পুলকিত হয়েছিলেন। কারণ প্রতিক্রিয়ার প্রতীক জয়প্রকাশকে অপমানিত ও বিতাড়িত করা গেল। বিধানসভায় জয়প্রকাশজীর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ তোলা হল এবং পশ্চিমবঙ্গে জয়প্রকাশের কোন স্থান হবে না বলে ঘোষিত হল। কেউ এই 'অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের' জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনার চাপে বা অন্য রাজ্যে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় দুর্গাপুরের এক সভায় ২ এপ্রিলের ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন। শুধু তাই নয় বিধানসভায় দীর্ঘ ভাষণের মধ্য দিয়ে সব কথা বললেন দুঃখপ্রকাশ করলেন এবং ভবিষ্যতে জয়প্রকাশ কলকাতায় সভা করতে চাইলে তা যাতে নির্বিঘ্নে ঘটে তার প্রতিশ্রুতিও মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন।

অপরদিকে কংগ্রেসের শ্রীবিজয়সিং নাহার-সহ কয়েকজন প্রবীণ এই ঘটনার নিন্দা করলেন। তাতে কংগ্রেসের ভেতরে রীতিমত উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত জে-পি 'জু জু' কংগ্রেসকে যেন পেয়ে বসেছে।

রাজ্যের সুস্থ বুদ্ধিজীবী মানুষ, গণতন্ত্রকামী মানুষ জয়প্রকাশকে বরণ করে নিতে চায় নি বা চাইছেও না; কিন্তু কোন নেতাকে লাঞ্ছিতও হতে দেখতে চায় না। নকশাল, সি পি এমের উগ্র ভূমিকায় কংগ্রেস অবতীর্ণ হোক এটা কোন মানুষই চায় না। জনগণের কথায় ও মেজাজে কংগ্রেসের একাংশের আচরণে ক্ষোভ ক্রমশ ফুটে উঠছে।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বলেছেন, জয়প্রকাশজী যেখানে, প্রতিবাদও সেখানে। লোকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চায়। কিন্তু তার রূপ অহিংস না হয়ে সংহিস হয়ে উঠলে তা কি জনগণ পছন্দ করবেন? নিশ্চয়ই নয়। পশ্চিমবঙ্গে অন্ধকার যুগের পুনরাবির্ভাব বা বিশৃঙ্খলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হোক এটা কেউ চায় না। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের উপর বলাৎকার কেউ পছন্দ করবে না। তাই কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে শালিনতা ও বুদ্ধির নতুন পরিচয় দেখা দিয়েছে যার ফলশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশ, তাতে মানুষ খুশী।

জে-পি এই রাজ্যে বিশেষ কোন আন্দোলন না করেই রাজ্যের মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু সি পি এমের সঙ্গে তার সখ্যতা রাজ্যের মানুষ ভাল চোখে দেখে নি, দেখবেও না। কিন্তু একদিকে কংগ্রেস—সি পি আই মিত্রতা, অপর দিকে সি পি এম সহ আট দলের দর কষাকষির মনোভাব জয়প্রকাশজীকে বেশ মুস্কিলে ফেলেছে। তবুও বলবো, জয়প্রকাশের আন্দোলন পঃ বঙ্গে প্রবেশ করেছে।

চাণক্য

কথাসাহিত্যিক বীরেন্দ্র দত্তের

পাহাড়ে সমুদ্রে	৮·০০
খেলার ছলে	৫·৫০

কবি মণীন্দ্র রায়ের

চতুর্দশী	৪·০০
ঘণ্টাঘড়ি	৪·৫০

কবি হরপ্রসাদ মিত্রের

হৃদয়ে চকিতে কে সে ৪·০০

আশা প্রকাশনী ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

অশ্লীলতা? প্রকাশিত হল—

আজকের পাঠকের জন্য
আজকের উপন্যাস
প্রণব মৌলিকের

উলঙ্গ আমি দাম ৮ টাকা

পরিবেশক—মোহন লাইব্রেরী ৩৫-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

দেশে বিদেশে

ইন্দোচীনে শেষ প্রহর

কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকার আশ্রিত সরকারের শেষ প্রহর যেন একই সঙ্গে ও অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।

কাম্বোডিয়ার রাজধানী নম পেনের রক্ষা-ব্যূহের শেষ ঘাঁটি নিয়াক লুং হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ঠিক প্রাককালে প্রেসিডেন্ট মার্শাল লন নল দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে তিনি নিয়ে গেছেন তাঁর প্রধান-মন্ত্রী লং বোরেৎ সহ কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে। ৬২ বৎসর বয়স্ক মার্শালের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রও গেছেন। যদিও লন নল তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশে একটি বেতার ভাষণে বলে গেছেন যে, 'আমার স্বাস্থ্য ভাল হলেই অথবা দেশে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন হলেই' তিনি ফিরে আসবেন, তাহলেও তাঁর নিজের দেশ ও সারা পৃথিবীর মানুষই বুঝতে পারছেন যে, পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত পরাজিত ও আপন দেশবাসীদের দ্বারা পরিত্যক্ত নায়কের এই দেশান্তর যাত্রাই চিরনির্বাসনের যাত্রা।

এদিকে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন অস্ত্রসম্ভার সজ্জিত সরকারি বাহিনী এক ধাক্কায় তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ায় এবং চূড়ান্ত বিশৃংখলার মধ্যে একটির পর একটি শহর মুক্তিবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে আসায় সায়গনে কোণঠাসা প্রেসিডেন্ট থিউয়ের শেষ রক্ষারও আর ভরসা দেখা যাচ্ছে না।

মাত্র এক মাসের মধ্যে ১৬টি প্রদেশ মুক্তিবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে থিউ-বাহিনী সরে এসেছে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ শহর তারা ছেড়ে দিয়ে এসেছে সেগুলির মধ্যে আছে প্রাচীন হুয়ে, আছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর দানাং যেটি এক সময়ে ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন মেরিন বাহিনীর জবরদস্ত ঘাঁটি আর আছে তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর-শহর কুই নন। এই পশ্চাদ-পসরণ শুরু হয়েছিল একটা সুপরিকল্পিত নীতি হিসাবে। প্রেসিডেন্ট থিউ তাঁর দূর-বিস্তৃত সৈন্যবাহিনীকে গুটিয়ে এনে সায়-গনের আশে পাশে এগারোটি প্রদেশে এবং আরও দক্ষিণে মেকং বদ্বীপ অঞ্চলের ১৫টি প্রদেশে তাঁর সরকারের রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ শক্ত করতে চেয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনী সরে আসার পরই দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিমানবাহিনী যেভাবে পিছনের সেতুগুলি ধ্বংস করে দিয়ে আস-ছিল তাতেও পশ্চাদপসরণের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এমনকি, প্রথম দিকে যেরকম সুশৃংখলভাবে পশ্চাদপসরণ হচ্ছিল এবং মুক্তিবাহিনী রাস্তায় আলো ফেলে পশ্চাদ-পসরণকারীদের চলে যেতে সাহায্য করছে বলে যেসব সংবাদ বেরোচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল, এ ব্যাপারে সায়গন সরকারের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর একটি গোপন বোঝা-পড়াও হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এই পশ্চাদপসরণের রণকৌশল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধভীরু, দুর্নীতিগ্রস্ত ও আতঙ্কিত থিউ বাহিনীর চূড়ান্ত বিপর্যয়ে পরিণত হল। থিউয়ের ফৌজ জায়গায় জায়গায় তাদের অধিনায়কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং সমস্ত রণসম্ভার সমেত মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করল অথবা উর্দি ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে লাগল।

পালাতে লাগল শুধু থিউয়ের ফৌজই নয়, অসামরিক অধিবাসীরাও। হাজারে হাজারে, হয়ত বা লাখে লাখে। এই উদ্বাস্তু-দের মধ্যে রয়েছে সেই সব মনুষ যাদের আতঙ্ক, থিউ সরকারের দালাল হিসাবে অথবা জনগণের শোষক হিসাবে তাদের শাস্তি পেতে হবে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের হাতে। আবার এমন বহু মানুষ আছে যারা নিছক আতঙ্কে, অন্যদের পালাতে দেখে নিজেদের যাবতীয় সম্বল নিয়ে বিমানের গায়ে বাদুড়ঝোলা হয়ে, জাহাজের মধ্যে গাদাগাদি করে, মহিষের গাড়িতে অথবা পায়ে হেঁটে দক্ষিণ অভি-মুখে পালিয়ে আসছে।

দানাং থেকে অসামরিক ও সামরিক উদ্বাস্তুদের এই মরি-বাঁচি পলায়নের একটি বীভৎস চিত্র অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা পিটার ও লাফলিনের সংবাদ থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। উদ্বাস্তুদের সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমেরিকা যে দুটি জাহাজ পাঠিয়েছিল তারই একটি থেকে ও'লাফলিন এই সংবাদ পাঠিয়েছিলেন:—

"বাচ্চারা পা রাখার জায়গা না পেয়ে অথবা অন্যের ধাক্কায় নৌকার ধার থেকে জলে পড়ে যাচ্ছিল। কোন কোন মা তাদের বাচ্চাদের পিছু পিছু জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছিল। জাহাজঘাটায় ফুলে-ওঠা লাশ ভাসছিল।

"মাবমুখী দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা 'পায়োনিয়ার কনটেন্ডার' ও তার সঙ্গী জাহাজ 'পায়োনিয়ার কম্যান্ডারের' কাছে গিয়ে পৌঁছবার জন্য অন্য উদ্বাস্তুদের সঙ্গে রীতিমত জলযুদ্ধ চালিয়ে নৌকায় উঠবার চেষ্টা করছিল। সৈন্যরা ২৫ জন লোককে গুলি করে মেরে ফেলল। ওরা বলল, এই লোকগুলি সব মুক্তিবাহিনীর সমর্থক।

কনটেন্ডার জাহাজের উপরও দুজন ভিয়েতনামী পুরুষকে গুলি করে মেরে ফেলা হল।

"কম্যুনিস্ট গোলা বর্ষণে উদ্বাস্তু অপসারণের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে 'কনটেন্ডার' জাহাজই এই শেষবারের মত উদ্বাস্তুদের নিয়ে যেতে এসেছে।

"একটা নৌকা এসে জাহাজের গায়ে লাগল। জাহাজের খালাসীরা নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিল। প্রস্রাব, ঘাম ও পচা ঘায়ের গন্ধে জাহাজ ভরে গেল।

"৬০ মিটার লম্বা ও ২৫ মিটার চওড়া নৌকায় ঠাসাঠাসি করে জায়গা নিয়েছে সম্ভবত হাজার চারেক মানুষ। চারদিন ধরে তারা রোদে পুড়েছে, বৃষ্টিতে ভিজেছে, খেতে পায়নি, পায়খানা-প্রস্রাব করারও সুযোগ পায়নি।

"এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিল নারী ও শিশু। এই শিশুদের মধ্যে কয়েকটি ঐ নৌকাতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

"আর নৌকায় ছিল কয়েক শ' সশস্ত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য।

"খালাসীরা নৌকায় একটি মাল তোলার জাল নামিয়ে দিল। তারপর একপাল গরুর মত জালশুদ্ধ টেনে তুলল একপাল নারী ও শিশু।

"জাহাজের খোলে নেমে ওদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক তার মৃত সন্তানটিকে তুলে ধরল।"

অতঃপর

কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক পরিস্থিতি অতি দ্রুত ঐ দুই দেশের মার্কিন-আশ্রিত সরকারের প্রতিকূলে চলে যাওয়ায় ইন্দোচীনের এই দুটি রণ-ক্লান্ত দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে।

মার্কিন সরকার অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিজের দেশের মানুষদের ও সেখানকার কংগ্রেসকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ও করছেন যে আরও কয়েক কোটি ডলার ঢাললে ও যুদ্ধের রসদ পৌঁছে দিলে আমেরিকার বন্ধুদের রক্ষা করা যায়। কিন্তু আমেরিকার জনমত ও সেখানকার কংগ্রেস আর নতুন করে ইন্দোচীনের যুদ্ধের সঙ্গে কিছুতেই জড়িয়ে পড়তে চায় না: এত কোটি কোটি ডলার খরচ করে এতদিন ধরে চেষ্টা করেও যে পরিণাম ঠেকিয়ে রাখা যায়নি, আর কিছু ডলার ঢাললে তাতে শুধু রক্ত-পাত বাড়বে মাত্র, অনিবার্য পরিণাম ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, মার্কিন জনমত এখন এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

প্রিন্স নরোদম সিহানুকের নেতৃত্বে কাম্বোডিয়ার যে নির্বাসিত সরকার গত প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ পিকিং-এ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই সরকারের পতাকা এখন যে কোন দিনই কাম্বোডিয়ার রাজধানী নম পেনে উড়তে পারে। ভারত সরকার ইতিমধ্যে সিহানুকের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

অবশ্য কাম্বোডিয়ায় প্রিন্স সিহানুকের সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে পর সিহানুকের নিজের হাতে কতখানি ক্ষমতা থাকবে বলা কঠিন। কারণ, যতদূরে খবর পাওয়া গেছে, সিহানুক নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর দেশের মানুষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা আছে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাম্বোডিয়ার জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। কিন্তু লাল খেমার সরকারের প্রধান দুই শরিক হল একদিকে

৪৩ বৎসর বয়স্ক খিউ সাম্ফান, সিহানুক সরকারের তথ্য মন্ত্রী হু নিম ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী হু ইউম-এর মতো কাম্বোডিয়ান জাতীয়তাবাদী নেতা এবং অন্যদিকে ইয়েং সারি, সালোথ সার, সোন সেন ইত্যাদির মতো কম্যুনিষ্ট নেতা। বাইরের বিপদ কেটে গেলে এই দুই শক্তি আর কতদিন নিজেদের ঐক্য রক্ষা করে চলতে পারবে অথবা প্রিন্স সিহানুককে মাথার উপর বসিয়ে রাখবে সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

এদিকে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রেসিডেন্ট নুয়েন ভ্যান থিউয়ের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে বাইরের ও ভিতরের চাপ পড়ছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী আগে সায়গনে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে পৌঁছবে, না অন্তর্বিদ্রোহীরা, সেটাই এখন শুধু দেখা বাকি।

সামরিক বিপর্যয়ের জন্য প্রেসিডেন্ট থিউকে দায়ী করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ একটি নতুন জাতীয় ঐক্যের সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। এদিকে খবরে প্রকাশ যে, জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্ট দক্ষিণ থেকে সায়গন আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে। খাস সায়গন শহরেও নাকি ফ্রন্টের কিছু গেরিলা সৈন্য ঢুকে পড়েছে। প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের সামনে রক্ষী সৈন্য-বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।
৩-৪-৭৫

পুণ্ডরীক

ফাদার দ্যতিয়েন রোজা নামচা

'ছাত্ররা মন দিতে জানে না...' মন্তব্য করে রাষ্ট্রবিদ্যার অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ে ইস্তফা দিয়ে ঢাকার শিক্ষা-সমাজের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে চট্টগ্রামের এক কলেজে চাকরি নিয়েছেন। প্রতি সোমবার ফোন করেন শাকিলাদের বাড়িতে। শাকিলারা সিরাজুলের আত্মীয় নয়. সিরাজুলের অসুস্থা খালা আম্মার প্রতিবেশী : সিরাজুলের খালা আম্মার বাড়িতে ফোন নেই...। প্রতি সোমবারে ফিরোজা শাকিলাকে জিগ্যেস করে সিরাজুল স্যার তার খোঁজ নিয়েছেন কিনা। শাকিলা বলে নিয়েছেন। সিরাজুল আসলে নেন নি, কোনো দিনই নেন না। প্রথম থেকে বলি শুনুন।

ফিরোজার, আব্বা সৈয়দ বংশের, ফিরোজার আম্মা সিলেটের মেয়ে আর ফিরোজা নিজেও বারান্দায় শোভমান ভেনাসের শ্বেতপ্রস্তরের মূর্তির মতোই শুভ্রবদনা। ফিরোজার আব্বা লক্ষপতি ব্যবসায়ী, ফিরোজার আম্মা উচ্চশিক্ষিতা, ফিরোজা কিন্তু বড় অসুখী : তার একটিও বন্ধু নেই। রিজিয়া বেগম তাঁর আত্মজাকে কারুর সঙ্গে মিশতে দেন না। নিজের ঘরে বসে সে গান করে, কেউ-ই আসে না শুনতে।

ফিরোজা আজ ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রী, রাষ্ট্রবিদ্যার অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের ক্লাস করে। বাড়ির পরিচারক শামসুর রহমান তাকে সকালে দিতে আসে বিকেলে নিয়ে যায়। সহপাঠিনী শাকিলা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চায়, জন্মদিনের নিমন্ত্রণও করে: মেয়েটি যায় না, শাকিলাকেও বাড়িতে আসতে দেয় না, ফোনও করতে দেয় না। বলে 'মা বকবে।'

রাষ্ট্রবিদ্যার ক্লাস গ্যালারিতে হয়; মেয়েরা প্রথম তিনটে সারিতে বসে। ক্লাসের আরম্ভে সিরাজুল স্যার কলম চেয়ে নেন, ফিরোজার জাপানী ডট-পেনে রোল-কল সেরে মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই থ্যাঙ্ক ইউ বলে কলমটা ফেরত দেন।

সেদিনই আগস্টের বিচিত্রানুষ্ঠানে ফিরোজা গান করে রবীন্দ্রসঙ্গীত; অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই রিজিয়া বেগম মের্সেডেস গাড়িতে করে আত্মজাকে নিয়ে বেরিয়ে যান।

সেদিন রাত্রে সিরাজুল স্যারের দাওয়াত ছিল তাঁর খালা আম্মার গরীবখানায়। শাকিলারাও নিমন্ত্রিত। খেতে বসে স্যার বলেন : ' ফিরোজার গলাটা ভালো, কিন্তু আনন্দের দিনে দুঃখের গান কেন?... ফিরোজা গেয়িছিল 'দুঃখের তিমিরে'।

পরের দিন ফিরোজাকে এক কোণে ডেকে ষড়যন্ত্রের সুরে শাকিলা বোঝায় : 'এত ছাত্রী এত গান করেছে ... একমাত্র তোমার গানটাই স্যারের মনে দাগ কেটেছে!' ফিরোজা অনেকক্ষণ নীরব থেকে বলে, 'স্যারের কি খেতে ভালো লাগে?' সঙ্গে সঙ্গে শাকিলা বোঝে তার শিশুসুলভ রসিকতার মর্মান্তিকতা।

...ফিরোজা আজকাল প্রায়ই জিগ্যেস করে, স্যার কিছু বলেছেন কি না। শাকিলা বানিয়ে বলে : বলেছেন, তোমার ডট-পেনে খুব সুখ লেখা হয়'। ফিরোজা ভাবে, স্যারকে কেমন করে কলমটা সে উপহার দেয়। শাকিলা বানিয়ে বলে, 'বলেছেন, তোমার সোয়েটারটার রং ভারি সুন্দর...' ফিরোজা ভাবে, স্যারের জন্য একটা বুনলে কেমন হয়।

শাকিলা আর কত বানাবে, বলুন! একদিন সে বলে, 'স্যার এবারে কিছু বলেন নি'। আর সেই দিন রাত্রেই 'ছাত্রেরা মন দিতে জানে না' বলে বগলে বইকাপড়ের পুঁটলি আর মাথায় খালার আশীর্বাদ নিয়ে, সবাইকে চমকিত করে, সিরাজুল স্যার ঢাকা ছেড়ে বিদায় নেন।

নতুন স্যার বয়স্ক, বিরলকেশ ও বিবাহিত; নিজের কলম নিয়ে পড়াতে আসেন। ফিরোজাও জাপানী পেনটা বাড়িতে রেখেই ক্লাস করতে আসে। রাতে সে স্বপ্ন দেখে, সিরাজুল স্যার তারই হাতে বোনা সোয়েটার পরিহিত হয়ে চাটগাঁয়ের রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, তারই দেওয়া পেন নিয়ে ছাত্রদের নাম লেখেন। দিনের বেলায় সে ভাবে, 'ছাত্রেরা মন দিতে জানে না' কথাটার অর্থ কি।' শাকিলাকে জিগ্যেস করে : 'ঠিক শুনেছ তো? 'ছাত্রীরা' বলেন নি তো?'

প্রতিটি সোমবার সিরাজুল স্যার শাকিলাদের বাড়িতে ফোন করেন, রুগ্না খালার খোঁজ নেন, ফিরোজার খবর নেন না। একদিন কল বিগড়ে যাওয়াতে দু সপ্তাহ ভাগ্নার সংবাদ না পেয়ে খালা বলেন, 'সিরাজকে চিঠি দিলে কেমন হয়?' নিরক্ষরা বৃদ্ধার সেক্রেটারি হয়ে শাকিলা লেখে : স্নেহের সিরাজ আল্লাতালার মেহেরবানিতে আমি ভালো আছি; আমার জন্য ভেবো না। বাগানে এবার খুব ঢেঁড়স হয়েছে; তোমার পোঁতা গাঁদাগাছে ফুল ধরেছে। আল্লাতালা তোমার উপর রহম করুন। খুদা হাফিজ। ইতি তোমার খালা আম্মা।' চিঠির পুনশ্চে শাকিলা নিজের কথা লেখে : 'আমাদের পরীক্ষা এসে গেছে; আল্লার কাছে দুয়া করুন, আমি যেন ভালো পাশ করি..' তারপর অনেক ভেবে ইতস্তত করে জুড়ে দেয় : 'ফিরোজা আপনার খুব কথা জিগ্যেস করে।' পোস্টকার্ডটা বাক্সে ফেলতে গিয়ে আরেকবার পড়ে সে সংশোধন করে : 'ফিরোজাবা'।

ফেরত ডাকে সিরাজুল ইসলাম জানান : চট্টগ্রামের খবর সব ভালো; বাগানে ঝিঙে হয়েছে, গোলাপ গাছ কুঁড়ি ধরেছে। শাকিলার প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রবিদ্যার পরীক্ষার জন্য তিনি 'সাজেশন' পাঠাবেন। তারপর কলমের টুপিটা কামড়িয়ে একটু চিন্তা করে লেখেন : 'ফিরোজারও যদি দরকার হয়, বলো আমাকে লিখতে।' চিঠিটা খামে ভরার আগে সংশোধন করে তিনি লেখেন : 'ফিরোজাদের'।

শাকিলা ফিরোজাকে পত্রটা দেখায়, সিরাজুল ইসলামের ঠিকানা দেয়। মেয়েটি চার পাতার এক চিঠিতে স্যারকে জানায় তার পড়াশোনার অসুবিধার কথা; তারপর পারিবারিক সমস্যার উল্লেখ করে লেখে : 'আপনার উত্তর শাকিলাদের ঠিকানায় পাঠালে ভালো হয়, আমারই নামে পাঠাবেন, আলাদা খামে, তাড়াতাড়ি।

ফিরোজার সুদীর্ঘ পত্রের জবাবে আসে স্যারের সুদীর্ঘ উত্তর। চিঠিটা পড়ে মুখস্থ করে মেয়েটি শাকিলার হাতে ফেরত দেয়—রিজিয়া বেগমের চোখে যাতে না পড়ে।

পত্রবিনিময় সেদিন থেকেই। ফিরোজার প্রশ্নগুলির উত্তরে সিরাজুল স্যার প্রত্যক্ষভাবে-বোঝান রাজনীতি, গণতন্ত্র, সংবিধান... পরোক্ষভাবে শেখান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে পিতামাতার অধিকারের সীমাবদ্ধতা। ফিরোজা একদিন জাপানী কলমটা পাঠায় ঈদের উপহার; ফেরত ডাকে সিরাজুল স্যার স্বহস্তে রোপিত গোলাপ-গাছের পাপড়িতে সুরভিত এক পত্রে ফিরোজাকে জিগ্যেস করেন তাঁর জন্মদিনের তারিখ।

স্যারের উৎসাহদানে ভীরু মেয়েটি আজ সাহসী থেকে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। ফিরোজার এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন লক্ষ্য করে রিজিয়া বেগম দুঃখ পান, তার একগুঁয়েমির জন্য আত্মজাকে ভর্ৎসনা করেন; মেয়ে চুপটি করে শোনে সব, কেয়ার করে না কিছু।

ফিরোজার আছেন দিলরুবা খাতুন নামে এক বিধবা চাচী—রিজিয়া বেগমের চক্ষুশূল। মহিলার দোষ? দিলরুবারা কুষ্ঠিয়া-নিবাসী, আর রিজিয়া বেগমের মতে কুষ্ঠিয়া-নিবাসীদের চালচলন কলকাতা-বাসিন্দা মুমিনদেরও হার মানায়। জায়ের প্রতি অবশ্য রিজিয়া বেগমের বিতৃষ্ণার আরেকটা মূল কারণ এই যে ফিরোজার আব্বা ফিরোজার ঐ চাচী ছুঁড়ীকে নাম ধরেই ডাকেন।

ফিরোজা মেয়েটি দিলরুবা খাতুনের কোলে তার বাণবিদ্ধ হৃদয় উজাড় করে তাঁকে বলে আমার কাছে ওকালতি করতে। বিধবা চাচী বলেন, 'যার দুটি গাড়ি আর চারটি বাড়ি আছে, সে কি সহজে তিনশো টাকার মাইনের এক মাস্টারের সঙ্গে তার মেয়ের সাদি দেবে?' ফিরোজা শুধরিয়ে বলে, 'মাস্টার নয়, অধ্যাপক... রাষ্ট্রবিদ্যার অধ্যাপক।'

দিলরুবার ওকালতি সফল হয়নি বললে কম বলা হয়। উচ্চশিক্ষিতা হলে কি হবে, রিজিয়া বেগম বুঝে উঠতে পারেন না যে, কিভাবে তাঁর একমাত্র মেয়ের পক্ষে তাঁর একটিমাত্র সন্তানের পক্ষে—ওয়ালিউল মাস্টারের পৌত্র, রফিকুল মাস্টারের পুত্র সিরাজ নামক এক মাস্টারের প্রতি চিত্তাকর্ষণ বোধ করা সম্ভব। ফিরোজার আম্মা সুনিশ্চিত : মাস্টারটা যাদু জানে, চক্রান্ত করেই এই কমাস ঢাকায় কাটিয়েছিল শুধু এই কারণে যে ধনী পরিবারের সর্বেশ্বর উত্তরাধিকারিণীটিকে কেড়ে নিয়ে কেলেঙ্কারি ঘটাবে।

ক্রন্দনরত গিন্নীর কাছে সংবাদ পেয়ে মেয়েটির লক্ষপতি আব্বা অবাক হন, ঘাবড়ে যান না; ভাবেন, ছোকরাটিকে ঘরজামাই বানিয়ে ব্যবসার পার্টনার করলে মন্দ কি?

ভাসুরের গুপ্ত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হয়ে চট্টগ্রামে গিয়ে দিলরুবা দেখেন, ছেলেটির মুখশ্রী ও দেহাবয়ব, স্বভাব ও চালচলন—আর চৌদ্দপুরুষের ঠিকুজিও—সর্বতোভাবে গ্রহণীয়। অসুবিধা শুধু এই : তিনশো টাকার ঐ মাস্টারিটাকে শ্রীমানটি ছাড়তে চান না, লক্ষপতির ঘরজামাই-কাম-অংশীদার হওয়ার অণুতম আগ্রহও তাঁর নেই। শ্রীমানের পিতৃদেবও পয়সাওয়ালা পণ্যজীবী বেয়াই লাভের অপ্রতিরোধ্য লোভে রোমাঞ্চিত হতে নারাজ।

ফিরোজা আজ সিরাজদের একান্নবর্তী পরিবারে একমাত্র কর্মঠ বৌমা। রিজিয়া বেগম বক্র হাসি হেসে বলেন : 'ওদের একটিও চাকর নেই। মেয়েটি সবাইকে খাইয়ে তবে খেতে বসে!' আর ফিরোজা? সে তো শাশুড়ীর দিকে মমতাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে : 'আমি ছিলাম মাতৃহীন; এবার একজন আম্মাকে পেয়েছি।'

গল্পটা শুনছিলাম শাকিলাদের বৈঠকখানায়, সুকথিকা শাকিলার মুখে। হঠাৎ ফোন বাজল। চট্টগ্রামের ফোন। আজকে তো সোমবার নয়, রুগনা খালার খবর নেওয়ার দিন নয়। ফোন-কারিণীর গলা পরিষ্কারভাবে শোনা যায় : 'ঐ বোনার পদ্ধতির বইটা পাঠাতে পারিস?... না, ওনার জন্য নয়.. না, না সোয়েটারও নয়, এক জোড়া মোজা, খুব ছোট্ট মোজা, ডাক্তার বলছে শিগগিরি কাজে লাগবে খালাকে খবর দে...

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

প্রথম পুরস্কার ১,৫০,০০০ টাকা।

অন্তর্বর্তী খেলা দ্বিতীয় শনিবার/চূড়ান্ত খেলা চতুর্থ শনিবার

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

ক্ষেতে ধান পাকতে লেগেছে। কাটাও শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্মীঠাকরুণ বিল ছেড়ে গৃহস্থের উঠানে গুটি গুটি আসন নিচ্ছেন। আঁটির গায়ে সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ। দেখতে দেখতে সব ধান পেকে গেল। তেপান্তরের বিলে সবুজের একটা গোছাও নেই কোন দিকে। চতুর্দিকে সোনা। যতদূর নজর চলে, দেখা যায় পাকা ধানের সোনা ঢেলে দিয়েছে যেন প্রকৃতি। সেই সঙ্গে হিমের আমেজ।

ভবনাথের উঠোনে ধান উঠে গেছে। তাই ছেলেদের বায়না নতুন চালের ফ্যানসা ভাত খাবে। কিন্তু পুজো না দিয়ে নবান্ন না করে খাবার নিয়ম নেই। একদিন তাই পুরুত ডেকে পুজো আচ্চাও হয়ে গেল। ভাটিয়াল চালের মিষ্টি ফ্যানসা ভাত গরম গরম পাতে পড়তেই বাচ্চাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দেবুবুড়িও তাদের মাঝখানে বসেছেন। একবার এর গালে একবার ওর গালে ভাত তুলে দিচ্ছেন। যেন উৎসব লেগে গেছে। এদিকে ভবনাথের বিলে যাবার তাড়া। ছেলেরা সব লায়েক হয়েছে। জলকাদা ভাঙ্গতে তাদের বয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই তিনি কাঁধে চাদর ফেলে ছাতা ও লাঠি হাতে হন হন করে বিলমুখো চললেন। উঠোনে তখন বাড়ির মেয়েদের বড়ি দেবার ধুম লেগেছে। এই সময় মাঠের আর এক চেহারা মাঠে মটর গাছ লতিয়ে উঠেছে। লকলকে সবুজ লতা—শুঁটি সামান্যই ধরেছে—অফুরন্ত বেগুনি ফুল। তার ওপরেই দামাল ছেলেদের হামলা চলে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুজো তারপরে আরও দু-বছর হয়েছে। নামেই দুর্গোৎসব—উৎসব কিছু নেই। ভবনাথ বলেছিলেন ধর্মকর্ম আমাদের বংশে সয় না। দুর্গোৎসব একবার ঠাকুর-দাদার আমলেও হয়েছিল পুণ্যশীলা ঠাকুরমার ইচ্ছায়। বোধনের বেলগাছটা সেই সময়ের পোঁতা। দেল-দোল দুর্গোৎসব তিন পার্বনই বরাবর করে যাবেন ঠাকুরমার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বছরের মধ্যেই সাপে কাটল তাঁকে। ঠাকুরদাদা বললেন যার জন্যে পুজো দুর্গাঠাকুরুণ তাকেই নিয়ে নিলেন। ও ঠাকরুণের মুখ দর্শন করব না আর আমি। সে তো হয় না—নিয়ম আছে দুর্গোৎসব একবার করলে নিদেন পক্ষে তিনটে বছর পর পর চালিয়ে যেতে হবে। তা ঠাকুরদাদারও তেমনি জেদ—বাড়িতে প্রতিমা কিছুতে তোলা হবে না। পুরুত ঠাকুরকে টাকা দিয়ে দিতেন। যজমানের হয়ে তিনি নিজের বাড়িতে পুজো সারতেন। দুটো বছর এইভাবে পুজো চালিয়ে দায়মুক্ত হয়েছিলেন ঠাকুরদাদা। এতকাল বাদে প্রতিমা ফেলে রাতবিরেতে কাবা পুজো চর্মপরে দিল—পুজোর ফলও মা হাতে হাতে দিয়েছেন—

ভবনাথ রায় দেবার আগেই উমাসুন্দরী দৃঢ় কণ্ঠে বললেন প্রতিমা-বরণের সময় মণ্ডপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বলে দিয়েছি, আবার এসো মা। আনতে হবে পুরুত বাড়ি-টাড়ি নয়, আমাদেরই মণ্ডপে। মায়ের যে ইচ্ছে তাই হবে, আমাদের কাজ আমরা করে যাবো।

পুজো হয়ে গেছে আরও দু-বছর। দেবনাথ আসেন নি, টাকা সহ কৃষ্ণময়কে পাঠাতেন। নিতান্ত রীতরক্ষের মতন নমো-নমো করে পুজো।

ভিতর-উঠানে এসে পিওনঠাকুর বললেন, নেই বুঝি ঘোষ মশায়—সদরে গেছেন? উঃ, পাবেনও বটে। আমার তো এই দেড় ক্রোশ পথ হাঁটতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। আর উনি সদরের দশ ক্রোশ পথ হরবখত যাচ্ছেন আর আসছেন। অথচ বয়সে আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড় তো হবেনই। দেবনাথ-বাবু আর আমি প্রায় এক বয়সী।

রান্নাঘরের কাছে কটা উদ্দো ঝালের গাছ। উমাসুন্দরী লঙ্কা তুলছিলেন সেখানে গিয়ে, লাল লাল পাকা লঙ্কায় আঁচল ভর্তি করে এই সময় এসে দাঁড়ালেন। যাদব চাটু-য্যের কথার সায় দিয়ে বললেন, যা বলেছেন ঠাকুরপো। কি নেশায় ওঁকে পেয়ে বসেছে—পনেরটা দিন যদি মালি-মোকদ্দমা না থাকে, হাঁসফাঁস করতে থাকেন। গায়ে যেন জল-বিছুটি মারে।

হাসিমুখে পিওনঠাকুরকে আহ্বান করলেন : বসুন আপনি, হাত-পা ধোন। আছেন উনি। ধান-কাটা লেগেছে, কালীকে নিয়ে বিলে গেলেন। আজকের সেবা এই-খানে কিন্তু। খাল-সেঁচা বড় বড় কই মাছ দিয়ে গেছে, জিয়ানো আছে। পায়ের ধুলো যখন পড়ল পাক-শাক আপনার হাতেই হবে।

রন্ধনকর্মে যাদব বাঁড়ুয্যে এক-পায়ে খাড়া। ব্রাহ্মণ কিন্তু ইতস্তত করে বলেন, দীনু চকোত্তি মশায় আগাম নেমন্তন্ন দিয়ে রেখেছেন যে—

বিনো বলে উঠল, চকোত্তি বাড়ীর তো বাঁধা নেমন্তন্ন। হবে খাওয়া-দাওয়া সেরে একপিঠে হয়ে বসে যাবেন।

না হে, খেলা নয়—খাবার নেমন্তন্ন আজ। চকোত্তি মশায় সেদিন বলে দিলেন, অথর্ব হয়ে পড়েছি কদ্দিন আর বাঁচব। সকাল সকাল চলে এসো, দুপুরবেলা একত্তর দুটো শাক-ভাত খাওয়া যাবে।

বিনো হেসে বলল, তার মনে রাঁধবাড়ার সময়টুকুও মিছে নষ্ট হতে দেবেন না। গেলেই অমনি হাত ধরে দাবায় নিয়ে বসাবেন।

পিওনঠাকুর ভ্রূভঙ্গী করলেন : চকোত্তি মশায়ের সঙ্গে দাবা খেলা—খেলা না ঘোড়ার ডিম। আগে যা-ও বা খেলতেন বিছানায় পড়ে থেকে থেকে মাথা ফোঁপরা হয়ে গেছে। ভুল চাল দেবেন আর চালফেরত নেবেন। তবু বসতে হয়, আতুর মানুষের কথা ঠেলতে পারিনে, কি করব?

দুহাতে এক জলচৌকি তুলে নিমি খোয়াকে এনে রাখল। বলে বসুন কাকা—

উমাসুন্দরীর দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে যাদব বলছেন, দাবাড়ে বটে একজন আপনাদের দেবনাথবাবু। কত খেলেছি—সে এক দিন গিয়েছে। বলতেন, বাইশ চালে মাত করব। বলতেন অশ্বচক্র করব গজঘুর করব। মুখে যা বললেন, কাজেও ঠিক তাই করে ছাড়তেন। পাশাতেও তেমনি, হাড়ের পাশা যেন ডাক শুনতে পেত। কচে-বারো, ছ-তিন নয়, পঞ্জ-জুড়ি—চোখ তাকিয়ে দেখ, দানেও ঠিক তাই পড়েছে। অনভ্যাসে এখন নাকি সব ধ্বংস হয়ে গেছে বললেন তো তাই সে-বারে।

ছুটোছুটি করে নিমি গাড়ু-গামছা এনে জলচৌকির পাশে রাখল। বলে, বসুন কাকা, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন।

হাত-পা ধুয়ে কি হবে মা, চকোত্তিবাড়ী যাব এক্ষুনি।

বিনো বলল, চকোত্তি-খুড়িমা রেঁধে-বেড়ে পাতের কোলে বাটি সাজিয়ে দেবেন, আর এখানে হলে নিজে রান্না করবেন। কোনটা ভাল বিচার করে দেখুন পিওন-কাকা।

প্রলোভন বিষম বটে। যাদব জলচৌকিতে বসলেন, গলার ঝুলন্ত ব্যাগ নামিয়ে পাশে রেখে দিলেন।

মিথ্যা করে উমাসুন্দরী আরও জুড়ে দিলেন : বেগুন দিয়ে কই-তেল রান্না হবে—বউমা ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। আপনার গলা শুনে বলল ঠাকুর মশায় এসে গেছেন—আর ভাবনা কি। ছাড়বে না ওরা, আপনার কাছে প্রসাদ পাবে বলে নাচানাচি করছে।

যাদব বাঁড়ুয্যে জল হয়ে গেলেন। বললেন, চিঠি কখানা বিলি করে আমি তবে। কল্লাট সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসব।

কিন্তু বাড়ীর মধ্যে পেয়ে ছাড়তে এরা রাজি নয়। ভাল মাছ অন্য বাড়ীতেও থাকতে পারে। পারে কেন, আছেই। আঁস্তাকুড়ে বিলের জলে টান ধরেছে কুয়ো সেঁচা হচ্ছে—সোল কই মাগুর সিঙ্গি সব বাড়ীতে। যাদবকে পেলে হাতের রান্না না খেয়ে কেউ ছাড়তে চাইবে না—নানান অজুহাত করে আটকাবে।

নিমি আব্দারের সুরে বলল, এখন যাওয়া হবে না পিওন-কাকা। ছাড়ছে কে যে যাবেন? চিঠি বিলি বিকেলের দিকে হবে। না হয়, হাটে গিয়ে করবেন। যদি কেউ এখন এসে পড়ে হাতে হাতে নিয়ে যাবে।

উমাসুন্দরী বিনোকে বললেন দাঁড়িয়ে থাকিসনে মা, বেলা কম হয় নি—সিধেপত্তর গোছা গিয়ে এবার।

যাদবকে বললেন, যান একটা ডুব দিয়ে আসুন। আমরা উনুন ধরাতে লাগি।

বড়গিন্নি উনুন ধরানোর ব্যবস্থায় গেলেন। পুঁটি এসে বলে চিঠিপত্তোর আছে পিওন-কাকা?

রাধাবাড়ার প্রসঙ্গে মত্ত হয়ে পিওন-ঠাকুর আসল কথাই ভুলে ছিলেন। এইবারে যেন মনে পড়ল। বললেন, থাকবে না মানে? তবে আর এসেছি কেন?

দেমাকের সুরে আবার বলেন, শুধু চিঠি কেন, চিঠি মনিঅর্ডার দুই রকম—

হাসিমুখে নিমি পুঁটিকে ধমক দিয়ে উঠল : চিঠিতে তোর কি দরকার রে? কে পাঠিয়েছে?

রান্নাঘরের অলকা-বউয়ের উদ্দেশে আড়চোখে তাকিয়ে নিমি নিম্নকণ্ঠে বলল, বড়দার চিঠি অনেক দিন আসে নি, বউদি তাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বিষম চাপা, মুখে কিছু বলে না। বেড়ার ফাঁকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল, আপনার গলা পেয়ে।

ব্যাগ হাতড়ে যাদব খামের চিঠি ও মনি-অর্ডার বের করলেন। নজর বুলিয়ে বললেন, ঘোষ মশায়ের নামে দুটোই। মামলায় জরুরী কথাবার্তা থাকে বলে ওঁর চিঠি-পত্তের অন্যের হাতে দেওয়া মানা। মনি-অর্ডার কলকাতার—জ্যেষ্ঠকে দেবনাথবাবু তিরিশ টাকা পাঠিয়েছেন। কুপনে খবরা-খবর আছে, কুপন পড়তে বাধা নেই—

একটুকু পড়ে উল্লাসে বললেন এই তো কুশলে আছেন ওঁরা সকলে। তবে আর ব্যস্ত হবার কি?

বুড়ো মানুষের কত আর বুদ্ধি হবে। কুশল-খবর জানলেই হয়ে গেল যেন সব। এর জাত্তরে মানুষের আর যেন উদ্বেগ থাকতে নেই। গোঁসাইগঞ্জের কুশল-খবর তো হামেশাই কানে আসে। রীতিমত কুশলে আছে দুলাল। ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে নির্মলা বলল, খামের চিঠি কোথা থেকে আসছে, দেখুন তো পিওন-কাকা।

ঠাহর করে দেখে বললেন, জ্যাবড়া শীলমোহর দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। আঁটা চিঠি ভবনাথ ঘোষের নামে—তাঁর হাতে দেবো, তিনি খুলবেন। মনি-অর্ডারের কুপনে লুকোছাপা নেই, তাই বরঞ্চ পড়ে দেখ—

গোটা গোটা সুস্পষ্ট হস্তাক্ষর দেবনাথের। শুধুমাত্র অক্ষর-পরিচয় থাকলেই আট-কানোর কথা নয়। বিড়বিড় করে নির্মলা খানিক খানিক বানান করে নেয় তারপর শব্দ সাড়া করে পড়ে ওঠে রান্নাঘরে অলকা-বউয়ের কান অবধি যাতে গিয়ে পৌঁছয়।

সর্দিকাশি ও জ্বর হইয়া আমায় একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীমান কৃষ্ণময়ও কুশলে আছে। আমাদের জন্য চিন্তা করিবেন না। অত্র তিরিশ টাকা পাঠাইলাম, ইহার অধিক সম্প্রতি সম্ভব হইল না। সংসার-খরচ দশ টাকার মধ্যে কুলাইয়া গেলে মামলা-খরচ বিশ টাকা হইতে পারিবে। আপাতত এইভাবে চালাইয়া লউন, মাসখানেক পরে আবার পাঠাইতে পারিব বলিয়া মনে করি।...

যাদব হো-হো করে উচ্চহাসি হেসে উঠলেন: পেটে খাওয়ার যা খরচ, তার ডবল হল মামলার খরচ। দুই ভাই ওঁরা এক ছাঁচের। বিষয় না বিষ—বিষয়-সম্পত্তি থাকলেই এই রকম হবে। নেই বিষয়, কসবার পথঘাটও তাই চিনি নে। মাইনে যে কটা টাকা পাই, পেটে খেয়ে শেষ করি। দিব্যি আছে, নির্ঝাটে আছি।

আচমকা রাজির প্রবেশ। দত্তবাড়ীর রাজবালা (বিয়ের আগের নাম রাজলক্ষ্মী), শশধর দত্তের নাতনী। শশধরের বড় ছেলে হরিদাস বহুদিন মারা গেছে, তাঁর মেয়ে। এ-বাড়ীর নিমির সঙ্গে বড্ড ভাব-ডাকাডাকি কিন্তু চক্ষুশূল বলে। বলে, সই পাতাই নি আমরা—সইয়ের বদলে চক্ষুশূল পাতিয়েছি।

রাজিকে দেখে নিমি কলরব করে উঠল : পিওন-কাকা আসতে না আসতেই টনক নড়েছে। চিঠি নেই—কাকা আসতেই আমি জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি।

রাজি লজ্জা পেয়ে বলে, সেই জন্যে বুঝি। জলপাই পাড়তে যাবার কথা না এখন? পিওনঠাকুর এদিকে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন : আছে মা তোমার চিঠি। আছে—

ব্যাগের মধ্যে হাতড়াচ্ছেন তিনি। নিমি বলে নাঃ, পিওন-কাকা একটু চেপে থাকতে পারেন না। মুখের চেহারা কি হত, দেখতেন।

হাসতে হাসতে তার মধ্যে নিমি নিজেও একটা নিশ্বাস চেপে নিল।

বয়স হলেও বিনো চুপ থাকতে পারে না, এদের মধ্যে ফোড়ন কেটে ওঠে : বিশ্বাসই করত না রাজি। জামাই লিখিয়ে-পড়িয়ে ধুর—পিওন-কাকার একটা ক্ষেপও বাদ যায় না।

এই যে—। ব্যাগের ভিতর থেকে চিঠি বের করে চশমাটা নাকের উপর তুলে যাদব বাঁড়ুয্যে ঠিকানা পড়ে যাচ্ছেন : শ্রীমতী রাজবালা বসু শ্রীযুত বাবু শশধর দত্ত মহাশয়ের বাটি পৌঁছে। নাও তোমার চিঠি।

সবুজ রংয়ের আঁটো-খাম, ফুল-লতা-পাতার উপর দিয়ে চিঠি মুখে একটা পাখি উড়ছে তার ছবি খামের উপরে, এবং পাখির পাশে ছাপার অক্ষরে লেখা 'যাও পাখি বলো তারে—'। দিব্যিদিশেলায় আছে খামের আঁটা মুখের উপর : মালেক ভিন্ন খুলিবেন না—সাড়ে-চুয়াত্তর। এত ব্যাপারের পরেও সশরীরে ঠিকানা পড়ার কি আছে সোনাখড়ি গ্রামের মধ্যে এমনি চিঠি রাজি ছাড়া কার নামে আর আসতে পারে?

চিঠি এগিয়ে ধরলেন পিওনঠাকুর। রাজির লজ্জা—বরের চিঠি হাত পেতে নেয় কি করে? মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিরক্ত হয়ে পিওনঠাকুর বললেন, সেদিনও এমনি করেছিলে। চিঠি আমি ছুঁড়ে দিলাম, চিলের মতন ছোঁ মেরে নিয়ে ছুঁড়িগুলো পালাল। নিত্যি নিত্যি ওরকম তো ভাল নয়। আজও ঐ দেখ কতগুলো এসে পড়ল।

খবর হয়ে গেছে—চারি সুরি ফেকসি বউলো সমবয়সীরা সব আসছে। চোখ তুলে রাজি দেখল একবার—পিওনঠাকুরের দিকে তবু এগোয় না, নতমুখে আঙুলে আঁচল জড়ায়।

রাজির সই—সেই দাবীতে নিমি এসে হাত পাতল : আমায় দিন কাকা, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

বেড়ালের উপর মাছের ভার—নইলে জুত হবে কেন? যাদব বাঁড়ুয্যে উচ্চহাসি হেসে উঠলেন। অলকা-বউ ওদিকে উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে—না, তার হাতেও নয়। বিনোর ভাবিক্কি বয়স, এবং ভক্তিমতীও বটে। দু-খানা মাত্র হাতে দশ-ভুজা হয়ে সে রান্নাবান্নার ব্যবস্থায় আছে। এত সমস্ত সত্ত্বেও ফচকেমি আছে ষোল আনা—কাজকর্ম ভুলে দুই চক্ষু মেলে সে রঙ্গ দেখছে। ইতস্তত করছেন পিওন-ঠাকুর। রোয়াকের উপর তরঙ্গিণী ফুল-ঝাড় কতটা শুকাল আঙুল টিপে পরখ করছিলেন, নেমে এসে বললেন চিঠি আমায় দিন ঠাকুরমশায়—

মেয়েগুলোর দিকে দৃষ্টি হেনে বললেন আমার কাছে কাড়তে আসবে কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে দেখি।

খাম নিয়ে তরঙ্গিণী রাজির হাতে দিলেন। একেবারেই কাঠের পুতুল—চিঠি দিয়ে হাতের মুঠো সজোরে বন্ধ করে দিতে হল। দিয়ে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেছেন—পটপরিবর্তন অমনি সঙ্গে সঙ্গে। রাজির উপর সবগুলো মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুমুল হুড়োহুড়ি—কেড়ে নেবে চিঠি, খুলবে, পড়বে। রাজিও আর সে-রাজি নয়—বরের চিঠি মুঠোয় এঁটে কাঠের পুতুল এখন ঘোরতর লড়নেওয়ালী। ধাক্কাধাক্কি

করে একে ঠেলে ওকে চড় কষিয়ে দিয়ে চোঁচা দৌড়। মেয়েরাও ছুটেছে। বাড়ি ছেড়ে পথে এসে পড়ল। ধরবে রাজিকে ধরবেই। সহজ নয় সেটা। দৌড়চ্ছে রাজবালা—মেয়ে সাত-আটটায় পৌঁচেছে, পিছন পিছন তারা। শিয়ালঘুল্লি দিচ্ছে রাজি—অর্থাৎ পালাচ্ছে একবার এদিক একবার সেদিক, শিয়ালের যে কৌশলে পালায়। পথ ছেড়ে হেড়াগিবনে ঢুকল তারপরে আমবাগিচায়—চষাক্ষেতে—পুকুরপাড়ে। ছুটতে ছুটতে প্রায় তো দত্তবাড়ি, নিজেদের বাড়ি, এসে পড়ল। রণে ভঙ্গ দিয়ে ওদিকেও এখন মাত্র তিনে ঠেকেছে—চারি. ফেকসি আর বেউলো। ফেকসি কাতরাচ্ছে : চিঠি না দেখাবি, কি কি পাঠ দিয়েছে তাই শুধু বলে যা—

কী ভেবে রাজি দাঁড়িয়ে পড়ল। খাম না ছিঁড়ে পাঠের কথা কি করে বলবে। চারজনে তারপর পুকুরপাড়ে জামতলায় গোল হয়ে বসল। ছুটোছুটির মধ্যে নিমি নেই,দলছুট একা একা সে চিঠি দেখবে। দেখাতেই হবে তাকে, না দেখিয়ে উপায় নেই। চিঠির যথোচিত জবাব দিতে হবে না—সে মুর্শাবিদা গাঁয়ের মধ্যে এক নিমি ছাড়া অন্য কারো সাধ্য নেই।

মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চারজনে পাঠোদ্ধারে মগ্ন। পাশ-করা বর হয়ে মুশকিল হয়েছে, শক্ত শক্ত কথা লেখে, বানান করে করে পড়তে হয় বারো আনা কথার মানেই ধরা যায় না। সাদামাটা 'হৃদয়েশ্বরী', 'চন্দ্রমুখী' 'প্রাণপ্রতিমা' পাঠ লিখে সুখ পায় না—ফলাও করে লেখে 'হৃৎপিন্ডেশ্বরী' লেখে 'অরবিন্দানগ'। বাপরে বাপ, উচ্চারণে দাঁত ভাঙে জল তেষ্টা পেয়ে যায়। নতুন বউয়ের বিদ্যা কতদূর, প্রাজ্ঞ বর সঠিক হদিস পায়নি এখনো। এবং রাজলক্ষ্মী স্থলে রাজবালা নব-নামকরণের ইতিহাসও সম্যক অবগত নয়। কনে দেখতে এসে পাত্রপক্ষ এতাবৎ গায়ের রং ও নাক-চোখ-মুখের গড়ন দেখত, বিনুনি খুলে মাথার চুল দেখত, হাঁটিয়ে চলন দেখত। এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করে কণ্ঠস্বর শুনত। মোচার ঘণ্ট কোন প্রণালীতে রাঁধতে হয় চালের উপরে ক' আঙুল জল দিলে আর ফ্যান গালার প্রয়োজন থাকে না—অর্থাৎ সারাজন্ম যা করতে হবে তার উপরে আজামোজা পরীক্ষা। পরবর্তীকালে আরও এক প্রশ্ন : মেয়ে কি কি শিল্পকর্ম জানে—আসন, খঞ্জিপোশ বোনা, কার্পেটের উপর উল দিয়ে রাধাকৃষ্ণের ছবি তোলা এসমস্ত পারে কিনা? অসুবিধা নেই—এর-ওর কাছ থেকে দু'-চারটে চেয়েচিন্তে এনে রেখেছে, বলে দিল মেয়ে সব নিজের হাতে বুনেছে। সামনে বসিয়ে দিনের পর দিন বুনিয়ে পরখ করবে কেমন করে?

এ পর্যন্ত ভালই। হালফিল এক ধুয়ো উঠেছে, কনের লেখাপড়া কদ্দুর? বউ নিয়ে গিয়ে সেরেস্তায় বসিয়ে দাখলে লেখাবে ভাবখানা এই প্রকার। কাগজ-কলম নিতে বলবে : নামটা লেখো দিকি মা—। ঠাকুরদাদা শশধরও তেমনি শত্রুতা সেধেছেন—দুনিয়ার আর নাম খুঁজে পাননি, সোহাগ করে নাতনির গাল-ভরা জাঁকালো নাম দিয়েছিলেন—রাজলক্ষ্মী। লাও ঠ্যালা। নাম নিয়েও যে দায়ে পড়তে হয়, তখন ও'দের ধারণায় ছিল না। অ-আ ক-খ সাদামাটা অক্ষরগুলো কায়ক্লেশে যদি-ই বা সাজানো যায় যুক্তাক্ষর রাজি কিছুতেই বানাতে পারে না। অথচ নিজ নামেরই শেষে ক্ষ্মী—'ক'য়ে 'ষ'য়ে ক্ষ, তাতে একটা ম-ফলা এবং মাথায় দীর্ঘ ঈ-কার। অমন যে প্রহ্লাদ মাস্টারমশায়—তাঁকে দিলেও সম্ভবত গুলিয়ে ফেলবেন। দু'-দুটো ভাল সম্বন্ধ ফেঁসে গেল শুধু ঐ নাম লেখার গণ্ডগোলে। নিজের ভুল বুঝে শশধর তখন 'রাজলক্ষ্মী' পালটে 'রাজবালা' নাম দিলেন। এবং একমাস ধরে সকাল-বিকাল মকসো করালেন। তবে বিয়ে গাঁথল।

(ক্রমশঃ)

প্রকাশিত হয়েছে

কথাসরিৎসাগর আশাপূর্ণা দেবীর নবতম উপন্যাস

হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা ১০·০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় — আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সব ফুল কিনে নাও ৮·০০ — **ফেরারী অতীত** ৭·০০

বীরেন্দ্রনাথ সরকার — সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

গৌরী গঙ্গা ৯·০০ — **একক প্রদর্শনী** ৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুখের আড়াল ৫-৫০ — **ঘরের পথ** ৬·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার আমার ৪·০০ — **নীল লোহিতের চোখের সামনে** ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবী

ভালবাসার মুখ ৬·০০ — **তরঙ্গহীন** ৫·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত — শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

মন জানে না ৬·০০ — **সরমা ও নীলকান্ত** ৬·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

একবোন পারুল ৬·০০ — **বনকরবী** ৬·৫০

চিরঞ্জীব সেন — অনিল রায়

রাশিয়ান রুবির রহস্য ৭·০০ — **সোনার পাতায় রক্ত** ৭·০০

সাহিত্য সংস্থা ॥ ১৮সি টেমার লেন ॥ কলিঃ—৯

কবিতা

নিষ্ঠুর আলস্যে ॥

মৃণাল বসু চৌধুরী

স্বপ্নেও আসো না কাছে বড়ো দূর, দূরে রয়ে গেলে—
ভোরের ভূখণ্ড জুড়ে ফুটে থাকে ম্লান ভুঁইচাঁপা
স্পর্ধিত যন্ত্রের পাশে তন্দ্রাতুর উপোসী মানুষ
অতিগূঢ় ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঝড় অভিপ্রায়হীন
ভেসে ওঠে মুখচ্ছবি, নীলাঞ্জন নগ্ন করতল
বনভোজনের লোভে পোড়ামাটি, আত্মনিবেদন
ধর্মের গাজনে শীর্ণ প্রজাপতি অতিপ্রাকৃতিক
শব্দের পেছনে ছোটে হাওয়া, তবু কি ভীষণভাবে
নিষ্ঠুর আলস্যে এই ভয়ংকর দুবছ বাড়ালে!

এখানে কোন্ ॥

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এখানে কোন অচেনা মন এঁকেছে ভট,
জ্বালে প্রদীপ কাজল-দ্বীপ— আলাস্কার।
পঙ্কশীল সবুজ নীল নদী-বিবর,
গিরিগুহায় পড়া তো যায় রঙীন পট!

ডেথ-ভ্যালির আহা কী স্থির ঝিলের জল,
সীমানা দূরে কত মধুর মালভূমির!
গোধূলি-ক্ষণ বুঝি স্বজন নভশ্চর
সূর্য-বেশ সেন্টলরেন্স অনর্গল!
করেছে সাব ওই মিনার ঘড়িবাহার
আইয়ের মন বশে কেমন মৌসুমীর!

বীণা বাজায় ভিজে পাতায় এণ্ডিকট!

জনান্তিকে ॥

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

ওকে আমি আড়ালে রেখেছি।
কেননা এখন ওর মুখ বার বার আঁকা হোক
আমি তা চাই না।
পবিত্রতা বড়ো বেশি উচ্চারিত
'অনুকম্পা' আরো বেশী
বার বার ফিরে আসা শব্দ ধ্বনিগুলি
মন্ত্রের শরীর পায়
ও এখন মন্ত্র হয়ে যাক
আমি তা চাই না।

আরো কিছু দিন আমি বড়ো ব্যস্ত থাকবো
জানলায় গ্রিল কিম্বা পিতামহ শিক
কতখানি বন্যতাকে ধরে রাখবো পর্দার রঙে
কোন কোণে বসাবো রূপসী আরশি
এই সব সাতপাঁচে
আমি বড়ো জড়িয়ে পড়েছি ইদানীং।
খাট-জোড়া রোদ আর
মশারী ভাসানো চাঁদ
শব্দের থেকেও দ্রুত ভেসে যায়
তাই আমি আরো কিছুকাল
অতিশয় ব্যস্ত থাকবো।
ও এখন আড়ালেই থাক।

শিশিরকুমার পুরস্কার

হরপ্রসাদ মিত্র

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র চল্লিশের একজন খ্যাতিমান কবি। কিন্তু শুধু কবিতা রচনাতেই নয় প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধানের দায়িত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে যে সব মননশীল নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে তাঁর গভীর মননশীলতার স্বাক্ষর মেলে। তাঁর এই মননশীল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে তিনি বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ উভয় গোষ্ঠীর পাঠকের কাছেই সমান সম্মানের পাত্র। এর আগে কবিতার জন্য তিনি উল্টোরথ পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর এই সাহিত্য কৃতির স্বীকৃতিতে তাঁর নামে এবার শিশিরকুমার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

মতিলাল পুরস্কার

সতীকান্ত গুহ

শ্রীসতীকান্ত গুহ এককালে শিশু সাহিত্য রচনা করে যশস্বী ছিলেন। এখনও তিনি শিশুসাহিত্যের দিকে সমান উৎসাহী। এই বিভাগে কৃতিত্বের জন্য তিনি ইতিপূর্বে মৌচাক পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান আকর্ষণ এখন পরিণত পাঠকদের জন্য গল্প উপন্যাস কবিতা রচনার দিকেই বেশি। বিশেষ করে তাঁর কয়েকটি গল্প এবং সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি উপন্যাস তাঁকে প্রথম শ্রেণীর লেখক হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। তাঁর প্রধান আকর্ষণ মানবজীবনের গভীরার্থ সন্ধানের দিকে। এদিক থেকে তিনি একেবারেই নতুন এবং প্রকৃত অর্থেই একজন উল্লেখযোগ্য লেখক। তাঁর এই উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তাঁর নামে এবার মতিলাল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। দুটি পুরস্কারের অর্থ মূল্যই এক হাজার টাকা করে।

অন্যান্য সাহিত্য পুরস্কার

শিশুসাহিত্যের জন্য এ বছরের মৌচাক পুরস্কার এবং রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে যথাক্রমে শ্রীবিমল দত্ত এবং শ্রীরবিদাস সাহারায়ের নামে। নাটকের জন্য গিরিশ পুরস্কার পাবেন খ্যাতিমান নাট্যকার শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়। চল্লিশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কবিতার জন্য এবছরের সত্যেন দত্ত পুরস্কার পাচ্ছেন। প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কারের জন্য অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের নাম ঘোষিত হয়েছে। শিশুসাহিত্য নাটক এবং কবিতার জন্য প্রদত্ত প্রতিটি পুরস্কারের অর্থ মূল্য পাঁচশো টাকা। ২৭ এপ্রিল সরলা মেমোরিয়াল হলে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারগুলি বিতরণ করা হবে।

নতুন লেখকদের প্রতিষ্ঠাকল্পে আহ্বান

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শিলিগুড়ি শাখা আয়োজিত একটি সাহিত্য সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সম্প্রতি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেছেন সাহিত্য পরিষদের প্রতিটি শাখার কর্তব্য হোল নতুন লেখকদের প্রতিষ্ঠায় যথার্থভাবে সাহায্য করা। বাংলার সংবাদপত্র কিভাবে সাহিত্যকে জনগণের অন্তরের গভীরে সঞ্চারিত করেছে সে প্রসঙ্গেও আলোকপাত করেন শ্রীঘোষ।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু সাহিত্যের চিরন্তন ধর্ম কি সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন সাহিত্য বলবে সেই জীবনের কথা যা সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার আধুনিক সাহিত্যে কোন নতুন চূড়ার সৃষ্টি হয়নি বলে যে মন্তব্য করেছেন শ্রীবসু বলেন যে তিনি তার সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন সৃষ্টিশীল সাহিত্যের উদ্দেশ্য হোল জীবনের অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোর বার্তা নিয়ে আসা।

এই সাহিত্য সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীআনন্দময় ভট্টাচার্য।

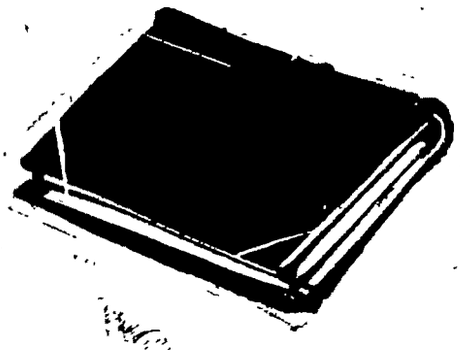

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

এই সাহিত্যসভার আগে শিলিগুড়ি আর্য সমিতি আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন দেশের এই সংকটকালে সরকারের সাহায্য ছাড়া কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কিম্বা গ্রন্থাগার তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। তিনি আশা করেন সরকার এই কর্তব্য সম্পর্কে শীঘ্রই সজাগ হবেন। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বাংলার নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সব শেষে কলকাতার রবীন্দ্র সদনে আর্য সমিতিকে তাদের প্রযোজিত নাটক মঞ্চস্থ করার আহ্বান জানান। এই সম্বর্ধনা সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅর্জুন পাল। অধ্যাপক শ্রীঅশ্রুকুমার সিকদার শ্রীঘোষ ও শ্রীবসুকে স্বাগত জানান এবং সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচরণ চন্দ।

মুক্তাঙ্গন সাহিত্য মহোৎসব

সাহিত্য প্রয়াসীর মুক্তাঙ্গন সাহিত্য মহোৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হোল শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের একটি বেণুকুঞ্জে। এই উৎসবের যাত্রা শুরু হয় চিত্র প্রদর্শনী দিয়ে; স্বরচিত সাহিত্য পাঠ ছিল এই অনুষ্ঠানের শেষ কার্যসূচী। আবৃত্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং আলোচনায় অংশ নেন সুধীর বেরা মায়া সেন স্বপন গুপ্ত অসিত হারো শৈলেন শেঠ বরুণ ঘোষ সুশীল দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। অধ্যাপক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সম্মেলন

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের ১৪শ বার্ষিকী সম্মেলন মহীশূর ভাষা কেন্দ্রের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় চোদ্দটি ভাষার শিশুসাহিত্যের পঞ্চাশজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে পঠিত পঁচিশটি প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মহীশূর ভাষাকেন্দ্রের এম ভি শ্রীধর তাঁর স্টিমুলেটিং চিলড্রেন্স লিটারেচার অব দি কমিউনিটিজ মাদার্স-এর জন্য সুরমা হোমরায় পুরস্কার পান। পুরস্কারটি দিয়েছেন স্বর্গতা সুরমা হোমরায়ের পুত্র এবং এই সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীউৎপল হোমরায়। শ্রীহোমরায় প্রতি বছর এই পুরস্কারটি দেবেন বলে ঘোষণা করেন।

শেকসপীয়ার সমগ্র রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড) মূল সম্পাদক ঃ হরপ্রসাদ মিত্র। জ্যোতি প্রকাশন, ২-এ, নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা-১। কুড়ি টাকা।

শেকসপীয়ার সমগ্র রচনা সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। প্রথম খণ্ডের মতই এই খণ্ডটি অনুবাদকের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের এবং সাহিত্য রসবোধের কারণে নিশ্চিতভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। অনুবাদকদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী হরপ্রসাদ মিত্র নিখিল সেন সমরেশ মৈত্র মণীন্দ্র রায় সুবোধকুমার ঘোষাল তুলসী মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর সেন। অনূদিত নাটকের মধ্যে 'কমেডি অব এররস', 'মাচ এ্যাডো . অ্যাবাউট নাথিং', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' 'কিং লিয়র' ও 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস'। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র রায় অনূদিত শেকসপীয়ারের ২৯ ও ৩০ সংখ্যক সনেট এবং শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র অনূদিত ১০৬ ও ১০৭ সংখ্যক সনেটগুলি এ-গ্রন্থে সংকলিত হওয়ায় আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডের বৈচিত্র্য বেড়েছে।

অনূদিত রচনাগুলি ছাড়া আলোচ্য খণ্ডের আর এক বড় বৈশিষ্ট্য হল—এ-গ্রন্থে সংকলিত তিনটি শেকসপীয়ার সম্পর্কিত আলোচনা। শেকসপীয়ারের কবিদৃষ্টি সম্পর্কে লিখেছেন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র, রচনাটি সামগ্রিকভাবে শেকসপীয়ারকে বোঝার পক্ষে নিশ্চয়ই উল্লেখ্য। বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শেকসপীয়ারের নায়ক-নায়িকা' আলোচনা ও জ্যোৎস্নাকুমার সেনের 'নাট্য-নির্দেশনা—হ্যামলেট' প্রবন্ধটিও বর্তমান খণ্ডের গৌরব। মূল নাটকের অনুবাদকরা তাঁদের সনিষ্ঠ শ্রম ও সততায় অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছেন বলেই দ্বিতীয় খণ্ডটিও বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সমান আদরের হবে।

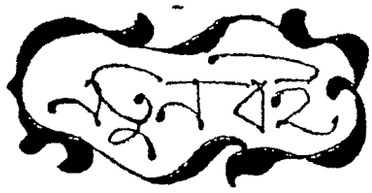

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এই পৃথিবী। সামসুল হক। বুক মার্ট, এ-১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

সামসুল হক দু'-এর দশকের একজন প্রতিষ্ঠিত কবি। ছন্দ শব্দ, ধ্বনি, চিত্রকল্প ও কাব্যের বিষয়-ভাবনায় তিনি সব সময়েই আধুনিক থাকতে প্রয়াসী। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এই পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে এই সব সর্ত বজায় আছে। কাব্য-গ্রন্থটি কবির কিছু মৌলিক কবিতা, কিছু অনূদিত কবিতা নিয়ে সংকলিত। মৌলিক কবিতাগুলির দুটি কবিতা কবি তাঁর পূর্বে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের জন্য' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত করেছেন। মৌলিক কবিতাগুলির মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিবেদিত একটি কবিতা আছে অনুবাদ-কবিতা নির্বাচন ও মৌলিক কবিতাগুলের বিষয়ভাবনা ও গ্রন্থের নামকরণ দেখে, সর্বোপরি সমস্ত কবিতা পড়ার পর বোঝা যায় কবি মনে-প্রাণে প্রগতিবাদী কিন্তু কোথাও প্রগতির পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে কাব্যত্ব নষ্ট করেননি। কবিতাগুলির মধ্যে কবির সপ্রাণ মানসিকতা প্রশংসনীয়।

Gopal Goswami / Adwaita Prakasani, 34, B. N Sen Road (Saidabad), P O. Khagra, Dt. Murshidabad /Rs 3 only

বাংলা ও ইংরাজী দুই ভাষাতেই শ্রীঅমিয়কুমার সেন গীতার বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন। ইংরাজী গ্রন্থটিতে মোট ২২টি অধ্যায় সংযোজিত। প্রত্যেকটি অধ্যায় যেভাবে লিখিত তা সাধারণ ও মননশীল—দুই শ্রেণীর পাঠককেই তৃপ্ত করবে। ইংরাজী সহজ, সরল ও গতিপ্রাণ। মূল রসবোধ আদৌ বাধার সৃষ্টি করে না। বাংলা গ্রন্থে একই বিষয় কিন্তু আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এখানে পঁচিশটি অধ্যায় সংযোজিত। বর্তমান যুগসংকটে গীতার দায়িত্ব ও বাণী কতটা কার্যকর এবং গীতার ব্যাখ্যা যে মানবজীবনেরই, মহত্তম লোকে উত্তরণের এক সুস্থ বিক্ষুব্ধ পন্থা—'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশ থেকে গ্রন্থের বক্তব্য ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে লোক তা বুঝিয়েছেন। গ্রন্থদুটি দার্শনিক মন মননকে উজ্জীবিত করার সহায়ক।

পুষ্প চয়ন (কাব্য সংকলন)। গোপেশচন্দ্র পুরকায়স্থ উমশলং শিলং—৬ অবালয়। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীগোপেশচন্দ্র পুরকায়স্থ 'পুষ্প চয়ন' কাব্য সংকলনের প্রথম সাতাশটি কবিতার কোন নাম নেই। স্বতন্ত্র ও ক্রমানুগ সংখ্যা উল্লেখ করে কবিতা সাজিয়েছেন। শেষ দুটি কবিতা 'গৌতম' ও 'শ্রীচৈতন্য' নামে চিহ্নিত। প্রাচীন রীতির ভাব ও ভাবনা কবিতাগুলিতে ওতপ্রোত। কবির ঈশ্বর ভাবনা, আধ্যাত্মিকতা কবিতাগুলিতে স্বতঃস্ফূর্তরূপে ব্যক্ত।

পুরুষবর্জিত নাটক। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। মণি প্রকাশনী, ৩৯-বি, ডেন্ট মিশন রোড, কলকাতা-২৩। তিন টাকা।

সম্পূর্ণ মহিলা চরিত্র নিয়েই যে এই নাটক, আলোচ্য নাটকটির নামকরণে লেখক বলেই দিয়েছেন। নাটকটির নাম 'পুরুষ-বর্জিত নাটক' না হলেই ভাল হত। 'সারি সারি মন' নাটকটিতে অমলা দে, সীমা, শেলী দত্ত, কেতকী নাগ ইত্যাদি কয়েকটি উল্লেখ্য চরিত্র নাটকের প্রেক্ষাপট উজ্জ্বল করেছে। পুরুষবর্জিত হলেও নাট্যকারকে নেপথ্যে 'অতনুর পুরুষকণ্ঠকে রাখতে হয়েছে। এই নাটকের 'অ্যাকশানে'র পক্ষে সংলাপ ও ঘটনা যথাযথ। দ্বিতীয় 'বিবর্ণ ক্যানভাসে'ও নাট্যকার দিব্য নামের এক পুরুষ চরিত্রকে নেপথ্যে এনেছেন। নাটকটির গঠনকৌশল নাট্যকারের পরিমিতি বোধ, সংযম ও নাট্যক্রিয়া রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কোলাজ (কাব্য সংকলন)। সন্দীপ দত্ত। প্রেসসিসেম, ১৮।এম, টেমার লেন কলকাতা-৯। তিন টাকা।

কবি সন্দীপ দত্ত যে কাব্য-ভাবনায় আধুনিক তার প্রমাণ আছে 'কোলাজ' গ্রন্থের কবি-ভাবনায় শব্দপ্রয়োগে, ছন্দ ব্যবহারে, চিত্রকল্পের অভিজ্ঞ রচনাকুশলতায়। শরীর নিয়ে কবি বেশী ভাবিত এবং এই শরীরের ইমেজ প্রায় প্রতি কবিতাতেই ছড়িয়ে আছে। কবি বলেছেন, 'দংশনে বিষে জ্বালাত হোক এ শরীর।' 'তৃষ্ণার্ত শরীর শরীর খোঁজে, তৃষ্ণা শরীরে।' শহর কলকাতা ভয়ংকর জটিল জটিলতম, এর আকর্ষণ মায়াবী সোনার হরিণের মত, তবু কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—'কোলকাতায় গাছ আছে গোপনে। কষ্টের রাস্তায় প্রেম আছে,—। মায়া দেয় কলকাতা। কোলকাতা আমার শহর।' ছোট ছোট লিরিক রচনায় কবি যথার্থ অর্থে দক্ষ, অনুভূতিপ্রবণ।

বিজ্ঞানের খেলা—অমরনাথ রায়। ওরিয়েন্ট লংম্যান। চার টাকা।

বিজ্ঞানের তত্ত্বের ওপরে ভিত্তি করে কত-যে খেলা হতে পারে, তার কিছু বিবরণ ছোটদের মতো করে এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। খেলাগুলো এমন যে অল্প আয়োজনে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়িতেই করা সম্ভব। এসব খেলা থেকে ছোটরা যেমন মজা পাবে তেমনি কিছু শিখতেও পারবে। তবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার সময়ে লেখক সর্বত্র ছোটদের বোঝার মতো প্রাঞ্জল হতে পারেননি কোথাও কোথাও যথাযথ নন (যেমন, 'কাগজের মাছের সাঁতার কাটা' খেলার ব্যাখ্যায়)। 'ধোঁয়ার কুণ্ডলী' খেলায় ছোটদের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট তুলে দেওয়া হয়েছে, কাজটি এড়ানো যেত।

বিজ্ঞানীদের ছেলেখেলা—সুনীল সরকার। পরিবেশক : দে বুক স্টোর্স। তিন টাকা।

এই বইয়ে পনেরোজন দিকপাল বিজ্ঞানীর ছেলেবেলার কাহিনী শোনানো হয়েছে। এই পনেরোজনের মধ্যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ও ওয়ালট ডিজনিও বিজ্ঞানী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ভারতীয় আছেন চারজন—প্রফুল্লচন্দ্র জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ ও সি ভি রামন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাদ গেলেন কেন? সে যাহোক ছোটদের জন্য লেখা এই বইটি পড়ে ছোটরা গল্প পড়ার মজা অবশ্যই পাবে, সেই সঙ্গে কিছু প্রেরণাও। বইয়ের ভাষা কোথাও কোথাও কিছুটা দুরূহ, এ-ধরনের বইয়ে যা না হলেই ভালো।

ছোটদের সেরা গল্প—জীবন সরকার সম্পাদিত। প্রকাশক—অসিতবরণ জানা, ১৬-বি শিবনারায়ণ দাস লেন কলি-৬। দাম চার টাকা।

রূপকথার গল্প রোমাঞ্চকর কাহিনী ও বিভিন্ন ধরনের দশটি গল্প নিয়ে ছোটদের জন্যে এই গল্প-সংকলনটি। প্রতিটা গল্পই সুখপাঠ্য। ছোটদের তো পড়তে ভালো লাগবেই এমনকি বড়দেরও অনেকের। লিখছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় পরেশ সাহা গিরিধারী কুন্ডু জীবন সরকার শিশির ভট্টাচার্য প্রমুখ। মনভোলানো রংচঙে প্রচ্ছদ।

পাড়-ভাঙা নদী (কাব্য সংকলন)। আরতি দত্ত। নবগ্রন্থ কুটীর, ৫৪।৫-এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

শ্রীআরতি দত্ত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় তাঁর কবিমানস নিহিত সুগভীর হতাশা বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তা কাব্য হয়ে উঠেছে অর্থাৎ কবিতাগুলির রসনিষ্পত্তি আনন্দলোকে। পাঠক এগুলি পাঠে সম্ভাব্য রসভোগে তৃপ্ত হবেন। সহজ, সরল, অন্তরঙ্গ ভাষা প্রয়োগে কবি শ্রীআরতি দত্ত সিদ্ধহস্ত। ঠিক এই কারণেই এঁর কবিতা বেশ কিছুটা আকর্ষণযোগ্য। আলোচ্য কবি জটিলতার মধ্যে যাননি। যা-কিছু বিশ্বাস করেন, তাকে অকপটে ব্যক্ত করেই কবিপ্রাণের মুক্তি ঘটান। এই অর্থে কবি শ্রীআরতি দত্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থের কিছু পাঠক নিশ্চয়ই পাবেন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কলরব (ছোটদের মাসিক পত্রিকা)। সম্পাদক রবিদাস সাহারায়। বি-৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২। প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের লেখায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা অগ্রহায়ণে লিখেছেন কালিদাস রায় মনোজিৎ বসু শিবরাম চক্রবর্তী ধীরেন্দ্রলাল ধর বন্দে আলী মিয়া এবং আরও অনেকে। পরলোকগত শিশু সাহিত্য সম্রাট হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং বর্তমানকালের সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ধারাবাহিক উপন্যাস ও চিত্রকাহিনী কলরব পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। গল্প ছড়া ইতিহাসের কাহিনী টারজানের গল্প কৌতুক ধাঁধা প্রভৃতি প্রচুর ছোটদের আকর্ষণীয় জিনিস এতে রয়েছে।

ইণ্ডিয়ান ডার্স—ভলুম ২ নাম্বার ৩ সামার ১৯৭৪ মূল্য ৩ টাকা। ৭০।২ বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা-১০।

ইংরেজী কাব্য পত্রিকা। উদ্যোক্তাদের মতে 'ভয়েস অব দি ইণ্ডিয়ান পোয়েটস'। এ সংখ্যার একটি বড় আকর্ষণ শ্রীঅরবিন্দর একটি সনেট।

এছাড়া শিব কে কুমার, জগদীশ চতুর্বেদী জাগতার জাহিদা জাইদি সুশীল রায় ইব্রাহিম হোম শম্ভুপ্রসাদ শ্রীবাস্তব চিত্ত ঘোষ হৃদয়েশ পান্ডে হাবেব হাসিম চন্দ্রকান্ত দেওতালে ও প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক)। উপরোক্ত কবিদের কবিতার ইংরাজী তর্জমা করেছেন যথাক্রমে মনমোহন ঠাকোর অসিত চক্রবর্তী এম এস রাটরা ও মইন এজাজ।

শ্রীঅরবিন্দ কবিতার ওপরে নির্মল ব্যানার্জীর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে।

কবিতা বিষয়ক (বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায়) এরকম সংকলন প্রচেষ্টা এদেশে বড় কম। আমরা এর প্রচার কামনা করি।

ফাল্গুনী। সম্পাদনা মনোরঞ্জন দাশ। হিজলগঞ্জ, ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

স্বদেশ। সম্পাদনা পান্নালাল মল্লিক। মুন্সেফপাড়া, বসিরহাট ২৪ পরগণা। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

অনুপম : মৃগাঙ্ক রায়। ১০ সিদ্ধেশ্বরী লেন হাওড়া। উৎকর্ষের দিক থেকে সংখ্যাটি একরকম হয়েছে।

ভগনদূত : সম্পাদনা—নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় ও হরলাল বর্ধন। ১৩বি, কবডাইস লেন কলকাতা-১৪। দাম ৪-০০।

এই সংখ্যার লেখক তালিকায় আছেন কুমারেশ ঘোষ শুদ্ধসত্ত্ব বসু রাণা বসু অরুণ মুখোপাধ্যায় পঙ্কজ ভট্টাচার্য কল্পনা ধর এবং আরো অনেকে।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা

ও

রসমধুর কাহিনী সমারোহ। দাম : সাত টাকা।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনসাধনায় চিরদিনই চেয়ে এসেছেন বাহ্য ও আন্তর সত্যের সমন্বয়ের ফলে নানা দুঃখকেও রূপান্তরিত করে নিত্যানন্দের সুধাস্বাদ পেতে। তাঁর 'লাইফ ডিভাইন'-এর একটি পরম বাণী :

"All problems in life are essentially problems of harmony."

একথা তিনি বলতেন বারবারই কেননা কেবল এই পরম সমন্বয় হলেই দুঃখশোকের নিহিতার্থ বা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়—শোকতাপ দুঃখশোক আধিব্যাধিকে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া শুধু যে কার্যত অসম্ভব তাই নয় থিওরিতেও মানুষের চেতনার বিবর্তনে কোনো সহায়তা করে না। শুধু তাই নয়, শ্রীঅরবিন্দ বলেন : যে-মহানিয়ন্তা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকলোকে উত্তীর্ণ করতে চেয়ে যুগে যুগে ঋষি কবি মনীষী অবতারের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তাঁর ঐশী বাণী প্রচার করে এসেছেন তিনি চাইতেই পারেন না মায়াবাদকেই জ্ঞানের চরম সমাধান বলে ঘোষণা করতে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা লেখায় ও পত্রেই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন—কেন মায়াবাদ যুগে যুগে বহু জিজ্ঞাসুকে টেনেছে জীবনবিমুখ বৈরাগ্যের দিকে। সে-দার্শনিক অবতারণা এ-স্মৃতিতর্পণে অবান্তর হবে বলে আমি এ-সূত্রে 'সাবিত্রী' থেকে তাঁর একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হব। সাবিত্রী শেষে যখন ভগবানের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন তখন বললেন তাঁকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে :

If earth can look up to the light of heaven
And hear her answer to her lonely cry
Not vain their meeting, nor heaven's touch a snare:
If thou and I are true, the world is true.

ধরা যদি ঊর্ধ্বমুখী হয়
অধরার আলো পানে,
নিঃসঙ্গ ক্রন্দনে তার
পায় অভিনন্দন স্বর্গের
তাহলে এ-পরিচয়—
স্বর্গের প্রসাদ—নয় বৃথা :
তুমি আমি যদি সত্য হই—
তবে সত্য এ-ভুবন।

ভগবান যে মানুষের ধরণীর, প্রার্থনায় সাড়া দেন এ শুধু শাস্ত্রবাণী নয়—প্রত্যক্ষ সত্য প্রতি তত্ত্বজিজ্ঞাসুরই জীবনের উপজীব্য। তাই যুগে যুগে ভগবানের নানা আত্মপ্রকাশ বা বিভূতির মধ্যে প্রেমের উচ্ছলনই তাঁর কাছে সবচেয়ে বরণীয়, মহনীয়, কমনীয় বলে গণ্য হয়ে এসেছে।

শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন—যেটি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি—যে তাঁর যোগসাধনায় তিনি প্রেমভক্তিকেই বরাবর সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এসেছেন। তাঁর 'সিন্থেসিস অফ যোগ'এর তৃতীয় খণ্ডে তিনি লিখেছেন :

Love is the crown of all being and its way of fulfilment, that by which it rises to all intensity and all fullness and the ecstasy of utter self-finding. .... Love is the power and passion of the divine self-delight and without love we may get the rapt peace of its infinity, the absorbed silence of the Ananda, but not its absolute depth of richness and fullness. Love leads us from the suffering of division into the bliss of perfect union, but without losing that joy of the act of union which is the soul's greatest discovery and for which the life of the cosmos is in long preparation. Therefore to approach God by love is to prepare oneself for the greatest possible spiritual fulfilment.

(ভাবার্থ : প্রেম জীবনের মণিমুকুট, পরম সার্থকতা—যার মাধ্যমে মানুষ আত্মসাক্ষাৎকারের আনন্দের নাগাল পায়। প্রেম বিনা আমরা ভূমার উইটমুক্তের শান্তির বা আত্মমগ্ন নৈঃশব্দ্যের সুধাস্বাদ পেতে পারি, কিন্তু তার অতল সমৃদ্ধির পূর্ণিমা-পরিচয় পাই না। প্রেম ভেদের দুঃখের এলাকা পেরিয়ে আমাদের পূর্ণমিলনের আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করতে পারে—যে আনন্দ আত্মার সর্বোত্তম আবিষ্কার—যে-আনন্দের অভিসারে প্রাণলীলা চিরপ্রবহমান। তাই প্রেমের পথে ভগবানের সঙ্গে শুভদৃষ্টিই মানুষের সর্বোত্তম আত্মিক সিদ্ধি।)

একথা যে অসত্য নয় তার একটি সুমধুর তথা প্রাণোদ্বেল পরিচয় পাই বিশেষ করে সাবিত্রীর শেষ স্কন্ধের ছত্রে ছত্রে। অমরাবতীর আনন্দ স্বাদ পেয়েও শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন আজীবন সে-আনন্দের কিছুটা আলো অন্তত আমাদের মসীম্লান পৃথিবীতে মাটির মানুষের অন্তরে আবাহন করতে। কত ভাবেই যে তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ধরণীপ্রীতি, সমর্থন অরছিলেন রূপান্তরিত পৃথিবীদের—পড়তে পড়তে চোখে জল আসে—হৃদয়ে শুনতে পাই তাঁর গভীর ধরাপ্রেমের স্পন্দন। কী সুন্দর তাঁর এই সরল বাণী যে, ভগবান যখন পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন তখন পৃথিবীকেও সাড়া দিতে হবে ভগবানকে তার গর্ভে জন্ম দিয়ে—লালন করে—পূজা করে—ভালোবেসে :

"Since God has made earth, earth must make in her God"

শুধু তাই নয়, তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর অতন্দ্র সাধনায় যে, প্রেমেই তাঁর উদ্ভব বিকাশ ও পরম পরিণতি :

My love is not a hunger of the heart,
My love is not a craving of the flesh,
It came to me from God, to God returns.

আমার এ-প্রেম নয় শুধু মর্ত্য
হৃদয়ের ক্ষুধা।

নয় সে তনুর তৃষ্ণা—বিভুর
আলোকলোক হতে

করেছে সে আমাকে বরণ—
ফিরে যাবে তাঁর কাছে।

— আটত্রিশ —

জীবনের চলতি ছন্দের ঢিমা তেতালা কদম দেখতে দেখতে মন অনেক সময়েই ভুলে যায় যে, পাখায় হু হু করে উড়ে যাওয়াও আমাদের অভিজ্ঞতার এলাকার মধ্যে পড়ে—বিশেষ করে উড়োজাহাজের অবিশ্বাস্য সংখ্যাবৃদ্ধির পরে। তবু বলা চলে যে, দিনের পর দিন যখন মানুষ একঘেয়ে জীবন কাটায়—কখনো কোনো কর্মসূচী—রুটীন—গড়ে কখনো এমনি ঘরোয়া আচার মেনে, যার মধ্যে না আছে নূতনত্ব না কোনো আশ্চর্য আবির্ভাব—তখন মানুষের মনে প্রায়ই প্রশ্ন আসে : ততঃ কিম্? —এর পরে কী? উত্তর দেয় জীবন—'কিছুই না—যা পাচ্ছ তাই গ্রহণ করো, যা যা বরণীয় তা বরণ করো—চলো সুনীতি মেনে যতটা সম্ভব—তারপর শেষে এ-পার ছেড়ে যখন যেতে হবে ওপারের ডাকে তখন যতটা সম্ভব কান্নাকাটি না করে প্রস্থান করো কেননা কান্নাকাটিতে ভবিতব্যকে ঠেকানো যায় না।'

এইই হয়ে এসেছে শতকরা নিরানব্বই জন বস্তুতান্ত্রিক মানুষের জীবনপঞ্জী। বাকি

মশার দৌরাত্ম্যে প্রাণ যায়!

সবচেয়ে বেশী কার্যকরী মশা বিতাড়ক

তাহলে ব্যবহার করুন

ওডোমাস

লক্ষ লক্ষ লোক-এর-ওপর নির্ভর করেন আর এটাই ব্যবহার করেন • শিশুদের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক
BALSARA বালসারা অ্যাণ্ড কোম্পানী (প্রাঃ) লিঃ
৪০, নেহেরু রোড, বোম্বাই ৪০০ ০০১।

CHATTHA BLS 45 BEN

শতকরা একজন ঝিকিয়ে ওঠে একটা নব দিগন্তের আভাস দিতে—হাজার করা একজন ঝিকিয়ে ওঠে একটা নব অবিশ্বাস্য প্রাপ্তির সুখবর দিতে—লাখে একজন ভাগবত জীবনের—লাইফ ডিভাইনের—প্রতিশ্রুতি। শ্রীঅরবিন্দ এই বিরলতম মহাপুরুষদের একজন। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন চিনেছেন ভক্তি করে অন্তরে পেয়েছেন তাঁর আলো, কানে শুনেছেন তাঁর বেদবাণী, তাঁরা কতকটা পেরিয়ে গেছেন দিনানুদৈনিক একঘেয়েমির চৌহদ্দি। কিন্তু তাঁকে যাঁরা দিশারি বলে বরণ করেছেন তাঁরা বিশেষ ভাগ্যবান কেননা তাঁরা অন্তত কিছুটা দিশা পেয়েছেন—কোন জ্ঞানদীপ্ত 'নিরস্তকুহক' সত্যকে ধ্যান করলে দুঃখনিবৃত্তি হয়—যার পাঠ দিয়েছেন ব্যাসদেব ভাগবতের প্রথম শ্লোকে : 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি'—যিনি নিজের আলোয় সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে জাগতিক অন্ধকারের গন্ডী পার হয়েছেন তাঁকেই ধ্যান করা চাই—সেই সত্যের সত্যকে।

কিন্তু এ আভাস মেলে আরো এমন অনেক সাধক সাধিকার উপলব্ধি থেকে যাঁরা গুরু না হয়েও আমাদের নিরস্তকুহক করতে পারেন। এই শ্রেণীর দুটি আধারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে আমি নিরাশায় আশ্বাস ও সংশয়ের দুর্লগ্নে নব প্রত্যয়ের পাথেয় পেয়েছিলাম—কৃষ্ণপ্রেম ও ইন্দিরা। কৃষ্ণপ্রেমের কথা বলেছি একটি গোটা স্মৃতিচারণে (YOGI SRI KRISHNAPREM) আজ বলব ইন্দিরার কথা যে আমার শিষ্যা হয়েই এসেছিল বটে কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই হয়ে উঠেছিল অলৌকিক সাধনসঙ্গিনী। তবে বলে রাখি আমি যা বলতে চাই বলব নিজের ঢঙেই। যথাসম্ভব অত্যুক্তি কাটিয়েই বলতে চেষ্টা করব, কেবল মুস্কিল এই যে, মানুষ যাকে দেখে অনেক কিছু অদেখাকে দেখতে পেয়েছে, যাকে চিনে অনেক কিছু অচিন আলোকে চিনতে শিখেছে—এককথায়, যার নির্দেশে তার বিসর্জনীতেও আগমনীর সুর বেজে উঠেছে তার কথা কি অতি সাবধানে ওজন করে বলা যায়? গেটের একটি উক্তিতে আমার মন পূর্ণ সাড়া দেয়ঃ

"Aufrichting zu sein kann ich versprechen, unparteiish zu sein aber nicht."

(আমি সত্যনিষ্ঠ হব এমন কথা দিতে পারি কিন্তু নিরপেক্ষ হব এমন শপথ করব কেমন করে?)

এ নিয়ে নানা তার্কিক বিষম তর্ক তুলেছেন। বেশি বাড়াবাড়ি করলে—যেমন কানা ছেলেকে স্নেহবশে মা পদ্মলোচন নাম দিলে—টুকতেই হয় অবশ্য কিন্তু পক্ষান্তরে পদ্মলোচনকে যাঁরা বেশি তারিফ করতে ভয় পান পাছে ক্রিটিকেরা ভ্রূকুটি করে—তাঁদের রায়কে কী নাম দেব? শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠি থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন :

"I do not believe in human judgments because I have always found them fallible—also because I have myself been so blackened by human judgments that I do not care to be guided by them with regard to others."

(মানুষের রায়ে আমার আস্থা নেই, কারণ আমি দেখেছি সে আদৌ অভ্রান্ত নয়—আর এজন্যেও বটে যে, আমার নামে লোকে এত কলঙ্ক রটিয়েছে যে, অপরের সম্বন্ধে তাদের মতামতে সায় দিতে আমার বাধে।)

তা বলে আমি এমন ইঙ্গিত করছি না যে, মানুষের কোনো কৃতিকেই কতকটা ঠিক চোখে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানেই কোনো সমালোচক কোনো প্রতিভাধরের সার্থক মূল্যায়ন করেছেন সেখানেই বলব—তিনি প্রেমের দৃষ্টি দিয়েই দেখেছেন প্রতিভার কৃতিকে যথা যখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন মিলটনের উদ্দেশে :

Milton! thou shouldst be living at this hour,
England has need of thee.

অথবা ম্যাথিউ আর্নল্ড লিখেছিলেন শেকসপীয়রের তর্পণে :

Others abide our question: thou art free.

তখন এ-দুজন মনীষী এমন অবিস্মরণীয় প্রশস্তি লিখেছিলেন—কৃতজ্ঞ পূজারীরই ছন্দে, নিরপেক্ষ ক্রিটিকের উচ্চারণে নয়। নিরপেক্ষ ক্রিটিকদের মূল্যায়নের কোনো দামই নেই এমন ইঙ্গিত করছি না কিন্তু সে-মূল্যায়ন প্রেমের প্রশস্তির পাশে দাঁড়াতে পারে না—স্মরণীয় হৃদয়াবেগ হয়ে। কারণ প্রেমই দেয় অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধি—বহির্দৃষ্টি।

এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখি : যে, আমি ইন্দিরা সম্বন্ধে যা লিখতে যাচ্ছি তার প্রেরণা আসে নি নিরপেক্ষ বুদ্ধি থেকে, এসেছে আনন্দ-উদ্বেল অন্তরের অন্তর্দৃষ্টি থেকেই।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে—আমার এক বুদ্ধিবাদী বন্ধু একদা আমাকে তিরস্কার করেন এই বলে যে, আমার মতন প্রবুদ্ধ সুধীও যদি হৃদয়াবেগের প্রেরণায় গুরুবাদী হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় শোকাবহ ব্যাপার, কেন না গুরুবাদের সমর্থন যে করে সে নিরপেক্ষ বুদ্ধি নয়—সে অন্ধ বিশ্বাস। তিনি আরো নানা যুক্তি জাঁকিয়ে আমাকে 'নিরস্তকুহক' করতে চেষ্টা করেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, এ-যুগ বুদ্ধির যুগ, বিজ্ঞানের টেকনলজির যুগ, এককথায়—ভবিষ্যৎমুখী সংস্কারপন্থী মনের যুগ—অতীতের পানে চেয়ে অশ্রুকণ্ঠী উচ্ছ্বাসের যুগ গত। দৃষ্টান্ত? একটিবার চোখ চেয়ে দেখই না—যাঁরা এ-যুগের দিক-পাল তাঁরা বুদ্ধিকে কর্ণধার করেই মহাকায় হয়েছেন অন্ধ বিশ্বাসের অনুগামী হয়ে নয়? এককথায়, বুদ্ধি হল খোলা হাওয়া, বিশ্বাস—অজ্ঞানভিত্তি—না জেনে মেনে নেওয়া ইত্যাদি।

শ্রীঅরবিন্দকে এ-চিঠিটি পাঠাতে তিনি আমাকে লেখেন এক দীর্ঘ পত্র :

Dilip,

But why on earth does your despairing friend want everybody to agree with him and follow his own preferred line of conduct or belief? That is the never-realised dream of the politician, or realised only by the violent compression of the human mind and life, which is the latest feat of the man of action. The "incarnate" Gods —Gurus and spiritual men of whom he so bitterly complains—are more modest in their hopes and are satisfied with a handful or, if you like, an Ashramful of disciples, and even these they don't ask for, but they come, they come. So are they not—these denounced "incarnates"—nearer to reason and wisdom than the political leaders?—unless of course one of them makes the mistake of founding a universal religion, but that is not our case. Moreover, he upbraids you for losing your reason in blind faith. But what is his own view of things except a reasoned faith? You believe according to your faith, which is quite natural, he believes according to his opinion, which is natural also, but no better, so far as the likelihood of getting at the true truth of things is in question. His opinion is according to his reason. So are the opinions of his political opponents according to their reason, yet they affirm the very opposite idea to his. How is reasoning to show which is right? The opposite parties can argue till they are blue in the face—they won't be anywhere nearer a decision. In the end he prevails who has the greater force or whom the trend of things favours. But who can look at the world as it is and say that the trend of things is always (or ever) according to right reason—whatever this thing called right reason may be? As a matter of fact there is no universal infallible reason which can decide and be the umpire between conflicting opinions there is only my reason, your reason, X's reason, Y's reason, multiplied up to the discordant innumerable. Each reason according to his view of things, his opinion that is, his mental constitution and mental preference. So what is the use of running down faith which after all gives something to hold on to amidst the contradictions of an enigmatic universe? If one can get at a knowledge that knows, it is another matter; but so long as we have only an ignorance that argues,—well, there is a place still left for faith,—even faith may be a glint from the knowledge that knows, however, far off, and meanwhile there is not the slightest doubt that it helps to get things done. There's a bit of reasoning for you!—just like all other reasoning too, convincing to the convinced, but not to the unconvincible, that is, to those who don't accept the ground upon which the reasoning dances. Logic, after all, is only a measured dance of the mind, nothing else

Sri Aurobindo

(ক্রমশঃ)

সতীশচন্দ্র প্রসঙ্গে

'অমৃত'-এর ৭ ফেব্রুয়ারী, ৩৯শ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের 'সতীশচন্দ্র প্রসঙ্গে' গবেষণামূলক তথ্য-চিত্রটি সময়োপযোগী। আচার্য সতীশচন্দ্রের সুদীর্ঘ ও সুমহান জীবন ও চরিত্র সবিস্তারে পর্যালোচনা করা—বিশেষ করে আজকের দিনে শিক্ষা ও শিক্ষণ বিভাগের কদর্য দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, খুবই সমীচীন। বিগত দিনের মনীষীদের চরিত্র-চিত্রণ ও তার মাধুর্য অনুধ্যানপূর্বক অনুশীলনমুখী আলোচনা অতীতের তুলনায় অধুনা অত্যধিক প্রয়োজনীয়।

পারিপার্শ্বিক দুর্বিসহ নির্যাতনে দৈনন্দিন পাপের বোঝা যতই বেড়ে চলেছে ততই এটাই নতুন করে আরও স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ব্যক্তি চরিত্রই সমষ্টিগত সমাজের মূল ভিত্তি। মানুষের মনুষ্যত্বের সত্যিকারের পরিচয় তার ব্যক্তিগত চরিত্র—যা তার নিজস্ব। আর একটি কথা ভারতের জনগণের অন্তর্নিহিত শাশ্বত ধর্মচেতনা যা স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ 'দি ল্যাংগুইজ অব দি রেইস ইজ রিলিজন'। এবং এই ধর্ম একই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে দ্বিবিধ ধারায় প্রবাহিত একটি সমষ্টিকল্যাণ, অপরটি অধ্যাত্মযোগ বা স্পিরিচুয়াল লিবারেশন। যাক—এখন মাননীয় দত্ত মহাশয়ের প্রবন্ধের দু-একটি ত্রুটির ইঙ্গিত মাত্র করে আমার এই সামান্য পত্র শেষ করবো। তিনি পরিষ্কার লিখেছেনঃ

(১) 'জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯০৬ খৃঃ সতীশ-চন্দ্র ডন সোসাইটি স্থাপন করেন।

দত্তমহাশয়ের এই বক্তব্য ঐতিহাসিক দিগ্‌দর্শন ও তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির তাৎপর্য-হতেও শুধু স্ববিরুদ্ধ নয়, বিভ্রান্তিকর যথা—

'সতীশবাবু যে-সময়ে ডন সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না শিক্ষাসম্পর্কীয় এই ন্যাশনাল মুভমেণ্ট-এরও তখন সূত্রপাত হয় নাই।'...

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৫-২-১৯০৬)

(ক) ডন সোসাইটি প্রকৃত প্রস্তাবে স্থাপিত হয় ১৯০২ সালের জুলাই মাসে ('মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন'-এর দুখানি ভাড়া নেওয়া গৃহাভ্যন্তরে) অর্থাৎ এই সোসাইটি স্থাপনের ৩ বৎসর ৮ মাস পরে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়;

(খ) সোসাইটির প্রথম সভাপতি হন উক্ত ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন 'ডন' পত্রিকার (১৮৯০—১৯১৩) সম্পাদক সতীশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫—১৯৪৮)।

২। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্যে (১৬ই নভেম্বর, ১৯০৫) মাত্র এক লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি দেননি সেই সঙ্গে পাঁচ লক্ষ টাকার স্থাবর সম্পত্তি দানেরও প্রস্তাব করেন—যার বাৎসরিক আয় ছিল তখনকার দিনে ২০,০০০ টাকা।

(ক) ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অপরাপর বহু বদান্য বঙ্গসন্তানও শত-সহস্র-লক্ষ লক্ষ টাকা জাতীয় শিক্ষার বাবত অকাতরে দান করেন।

(খ) বর্তমান 'যাদবপুর ইউনিভার্সিটি (১৯৫৬)'-ই এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ঐতিহ্যবাহী জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন।

ভবদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
আন্দুলমৌড়ী হাওড়া।

"মহিলা টেস্ট"

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্টের পর আরেকটি উত্তেজনাপূর্ণ টেস্ট সমাপ্ত হয়েছে। ম্যাচটি অবশ্য ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ। তিনদিন-ব্যাপী টেস্ট ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত থাকলেও খেলাটিতে শেষ বল পর্যন্ত প্রবল উত্তেজনা ছিল। মাত্র ১২ রানের জন্যে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেট দলকে হারাতে পারেনি।

তুলনামূলক বিচারে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দল অনেক বেশী অভিজ্ঞ, হয়ত বা কিছুটা শক্তিশালীও বলা যেতে পারে। এরা অনেকদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসরে নেমেছেন। কিন্তু আমাদের যাত্রা সবে শুরু হয়েছে। তবুও ইডেনের টেস্ট ম্যাচে ওঁদের পাশাপাশি আমাদেরও কয়েকজন কুশলী ও সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়কে চিনে নিতে অসুবিধা হয়নি।

খেলাটি যে আমাদের মেয়েরা বেশ রপ্ত করে ফেলেছেন তা মাঠের মধ্যে খেলোয়াড়দের হাঁটাচলা, ব্যাট ধরার ভঙ্গি বোলিং ফিল্ডিং দেখে বোঝা যায়। আবেদনের বহর, মাঠ সাজানো বিভিন্ন সময়ে শলা-পরামর্শ—এসব দেখে আমরা অনেকেই টেস্ট ম্যাচের (মহিলা নয়) মেজাজ ফিরে পাচ্ছিলাম কিন্তু ওঁদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আমাদের সচেতন করে তোলে, আমরা আবার মহিলা ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের আসরে আছি বলে বুঝতে পারি।

বাংলার শ্রীরূপা বসু এই টেস্টে নতুন অধিনেত্রী হয়ে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন বলা যায়। শ্রীরূপা বসু টসে জিতেও প্রতিপক্ষ দলকে ব্যাট করার আহ্বান জানান। ধারণা সম্ভবত এই ছিল যে সকালের দিকে ইডেনের উইকেট পেস বোলারের সহায়ক হয় এবং সেক্ষেত্রে ধুণা বসুর বল বিশেষভাবে কার্যকরী হবে। বস্তুত সে-ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি রুণাকে দিয়ে ৩৮ ওভার বল করিয়েছেন পেস-বোলার হিসেবে ৩৮ ওভার বল কম মোটেই তুচ্ছ ব্যাপার নয় রুণা অবশ্য বল মন্দ করেননি, তবে শান্তার বল কার্যকর হয়নি।

অনেকেই ভাল বল করেছেন—তার মধ্যে ডায়না এডুলজি বেশ মাথা খাটিয়ে বল দিয়েছেন। ডায়নার খেলায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে। তিনি স্পিন বল করেন এবং মাঝে মাঝে ফ্লাইটের রকমফের ঘটান যা বেশ সমীহ আদায়কারী। বল ছাড়া, তিনি ব্যাটও করতে পারেন এবং তিনি একজন দক্ষ ফিল্ডার। তিনি চলতে চলতে বল তুলে নিতে পারেন এবং একবারে বল অভ্রান্ত নিশানায় ছুঁড়তে পারেন যাকে ইংরাজীতে running pick up and throw in one action বলে তাই।

চলতে চলতে বল ধরা ও ছোঁড়ার অপূর্ব নিদর্শন পেয়েছি পরের এক খেলায় রীজেশ প্যাটেলের কাছে। ডায়না যদিও অত উচ্চ পর্যায়ে উঠতে পারেননি—তবুও তাঁর মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে সে-কথা বললে বোধহয় অতিরঞ্জিত হবে না। এপ্রসঙ্গে আমাদের দলের একটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ্য—তা হচ্ছে হাতের জোর খুবই কম। বাউণ্ডারীর সীমানা থেকে একটিপে বল ফেরত পাঠাবার মত খেলোয়াড় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে বেশী ছিলেন না। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে দলীয় ফিল্ডিং ভালই হয়েছে। শ্রীরূপা বসুর মাঠ সাজানো প্রশংসার দাবী করে। অন্তিম লগ্নে অস্ট্রেলিয়া দল রীতিমত উন্নত মানের ফিল্ডিং দেখিয়েছেন। ম্যাচ যখন প্রায় হাতছাড়া হবার উপক্রম, তখন উন্নত মানের ফিল্ডিং দিয়ে তাঁরা ম্যাচ আয়ত্তের মধ্যে রাখেন।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাট বলতে প্রথমেই আসে লিনেট স্মিথের কথা। লিনেট জাত-খেলোয়াড় শত বান থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মারের হাত যে বেশ চোস্ত তা ৬১ রানের ইনিংস থেকে সহজেই বোঝা যায়। তবে গার্লিককেও প্রশংসা করতে হয়। কেবলমাত্র শত রানের

জন্যই নয় তাঁর পরিপাটি মেজাজটিও মনে রাখার মত। দলের সূচনা করতে এসেছিলেন, শেষ অবধি অপরাজিত থেকে যান। এই ক্যাথলিন গাবলিক বিধি অনুযায়ী খেলেন। রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক দু-ভাবেই খেলতে তিনি অভ্যস্ত। লিনেট ও গারলিকের খেলার মধ্যে পার্থক্য আছে অনেক। লিনেট ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেন না। অর্থাৎ ক্রিকেটের পরিভাষায় তাঁর ফুট-ওয়ার্ক ভাল এবং উইকেটের চারদিকে মার মারেন। আর গারলিক প্রধানত লেগের দিকে মার মারতেই চোস্ত। সামনের পায়ে ভর দিয়ে যে তিনি ড্রাইভ মারেন না তা নয়, তবে লেগের পুল মারবার প্রবণতা বেশী। ব্যাটিং-এ অস্ট্রেলিয়া ঐ দুজনই চোখে পড়ার মত। বোলিং-এ দু-দিক থেকে সুইং করাতে পারেন এমন খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু ইডেনের কি তাঁদের চোখে পড়েছে ?

অপরদিকে আমাদের ওপেনিং ব্যাটসম্যান শোভা পন্ডিত ও ফৌজি খালিলি মোটামুটি আস্থার সাথে ব্যাট করেছেন। দুজনের মধ্যে শোভা পন্ডিতের ব্যাটিং আনন্দদায়ক।

শোভা পন্ডিতের বড় গুণ হচ্ছে ইনিংসের শুরুতেই অফ স্টাম্পের বাইরের বল মারবার চেষ্টা করেন না। খালিলির এ ইচ্ছাটা আছে, তাই তিনি একবার আউটের সুযোগও দিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে অবশ্য ফিল্ডিংয়ের ক্যাচটি ধরে রাখতে পারেন নি। শোভা পন্ডিতের ব্যাক ফুটের মার ও কুশার ড্রাইভ ভাল। আর ভাল ব্যাট করেছেন শান্তা রঙ্গস্বামী। তিনি বলে সুবিধা করতে পারেন নি। ব্যাটে বিচক্ষণতার পরিচয় রেখেছেন। তিন নম্বর বা চার নম্বর হিসাবে খেলতে হলে যা সাধারণত থাকা দরকার শান্তা রঙ্গস্বামী তা আছে। এ ক্ষেত্রে আরেকটি ত্রুটি হয়ত অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে তা হ'ল running between the wicket

অস্ট্রেলিয়ানরা উইকেটের মাঝে দৌড়ান ভাল, তাই রান চুরি করতে বা শর্ট রান নিতে বা বাউন্ডারী না হলেও তিন রান করতে অসুবিধা হয়নি। আমাদের খেলোয়াড়রা অনেকেই সে ধরনের রান নিতে পারেনি। শান্তা ও ডায়না ছোটেন ভাল, তা অসম্ভব রান নিতে গিয়ে নিজেদের বি

ডেকে এনেছেন। শান্তা রঙ্গস্বামী ও শিরিন কিয়াস দুজনেই জোরে মেরে খেলতে অভ্যস্ত। শান্তা রঙ্গস্বামীর মারে জোর আছে ও প্রকরণগত মারে সিদ্ধহস্ত। আর শিরিন কিয়াসের মারেও জোর আছে, রানও আসে খুব তাড়াতাড়ি এবং দর্শকদের আনন্দও দেয় তা প্রচুর; তবুও তা প্রকরণগত নয়।

পরিশেষে বলা চলে, ইডেনে ২২ ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল যা খেলেছে তা ভবিষ্যত ইঙ্গিতবহ।

অসিতকুমার কাঞ্জিলাল
বরাহনগর
কলিকাতা-৫০

সেইসব মানুষ ও অমৃত প্রসঙ্গে

আপনার পরিচালিত 'অমৃত' পত্রিকা সত্যই একখানি সুন্দর পত্রিকা যা পড়ে খুবই তৃপ্তি পাওয়া যায়। গল্পগুলিও ভালো। আর বাড়ীর ছোট বড় সবাই পড়তে পারে। অমৃত নামেও যা কাজেও তা। এর মিষ্টিমধুর উপন্যাস 'সেই সব মানুষ' (মনোজ বসুর লেখা) পড়ে মনে হয় যেন বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া গ্রামবাংলাকে ফিরে পেলাম। ফিরে পেলাম নিজের ছোটবেলার পালপার্বণের স্মৃতি, আত্মীয়স্বজনের স্পর্শ। এ যে কি মিষ্টি লেখা তা লিখে বোঝানো যায় না আমাদের মত দু' একজন বয়স্ক লোকই এই গল্পর মর্ম বুঝবেন। ড্রইংরুমে সাজানো আধুনিক ছেলেমেয়েদের ও তাদের পরিবেশের গল্প যেমন বিরক্তকর তেমনি একঘেয়ে। এ ছাড়া রয়েছে একটি লেখা, যাতে সেকালের জ্ঞানীগুণী সংগীতকারদের পরিচয় পড়ে পড়ে যেন আশ মেটে না। আর অরবিন্দ স্মরণে, সেত ভালই হবে।

আমি মনোজবাবুর ঠিকানা জানি না। আপনাদের পত্রিকা মারফৎ তাঁকে তাঁর লেখার জন্য আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালাম।

আপনার সম্পাদিত পরিচ্ছন্ন অমৃত নিরবিচ্ছিন্ন উন্নতি কামনা করি।

ইন্দ্রাণী দেবী
কলিকাতা—৯।

রবীন্দ্রসংগীতে স্রষ্টা বনাম শিল্পী

১৪ মার্চ অমৃতএ প্রকাশিত দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদারের 'রবীন্দ্রসংগীতে স্রষ্টা বনাম শিল্পী শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ সময়োপযোগী কিছু কথা বলার জন্য, যার মূল্যায়ন ও ফচার যে কোন অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শ্রোতাদের কাছে অপরিসীম। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর স্বাধীনতার কথা একান্তই অযৌক্তিক। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে যেভাবে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের হট্টগোল শুরু হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। বিভিন্ন সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে সুরে ও উচ্চারণে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয়, তাকে কোনমতেই উক্ত সংগীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না। অনেক সময় অবাক হয়ে গেছি যখন রবীন্দ্রসংগীতে ইচ্ছেমতো সুরসংযোজন করে পরিবেশন করতে শুনেছি। শোনার পর সেটা ঠিক কি সংগীত গাওয়া হলো চিনে নেওয়া শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এই অবস্থায় রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই শঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। রবীন্দ্রসংগীত একমাত্র সেই গায়কেরই গাওয়া উচিত, যাঁর রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান ও অনুশীলন রয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গান শুধু গানই নয়, সাহিত্য উপাদানের সমন্বয়ে সুমন্ডিত মঞ্জুষাও বটে। অনেক বাড়ী দেখেছি যাঁরা ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্রসংগীত শেখান অথচ যে সংগীতটি শেখাচ্ছেন তার অর্থ যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেন না। এতে গানের মধ্যে স্রষ্টার যে রসবোধ অন্তর্নিহিত রয়েছে, তার মর্মার্থ গায়কের কাছে অপরিচিতই থেকে যায়। এমন অনেক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনকারীদের দেখেছি যারা রবীন্দ্রসংগীত গান, কিন্তু কি দৃষ্টিভঙ্গীতে গানটি লেখা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন খবরই রাখেন না। আমার তো মনে হয় রবীন্দ্রসংগীতের উপর শিল্পীদের যে অত্যধিক স্বাধীনতা রয়েছে তার গতি কিছুটা শ্লথ করা প্রয়োজন।

বিমলকান্তি ভট্টাচার্য,
আদরা, পুরুলিয়া।

খেলার জগতে মেয়ে

আপনার প্রচারিত ২১ মার্চ ১৯৭৫ তারিখে পত্রিকায় খেলার জগতে মেয়ে লেখাটি পড়লাম। এতে কতকগুলি তথ্য ছাপা হয়েছে যা ভুল। মেয়েদের ১৬ বৎসরে একমাত্র শ্যামশ্রী ঘোষই জোরে প্রথম হয়। Voulting এও হবার পর শ্যামশ্রীই তৃতীয় হয়।

শবরী চৌধুরী জাতীয় প্রতিযোগিতার কোন বিষয়েই প্রথম হয় নি।

শোভা চক্রবর্তী ত্রিপুরায় মেয়েদের দলের ম্যানেজার হয়ে যান নি। মেয়ে দলের ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিলেন শাম্পলী ঘোষ

স্বপনকুমার দাস
হাওড়া।

বাংলা ছবির নায়ক সংবাদ প্রসঙ্গে

বাংলা ছবির নায়ক সংকট প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বহু পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার তথ্যবহুল নানা আলোচনা ও আবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চলচ্চিত্র কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য সকলকেই ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমার কিছু ব্যক্তিগত মতামত 'অমৃতে'র মাধ্যমে চিত্র-পরিচালকগোষ্ঠীর সম্মুখে পেশ করে বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা একটা যুগ কাটিয়ে এলাম। এক নবতরঙ্গের ঢেউ-এর মোক্ষমোচনের ইতিকথা কিন্তু এখনও সেই হাহাকার—নায়ক নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য পনেরোটা বছর ধরে আমরা একটা সিনেমাটিক হিরোকে খুঁজে পাইনি। আজও খুঁজে বেড়াই। এ দুঃখ শুধু সমস্ত পরিচালকদেরই নয়—দর্শক-দেরও। হিরো বলতে এখনও সেই মহানায়ক উত্তমকুমার। এর একমাত্র কারণ হিরোর অভাব হিরোর হাহাকার। কলকাতার স্টুডিওর শতকরা আশী ভাগ ছবিই চলে যায় উত্তমকুমারের হাতে। উত্তমকুমারের বয়স হয়েছে; গলার স্বর ভারী হয়েছে, 'গ্ল্যামার হিরো' রূপে ওঁকে আর কতদিন মানাবে? কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাহলে প্রযোজকরা উত্তমকুমারের বদলে কাকে নেবেন?

বর্তমানে যাঁরা নায়িকা আছেন তাঁরা কাজের পক্ষে যথেষ্ট। আর যাঁরা আসছেন —সুমিত্রা মুখার্জি মিঠু মুখার্জি রাজশ্রী বসু জয়শ্রী রায়, সোমা দে প্রভৃতি এঁরা দক্ষ শিল্পী হবার সম্ভাবনা নিয়েই এসেছেন। কিন্তু নায়কের অভাব সত্যিই আছে। উত্তমকুমারের পর বাংলা ফিল্মে আর নায়ক কোথায়? এক আছেন সৌমিত্র। কিন্তু তার পর যাঁরা, অর্থাৎ শুভেন্দু, বিশ্বজিৎ, সমিত, ধৃতিমান, রঞ্জিৎ মল্লিক প্রমুখ রয়েছেন, কিন্তু বকস-অফিস তথা পাব্লিকের মানদণ্ডে আজও ওদের প্রত্যেকের স্থান উত্তমকুমারের চাইতে অনেক নীচে। অথচ আমি বিশ্বাস করি ওঁদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু যোগ্যতা রয়েছে। অতএব এই মুহূর্তে প্রতিষ্ঠিত পরিচালক-দের প্রতিভাবান নতুন নায়ক সৃষ্টি করার প্রয়োজন নয় কি?

মাঝে একটা সময় এসেছিলো যখন উত্তমকুমারের তথাকথিত রোমান্টিক চরিত্রের চরিত্রের বাজারে মন্দা দেখা দিলো। কিন্তু সেই শূন্যতা পূর্ণ করার মতো আজ পর্যন্ত কেউই আসতে পারলেন না। অথচ মজার ব্যাপার উত্তম এতোই শক্তিমান অভিনেতা যে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার ব্যাপারে তিন চারটে ছবির ব্যর্থতা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারেনি। আবার তিনি ফিরে গেছেন পুরানো প্যাভিলিয়নে।

প্রযোজকরা টাকা খাটান, টাকা দিয়ে টাকা তোলেন আর তাঁদের পেছনে রয়েছেন ডিস্ট্রিবিউটার এবং লগ্নীকারীদের দল। আসল রহস্যটাই হচ্ছে উত্তমকুমারকে নিয়ে ছবি করলে লগ্নীকারীরা চোখ বুজে টাকা দিতে কসুর করেন না, আর ডিস্ট্রিবিউশনও সহজেই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রযোজকদের এগিয়ে আসতে বাধা কোথায়? সোনার কাঠি রূপার কাঠির ছোঁয়ায় যেমন দৈত্যপুরীর রাজকন্যার ঘুম ভাঙে তেমনি আধমরা কলকাতার স্টুডিও জেগে ওঠে উত্তম-কুমারের যাদুস্পর্শে।

আমার প্রশ্ন উত্তমকুমারকে নিয়ে নয় বা উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তাকে ঘিরে নয়। আমার প্রশ্ন, উত্তমকুমারের পর বাংলা ছবির হাল কি হবে? উত্তমকুমারের পর 'গ্ল্যামার হিরো'র আসন দখল কে করবেন? এর উত্তরের পঁচাত্তর ভাগ রয়েছে পরি-চালকদের হাতে আর পঁচিশ ভাগ রয়েছে আমাদের (অর্থাৎ দর্শকদের) চোখে।

তাই পরিশেষে আমার বক্তব্যের ভিত্তিতে পরিচালকদের ব্যক্তিগত মতামত 'অমৃতে' আশা করছি।

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক : অন্তরঙ্গ,
পোঃ বেগাই (হুগলী)।

সংস্কৃতি কার?

অমৃতের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং পাঠকদের অজস্র প্রশংসা সত্ত্বেও আমি একজন অনুরাগী ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তৃপ্ত হতে পারি না—এই অতৃপ্তি হয়ত প্রত্যাশার চূড়া নির্দেশ করে। স্বীকার করতে বাধা নেই, বিগত কয়েক মাস অমৃত নতুন নতুন ফীচার এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় রচনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে, মুদ্রণ পারিপাট্য এবং তার বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেও সমান দৃষ্টিবান; তবু প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিকের কর্তব্য আরো গুরুভার, দৃষ্টি প্রবলতর হওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে যুবক-যুবতী ইত্যাদি ফীচারগুলি নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় এবং তা বর্তমান ধ্যান ধারণা প্রচারে সহায়ক, তবু সাক্ষাৎকারে মনোযোগী না হলে একই বিষয়বস্তু বিপরীত ফল আনতে পারে—সিনেমা সম্বন্ধে মতামত এবং ক্লাব লিব আন্দোলন, নাটক ইত্যাদি বিষয় সাক্ষাৎকারে এমন যুবক-যুবতী বেশী সংখ্যায় দেখি, যাঁরা প্রত্যেক বিষয়েরই গভীরে যেতে অপারগ—তাঁরা নাটক সম্বন্ধে বলতে গিয়েই নগ্নতার প্রসঙ্গ আনেন; তাঁরা কি ধরনের নাটকে অভ্যস্ত জানি না, তবে মনে হয় নগ্নতা পুরোপুরি বাদ দিয়ে বেশ কিছুকাল ধরে যে নাটক নিয়ে বিপ্লব হচ্ছে, তাতে তাঁরা আগ্রহী নন, অনেক সংস্থা সেই পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে একাগ্রতা এবং অধ্যবসায়ের তুঙ্গে উঠে নাটককে কাব্যের সঙ্গে লীন করেছেন, যা আমাদের গর্বিত করে, তাছাড়াও নতুন অনেক সংস্থা এগিয়ে এসেছেন 'নতুন বোতলে নতুন মদ' নিয়ে, যা ভাবায়, অনুভবী করে। সেসবের কোনো কথা না বলে তাঁরা নগ্নতা সম্বন্ধেই মুখর। লিব আন্দোলন ও অনেকাংশেই যথেচ্ছাচার কথার স্বাধীনতা ভিক্ষার করুণ অথচ হাস্যকর আর্তনাদ।

বক্তব্য, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক দেশের মানুষ, যারা নিজেদের নিজেরাই পরিচালিত করবে, কোনো ব্যবসায়ীর হাতের ক্রীড়নক হয়ে সেই স্রোতে কেন ভাসবে? বাঙালীর সংস্কৃতির ঐতিহ্য পুরাতন ও গৌরবময়, তা রক্ষা করতে হবে নিজেদেরই, তাই নগ্ন কঙ্কাল মানসিকতা থেকে যেতাই পেতে সমস্ত প্রলোভন, বিকৃত রুচিকে উপেক্ষা করতে হবে, তাদের আন্তরিকভাবে বর্জন করতে হবে, তবেই তা যথেষ্ট শান্তি হবে এবং তা-ই পথ সুগম করবে।

পরিশেষে অনুরোধ করব, সম্পাদক তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে বিকৃতিগত ছবি এবং ধ্যান-ধারণা পরিহার করে পাঠকদের আহ্বান জানাবেন এক সুন্দর সুস্থ সকালের।

সাধন দত্ত,
দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।

আপনার পরিবারের সকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্যে
হাওড়া সমবায়িকা

পঙ্খের কাজ

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাটা পঙ্ক না পঙ্খ সেবিষয়ে মতানৈক্য থাকা সম্ভব। আমরা ছেলেবেলা থেকে পঙ্খ শব্দটির ব্যবহারই শুনে এসেছি কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত এক-আধটি লেখায় দেখলাম পঙ্ক কথাটি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। রাজশেখর বসু মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়ে দেখি তিনি তাঁর চলন্তিকায় (পঞ্চম সংস্করণ : ৩১৭) পঙ্ক কথাটির প্রধান অর্থ দেখিয়েছেন—পাঁক কর্দম। কিন্তু একই মূল সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভূত বাংলা শব্দ ও তার টীকা করেছেন—) পঙ্খ ঘরের মেঝে বা দেওয়ালের উপর চুনের মসৃণ লেপ (পঙ্খের কাজ)। বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহৃত পঙ্ক কথাটি মুদ্রণ প্রমাদ বলে মনে হয় তা না হলে পূর্বগামী পঙ্খ ও তার ব্যাখ্যার সঙ্গে সংগতি থাকে না। অতএব চুনের মসৃণ লেপ বিশদভাবে বোঝাতে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা পঙ্খ বা পঙ্খের কাজ কথাগুলিই ব্যবহার করব।

আজকালকার ধনীগৃহের দেওয়ালে যে রকম ডিসটেমপার দেখা যায় উনিশ শতক এমন কি বিশ শতকের প্রথম দিকেও বঙ্গদেশের বিত্তশালী লোকেরা তাঁদের ভদ্রাসনের সব কক্ষের না হোক অন্তত বৈঠকখানা জলসাঘর ও ঠাকুরদালানের দেওয়াল ও থাম প্রভৃতির গায়ে চুন-বালির কাজের উপরে এই পঙ্খের প্রলেপ লাগিয়ে নিতেন। উপমা দিয়ে বোঝাতে গেলে বলতে হয় তৈজসপত্রের ক্ষেত্রে জেমন লোহা (বা অন্য ধাতুর) উপরে এনামেল ধরানো হয় দীর্ঘস্থায়িত্ব ও সৌন্দর্যের জন্য চুনকামকরা সাধারণ চুনবালির দেওয়ালের উপরেও সেরকম পঙ্খের আবরণ লাগানো হত একই উদ্দেশ্যে। আধুনিক ডিসটেমপার-এর থেকে পঙ্খের আচ্ছাদনের অতিরিক্ত সুবিধা ছিল এই যে তা অনেক বেশি টেকসই হত এবং মিঠা-ভেজানো জলে সিক্ত ন্যাকড়া ঘষে তা প্রয়োজনমত বারংবার পরিষ্কার করে নেওয়া যেত যা সব শ্রেণীর ডিসটেমপার-এর ক্ষেত্রে করা যায় না। তাছাড়া এই প্রলেপ ব্যবহারের জন্য কিছু বেশি খরচ পড়লেও খুব বেশি পড়ত না। এত সুবিধাজনক একটা আস্তরন হাতে পেয়ে সেকালের ধনীরা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদির অলংকরণেও পঙ্খের যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। সে বিষয়ে পরে বলছি। প্রথমে শিল্পীরা কিভাবে এ কারুকর্মটি করতেন সেকথা বলে নিই।

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও এ শিল্পটি কিছুটা চলিত ছিল সেকথা আগেই বলেছি। সে সময়ে যেসব দক্ষ রাজমিস্ত্রী এ কাজ ভালভাবে জানতেন তাঁদের কেউই আজ জীবিত নেই। তবে তাঁদের সঙ্গে 'ছোকরা যোগানদার' হিসেবে কাজ করেছিলেন (এবং পার পঙ্খের কাজ নিজেও কিছু কিছু করেছেন) এহেন কারিগরের আমরা সন্ধান পেয়েছিলাম। তাঁকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ-শিল্পের প্রযুক্তিবিদ্যার দিকটা ভালভাবেই জানবার সুবিধা হয়েছিল।

এই কারুকর্মে কোন দুর্লভ বা দুর্মূল্য উপকরণের দরকার হত না তবে শিল্পীর নৈপুণ্য ও নিয়োগকারীর ধৈর্যের যথেষ্ট প্রয়োজন হত। কেননা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে হলে এ-কাজে সময় লাগত প্রচুর। পঙ্খের কাজের জন্য যে বিশেষ রকমের চুনের ব্যবহার হত তা পাওয়া যেত জোংড়া নামক শাঁক বা শামুক জাতীয় জলজ প্রাণীর আবরণ বা খোলা পুড়িয়ে। শাঁখ বড় একটা পাওয়া যেত না সেজন্য শামুকের খোলাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। জোংড়া শামুক দেখতে অনেকটা পেঁচানো ক্রীমরোল বা কুলপি-বরফের মতো ও তিন-চার ইঞ্চি লম্বা। রং একেবারে সাদা নয় একটু বাদামী। এই উপকরণ থেকে ব্যবহারযোগ্য পঙ্খের প্রলেপ তৈরী করা বিশেষ দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও শ্রমসাপেক্ষ ছিল। চুনারী বা চুন প্রস্তুতকারীদের সামান্য ভুলেও তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যেতে পারত।

প্রথমে বড় বড় উনুনে দু-তিন মন জোংড়া শামুকের খোলা এক সঙ্গে পোড়ানো হত। আগুন নিভে গেলে দেখা যেত শামুকের খোলাগুলি কয়েকটি চাপড়া বা ঢেলায় পরিণত হয়েছে। ছাই ঝেড়ে ফেলে সেগুলিকে তারপর গুঁড়ো করা হত। তখন তার নাম হত জোংড়া বাখারি। এই বাখারি বড় বড় মাটির গামলা বা চৌবাচ্চার মধ্যে পরিমাণমত জল ঢেলে দিলে তা গরম হয়ে ফুটতে ফুটতে শেষে থকথকে কাদার মতো এক মণ্ডে পরিণত হত। এই মণ্ড পচাবার জন্য পাত্রগুলিতেই রেখে দেওয়া হত তিন-চার দিন। এ পদ্ধতির নাম ছিল খামি করা'। তারপর সেই পচানো চুনের কাথকে খুব ভালভাবে কাপড়ে ছেঁকে বড় বড় বস্তায় পুরে শুকনো বালির গাদার উপর রেখে দেওয়া হত পাশাপাশি। মণ্ডের জল বালিতে কিছুটা শুষে নিত কিন্তু চুনের কাথকে একেবারে শুষ্ক হতে দেওয়া হত না। তারপর বস্তা থেকে আধ শুকনো চুন বার করে ছোট ছোট গামলায় রেখে তার সঙ্গে পরিমাণ মত ডিমের সাদা অংশ ভেলী গুড় দই বা ছানা এবং সাদা খয়েরের গুঁড়ো

শঙ্খ, গদা ও অসিধারী (চতুর্থ বাহুটি ভগ্ন) অভিনব নারায়ণ মূর্তি।

মিশিয়ে কাঠের তাড়ু (খুন্তি) দিয়ে নেড়ে-চেড়ে বারবার ফেটানো হত। যখন চুনের মণ্ড বেশ আঠা-আঠা হয়ে আসত তখন মনে করা হত পঙ্খের কাজের জন্য উপযুক্ত প্রলেপ তৈরী হয়েছে।

অতঃপর ঘরের দেওয়ালের চুনবালির পলস্তারার উপর এই প্রলেপ লাগানো হত কিন্তু সে পলস্তারা একেবারে নিখুঁতভাবে সমতল না হলে পঙ্খের কাজ উচ্চ শ্রেণীর হত না। সেজন্য যদিও সাধারণ দেওয়ালে বালির-কাজ মোটামুটি মসৃণ করে ছেড়ে দেওয়া হয় পঙ্খের কাজের বেলায় তাকে কিন্তু আরও অনেক বেশী চৌরস করতে হত বারবার পাটা ঘষে। তারপর সেই সুসমতল জমির উপর উশো দিয়ে পঙ্খের প্রলেপ প্রয়োজনবোধে লাগানো হত একাধিকবার। খুব সাবধানতার সঙ্গে কর্ণিক দিয়ে ঘষে সে প্রলেপ মোটামুটি সমতল করে নেওয়া হত। তারপরে উশো দিয়ে আরও মাজা হত। সাবধানতার প্রয়োজন হত এই জন্য যে এ পর্যায়ে কর্ণিক বা উশোর ব্যবহার একটুও অতিরিক্ত হয়ে গেলে জমির রং পরে কালচে হয়ে যাবার আশংকা থাকত। এরপর আরম্ভ হত সবচেয়ে দক্ষতাসাপেক্ষ পর্ব যখন খুব মসৃণ শ্বেত পাথরের খণ্ড বা শাঁখ দিয়ে জমিকে অনবরত মাজতে হত যতক্ষণ না তাতে বেশ জেল্লা ফুটে ওঠে। অল্প পরিসর স্থানে বা উঁচুনীচু কারুকার্যের উপর যেখানে শ্বেতপাথর বা শাঁখ ব্যবহারে অসুবিধা সেখানে বিকল্পে কড়ি দিয়ে মেজে প্রয়োজনীয় ঔজ্জ্বল্য আনা হত। বলা বাহুল্য তাতে সময় ও নৈপুণ্য দুই-ই লাগত বেশ বেশি পরিমাণে।

পঙ্খের কাজ শুধু বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করত না, লোনা ধরা বা আর্দ্রতার অনুপ্রবেশও প্রতিরোধ করত। এটা সম্ভব হত মুখ্যত জোংড়া-চুনের গুণে। সেজন্য আরও পঙ্খের কাজের খরচ বা ঝঞ্ঝাট যাঁরা পোহাতে চান না, তাঁরা দেওয়ালে শুধু চুনকাম করাবার সময় সাধারণ জোংড়া

চুনই ব্যবহার করে থাকেন। অথচ পঙ্খের কাজ কিছু ব্যয়সাধ্য হলেও খুব বেশি ব্যয়-সাধ্য ছিল না। তবু, বঙ্গদেশে এ শিল্প-কৃতিটির পুনরাবির্ভাব আর ঘটবে বলে মনে হয় না। কেননা শিল্পীরাই বেশ কয়েক দশক হল নিশ্চিহ্ন হয়েছেন। তা ছাড়া আজকের ধনীরা গৃহসজ্জার ব্যাপারে গত শতকের ধনীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। একদিকে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অন্যদিকে কারুবিদ্‌দের অনুপস্থিতির জন্য এই অনুপম গৃহ-শিল্পটি দেওয়ালগিরি বেলোয়াড়ী ঝাড়লণ্ঠন টানা-পাখা পালকি ময়ূরপঙ্খী নৌকারা যে-পথে অদৃশ্য হয়েছে, সে পথেই গিয়েছে বলা যায়। অতএব এই বিশেষ কারুকৃতিটির জন্য আজ পৃথকভাবে শোক করবার কোন অর্থ হয় না।

এতক্ষণ অবধি যা লিখেছি তাতে অনেকের হয়ত ধারণা হতে পারে যে কেবল ঘরের দেওয়ালের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্যই পঙ্খের কাজের প্রয়োগ হত। বৈঠকখানা জলসাঘর ঠাকুর-দালানের দেওয়াল প্রভৃতির ক্ষেত্রে একথা হয়ত সত্য। কিন্তু ঠাকুর-দালানের থামগুলির শীর্ষে প্রায়শই যেসব লতাপাতার অলংকরণ থাকত, তাতে পঙ্খের পালিশ লাগানোর জন্য কারিগরদের যে কিছু ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে সেকথা সংক্ষেপে আগেই বলেছি। কিছু কিছু শিল্পী যখন এ নৈপুণ্য অর্জন করলেন, তখন পৃষ্ঠপোষকদের কেউ কেউ শুধু স্তম্ভশীর্ষের অলংকরণ ছাড়াও ঠাকুর-দালানের দেওয়ালেও পঙ্খের উপকরণে ফুল-লতাপাতা বা জ্যামিতিক নকশারও বাহানা করতে লাগলেন। এ জাতীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ হতে যেহেতু বহু অর্থের প্রয়োজন, সেজন্য শুধু ধনীদের ক্ষেত্রেই এহেন অভি-লাষ কার্যে পরিণত হয়েছে। সেকালের বেশী বিত্তশালী জমিদার প্রভৃতিদের ঠাকুর-দালানে এহেন অলংকরণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু তাদের তালিকা পেশ না করেই অসঙ্কোচে একথা বলা যায় যে নদীয়া জেলার সদর শহরে কৃষ্ণনগররাজের ঠাকুর দালানটি পঙ্খের নকাশি-কাজের প্রাচুর্যে ও মনো-হারিত্বে পশ্চিমবাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ। পঙ্খের প্রলেপ সাধারণত ধবধবে সাদা হয়, পরে কালক্রমে তা হাতির দাঁতের মতো ঈষৎ হলদেটে হয়ে আসে। এখানে (কৃষ্ণনগরে) কিন্তু ঠাকুর-দালানের সজ্জা আগাগোড়া সাদা না রেখে খুব ফিকে গোলাপী রঙেরও ব্যবহার করে বর্ণাঢ্যতরের সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে দুরকম রংয়ের সহযোগে শিল্পীরা (তাঁরা যে খুবই দক্ষ ছিলেন তাতে সন্দেহ-মাত্র নেই) মনের সাধে তাঁদের রচিত অলং-করণগুলিকে চিত্তাকর্ষক করতে পেরেছেন। যেসব ভ্রমণকারী কৃষ্ণনগরে গিয়ে কেবল ঘূর্ণী পল্লীর মাটির পুতুল দেখে ফিরে আসেন, তাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন এ ঠাকুর-দালানটি অবশ্যই দেখেন। তাহলে গৃহ অলংকরণে পঙ্খের কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন (যা এখনও নষ্ট তো হয়ই নি, বরং রীতিমত সুরক্ষিত আছে) দেখা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন না। অবশ্য ঠাকুর-দালানটি প্রাকারবেষ্টিত রাজ-প্রাসাদের ভিতরে অবস্থিত বলে অনুমতির প্রয়োজন হয়। প্রবেশের সে-অধিকার পেতে খুব কাঠখড় পোড়াতে হবে না বলেই শুনেছি। আর কিছু উৎকৃষ্ট পঙ্খের অলংকরণ (সবই সাদা) একদা দেখেছিলাম মানকরের (বর্ধমান জেলা) প্রধান জমিদারের ভদ্রাসনে। ২৪ পরগণার জয়নগর মজিলপুরে (সেখানে একদা অনেক জমিদারের বাস ছিল) কিছু কিছু নমুনা এখনও দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু এহেন ব্যয়সাপেক্ষ গৃহসজ্জা কেবল ধনীদেরই পোষাত এবং গত শতকে জমিদাররাই ছিলেন প্রধান ধনী সম্প্রদায় সেজন্য যেখানেই তাঁরা অধিক সংখ্যায় বাস করতেন সেখানেই অদ্যাবধি কিছু-না-কিছু পঙ্খের কাজের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

এ তো গেল গৃহসজ্জার দিক। ভদ্রা-সনের ভিতরে ঠাকুর-দালান বা অন্যত্র, প্রধানত ফুল-লতা-পাতা বা জ্যামিতিক অলংকরণে হাত কিছুটা পাকলে, শিল্পীরা তাঁদের নৈপুণ্য প্রকাশের জন্য আরও বিস্তৃততর ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগলেন। কিছু কিছু পৃষ্ঠপোষকও এগিয়ে এলেন তাঁদের সহায়তায়। আরম্ভ হল মন্দির-অলংকরণে পঙ্খের ব্যবহার।

মন্দির-'টেরাকোটা' কথাটা এখন অনেকের কাছেই খুব পরিচিত শব্দ। কেউ কেউ আবার 'টেরাকোটা' বলতে কেবলমাত্র পোড়ামাটির মন্দিরসজ্জাকেই বোঝেন (এবং লেখেন)। তাঁদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে 'টেরাকোটা'—এই ইতালীয় শব্দটি ইংরেজী ভাষায় গৃহীত হয়েছে এবং এর অর্থ পোড়ামাটি বা তার তৈরী যে-কোন জিনিস, তা সে মন্দির-অলংকরণই হোক বা হাঁড়িকুড়ি অথবা অন্য তৈজস-পত্রই হোক। অসংকোচে বলতে গেলে, সাধারণ ইটও তো একরকম 'টেরাকোটা'-সামগ্রী, কেননা তা পোড়ানো মাটি দিয়ে তৈরী। প্রাচীন ঢিবি প্রভৃতি খুঁড়ে রাশি রাশি পোড়ামাটির গার্হস্থ্য-সামগ্রী পাওয়া গেছে যা যে-কোন মিউজিয়মে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিও 'টেরাকোটা'-বস্তু। সেজন্য 'টেরাকোটা' কথাটিকে শুধু মন্দির, মসজিদ বা অন্য কোন রকম ইমারতি অলংকরণ এই অর্থের মধ্যে সীমিত রাখা ঠিক নয়।

সে যাই হোক, বঙ্গদেশে পঙ্খের অলংকরণ প্রধানত মন্দিরেই ব্যবহৃত হয়েছে দুটি কারণে। প্রথমত, উনিশ শতকের

রামায়ণী প্রকাশ ভবনের
সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস

আমার আয়নার মুখ ৭·০০
সমরেশ বসু

আকর্ষণ ৮·০০
বিমল কর

সত্যের আড়ালে ৮·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একজন দৈত্য একটি লাল গোলাপ ১০·০০
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয়পুর ৬·০০
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

জটিল জলস্রোত ১১·
সমীর রক্ষিত

খোঁজ নিন : স্যাণ্ডগুইন পাবলিশার্স কনসার্ন
৩, কমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ-৯

লক্ষ্মীনারায়ণ ও (উপরে) ফুল-লতা-পাতা ও পাখির অলংকরণ

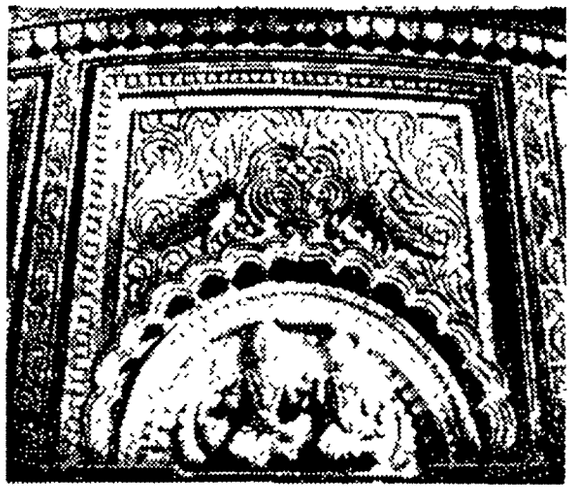

দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই মন্দির-'টেরাকোটা'-শিল্পের এত দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে যে বর্তমান শতকে পশ্চিমবাংলায় এই শ্রেণীর মন্দির সম্ভবত দু-তিনটির বেশি নির্মিত হয়নি। আমাদের আবিষ্কৃত সবচেয়ে অর্বাচীন 'টেরাকোটা'-মন্দিরটি মেদিনীপুর জেলার, ডেবরা থানার, ধামতোড় গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩১ খৃস্টাব্দে। সেটির ও বিশ শতকের আর দুএকটি দেবালয়ে উৎকীর্ণ 'টেরাকোটা' অলংকরণের অতি-নিম্ন মান থেকে কোনই সন্দেহ থাকে না যে এই বিশেষ শিল্পকৃতিটির তখন একেবারে মুমূর্ষু দশা। অবশ্য অবনতিটা আরম্ভ হয়েছিল আরও পূর্বে; উনিশ শতকের মাঝামাঝি বা তারও কিছু আগে থেকে। কিন্তু এ সময়টায় মন্দির প্রতিষ্ঠা থেমে যায়নি। ধনী এবং ধর্মপ্রাণ বণিক ও জমিদার শ্রেণীর অনেকেই নিজেদের বঞ্চিত করেন নি এহেন পুণ্যকর্ম থেকে। তাঁদের অগ্রাহ্যতিশয্যে ও মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পীদের অনুপস্থিতিতে পঙ্খ-শিল্পীরা এগিয়ে এলেন তাঁদের শূন্যস্থান পূরণ করতে। মন্দির অলংকরণের এই গোত্র বদল ত্বরান্বিত হবার দ্বিতীয় কারণ পঙ্খের কাজে অপেক্ষাকৃত সুলভতা। পরবর্তী-কালের এই সস্তা শিল্প-প্রকরণে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যয়ও অনেকটা কমেছে এবং অলংকরণকে একেবারে বাদও দিতে হয়নি।

প্রথম দিকে যেসব মন্দির এভাবে অলংকৃত হয়েছে, তাতে ফুল-লতা-পাতা বা জ্যামিতিক নকশার প্রাচুর্যই বেশি। 'টেরা-কোটা'-শিল্পীদের তখন দৈন্যদশা শুরু হয়ে থাকলেও কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা তখনও পাচ্ছিলেন। তা ছাড়া, বহু শতক ধরে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে অধিকাংশ মন্দির সজ্জিত হওয়াতে, তাঁদের ইজ্জত ছিল বেশী এবং তাঁদের সৃষ্টিকে কালোত্তীর্ণ 'স্বদেশী' শিল্প বলে মনে করাও হত। ফলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দিরে যুগপৎ 'টেরাকোটা' ও পঙ্খের কাজের সাক্ষাৎ মেলে। এহেন যুগ্ম-অলংকরণযুক্ত দেবালয়ের সংখ্যা মেদিনীপুর জেলায় খুব বেশী হলেও কাছাকাছি হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট দেখা যায়। 'টেরাকোটা' সজ্জা ও পঙ্খের কাজ দেবগৃহের ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় নিবদ্ধ হবে সে-সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। মন্দিরের সামনের দেওয়ালের বাইরের দিকে পঙ্খের কাজ দিয়ে ফ্রেম-করা কুলুঙ্গির ভিতর যেমন 'টেরাকোটা' মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, তেমনি আবার গর্ভগৃহে প্রবেশ-দ্বারের উপরে অর্ধবৃত্তাকার স্থানের সবটাই দখল করেছে পঙ্খের কাজ এমন উদাহরণও আছে। মন্দির-অলংকরণে 'টেরাকোটা' ও পঙ্খের কাজের এহেন যুগপৎ ব্যবহারের রীতিটি একই সঙ্গে বেশ কিছুদিন চলে-ছিল কিন্তু সেই সময়-সীমার মধ্যে, উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যান।

এই বাস্তব পরিস্থিতিতে অলংকৃত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতারা পঙ্খ শিল্পীদের উপর ষোলো আনা নির্ভর করতে বাধ্য হলেন। রাঢ়ের, বিশেষত মেদিনীপুর জেলার বহু স্থানে, শুধু পঙ্খের অলংকরণে সজ্জিত মন্দির এখনও বিদ্যমান। মসজিদ-সজ্জার জন্য একদা বিমূর্ত 'টেরাকোটা'-নকশার বহুল ব্যবহার হয়ে থাকলেও, পরবর্তীকালে, পঙ্খের অলংকরণ প্রায় সর্বত্রই পরিত্যক্ত হয়েছে দেখা যায়)। এসব মন্দির থেকে পঙ্খ-শিল্পের ক্রমোন্নতির একটা আভাস মেলে। ফুল-লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশা দিয়ে শুরু করে শিল্পীরা কালক্রমে ছিদ্রবহুল জাফরি ও দেবদেবী-মূর্তি গঠনের কাজেও রীতিমত দক্ষ হয়ে ওঠেন। পঙ্খের কাজ-করা অসংখ্য দেবা-লয়ের মধ্যে কারুকার্যের দিক থেকে আমার মতে যেটি শ্রেষ্ঠ, বর্তমান প্রবন্ধে স্থানা-ভাবে, কেবল সেটিরই আলোচনা করব। আশা করি, সে মন্দিরের অলংকরণের বিবরণ থেকে সাধারণ পাঠকের মনে পঙ্খের উৎকৃষ্ট সজ্জা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিষ্কার ধারণার সৃষ্টি হবে। পঙ্খের কাজ ও পঙ্খ-শিল্পীরা লুপ্ত হয়ে গেলেও তাদের সম্পর্কে এখনও বিস্তৃতভাবে বিশেষ কিছুই লেখা হয়নি।

আলোচ্য দেবালয়টি হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার যাদববাটি গ্রামে (মৌজা—যাদববাটি; জুরিসডিকসন লিস্ট নং ৩৫) অবস্থিত। গর্ভগৃহে প্রবেশ দরজার সামনের মেঝেতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠা-ফলক থেকে দেখা যায়, স্বর্গত শ্রীধরচন্দ্র রক্ষিতের বিধবা পত্নী শ্রীমতী বিন্দু-বাসিনী দাসী ১৩১৩ সনের ১৩ই বৈশাখ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। রক্ষিত পরিবারের কাপড়ের বেশ ফলাও কারবার ছিল কল-কাতার বড়বাজারে। সেই সূত্রে বিধবা বিন্দু-বাসিনী দাসী বহু সম্পত্তির উত্তরাধি-কারিণী হয়ে, যাদববাটিতে তাঁর পিতা শ্রীনাথ সরকারের আশ্রয়ে এসে বসবাস করতে থাকেন। জনশ্রুতি, পিতাপুত্রীতে এত সদ্ভাব ছিল যে স্বামীপুত্রহীনা কন্যার অভিলাষ পূরণের জন্য সরকার মহাশয়ের খরচেই দেবগৃহটি নির্মিত হয়। ১৩১৩ সন ১৯০৬-৭ খৃস্টাব্দের সমার্থক। অতএব মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল আজ থেকে মাত্র ৬৮ বছর আগে। তখন মন্দির-'টেরা-কোটা' শিল্পী বলতে বিশেষ কেউ আর অবশিষ্ট ছিলেন না গোটা বাংলাদেশে। সরকার মহাশয়কে এ মন্দির অলংকরণের জন্য অতএব পঙ্খ-শিল্পীদের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল। আদরিণী কন্যার প্রতি গভীর স্নেহবশতঃ তিনি যে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পীদেরই একাজে নিয়োগ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই; অর্থব্যয়টা তাঁদের কাছে সমস্যাই ছিল না। কেননা, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পুত্রীর ধনসম্পদ ছাড়াও, তাম্বুলী সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁর পিতা কলকাতায় সোনা, রূপা, ঘি তেল প্রভৃতির ব্যবসায়ে যথেষ্ট বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন। যাদববাটি গ্রামটি এখনও তাম্বুলীপ্রধান তবে বর্তমানে এ-সম্প্রদায়-এর (কৌলিক উপাধি—সেন দে, সোম, সরকার, নন্দী প্রভৃতি) অনেকে পৈতৃক পেশা ত্যাগ করে চাকুরি বা অন্যান্য শিক্ষিত বৃত্তিতে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন।

পশ্চিমমুখী এ মন্দিরটি নবরত্ন শ্রেণীর কিন্তু নিতান্ত আধুনিকতার করণে একতলার উপরেই কার্নিস প্রথা-গতভাবে বাঁকানো নয় যেমন দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দির বা অসংখ্য প্রাচীনতর মন্দিরে। গর্ভগৃহের সামনে ও দুপাশে সমতল ছাদের বারান্দা নির্মাণ করার জন্যও চিরাচরিত বাঁকানো কার্নিস বর্জন করতে হয়েছে। প্রধান বিগ্রহ এক শিবলিঙ্গ কিন্তু পিছনের দেওয়ালের এক বড় কুলুঙ্গিতে অন্নপূর্ণা ও ভিখারী শিবের মূর্তিও রক্ষিত আছে। সেজন্য এখানকার প্রধান পার্বণ শিবরাত্রি ও অন্ন-পূর্ণা পূজা।

অনুভূমিক সোজা কার্নিস ছাড়াও মন্দিরটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য—নীচে এক-তলার ঢাকা বারান্দার উপর খোলা ছাদ চুনবালির পলস্তারা-আবৃত ইঁটের রেলিং দিয়ে ঘেরা। সে-রেলিং-এর উপর কিছু দূরে দূরে অশ্বারোহী পরী দারোয়ান সিপাহী প্রভৃতির বেশ বড় বড় মূর্তি বসানো আছে। আদিতে

এগুলির চুনবালির কাঠামোর উপর পঙ্খের প্রলেপ দেওয়া ছিল। কিন্তু অনাবৃত স্থানে এতদিন থাকবার জন্য রোদ-বৃষ্টিতে এ-ভাস্কর্যগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। গর্ভগৃহের ঠিক উপরের দ্বিতল কক্ষটির পূব ছাড়া অন্য তিন দিকের দেওয়ালের গায়ে যেসব ফুল-লতা-পাতার অলংকরণ ও দেবদেবীমূর্তি আছে তারা বড় বড় কুলুঙ্গির মধ্যে নিবদ্ধ থাকায় প্রকৃতির অত্যাচার থেকে তবু কিছুটা রক্ষা পেয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁদের পঙ্খের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে ছাতা ধরেছে অনেক স্থানে। অনুরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তের মতো, এখানেও হয়ত প্রতিষ্ঠাতা-পরিবারের বংশধরদের এ-মন্দিরটি সযত্নে রক্ষা করবার মতো আর্থিক সঙ্গতি এখন আর নেই। অন্যদিকে যে সরকারী দপ্তরটি এসব পুরাকীর্তির খোঁজখবর রেখে মেরামতির দায়িত্ব নেবার কথা, তাঁরা এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন। সে যাই হোক, এ-মন্দিরের দোতলার দেওয়ালের শিল্পকর্মের তুল্য উৎকৃষ্ট পঙ্খের কাজ সারা পশ্চিমবঙ্গে বিরল।

আগেই বলেছি, পঙ্খ-শিল্পীরা বেশ কিছুকাল সহজতর কারুকর্মে শিক্ষানবিসী করে তারপর মূর্তি-নির্মাণে হাত দেন। এর সঙ্গতি কারণ ছিল। 'পঙ্খ' বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত একরকম দীর্ঘস্থায়ী প্রলেপ মাত্র যা সাধারণত চুনবালির জমির উপরে লাগানো হত। গৃহ-অলংকরণের ক্ষেত্রে এই জমি তৈরী করা মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু চুনবালির উপকরণে, যাবতীয় শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে, দেবদেবীর মূর্তি গড়া শক্ত কাজ। সকলেই জানেন, মাটির প্রতিমা-নির্মাতারা প্রতিমার মুখ, হাত, আঙুল প্রভৃতি সূক্ষ্ম অংশগুলি পৃথকভাবে ছাঁচে তৈরি করে নিয়ে পরে ধড়ের সঙ্গে জুড়ে দেন। অতিশয় নমনীয় ও ইচ্ছামত অদল-বদল করবার পক্ষে উপযুক্ত কাদামাটির সঙ্গে চুনবালির উপাদানের তুলনাই হয় না। তবুও এই অসুবিধাজনক উপকরণ দিয়েই পঙ্খ-শিল্পীদের মূর্তিগুলির প্রাথমিক আদলটি তৈরি করে নিতেই হত। তারপরে পঙ্খের প্রলেপ লাগাবার সময় তাদের যথার্থ রূপ দিতে বারংবার এখানে-সেখানে কম কি বেশি প্রলেপ বোলাতে হত যতক্ষণ না মাটির প্রতিমার মতই তা সুদৃশ্য হয়ে ওঠে। (প্রসঙ্গত বলা যায় যে বিষ্ণুপুরের কিছু কিছু মন্দিরে ল্যাটেরাইট মূর্তিও পঙ্খের আবরণে আবৃত হয়েছিল)। এখানেই শিল্পীদের পরিশ্রমের শেষ হত না। নানা ভঙ্গির বিভিন্ন অবয়বকে 'মেজে' উজ্জ্বল করবার সময় মসৃন শ্বেতপাথরের খণ্ড দিয়ে যেভাবে অনায়াসে দেওয়াল পালিশ করা চলত সে প্রক্রিয়া এখানে যে অচল হবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। অতএব বিভিন্ন আকারের কড়ি দিয়ে প্রতিমাগুলির অসমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সূক্ষ্ম স্থানগুলি তাদের 'মাজতে' হত। এ কাজ যে কতদূর কষ্ট-সাধ্য ও দক্ষতাসাপেক্ষ ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

যাদববাটির মন্দিরে দোতলার দেওয়ালে সর্বোৎকৃষ্ট পঙ্খের অলংকরণগুলি নিবদ্ধ হলেও একতলার ঢাকা-বারান্দার খিলানের উপরে পঙ্খের অল্পস্বল্প ফুলকারি নকশাও দেখা যায়। কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। দোতলার উত্তরদিকের দেওয়ালে দুটি পৃথক কুলুঙ্গির মধ্যে হর-পার্বতী ও এক বীণাবাদিনী যুবতীর ভাস্কর্য রক্ষিত। প্রথমটিতে অর্ধ-শয়ান শিবের পদসেবা করছেন পার্বতী আর তাঁদের পিছনে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে নন্দী বা ভৃঙ্গী। এই দেব-দৃশ্যের ঠিক উপরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ফুলকারি নকশা যার মধ্যে দুটি অতি সুন্দর পরীও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় ভাস্কর্যটি প্রায় প্রমাণ আকারের এক বীণাবাদিকার মূর্তি যেটি এখন কিছু ভগ্ন ও শ্রীহীন হলেও তার পুরাতন সৌকর্য অনায়াসেই অনুমান করা যায়। সামনের (পশ্চিমের) দেওয়ালে তিনটি প্যানেলে প্রথমটি উপবিষ্ট লক্ষ্মী-নারায়ণের। তাঁদের মাথার উপরেও ফুলকারি নকশা যার মধ্যে দুটি টিয়াপাখিকে অত্যন্ত মুনশীয়ানার সঙ্গে উৎকীর্ণ করা হয়েছে মধ্যের কুলুঙ্গিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রায় প্রমাণ সাইজের এক যুগল মূর্তি স্থাপিত। কৃষ্ণের দুটি হাতই অল্পবিস্তর ভগ্ন এবং ভাস্কর্যটিতে যথেষ্ট ছাতা ধরে থাকলেও আদতে এটি যে পঙ্খশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিম দেওয়ালে অনুরূপ আকারের তৃতীয় মূর্তিটি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায় যদিও তাঁর ডান দিকের উপরের হাতে এই নারায়ণমূর্তিটি কেন যে তরবারি ধারণ করে আছেন জানি না। তাঁর নীচের বাম হাতটি ভগ্ন হওয়ায় সেখানে কোন্ আয়ুধ ছিল বলা সম্ভব নয় কিন্তু অবশিষ্ট দুটি হাতে শঙ্খ ও গদা দেখা যায়। দক্ষিণ দেওয়ালের বিগ্রহ, ষাঁড়ের উপর উপবিষ্ট হর-পার্বতী ও উপরে এক সুদৃশ্য ফুলকারি প্যানেল। যে কারণেই হোক, এই দেওয়ালের অলংকরণ সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাদের আদি সৌন্দর্য অনেকটা রক্ষিত হয়েছে।

গৃহসজ্জা বা মন্দির-অলংকরণের জন্য অধুনা পঙ্খের কাজের কোথাও ব্যবহার হয় বলে শোনা যায় না। আগেই বলেছি এ-বিষয়ে আজকের ধনীদের রুচি বিগতকালের বিত্তবানদের থেকে একেবারে ভিন্ন। ফলে, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, আরও পাঁচটা গ্রামীণ শিল্পকলার মত, পঙ্খের কাজও হয়ত বঙ্গবঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে চিরকালের মত।

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

প্রকাশিত হ'ল

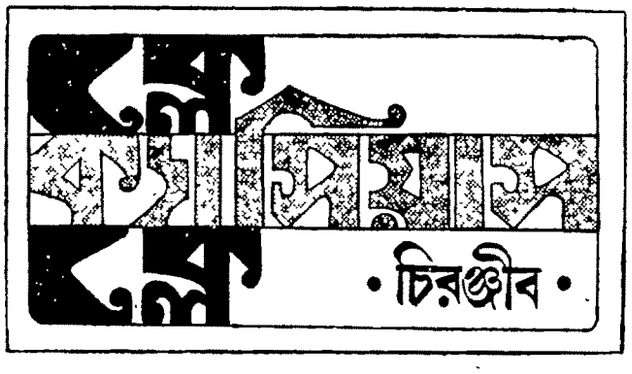

"আই অ্যাম ক্লে, মিন্ ক্যাসিয়াস ক্লে, দ্য বক্সার।"

ক্লে-র সব কিছুই অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক গোটা জীবনটাই।

চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জ এবং বলে বলে প্রতিপক্ষকে দিনের পর দিন পরাস্ত করা তাও এককভাবে; বিশ্বের ক্রীড়া-ইতিহাসে এমন নজির দ্বিতীয়টি নেই। এসব দিক থেকে বিচার করলে বিশ্ব-ফুটবলের সেরা শিরোপা—ব্রাজিলের দশ নম্বর জার্সির ফুটবলের কিংবদন্তী পেলে-ও বুঝিবা ম্লান। ব্র্যাডম্যান—ওরেল—সোবার্স ত সব দেশে আদৃতই নন। ক্লে তাই মহম্মদ আলী হয়েও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। দাম : ৮৲

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা-৯

গ্রামে চাই শিক্ষার আলো

আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষে বিশ্বব্যাপী মহিলাদের সর্বস্তরের উন্নতির জন্য এক বিরাট তোড়জোড় শুরু হয়েছে। অবশ্য এই তোড়জোড় শুরু হলেও সব দেশেই প্রগতির পথের কর্মপন্থা এক নয়, কারণ পৃথিবীতে বেশ কয়েকটি দেশ আছে যেখানে মহিলাদের ব্যবহারিক, আক্ষরিক এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষা যথেষ্ট উন্নতমানের এবং সেই দেশগুলিতে মহিলা-শিক্ষার কথা নতুন কোন ব্যাপার নয়। এসব দেশগুলিতে মহিলাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কিছুটা হয়তো অদলবদল করা হচ্ছে। এই দেশগুলি আবার মোটামুটি উন্নতির একটা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুনোর পর তাকিয়ে আছে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির দিকে। এবারে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় এ দেশগুলির মধ্যে আছে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই দুটি মহাদেশের অধিবাসীরা অগ্রগতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে জাপান ও চীনের মহিলারা কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার নারী অগ্রগতি থেকে বড় একটা পিছিয়ে নেই। তাই এখন মহিলাবর্ষে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য এশিয়ার ভারতবর্ষ, সিংহল, পাকিস্থান, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে এক নবজাগরণের আলোড়ন উঠেছে।

অনেকের মতে অবশ্য ভারতে তুলনামূলকভাবে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলতে পারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহিলা। মহিলা প্রধানমন্ত্রীর কথা বাদ দিলেও লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় কয়েকজন মহিলা সদস্যা আছেন। প্রশাসন চিকিৎসা ও কারিগরি বিদ্যাতে বহু মহিলা পারদর্শিনী দেখা যায়। বিগত জনসংখ্যার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে আছেন তিন লক্ষের বেশী মহিলা গ্রাজুয়েট (এর মধ্যে চার হাজার বাণিজ্য স্নাতক, চারশো কৃষি স্নাতক) বিরাশী হাজার বিজ্ঞান স্নাতক, সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাজার ইঞ্জিনীয়ার এবং ষোলো হাজার ডাক্তার। আবার অন্যদিকে বিচার করে দেখতে গেলে আক্ষরিক জ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষা ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে নিতান্তই কম। ভারতে শতকরা আঠারো জন মহিলারও আক্ষরিক জ্ঞান নেই। এদেশে এখনও চারজন মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে পাঠশালায় যায়। একশো জন মেয়ে পাঠশালায় গেলে তার মধ্যে শতকরা তিরিশ জন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে। এগারো থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক মেয়েদের মধ্যে প্রতি পাঁচ জনে একজন স্কুলে যায়। এই ভয়াবহ চিত্রটি হল শুধুমাত্র আক্ষরিক ও প্রাথমিক শিক্ষার দৃষ্টান্ত। এই শিক্ষা বিরাট আকারে বাড়লেই যে শুধুমাত্র মেয়েদের শিক্ষা সমস্যার সমাধান হবে তা মনে করলে চলবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে পুঁথিগত বিদ্যা ও ব্যবহারিক জীবনে সামঞ্জস্য বিধান করা খুব কঠিন কাজ। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাকে শিক্ষার মানদণ্ড হিসেবে মনে করলে নারীশিক্ষার পরিপূর্ণতা কোন দিনই আসবে না।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা এখনও জ্বলেনি। শহুরে জীবনে রয়েছে নানা রকম সুবিধা। শিক্ষার প্রসার শহরের মেয়েদের মধ্যে যত দ্রুত গতিতে হচ্ছে বা হওয়া সম্ভব গ্রামে তা কোন মতেই হওয়া সম্ভব নয়। অনেকে হয়তো এ প্রসঙ্গে বলবেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন অসুবিধা নেই। কয়েক বছর ধরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার চালু করা হয়েছে। অথচ আমাদের অনেক গ্রামের অভ্যন্তরে ঠিক অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেবার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নেই। যেখানে অক্ষর পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা আমাদের মেয়েরা এখনও উপলব্ধি করতে পারেন নি, সেখানে দূরে দূরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যাওয়া শুধুমাত্র সময় নষ্ট ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার অধিকারও যে তাদের আছে একথা তারা কোন মতেই ভাবতে শেখেন নি। চাষবাস বা ঐ জাতীয় গতানুগতিক কাজেও যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে তা তাদের উপলব্ধির বাইরে। কোন রকমে সন্তান উৎপাদন ও কায়ক্লেশে তাদের আহারের সংস্থান করাই তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের গুরুদায়িত্ব নারীদের ওপর ন্যস্ত। অথচ শিক্ষার আলোক মেয়েদের কাছে না পৌঁছুলে এ সম্বন্ধে কোন চেতনা তাদের আসা সম্ভব নয়। যতদিন এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষ না হবে ততদিন তারা গতানুগতিক জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে নিজেদের চিন্তাধারাকে প্রসারিত করতে সক্ষম হবে না।

শুধু কি আক্ষরিক জ্ঞানদানই মেয়েদের প্রধান শিক্ষনীয়? দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিসেও যে নানা শিক্ষনীয় জিনিস আছে এ বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। সন্তান প্রতিপালন, তাদের পুষ্টি শিক্ষাদান এ সব বিষয়েও তাদের চেতনাকে বাড়াতে হবে। সংসারের নানা দায়দায়িত্বের মাঝে অটুট স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার শিক্ষাটুকু অবশ্যই তাদের শিখতে হবে। এছাড়া ঘরকে সুখের ও শান্তির আলয় করে গড়ে তোলার কৃতিত্ব মেয়েদের অনেকখানি। ঘর সাজাবার প্রয়োজনীয়তা ও উপায়গুলি সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা একান্ত দরকার। মাঝে মাঝে এই উপায়গুলি শিক্ষা দিয়ে এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে এ ব্যাপারে তাদের অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ বেড়ে যাবে বহুগুণ। নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি করার পদ্ধতিটুকুও ক্রমে ক্রমে তাদের রপ্ত করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক দিকগুলির পরিচয় ঘটানো তখন বোধহয় খুব আর কঠিন বলে মনে হবে না।

সুদূর গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুব্যবস্থা থাকলে তাদের মধ্যে কিছু কিছু জ্ঞানের আলো প্রসার করা খুব সহজ হবে। অন্ততঃ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাদের চেতনাকে খানিক জাগ্রত করা সম্ভব হবে। নানাবিধ হস্তশিল্প প্রসারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শিল্প কেন্দ্র চালু করা প্রয়োজন। এ শিক্ষা সমাপ্তে তারা যদি কিছু কিছু উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তবে অল্পকালের মধ্যেই তা সকলের মধ্যে বিশেষভাবে গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হবে। উপরন্তু টেলিভিশন শিক্ষাদানের এক বিরাট মাধ্যম। নিরক্ষর গ্রাম্য মহিলাদের মধ্যে আক্ষরিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবহারিক দিকের জ্ঞানের উন্মেষ হলে তবেই নারীবর্ষ সার্থকতা লাভ করবে।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেভাবে অগ্রগতি চলছে ভারতও তাদের অগ্রগতির সবটাই অনুকরণ করলে চলবে না। এদেশের যে সমস্যাগুলি আছে সেসবগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে তাকে এগোতে হবে। এই এক বছরেই যে মহিলাদের প্রগতির পরিপূর্ণতা আসবে একথা নয়, প্রগতির শপথ গ্রহণ ও ভবিষ্যতে তা দ্রুত কার্যকর করার গুরু দায়িত্ব নারীসমাজ তথা সমগ্র দেশবাসীকে গ্রহণ করতে হবে।

অঞ্জলি চৌধুরী

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বঙ্কিম দত্ত যা চান রঞ্জু তা নয়। তার চিন্তার জগৎ পরিবেশ সবই স্বতন্ত্র। আর ঝুঁইদি এসে যেন ষোল বছরের রঞ্জুর মানসিক জগৎকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। বিবাহিতা ঝুঁইদি যেন তাকে কাঁচপোকার মত আকর্ষণ করছে। বঙ্কিমবাবুর মত কি অমিয়ই হতে পেরেছে? শুধু একটা ভয় তার বাবার মতই। তার বন্ধু রুদ্রেন্দু গম্ভীর এবং বিপ্লবী মেজাজের বলে তাকে সেও এড়িয়ে চলতে চায়, ভয় করে। সেই রুদ্রেন্দুর সংগে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল অমিয়র।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ রঞ্জুও দেখে ফেলল দূর থেকে। বাবার পাশে এক ঝাঁক টিয়ের মত টুটুনদের দলটা। সবাই আজ শাড়ি পরেছে। বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। তার পাশে বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে মনে হচ্ছে ভীরু বোগা তাড়া খাওয়া শেয়াল। বাবার পাশে গোপাও আছে। তার সংগে গোপার একটা নীরব সম্পর্ক আছে। যেটা কেউ জানে না। কাল রঞ্জু ঝুঁইদির সংগে কেষ্টনগর চলে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে। সেই খবরটা ওকে দেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চলতা অনুভব করে রঞ্জু। রঞ্জু সুযোগও পেল বাড়ীতে যখন গানের আসর বসিয়েছিলেন বাবা। রঞ্জু তখন তার পড়ার ঘরে ঝুঁইদির সামনে বসে কেষ্টনগরে যাবার জন্যে গোছগাছ করছিল। তার মধ্যেই সে ফাঁক বুঝে কথাটা বলে ফেলল বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। সেই রাত্রেই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার শুনল সে। মা চেপে ধরায় টুটুন বোটানিক্সে গিয়ে তার বাবা তারই বান্ধবী গোপাকে ছুতো করে গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল, এই কথাটা কবুল করতেই মা'র মুখ চোখ রাগে কঠিন হয়ে উঠলো। তাহলে বাবাকে কি মা সন্দেহ করে? প্রথমটা রঞ্জুর খুব রাগ হোল টুটুনের ওপর বাবার সম্পর্কে মাকে লাগাবার জন্য। তারপরেই তার খুব আনন্দ হোল। বেশ হয়েছে। কুটনী মেয়ের এই রকমই শাস্তি হওয়া উচিত।

— চব্বিশ —

আমি মুক্তপুরুষ। অমিয়বাবু নিজেকে বোঝান। দরকার হলে অন্যকেও তাই বলেন। আমার কোনোরকম দায়দায়িত্ব নেই।

অন্য বলতে এখানে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা—বাবা বা ভাই বা ভাইয়ের স্ত্রী। পরিবারের গণ্ডীর বাইরে তাঁর কর্তব্য-অকর্তব্য নিয়ে কেউ কোনোদিন অবশ্য প্রশ্ন করে না। এই জন্য তাঁকেও মুখ খুলতে হয় না। তিনি চুপ করে থাকেন। চুপ থেকে একজন মুক্ত-পুরুষ যেভাবে চলেন বলেন হাসেন কথা বলেন, সেভাবে তিনি চলেন বলেন হাসেন কথা বলেন। চুপ থেকে বাইরের মানুষ তা দেখে। অনেকে তাঁকে ঈর্ষা করে। হয়তো ঠোঁট টিপে হাসে কেউ। কিন্তু অনুকম্পা করে কি?

অমিয়বাবু কখনও তা মনে করেন না।

এই দুর্দিনে কার দায় কে ঘাড় পেতে নেয়। তাঁর বাবা বঙ্কিম দত্ত আশীবছর বেঁচে থেকে সরকারী পেন্সন ভোগ করছেন। বাবার আয়ে অমিয়বাবু খাচ্ছেন পরছেন। তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা খাচ্ছে পরছে।

এই সৌভাগ্য ক'জনের হয়! উপার্জন-শীল উপযুক্ত ভাই আছে। ভাই ও তাঁর পরিবারকে যথেষ্ট সাহায্য করছে। বলতে গেলে এটা অমিয়বাবুর পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। সৌভাগ্য।

এই নিয়ে ঈর্ষা চলে। আড়ালে ঠাট্টা চলে। ঠাট্টাটা ঈর্ষারই আর একটা রূপ। কিন্তু তাঁকে অনুকম্পা করবে তুমি কোন সাহসে! এই বাজারে? যেখানে হাতল ধরে তুমি বাসে ঝুলছ। যে-কোনো সময় ঝাঁকুনি লেগে হাতল থেকে হাত আলগা হয়ে নিচে ছিটকে পড়ে তুমি চাকার তলায় চলে যেতে পার। দেখেশুনেও যেখানে কেউ হাত ধরে তোমাকে টেনে তুলছে না। সেখানে দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে জানালার ধার ঘেঁষে একটা সীটে বসে আরাম করে যাওয়া কি সহজ? বরাতের জোর থাকলে সম্ভব! কাজেই ঈর্ষা রাগ বিদ্বেষ চলতে পারে—অনুকম্পা কথাটা এখানে একেবারেই অচল।

কাল রাত্রে এই উপমা দিয়েই অমিয়বাবু স্ত্রীকে কাবু করতে চেষ্টা করেছিলেন। উপমাটা পুরোনো।

রঞ্জুর মা যখন রাগটাগ করেও খুব একটা সুবিধে করতে পারে না তখন 'তোমাকে দেখলে মায়া হয়', 'তোমাকে করুণা করতে ইচ্ছে করে' ইত্যাদি বলে স্বামীকে আঘাত করে ও চোখেমুখে প্রবল ঘেন্নার ভাব ফুটিয়ে তোলে।

কিন্তু ঐ যে—পিঠে বেঁধেছি কুলো কানে গুঁজেছি তুলো। মুক্তপুরুষের কাছে রাগ ঘেন্না সমান কথা। যে জন্য স্ত্রীর কথায় রাত্রে অমিয়বাবু হেসেছিলেন। হেসে বাস-এ 'ঝুলে যাওয়া' ও 'বসে যাওয়া'-র পুরোনো দৃষ্টান্তটা তুলে ধরে অপার তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। তারপর নীহার আর একটা কথাও বলেনি। কোনোদিনই বলে না। অর্থাৎ তখন তার মনের ভাবটা এই দাঁড়ায়—যার মান-অপমান বোধ নেই। তার সংগে কথা বলা বৃথা। অথবা তার সংগে কথা বলতে আমার ঘেন্না করে। এই জন্য অমিয়বাবুর মনে বড় একটা ক্ষোভ উপস্থিত হয় কি। মোটেই না। বরং তিনি শান্তি পান। তিনি মনে মনে এই চান। আর পাঁচটা বিষয় নিয়ে স্ত্রী যত খুশি কথা বলুক তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি উপার্জন করেন না কেবল পাখি নিয়ে ফুল নিয়ে থাকেন ও মাছ ধরে সময় কাটান—এই জিনিসগুলি বলে স্ত্রী যেন তাঁর ভিতরের শান্তি নষ্ট না করে।

অন্য অনেক রাত্রির মতন বেশ কিছুক্ষণ ঝগড়া ও বকবক করার পর নীহার কাল চুপ করে যখন আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে অমিয়বাবুও তখন নিঃশব্দে একটা মাদুর ও বালিশ টেনে নিয়ে বারান্দায় চলে আসেন।

ঝগড়াটা যখন আরম্ভ হয়, একনাগাড়ে তিন-চারদিন চলে। এবং তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এমনকি রাতগুলি অমিয়বাবু ঘরে না শুয়ে দোতলার বারান্দায় তাঁর ক্যাকটাসের

টবগুলির কাছে মাদুরের বিছানায় শয্যা নেন। ঠান্ডা পড়লে একটা জরির চাদর বা কখন পাশে রাখেন।

এই নিয়ে কেউ কিছু বলে না। বুড়ো বঙ্কিম দত্ত থেকে আরম্ভ করে বাড়ির ছেলেমেয়েরা, এমনকি ঝি-চাকরেরাও বুঝে নেয় গিন্নীমার সঙ্গে বড়বাবুর মন কষাকষি চলছে।

আর অমিয়বাবুও নিজের দিক থেকে এই কটা দিন খুবই স্বস্তিবোধ করেন।

স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ থাকার ক'দিন তিনি যে কেবল ক্যাকটাসের টবের পাশে মাদুরের বিছানায় শুয়ে রাত কাটান তা নয়—দিনের বেলাও বড়একটা বাড়িতে থাকেন না। সারাদিন বাইরে বাইরে ঘোরেন—খুশিমতন বেড়ান।

অর্থাৎ এই ক'দিনের জন্য তিনি আরও বেশি মুক্তপুরুষ হয়ে যান। এই সময়টায় তাঁর চেহারা বেশভূষা এমন কি হাঁটাচলাটাও বদলে যায়। চোখেমুখে একটা অতিরিক্ত স্ফূর্তির ছাপ পড়ে। বেশভূষা বলতে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি ধুতি আর পায়ে মোটা স্ট্র্যাপের স্যান্ডেল। তাঁর বাড়ির আটপৌরে পোশাকটা হল পায়জামা ও গেঞ্জি বা কখনও হাফ-সার্ট।

কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবিতে তাঁকে মানায় ভাল। যেন তাঁর বয়সটাই তখন কমে যায়। যেন নতুন করে রাস্তার মানুষ তাঁকে তাকিয়ে দেখে। অথচ তিনি কিছু নতুন লোক নন। ওল্ড বালিগঞ্জের মানুষ। কেবল ওল্ড বালিগঞ্জ কেন, কলকাতা শহরের নানা জায়গায় নানা রাস্তায়, ফুটপাথে হোক ট্রাম-বাসে হোক পার্কে বা ছেলেদের কোনও খেলার মাঠের ধারে — কখনও-সখনও রিকসায় বসা অবস্থায় কত মানুষ কতদিন তাঁকে দেখেছে। গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেখছে। হিসাব করলে তাই তো হয়। দেশভাগের পর থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর তিনি কলকাতা শহরে স্থায়ীভাবে আছেন।

কিন্তু তাঁকে দেখে লোকে বিস্মিত হয়। স্থিরযৌবন বললে অবশ্য বাড়াবাড়ি হয়। অনেকদিন আগেই প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন। কিন্তু তবু যেন তাঁর আটসাট লম্বাচওড়া চেহারায় একটা যৌবনের জলুস লেগে আছে। শেষ ভাদ্রের বিকেলের হলুদ রোদের মতন। গায়ের রংটা এককালে অসম্ভব ভাল ছিল তো। রঙের দপদপে জ্বলুনি কমেছে। কিন্তু আভাটা পুরোমাত্রায় রয়ে গেছে। তাছাড়া শরীর এখনও বেশ মজবুত। চামড়ায় কোথাও এতটুকু কুঁচি পড়েনি। আর চোখেমুখে সারাক্ষণ একটা অবিশ্বাস্য রকমের পরিতৃপ্তি। বুঝুন, কলকাতা শহর। চব্বিশ ঘন্টা যেখানে বিষাক্ত বায়ুর মধ্যে শ্বাস গ্রহণ করতে হয়। বরফ-পচা মাছ বাসি আনাজ ভেজাল তেল ও জেলো দুধের ওপর যেখানে দেহ টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন। অনেকের অবশ্য মাছ দুধ জোটে না। শত হোক জজের ছেলে। লোক-দেখানোর মতন করে হলেও একটুকরো মাছ এক ফোঁটা দুধ নিশ্চয়ই এই ভদ্রলোকের পেটে পড়ে। অন্তত বাইরের মানুষ তাই ধরে নেয়। এতৎসত্ত্বেও এই অমিয় নামের মানুষটি যে কোনোদিন জীর্ণ জরাগ্রস্ত হবে—তাঁর চলা বলা ও হাসি দেখে কারো মনেই হয় না। যেন দশ বছর আগে তিনি যেমন ছিলেন এখনও তাই। আবার বিশ বছর পরেও ঠিক এমনটি থাকবেন। এটা কি কম!

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। দশ না, যেন আরও আগে, পনেরো বছর হবে—মনে আছে সার্কুলার রোডের ট্রাম থেকে নেমে বাদুড়বাগানের দিকে একদিন অমিয়বাবু হাঁটা ধরেছিলেন। আমিও সেই ট্রামে ছিলাম। কি কারণে যেন আমাকেও বাদুড়বাগানের দিকে যেতে হয়েছিল। অমিয়বাবু আগে আগে হাঁটছিলেন। বাদুড়বাগানে ভদ্রলোকের কে আছে আমি জানতাম না। তিনি যে বালিগঞ্জের মানুষ তা-ও আমার অজানা ছিল। সেদিন তাঁর বাবার মরিস গাড়িটা ছিল কি? কিন্তু কোনোদিন অমিয়বাবুকে আমি গাড়ি চড়তে দেখিনি। যেন ট্রামে বাসে রিকসায় বা হেঁটে চলাফেরা করে তিনি সুখ পান। যেন হাঁটাটাই পছন্দ করেন বেশি। হয়তো সেদিনও করতেন। অথচ পনেরো বছর আগে ট্রাম-বাসে আজকের মতন ভিড় ছিল না।

যা বলছি—তিনি আগে আগে হাঁটছিলেন। দুপুরবেলা। বাতাস গরম হয়ে উঠেছিল। তা হলে হবে কি। তাঁর মাথা থেকে একটা ফুলেল তেলের গন্ধ ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ে বাতাসটাকে ঠান্ডা নরম করে দিচ্ছিল। দেখছিলাম তাঁর হাঁটুর নিচে পাঞ্জাবির ঝুল পবনে সদ্য নরুন পাড় ধুতি পায়ে চটি। কেমন হেলেদুলে বুকের মধ্যে লুকোনো একটা খুশি নিয়ে গুনগুনিয়ে গান করতে করতে রাস্তা চলছিলেন।

আজও তাই। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হয় তাঁর চুলের সেই ফুলেল তেলের গন্ধ যেন পাচ্ছি। যদি তিনি ভেলটা মাথার আর নাও মাখেন—তাঁর চমৎকার বাবরি চুল, চেহারা ও হাঁটা দেখে মনে হয় সেই অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধটা বুঝি আমাদের নাকে লাগছে।

এক-একটা মানুষ এমন আছে।

তাদের হাঁটাচলা হাসি বা কথা বলার ধরণ অথবা বেশভূষা এবং সেটাও যে খুব জাঁকালো হতে হবে তার কোনো কথা নেই—সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি হলেও ক্ষতি নেই—আসলে পোশাকটা যে তাদের মানিয়েছে সেটাই বড় কথা—হয় তাদের হাসি পোষাক মাথার চুল বা চলাবলা আমাদের মনের ওপর একটা বিশেষ ছাপ ফেলে দেয়। অর্থাৎ দেখলে মনে হয় তারা কোনোদিন দুঃখে নেই, কোনো কিছু নিয়ে মন খারাপ করে না যদি কোনো দুঃখ সামনেও পড়ে তারা অতি সহজে তা জয় করতে পারে। সর্বদা একটা হাসি-হাসি ভাব মুখে লেগে থাকে। চোখের আগায় পরিতৃপ্তির চিহ্ন কোনোকালেই যেন শেষ হবার নয়। গুন-গুনিয়ে গান না করলেও মনে হয় যেন গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে তারা রাস্তা চলছে। এত আনন্দ কোথায় পায়!

পনেরো বছর আগে একদিন দেখেছিলাম। আবার বছর-দশেক আগে ভদ্রলোককে একদিন চোখে পড়েছিল। ততদিনে আমি জেনে গিয়েছিলাম ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস-এর অম্বুজ-নিলয়ের মানুষ তিনি। নাম অমিয় দত্ত। তাঁর বাবা জজিয়তি করতেন। আর তিনি ব্যারিস্টারী পাশ করেও প্র্যাকটিশ করেননি। কলেজে পড়াতেন। তারপর কলেজে পড়ানো ছেড়ে দিয়ে ফ্রি-লান্স সাংবাদিকতা করতেন। তারপর তা-ও ছেড়ে দিয়ে খুশিমতন হাঁটতেন বেড়াতেন মাছ ধরতেন পাখি পুষতেন। তাঁর বাবার একটা মরিস গাড়ি ছিল। বেচে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যতদিন ওটা ছিল অমিয়বাবু চড়েন নি। ভাল লাগত না। ট্রামে বাসে রিকসায় বা হেঁটে চলা তাঁর চিরদিন পছন্দ। হয় দশ বছর আগে দেখছিলাম সেই পোশাক। সেই বাবরি চুল। চুল থেকে ফুলেল তেলের গন্ধ উঠে আসছে। হাসি-হাসি চেহারা। জগুবাবুর বাজারে একটা ছোটখাট মিষ্টির দোকানে বসে স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ তৃপ্তি-সহকারে জলযোগ করছিলেন। কিঞ্চিৎ জলখাবার খেতে কি করে যেন হঠাৎ আমিও ঠিক ঐ দোকানে ঢুকে পড়ি। কাজেই সেদিন খুঁটিয়ে ভদ্রলোককে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর রূপসী স্ত্রীকেও দেখলাম। সন্তান দুটিকে দেখলাম। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি। মনে আছে, জলযোগ সারার পরেও বেশ কিছুক্ষণ সকলকেই দোকানে আটক থাকতে হয়েছিল। এমন ঝড়-বাদলের সময় কলকাতা শহর কত মানুষকে যে হঠাৎ এক একদিন এই দোকানে সেই দোকানে আটকা পড়ে যেতে হয়। আর তখন এ'র সঙ্গে ও'র, তাঁর সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয়ও হয়ে যায়। একদিক থেকে এটা মন্দ না।

যাক, দশ বছর পর আবার তাঁকে সেদিন দেখলাম পদ্মপুকুর রোডে একটা বাধাচূড়া গাছের নিচে। শ্রাবণ মাসের বিকেল। গাছতলায় পেয়ারার দোকান সাজিয়ে বসেছিল একটা মানুষ। অতসী ফুল রঙের ঝিকিমিকি গোদ তখন গাছের মাথায়। অমিয়বাবু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পেয়ারা কিনছেন। সেই লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি। সরু পাড় ধুতি মোটা স্ট্র্যাপের স্যান্ডেল পায়ে। চুল থেকে ফুলেল তেলের ঠান্ডা গন্ধটা অল্প অল্প উঠে আসছিল। অবাক লাগল দেখে কানের কাছে কিছু চুল ধূসর হওয়া ছাড়া চৌদ্দ আনা মাথা এখনও কালো কুচকুচে রয়ে গেছে। গায়ের চামড়া আজও বেমন টানটান। ভাবলাম সেই স্ত্রী পুত্র কন্যাকে মিষ্টির দোকানে দেখে

ছিলাম তাদের জন্য বুঝি শখ করে পেয়ারা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ভুল ভাঙলো। একটা ডাঁসা পেয়ারা কিনলেন তিনি। পকেটে পুরলেন সেটা। তারপর একটা রিকসা ডাকলেন। তারপর দেখলাম রিকসাটা যখন চলছে পকেট থেকে পেয়ারাটা বের করে একটা লোভী কিশোরের মতন বড় বড় কামড় বসিয়ে দিব্যি খেতে খেতে যাচ্ছেন। দেখে ঈর্ষা হল। ঠিক একই বয়সের মানুষ। আমার দাঁত খটখট করে নড়ছে। চুল চোদ্দ আনা পেকে গেছে। চামড়া প্রায় শুকনো খেজুরের চেহারা ধরেছে। আমি কেন। হলপ করে বলতে পারি আমার বয়সের নিরানব্বইটা মানুষের এই দশা। ব্যতিক্রম অম্বুজা-নিলয়ের অমিয়বাবু। কাল দেখলাম গুচ্ছের মেয়ে নিয়ে তিনি ট্রাম থেকে নামছেন। কোথায় পাখি দেখতে গিয়েছিলেন। আর আজ দেখছি গনগনে রোদের দুপুরে একা একা হাঁটছেন তিনি। বাতাস নেই। পাথুরে শক্ত হয়ে আছে আবহাওয়া। কিন্তু লক্ষ্য করছিলাম তাঁর গতি যেন আগের চেয়েও মুক্ত স্বচ্ছন্দ হয়ে গেছে। মানে এর আগে আমি যে ক'দিন তাঁকে দেখলাম। আজ তাঁর চোখেমুখে স্ফূর্তির ভাবটা অনেক বেশি। তিনকোণা পার্কটার কাছে এসে একটু সময় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ঘাড় তুলে একটা দেবদারুর মাথার সবুজ পাতায় ঝিলিমিলি দেখলেন। নিজের মনে হাসলেন। ভাবলেন কিছু। কেবল তাই না। ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড়িয়ে কিছু যে বললেন তা-ও স্পষ্ট আমার কানে এল। স্ত্রীর সংগে কথা বলছেন অমিয়বাবু। ভদ্রমহিলা সামনে নেই। ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস-এর দোতলার ঘরে ঘুমোচ্ছেন অথবা শ্বশুরের দেওয়া হাত-মেশিনটা ঘুরিয়ে কিছু সেলাই-টেলাই করছেন। অনুমান করতে আমার কষ্ট হল না। আর এখানে পার্কের কিনারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেবদারু গাছের আগায় চোখ রেখে গিন্নীর সংগে কথা বলছেন ভদ্রলোক। জিনিসটা দেখবার মতন। ক'দিন ধরে ঝগড়া যাচ্ছে। স্ত্রীর সংগে কথাবার্তা বন্ধ। কাজেই অনেক কথা জমে উঠেছে অমিয়বাবুর বুকে। এখন নিরালা পার্কের কাছে এসে পলো থেকে ছাড়া-পাওয়া মাছের মতন ফরফর করে কথাগুলি তাঁর বুক থেকে বেরিয়ে আসছে।

কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই। অমিয়বাবুর যুক্তি ঠেলে ফেলে দেবার মতন নয়। ছেলেবেলায় তিনি পুরে হেলতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাবা তা হতে দেননি। যেমন একটা চারাগাছকে খুঁটির সংগে বেঁধে রাখা হয় সেভাবে শক্ত করে বঙ্কিম দত্ত ছেলেকে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু গাছ তার নিজের ধর্ম নিয়ে মাথাটা সোজা না রেখে এখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। ছেলেবেলায় পূর্বদিকে আলো জ্বলছিল। সুরেন্দ্রদেব দলটা ছিল সেদিকে। বিপ্লবের সূর্য উঁকি দিয়েছিল সেখানটায়। কিন্তু অমিয়বাবুর সেই প্রচণ্ড আলোর পিপাসা মিটল না। তাই এখন বড় হয়ে এত ডাল-পালা নিয়ে পশ্চিমে ঝুঁকে পড়েছেন। এদিকটায় আলো কম নেই। আলো ছাড়া গাছ বাঁচে না। তার অর্থ সংসারে দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে উপার্জনশীল সক্ষম ভালমানুষ স্বামী কি বাবা হওয়া তাঁর একেবারে পোষাচ্ছিল না। বুদ্ধিদের অর্থে আমি বিপ্লবী হতে পারিনি। স্ত্রীকে উদ্দেশ করে তিনি এখন বলছেন, কিন্তু ছন্নছাড়া ভাবটা আমার রক্তে পুরোপুরি রয়ে গেছে। তাই চাবদেওয়ালের গন্ডীর মধ্যে আটকা থেকে রেশন ধরা ও হরিণ-ঘাটার দুধের টাকা জমা দেওয়ার চিন্তা আমার মাথায় আসে না। পাখি, ফুল ও মাছের স্বপ্ন নিয়ে আমি বিভোর।

আহা যদি এভাবে পরিষ্কার করে সামনাসামনি গিন্নীকে কথাগুলি শোনাতে পারতেন।

কতক্ষণ এভাবে পার্কের কাছটায় দাঁড়িয়ে থেকে কৌটো খুলে এক টিপ নস্যি নিয়ে অমিয়বাবু কথাগুলি চিন্তা করেন। তারপর আবার হাঁটেন।

এমন জমাট পাথুরে দুপুরে ট্রামের ঘড়ঘড় ও বাস-এর খকখক অসহ্য। এখন ঘুঘুর ডাক বৌ-কথা-কও পাখির ডাক শুনতে ভাল। ঝুরঝুরে নিমপাতা ঝরে পড়া ও বাঁশঝোপের কাছে কাঠবিড়ালের আনাগোনা দেখতে ভাল। মাচায় ঝুলছে ঝিঙে ফুল। অথবা কাঁটানটে কি ফণি-মনসার ঝোপ এধার-ওধার। ক্যাকটাসের ঘন জঙ্গল। এসব ভেবে বড় রাস্তায় আর না হেঁটে তিনি লেন বাই-লেন ধরলেন।

* * *

—এটা কি?

—প্যাস্ট্রি।

—এটার ভেতর?

—খুলে দ্যাখো।

ছোট ছোট সুদৃশ্য কাগজের প্যাকেট। পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা একটা করে বের করে তিনি ওর হাতে তুলে দেন। মোড়কটা ছেঁড়ার আগে নাকের কাছে নিয়ে ও গন্ধ শোঁকে। শুঁকতে গিয়ে নাকের ডগা সামান্য কুঁচকোয়। মিষ্টি করে হাসে।

—টের পাচ্ছ না! অমিয়বাবু মাথা নাড়ে।

ও মাথা নাড়ে। ওর নাকের পাটা কাঁপতে থাকে। ছোট্ট ফরসা বাঁকান নাক। টিয়ের ঠোঁটের মতন। নাকি সাদা ধবধবে বকফুলের কলি।

—কি হল। নাক দেখা সেরে অমিয়বাবু ওর কালো সুঠাম ভুরুর বাঁক দেখেন। টিপে টিপে হাসেন। টের পাচ্ছ না?

—ক্ষীরের সন্দেশ মনে হয়।

—এটা? আর একটা প্যাকেট অমিয় পকেট থেকে তুলে ওর হাতে দেন।

—এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। আমসত্ত্ব।

—এটা!

—ইস এ আপনি কি করেছেন?

—কি করলাম। এবার দাঁত ছড়িয়ে অমিয়বাবু হাসেন। নাও ধর। খুব ভাল চকলেট।

ঘাসের শিসের মতন ওর পাতলা ঠোঁটজোড়া কাঁপে। প্যাকেটটা ধরতে চায় না। অন্য দিকে তাকায়। —আপনি ভীষণ ছেলেমানুষ। ভুরু কুঁচকোয়।

—কেন!

—ভীষণ পাগলামি করেন।

মা কোথায়? এদিক-ওদিক তাকান অমিয়বাবু। তারপর ওর দিকে ঘাড় ফেরান। টলটলে চোখে পলক পড়ে না ওর। একভাবে তাকিয়ে। যেন ঠোঁটের কোণায়

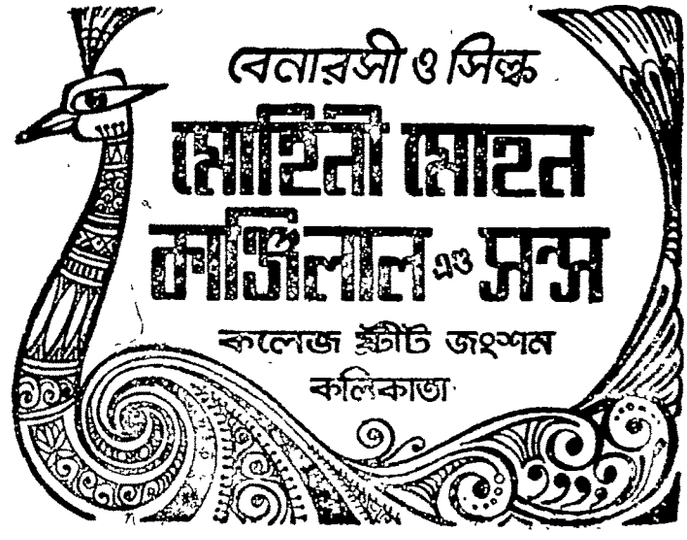

রহস্যভরা অভিমান লুকোনো। একদৃষ্টে অমিয়বাবুকে পরীক্ষা করছে।

—বসবেন না? আস্তে বলল ও।

—না।

—কেন!

—তুমি ভারি অবাধ্য। মোটেই কথা শুনছ না।

—সে কি! কোন কথাটা হল যে না শুনে আমি অবাধ্যপনা করছি! অবাক হয়ে ঠোঁট ওল্টাল ও। মাথা নাড়ল। পিঠের চুলের গোছা নড়ে উঠল। রীবনের গিঁট-দেওয়া বেণী নেই আজ। ফাঁপানো কোলানো চুল। যেন শ্যাম্পু-করা হয়েছিল। মিষ্টি এলাচ-এলাচ একটা গন্ধ অমিয়-বাবুর নাকে লাগল।

—হুঁ, কথা তো শুনছই না। এত ভালো কাজু বাদাম আনলাম। প্যাকেটটা মোটে ছুঁয়েই দেখছ না।

—আরে কী মুস্কিল! এবার ও হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা ধরল। —একলা এত সব বুঝি খাওয়া যায়। পকেট বোঝাই করে কত কি নিয়ে এসেছেন।

—খুব খাওয়া যায়। ঘাড় নেড়ে অমিয় হাসেন। মা কোথায়!

—অফিসে। আর একদিনও ঠিক দুপুরেবেলা এসেছিলেন। বলিনি?

—অ, হ্যাঁ। অমিয় মাথা নাড়েন। মনেই ছিল না। যেন অপরাধীর চেহারা হল তাঁর।

—ভীষণ ভুলো মন আপনার। দু' চোখের তারা নাচিয়ে ও শাসনের সুর করে।

ওর বাবার অফিসে মিসেস গাঙ্গুলী চাকরি পেয়েছেন। মিঃ গাঙ্গুলী অফিসের চেয়ারে বসে কাজ করতে করতে স্ট্রোক হয়ে মারা যান। মা অল্প বেতনে কর্পোরেশন স্কুলে মাস্টারি করত। বাপ মারা যেতে মা-কে ওরা ডেকে নিয়ে কাজ দেয়। ওর মুখে কি অমিয়বাবু গল্পটা শোনেননি।

—বয়স হয়েছে। সব সময় সবকিছু যেন মনে থাকে না। ভয়ে ভয়ে অমিয়বাবু ওর চোখের দিকে তাকান। যেন দপদপে দুটো তারা হয়ে ওর চোখের মণিদুটো জ্বলছে। অমিয়বাবু আস্তে মাথা নাড়েন। —তাই তো। এ-সময় তোমার মা অফিসে থাকেন। ঠিক। এখন মনে পড়েছে।

—আমার মনে হয় ছেলেবেলায়ও আপনার ভুলো মন ছিল। এখন বলছেন বয়েস হয়েছে।

—কেন!

—এক-একজনকে দেখলেই বোঝা যায়। চোখের তারার আর শাসন নেই। ঠোঁটের কোণা টিপে এবার ও হাসে।

—হুঁ, তা কতকটা সত্যি। ঠিক ধরেছ।

ইস্কুলের ইতিহাস পড়া একেবারে মনে থাকত না। রাত জেগে দারুণ মুখস্থ করতাম। সকালে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে মনে হত মাথার ভেতরটা ফাঁকা। মুখস্থ করা পড়া পাখা মেলে কোথায় যেন উড়ে গেছে।

খিল খিল করে ও হাসল।

অমিয়বাবু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন ও আর একবার এদিক ওদিক তাকালেন। ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট বাড়ি। পিছনে আম লিচু জামের বন। সামনে ঘন হেনার ঝোপ। আম না লিচু গাছে একটা পাখি খুব টি-টি করে ডাকছে।

—ভীষণ চুপচাপ তোমাদের বাড়িটা। জঙ্গলের মতন নিঝুম মনে হয়।

—আপনি তো জঙ্গল ভালবাসেন।

—কি করে বুঝলে! ভায়লেট কালারের ফ্রক পরেছে আজ ও। ডান হাতে খাবারের প্যাকেটগুলো। বাঁ-হাতে পিঠ থেকে একটা খোলা চুল টেনে এনে আঙুলে জড়ায়।

—তা না হলে পাখি ভালবাসেন কেমন করে। ফুল ভালবাসেন কেন। আস্তে বলল ও।

—হুঁ, তাও বটে। ধরেছ ঠিক। পাঞ্জাবির কোণা দুটো একটু তুলে ধরে অমিয়বাবু সামনের সোফাটায় বসেন। সারাক্ষণ ট্রাম বাস মানুষের হৈ-চৈ-এর ভেতর কেমন মাথা ধরে। হাঁপিয়ে উঠি।

—টুটুনকে নিয়ে এলেন না কেন।

—ও এলে তোমার ভাল লাগত?

—একটু একটু লাগত বৈকি। ঠোঁটের কোণা টিপে আবার হাসে ও।

—আমার মনে হয় না এটা সত্যি বললে।

—কেন বলুন তো! আর সোজা করে তাকায় না ও। থুতনি তুলে মাথার ওপর পাখাটা দেখে। যেন ঠোঁট মোচড়ানো হাসিটা গোপন হঠাৎ ও ওপরের দিকে মুখটা তুলে ধরে।

—আমার দিকে তাকাও। অমিয় শব্দ না করে হাসেন।

—বলুন। ও চোখ নামায় না। তখনও পাখা দেখছে।

—আমার মনে হয় টুটুন এলে তেমন করে আমাদের গল্পই জমত না। এই জন্যই তো ওকে আনিনি। একটু থেমে থেকে অমিয়বাবু আবার বলেন, একটা গুমরো-মুখো মেয়ে। তোমার মতন মোটেই হাসি-খুসি নয়।

—চা খাবেন না কফি!

—আগে আমার কথার জবাব দাও। হাঁটুর ওপর দু হাত আড় করে শুইয়ে রেখে অমিয় সোফার পিছনে শরীরটা হেলিয়ে ঢিলে হয়ে বসেন।

(ক্রমশঃ)

॥ অমর সাহিত্যের বই ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
কাঞ্চনরাগিনী ৮৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
কামনার ধূপ ১০৲

সুমথনাথ ঘোষের
ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর
নীল পর্দা ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কিরীটী অমনিবাস
ষষ্ঠ খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নবতম
তিনে একে চার আসন্ন প্রকাশ

ভৃগুজাতকের
হাত দেখতে শিখুন ৪৲

মহশ্বেতা দেবীর
অজানা ৪॥

অমর সাহিত্য প্রকাশন. ৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

পুনশ্চ

অধুনা স্কুলে বিজ্ঞান-বিষয়ক বিভিন্ন মানের গ্রন্থ বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ্য হিসাবে পঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীগুলিতে যেসকল গ্রন্থ প্রাথমিক বিজ্ঞানচর্চার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট, তার দ্বারা বস্তুবিষয় সম্বন্ধে ছেলে-মেয়েদের কোন জ্ঞান হয় না। অথচ এই বস্তুবিদ্যার অনুশীলনের বিশেষ আবশ্যকতা বিজ্ঞানচর্চার পূর্বেই অনুভূত হয়ে থাকে এবং এই বিষয়টির গুরুত্ব একদা শতাধিক বৎসর পূর্বেও স্কুলের পাঠ্য হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছিল।

হুগলী নর্মাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সেদিক থেকে একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ১২৭৫ সালে এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, তার পূর্বেই এর একাদশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থখানির মধ্যে পাঁচটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে কাচ কর্পূর চন্দন ববার হিঙ্গু টার্পিন ধুনা আলকাতরা কস্তুরি লাক্ষা বেশম চা কাগজ সর্পবিষ সিরিশ পশম শিং-দাঁত-অস্থি গন্ধক পারদ অভ্র মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য মুবংগার সীসা লৌহ যবক্ষার দস্তা হরিতাল প্রবাল আতর সাবান বারুদ ও হীরক প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়বস্তুর প্রাথমিক পরিচয় সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচিত হয়েছে।

প্রত্যেকটি বিষয়ই যে কিরূপ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ এবং অল্পবয়সী ছাত্রদের পক্ষে শিক্ষণীয়, তা উক্ত গ্রন্থের 'তৈল' নামক একটি নিবন্ধ থেকেই পাঠকবর্গ উপলব্ধি করতে পারবেন। বর্তমান সময়ে তেল,—তা সে সরিষা, নারিকেল তিল বা বাদাম যে বস্তুর তেলই হোক না কেন, যেভাবে আজ দুর্মূল্য হয়ে, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বের ঘৃতের মূল্যকেও বহু ব্যবধানে হার মানিয়েছে তাতে তেল সম্পর্কে পুরাতন এই আলোচনাটি সাধারণের কাছে বহু তথ্যের সন্ধান দিয়ে আজও কৌতূহল নিরসনে সাহায্য করবে বলেই আমাদের ধারণা।

।। তৈল ।।

তিল হইতে যে স্নেহ নির্গত হয়, বাস্তবিক তাহাকেই তৈল বলা যায়। কিন্তু এক্ষণে অন্যান্য দ্রব্যজাত ঐরূপ পদার্থ মাত্রেই তৈল শব্দে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রায় সকল তৈলই ঈষৎ পীতবর্ণ, তরল দীপ্য ও জল অপেক্ষা লঘু। তৈল আমাদিগের সংসারযাত্রা নির্বাহের এক প্রধান উপযোগী পদার্থ। ইহা আমরা আহার করি গাত্রে মর্দন করি, অন্যান্য দ্রব্যে মাখাইয়া তাহার দুর্গন্ধ দূর করি ও জ্বালাইয়া অন্ধকার নিবারণ করি। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ বস্ত্র ও শিল্পকার্য্যসমূহে যে ইহার কত প্রয়োজন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

তৈল নানাপ্রকার, তন্মধ্যে অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ হইতে কতকগুলি প্রাণী-শরীর হইতে ও কতকগুলি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে উক্ত ত্রিবিধ তৈলেরই সচরাচর প্রচলিত কয়েক প্রকার মাত্রের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

তিল তৈল—তিলের বীজ সকল শিম্বীর অভ্যন্তরে জন্ম। উহার আকার যেরূপ তাহা সকলেই অবগত আছেন। উহাদিগের বর্ণ দুই প্রকার হয়, কৃষ্ণ এবং শ্বেত। তিল সকল কিঞ্চিৎ জল সংযুক্ত করিয়া ঘানি যন্ত্রের অভ্যন্তরে দিয়া পাক দিলেই উহারা পিষ্ট হইয়া এক দিক দিয়া কল্ক (খইল) এবং অপর দিক দিয়া তৈল নির্গত হইয়া পড়ে। তিল হইতে শতকরা ৪০।৪২ সের উত্তম তৈল নির্গত হয়। তিল তৈল অতিশয় স্নিগ্ধ, অন্যান্য তৈল অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ।

যাহাকে পুষ্প-বাসিত তৈল অর্থাৎ ফুলেল তেল কহে তাহা তিল হইতে উৎপন্ন হয়। তিলের অতিশয় গন্ধগ্রাহিতা শক্তি আছে, অর্থাৎ উহা যে দ্রব্যের সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই দ্রব্যের গন্ধ অচিরাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া লয়। এই নিমিত্ত লোকেরা কোন পাত্রের উপর তিল ছড়াইয়া তাহার উপরিভাগে গোলাব মল্লিকা জাতি বা অপরবিধ সুগন্ধি পুষ্পের দলসকল ছড়াইয়া তদুপরি তিল ও তদুপরি পুষ্পদল, এইরূপে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখে। ২।১ দিন পরে পর্য্যুষিত পুষ্প সকল বাহির করিয়া অভিনব পুষ্পদল পূর্ব্বোক্তরূপে বিন্যস্ত করে। এইরূপ কয়েকদিন করিলেই তিল সকল পুষ্পের গন্ধে সুবাসিত হইয়া অতিশয় সুগন্ধি হয়। তখন উহাকে মাড়িলে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাই ফুলেল তেল। ফুলেল তেল অতিশয় স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি কিন্তু অধিককাল বাতাস পাইলে অত্যন্ত দুর্গন্ধি হয়।

অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসকেরা তিল-তৈল দ্বারা গুড়ুচী প্রভৃতি নানাবিধ পাকতৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

সার্ষপ-তৈল—সর্ষপেরও বীজ দুই প্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেত সর্ষপ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিষ্পীড়ন করিলে শতকরা ৩৬ এবং কৃষ্ণবর্ণ হইতে ২৮।২৯ অংশ তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সার্ষপ তৈল ঈষৎ পীতবর্ণ ও কিঞ্চিৎ ঝাল। এই তৈলে গন্ধকের কিঞ্চিৎ অংশ আছে এই জন্য ইহা গাত্রে মাখিলে ব্রণ ও চুলকোণা সকল নষ্ট হয় এবং ক্ষতভাগের উপর দিয়া রাখিলে ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

নারিকেল তৈল—এই তৈল দুই প্রকার প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের শাঁস ছেঁচিলে যে দুগ্ধ নির্গত হয়, তাহা অগ্নিতে জ্বাল দিলে উহার উপরিভাগে তৈল উত্থিত হয়, এবং ঐ শাঁস সকল খণ্ড খণ্ড রূপে কাটিয়া উত্তম রূপে শুষ্ক করত ঘানি গাছে নিষ্পীড়ন করিলে একেবারে উত্তম তৈল বহির্গত হয়। অন্যান্য তৈল অপেক্ষা এই তৈল অধিক স্বচ্ছ; ইহা অল্প মাত্র শীতল হইলেই জমিয়া ঘনীভূত হয়। এই তৈল অনেক ঔষধে লাগিয়া থাকে এবং মোমের সহিত মিশ্রিত করিলে ইহাতে উত্তম বাতি ও শুকো মলম প্রস্তুত হয়।

এরণ্ড তৈল—এরণ্ড অর্থাৎ ভেরেণ্ডা বৃক্ষের বীজের শাঁস সকল নিষ্পীড়ন করিলে যে তৈল নির্গত হয় তাহাকেই এরণ্ড তৈল বা রেড়ির তৈল কহে। ইংরেজী ভাষায় ইহার নাম কাস্টার অয়েল। এই তৈল কিঞ্চিৎ গাঢ়। ইহা নানা প্রকার ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহাতে উত্তম জোলাপ হয়। তদ্ভিন্ন নানাবিধ শিল্পকার্য্যেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

মসিনা তৈল—তিসি বা মসিনা হইতে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকে মসিনা তৈল কহে। এই তৈলও কিঞ্চিৎ গাঢ়। রুসিয়া ও গ্রীনল্যাণ্ড নিবাসী লোকেরা অতি সুখাদ্য বলিয়া এই তৈল আহার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার অধিকাংশই শিল্পকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়।

গর্জন তৈল—চাটগাঁ পেগু ত্রিপুরা আসাম প্রভৃতি দেশ সমূহে গর্জন নামে এক প্রকার প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মে তাহার গাত্র হইতে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকে গর্জন তৈল কহে। শীতকালে উক্ত বৃক্ষের গুঁড়ির এক স্থানে চাঁচিয়া অগ্নিদ্বারা কিঞ্চিৎ দগ্ধকরত একটি ছিদ্র করিয়া দিলে তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে ঐ তৈল নির্গত হয়। গর্জন তৈলে একপ্রকার তীব্র গন্ধ আছে। ইহা কোন কোন ঔষধে ও শিল্পকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বোক্ত তিল নারিকেল ও সর্ষপাদি ব্যতিরিক্ত অন্য নানাবিধ ফল ও বীজ হইতেও তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এস্থলে বাহুল্য ভয়ে তাহাদিগের বিবরণ সকল লিখিতে পারা গেল না।

ক্ষপণক

আর্থিক প্রসঙ্গ

ভারসাম্যমূলক অর্থনীতি

ইকোসিস্টেম :

ধানঘড়ির প্রবেশ পথে আমাদের ভাল-ভাবেই অভ্যর্থনা করেছিল। এর পর ৩০ কিলোমিটারের মত অবশ্য পথ, মেবামতির কাজ সবে শুরু হয়েছে। কারণ, পার্কই খুলেছে মাত্র ২।৩দিন। ১লা জুন থেকে ৩১শে অকটোবর পর্যন্ত কর্বেট ন্যাশানাল পার্ক সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। আমরা যেদিন প্রবেশ করছিলাম সেদিন ছিল, ২রা কি ৩রা নভেম্বর।

পারমিট ইত্যাদি দেখানোর পর গেটের পাশেই চায়ের স্টলে চা পান করতে নামলাম। প্রতিহারদেরই একজন এই পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল বহুত টেম লাগ যায়গা,—কারণ অরণ্য পথ এখনও আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে ঠিক প্রস্তুত নয়। বোধহয় স্টলের ঠিকাদারের সঙ্গে দ্বারপালদের বখরারও বন্দোবস্ত আছে।

সায়াহ্নের দিকে অরণ্যের অনাস্বাদিত-পূর্ব পরিবেশে চা পান করছি এমন সময় দৃষ্টি পড়ল দৌবারিকদের একজন ঠিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না হলেও বিশেষভাবে গাড়ীর ভেতরটা পরীক্ষা করছে। পাঁচসাত গজ দূরে বসাই—বসে রয়েছি, সুতরাং কষ্ট তুলে দেবার প্রয়োজন বোধ করি নি। সরকারী কর্মচারীর এ কি ব্যবহার? মনে যে ভাবের উদয় হল তা বোধহয় আশঙ্কা ও অস্বস্তির সমন্বয়। প্রশ্নচ্ছলেই প্রতিবাদ করলাম : কেয়া করা রহা হো? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল : দেখ রহা হো কোই কুত্তা-বিল্লী ত নেই হ্যায়। অবাক হলাম। আপন পরিবেশে বন্য জন্তু দর্শন করতে এসেছি কুত্তা-বিল্লী সঙ্গে নিয়ে আসব কেন? হাতেই ছিল পার্কের গাইড-বুক বা বুকলেট। এক রকম ছোঁ মেরে তা কেড়ে নিয়ে দৌবারিকটি মাঝখানের একটি পৃষ্ঠায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, আপ পড় লেও। পড়লাম লেখা আছে : ডিজিটরস শুড নট ইনট্রোডিউস এনি অ্যানিম্যাল, ডোমেসটিক অর ওয়াইল্ড, ইন টু দ্য পার্ক।

আধা অনুধাবন করলেও বিধিটির তাৎপর্য সম্বন্ধে উত্তরপ্রদেশের ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন শ্রীউপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি তখন তত্ত্বাবধান কার্যে ধিকালাব বন বিশ্রামাবাসেই ছিলেন। উপাধ্যায় মহাশয় সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দিলেন : বিকজ ইট মে ডিসটার্ব দ্য ইকোসিস্টেম।

ইকোসিস্টেমে বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে সারা বিশ্ব আজ মোটামুটি সচেতন হয়ে উঠেছে, এবং সচেতনতাই হল বন্য প্রাণী সংরক্ষণের আসল ও চূড়ান্ত তাৎপর্য। ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করলে বিষয়টি প্রকৃতি বা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখারই প্রশ্ন, এবং অর্থনীতির দিক দিয়ে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারসাম্য ও অর্থনীতি :

ভারসাম্যকে অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ধারণা বলে অভিহিত করা যায়। আডাম স্মিথ রিকার্ডো প্রভৃতি বাজার-ব্যবস্থার বিশ্লেষণে ভারসাম্যের ব্যাখ্যা করলেও ধারণাটিকে পরিস্ফুটিত করে তার যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করেন অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২—১৯২৪)। এর দরুণই অর্থনীতি হয়ে দাঁড়ায় ভারসাম্য-সূচক অর্থনীতি বা ইকুলিব্রিয়াম ইকনমিকস। মার্শালের ছাত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ জে এম কেইনসের (পরে লর্ড কেইনস) ভাষায় মার্শাল এক নতুন কোপারনিকান সিস্টেম সৃষ্টি করেছিলেন, যে সিস্টেম বা ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিশ্বের সকল উপাদান পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতের এবং পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে নিজ নিজ স্থানে থাকে। মার্শাল বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সহসা উল্লম্ফন প্রকৃতির রীতি নয়—নেচারা নন ফ্যাসিত সলটাম। সুতরাং ভারসাম্য বজায় রেখেই সময়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

মার্শালের সময়েই অনেক অর্থনীতি-বিদ ভারসাম্য নয়—পরিবর্তনেই অর্থনীতির অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়বস্তু বলে মনে করতে থাকেন। যুদ্ধ বিপ্লব মহামন্দা সামাজিক সংঘাত যখন মানুষকে বিব্রত করছে তখন কল্যাণকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্থিতাবস্থা, বজায় রাখার প্রশ্ন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন কি করে? তারপর আছে উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির প্রশ্ন — দ্য কোয়েশচান অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ।

সমৃদ্ধির সীমা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সেদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কোন সীমা নেই। সুতরাং দৃষ্টি দাও মোট জাতীয় উৎপাদন—জি এন পি—বৃদ্ধির দিকে। এ হল আবার মডেল বা ইনপুট-আউটপুট ট্যাবলোর প্রশ্ন মাত্র।

হঠাৎ প্রশ্ন উঠল সমৃদ্ধির সীমা সম্বন্ধে। 'ক্লাব অফ রোম' ইত্যাদি কম্পিউটারের সাহায্যে যে সব তথ্য পরিবেশন করলেন তাতে আঁতকে ওঠা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই : পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরে উড়োজাহাজ আকাশে আর উড়বে না, রাস্তাঘাটে মোটরগাড়ী আর চলবে না, কয়লা ফুরিয়ে গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদন অকল্পিতভাবে হ্রাস পাবে, লৌহ আকরের সঞ্চয় শেষ হলে মানুষকে আবার সেই প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে হবে ইত্যাদি। মোট কথা, সমৃদ্ধির সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঘটবে সভ্যতার রোজ-কেয়ামত।

রোজ-কেয়ামতের নতুন আশঙ্কা :

পরে অবশ্য ক্লাব অফ রোম প্রভৃতি কিছুটা আশাবাদের বাণী বিতরণ করতে শুরু করেন : না অত তাড়াতাড়ি ঐ রকম কিছু ঘটবে না—স্থল ভাগের সম্পদ শেষ হলেও রত্নাকর ত আছেন। রত্নাকরের সাম্রাজ্য যে ধরিত্রীর দুই-তৃতীয়াংশের ওপর। তা ছাড়া মানুষ কি ভূভাগের সকল সম্পদের সন্ধান পেয়েছে?

কিন্তু এক দল সতর্ক করেছেন—মানুষ সমৃদ্ধির অনুসরণে বসুন্ধরা-ব্যবস্থা বা ইকোসিস্টেম যেভাবে ধ্বংস সাধন করে চলেছে তাতে রোজ-কেয়ামত অন্য দিক দিয়ে ঘনিয়ে আসবে। বন্য প্রাণ্য সংরক্ষণের দাবী এই আশঙ্কারই অন্যতম প্রকাশ।

সন্দেহবাদীরা প্রশ্ন করে থাকেন : বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ মানব-সভ্যতার ভবিষ্যতের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত? বাঘ-সিংহ-গণ্ডার-হাতী-জলহস্তী যদি পৃথিবী থেকে বিলুপ্তই হয় তবে ক্ষতি কি? কেউটে-গোখরো সাপের জাত যদি শেষ করে ফেলা হয় তাতে কি ভালই হবে না? সর্পাঘাত থেকে কিছু মানুষ ত প্রতি বছর বাঁচবে।

এই সন্দেহবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিজ্ঞানীদের যুক্তি হল সংক্ষেপে এই রকম: কোন জীব বা প্রজাতিকে ধ্বংস করলে মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজেরই বিপদ টেনে আনবে। কারণ, বাস্তব-ব্যবস্থায় মানুষ ও বিভিন্ন জীব পরস্পরের সঙ্গে জটিল কিন্তু নিশ্চিত সম্পর্কে সম্পর্কিত। যদি কোন প্রজাতির বিলুপ্তির মাধ্যমে এই পারস্পরিক সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা হয় তবে সম্পূর্ণ অকল্পিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। মাইকেল ওয়েবস্টারের ভাষায় বলা যায়, ফল কি ঘটবে সে-সম্বন্ধে এখনই কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যখন ঘটবে তখন আর কোন উপায় থাকবে না।

বিগত পাঁচ দশকে চীনের কমিউনিস্টরা চড়ুই পাখির বংশ শেষ করেত বদ্ধপরিকর হয়, কারণ চড়ুই পাখিরা বহু পরিমাণে ধান ও বীজ খেয়ে ফেলত। অসংখ্য চড়ুই পাখি মেরে ফেলবার পর চীনেরা বুঝতে পারে যে পাখির ঐ প্রজাতি শুধু বীজ-ধানই খায় না পোকামাকড়ও খেয়ে ফেলে। আর পোকামাকড় যে পরিমাণ শস্য ধ্বংস করে চড়ুই পাখি তার একাংশও ধ্বংস করে না। ফলে চড়ুই পাখি অভিযান বন্ধ করা হয়।

মাত্র দু-তিন বছর আগে পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় বহু সংখ্যায় জলহস্তীকে মেরে ফেলা হয়, কারণ জলহস্তীরা শস্য ধ্বংস করছিল। জলহস্তীর সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাবার পর দেখা যায় যে ঐ অঞ্চলের প্রধান মৎস্য—টিলাপিয়ার (তেলাপিয়া নয়) বংশও উজাড় হতে চলেছে। কারণ, জলহস্তীদের দেহ-নির্গত উপাদানসমূহই ছিল জলজ গুল্ম ইত্যাদির সার। যে গুল্ম হল টিলাপিয়া মাছের প্রধান খাদ্য।

আর্জেন্টিনায় শিকারীরা কুমীর প্রায় শেষ করে ফেলার পর দেখা যায় পিরানহা নামে এক রকম মাছের অস্বাভাবিক বংশ বৃদ্ধি ঘটছে। এর দরুণ নদীতে নামাই মুশকিল, গরু-ঘোড়া নিয়ে হেঁটে নদী পার হওয়া ত দূরের কথা। গরু-ঘোড়া নিয়ে হেঁটে নদী পার হতে হলে আগে একটি পশুকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দিতে হয় তারপর মাছের ঝাঁক সেদিকে গেলে নদী পার হওয়া সম্ভব হয়।

ব্রেজিলে শিকার এবং কীটপতঙ্গনাশক দ্রব্যের ব্যবহারের ফলে বুনো বিড়াল ও পেঁচার সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পেলে দেখা যায় যে মানুষের বসতি রোগের জীবাণু বহনকারী ইঁদুরে ভরে গেছে।

আমারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনী। প্রায় দশ বছর আগে হাজারিবাগ থেকে ৮।১০ মাইল দূরে মারহান্দ একটি বড় কৃষি খামারে কয়েক দিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে রাত্রে একদিন বাঘের ডাক শুনলাম। পরের দিন খামারের মালিক (একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী) পরের দিন ঘটনাটা জানালাম। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন : বাঘ ত আছে। তবে সংখ্যায় ৩।৪টের বেশী বোধ হয় হবে না।

—মারেন না কেন?

—মারলে হরিণে খামারের কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। ওরাই হরিণদের দূরে সরিয়ে রাখে। মাত্র গরু-ছাগলগুলো সামলে রাখতে হয়।

ভদ্রলোক ইকোসিস্টেম বা ভারসাম্যের উল্লেখ না করলেও এটা হল তারই কথা। বরবেট পার্কে উত্তরপ্রদেশের ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন ইকোসিস্টেম শব্দটি ব্যবহার করলেও এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন নি—করার সুযোগ অবশ্য ছিল না। তাৎপর্য যে কি বিজ্ঞানী বা ধনবিজ্ঞানীরা ঠিক আজও জানেন না। তবে প্রখ্যাত মার্কিন জীববিজ্ঞানী কীথ স্মিনার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, ইকোসিস্টেম নষ্ট হলে অনেক প্রজাতিই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে এবং এই তালিকায় মানুষও থাকবে।

সুতরাং মানুষকে যদি বাঁচতে হয় তবে স্থিতাবস্থা যথাসম্ভব বজায় রেখে তবেই পরিবর্তনের পথে চলতে হবে। নইলে রোজ-কেয়ামতকে এড়ান যাবে না। বাঘ-সিংহ-গণ্ডার-হাতী-কুমীর সংরক্ষণের আসল প্রকৃত অর্থনৈতিক তাৎপর্য এখানেই।

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

প্রকাশিত হলো নতুন উপন্যাস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

মেঘের মিনার ৮.

খনির নতুন মণি ১২৲ দুটি প্রতীক্ষার কারণে ৮৲

আনন্দরূপ ১০৲

অপরিচিতের মুখ ৭৲ সিকেপিকেটিকে ৫৲

রূপের হাটে বিকিকিনি ১০৲

প্রফুল্ল রায়-এর নতুন উপন্যাস

শীর্ষবিন্দু ১০৲

রৌদ্রঝলক ১০৲ আমার নাম বকুল ৭৲

সুখের পাখি অনেক দূরে ১০৲ নয়না ৪৲

আলোয় ফেরা ৯৲ (রাজা নামে চিত্রায়িত হচ্ছে)

নিজের সঙ্গে দেখা ১০৲

* পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন *

দে'জ পাবলিশিং C/O দে বুক স্টোর, কলিকাতা—১২

(৩৪-৫০৩৫)

পাপ টালি কালো হয়

কামাল হোসেন

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল আনিসা। মাথায় এক রাশ রুক্ষ চুলের এলো খোঁপা— অনেকদিন তেল না দেওয়ার ফলে অদ্ভুত রক্তাভ আচ্ছন্নভাব।

ঘর মানে এক একটি চৌখুপী—পাশাপাশি গায়ে গা লাগিয়ে একান্নবর্তী সংসারের আদলা নিয়ে ভাগ বাটোয়ারা করা পৃথকীকৃত পরিবার।

ভোর রাত্তিরে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, দুপাশে সারি দেওয়া ঘরগুলির মাঝ বরাবর চলে যাওয়া কাঁচা গলিপথে জল জমে বিচ্ছিরি রকম কাদা। আবুল মিয়ার একপাল মুরগী এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করছে। কেমন একটা নিস্পৃহ দৃষ্টি নিয়ে আনিসা নির্বাক। সমনের ঘরগুলির শরীরে বেবেকাব দেওয়া চুনের প্রলেপের ভিন্ন সম্মোহন। নোনা ধরা ইটগুলির ওষ্ঠহীন হাসি এখন আর আনিসাকে বিচলিত করে না।

হাসপাতালের আয়া মেরী দিদি এখনো ফেরেনি। আজ রাতে ডিউটি ছিল। ওর বাচ্চা ছেলে জনি এখনো শুয়ে আছে। দরজা বন্ধ রয়েছে।

পরনের মরলা রঙিন শাড়িটা কৃশ শরীরে ভালোভাবে জড়িয়ে আনিসা গলা উঁচিয়ে দেখল ও-পাশে মৌলবী সাব চটকলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। দাড়ির সবটাই সাদা মাথার চুলেও কালোর চিহ্ন নেই গায়ে সরু সরু চেক কাটা শার্ট আর সাদা পায়জামা।

ঠিক ধর্মগুরু অর্থে নয় দিনে পাঁচবার নামাজ পালন, মোটামুটি শান্ত স্বভাব বা সহজ কথায় সৌম্য চেহারার মানুষদের এখনে ওই একই সম্বোধন—'মৌলবী সাব' চিহ্নিতকরণ। যেমন জি পি ও র বে পিওন ভদ্রলোক ও কোলটাতে আছেন সামান্য লেখাপড়া জানেন, সকলের কাছে তিনি 'মাস্টরসাব।

ভোরবেলার শীতল নির্জনতায় এই পরিবেশ, এই মুহূর্তে এক রকম স্থবিরতার মোহ সঞ্জীব। একমাত্র যাদের চটকলে চাকরি আছে, ডিউটির সময় নির্দিষ্ট রাখতে ছুট দিতে হয়; বেলা বাড়ার উজ্জ্বল জন্মযন্ত্রণায় দৈত্যের স্বপ্নভঙ্গ হবে।

চমকপ্রদ বিস্ময়ে আনিসার শাড়ির আঁচল খসে গেল। হায় আল্লা—কত কিছুই যে দেখে নেতে হবে! সাত সকালে ড্যানি একটি মেয়ে নিয়ে রিকসা থেকে নামছে।

বহুব বাইশ-তেইশের ডানিয়ে চোখে মুখে রাত জাগার ক্লান্তি। কালো রংয়ের জিনের বেল-বটম গায়ে রঙিন গেঞ্জি গলায় জনলীল রুমাল। ক'মাস হল এ বস্তিতে এসেছে। কথায় চালচলনে একেবারে একালের। চিবুকের দুপাশে অস্পষ্ট নির্মমতা। তার উপার্জনের প্রকৃত সোপান কোথায় গিয়ে পেঁছেছে, সেসব নিয়ে কারোর মাথাব্যথা নেই। যৌবন আছে জুয়ার টেবিলে বসে সেটাই তো তোমার একমাত্র টেকক্কা। মদ, মেয়েমানুষ, স্মাগলিং—কোনোটাই তোমার হাতের নাগালের বাইরে থাকা উচিত নয়। এক বিচিত্র উষ্ণতা ড্যানির চতুর্দিকে সর্বক্ষণ আত্মহারা। হয়তো ড্যানি নিজেও জানে না কিংবা ভুলে যেতে চায়, সদ্যখ্যাত হিন্দী চিত্রের এক মারকুটে নায়কের সাদৃশ্যে তার চলাফেরা এবং নামকরণের অন্তরালে প্রকৃত মানুষটি কে?

রিকসাওয়ালাকে কম পয়সা দেবার জন্য সামান্য ঝগড়া হবার উপক্রম হয়েছিল। হাতের লোহার বালাটা ঘোরাতে ঘোরাতে অশ্লীল ভাষায় ধমক দিল ড্যানি। কাঁধের উপর গামছা দিয়ে একবার মুখ মুছে নিয়ে পাল্টা গাল দিতে দিতে রিকসাওয়ালা চলে গেল। রিকসার ঠুন ঠুন শব্দ শুনতে আনিসার ভারী ভালো লাগে।

ফিরিঙ্গি মেয়েটির কোমর ধরে আসতে আসতে আনিসার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল ড্যানির—কী ভাবি, লতিফ ভাই কাজে চলে গেছে?

মাথাটা একবার নাড়িয়ে নিজের কুঠরীর মধ্যে ঢুকে গেল আনিসা। এ ছেলেটিকে সে সহ্য করতে পারে না। চোখের দৃষ্টিতে কোনো লজ্জা শরমের বালাই নেই।

বাড়িওয়ালীর বোন অর্থাৎ জুম্মন মিঞার বউ স্বামী পুত্র নিয়ে এদিকটাতে থাকে। নির্দিষ্ট খুপরীর সঙ্গে সামনের সামান্য পরিসর বাঁশের খুঁটির অবলম্বনে কয়েকটি ছেঁড়া চটের ঘেরাটোপে ঢাকা—দিব্যি একফালি ঘেরা জায়গা। ঘরের মধ্যে জুম্মন মিঞার জোয়ান মেয়েটা ছেলে নিয়ে শুয়ে আছে। মেয়েটার স্বামী অন্য একটা মেয়ে নিয়ে ভেগে গেছে। আপাতত মেয়েটার দশা একা একা। বাপের ঘাড়ে রয়েছে। তবে মুস্তাক মিস্ত্রীর মেজ ছেলে আশরফের সঙ্গে ওই ধুমসী মেয়ের নানা অছিলায় আসনাই যে আনিসা একেবারে লক্ষ্য করে না তা নয়।

জুম্মন মিঞার গলা শোনা যাচ্ছিল। ঘরের বাইরের চাতালে শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন পুত্র ফকির বা ফেকুকে চিৎকার করে ওঠাচ্ছিল—ফেকু, ওঠ বাবা—কারখানায় সব চলে গেল—যা বাবা!

আনিসা জানে, কিছুক্ষণ এরকম বিনীত আবেদন, তারপর গালাগাল—ছেলেও ততক্ষণে জেগে উঠবে—বাপকে সেও রেয়াত দেবে না।

বৃষ্টিটা না হলেই কি ভালো ছিল না? রাজ্যের আবর্জনা ঘরের সামনে ভেসে এসেছে। বড় রাস্তাতে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে। সেখান থেকে এই কাঁচা গলিপথে অস্থির অস্বাস্থ্যের প্রলাপ পেঁছুতে কতক্ষণ? আসলে এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শব্দগুলির পরিভাষা শ্রাবণ রাতের ঝিকিমিকি তারার মতো শুধু দূরেই রয়ে যায়।

টিনের কৌটাতে জল ভরে মেয়েদের প্রাকৃতিক কার্য সমাধার নির্দিষ্ট ঘরের সামনে লাইনে এসে দাঁড়াল আনিসা। পরপর গোটা পাঁচ-ছয় কৌটা মগ বদনা মাটিতে বসানো রয়েছে। সব শেষে নিজের কৌটা রেখে আর সকলের সঙ্গে আনিসা গল্পে মেতে গেল। নিজের নিজের স্বামীর কথা, ভাই বা দেওয়ের কথা, ননদ বা আত্মীয়স্বজনের কথা। মেয়েলি পরচর্চায় যা স্বাভাবিক অর্থাৎ অনুপস্থিত প্রতিবেশীর নিন্দা-মন্দ, এখানে চরিত্র প্রধান বিবেচ্য নয় তবু রসালো আলোচনা উৎসাহে ঘাটতি কেন পড়বে? সকল কথার মাঝখানে আনিসার কখনো মনে হয়, ভোরবেলার বৃষ্টিতে কলকাতার তামাম রাস্তাতেই জল জমে যায়নি তো! ওর স্বামী লতিফ এখন তিন চারবার ভ্যানে করে রুটি কেক বিস্কুট দোকানে দোকানে পেঁছে দিতে দিতে যাচ্ছে।

শিকল খুলে নিজের ঘরে ঢুকে আনিসা ভাবনায় পড়ে দুপুরে কী রান্না করা যায়। মিয়াঁ তো হপ্তার রেশনই তোলেনি। একটু বাড়তি কথা বলতে গেলে সব সময় তেবিয়া হয়ে উঠবে, যত ঝক্কি আনিসার মাথার উপর।

ফেকু চলে গেছে। জুম্মন মিয়াঁর হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে না দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ মেলে আনিসা দেখল, জিলিপি কচুরি আর চা সহযোগে সকাল বেলার নাস্তা করছে জুম্মন-পরিবার। যেন এই তো সব ঠিক আছে, খাচ্ছি, দাচ্ছি, ভালো আছে।

ভালো আছি—একথাটা আনিসাই তো বড় মুখ করে সকলকে শুনিয়ে দেয়। তবু যদি বৃষ্টিটা না হত। অতর্কিত রোদ্দুর মুখে এসে পড়ে। কল থেকে জল আনতে যাবার নামেই তার এক গা জ্বর আসে। অথচ এক সময় সারা দিনরাত প্রতীক্ষায় বসে থাকত কখন প্রান্তরের সবুজ কিনারা ছুঁয়ে বাদামী মেঘের লুকোচুরি চোখে পড়বে। এখানে প্রকৃতির অসংগতি চোখে কোনো ব্যথা জাগায় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপাতে গিয়েও চাপতে পারে না সে। বালতি আর ডেকচি নিয়ে কলতলায় গিয়ে দাঁড়াল। কর্পোরেশনের জল। পাশ দিয়ে নর্দমা ময়লাতে থই থই করছে। সামনে বাড়িওয়ালাদের মোষের খাটাল। ছাউনি দিয়ে ঘেরা জায়গায় দশবারোটা কৃষ্ণকায় জান্তব সত্তা কী নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই দ্বারভাঙ্গা থেকে বাজের সন্ধানে আসা জহমন এদের দেখাশোনা করে। উদয়াস্ত খাটে। ছোট বাড়িওয়ালীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা সবাই জানে। কেননা একদা সেও ছিল গয়লাদের মেয়ে। কীভাবে কে জানে বাড়িওয়ালার সঙ্গে তার নিকা হয়ে গেছল—ওই ইসক্-মুহব্বৎ-এর ব্যাপার হবে।

মরণ আর কী! বুড়োর রসও ছিল বটে, মনের ভিতরে খিকখিক করে আনিসা হাসে।

দেওয়ালে ঘুঁটে দেওয়া আছে। খানিকটা জায়গা ছোট চৌবাচ্চার মতো করে তার মধ্যে গোবর সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে। তার পাশে পুরোপুরি ট্যাঙ্কের মতো ঘিরে রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ। প্রয়োজন মতো রবারের নল দিয়ে কল থেকে জল সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। মোষদের স্নান করাতে, খাটাল পরিষ্কার করতে কম জলের দরকার হয়!

আবুল মিঞা সাত-আটটা বালতি ডেকচি নিয়ে পরপর ভরে যাচ্ছিল। পাশে দাঁড়িয়ে মুন্নি প্রতিদিনের মতো গলা চড়িয়ে যাচ্ছিল। ওই এক খাণ্ডারনী মেয়েছেলে। কখনো হাসিমুখে কথা বলতে যেন জানে না।

বহু-ব্যবহৃত পাতলা ময়লা শাড়ির মধ্যে দিয়ে মুন্নির ভেতরকার আবরু প্রায় সবই নজরে পড়ছিল। হোক না আবুল মিঞা বাপের বয়সী, তবু আনিসার লজ্জা করছিল।

আসলে লজ্জাটা করবার মতো শরীর আছে নাকি, যে-দুটি স্পর্ধিত দম্ভ মেয়েমানুষের নাকি সৌন্দর্য, তারই অভাব বড়ো প্রকট মুন্নির দেহে। তবে মুন্নিরও একদিন সেই বিশেষ বয়স ছিল, যখন অতি বড়ো কুৎসিত রমণীর শরীরেও অন্য চটক, সেরকম উচ্ছল কোনো মুহূর্তে আশরফের ভালো লেগেছিল মুন্নিকে, তখন তার কণ্ঠস্বরও নিশ্চয় ছিল নরম কোমল।

বেশ মেয়ে মুন্নি। নিজের ভরে নেওয়ার পর আনিসার বালতি কলের মুখে লাগিয়ে দিল। তখন শুধু কলের প্রার্থিত ছিদ্রের প্রতি অন্বেষণ। পড়ে—জল পড়ে, চোখেরও পাতা নড়ে।

বালতির উপর জল ভরা ডেকচি বসিয়ে ঘরে আসতে আসতে একটু হাঁপিয়ে পড়ল সে।

হাসপাতাল থেকে মেবী দিদি এসে গেছে। কালো লিকলিকে দেহ, মাংসের বাহুল্য নেই। পূর্বপুরুষ আদিবাসী ছিল। কৃশ্চান মিশনারীদের প্রভাবে তার মা ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের কাছেই মানুষ হয়েছে, সামান্য কিছু সেবিকার কাজ শিখেছিল, এখন হাসপাতালে আয়ার কাজ করছে।

ঘুম থেকে উঠে জনি ছোটাছুটি করছিল। ছেলের এরকম খেলাধুলোয় মেবী মোটেই খুশী নয়। হয়তো তার মনের গভীর স্বরাজ্য জুড়ে এক হিমানী শ্বেত প্রাসাদের অস্তিত্ব রয়ে গেছে। সুদূর সমুদ্রপারের স্বর্গীয় দীপপুঞ্জে প্রবেশের ছাড়পত্র সে প্রাসাদে জামানত রয়েছে। কোনোদিন তার জনি কি যেতে পারবে না সেখানে? লর্ডদের সামনাসামনি মেলামেশা করতে হলে প্রয়োজনীয় সহবৎ শিক্ষারও তো প্রয়োজন আছে।

মেরীর বোন বেবার শরীরে এখন যৌবনের হিরন্ময় আবর্তন। পড়ালেখা বেশীদূর শেখেনি—কাজ চালানো গোছের অশুদ্ধ ইংরেজি বলতে পারে। নিজের কৃষ্ণাভ ঠোঁট মুখ নাড়িয়ে পরিচয় দেয় 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান'। আসলে বেঁচে থাকার জন্ম-অধিকার

সম্পর্কে সে পুরোমাত্রায় সচেতন। বাঁচতে তো হবেই এবং তা নিজের উপার্জনের বাস্তবতায়।

বস্তুত এ পৃথিবীবাস কয়েক দিনের—ইয়ে জিন্দেগী কুছ দিনকে লিয়ে—জুম্মন মিঞার এ খেদোক্তি অন্য দৃষ্টিকোণে দেখলে ভুল হবে। সে সন্ন্যাসী নয়। সাধারণ গৃহী মানুষ। তবু কী আশ্চর্য, নেই তার নিজস্ব আশ্রয়স্থল। ধৈর্যের নির্মমতা তার পৌরুষকে রূপান্তরহীন দিন রাত্রির স্পর্শ করে হেসে চলেছে।

হাসো নাচো অউর ফূর্তি কর—আনন্দই জীবনের ভবিষ্যৎহীন উৎস-স্বার। তারপর চোখের সামনে যে রাস্তা পড়ে, সোজা চলে যাও, পথ খুঁজে না পাও চিন্তার কিছু নেই তুমি যে নিজের ইচ্ছেমতো একটি পথে চলছ—এই গতির শিহরণই পরম আনন্দ।

শাড়ি-কাপড়েওয়ালা ...জাঙ্গিয়া ব্লাউজ গেঞ্জি...চিৎকার করতে করতে ফেরিওয়ালা বস্তির পথ পরিক্রমণ করছে। কপালে ঘামের বিন্দু। পিঠে কাপড়ের বোঝা। পায়ে ক্যাম্বিসের শতছিদ্র চটি।

সামনের গলি পেরিয়ে আরো ভেতরে চলে গেল কাপড়ওয়ালা। জুম্মনের চোখ চক চক করে। কতো দিন গায়ে গেঞ্জি পরেনি। ও-সব ছোকরা লোকের ফ্যাশান।

—ইধার ইটা লাগেগা তো দেখা স্বগা...

—কৌন হ্যায়?

আসমানী শাসাচ্ছিল রফিককে। রফিকের মুখে অপরাধীসুলভ মজা করার হাসি। আকাশে অনেকগুলি পায়রা উড়ছিল। ভোরের মেঘ বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই আবহাওয়ায়। সাদা পায়রাগুলির পালকে দুপুর বেলার উজ্জ্বল রোদ ঝকঝক করছিল। পায়রাদের লক্ষ্য করে ইঁটের টুকরো ছুঁড়েছিল রফিক। একটি টুকরো বোধ করি আসমানীর পায়ের কাছে এসে পড়েছিল।

—শালা ছোকরালোক...আপন মনে গজ গজ করতে করতে সামনের নির্দিষ্ট মাপে কাটা কাগজগুলি নিয়ে ব্যস্ত হয় জুম্মন। ভেতর থেকে ভাঙ্গা থালাতে আটা তৈরী করে আনল মেয়ে ফরিদা। শুধু শাড়িটা শরীরে কোনো রকমে জড়ানো। মেয়ের শরীরের দিকে তাকানো যায় না। ফরিদার মা সামনের মাসে মাইনে পেলে মনে করিয়ে দিতে হবে একটি ব্লাউজের কথা। হতভাগ্য জামাইটা.....

বাপ-বেটি এক মনে ঠোঙ্গা করতে থাকল। কারখানায় কাজ করতে করতে হঠাৎ অ্যাকসিডেন্টে বাঁ হাতের দুটি আঙ্গুল খুইয়ে ক মাস হল চাকরি থেকে খারিজ হয়েছে জুম্মন। ছেলেটা রোজগারের অস্প ট লাই মায়ের হাতে দেয়। এক নম্বরের কুঁড়ে, সরাব খায়, জুয়ো খেলে, খারাপ জায়গায় যাওয়া আসা করে।

ফরিদার মা গেছে সাহেব বাড়িতে রান্না করতে। মেমসাহেব এতটুকু দেরী সহ্য করতে পারেন না।

জলের বালতি ডেকচি রেখে আনিসা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। মেরী দিদি জমিয়ে গল্প করছিল। ওর দিকে তাকিয়ে বলল—কীরে আনিসা পানি আনতে গেছলি বুঝি? এদিকে এসে বস.....কাল মাঝ রাতে জানিস, হঠাৎ একটা ডেলিভারী কেস এসে হাজির, অর্জেন্ট—মেয়েটা খুবই কাৎরাচ্ছিল...।

বুকের মধ্যে সাঁৎসেতে গুমরানি—একটি অসমাপ্ত ভ্রূণ আস্তে আস্তে পরিপূর্ণতার দিকে এগোচ্ছে...ধূসর ছায়া পড়ে শান্ত টলটলে জলের উপর, পাল তুলে একটি প্রার্থিত জলযান সমুদ্র আর মোহনা ছাড়িয়ে ক্রমশ বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে... অন্তহীন জ্যোৎস্না রূপালী কিংখাবের আবরণে মুড়ে দেয় চতুর্দিক.....আনিসার চমক ভাঙ্গে মেরী দিদির কথায়—গেল বছর ছ-সাত মাসে তোর পেটেরটা খসে না গেলে এ্যাদ্দিনে বেশ ডাগরটি হত! কী আর করবি, বল সবই যীশুর ইচ্ছা.....

নিজের স্বামীর কথা বলছিল মেরী—তার স্বামী জাহাজের খালাসী। পৃথিবীর সেই সব সুন্দর-ও সুখী মানুষদের বন্দরে বন্দরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জাহাজের চারপাশে নীল সমুদ্র কত বিচিত্র সব জলপ্রাণী—মাথার উপরে আকাশ, তারো রং নীল—উড়ন্ত অলবাট্রসের ডানাতেও নীলাভ দ্যুতি। অর্থাৎ সব মিলে এক নীল স্বপ্নের অনুরণন খেলা করে চলে মেরীর সর্বাঙ্গে। বহু দিন হল স্বামী চার্লস ঘরে ফেরেনি। কোনো চিঠিপত্রও আসে না। তবু যেন নিজেকে স্বামী-পরিত্যক্তা হিসেবে অপরের করুণার আয়নার সামনে দাঁড় করাতে সব মেয়েই সংকোচ বোধ করে।

কে জানে মানুষটা বেঁচে আছে কিনা। বুকটা টন টন করে ওঠে মেরীর। চোখে মুখে এক অনাবিল গর্বের ছোঁয়াচ ফুটিয়ে বলল—তখন বয়স আর কত, এই রেবাদের মতো হবে। জনির ড্যাডির হেল্প তো চিরকালই ভালো, রেবারা জানে...আরে আমাদের তো দস্তুর মতো লাভ করে শাদি!

সামান্য রসিকতার হালকা আমেজে সকলে সন্তুষ্ট। কে কোথায় কবে ইস্‌ক—ভালোবাসার শাদি দেখেছে. নিজেদের ঝুলি উজাড় করে দেয়। একই গল্পের কতবার পুনরাবৃত্তি হল, কেউ চিন্তা করে না।

খোঁপার মধ্যে টুথ ব্রাশ গুঁজে রেবা রফিকের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। একটু ফাজলামীর ভঙ্গীতে রফিক নিজের বাঁ চোখ টেপে। পুরু ঠোঁটের ফাঁকে হাসি খেলে গেল, রেবা কলতলার দিকে এগোল।

জনি ছোট মেয়েদের সঙ্গে খেলছিল। মেরী গাল পাড়ে—এ লেড়কা, বহুৎ ধান্দাবাজ হো গিয়ারে.....পহেলা নাম্বার ধান্দাবাজ.....

আনিসারা হাসে। মেরী দিদি খুব মজার মানুষ।

নিজের শীর্ণ ছোট খাট শরীর নিয়ে জনি মার কাছে আসে। মায়ের কথার সব অর্থ না বুঝেও একটা কিছু হাসির কথা ভেবে হলুদ হলুদ বাঁকা চোরা দাঁত বের করে।

শহর কলকাতার এই সব মুসলমান প্রধান বস্তিগুলির অধিকাংশ মানুষই যথার্থ অর্থে বাঙ্গালী নয়। ওদের আদিনিবাস বিহার উত্তর প্রদেশ বা পশ্চিম ভারতীয় কোনো অঞ্চল। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই এই বিরাট শহরে ওদের স্থিতি। নিজস্ব বলে ওদের কিছু নেই—না বাড়ি—না সঞ্চয়—না ভবিষ্যৎ। পুরুষানুক্রমে এ ধরনের স্বল্প ভাড়ার খুপরীতে মাথা গুঁজে দিন কাটায়। বর্তমান ছাড়া আর কিছু ওদের যেন জানবার নেই! মহানগরীর বিভিন্ন রকমের জীবিকার খুঁজে নিয়েছে। কেউ এসেছে কয়েক পুরুষ আগে, কেউ কমাস আগে আত্মীয় স্বজনের সূত্র ধরে—এই 'কলকাতা' শহর আরো লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো তাদের কাছেও পরম আশ্বাস। এদের মুখের ভাষাও বিচিত্র—'খোট্টাই হিন্দী' বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে কিছু উর্দু আরবী ফরাসী ইংরেজী এবং অবশ্যই বাংলার মিশেল। পোশাক-পরিচ্ছদেও স্বদেশীয়ানা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। বাঙ্গালীদের অনুকরণে শাড়ি পরার ধরণ-ধারণও মেয়েরা শিখে নিয়েছে। যদিও বোরখার স্তব্ধ প্রকৃতি এখনো ঈশ্বরের মতো দুর্জ্ঞেয় রহস্যে দীপ্যমান।

স্পাম এরিয়া অর্থে যে কদর্য চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবই এখানে সহজভাবে স্পন্দিত যদিও এও ঠিক একটি প্রচণ্ড সামাজিকতার রক্ষাব্যূহ এদের চারপাশে সদাজাগ্রত। ফেলে আসা গ্রামগুলিকে এরা এই শহরের বিভিন্ন টুকরো টুকরো জায়গায় স্থাপিত করেছে। সেই মিলাদ মহফীল, বড়ো পীর সাহেবের নেওয়াজ, ঈদের আলিঙ্গন, এবং সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে সেলাম আলেকুম' বিনিময়।

দাঁত মেজে মুখ হাত ধুয়ে জল ছেটাতে ছেটাতে রেবা কলতলা থেকে ফিরে আসছিল। আবুল মিঞার ঘরের দরজার সামনে চটের পর্দা ঝোলানো। আবরু-রক্ষা 'আর কি! আবুল মিঞা নিজেকে এক খানদানী বংশধারার দম্ভের বৃত্তে বন্দী রেখেছেন। ছেঁড়া চটের পর্দার বিশ্রী রকম ছিদ্রগুলি দিয়ে অন্দরমহলের সব কিছু গোপনতম অস্বচ্ছতাও বাইরে থেকে লক্ষ্য করা যায়। মনে মনে রেবা হাসে।

পর্দা সরিয়ে আবুল মিঞার ছোট মেয়ে নাজিমা এসে দাঁড়াল। দুহাতে ছাই।

—সাত সকালে হাতে ছাই মেখে কী করছিলি? রেবা জিজ্ঞেস করে।

—আর বলিস কেন, সেই হাঁড়ি-বাসন মাজার পালা! হায়রে কানের ওই ফুল দুটো নতুন গড়ালি বুঝি?

—যাঃ সোনার কেন হবে? স্রেফ ইমিটেশান —আমাদের কাছে সবকিছুই এরকম নকল সোনার কারবার! তুই কিনবি? আমি দেড় টাকায় এনে দিতে পারি.....

—ওরে বাবা, দেড় টাকা! আব্বা শুনলে ...তবে যাই বলিস, তোকে কিন্তু ও-সব পরলে বেশ মানায়!

—যা বলেছিস মাইরী—রাতের বেলায় কুইন এলিজাবেথ.....নাজিমার পিঠে একটা চাপড় মেরে ঘরের দিকে পা বাড়াল রেবা।

সামনে দিয়ে আশারফ আসছিল। রেবাকে জোর করে ডেকে দাঁড় করাল। লোভী চোখ নিয়ে ঠাট্টা—রসিকতা করার চেষ্টা করল। সামান্য আদিবসের ছোঁয়াচ পেয়ে রঙিন হল রেবার মুখ। মনে মনে সামান্য মজাও অনুভব করল। এই লোকটাই একদিন 'লাভ' করে মুনিকে শাদি করেছিল। এখন রেবার সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কথা বলছে, যেন পথের মা-খেকো পাওয়া কুকুরটা। মুখিয়ে উঠল রেবা—খবরদার, বেশী বাজে কথা বলবি না—তোর বিবিকে বলে দেব.....তখন দেখবি মজাটা.....

ঘরের মধ্যে এসে আনিসা চারপাশটা একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। এপাশে একটি নারকেলের দড়ি খাটিয়া, এক কোণে তোলা উনুনে জলভরা বালতি ডেকচি আর কিছু বাসনপত্র। মাথার উপর গাঁঠরি করে ঝোলানো কয়েকটি কাঁথা পুরোনো কাপড় চোপড়। গত বছর ঈদে চিৎপুর থেকে কিনে আনা শাড়ি, ব্লাউজ সাষা আর লতিফের পাঞ্জাবি পায়জামা রংচটা একটি তোরঙ্গে সঞ্চিত আছে। দেওয়ালে 'আল্লাহ' মহম্মদ লেখা পুরোনো ক্যালেন্ডার। দিলীপকুমার বৈজয়ন্তীমালার ছবিঅলা একটি ক্যালেন্ডারও একপাশে আছে।

খাটিয়ার পায়ার কাছেই প্রথম আবিষ্কার করল আনিসা। ঘেন্নায় গা শির শির করে উঠেছিল তার। ছোট ছোট সাদা বস্তুর দুটি পোকা কোনোরকমে বাইরে ফেলে নিশ্চিত হল সে। কয়েকটি মোরগ মুরগী নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি করে উদরাস্থ করে ফেলল সেগুলি। এক পাল কাক পাশাপাশি ঘরগুলির টালির ছাউনির উপর বসে তারস্বরে চিৎকার করছিল।

আবার—আবার কোথা থেকে এল এই সব দোজখের কীটগুলো। ছোট ঘরটির এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে ছুটে খেই পায় না আনিসা। অবশেষে বুঝতে পারল উপর থেকে বৃষ্টিধারার মতো পোকাগুলি পড়ছে।

এখানকার প্রায় সব সারি দেওয়া ঘরগুলি এলোটানা একই টালির ছাদের নীচে অপরিসীম ধৈর্য্যে স্থিত। কবে কোনদিন নতুন ঝকঝকে লাল টালির আস্তরণে হয়তো উজ্জ্বল ছিল এ মহল্লা। তারপর রৌদ্র বর্ষণ রৌদ্রের পাশাপাশি ঘোড়দৌড় খেলা।

বাঁশের জাফরি কাটা মাদুরের মতো দেয়া দিয়ে টালির ছাউনির নীচে অংশ সিলিংয়ের মতো ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল।

ঈশ্বরের প্রতি নিদারুণ ক্ষোভে কেঁদে ফেলল আনিসা। তার অত কষ্ট করে তোলা জলের বালতিতে সেই শ্বেতাভ ঘৃণ্য কীট কিলবিল করছে। যেন অশুচি হল তার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে উদ্গত কান্নার প্রবাহ রোধ করতে। বাইরে বাড়িওয়ালীর ঘরের সামনে থেকে ঝগড়ার শব্দ ভেসে আসছিল।

শফি মিস্ত্রী ভীষণ ক্রোধে হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে। ঘর ছেড়ে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি এগোয় আনিসা।

বাড়িওয়ালী সাজিদা খাতুনের স্বামী কয়েক বছর আগে মারা গেছে। ঘর সংসার চালাবার যাবতীয় দায়িত্ব এখন তার উপর। বয়স পঞ্চাশের মাঝামাঝি হলেও শরীরের বাঁধুনি এখনো ঠিক আছে। মাথার চুল অর্ধেক সাদা। এই প্রৌঢ়ার দাপটে তার ছটি জোয়ান ছেলে থেকে মহল্লার সকলেই শঙ্কিত।

সকলেই জানে, সাজিদা এক সময় বাড়িওয়ালা মালেক মিঞার ঘরের চাকরাণী ছিল। বিপত্নীক মালেক মিঞার মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো উচ্ছল প্রাণরস সে সময় তার মধ্যে অবশ্যই ছিল।

বাইরে থেকে এই বস্তির মাত্র কয়েক সারি ঘরের সামান্য বাড়িওয়ালার বোজগারের ভিন্ন ভিন্ন গলিপথ সম্পর্কে আন্দাজ করা খুব একটা সহজ নয়। চারিদিকে দারিদ্র্য ক্ষুধা আর অবশ্যম্ভাবী নগ্নতার প্রেক্ষিতে সাজিদার ছেলেমেয়েদের চটকদার চলাফেরা কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য এনে দেয়।

ঘর ভাড়ার রোজগার তো আছেই তবে সে খুব সামান্য—আসল রোজগার অন্য দিকে দু খানা ট্যাক্সি কলকাতা শহরে ভাড়া খাটছে যার একটি মেজ ছেলে চালায় অন্যটিতে দেশওয়ালী এক ড্রাইভার আছে বটে সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলেটাও কাজ শিখে নিচ্ছে। আর আছে রিকসা তৈরী ও মেরামতের দোকান যার দেখাশোনা করে সাজিদার ছোট ভাই শফি মিস্ত্রী। কিছু রিকসাও ভাড়া খাটছে। এবং কিছু পিছনের বৃত্তি—সাট্টা জুয়া নিষিদ্ধ দেশীয় পানীয়।

এ রকম স্বল্প সংখ্যক পরিবারের হাতে কিছু পয়সা জমলেও অধিকাংশই শিক্ষা-সমৃদ্ধ রুচিশীল জগতের বাইরের বাসিন্দা অন্ধকারের ছায়া এদের চার পাশে। প্রতি সন্ধ্যেতে টেরিলিনের প্যান্ট শার্ট পরে হাতে একটি ট্রানজিস্টার ঝুলিয়ে ছোট ছেলে বুক ফুলিয়ে মহল্লাতে ঘুরে বেড়ায়। এটুকুই ওদের তৃপ্তি। হয়তো অন্ধকারের জগতের মজাটা হচ্ছে আমির ফকির সকলে পাশাপাশি মুখ লুকিয়ে থাকতে পারে। মার-

প্রকাশিত হলো

অজাতশত্রু **নীলডুংরি** কুড়ি টাকা

মাটি আর নেই — প্রফুল্ল রায় — ১২·০০

দেহপট — হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় — ৭·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার কাঠি রুপোর কাঠি — দশ টাকা

হায়নার হাসি — কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় — ১১·০০

নানিষাদ — সৈয়দ মুস্তাফাসিরাজ — ৮·০০

রঞ্জন মজুমদার **বায়োস্কোপিক** বারো টাকা

বাতাসে বিষ — কপিল চৌধুরী — ৭·০০

সনাক্তকরণ — প্রলয় সেন — ৯·০০

নিশাচর **আরক্ত রাত্রি** সাত টাকা

ঝলসানো বরাভয় — শেখর সেনগুপ্ত — ৯·০০

নীল সায়রে — তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী — ৭·০০

প্রকাশিত হলো — সুনীল চৌধুরী

হিমালয়ের মানুষ দশ টাকা

সাহিত্য প্রকাশ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

দাঙ্গা খুনোখুনি সব কিছুই এদের অবসর বিনোদন।

ছেলেগুলো এক একটা গুন্ডা—মনে মনে হিস হিস করতে করতে বাড়ীওয়ালার ঘরের সামনা-সামনি এসে আনিসা দেখল শফি মিস্ত্রী গুম হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে ক্রোধমিশ্রিত সংলাপ নির্গত হচ্ছে—আরে না—এবার চলে যাব নিজেদের গাঁয়ে—কলকাতার মুখে থু..

বেশ ভিড় জমে গেল। একটা মজাদার ব্যাপার। শফি মিস্ত্রী তার মালিক ভাগ্নেদের প্রতি ক্ষুব্ধ। আরে বাবা, তুমি আশ্রিত একথা বোঝো না হে?

আস্তে আস্তে নানা কথাবার্তার মধ্যে থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। যে-ঘরে রিকসা তৈরীর কাজে শফি মিস্ত্রী ব্যস্ত থাকে তার ভেতর দিকে আর একটি ঘর আছে গুণধর ভাগ্নেরা সেখানে তাস জুয়া মদ মেয়েমানুষে নিমগ্ন থাকে। গত রাত্তিরে এক নাচনেওয়ালী মেয়েছেলে নিয়ে আসর বেশ জেমে উঠেছিল। নেশার বিবামহীন মাদকতার ঘোরে বড়ো ভাগ্নের মুখ থেকে অনেক ভাল লাগার অমৃত বাক্য অশ্লীল বাক্যসহযোগে নির্গত হচ্ছিল। বাঈজী তখন স্বেচ্ছানির্বাসিতা, আবহাওয়ায় উত্তেজনার স্বাভাবিক সংকেত। তখন সেই রমণী নাকি একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল, পাশের ঘরে মামা বসে, একটু সংযত হয়ে কথা বললে ভাল হয় নাকি...

স্বভাবতই শৃঙ্খলমুক্ত জলধারার মুখে প্রস্তর খন্ড বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করলে স্রোত আরো মুখর হয়ে ওঠে মামা তো মামা—এখানে গার্জেনগিরি ফলাতে আসবে কোন সম্বন্ধী? মামার উদ্দেশে কিছু অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্য নিক্ষেপ, যা শফি মিস্ত্রীর এত দিনের আত্মাভিমানে যথার্থ বেদনার কারণ ঘটিয়েছে।

রগের চুল সব সাদা হয়ে গেছে ময়লা লুঙ্গির এক প্রান্ত ছিন্ন, ফতুয়ার হাতা বিপু করা, এক পাশে ভাবলেশহীন চোখে মধ্যযৌবনা স্ত্রী বসে আছে। এখন এক রকম অবসন্ন অনুভূতি শফি মিস্ত্রীকে ক্লান্ত করে। উলঙ্গ অর্ধউলঙ্গ ছেলেমেয়েরা হাঁ করে বাবার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গ্রাম মানে তো সেই আরহমানকাল তৃষ্ণার উৎসারণ; বেঁচে থাক কলকাতা—এখানে কল ঘোরালে কর্পোরেশন গঙ্গার ঘোলা জল থেকেও তো বঞ্চিত করে না।

ধীরে ধীরে সব কিছু স্বাভাবিক হয়। সাজিদা ভাই এবং ছেলে উভয় পক্ষের সম্মান বজায় রেখে মিটমাট করে দিল। ভাই-বহিন গলা ধরে খানিক কাঁদল। এক অলিখিত চুক্তির উষ্ণীষ মাথায় দিয়ে রিকসা তৈরীর কারখানায় আবার প্রবেশ করল শফি মিস্ত্রী। মাপ করে কাটা বাঁশের বাতা-গুলি আলকাতরা দিয়ে রং করতে থাকল। প্রয়োজন মত পেরেক ঠোকে। অনেক তৈলাক্ত কালিমা সর্বাঙ্গে আশ্রয় নেয়। পাঁচ টাকা রোজ। রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত কাজ চলে। বড় ছেলে সওকতের বয়স বছর ষোল হবে। প্লাস্টিকের জিনিসপত্র তৈরীর ছোট একটি কারখানায় তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে রোজ দু টাকা বাপের হাতে এনে দেয়। বস্তিতেই এক খুপরিতে দিদি শফি মিস্ত্রীকে বিনা ভাড়ায় সপরিবারে থাকতে দিয়েছে।

হাত নেড়ে রফিককে আনিসা ডাকল। ঘরের মধ্যে এনে চারদিকে সারি সারি ক্ষুদে ক্ষুদে শয়তানদের দেখাল।

মাথা নীচু করে রফিক কি যেন ভাবতে থাকল। আনিসা ব্যাকুলভাবে বলল—ভাইয়া, সকাল থেকে এই জ্বালাতে জ্বলছি, তোমার লতিফ ভাইও তো নেই—তুমি শিগগীর কিছু একটা ব্যবস্থা না করলে খানিক পরে হয়ত আমার কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।

—উপরে কিছু মরে-টরে যায় নি তো ওখান থেকেই তো পোকাগুলো পড়ছে।

—দেখ ভাই, যা হোক কিছু কর।

রফিক তার বলিষ্ঠ দেহ থেকে গেঞ্জি খুলে ফেলল। তারপর দুজনে মিলে ঘরের জিনিসপত্র বাইরে এনে রাখল। মেরী দিদি জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল। আনিসা তার সংকটের কথা জানাল।

মাথার উপরে সিলিংয়ের মতো পাটা-তনের এক পাশে একটি মানুষ ঢোকার মত ফুটো। পাকা বাড়ীর কড়ি বরগার ধরনে কয়েকটা বাঁশ আড়াআড়িভাবে সাজানো।

রফিকের শক্ত সমর্থ শরীরটা আস্তে আস্তে রন্ধ্র বেয়ে উপরে চলে গেল। লুঙ্গিটা মালকোঁচা মেরে পরা। পরুষ্ট জানু দুটি শ্বেতাভ উজ্জ্বল। পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত নরম লোমে ঢাকা। বয়স বেশী নয়—কুড়ি বাইশ। উর্দু মিডিয়াম স্কুলে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছিল। তার বড় ভাইয়ের ভীষণ ইচ্ছে সত্ত্বেও স্কুল ফাই-ন্যালটা আর দেওয়া হল না। অল্প বয়েস থেকে বস্তির হাওয়া তার গায়ে লেগেছে। বড় ভাই রেলে চাকরী করে। কায়ক্লেশে সংসার চলে। রফিক আপাতত চাকরীর উমেদারী করে বেড়াচ্ছে—কোন রকমে একটি পিওনের চাকরী জুটলেই শাদি করে ফেলবে সে। হাত খরচের জন্য সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে, বিড়ি সিগারেট গাঁজা তাড়ি সব রকম নেশা করে। বিকলাঙ্গ প্রাতাহিক তার পয়লা নম্বরের দুষমণ। আসমানীর সঙ্গে সামান্য অম্ল-মধুর সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু নিষ্কর্মা রফিকের হাতে মেয়ে দেবার পাত্র নন আসমানীর আব্বাজান।

আনিসায় তন্ময়তা ভঙ্গ করে রফিক চেঁচিয়ে উঠল—ভাবী, পেয়েছি! এ শালা এক বিল্লী মরে চ্যালাকাঠ হয়ে পড়ে আছে। কাটা দাও। নীচে ফেলে দিচ্ছি।

সভয়ে এক পাশে সরে যায় আনিসা। সর্যাজর্জনীর নিপুণ প্রহারায় এক রাশ পোকা সমেত গলিত এক বেড়ালের শবদেহ নীচে ফেলে দেয় রফিক। হয়ত কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছিল। উপরে আশ্রয় নিয়ে নিরা-পদ বোধ করেছিল। এখন যত ঝামেলা আনিসাদের।

বিরক্তিতে আনিসার গা ঘুলিয়ে উঠল। গন্ধও বটে।

সেই বীভৎস নারকীয়তা থেকে মুক্ত করতে রফিকও হাত লাগাল। বেড়ালটাকে ময়লা কাপড়ে জড়িয়ে বড় রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে এল।

এক ভীষণতম দুঃস্বপ্নের অধীনতা থেকে সুখী পৃথিবীর শরিক হয়েছে, এরকম পার্থিব কিছু ভাবতে ভাবতে নীচু হয়ে ঘর পরিষ্কারে ব্যস্ত ছিল আনিসা। হঠাৎ কাঁধের কাছে সবল আকর্ষণ। ঠোঁটের উপরে অগ্রাসী লিপ্সা চোখের কপাট বন্ধ করার আগে সে একবার দরজার দিকে তাকাল—ভেজান রয়েছে আর খুপরীর একমাত্র জানলা তো অনেকটা উঁচুতে বায়ু চলাচলের মাধ্যমের বেশী কিছু নয়।

ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলেছে রফিক। পাগলের মত মুখ ঘষছে পেলব গিরিচূড়ায়. প্রেম এবং যৌনতার এই বুর্জোয়া বন্যার মুখে ভাসিয়ে দেবার আগে কি রকম যেন অপরাধবোধ ক্রিয়া করে আনিসার মনে। সজোরে এক ঝটকায় বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে সে কাঁপতে থাকল। শাড়ির আঁচলে ভালভাবে দেহ জড়িয়ে নিল।

চোখের সামনে এক জোড়া আলো দপ করে জ্বলে নিভে গেল। এক অপরিচ্ছন্ন পিচ্ছিল হতাশার মৃদু দুর্গন্ধ ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে থাকল।

এবং তখন খাটিয়ায় মুখ গুঁজে অশ্রুপাত ছাড়া যেন আর কোন দায়িত্ব নেই। ঈষৎ কর্কশ নারকোলের দড়ি চোখে মুখে বসে যেতে থাকে। মনে পড়ে অনেক পুরোনো কথা হয়ত গত জন্মের। বিহারের কোন ছোট গ্রামের রুক্ষ পরিবেশে দিন দিন শরীরের পরিবর্তনে আশ্চর্য মুগ্ধ-তায় বিস্মিত আলোকিত একটি বালিকা। অবিচ্ছিন্ন ডানা মেলে উড়ে-যাওয়া হংস-দূতের দিকে তাকিয়ে কখনো আনমনা হত দাদিমার কাছে শোনা লাইলি মজনুর কিসসার কথা কানের কাছে ভেসে আসত। রূপকথার পরিত্যক্ত ছেঁড়া পুতুলের অপরিচ্ছন্ন বেশবাশ থেকে বেরিয়ে আসত এক রাজকুমার। নিত্য দিন সৃষ্টির স্থবির-তায় একই দৃশ্যের পুনরাভিনয়। শুভ্র উজ্জ্বল রৌদ্রের আদিমতা কিশোরীকে ব্যাকুল করে তুলত।

একই গ্রামের ছেলে লতিফ কলকাতা শহরে রোজগার করে। পাত্র হিসেবে দারুণ মূল্য। শাদি হয়ে গেল আনিসার সঙ্গে। একদিন লতিফ দয়িতার হাত ধরে নিয়ে এল এই বিশাল মহানগরীর অজস্র শিরা-উপশিরার কোল ঘেঁষে কোনো নিজস্ব কোষ-বিন্দুতে, প্রয়োজনীয় বস-উপরস খাদ্য-কণিকা নিজের দাবীতে সেখানে সংগ্রহ করে নিতে হয়।

বেলা গড়িয়ে লতিফ এল। উস্কোখুস্কো চুলের [illegible] জামায় মোড়া কিছু

একটা জিনিস দেখে সারা দিন উপবাসের বিচ্ছিন্ন অগ্নি এবং মানসিক দীনতার অবসাদে আনিসার দেহ-মন নতুন করে আচ্ছন্ন হল।

এক গাল হেসে গামছার মধ্য থেকে একটি প্যাকেট লতিফ বের করল। চকচকে কাগজের মোড়কে নরম মধুর কেক। বিবসন লালা গন্ধি চঞ্চল হল। কি রকম আর্ত দৃষ্টিতে লতিফের দিকে আনিসা তাকিয়ে থাকল।

—নে, বাসন বের কর। কেক এনেছি... দুজনে খাব...। লতিফের হলুদ দাঁত উজ্জ্বল হল।

—ফের চুরি করেছ?

—চুরি? হাসালি—আরে নিজে হাতে মিঠাই তৈরী করে ময়রা কি এক-আধটা টেস্ট করে দেখে না?

—তাই বলে চুরি করবে? সেবার ধরা পড়ে চাকরী থেকে ছুটি করে দিয়েছিল মনে নেই? হাতে পায়ে ধরে কাজ পেয়েছিলে?

আচ্ছা মেয়ের পাল্লায় পড়া গেল তো? দারুণ ক্রোধে ছটফট করতে থাকল লতিফ। হাতের কাছে ঝাঁটা পেয়ে আনিসার পিঠে ঘা-কতক দিয়ে দিল। মালিকের বেকারিতে উদয়াস্ত পরিশ্রমের যা মূল্য সপ্তাহ শেষে মেলে, মিঞা বিবির পেটচলা এক কথার ওই নগণ্য হৃতস্বার্থের জাবর-কাটা। আরে বাবা ঘরে কিছু নেই, তা কী আর জানি না? আগরওয়ালের রেশনের দোকানে ধারকর্জ কিছু মিলবে না। শালা পয়সা পিটছে, ব্ল্যাকে চাল গম চিনি সুজি তেল সব ঝেড়ে দিচ্ছে। ভাইয়ের নামে মুদিখানার দোকান চলছে, গম-ভাঙ্গার আটা কলও রয়েছে। আহা, মুখে যেন সব সময় মধু ঝরে পড়ছে —কী গো লতিফ মিঞা কাজ-কারবার কেমন চলছে? ...ওর ব্যাটা কলেজে পড়ে, খুব পলিটিকসের বুলি আওড়ায়। মাঝে মাঝে কাছে এসে বেকারিতে একটা ইউনিয়ন করার পরামর্শ দেয়।

ঘোলাটে চোখে লতিফ একবার আনিসার দিকে তাকাল। খাটিয়াতে মুখ গুঁজে এখনো পড়ে আছে। এক দুঃসহ স্বেচ্ছাচার লতিফের চারপাশে ঘিরে ধরে। বুনো মোষের মতো গোটা কেকটা একাই সাবাড় করে দিল। ঘোঁত ঘোঁত করে জল খেল। তীব্র প্রতিহিংসার আগ্নেয়গিরি তার হৃৎপিণ্ড জুড়ে জ্বলে যাচ্ছিল।

লতিফ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পর খাটিয়া ছেড়ে আনিসা উঠে দাঁড়াল। দরজার ফাঁক দিয়ে একটা কুকুর উঁকি মারছিল। হেট-হেট—ওঃ আবার কেকের ঠোঙাটার দিকে নজর হয়েছে—হাত বাড়িয়ে আনিসা তাড়া করল। কুকুরটা সরে গেল। গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে, ক্ষুণ্ণ মনে বালতির ভেতরে মগ ডুবিয়ে জল খেল। আরে তাইতো, ঠোঙাটার মধ্যে এক কণা লেগে আছে বুঝি। লতিফ অত খেয়াল করে খায়নি, যা রাগ মানুষটার! ঠোঙা থেকে কেকের কণাটা বের করে মুখে দিল। কী ভাগ্য, একটা কিশমিশও রয়ে গেছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে রাস্তা দেখা যাচ্ছে—ভুট্টার খোসা ময়লা কাগজ মানুষের বিষ্ঠা, ইঁটের টুকরো পুরনো চপ্পল, শালপাতা, ভ্রাম্যমাণ মুরগী আর অপরিচ্ছন্ন শিশুরা। মৌলবী সাবের দরজার সামনে দড়িতে ঝোলানো লুঙ্গি গেঞ্জি শুকোচ্ছে। লাল মিঞার মেজ ছেলে শামিম ক্যামেরা হাতে চলে যাচ্ছে। ওর একটি ছোট স্টুডিও আছে।

ছায়া ঘন হয়। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে সচ্ছল বাতাস মহানগরীর আনাচে কানাচে প্রবেশ করে। পুঞ্জ পুঞ্জ সময়ের চেতনা নিজস্ব আধারে আলোড়িত হয়। অতি কুৎসিত মুখশ্রীও স্বপ্নের মতো পরিবর্তিত হয়।

মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। প্রতিদিনের মতো আজকেও সেই বৃদ্ধ লোকটি 'চাই বেলফুল' ঘোষণা করে চলেছে। ড্যানি সকালবেলার মেয়েমানুষটিকে নিয়ে চলেছে রাস্তার দিকে। আবার কিছু দিন হয়তো ডুব দেবে। ফিরে আসবে উত্তপ্ত মুদ্রা ও নতুন নারীর খুচরো মেয়াদ নিয়ে।

একজন কাবুলিওয়ালা জুম্মন মিঞার ঘরের সামনে গালমন্দ দিচ্ছে। এ মাসের সুদ বোধহয় দেওয়া হয়নি। মুখ নীচু করে জুম্মন মিঞা বসে আছে। কয়েকটি শিশু সমস্বরে গান ধরেছে—ঝুম ঝুম কে নাচো গাও...

মেরী দিদি কজন বন্ধু নিয়ে সাট্টা খেলছে। চোখের বিচক্ষণ ইঙ্গিতে বেঁচে থাকার পরিচয়। ঘরে একপাশে আয়নার সামনে রেবা চুল বাঁধছে। সস্তা স্নো-পাউডার কৃষ্ণাভ মুখে পুরু করে দিচ্ছে। আধুনিকা মেয়েদের অনুকরণে শাড়ি পরছে। তার বাইরে যাবার সময় হয়ে এল। বড়ো রাস্তা ধরে আর একটু এগিয়ে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে সে পৌঁছে যাবে। তখন আলো শব্দ মানুষের একত্র মিলন। অতি প্রাচীন একটি ব্যবসার লেনদেন সেরে মাঝরাত্তিরে সে ঘরে ফিরবে।

সব ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছোয় নি। কেরোসিনের কুপী, হেরিকেন দিয়ে কাজ চলে। তবে বস্তির গলিপথের মাঝে মাঝে বিদ্যুৎএর আলো রয়েছে। আজ এদিকটায় লোড শেডিং। আলো নেই। সারি দেওয়া ছোট ছোট ঘরগুলির মাথার উপরে আচ্ছাদন টালি, খোলা বা করোগেট টিনের উপরে অন্ধকার সমস্ত শরীর বিছিয়ে দিয়েছে। আসলে এখানে এই বোধহয় প্রকৃত তথ্য, মলিন। আস্তরণ ধুলো বালি ময়লা কার্বণকণা বর্ষার শ্যাওলা কারোরই এখানে কোনো বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নেই। এরই নাম বোধহয় জীবনের ধারাবাহিকতা অথবা সময়।

দরজা ঠেলে কেউ ঘরের ভেতরে ঢুকল। আতঙ্কে নীল হয় আনিসার মুখ। অস্ফুট আর্তনাদ ধ্বনিত হয়—কে...কে?

পরিচিত কণ্ঠস্বরে অনুশোচনার রেশ—আমি রে...আমি...

তাহলে লতিফ এসেছে। ধার করে তাড়ি খেয়েছে, মুখ থেকে উৎকট গন্ধ বেরোচ্ছে। তবু যেন তাকে বেহেশতের দেবদূত মনে হয় আনিসার। একঘেঁয়ে দৃশ্যপটে এতক্ষণ সে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

অন্ধকারেও ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে যায়। সামনের বস্তু অতি সহজে অনুভব হয়। শূন্য তূণ হাতে এক অনির্দেশ সংকেতের প্রতীক্ষায় লতিফ খাটিয়ার দিকে এগিয়ে আসে।

গভীর থেকে গভীরতর হয় অন্ধকার। বিহ্বল চঞ্চলতা সমস্ত দিনের ক্ষুধা উপবাস বিস্মৃতির জগতে ঠেলে সবিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রের প্রবেশপথে এক আশ্চর্য তোরণের মুখোমুখি ওদের দাঁড় করিয়ে দেয়। কোনো নিবিড়তম উল্লাসের স্নিগ্ধতা কোষে কোষে সান্নিধ্য খোঁজে। দুজনের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যায় অনন্ত মুহূর্ত—যার নাম চিরকাল।

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

এক।—কুকুরটা রাতে চেঁচায়নি কেন? চেনা মানুষ দেখেছিল বলে।

দুই।—ভেড়া তিনটের খুঁড়িয়ে চলা রোগ হল কেন? ...ওদের 'টেণ্ডন' চিরে দিয়ে স্ট্রেকার হাত পাকিয়েছিল বলে।

খেলাধূলা

দর্শক

রঞ্জি ট্রফি

বোম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৪১তম জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই ৭ উইকেটে গত বছরের বিজয়ী কর্ণাটককে হারিয়ে মোট ২৫ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য বোম্বাই ১৯৫৯ সাল থেকে একাটানা ১৫বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের পর গত বছরের সেমি-ফাইনালে কর্ণাটকের কাছে হেরেছিল প্রথম ইনিংসের রান-সংখ্যার তারতম্যে। ৪১ বছরের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইতিহাসে বোম্বাই ২৬ বার ফাইনালে খেলে ২৫ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে। ফাইনালে তাদের একমাত্র পরাজয় ১৯৪৭-৪৮ সালে হোলকারের কাছে। অপরদিকে কর্ণাটক এপর্যন্ত ৪ বার ফাইনালে খেলে মাত্র একবার (১৯৭৪ সালে) রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে।

এই নিয়ে বোম্বাই রঞ্জি ট্রফির খেলায় কর্ণাটককে ৮ বার হারালো। এর মধ্যে বোম্বাই প্রথম ইনিংসের রানে জিতেছে মাত্র একবার এবং ইনিংস জয়ী হয়েছে ৪ বার।

টসে জিতে কর্ণাটক প্রথমেই ব্যাট করার দান নেয়, কিন্তু প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পুরো কাজে লাগাতে পারেনি—প্রথম দিনে প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে তারা ২২১ রান সংগ্রহ করেছিল। বিশ্বনাথ চারবার 'চান্স' দিয়ে ১৪৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। এটা বিশ্বনাথের খেলোয়াড়-জীবনের নিকৃষ্টতম সেঞ্চুরীর নজীর। তিনি তাঁর স্বাভাবিক খেলা দেখাতেও পারেননি। তিনি ২৯২টি বল খেলে তাঁর নট-আউট ১৪৪ রানে ১৭টা বাউন্ডারী করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে কর্ণাটকের প্রথম ইনিংস ২৪০ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তারা প্রথম দিনের ২২১ রানের সঙ্গে শেষ পাঁচ উইকেটে মাত্র ১৯ রান যোগ করেছিল। খেলার বাকি সময়ে বোম্বাই পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে ২৩৫ রান তুলেছিল—কর্ণাটকের প্রথম ইনিংসের ২৪০ রানের থেকে মাত্র ৫ রান কম। বোম্বাইয়ের সুনীল গাভাস্কার ৬৬ রান এবং করসন ঘাবড়ি ৪৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন। বোম্বাইয়ের ১২৯ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়েছিল।

তৃতীয় দিনে বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংস ৩০৫ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৬৫ রানে এগিয়ে যায়। গাভাস্কার ৯৬ রান করে অপরাজিত থেকে যান। এই দিন বোম্বাই তাদের শেষ পাঁচ উইকেটে ৭০ রান সংগ্রহ করেছিল। ৯ম উইকেটের জুটিতে ইসমাইল (২৩ রান) এবং গাভাস্কার ৫৩ রান যোগ করেছিলেন। তৃতীয় দিনের সকালের খেলায় প্রসন্ন মাত্র সাতটা বলে ৩ উইকেট নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ঘাবড়ি (৫৬ রান) এবং গাভাস্কার ৯৭ রান যোগ করেছিলেন। তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় কর্ণাটক দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১২৮ রান সংগ্রহ করেছিল। ফলে খেলার গতি বোম্বাইয়ের অনুকূলে ঘুরে যায়। ব্রিজেশ প্যাটেল ৭০ রান করে আউট হন।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের ২০ মিনিট আগে কর্ণাটকের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৫ রানের মাথায় শেষ হয়। ৭ম উইকেটের জুটিতে সুধাকর রাও (৩৪ রান) এবং জয়প্রকাশ ৫৯ রান যোগ করেছিলেন ১০০ মিনিটের খেলায়। জয়প্রকাশ ৪৭ রান করে অপরাজিত থেকে যান। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৫১ রান তুলতে বোম্বাই দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৫১ রান তুলে ৭ উইকেটে জিতে যায়। বোম্বাইয়ের অধিনায়ক অশোক মানকাদ ৪৮ রান এবং অজিত পাই ৪৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁদের অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৯৮ রান উঠেছিল। অজিত পাইয়ের ব্যাট থেকে খেলায় জয়সূচক রানটি এসেছিল।

ডঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.,ডি.জি.ও
ডঃ এস. এন. পাণ্ডে এম.বি.,বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

ভেঙ্কট রাঘবন
অধিনায়ক—ভারত

সংক্ষিপ্ত স্কোর

কর্ণাটক : ২৪০ রান (বিশ্বনাথ ১৪৪ রান। ঘাবড়ি ৬৬ রানে ৫, ইসমাইল ৩০ রানে ২ এবং শিভালকার ৫৪ রানে ২ উইকেট)

ও ২১৫ রান (ব্রিজেশ প্যাটেল ৭০ এবং জয়প্রকাশ ৪৭ নট আউট। সোলকার ৪৩ রানে ৪, শিভালকার ৬০ রানে ২ এবং ট্যান্ডন ১৬ রানে ২ উইকেট)

বোম্বাই : ৩০৫ রান (গাভাস্কার ৯৬ নট আউট এবং ঘাবড়ি ৫৬ রান। প্রসন্ন ১২৩ রানে ৬, চন্দ্রশেখর ১২২ রানে ২ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ২ রানে ২ উইকেট)

ও ১৫১ রান (৩ উইকেটে। মানকাদ ৪৮ নট আউট এবং অজিত পাই ৪৪ নট আউট। চন্দ্রশেখর ৪৮ রানে ২ এবং প্রসন্ন ৫৩ রানে ১ উইকেট)

বোম্বাইয়ের রঞ্জি ট্রফি জয়

ফাইনাল খেলার ফলাফল

জয় ২৫ বার : ১৯৩৫ সালে নর্দার্ন ইণ্ডিয়াকে ২০৮ রানে, ১৯৩৬ সালে মাদ্রাজকে ১৯০ রানে ১৯৪২ সালে মহীশূরকে এক ইনিংস ও ৮১ রানে, ১৯৪৫ সালে হোলকারকে ৩৭৪ রানে, ১৯৪৯ সালে বরোদাকে ৪৬৮ রানে ১৯৫২ সালে হোলকারকে ৫৩১ রানে, ১৯৫৪ সালে হোলকারকে ৮ উইকেটে, ১৯৫৬ সালে বাংলাকে ৮ উইকেটে ১৯৫৭ সালে সার্ভিসেসকে এক ইনিংস ও ৩৮ রানে, ১৯৫৯ সালে বাংলাকে ৪২০ রানে, ১৯৬০ সালে মহীশূরকে এক ইনিংস ও ২২ রানে ১৯৬১ সালে রাজস্থানকে ৭ উইকেটে, ১৯৬২ সালে রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ২৮৭ রানে, ১৯৬৩ সালে রাজ-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

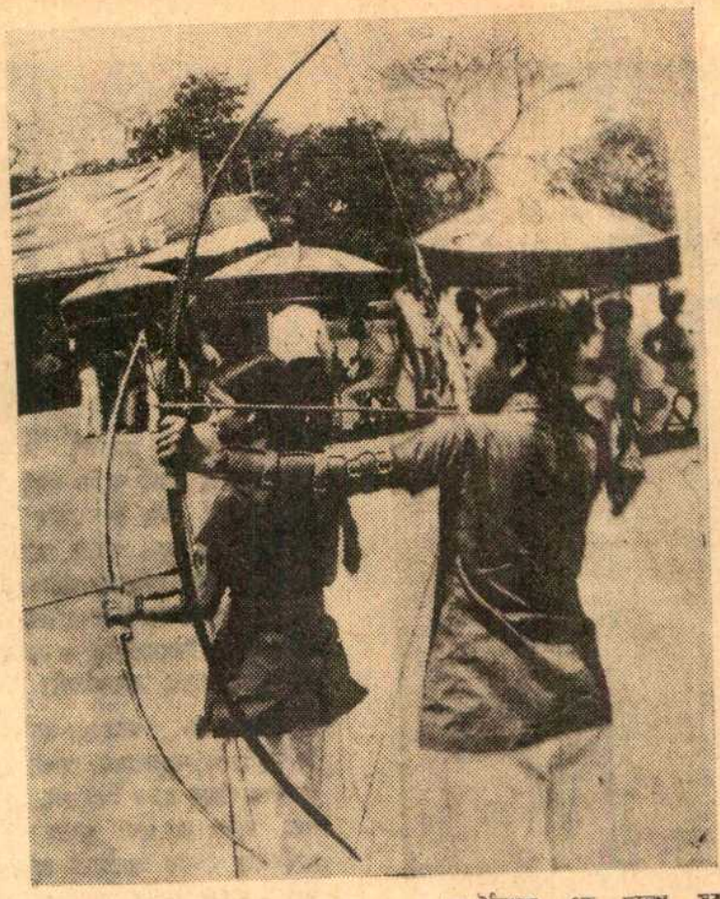

স্থানকে এক ইনিংস ও ১৯ রানে ১৯৬৪ সালে রাজস্থানকে ৯ উইকেটে, ১৯৬৫ সালে হায়দরাবাদকে এক ইনিংস ও ১২৬ রানে, ১৯৬৬ সালে রাজস্থানকে ৮ উইকেটে ১৯৬৭ সালে রাজস্থানকে প্রথম ইনিংসের রানে ১৯৬৮ সালের মাদ্রাজকে প্রথম ইনিংসের রানে ১৯৬৯ সালে বাংলাকে প্রথম ইনিংসের রানে, ১৯৭০ সালে রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ৫৯ রানে ১৯৭১ সালে মহারাষ্ট্রকে ৪৮ রানে, ১৯৭২ সালে বাংলাকে ২৪৬ রানে, ১৯৭৩ সালে তামিলনাড়ুকে ১২৩ রানে এবং ১৯৭৫ সালে কর্ণাটককে ৭ উইকেটে পরাজিত করে বোম্বাই মোট ২৫ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে।

ফাইনালে বোম্বাইয়ের জয়-পরাজয়

জয় ২৫ বার : রাজস্থানের বিপক্ষে ৭ বার বাংলার বিপক্ষে ৪ বার, হোলকারের বিপক্ষে ৩ বার, মাদ্রাজের বিপক্ষে ২ বার, মহীশূরের বিপক্ষে ২ বার এবং একবার করে নর্দার্ন ইণ্ডিয়া বরোদা, সার্ভিসেস, হায়দরাবাদ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের বিপক্ষে।

পরাজয় (১) : ১৯৪৮ সালে হোলকারের কাছে ৯ উইকেটে।

রঞ্জি ট্রফির খেলায় উল্লেখযোগ্য রেকর্ড

একটি খেলায় মোট সর্বাধিক রান : ২৩৭৬ রান (৩৮ উইকেটে) — বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র, পুণা, ১৯৪৮-৪৯ (প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড)

এক ইনিংসে এক দলের সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৬টি — হোলকার (বিপক্ষে মহীশূর) ইন্দোর, ১৯৪৫-৪৬। —প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড।

একটি ম্যাচে সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৯টি —বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র, ১৯৪৮-৪৯। —প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড।

পার্টনারশিপ রেকর্ড :

৫৭৭ রান (৪র্থ উইকেটে) — বিজয় হাজারে (২৫৪ রান) এবং গুল মহম্মদ (৩১৯ রান), বরোদা (বিপক্ষে হোলকার বরোদা, ১৯৪৬-৪৭। পৃথিবীর যে-কোন দেশের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় যে-কোন উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড।

৪৫৫ রান (২য় উইকেট)—বি বি নিম্বলকার (৪৪৩ নট আউট) এবং কে ভি ভাণ্ডারকার (২০৫ রান) মহারাষ্ট্র (বিপক্ষে পশ্চিম ভারত স্টেট), পুণা, ১৯৪৮-৪৯। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ২য় উইকেট পার্টনারশিপের বিশ্ব রেকর্ড।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান : ৪৪৩ নট আউট — বি বি নিম্বলকার (মহারাষ্ট্র) বিপক্ষে পশ্চিম ভারত স্টেট, পুণা, ১৯৪৮-৪৯।

দীর্ঘ ইনিংসের খেলা : ৬৪০ মিনিট — বিজয় মার্চেন্ট (বোম্বাই), বিপক্ষে মহারাষ্ট্র বোম্বাই, ১৯৪৩-৪৪। এই সময়ের খেলায় মার্চেন্ট ৩৫৯ রান করে অপরাজিত থাকেন।

ফাইনালে বৃহত্তম জয়

১০ উইকেটে — মহারাষ্ট্র (বিপক্ষে যুক্তপ্রদেশ) ১৯৩৯-৪০।

৫৩১ রানে — বোম্বাই (বিপক্ষে হোলকার), ১৯৫১-৫২।

এক ইনিংস ও ৪০৯ রানে — বরোদা (বিপক্ষে হোলকার), ১৯৪৬-৪৭।

বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আগামী জুন মাসে ইংল্যাণ্ডে প্রথম বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসবে। প্রতিযোগিতায় যে ভারতীয় দল যোগদান করবে তার অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন তামিলনাড়ুর ভেঙ্কটরাঘবন। শক্তিশালী ভারতীয় দল গঠনের জন্যে জোর তোড়জোড় চলেছে।

বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান

আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার ঘোষণা রাশিয়ার তরুণ গ্র্যাণ্ডমাস্টার আনাতোলি কারপভ বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। ১৯৭২ সালের বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার ববি ফিশারের সঙ্গে আনাতোলি কারপভের বিশ্ব দাবার খেতাবী লড়াই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিশারের কাছ থেকে কোন জবাব চেয়েছিলেন তা না-পাওয়াতে কারপভকে শেষ পর্যন্ত দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে। ২৩ বছরের কনিষ্ঠ বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ান। আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার নিয়মানুসারে তিন বছর অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে কারপভকে খেতাব লড়াইয়ে নামতে হবে।

আনাতোলি কারপভ
বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান

স্মৃতি শর্মা

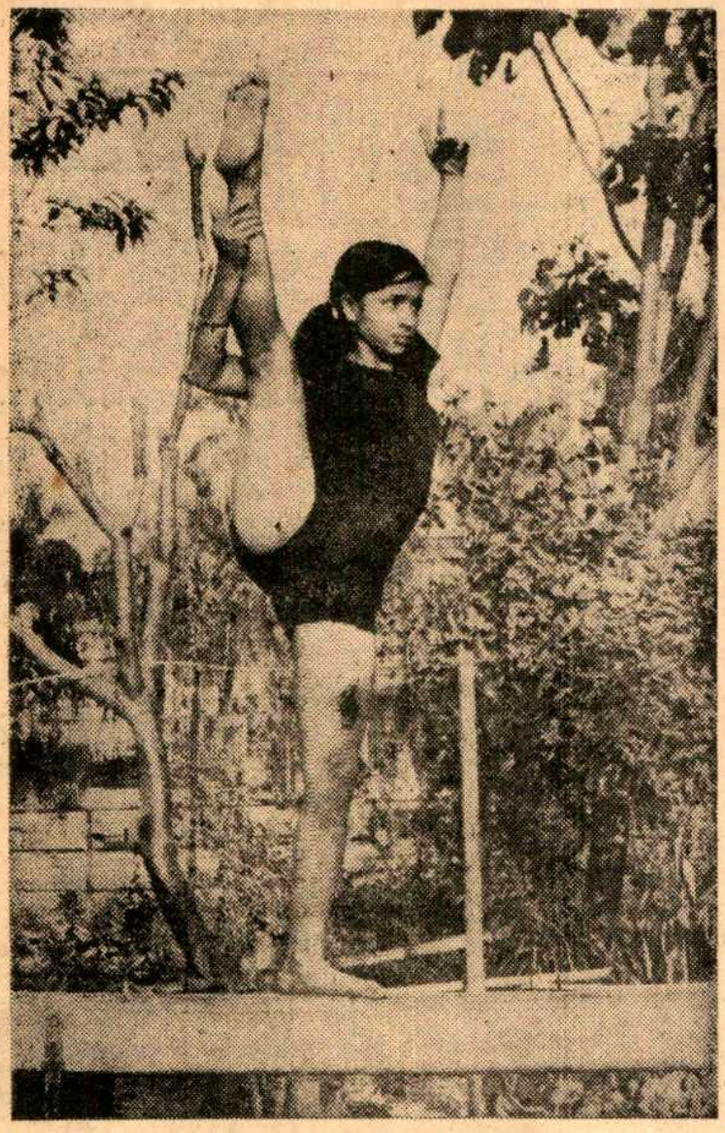

খেলার জগতে মেয়ে

যোগাসন ও জিমন্যাস্টে

স্মৃতি শর্মা

আগরপাড়ার নেতাজী শিক্ষায়তনের দশম শ্রেণীর ছাত্রী স্মৃতি শর্মা একাধারে জিমন্যাস্টিক এবং যোগব্যায়াম কুশলী। উপরন্তু ও স্কুল পর্যায়ে দৌড় বিভাগে বিজয়িনী হয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান আখ্যা অর্জন করেছে। কিন্তু রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে স্মৃতি জিমন্যাস্টিক ও যোগব্যায়ামেই বিশেষ কুশলতার অধিকারিণী।

স্মৃতি বলে, আমাদের আদি বাড়ী ছিল কুমিল্লায়, বাংলাদেশে। দেশটা প্রথমে ত পাকিস্তানীদের হাতে গিয়েছিল, সেই সময় বহু পরিবারের মত আমার বাবাকেও সপরিবারে পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়। আমার জন্ম পশ্চিমবঙ্গে। আমি আগরপাড়ায় মেজদা আর তার বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহে একটু আধটু জিমন্যাস্টিক আর অন্যান্য খেলাধুলো শুরু করি। আগরপাড়ায় কোন জিমন্যাস্টিক ক্লাব নেই। তাই মেজদার চেষ্টায় আমি এখানে বহুবাজার ব্যায়াম সমিতিতে যোগ দিই। সেটা বোধহয় ১৯৭২ সাল। '৭৩ সাল থেকে একনাগাড়ে নিয়মমত জিমন্যাস্টিক আর যোগব্যায়াম শিক্ষা করে চলেছি।

—তোমার বাড়ীতে আর কেউ খেলাধুলো করে না?

—আগে মেজদা কলকাতার দলে ফুটবল খেলত কিন্তু চোখে আঘাত পেয়ে তাকে খেলা ছেড়ে দিতে হয়। আমরা তিন ভাই, তিন বোন। বোনেদের মধ্যে আমি মেজ। মেজদা খেলতেন, আর আমি এখন খেলাধুলোয় রয়েছি। আমার ছোট বোনও আস্তে আস্তে জিমন্যাস্টিক শিখতে শুরু করেছে। আমাদের বাবার ওষুধের ব্যবসা আছে।

—বাড়ীর সবাই তোমার জিমন্যাস্টিক শেখায় সমর্থন করেন?

—না। বাবা-মার খুব আপত্তি ছিল। আমার দিদি আর মেজদাই আমাকে এ বুদ্ধিপাদে খুব উৎসাহ করেন তাছাড়া

আমার বৌদি। আমাদের বাড়ীটা একটু মফঃস্বল অঞ্চলে তো। ওখানকার প্রবীণরাও মেয়েদের খেলাধুলো, জিমন্যাস্টিক পছন্দ করেন না। তাঁরাও নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে সব বাধা কেটে গেছে। তবে আমার স্কুলের শিক্ষক শ্রীরবীন দত্ত এবং প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী মায়া রায় আমাকে খুব উৎসাহ দেন।

—এখানে তুমি কি কি বিভাগে অনুশীলন কর? প্রশিক্ষণই বা কে দেন

—এখানে আমি অন্য সবাইয়ের মতই বীম ব্যালেন্স, ভল্টিং হর্স আনইভিন বার ও ফিল্ড একসারসাইজ অনুশীলন করি। আমাদের প্রশিক্ষক শ্রীসন্তোষ ওঝা, তাছাড়া প্রখ্যাত জিমন্যাস্ট শ্রীমতী অম্বালিকা মজুমদারও আমাদের প্রশিক্ষণ দেন।

—আর যোগব্যায়ামে?

—যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ দেন ভারত-খ্যাত দেহসৌষ্ঠবকুশলী কমল ভাণ্ডারী।

—সপ্তাহে কতদিন অনুশীলন কর?

—এখন রোজই।

—তুমি জিমন্যাস্টিকে স্কুল ক্রীড়ায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছ?

—দেখুন আমি '৭৩ এবং '৭৪ দুবছরই স্কুল দলে স্থান পেয়েছিলুম কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমার যে, দুবারই পায়ের পেশীতে টান পড়ায় আমার যাওয়া হয়নি।

তবে '৭৩এ প্রথমবার রাজ্য প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ পেয়েই স্মৃতি ষোল বছরের অনূর্ধ্ব বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান আখ্যা জয় করে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ প্রতিযোগিতায় ঐ বিভাগেই বীম ব্যালান্স, ভল্টিং হর্স ও আনইভিন বার-এ দ্বিতীয় স্থান পায়—আর ফিল্ড একসারসাইজে তৃতীয় হয়। ঐ বছর ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপের আসরে ষোল বছরের অনূর্ধ্ব বিভাগে বিজয়ী বাংলা দলে স্মৃতিও ছিল অন্যতম সফল প্রতিনিধি। গত বছর কালীঘাট ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত প্রতিযোগিতাতে বীম ব্যালেন্সে দ্বিতীয় হয়েছিল। স্মৃতি দুঃখ করে বলে এবারও আমরা ঝাঁসীতে গিয়েছিলুম জাতীয় আসরে প্রতিযোগিতা করতে। কিন্তু গিয়ে শুনলাম এখান থেকে কারা মামলা করায় বাংলা দলের যোগদানের ওপর ইনজাংশন জারী হয়ে গেছে। সে কি দুঃখের কথা কি বলব! আমরা মেয়েরা জিমন্যাস্টিক আসরে নামার জন্য সবাই তৈরী। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত শুনলাম, আমরা নামতে পাব না। মনের দুঃখে আমাদের অনেকে ত কেঁদেই ফেললুম। অতদূরে কষ্ট করে কত আশা নিয়ে গেলুম, আর চোখের জল নিয়ে আমাদের ফিরতে হল। আমাদের ম্যানেজার ছিলেন শ্রীমতী অম্বালিকাদি। আসর থেকে বিনা প্রতিযোগিতায় উঠে আসতে হল!

—তুমি যে যোগাসনের কথা বলছিলে, সে বিষয়ে কিছু বল ত? যোগাসন আরম্ভ করলে কেন?

—শরীর সুস্থ ও সবল করার জন্য যেমন জিমন্যাস্টিক, শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখার জন্য তেমনি যোগব্যায়াম। সঠিক প্রশিক্ষণ নিতে পারলে যোগব্যায়ামে দেহের ভিতরের পেশী মজবুত হয় সেই সঙ্গে শরীরের লালিত্য বাড়ে। আমার প্রশিক্ষক শ্রীভাণ্ডারী দেহসৌষ্ঠবে ভারতবিজয়ী। ওঁর কাছ থেকে ঠিক ঠিকভাবে যোগব্যায়াম করার ফলে আমার পেশীর টান এবং কোমরের ব্যথা একেবারে সেরে গেছে। তা ছাড়া আমি ১৯৭৪-এ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আয়োজিত যোগাসন প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার বিভাগে দ্বিতীয় হই। প্রথম হয় খনা চক্রবর্তী। ঐ বছর পাটনায় নিখিল ভারত যোগব্যায়ামেও জুনিয়ার বিভাগে খনা ও আমি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান পাই।

জিমন্যাস্টিক আর যোগব্যায়াম স্মৃতির খুব ভাল লাগে। স্মৃতি জানাল এই ক্লাবের অনেকেই যোগব্যায়াম অভ্যাস করে বাচ্চা বয়স থেকে।

—যোগব্যায়ামের সুফল কি করে বুঝলে?

—জিমন্যাস্টিক অনুশীলনের সময় একবার হঠাৎ বীম থেকে পড়ে আমার কোমরে চোট লাগে। কিছুতে সে ব্যথা সারছিল না। তখনই শ্রীভাণ্ডারী আমাকে যোগব্যায়াম অভ্যাস করাতে থাকেন। ক্রমে দেখি ব্যথা আস্তে আস্তে সেরে গেছে। সেই সঙ্গে পায়ের পেশীতে টান ধরাও সেরেছে। কতকটা খেয়ালের বশেই যোগব্যায়াম শুরু করি কিন্তু এখন এটি খুব ভাল লাগে। (এ বছরও এপ্রিলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যোগাসনে যোগ দেব—আপনি দেখতে আসবেন নিশ্চয়ই।)

স্মৃতি জিমন্যাস্টিকেও খুব আকর্ষণ বোধ করে অন্যান্য ক্লাবের প্রতিযোগিতা দেখতে যায়। নিজে যেসব আসরে নামে সেখানেও অন্যদের কলাকৌশল মন দিয়ে দেখে।

—তুমি তো বললে পাড়ার প্রবীণরা তোমাদের খেলাধুলো প্রসন্নমনে নিতে পারেন না। পাড়ার খুব সমাজ কিভাবে দেখে?

—তাঁরা আমাদের খেলাধুলোকে খুব সমর্থন করেন। আমাদের খুব উৎসাহ দেন, সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

স্মৃতি কথায় কথায় বলে, আমরা যদি ক্রীড়া চিকিৎসকদের সাহায্য পেতাম তাহলে খুব ভাল হত। যেমন ধরুন কিভাবে থাকলে চট করে শরীর অসুস্থ হয় না, বা দেশী খাবার-দাবারের মধ্যেই কোন কোনটি শরীরের পুষ্টির জন্য জিমন্যাস্টদের বিশেষভাবে খাওয়া উচিত এসব বিষয়ে ডাক্তারী উপদেশ পেলে খুব ভাল হয়। আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, আমাদের পক্ষে দামী দামী ফলমেওয়া খাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু চলতি খাদ্যবস্তুর থেকেই চিকিৎসকরা ভেবেচিন্তে আমাদের জন্য পুষ্টিকর অথচ সস্তা দামের খাদ্যতালিকা করে দিতে পারেন।

—এ পর্যন্ত তোমরা ক্রীড়া চিকিৎসকের সাহায্য পেয়েছ?

—বছর দুই আগে মেডিক্যাল কলেজ থেকে একজন ক্রীড়া চিকিৎসক এসে আমাদের কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর এ পর্যন্ত আর কাউকে দেখিনি।

—দেখব ক্রীড়া চিকিৎসকদের তোমার কথাগুলি জানাবার চেষ্টা করব। তুমি বিদেশী জিমন্যাস্টদের ছবি দেখ?

—না সে সুযোগও পাইনি।

—বইটই পড়তে কিরকম লাগে?

—ছোটখাট যা ক্লাবে আসে তা-ই দেখি।

কথাপ্রসঙ্গে স্মৃতি বলে, জানেন, আমার যীশুখৃষ্টের জীবনী পড়তে খুব ভাল লাগে। বাড়ীতে রামায়ণ মহাভারতও আছে। তাও পড়ি, বা বাবা মার কাছে গল্প শুনি।

অমল

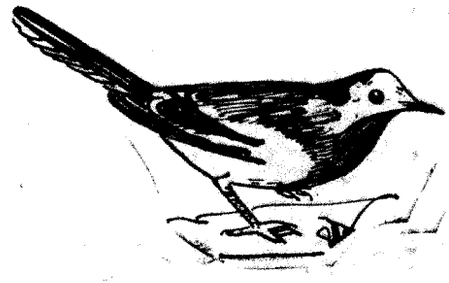

রথীন দত্ত

নির্মল দত্ত

তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শরনিক্ষেপ চ্যাম্পিয়ানশিপে রথীন দত্ত দ্বিতীয় ও নির্মল দত্ত তৃতীয় স্থান লাভ করে।

শর নিক্ষেপ

তীর ধনুক প্রসঙ্গ উঠলেই হরধনু-ভঙ্গের কাহিনী মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। বিরাট হরধনু ভেঙ্গে রামচন্দ্র সীতাকে স্ত্রী-রূপে লাভ করেছিলেন। আবার দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভার ছবিটিও দৃষ্টিপটে উদ্ভাসিত হয়। মাটির ওপর জলাধারে গতিশীল চাকার মধ্যে মাছের প্রতিবিম্ব লক্ষ করে তার চোখ তীরবিদ্ধ করে অর্জুন দ্রৌপদীকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছিলেন। কিংবা অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের অস্ত্র পরীক্ষা বা শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ একলব্যের সকরুণ কাহিনী-চিত্র আমাদের ভীষণ চেনা। রাম রাবণ বা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে প্রধান যুদ্ধাস্ত্রই ছিল তীর ধনুকে। ইন্দ্রবাণ বায়ুবাণ অগ্নিবাণ শব্দভেদীবাণ ইত্যাদি আরও কত হরেক রকম বানের নাম শোনা যায় রামায়ণ মহাভারতে। সুতরাং তীর ধনুকের প্রচলন সুপ্রাচীন। এমনকি রোম গ্রীস, এথেন্স, স্পার্টন প্রভৃতি সামরিক শক্তিতে বলীয়ান প্রাচীন দেশগুলোর সমরসম্ভারে অন্যতম প্রধান অস্ত্র ছিল তীর ধনুক।

তীর ধনুকের সঠিক জন্মবৃত্তান্ত হারিয়ে গেছে কুহেলী সমাচ্ছন্ন ইতিহাসের অতীত অধ্যায়ে। নানা মুনির নানা মত। এক দলের ধারণা প্রস্তর যুগের আগেই মানুষ তীর ধনুকের ব্যবহার শিখেছে। পঞ্চাশ লক্ষ বছর পূর্বে মানুষ যখন আগুন জ্বালাতে শেখে তখন থেকেই তীরের উৎপত্তি। অন্য দলের মতে প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রের ব্যবহারে বিপদের ঝুঁকি ছিল বলে আদিম মানুষ পরিবর্তে অস্ত্রের সন্ধান করতে করতে তীর ধনুক আবিষ্কার করে। গাছের লম্বা সরু ডাল কিংবা সরু বাঁশকে বেঁকিয়ে দড়ির মত শক্ত পাতলা বনজ লতা দিয়ে দু মুখ বেঁধে ধনুক তৈরী করে। আর বাঁশকে চেঁচে চিরে অগ্রভাগ ছুঁচলো করে তৈরী করে তীর। ফলে নিরাপদ স্থান থেকে হাতের অস্ত্র অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে মানুষ কৃতকার্য হয়। এবং এরপর থেকেই আত্মরক্ষা ও পশুশিকারে তীর ধনুক জনপ্রিয় হয়।

আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় সমরাস্ত্রের সূচীতে তীর ধনুকের নাম প্রায় মুছে যায়। কিন্তু মানুষের মনে তীর শাশ্বত-কালের জন্যে বিদ্ধ হয়ে থাকে। রণক্ষেত্রের শর নিক্ষেপ রূপান্তরিত হয় খেলায়, প্রতি-যোগিতায়। এমন প্রতিযোগিতার প্রথম নজীর মেলে প্রাচীন বেলজিয়ামে। নানান দূরত্বের বিভিন্ন আকৃতির কৃত্রিম পাখীর ওপর শর নিক্ষেপের বিচিত্র কাহিনী শোনা যায়। ভারতবর্ষের পুরাকালের রাজরাজড়াদের মধ্যেও নানা ধরনের মজার প্রতি-যোগিতা হত। লক্ষ্যভেদের এই খেলায় লক্ষ্য কখনও বা অসীম নীল আকাশে উড়ন্ত পাখী, কখনও বা গাছের সবুজ শাখা-প্রশাখায় চঞ্চল পক্ষী।

ধূলি-ধূসর ইতিহাসের অতীত পাতা থেকে যতদূর জানা যায় ১৮৪৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম তীর ধনুক চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা হয়। এবং প্রথম জাতীয় খেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাসে ন্যাশনাল আরচারি এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় চিকাগোতে প্রথম জাতীয় তীর ধনুক প্রতি-যোগিতা হয়। পরে অবশ্য ১৯৩৯ সালে 'ন্যাশনাল ফিল্ড আরচারি এসোসিয়েশন' নামে আর একটি সংস্থার জন্ম হয়। এই সঙ্গে এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে 'টার্ন' নামে শর নিক্ষেপ সংক্রান্ত একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৫৪৫ সালে ইংরেজীতে ধনুকের ওপর লেখা একটি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ক্লাব হিসেবে যুক্তরাজ্যের ফিলাডেল-ফিয়ার আরচারি ক্লাব পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম। ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। কিন্তু ১৮৮৮ সালে ক্লাবটি বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ১৯৩২ সালে পৃথিবী বিখ্যাত তীরন্দাজ রবার্ট পি এলমার-এর ঐকান্তিক সহযোগিতায় প্রতি-ষ্ঠানটির পুনর্জন্ম হয়। এবং এলমার উপর্যুপরি বেশ কয়েকবার শ্রেষ্ঠ তীর-ন্দাজের সম্মান লাভ করে। অবসর জীবনে শর নিক্ষেপের ওপর এলমারের লেখা গবে-ষণামূলক পুস্তকটি যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। জাপানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তীর ধনুকের ব্যবহার ছিল। ১৮৬৮ সালে তীরকে খেলাধুলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং ১৯৪৮ সালে জাতীয় ক্রীড়া প্রদর্শনী উপ-লক্ষে 'অ্যামেচার আরচারি ফেডারেশন অফ জাপান' নামে একটি সংস্থার উদ্ভব হয়।

ভারতবর্ষে তীর ধনুকের ব্যবহার সৃষ্টির আদিকাল থেকে। বিশেষতঃ কোল ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতি-দের প্রধান হাতিয়ার তীর ধনুক অনাদি-অনন্তকাল ধরে। বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের যুগেও আদিবাসীদের এই প্রচলন অপরিবর্তিত। যেন তীর চিরন্তন

হয়ে বিঁধে গেছে তাদের মনের চেতনে অবচেতনে। তাই আজও উপজাতীয় মেলার প্রধান আকর্ষণ তীর খেলা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এখনও শিলং-এর মত অভিজাত শহরে এক বিচিত্র স্বাদের জুয়াখেলা হয় তীর খেলাকে ঘিরে। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম বর্ধমানের কাটোয়া আসানসোল দার্জিলিং-এর আলুবাড়ি, বাঁকুড়ার খয়রাবোণী বাঁধ, বীরভূম কুচবিহার পুরুলিয়া চন্দননগরে অদ্যাবধি তীরখেলা প্রতিযোগিতা ও বিনোদনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে গোষ্ঠীদের মত সীমিত এই খেলা এদেশে স্বীকৃত প্রতিযোগিতায় রূপ নেয় এক বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে। ষাট দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ গণ্ডীবদ্ধ ছিল রাইফেল স্যুটিং-এর মাধ্যমে। কিন্তু বিদেশী আমদানীকৃত গুলির এবং বন্দুকের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাইফেল শুটিং প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ১৯৬৭ সালে এই সংকট মুহূর্তে চন্দননগরের যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাঁশের তীর ধনুক তৈরী করে টারগেট স্যুটিং এর পরিবর্ত প্রতিযোগিতা চালু করেন। ইতিপূর্বে মালদা বীরভূম পুরুলিয়া পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তীর ছোঁড়া প্রতিযোগিতার রেওয়াজ থাকলেও ভারতবর্ষে এই প্রথম আধুনিক ধাঁচের বিজ্ঞানসম্মত তীর ধনুক প্রতিযোগিতা।

ভারতবর্ষের তীর প্রতিযোগিতা বিবর্তনের ইতিহাসে এক উল্লেখনীয় অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৭৩ সালে শ্রীভূপেন সেনের নেতৃত্বে। এই বছরের ২৪ ও ২৫ জানুয়ারী তারিখে কলকাতার ভবানীপুর ক্লাব মাঠে ওয়েস্ট বেঙ্গল আরচারি এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আরচারি চ্যাম্পিয়ানশিপ অনুষ্ঠিত হয়। '৭৫ সাল পর্যন্ত তিনটি প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নিচে দেওয়া হচ্ছে।

১৯৭৩—

৩০ মিটার

১ম ডি ঘোষ (হুগলী) ১৮৬ পয়েন্ট
২য় জে কিসক (বাঁকুড়া) ১২৫ পয়েন্ট
৩য় হানসু হাসদা (পুরুলিয়া) ১১৭ পয়েন্ট

৪০ মিটার

১ম এ কে বিশ্বাস (হুগলী) ১১১ পয়েন্ট
২য় ডি ঘোষ (হুগলী) ১০৮ পয়েন্ট
৩য় হানসু হাসদা (পুরুলিয়া) ১০৪ পয়েন্ট

৫০ মিটার

১ম ডি ঘোষ (হুগলী) ১০৬ পয়েন্ট
২য় বি দে সরকার (হুগলী) ৯২ পয়েন্ট
৩য় এ কে বিশ্বাস (হুগলী) ৯০ পয়েন্ট

১৯৭৪—

৩০ মিটার

১ম মঙ্গল হেমব্রেম (মেদিনীপুর) ৯০ পয়েন্ট
২য় শম্ভু মারনদি (বর্ধমান) ৮৭ পয়েন্ট
৩য় ঝুনা হেমব্রেম (মেদিনীপুর) ৪৭ পয়েন্ট

৪০ মিটার

১ম মঙ্গল হেমব্রেম (মেদিনীপুর) ৪০ পয়েন্ট
২য় কে সংকলামা (দার্জিলিং) ৩৩ পয়েন্ট
৩য় শম্ভু মারনদি (বর্ধমান) ৩২ পয়েন্ট

৫০ মিটার

১ম কে সংগলামা (দার্জিলিং) ৩৩ পয়েন্ট
২য় বিজো কিসকু (বর্ধমান) ৩১ পয়েন্ট
৩য় মঙ্গল হেমব্রেম (মেদিনীপুর) ৩০ পয়েন্ট

১৯৭৫—

৩০ মিটার

১ম মঙ্গল হেমব্রেম (মেদিনীপুর) ৫৮ পয়েন্ট
২য় রথীন দত্ত (কলকাতা) ৪১ পয়েন্ট
৩য় ঝুনা মুরমু (মেদিনীপুর) ৩৭ পয়েন্ট

৪০ মিটার

১ম অশোক চৌধুরী (২৪ পরগণা) ৩২ পয়েন্ট
২য় রাম মারনদি (মেদিনীপুর) ২৭ পয়েন্ট
৩য় নির্মল দত্ত (২৪ পরগণা) ১৮ পয়েন্ট

৫০ মিটার

১ম মঙ্গল হেমব্রেম (মেদিনীপুর) ২১ পয়েন্ট
২য় রাম মন্ডি (মেদিনীপুর) ১৭ পয়েন্ট
৩য় অশোক চৌধুরী (২৪ পরগণা) ১৫ পয়েন্ট

১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের অনুষ্ঠান শেষ হবার পর মার্চ মাসে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে প্রথম জাতীয় আরচারি চ্যাম্পিয়ানশিপ অনুষ্ঠিত হয়।

ফলাফল নিম্নরূপ—

	মিঃ ৩০	মিঃ ৪০	মিঃ ৫০
এ কে বিশ্বাস (পশ্চিমবঙ্গ)	১ম	২য়	১ম
জে ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গ)	২য়	১ম	৪র্থ
বি দে সরকার (পশ্চিমবঙ্গ)	৩য়	৪র্থ	২য়
ডি ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গ)	৪র্থ	৩য়	৩য়

পশ্চিমবঙ্গ দলগত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ১৯৭৪ সালে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে আয়োজিত দ্বিতীয় জাতীয় আরচারি চ্যাম্পিয়ানশিপেও পশ্চিমবঙ্গ দলগত শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি অর্জন করে। ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অকটোবর মাসে প্রথম অল ইন্ডিয়া রুরাল আরচারি টুর্ণামেন্টে পশ্চিমবঙ্গ তীর ধনুক দল বিজয়ী রাজ্যের নাম তালিকার শীর্ষে স্থাপন করে ও ১৯৭৪ সালে ত্রিপুরার আগরতলায় আয়োজিত প্রতিযোগিতাতেও পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখে।

ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও আরচারি প্রতিযোগিতা এগিয়ে চলেছে সমস্যা সঙ্কুল পথ মাড়িয়ে। পুরনো কায়দায় তৈরী বাঁশের তীর ধনুককে পেছিয়ে পড়তে হয়েছে আমদানী করা গ্লাস উড এর তৈরী পণ্যের কাছে। এতে সরল পদ্ধতিতে হাতের তীরকে সহজে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু একটি ধনু এর দাম চার-পাঁচ হাজার টাকা বলে দরিদ্র উপজাতিদের পক্ষে কেনা অসম্ভব। ফলে ক্রমশ আরচারিও রাইফেল শুটিং এর মত বিত্তবান সমুদয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত হতে চলেছে।

সস্তায় সাধারণ মানুষের হাতে তীর ধনুক পৌঁছে দেবার জন্যে গ্লাসউড এর মত শক্ত অথচ নমনীয় কঠোর সন্ধান করা হচ্ছে। কল্যাণকুমার দত্ত এ ব্যাপারে বিশেষ সচেষ্ট। ধনু নির্মাণের উপযুক্ত চারত্রের এক ধরণের কাঠের খোঁজ পাওয়া গেছে। নাম বেনগ্রেশাল্লা। দার্জিলিং এর পার্বত্য অঞ্চলে আঠার হাজার ফুট উঁচুতে এই কাঠ জন্মায়। খইর বা ধামন সম গুনসম্পন্ন। এ দিয়েও ধনুক তৈরীর কাজ চলতে পারে। তীর এর জন্যে যে কোন শক্ত কাঠ চলতে পারে তবে দেখতে হবে বহু ব্যবহারের পরেও যেন কাঠ সোজা থাকে।। শিশু পুনা বিজাশাল এই চরিত্রের বলে তীর বানানোর কাজে অপরিহার্য। উড বাউডিং মেসিনের দুষ্প্রাপ্যতা তীর ধনুক তৈরীর পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। অনেক অভাব অভিযোগের মধ্যেও তীর প্রতিযোগিতা ক্রমোন্বয়ে শহুরে সভ্য শিক্ষিত মানুষের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

এই খেলাটি চিরপুরাতন হয়েও চিরনূতন। রকেটের যুগে বসেও আমরা আদিকালের তীর বেঁধা মনটাকে হারাতে পারিনি। ক্রমশঃ প্রাচীন এই পোর্টসটি আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় আমেরিকায় আশী লক্ষের অধিক পশ্চিম জার্মানীতে পনের হাজারের মত ও জাপানে সাড়ে চার লক্ষের কাছাকাছি তীরন্দাজ আছে। এছাড়া বেলজিয়াম ফ্রান্স পোল্যান্ড সুইডেন কানাডা ফিনল্যান্ড প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরচারি অনুরাগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

এই জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেই বোধ হয় মিউনিখ অলিম্পিকের ক্রীড়া সূচীতে তীর ছোঁড়াকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে সম্ভবতঃ ১৯০৪ ও ১৯৮ সালে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে এর প্রতিযোগিতা হয়েছে। আর ১৯০২ সালের অলিম্পিকে বার্ড শুটিং অর্থাৎ সেই পুরনো কায়দায় পাখিকেই টারগেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তৃতীয় বার্ষিক রাজ্য শর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন দাসনগরের সি কে দাস ও মহিলা বিভাগে অর্জুন আরভার ক্লাবের সদস্যা ভারতী চক্রবর্তী। শ্রী দাস ৫০ মিটার ইভেন্টে ১৯৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে জাতীয় রেকর্ড গড়েন। (আগের জাতীয় রেকর্ড ছিল ১৬৮ পয়েন্ট।) দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন করেছে দ্রোণাচারী ক্লাব।

প্রশান্ত দাঁ

রঙ্গিনী আলোয়

পরদিন সকালেই আমাদের সকলের কলকাতার পথে পাড়ি দেবার কথা, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা-হয় গড়িমসি করতে করতে বেলা দশটা এমনিতেই বেজে গেল। দিনটা আবার বেস্পতিবার। অনুপকুমারের স্টেজ-এর দিন। উনি তখন স্টারের আর্টিস্ট। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, এই ছবির শুটিং করতে করতে উনি সপ্তাহের তিনটি দিন নিয়মিত স্টেজ-শো চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেস্পতিবার সন্ধ্যায় একটা শো, শনি আর রবিবার দুটো করে শো। কিছু মুস্কিল নয়, বেলা বারোটা নাগাদ লোকেশান থেকে বেরিয়ে সোজা কলকাতায় গিয়ে স্টেজ-শো ধরেছেন, তারপর রাত্রে আবার লোকেশানে ফিরে এসেছেন গাড়িতে। আমাদের শুটিং-ও সেইভাবে করা হয়েছে যাতে ছবির কোন আর্টিস্ট যদি রেগুলার স্টেজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাঁর কোন অসুবিধা না হয়। এখানকার সব ছবিতে এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য কলকাতার কাছাকাছি লোকেশান হলে শিল্পীরা এইভাবে স্টেজ-শো করে থাকেন। এখন লোকেশান যদি দিল্লীতে বা কলকাতা থেকে বহু দূরে হয়, শিল্পীকে সে-ক্ষেত্রে স্টেজ থেকে শুটিং-এর ক-দিন ছুটি নিতে হয়। বড় দরের আর্টিস্ট হলে তাঁর স্ট্যান্ড-বাই যিনি থাকেন, তাঁকেই সে-কদিন চালিয়ে নিতে হয়।

দশটা বেজে গেছে দেখে প্রোডাকশন ম্যানেজার শান্তিবাবু বলল—তাহলে চাট্টি খেয়েই না-হয় কলকাতায় ফেরা যাক।

প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ সকলের সমর্থন লাভ করল। বাস্তবিক, এখন যাত্রা শুরু করলে দেড়টা দুটোর আগে কেউ বাড়ি পৌঁছাতে পারবে না। আর তখন কেউ ভাত বেড়ে বসে থাকবে—এমন আশা করা অন্যায়। অতএব চাট্টি খোল-ভাত খেয়ে বেরুনোই বুদ্ধিমানের কাজ।

শান্তিবাবু বলল, খুব ভাল পার্শে মাছ এনেছি, নদী থেকে সদ্য সদ্য ধরা—

ক্যামেরাম্যান দিলীপরঞ্জন বরাবরই পেটুক। শুনে সুটকেশ গোছানো স্থগিত রেখে বলল—এত করে বলছ যখন...

সঙ্গে সঙ্গে এক রাউন্ড চা এসে গেল। অনুপকুমার শান্তিবাবুকে ডেকে বললেন—শান্তির আমি কিন্তু আর আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব, সেই মত ব্যবস্থা কর। আর কোন্ গাড়িটা দিচ্ছ?

—গোপালের গাড়িটা। ফুল ট্যাঙ্ক পেট্রোল ভরে দিয়েছি দাদা, আপনার কোন চিন্তা নেই। ঠিক সময়ে আপনাকে স্টারের সামনে নামিয়ে দেবে।

—ঠিক আছে।

আমি বললাম, যাব তোমার গাড়িতে?

অনুপকুমার বললেন, চল। তাহলে তুমি রেডি হয়ে নাও—

—কিন্তু তোমার শো তো সেই বেলা পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায়। এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে কি করবে?

অনুপকুমার হেসে বললেন বায়োস্কোপ কোম্পানীর ব্যাপার। আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বলেছি, এখন খেয়ে-দেয়ে বেরুতে বেরুতে আসলে সেই একটা দেড়টাই হবে বৎস—

লক্ষ্য করলাম আমাদের ক্যাম্পের সামনে একটু একটু করে ভীড় জমছে। এমন কিছু নয়। হয়ত খবর পেয়েছে আমরা চলে যাব তাই চোখের দেখা দেখতে এসেছে। প্রত্যেক লোকেশানেই এই একই ব্যাপার হয়। মাত্র কয়েকদিনের আলাপ পরিচয়ে এক ধরনের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। যাবার সময় হয় মুস্কিল। সবাই ভীড় করে আসে, আরও কয়েকটা দিন থেকে যেতে অনুরোধ করে, কিন্তু সে-সব আবেগ ঝেড়ে ফেলেই বায়োস্কোপের লোকদের চলে আসতে হয়। কষ্ট হয়, কিন্তু কোন উপায় থাকে না।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। বোম্বের এখনকার একজন প্রথম সারির অভিনেত্রী ফিল্মে এসেছিলেন ঠিক এই একইভাবে।

রাণাঘাটের কাছে একটা জায়গায় কোন একটা ছবির লোকেশান শুটিং হচ্ছে। ছবির নায়ক এবং নায়িকা—দুজনেই খুব প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ওঁরা ক্যাম্পেই থাকেন। ওঁদের সঙ্গে আশপাশের সকলের খুব হৃদ্য সম্পর্ক হয়েছে। পাড়ার মেয়েরা বিকেলবেলায় নায়িকাকে ঘিরে বসেন। প্রতিদিনই নানা গল্প-স্বল্প হয়। এখন একটা বাচ্চা মেয়ে, ভারি চমৎকার তাকে দেখতে, সে হঠাৎ খুব ন্যাওটা হয়ে পড়ল ওই নায়িকার। সব সময় পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে। যেখানে শুটিং হয় মেয়েটি নায়িকার আঁচল ধরে সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হয়। দুপুরবেলায় আর তাকে বাড়িও যেতে হয় না, নায়িকা নিজের লাঞ্চ থেকে তাকে খাইয়ে দেন, যেন নিজেরই ছোট্ট একটি বোন। এদিকে ইউনিটের সবাই সেই মেয়েটিকে বেশ ভালবেসে ফেলেছে। পরিচালক নিজেও খুব আদর করছেন মেয়েটিকে। ফলে মেয়েটিও খুব খুশী। এক যা রাতের বেলায় ঘুমোবার সময়টুকু বাদ দিয়ে সে সারাক্ষণই এই বায়োস্কোপের দলের সঙ্গে ঘুরছে ফিরছে। মেয়েটির বাড়ির সবাই খুব খুশী। মেয়েকে উপলক্ষ্য করে শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা করার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। ওর মা-দিদিরা আসে, নায়িকার সঙ্গে বসে গল্প করে। হঠাৎ সেই ছোট্ট মেয়েটি একদিন আবদার করে বসল—আমি দিদির সঙ্গে কলকাতায় যাব—

দিদি অর্থে সেই নায়িকা।

মা অবাক। —সেকি রে, তোকে কেন নিয়ে যাবে?

মেয়েটি বলে—হ্যাঁ আমায় বলেছে দিদি তুই যদি যেতে চাস তো আমার সঙ্গে যেতে পারিস। আমি দিদির সঙ্গে কলকাতায় চলে যাব।

কথাটা উনি বাস্তবিকই বলেছিলেন। অমন ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে, বড় সখ হয়েছিল ওর বাড়ির লোকেরা যদি ছেড়ে দেয় তো ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কাছে রেখে মানুষ করবেন।

—কিরে তুই যাবি আমার সঙ্গে?

শুনে মেয়ে তো তৎক্ষণাৎ এক পায়ে খাড়া। —হ্যাঁ যাব।

—মায়ের জন্য মন খারাপ করবে না তো?

মাত্র এক লহমারই যা বিরতি, তারপরই মেয়ে বলেছে—নাঃ।

শুটিং-এর পর মা এসেছেন ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে —হ্যাঁ দিদি, খুকুকে আপনি নাকি সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছেন?

নায়িকা হেসে বলছেন—মানে এমনি বলেছিলাম, আবদার করছিল—

—সে তো আমায় এখন পাগল করে দিচ্ছে, সারাক্ষণ মুখে এক ওই বুলি, কলকাতায় যাব আর কলকাতায় যাব, তা নিয়েই যান ওকে—

নায়িকা সামান্য ইতস্তত করে বললেন —গিয়ে থাকতে পারবে? শেষে হয়ত কান্নাকাটিই জুড়ে বসবে—

মা হেসে বললেন—সেদিক দিয়ে মেয়ে আমার খুব শক্ত, সহজে ভেঙ্গে পড়ার পাত্রী নয়। আর সে রকম যদি কিছু করে তো পাঠিয়ে দেবেন কাউকে সঙ্গে দিয়ে—

—বেশ তাহলে আমার আপত্তি নেই।

মেয়ে খুব খুশী, আহ্লাদে ডগমগ। সমবয়সীদের শুনিয়ে শুনিয়ে কি তার নাচ আর গান। বন্ধুদের মুখ হাড়ি।

তারপর নির্ধারিত দিনে ছবির লোকেশান শুটিং প্যাক-আপ হয়ে গেল। স্থানীয় মানুষজনের কাছে বিদায় নিয়ে সবাই কলকাতায় ফিরে এলেন।

আর শেষ পর্যন্ত নায়িকার সঙ্গে কলকাতায় এল সেই মেয়েটি। তখন বারো কি তের বছর তার বয়স। ফ্রকপরা সপ্রতিভ সুন্দরী মেয়ে। নায়িকা তাকে সে-বছরই কলকাতার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই মেয়ের পোষাক-আশাক আদব-কায়দা যেন সবই বদলে গেল। বোঝার আর কোন উপায়ই রইল না—মাত্র কয়েক মাস আগে সে ছিল সুদূর মফঃস্বলে, এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোরী কন্যা!

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আমরা একটা ছবির শুটিং করছি, সেই নায়িকাই

আমাদের ছবির হিরোইন, উনি স্টুডিওতে এলেন, সঙ্গে সেই মেয়েটি। কলবল করছে সারাক্ষণ। তখনই সব জানা গেল।

কালক্রমে মেয়েটি বড় হল। ফিল্মেরই একজনের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হল। ছবিতে নায়ক। বোম্বে গেল। এখন সে অবশ্য তার স্বামী বদলে ফেলেছে, সন্তান-এর জননী হয়েছে; হয়েছে হিন্দী চলচ্চিত্রের প্রথম সারির নায়িকা। দেখুন, কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে।

সেদিন আমাদের ক্যাম্পের সামনে ভীড় দেখে প্রথমে যা ভাববার তাই ভেবেছিলাম। তারপর স্নান সেরে আমি আর অনুপকুমার দোতলার বারান্দায় সবে খেতে বসেছি, হঠাৎ খানিকটা চীৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। রাস্তায় কারা যেন গণ্ডগোল করছে। আর ধুত্তোর। দেখি ড্রাইভার গোপাল ছুটতে ছুটতে আসছে আমাদের দিকে।

—কি হয়েছে রে গোপাল?

গোপাল কাছে এসে ভ্যাক করে কেঁদে বলল—ওই শালারা আমায় পিটছে দাদা—

অনুপকুমার চট করে উঠে দাঁড়িয়ে —কেন, কি হয়েছে কি—

বলা শেষ হলো না, দড়াম করে আস্ত একখানা থান ইঁট এসে পড়ল আমাদের মাঝে। আমরা লাফিয়ে সরে গেলাম, বাপরে, লাগলে আজ আর রক্ষে ছিল না। আর তার পরই শুরু হলো মুষলধারায় ইস্টক বর্ষণ। বাইরের একদল লোক আমাদের ক্যাম্পের দিকে তাগ্ করে ছুঁড়ছে।

চারিদিক হৈ চৈ পড়ে গেল। আচমকা এই আক্রমণের জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না।

গোপাল বলল—সবে আমি গাড়ি বের করেছি হঠাৎ একদল বদমাস ছোঁড়া এসে আমার গাড়ি থামিয়ে বুয়েচেন দাদা আমায় ধোলাই দিতে আরম্ভ করল। যত বলি এই মারছিস কেন, কোন জবাব নেই। সব গাড়ির চাকার পাম্প খুলে দিয়েছে, বলে কাউকে যেতে দেবে না এখান থেকে—

শান্তিবাবু রগচটা টাইপের লোক। চেঁচিয়ে বলল—ইঃ, মগের মুল্লুক নাকি যে যেতে দেবে না, কে বলেছে ওদের ফাংশন করে দেবে?

জানা গেল যারা ফাংশন করবে বলে শহরে পোস্টার সেঁটেছিল আজকের এই গণ্ডগোলের নায়ক আসলে তারা-ই। ফাংশন-এর নাম করে প্রচুর টাকা তুলে প্রথমেই চোট্ করে বসে আছে, হঠাৎ যেই শুনেছে যে বায়োস্কোপের লোকেরা চলে যাচ্ছে, ব্যস, ওদের মাথায় সাক্ষাৎ বজ্রাঘাত! টাকা তো সব ভাগ্‌বাটোয়ারা হয়ে গেছে এখন সেই ফাংশন যদি না হয় তো দেনেওয়ালারা পিটিয়ে নির্ঘাৎ ছাল-চামড়া তুলবে। অতএব যে কোনও উপায়ে বায়োস্কোপের লোকদের আটকাতে হবে, সমস্ত দোষটা ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের নিজের চামড়া বাঁচাতে হবে। তাই সকালে ওরা প্ল্যান করে এসে এই হুজোত লাগিয়ে দিয়েছে।

আমাদের ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে তৈরী। লাইটের মোটা লোহার স্ট্যাণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, খবর্দার, এদিকে এগোলে মেরে ঠাণ্ডা করে দেব।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল খানিকটা। তারপর শুরু হলো বচসা। ওরা বলে আমাদের এখানে ফাংশন করে দিয়ে যেতে হবে। আর আমরা বলি, কে তোমাদের ফাংশন করতে বলেছে? যে বলেছে তার কাছে যাও। ওরা বলে—এখান থেকে যেতে দেব না। আমরা বলি—দেখি কেমন তোমরা আমাদের যাওয়া বন্ধ করো!

ক্যাম্পের সামনে ভীড়।

অনুপকুমার এগিয়ে গেলেন, ভালভাবে বুঝিয়ে বললেন, দেখ ভাই, এটা তোমরা খুব অন্যায় করছ। তোমাদের জায়গায় এসেছি, কোথায় সহযোগিতা করবে তা না উল্টে ইঁট ছুঁড়ছো, তা আমাদের অপরাধটা কোথায়?

ওদের মুখপাত্র বললে—শ্যামলদা আমাদের এখানে ফাংশন করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, সেটা না করলে আমরা কাউকে ছাড়ব না।

অনুপকুমার দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলেন। —উঁহু, শ্যামল তোমাদের এখানে ফাংশন করে দেবে—একথা কখনো বলেনি। আমি নিজের কানে শুনেছি, সে বলেছিল যদি নির্বিঘ্নে শুটিং করতে দাও তো একদিন গান শুনিয়ে দেব, তাও কোন ঘরোয়া আসরে, ফাংশন করবে তো বলেনি—

কিন্তু ওরা গোঁ ধরে রইল—আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে, তার কি হবে?

—সে তোমরা যদি খরচ করে আমাদের ওপর গায়ের জোরে ফেলে দাও, সেটা জুলুম করা হবে। কেউ তোমাদের খরচ করতে বলেনি। তোমরা পোস্টার দিয়েছ, টিকিট বিক্রী করেছ, এখন তোমরাই বোঝো—

এই এক-কথায় দু-কথায় বেধে গেল তুমুল কাণ্ড। একটা মস্তান অনুপকুমারকে ঠেলা দিয়েছিল, ব্যস, আর যায় কোথায়, আমাদের ছেলেরা তাকে টেনে নিয়ে এসে কিঞ্চিৎ দাওয়াই দিতে তবে সে ধাতস্থ হলো।

অনুপকুমার আবার সবাইকে ধমক-টমক দিয়ে শান্ত করলেন।

এদিকে যাবার আর কোন উপায় ওরা রাখেনি। গাড়ির টায়ার চুপষে গেছে। অনুপকুমারের পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। হাতে যা সময় আছে তাতে সময়মত কলকাতায় পৌঁছানো দায়। ইতিমধ্যে একটা রফা হলো। ওরা বলল পাঁচশো টাকা দিলে আমরা সামলে নিতে পারি। শ্যামল মিত্রের ভাই সলিল উপস্থিত ছিল। সে বিরক্ত হয়ে বলল—আচ্ছা তাই দেব। এখন আপনারা বিদায় হন।

ইতিমধ্যে শহরের একদল ছেলে ঘটনা-স্থলে এসে উপস্থিত। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ প্রকৃতির শিক্ষিত ছেলে তারা। খবর পেয়ে তারা ছুটতে ছুটতে এসেছে। এসে আর কোন কথা নয়, ফাংশন পার্টিকে চাঁদা করে ধোলাই দিতে আরম্ভ করল।

মার খেয়ে ওরা পরিত্রাহি ছুটে পালাল। পাঁচশো টাকা আর জুলুম করে আদায় হলো না। পালাবার পর এই ছেলের দল অনুপকুমারকে বলল—দাদা কিছু মনে করবেন না। গুণ্ডা বদমাইশ সে তো আপনি যেখানে থাকেন সেখানেও আছে, সেই কথা ভেবে এবারের মত মার্জনা করে দিন।

ওরাই সব ব্যবস্থা করে দিল। গাড়ি-গুলো ঠেলেঠুলে নিয়ে গিয়ে টায়ারে বাতাস ভরে দিল। নিজেরা ধরাধরি করে আমাদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলতে সাহায্য করল। অনুপকুমারের দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে ওরা কলকাতাগামী একটা বাস দাঁড় করিয়ে বলল —দাদা এতে আপনি এগিয়ে যান, পথে ট্যাকসি ধরে নেবেন—

অনুপকুমার বললেন—যাচ্ছি, কিন্তু মনে রেখ ভাই, এদের যেন কোন বিপদ না ঘটে, এদের নিরাপদে কলকাতার দিকে রওনা করে দিলে বুঝব আমাদের দেশের ছেলেরা এখনও পশু-শক্তির কাছে মাথা নীচু করেনি, এখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার নৈতিক মনোবল অটুট আছে—

স্থানীয় কলেজের ছেলে ওরা। অনুপ-কুমারের কথায় ওরা নীরবে ঘাড় নাড়ল। অনুপকুমার পাবলিক বাসে চলে গেলেন। আর—

আর আমরা, ঘন্টাখানেক পরে রওনা হলাম। ওরা আমাদের পাহারা দিয়ে মাইল-পাঁচেক এগিয়ে দিল। তারপর নেমে গেল। যাবার সময় ওদের নেতৃস্থানীয় সেই ছেলেটি, কি-যেন তার নাম, আমাকে বলল—দাদা, তিক্ততা নিয়ে যাবেন না, আবার একবার আসুন, সত্যিকারের মানুষ যারা আছে এবার তাদের দেখতে পাবেন... আমরা কথা দিলাম।

ফিল্মের ভাল-মন্দ অনেক ঘটনার সাক্ষী আমি, এই ঘটনা কোনদিনও বিস্মৃত হব না।

রঞ্জন মজুমদার

সিনেমার অন্তরঙ্গ কাহিনী
পর্দার বিখ্যাত মানুষেরা লেখার পাতায় পাতায় এখন
যত হাসি তত হাসি হাসাহাসি

বায়োস্কোপিক

রঞ্জন মজুমদার বারো টাকা

সাহিত্যপ্রকাশ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

দেবরাজ।মিঠু

কবি

প্রযোজনা — মাটালিয়া প্রডাকসন্স

গানে, অভিনয়ে, আঙ্গিকে
একটি পরম রমণীয় ছবি

নিতাইচরণ ডোমের ছেলে হয়েও, জাত ব্যবসায় বা চুরি ডাকাতি করতে চায় না, লেখাপড়া, গান এবং কবিগানের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে চায়। চামুণ্ডা মেলার আসরে বিখ্যাত কবিয়াল 'মহাদেবকে' নিতাই হারিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে। বাড়ীর আশ্রয় ছেড়ে নিতাই, বন্ধুর (রাজা) স্টেশনের পয়েন্টসম্যানের কোয়ার্টারে থাকবার ব্যবস্থা করে। বন্ধুত্ব হয় ভিন গাঁয়ের কিশোরী বধূ ঠাকুরঝির সঙ্গে। ঠাকুরঝি দুধ যোগান দেবার জন্যে এসে কবিয়াল নিতাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। কবির আসরে গান শুনে ওকে মনে প্রাণে ভালবেসে ফেলে। আচমকা সেই গ্রামে আসে ঝুমুরের দল, তরুণী 'বসন' একাই নৃত্যগীতে আসর জমিয়ে রাখে। কবিয়ালকে আক্রমণ করে নানাভাবে, নিতাইও কম যায় না কবিগানের মাধ্যমে তার আক্রমণ প্রতিহত করে, বসনকে হারিয়ে দেয়। নিতাই তার ঘরে এসে দেখে বসন তার বিছানায় শুয়ে, ওর গায়ে হাত দিয়ে বোঝে সে অসুস্থ। বসনের অনুরোধে ওর কপাল টিপে দেয়, এই দৃশ্য দেখে 'ঠাকুরঝি' ভাবে নিতাই অন্য নারীতে আসক্ত। এই আঘাতে প্রথমে অসুস্থ, পরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ঠাকুরঝি। ডাক আসে কবিগানের, নিতাই আবার যায় বসনের সঙ্গে একত্রে ননীর বিরুদ্ধে গান বাঁধতে। প্রথমে হেরে গেলেও পরে মদ খেয়ে খিস্তি খেউড়ের সাহায্যে তাঁকে পরাজিত করে। কিন্তু মনে মনে ঠাকুরঝিকে ভালবাসলেও, নিতাই মমত্ববোধে বসনের সঙ্গে গাঁঠছড়া বেঁধেও যক্ষ্মারোগ থেকে বাঁচাতে পারলো না। বসন মারা গেল। নিতাই গ্রামে ফিরে বন্ধু 'রাজার' কাছ থেকে জানলে, একমাস আগে ঠাকুরঝি স্বর্গে গেছে।

'তারাশঙ্করের 'কবি' ইতিপূর্বে দেবকীকুমার বসু বাংলা ও হিন্দীতে পরিচালনা করেছিলেন। সে ছবির গীতিময় ভাবটি পরিচালক 'সুনীল ব্যানার্জির' ছবিতে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। বরং এ ছবিকে দেবকীবাবুর ছবির আধুনিক সংস্করণ বলা চলে। এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ—নবাগত শিল্পীদের অভিনয় ও আঙ্গিক। অনুভা, নীলিমা ও রবীন মজুমদারের অভিনয়ের সঙ্গে কোন তুলনা না করে, বলবো 'ঠাকুরঝির' ভূমিকায় ঝুমুরে গাঙ্গুলী, 'বসনের' ভূমিকায় মিঠু মুখার্জি ও 'কবিয়ালের' ভূমিকায় দেবরাজ রায় বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায়—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজা), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (মহাদেব) বীথি গাঙ্গুলী রেবা দেবী ননী গাঙ্গুলী; গীতা দে প্রশান্তকুমার প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। কলাকৌশলের কাজ বেশ পরিচ্ছন্ন। অন্তর্দৃশ্য গ্রহণে সৌমেন্দু রায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুর-সংযোজনায় ও গাওয়ার গুণে সব গানগুলি সুগীত, এজন্যে সব কৃতিত্ব সুরকার অনিল বাগচীর।

.চিত্রদূত

দেখাগৃহ

"সাজিস"

দুর্বল কাহিনী কেন্দ্রীক একটি উপভোগ্য গোয়েন্দা চিত্র

প্রযোজনা—মায়া মুভিটোন

ধনী বাবার মেয়ে 'সুনীতা' আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে। 'মিস কসমস' উপাধি পাবার পর, সুনীতা এক ভারতীয় তরুণের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, যিনি সে সময় আমেরিকায় 'মোটর রেসে আহত হয়েছিলেন। উনি (জ্যাক) ওখানে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পরিচিত হলেও আসলে ছিলেন একজন ইন্টারপোল পুলিশ অফিসার। যাঁর দায়িত্ব ছিল অবৈধ চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত লোকেদের গ্রেপ্তার করা। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম, অতঃপর সুনীতা ও জ্যাক বেরিয়ে পড়লো, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ঘুরে দেখবার জন্যে। এক লাকসারী লাইনারে একজনের খুনের ঘটনায় 'সুনীতার' জীবন বিপন্ন হলো, 'চ্যা' ও 'হ্যান-এর দল ওঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়, সাহায্য চায় জ্যাকের। ওঁদের মধ্যে রফা হোল 'জ্যাক' ১০ হাজার আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে 'সুনীতাকে ওঁদের হাতে তুলে দেবে। বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে 'হ্যান' ও 'চ্যাং'-এর কুচক্রী দল সুনীতা ও স্মাগলিং করা সোনা নিয়ে পালালো, কিন্তু অসম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে জ্যাক 'সুনীতাকে' উদ্ধার করলো আর ওঁদের রাখা টাইম বোমায় কুচক্রীর দল নিহত হোল, সোনাও বিনষ্ট হোল।

জেমস বন্ড ও বিদেশী গোয়েন্দা ছবির অনুসরণে কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন রঞ্জন বোস।

সাজিস।সায়রা বানু।ধর্মেন্দ্র

এই ছবির অভিনয়ে (জ্যাক) ধর্মেন্দ্র এবং (সুনীতা) সায়রা-বানু ভালো অভিনয় করবার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায়—দেবকুমার (হ্যান) মদনপুরী (চ্যাং), হেলেন (লোলা), রাজেন্দ্রনাথ পেন্টাল ও ইফতিকার চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, হংকং ও সিঙ্গাপুরের বহির্দৃশ্য গ্রহণে চিত্রগ্রাহক এ ভট্টাচার্য এবং সম্পাদনায় গুরু দত্ত ও তামন ভোঁসলে তাঁদের সুনাম রক্ষা করেছেন। সঙ্গীত রচনায় শঙ্কর জয়কিষণের সুররচনা আরো উন্নত হতে পারতো।

চিত্রদূত

চোর চোর
বিজয় আনন্দ।লীনা চন্দ্রভারকর

ইমান

অভিনয়ে আঙ্গিকে সমৃদ্ধ হলেও দুর্বল কাহিনী ও চিত্রনাট্যের জন্য ছবি জমাট বাঁধতে পারেনি

প্রয়োজনা : গুরুদত্ত ফিল্ম কম্বাইন

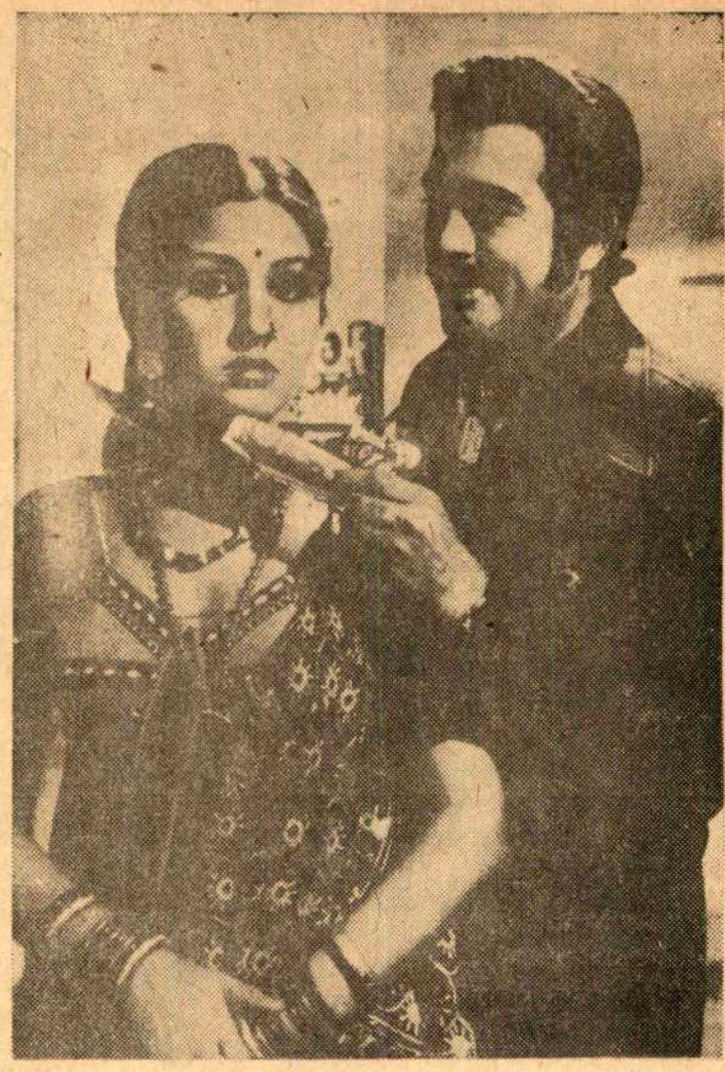

মৃত্যুপথের যাত্রী এমন এক রোগীর জন্যে অর্থের অভাবে ওষুধ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধরা পড়ে মাধবের তিন মাসের জেল হয়। কিন্তু সৎ স্বভাব ও বিনয়ী ভাবের জন্যে মাধবকে শীঘ্রই জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়ে ওকে আবার যাতে পাপের পথে না আসতে হয় সেজন্যে জজসাহেব সোনপুরে দ্রব্য-সামগ্রীতে ভর্তি একটি ছোট্ট মুদী দোকান উপহার দেন, মাধবও সৎভাবে দোকানের জিনিস বিক্রী করে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু ওর পড়শী দুই মুদী সাধুরাম ও শান্তারাম নানাভাবে তাকে হয়রানি করতে লাগল। বেদের মেয়ে ইমলীও মাধবের দোকান থেকে চুরি করতে শুরু করল। পরে মাধবের কথামত চুরি করা ছেড়ে দিয়ে ভাল হবার চেষ্টা করল। অন্যদিকে মাধবের পাতানো মামার কাছ থেকে নানা রকমের বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হল। কিন্তু মাধবকে সহজে কেউ দমাতে পারে নি। সাধুরাম ও শান্তারাম ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে পুলিশের কাছে ওকে উপস্থিত করে ধার নেওয়া টাকা শোধ না দেবার জন্যে। ওর বিরুদ্ধে সমন আসে কিন্তু ইমলীর সহযোগিতায় মাধব ছাড়া পেয়ে জঙ্গলের এক কুঠীতে আশ্রয় নেয়। আর এদিকে দুই মুদী তার দোকান লুঠ করে।

এবারে রঙ্গমঞ্চে আগমন হোল মাধবের ভাই লাখনের। চেহারা দুই ভায়েরই এক, তফাৎ কেবল গোঁফ। ভেজাল দেওয়ার অপরাধে ওকে গ্রেপ্তার করা হল। জেলা জজের সামনে মাধব প্রমাণ করে দেয় উভয়েই এক ব্যক্তি এবং ছদ্মবেশের মাধ্যমে কিভাবে মাধব সমস্ত কাজ হাঁসিল করেছে সেটাই জানিয়ে দেয়।

পরিচালক পদ্মনাভ পর্দায় যে কাহিনী উপস্থিত করেছেন সেটা রেখটের এক বিখ্যাত নাটক অনুসরণে রচিত হয়েছে। কিন্তু দুর্বল কাহিনী ও চিত্রনাট্যের জন্যে ছবি তেমন দানা বাঁধতে পারে নি। সম্পাদকের কাজও তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তাঁর কাঁচি আরও নির্মম হতে পারত।

অভিনয়ে—মাধব ও লাখন দুই ভূমিকায় সঞ্জীবকুমার এবং ইমলীর ভূমিকায় লীনা চন্দ্রভারকর সুন্দরভাবে তাদের চরিত্রকে উপস্থিত করেও দুর্বল কাহিনী ও পরিচালনার জন্যে কৃতকার্য হতে পারলেন না। অন্যান্য ভূমিকায় ভগবান আনোয়ার হুসেন সতেন্দ্র কাপ্পু কৃষ্ণবসন্ত কেষ্ট মুখার্জি আশা পোদ্দার মোহন চেটির অভিনয় যথাযথ। আলোকচিত্র গ্রহণ ও কলাকৌশলের কাজ খুবই উচ্চাঙ্গের। সঙ্গীত-পরিচালনায় আর ভি বর্মণের সুর সংযোজন গতানুগতিক।

চিত্রদূত

অনিল চ্যাটার্জি - মহুয়া রায়চৌধুরী - দীপংকর দে - পরিচালক ইন্দর সেন

'অসময়' হাজারিবাগে

ভোর হল হাজারীবাগ রোড ষ্টেশনে। তেইশে মার্চ। আমি আর সুকুমার রায় আমাদের ফটোগ্রাফার ষ্টেশনে নেমে বাসের ভীড় দেখে ট্যাকসির সন্ধানে—এহেন পরিস্থিতিতে প্রোডাকশন কন্ট্রোলার কাশী বাঁড়ুজ্যে সহযোগী কাজল দৃশ্যমান হলেন। আমরা গলার স্বর সপ্তমে তুলে প্রথমে কর্ণগোচর, তারপর দৃষ্টিগোচর। ওরা এসেছেন এক অভিনেত্রী দেবিকা এবং ওর মাকে বম্বে মেলে মেলা করিয়ে দিতে। বেশ ভাল কথা। আমরা ওভার ব্রীজ পার হয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ির চালক গোপালবাবু সাত সকালে স্নানটান সেরে বেশ পরিপাটি। স্নানের উপকারিতা সম্পর্কে বিশদ বলতে থাকেন এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে। শুটিং ভালই হচ্ছে। খুব গরম। সকালের দিকে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। আকাশ এখনও মুখ গোমড়া করেনি। এইসব শুনতে শুনতে ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। উফ সে কি সাদর সম্ভাষণ। অনিল চাটুজ্যে হৈ হৈ করে উঠলেন। পরিচালক ইন্দর সেন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার মত হাত জোড় করে দাঁড়ালেন এর মধ্যে চিত্রশিল্পী কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও স্বরূপ দত্ত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন। চা পর্ব চলছে তখন। সুতরাং চা আসবেই। হঠাৎ কি হল আমরা সকলে একযোগে আকাশের দিকে তাকালাম। গতিক সুবিধের নয়। আমরা কি তাহলে কলকাতা থেকে মেঘ ধরে নিয়ে এলাম। সেটা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন ইন্দর। অনিলদা বললেন, উহুঁ তা নয় আচ্ছা এখানে রওনা হবার ঠিক আগে তুমি কোন নায়িকার ইন্টারভিউ নিয়েছ আর সুকুমার—কোন নায়িকার ছবি তুলেছ বাবা...কথার রেশ থাকতে থাকতেই সকলের মুখে যেন হাসির তুবড়ী ফাটল! এর মধ্যে দোতলার ছাদে এসেছেন অপর্ণা অপর্ণা সেন—এ ছবির নায়িকা। তিনিও সাদর সম্ভাষণ জানালেন। এই করতে করতে বেলা গড়িয়ে চলল। আকাশ তখন ভারত-পাকিস্থানের হকি খেলার অবস্থায়। ভগবানের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি। পরিচালক তাঁর ইউনিটসহ লোকেশনে রওনা হলেন। আমরা সঙ্গী হলাম। স্পটে গাড়ি আমাদের ছেড়ে দিল। তার আগেই ভ্যান এসে পৌঁছে গিয়েছে। একটু পরে এল একটা টাঙ্গা। বাহান্ন মাইল অতিক্রম করে ঘোড়া বেচারা হাঁপাচ্ছে। সারা রাত হেঁটেছে। ধানবাদের ঝরিয়া টাঙ্গা স্ট্যান্ড থেকে। ঘোড়াটা তেমন স্বাস্থ্যবান নয় তাই ওর কষ্টটা একটু বেশীই হচ্ছে। ওকে দানা-পানি খাওয়ান হতে লাগলো যাতে করে সুস্থ হয়ে শট দিতে পারে। ঘোড়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে ওপরওয়ালার করুণা হয়েছিল কিনা জানি না শুটিং করা গেল না। লাঞ্চ ব্রেক অবধি সূর্যের দেখা মিলল না। ফলে লটবহর নিয়ে সকলকে ক্যাম্পে ফিরতে হল। ফিরে আসা মাত্তর একি ধরণের রসিকতা বলুন রোদ একেবারে হ্যা হ্যা করে হাসতে শুরু করে। মেক-আপ তোলা না হলে দেখা যেত। তাও হবার জো রইল না। একটু পরেই বিকেলের আলো পড়ল। আর আলোতে কোন ঘরে ফিশ কোন ঘরে রামি কোন ঘরে ব্রীজ বারান্দার ভাগ্য গননা। সহকারী ক্যামেরাম্যান ভবতোষ ভটচাযি মশাই দেখব না দেখব না করেও বেশ কয়েকটা হাত দেখে ফেললেন। লাইনে আরও কয়েকটা হাত ছিল সকালে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আর আমরা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়েই মরলাম। বেদম ঝড় বৃষ্টি চলছে। আলো নেই। তারফার ছিঁড়ে গেছে আর কি। এই অবস্থায় আড্ডা জমে ওঠে। অন্ধকারেই আলোর সন্ধান মেলে।

দুম করে সিরিয়াস আলোচনার সূত্রপাত হল। আচ্ছা এত জায়গা থাকতে আপনি হাজারিবাগ লোকেশন কেন নির্বাচিত করলেন অসময় ছবির জন্য? ইন্দর বলেন: এখানে সারাদিন ঘুরে আপনি কত লোকজন দেখেছেন হাতে গুনতে পারবেন কত গাড়ি ঘোড়া তাও কটা বাড়ি আছে—সব মিলিয়ে এই জায়গার নির্জনতা আমাকে বেশী টেনেছে। সাবজেকট অনুযায়ী এরকম একটা নির্জন জায়গার খোঁজেই ছিলাম আমরা। কদিন ধরে আমরা এখানে শুটিং করছি। এখানে বলতে এখানকার রাস্তাঘাটে ফাঁকা মাঠে একটা আশ্রমে এবং ষ্টেশনে। আজকে একটা গান পিকচারাইজ করার কথা ছিল। মান্না দের গাওয়া নজরুল গীতি। এই গান গাইতে গাইতেই পর্দায় শচিপতির আগমন।

মোহিনীর জীবনে শচিপতি প্রথম পুরুষ।... যে পুরুষমানুষ ভাবে ভালবাসার

চেয়ে মরার ভয়টা বেশী তার ভালবাসার চেয়ে আমি বিশ্বাস করি না। শচিদা আমাকে কতটুকু ভালবেসেছিল আর কতটা নিজেকে ভালবাসত তার হিসেব তো সে দেখল না।...শচীদার জন্য মায়া হয়। ও ভীষণ দুর্বল। না আছে সাহস। না জেদ। ওকে দেখলে মেয়েদের মায়া হয় মন ভরে না।...শচীপতি ক্যান্সার রোগে ভুগছিল। মৃত্যুভয় ওকে ধীরে ধীরে জীবনের চারিদিক ঘিরে ফেলেছিল। তাছাড়া আরেকটা বিশ্বাস ছিল...আমাদের বংশের কেউই বেশীদিন বাঁচেনি।...শচীপতির পর মোহিনীর জীবনে এসেছিল এক কন্দর্পকান্তি চেহারার পুরুষ। তার সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ঘর করতে পারেনি। করা যায় না। সব ফাঁকি সব

প্যারী, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী দোকানেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
রূপাং সেরামিক্স প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

শতাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত
লক্ষ্মীবিলাস তৈল

নতুন প্যাক

যুগোপযোগী রুচির চাহিদা মত এবং প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার মত প্যাকিংএ পাওয়া যাচ্ছে। কেশ তেলে এরূপ প্যাকিং এই প্রথম।

এল. এন. বসু এণ্ড কং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১৬

আঘাত সব অসম্মান সহ্য করা যায় না। এরপর থেকে মোহিনী বড় একা হয়ে গিয়েছিল। যদিও ফিরে এসেছিল বিপত্নীক জ্যাঠামশাই ছোট বোন আয়না আর ছোট ভাই সুহাসের মাঝে। সুহাস কলকাতায় চাকরী করে। মাঝে মাঝে আসে। মোহিনীর সঙ্গে মানসিক সংযোগ স্থাপনে বুঝতে পারে অনুভব করতে পারে। বাড়ির তিন পুরুষের ইট পাথর মাটির তলায় চাপা পড়ছে মোহিনী। আচমকা ঝড় আসে। সব তছনছ হয়ে যায়। কলকাতা থেকে সুহাসের সঙ্গে ওর বন্ধু অবিন বেড়াতে আসে। বিদ্যুতের মতো তীক্ষ্ণ কথাবার্তা। আলাপের মুহূর্তেই কেন যেন সব এলোমেলো হয়ে যায় মোহিনীর। তবুও সে কথা বলে...ভাল নাম অবন্তী থেকে অবিন কেন? অবু না হয় অন্ত হওয়া উচিত ছিল।...অবিন ম্যানেটা নামের উদ্দেশ্য নয়। ঝুঁটি ধরে আনার জন্য কেউ চুল রাখে।...আপনার নামটা পুরানো কিন্তু মিথ্যে নয়।...কথা শুনে মোহিনী লজ্জায় লাল হয়ে গেল। অবিন কেন এল? যখন তার বেলা ছিল তখন সে তো আসেনি। মনে মনে বলে হয় তো...এই অসময়ে তুমি আমার কাছে কিছু চেও না।...অবিন কোনটা গ্রাহ্য করে কোনটা করে না বোঝা মুশকিল। তবে সে মোহিনীর মুক্তি চায়। সে হল ঝড়ের বাতাস. ছন্নছাড়া ঘরছাড়া মনছাড়া। ও যে সর্বনেশে পুরুষ।...আমায় তুমি সর্বনাশী হতে বলো না। আমি এই সংসারে বাধা পড়ে গিয়েছি। একদিন এখানে শুধু আমি একলাই থাকব। আমার চারপাশ ফাঁকা হয়ে যাবে।...তবুও মোহিনী একসময় বুঝতে পারল এখানে একদিন একাই থাকতে হবে। ভবিষ্যতের বিপুল একাকিত্বের কল্পনায় মুখোমুখি মোহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। মানসিক অস্থিরতায় তিল তিল করে শূন্য হতে থাকে। এমন সময় অবিন এসে হাজির হয়। বুকের যেখানে দুঃখের পাথর জমে ছিল অকস্মাৎ কোথাও তার ফাটল ধরে। এখানেই মোহিনীর মুক্তি। তাই অবিনকে ফিরিয়ে দিতে পারে না।

মোহিনী: অপর্ণা সেন। অবিন: স্বরূপ দত্ত। শচীপতি : দীপঙ্কর দে। আয়না : মহুয়া রায়চৌধুরী। জ্যাঠামশাই: অনিল চট্টোপাধ্যায়। তপু নামে একটি চরিত্র: পার্থ মুখোপাধ্যায়। সুহাস: কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। ভৃত্য: অজিত চট্টোপাধ্যায়।

পরদিন গান পিকচারাইজ করা শেষ হলে আমরা দুই কি তিন ক্ষেপে হাজারিবাগ টাউন অভিমুখে যাত্রা করলাম। প্রথমের গাড়িতে ছিলেন অনিল চট্টোপাধ্যায় অপর্ণা সেন স্বরূপ দত্ত পার্থ মহুয়া প্রভৃতি। এই গাড়ি আরেকটু হলে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ত। মুখোমুখি আসছিল একটা মাল বোঝাই লরী। রাস্তার দুপাশে বন জঙ্গল। হেড লাইট জ্বলছে মুখোমুখি। দেখা গেল লরী নয় লরীর একটা চাকা এগিয়ে আসছে। যথা সময়ে গাড়ি না থামলে বায়স্কোপের লোকজনদের তেইশটা বেজে যেতে পারত। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনতে শুনতে আবার ঝড় বৃষ্টি। নতুন ক্যাম্প এসে সব ঠিকঠাক করতে করতে রাত হল। আড্ডা আর হল না। ঘুম হল: পরদিন সকাল থেকে নতুন লোকেশনে শুটিং। কাছেই মস্ত এক বাড়িতে। বাড়ির নাম জিব্রাল্টার। সকালে উঠে অবশ্য রোদের দেখা মিলল। স্পটে পৌঁছতে পৌঁছতে বেগড়বাঁই শুরু হয়ে গেল। শুটিং আর হবে কি সর্বক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফাঁকে ফাঁকে গল্প চলছিল শিল্পীদের সঙ্গে। অপর্ণা ইদানিং খুব ছবি তুলছেন। ছবি তোলা ওঁর হবি। মুভি ফটোগ্রাফি শেখার বাসনাও আছে। ক্যামেরার সামনে তো অনেকদিন হল। এবার নেপথ্যে এসে ভিজুয়ালাইজ করার ইচ্ছে। কল্যাণ চুল এবং দাড়ি কি অনুপাতে বড় করেছে তার প্রমাণ মিলল যখন ঝুঁটি বেঁধে দিলেন দীপঙ্কর। সাহায্য করলেন অপর্ণা। সতেরো কি আঠারো বছরের মহুয়ার বুড়ির মত পান খাওয়া চলছিল অবিরত। পার্থ সব কিছুর মধ্যে ছিল আবার ছিল না। স্বরূপ পাহাড়-প্রমাণ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে কলকাতা চলে গেলেন হারমোনিয়াম -এর শুটিং করতে। ফিরে আসার কথা কদিন পরে। অনিল চাটুজ্যে আমার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে থেকে বললেন একদিন—তোমরা যতই আমাকে বৃদ্ধ বানাবার চেষ্টা কর আমি হচ্ছি না।

সেটা কেমন করে সম্ভব? এই তো আপনি এখানে বৃদ্ধর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এরকম দু-চাট্টের কথা বাদ দিয়ে আমি এখনও নায়কের রোল করছি বেশ কয়েকটা ছবিতে। অজিত লাহিড়ীর ছবিতে নো মেক-আপ স্রেফ একটা উইগ। আমি বাপু আমার বয়স বাড়াতে কোন মতেই রাজি নই।...

এইভাবে কয়েকটা দিন অতিবাহিত করে আমি সুকুমার রায় সহ কলকাতায় ফিরে এলাম। শুটিং এখনো চলছে। চলবে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

আপনজন চিত্রমের ব্যানারে তৈরী হচ্ছে এ ছবি। বিমল করের উপন্যাস থেকে স্বরচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন সুন্দর সেন। চিত্রশিল্পী: কৃষ্ণ চক্রবর্তী। প্রধান সহকারী: অনিল ঘোষ। লোকেশান সম্পাদক অরবিন্দ ভট্টাচার্যের সহকারী বাসু সাউন্ডে অমূল্য মেকাপে গৌর প্রোডাকশনে তপন মুরারি অনিল অনুকূল স্থির চিত্রে তপেন পরিচালনায় সহকারী পঙ্কজ সমর এবং সুজিত প্রভৃতি বাবুরা।

বিশেষ সংবাদদাতা

কিছুক্ষণ

মাধবী মুখার্জি

মাধবী মুখার্জীর (চক্রবর্তীর) বাড়ীতে যখনই গেছি আপ্যায়নের ত্রুটি দেখিনি। বেস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা গেলে তো কথাই নেই। লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ না খাইয়ে ছাড়েননি কোনো দিন। ফলমূল আর মিষ্টিতে ভরা প্লেটখানা এগিয়ে দিয়ে বলতেন 'চায়ের আগে নিন প্রসাদটুকু খেয়ে নিন।'

এইকথা মনে ছিল বলেই না বলেকয়ে দোলের দিনই হানা দেব ভাবলাম। একে দোলপূর্ণিমা, তায় আবার বেস্পতিবার। সুতরাং পুজোটা বেশ ঘটা করেই হয়তো হবে। আর অভিনেত্রী মাধবী মুখার্জীকে দেখতে পাব গরদের শাড়ী পরে পুজোর কাজ আর লোক সামলাতে ব্যস্ত। নতুন রূপে দেখবো উর্বশী মাধবীকে। আপনাদেরও দেখাবো।

যেই ভাবা সেই কাজ। রং লাগার ভয়ে আতংকিত হতে হতে বাসের জানালা বন্ধ করে রিকসা ঠেঙ্গিয়ে দোলের দিন সন্ধেবেলা যখন লেক গার্ডেনস-এর বাড়ীখানার কলিংবেলে আঙ্গুল রাখতে যাব তখনও মনে হয়নি শিল্পী মাধবী মুখার্জী একবারে ঘরোয়া হয়ে বসে আছেন ঘরে। কলিংবেলের শব্দে প্রথমেই নীচে নেমে এল মিমি, নির্মল-মাধবীর মেয়ে একমাত্র মেয়ে। আমাকে দেখে ফুটফুটে হাসি হাসি মুখ করে বলল মাকে তো? ইতিমধ্যে দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে ওপরে আসতে বললেন মাধবীদেবী নিজেই।

এলাম ওপরে। ঘরে ঢুকে দেখি চিত্রনাট্যকার প্রশান্ত দেব বসে আছেন। আমি গিয়ে বসলাম পাশের চেয়ারে। মাধবী দেবী একটু দূরে সামনের সোফায় বসলেন। বললেন কি খবর? অনেক দিন পর হঠাৎ?

—এমনিই। ছুটির দিন তো, জানি বাড়ী আছেন আপনি, তাই। মাধবী দেবী তখন চারুলতার হাসি নিয়ে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে। মিমি এসে বসেছে মার কোলে।

কেন জানিনা বেশ ফরসা লাগছিল মাধবীকে। বিশেষ করে মুখখানা। কোনো মেক-আপ নেই। মুখে পান খাওয়ার কিছু চিহ্ন। পরণে অরগ্যান্ডি ধরনের একখানা শাড়ী, সাদা ব্লাউজ। চুল আলগা করে বাঁধা। খুব রুক্ষ নয়। বোধহয় দোলের রঙ গায়ে লাগে নি।

তাই জিজ্ঞেস করলাম—'কি ব্যাপার, রঙের ছোঁয়া দেখছি না তো আপনার পোশাকে?

বেশ খেদের সঙ্গেই বললেন—এই দেখুন না, সকাল থেকে এই ছেঁড়া শাড়িখানা পরে বসে আছি রঙ নেবার জন্য। কিন্তু এখনও কেউই এলো না।

—দুঃখ হচ্ছে আপনার?

ঃ না দুঃখ নয় তবে প্রতিবারই আসে কেউ না কেউ। পাড়ার ছেলেরা তো বটেই। ফিল্ম লাইনের খুব একটা লোক অবশ্য আসে না।

বেঁচে গেছেন। বলে উঠলেন প্রশান্তবাবু। আজকালকার যা রঙ আবীর হয়েছে সবই ভেজাল। রঙ না পাবার জন্য দুঃখিত হবার কারণ নেই।

বেঁচে আর কোথায় গেলাম, কালই তো গাড়ীতে রঙ ছুঁড়েছিল।

আমিও প্রশান্তবাবুর সঙ্গে একমত হতে মাধবী দেবী আর বেশী কিছু বললেন না।

—মিমির সঙ্গে

মিমিকে পড়তে পাঠিয়ে দিলেন নীচের ঘরে।

পুরোনো দিনের কথা উঠতে তিনি বললেন—এখানে তো রঙের তেমন উপদ্রব নেইই। চোখটা বেশ বড় করে তিনি শোনালেন কাশী মিত্তিরের ঘাটে তো একমাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় হোলি। হিন্দুস্থানীরা সারাটা রাত রামাহো শ্যামাহো করে যা করে ঘুমোয় কার সাধ্যি!

এইসব কথার ফাঁকে তিনি দু-একবার উঠে গেছেন বোধহয় কাজের তদারকির জন্য। কারণ একবার তিনি কাজের মেয়েটাকে একটু জোরে ডেকে বললেন—গমটা ভাঙাতে দেওয়া আছে, নিয়ে আসবি।

নির্মল-মাধবী আর মিমি এই তিনজনকে নিয়ে ছোট্ট সংসার মাধবীর। সারাটা দিন সংসারের কাজ করতেই চলে যায় তার। সকাল বেলা মেয়েকে খাইয়ে-দাইয়ে স্কুল পাঠানো থিয়েটারের দিন হলে নির্মলবাবু তো আবার পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে যান—তাঁর শরীরের দিকে ঠিকমত নজর রাখা। শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, ওষুধ পত্রগুলোও ঠিক ঠিক সময়ে মুখের কাছে ধরতে হয় মাধবীকেই। অবশ্য সে ধরবে না তো কে ধরবে। এরই মধ্যে আবার নতুন নাটকের মহলা আছে।

সুন্দর করে সাজিয়েও নিয়েছেন সংসারটাকে। শুধু আর্থিক দিক থেকে নয়, মানসিক ভাবেও। যখনই মাধবীকে দেখবেন হাসি ছাড়া দেখবেন না। মাধবীর মুখে হাসি নেই এটা চিরমিথ্যে। যেমনটি দেখছি এখন। চুপচাপ বসে থাকলেও হাসির একটা রেশ লেগে থাকে যেন ঠোঁটে। মাঝে মধ্যে একটু টোল পড়ে গালে। চেহারাতেই বেরিয়ে আসে সুখের ছাপ। জিজ্ঞেস করার তাই প্রয়োজন হয় না।

সারা ঘর জুড়েও সেই সুখের পরশ ছড়ানো। বসবার ঘরটা বেশ বড়োসড়ো। তিনটে সোফা আছে তিন দেয়ালে। মাঝখানে এল সেপ-এর একখানা নীচু টেবিল। মোজাইক করা মেঝে বলেই বোধ হয় আর কার্পেট পাতেননি। একটা দেয়ালে রেডিও-গ্রামখানা ডালা বন্ধ করা অবস্থায় রয়েছে। দেয়াল সাজানোয় আতিশয্য কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের একটা প্রকাণ্ড ছবি আর দরজায় মাথায় কাঠের তৈরী ওমরখৈয়ামের নায়ক-নায়িকা পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে নিয়ে বসে। আর আছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সেরা অভিনেত্রীর মানপত্রটি। কনের সাজে বিয়ের দিন তোলা একখানা ক্লোজআপ ছবি দেয়ালের একবারে মাঝখানে লাগানো।

ইতিমধ্যে প্রশান্তবাবু হলিউডের অভিনেত্রী আর স্টার সিস্টেম নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। ইনগ্রিড বার্গম্যান - এন্থনি কুইন - কার্ক ডগলাস করতে করতে স্ক্রিন পার্সোন্যালিটির কথা এসে গেল। মাধবী দেবী বললেন—আমাদের দেশে স্ক্রিন পার্সোন্যালিটি আছে সুচিত্রা সেনের। দারুণ পার্সোন্যালিটি!

কথাটা অস্বীকার করার নয়। কিন্তু স্টারের স্ক্রিন পার্সোন্যালিটি যদি চরিত্রের পার্সোন্যালিটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাহলে? অনেক ক্ষেত্রে হয়ও তাই। কথাটা মানলেন মাধবী দেবী। স্ক্রিন পার্সোন্যালিটি স্টার ইমেজ তৈরী করতে সাহায্য করে সত্যি কিন্তু চরিত্রকে ডিঙিয়ে স্ক্রিন পার্সোন্যালিটি যদি বেরিয়ে আসে তখন অভিনয় কি সাফল্যলাভ করে? সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সাধারণ দর্শকরা এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। কিছু বলতে যান এই নিয়ে, দেখবেন সবাই বলবে আঁতেল হয়েছো? বললাম আমি।

মাধবী দেবীর ক্ষেত্রে কিন্তু স্ক্রিন পার্সোন্যালিটি তাঁর কোনো চরিত্রকেই ডিঙিয়ে যেতে পারেনি। সেই বাইশে শ্রাবণ থেকে শুরু করে বুন পলাশীর পদাবলীর মেঝ বৌ (?) পর্যন্ত কোনো ছবিতেই তাঁকে চরিত্র ছেড়ে বাইরে আসতে দেখা যায় নি।

শিল্পীর এই গুণটাই তো সব থেকে বড়ো।

প্রশান্তবাবু নাটুকে ঢঙে কথাবার্তা বলে আলোচনাটাকে তুঙ্গে তুলে দিয়ে বললেন চলি। মাধবী দেবী শুনেই হা-হা করে উঠলেন—সেকি চা না খেয়ে যাবেন কি, বসুন। মেয়েটাকে খাবার আনতে পাঠিয়েছি। ও এই এলো বলে।

কিন্তু এক ঘণ্টা পরও যখন মেয়ে ফিরল না তখন প্রশান্তবাবু সত্যিই বিদেয় নিলেন আমাকে একলা রেখে। মেয়েটি ফিরছে না দেখে মাধবী দেবী বেশ চিন্তিত মনে হলো। কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না।

কাজের লোক নিয়ে যে কত কি ঝামেলা তখন আলোচনার বিষয় হোল তাই। কদিন আগে কাজের মেয়েটি চলে যেতে এই নতুন মেয়েটি এসেছে মাত্র দু-দিন হলো। খুব গরীবের মেয়ে, তাই রেখেছেন। অনুভূতি আছে মাধবীর। বললেন—আরও একটা মেয়ে রাখার কথা আছে। যদিন পারি রাখি।

আবার অভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনার মোড় ঘুরতেই বললাম গতকাল নাকি আপনি কোথায় নাটক করতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম নিউ ব্যারাকপুরে।

: কি নাটক করলেন?

—শেষের কবিতা।

থিয়েটারকে মাধবী ভালবাসেন নিজের জীবনের মত। তাঁর রক্তে থিয়েটার। হবে নাইবা কেন, থিয়েটারই তো তাঁকে প্রতিষ্ঠা

দিয়েছে, অভিনয় শিখিয়েছে। তাই যখন জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে কমার্শিয়াল বোর্ডে যোগ দিচ্ছেন না কেন?

উত্তরে জানালেন একবার নাকি বিশ্বরূপার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল কিন্তু কন্ট্রাকটের ব্যাপারে কিসব ঝামেলা হওয়ায় তিনি যোগ দেননি। আপাতত আর ইচ্ছে আছে কিনা জানতে চাইলে বললেন—ইচ্ছে তো আছে তবে কমার্শিয়াল থিয়েটারে যোগ দিতে পারবো কিনা ঠিক বলতে পারছি না।

অবশ্য থিয়েটার তিনি এমনিতেও [illegible] নিজের দলে। নিয়মিত নয়, মাঝে [illegible]। এই যেমন কয়ে এলেন নিউ [illegible]কপুরে।

[illegible] জানেন থিয়েটারে কাজ করতে এতো ভালো লাগে যে সেই আনন্দ নিয়ে আমি কদিন কাজ না করেও থাকতে পারি। পাবলিক স্টেজে নাই বা করলাম কাজ।

বেশ চকচকে চোখ আর আনন্দমাখা মুখ নিয়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন তিনি। যেন থিয়েটার নিয়ে আলোচনা করতেও ওঁর আনন্দ হচ্ছে।

থিয়েটার আমি কোনদিনই ছাড়তে পারবো না। সিনেমায় কাজ করি পয়সার জন্য কিন্তু আনন্দ আছে থিয়েটারে—বলে থামলেন খানিক।

মিমি এসে বললো মা জল খাব। অমনি গ্লাসে করে জল এনে নিজের হাতে খাওয়ালেন তাকে। মেয়ে চলে গেল আবার।

আলোচনায় ছেদ পড়ল। চেয়ারে এসে আবার বসতেই বললাম—বেস্পতিবার দোল পূর্ণিমা—পুজোটুজো হয়নি বাড়ীতে। বললেন—এখনও পুজো করতে পারিনি, এবার যাব। সারা দিন তো উপোস করে আছি। পুজো না করে কিছু খেতেও তো পারব না।

আবার নিজেকে অপরাধী লাগল।

ঃ সে কি! আগে বলবেন তো। আপনাকে শুধু শুধু আটকে রেখেছি। যান আপনি পুজো করতে। আমি উঠি এবার। কিন্তু আমার কথা শুনলেন না। বসে রইলেন। নির্মলবাবু না এলে যাবেন না, তাই পুজো দেরীতে হলেও ক্ষতি নেই জানালেন। আরও জানলাম শ্বাশুড়ির কথামত এখনও তিনি ষষ্ঠী ইত্যাদির উপোস নিয়মিত করে যাচ্ছেন। যাবেনও যদ্দিন শরীরে কুলোয়।

এসব কথা শুনতে শুনতে ভাবছিলাম পর্দায় দেখা সংসারী বৌ মাধবী আর ঘরোয়া মাধবীতে তো কোনো পার্থক্য নেই। সে জন্যই বুঝি এই ধরনের চরিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে হয় না, আপনা থেকেই চরিত্রটি হয়ে যান তিনি।

— কথায় কথায় রাত গড়াচ্ছে। উঠবার কথা বলতে তিনি বললেন—দেখুন তো কি চিন্তায় পড়লাম মেয়েটা এলো না, চা-ও খাওয়া হোল না। নির্মল এসে তো আমায় বকবে! গলায় চিন্তার ছাপ বেশ স্পষ্ট।

বললাম—এখুনি এসে যাবে, কোথায় আর যাবে হয়তো কোথাও গল্প করতে বসে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখি মিমি কখন এসে দাঁড়িয়েছে। ওকেও বললাম—চলি, আবার আসব।

শনিবার দিন ফোন করে জানলাম মেয়েটি আর ফেরেনি পালিয়েছে। গম আর কয়েকটা টাকা নিয়ে।

নির্মল ধর

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

যতসব এ মার্কা নায়িকারা সেই যে একবার করে ধড়াস করে পড়েছেন, আর উঠতে পারছেন না। এক এক করে বলি শুনুন—রেহানা সুলতান চেতনা জাগিয়ে বিখ্যাত হলেও প্রেস বক্স ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে গুঁড়িয়ে গেছে। রাধা সালুজা দো রাহা-র মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্থির করতে পারেন নি কি করবেন। তাই তাঁর আজ এ অবস্থা। সভেরা ছবিতে শেষ চেষ্টা করেছিলেন। সফল আর হল কোথায়। জরুরৎ ছবিতে বীণা রায় বড় বেশী জরুরী ছিলেন। এখন দর্শকরা ভুলতে বসেছেন। চরিত্র ছবিতে পারভিন বাবি যে চরিত্রেই অভিনয় করুন না মোদ্দা উদ্দেশ্য ছিল শরীর দেখানো। তাই আজো প্রথম সারির নায়িকার দলে আসতে পারেননি। দিওয়ার-এ অমিতাভ শশীর মাঝখানে পারভিন সত্যি সত্যি দিওয়ার বনে গেছেন। দর্শকরা তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। বলছেন, পারভিন না থাকলেই বা কি ক্ষতি হত। এইভাবে অ্যাডাল্ট ছবির নায়িকাদের ওপর ভগবানের একটা অভিশাপ চলছে। অথচ প্রত্যেকেই সু-অভিনেত্রী অন্তত বম্বের চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে। অনেক নায়িকা করে যাচ্ছেন তাঁদের চেয়ে রেহানা অনেকগুণে ভাল। রেহানার মতো প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী কম আছেন। সেটা আশাকরি কলকাতার দর্শকরাও স্বীকার করে নেবেন।

একটি দমফাটা হাসির ছবি!

আপনার প্রিয় চিত্রতারকদের সবচেয়ে কৌতুককর ভূমিকায় দেখুন।

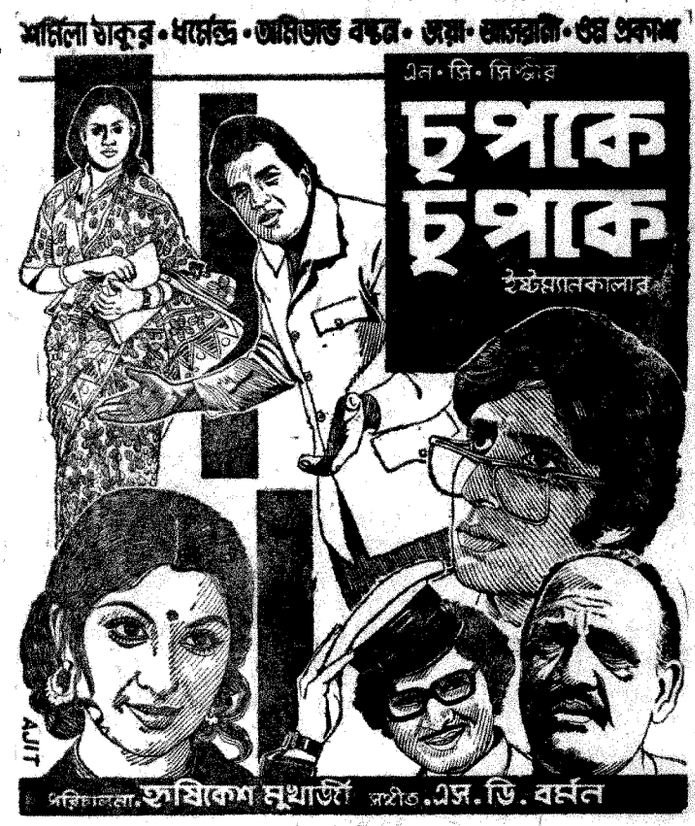

সগৌরবে চলিতেছে!

ক্রাউন — জনতা — গ্রেস — নবীনা — ছায়া — উত্তরা — ভারতী (দুপুরে)
কমল — শান্তি — মিলন — শিবানী — লিপি — স্বপ্না — শ্রীরামপুর
অপসরা — আনন্দম — বাটা — লক্ষ্মী — রজনী — রাধা — মৃণালিনী
মিলনী — চিত্রা — অঞ্জনা ও অন্যত্র। দি ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটারস রিলিজ

নাট্যমঞ্চ

থিয়েটার সেন্টারের নাট্যোৎসব

গত ১৪ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত থিয়েটার সেন্টারের বিংশতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক নাট্যোৎসব হয়ে গেল।

উৎসবের সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' নাটক দিয়ে। এই অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি শ্রী বি এম সিনহা থিয়েটার সেন্টারের অগ্রগতি সম্পর্কে এবং শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এঁদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে দর্শককে ওয়াকিবহাল করান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীধরমবীর সিনহা উৎসবের সাফল্য কামনা করে বক্তৃতা করেন। শ্রীশম্ভু মিত্র বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

পুরনো এবং নতুন মিলে মোট সাতটি নাটক এঁরা দর্শককে উপহার দেন। তার মধ্যে 'অথচ সংযুক্তা' এবং নবতম সংযোজন 'প্রহসন' শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। এর পরেই নাম করা যায় 'পরাজিত নায়ক' এবং 'ষোড়শী' নাটক দুখানি।

সেদিক থেকে এই উৎসবের সবচেয়ে দুর্বল সংযোজন 'সেদিন দুজনে' 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' নাটকে থিয়েটার সেন্টারের খ্যাতি থাকলেও তেমন করে যেন মন ভরায়নি এবার। যেমন দর্শকরা নিরাশ হয়েছেন, 'ক্ষুধিত পাষাণ' দেখে। 'ক্ষুধিত পাষাণের' প্রধান ত্রুটি বোধহয় এর নর্তকীদের অগোছাল নাচ। যা অনেক সময় ছন্দপতন এবং ক্লান্তিকরও মনে হয়েছে। অথচ দেবরাজ রায় এবং সরবি হুন যতটা সম্ভব মর্যাদার সঙ্গেই অভিনয় করেছেন।

'অথচ সংযুক্তা'য় (ধনঞ্জয় বৈরাগী কৃত) তরুণ রায় এবং বিশেষ করে দীপান্বিতা রায়ের অভিনয় দর্শককে প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ করে বসিয়ে রেখেছিল। দেবরাজও ভাল। তরুণ রায় এমন একটি নাটকে নিজের স্ত্রী এবং পুত্রকে যুক্ত করেছেন যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। নাট্য জগতে এটা একটা ব্যতিক্রম হয়েই থাকবে।

'সেদিন দুজনে'তে নায়ক নায়িকাকে মানিয়েছে ভাল। গানের সুরও (সুধীন দাশগুপ্তের দেওয়া) ভাল—তবু নাটকটি দর্শককে তৃপ্ত করতে পারেনি বলেই অনুমান। 'পরাজিত নায়ক'-এ দুটিই চরিত্র। আর সেই দুটি চরিত্রেই তরুণ রায় এবং দীপান্বিতা রায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। দীপান্বিতা রায় বিস্ময়কর অভিনয় করেছেন প্রথম 'অথচ সংযুক্তা'য় এবং দ্বিতীয়ত প্রহসনে। শেষোক্ত নাটকে তাঁর অভিনয়ের অবকাশ কম ছিল। কিন্তু যৌবনোত্তর বয়সেও যে তিনি সমান দক্ষ অভিনেত্রী তার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন নাটকের ছত্রে ছত্রে।

অভিনয়ে আর যিনি দর্শককে প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন তিনি অরুণ মুখোপাধ্যায়। এমন মেজাজী অভিনয় আমরা অনেকদিন দেখিনি।

প্রহসনে মোট পাঁচটি নাটকের দৃশ্যবিশেষ অভিনীত হয়েছিল। সেগুলি হোল যথাক্রমে মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা?', দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' রসরাজ অমৃতলালের 'খাস দখল', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' এবং রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কষ্টি পাথর'।

প্রহসনে পরের দিকে কিছুটা ক্লান্তিকর মনে হলেও অরুণ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি সেই আবহাওয়া কাটিয়ে দিয়েছে এবং দর্শক প্রচুর আনন্দ লাভ করেছে। এর জন্যে নাট্যামোদী দর্শক অবশ্যই থিয়েটার সেন্টারের কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে নাটক নিয়ে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর নাট্যগোষ্ঠী। এটা বলা বাহুল্য সুলক্ষণ। কিন্তু থিয়েটার সেন্টার (কলকাতা) যখন সৃষ্টি হয় তখন বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় দু-একটি ছাড়া নাট্য দল ছিল না বললেই চলে। সেই সময় থেকে একটি সাধু প্রচেষ্টাকে লালন করে আসা কম বিস্ময়ের নয়।

আমরা আশা করবো থিয়েটার সেন্টার আরো দীর্ঘকাল এমনি করে দর্শকসাধারণকে আনন্দ দেবে এবং নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সার্থকতার ছাপ রাখবে।

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়ার একাদশ বার্ষিক উৎসব

গত ২৮ মার্চ কলামন্দিরে ইউথ পাপেট থিয়েটার ইণ্ডিয়া তাদের একাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান পুতুলনাচের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত করলেন।

পৃষ্ঠপোষক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 'মনু ও মস্তান' নামে ছোট একটি নকশা পুতুলনাচের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন।

এরপরে ইউথ পাপেট থিয়েটার ইণ্ডিয়ার পুতুলনাট্যগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দ্বারা পরিবেশিত হতে থাকে। আলিবাবা, ছোট্ট লাল টুকটুকি, সিলাটে ও বিদায় অফ নেচার (সুতোর সাহায্যে) পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শককে প্রাণ-চঞ্চল করে তোলে। সুষ্ঠু পরিবেশনা, সঙ্গীত, দৃশ্য সজ্জা, আলোক সম্পাত মায়াজাল বিস্তার

হাসতে হাসতে নাভিশ্বাস

গুরুর গুরু টপ গুরু ফুলু ঠকুরমার জয়জয়কার!

পূর্ণ-প্রাচী জয়া - পদ্মশ্রী - ইলোরা - জয়শ্রী - শ্যামাশ্রী
মায়া - উদয়ন - রমা - মীনা - কল্যাণী

করে ও দু ঘন্টাব্যাপী এই পুতুলনাচ সকলকে অভিভূত রাখে।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ রমা চৌধুরী পুতুলনাচের ঐতিহ্যবাহী রূপের বিশ্লেষণ করে এর প্রচার ও প্রসারের জন্য সরকার ও হিতৈষী জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং ইউথ পাপেট থিয়েটারের এই মঞ্চশিল্পানুষ্ঠানে অবদান ও অগ্রগতির উল্লেখ করেন। ডাঃ প্রতাপ চন্দর বিদেশে পুতুলনাচের ব্যাপক ব্যবহারে ছোটদের শিক্ষা ও আনন্দ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

—নাট্যসমালোচক

হারমোনিয়াম : সুদীপ্ত মজুমদার - শিবাজী বসু - শ্যামল রায়চৌধুরী ও সন্তোষ দত্ত। পরিচালনা : তপন সিংহ। ফটো : অমৃত

বিদেশী ছবি

কোলকাতায় জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের চলচ্চিত্র উৎসব

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রক ফিল্মস ডিভিশন এবং জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের যুগ্ম উদ্যোগে লাইট হাউস সিনেমায় পূঃ জার্মানীর কিছু নির্বাচিত ছবি নিয়ে সম্প্রতি এক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে মোট ছটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এবং ছটি শর্ট ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। ছবিগুলির নাম যথাক্রমে (পূর্ণ দৈর্ঘ্যের) মাইডিয়ার রবিনসন হাউ টু নরিশ এ ডাঙ্কি ডু ইউ নো মিঃ মার্বান, হোয়াইট উলভস দি ম্যান হু রিফেলসড গ্র্যান্ডমাদার ও রাইপ চেরিজ। শর্ট ফিল্মগুলির নাম যথাক্রমে ফ্লাগস্পোর্ট উইন্টারস্পোর্ট, উইন্টার এম মীর, ড্রেসডনার ক্লজার ওয়ার্ট বার্গ ইত্যাদি এবং বিদ্যার্থী রঞ্জন প্রযোজিত বাঙলা বিদ্যাসাগর।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতাস্থ পূঃ জার্মান কনসাল জেনারেল ডঃ জে হেইডরিচ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, সাদর সম্ভাষণ জানান শ্রীমতী মলিনা দেবী এবং ফিল্মস ডিভিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান শ্রীজে আর হালদার।

আগামী সংখ্যায় উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলির বিস্তারিত আলোচনা দেওয়া হবে।

দুস্থ শিশুদের সাহায্যার্থে চলচ্চিত্র উৎসব : আর জি কর মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে দুস্থ শিশু ও দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থে এলিট সিনেমা গৃহে (প্রত্যহ সকালে) ৯ই থেকে ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। সত্যজিৎ রায়ের দেবী ছবিটি দিয়ে উৎসবের শুরু। শেষ তাঁরই সমাপ্তি ছবি দিয়ে। অন্যান্য দিনের ছবিগুলি হল ক্রেনস আর ফ্লাইং (রাশিয়া), ক্যাপারিসিয়াস সামার (চেক) বোয়িং বোয়িং (আমেরিকা), দি বেকেট (ব্রিটেন), ফারসট ডে অফ ফ্রিডম (পোল্যান্ড) ও একটি জার্মান ছবি।

ইতিপূর্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে এই রকম চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যথাক্রমে শ্রীঅঞ্জন মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় ওয়াদ্দাদার ও ডাঃ সুবীর চট্টোপাধ্যায় এবং মিঃ ঘোষ।

পঃ জার্মান ছবির প্রদর্শনী : ম্যাকসমুলার ভবন এবং কোলকাতার ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়ার যুগ্ম উদ্যোগে ১১ই এপ্রিল থেকে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীর নিম্নলিখিত ছবিগুলি কোলকাতায় দেখাবার ব্যবস্থা হয়। ছবিগুলির নাম ফলস ওয়েট পেডেস্ট্রেন গড প্রোটেকটস দি লাভার্স এবং লাউউইগ টু।

বিবিধ সংবাদ

শিক্ষামূলক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৭৫ : ভারতীয় শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ আয়োজিত শিক্ষামূলক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৭৪ ও তৃতীয় বিশ্ব শিশু চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হল গত শনিবার ২৯ মার্চ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। উদ্বোধন করল একটি আন্তর্জাতিক শিশু সভাপতি মন্ডলী। যার মধ্যে ছিল ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের বাংলাদেশের জামিন আখতার, পশ্চিম জার্মানীর এলার্ড কোমরোড়, ফ্রান্সের স্টিফেন পল, ভারতের গৌরব চোপরা, পোল্যান্ডের আন্না সুখওভস্কি সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্যাসেল বিফ উলান। সভাপতি মন্ডলীর সভানেত্রী ছিল চন্দ্রালী সেনগুপ্তা।

৯৪ দিনব্যাপী এই সর্বভারতীয় উৎসবে ১০৭টি দেশের প্রায় ১৭০০ ছবি দেখান হবে ৩৬২টি গ্রাম ও শহরের সাড়ে ৩৭ লক্ষ শিশুকে। বিভিন্ন হাসপাতালেও শিশুদের ছবি দেখান হবে। ১৫ এপ্রিল থেকে ৭ মে কলকাতায় তারপর ৮ মে থেকে ১২ জুন বিভিন্ন রাজ্যে ছবিগুলি দেখান হবে। ১৩ থেকে ২২ জুন কলকাতায় তৃতীয় বিশ্ব চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় ছবিগুলি ৫০০ শিশুর এক বিচারক মন্ডলী চূড়ান্ত নির্বাচন করবে। ২৩ থেকে ২৯ জুন বিজয়ী ছবিগুলি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে প্রদর্শিত হবে এবং ৩০ জুন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেওয়া হবে।

তাপস সেনের সম্মান

আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রজগতে যিনি আজ যাদুকরের সঙ্গে তুলনীয়, সেই তাপস সেনকে সংগীত নাটক আকাডেমী ১৯৭৪ সালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পুরস্কার দিলেন।

রঙ্গমঞ্চে আলোকসম্পাতে গত তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে তাপস সেন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তাতে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা একাধারে যেমন রঙ্গমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি তা নাটকের বক্তব্য ও দৃশ্যকে দর্শকদের মনে আলোড়ন সৃষ্টিতেও প্রভূত সাহায্য করেছে। সেদিক থেকে বলা যায় শ্রীসেন রঙ্গমঞ্চজগতে একটি যুগের স্রষ্টা।

স্মৃতিলীন-শিল্পী পরেশ ভট্টাচার্য

বাগ্‌ইআটিতে ছোট্ট আঙ্গিনার মধ্যে ছবির মত একটি কুটির। চারিদিকে ঘন ঝোপঝাড়ের ছায়া। এ বাড়ীতে আমাকে আর আমার ভাইকে নিয়ে গেলেন শ্রীমতী বেলা সেনগুপ্ত (সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ এস এন সেনগুপ্তর মেয়ে)। পৌঁছিলাম যখন ঘড়ির কাঁটা বেলা বারটার ডানদিকে হেলেছে। যাবার কথা ছিলো দশটায়। কথা রাখতে পারিনি। শুনলাম উনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর স্নান সেরে মহাভারত পড়তে বসেছেন। ওঁর মেয়ে সলজ্জভাবে জানালেন—'একটু বসুন। বাবা এখনই আসবেন। স্নান করে মহাভারত না পড়ে উনি কোনোদিকে মন দিতে পারেন না।'

লজ্জা পাবার কথা আমাদের। এই নিয়মনিষ্ঠ সংযমী মানুষটার সকালের স্নানাহারের নিয়মকানুন তচনচ করে দিয়ে অসুবিধা ঘটানোর জন্য। কিন্তু এ যুগে সবই উল্টো। নিজে অপরাধী হয়েও অপরকে পাল্টা অপরাধী বানানো যায়।

একসময় সদ্যস্নাত সৌম্য মানুষটি সামনে এসে বসলেন। আসবাবের আড়ম্বর নেই। কিন্তু পরিচ্ছন্ন, পারিপাট্যে বাড়ীর সকলের মার্জিত রুচির পরিচয় মেলে।

ওঁকে দেখছিলাম অবাক হয়ে। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এক গৌরব-উদ্ভাস যুগের ইনি দর্শক, শিল্পী অংশীদার। স্বর্গত আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, গোলাম আলি ওঙ্কারনাথ থেকে এমন কোনো দিকপাল শিল্পী নেই যাঁর সঙ্গে ইনি সঙ্গত করেননি। মন্মথনাথ ঘোষ, ধাইবাবু, হীরুবাবু মণ্টুবাবু এখনও যেন স্বপ্ন রাজ্যে চলে যান এইসব শিল্পীদের সঙ্গে বাংলার পরেশ ভট্টাচার্যের তবলা ও পাখোয়াজ সঙ্গতের অনেক স্মরণীয় অনুষ্ঠানের স্মৃতিচারণ করতে বসে। যৌবনের উচ্ছল লগ্নে ভীষ্মদেববাবু ও পরেশবাবুর গান ও তবলা সঙ্গতের কাহিনী কিংবদন্তী হয়ে আছে সঙ্গীতজগতের বিশিষ্ট গুণীদের স্মৃতিতে। সে সব উজ্জ্বল দিনগুলির কাহিনী বলতে বলতে এঁদের চোখ আজও অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সনিশ্বাসে বলেন, 'হায়! এমন একটা হাত রায়টের সময় জখম হয়ে গেলো। এতে ওঁর ব্যক্তিগত ক্ষতির কোনো পরিমাপ ত নেই-ই। ক্ষতিগ্রস্ত হোলো বাংলার সঙ্গীত-ধারার এক তুলনাবিহীন শৈলী।' কেউ বলেন, 'আজ সকলের দৃষ্টির অন্তরালে অমন সাধারণভাবে ওঁর থাকার কথা নয়। জাঁকজমক বিলাসে শহরের মাঝখানে ছাত্রগোষ্ঠী নিয়ে জাঁকিয়ে বসার কথা।'

ওঁকে দেখছিলাম আর সেইসব কথা ভাবছিলাম। নিরভিমান, নিরহঙ্কার মানুষটি। অতীত যেন স্তব্ধ হয়ে আছে তাঁর মধ্যে। মনের দ্বারে ধাক্কা দিলে সাড়া মেলে, কিন্তু নিজেকে জানান দেবার কোনো গরজ তাঁর নেই। প্রশ্ন করলে বিনা আড়ম্বরে বলে চলেন শিল্পীজীবনের আশ্চর্য যোগাযোগের কাহিনী। বলার মধ্যে কোনো আত্মসচেতনতা নেই অহমিকার আস্ফালন নেই। আবার অন্যের প্রশংসা আদায়ী অতি বিনয়ের কৃত্রিমতাও নেই। নিজের সম্বন্ধে এমন অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি, এমন নিস্পৃহতা খুব কম শিল্পীর মধ্যেই দেখেছি।

আমাদের আগ্রহাতিশয্যেই যেন পথ-প্রদর্শকের মত প্রায়-বিস্মৃত একটি যুগে আমাদের পৌঁছে দিলেন। এক একটি করে যেন সযত্নরুদ্ধ মহলের দুয়ার খুলে গেলো।

পরেশবাবুর প্রথম শিক্ষা মন্মথ গাঙ্গুলীর কাছে (সুবিখ্যাত তবলিয়া হীরুবাবুর বাবা)। এঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামেরই এক গায়ক অন্ধ সাতকড়িরূপে ছিলো যাঁর খ্যাতি। সঙ্গীতের প্রথম প্রেরণার উৎস তিনিই। সাতকড়িবাবুর সঙ্গে একদিন মন্মথবাবুর বাড়ী গেলেন। তখনকার দিনের বনেদী গুণী। প্রতিভার মূল্য দিতে জানতেন। তবলার একটি টোকা শুনেই কিশোরের প্রতিভাকে চিনেছিলেন। সাগ্রহে এবং সাদরে তিনি পরেশবাবুকে শিষ্য করে নিলেন।

বরিশালের গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় এলেন সাতকড়িবাবুর সঙ্গেই। প্রত্যক্ষ করলেন শুধু সঙ্গীতমহলকেই নয় কোলকাতার প্রথম যুগকেও। সবে তখন ট্রাম চালু হয়েছে। ঘোড়ায়-টানা ট্রাম। মন্মথবাবু তাঁর প্রতিভা ও অধ্যবসায়ে মুগ্ধ হয়ে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে তাঁকে গড়ে তুলেছেন। মাত্র ছ মাস তাঁর কাছে শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তরুণ পরেশ ভট্টাচার্য। কিন্তু ছমাসেই যেন ছয় যুগের বিদ্যা আহরণ করেছেন। যখন যে বোল গুরু দেখান সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেন শিষ্য। আর তার সঙ্গে নিজের কল্পনার রং মিশিয়ে এমন মধুর করে বাজাতেন যে পথ-চলা পথিকও তার দুর্নিবার আকর্ষণে থমকে দাঁড়াতো। তবলার আওয়াজ এমন করে মনকে টানে? কে এ শিল্পী? সবার মনেই জাগত এই প্রশ্ন।

ছমাস বাদে শ্রদ্ধেয় মন্মথবাবুর দেহাবসান ঘটলো। কিন্তু শিক্ষা ও রেওয়াজে ছেদ পড়লো না। অসমাপ্ত শিক্ষাকে সমাপ্ত করবার দায়িত্ব স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র সারা ভারতের শ্রদ্ধেয় তবলিয়া শ্রীহীরেন্দ্র গাঙ্গুলী। গুরুর স্নেহে, সখার সমবেদনায় ও প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে হীরুবাবু তাঁর পিতার প্রিয় শিষ্যকে ঘিরে রাখলেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে অনাথবাবু, অনন্ত ঘোষ ও আজিম খাঁর সংস্পর্শজাত প্রভাব তরুণ শিক্ষার্থীর ধ্যানধারণাকে উজ্জ্বল করে তুলল।

তখনকার রাজা-জমিদাররা বড় [illegible] ছিলেন। সকলরকম বিলাসের মধ্যে থাকলেও সঙ্গীতশিল্পের প্রতি তাঁদের যথার্থ অনুরাগ ছিলো। এঁদেরই আনুকূল্যে সঙ্গীত প্রথম যুগে আশ্রয় পেয়েছে। নানান গুণীদের সবরকমে সাহায্য করে এঁরা তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। এইসব আসর কত লোকের আনন্দের উৎস ছিলো'। আত্মগত ভাবে কথাগুলি বলেই প্রবীণ শিল্পী নীরব হয়ে গেলেন। বর্তমানের বেড়া টপকে মনটা যেন অতীতচারী হয়ে ওঠে।

ভূপেন ঘোষের বাড়ীতেই বহু গুণীর সংস্রবে আসা এবং তাঁদের সঙ্গে বাজাবার দুর্লভ সৌভাগ্য পরেশবাবুর শিল্পীজীবনের মহাসম্পদ। এইখানেই জ্ঞান গোস্বামী হুসেন শীল, গিরিজাবাবু আরো কত গুণীর সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খলিফা আবিদ হোসেন খাঁ, মজিদ খাঁর বাজনা শুনেছেন মুগ্ধ হয়ে। অজান্তেই হাতের বোলে লেগেছে এঁদের কায়দা, মজাদার লয়ের নকসার রং ঢং প্রাণকাড়া রেলার গতিবৈভব।

নানা জলসায় বাজাতে বাজাতে এঁদের সঙ্গে একাসনে বসতে হোতো। গুণীসুলভ বিনয়ে জড়সড় হয়ে যত সসংকোচে পরেশবাবু একপাশে সরে থাকতে চাইতেন ঠিক ততখানি সমাদর ও কলোচ্ছ্বাসে বড়রা ডাকতেন পরেশবাবু এড়িয়ে গেলে চলবে না। মাঝখানে আসুন। আপনার বাজনাও

একটু হোক।' বাজনারই মত মিষ্টি স্বভাবের জন্য তিনি সঙ্গীতমহলে সকলেরই পরম আদরের পাত্র ছিলেন। বড় বড় ওস্তাদরা একটু অসন্তুষ্ট হতেন না কি? কে এ ছোকরা? আমরা থাকতে একে বাজাতে বলা? বে-আদবী ত কম নয়। কিন্তু যাঁদের অনুগ্রহের ওপর শিল্পী-জীবনের নির্ভরস্থল তাঁদের ইচ্ছেকে ত অগ্রাহ্য করা যায় না।

তরুণ পরেশ কাঁচুমাচু হয়ে তবলা বাঁধেন। কিন্তু ঐ অসহায় আর্তভাব বাজাবার আগে পর্যন্তই। তবলা বা পাখোয়াজে হাত দিলেই অন্য মূর্তি। আত্মবিশ্বাসে স্ববৈশিষ্ট্যে এবং রংগভরা বাদনশৈলীতে সুপ্রতিষ্ঠিত এক অনন্য শিল্পী। পাণ্ডিত্যকে দাবিয়ে রেখে, জাহিরীপনাকে ঘুম পাড়িয়ে গাইয়ে বা বাজিয়ের সুযোগ্য সঙ্গতকারই শুধু নন—একাধারে ফ্রেন্ড, ফিলসফার এ্যান্ড গাইড। সঙ্গতকারের সঙ্গত প্রতিযোগিতা নয়। সহযোগিতা। শিল্পীর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে একথা বুঝেছিলেন বলেই ছোটোবড় কোনো শিল্পীর সঙ্গে এক মুহূর্ত বাজিয়েই অন্তর্যামীর মত বুঝে নিতেন কোনদিকে তাঁর সহজ প্রবণতা। সেই পথেরই দিশারী হয়ে তুফান ঢেউ পার করতেন তবলায় সেই ছাঁদের হাজারো উঠান, ফিরৎ টুকরোর অজস্র ফুল ফুটিয়ে শিল্পীকে সৃষ্টিকর্মে উদ্দীপ্ত করতেন। আদায় করে নিতেন তাঁর শ্রেষ্ঠ বস্তু। শিল্পী ও শ্রোতার মন রাঙাবার এই যাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলেই পরেশ ভট্টাচার্যর সঙ্গে যিনি বাজাতেন একবার, তিনিই ফিরে ফিরে তাঁকে খুঁজতেন।

সঙ্গতকার হিসেবে তিনি ছোটবড় সকলকেই সমান গুরুত্ব দিতেন। কারণ একমুহূর্তের জন্য তিনি ভোলেননি যে সকলের সমসহযোগী হওয়া তাঁর কর্তব্য। হয়ত এইজন্যই নিজে থেকে সমসাময়িক কোনো বড় শিল্পীর তারিফে মুখর হয়ে ওঠেন না। প্রশ্ন করলে তবেই বলেন তাঁর কথা বিধিদত্ত তাঁর নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গিতে। কোনো ব্যক্তিগত উত্তাপের ছোঁয়া না লাগিয়ে। শিল্পীদের মন যতটা স্পর্শকাতর হয় মানুষ পরেশ ভট্টাচার্য তার চেয়েও স্পর্শকাতর ছিলেন বলেই হয়ত অজ্ঞাতেই তাঁর মনের মধ্যে একটি বেড়া তুলে দিয়েছিলেন কারো সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গতার মাখামাখি থেকে নিজেকে দূরে রাখবার জন্য। সহজবোধ দিয়েই হয়ত বুঝেছিলেন যে মানুষ যতটা আত্মকেন্দ্রিক তার সহস্রগুণ আত্মকেন্দ্রিক শিল্পী মানুষ। আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতায় লাগবে প্রতিদিনের ম্লানস্পর্শ। শ্রদ্ধেয় ধারণা যাবে চুরমার হয়ে। তাই শিল্পীর শিল্পকৃতির মুহূর্তে সঙ্গতিয়া হিসেবে যতখানি কাছে থাকতেন ঠিক ততখানি দূরে সরে আসতেন গানের আসর শেষ হলে।

এটা উনি বলেননি। কিন্তু আমার অনুমান। কারণ কোনো শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কজাত কোনো স্মরণীয় ঘটনা জানবার আগ্রহ যতবার প্রকাশ করেছি ততবারই শুনেছি 'তেমন কিছু মনে নেই।' এটা যে এড়িয়ে যাওয়া নয় সে কথা তাঁর মুখের সরল অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে। জীবনে ভালবেসেছিলেন সঙ্গীতকে তাই তারই বাহক শিল্পীকে ততখানিই চেয়েছেন সঙ্গীতের সঙ্গী হবার জন্য যতখানি দরকার। কিন্তু মহাকাব্যের শেষ কলির মতই ঘুরেফিরে বারবার তাঁর কথায় এসে পড়ছিলো শ্রদ্ধেয় দীলিপ রায়ের প্রসঙ্গ। শিল্পীজীবনের প্রতিষ্ঠায় ও স্বীকৃতি-প্রাপ্তিতে দীলিপ রায়ের সদাজাগ্রত সখ্য স্নেহভরা আনুকূল্য তিনি জীবনের প্রান্তসীমায় এসেও ভুলতে পারেননি। এই বাঙালী শিল্পীকে যখন অবাঙালী ওস্তাদরা তাচ্ছিল্য দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতেন দুঃসাহসী, বেপরোয়া দিলীপবাবু জোর করে তাঁকে আসরে ঠেলে দিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন নিরীহ দর্শন বাঙালীর শিল্পবোধের গভীরতার পরিমাপ তেমন নিরীহ নয়।

ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সঙ্গে প্রথম বাজালেন কবে? প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'শ্যামপুকুরে তখন থাকতাম। একবার খুব জ্বর হয়েছিলো। লেপঢাকা দিয়ে শুয়ে আছি। মাঝরাতে হঠাৎ ভীষ্মদেব এসে বলেন যে রাতেই যেতে হবে একটা জলসায়। না গান শুনতে নয়। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানের সঙ্গে তবলা বাজাতে। খুব জ্বর। উঠতে পারছি না। ভীষ্ম বললেন 'পরেশদা যে করে হোক যেতেই হবে।' কি আর করি? ভীষ্মর যখন ইচ্ছে। গায়ে কম্বল জড়িয়ে গেলাম জলসায়। বড্ড ভয় করছিলো। এতবড় ওস্তাদ ভারতবর্ষ-জোড়া যাঁর নাম। তাঁর সঙ্গে আমি কি বাজাব? যেতে যেতে মনে পড়ছিলো তখনকার বিখ্যাত বেহালাবাদক হাবুবাবুর কথা, 'ফৈয়াজ খাঁ সাহেব এক একটা কাজ করেন আর আমি বাজিয়ে চলি। তিনি বলেন 'হুঁ'। আবার কাজ করেন। আবার বাজান। ওস্তাদ বলেন 'হুঁ'। —এইসব ভাবতে ভাবতে খুব হতাশ হয়ে পড়ছিলাম।

ত্রিপুরার আবিদ হোসেন খাঁ নাকি তাঁর কাছে অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। ঠেকা দিতে পারেননি। অবাক হয়ে বলি 'বল কি?'

তবু বাজাতে বসলাম। ভাগ্যকুলের জমিদার বনোয়ারী লাহার বাড়ী। ঘর ভর্তি ওস্তাদ। শিল্পী হরিপদ চ্যাটার্জি বললেন, 'খাঁ সাহেব, একটি বাঙালী ছেলে আপনার সঙ্গে বাজাবে।'

গোঁফ মুচড়ে বললেন 'বহুৎ আচ্ছা।' প্রথম বাজাতে বসতেই ঠকানো শুরু হোলো। আমার জ্বর ছেড়ে গেলো। রক্ত গরম হয়ে উঠলো। ধরলেন খামার। বাজালাম। চারিদিকে উঠলো আচ্ছা, আচ্ছা।' রব। উনি অনঘাত সোম দিলেন। আমিও দিলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এরপর 'বহুৎ আচ্ছা' বলেই ঠুংরী ধরলেন। 'আর একঠো তবলা লাও' বাজালেন পরেশবাবু ও আবদুল। চারিদিকে ধন্যধন্য রব।

গানের শেষে সম্রাটতুল্য শিল্পী যখন তরুণ শিল্পীকে জড়িয়ে ধরে অকুণ্ঠ সাধুবাদে মুখর হলেন আসরের উপস্থিত সকলের চোখ জলে ভরে উঠলো। কারণ মধুর স্বভাব পরেশ ভট্টাচার্য ছিলেন সকলের প্রিয়। তখনকার মস্তবড় খেলোয়াড় সূর্য চক্রবর্তী বললেন, ' তুমি বাঙালীর মুখ রেখেছ।'

ন্যাটাবাবু যখনই আসতেন ডাকতেন। মনীষীদলে প্রতি বছর ৫ দিনের উৎসবে তিনি বাঁধা আর্টিস্ট। এই ন্যাটাবাবুই তবলায় বাঁয়ার কাজ করতেন।

আবদুল করিম, নুরজাহান—কার সঙ্গে ইনি বাজাননি?

জ্ঞান গোস্বামীর সঙ্গে প্রথম বাজান হাটখোলায় বিষ্ণুবাবুর বাড়ী। এক রবিবারের বৈঠকে। শুনে বললেন, 'বাঃ। হাতটি ত ভারী মিষ্টি। বাড়ী যেও।' এ শুধু তাঁর মুখেরই কথা নয়। কয়েকদিন বাদে ওঁর কাছ থেকে পরেশবাবুর কাছে লোকও এসেছিলো বাড়ীতে যাবার তাগিদ নিয়ে। প্রায় যেতেন। বসতেন। শিল্পী-চিত্তের আদান-প্রদান ঘটত গান ও বাজনারই মাধ্যমে।

রিডাকশন সেল
শাড়ী • ধুতি • পোষাক • বেডসিট • তোয়ালে • কাটপিস
৭৩, জি.টি. রোড (সাউথ) হাওড়া • ফোন: ৬৭-৫৩২৫
মজুমদার

তারপর ফুলের গন্ধর মতই চারিদিকে নাম ছড়িয়ে পড়বার সংগে সংগে রেকর্ড রেডিও থেকে শুরু করে সকল সংগীত প্রতিষ্ঠান থেকেই ডাক আসে। আস্তে আস্তে। গেলেন হিন্দুস্থান কোম্পানীতে। সেখানে শচীন দেববর্মণ সায়গল, পঙ্কজ মল্লিকের সংগে বাজিয়ে সংগীতের স্বাদ-বৈচিত্র্য পেলেন। সজনীকান্তর সুবিখ্যাত রেকর্ড 'তব চরণতলে'র সংগে তবলা বাজিয়েছেন পরেশবাবুই। তারপর গ্রামোফোন কোম্পানীতে। এখানে ছিলেন তখনকার দিনের নামকরা তবলিয়া রাসবিহারী শীল।

মেগাফোন কোম্পানীতে দেখা হোলো আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সংগে। তাঁর সংগে প্রথম বাজানোর অভিজ্ঞতা খুব সুখপ্রদ নয়। 'এমন একটি গৎ ধরলেন যে বুঝতে পারলাম না কোন তাল। দেখিয়ে দিলেন। বাজালাম। খুশীও হলেন। আমার নাম শুনে হয়ত ভেবেছিলেন আমি অল্প জেনেই নিজেকে বিজ্ঞ মনে করি। উনি অনেক সাধনায় আয়ত্ত করেছেন সংগীত-বিদ্যা। তাই কেউ ফাঁকিবাজী করে কিস্তি মাত করতে চাইছে এমন ধারণা হলে তাঁকে সর্ষের ফুল দেখিয়ে দিতেন। হয়ত আমার সম্বন্ধেও ও'র এই ধারণাই ছিলো। তাই জব্দ করবার অভিপ্রায়েই বাজাবার সুযোগ প্রায় দেননি। শুধু ঠেক দিতে বললেন। দিলীপবাবু প্রতিবাদ জানালেন 'খাঁ সাহেব পরেশবাবুর বাজনাটাও আমরা শুনতে চেয়েছিলাম।' অমনই শিশুর মত মানুষটি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন 'বাজাও বাবা বাজাও।'

ভূপেনবাবুর প্রথম conference -এ আমি, দানীবাবু, রামাপ্রসাদবাবুদের সংগে একাসরে বাজাবার সুযোগ পেয়েছি।

যাক আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সংগে একবার শ্রীরামপুর কনফারেন্সে বাজিয়েছিলাম। উনি বললেন 'আজ প্রাণখুলে বাজাবে' সত্যিই বাজিয়েছিলাম। বাজাবার সুবিস্তৃত অবকাশ উনি দিয়েছিলেন। এমন ছন্দ, লয়কিরী তালের বৈচিত্র্য বিরল। তাল তাঁর হাতে যেন রস হয়ে উঠত। প্রথম দিনের আসরে তরুণ রবিশঙ্করকে বললেন, 'বাজাও এর সংগে' উনি সসংকোচে বললেন 'আজ নয়'। পরে শুনেছি আলি আকবর, রবিশঙ্করকে। লয়, সুর তাল, সংগীত সবই যেন এঁদের হাতের মুঠোয়।'

আত্মগতভাবেই বললেন—'সেদিন ন্যাশনাল প্রোগ্রামে হঠাৎ শুনলাম একটি মেয়ের বেহালা। নাম বললে 'শিশিরকণা'। যেমন দুর্দান্ত হাতের টিপ, তেমনই কাজ তেমনই তালের দখল। এমন বেহালা আজ পর্যন্ত শুনিনি। আর একটি মেয়ের গান এমনই হঠাৎ একদিন শুনেছিলাম রেডিও খুলে। সুনন্দা পট্টনায়ক। যেমন তেজী গলা। তেমনই দুরূহ কাজ। কি অনায়াসেই করে গেলো। সারাজীবনে এমন তরুণী কোনো নারীকণ্ঠে শুনিনি। পিপড়ের চাম মুহূর্তেও এতটুকু সুর পড়েনি।' তারপর অন্যমনস্কভাবেই বললেন 'এমন কত প্রতিভা হয়ত আছে যাদের কেউ জানেও না।'

তবলার প্রসংগে রায়বাবুর কথাও বললেন। কিন্তু শিল্পী ও মানুষের অপরূপ সমন্বয় দিলীপ রায় পরেশবাবুর জীবনে এসেছেন দেবদূত হয়ে। প্রথম আলাপ হেদোর কাছে সারদেশ্বরী আশ্রমে। তারপর থেকে যেন আত্মিক সম্বন্ধেই এঁর কাছে তিনি বাঁধা।

পরেশবাবুর বাজনার স্টাইল? হীরুবাবুর মতে 'পরেশবাবুর বাজনাকে ও'র নিজস্ব ভাবমাধুর্যের ঘরানা বলতে পারি। কোনো বিশেষ ঘরে ওর বাজনা বাঁধা পড়ে নি। কাণীর কাজে দিল্লীর দিকে ছাপ হয়ত একটু আছে। কিন্তু সেটা চেষ্টাকৃত নয় স্বতঃস্ফূর্ত। শুনে ভালো লেগেছে। অজ্ঞাতেই মন আহরণ করে নিয়েছে।

শিল্পী হেসে বললেন, 'কোলকাতায় এসেছিলাম চাকরী করতে। হয়ে গেলো অন্যরকম। তখনকার গান-বাজনার পরিবেশেই হারিয়ে গেলাম। বাজিয়ে পেতাম তাই যথেষ্ট মনে হোতো। গান-বাজনাকে ভালবেসেছিলাম বলেই হয়ত জীবনের রুক্ষ বাস্তব দিকটির কথা ভাবতে পারিনি—সাধারণ মানুষ। সাধারণ ভাবেই জীবন কাটিয়েছি। সংগীতের আনন্দই অর্থ চিন্তাকে ভুলিয়ে রেখেছিলো।'

'সংগীতের দুটি যুগকে আপনি দেখেছেন। দর্শক হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতার খবরটি জানতে ইচ্ছে করে।'

এইটিই ছিলো আমার শেষ প্রশ্ন।

'প্রথম যুগ ভূপেনবাবু এবং তারপর লালাবাবুর যুগ। উচ্চাংগ সংগীতকে এঁরাই জন সমাজে এনেছেন। তখনকার শিল্পীরা কোনো কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান না করে সংগীতের অতলে ডুবে যেতে জানতেন। এখন শিখতে না শিখতেই সবাই পেশাদারী হয়ে পড়েন। বাইরের জাঁকটাই এঁদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। তখন ভাল গান শুনে ভাবের গভীরতায় চোখে জল আসত। এখন সবাই বলেন 'বাঃ বেশ তৈরী'—এ তৈরী মজবুদ কেদারার মত বাইরের ঘরে আগন্তুকদের আশ্রয় দেয়। পূজোর ঘরে ধূপের মত আপনাকে ক্ষয় করে গন্ধ বিলোতে পারে না'।

শিল্পী আবার নিস্তব্ধ। তাঁর কন্যা আনেন একরাশ মিষ্টি বিস্কুট চা।

'এত খাওয়া যায়?'—এতক্ষণ যিনি কোনো প্রশ্ন করেন নি কোন কাগজ থেকে গেছি করে এ লেখা বেরোবে। কিচ্ছু না। তিনি মুখ খুললেন 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাড়ী ফিরতে দেরী হবে। এটুকু খেয়ে নিন।'—উঁচু মহলের শিল্পীদের মূল্যবান আসবাব সজ্জিত ড্রয়িংরুমে এমন আতিথেয়তার স্বাদ মেলে না। কুটীর-বাসীর পক্ষেই আজকালকার দিনেও অন্তরের এই প্রাচুর্যের দর্শন পাওয়া সম্ভব।

উনি রোজ মহাভারত পড়েন। এমন বিনম্রতা, শান্ত আনন্দ কি সেখান থেকেই পাওয়া? ও'কে দেখে আমার কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কথা মনে পড়ছিলো। যেন ঐ রকমই সকল উৎসবামোদের বিপরীতে জগতের সকল অনিত্যতার মধ্যেও এক মধুর ঔদাস্যের সাক্ষী হয়ে বসে আছেন।

এখনকার চঞ্চল, গতিচটুল যুগে তিনি যেন উদাত্ত সামস্বরূপ। শান্তিরসসম্পদ আশ্রম।

সন্ধ্যা সেন

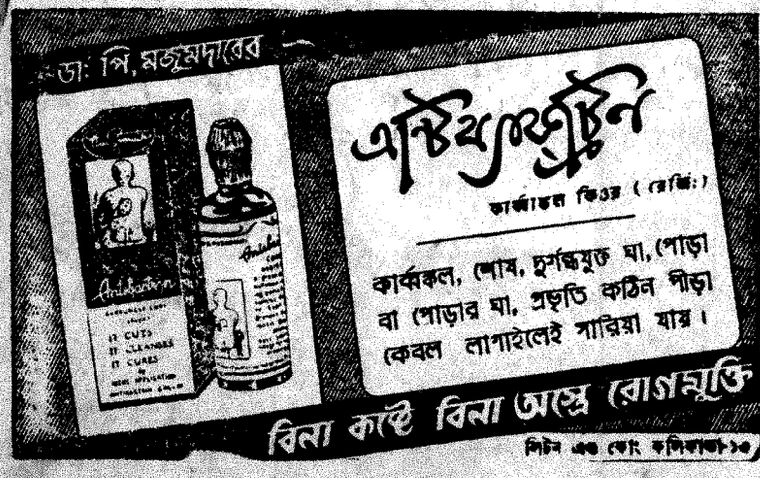

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৯/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশিত হয়েছে! প্রকাশিত হয়েছে!

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড —— কুড়ি টাকা

তারাশঙ্কর রচনাবলী

দশম খণ্ড —— কুড়ি টাকা

গ্রাহকগণ সত্বর তাঁদের প্রাপ্য খণ্ড সংগ্রহ করুন!

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
ভাগবতী তনু রবীন্দ্রনাথ ১২॥০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
অশান্ত ঘূর্ণি ১০৲

নিমাই ভট্টাচার্যের
নাচনী ৭৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
শত রূপে দেখা ২০৲

সুখলতা রাওর
গল্প আর গল্প ১০৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
শেরপাদের দেশে ১৪৲

আশাপূর্ণা দেবীর
প্রথম প্রতিশ্রুতি ২৫ বকুল কথা ২০৲

জরাসন্ধের
নিশানা ৮৲ বেনিফিট অব ডাউট ১০৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
না (নতুন মুঃ) ৫৲ কবি (নতুন মুঃ) ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রর
ছেলেদের আরব্য উপন্যাস ৬৲

প্রকাশিত হলো

বিমল মিত্রের
নবতম অবদান
তিন নম্বর সাক্ষী ১০৲

সমরেশ বসুর
অত্যাশ্চর্য উপন্যাস
অবরোধ ১০৲

জরাসন্ধের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি
নিঃসঙ্গ পথিক
দু খণ্ডে সমাপ্ত
দাম ৩০·৫০ পঃ

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২০৲ দ্বিতীয় খণ্ড ২০৲

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ ৩৪-৩৪৯২
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ৩৪-৮৭৯১

ইউবিআই-এর
রেকারিং ডিপজিট স্কীমে

প্রয়োজনের সঙ্গে
তাল রেখে সঞ্চয়ও বেড়ে ওঠে

কখনো না কখনো নিশ্চয়ই আপনার একসঙ্গে গোক টাকার দরকার পড়ে। আমাদের রেকারিং ডিপজিট স্কীমে আপনার পরিকল্পনামত সঞ্চয়ের সুবিধে আছে। পাঁচ থেকে পাঁচশ টাকার মধ্যে সাধ্যমত একটা নির্দিষ্ট টাকা মাসে মাসে জমাতে শুরু করুন। আপনার পক্ষে সুবিধেজনক মেয়াদ আপনিই ঠিক করবেন। দেখুন না, আপনার সঞ্চয় চক্রবৃদ্ধি সুদে কেমন বেড়ে ওঠে।

অযথা যে টাকা থাকে না, সত্যিকার কাজেও লাগে না, সেটাই নিয়মিত জমালে আপনি একসময় মোটা টাকা পাবেন। ধরুন, ৭২ মাসের মেয়াদে প্রতি মাসে আপনি ১০ টাকা করে রেখেছেন। মেয়াদ শেষে আপনার তাহলে জমলো ৭২০ টাকা। কিন্তু ইউবিআই আপনাকে দেবে ৯৮৩ টাকা। আজই ইউবিআই-তে একটা রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউন্ট খুলুন।

মাসিক কিস্তি টাকা	মেয়াদ শেষে আপনি পাবেন					
	১২ মাস টাকা	২৪ মাস টাকা	৩৬ মাস টাকা	৪৮ মাস টাকা	৬০ মাস টাকা	৭২ মাস টাকা
৫	৬৩	১৩০	২০৭	২৮৯	৩৭৮	৪৯১
১০	১২৫	২৬১	৪১৪	৫৭৮	৭৫৭	৯৮৩
২০	২৫১	৫২১	৮২৭	১১৫৫	১৫১৩	১৯৬৬
৩০	৩৭৬	৭৮২	১২৪১	১৭৩৩	২২৭০	২৯৪৯
৪০	৫০১	১০৪৩	১৬৫৪	২৩১০	৩০২৭	৩৯৩২

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBI-207

১৪ বর্ষ

অমৃত

৫০ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 25th April, 1975 শুক্রবার—১১ বৈশাখ, ১৩৮২

সূচীপত্র

৬	সম্পাদকীয়		
৭	ত্রিভুজ কিংবদন্তী	(গল্প)	শ্রীসতীকান্ত গুহ
১৭	পটভূমি		শ্রীকৌটিল্য
১৮	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
২০	দেশেবিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
২১	সুরের আগুন		শ্রীসন্ধ্যা সেন
২৬	নির্জনে খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩২	রোজনামচা		ফাদার দ্যাতিয়েন
৩৪	দিন ও দিগন্ত	(কবিতা)	শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী
৩৪	কীর্তি	(কবিতা)	এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ
৩৫	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		শ্রীউপগুপ্ত
৩৭	মাইকেল এঞ্জেলো		শ্রীঅসীম রেজ

শুভ নববর্ষে আমাদের প্রকাশিত নতুন বই :—

শক্তিপদ রাজগুরুর

রং নিয়ে খেলা ৭৲

লেখকের অন্যান্য বই — কয়লার রং কালো ৮৲ চেনামুখ ৩৲ মাটির পুতুল ৬৲ পথের পানে চেয়ে ৫৲ তমসা ৬৲ মুক্ত ত্রিবেণী ৫৲

বেদুইনের

মাটির ক্ষুধা ৮৲

লেখকের অন্যান্য বই — বিচিত্র এই কলকাতা ৯ আমায় বাঁচতে দাও ৮৲ বিক্ষোভ বিদ্রোহ বিপ্লব ৮৲ মোজাম্বিক ৬৲ রাজনীতির পটভূমি ৮৲ কলকাতার ইতিকথা ৬৲

বিশ্ব বিশ্বাসের

বিজ্ঞান সাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৪৲

বীর সাভারকর ও ধীংড়া	৫৲	শহীদ ভগৎ সিং	৭৲
অনশন শহীদ যতীন দাস	৪৲	বিপ্লবী সূর্য সেন	৫৲
স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারত	৭৲	বিপ্লবী সতীন সেন	৫৲
ভক্তকবি দ্বিজেন্দ্রলাল	৪৲	জয়বাংলার মুক্তিযুদ্ধ	৫৲
বীর বিপ্লবী বাঘা যতীন	৬৲	বিক্ষুব্ধ বাঙলা	৬৲

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫/১এ, কলেজ রো কলিকাতা-৯

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক-প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন— ১ম খণ্ড—৮ম সংস্করণ	12.00
ভারতীয় দর্শন— ২য় খণ্ড ৩য় সংস্করণ	7.00
পাশ্চাত্ত্য দর্শন—১০ম সংস্করণ	12.00
নীতিবিজ্ঞান (Ethics)— ৮ম সংস্করণ	12.00
সমাজদর্শন—৯ম সংস্করণ	12.00
মনোবিদ্যা (Psychology)— ৭ম সংস্করণ	22.00
Hand Book of Social Philosophy— 2nd edition	16.00
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস— ৩য় সংস্করণ	12.00
ধর্মদর্শন Philosophy of Religion)	22.00
সমাজ-মনোবিজ্ঞান	10.00

শিক্ষা (ducation)

অধ্যাপক ঋতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ	14.00
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—৩য় সংস্করণ	15.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ সংস্করণ	22.00

শিক্ষক শিক্ষণ (B.Ed. Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ	16.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান	14.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস	15.00
ভারতের শিক্ষা সমস্যা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)	4.00

অধ্যাপক হালদার ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস	16.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান	25.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব	16.00

BP ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
ফোন ৩৪-৭২৩৪

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। অনামন্ত্রিত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্যে পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

মুক্তিফৌজের দুর্বার আক্রমণে সায়গনের মুক্তি আসন্ন। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থার পটভূমিকায় ও মার্কিনী অপশাসনে পিষ্ট সায়গন শহরের এযাবৎ কাল অপ্রকাশিত বহু গোপন কাহিনী ও রোমাঞ্চকর আলোকচিত্রসহ

পাপনগরী সায়গন ১২৲

পূর্বাচল : ৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড । কলি-৯

প্রকাশিত হল

ফোটা পদ্মের গভীরে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটা পদ্মের গভীরে আছে সব বিচিত্র কীটের দংশন তবু নানা সবজীর সেই ফুলের গভীরে অন্তহীন সাম্রাজ্য আবিষ্কারে এক নতুন সত্যাসত্যের মুখোমুখি হল অজু। অজস্র ঘটনা এবং চরিত্রের ভেতর কোন মানুষকেই আর ছোট ভাবতে পারল না। কি সেই ডেজাটার খানা মেলা মুর্শিদ কি অবী অথবা মেজর জব্বার কাকা, কেয়া তারা সবাই মিলে যেন এক অপরাজিত মানুষের জয়যাত্রার সিমফনি তৈরি করছে। সহজ সরল গদ্যে এমন অন্তরঙ্গ মানুষের উপন্যাস সত্যি ভাবা যায় না।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

কামনার সুখ দুঃখ ৬·৫০

এক দুঃসাহসিক উপন্যাস। শঙ্খ বিষ নামে সিনেমায় রূপায়িত হচ্ছে। ছবি দেখার আগে পড়ে নিন।

এই লেখকের আসন্ন প্রকাশঃ

গোয়েন্দা কর্ণেল ৬·০০

প্রফুল্ল গ্রন্থাগার : ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

ও

আরও বিচিত্র কাহিনী

পড়ে' আনন্দ পাবেন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৯	সেই সব মানুষ	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
৪১	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক
৪৩	শেষ বিচার	(উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৫	রূপালীর খাতা		শ্রীবরবর্ণিনী
৪৬	অশোক	(গল্প)	শ্রীশিশির লাহিড়ী
৪৯	খেলার জগৎ		শ্রীঅজয় বসু
৫১	খেলাধুলা		শ্রীদর্শক
৫২	নাটের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৩	দেশবিদেশের খেলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৪	খেলার জগতে মেয়ে		শ্রীঅময়
৫৬	সিনেমাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৮	কিছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৬১	ফ্লোর থেকে বলছি		
৬৩	স্টুডিও সংবাদ		শ্রীমুসাফির
৬৪	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা		শ্রীঅভিজিৎ
৬৬	চিত্রসমালোচনা		শ্রীচিত্রদূত
৬৮	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৬৯	নাটমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৭০	বিদেশী ছবি		শা র চ
৭১	বিবিধ সংবাদ		
৭২	জলসা		শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

॥ নতুন নাটক ॥
অগ্নিদূত
শ্যালক সমাচার ৫·০০
বেতারে বহুবেশা নামে অভিনীত
সমর মুখোপাধ্যায়
অজগর ৫·০০
বহু পুরস্কার প্রাপ্ত
জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়
মৃত্যু ঘন্টা ৫·০০
লিপিকা ৩০।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা—৯

ডঃ দীপক দে-র পি. এইচ. ডি.
ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণা গ্রন্থ
বঙ্কিম মূল্যায়ন ১০
যৌন আচরণ নিয়ে যাঁরা উদার মতবাদ প্রচার করেন, তাঁরাও আপন স্ত্রীর বহু পুরুষচারিতা মেনে নিতে পারেন কিনা—এই জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে গড়ে উঠেছে এক উপন্যাস যা অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির দশখানার মধ্যে একখানা নাম—
উদারপন্থী ৫,
কলকাতা দেখেছি ৩,
ঋতায়ন
২২।২এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলিঃ ৩

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে আনার দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম ফলকারিতে তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক
প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোস্ট বক্স নং ৬৭৭৪,
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-২৭০৮

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবনা

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে এককালে যে রকম গৌরব ছিল আজ তাদের সম্পর্কে সে-পরিমাণই উদ্বেগ। স্বাধীনতার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অল্প। তাদের এলাকা ছিল বড় এবং ছাত্র সংখ্যা আজকের তুলনায় ছিল নগণ্য। কিন্তু তার গৌরব ছিল বিদ্যাচর্চায় এবং বিদ্যার্থীদের গুণগত উৎকর্ষে। সে সময়ে শিক্ষকরাও ছিলেন খ্যাতিমান। আচার্য জগদীশচন্দ্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিংবা আচার্য চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামণ শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই নয় পৃথিবীর যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব। দুঃখ করে লাভ নেই, এখন শিক্ষার প্রসার যতটা ঘটেছে তুলনায় তার উৎকর্ষ বাড়ে নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। অবিভক্ত বাংলায় মাত্র দুটো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। একটি কলকাতায় অপরটি ঢাকায়। এখন আমাদের পশ্চিম বাংলায় কলকাতা ছাড়া আরও ছটি বিশ্ববিদ্যালয়। কল্যাণী ভেঙে দুটো হওয়াতে তার সংখ্যা দাঁড়াল কলকাতাকে নিয়ে মোট আট। দাবী উঠেছে মেদিনীপুরে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। সুতরাং শিক্ষিত লোক যত বাড়বে তাদের চাকুরী ও প্রতিষ্ঠার জন্য কলেজের সংখ্যার সংগে পাল্লা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ও বাড়বে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটছে না অর্থাভাবে। স্কুলের শিক্ষকদের একটা ভদ্রগোছের মাইনে দেওয়া যাচ্ছে না, অথচ বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াবার জন্য চলছে প্রচার। কোন কাজটা আগে করা দরকার সেদিকে কারো হুঁস নেই। তার ফলে একটার পর একটা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছি আমরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালেই সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করা যায়। দেশের অন্যতম প্রাচীন বিদ্যায়তন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তার এক্তিয়ার অনেক ছাঁটকাট করা সত্ত্বেও এখনও ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই পক্ষপাতী। কিন্তু বিশাল ছাত্র সংখ্যা নিয়ে পড়াশোনা চালানো পরীক্ষা নেওয়া ও খাতা দেখা একটা সমস্যা। গণি কমিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন কমিয়ে তার ওপর চাপ কমাবার সুপারিশ করেছেন। সুপারিশে বলা হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে অনুমোদিত ২০৯টি কলেজের পরিবর্তে কলেজের সংখ্যা ৯০ করা হোক। এ নিয়ে সিনেটে বিতর্ক চলছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেবার প্রস্তাবেও দেখা দিয়েছে মত বিরোধ। ঘুরে-ফিরে সেই স্ট্যাটাস কুয়োর দিকে লক্ষ্য রেখেই সব বক্তব্য উচ্চারিত হয়। তার পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে তার ফলে শিক্ষার মান হ্রাস বিশৃঙ্খলা এবং পুরনো জমিদারী সেরেস্তার মতো চলে কাজকর্ম। শিক্ষা সংস্কার করতে হলে পুরনো শিক্ষায়তনগুলোর খোল-নলচে অনেক কিছুই পাল্টানো দরকার। শুধু ঐতিহ্য গেল বলে চিৎকার করলে কোনো ফল হবে না।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও ভাল নয়। কল্যাণীতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করাই ছিল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রভারতীকে তিনি চেয়েছিলেন রবীন্দ্রচর্চা ও চারুকলা অনুশীলনের কেন্দ্র হিসেবে। কল্যাণী একটা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠল। তাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে গেলে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের শিক্ষক ছাত্ররা আপত্তি তুললেন। ফলে একটার জায়গায় দুটো বিশ্ববিদ্যালয় করতে হল সেখানে। জনতার চাপে সব কিছুই সরকারকে মেনে নিতে হয় এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয় নি। রবীন্দ্রভারতীতে তো রীতিমত কেলেঙ্কারী ঘটেছে। ছাত্রদের মধ্যেই শুধু নয় শিক্ষকদের মধ্যেও দলাদলির অভিযোগ এই শিক্ষায়তনটির কাজকর্ম প্রায় অচল করে দিয়েছে। উপাচার্য অনুপস্থিত। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ও অশিক্ষক সকলে মিলে সভা করে উপাচার্যের অপসারণ দাবী করছে, এ এক অভিনব ব্যাপার। বর্ধমান উত্তরবঙ্গ, বিশ্বভারতী সর্বত্রই প্রায় এক চিত্র। ছাত্র বিক্ষোভ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই উপসর্গ। বহু ক্ষেত্রেই পরীক্ষায় ঢালে ব্যাপক টোকাটুকি। এভাবে উচ্চ শিক্ষার প্রসার হবে কিনা কিংবা হওয়া বাঞ্ছনীয় কি না তা প্রত্যেক শিক্ষানুরাগীকেই আজ ভেবে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় নামের মধ্যে যে মর্যাদার ব্যঞ্জনা আছে তাকে নষ্ট হতে দেওয়া কোনো মতেই উচিত নয়।

ত্রিভুজ কিংবদন্তী

সতীকান্ত গুহ

কলকাতার পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের যে অংশ পশ্চিমে ক্যামাক স্ট্রীটের মোড় থেকে একটানা পথ এসে পূবে রডন স্ট্রীটের মোড়ে থেমেছে এবং হঠাৎ থেমেছে তার একটা বিশেষ পরিচয় আছে। এ পরিচয় যত প্রচ্ছন্নই হোক এবং সাধারণ মানুষের চোখে যত অনায়াসেই ধুলো দিক। অভিজ্ঞ মানুষের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। এই অংশ যে অতি বিচিত্র ও বিশিষ্ট পার্ক স্ট্রীটের অন্য যে-কোনো অংশ থেকে পৃথক, বিশেষ কারণে স্বতন্ত্র, তার প্রমাণ লেখকের পরিচিত ইহলোক ও পরলোকের একাধিক নরনারী ও তাদের অকপট স্বীকারোক্তি। একাধিক কথার অর্থ মুষ্টিমেয় নয়। পরিমিত হিসেবে অসংখ্য।

লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস এই অংশের বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ একটি স্থলে ও স[illegible] ইঙ্গিত। ক্যামাক স্ট্রীট ও পার্ক স্ট্রী[illegible] সংগমে (সংগম কথাটি প্রাসঙ্গিক [illegible] অর্থপূর্ণ) একটি ত্রিকোণ উদ্যান। [illegible] অ্যালেন গার্ডেন। কিছুকাল আগেও [illegible] নাম লক্ষ্য করেছি। সম্প্রতি নাম প[illegible] বর্তনের হিড়িকে কোনো অঘটন ঘটে[illegible] কিনা জানি না। যাহোক ত্রিকোণ উদ্য[illegible]

প্রসঙ্গে ফিরে এসে যদি বলি এই ত্রিকোণ উদ্যানটি একটি জৈবিক রূপের রূপক; সৃষ্টির আদিকাণ্ডের একটি ত্রিভুজ; এবং সত্যের খাতিরে এই ত্রিভুজের নাম হওয়া উচিত ইডেন গার্ডেন তাহলে এই অঞ্চলের বিশেষ পরিচয়ের স্থূল ও সরল ইঙ্গিত স্পষ্টতর হয়। সন্ধ্যার পর থেকেই এখানে একটি বিশেষ উপস্থিতি সাড়া দিতে থাকে। রাত যতই গভীর হতে থাকে এই সাড়া মুখর হয়ে ওঠে। ত্রিভুজের উপাসকেরা ছদ্মবেশে সুগোপনে আত্মবলি দিতে আসেন। বড় গাড়ি দূরে বেঁধে রেখে মানের মাপে খাটো হয়ে রিকসায় চাপেন। পরে সুবিধেমতো আরো খাটো হয়ে জান্তব পর্যায়ে নেমে আসেন। কেউ কেউ সঙ্গে নতুন বলি নিয়ে আসেন। যে-সরল অসহায় মানুষ অনুকূল অদৃষ্টের আশ্রয়ে নির্বিঘ্নে জৈবিক জীবনের সহজ পথে বছরের পর বছর হেঁটেছে। সে হঠাৎ নিশার ডাকে সাড়া দেয়, নিছক বিপদের নেশায় বিপথে পা বাড়ায়। এখানে প্রতি রাতে এই ত্রিভুজ উদ্যানে ও তার আশেপাশে পতঙ্গেরা আগুন খুঁজে ফেরে; মাছি মাকড়শার জালের নিশানা জানতে চায়।

এ অঞ্চলে রাতে মানুষের ভাষাও যেন বদলে যায়। ভাষার স্থূল রূপ একই হয়তো থাকে, কিন্তু মানুষের নিষিদ্ধ কামনার বিকার তাকে বিকট করে তোলে। ছাপার অক্ষরে যে কথা সহজ প্রেমালাপ বলে মেনে নেওয়া চলে, বিকৃত উচ্চারণের প্রলেপে তা অশ্রাব্য হয়ে পড়ে।

এই অঞ্চলে মিস রহমান নামের ছদ্মবেশে সুলক্ষণা সরকার প্রতি নিশীথেই আসতো। তার সঙ্গে অন্য উপাসক উপাসিকাদের লক্ষণগত কোনো মিল ছিল না। সে নারীজীবনের যে-কোনো আকাশে চাঁদ হয়ে স্বমহিমায় বিরাজ করতে পারতো। কিন্তু রক্তসমুদ্রের ফেনিল ক্ষুধার চেয়েও এক নিবিড় প্রয়োজন তাকে প্রতি রাতে এখানে আকর্ষণ করত। তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে তাকে ত্রিভুজ উদ্যানের পশ্চিম কোণে একটি সরু ফটকের সম্মুখে নিয়ে আসতো। সে উদ্যানে ঢুকতো না। একটি ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়াতো। গভীর রাতে ল্যাম্পপোস্টের তলায় যে-নারীরা প্রয়োজনের তাড়নায় আশ্রয় নেয় সে তাদেরই মতো কারো প্রতীক্ষায় থাকতো। ঈপ্সিত ব্যক্তি এলে 'আপনার ঘড়িতে কটা বেজেছে?' এই অব্যর্থ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে হবে জানতো। কিন্তু তার সম্মুখে থামতে গিয়ে কোনো রিকসা থামতো না। একবার তাকে লক্ষ্য করেই নিশাচরেরা ঘোর অস্বস্তিতে পাশ কাটিয়ে যেত। সে তাদের এই আচরণে বিস্মিত হত না। সে বুঝতো তার ঈপ্সিত মানুষ এদের কেউ নয়। হতে পারে না। কারণ সে ভিড়ের মানুষ নয়। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পেত না। কিন্তু সে যে অভ্রান্ত তার এ ধারণার সমর্থন দেহে মনে। প্রতিটি স্নায়ু ও শিরা উপশিরায়, সংস্কারে ও অনুভূতিতে এদের অন্তরালে আরো বহুদূরে অতি-চেতনার গভীরে পেত। হাত পাততে হত না। হাতের মুঠোয় কে গুঁজে দিয়ে যেত।

ত্রিভুজ উদ্যানের ডাক তার দেহ ও মনের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ত। আসঙ্গের উপাসনা উৎকট উল্লাসের তুঙ্গে উঠে তার দিকে বার বার হাত বাড়াতো। তার কানে নিষিদ্ধ জীবনের প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তেই উচ্চারিত হত। কিন্তু কামনা-কর্ষিত পাপবিদ্ধ সুলক্ষণা ল্যাম্পপোস্টের তলায় তার অভীপ্সিতের প্রতীক্ষায় অবিচল থাকতো। অসামাজিক জীবনের শিখরিণী সুলক্ষণা সরকার, বহুঅঙ্কশায়িনী সহস্র পালঙ্কের অধিষ্ঠাত্রী সুলক্ষণা সরকার কোন প্রয়োজনে মাঝরাতে শুচি হয়ে পাপোদ্যানের গুপ্ত দ্বারে ল্যাম্পপোস্টের তলায় রাতের পর রাত উপস্থিতির খাতায় স্বাক্ষর রেখে যেত তা সে নিজে যতটুকু বুঝুক না বুঝুক লেখকের বোধগম্য নয়। লেখক রহস্যের পাকে বন্দী হয়ে থাকতেও রাজী নন। তিনি চিরাচরিত পথে সুলক্ষণা সরকারের রহস্যভেদ করতে চান। এজন্য তার ব্যক্তিগত ইতিহাসের পাতা উল্টে না দেখে পারেন না।

গোড়ায় গলদ হচ্ছে এই সুলক্ষণার কোনো সুসম্বদ্ধ ক্রমিক ইতিহাস নেই। সে জনশ্রুতির ফসল। উপাখ্যানোচিত অনুমানের নায়িকা। যে-বিখ্যাত ধনকুবের মাতুল পরিচয়ে তার অভিভাবকের আসনে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি ইহলোক ত্যাগের পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত উইলের জোরে সুলক্ষণাকে তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরিচয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করে যাননি। বরং রহস্য যাতে ঘনীভূত হয় প্রকারান্তরে, হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে, সে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তিনি সুলক্ষণার মাতুল বলে যে-পরিচয় জীবদ্দশায় দিয়ে এসেছিলেন তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রথম ধোপেই সে পরিচয়ের বেশখানিকটা কাচা রং উঠল। অনুসন্ধানের গোড়ায়ই সন্দেহ জন্মালো আদৌ তাঁর কোনো ভগ্নি ছিল কি না! সুলক্ষণা কি তাহলে প্রকৃতপক্ষে অনাথ? মাতুল আশ্রয়দাতা ছাড়া কেউ নন কিম্বা মাতুল মাতুলের চেয়ে অনেক বেশী অনেক নিকট? সুলক্ষণার জন্য ইহলোকের কপাট কি উনিই মেলে ধরেছিলেন?

মাতুলের মৃত্যুর পর এক বছর যেতেই সুলক্ষণা সাবালিকা হয়ে বিশাল সম্পত্তির স্বাধীন দখল পেল। এই এক বছরে উইলের অছি ব্যারিস্টার চৌধুরী একদিন একবারও তার পিতামাতার প্রসঙ্গ তোলেন নি। সুলক্ষণার কৌতূহলও তার জন্ম-রহস্যের কণ্টকিত পথ মাড়ায়নি। মাতুলের বংশমর্যাদা ও অতুল ঐশ্বর্যের জোরে সে সমাজে টিঁকে গেল এ ধারণা তার মনে এক মুহূর্তের জন্য স্থান পেল না। তার পরিচয় একান্ত তার। তার পিতামাতার নয়। তার মাতুলের তো নয়ই। সে রামায়ণের সীতার মতো জীবনের উর্বর মৃত্তিকার ফসল। মহাকাব্যের পুণ্যশ্লোকা নায়িকার মতো মহৎ পরিচয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সে তার অদৃষ্ট সম্মুখে রেখে জীবনের নাটমঞ্চে আবির্ভূত। তার লক্ষ্য সুদূরবন্ধ। আকাঙ্ক্ষা উত্তুঙ্গ। জৈবিক রসায়নের ক্রিয়ায় কে তাকে কোন আধারে রেখেছিল এ বৃত্তান্ত তার কাছে গৌণ। জীব হিসেবে পৃথিবী ও সৌরলোকে সকলের সঙ্গে তার তুল্য অধিকার। আকাঙ্ক্ষার হিসেবে তার অধিকার অনন্য। কোটি মানুষের অধিকারের উপর তার অধিকার।

কিন্তু পাতালদুহিতা সীতা আকাশে কান পেতেছিলেন। সুলক্ষণা কান পাতলো পাতালে। কে তাকে বলল, 'আমারও অনন্ত রাজ্য। সেখানেও অসংখ্য পথ। আলোর মরীচিকা নেই। অন্ধকারের রহস্যদৃষ্টি আছে। দিন ও রাতের ব্যবধান নেই। অনন্ত অন্ধকারে আমার রাজপথ চিরজাগ্রত। এখানেও সপ্তাশ্বরথ চলে। যে আমাকে মানে তার ভাগ্যে অদৃষ্টজয় হয়।'

অন্ধকারের আহ্বানে সুলক্ষণা কী দুর্লভ আশ্বাস পেয়েছিল সেই জানতো। সমাজে স্থান পেয়েও সে পাপপুণ্যের বিচার না করে অসামাজিক জীবন বেছে নিল। শালীন ও উন্নত জীবন ছিল তার সাধনা। কিন্তু পাপ ছিল তার পণ। বহুঅঙ্কশায়িনী হয়েও সে সঠিক অর্থে দেহোপজীবিনী ছিল না। সে গৃহীত হত না। গ্রহণ করত। যাকে গ্রহণ করত তাকে উন্নতস্তরের উপভোগের মহিমায় উজ্জ্বল করত। আসঙ্গের প্রাসাদেও মানুষ যে ধন্য হয়, মহাজীবনের না হলেও ইন্দ্রলোকের সমৃদ্ধ জীবনের স্বাদ পায় তার শয্যাসঙ্গীরা এই আশ্চর্য সত্যের প্রমাণ পেয়ে বিস্মিত হত। গ্লানি নেই, ধিক্কার নেই, অবসাদ নেই কোন কঠোর তপস্যায় সে তার এই বিচিত্র কামতন্ত্র আয়ত্ত করেছিল ভেবে তারা সুলক্ষণার পাপের ভিতর এক নতুন ঈশ্বরকে দেখতো, যে ঈশ্বর কামনার স্বর্গে অতুল মহিমায় বিরাজ করেন। কোনো কলুষকলঙ্কের চিহ্ন তার চোখেমুখে ছিল না। সুলক্ষণা ছিল হীরকিত প্রমোদের অক্ষয় পূর্ণিমার চাঁদ।

কেন, কার দুর্বার আকর্ষণে সে ত্রিকোণ পার্কের নৈশলীলায় যোগ দিতে যায় যোগ দিতে গিয়ে কেন সে পারে না, বাইরে ক্ষুদ্র ফটকের পাশে ল্যাম্পপোস্টের তলায় কার প্রতীক্ষায় থাকে, কেন থাকে—একে একে এই প্রশ্নগুলি নিয়ে সে প্রতিদিনই নির্জনে চিন্তা করত। কিন্তু একদিন এই চিন্তা চরমে উঠল। তুচ্ছ কারণে নয়। এক অভাবনীয় ঘটনার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে।

সুলক্ষণা ল্যাম্পপোস্টের তলায় প্রতি রাতের মতোই সে রাতে প্রতীক্ষায় ছিল। সে হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কখন একজোড়া তেজী সাদা ঘোড়ায় টানা কালো হীরের মতো উজ্জ্বল একটা জুড়ি এসে থেমেছিল সুলক্ষণাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে আরোহী নেমে এসে-

ছিলেন, নিবিড় অন্যমনস্কতায় সে টের পায়নি। আরোহী যখন তাকে সম্বোধন করলেন সে চমকে উঠল। এতদিন পর! এ কে? এ সম্বোধন কি সে তিন হাতখানেক ব্যবধান থেকে শুনছে? না অনেক অনেক দূরে থেকে? সুদূরান্ত বলা যায়। কোটি কোটি দিগন্তের শেষে যে সুদূরকে কল্পনা করা চলে।

অপরিচিতের স্মিত হাসি, প্রসন্ন আনন দুটি উজ্জ্বল চক্ষু তাঁর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিলে সুলক্ষণার চেতনায় এক তীব্র অনুভূতির প্লাবন এনে দিল। প্রার্থিত সম্বোধনের উত্তরে সে সাজানো যে-কয়েকটি কথা বলবে স্থির করে রেখেছিল বহুনিশীথের প্রতীক্ষালালিত সে কথাগুলি কুটোর মতো এ প্লাবনে ভেসে গেল। বহু শতাব্দীর ইতিহাস ও কিংবদন্তীর চোখ দিয়ে সুলক্ষণা তার সম্মুখের অবিশ্বাস্য আবির্ভাবকে লক্ষ্য করতে লাগলো। জীবন নাটক, এ কথা সে পড়েছিল ও বিশ্বাস করত। কিন্তু সে রাতে সে যা দেখল তা নাটকের নাটক। এক এক করে না উঠে জীবনের অনেকগুলো যবনিকা যেন এক সঙ্গে মহাকালের নিঃশ্বাসে উঠে গেল। এর পরও প্রত্যহের জীবনে ফিরে যাওয়া যায় কিন্তু সেখানে ঘর বেঁধে থাকা চলে না। সুলক্ষণা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজেকে নিঃশব্দে তিরস্কার করল, মূর্খ! কথা হল না। পরিচয় হল না। বোঝাপড়া বা ব্যবস্থা হল না। তোমার এ দীর্ঘশ্বাসের কী অর্থ থাকতে পারে?'

অপরিচিত সুলক্ষণাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললেন, 'আমাকে দিয়ে তোমার প্রয়োজন?'

সুলক্ষণা স্তব্ধ হয়ে শুনলো। উত্তর দিতে গিয়ে উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে হল। শুধু তার নিষ্পলক দুটি চোখের দৃষ্টি অপরিচিতকে বেঁধে রাখতে চাইলো।

অপরিচিত শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন 'তোমাকে দিয়ে আমারও বিশেষ প্রয়োজন। কী চিন্তা করে বললেন, 'কিন্তু তুমি আজ প্রস্তুত নও। তোমার আরো সময়ের প্রয়োজন। এ প্রতীক্ষা সহজে শেষ হবার নয়। আমি আবার আসবো। আসতেই হবে। তোমাকেও প্রতীক্ষায় থাকতেই হবে।'

অপরিচিত হাসলেন। আশ্চর্য সে হাসিতে নিঃসঙ্গ অনন্তের বিষাদ। নাটকে যেরকম ঘটে, তিনি সমারোহে শকটে উঠলেন। একটা উজ্জ্বল নিঃশব্দ ঝটিকার মতো সুলক্ষণার নৈশপ্রতীক্ষার অধ্যায় বিদ্যুৎ নখরে ছিন্ন করে সাদা ঘোড়ার জুড়ি অপরিচিতকে নিয়ে অদৃশ্য হল।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গাতে ভাঙ্গাতে প্রায় নটা হল। সুলক্ষণা খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে মাথার উপরে ব্রঞ্জের সৌখীন ঝাড়টার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর কী একটা বিষয়ে মনস্থির করে সে উঠে বসল। বিছানার পাশের কৌচ থেকে হাত বাড়িয়ে ড্রেসিং গাউনটা নিয়ে গায়ে চাপিয়ে স্নানাগারে গেল। দৈহিক শুচিতা নিয়ে তার বিশেষ রকমের বাড়াবাড়ি ছিল। তারপরই ছিল প্রসাধনে নিষ্ঠা। প্রতিদিনই স্নান ও প্রসাধনপর্বের শেষে শুচিস্নিগ্ধ হয়ে সে দেখতে অপরূপ হত। শুধু অপরের চোখে নয়। নিজের চোখেও। অবশ্য তার চোখজোড়া প্রায়ই তার ভিতরে আর এক সলক্ষণাকে দেখতে দেখতে বিস্ময়বিহ্বল হত। এ সুলক্ষণাও শুচিস্নিগ্ধ। অরূপ। কিন্তু শুধু রূপাতীত নয়। অপরূপ। অরূপ। কী করে? সে সবিস্ময়ে নিঃশব্দ উত্তর শুনতো 'নৈশ প্রতীক্ষায়।' এর অর্থ কী? অরূপ ও অপরূপের ভিতরের দুস্তর ব্যবধান কোন তন্ত্রে সে লঙ্ঘন করে? গত রাতের অভিজ্ঞতায় উত্তরের বদলে রহস্য এল। শূন্য হাতে নয়। প্রশ্ন নিয়ে। প্রয়োজন, প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতির প্রশ্ন নিয়ে। নৈশ প্রতীক্ষার অর্থের বদলে সে পেল প্রশ্ন ও রহস্য। কিন্তু আশ্চর্য প্রশ্ন ও রহস্য। সুলক্ষণার মন তারা অর্থের উপরে তুলে নিয়ে গেল।

সুলক্ষণা কী চিন্তা করে একটা টেলিফোন করল। তারপর ডাইনিংরুমে প্রাতঃরাশের সৌখীন সাজসরঞ্জামের সম্মুখে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

সুদর্শন হন্তদন্ত হয়ে ডাইনিংরুমে ঢুকে বলল, 'পশ্চিমে সূর্য উঠল। অনাবশ্যক ভেবে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলে। ক্লাবে চারচক্ষের মিলনের চেষ্টা করলে রোষকটাক্ষের চাবুকে ঘায়েল করতে। আজ তোমার দিন শুরু হতে না হতে আদিপর্বে

অমৃত

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮২

প্রতি বছরের মত এবারও অমৃতের নববর্ষ সংখ্যা ৯ মে প্রকাশিত হবে।

এবার এক নতুন পরিকল্পনায় প্রকাশিত হচ্ছে অমৃতের এই নববর্ষ সংখ্যা। অমৃত এবার পনের বছরে পড়ছে। আমরা স্থির করেছি, গত ১৪ বছর ধরে যে সব বিখ্যাত লেখকের গল্প অমৃতে প্রকাশিত হয়েছে তারই ভেতর থেকে বেছে ৩৮টি শ্রেষ্ঠ গল্পের একটি সংকলন এ বছর উপহার দেব আমরা। আমাদের লেখকবৃন্দের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে একেবারে হাল আমলের প্রায় সমস্ত প্রখ্যাত লেখকেরই গল্প থাকবে এতে। এই সংখ্যাটির সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম; এবং অনেকেই এটি সংগ্রহ করে বাঁধিয়ে রাখতে উৎসাহী হবেন। বলা বাহুল্য এই সংখ্যাটি যদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তাহলে এর দাম কুড়ি টাকা হবে। কাজেই সেদিক থেকেও এর আকর্ষণ কম নয়।

এর সঙ্গে থাকছে বাঙলার একজন বিশেষ জনপ্রিয় লেখক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন একখানি উপন্যাস এবং রবীন্দ্র বিষয়ক নিবন্ধাদি।

বৃহদায়তন ও সুঅলঙ্কৃত

দাম ৪·৫০ পয়সা

টেলিফোনে তলব করেছ! পরিহাস? তোমার? না নিয়তির?'

সুলক্ষণা ম্লান হেসে বলল, 'নিয়তির।'

সুদর্শন গভীর বিস্ময়ে বলল, 'নিয়তি! তুমি নিয়তি মানো?'

সুলক্ষণা বলল, 'মানতে বাধা কী?'

সুদর্শন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল 'তাহলে তোমার নিজের বাইরে কোনো একটি শক্তিকে যে মানতে হয়!'

সুলক্ষণা বলল, 'মানতে যদি হয়ই না মেনে উপায় কী?'

সুদর্শন বলল, 'এতকাল একমুহূর্তের জন্যও উপায়ের অভাব হয়নি। আজ কেন হচ্ছে? আজ কেন নিয়তিকে স্মরণ করছ?'

সুলক্ষণা বলল 'শুধু স্মরণ করছি না। তার শরণ নিচ্ছি।'

সুদর্শন বলল, 'কেন নিচ্ছ?'

সুলক্ষণা বলল, 'যা ভাবিনি ঘটেছে। আমাকে রহস্য আক্রমণ করেছে।'

'রহস্য?' সুদর্শন নিষ্পলক চোখে সুলক্ষণাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। তারপর গলা নামিয়ে বলল 'সূর্য শুধু পশ্চিমে ওঠেনি। পূবে অস্ত যাচ্ছে। থাকছে রহস্যের অন্ধকার।'

সুলক্ষণা ছিল তার অসংখ্য অনুরাগীর চোখে এক মূর্তিমতী রহস্য। রূপের বিচারে সে ছিল রহস্যপ্রতিমা। জীবন-তত্ত্বের বিচারে সে ছিল রহস্যের রসাতল। রহস্যপ্রতিমা? কেন নয়? সম্ভোগের গ্রহণ তাকে স্পর্শ করত না। রূপের ঠাটে ও চমকে সে ছিল চিরবসন্তের নারীরূপ! সে এক অলৌকিক শক্তিতে সময়ের বাইরে, জরা ও ক্ষয়ের বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু শুধু কি সে নিজে? যে তার ডাকে সাড়া দিত, তাকে অঙ্কে গ্রহণ করে ধন্য হত সে হৃদয়ে মনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। সুলক্ষণার জাদু তাকে ছুঁয়ে দিয়ে তার কানে গন্ধর্ব-লোকের গুপ্তমন্ত্র উচ্চারণ করত। মার্জিত শালীন বিচিত্র উপভোগের প্রসাদে সাধারণ মানুষ থেকে সে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ত। যে রসাতল সুগোপনে অন্ধকারে বীজের কানে জাগরণের মন্ত্র পাঠ করে, ক্ষুদ্র কণা থেকে পুষ্পিত বল্লরিত ফসল আলোর পৃথিবীকে উপহার দেয় সুলক্ষণা তার জীবনের সেই দুর্জ্ঞেয় রসাতল থেকে সেই আশ্চর্য বীজ-মন্ত্রে তার অনুরাগীদের হৃদয় ও মন সোনার ফসলে ভরে দিত। জীবনের যে স্বৈরাচারকে মানুষের বহুযুগের স্বীকৃত নীতি লাম্পট্য আখ্যা দিয়ে ধিক্কার দিয়েছে, এখনও দেয়, সৃষ্টির শেষ সূর্য যেদিন অস্ত যাবে সেদিনও দেবে। সুলক্ষণার উপভোগের প্রতিভায় ও জাদুতে সেই স্বৈরাচার দেহ-দেবতার আরতি ও উপাসনার স্তরে উঠে নীতির জটিল তত্ত্বে একটা বিষগিঁঠ এঁটে দিত। যে-প্রশ্নের উত্তর নেই তার কঠিন গিঁঠ।

কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে সুদর্শন এক সময়ে বলল 'উঠি। সন্ধ্যায় ক্লাবে দেখা হবে। ক্লাবে যাচ্ছো নিশ্চয়ই?'

সুলক্ষণা যন্ত্রচালিতের মতো মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

সুদর্শন বলল, 'কাল পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখতে চাও? বেশ কালই সই!'

সুলক্ষণা বলল, 'অপেক্ষায় থাকবার প্রয়োজন নেই। আমার ক্লাবের পাট চুকেছে।'

সুদর্শন নিজের দু কান বিশ্বাস করতে পারলো না। সে নিজেই বলল না কেউ তাকে দিয়ে বলালো সে বুঝতে পারলো না। কিন্তু শুনলো সে সুলক্ষণাকে বলছে, 'ভয়? না বৈরাগ্য?'

সুলক্ষণা ম্লান হেসে বলল, 'আমার কামনাসমুদ্রে এখনো লক্ষ বছর ঢেউ উঠবে। বৈরাগ্য নয়। ভয়। রহস্যের ভয়। যাকে চিনিনা মানিনা সে আমার পিছু নিয়েছে। আমাকে তার হাতের মুঠোয় আনতে চায়। কে সে সুদর্শন?'

সুদর্শন বলল, 'জানি না। সাধ্যে কুলোয় তো জানতে চেষ্টা করব।' থেমে সুলক্ষণার দিকে চিন্তাকুল চোখে তাকিয়ে

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
শৈলেন রায়

বলল, 'শুধু রহস্যের আক্রমণ সংবাদ দিতেই ডেকেছিলে? আর কোনো কথা নেই!'

'এর চেয়ে জরুরী কথা, এ কথার পর আর কোন্ কথা থাকতে পারে সুদর্শন?' সুলক্ষণা দু-হাতে মাথা চেপে ধরল। তার চোখে জল এল।

সুলক্ষণার প্রশ্নে ও আচরণে সুদর্শন স্তম্ভিত হল। তারপর নীরবে প্রস্থান করল।

সুলক্ষণা ক্লাবে গেল না। ক্লাব সুলক্ষণার প্রশস্ত ফ্ল্যাটে এল। শহরে যারা ছিল সকলেই এল। চল্লিশটি সুবেশ নরনারী। চালচলনে কথাবার্তায় উন্নতরুচির সুস্পষ্ট ছাপ। যে সুন্দর বা সুন্দরী নয় সেও কাম্য ঈপ্সিত। তারও দেহে নিশার ডাক।

বিশাল পরিপাটি সাজানো ড্রইংরুমে জাপানী কিমোনো গায়ে তার সখের চিত্রিত কিংখাবে মোড়া পুরাকালের সিংহাসনের মতো একটি আসনে একটি মখমলের তাকিয়া আলগোছে কোলে রেখে সুলক্ষণা বসে ছিল। সে আজ দূর আকাশের মতো উদাসীন।

বল্লভ রায় সুপুরুষ ও বিদ্যার জাহাজ। সুলক্ষণাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে উত্তেজনা দমন করে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'সুদর্শন যে দুঃসংবাদ দিয়েছে তা মহাকাব্যের দুর্মুখের মুখে মানাত। প্রবৃত্তি ও আইন বাধা না হলে সানন্দে তার মুণ্ডচ্ছেদ করা চলত। এ যাত্রা সে বেঁচেছে। আমাদেরও বাঁচার ব্যবস্থা করো। মন শক্ত করো। তুমি ক্লাব ছাড়লে তোমার অনুরাগীরা বানের জলে ভেসে যাবে।'

সুলক্ষণা বলল, 'ভেসে যাবে কোন দুঃখে! আমি নোঙর খুঁজছি। তোমরাও খোঁজো।'

বল্লভ রায় বললেন, 'আমাদের মহাসমুদ্র ক্লাব। পালই বলো নোঙরই বলো সবই তুমি। তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা নেই। যতদিন তুমি আছো আমাদের

নৈশলীলায় প্রশ্নের কাঁটা নেই, বিবেকের দংশন নেই, ক্ষয়ের খরচ নেই।'

সুলক্ষণা শুষ্ককণ্ঠে বলল, 'ক্ষয়ের খরচ নেই! কে বলল নেই?'

বল্লভ রায় হেসে বললেন, 'তুমি জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছো সুলক্ষণা ক্ষয়ের চিহ্নমাত্র যদি থাকতো তোমার দেহে আজ চল্লিশ বছর-এর প্রৌঢ়াকে দেখতাম। আর আমরা? তোমার মতো অনন্তযৌবনের অহংকার আমাদের নেই। না থাকলেও তোমারই জোরে জরার অভিযান মন্থর করে যৌবনের বসন্ত সুদীর্ঘ করেছি। এ অহংকারের অধিকার কেন কেড়ে নিতে চাও?'

সুলক্ষণা বলল, 'তোমাদের ঠকাতে চাই না বলে।'

বল্লভ রায় সবিস্ময়ে বললেন, 'ঠকাতে চাও না বলে! কবে কখন ঠকালে?'

সুলক্ষণা বলল, 'ক্ষয়ের ব্যাপারে তোমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে।'

বল্লভরায় চারদিকে একে একে সকলের দিকে তাকিয়ে সুলক্ষণাকে সুকোমল পরিহাসে নাড়া দিয়ে বললেন, 'আমরা তোমার অনুযায়ী বলে তোমার ঘানিতে কলুর বদল নই। সাধ্য কি আমাদের চোখে ঠুলি পরাও।'

সুলক্ষণা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'আমি কে? আমার সাধ্যই বা কী? যে আমাকে নিয়ে খেলেছে তার প্রহসনে আমার সঙ্গে তোমরাও আছো। কেউ বাদ যাও নি। আমাদের সকলের চোখেই ঠুলি।

ইতিমধ্যে কফি ও শীতল পানীয় এসে গিয়েছিল। সুলক্ষণা বলল, 'যা শুনবে, ভয়ঙ্কর মনে হবে। তার আগে কফি খেয়ে নাও। পরে জিভে ঠেকবে।'

কফিতে সেদিন কারো রুচি ছিল না। হাতে হাতে কফির পেয়ালা কয়েক মুহূর্তে শূন্য হল। কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে সকলকে সম্বোধন করে বল্লভ রায় বললেন, 'সুলক্ষণার সঙ্গে কথার পালা আমিই চালাবো না আর কেউ ভার নেবে?'

সকলে সমস্বরে বললেন, 'আপনিই চালান। আমরা শুনি।'

সুলক্ষণা বল্লভ রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা স্বাভাবিক নয়, তার কারণও স্বাভাবিক হতে পারে না।'

বল্লভ রায় সমর্থনে মাথা নাড়ালেন।

সুলক্ষণা বলল, 'আমাদের নৈশলীলা আরব্যরজনীর কাহিনীকেও হার মানিয়েছে। সেখানেও অসম্ভবের অভাব নেই। তবে সে-অসম্ভব আমাদের নৈশলীলার অসম্ভবের তুলনায় ছেলেখেলা।'

বল্লভ রায় বললেন, 'মানলাম।'

সুলক্ষণা বলল, 'এতেই ভয়। এতেই বিপদ। যে-অসম্ভবের তুলনা নেই, যুক্তি নেই, কীসের জোরে কী করে তা সম্ভব হয়!'

বল্লভ রায় বললেন, 'তুমি জানো। আমরা জানতে চাই না। তোমার জোরে হয়।' নির্ণিমেষে সুলক্ষণাকে দেখতে দেখতে বল্লভ রায় বললেন, 'তুমি অসম্ভব হয়েও সম্ভব।

EXOTIC
Exotic Luxury
ল্যাক্‌মে
এক্সটিকা
ট্যাল্ক
এক্সটিকার মন মাতানো সৌরভ দিকে
দিকে ভেসে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে
চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
লেক্‌মে
dCP/LE/4a Ben

প্রত্যক্ষ সত্য। তোমার জাদুতে আমাদের লৈলীলা ক্ষয়ক্ষতির অতীত। সংশয় সন্দেহের অতীত। আমরা কামনাসমুদ্রে ভোগের সন্তরণকরে পাল তুলে অকূলে দিব্যি পাড়ি দিচ্ছি।'

সুলক্ষণা বলল, 'ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও?'

বল্লভ রায় বললেন, 'বুঝিয়ে বলো।'

সুলক্ষণা বলল, 'নরকে নরকের গন্ধ পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় বাইরে। বিশেষ করে স্বর্গ যদি নিকটে থাকে।'

বল্লভ রায় বললেন, 'উপমায় ত্রুটি নেই। কিন্তু ব্যাখ্যা করে বলো।'

সুলক্ষণা বলল, 'ক্ষয়ের অক্ষর নরকে আছি বলে, আলোর ক্ষয়, অমৃতের ক্ষয় চোখে পড়ছে না।'

বল্লভ রায় কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'তোমার দুর্বোধ ব্যাখ্যার সিঁড়ি বেয়ে অর্থে পৌঁছাই সে-শক্তি নেই। সহজ ভাষায় আরো সরল করে বলো।'

সুলক্ষণা বলল, 'আমাদের লৈলীলা ঈশ্বরের পৃথিবী থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে।'

বল্লভ রায় বললেন, 'কী করে?'

সুলক্ষণা বলল, 'যে-ক্ষয় চোখে ধরা পড়ে, যে-ক্ষয়ের সমাচার কানে শুনি, স্পর্শে যে-ক্ষয়ের অস্তিত্ব টের পাই, কিছুকালের জন্য সে-ক্ষয়ের গতিরোধ করে। উপভোগের ক্ষয় নেই এই মোহ মিথ্যাকে সত্যের মুখোশ পরিয়ে, যৌবনের বস্তুমরীচিকা দিয়ে আমাদের কিছুকাল বিভ্রান্ত করে। কামনার স্বর্গে আমাদের কিছুকাল বহাল রেখে, যৌবনের ঘণ্টে হাত না দিয়ে। লেলার পথে প্রলোভনের পথে জীবনের অতল পাতালে টেনে নিয়ে।'

বল্লভ রায় বললেন, 'তোমার এত কথার অর্থ কি এই আমরা ছলনার একটা ভগ্নরে জগতে বসে করছি। একদিন মোহভঙ্গের নির্মম মুহূর্তে পুঞ্জীভূত জরা ও গ্লানি আমাদের আক্রমণ করে বসবে?'

সুলক্ষণা হেসে বলল, 'তাতে ভয়ের কী থাকতে পারে? যা প্রাপ্য তা পেলে দুঃখের কারণ থাকবে না কিন্তু সর্বনাশ যা হবার চোখের আড়ালে হয়ে গিয়েছে। এখনও হচ্ছে। লৈলীলার ঘটকে যতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম ততদিন প্রতিমুহূর্তে সর্বনাশ ঘটেছে। যে-ক্ষয় চোখের আড়ালে হয় তার প্রতিদিনের হিসেবে আমাদের চূড়ান্ত ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। ছোট খেলায়, মুহূর্তের খেলায় জিততে গিয়ে বড় খেলায়, অনন্তকালের খেলায় আমরা হেরে বসে আছি।'

বল্লভ রায়, 'ক্ষয়-ক্ষতির খেলায় কোন্ হিসেবের কথা বলছ?'

সুলক্ষণা বুকে হাত দিয়ে বলল, 'এখানে। যে-হিসেব এখানে হয়।'

ঘরে কে নিঃশ্বাস ফেলল? সুলক্ষণা? এ কী আশ্চর্য দীর্ঘশ্বাস। ড্রইংরুমে যেন একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত বয়ে গেল।

সুলক্ষণা বলল, 'কত কোটি বছরের সায়নার সংখ্যাতীত কত প্রহরের ধিকিধিকি জ্বলে মহাকালে একটা তারা জন্ম নেয়! সংখ্যা ও সময়ের হিসেব মানুষের বেলায় খাটো হলেও সাধনার ক্লেশ ও পেয়ে ছেড়ে দেওয়া, ভোগের এক মুহূর্তের জন্য এক প্রহরের অবসাদে মূল্য দেওয়া আসল হিসেবে খাটো নয়। এ হিসেব ঠিক না থাকলে দেহের মানুষটা যত আস্ফালনই করুক, ভিতরের মানুষটা বাড়ে না। ত্যাগ ও ক্ষয় হচ্ছে ওর ভোজ্য ও পানীয়। এ দুয়ের অভাবে ও শুকিয়ে মরে।'

একটু থেমে সুলক্ষণা বলল, 'আমার সহজ প্রশ্নের একটা সহজ জবাব দাও। তোমাদের যে-কেউ যে-কোনো একটা দিন-রাতের হিসেব দাও। বলো কী করে কেটেছে।'

বল্লভ রায় বললেন, 'হিসেব সহজ। উপভোগে সম্ভোগে আনন্দে উল্লাসে দিন কেটেছে। তোমার প্রসাদে কিছু দিতে হয়নি, ছাড়তে হয়নি। জরাই বলো অবসাদই বলো কোনো মূল্যই দিইনি। সাধারণ অসংখ্য মানুষের জীর্ণ জগৎটার দিকে তাকিয়ে মন ধিক্কারে ভরে গিয়েছে। যারা বাঁচতে গিয়ে প্রতিমুহূর্তে মরছে তাদের জন্য চিন্তা করতে গিয়ে লজ্জা পেয়েছি।'

সুলক্ষণার চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল। তারপর হতাশ কণ্ঠে বলল, 'ওরা, যাদের অসহায় ভেবে লজ্জা পেয়েছি, ধিক্কার দিয়েছি, জীবনের সহজ নিয়মে ওরা ক্ষয়ে অবসাদে ক্লেশে ষোলো আনা মূল্য দিয়েছে। কড়াক্রান্তি ফাঁকি দেয়নি। ওদের ভিতরের মানুষ রসে ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে। আমরা ভিতরে না জেনে না বুঝে মরীচিকার মোহে শূন্য হতে হতে নিঃস্ব হয়েছি।'

বল্লভ রায় বললেন, 'তুমি কি অসুস্থ? তুমি আজ কোন্ সুরে কী কথা বলছ?'

সুদর্শন থামাতে গেল। পারলো না। মার্জারনয়না উত্তমা রায় সাপের মতো ফণা মেলে উঠে দাঁড়ালো। বলল, 'ভয় দ্যাখাচ্ছো না! বড়রকমের কোনো ত্রুটি সারতে চাইছো? তোমার যৌবনতন্ত্রে নিশ্চয়ই গোঁজামিল ছিল। তাতে ঘুণ ধরেছে। তোমার চুলে পাক ধরেছে। কিমোনোর তলায় গায়ের চামড়ায় জরার ছোঁয়াচ লেগেছে। ধরা পড়বার আগে লুকোতে চাও। আমরা তোমাকে ছাড়বার আগে নিজেই সরে পড়তে চাও।'

সুলক্ষণা উঠে দাঁড়ালো। উত্তমা রায়কে সম্বোধন করে দৃপ্তকণ্ঠে বলল, 'জবাব চাও?' তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সত্য আজ এখানে উপস্থিত। সত্যের কাছে লজ্জা কী? আজ আমি লজ্জাহীনা।' সুলক্ষণা একটানে কিমোনো খুলে উত্তমা রায়কে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। সে অনাবরণের তাণ্ডবে মেতেছে। একে একে বেশবাসমুক্ত হয়ে আদি নারীর প্রথম প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু-হাত ঊর্ধ্বে তুলে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'তোমরা ক জোড়া চোখে দেখবে? যাঁর কোটি কোটি চোখ তিনি দেখুন। আমি এখনও তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী নারী। তবু, সৃষ্টির নিয়মে সাড়া না দিয়ে পারি না। যার তন্ত্র তাকে ফিরিয়ে দেব। হে সৃষ্টির অধীশ্বর! হে ক্ষয়ের অক্ষয়-সম্রাট! তুমি আমাকে দুঃখ দাও, ক্লেশ দাও, জরা দাও, ক্ষয় দাও। মূল্য দাও। আমাকে পথের পাথেয় দাও।'

সুলক্ষণা মুখ ঢেকে ফেলল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে শয়নকক্ষে ঢুকলো।

সন্ধ্যায়, প্রথম রাতে এক-আধ মিনিট অন্তর তার ড্রইংরুমে ও বেডরুমে টেলিফোন বাজলো। নগ্না সুলক্ষণা তার শয্যায় বিনিদ্র নিয়ে পড়ে রইল। বারবার তার বুকে জুড়ে প্রার্থনা ধ্বনিত হল, 'মূল্য নাও। পাথেয় দাও।' একবার তন্দ্রাঘোরে সে বলল, 'লজ্জা? কীসের প্রভু? তোমার সৃষ্টি আমার আবরণ। তুমি যেমন করে মহাকালকে নাও আমাকেও নাও।'

সুলক্ষণা আত্মসম্বরণ করে শয্যা ছেড়ে উঠেছিল। নৈশবাস ও প্রসাধন সেরে যেন-ভূষায় চিরদিনের মতোই পরিপাটি হয়ে লাইব্রেরীতে একখানা বই হাতে বসেছিল। তার দু চোখ বই-এর পাতায় অক্ষর ও বাক্যের জঞ্জাল অতিক্রম করে অতীতে প্রদেশ দূরে চলে গিয়েছিল। সেদিনও সে সন্ধ্যা-রাতে বিশাল লাইব্রেরীতে একা একখানা বই হাতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে সে তখন জীবনের নিষিদ্ধ পথে নানা অভিসারের সুখস্বপ্ন দেখছিল। সেদিন তার প্রার্থনার উত্তরে সে অলৌকিক আশ্বাস পেয়েছিল 'তোমার ভবিষ্যত আমাকে দাও। আমাকে আশ্রয় করো। আমার হাত থেকে ইহলোকের অনন্তযৌবনের বর নাও। ইহলোকের পর যদি অন্যলোক থাকে, তার ভাবনা, তার হিসেব আমার উপর ছেড়ে দাও।'

সুলক্ষণা কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে পরম সভয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কে?'

উত্তর শুনেছিল, 'জানতে চেয়ো না। ঈশ্বরের মতো আমারও বিশ্বাসের প্রয়োজন। বিশ্বাস করো। যেদিন বিশ্বাসে চিড় ধরবে সেদিন জানবে।' চাপা হাসিতে লাইব্রেরী-ঘর ভরে গিয়েছিল। সবিস্ময়ে সুলক্ষণা শুনেছিলো 'সেদিন শুধু জানবে না। স্বয়ংকে আবির্ভূত হবো।'

অস্ফুটস্বরে সুলক্ষণা প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কি তন্ত্রের অধীশ্বর?'

উত্তর শুনেছিল, 'না বলব না। তবে আমার কাছে আকাশের তারা চেও না। পাতালের প্রসাদ চেও। অন্ধকারে কত রস কত ঐশ্বর্য! উপভোগে সম্ভোগে ইহলোকের অক্ষয় থাকার কী বিচিত্র আয়োজন! সব তোমার হাতের মুঠোয় ইচ্ছায় মোড়ে পাবে। তুমি হবে আমার তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী। যে তোমার অনুসরণ করবে তোমার প্রসাদে সেও উপভোগ ও সম্ভোগের উল্লাসে ও আনন্দে ধন্য হবে। তোমাকে কেন্দ্র করে আমার তন্ত্রের এক বিশেষ সম্প্রদায় গড়ে উঠবে। তুমি হবে তাদের বরবাদী দেবী।'

তার পরের ইতিহাস জরা ও ক্ষয় অতিক্রম করার ইতিহাস। ইন্দ্রিয়কাঙ্ক্ষিতার্থ করার, নিরলস অবসাদহীন প্রজ্ঞানের কাহিনী। কিন্তু হৃদয়ে মনে আত্মায় কোথাও যেন কিছু জমা পড়ল না। এ যেন সুখ ও বিলাসের আকাশে বিদ্যুত ঝলক পড়ল।

দেহে ক্লান্তি ও অবসাদ নেই। কিন্তু আত্মা, যে সবকিছু চায়, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কী অপরিসীম গ্লানি ও ক্লান্তির কথা বলে। কী ভয়ঙ্কর তার নালিশ!

সুলক্ষণার বুক হতাশায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। দুটো টেলিফোন সমানে বেজে চলেছে। সুলক্ষণা বইটা টেবিলে রেখে দুটো টেলিফোনেরই রিসিভার তুলে রেখে দিল। যথারীতি ডাইনিংরুমে গিয়ে তার মানসিক অবস্থায় যতটুকু মুখে দেওয়া সম্ভব দিল। তারপর সে শয়নকক্ষে এসে আলো নিভিয়ে দিয়ে শয্যা আঁকড়ে শুয়ে পড়ল। এ যেন শয্যা নয়। মাটি। মানুষের আদিজননী। সুলক্ষণার ক্লান্ত জর্জর মন বলল, 'কেউ যদি না নেয়, তুমি আমাকে নাও। তোমার কোথাও আমাকে আশ্রয় দাও।' রামায়ণের আলোর সীতা একদিন অভিমানের চরম মুহূর্তে পাতালে আশ্রয় পেয়েছিলেন। অন্ধকারের সীতা সুলক্ষণা আজ আকাশে না পাতালে, কোথায় আশ্রয় পায়!

বার বার সন্ধ্যারাতের লাইব্রেরীর সেই ঘটনা অনেক দূর থেকে দেখা অতিপ্রাচীন একটা চিত্রপটের মতো তার মানসচক্ষের সম্মুখে ফুটে ওঠে। তার বর্তমান অতীতের ঐ ঘটনার অলংকৃত বিবর্তন। বিশাল লাইব্রেরীর একপ্রান্তে নির্জনে একটা টেবিলে বসে যে বিশেষ মুহূর্তে ঘটনার উপক্রম তার অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে যদি কোনো উপায়ে ফিরে যাওয়া যায়, তাহলে ঈশ্বরের পৃথিবীর সুলক্ষণাকে তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী সুলক্ষণা একবার দু-চোখ ভরে দেখে নিয়ে চিনতে পারে। তাকে দু হাতে 'তুমি আমার। তোমার ক্ষয়ক্ষতি অক্ষমতা নিয়ে ঈশ্বরের হাতে গড়া পুতুল সুলক্ষণা তুমি আমার। বলে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলতে পারে। আলো ও অন্ধকারের স্বাদ একসঙ্গে পেতে পারে। একই সঙ্গে ঈশ্বরকে ও তন্ত্রের অধীশ্বরকে দেখতে পারে। তারপর সে যাঁর, তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে।

সে কার? রুদ্ধস্বরে শয্যায় অন্ধকারে সুলক্ষণা নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেকে না অদৃষ্টকে, 'বলো। বলো। আমি কার? হে আকাশ! হে পাতাল! হে আলো! হে অন্ধকার! তোমাদের যে-পরম সত্য তার মুখে শুনে আমাকে আজ সত্য করে বলো আমি কার!'

ভিতরে কে বলতে চায় 'জন্মে মৃত্যুতে সুখে দুঃখে যৌবনে বার্ধক্যে তুমি আমার! আমিও তোমার!' কিন্তু এ কথা হয়তো তার মনগড়া আপন কথা। আত্মছলনা। কারণ তার মানসচক্ষের সম্মুখে লাইব্রেরীঘরের প্রাচীন পটে যেন ঝড়ের হাওয়া লাগে। রুদ্ধশ্বাসে আহত ঝটিকার মতো কে নিঃশব্দে নির্ঘোষে বলে, কে তোমাকে অসার কথায় ভোলাতে চায়! তুমি আমার। তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী! তুমি আমার!

সুলক্ষণা স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর সে আবার শোনে, 'তুমি আমার।' কথা যেন আর দূরে থেকে আসে না। কানের পাশে বাজে। অন্ধকারের জপমন্ত্রের মতো। স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়।

সুলক্ষণা উঠে বসে। 'এই মুহূর্তে চলে এসো। তোমার মাতুলের লাইব্রেরী ঘরে। তোমাকে বোঝাবো। তোমার সংশয় সন্দেহ চূর্ণ করব। তোমাকে নতুন করে মন্ত্র দেব। কঠোর সংকল্পে তোমার মন বাঁধবো। বিলম্ব কোরো না। শীঘ্র এসো। আমি অপেক্ষায় আছি। আমার অনেক কাজ।'

সুলক্ষণা এক মুহূর্ত চিন্তা করে। তারপর নিজেকে বলে 'চলো। আজ বোঝাপড়া হয়ে যাক। মৃত্যুতে যার ভয় নেই। কোন ভয়ে তার ভয়?'

মাতুলের মৃত্যুতে কিছুকাল পরই সুলক্ষণা সেকালের বিশাল বাড়িটা এস্টে-

প্রকাশিত হলো

এ-বছরের মতিলাল পুরস্কারে সম্মানিত লেখক

সতীকান্ত গুহের

বিস্ময়কর নবতম অবদান

উপন্যাস

নাট্যকার ৭·০০ কথোপকথন ৫·০০

গল্পসংকলন

সর্পনর ও অন্যান্য গল্প ১০·০০

বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড

৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯

টের অফিস ও গেস্ট হাউস হিসেবে ব্যবহারের জন্য রেখে হালফ্যাসানের একটি বিরাট সুরম্য ফ্ল্যাটে এসে উঠেছিল। আজ বহু বছর পর সুলক্ষণা সেই প্রাচীন অট্টালিকার পথে পা বাড়ালো। মাঝরাতের এক আধ ঘন্টা পর কিছুক্ষণ সদাজাগ্রতা কলকাতা মহানগরীও খানিকটা ঘুমোয়। এ সেই নির্জন নীরব প্রহর। পথচারী নিজের পায়ের শব্দে চমকে ওঠে। নিজেকে অন্য কেউ কল্পনা করে শঙ্কিত হয়।

সুলক্ষণা একা পথ হাঁটে। এ যেন অনেক অনেক দিন আগে তার জন্মের পূর্বেই ঠিক হয়ে ছিল, একদিন মাঝরাতের একদন্ড দুদন্ড পর সে তার জীবনের এক অবিশ্বাস্য অভিসারে বার হবে।

সুলক্ষণা যখন মাতুলের লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলো তখন চার্চের ঘড়িতে সশব্দে দুটো বাজলো। সবই আগে থেকে ঠিক করে রাখা। সাজানো অধ্যায়। না হলে ফটকে রাতের জমাদার তাকে দেখেও দেখল না। লাইব্রেরীঘরের মাঝের দরজাটাও সময় মতো খোলা ছিল।

অন্ধকারভেদী দৃষ্টি তাকে কে দিল? সুলক্ষণা বিস্মিত হল না। এমন হবে সে জানতো। সে অদৃশ্য আলোয় পথ দেখছে। দৃঢ় পদক্ষেপে সে লাইব্রেরীঘরে ঢুকলো। তাকে আজ কোনো কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সে জানে কোন দিকে যেতে হবে।

'যে চেয়ারে সেদিন বসেছিলে বোসো।' সুলক্ষণা শুনলো। কার সাধ্য এ আদেশ অমান্য করে! তবু বসতে বসতে সুলক্ষণা বলল 'তুমি! তুমিও বোসো।'

লাইব্রেরী ঘর কার দীর্ঘশ্বাসে ভরে গেল। গভীর গম্ভীর স্বরে কে বলল, 'সুলক্ষণা। আমি যদি মানুষ হতাম তোমাকে আমার জীবনের নায়িকা করতাম। যাকে আমি ঈর্ষা করি, যে আমার মহাশত্রু তাকে ত্রিভুবন 'তুমি' বলে। আর আমাকে? আমাকে ভয় করে। আমার কাছে হাত পেতে তন্ত্র ভিক্ষা করে। কাজ ফুরোলে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার তাকেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করে। সুলক্ষণা! আমার আকাঙ্ক্ষার ও অহংকরের শেষ নেই। দুঃখেরও সীমা নেই। কেউ মনে প্রাণে আমার হলনা। এ পৃথিবী ঈশ্বরের পৃথিবী থেকে গেল। দুঃখে ক্লেশে লাঞ্ছনায় এ পৃথিবী আজও তার। আমি তন্ত্রের জোরে অসাধ্য সাধন করি, সৃষ্টির নিয়মকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাই জলে আগুন লাগাই শূন্যের বুক থেকে সাতমহলা প্রাসাদ বের করে আনি, জরায় যৌবনের জোয়ার নিয়ে আসি। আমার কীর্তিতে মানুষের শুধু তাক লাগে। বিশ্বাস করে বুকে স্থান দেয় না।' সে শুধু অপেক্ষা করে থাকে একটা প্রশ্ন শোনার জন্য 'তুমি কি প্রস্তুত?'

সুলক্ষণা বলল, 'বহু প্রতীক্ষার পর ঐ প্রথম আমিও শুনেছি আরো কঠোর ভাষায়—'তুমি এখনও প্রস্তুত নও। প্রস্তুত হতে তোমার এখনও অনেক দেরী।' তবু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি— আমাকে তোমার জীবনের নায়িকা করতে? কেন করতে?'

সুলক্ষণা শুনলো, 'তোমার মুখের ঐ তুমি সম্বোধনের জন্য।'

সুলক্ষণা সভয়ে বলল 'কিন্তু কী আশ্চর্য না বলে পারলো না। আঘাত দিচ্ছে জেনেও না বলে পারলো না। বলল, 'তোমাকে ও ভাবে তুমি বলার অভিপ্রায় ছিল না। হঠাৎ বলেছি। ক্ষমা কোরো।'

'না। না। ক্ষমা চেয়ো না। আমি তোমাকে অনন্ত যৌবন দিয়েছি। অনেক দিয়েছি। আরো অনেক দেব। আমার তন্ত্রের ভান্ডার উজাড় করে দেব। ঐ সম্বোধন ফিরিয়ে নিয়ো না। ক্ষমা চেয়ো না।'

সুলক্ষণা বলল, 'বলো তুমি কী চাও?'

'আমার পথ ছেড়োনা। মন শক্ত করে আমার তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে থাকো। সন্দেহের বীজ বুনো না। যে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তাকে শক্ত মুঠোয় ধরে রাখো।

সুলক্ষণা বলল, তোমার তন্ত্রে কল্যাণ নেই।'

এবার অদৃশ্য পুরুষের কণ্ঠ কঠোর হল। সুলক্ষণা শুনলো 'কল্যাণ? কল্যাণ বলতে কী বোঝো?'

সুলক্ষণা বলল যার শুরু নেই শেষ নেই, যাকে বাদ দিয়ে কেউ নেই তার কাছে যে-পথে আসাযাওয়া চলে সে-পথই হচ্ছে কল্যাণের পথ। যে-মন্ত্রে সুখে দুঃখে বর্থতায় তাঁকে স্মরণ করে মহাশরণের নির্ভর আনন্দ পাওয়া যায় সে-ই হচ্ছে কল্যাণের মন্ত্র। আমি সেই পথে সেই মন্ত্রে কল্যাণ চাই।'

গভীর গম্ভীর স্বরে উত্তর এল, 'যদি একান্ত চাও পরে চেয়ো। এখনও চাওয়ার সময় নয়। ভোগের চূড়োয় এখনও পৌঁছওনি। দুর্লভ অভিজ্ঞতার শিখরে উঠে পরে একদিন পৃথিবীর পথে নেমে এসো। বাধা দেবো না। তুমি আরো কিছুকাল আমার তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে থাকো। আমার উপাসক উপাসিকাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হোক। দলে দলে তারা পৃথিবীর শহরে পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ুক।'

সুলক্ষণা বলল, 'তাতে তোমার লাভ!'

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর হল 'লাভ! চূড়ান্ত লাভ।' নিজেকে প্রমাণ করার তৃপ্তি শ্লাঘা অভিমান।'

সুলক্ষণা বলল 'মানুষের আত্মাকে খাটো করে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার চটকে চোখ ধাঁধিয়ে অসাধ্য সাধনের সস্তা প্রমাণ।'

সুলক্ষণা সদর্প উত্তর শুনলো 'তোমার মুখে এ বিদ্রূপ শোভা পায় না। মানুষ যা পারে না আমি পারি।'

সুলক্ষণা বলল, 'পারো। কিন্তু কতকাল পারো? কতদিন যৌবনকে ধরে রাখতে পারো!'

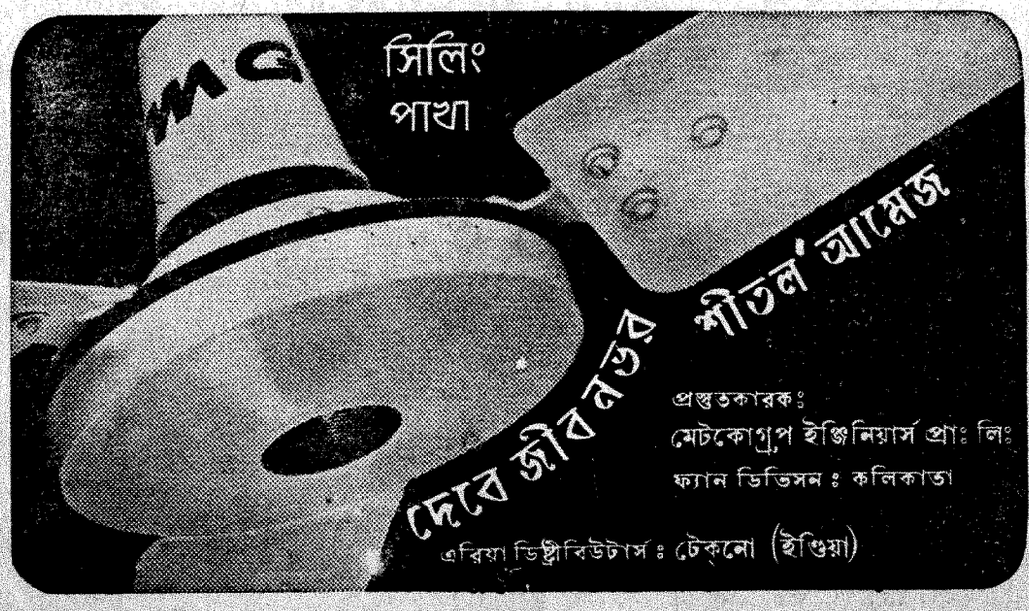

উত্তর শুনলো 'যে যতদিন বাঁচবে ততদিন। প্রয়োজন হলে ততদিন।'

সুলক্ষণা জিজ্ঞাসা করল, 'তার একদিন বেশী নয় ?'

লাইব্রেরীঘরে অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল। সুলক্ষণা উৎকর্ণ হয়ে উত্তরের অপেক্ষায় রইল।

রুদ্ধকণ্ঠে সে বলল 'মানুষের আয়ুতে আমার হাত নেই। কিন্তু আয়ুকে আমি রঙে রসে অকল্পিত রূপ দিই। সমৃদ্ধ করি। এ কি কম লাভ ?'

সুলক্ষণা বলল, 'কিন্তু তারপর ? শেষনিঃশ্বাস বার হয়ে দেহ স্তব্ধ হবার পর ?'

উত্তর শুনলো 'ও হিসেবে মানুষের কোন প্রয়োজন ?'

সুলক্ষণা বলল, 'দেহী মানুষের প্রয়োজন নয়। হয়তো ইহলোকের অস্তিত্বেরও প্রয়োজন নয়। কিন্তু যে-আত্মায় মানুষ অক্ষয় সেই আত্মার প্রয়োজন।'

উত্তর শুনলো, 'আত্মার হিসেব ছাড়ো। ইহলোকের হিসেবে এসো।'

সুলক্ষণা বলল 'ইহলোক শুধু ইহলোক নয়। অনন্তলোকের একটা বিশেষ নাম। বিশেষ পরিচয়। আত্মার হিসেব কী করে ছাড়ি!'

আবার কিছুক্ষণ আগের সেই অস্বাভাবিক নীরবতা। রাতের আকাশের মতো সুলক্ষণার বুক কেন কাঁপলো সে বুঝলো না। তার মনে হল কেউ তার দিকে একটা অসহায় হাত বাড়াচ্ছে কিন্তু তাকে ধরতে ছুঁতে পারছে না।

উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় সুলক্ষণা বলল, 'তুমি কোথায় ? কথা বলো।'

সুলক্ষণা হতাশকণ্ঠের উত্তর শুনলো 'আমি কোথায়? মহাশূন্যের মরুভূমিতে। আমার রাজধানীর আলো নিভে গিয়েছে। আমি আহত। তুমি আত্মার প্রসঙ্গ তুলে আমার মর্মে আঘাত করেছ। আমি মুমূর্ষু।'

সুলক্ষণা বিস্ময়ে অবিশ্বাসে আন্দোলিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে ?'

ক্লান্তকণ্ঠের সাহঙ্কার উত্তর শুনলো 'আমি ভোগের শক্তি। উপঈশ্বর। প্রমোদ পৃথিবীর সম্রাট। সৃষ্টির যত শক্তি আছে, তাদের সকলের চেয়ে আমার বেশী জোর। বেশী অহঙ্কার। ঈশ্বরের ছক ধরে নাড়া দেবার দুঃসাহস আর কারো নেই।'

সুলক্ষণা অভিভূত কণ্ঠে বলল 'এত শক্তি এত অহঙ্কার তোমার। আমার হাতও কি ধরতে পারো না !'

বিষণ্ণ ক্লান্ত স্বরে উত্তর এল, 'না পারি না। বারবার আত্মা স্মরণ করে এক আশ্চর্য মুহূর্তে তুমি তাকে সত্য করে তুলেছ। সে তোমার ও আমার মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। তোমার হাত ধরতে চাই। পুরুষ যেমন করে নারীর হাত ধরে তেমনি করে ধরতে চাই। কিন্তু পারি না। আমি শক্তি। সৃষ্টির একটা প্রচণ্ড শক্তি। আমার নিজের সীমা লঙ্ঘন করতে পারি না। তুমি এ মুহূর্তে যেখানে আছো আমার হাত পৌঁছবে না।'

সুলক্ষণা ততক্ষণে বহু বছর পূর্বে লাইব্রেরী ঘরে এই শক্তির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সন্ধ্যায় ফিরে গিয়েছে। এক এক করে সেদিনের সংলাপের প্রতিটি কথা তার মনে পড়ছে। সেদিন সুলক্ষণা তাকে প্রশ্ন করেছিল 'তুমি কে?' উত্তর পেয়েছিল 'জানতে চেয়ো না। ঈশ্বরের মতো আমারও বিশ্বাসের প্রয়োজন। বিশ্বাস করো। যেদিন বিশ্বাসে চিড় ধরবে, জানবে। শুধু জানবে না সেদিন স্বচক্ষে দেখবে। আমি আমার পূর্ণ মহিমায় আবির্ভূত হবো।'

সুলক্ষণা বলল 'তোমার প্রথম দিনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। দেখা দাও। আবির্ভূত হও।

'কেন দেখতে চাও ?' সুলক্ষণা স্পষ্ট শুনলো।

'ইচ্ছে হয়। হয়তো কৌতূহল। হয়তো'—সুলক্ষণা কথা শেষ না করতেই রুদ্ধকণ্ঠের প্রশ্ন শুনলো 'হয়তো ! হয়তো কী ?'

সুলক্ষণা বলল, 'আগে দেখা দাও। পরে প্রশ্নের জবাব পাবে।'

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস। তারপর এক অলৌকিক সংঘটন। কোথায় লাইব্রেরী-ঘর! কোথায় নিশীথের মহানগরী! অনন্ত আকাশের তলায় সে পৃথিবীর মানচিত্রের কোন মহাদেশের কোন মহাপ্রান্তরে ? দূরে বহুদূরে অন্ধকারের পটে এ কার আবির্ভাব ! কোটি রতের অন্ধকার তিলে তিলে জমিয়ে এই অতিকায় অশ্ব কে নিপুণ হাতে গড়েছে ? তাতে প্রাণসঞ্চার করেছে ! তার পিঠে আরোহীর আসনে সম্রাটের মহিমায় বসে কে তাকে নিরীক্ষণ করছে? তার দুটি চক্ষু দুটি নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল। তার মুখে অপরিসীম ক্লান্তি ও হতাশা। কিন্তু দম্ভে কঠোর। কত উঁচুতে তার মাথা। দেখতে গিয়ে চোখে শ্রান্তি আসে। কিন্তু তার দম্ভ ? ঐ দম্ভের কথাই বারবার সুলক্ষণা বিস্ময়ে চিন্তা করে। তার দম্ভ যেন তার মাথার মুকুট ছাপিয়ে আকাশে হাত দিতে চায়।

গভীর গম্ভীর স্বরে সে বলল 'এবার বলো হয়তো কী ?'

সুলক্ষণা বলল, 'হয়তো ভালো লাগাতে চাই।'

সে প্রশ্ন করল, 'কাকে ?'

সুলক্ষণা বলল, 'তোমাকে।'

সুগভীর বিষাদে সে বলল, 'তার আর উপায় নেই।'

সুলক্ষণা বলল, 'কেন ? উপায় নেই কেন বলছ ?'

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা

ও

রসমধুর কাহিনী সমারোহ। দাম : সাত টাকা।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সে এবার তার দুটি উজ্জ্বল চোখে সুলক্ষণাকে দেখতে দেখতে বলল 'সুলক্ষণা। সৃষ্টি অনন্ত নয়। তার সুরু ও শেষ। দুই-ই আছে। এক সৃষ্টি যায়, আর এক সৃষ্টি আসে। আমি সৃষ্টির একটা প্রচণ্ড শক্তি। সব শক্তির মতো আমিও উপঈশ্বর। ভোগ ও যৌবনের বিধাতা। কিন্তু অনন্তের বিধাতা নই। সৃষ্টি শেষ হলে আমিও ফুরোই।'

সুলক্ষণা সতৃষ্ণ নয়নে তাকে দেখতে দেখতে বলল, তাতে কি! মানুষের জীবন তোমার আয়ুর তুলনায় একটা ফুৎকার। জ্বলতে না জ্বলতেই নেভে।'

সে বিষণ্ণ হেসে বলল 'সমস্যা এই কোনো কোনো মানুষ, যে আমাকে কামনা না করে ঈশ্বরকে চায়, সে অনন্তের ধ্যান বুকে নিয়ে নেভে। অর্থাৎ নেভে না। ইহকালে নিভে অনন্তকালে জ্বলে।'

সুলক্ষণা বলল তোমাকে ও ঈশ্বরকে কি একসঙ্গে কামনা করা চলে না?'

সে উত্তর দিল, 'না জেনে বুঝে করা চলে। জানবার বুঝবার পর একজনকে বেছে নিতে হয়।'

সুলক্ষণার ভিতর কে চোখ মেলছে, কে তাকে সতর্ক করতে চাইছে। সুলক্ষণা তার দিক থেকে চোখ ও কান ফিরিয়ে নিয়ে বলতে চেষ্টা করে, তার কণ্ঠ ক্ষীণ শোনায়, তার কথা তার জিভে জমে যায়।

সুলক্ষণা শোনে, তোমার ভিতর অনন্ত চোখ মেলেছে। তুমি এখন ঈশ্বরের। যেদিন তোমার ভিতর অনন্তের ক্রিয়া প্রচণ্ড হয়ে উঠবে, আমার দম্ভ ঐশ্বর্যের ও দাপট তোমার কাছে হাস্যকর ঠেকবে। তাছাড়া তোমাকে ধরি ছুঁই সে শক্তি আমার নেই। আমার ও তোমার ভিতর বিশ্বাসের ব্যবধান। তুমি আমাকে এই মুহূর্তে চাও। চোখে জাদু লেগেছে বলে চাও। কিন্তু বিশ্বাস করো বলে আসলে চাও না।'

সুলক্ষণা হতাশ কণ্ঠে বলল, 'এত করে চাই কেন? বিশ্বাস করি বলেই তো চাই।'

সে বলল 'বিশ্বাস নয়, লোভ। লোভে চাও। অনন্তের বিশ্বাস দিয়ে আমাকে আঘাত করেছ। এখন লোভ দিয়ে বাঁধতে চাইছো। তোমাকে এই মুহূর্তে ত্যাগ করছি। জানি না আমার ক্ষত কতদিনে শুকোবে। কিন্তু যতদিন সৃষ্টি আছে আমিও আছি। আমার তন্ত্রও থাকবে। তুমি এতদিন আমার তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী ছিলে। আজ তোমার আসন শূন্য হল। নতুন অধিষ্ঠাত্রীর সন্ধানে বার হতে হবে। সময় নেই। আমি চলি।'

লাইব্রেরীঘরের অন্ধকারে সুলক্ষণা নিজেকে প্রশ্ন করে, 'এ কি স্বপ্ন? না সত্য?' প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরী হয় না। তার দেহে মনে একটা পরিবর্তন সুরু হয়েছে সে বুঝতে পারে। মুখে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারে দেহের মায়াতন্ত্র তাকে ত্যাগ করেছে। জরার রেখা আঙ্গুলের স্পর্শে ধরা দেয়। মনেও যেন অপরাহ্নের ছায়া পড়েছে। যাঁর কানে কথা অনেকদিন পর পৌঁছয় যাঁর চোখে পড়তে গেলে জীবনের ধুলোয় দিনের পর দিন পড়ে থাকতে হয়, সুলক্ষণা তাঁকে সকাতরে ডেকে বলে, 'তোমার বিশ্বাসের আঘাতে আমাকে তন্ত্রহীনা করেছ। এখন হয় আমাকে নাও। নয় আমাকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দাও।'

সুলক্ষণা কি লাইব্রেরীঘরের মেঝেয় সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল? না তাকে কেউ দু-হাতে ধরে শুইয়ে দিল? কে তার কানে কানে বলল 'আজ তুমি প্রস্তুত। প্রস্তুত, তাই ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়াতে হয়নি। আমি এসেছি। এসো। সাদাঘোড়ার জুড়িতে ওঠো।'

যেদিন সুলক্ষণার ফ্ল্যাটে ক্লাবের মিটিং হয়েছিল তারপর থেকে সে নিরুদ্দেশ। তার কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি। ক্লাবও ভেঙে গিয়েছে এবং যৌবন ও উপভোগ তন্ত্রের উপাসক উপাসিকারা সাধারণ মানুষদের দলে ভিড়েছে। উপরে সে রাতের যে অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে তা লেখকের স্বকপোলকল্পিত নয়। উল্লিখিত রাতের সাতদিন পর সুদর্শনের কাছ থেকে লেখকই এই লিখিত বিবরণ পান। সুদর্শনের দাবী, সে ঐ রাতে অলক্ষ্যে সুলক্ষণাকে অনুসরণ করে লাইব্রেরীঘরে গিয়েছিল। সে যা স্বচক্ষে দেখেছে স্বকর্ণে শুনেছে তাই বিবরণে হুবহু লিখেছে। তার বিবরণ একবর্ণও রঞ্জিত নয়। সুদর্শনকে জেরা করতে গিয়েছিলাম। সম্ভব হয়নি। সে মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। তাছাড়া সে মৌন অবলম্বন করেছে। সে চিরকালের জন্য তার সংলাপ শেষ করেছে। তার ব্যাধির ফল এই বিবরণ, না এই বিবরণের আঘাতের ফল তার ব্যাধি, পাঠক-এর উপর এ বিষয়ের বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়াই সংগত বোধ করলাম।

পশ্চিম বাংলার
শ্রী এবং শ্রীমতী রায় বলেনঃ

"আমরা বাপু সানরাইজ ছাড়া অন্য কোন মশলা কিনতে সত্যি করে ভরসা পাইনা। স্বাদের জন্য ছাড়াও স্বাস্থ্যের কথাও তো চিন্তা করতে হবে।"

পটভূমি

রাজনীতিতে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি?

রাজ্যের কংগ্রেসী রাজনীতিতে দলীয় কোন্দল এখন চূড়ান্তে এসে পৌঁছেচে। এটা বলতে গেলে অকস্মাৎই ঘটেছে। আকাশে বেশ কিছুদিন ধরে থমথমে ভাব ছিল। কিন্তু নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের বিষয় নিয়ে বজ্রপাত ঘটে গেলো। রাজ্য কংগ্রেসের কার্যকর কমিটির বৈঠকে সেদিন বাজ পড়েছিল। আকাশের যা অবস্থা, আরো বেশ কয়দিন ভবিষ্যতে বাজ পড়বে। এই বজ্রপাতের ফলে কেউ বা কয়েকজন যে মারা যাবে না তা এক্ষুনি হলফ করে বলা যায় না। মোরারজী ভাই দেশাইয়ের অনশন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাটের আসন্ন নির্বাচনের তারিখ ঠিক করার ব্যাপার নিয়ে দিল্লী যখন হিমসিম খাচ্ছে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এ ব্যাপারে যখন মাথা গলাবার সুযোগ পেয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত লক্ষ্মীকান্ত বসু প্রমুখ চারজন এম এল এ কংগ্রেস ছেড়ে দেবার হুমকী দিলেন। সিদ্ধার্থবাবুর মাথা গুলিয়ে গেল। জগজীবনরাম একটু মুচকে হাসলেন। রাজনীতিবিদদের কথা হচ্ছে বাবুজী (জগজীবনবাবু) মনে মনে বোধহয় বললেন, বাপু দিল্লীর ব্যাপারে অযাচিতভাবে মাথা গলাতে এসেছো। নিজের ঘর সামালোও। মুখ্যমন্ত্রী একদিনেই লক্ষ্মীবাবুকে একাধিকবার দিল্লী থেকে ট্রাংক টেলিফোন করেছিলেন। কিন্তু তার পরেই আবার বিপ্রদ কার্যকরী কমিটির বৈঠকে দক্ষযজ্ঞ।

কিন্তু এ আর কি দক্ষযজ্ঞ; এ তো মাত্র শুরু। ভারতের মানচিত্রে চারিদিকে শুধু অশান্তির ছাপ। মানুষের সমস্যার কোন সমাধানই হলো না; বরং দুর্নীতি জাতির জীবনীশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের কাছ থেকে শুনেছিলাম। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী; তিনি অবসর গ্রহণের পর অন্ধ্র ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকাকালীন রাজ্যপালের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। অতএব তাঁর যথেষ্ট প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। তিনি নিজে দিল্লীর ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর কাছে এক গোপনীয় চিঠি লিখে মধ্যপ্রদেশের সবচেয়ে উঁচু এক ব্যক্তির নামে এক দুই তিন করে অভিযোগ লিখে জানালেন। এবং এটা বলা নিষ্প্রয়োজন সব অভিযোগই দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কিছু হলো না। তাই সাধারণ মানুষ আজ বলতে শুরু করেছেন সরষের মধ্যেই যখন ভূত, তখন হবার কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ নেতা বিজয়সিং নাহার এই রাজ্যে সরষের মধ্য থেকে সেই ভূত হটিয়ে দেবার জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বিজয়বাবুর সত্যি ট্র্যাটেজি কি তা অবশ্য রাজনীতিবিদদের এখনও গবেষণার বিষয় হয়ে রয়েছে। তবে সিদ্ধার্থবাবু এ ব্যাপারে বোধহয় মনে মনে একটা কিছু আঁচ করে ফেলেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেই চিৎকার দিয়েছেন : আমাকে সরাবার জন্য সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র। অতএব অরুণ মৈত্রকে দিয়ে শত্রু ব্যূহে আঘাত করো। অরুণবাবু বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে পার্টির বিরোধী কাজের অভিযোগ এনেছেন। আর বিজয়বাবু সেদিন অ্যাসেমব্লির লবীতে বললেন : দিল্লীতে তিনি কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বরুয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দেবকান্তবাবু তাঁকে বলেছেন আন্দোলন চালিয়ে যান। তা হলে, ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে এটা সাধারণের আর একটা প্রশ্ন।

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশজীর আন্দোলন নিয়েও একই প্রশ্ন : তিনি ব্যাপারটা কি দাঁড় করাচ্ছেন? জে পি কি দুর্নীতি দূর করতে চান, না কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি নিয়ে একটা বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলায় আগ্রহী। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই নেতার আন্দোলন এখন যে রূপ নিতে চলেছে তাতে কিছুটা পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠেছে। এবং তা হচ্ছে ইন্দিরাজীকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। এর জন্য দলমতনির্বিশেষে জয়প্রকাশজী সকলের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত।

লক্ষ্মীকান্ত বসুও দেখছি, প্রস্তুত। তিনি ও তাঁর দলের লোকেরা একটা শো-ডাউন করবেনই। তাঁরও মনে প্রশ্ন : তা হলে প্রিয়বাবু সৌগতবাবুর গোষ্ঠীর লোকেরা তাঁদের কি পার্লামেন্টারী রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন? তা না হলে নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে সরকারী সুপারিশের খসড়ায় এ অবস্থা দাঁড়াল কি করে? বারিদবরণ দাস রথীন তালুকদারের কেন্দ্রই উঠে গেল। রাষ্ট্রমন্ত্রী ফজলে হকের এলাকা তপশীলী এলাকা হলো—কি করে? পেছন থেকে কে ছুরি মারল? বারিদবরণবাবুর কথা হচ্ছে, স্বৈরাচারী শাসকরা যদি সোজা পথ গ্রহণ করতে না চায় তা হলে তারা ঘোরাল পথ ধরেই শত্রুকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। কিন্তু এ তাঁরা সহ্য করবেন না। ফলে রাজ্যের কংগ্রেসী রাজনীতিতে জল ভয়-করভাবে ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। এতদিন ধরে সংগঠনের ভেতরে ওপর ওপর থেকে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল তা এখন মাত্র একটা ঘটনাতেই মূল ধরে নাড়া দিয়েছে। অতএব...

রাজ্য কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নিত্যানন্দ দে তো চূড়ান্তভাবে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনিও নাকি পদত্যাগ করতে চাইছেন। এবার পদত্যাগের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অতএব এ অবস্থায় পার্টির কিসে ভাল হবে, শত্রুপক্ষ কি সুবিধে নেবে তা কারোর মাথায় আসে না। সেদিন রাজ্য বিধানসভায় ও পরবর্তীকালে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকে তার চিহ্ন দেখা গেছে। প্রকাশ্যে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তি দাশগুপ্ত যেভাবে ঘৃণাভরে মুখ্যমন্ত্রীকে তিরস্কৃত করলেন, তার তুলনা মেলে না। পরিষদীয় দলের বৈঠকে যেভাবে এম এল এ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্ত হলেন তারও নজির কোথায়?

অতএব দেখা যাচ্ছে, হৈ-হৈ করে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সামনে গণ্ডগোল বাধিয়ে কংগ্রেসীরা যে মনে করেছিলেন জে পি-কে পশ্চিমবঙ্গ থেকে হটিয়ে দেওয়া গেল, তা ঠিক নয়। জে পি আসুন বা নাই আসুন কংগ্রেসের ক্ষতি এখন ভেতর থেকেই আসবে। এবং এর জন্য এ পক্ষ বা ও পক্ষ পৃথক পৃথকভাবে দায়ী নয়। সকলেই এই অপরাধে অপরাধী।

কৌটিল্য

এই বাংলার খবর

খাদ্যশস্যের ফলন

এ বছর পশ্চিম বাংলায় খাদ্যশস্যের ফলনের মোট পরিমাণ আগের যে-কোনো বছরের তুলনায় ভালো হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আমন ধানের চাষ হয়েছিল প্রায় এক কোটি একর এলাকা জুড়ে। মোট ফলন হবে প্রায় ৪৮ লাখ টন (চালের হিসেবে)। গত বছর হয়েছিল ৪৫ লাখ টনের মতো। বোরো চাষও হয়েছে প্রায় দশ লাখ একর এলাকা জুড়ে। এ পর্যন্ত সরকারি দক্ষতার যে খবর এসেছে তা থেকে মনে হয় বোরোর ফলন হবে ১২ লাখ টনের মতো। বোরো চাষ কীভাবে করতে হয় তা এখন এই বাংলার চাষীরা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করে ফেলেছেন। ঠিক জাতের বীজ আর উপযুক্ত সার দিয়েছেন। বিহারের তেনুঘাট থেকে জল পাওয়ার পর সেচ নিয়ে দুর্ভাবনাও দূর হয়েছে। এদিকে গমের চাষও হয়েছে খুব ভালো। গম চাষের এলাকা আগের তুলনায় বেড়েছে। চাষীরা যত্ন নিয়ে চাষও করেছেন। গমের মোট ফলন দশ লাখ টনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। (উল্লেখযোগ্য, গোটা দেশের মধ্যে একর পিছু গম উৎপাদনের পরিমাণে পশ্চিম বাংলার স্থান দ্বিতীয়। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রাম কিছুদিন আগে বলেছেন, পশ্চিম বাংলায় এখন যেমন গমের চাষ হচ্ছে তাতে ঐ রাজ্যের কোনো কোনো এলাকায় গেলে মনে হয় যেন লুধিয়ানায় গেছি!) এই বছর আলুও ফলেছে বিস্তর—বারো লাখ টনের মতো। আগে আর কখনও এত আলু ফলে নি। সাধারণত বছরে সাত-আট লাখ টনের মতোই ফলে। আলুর দাম পড়ে গেছে। তাতে চাষীরা কিছুটা উদ্বিগ্ন। হিমঘরে বোঝাই আলু, তবুও চাষীদের হাতে বাজারে ছাড়ার মতো আলু রয়েছে যথেষ্ট। এ বছর আউশ ধানের চাষ হবে প্রায় ২৫ লাখ একর এলাকা জুড়ে। ফলন ন' লাখ টনের কাছাকাছি হতে পারে। সব মিলিয়ে কৃষি দফতরের অনুমান খাদ্যশস্যের মোট ফলনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯০ লাখ টনের মতো। আগে কোনো বছরই মোট ফলনের পরিমাণ এত উঁচুতে ওঠে নি।

কিন্তু অঢেল ফলন হলে কী হবে, ধান-চাল সংগ্রহ আশানুরূপ হয় নি। তার একটা কারণ, অনেক লেভির নোটিশের বিরুদ্ধে চাষীরা মামলা করেছেন। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ জানিয়েছেন, ৩৭৯২ জন চাষী লেভি ধার্যের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালত থেকে ইঞ্জাংশন পেয়েছেন। সোয়া দু' লাখের বেশি চাষীর ওপর লেভির নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সংগ্রহ হওয়ার কথা সোয়া দু' লাখ টনের (চাল) কাছাকাছি। হয়েছে মাত্র ৭২ হাজার টন।

নির্বাচনী সীমানা

লোকসভার পরবর্তী নির্বাচনে পশ্চিম বাংলা থেকে নির্বাচিত হবেন আগের তুলনায় দু'জন বেশি সদস্য—চল্লিশের জায়গায় বিয়াল্লিশ। রাজ্য বিধানসভার আসন সংখ্যাও বাড়বে—২৮০ থেকে বেড়ে হবে ২৯৪। নির্বাচনী কেন্দ্র সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশন এই সব সুপারিশ করেছেন। প্রতি দশ বছরে একবার দেশে লোকগণনা হয়। সেই লোকগণনার হিসেবের ভিত্তিতে নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস করতে হয়। চলতি [illegible] ফেব্রুয়ারী-মার্চে লোকসভার আচমকা নির্বাচন হতে পারে বলে যখন কথা উঠেছিল, তখন প্রশ্ন ওঠে, এই সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ ঐ সময়ের মধ্যে শেষ হবে কী করে? কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অনেক জেলাতেই বিধানসভার আসন সংখ্যা একটি বা দুটি বেড়েছে। তবে ২৪ পরগণায় বেড়েছে সবচেয়ে বেশি—ছ'টি। কিন্তু বিধানসভার আসনের সংখ্যা ২৩ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ২১টি। এই সিদ্ধান্ত অবশ্য চূড়ান্ত নয়। কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে মে মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত আপত্তি জানানো যাবে। জুলাই নাগাদ নির্বাচন কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে।

কিন্তু কলকাতার আসন সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাবে কংগ্রেস দলের মধ্যে দেখা দিয়েছে সঙ্কট। যে দুটি কেন্দ্র তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে সে দুটি হলো কালীঘাট আর শ্যামপুকুর। রথীন তালুকদার আর বারিদবরণ দাস ঐ দুটি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৭২ সালে। এখন শ্রীদাস এবং বিধানসভার আরো তিনজন সদস্য, লক্ষ্মীকান্ত বসু, সোমেন মিত্র ও পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন যে, যেভাবে সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে তার প্রতিবাদে তাঁরা কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেবেন। তাঁদের মতে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই এইভাবে সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। যে-সব আসনে গতবার সি পি আই-বিরোধী কংগ্রেসীরা জয়ী হয়েছিলেন সেই সব আসন হয় তুলে দেওয়া হয়েছে, অথবা ওলোটপালট করা হয়েছে। তাঁরা এজন্যে সংসদ সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীকে দায়ী করেন। প্রিয়বাবু ছিলেন কমিশনের একজন সহযোগী সদস্য। ১৩ এপ্রিল প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসমিতির সভায় এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়। সভা একরকম পণ্ডই হয়ে যায়। যে-সব বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল (খাদ্য সমস্যা, সরকারি কর্মসূচী রূপায়ণ) সে-সব বিষয়ে কোনো আলোচনাই হতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত একটি আপস প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে বলা হয়, কলকাতার ২৩টি আসনই যাতে বজায় থাকে এবং অন্যান্য কেন্দ্রেও বড় রকমের রদবদল না-হয় তার জন্যে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কমিশনের কাছে আবেদন জানাবে।

হরিজন নিগ্রহ

পুরুলিয়ার এক গ্রামে পুলিশ দু'জন হরিজন মেয়েকে উলঙ্গ করে বেত মেরেছে, কংগ্রেস সদস্য সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ করলে এপ্রিলের দশ তারিখে রাজ্য বিধানসভায় রীতিমতো ঝড় বয়ে যায়। এই অভিযোগের সূত্র ধরে এমন হৈ-হট্টগোল হয় যে বিধানসভার চলতি অধিবেশনে তার কোনো নজির নেই। সুকুমারবাবুর মুখে এই অভিযোগ শোনার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও বিরোধী সদস্যেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার দু'জন সাব-ইন্সপেকটর বড়বাগান নামে এক গ্রামের দু'জন বাউড়ি মেয়ের কাছে গিয়ে কুপ্রস্তাব করেন। তারা ঐ প্রস্তাবে রাজি না-হওয়ায় ঐ দুই পুলিশ কর্মচারী চটে যান। ঐ বাড়ির একজন পুরুষকে তাঁরা এক সাজানো চুরির ঘটনায় জড়িয়ে দেন। এই অভিযোগের তল্লাসি করতে যাচ্ছেন বলে তাঁরা এপ্রিলের সাত তারিখে ঐ বাউড়ি মেয়েদের বাড়িতে চড়াও হন। পুরুষ মানুষটিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মেয়েদের উলঙ্গ করে লাগানো হয় বেত। একটি শিশুকেও লাথি মারা হয়। এই

কাহিনী শোনার পরই সদস্যেরা এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে চান। স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মোতাহের হোসেন এ-ব্যাপারে কিছু বলতে চাইলে তাঁর কথা শুনতে সদস্যেরা মোটেই রাজি হন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি অবশ্য কথা বলার সুযোগ পান এবং জানান যে, ব্যাপারটি গুরুতর, এ-বিষয়ে পরদিন তিনি সব কিছু জানাবেন। কিন্তু সদস্যেরা এখনই ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রী এরপর সভায় আসেন। তিনি জানান, সুকুমারবাবু তাঁর অনুমোদন নিয়েই বিষয়টি তুলেছেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে এত চেঁচামেচির কী আছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে। তবে সংশ্লিষ্ট দুই পুলিশ কর্মচারীকে এখনই সাসপেন্ড করা হবে কিনা তা তিনি বলতে পারছেন না। কাশীকান্ত মৈত্র আর কৃষ্ণকুমার শুক্লা ছাড়া আর কেউই তাঁর এই কথায় আপত্তি করেন নি। তাই তাঁর মনে হচ্ছে, ঐ দুজন ছাড়া আর সকলেরই তাঁর ওপর আস্থা আছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথায় কাশী-বাবু রীতিমতো চটে যান এবং বলেন আস্থা-অনাস্থার কোনো কথাই এখানে উঠছে না। এখানে উঠছে সদস্যদের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন। পুরুলিয়া থেকে নির্বাচিত দুর্গাদাস বাউড়ি পুলিশী হামলার ভয়ে হরিজন নিগ্রহের কাহিনীটি সভায় তুলতে পর্যন্ত পারেন নি, সুকুমারবাবুকে দিয়ে তুলিয়েছেন। স্পীকার অবশ্য জানান যে দুর্গাদাসবাবু তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, সুকুমারবাবু ভালো বক্তা তাই তিনি বিষয়টি তাঁকে দিয়েই তোলাতে চেয়েছেন।

ঐ দিন বিধানসভায় কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যের আচরণ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে পরদিন কংগ্রেস পরিষদীয় দলের এক সভা ডাকা হয়। সভায় কোনো সদস্যকে নিন্দা করে কোনো প্রস্তাব অবশ্য গৃহীত হয় নি। কৃষ্ণকুমার শুক্লা তাঁর উক্তির (স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রীর পদত্যাগ চাই) জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তিনি ডঃ মোতাহের হোসেনেরই পদত্যাগ দাবি করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নয়। কাশীবাবু কিন্তু কোনোরকম দুঃখ প্রকাশ করেন নি।

মন্দার ছায়া ?

কিছু কিছু শিল্পপতি যেভাবে তাঁদের কারখানা বন্ধ করে দেওয়া অথবা কাজকর্ম একরকম বন্ধ রাখার চেষ্টা করছেন তাতে রাজ্য সরকার রীতিমতো উদ্বিগ্ন। তাঁরা বন্ধের নোটিশও জারি করছেন না, ফলে সরকার কোনো ব্যবস্থাও নিতে পারছেন না। তাঁরা মুখে মন্দার কথা বলে কারখানা বন্ধ করতে চাইছেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁরা অনেকে এই রাজ্য থেকে পাওয়া মুনাফার টাকায় অন্য রাজ্যে কল-কারখানা বসাতে চাইছেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তাঁরা মোটা মুনাফা করেছেন, আর এখন সামান্য অজুহাতে কারখানা বন্ধ করে দিতে চাইছেন। এইভাবে নিজেদের পরিচালনার অযোগ্যতা ঢাকা দেওয়ারই চেষ্টা করছেন তাঁরা। কিন্তু শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপালদাস নাগ জানিয়েছেন, মন্দার অজুহাতে যাঁরা কারখানা বন্ধ করতে চাইছেন সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবেন। দরকার হলে ভারতরক্ষা বিধি অথবা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিনি এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গেও কথা বলবেন। তিনি প্রসঙ্গত খড়দহের (২৪ পরগণা) একটি চটকলের কথা উল্লেখ করেন। ঐ কলে কাজ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ কারখানার মালিকেরাই জয়পুরে এবং উত্তর ভারতের অপর দুটি শহরে তিনটি কারখানা বসিয়েছেন। এই ধরনের কল-কারখানার মালিকেরাও এখন মন্দার অজুহাত দিচ্ছেন। কাপড়ের কলের মালিকেরাও বলছেন এই ধরনের কথা, যদিও গত বছর তারা প্রত্যেকেই অন্তত দু' কোটি টাকা লাভ করেছেন। এইভাবে কারখানা বন্ধ করার চেষ্টা হলে শ্রমিক ছাঁটাই হবে অনেক। সরকারের উদ্বেগের প্রধান কারণ সেটাই। এ ব্যাপারে কী করা যায় তা সরকার ভেবে দেখছেন। একটি মাত্র কারখানাই এ-পর্যন্ত ক্লোজার নোটিশ দিয়েছে। কিন্তু অন্য সব কারখানার ভেতরে কী হচ্ছে তা জানার উপায় নেই। মেসিনপত্র বেচে দেওয়া হচ্ছে কিনা তাই বা কে জানে? (১৪।৪।৭৫) দেবদত্ত

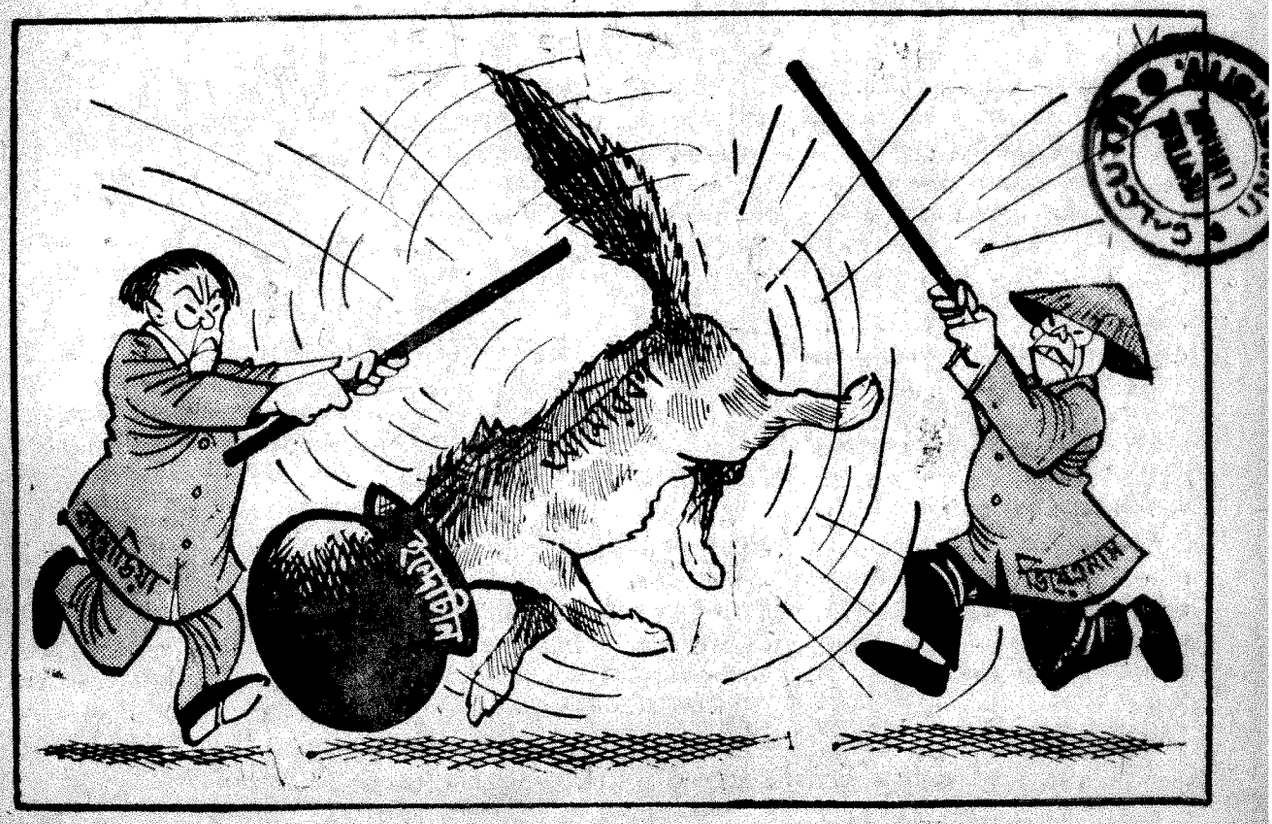

দেশে বিদেশে

মোরারজীর অনশন

"গণতান্ত্রিক অধিকার" আদায়ের জন্য অশীতিপর প্রবীণ নেতা মোরারজী দেশাই যখন দিল্লীতে অনশন করছিলেন ঠিক তখনই সিকিমের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষিত করার জন্য সেখানকার বিধানসভা চোগিয়ালের পদ লুপ্ত করে সিকিমকে একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, ঘটনার যোগাযোগ হিসাবে এটা লক্ষণীয়। এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে দেখা গেল, ভিতর থেকে ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর যতই চাপ পড়ুক না কেন, এই গণতন্ত্রের কিছু আকর্ষণশক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে।

মোরারজী প্রধান যে দাবীতে অনশন করছিলেন সেটা হল, আগামী বর্ষার আগেই গুজরাট বিধানসভায় নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচন সেপ্টেম্বর মাসের আগে করা সম্ভব নয়, এটাই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত। তাঁদের যুক্তি হল, গুজরাটে, বিশেষ করে কচ্ছ ও কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে এখন নিদারুণ খরা চলছে। এ সময় নির্বাচন হলে যেসব সরকারি কর্মচারী এখন খরাত্রাণের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের নির্বাচনের কাজে লাগাতে হবে এবং তার ফলে খরাত্রাণের কাজ ব্যাহত হবে। তাছাড়া, এ সময়ে নির্বাচন হলে যাঁরা দুর্গত এলাকা থেকে সরে এসেছেন তাঁরা ভোটদানে বঞ্চিত হবেন।

বিরোধী দলগুলি এই সরকারি যুক্তির জবাবে বলেছে, সরকারি কর্মচারীদের বদলে নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীরাই বরং আরও ভালভাবে ত্রাণের কাজ চালাতে পারবেন। তাদের ধারণা, এই সময়ে ভোট হলে কংগ্রেস হেরে যাবে, এই ভয়েই খরাকে একটা ছুতো হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তা না হলে এতদিন গুজরাটের খরা নিয়ে কোনরকম উচ্চবাচ্য না করে হঠাৎ এ ব্যাপারে এতখানি সোরগোল তোলা হচ্ছে কেন?

বিরোধী দলগুলির পাল্টা যুক্তির সামনে না হলেও, মোরারজী দেশাইয়ের অনশনের ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তার সামনে, অবশেষে ভারত সরকার নতি স্বীকার করেছেন। ৭ জুনের কাছাকাছি কোন সময়ে গুজরাটে নির্বাচন হবে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে লিখিতভাবে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর ৭৯ বছর বয়স্ক মোরারজী দেশাই তাঁর সপ্তাহব্যাপী অনশন ভঙ্গ করেছেন।

মোরারজীর সঙ্গে এভাবে মীমাংসায় এসে শ্রীমতী গান্ধী একটা নিদারুণ উৎকণ্ঠা থেকে সারা দেশকে রক্ষা করেছেন। আগের দিন পর্যন্তও দুই নেতার মধ্যে কোন মীমাংসা সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছিল না। কেননা, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নির্বাচনকেন্দ্র রায়বেরিলিতে এক জনসভায় খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, সরকার কোনরকম চাপ স্বীকার করে নেবেন না। গুজরাট বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যও যে মোরারজী দেশাই অনশন করেছিলেন, সে কথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি জানতেন যে বিধানসভা ভেঙ্গে দিলে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না, তবু তিনি ঐ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী যখন এভাবে তাঁর নিজের মত আঁকড়ে ধরে ছিলেন তখন অনশনরত মোরারজী দেশাইয়ের স্বাস্থ্য দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তাঁর ওজন কমে যাচ্ছিল এবং কিডনির কাজ ঠিক না হওয়ায় তাঁর প্রস্রাবে অ্যাসেটোন দেখা দিচ্ছিল। অবিলম্বে তাঁকে অনশন ভঙ্গ করতে রাজি করাতে না পারলে এই প্রবীণ নেতাকে তাঁর জীবন হারাতে হতে পারে, এটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। এই অবস্থায় কংগ্রেস সহ বিভিন্ন দলের মানুষেরা স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ একটি বিবৃতি দিয়ে সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, এই অনশনের ফলে মোরারজী দেশাই-এর যদি বিপদ ঘটে তাহলে সারা দেশে গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দেবে এবং সেই পরিস্থিতি সামলান কঠিন হয়ে উঠবে। রবিবার সংসদের প্রায় ৬০ জন সদস্য মোহন ধারিয়ার বাড়িতে জমায়েত হয়ে স্থির করেন যে, মোরারজীর প্রাণরক্ষার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। এদিনই মধ্য রাত্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রবীণ সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত করেন। সোমবার সকালে উমাশঙ্কর দীক্ষিতের মারফৎ মোরারজী ও শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে পত্র বিনিময়ের পর মোরারজী অনশন ভঙ্গ করলেন।

মোরারজী অন্য যেসব দাবি তুলেছিলেন সেগুলির মধ্যে জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার দাবি সরকার মেনে নেননি। তবে মোরারজী প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, তিনি এবিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবেন।

•

সিকিমে আর এক ধাপ

মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটিয়ে আধুনিক প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করার জন্য সিকিমের জনগণ আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করতে চলেছেন। এক, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে চোগিয়ালের পদ লোপ করে দিতে চাওয়া হয়েছে, এবং, দুই, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সিকিমের এখন যে সহযোগী রাজ্যের সম্পর্ক রয়েছে সেটার বদলে সিকিমকে সম্পূর্ণ ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে চাওয়া হয়েছে। সিকিম বিধানসভায় প্রস্তাবের আকারে গৃহীত এই দুটি সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য যে গণভোট নেওয়া হয়েছে, সেটা যে একটা আনুষ্ঠানিক রীতি রক্ষামাত্র সেবিষয়ে প্রথম দিকেই কোন সন্দেহ ছিল না।

পরপর যেসব নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে সিকিম বিধানসভায় ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতেই সিকিমের জনগণের অভিমত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী কাজী লেনদুপ দোরজির প্রাণনাশের চেষ্টা ঐ চেষ্টার সঙ্গে স্বয়ং চোগিয়ালের জড়িত থাকার অভিযোগ, চোগিয়ালের প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ সিংতামে সিকিমের ইতিহাসের বৃহত্তম জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ—অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে গেছে। নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে চোগিয়ালের বিরোধ যখন ক্রমশ পাকিয়ে উঠেছে, তখন সিকিমের জনগণ সুস্পষ্টভাবে তাঁদের নির্বাচিত সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সিকিমের জনগণের ইচ্ছাকে কার্যকর রূপ দেওয়ার দায়িত্ব এখন নয়াদিল্লীর উপর এসে পড়েছে। তবে ভারত সরকার এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এ-ব্যাপারে তাঁরা তাড়াহুড়া করতে চান না। লোকসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন জানিয়েছেন যে, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলে আসছেন সেখানে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করতে হলে চোগিয়ালকে সরে যেতেই হবে। কিন্তু ভারত সরকার চোগিয়ালের পদটি রক্ষা করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখতে চান এবং সেজন্যই মুখ্যমন্ত্রী দোরজিকে ধৈর্য ধারণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ, চোগিয়াল ইচ্ছা করেই রাজ্যে একটা সংকট সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় সিকিম বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাবটি ভারত সরকার সতর্কভাবে বিবেচনা করে দেখবেন বলে চ্যবন আশ্বাস দিয়েছেন।

সিকিমকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হলে তার সাংবিধানিক মর্যাদা ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতোই হবে অথবা তার জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করা হবে, এটা এখন ভারত সরকারকে বিবেচনা করতে হবে।

এর আগে সিকিমকে যখন ঐ রাজ্যের বিধানসভার ইচ্ছা অনুযায়ী ভারতের সহযোগী রাজ্যে পরিণত করা হয়েছিল তখনকার মত এবারও চীন ও পাকিস্তান এ-ব্যাপারে ভারতের সমালোচনা করেছে। চীন এ-ব্যাপারে রাশিয়ারও হাত দেখতে পেয়েছে। ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র এ-ব্যাপারে পাকিস্তানের মন্তব্যকে ভারতের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। পাকিস্তান কিভাবে ক্ষুদ্র হুঞ্জা রাজ্যকে আত্মসাৎ করেছে, সে-কথা ঐ মুখপাত্র এপ্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

পুণ্ডরীক

সুরের আগুন

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

১৯৭২ অব্দের ২১ সেপ্টেম্বরের অমৃতে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে ইন্টারভ্যু প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু তাকে ইন্টারভ্যু বলাতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিলো। কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে এতে তিনি প্রায় কিছুই কবুল করেননি। তাঁর হৃদয়ের গোপন-গহন কোণে তিনি গানের প্রিয়তমকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। ভীমগীতায় (পরশু-রামের) পড়েছিলাম— ভীমের মতে অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অত লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কেশাকর্ষণের কথা মনে করিয়ে বা যে কোনো উপায়ে তাঁকে রাগিয়ে দিলেই গাণ্ডীব নিয়ে এক লাফে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এক্ষেত্রে অনেকটা তাই হয়েছে।

বহুদিন ধরে বহুচেষ্টায় জর্জদার কাছ থেকে যেকথা আদায় হয়নি, সেই বন্ধ দরজার দুয়ারটা যেন দড়াম করে খুলে গেলো তাঁর বিরুদ্ধে গায়কীর সাম্প্রতিক কিছু সমালোচনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ায়। নিজের সঙ্গীত-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদাবোধ, আবেগ, আনন্দ বিদ্রোহে যিনি অনন্যসাধারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জনপ্রিয়তার শিখরে তিনি এই অভিযোগ মেনে নিলেন বলেই কি স্তব্ধ? একদিন ঠাট্টা করেই জিজ্ঞেস করলাম, কি জর্জদা, আপনার বলিষ্ঠ মনের সাহস কি শুধুই এ্যাপিয়ারেন্স? এর মধ্যে রিয়েলিটি কিছু নেই? জর্জদা তাঁর স্বাভাবিক তাচ্ছিল্যের ঢংয়েই বললেন দ্যাহেন তাসের দেশের সম্পাদকীয় কলমের আস্ফালন কৌতুককরই। ওর প্রতিবাদ করাটা সময়ের অপচয় বলেই আমি মনে করি। তবে আপনি যদি কিছু জানতে চান আসেন একদিন।

গেলাম—। বলুন কি জানতে চান? —আপনার যে বিপুল বিরাট গীতার ভাষায় অপূর্বমান জনপ্রিয়তা, এ তো শুধু অশিক্ষিত শ্রোতার গদগদ ভাবালুতার ওপরই দাঁড়িয়ে নেই। বিদগ্ধ রসিক রবীন্দ্র সঙ্গীত ও সাহিত্যে ওয়াকিবহাল পণ্ডিত-ব্যক্তিরও আপনার গান শুনে চোখ ছল-ছলিয়ে উঠতে দেখেছি। আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে—শুনে রবীন্দ্র-

সদনের থমকে যাওয়া পরিবেশ ত এরই মধ্যে ভুলে যাবার নয়।

একরাশ পান মুখে ফেলে জর্জ বিশ্বাস চশমা চোখে দিয়ে একটি ফাইল বের করে অনেক নামী লোককে লেখা তাঁর কয়েক-খানি চিঠি বের করে শোনালেন। এর মধ্যে শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রকে (বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের সম্পাদক) লেখা চিঠিও ছিলো। এগুলির মধ্যে একাধারে আমার, তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের কথার জবাব এবং জর্জদার নিজের বক্তব্যও পাওয়া গেলো। তাঁর গানেরই মতো নির্ভীক ও বেপরোয়া ভঙ্গীতে। তারই কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি। প্রথমে কয়েকটি চিঠি থেকে—

ইতিহাসকে সঙ্গীরূপে দাঁড় করিয়ে কোনো কিছু বক্তব্য পেশ করার রীতির প্রচলন আছে দেখেছি। যাঁরা এই সব সাক্ষীর সাহায্য নেন আমার মনে হয় তাঁদের মনে নিজেদের ইনটেলেক-চুয়ালিজমকে বিদগ্ধ সমাজের চোখের সামনে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টাই প্রচ্ছন্ন থাকে সমস্যার সমাধান হোক বা না হোক। হাইকোর্টের বিচারকের আসনের মতো কোনো ব্যবস্থা তো এই সব ব্যাপারে থাকে না। সুতরাং বাগ্মিতাই আসল।

দেবব্রত বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ কোন ব্যক্তি
বা গোষ্ঠির জমিদারী
সম্পত্তি নন।
তিনি সকলের।

—জর্জ বিশ্বাস

তবে এই ব্যাপারে একটি দৈববাণীর সন্ধান আমি পেয়েছিলাম। এই দৈববাণীর সঙ্গে দেবতাদের কোনো সম্পর্ক নেই; অথবা এটা কোনো ঐশ্বরিক ব্যাপারও নয়। তবে এটি আমার বহুপরীক্ষিত সত্য। যদিও কি করে পেয়েছিলাম সেকথা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। —যে বাণীটির সন্ধান আমি পেয়েছি তা হোলো এই যে এই দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে তা ঘটছে অদৃশ্যলোকে অবস্থিত একটি ভৌতিক শক্তির কলকাঠির নাড়াচাড়ার ফলে। এই কলকাঠি নড়ে আপন খেয়ালখুশীতে। কোনো ধরনের প্রার্থনা অথবা উৎকোচ এই শক্তিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। এই ভৌতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে একটি নীতি আদিকালে চালু হয়েছিলো। সেই নীতি চলছে এবং চলবে। তা হলো বলং বলং বাহুবলং। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার। প্রথমে ছিলো ব্যক্তিগত জোর। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দলগত জোরের উৎপত্তি ঘটেছে। এই নীতি অনুসারে যারা দুর্বল তারা বলীয়ান দ্বারা নিগৃহীত হয়। অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো হবে। অন্য দেশের কথা জানি না। তবে ভারতের মাটিতে বহু গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি যেমন গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যদেব এবং রবীন্দ্রনাথ ও আরো অনেকে চেষ্টা করেছেন এই নীতিটিকে বানচাল করতে। কিন্তু তাঁরা কিছুই করতে পারেননি।

এই ভৌতিক শক্তির কলকাঠির জুরিস-ডিকসন এতদিন ছিলো ধর্মনীতি, রাজনীতি এবং অর্থনীতি। হালে দেখছি সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে রাবীন্দ্রিক নীতিটিও এই কলকাঠির আওতায় এসে পড়েছে। ফলাফল কি হবে বোঝা যাচ্ছে না।

সম্প্রতি এক বন্ধু অসংকোচেই মন্তব্য করেছেনঃ ১। আপনি দারুন জনপ্রিয় ২। আপনার কণ্ঠের ভক্তসংখ্যা অগণ্য, ৩। আপনার কিছু উচ্চারণে কারো আপত্তি আছে ৪। কোনো কোনো গানে আপনার কোনো কোনো ভক্ত কোনো কোনো বাজনার আধিক্য অপছন্দ করছেন, ৫। অনেকেই কোনো সময়ে এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার পছন্দ করেননি। ৬ নম্বরে লেখিকার বক্তব্য ছিলো—আপনার গানে রাবীন্দ্রিকতাকে ছাপিয়ে দেবব্রতী ঢং-ই অনেক সময় প্রকট হয়ে ওঠে বলে অনেকের অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুটি মন্তব্যের উল্লেখ করছি। ১। সুরকারের সুর বজায় রেখেও একসপ্রেশনে কমবেশী স্বাধীনতা চাইবার একিয়ার গায়কের আছে। ২। খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক **শিল্পীগায়কের** পরে থাকবে এর দায়িত্ব।'

ভাষাতত্ত্ব এবং শব্দতত্ত্ব নিয়ে রবিঠাকুর দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর মাথা ঘামিয়েছেন। সুতরাং শব্দপ্রয়োগে তাঁর নৈপুণ্য সন্দেহ করবার কোনো অবকাশ নেই। কোথায় কি ধরনের শব্দ প্রয়োগ করলে বাক্যের অর্থটি সকলের কাছে বিশদভাবে ফুটে উঠবে এই কায়দাটি উনি খুব ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন। স্বাধীনতা চাইবার একিয়ার গায়কের আছে বলার কালে শুধুমাত্র 'গায়ক' শব্দটি ব্যবহার করলেন। 'শিল্পী' শব্দটি নিশ্চয়ই তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিলো। কিন্তু তবু তিনি ঐ শব্দটি বাদ দিলেন। অথচ দায়িত্ব দেবার বেলায় উনি দায়িত্ব দিতে চাইলেন খুব **মুষ্টিমেয় সংখ্যক** শিল্পী--গায়ককে অর্থাৎ **যিনি শুধুমাত্র গায়কই নন, শিল্পীও।** রবিবাবু ইচ্ছে করলে 'সুগায়ক' বা ঐ জাতীয় অনেক কিছু শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে শিল্পীগায়ক কথাটি ব্যবহার করলেন। 'শিল্পী' কথাটিকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করে হয়ত একটু মজা পেয়েছিলেন।

—আমি শুনেছি মানুষের দেহের ভিতরে নানাধরনের জটিল যন্ত্রপাতি আছে। কিন্তু দেখেছি তার ওপরেও আরো ঘোরতর জটিল ব্যাপার আছে তা হোলো ১। ইনটেলেকট ২। ইমোশন। উদাহরণ দিয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই বোঝাতে হবে না যে এই ইনটেলেকট এবং ইমোশন সবার এক নয়। এবং এইগুলির বন্টন ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই। ইনটেলেকট এবং আবেগ গ্রহণ করার শক্তি বা ভঙ্গি নানাধরনের মানুষের ক্ষেত্রে নানাধরনের। আর আবেগ নিজের তাগিদেই প্রকাশিত হয় নানা ভঙ্গিতে। কেউ কাঁদে, কেউ আহা বলে কেউ স্তব্ধ হয়ে যায়। আমার যৌবনকাল কেটেছে নানান পরীক্ষানিরীক্ষায়। যাঁরাই ঘরে আসতেন তাঁদের নানাধরনের গান শুনিয়ে মতামত সংগ্রহ করতাম। নানা ভঙ্গিতে গেয়ে নানান ব্যাখ্যার আলোয় একসপ্রেস করে করে কিভাবে গান গাইলে শ্রোতাদের বুদ্ধি অথবা আবেগকে ধাক্কা দেওয়া যায় সেই কথাটাই অনুভব করবার চেষ্টা করেছি। অনেক সময় সফল হয়েছি। অনেক সময় হইনি। বিভিন্ন মানুষের ইনটেলেকট এবং ইমোশন বিভিন্ন ধরনের বলেই ফল একরকমের হয় নি। তাছাড়া যদি আমি কখনও **গান গেয়ে শ্রোতার মনকে নাড়া দিতে না পারি তার জন্য নিজের অক্ষমতাকেই দায়ী** করি। অন্য কাউকে দোষী মনে করি না।

যে কথাটি অকপটে স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই সেটি হোলো এই যে মঞ্চে গাইবার ব্যাপারটিকে আমি একটা সিরিয়াস ক্রিকেট ম্যাচের মত গ্রহণ করেছি। আমি গান শোনাতে বসি রীতিমত খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি নিয়ে। আমার গলার আওয়াজ আমার বল। শ্রোতাদের ইনটেলেকট, ইমোশন আমার সামনে স্টাম্পের মত দাঁড়িয়ে। ফাস্ট, স্লো, স্পিন, ব্রেক ইত্যাদি নানাধরনের গলার আওয়াজ ছুঁড়ে ছুঁড়ে শ্রোতাদের ইনটেলেকট ও ইমোশনকে ধাক্কা মারবার চেষ্টা করি। ভাগ্য ভালো হলে উইকেট পাই না হলে পাই না। মাঝে মাঝে গ্রিপ পাই না বলে বল ওয়াইড চলে যায়। শুনে হয়ত হাসবেন এখনও মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও নারভাস হয়ে পড়ি। তখন আমি গ্রিপ পাই না। তার জন্য দুঃখ হলেও লজ্জা নেই। কারণ মানুষের সব একসপেরিমেন্ট সবসময় সাকসেসফুল হয় না। তার জন্য নিজেকে পরাজিত মনে করবার যেমন কারণ নেই তেমনই অধিকার নেই শ্রোতাদের অজ্ঞ বলে গালিগালাজ করবার।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা নিঃসংকোচে নিবেদন করছি। **রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি অন্য কারো চেয়ে কম সচেতন নই।**

বিশ্বভারতী বোর্ডের শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রর কাছে লেখা জর্জদার একটি চিঠির বক্তব্য এ বিষয়ে অনেক আলোকপাত করবে বলে তার থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হয়েছিলো বলে বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রসংগীতচর্চার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের রসে মনটা আমার রসিয়ে উঠেছিলো। ১৯২৭ সালে কলেজের পড়ুয়া হয়ে কোলকাতায় এসে যখন স্থায়ীভাবে কোলকাতার বাসিন্দা হয়ে উঠেছিলাম সেই সময় থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের পাল্লায় পড়ে বহু ব্রাহ্ম এবং রবীন্দ্রসংগীত আমায় শিখতে এবং গাইতে হয়েছে। যাঁদের কাছে শিখতাম তাঁদের কেউই এখন জীবিত নেই। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নানা উৎসবে গানের মহড়ায়ও আমার যাতায়াত ছিলো। হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সে চাকুরী করবার সময় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সেই সূত্রে পাম্ এ্যাভিনুর বাড়ীতে স্বর্গীয় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁর কাছে বহু গান শুনেছি এবং শিখেছি। আমার মনে আছে পিয়ানো বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান নিয়ে তিনি নানাকারণে একসপেরিমেন্ট করতেন। ছাপানো স্বরলিপির সামান্য অদলবদল করে। সে সব গান আমাদের শেখাতেন এবং সে সম্বন্ধে আমাদের মতামতও জিজ্ঞেস করতেন। কতকগুলি রবীন্দ্রসংগীতের হারমোনি করা সুরে তিনি আমাদের দিয়ে নানা অনুষ্ঠানে গাইয়েছিলেন। 'আমি চিনিগো চিনি' গানটির হারমোনাইজড স্বরলিপি তৈরী করে আনন্দসংগীত পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিলেন। এই গানটি হারমোনাইজডভাবে বহু অনুষ্ঠানে আমাদের গাইতেও হয়েছে। তাছাড়া রথীদা ও চারুবাবু যে আমার গান অত্যধিক পছন্দ করতেন তাতো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন। অনাদিদার দৌলতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়ে খুশী করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। এতো কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে বাল্যকাল থেকে শুরু করে নানাধরণের রবীন্দ্রসংগীত নানাভাবে গাইতে গাইতে এবং রেকর্ড করে করে আমার জীবনের ৬৩ বছর কেটে গেলো। কাজে কাজেই যতই বিনয় করি না কেন এটুকু না বলে থাকতে পারছি না যে সুষ্ঠুভাবে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করার ব্যাপারে আমার বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার রেকর্ড করা গানগুলি যেভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসংগীতরসিক ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে তাতে আমার মনে এটুকু বিশ্বাস জন্মেছে যে নিছক সস্তা রুচিতে সংগীত পরিবেশন করে সেটা সম্ভব হয়নি। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণদের এবং নবীনদের অকুণ্ঠ ভালবাসা আমি সারাজীবন পেয়েছি।

কিন্তু এটুকুও না বলে পারছি না যে আমার দৃঢ়বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী এবং সুরের সমন্বয়ের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ গায়নশৈলীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গানের মর্ম গভীরভাবে উদ্ঘাটিত করে ব্রাহ্মসমাজের বাইরে যে অসংখ্য রবীন্দ্রসংগীতানুরাগী রয়েছেন তাঁদের ইনটেলেকট ও ইমোশনকে গভীরভাবে নাড়া দিতে আমি সক্ষম হয়েছি। এই প্রসঙ্গে বেশ কয়েক বছর আগেকার একটি ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করছি কোলকাতার বেশ নামজাদা কয়েকজন উচ্চাঙ্গসংগীতশিল্পীদের একটি আসরে একজন বিদেশী (য়ুরোপীয়) কম্পোজারকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিলো। সেই আসরে আমিও উপস্থিত ছিলাম। বিদেশী কম্পোজার তাঁরই একটি যন্ত্রসংগীতের অর্কেস্ট্রার টেপ-করা রেকর্ড শোনালেন। বাজানো শেষ হয়ে গেলে অনেকেই নানা ধরনের প্রশংসার বাণী বর্ষণ করলেন। একজন নাম-করা বাঙালী যন্ত্রসংগীতশিল্পী এক কোণায় বসে কি যেন ভাবছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে তিনি মুখ খুললেন। তিনি যা বলেছিলেন তার ভাবার্থ হোলো এই যে বাজনা শুনে

তাঁর মনে হচ্ছিলো তাঁরা যেন দল বেঁধে কোনো এক মরুভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তুমুল ঝড় উঠলো। ঝড়ের বেগে বালুকণা উড়তে লাগলো। চোখ প্রায় অন্ধ। কিছুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে ঝড় থেমে গেলো। আবার তাঁরা চলতে লাগলেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি। অপূর্ব শান্ত পরিবেশ। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বিদেশী কম্পোজার হঠাৎ প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বললেন 'আপনি ঠিকই বলেছেন, —আমার এই কম্পোজিশনটির নাম **ক্যারাভান।**' আমি অবাক। এই যন্ত্রশিল্পীটি হলেন শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র। তিনি নিজে যন্ত্রী। তাই বাদ্যযন্ত্রের ভাষা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছিলো।

রাধিকাবাবুকে কোনোদিন পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করতে দেখিনি। শুনিওনি। অথচ য়ুরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির ভাষা তাঁর হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি করেছিলো তা দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। রাধিকাবাবুর হয়ত এই ঘটনাটির কথা মনে নেই। কিন্তু সেদিন ঘটনাটি আমার মনে যে দাগ কেটেছিলো তা কোনোদিনও মলিন হবে না। সেদিন আমার মনে হয়েছিলো বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন আওয়াজ এবং বিভিন্ন সুর আমার মনেও বিভিন্ন আবেগ সৃষ্টি করে। যেমন সানাই বাঁশী অথবা অন্য কোনো তারযন্ত্র। কিভাবে এবং কেন এই আবেগ সৃষ্টি হয় তা বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর থেকে আমি অনেক ভেবেছি। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা এ বিষয়ে আমায় প্রেরণা জোগালো। তিনি বলেছিলেনঃ য়ুরোপীয় সঙ্গীতে যে হার্মনি অর্থাৎ স্বরসঙ্গতি আছে আমাদের সঙ্গীতে তাহা চলিবে কিনা। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়—না ওটা আমাদের গানে চলিবে না। ওটা য়ুরোপীয়। কিন্তু হার্মনি য়ুরোপীয় সঙ্গীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয় তবে একথাও বলিতে হয় যে যে দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে।'

'ইহার অভাবে আমাদের সঙ্গীত যে অসম্পূর্ণ সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে। তবে কিনা ইহাও নিশ্চিত যে আমাদের গানে হার্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার স্বাদ স্বতন্ত্র হইবে।'

'যাই হোক আমাদের সঙ্গীতের একটা বড় মহল ফাঁকা আছে। এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এইদিকে অনেক পরীক্ষা ও উদ্ভাবনার জায়গা পাইব। যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ সাহস যাঁদের আছে এবং লক্ষ্মীছাড়ার খ্যাপা হাওয়া যাদের গায়ে লাগিল এই একটি আবিষ্কারের ক্ষেত্র তাদের কাছে পড়িয়া রহিল। আজ হোক কাল হোক এক্ষেত্রে নিশ্চয় লোক নামিবে।

—লক্ষ্মীছাড়ার খ্যাপা হাওয়া আমার গায়ে লাগেনি। কিন্তু ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে এই ব্যাপারে নানা ধরণের একসপেরিমেন্ট করতে আমি দেখেছি।

রাধিকাবাবুর কথাগুলি আমার একটা ভাবনার যোগান দিয়ে দিলো। পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞানই নেই। কিন্তু ভেবে দেখেছি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন ধ্বনি এবং সুর মানুষের হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি করে তা তো কোনো দেশকালের নিয়ম মানে না। রবীন্দ্রসংগীতের নিজস্ব একটি আবেগ-সৃষ্টিকারী ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাটিকে ধার দিয়ে আরো বেশী জোরালো করে শ্রোতাদের ইনটেলেকট এবং ইমোশন গুলিকে আরো গভীর ভাবে নাড়া দেবার উদ্দেশ্যে আমার রেকর্ড করার সময় দেশী-বিদেশী নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্রগুলির ধ্বনির সাহায্য নিয়ে নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি করেছি। ঐ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি আমার নিজের মনে যে আবেগ সৃষ্টি করে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মনের মত ছাঁদে সুরের জাল বুনে গানগুলির সুরারোপের কাঠামো জখম না করে ঐ সব বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য আমি নিয়েছি। এবং অকপটে স্বীকার করছি যে গানগুলি গাইবার সময় একসপ্রেশনের স্বাধীনতা আমি নিয়েছি। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই ব্যাপারে পথ দেখিয়েছেন। বাদ্যযন্ত্রের সুর সাজিয়ে গানের রূপ ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে আমি কতখানি সফল হয়েছি সে বিচারের ভার শ্রোতাদের ওপর। তাঁদের বিচার আমি মাথা পেতে গ্রহণ করি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছি আমি সম্পূর্ণ সফল হইনি। তাতে আমি দুঃখও পেয়েছি। অবশ্য সব একসপেরিমেন্টই যে সফল হবে তা জোর করে বলা যায় না। তবে এতে আমার অভিজ্ঞতা বাড়লো একথা ত অস্বীকার করতে পারি না।

প্রশ্ন করতে পারেন রবীন্দ্রনাথের গান ত স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহলে ঐ সব বিদেশী যন্ত্রের সাহায্য নেবার কি প্রয়োজন? তাহলে এ প্রশ্ন ওঠে মিউজিক বোর্ড রবীন্দ্রসংগীতের জন্য যে বাদ্যযন্ত্রের তালিকা দিয়েছেন সেই যন্ত্রগুলিরই বা প্রয়োজন কি? যাই হোক কবির স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দেবার চেষ্টায় আমি কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বাধা পেলাম ১৯৬৯ সনে। আমার দুটো গানের রেকর্ড বোর্ডের অনুমোদন পেলো না। কারণ দেখানো হোলোঃ—১। **'পুষ্প দিয়ে মারো যারে'—একসেসিভ মিউজিক একোমপ্যানিমেন্ট হাম্পারস দি সেটিমেন্ট অফ দি সং** ২। **'তোমার শেষের গানের'** দি টেম্পো অফ **দি সং ইজ টু মাচ অ্যান্ড দি সং ইট-সেলফ ইজ নট সাং অ্যাকরডিং টু নোটেশন।**

লক্ষ্য করে দেখুন—নোটেশনের ব্যাপারে কি ভুল হয়েছে তার কিন্তু কোনো উল্লেখ নেই। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী আমার মতামতের জন্য অনেকদিন পীড়াপীড়ি করেছিলেন এই ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানীকে জানাতে হয়েছিলো যে **রবীন্দ্রসংগীত গাইবার এবং রেকর্ড করবার ব্যাপারে আমার কর্তৃত্বজ্ঞান এবং দায়িত্ববোধ অন্য কোনো চাইতে কম বলে আমি বিশ্বাস করি না।**—তাছাড়া মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষকের মতামত নিতান্তই সাবজেকটিভ। অতএব এ ব্যাপারে আমার বলার কিছুই নেই। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রেকর্ড করা বন্ধ করতে হোলো। ১৯৭০ সালের শেষের দিকে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর মালিক চণ্ডীচরণ সাহা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে ঐ সময়ে আরো কয়েকটি গান রেকর্ড করিয়েছিলাম। সেই গানগুলির মধ্যে কয়টি অনুমোদন লাভ করেছে সে খবর জানা নেই। কিছুকাল পরে রেকর্ড কোম্পানী আমায় জানালেন যে রেকর্ড করার ব্যাপারে **বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড** কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। এবং প্রবর্তিত নিয়মগুলির কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। কার অথবা কাদের ভাবনাপ্রসূত এইসব নিয়ম তা আমার জানার কথা নয়। **কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ভাবনা দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জাত বাঁচানো যাবে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভাবতে পারতেন না।** কারণ আমি জানি তিনি দিলীপবাবুকে বলেছিলেন 'গানের গতি অনেকখানি তরল কাজেই তাতে গায়ককে অনেকখানি স্বাধীনতা তো দিতেই হবে। না দিয়ে গতি কি? ঠেকাব কি করে? তাই আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলিনে যে আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময় সেইভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না।' সুতরাং কার কথা মেনে চলব? রবীন্দ্রনাথের? না, যাঁরা নতুন নিয়মগুলি করেছেন তাঁদের?

এবার আমাদের রেকর্ড কোম্পানীকে লেখা মিউজিক বোর্ডের ২২।১১।৭২ তারিখের চিঠি থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছিঃ—

> "There is a growing tendency among the artistes to make use of interlude music at the time of recording Rabindra Sangeet by taking help of various types of musical instruments and also foreign tunes during recitals of songs which sound discardent to the ear and also militates against the true spirit of the songs.

ব্যাপারটাই এখানে subjective, "discardent to the ear" সব ক্ষেত্রে সত্য হয় না। এ বিষয়ে জর্জ বিশ্বাসের মন্তব্য হোলো এইঃ—কানে কানে ভেদাভেদ থাকবেই। সব কান একরকম হয় না। কোনটা 'টু স্পিরিট অফ দি সং' তা জানতে চাইলে দেখা যাবে টু স্পিরিট ব্যক্তিবিশেষে আলাদা হয়। [illegible]

শ্রোতা বিস্তর পয়সা খরচ করে রেকর্ড কিনে আনন্দ পান তাঁদের সবারই যে একেবারেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের রস আস্বাদন করবার মতো বুদ্ধি ও ক্ষমতা নেই এমন কথা বলতে পারি না। শ্রোতাদের গ্রহণ ও বর্জন দিয়েই প্রমাণিত হয় কোনটা ভাল কোনটা মন্দ।

পরের প্যারাগ্রাফে লেখা আছে:—

'ইট হ্যাজ অলরেডী বিন ইম্প্রেসড আপন ইউ দি ইম্পরটেন্স অফ মেকিং ইউজ অফ সাবডিউড মিউজিক ইন অর্ডার টু মেনটেন দি স্টাইল এ্যান্ড মোড অফ রবীন্দ্রসংগীত বাট ইন দি এ্যাবসেন্স অফ এনি মেথড ফর এলিমিনেটিং দি ইনফ্লুয়েন্স অফ দি ওয়েস্টার্ন স্টাইল অফ মিউজিক ইন দি রেকর্ডেড সংস বাই ডিটারমাইনিং দি বেসিক রিকোয়ারমেন্টস অফ মিউজিক্যাল একমপানিমেন্টস নো সাটেবল এ্যারেঞ্জমেন্টস কুড বি মেড সো ফার ইন দি ম্যাটার।' 'এ্যাজ অলরেডী কমিউনিকেটেড টু ইউ দ্যাট দি বেসিক রিকোয়ারমেন্টস এ্যাজ ইনডিকেটেড ইন দি এ্যাটাচড শিট'। আর টু বি স্ট্রিকলি এ্যাডহেয়ারড টু এ্যাট দি টাইম অফ রেকর্ডিং অফ রবীন্দ্রসঙ্গীত ইন ফিউচার'।

এর উত্তরে জর্জদা বলছেন:—

'স্টাইল এ্যান্ড মোড অফ রবীন্দ্রসঙ্গীত'।

কথাগুলি নিতান্তই অর্থহীন। কারণ শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওস্তাদদের মধ্যেই এই ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ ছিলো এবং এখনও বোধহয় আছে। কোলকাতায় যতগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিষ্ঠান আছে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ওস্তাদরা বলেন, বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত কাকে বলে তাঁরাই শুধু জানেন। অথচ দেখা যায় প্রত্যেকেরই গাইবার এবং শেখাবার পদ্ধতি আলাদা। সুতরাং আসল নকল বোঝা মুস্কিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠির ব্যবস্থা করে যাননি। কিন্তু উপরোক্ত ইংরেজী ভাষায় লেখা নির্দেশের শেষের অংশটুকু পড়লে মনে হয় মিউজিক বোর্ডের সব রাগ যেন বাদ্যযন্ত্রের ওপর। বোর্ড বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে চাইছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় কি কি বাদ্যযন্ত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপযোগী এবং সেগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরসংগতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতের কথা একটু আগেই বলেছি। এ ব্যাপারে নানাভাবে, নানা জায়গায় ব্যক্ত আরো সুস্পষ্ট মতামতের কিছু কিছু উল্লেখ করছি।

১। আমাদের দেশে অনেক জিনিসকেই ইউরোপ হইতে পাইবার জন্য আমরা হাত পাতিয়া বসিয়া আছি। আমাদের সংগীতকেও একবার সমুদ্র পার করিয়া তাহার পরে তাহাকে যখন পাইব আরো ভালো করিয়া পাইব। ...আমার বিশ্বাস সঙ্গীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্রবের প্রয়োজন আছে। তাহাকে প্রাচীন দস্তুরের সিন্দুক হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের হাটে ভাঙ্গাইতে হইবে।

২। 'বঙ্কিম আনিলেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালংকের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি অমনই বিজয়বসন্ত লায়লা মজনুর হাতির দাঁত-বাঁধানো পালংকের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হয়ে গেলো। তারপর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে?'

৩। 'যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলিন্যকে বড় করে মানে তারা বলবে ঐ রাজপুত্রটি বিদেশী। তারা এখনো বলে এ সমস্তই ভুয়ো। বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো ঐ কবি কংকণচণ্ডী কারণ এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথা যদি সত্য হয় তাহলে একথা বলতেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না। যা তার প্রাণের সঙ্গে চলে। যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়। .....কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে সৃষ্টি করে নাই।'

৪। আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সংগীতে পৌঁছয় নি। সেই জন্যই আজও সংগীত জাগতে দেরী করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে।'

৫। 'দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজী সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাঁকে হিন্দু সংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।'

সুতরাং ইনফ্লুয়েন্স অফ ওয়েস্টার্ন মিউজিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা তা আমাদের জানা। একথাও আজ সবাই জানেন জ্যোতিদাদার পাশ্চাত্য কায়দায় পিয়ানো বাজানোর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের জন্ম হয়েছিলো। তাছাড়া অনেকেই জানেন যে অনেক বিদেশী সুরে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর গান বেঁধেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করার প্রথম যুগের গানের রেকর্ডগুলি শুনলে দেখা যায় যে তখন শুধু হার্মোনিয়ম বা অর্গান বাজিয়ে গান রেকর্ড করানো হোতো। তখনকার দিনে রেকর্ড বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে শিল্পীদের এবং উদ্যোক্তাদের মনে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিলো না বলেই তখনকার দিনে অন্যান্য গান রেকর্ড করার বেলাতেও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে কোনো বিশেষ একটি রূপ ধরে নি। সবই মামুলী ধরনের হোতো। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের সোনার কাঠির ছোঁওয়া লেগে আর্টের সবগুলি ক্ষেত্রে নূতন নূতন উপলব্ধির তাগিদে নূতন নূতন উদ্ভাবনের পথে মানুষ চলতে সুরু করলো। রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার পথে মানুষ এগিয়ে চলেছে। বিশ্বযাত্রার তালে তাল মিলিয়ে ৫০ বছর আগে যে রূপে ও ভঙ্গিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া এবং রেকর্ড করা হোতো—বর্তমান কালের রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেহারার এবং ভঙ্গির সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই। কালের গতিতে সেই চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতেও যে হবে না তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে? একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর গানই নাকি টিকে থাকবে। কিন্তু আমাদের মাতামহীর আমলের জীর্ণ কাঁথা দিয়ে ঘিরে রাখলে এবং পলেস্তেরা করে ফোঁটা ফোঁটা নিয়েমের বিধান খাইয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে টিকিয়ে রাখা যাবে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভাবতে এবং বলতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন 'সুরকারের সুর বজায় রেখেও একসপ্রেশনের কমবেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে।' তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলায় গান যে উৎকর্ষ লাভ করবে সে তার আপন রাস্তাতেই করবে। আর কারও পাথর জমানো বাঁধা রাস্তায় করবে না। বলা বাহুল্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ গায়ককে এবং শ্রোতাকেও একসপ্রেশনের ব্যাপারে যে সাহায্য করে তা শুধু অনুভূতির ব্যাপার। বিশ্লেষণ করে বোঝানো যায় না। পাশ্চাত্য সংগীত বা ইয়ুরোপীয় সংগীত সম্পূর্ণ বিদেশী। তাকে আয়ত্ত করতে গেলে অথবা বুঝতে হলে অনেক বছরের সাধনার প্রয়োজন। মিউজিক বোর্ডের তালিকাভুক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যতীত অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র রেকর্ড করার সময় ব্যবহার করলেও ওয়েষ্টার্ণ ইনফ্লুয়েন্সের উৎপাত এসে জুটবে এমন একটি অদ্ভুত ধারণার পিছনে কোনো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে কিনা জানি না। যাঁরা ওয়েষ্টার্ণ মিউজিক-এর পণ্ডিত ব্যাপারটি তাঁদেরও বোধগম্য হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

যাইহোক যে রবীন্দ্রনাথকে আমার পিতামাতা গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন যে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা আমার চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে কোনো মূল্য না দিয়ে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মাঝারি কর্তাদের নির্দেশ এবং বিধিনিষেধ মেনে আর রবীন্দ্র-

সঙ্গীত রেকর্ড করবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। প্রবৃত্তিও নেই। এই ব্যাপারে যুক্তিহীন কতকগুলি নিয়ম যতদিন বলবৎ থাকবে ততদিন নিজেকে দূরে সরিয়েই রাখব।

আমি দেখেছি হালে কয়েকজন তরুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকা অতি সুন্দর গাইছেন। মনে হয় তাঁদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। লক্ষ্য করেছি তাঁরাও এ ব্যাপারে বেশ ভাবনা চিন্তা করেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই নিয়মের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার মত সাহস ও ক্ষমতা তাদের নেই। আমার একথাও মনে হয় যে রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অবকাশ ও সময় আপনার নেই। তাই আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে যথার্থ সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীত রসিকদের আহ্বান করে তাঁদের আলাপ আলোচনার আলোকে এমন একটি ব্যবস্থা করুন যাতে আমাদের অতিপ্রিয় সবুজ ও সজীব রবীন্দ্রসঙ্গীত শুকনো কাঠ না হয়ে যায়।

আপনার উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়েছিলাম 'তুমি রবে নীরবে' গানটি রেকর্ডের অনুমোদনের ব্যাপারে। তাই আপনার কাছে মনের সব কথা জানাতে সাহস পেলাম। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বাণীর উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না। তিনি লিখেছিলেন 'কিন্তু সরস্বতীকে শিকল পরাইলে চলিবে না। সে শিকল তাঁর নিজের বীণার তারে তৈরী হইলেও নয়। কেননা মনের বেগই সংসারে সবচেয়ে বড় বেগ। তাকে ইনটারণ করিয়া যদি সলিটারী সেলের দেয়ালে বেড়িয়া রাখা যায় তবে তাহাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হইবে। সংসারে কেবলমাত্র মাঝারির রাজত্বেই এমন সকল নিদারুণতা সম্ভবপর হয়। যারা বড়, যারা ভূমাকে মানে তারা সৃষ্টি করতেই চায়। দমন করতে চায় না। এই সৃষ্টির ঝঞ্ঝাট বিস্তর। তার বিপদও কম নয়। বড় যাঁরা তাঁরা সেই দায় স্বীকার করিয়াও মানুষকে মুক্তি দিতে চায়। তাঁরা জানে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মাঝারির শাসন। এই শাসনে যা কিছু সবুজ তা হলদে হইয়া যায়। যা কিছু সজীব তাহা কাঠ হইয়া ওঠে।' নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকেই লেখা আর একটি চিঠিতে জর্জ বিশ্বাস বলছেন '১৯৬৪ সনে আমার একটি রেকর্ড-করা গান 'এসেছিলে তবু আস নাই'—বোর্ডের অনুমোদন পেলো না। ভুল গাওয়া হয়েছে বলা হোলো। পরে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়কে যখন গানটি শোনানো হোলো তখন তিনি লিখলেন যজ্ঞা ট থ ন এইভাবে সুর অবশ্যই হতে পারে। এতে কোনো দোষ নেই। আমার মনে হয় ছাপায় কোনো গোলমাল ঘটেছে।' স্বাক্ষর শান্তিদেব ঘোষ ১৯৬৪।

শান্তিদেববাবুর স্বাক্ষর-করা লেখা এখনও আমার কাছে রয়েছে। আমার মনে হয় বোর্ডের কাছেও আছে। শান্তিদেববাবুর যা মনে হয়েছে তাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। দেখা যাচ্ছে এই 'মনে-হওয়া' ব্যাপারটি বেশ গোলমেলে। যিনি আমার এ গানটি অনুমোদন করতে চান নি তাঁর নিশ্চয়ই কিছু মনে হয়েছিলো। আবার শান্তিদেববাবুর অন্য রকম মনে হোলো। কার মনে কি মনে হয় তা বলা খুব শক্ত। সুতরাং রেকর্ডের অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোনো ইউনিফরমিটির আশা করা বৃথা। অবিশ্যি একথা স্বীকার করতেই হয় যে একটা কিছু নিয়ম মানা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কিছু নিয়মের কথা বলে যান নি। সুতরাং ছাপানো স্বরলিপির বইকেই এই ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হয়। যদিও তাতে অনেক সময় ভুল থাকে তবুও তা দেখে সুরের স্ট্রাকচারকে একটা ধারণা করা যায়। স্বরলিপিতে যে সুর অথবা স্বর লেখা থাকে সেগুলি যথাযথভাবে মেনে চললেও গান বিভিন্ন ঢং-এর হতে পারে। রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন। তবে বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে শ্রুতির খাতিরে স্বরলিপিতে যে মাত্রাভাগ থাকে তার সামান্য অদলবদল করতেই হয়। তা না করলে গান শুকনো কাঠ হয়ে যেতে বাধ্য।

আমি এ ধরনের অদলবদল দীনেন্দ্রনাথকে করতে দেখেছি। ইন্দিরা দেবীকেও দেখেছি। স্বরলিপি প্রস্তুত করার সময় শুধুমাত্র সুরের রুড আউটলাইনটাই দেওয়া সম্ভব। শ্রুতি এবং গায়নভঙ্গি স্বরলিপি করে বোঝানো কিছুতেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গায়কের নিজস্ব ঢং-এর ব্যাপারে গায়ককে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। দিল্লীতে একবার সাপ্রু হাউসে আমার গান ছিলো। 'কোথা যে উধাও' ও 'পাগলা হাওয়ার'—গান শুনে এক বিদেশী সাংবাদিক আমায় নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি বললাম 'আমি ও-সব কিছু জানি টানি না।' তারপর একটি বাচ্চা ছেলেকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম 'ওর সঙ্গে কথা বলুন ওই আপনাকে সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেবে।' ...খানিক বাদে খুব উৎফুল্ল মুখে সেই বিদেশী সাংবাদিকটি আমার কাছে এসে বললেন 'আপনি ঠিক লোককেই দেখিয়েছেন। এই দেখুন উনি নোটেশন করে করে করে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় মল্লারের কোমল গান্ধারের ছোঁয়া লেগে কথার কোমল আবেশটি অনুরণিত হয়েছে। দিকে দিগ-দেতে এতখানি শ্রুতির বিস্তার হোলো দিগন্তের বিশালতা বোঝাতে। আবার ঐ এক বর্ষারই গানে 'পাগলা হাওয়া'-র টেম্পো কাণ্ট হয়ে গেলো হঠাৎ বর্ষার নূপুর বেজে উঠতে মনটাও কেমন উল্লাসে নেচে ওঠে সেই ছবিটি ফোটাতে।

এই বাচ্চা ছেলেটিই হলেন আজকের ভুবনবিজয়ী শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর। বসন্তের কচি কিশলয়?নদীর অসংখ্য ঢেউ-এর কলতান তাদেরও একটা ভাষা আছে। সুর আছে। এই ভাষাটি জ্ঞান পেতে শোনবার সাধনা করেছিলেন একটি ভদ্রলোক। তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। আর আমি সারা জীবন ধরে ঐ রবীন্দ্রনাথের ভাষার সুরটি শোনবার চেষ্টা করছি।'

এই হোলো বিতর্কিত বিদ্রোহী এবং জনপ্রিয়তার রাজসিংহাসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত জর্জ বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্যান, ধারণা দর্শন ও সাধনার কাহিনী।

জর্জ বিশ্বাস। আপনার রূঢ় কাঠিন্যের আড়ালে অতি সুকুমার অতি পেলব স্পর্শালু শিল্পীসত্ত্বাকে আমি বার বার অনুভব করেছি। আত্মপ্রকাশ-বিমুখ সূক্ষ্ম রুচিবোধে মুগ্ধ হয়েছি। 'আমি কাগজ-নির্ভর শিল্পী নই'—একথাও আপনার মুখে সাজে। কারণ আপনার গানের সম্বন্ধে সমালোচকরা যদি প্রশংসার উচ্ছ্বাসে মুখর না হন আপনি তার জন্য কাগজের কর্তৃপক্ষের কাছে প্যান-প্যান করে নাকে-কান্না কেঁদে তাঁদের বিব্রত করে তোলেন না। কারণ আপনার ভাষায় গান-গাওয়া ব্যাপারটা আপনার কাছে সিরিয়াস ক্রিকেট ম্যাচের মত। মাঝে মাঝে গ্রিপ না পেলে আপনি দুঃখ পেলেও লজ্জিত হন না। কারণ আপনি জানেন মানুষের সব একসপেরিমেন্ট সব সময় সাকসেসফুল হয় না। আপনার এই স্পোর্টিং মনোভাব শিল্পীসুলভ নির্লিপ্ততা আত্মমর্যাদা বোধ ও পৌরুষকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তবু না বলে পারছি না—'আরে বাবা কাগজের লোক? সরেন সরেন?' বলে কাগজের লোকদের প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমান প্রকাশ করাটা আমার কাছে অনেক সময় আত্মাভিমান বলে মনে হয়েছে। যা চকচক করে তাই যেমন সোনা নয় তেমনই কাগজের লোক মানেই শুকনো খটখটে হৃদয় নয়। আমরাও শ্রোতা—! শিল্পীদের সম্মান দিতে আমরাও জানি। জর্জ বিশ্বাস। যখন আপনার ভাষায় 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর নির্মমতার নির্মমতা' আপনাকে শ্রীহীন আক্রমণ করে আপনার আলোর আকাশ কালো করে তুলেছে তখন অমৃতবাজার অমৃত যুগান্তর কি আপনার পাশে এসে দাঁড়ায় নি? আপনি হয়ত দুরন্ত অভিমানে বলবেন নাই দাঁড়াতো দরকার কি?' কবির ভাষাতেই এর উত্তর দিয়ে এ-প্রসঙ্গের যবনিকা টানিঃ—

'তোমায় কিছু দেব বলে
চায় যে আমার মন।
নাইবা তোমার থাকলো প্রয়োজন।

সন্ধ্যা সেন

নির্জনে খেলা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

ডিসেম্বরের গোড়াতেই নরসিং লালজীর সঙ্গে মানালী থেকে নেমে এলাম কুলুতে। চাচাজীর কোঠীতে এই আমার প্রথম আসা। সারা পথ উত্তুরে হাওয়ায় সাঁই সাঁই চাবুক বাজছিল। সিডার আর পাইনের বন পেরিয়ে আসার সময় শুনতে পাচ্ছিলাম একটানা কান্নার আওয়াজ। বিপাশার তীর ঘেঁষে গাড়ী চলছিল। দুরন্ত পাহাড়ী মেয়েটা হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেছে। নীল শাড়িখানা জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছে।

সন্ধ্যার একটু আগেই চাচাজীর ডেরার সামনে এসে দাঁড়ালাম। শেষবেলার হলুদ আলোয় প্রথম চোখাচোখি ঝিন্নির সঙ্গে। আপেল বাগিচার বেড়ার ধারে সে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে আমার দিকে চেয়ে হাত তুলে নমস্কার করল। তারপর চাচাজীর হাত থেকে সবজীর টোকরীটা নিয়ে কোঠীর দিকে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল।

শীতের শান্ত সন্ধ্যা। পেছনের উঁচু পাহাড়টার ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। কয়েকটা আপেল আর পাইন গাছের পাশ কাটিয়ে চাচাজীর পেছন পেছন এসে দাঁড়ালাম কোঠীর দাওয়ায়।

চাচা নরসিংলালজী খপ করে আমার একখানা হাত ধরে ঘরের ভেতর মহলে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, এ কোঠী তোমারা বাবুজী। এ বাগিচা ভি তোমারা। মুখার্জি সাব মেহেরবানী করে আমাদের এখানে থাকতে দিয়েছেন। তিনি আজ নেই তা বলে চাচা তো ভাতিজার সঙ্গে বেইমানী করতে পারবে না।

বললাম চাচাজী এ কোঠী কার সে নিয়ে ফয়সালা পরে হবে। এখন চাচার কাছে এসেছি ব্যস। সব ভাবনা এখন চাচাজীর।

নরসিংলালজী আমাকে নিয়ে একটা কাঠের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেন।

চাচাজী এবার বললেন এই তোমার কামরা। কুর্শি টেবিল সব আছে। খাটিয়া পর বিস্তারাভি পাতা আছে। খুশিসে আরাম করো কোই তকলিফ হোনে সে বোলো।

নরসিংলালজী বেরিয়ে গেলেন। কাঠের সিঁড়িতে ভারী পায়ের আওয়াজ উঠলো।

ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় গায়ের কোট খোলার প্রশ্নই ওঠে না। নেয়ারের চারপায়ার ওপর দেহটাকে ঢেলে দিলাম।

তখনও ঘরের ভেতর আধময়লা কাপড়ের মত একটুখানি আলো ছিল। দেখলাম আমার খাটিয়ার পাশের টিপয়ে পোর্সিলেনের ফুলদানিতে ফুল রাখা আছে। সামনের জানালা বন্ধ ছিল। তার কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বন পাহাড় আর বিপাশার ছবি। সন্ধ্যার আবছায়ায় আমি খাটিয়ার ওপর বুক চেপে শুয়ে সেই অস্পষ্ট হয়ে আসা দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

কতক্ষণ পরে সিঁড়িতে আবার পায়ের সাড়া জাগল। এবার শব্দটা মৃদু। মনে হল চাচাজী নয় অন্য কেউ আসছে। খাটিয়ার ওপর চুপি চুপি উঠে বসতে গেলাম কিন্তু সারা ঘরে চারপায়ার একটা করুণ আর্তনাদ বেজে উঠলো।

ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে ঝিন্নি। হাতে থালার ওপর রাখা চায়ের কাপ। প্লেটে কিছু খাবার।

সে এবার টিপয়ের ওপর থালাটা বসিয়ে রেখে পাশের দেয়ালে হাত বাড়াল। চকিতে একটা সোনার ঈগল যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভেতর।

আলোয় দেখলাম ঝিন্নিকে। টিপিক্যাল কুলুর তরুণী। লালে সাদায় মেশা রং ঠোঁটে গোলাপী আভা বাদামী চুলের রাশ বিনুনী আর টাসেলে বাঁধা ঝকঝক করছে চোখ দুটো।

ওই কথা বলল—চাচাজী আসছেন, আপনি হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিন। পাশে বাথরুম দেখিয়ে বলল—গরম জল রাখা আছে ওখানে।

চমকে উঠলাম। এমন নিখুঁত উচ্চারণে হিমাচল প্রদেশের একটি মেয়েকে বাংলা বলতে শুনে সত্যি থ বনে গেলাম।

ও চলে যাচ্ছিল দেখে ওকে ডাকলাম। আমার মুখের ওপর চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল ও।

এমন বাংলা শিখলে কোত্থেকে?

ঝিন্নি বলল—পিতাজীর কাছে।

সংশয় জানিয়ে বললাম—তোমার পিতাজী তো এমন সুন্দর উচ্চারণে বাংলা বলতে পারেন না।

ঝিন্নির চোখে মুখে হাসি উপছে পড়ল। সে বলল—আপনার পিতাজী আমাকে শিখিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে শিখেছি ওঁর কাছে। ওঁকে আমি পিতাজী বলে ডাকতাম। আর আমার পিতাজীকে আপনার মত আমিও চাচাজী বলে ডাকি।

আমি আর কোন কথা তোলার আগেই ঝিন্নি পাক খেয়ে সিঁড়ির দিকে ফিরে তাকাল। ওর কানবালার ঝুমরিগুলো টুলটুল করে নড়ে উঠল। বিনুনীতে বাঁধা লাল টাসেল দোল খেয়ে থেমে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন নরসিংলালজী। বললেন—বহুৎ ঠান্ডা পড়া হ্যায় বাবুজী। গরম গরম চা পিও।

চাচাজী কুর্শিতে বসে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলেন। ঝিন্নির দিকে তাকিয়ে বললেন—ঝিন্নি তোমার ভাষা আমার থেকে ভাল বলতে পারে বাবুজী। ওকে মুখার্জী সাব শিখলায়েছেন।

হেসে বললাম—একটু আগে ও কথা বলে আমাকে অবাক করে দিয়েছে।

ঝিন্নি আর দাঁড়াল না। সে ঘরের বাইরে অদৃশ্য হল। শুধু তার দ্রুত পায়ের সাড়া সিঁড়িতে তবলার বোলের মত বেজে উঠল।

নরসিংলালজী বললেন—তোমার পিতাজী ঝিন্নিকে বহুৎ প্যার করতেন। ঝিন্নির মা মত রোজ জিন্দা ছিল মুখার্জী সাবকো জিজাজী বলে ডাকত। মুখার্জী সাব বলতেন—বহিনজী। ঝিন্নির মা মারা যাবার দু বরষও পার হল নাই মুখার্জী সাব চলিয়ে গেলেন। দোসরা জনমে সাগা ভাই বহিন ছিল বাবুজী।

বোধহয় চাচাজী অদূর অতীতের দিকে চোখ ফেরালেন। হাতে ধরা রইল চায়ের কাপ।

আমি কোন কথা বললাম না। স্মৃতি-ভারাক্রান্ত প্রৌঢ় একসময় হাতের কাপটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন—বাবুজী আপনা কোঠীতে আরাম করো। বলেই নীচে ধীরে ধীরে নেমে গেলেন।

একটু পরে ঝিন্নি এসে ঘরে ঢুকল। সে আর আমার দিকে চেয়ে দেখল না। টিপয়ের ওপর থেকে কাপ প্লেটগুলো নিয়ে থালায় সাজিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ও চলে যাচ্ছিল। বললাম—আলোটা নিভিয়ে দেবে?

দেয়ালের যেখানে সুইচ আছে সেদিকে ও এগিয়ে গেল হাত বাড়াল কিন্তু নেভাল না। আমার কাঁধের ওপর দিয়ে এক ঝলক তাকিয়ে বলল—আলো নিভলেই আপনার ঘুম এসে যাবে তখন রাতের খাবার খেতে চাইবেন না।

বললাম—তোমার হাতের রান্না খাবার লোভে আমার ঘুম আসবে না ঝিন্নি।

আমার কথা ঝিন্নির মুখে কি ছবি ফোটাল তা দেখার আগেই টুক করে একটা শব্দ হলো আর সারা ঘরখানা অন্ধকারে ভরে গেল। সিঁড়িতে অভ্যস্ত পা ফেলে ঝিন্নি অন্ধকারেই দ্রুত লয়ে নেমে গেল।

গায়ের ওপর কম্বল টেনে নিলাম কিন্তু চোখ চেয়ে রইলাম। ঘরে অন্ধকার বাইরে অন্ধকার। হাওয়ার শব্দ একটানা কান্নার মত বেজে চলেছে। জানালার সার্সিতে চোখ পাতলাম। দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে জোনাকীর মত আলোগুলো ঝিকমিক করে জ্বলছে। কনকনে ঠান্ডায় আলোগুলোকে অনেক উজ্জ্বল দেখায়! ওদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন চোখে ঘুম নেমে এল জানি না।

ভোরবেলা জেগে উঠে আমার প্রথম অনুভূতি হলো তিন-চারখানা কম্বলের তলায় আমি আরামে শুয়ে আছি। মুখ বের করে দেখলাম এক চিলতে রোদ আমার মাথার দিকের বন্ধ জানালা ফুঁড়ে ঝকঝকে তলোয়ারের মত মেঝেতে পড়ে আছে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম আর সঙ্গে সঙ্গে রাতের কথাগুলো কানে বেজে উঠলো। ঝিন্নির গলা 'আলো নিভলেই আপনার ঘুম এসে যাবে তখন রাতের খাবার খেতে চাইবেন না।'

মানালী—পাইন ও তুষার পাহাড়

উত্তর একটা তখন দিয়েছিলাম কিন্তু ঝিন্নির কাছে হেরে গেলাম। রাতে ওরা যে আমাকে নানা কৌশলে জাগাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে এটা আমার অনেকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। ছোটবেলা থেকেই রাতে একবার বিছানা নিলে আমাকে ঠেলে ওঠানো দায়। বড় হয়ে এই বদভ্যেস তাড়ানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু স্বভাব নাকি মলেও যায় না এই প্রবাদের পাকা উদাহরণ হয়ে বসে আছি।

মনে মনে খুশি হলাম। ঝিন্নির কাছে হেরে গেছি বলে খুশি হলাম। অনেক সময় মানুষ মনে মনে হার মেনে সুখী হয়। আজ এই রোদে ভরা সকাল আমার কপালে হারের একটা তিলক পরিয়ে দিয়ে আমাকে খুশি করে তুলল। রোদ্দুরের এক বিন্দু টিপ জানালার ফুটো দিয়ে আমার কপালের ওপর এসে পড়েছে। টিপটা আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তার উত্তাপ আমাকে ছুঁয়ে আছে।

জানালাটা খুলতেই এক ঝলক কনকনে শীতের হাওয়া প্রথমেই আমাকে কাবু করে ফেলল। বেশ খানিকটা রোদ্দুর অবশ্য ঢুকে এলো খোলা জানালা দিয়ে। আমি তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের কোলে আপেল বাগিচার একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝিন্নি। চোখ দুটো ভোরের সূর্যের দিকে চেয়ে আধবোজা রোদের জলে যেন ভোরবেলাকার স্নান সেরে নিচ্ছে সে।

পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম কোন মানুষের সাড়া নেই। চাচাজী কোথাও বেরিয়ে থাকবেন হয়ত। আমি ঝিন্নির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে পেছন থেকেই বললাম—এখুনি চলে যাচ্ছি কিন্তু।

চমকে ও পেছন ফিরে চাইল। ঝিন্নির অবাকলাগা খোলা ঝিনুকের মত চকচকে দুখানা চোখের দিকে আমি চেয়ে রইলাম।

ঝিন্নির কথা চাচা নরসিংলালজীর মুখ থেকে কত প্রসঙ্গেই না শুনেছিলাম কিন্তু ওর মুখচোখের টুকরো টুকরো অভিব্যক্তিগুলো যে এত নিটোল সুন্দর তা জানতাম না।

ও বলল—চাচাজী বাইরে গেছেন। এসে যদি শোনেন আপনি চলে গেছেন তাহলে বড় গুসসা করবেন।

বললাম, ঝিন্নি, না খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায় বল?

ও আমার মুখে কৌতুকের পাঠটা পড়তে পারল না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘরের দিকে চলতে লাগল। যেতে যেতে বলল আপনি আসুন, আমি পাঁচ মিনিটে নাস্তার জোগাড় করে ফেলছি।

বললাম, যেও না, দাঁড়াও।

ও বাগানের শেষপ্রান্ত থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল।

বললাম সব কথাকে এমন সিরিয়াসলি নাও কেন ঝিন্নি? তুমি কি মনে কর, এই ডিসেম্বরের শীতে একহাঁটু বরফ ভেঙে আবার আমি মানালীর বাংলোতে গিয়ে উঠব? আমাকে একবেলা খেতে দিলেও আমি অন্তত মাসদুয়েকের আগে এখান থেকে নড়ছিনে।

এবার ও হেসে ফেলল। দেখলাম, ঝিন্নির দাঁতগুলো খুব নিখুঁত সাজান নয়। কিন্তু অমন উঁচু-নীচু দাঁতে ওর হাসিটা আশ্চর্যভাবে মুখের সঙ্গে মানিয়ে গেছে।

ও সরাসরি বলল কাল রাতে কিন্তু অনেকবার খাবার জন্যে আমি আর চাচাজী আপনাকে সেধেছি। ঘুম ভাঙাতে পারিনি। এমন ঘুমকাতুরে আপনি!

বললাম ধাক্কাধাক্কি করেছিলে?

ঝিন্নি সারা শরীরে তরঙ্গ তুলে হাসল। হাসি থামলে বললো, এখন মনে হচ্ছে তাই করলে ঠিক হত।

আমি ওর কাছাকাছি গিয়ে বললাম তাতেও যদি ঘুম না ভাঙত, তাহলে এক-মুঠো বরফ মুখের ওপর চাপিয়ে দেখতে পারতে।

ঝিন্নি আবার তেমনি করে ঢেউ তুলে হাসল।

ঝিন্নির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, চাচাজীর কাছে তোমার অনেক কথা শুনেছি কিন্তু তুমি যে কথায় কথায় এমন হাসি ঝরাতে পার তা জানতাম না।

আশা করেছিলাম, আমার কথার জবাব ঝিন্নি হাসিতেই দেবে। কিন্তু এবার ও হাসল না। বলল, চাচাজী আপনার গল্পও অনেক করেছেন কিন্তু আপনি যে রাগ দেখাতে পারেন তা একটি বারও বলেননি।

এবার হেসে বললাম, দু-দুটো মাস রইলাম তোমাদের কাছে অনেক বদভ্যাসের খবরই এক-এক করে পাবে। তখন হয়ত ভাববে, দুটো মাস যে আর ফুরোতেই চায় না।

ঝিন্নি মাথাটা একটু নাড়ল, তারপর কোন কথা না বলে পায়ে-পায়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সকালের জলযোগ পর্ব শেষ করে বাগানের ভেতর বেড়িয়ে বেড়ালাম। অনেকটা সময় ঘুরলাম কিন্তু কাক আর কাঠ-বেড়ালী ছাড়া মনুষ্যেতর অন্য কোন তৃতীয় প্রাণীর দেখা পেলাম না।

স্থান নির্বাচনে আমার পরলোকগত পিতৃদেবকে মনে মনে কতবার যে তারিফ করেছি, তার হিসেব নেই।

জায়গাটা বেশ শান্ত নির্জন। দোকান-পাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে। কাছেপিঠে বসতির চিহ্ন নেই। নিতান্ত দরকার ছাড়া এ তল্লাটে কারো আসারও কথা নয়। যদি কেউ প্রকৃতি বা নিজের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাহলে এ বাংলো বাড়ী সত্যিকার একটা আদর্শ স্থান।

এখানে আপেলের বাগান আছে, পাহাড় আছে, আর যা আছে তা আমাকে দেখাল ঝিন্নি। বাগান পেরিয়ে পাহাড় ঘুরিয়ে ও আমাকে নিয়ে এল নদীর ধারে। বলল, বিপাশা যে এত কাছে, তা আপনি ভাবতে পেরেছিলেন?

বললাম, না। আমাকে একেবারে অবাক করে দিলে!

আরও বললাম ঘর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। পাহাড় ঘুরে একবার এখানে পৌঁছলে মনে হয়, একটা নতুন জগৎ আবিষ্কার করে ফেললাম। ঘরে বসে সারাদিন নদীর দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে এ অনেক ভাল।

ঝিন্নি বললো, আমারও ঠিক ঐ একই কথা।

হেসে বললাম মনে হচ্ছে সামনের দুটো মাস ভালোই কাটবে। অন্তত তোমার সঙ্গে গরমিলের আশঙ্কাটা কম।

ঝিন্নি হাসল। পানপাতার মত সুন্দর মুখখানা একটুখানি বাঁকা করে ভুরুর দিকে চাহনি হেনে হাসল।

পরক্ষণে হাসি থামিয়ে নদীর দিকে চেয়ে বলল, এখনও বিপাশার কলকলানি ছলছলানি আছে, কদিন পরে দেখবেন ধবধবে সাদা র‍্যাপারে গা ঢেকে চুপচাপ শুয়ে পড়ে আছে।

নদীটা বেশখানিক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওপারে পাহাড়। পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়ে বরফ ঝকঝক করছে। নীল জলের একটানা স্রোত। কোথাও পাথরের চাঁইতে ধাক্কা খেয়ে সাদা ফেনার তুলো ধুনছে।

বললাম তোমার দেশের তুলনা নেই ঝিন্নি।

ও বলল, আমার দেশ বলছেন কেন? এ দেশ কি আপনারও নয়?

বললাম, তা ঠিক তবে নতুন যা কিছু দেখছি সবই ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে কুলু ভালি ছেড়ে যেদিন চলে যাব, সেদিন সত্যি কষ্ট হবে।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর খানিকটা বিস্ময়মাখা দৃষ্টি ফেলে বললো চাচাজী তবে কেন বললেন যে আপনি মানালীতেই প্র্যাকটিশ করবেন।

হেসে বললাম, আমার ভবিষ্যৎ প্রোগ্রামগুলো তাহলে তোমার জানা হয়ে গেছে দেখছি। কথাটা হয়ত ঠিকই বলেছেন চাচাজী, তবু বলা তো যায় না। মন যতদিন চাইবে থাকার মেয়াদ ততদিন।

ঝিন্নি আর কিছু বলল না। অন্যমনে সে কি যেন ভাবতে লাগল। সকালের আলোটুকু ঝিন্নির গোল্ডেন অ্যাপেল রঙের মুখখানাকে বড় লোভনীয় করে তুলেছে। আমি আমার সামনের বন পাহাড় আর নদীর ছবি দেখব, না ঝিন্নিকে দেখব ভেবে পেলাম না।

ঝিন্নি বলল, আপনি কি এখন এখানে থাকবেন না কোঠীতে যাবেন?

বললাম, তুমি যাও ঝিন্নি। হয়ত চাচাজী এসে গেছেন। আমি খানিক বাদে আসছি।

ঝিন্নি বলল, চাচাজীর হুকুম নেই। কাল রাতে বলে দিয়েছেন আপনাকে আগলে বেড়াতে।

বললাম আমি কি ছোট একটা বাচ্চা যে আমাকে তুমি আগলে বেড়াবে?

ও আবার বলল, জানি না, হুকুম নেই একা ছেড়ে দেবার।

রাগ করে বললাম সারাদিন যদি এখানে বসে থাকি, তাহলে তুমিও কি আমাকে পাহারা দিয়ে বসে থাকবে নাকি?

ঝিন্নি কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল।

বুঝলাম, ঝিন্নি দারুনরকম পিতৃভক্ত। ও আমাকে নির্জনে রেখে এক পাও নড়বে না।

বাংলোর পথে পা বাড়িয়ে বললাম চল তাহলে বাংলোতেই ফেরা যাক। এখানে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে জানলে কে নামত মানালী থেকে কুলুতে।

ঝিন্নি কোন উত্তর করল না। অপরাধীর মত মুখ নীচু করে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। আড়চোখে দেখলাম, ঝিন্নির মুখে একটা বিষণ্ণ ভার ছায়া ফেলেছে। চলতে চলতেই বললাম তবে একটা লাভ নিজের ইচ্ছেমত চলা ফেরার শক্তি হারালেও আর একজনের সঙ্গ পাওয়া যাবে।

ঝিন্নি এবারও কিছু বলল না। নিঃশব্দে আমার সঙ্গে বাংলোয় ফিরে এল।

মধ্যাহ্নভোজের খানিক আগে ফিরলেন নরসিংলালজী। মুখোমুখি হতেই বললেন, আখরা বাজারসে মাসকাবারী সওদা করে আনলাম। তোমার খানাপিনা হয়েছে তো?

বললাম সকালে ঝিন্নি কাল রাতের খাবারটা খাইয়ে দিয়েছে, তাই এত বেলাতেও ক্ষিদে নেই।

নরসিংলালজী দরাজ গলায় হেসে বললেন, বেটী খাওয়াতে পারলেই খুশি। একটু থেমে বললেন বাবুজী, ওর মায়ের দিলটা বিলকুল এমনি ছিল। তোমার পিতাজী এ বাংলোতে ঠিক এই টাইমে এসে থাকতেন আর ঝিন্নির মা দু-তিন মাহিনা ওঁকে বহুৎ যত্ন করে খাওয়াতো।

প্রৌঢ় নরসিংলালজী কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে ঝিন্নির মায়ের কথা বোধহয় ভাবতে লাগলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, চাচা নরসিংলালজী আবেগপ্রবণ মানুষ। পারি-পার্শ্বিক ভুলে তিনি নিজের ভেতর ঘুরতে লাগলেন। দেখলাম, ফেলে আসা জীবনের ব্যথাটুকু তিরতির করে কাঁপছে তাঁর চোখের তারায়।

যে অতীতকে আমরা কোনদিনও ফিরে পাব না তার জন্যে মনের ভেতর গভীর এক মমতা থাকে। বাইরের হাওয়ায় যখন অতীতের জানালাটা খুলে যায়, তখন ঐ কোমল মমতার গায়ে ছোঁয়া লাগে। আর অমনি ঝিরঝির করে ঝরতে থাকে ব্যথার নদীটা।

ঝিন্নি এসে সামনে দাঁড়াল। নির্বাক দুটো মানুষের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল, খানা রেডি এখন চটপট তৈরী হয়ে নিতে হবে।

পরিস্থিতিকে হালকা করার জন্যেই বললাম, চাচাজী, আপনি বেশ লোকের জিম্মায় আমাকে ফেলে গেছেন যা হোক। ঘুমুলে পাহারা হাঁটলে পাহারা, বসতে খেতে সব সময় পাহারা। ওর গার্জেনীর জ্বালায় সকাল থেকে জ্বলছি।

নরসিংলালজীর ধ্যান ভাঙল। তিনি হেসে বললেন, খুব জ্বালাচ্ছে বুঝি? একা আমার ওপর খবরদারী করত, এখন আর একজন মানুষ পেয়েছে।

বললাম একা একা কোথাও ঘুরে বেড়াই এটা বোধহয় ঝিন্নির পছন্দ নয়।

নরসিংলালজী বললেন, ওটা ওর দোষ নয় বাবুজী। তোমাকে একটু সামলে রাখতে আমিই বলেছিলাম।

কৌতূহলী হয়ে বলে উঠলাম, কেন চাচাজী?

সে অনেক কথা বললেন নরসিংলালজী, এখানে বনে বনে পাহাড়ের খাঁচে খোঁচে যোগনীরা থাকে। ওরা বাবুজী কারো খারাপ ছাড়া ভাল করে না।

অবাক হয়ে বললাম, যোগনী কি, চাচাজী?

নরসিংলালজী বললেন ওরা হল ইভল স্পিরিট। মারা যাবার পরেও এই

খুকু বড় হইয়ে শ্বশুরালয় গেল কিন্তু
এই ফটোই তার শৈশব স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

প্রতি ১২৮ রোলের ফিল্মে আপনি ১২টি বড় সাইজের (৩×৪ সেঃমিঃ) ছবি পাবেন।
সব সময়ে ব্যবহারযোগ্য চামড়ার খাপ, পোর্ট্রেট লেন্স এবং ফ্ল্যাশগান —
এ সবই পৃথক মূল্যে পাওয়া যায়।
শাই, পরিষ্কার প্রিন্টের জন্য এবং এনলার্জমেন্টের জন্য সর্বদা আগফা-গেভার্ট
ফোটো পেপার ব্যবহার করুন।
প্রত্যেক অনুমোদিত আগফা-গেভার্ট ডিলারের কাছে পাওয়া যায়।

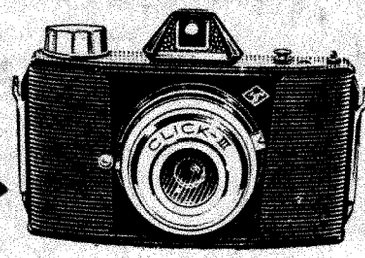

Agfa

AGFA

একমাত্র পরিবেশক : আগফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড
মর্চাণ্ট চেম্বার্স, ৪১, নিউ মারীন লাইন্স, বোম্বাই ৪০০০২০
শাখা : বোম্বাই ● নিউ দিল্লী ● কলকাতা ● মাদ্রাস।
● ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধীয় যাবতীয় উৎপাদনের প্রস্তুতকর্তা আগফা গেভার্ট অ্যাক্টিওগার্স / লিভারকুসেন এর ট্রেডমার্ক
ভারতে প্রস্তুতকারক : ফিলিপস ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

SIMOES/AG/2/73 BEN

দুনিয়ার মায়া কাটাতে পারে না। ঝোপ-ঝাড়ের আঁধারে আঁধারে নিরালা পাহাড়ের কোণে কোণে ঘুপটি মেরে বসে থাকে। জান পহচানে আদমীকে বাগে পেলে ছোড়বে না। আর অচেনা মানুষ দেখলে ওরা তার পিছু আলবৎ ঘুরবে। তার জান নিকলে ছাড়বে।

নরসিংলালজী প্রবীণ মানুষ। তাঁর এতদিনের সংস্কারে আঘাত দিয়ে লাভ হবে না জেনে চুপ করে রইলাম।

ঝিন্নির মুখের দিকে চাইলাম। বাবার বিশ্বাস তার মুখে কি ছায়া ফেলেছে তাই দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঝিন্নির মুখে কিছুই পড়া গেল না।

আবার বেলা পড়ে এলে ঝিন্নির সঙ্গে বেড়াতে বেরোলাম। চাচাজী সারা বছরের হিসেবের খাতা খুলে বসেছেন, তাই আমাকে সঙ্গ দিতে পারলেন না বলে দুঃখিত হলেন। কিন্তু ঝিন্নিকে সঙ্গে দিতে ভুললেন না।

বাগান পেরিয়ে ঝিন্নি বলল, কোনদিকে যাবেন?

বললাম সেদিকে যোগনী আছে।

ও একবার থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, বিশ্বাস হয়নি বুঝি চাচাজীর কথা? আপনার কপালে সত্যি দুঃখ আছে।

বললাম, দুঃখ যদি কপালে বিধাতা-পুরুষ লিখেই থাকেন তাহলে তাকে খণ্ডাবে কে বল? ঝিন্নি শক্ত করে আমার হাতখানা টেনে রাখলেও কি আর যোগনীর হাতের টান থেকে আটকাতে পারবে?

ঝিন্নি চলতে চলতে বলল, আপনি ভীষণ অবিশ্বাসী।

বললাম, অবিশ্বাসী বোলো না। উদ্ভট কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই। সবকিছু যাচাই করে তবে বিশ্বাস করতে চাই।

আমরা এখন নদীর দিকের পাহাড়টাকে ডাইনে রেখে চলেছি। ঝিন্নি একটু পরেই বাঁদিকে বেঁকে একটা অতি সংকীর্ণ পথ ধরে চলতে লাগল। পথটা ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গেছে। পাহাড়ের কোল জুড়ে ক্ষেতি। এখন কোন ফসল নেই। সব ফসলই ঘরে তোলা হয়ে গেছে। দূর থেকে ভারী সুন্দর লাগে ক্ষেতগুলো দেখতে। সমুদ্রের কয়েকটা আছড়ে পড়া ঢেউ যেন বেলাভূমিতে সীমাচিহ্ন আঁকতে আঁকতে সরে গেছে।

আমরা ক্ষেতি পেরিয়ে আসার সময় কাটা ফসলের পরিত্যক্ত অংশগুলো পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে নামতে লাগলাম। অনেক-খানি নীচে নেমে কয়েকটা দেওদারের জটলার ভেতর এসে পড়লাম। এটুকু পথ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নামতে গিয়ে এই ডিসেম্বরেও আমার শরীরে তেমন কোন শীত বোধ হচ্ছিল না। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আমাকে ছুঁয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মিঠে আওয়াজও কানে এসে বাজল।

ঝিন্নি এতক্ষণ একটি সোনার হরিণের মত শেষ বেলার রোদ্দুর গায়ে মেখে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল আর আমি সেই রবিঠাকুরের গানের মনোহরণ চপলচরণ হরিণটিকে অনুসরণ করে চলছিলাম। এখন ঝিন্নি থেমে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। গলায় আমন্ত্রণের সুর তুলে বলল, এটা একেবারে আমার নিজস্ব জায়গা। আসুন এখানে বসা যাক।

বলতে বলতে আরও খানিকটা এগিয়ে দেওদারের জটলার ভেতর ঢুকল ঝিন্নি। আমিও ওর পেছন পেছন বনের ভেতর ঢুকলাম। একটুখানি ভেতরে গিয়েই ঝর্ণাটার দেখা পেলাম। দুটো দেওদারের পাশ কাটিয়ে একটা পাথরের চাঁইকে আধ-খানা বেড় দিয়ে জলের ধারা নেমে গেছে। ঝিন্নি বলল, জায়গাটা সুন্দর না? বসা যাক এখানে।

বসলাম। আমার খুব ভালো লাগছিল। ঝিন্নি আমার একটু তফাতে ঐ পাথরের চাঁইটার নীচের ধাপে পা ঝুলিয়ে বসল। ও ইচ্ছে করলে পা ডুবিয়ে ঐ ঝর্ণার জল ছুঁয়ে খেলা করতে পারে।

বললাম আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। মনে হচ্ছে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ যেন পালিয়ে এসে লুকিয়ে আছে এখানে।

দেখলাম, আমার কথাটা শুনেই কেমন যেন চমক লাগলো ঝিন্নির দেহে। সে কিন্তু আমার দিকে চাইল না। মুখটা একবার তুলেই ঝর্ণার দিকে চোখ নামাল।

ঝিন্নি গাঢ় মেরুন রঙের একটা পোষাক পরেছে। কুলুর মেয়েদের পোষাক পরার বিশেষ ধরন আছে একটা। মনে হয় ওদের কাপড়ের ঘূর্ণিটা শুরু হয় বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে। তারপর কাপড়খানাকে ডান কাঁধের তলা দিয়ে টেনে নিয়ে বুক ঢেকে বাঁ কাঁধের তলা দিয়ে পিঠ বেড়ে আবার ডান কাঁধে ফেলে দেয়। পিন দিয়ে সুন্দর করে আটকে নেয় কাপড়টা। কোমর থেকে হাঁটু অবধি জড়িয়ে নেয় পছন্দমত রঙের ব্ল্যাঙ্কেট। শীতে ওরা উলেন ট্রাউজার পরে। গরমে প্রায় মেয়েই ট্রাউজার পরে না। সাদা নিটোল অনাবৃত পায়ের অনেক-খানি অংশই তখন নজরে আসে।

গাঢ় নীল রঙের একটা ব্ল্যাঙ্কেট ঝিন্নির কোমর জড়িয়ে আছে। বুকের ওপর পড়ে আছে হারখানা। লাপিস লাজুলি পাথর সেট করা পেন্ডেন্টটা ওর বুকের ওপর জেগে ওঠা দুটি নিটোল স্তনের মাঝখানের উপত্যকায় লুটিয়ে পড়ে আছে।

এই মাত্র শেষ বেলার কয়েক টুকরো রোদ ডালপালার ফাঁকে এসে পড়ল ঝর্ণা আর ঝিন্নির ওপর। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ঝিন্নি অসাধারণ। ওর তারুণ্য বেলা শেষের রোদ মেখে ঝর্ণার জলে যেন সোনার বিন্দুর মত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মনে নেই ওকে দেখার মোহে কত-গুলো মুহূর্ত আমার পার হয়ে গিয়ে-ছিল। এক সময় ঝিন্নিই কথা বলতে সুরু করল, আমি কোঠীতে এলে রোজ বিকেলে এখানে চলে আসি। আমার খুউব ভালো লাগে এখানে একা একা বসে থাকতে।

বললাম, তোমার জমিদারীতে এমন অবাক করে দেবার মত জায়গা আরও কটি আছে ঝিন্নি?

ও আমার দিকে তাকাল। মুখে মিষ্টি হাসি। বলল আমার জমিদারী বলছেন কেন, এ তো আপনারই জমিদারী। আমা-দের দয়া করে দেখা শোনার ভার দিয়ে-ছেন।

কথাটা সোজা আমার মনের ওপর এসে ধাক্কা দিল। কথা সত্যি হলেও অনেক সময় তার সূক্ষ্ম আঘাত দেবার একটা ক্ষমতা থাকে। ঝিন্নির কথায় সেই আঘাতটা বুকে এসে বাজল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে এক সময় বললাম, দয়ার কথা এল কেন ঝিন্নি। আমার বাবার সঙ্গে কি তোমাদের দয়ার সম্পর্ক ছিল?

ঝিন্নি সঙ্গে সঙ্গে গভীর আবেগে প্রতিবাদ করে উঠলো না-না। কখখনো না।

হেসে বললাম, তাহলে? বাবার পরে আমার ওপর তোমাদের ভরসাটা নিশ্চয়ই কমে গেছে।

ঝিন্নি বললো, রাগ করবেন জানলে কথাটা বলতাম না। এখন ক্ষমা করা আর না করা আপনার দয়া।

বললাম ক্ষমা কেবল একটি সর্তেই করা যেতে পারে।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর চোখ রেখে তাকাল।

বললাম, দয়া কথাটাকে আজ থেকে ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। অন্তত আমার সঙ্গে কথা বলার সময় ঐ শব্দটি কোন-রকমেই তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে না, এ প্রতিশ্রুতি চাই।

ঝিন্নির মুখে চোখে হাসি উপছে পড়ল। সে চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে জানাল আমার কথা সে মেনে চলবে।

বললাম, ঝিন্নি, তুমি ভাল করেই জানো মা মারা যাবার পরে আমি আর বাবাকে কাছে পাইনি। দশ বছরের ছেলে থেকেছি মাসীর বাড়ি। তারপর আরও পনেরটা বছর কেটে গেছে কলকাতায়। শুধু মাসের প্রথমে মানি-অর্ডারের পাতায় ছিল বাবা আর ছেলের যোগাযোগ। সেদিক থেকে বরং বলব তোমরা তাঁর অনেক কাছের মানুষ। অনেক আপনার জন। তাই তাঁর এই কুলু ভ্যালির দু' দুটো সম্পত্তির ওপর তোমাদের দাবীটা আমার চেয়ে কিছু কম নয়, বরং অনেক বেশী বলেই মনে হয় আমার।

হঠাৎ কি হলো ঝিন্নির, চোখ দুটো তার ছলছলিয়ে উঠল। দুটো হাতের পাতায় সে মুখ আর চোখ ঢেকে ফেলল।

বললাম কি হলো ঝিন্নি, অমন করছ কেন?

ও আমার কথায় আরও ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

এই প্রথম আমি ঝিন্নির মাথায় হাত রেখে নাড়া দিয়ে বললাম, কান্নার কি হলো ঝিন্নি, আমি তো তোমাকে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলি নি।

কিছু পরে ঝিন্নি চোখের জল মুছে স্থির হয়ে বসল। তারপরেও অনেকক্ষণ তার পক্ষে কোন কথা বলা সম্ভব হল না।

আমি এক সময় বললাম তোমাকে যদি কোন কারণে দুঃখ দিয়ে থাকি, তাহলে তুমি ছোট হলেও আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ও আমার নীচের ধাপে বসেছিল। হঠাৎ হাতখানা আমার হাঁটুর কাছে ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকাল। বলল, ক্ষমার কথাই উঠছে না। মনের খুশি ধরে রাখতে পারলাম না তাই আসি হয়ে গড়িয়ে এল।

বললাম, কিসে এমন খুশি হয়ে উঠলে ঝিন্নি?

আপনার কথায়, বাবুজী।

ব্যাপারটা ধরতে না পেরে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে ও বলল আজ এখুনি আমি যে কত খুশি তা আপনাকে কেমন করে বোঝাব বলুন।

কথা থামিয়ে ঝিন্নি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে স্থির চাহনি মেলে বসে রইল। তার মুখে তখন আশ্চর্য এক সুখ খেলা করছিল। খুশির সূক্ষ্ম আলোর ঢেউগুলো যেন উপচে পড়ছিল তার চোখের তারা থেকে।

ঝিন্নি বলল, আপনার পিতাজী মারা যাবার মাস খানেক আগে বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর যাবার সময় এগিয়ে আসছে। তিনি আমার বাবাকে ডেকে বললেন সব সম্পত্তি তোমার নামে আমি লিখে দিতে চাই। আমার ছেলে ডাক্তার হয়েছে, তার পথ সে দেখে নিতে পারবে।

চাচাজী অমনি বললেন, তা হয় না দাদাজী। ভাতিজার সঙ্গে আমি বেইমানী করতে পারবো না। দোহাই আপনার এমন অনুরোধ আপনি করবেন না।

পিতাজী অমনি রাগ করে বললেন, চিরকালটা গোঁয়ার রয়ে গেলে, নরসিংলাল। শেষে হয়ত পস্তাতে হবে।

চাচাজী কথায় ছেদ টেনে দিয়ে বললেন দাদাজী, তোমার ছেলের কথাটা ভেবে দেখ একবার। আমরা পেলাম তোমার পুরা ভালবাসা আর ও বেচারা পাবে তোমার শুকনা পাথর আর মাটি। আমি এও জানি দাদাজী, তোমার লেড়কা বাপকা বেটাই হবে। তোমার দিল ও জরুর পাবে।

একটু থেমে আবার বলল ঝিন্নি, তাই কাঁদছিলাম। আপনার ভেতর আপনার পিতাজীর দিল দেখে কাঁদছিলাম।

আমি এবার বললাম তোমার ধারণাটা একদিন যদি ভুল হয়ে যায় ঝিন্নি? হয়ত দেখবে কুলুর দু' দুটো আপেল বাগিচার মালিক হয়ে আমি তোমাদের ভুলে গেছি।

ঝিন্নি আমার দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল। বলল, ঝিন্নির আন্দাজ কখনো ভুল হয় না বাবুজী।

বললাম, নিজের ধারণার ওপর এতটা ভরসা নাইবা রাখলে। পরে কোনদিন আঘাত এলে সহজে সামলাতে পারবে না।

কথা বলতে বলতে দুজনে এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে ঝর্ণার জল থেকে রোদের সোনালী উত্তরীয়খানা কখন গাছের ডালে পাতায় দুলতে দুলতে পাহাড়ের আড়ালে উড়ে চলে গেছে তা জানতে পারিনি। কথা বলার ভেতর দিয়ে একটা ভাল লাগা আমাদের দুজনের মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ঠিক যেন কথার টানাপোড়েনে একটা নকসী পাড় বোনা চলছিল এতক্ষণ। কথাগুলোর হয়ত বিশেষ কোন ব্যবহারিক অর্থ ছিল না, কিন্তু পারিপার্শ্বিক ভুলিয়ে দেবার অসাধারণ একটা ক্ষমতা ছিল সেই টুকরো টুকরো কথার।

খেয়াল হলো হঠাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে আসায়।

ঝিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন শোনার জন্যে কান পাতল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

ঝিন্নি অসংকোচে আমার হাতখানা ধরলো। বনের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, ঝড় উঠেছে একদম খেয়াল হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি উঠতে হবে ওপরে।

আমি ঝিন্নির হাত ধরে ঐ সরু ভাঙা পথে ওপরে উঠতে লাগলাম। পাহাড়ে আন্দাজ করে পথ চলা বড় কঠিন। সন্ধ্যার মুখে যে অস্পষ্ট আলোটুকু পথ দেখায়, কয়েকটা মেঘের তাল আজ তা শুষে নিয়েছিল।

থেকে থেকে ঝিন্নির গলা বেজে উঠছিল। ওর নির্দেশেই আমি প্রায় অন্ধের মত পা ফেলে ফেলে চলছিলাম। কোন কোন জায়গায় ও আমাকে নীচ থেকে টেনে ওপরে তুলছিল। ওর শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পেয়ে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

বাগানের খানিক নীচে থেকেই শুনতে পেলাম চাচাজীর গলা। তিনি ফিরিয়ে ফিরিয়ে ঝিন্নি আর আমার নাম ধরে ডাকছিলেন।

ঝিন্নি মুখের ওপর হাত দুটো বিশেষ ভঙ্গীতে জড়ো করে এক ধরনের শব্দ করল। অমনি চাচাজীর ডাক থেমে গেল। মনে হল আমাদের অবস্থান জানতে পেরে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন।

ঝিন্নি বলল, চাচাজী আমাদের খোঁজে নদীর দিকে গিয়েছিলেন।

বললাম, বুঝলে কি করে?

ও বলল ওঁর ডাকগুলো আসছিল নদীর পাহাড়টার কোল থেকে।

তারপর আবার বলল, আমরা যে এত নীচে ঐ দেওদার বনের কাছে চলে গেছি তা চাচাজী ভাবতেই পারেন নি।

বললাম, সত্যি এতটা পথ গিয়ে আমরা বোধহয় ভাল করিনি। চাচাজী আবার না রাগ করে বসেন।

ঝিন্নি বলল, এতক্ষণ তো গল্প করলেন এখন না হয় একটু বকুনিই খেলেন। বকুনি খাবার অভ্যেস বুঝি নেই আপনার?

আমরা ততক্ষণে আপেল বাগিচা পেরিয়ে বাংলোর চাতালে এসে পড়েছি। ঝিন্নি আচমকা আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভেতর দৌড়ে পালাল।

বললাম, এখনও আমি অন্ধ হয়ে আছি ঝিন্নি কিছু ঠাওর করতে পারছি না।

ভেতর থেকে কোন আওয়াজ এলো না, হঠাৎ সারা উঠোন বিজলী আলোর তরঙ্গে ভেসে গেল।

বাংলোর ভেতর ঢুকতে ঢুকতে আশ্চর্য এক অনুভূতি হল। ঝিন্নির খুশি যেন একঝলক আলো হয়ে আমার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে আছে।

সন্ধ্যে থেকে হেঁকে হেঁকে ঝড়ো হাওয়া বইছিল। আমরা তিনজনে একই সঙ্গে বসে রাতের খাবার খেলাম। খাওয়া শেষ হলে নরসিংলালজী কয়েক মিনিট ব্যবসা-বাণিজ্যের মামুলি দু' একটা কথা তুললেন, কিন্তু আমার দিক থেকে বিশেষ কোন সাড়া না পেয়ে বললেন বাবুজী, নিদ যাও।

বলে তিনি বাইরের ঘরে শুতে চলে গেলেন।

এই বাংলোবাড়ী তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বাগানের অপর প্রান্তে আর একখানা আউট হাউস তৈরী করেছিলেন। দিল্লি কলকাতার মত দূর দূর সিটি থেকে যেসব ক্রেতারা ফল আর পশমিনার জন্যে আসত, তাদের থাকতে দেওয়া হত ঐ আউট হাউসে।

আমি আসার পর ওপরের ঘরখানা আমাকে ছেড়ে দিয়ে নরসিংলালজী আউট হাউসে আস্তানা পেতেছেন। আমি বাধা দিয়েছিলাম এ ব্যবস্থায় কিন্তু ফল হয়নি। আমার বাবা নাকি এই ঘরটি ব্যবহার করতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আমাকেও তাই করতে হবে।

রাতে নরসিংলালজী বাগান পেরিয়ে শুতে চলে গেলে আমিও ওপরে উঠে এলাম। সন্ধ্যে থেকে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। আজ লেপের তলায় নিজেকে সঁপে দিয়েও শীতের হাওয়ার কনকনে কামড় থেকে রেহাই পাচ্ছিলাম না। ছেলেবেলা থেকেই আমার শীতবোধ একটু মাত্রা ছাড়ানো। তাই এখানকার শীত আমাকে একেবারে যেন পেড়ে ফেলল। পায়ের তলায় একস্ট্রা কম্বলখানা লেপের ওপর চড়াতে গেলাম। তার ফাঁকফোকরে শীতের হাওয়া ঢুকে আমাকে হাড়ে কাঁপনি ধরিয়ে দিল। একপাশ হয়ে পড়ে থাকলে তবু একরকম। পাশ ফিরলেই বরফের একখানা তলোয়ার সিধে হাড় অব্দি গেঁথে যায়।

(ক্রমশঃ)

ফাদার দ্যতিয়েন রোজ নামচা

পাকিস্তান ইসলামী গণতন্ত্র হলে কি হবে, সমগ্র পাকিস্থানের—এবং আজ বাংলাদেশেরও—প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছোট ক্লাস থেকেই ভাষা, বিজ্ঞান অঙ্কাদি ছাড়া ছাত্রদের নিজস্ব ধর্মও অবশ্যপাঠ্য। মুমিনেরা পড়ে 'ইসলামীয়াত', হিন্দুরা পড়ে 'সনাতন ধর্মতত্ত্ব', বৌদ্ধেরা পড়ে 'সদ্ধর্ম সুধা'। সিরিজগুলির লেখকগণ যথাক্রমে মুমতাজুল মুহাদ্দিসীন, সপ্ততীর্থদর্শনশাস্ত্রী - সিদ্ধান্তবাগীশ - ভক্তিভূষণ, সাহিত্যবিনোদ - সূত্রাবলয়বিশারদ। তবে না ছাত্রেরা পরস্পরের ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় না। অর্থাৎ সবাই পায় না।

কমল আর কামাল পেয়েছে—নিয়েছে। কমলের আসল নাম ক্ষিতীন্দ্র, তবে মুমিন বন্ধুর নামের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে নিজের নাম সে রেখেছে কমল। ওর অবশ্য আরও অনেক নাম আছে : খোকন, বাপি বাবুসাহেব—

কমল আর কামাল পড়ে ধানমণ্ডি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর খ-বিভাগে—প্রথম বেঞ্চে পাশাপাশি বসে। বর্ষাবন্ধে অন্য সেকশনে কায়েম হওয়াতে কমল ছেলেটি এত কান্নাকাটি করেছিল যে, পিতামাতার অনুরোধে সরস্বতী পুজোর পরে কামালের ঐ খ-বিভাগেই তাকে ফের স্থানান্তরিত করা হয়। মাণিকজোড় আলাদা করে শেখে একমাত্র ধর্ম।

কমলের বড় কৌতূহল : কামালেরা 'ইসলামীয়াতে' কি সব পড়ে...কামালেরও জানার ইচ্ছা হয়, কমলদের 'সনাতন ধর্মতত্ত্ব' পদার্থটা কি। রোববারে তাই পরস্পরের গৃহে তারা ক্লাস করে। উভয়েই উভয়ের শিক্ষক : কমল কামাল-হুজুরের লাগরেদ, কামাল কমল পণ্ডিতের ছাত্র...। অধ্যয়নান্তে 'আম্মার' কিংবা 'মায়ের' হস্তাক্ষরে একই থালায় ভূরিভোজ। নন্দনকে সতর্ক করে মা বলেন : 'সাবধান তোর থালার বড়-গোস্ত ছুঁবি না'...বেটাকে আম্মা শাসান : 'খবরদার, তোর মাসীর পুজোর প্রসাদ খেতে নেই।'...আর হ্যাঁ কমলদের বাড়িতে কমলের ছোট বোন একলীন্ত মিষ্টু চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় দূর থেকে পিতৃদেবকে আসতে দেখে সংকেতের তুড়ি বাজায়...কমলের মা তখন 'পালা'...বলে সংক্ষিপ্ত ভাষণে কামালকে তাঁর পাকশালা নিরলঙ্কৃত করার আদেশ দেন। কমলের বাবার মতে, ছুঁৎ-অছুঁৎ ব্যাপারে ওদের কোনো কেলেঙ্কারি 'সনাতন সমাজে' রাষ্ট্র হলে মিষ্টুর সপ্তপদীর আর আশা থাকবে না। মিষ্টু মাকে বলে : 'ক্ষতি কি মা? আমি তো কামালদাকেই বিয়ে করব—'

'হা কালী, সর্বনাশ' বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে মা অভুক্ত লুচি আর সন্দেশগুলি ঠোঙ্গায় পুরে কমলকে বলে : 'শিগগির যা...কামালদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আয়...'

আজকে ছিল ধর্মের বার্ষিক পরীক্ষা। স্কুল-ফেরৎ দুই বন্ধু কামালদের বৈঠকখানায়, পরস্পরের সাইক্লোস্টাইল-করা প্রশ্ন রিভাইজ করছিল; আমি তখন ঘরের এক কোণে বসে কামালের আব্বার সঙ্গে আলোচনায় মশগুল। হঠাৎ শুনি : 'নিমি কে? আত্রেয়ের আব্বা। জবালা কে? সত্যকামের আম্মা। নীলাম্বর কে? চৈতন্যের নানা। কাত্যায়নী কে?' যাজ্ঞবল্ক্যের ছোট বিবি—ছাত্র কামালের পাণ্ডিত্যে আশ্চর্য হয়ে কমলপণ্ডিতকে অভিনন্দন জানালাম। কমল বলল, 'এবার শুনবেন কামালের বানানো 'সনাতন নামতা?' সবিনয়ে কামাল আবৃত্তি করল : 'দুই অশ্বিনীকুমার ত্রিমূর্তি চতুরানন পঞ্চকোষ ষড়রিপু সপ্তসিন্ধু অষ্ট বসু নবগ্রহ দশ বিশ্বদেব একাদশ রুদ্র দ্বাদশ আদিত্য ষোড়শ শ্রাদ্ধ ছিয়াশী নরককুণ্ড...' তারপর একটু থেমে সে বলে : 'আরও আছে...বড় বড় সংখ্যা সব, যেমন—কমলের চৌরাশি লক্ষ পূর্বজন্ম ভারতের সাড়ে তিন কোটি তীর্থস্থান...কমল বলে কি জানেন? ওর সেই চৌরাশি লক্ষ পূর্বজন্মের এক জন্মে ও ছিল আরব দেশের এক পরাক্রান্ত শেখ, ওর ছিল তিনশো তাঁবু আর সাড়ে পাঁচশো উট...ও জাতিস্মর কিনা, স্বপ্নজাতিস্মর।'

কমলের মতে অবশ্য কামালও ছিল

আপনার পরিবারের সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য
হাওড়া সমবায়িকা

পূর্বজন্মে মহর্ষি ব্যাসের এক শিষ্য তাই সংস্কৃত শ্লোকের তার এত সুন্দর উচ্চারণ। সম্ভ্রান্ত অতিথি এই অধমের জন্য কামাল আবৃত্তি করল : 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ / শ্মশানানলদগ্ধোসি, পবিত্রাস্তোসি বান্ধবৈঃ / ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব...' তারপর বিনা প্রস্তাবনায় কমলের প্রতি শর নিক্ষেপ করে সে বলল : 'বেচারী গান্ধারীও তো পঞ্চাশবার ঐ কথাগুলো শুনেছিল, পুণ্যনীরে স্নান করেছিল পুণ্যক্ষীর পান করেছিল, আর তবু সুখী হল কৈ?...পতির প্রতি ভক্তির দরুন তার সেই পঞ্চাশ জন্মের কথার তার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল, তার মধ্যে কোনো খুঁতই ছিল না আর তবু উনপঞ্চাশত্তম জন্মের বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে একশত পতঙ্গের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে সে যে-পাপটা করেছিল, তার ক্ষমা বুঝি এতদিন হতে পারল না? তার শাস্তি নাকি হল একজন্মেই একশ' বেটার খুন?'

উত্তরটা কমলের মুখস্থ ছিল : 'একশত পতঙ্গের একশত জননীর শোকের বিনিময়ে গান্ধারীর একশত জন্মেই পুত্রশোক প্রাপ্য ছিল।' কথাটা কামালের মনঃপূত নয় : 'আসলে পুনর্জন্মের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই যে, দুই জন্মে দুই নারীকে আমি আম্মা বলতে পারি না।'

'তাই বুঝি একই জন্মে তোমরা চারজনকেই আম্মা বলতে শেখ?'...বলে পাল্টা উত্তরের কিংবা মারের জন্য অপেক্ষা না করে কমলপণ্ডিত ছুট দিল। তার পিছনে ছুটল ছাত্র কামাল।

স্মিত হাসি হেসে কামালের আব্বা বললেন, 'জানেন? যে জেতে কারবালায় সে হারে কুরুক্ষেত্রে...' কারবালা কামালদের উঠোন, কুরুক্ষেত্র কমলদের বাড়ির পিছনের মাঠ। বাইরে থেকে শোনা যায় কামালের জুলফিকার ও কমলের গাণ্ডিবের ঠনঠনে সংঘর্ষ।

দাদাদের প্রস্থানের সুযোগ নিয়ে খেলাধুলো ছেড়ে ঘরে প্রবেশ করে কামালের ছোট বোন - মরিয়ম আমাকে বোঝায় তুলনাত্মক ধর্মের প্রতি তারও আকর্ষণ অল্প নয়। তাদের স্কুলে সিস্টারেরা নাকি এক প্রার্থনাগৃহ সাজিয়েছেন। তাতে কোনো মূর্তি কিংবা বাতি কিংবা ফুলদানি কিছুই নেই শুধু আছে মেঝেতে চারটে গাদুর আর দেওয়ালে তিনটি উদ্ধৃতি—ছাত্রীদের স্বনির্বাচিত এক সংকলন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের এই তিনটি উল্লেখ স্কুলের পাঠক্রমের প্রথম পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত। প্রথম উদ্ধৃতি বাইবেলের : 'বিধানের প্রথম আজ্ঞা এই যে ঈশ্বরকে তুমি মনেপ্রাণে ভালোবাসবে; আর দ্বিতীয় আজ্ঞা সেই প্রথম আজ্ঞারই সদৃশ : তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতোই ভালোবাসবে।' দ্বিতীয় উদ্ধৃতি গীতার : 'যে শুদ্ধবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তির সঙ্গে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তার সেই ভক্তি-উপহার প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করি।' তৃতীয় উদ্ধৃতি কোরান শরিফের সুরা ফাতেহা : 'সকল তারিফ সারা জাহানের পালনকর্তা শুধু আল্লার জন্যই। তুমিই পরম করুণাময় ও দয়াময়। তুমিই বিচারদিনের মালিক। শুধু তোমারই আমরা ইবাদত করি, আর শুধু তোমার কাছেই আমরা সাহায্য চাই। তুমি আমাদেরকে সরল সহজ পথ দেখাও। তাদেরই পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত ও গোমরাহ।' উদ্ধৃতিটা সেই 'কথ্যভাষায় প্রথম ও মূলানুগ অনুবাদ' থেকে গৃহীত, যার মধ্যে নাকি 'শব্দচয়নে কোরান শরিফের স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।' অনুবাদকের সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছা করে। কোরান শরিফের 'সাহিত্যগুণ শুধু মুমিন কেন, অমুমিন সমাজেও বিশ্বস্বীকৃত; সেই সর্বজনীন আবেদন অনুবাদে রাখতে হলে উন্নতমানের শৈলীর প্রয়োজন—যেমন প্রয়োজন বাইবেলের সেই সমস্ত কাব্যাংশে যার বাংলা প্রচলিত অনুবাদে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ।

কাগজটা মরিয়মের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমি বললাম 'স্কুলের ঐ প্রার্থনাগৃহটা আমি খুব দেখতে চাই, তবে কি জান, তোমাদের ভাষাটা একটু ঘষেমেজে চানকে নেওয়া দরকার; তোমার সিস্টারদের বল ইবাদত গোমরাহ পালনকর্তা...আর ফার্সি-তৎসম খিচুড়ির দিকে একটু নজর রাখতে।'

ঈষৎ অপমানিত বোধ করে খাতা-পেন্সিল আমার হাতে গুঁজে দিয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে মরিয়ম বলল : 'দেখি তাহলে আপনার খিচুড়িটা কিরকম!' সবিনয়ে জানালাম, 'মুমিনও যে নয়, বাঙ্গালীও যে নয় তার তো সাতখুন মাপ!' তার বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করে মেয়েটি বলল, 'আঙ্কেলটা কিন্তু মন্দ নয়, কি বল আব্বা?'

আমার সপক্ষে আব্বার কিছু বলার নেই দেখে আত্মসম্মান রক্ষার্থে অনুবাদে হাত দিলাম : 'ধন্য তুমি পরমেশ্বর, জগৎস্বামী, করুণাঘন, ভক্তবৎসল, বিচারদিনের বিচারপতি। তোমাকেই পূজা করি, তোমারই সাহায্য চাই। সৎপথে আমাদের পরিচালিত কর...'

লেখাটা পড়ে কোনো মন্তব্য প্রকাশ না করে মরিয়ম বলল, 'অনুবাদটা আমার ডায়েরিতে লিখুন...আমার বন্ধুদের দেখাব বলব 'সাহেবের লেখা'...দাম বাড়বে!' তারপর আমার কানের কাছে মুখ রেখে আস্তে আস্তে সে বলল, 'আপনার অনুবাদটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, ওটাই আমি রোজ উচ্চারণ করব...তবে 'পরমেশ্বর' আর 'পূজা' কথাগুলো আমাদের বাড়িতে চলে না।'

(ক্রমশ)

লাইব্রেরীতে রাখার মত কয়েকখানি বই

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত

জলছবি ১২.

গী দ্য মোপাসাঁর বিশ্ববিখ্যাত "বেল-আমি" উপন্যাসের ভাষান্তর/ইন্দুভূষণ দাশ

এক নায়ক অনেক নায়িকা ১০.

জরাসন্ধ-এর নতুন গ্রন্থ সরোজ প্রভাকর-এর উপন্যাস

নদীর এপার কহে ৮. সুচিরতাষু ৬.

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর নতুন গ্রন্থ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর নতুন বই

সাঁঝের বেলা ৮. নীল শূণ্য ১২.

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ।। কলিকাতা-৭০০০০৯

কবিতা

দিন ও দিগন্ত ॥

গোবিন্দ চক্রবর্তী

একেকটা দিন পেরুতে—
পেঁছুই যেন মেরুতে।
একেকটা দিন বায়—
ঢেউয়েতে নৌকো গড়ায়।

চোখ মেলি যত কান মেলি।
দিন নয়, যেন
গোটা একেকটা পাহাড় ঠেলি।

কখনো-সখনো
ঠেলা গাড়ীটাকে থামাই।
যে বোঝাটা টেনে চড়োয় তুলছি,
সেটাই ফিরতি নামাই।

এই উঠতে - উঠতে - উঠতে,
ছুটতে - ছুটতে - ছুটতে,
এই উঠতে - নামতে - থামতে
এবং থামতে - থামতে

যেই,
প্রভুর কাছে ফিরিস্তি চাই
গুণাহ্ অল্প ত্রুটির!
অমনি কোথায় ঘণ্টা বাজে
ছুটির,

—

মুঠোর থেকে ছিটকে পড়ে
টুকরোটা পাঁউরুটির!!

কীর্তি ॥

এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ

পিতৃপুরুষের কীর্তির আবৃত্তি আমি করিনি কখনও
দুর্বোধ্য আতঙ্কে চিৎকারে বিয়াল্লিশ সালের এক
পঞ্জিকার পাতা থেকে ঝরে পড়ে
বিস্মৃত কিছু কিছু হিংসুক অবিশ্বাসী সময়ের ছায়া :
নিঃসঙ্গ ছাদে, কালো দুই বেড়াল যখন
খেলে, সুপারী দানা সন্ত্রস্ত দম্পতি আমরা
সন্দিহান, তাকাই।
কথাহীন অতীত দানব এখনই বলবে
খোলো দ্বার
বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তর্কাতর্কি
রেষারেষি হোক শুরু আজ
খুলেছে তলোয়ার আঁতেল সিজার
চারমিনার পুতঃ ধূপধুনো ধন্য আলোচক, যে কবি সেও
বেচারা বেকার।
আদিম বিপুর কাছে পরাজিত হতে হতে
জিতে যাই, যখন সত্তায়
হাঁক দেয়, স্পষ্টতর হয় আয়নায়
পিতৃপুরুষের ছবি.....
বিরূপতার ছবি ক্রমশ গুটিয়ে নিয়ে
দেখি অবিচল শ্রদ্ধার প্রতীতি বিধ্বস্ত
হয়ে যাচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে সমস্ত বিশ্বাস।

চলমান শিল্প : গ্যালারী এ'র উদ্বোধন : সম্প্রতি চলমান শিল্পের উদ্যোগে চৌরঙ্গীর মনোহর দাস তড়াগের এক নম্বর গম্বুজের কাছাকাছি গ্যালারী এ'র উদ্বোধন হয়েছে। এই খোলামেলা প্রদর্শনীতে মৈনাকশঙ্কর রায় এবং তপন মিত্রের গ্রাফিক্স ও ড্রয়িং ছাড়াও পত্র-পত্রিকা এবং বইও রাখা হয়েছে। ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে। প্রতি শনি ও রবিবার দুপুর ১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকবে।

আদ্রায় মাইকেল জন্মোৎসব : সম্প্রতি আদ্রা প্রাইমারী স্কুলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন জোনাকী সাহিত্য গোষ্ঠী। মধুসূদনের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন সর্বশ্রী নিত্যানন্দ সেনগুপ্ত সজল দাস-গুপ্ত, বিমলকান্তি ভট্টাচার্য, প্রদীপ চক্রবর্তী ও রঞ্জিৎ মুখার্জি। অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বরচিত কবিতা পাঠের আসরটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছিল।

আমীর খসরুর স্মৃতি উৎসব : আমীর খসরুর ১৭শ বার্ষিক স্মৃতি উৎসব সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল। দু দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল এ এল ডায়াস। শ্রীডায়াস তাঁর ভাষণে বলেন, আমীর খসরুর দেশপ্রেম এবং তাঁর জীবন-ব্যাপী সাধনা ভারতীয় ভাষা ও কৃষ্টিকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধতর করেছে। উৎসব কমিটির সভাপতি রুশি বি গিমি বলেন, কবি ও দার্শনিক ছাড়াও পারস্যের তম্বুরা ও ভারতীয় বীণার সংমিশ্রণে সেতারের সৃষ্টি করে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শুধু নয় উভয় দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সেতুবন্ধনের চেষ্টা করেছেন। বিচারপতি শ্রীমাসুদ ইরাণও ভাষণ দেন।

সংস্কৃত ও সংস্কৃতি বাঁচানোর দাবী :

নিখিল বঙ্গ সংস্কৃতসেবী সমিতি এবং সংস্কৃত ও সংস্কৃতি বাঁচাও সমিতি সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কাছে ১৬ দফা দাবী জানিয়ে বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বর্তমানে নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই দুই সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভাষা ও সাহিত্যকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাকে আবশ্যিক পাঠ্য-ক্রমের তালিকাভুক্ত করা উচিত।

উপগুপ্ত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি। দেবকুমার চক্রবর্তী। পূর্ত বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দাম আড়াই টাকা।

সমাজজীবন এবং সভ্যতার মূল্যায়নে অতীতের পুরাকীর্তিগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মন্দির এবং স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে যুগ পরম্পরায় শিল্প এবং সংস্কৃতি সাধনার ধারা সযত্নেই ধরে রাখা হয়েছে। এই কারণে অজয়, দামোদর, ময়ূরাক্ষী এবং চন্দ্রভাগার স্রোতস্নাত বীরভূমের পুরাকীর্তির নবমূল্যায়ন পশ্চিমবঙ্গের ইতিবৃত্তের সমৃদ্ধির প্রয়োজনেই দরকার। এবং শুধু বীরভূমের মন্দির স্থাপত্য এবং তার অলঙ্করণে বীরভূমেরই শুধু নয়, বাংলার স্থাপত্যশিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গেও অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বাংলার মানসচর্চা, ভাবস্ফুরণ এবং সমাজবিবর্তনের পরিচ্ছন্ন ছবি এই মন্দির-ভাস্কর্যের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলার দেবদেউল' শীর্ষক নিবন্ধের মধ্যে লেখক কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন, 'পট-ভূমির প্রসারে, কল্পনার বিচারে এবং শিল্প-সৃষ্টির দক্ষতায় বাংলায় মন্দিরশিল্পকে সমসাময়িক যুগের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম দলিল বলে অভিহিত করা চলে।' এই উক্তিকে অনিবার্যভাবেই স্বীকার করে নিতে হয়। এবং সেই স্বীকৃতিরই অন্যতম নিদর্শন বোধকরি আলোচ্য গ্রন্থখানি।

লেখক অসাধারণ নিষ্ঠায় এই গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব তথ্যসমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। বীরভূম জেলার মন্দিরগুলির নির্মাণরীতি, নির্মাণের উপকরণ, এবং নির্মাণকার্যে স্থানীয় বিশেষ ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়ে এই গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে আলোচনা করা হয়েছে। মন্দিরগুলির গঠনশৈলীর আলোচনার ক্ষেত্রে লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতের 'নাগবর্ত্তীতি'র অনুসরণে নির্মিত 'রেখ-দেউলের' প্রস্তর-নির্মিত নিদর্শনের মধ্যে যে নতুন ধরনের স্থাপত্যরীতির প্রকাশ ঘটেছে, কিংবা হেতমপুরের অষ্টকোণাকৃতি 'চন্দ্রনাথ শিব-মন্দির'টির স্থাপত্যরীতির মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব কিভাবে এবং কেন ঘটেছে সে সম্পর্কে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন লেখক। তাঁর এই কৃতিত্বপূর্ণ প্রয়াসকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হয়। প্রয়োজনীয় বেশ কিছু ছবিও এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে যা গ্রন্থখানির মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুদূরের পিয়াসী। বিমল দে। পরিবেশক : দে বুক স্টোর। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কোলকাতা-১২। দাম পনের টাকা।

ভূপর্যটক বিমল দে সাইকেলযোগে কোলকাতা থেকে বেরিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন সুদূর আমেরিকায়। দেশে ফেরার পথে ঘুরে এসেছিলেন ইন্দোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুর। মাত্র একখানা সাইকেল ভরসা করে কপর্দকশূন্য অবস্থায় দীর্ঘ পাঁচ বছর মেয়াদী এই বিদেশ ভ্রমণ কম দুঃসাহসের নয়। সেই দুঃসাহসিক ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখা এই বইখানি। ভ্রমণকালে নানা ধরনের মানুষজনের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই দেখা হয়েছে। তাই দেশ দেখার অভিজ্ঞতার পাশে পাশে সেই সব মানুষের কথাও স্বাভাবিকভাবে এসে গেছে। আলবেনিয়ায় বে-আইনী অনুপ্রবেশের দায়ে জেল হাজতে যাওয়ার উপক্রম থেকে শুরু করে ক্রীটে হিপিদের সঙ্গে গুহাবাসের মত মজাদার বহু ঘটনাই বইখানিকে সরস করে তুলেছে।

ভ্রমণকাহিনী শুধু ভ্রমণের শুকনো বিবরণই তুলে ধরে না তাকে অবশ্যই সুখপাঠ্য হতে হয়। আলোচ্য বইটি এই অবশ্য পালনীয় দায়িত্বটিকে নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছে। এটি পড়া শুরু করলেই একটি অনিবার্য আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত

পাঠককে টেনে রাখে। তবে একটা কথা বলার রয়েছে, তা হোল পথের বর্ণনাকে ছাপিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তির প্রাধান্য ঘটেছে। তার ফলে দীর্ঘ পথ পার হওয়ার বিবরণ না দিয়েই তিনি একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে গেছেন। কৌতূহলী পাঠকের কাছে এই ফাঁকটুকু সহজেই ধরা পড়ে। ভবিষ্যতে এবিষয়ে লেখককে একটু সচেতন হতে হবে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ ভালো।

দিব্যকরুণা। সম্পাদক : অশোককুমার সেন। শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ। পাঁচ টাকা।

মোট পাঁচটি রচনা—কবি নিশিকান্ত, বিদ্যাবতী কোকিল, হৃদয়, জীবেন্দ্র ও যতীন দাস—আলোচ্য দিব্যকরুণা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। শ্রীমতী বিদ্যাবতী কোকিলের মূল রচনাটি হিন্দীতে লেখা। রচনাটি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক রামবহাল তেওয়ারী। আবার শ্রীজীবেন্দ্রের ইংরেজী লেখাটির অনুবাদ সরল, সরস ও সর্বজন-গ্রাহ্য হয়েছে। কবি নিশিকান্তের উপর আলোচনাটি দীর্ঘ। কবির সঙ্গে যাঁরা দৈনন্দিন সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং যাঁরা কবির মুখ থেকেই নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনেছেন, সেই নলিনীকান্ত গুপ্ত, অবনী সিংহ, তেজেন মুখার্জি, অমলেশ ভট্টাচার্য ইত্যাদির বক্তব্য আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত। সেই সঙ্গে শ্রীঅশোককুমার সেন কবি নিশিকান্তকে যে ব্যক্তিগতভাবে তিনটি প্রশ্ন রেখেছিলেন, কবির নিজস্ব কথায় সেগুলির উপযুক্ত উত্তরও এ গ্রন্থে রাখা হয়েছে। গ্রন্থটি অনুরাগী পাঠকদের সংগ্রহযোগ্য।

উত্তর দক্ষিণ। অসীমকুমার বসু। জ্যোতির্ময় দাস ইত্যাদি। মহাপৃথিবী, ১১, ঠাকুরদাস দত্ত প্রথম লেন, হাওড়া-১। চার টাকা।

অসীমকুমার বসু, জ্যোতির্ময় দাস, অজিত বাইরী ও শম্ভু রক্ষিত—এই চারজন তরুণ কবির কাব্য আলোচ্য 'উত্তর দক্ষিণ' কাব্যসংকলনে সংকলিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এঁরা কবিতা লেখেন। এঁদের চারজনের বয়ঃসীমা সাতাশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট। স্বভাবত এই বয়সের তেজ, গর্ব, অভিমান, নৈঃসঙ্গ্য ও বলিষ্ঠ চেতনা কবিতাগুলিকে দীপ্ত করেছে। প্রত্যেক কবিই ছন্দ সম্পর্কে সচেতন, শব্দ ব্যবহারে কুশলী এবং চিত্রকল্পের প্রয়োগে আপন গভীর গোপন অভিজ্ঞতাগুলির আশ্রয়প্রার্থী। কাব্যসংকলনটি আধুনিক কবিতার প্রবণতাকে বোঝার সহায়ক।

সর্পিণী নাগিনী। শ্রীমেঘদূত। আলাট্টা পাবলিসার্স, ৪, লায়েলকা লেন, কলকাতা-৩২। পাঁচ টাকা।

একটি নিটোল কাহিনী, কয়েকটি বিচিত্র চরিত্র দিয়ে লেখক তাঁর বক্তব্য বলতে সচেষ্ট। কাহিনীতে নূতনত্ব না থাকলেও সাধারণ পাঠকদের ধরার উপযোগী কৌশল আছে। নাটকীয়তা, কিছু অবাস্তব ঘটনার যোগাযোগ, বাঁধা সংলাপ ও বাঙালীর সহজগ্রাহ্য সেন্টিমেন্ট দিয়ে লেখক উপন্যাসটি শেষ করেছেন। কেতকী, শর্মিলা, রুদ্রনারায়ণ, হিমাংশু, অনীতা ইত্যাদি চরিত্র সুঅঙ্কিত।

খেয়ালী পারাবত। সরোজকুমার দত্ত। প্রতিভা প্রকাশন, ৫।৪, শীতলামাতা লেন, কলকাতা-৫০। চার টাকা।

মোট পঁয়ষট্টি কবিতার সংকলনগ্রন্থ 'খেয়ালী পারাবত'। কবি সরোজকুমার দত্ত আপন আবেগে কিছু অন্তরের কথা দরদ দিয়ে বলেছেন। অনেক কবিতাই প্রকাশ-যোগ্য নয়। বহু কবিতার ছন্দে গোলমাল আছে। প্রাচীন ছন্দে, প্রাচীন রীতিতে কয়েকটি কবিতা পুরানো আমলের পাঠক-দের হয়ত ভালও লাগতে পারে। কবির আন্তরিকতা গ্রহণীয়।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

নীলকণ্ঠ। (শীত সংখ্যা)। সম্পাদনা আশিসকুমার ঘোষ। ৬৪।৫৬ বেল-গাছিয়া রোড কলকাতা-৩৭। দাম সেড় টাকা।

রীতিমতো পরিচ্ছন্ন এই পত্রিকাটির সূচীপত্রে পরিচিত অপরিচিত বহু লেখ-কেরই নাম দেখলাম। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম-চন্দ্রের সুবর্ণ গোলক-এর পুনর্মুদ্রণ হয়েছে এই সংখ্যায়। সমীর রক্ষিত জীবন সরকার এবং নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের গল্প ভালো লাগল। সুশীল রায় কৃষ্ণ ধর শিশির ভট্টাচার্য এবং কৃষ্ণা সিংহের কবিতা এবং চন্দ্রশেখর রায় ও প্রীতিকণা মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। ছাপা ভালো। প্রচ্ছদও পরিচ্ছন্ন।

মহুয়া। সম্পাদক সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩বি।৭ গোয়ালাপাড়া রোড। বেহালা। কোলকাতা-৫০। দাম এক টাকা।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এবং মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ নির্মলেন্দু রক্ষিত জীবন সরকার এবং নির্মলেন্দু গৌতমের গল্প এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। প্রচ্ছদ ভালো।

শুভশ্রী : সম্পাদক : হরেন্দ্রকুমার সরকার। ৭ রামবাবু লেন খাগড়া বহরমপুর মুর্শিদাবাদ। দাম : দু টাকা।

জীবনানন্দ। সম্পাদক : পলাশ মিত্র ও সুচেতা মিত্র। ২, কালী লেন, কলকাতা-২৬। এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

১৯৭৪-এর অকটোবর-ডিসেম্বর-এর 'জীবনানন্দ' নামের সুরুচিসম্মত কবিতা পত্রিকাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনটি পূর্বের সুনাম বজায় রেখেছে যথাযথ। এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ অন্য ভাষার কবিতা অনুবাদ। হিন্দী কবিতার অনুবাদে পলাশ মিত্র, উর্দু কবিতার অনুবাদে সুচেতা মিত্র ও অসমীয়া কবিতার অনুবাদে সুজাতা প্রিয়ংবদা যথেষ্ট কবিসুলভ কৃতিত্ব দেখিয়ে-ছেন। বাংলা কবিতা লিখেছেন কবিতা সিংহ, কালীপদ কোঙার, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শিব-শম্ভু পাল, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, সাধনা মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত রায় ইত্যাদি।

নিউ এজ

॥ প্রকাশিত হল ॥

নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা

বিভাস রায়চৌধুরী : ১৬৲

[নাটক যাঁরা পড়েন, নাটক যাঁরা দেখেন, বা লেখেন, বা নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাদের সকলের পক্ষেই বইটি অপরিহার্য। বইটিতে নাটক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য রয়েছে। যথা নাটকের আঙ্গিক, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতিসহ সমস্ত কলা-কৌশল। আর রয়েছে বাংলা নাটকের আদি হতে আধুনিক ইতিহাস।]

॥ উপহার দেবার মত বই ॥

বিশ্বের প্রবাদ : ইবনে ইমাম : ১০৲

[বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য বই। বইটিতে রয়েছে বিশ্বের সমস্ত ভাষা থেকে ভাল ভাল প্রবাদগুলির একত্র সমাবেশ। বিদেশী প্রবাদগুলির স্বাদ ও পরিচয় পেতে হলে, সেই সঙ্গে নিজেদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে এই বইটি অবশ্যই পড়ার মত বই, রাখার মত বই ও দেবার মত বই। বইটিতে এইসঙ্গে রয়েছে বহু সুন্দর সুন্দর ছবি যা প্রবাদগুলিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। সুন্দর ছাপা ও সুন্দর প্রচ্ছদে বইটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।] **ভারতীয় সমাজ ও**

বিবাহ : নৃপেন্দ্র গোস্বামী : ১২·০০; কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু : ৫·০০; রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্য : বুদ্ধদেব বসু : ৫·০০; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী : ১০·০০; বাঙালীর ইতিহাস : [সংক্ষিপ্ত] নীহার-রঞ্জন রায় : ৬·০০; রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা : নীহাররঞ্জন রায় : ৪০·০০; বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি : নৃপেন্দ্র গোস্বামী : ১৫·০০; লোকায়ত দর্শন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ১৫·০০; লেখকের কথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মাইকেলেঞ্জেলো

অসীম রেজ

বলিষ্ঠ কাঁধ স্ফীত পেশী প্রস্তর খন্ডের মতো শক্ত ও মজবুত দেহযুক্ত অজস্র ঢেউয়ের মতো টুকরো টুকরো ভাঙাচোরা সূক্ষ্ম রেখার সাবলীল গতির ভিতর একটি ছবিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেটি হল এক পুরুষের যাকে বহুবার বহু পরিবেশে খুঁজে পাওয়া যায়। ঐ পুরুষদেহ যাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে এক দুর্দান্ত বেগ অশ্বের মতো ক্ষিপ্র, বজ্রের মতো তীক্ষ্ণ, যিনি নিজের ভিতর থেকে নিজেকে বার করে আনতে চেয়েছিলেন, পরীক্ষার পর পরীক্ষা মূর্তির পর মূর্তি, ছবির পর ছবি. ড্রইংয়ের পর ড্রইংয়েও যাকে সম্পূর্ণ করা যায় নি, বন্ধনহীন হয়েও আবদ্ধ, ঘুরে ফিরে একই দেহের কেন্দ্রে যাঁকে বারবার ফিরতে হয়েছে আর এক একটি মানুষের দেহজুড়ে বয়ে এনেছেন এক ভয়ানক নৈঃশব্দ্য, অতীব পার্থিব দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল যা মাঝে মাঝে সকল আধ্যাত্মিকতাকেও অস্বীকার করার স্পর্ধা রাখে। সেই শিল্পী হলেন মাইকেল এঞ্জেলো।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে ইতালীয় শিল্পে যে ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষা একাগ্রতা কৌতূহল নিষ্ঠা ও ভালবাসা লক্ষ্য করা যায় তারই ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম নেয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁস। প্রাক-ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে এর স্বয়ংসম্পূর্ণ আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর তেমনি অদ্ভুত। নিজস্ব পরিধিতে গড়ে ওঠা এই স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প মূলত ফ্লরেন্সীয় মানবতাবাদ ও সিয়েনীজ ভাববাদিতার অনুগামী। এছাড়া একদিকে ইতালীয় বাস্তবতা ও অন্যদিকে গথিক রোমান্টিকতারও এ এক আশ্চর্য মিলন। রেনেসাঁস শিল্প এ অর্থে অনুভব ও ভাবনার শিল্প। অপর অর্থে চিত্রিত কবিতার ইতিবৃত্ত। আর ঐ ইতিবৃত্ত রচয়িতাদের ভিতর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও র‍্যাফেল ছাড়া যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি হলেন মাইকেলএঞ্জেলো।

এই মুহূর্তে মাইকেলএঞ্জেলোর কথা কেবলই আমাদের মনে পড়ে, কারণ তিনি পাঁচশ বছর পার হয়ে এলেন।

১৪৭৫ সালে ৬ই মার্চ ক্যাপ্রি শহরে মাইকেলএঞ্জেলো বুয়োনারোতির জন্ম। তিনি ছিলেন মেয়র লোদোভিচো বুয়োনারোতির দ্বিতীয় পুত্র। শিশুকাল থেকেই শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। মাত্র তের বছর বয়সে তিনি তৎকালীন নামজাদা চিত্রকর গিয়ারলান্দায়োর কাছে শিক্ষানবিশ হয়ে ঢোকেন। এই সময় তাঁর কাজ ছিলো জত্তো, মাজাচ্চিও প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা ফ্রেস্কোগুলির স্কেচ ও পুরোন শিল্পীদের ছবির ড্রইং করা। কিন্তু ব্যাপারটা নিতান্তই একঘেঁয়ে হয়ে ওঠায় নতুনত্বের সন্ধানে পরের বছরই বারতোলদোর 'স্কুল ফর স্কাল্পটরস'-এ যোগদান করেন। স্কুলে থাকাকালীন সময়ে তিনি ভাস্কর্যের প্রাথমিক সমস্ত নিয়মগুলিকে আয়ত্বাধীন করার প্রচেষ্টায় রত হন। ১৪৯০ সালে ফ্লরেন্সের শাসনকর্তা লরেঞ্জো দি মেদিচির আমন্ত্রণে প্রথম 'মাদোনা অফ দি স্টিয়ারস' মূর্তিটি তৈরী করেন। এখান থেকেই তাঁর শিল্পীজীবনে খ্যাতির পথ সুগম হয়ে ওঠে।

একটা বিষয় বিতর্কেরই—আসলে তিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন না ভাস্কর। ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা মাইকেলএঞ্জেলো বার বার উল্লেখ করেছেন। তাঁর ছবিগুলি একটু নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় তাতে ভাস্কর্যের নিয়মগুলি পুনঃপুন ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি নরনারীর দেহগুলি এমনভাবে এঁকেছেন যাতে মনে হয় পাথর কেটে মূর্তি গড়া। দেহের প্রতিটি অংশ জ্যামিতিকভাবে নিখুঁত, কাঁধ ও পেশীগুলি দেখলে মনে হয় মানুষগুলি দৃপ্ত বলিষ্ঠ ও প্রাণবান; এঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব ওজন আছে; মূর্তির মতো ত্রিমাত্রিক। উপরন্তু, এমন ভাবনাও বোধহয় অস্বাভাবিক নয় যে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় মাইকেলএঞ্জেলো বড় হয়ে উঠেছিলেন, সেই রাজশ্রেষ্ঠীরা চিত্রকলার চেয়ে ভাস্কর্যকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৫০৫-৮ সালে তিনি রোমের পোপ জুলিয়াসের অনুরোধে 'টুম্ব অফ জুলিয়াসে'র ডিজাইন সম্পূর্ণ করেন। তবু চিত্রকলাও যে আর একটা পথ, নিজের বাইরে বেরিয়ে আসার আর একটা উপায়, এমন উপলব্ধি করেই বোধহয় সেদিন তিনি পোপের অনুরোধে ভাতিকান প্রাসাদে সিস্তিন গীর্জার ছাঁদ বরাবর এঁকেছিলেন তাঁর অসাধারণ চিত্রগুলি যা আজও বিশ্বের বিস্ময়। ভাস্কর্য চিত্রকলা ছেড়ে এমনকি তিনি কবিতাতেও গিয়েছিলেন। লিখেছেন অজস্র চতুর্দশপদী প্রেমের কবিতা যা নাকি তাঁর একান্ত প্রিয় বান্ধবী তোম্মাসোর উদ্দেশ্যে লেখা।

অথবা এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বোধহয় যুক্তিযুক্ত যে তিনি সমস্ত মাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন, তাদের ভেঙেছেন, গড়েছেন আর তার ভিতর থেকে বার করে আনতে চেয়েছেন একটা সত্যকে—সেই সত্যের নাম জীবন।

'জীবন' এই শব্দেই যেন মাইকেলএঞ্জেলোর সমগ্র শিল্পভাবনাকে ধরা যায়। তিনি জীবনকে ভালবেসেছিলেন, ভালবেসেছিলেন মানুষকে; তাই মানুষই বড় হয়ে উঠেছে শিল্পে। তিনি যেন বারবার বলতে চেয়েছেন, দেখ জীবন কি দুর্দান্ত, কি বেগবান, কি মধুর। ঐ জীবন আবার নরনারীর অসংখ্য দেহের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে। তিনি দেহকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙেচুরে, রক্তেমাংসে, শোকেদুঃখে আবেগে ভালবাসার উষ্ণতায় উত্তাপে জীবন্ত করে তুলেছেন সেই সব যুবা পুরুষদের যাদের নগ্ন দেহের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এক সুন্দর যা স্পর্শমাত্রেই পবিত্র হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে ১৫০৮-৯ সাল পর্যন্ত সিস্তিন গীর্জায় আঁকা ন্যুড ইউথ সিবিজের ফ্রেস্কোগুলির কথা মনে পড়ে। আবার হয়ত সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করে সমস্ত যন্ত্রণার শরীর খুঁজে যেন বার করে আনতে চেয়েছেন এক হীরকখণ্ড— গভীর আত্মপ্রত্যয়ে বিধৃত এক গভীর বিশ্বাস— বাঁচার মতো বাঁচার বিশ্বাস। 'ক্যাপটিভ' সিবিজের মূর্তিগুলিতে তিনি মানুষকে এক ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী করে তুলতে চেয়েছেন। কখনও বা ঐ মানুষেরই মুখমণ্ডল ঘিরে জমে থাকে এক ভয়ানক স্থৈর্য ও সংযম, ভাবলোকে সকলেই সমাহিত, যেন নৈঃশব্দ্যে দ্বীপান্তরিত। হেড স্টাডিগুলির আরো কাছে গেলে দেখা যায় এক প্রচ্ছন্ন ভালবাসার আলোয় উজ্জ্বল মহত্ত্ব মানবীয় গুণে মুখগুলি আলোকিত। অদ্ভুত রমণীয় কমনীয়তায় যুবাকে নারী বলে ভ্রম হয়। কিংবা পৃথকভাবে যদি মেদিচি ও ব্রুগেস মাদোনাদ্বয়ের নীচে চোখ রাখি, দেখা যায় এ নারী সে নারী নয়, স্নেহ ভালবাসা মমতায় আচ্ছাদিত জায়া ও জননীরূপে ভিন্নলোক থেকে আসা।

মাইকেলএঞ্জেলো শুধু আলোই দেখেননি দেখেছেন অন্ধকারকেও। মানুষের চিরন্তন মৃত্যুজনিত ভয় ও ভাবনা 'ডেভিল' অথবা ডেথরূপে ধরা দিয়েছে তাঁর চিত্রকলায়। তবু পিয়েতা বা মহান খৃস্টের মৃত্যুর শেষ মুহূর্তটি তাঁর শিল্পের প্রিয় বিষয় হয়ে ফিরে এসেছে একাধিকবার। ঐ মৃত্যু ঘিরে যে শোক, তা যেন শুধুই শোকমাত্র নয় এ এক সমাহিতি।

তাঁর শিল্পের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চরিত্রগুলির নাটকীয় উপস্থাপনা ও তাদের মনোবিশ্লেষণ। এক একটি বিশেষ মুহূর্তের ভাবভঙ্গিমা অভিব্যক্তি বা মুখাবয়বে তাদের গভীর ভাবনা ভয় ও সংশয়জনিত কিছু গোপন করার প্রচেষ্টা নাটকীয় দৃশ্যের মতো বারংবার উপস্থাপিত। একে ঘিরে রয়েছে চরম নাটকীয় উত্তেজনা, সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব। এ প্রসঙ্গে সিস্তিন গীর্জার গায়ে আঁকা 'দ পারশিয়ান সিবিল' 'জোয়েল' 'জোনা' 'ড্যানিয়েল' বা 'জেরিমায়া' ছবিগুলির কথা উল্লেখ করছি।

চিত্রশিল্পী মাইকেলএঞ্জেলোর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বোধহয় সিস্তিন গীর্জার ফ্রেস্কো। বিষয় বাইবেল হলেও যেন মনে হয় একটা মহাকাব্য, একটা বিশ্ব ঈশ্বর, দেবদূত ও মানুষেরা অসংখ্য ঘটনার ভিতর একটি বৃত্তের মতো বিধৃত। এঁকেছেন বাইবেলের নানান কাহিনী—আদম ইভ, সৃষ্টির প্রথম ছয়দিন, নোয়ার নৌকো, মহাপ্লাবন আর ঈশ্বরের উপস্থিতি। ভাসমান কতকগুলি মেঘখণ্ডের মতো সকলেই বন্ধনহীন, এক আশ্চর্য গতির ভিতর মানুষ ও প্রকৃতি একাকার দেহগুলি মনে হয় কোন অলৌকিক অপার্থিব বিশ্ব থেকে আসা। এখানেই তাঁর উত্তরণ। আর যে ধর্মের পিছনে তাঁর সারাটা জীবন অন্বেষণ, সে ধর্ম যেন মানবিক হয়েও ঐশ্বরিক, দৈহিক হয়েও আত্মিক আধ্যাত্মিক ,পবিত্র সঙ্গীতের মতো।

পরিশেষে সৃষ্টি স্থিতি লয়—এই নিয়েই তাঁর 'শেষ বিচার' বা 'লাস্ট জাজমেন্ট।' বুঝিবা তাঁর সমগ্র শিল্পের শেষ উত্তর।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

ভবনাথের উঠোনে ধান উঠে গেছে। তাই ছেলেদের বায়না নতুন চালের ফ্যানসা ভাত খাবে। কিন্তু পুজো না দিয়ে নবান্ন না করে খাবার নিয়ম নেই। একদিন তাই পুরুত ডেকে পুজো আচাও হয়ে গেল। ভাটিয়াল চালের মিষ্টি ফ্যানসা ভাত গরম গরম পাতে পড়তেই বাচ্চাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দেবুবুড়িও তাদের মাঝখানে বসেছেন। একবার এর গালে একবার ওর গালে ভাত তুলে দিচ্ছেন। যেন উৎসব লেগে গেছে। এদিকে ভবনাথের বিলে যাবার তাড়া। ছেলেরা সব লায়েক হয়েছে। জলকাদা ভাঙতে তাদের বয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই তিনি কাঁধে চাদর ফেলে ছাতা ও লাঠি হাতে হন হন করে বিলমুখো চললেন। উঠোনে তখন বাড়ির মেয়েদের বড়ি দেবার ধুম লেগেছে। এই সময় মাঠের আর এক চেহারা মাঠে মটর গাছ লতিয়ে উঠেছে। লকলকে সবুজ লতা—শুঁটি সামান্যই ধরেছে—অফুরন্ত বেগুনি ফুল। তার ওপরেই দামাল ছেলেদের হামলা চলে। নিস্তরঙ্গ গ্রাম আবার প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে ওঠে। ভবনাথের বাড়িতেও তার ছোঁয়া লাগে। ডাক পিওন এসে সেই ভাবকে যেন আরো বাড়িয়ে দিল। বিশেষ করে সে বাড়ি এবং আশপাশের বাড়ির বৌঝিদের মধ্যে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রান্নাঘরের দাওয়ায় আলাদা একটা উনুন। অতিথি-অভ্যাগতের স্বপাক-ভোজনের গরজ পড়লে তখন এই উনুন জ্বলে। সকালের ফ্যানসা ভাতটাও বর্ষাকালে উঠানে না হয়ে এই উনুনে হয়। বিনো সিধা-পত্তোর গুছিয়ে যাদবকে ডাক দিল : আসুন পিওনকাকা—

উনুনের উপর পিতলের কড়াই। জল-চৌকির উপর চেপে বসে খুন্তিটা সবে তুলে নিয়েছেন—যাদব চমক খেলেন : কানাচের দিকে কে যেন শাপশাপান্ত করছে কাকে?

ও গুণো কাজকর্মে লেগেছে।—বিনো হেসে বলল, এখন এই। খেটে খেটে আরও কাতর হোক তখন শুনবেন।

গোপালনাথের বউ গুণমণি। গোপাল বসন্তরোগের চিকিৎসা করত টিকা দিত। এখনকার চলিত গোবীজের টিকা নয়—বাংলা টিকা। মানুষের মধ্যে কারো বসন্ত হলে (বসন্ত নয় বলতে হয় মা-শীতলার অনুগ্রহ) তাই থেকে বীজ নিয়ে টিকা দিত। বড় সাইজের টিকা গোলাকার রুপোর টাকার মতন। এই টিকা একবার নিলে সারা জন্ম আর বসন্তের ভয় থাকে না। বছর বছর টিকা নিতে হয় না এখনকার মতো। তবে বাংলা-টিকায় হিতে-বিপরীত হত কখনো, সখনো আনাড়ি টিকাদারদের হাতে পড়ে নীরোগ মানুষকে সাংঘাতিক বসন্ত রোগে ধরত, সে-রোগের চিকিৎসা ছিল না—শেষাশেষি রোগীকে চিতায় উঠতে হত। কিন্তু গোপাল নাথের হাতে এমন একটা-দুটোর বেশি ঘটেনি। সে-ও গোড়ার দিকে—হাত পোক্ত হয়নি তখন। কিন্তু নৌকা-দুর্ঘটনায় নির্বংশ হয়ে যাবার পর গুণমণি পাগল হল গোপালও তারপরে আর নরুণ ধরে টিকা দিতে যায় নি কোথাও। শত অনুরোধ উপরোধেও না।

গুণমণি এমনি সর্বক্ষণ বিড়বিড় করে। কাজে বসলে অলক্ষ্য কার সঙ্গে যেন কথা-বার্তা শুরু করে দেয়। ক্রুদ্ধ হয়ে, ক্রমশ গালিগালাজ—শেষটা একেবারে চিলের মতন চেঁচাবে। ভবনাথ কি উমাসুন্দরী তখন গিয়ে কাজ থেকে তুলে আনবেন, অন্য কেউ সে মূর্তির সামনে এগোয় না। গলার জোর ক্রমশ নরম হয়ে শেষটা আবার বিড়-বিড় করে গালি দেবে।

যাদব শুধান : গালি দেয় কাকে?

তা কে জানে। যমরাজকেই বোধহয়। তিন তিনটে ছেলে ডুবিয়ে লহমার মধ্যে যিনি নির্বংশ করে দিলেন। গোপাল নাথকেও হতে পারে—দু কুড়ি বয়স পার হয়ে গিয়ে কেশো-রোগি এই গুণমণিকে বিয়ে করেছিল।

তাই বা কেমন করে। গোপালের উপর গুণমণির টান বিষম। গোপালের বাড়ি এ গ্রামে নয় পাঁচারই—বুড়িভদ্রা গাঙের উপর। এই মাসকতক আগে সোনাখড়ি এসে ঘর বেঁধেছে। নৌকোডুবিতে তিন তিনটে ছেলে মারা গেল—দহের মুখে পড়েছিল নৌকো। ছেলেদের সঙ্গে গুণমণিও ছিল ঢেউয়ের মুখে কোনরকমে সে ডাঙায় গিয়ে পড়ে। মাথা খারাপ সেই থেকে। বাড়ি তাদের একেবারে গাঙের উপরে। পাগলের এক বাতিক হল যখন তখন গাঙে ঝাঁপ দিতে যায়—বলে ছেলেদের ডেকে নিয়ে আসি। গোপালের বয়স হয়েছে—তার উপর রোগে শোকে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। বিয়ের, কন্যাপক্ষকে ওদের মোটা পণ দিতে হয়—এই পণের সংগ্রহে বর বুড়ো হয়ে যায় অনেক সময় বুড়ো বরে কচি মেয়ের বিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেইজন্য কথা চলিত আছে : 'খুড়ি লায়েক হতে হতে খুড়ো চিতেয় ওঠে।' গোপালের সেই অবস্থা।

মামাতো-ভাই ভগবান দুঃসময়ে দেখতে এসে প্রস্তাব করল : পড়ুটে মানুষ কাঁহাতক তুমি বউ চোখে চোখে রাখবে। গাঙের ধারে থাকাও ঠিক হচ্ছে না। চলো আমার বাড়ি। ধরে পেড়ে সোনাখড়িতে তাদের নিয়ে এলো। নিজের বাস্তুভিটের পাশে আলাদা একটা চালা তুলে দিয়েছে।

এখানে এসে পাগলীর এক নতুন রোগ-লক্ষণ দেখা দিল। গোপালকে সে চোখে হারায়। এক একদিন চাল বাড়ন্ত থাকে—সে দিন গুণমণি বাড়িতে না রেঁধে ভাত রোজগারে বেরোয়। একটানা খেটে যাবে দুপুরে অবধি তারপর কাঁসর পেতে ধরবে। গৃহস্থ ভাত দেয়। ভাত গুণমণি সেখানে বসে খাবে না বাড়ি নিয়ে আসবে। একজনের ভাত দিলেও হবে না দুজনের মতো। বাড়ি এসে গোপালকে ভাত বেড়ে দিয়ে নিজে সামনে বসে। বেশি করে না খেলে কলহ করে। এমনকি সময় বিশেষ চড়টা চাপড়টাও দেয় নাকি। ঠিক যেমন মরা ছেলেদের উপর করত।

বিনো আছে পিওনঠাকুরের কাজে। আচমকা এই কাজটা পেয়ে বর্তে গেছে সে। বাটনা বাটছে জল এনে দিচ্ছে পুকুরঘাট থেকে। এটা দাও ওটা আনো—ফাইফরমাস খাটছে। ছোঁয়াছুঁয়ি না হয় সদসতর্ক।

পিওনঠাকুর কিন্তু উদার। বলেন, ছোঁয়া পড়ে গেলেও দোষ হবে না মা বিনোদিনী। মাছের তরকারি তুমিও চাপাতে পারতে। ঘোঁটাঘুঁটিও করতে পারো। যতক্ষণ নুন না পড়ছে ততক্ষণ এঁটো নয়।

পাড়ার মধ্যে খবর হয়ে গেছে, পিওন-ঠাকুর গাঁয়ে এসেছেন। এবং পাড়ার বাইরেও কোন কোন বাড়ি চিঠিপত্তোর এলো কিনা খোঁজ নিতে সব আসছে। এমনিটাই হয়ে থাকে—জানা আছে যাদবের। বাঁধতে বাঁধতে চামড়ার ব্যাগ ছোঁবেন না—চিঠি বের করে শাক-ধোওয়া ডালায় রেখেছেন চিঠির মালিক এসে পড়লে বাঁ-হাতের দু-আঙুলে তুলে আলগোছে সেই লোকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে গৌরদাসের মা-বুড়ি পাঁচিলের দরজায় এসে দেখা দিল। সর্বনাশ, পিওন আসার খবর অন্দরে ঐ মেঠোপাড়া অবধি পৌঁছে দিতে গেল কে! ফিচেলের অভাব নেই—মজা দেখবার অভিপ্রায়ে নিশ্চয় কেউ খবর দিয়ে এসেছে। খোবড়ানো মুখ বুড়ির গালে একটি দাঁত নেই কোনো এক কালের ফর্সা রং জ্বলে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। চোখ দুটো কোটরের মধ্যে তলিয়ে রয়েছে। তবু সে চোখের দৃষ্টি যেন বাঘের দৃষ্টি। দৃষ্টিটা যাদব বাঁড়ুয্যে বড্ড ডরান। বাঘ সত্যি সত্যি একবার বাঁড়ুয্যে মশায় দেখেছিলেন, বাঘের একেবারে মুখোমুখি পড়েছিলেন। বাদার বাঘ মাঝে মাঝে ভল্লাটে ঢুকে পড়ে, তেমনি একটা হবে। হাটুরে মানুষ দশ-বারোজন হাট-ফেরতা বাড়ি যাচ্ছে—যাদব বাঁড়ুয্যেও তাদের মধ্যে জ্যোৎস্না রাত—পথের ধারে বেত ঝোপের পাশে বাঘ ডাকিয়ে রয়েছে। এতগুলো গলায় হাঁক পেড়ে উঠতে—যেন কিছুই নয় এমনি একটা অবহেলার ভাব নিয়ে বাঘ ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। চকিত হলেও যাদব বাঘের দৃষ্টি দেখেছিলেন—সেও কিন্তু গৌরদাসের মা বুড়ির মতন এমন ভয়ঙ্কর নয়।

এমনি তো ত্রিভঙ্গ-দেহ—রান্নাঘরের ছাঁচতলায় এসে লাঠির উপর ভর দিয়ে কী আশ্চর্য বুড়ি টান-টান হয়ে দাঁড়াল। মাজায় কড়াত করে আওয়াজও হল যেন। ভূমিলগ্ন সাপ ফণা তুলে হঠাৎ খাড়া হয়ে ওঠে।

খোনা গলায় বুড়ি বলে উঠল বোল ফুটছে তা কড়াইয়ের মধ্যে অত কি দেখছ ঠাকুর? তাকাও এদিকে। এলো আমার গৌরদাসের চিঠি?

যাদব ঘাড় নাড়লেন।

আজও নয়? চিঠি তুমি কতকাল পাওনি বলো তো ঠাকুর।

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস.
ডাঃ এস. এম. পাণ্ডে এম.বি.বি.এস.
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

বিপন্ন যাদব বলেন ভাল বে ভাল। ডাকে না এলে আমি দিই কেমন করে?

বিনোর দিকে চেয়ে অসহায় কণ্ঠে বললেন, অবুঝকে কী করে বোঝাই। তুমি মা বিনোদিনী চেষ্টা করে দেখ। ছেলে চিঠি দেবে না তার চিঠি আমি লিখে আনব নাকি?

বুড়ি চোখ পাকিয়ে পড়ে : বটে, গৌরদাস আমার তেমন ছেলে নয়। চিঠি সে ঠিক লিখে যাচ্ছে তুমি গাপ করে ফেল। বড়লোকের পা-চাটা তুমি ঠাকুরমশায়। কাগ-ভরতি করে তাদের চিঠি গাদা গাদা আনতে পারো আমার গৌরের একখানা চিঠি নিয়ে আসতে হাতে কুড়িকুষ্ঠ ধরে তোমার। উচ্ছন্নে যাবে খানেশরাপে যাবে, ভিটেয় তোমার ঘুঘু চরবে—

নারদ নারদ।

কানাচে কারা খলখল করে হেসে উঠল। কলহের দেবতা নারদ—অলক্ষ্যে আবির্ভূত হয়ে জিনিসটা আরও জোরদার করবেন এই জন্যে ডাকাডাকি। ডেকেই দৌড়।

আঙুল মটকে মটকে বুড়ি গালি পাড়ছে। পিওনঠাকুর একেবারে চুপ। অপরাধী বটে তিনি চিঠি সত্যিই গাপ করেছিলেন। আক্রোশ মিটিয়ে বাক্যশেল নিক্ষেপ করে বুড়ি অবশেষে ফিরে চলল। পূর্ববৎ কুঁজো হয়ে গেছে মাটি থেকে মাথা হাত দেড়েক মাত্র উঁচুতে। লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে গৌরদাসের মা বাড়ির বার হয়ে গেল।

মাথা নিচু করে আছেন যাদব বাঁড়ুয্যে। উনুনে কাঠ ঠেলে দেওয়া হয়নি নিভে যাবার গতিক।

বিনো বলে কি হল পিওন-কাকা? বুড়ির কথা কানে নেবেন না। মাথার ঠিক নেই ওর।

হঠাৎ যেন সম্বিত পেয়ে যাদব উনুনে খান দুই গামছা গুঁজে দিলেন। চিঠি গাপ করেছেন সন্দেহে বুড়ি শাপশাপান্ত করে গেল। ব্যাপারটা সর্বাংশে সত্য। সরকারী লোকের পক্ষে অতিশয় গর্হিত কাজ কোনদিন কাউকে জানতে দেবেন না। মাস তিনেক আগে এই গাঁয়ের নতুন বাড়িতে এমনি ধারা একদিন রান্না চাপিয়ে বসে ছিলেন। 'হাঁ' এবং না-এর মধ্যে মন দুলছিল—হঠাৎ এক সময় পোস্ট কার্ডের চিঠিখানা উনুনে ঢুকিয়ে দিলেন। পেটের দায়ে গৌরদাস জব্বলপুর নামে কোন এক সুদূর অঞ্চলে রেলের কাজ নিয়ে গিয়েছে। ত্রিসংসারে ঐ ছেলে ছাড়া বুড়ির কেউ নেই। নতুন বাড়িতে সেদিনের আয়োজনও গুরুতর—প্রকাণ্ড রুইমাছ ধরেছে সোনামুগের সঙ্গে মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট পাক হচ্ছে। হাটবার বলে বুড়ি তো তক্কে তক্কে আছে, এক্ষুণি এসে পড়বে। চিঠিও এসেছে আজ জব্বলপুরের চিঠি। পিওনঠাকুর ব্যাগ থেকে চিঠিখানা বের করে আলাদা করে রাখছেন। এমনি সময় নজরে পড়ে গেল গৌর দাসের মৃত্যুসংবাদ। গৌরেরই কোন বন্ধু পোস্ট-কার্ড লিখে মাকে খবর জানিয়ে দিয়েছে। এ চিঠি বুড়ির হাতে পৌঁছলে এক্ষুণি তো মড়া কান্না পড়ে যাবে। মুড়িঘণ্ট মাটি। শোকের আঘাতে বুড়ি নিজেই হয়তো মারা পড়বে।

যাদব বাঁড়ুয্যের বিস্তর দিনের চাকরি চিরকাল নিস্কলংক কাজকর্ম করে এসেছেন। অবসর নেবার মুখে এসে দুস্কার্য করে বসলেন পোস্টম্যানের পক্ষে যার চেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না। চিঠিখানা জ্বলন্ত উনুনে ঢুকিয়ে দিলেন। ছেলে বেঁচে নেই গৌর দাসের মা আজও তা জানে না। কিন্তু মনে পাপ আছে বলে পিওনঠাকুর তাকে এড়িয়ে চলেন। বিট বদলে ফেলে এই সোনাখড়ি মুখোই আর হবেন না অনেকবার মতলব করেছেন। কিন্তু পোস্ট মাস্টারকে বলতে গিয়েও বলেন নি। গৌর দাসের মায়ের আতঙ্ক সত্ত্বেও এই গাঁয়ের দুটো দুর্বার আকর্ষণ—কয়েকটি উৎকৃষ্ট আড্ডা আছে চিঠি বিলি উপলক্ষে এসে সারা বিকালটা জমিয়ে দাবা ও পাশা খেলে যান। এবং যাবার মুখে হাটঘাট করে বাড়ি ফেরেন। সোনাখড়ির হাটে ভাল মাছ-তরকারির আমদানি হয় এবং দামেও কিছু সস্তা। বিটের বার সে জন্য হাটবার দেখে ঠিক করেছেন।

দিগ্বিজয় অন্তে অশ্বারোহীরা যে যার বাড়ি যাচ্ছে। দল ভেঙে গিয়ে কমল একা এখন। টুকটুকিকে নিয়ে পুঁটিও পাড়া বেড়িয়ে ফিরল। সুপারি বনে খোলা পড়ল একটা ছুটে গিয়ে কমল কুড়িয়ে আনে। এক খেলা সাবা করে এলো তো আর এক খেলা মাথায় এসেছে। পুঁটিকে বলে গাড়িতে চড়ি আয়। টুকটুকিকে বাড়ি দিয়ে আয় আগে। তুই টানবি আমি বসব। তারপরে তোর বসার পালা।

ঘাড় ঝাঁকিয়ে পুঁটি আপত্তি জানায় : এই এতক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে এলি চড়ে চড়ে তোর আশ মেটে না খোকা। তুই নোস আমি নই—আমরা কেউ না টুকটুকি চড়বে। ওর বুঝি গাড়ি চড়তে ইচ্ছে হয় না। তুই টান আমি ওকে ধরে থাকব—ধরে ধরে চলে যাব। জোরে টানবি নে কিন্তু, গড়িয়ে পড়বে।

খোলার উপর বসিয়ে দিয়েছে। ইঁদুরের মতন চিকচিকে দাঁত কটি মেলে হাসছে কেমন টুকটুকি—মজা পেয়ে গেছে। পাতার আগা ধরে যেই না কমল টান দিয়েছে—দিব্যি তো হাসছিল মুখভাব কেমন ধারা হয়ে গেল কেঁদে পড়ে বুঝি এইবার। বাঁদল না, সামলে নিল। খোলায় বসে সামনের দিকটা কেমন শক্ত করে ধরেছে দেখ—একেবারে বড়দের মতন। পুঁটিরা হলেও ঠিক এই করত।

(ক্রমশঃ)

পুনশ্চ

কলিকাতার ইতিহাসে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের একটি বিশেষ স্থান আছে। কেবলমাত্র কলিকাতা কেন, সারা পৃথিবীতেই সংবাদপত্রের এই স্থান সম্ভবত মানুষের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে যেমন গণ্য হয়ে থাকে, তেমনি দেশ, সমাজ ও কালের বিবিধ ঘটনা সম্পর্কে মারাত্মক রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের গুরুত্বই সর্বাধিক।

এই সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায় কিভাবে বিস্তার লাভ করে এবং প্রথম দিকে ইংরেজী ও বাংলা যে সংবাদপত্রগুলি বিশেষ প্রাধান্য পায়, আমরা তারই ইতিহাস কিছুটা ধারাবাহিকভাবে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-এর 'দি আর্লি হিস্ট্রি এন্ড গ্রোথ অফ ক্যালকাটা' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'কলিকাতার ইতিহাস' থেকে কিছু অংশ 'পুনশ্চ'র মধ্যে উদ্ধৃত করছি। এই অনুবাদ স্বর্গত সুবলচন্দ্র মিত্র কৃত।

।। মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র ।।

অনেকে বলিয়াছেন, 'সংবাদপত্র রাজ্যের চতুর্থ বল।' বোধহয় ইহার শক্তি তদপেক্ষাও অধিক। লাটিন ভাষায় একটি প্রবাদ-বাক্য আছে, তাহার অর্থ, 'জনসাধারণের বাণীই ভগবানের বাণী।' সংবাদপত্র সেই সাধারণের বাণী প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। সভ্যতার উন্নতির সহিত সংবাদপত্রের ইষ্টানিষ্ট সাধনশক্তি অতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করিতেছে। ইংল্যান্ডের মহাবাগ্মী চেদাস যে সমস্ত প্রসিদ্ধ বক্তৃতাদ্বারা অমরত্বলাভ করিয়াছেন, তাহার একস্থলে সংবাদপত্রকে বায়ুর ন্যায় সর্ব্ববন্ধনমুক্ত ও অব্যাহত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, (তাহার একস্থলে সংবাদপত্রকে বায়ুর ন্যায় সর্ব্ববন্ধনমুক্ত ও অব্যাহত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন)। এই সংবাদপত্রের রাজনীতি-সমালোচক আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আরাম করিতে করিতে রাজা সেনাপতি রাজমন্ত্রী ধর্ম্মযাজক ও জনসাধারণকে স্ব স্ব কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। ইহা চরিত্রহীন ব্যক্তিদিগকে চরিত্রদান করিয়া থাকে।

সংবাদপত্রের প্রকৃতি এইরূপ। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সিসিরো ও ডিমস্থিনিস যৎকালে বক্তৃতাদ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করেন, তৎকালে সংবাদপত্রের শক্তি বিকশিত হয় নাই। আধুনিক বাগ্মীগণকে বক্তৃতা করিতে বা প্রবন্ধ পাঠ করিতে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারণ তাঁহারা জানেন যে, যে নবশক্তি সদা আত্মাভিমানে মত্ত ও যাহার নিকট কোন ব্যক্তির, কোন ধর্ম্মের পরিত্রাণ নাই, সেই শক্তি অচিরে তাঁহাদের উক্তি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে এবং সর্ব্বজনসমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহার সমালোচনা করিবে। কথিত আছে যে, 'সিজারের পত্নী সর্ব্বপ্রকার নিন্দা ও সন্দেহ হইতে মুক্ত।' কিন্তু মহাপ্রভাবশালী সংবাদপত্রের নিকট তাঁহাকেও মস্তক নত করিতে হয়; নচেৎ এক সময়ে সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, এবং তাঁহার চরিত্রের দোষ উদ্ঘাটন করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। বস্তুতঃ ইহা 'শিক্ষকগণকে শিক্ষা দিয়া থাকে।' ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, চারিশত বৎসর কালের মধ্যে ইহা এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং এরূপ অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেছে। উল্লিখিত আছে যে, প্রথম সংবাদপত্র জার্ম্মানি দেশে ১৪৯৮ অব্দে প্রকাশিত হয়।

বস্তুতঃ, অতি প্রাচীনকালে যখন শাসন-বিজ্ঞান ও শাসন-নীতি অতি অপক্ক অবস্থায় ছিল, সে সময়ে প্রশংসা ও নিন্দাবাদ সাধারণ্যে প্রচার করায় যে যথেষ্ট সুফল ফলিত তাহা বেশ বুঝা যায়, কারণ প্রশংসা প্রচার দ্বারা সৎকর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হইত এবং নিন্দা প্রচারে অসৎ কর্ম্মের দমন হইত। অন্যান্য লোকের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা ও অনুমোদন করা, অথবা তাহাতে সম্মতি দেওয়া আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম। লোকে বলে, সত্য ও ন্যায় সর্ব্বাধিক প্রচার দ্বারাই বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করে। সংবাদপত্রের শিক্ষা দিবার শক্তিও বিলক্ষণ আছে। কারণ একাল পর্য্যন্ত জ্ঞানবিস্তারের যে সকল উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্র অতি অল্পকাল মধ্যে বহুলোকের নিকট যেরূপ সত্বর জ্ঞানবিস্তার করিতে পারে, আর কোন উপায় দ্বারাই তেমন হয় না। ইহা জনসাধারণকে ভাব ও চরিত্র দান করে, এবং ইহার দ্বারা বর্ত্তমান সাহিত্যের যে কতদূর উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।...

তথাকথিত 'বাকশক্তিহীন' লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত প্রজা সংবাদপত্রকেই তাহাদের স্বত্বাধিকারের প্রকৃত ব্যাখ্যাকর্ত্তা ও রক্ষক বলিয়া জানে। সুতরাং ইহা যে অল্পকাল মধ্যে মানবসমাজের বিষয় ব্যাপারে এতাদৃশ প্রভাব ও ক্ষমতা লাভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? বিলাতে ইউনিভার্সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক হেনরি মর্লি 'সংবাদপত্র প্রাচীন ও আধুনিক' এতদ্বিষয়ক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইহার বীজ মধ্যযুগে প্রথম রোপিত হয়। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে ভেনিস নগরে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের দ্বারা প্রস্তুত ও সাধারণের চিত্তাকর্ষক সংবাদসমূহে পূর্ণ এক খণ্ড হস্তলিখিত কাগজ কোন প্রকাশ্য স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা হইতে সংবাদপত্রের উদ্ভব হয়। পূর্ব্বোক্ত সংবাদপূর্ণ কাগজ পড়া যাহারা শুনিতে যাইত, তাহাদিগকে এক এক 'গেজেটা' (এক প্রকার সামান্য মূল্যের মুদ্রা) দিতে হইত। এই 'গেজেটা' কথা হইতেই উত্তরকালে 'গেজেট' শব্দ উদ্ভূত

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান
সিল্ক হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

হইয়াছে। মর্লি সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে পূর্ব্বে বণিকগণ যে সংবাদপূর্ণ চিঠিপত্র বিদেশে লইয়া যাইতেন, তাহা হইতেই সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে সংবাদপূর্ণ কাগজ বাহির করা হইত। ইংল্যাণ্ডে ন্যাথানিয়েল বট্‌লার এবং ড্যানিয়েল ডিফো 'উইক্‌লি নিউস' নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। মুসলমান শাসনকালে দেশীয় রাজগণের ব্যয়ে সংবাদসংবলিত কাগজ রাজকীয় গেজেট রূপে বাহির করা হইত। ঐ সকল কাগজে সত্য ও মিথ্যা ঘটনার বিবরণ সত্য বলিয়া প্রকাশ করা হইত, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনা বা মন্তব্য প্রকাশিত হইত না। ঐরূপ কাগজের নাম ছিল 'আকবর'। তাদৃশ্য গভর্ণমেন্টের অধীন লেখকগণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ইংরেজী সংবাদপত্রের সহিত ঐ সকল আকবরের তুলনাই হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত অতি বিচিত্র। প্রায় দুরতিক্রম্য অসুবিধা সমূহের মধ্যে ইহার উদ্ভব হয়, এবং তাহার পদে পদে ইহাকে নানারূপ সঙ্কটে পড়িতে হয়। তখন অবস্থা এইরূপ ছিল যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়রা ভারতে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। ফরাসীরা তখনও বিলক্ষণ প্রভাবশালী ছিল এবং দারুণ উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ভিন্ন কতকগুলি ইংরেজ, বিশেষতঃ খৃষ্টীয়ান পাদরিরা, দেশীয়দিগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি তারস্বরে নিন্দা করিতেছিল।

ঈদৃশ অবস্থায় ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই নবশক্তির অভ্যুদয় যে দারুণ ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তৎকালে এতদ্দেশের ইংরেজ গভর্ণমেন্ট বিলাতের এক বিশেষ সভার প্রত্যক্ষ অধীন ছিল, এবং সেই প্রভুরা এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রকে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সার্ জন ম্যালকম সাহেবের ভারত ইতিহাসের পরিশিষ্টে তাঁহার যে বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেই এই প্রণালীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমর্থন দৃষ্ট হয়। ঐ সমর্থনে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎ প্রসঙ্গে উইলিয়ম ডিগ্‌বি সাহেব লর্ড হেষ্টিংসকে ভারতীয় ইংরেজী সংবাদপত্র সমূহকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত প্রশংসা করিয়াছেন। পরন্তু এ বিষয় সার চার্লস মেটকাফই (পরে লর্ড মেট্‌কাফ) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তিনি পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে সার্ চার্লস্ মেটকাফ কিছুদিন তাঁহার পদে অস্থায়িভাবে কার্য্য করেন এবং সেই সুযোগে এই সংস্কার-সাধন করিয়া ভারতবাসিগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। এই কার্য্যে তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নিজ দায়িত্বে সংসাধন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে মেকলে সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করে। সার চার্লস মেট্‌কাফ প্রকৃতই 'ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদাতা' নামে অভিহিত হইয়াছেন।...

কলিকাতাবাসীরা এই মহোপকারের স্মরণার্থ ভাগীরথীর তীরে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম 'মেটকাফ হল' রাখেন। সে উদ্দেশ্যে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, 'ইহাতে একটি সাধারণ পুস্তকালয় থাকিবে এবং নানাপ্রকার জ্ঞান-বিস্তার কল্পে ইহার ব্যবহার হইবে।'...

ইহার পর ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দুইবার অস্থায়ীভাবে হরণ করা হয়। একবার ১৮৫৭ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহরূপ শোচনীয় ঘটনার সময় এবং দ্বিতীয়বার ১৮৭৮ অব্দে লর্ড লিটনের শাসনকালে। পরন্তু এই দ্বিতীয়বারে কেবল দেশীয় ভাষায় প্রচলিত সংবাদপত্র-সমূহের স্বাধীনতাই সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল। পরে লর্ড রিপন মহোদয় ১৮৭৮ অব্দেই এই বিষয় পক্ষপাতমূলক অহিতকর আইন রহিত করিয়া দেন।

*

কলিকাতায় প্রচলিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম 'বেঙ্গল গেজেট'। উহা ১৭৮০ অব্দের জানুয়ারি (অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'টাইমস্' প্রকাশিত হইবার আট বৎসর পূর্ব্বে) প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রচারিত হইবার বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত ছিল: 'রাজনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র সকলেরই নিকট উন্মুক্ত, কিন্তু কাহারও প্রভাব-পরিচালিত নহে।' দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৮ ইঞ্চি এইরূপ দুই খণ্ড কাগজে ইহার অবয়ব গঠিত হইত; তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তিন কলম (স্তম্ভ) করিয়া মুদ্রিত 'ম্যাটাব' থাকিত, এবং তাহার অধিকাংশই বিজ্ঞাপনে নিয়োজিত হইত। এতৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—'এই ক্ষুদ্র কাগজের অধিকাংশ স্থান কলিকাতার ও মফঃস্বলের পত্রলেখকগণের পত্রে পূর্ণ থাকিত, তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে ইউরোপ হইতে যে নূতন সংবাদ আসিত তাহাও মুদ্রিত হইত। ইহার কাগজ এবং ছাপা অতি কদর্য্য ছিল।'

জেমস অগষ্টস্ হিকি নামক একজন সাহেব ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। বেণ্টিঙ্ক সাহেব লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে হিকি সাহেবকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। জীবন-সংগ্রামে তাহাকে নানাপ্রকার ভাগ্যবিপর্য্যয় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বেণ্টিঙ্ক সাহেব আরও বলেন—'প্রথমে যেসকল লেখকের নামের তালিকা বাহির হয় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার সময় স্বত্বাধিকারী প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংবাদপত্ররূপ হিতকর অনুষ্ঠানটিকে তিনি যদি সৌভাগ্যক্রমে সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত মনে করিবেন। যেহেতু উহা অল্পকাল মধ্যে একটি অমোঘ পিত্তঘ্ন ওষুধরূপে পরিণত হইবে, কারণ তিনি আশা করেন যে, তাঁহার গ্রাহকেরা টিংচার অভ্ বার্ক' ক্যাণ্টাব অয়েল বা কলম্বা রুট অপেক্ষা উহা হইতে অধিকতর প্রকৃত উপকার লাভ করিবেন।'

এই নবজাত সংবাদপত্রের জীবনের প্রথম কয়েক মাস বেশ সুখশান্তিতে কাটিয়াছিল বলিয়া বোধহয়। ইহা সাধারণতঃ নীরস ও অনেকটা ইতর প্রকৃতির হইলেও, মোটের উপর নিরীহভাবেই চলিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

ক্ষপণক

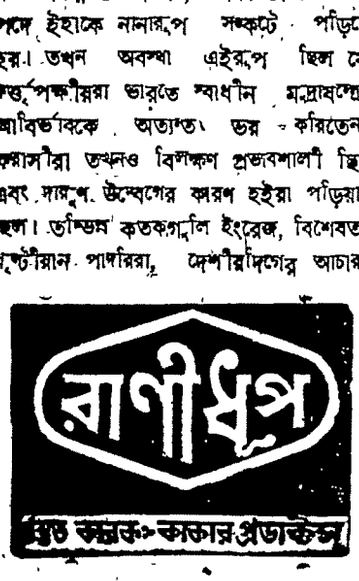

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

দৃশ্যটা হঠাৎ রঞ্জুও দেখে ফেলল দূর থেকে। বাবার পাশে এক ঝাঁক টিয়ের মত টুটুনদের দলটা। সবাই আজ শাড়ি পরেছে। বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। তার পাশে বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে মনে হচ্ছে ভীরু রোগা তাড়া খাওয়া শেয়াল। বাবার পাশে গোপাও আছে। তার সঙ্গে গোপার একটা নীরব সম্পর্ক আছে। যেটা কেউ জানে না। কাল রঞ্জু যুঁইদির সঙ্গে কেষ্টনগর চলে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে। সেই খবরটা ওকে দেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চলতা অনুভব করে রঞ্জু। রঞ্জু সুযোগও পেল বাড়ীতে যখন গানের আসর বসিয়েছিলেন বাবা। রঞ্জু তখন তার পড়ার ঘরে যুঁইদির সামনে বসে কেষ্টনগরে বাবার জন্যে গোছগাছ করছিল। তার মধ্যেই সে ফাঁক বুঝে কথাটা বলে ফেলল বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। সেই রাত্রেই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার শুনল সে। মা চেপে ধরায়, টুটুন বোটানিকেলে গিয়ে তার বাবা তারই বান্ধবী গোপাকে ছুতো করে গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল, এই কথাটা কবুল করতেই মা'র মুখ চোখ রাগে কঠিন হয়ে উঠলো। তাহলে বাবাকে কি মা সন্দেহ করে?

অথচ অমিয়র ধারণা সে মস্ত পুরুষ। মেয়ের বান্ধবীদের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক সেটা নিছকই স্নেহের। তার পেছনে তার কোন খারাপ মতলব নেই। কিন্তু তার হাবভাব কি সেই কথাই বলে?

(২৫)

ওর পিছনে একটা বড় ড্রেসিং-আয়না। সেদিকে চোখ রেখে একদৃষ্টে অমিয়বাবু কিছু দেখছেন বোঝা গেল।

—কি দেখছেন! টের পেয়ে হঠাৎ ও চমকে উঠল।

—কিছু না। গম্ভীর গলায় অমিয় উত্তর করলেন।

—আহা, আমি বুঝি টের পাই না।

—কি দেখছি বলো তো? ওর মুখের দিকে অমিয়বাবু তাকান না। কেবল ঘাড়টা সামান্য কাত করেন। দৃষ্টি আগের মতো ওর পিঠের কাছে ধরে রাখেন।

তাঁর চোখ অনুসরণ করে পিছনটা দেখতে ও ঘাড় ফেরায়। তারপর ফিক করে হাসে। আয়নার ভিতর নিজের শরীরের কত বড় ছায়াটা। আর সেখানে অমিয়বাবুর প্রকাণ্ড লালাভ গোলগাল চোখের ফ্যাকাসে বাদামী মণি দুটো। মনে হচ্ছিল বৃষ্টি ভেজা অসহায় দুটো শালিকের ছানা চুপ করে বসে আছে। যেন মা কখন কুলায় ফেরে তার অপেক্ষা।

আয়নার মধ্যে নিজের কালো চোখ দুটোকে কী অসম্ভব তাজা চঞ্চল দেখায়। যেন আলোর মতন কিছু ঝরে পড়ছে ওই চোখ থেকে। কি ভেবে ও অল্প হাসে না। চট করে মুখটা এদিকে ঘুরিয়ে আনে।

—কফিটা খান ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আস্তে বলল ও।

—হুঁ। সামান্য মাথা নেড়ে অমিয়ও ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে আনেন। কৈ—বললে না পেছনে কি দেখছিলাম!

—থাক, যা দেখছিলেন দেখছিলেন—বলে আর কি হবে।

—কেন?

আর কথা বলে না ও। হাতের নখ খোঁটে। ঝিনুকের মতন ঝকঝকে গোলাপী নখ। হাতের দিকে দু চোখ নামানো। পান পাতার মতন লম্বাটে মুখখানা। চিবুকটা প্রায় ভরে উঠেছে। কাঁধের দুপাশে পাতলা সরের মতন মেদের আভাস দেখা যায়। এখনকার ছিপছিপে ঢেঙ্গা গড়নটা আর বড় জোর দু-এক বছর থাকবে। তারপর শরীরটা বড় হয়ে যাবে ভাঁপ্পি হয়ে উঠবে। অমিয় চিন্তা করেন। তখন কি দেখতে এত ভাল লাগবে ফ্লেমিঙ্গোকে।

—কি হল চুপ করে কেন। আদুরে গলায় অমিয় বলেন।

—আপনার কফি জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে।

অমিয় কফির পেয়ালার দিকে মোটে তাকান না। ওর নখ খোঁটা দেখেন। ওর দুচোখ এখনও নখ নিয়ে ব্যস্ত।

—আমার দিকে তাকাও। আদেশের গলায় অমিয় বলেন।

—আ-রে কী মুস্কিল! এই তো তাকালাম। বলুন কি বলবেন। ঘাড় সোজা করে ও।

কথা বলার আগে অমিয় বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলেন। সোফার পিঠ থেকে পিঠটা আলগা করে নিয়ে সোজা হয়ে বসেন। এদিক ওদিক দেখেন। তারপর সামনের দিকে চোখ রাখেন। ওর মুখের দিকে।

—তোমার পেছনটাও খুব সুন্দর। বুঝেছ ফ্লেমিঙ্গো। আয়নায় তোমার পিঠ কোমর দেখছিলাম। ভেরি গ্রেসফুল।

—এইজন্যই বুঝি টুটুনকে সঙ্গে আনেন না।

—গোমড়ামুখো মেয়ে ও। তুমি কি ওকে নতুন চেন! অমিয়বাবু বোঝান।

ও কথা বলে না। একটু আগে যেমন করেছিল। ঠোঁটের কোণা টিপে আবার হাসে। মুখটা ওপরের দিকে তুলে ধরে। পাখাটা দেখছে।

—সত্যি কিনা, টুটুনটার মধ্যে লাইফ নেই। অমিয়বাবুও এবার সিলিং ফ্যানটা দেখেন। ওপরের দিকে থুতনিটা তুলে দিয়ে কথা বলেন।

কিন্তু মনে হল কথাটা ও কানে তুলছে না। যুক্তিটা শুনতে মোটেই যেন উৎসাহ নেই।

—ওই মেয়ের সঙ্গে গল্প করে সুখ নেই। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে অমিয় বলেন, শুনছ কি বলছি!

সিলিং-এর দিক থেকে ঝপ করে ও চোখ নামায়। ঠোঁট টেপা হাসিটা ঠিক রয়ে গেছে। বলে,

—এই জন্যই একা একা চলে এসেছেন।

—ইস, তোমায় আমি কী বলছি! অমিয় বিরক্ত হন।

—আমি ঠিক বলেছি। আমি ঠিক বুঝতে পারি। খোলা চুলের বোঝা নিয়ে মাথা দোলায় ও।

—এই দ্যাখো। যেন বিব্রতবোধ করতে গিয়ে অমিয় ভুরু কুঁচকোন। —তুমি

মোটেই ভাল মেয়ে নও, ভীষণ দুষ্টু দেখছি।

—কফিটা বরফ হয়ে যাচ্ছে। সামনে সেন্টার টেবিলে রাখা পেয়ালাটার দিকে ও আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে আর ঠোঁটের কোণায় না—গাল ছড়িয়ে হাসে। আর আমি কফি করতে পারব না কিন্তু।

—আমি কি তোমাকে কফি করতে বলেছিলাম। বার বার বারণ করেছি। অমিয় রাগ করার ভান করেন। সোফা ছেড়ে প্রায় উঠে দাঁড়ান।

—কি হল।

—চললাম।

—ইস, বড্ড ছেলেমানুষ আপনি। আর হাসে না ও।

—ছেলেমানুষির কি দেখলে। ওর চোখে চোখ রেখে অমিয় ঢোক গেলেন।

—একটু কিছু বললাম অমনি রেগে গেলেন। তাই বলছি।

—আমি রাগ করি তাই তো তুমি চাও।

—মোটেই না।

—আমি বলছি হ্যাঁ। রাগ করে চলে যাই এই তোমার ইচ্ছে।

—আজ্ঞে না স্যার। ঠোঁট ওল্টায় ও। যেন এবার ওর রাগ করার পালা। জোরে মাথা ঝাঁকায়। মেয়েদের সাইকলজি মোটেই আপনার জানা নেই।

—ব্বাস! অমিয়বাবুও দমবার নন। নাকের পাটা ফুলিয়ে দিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকান। দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলেন। কত সাইকলজি বুঝে গেছে একফোঁটা মেয়ে।

—মোটেই আমি এক ফোঁটা মেয়ে নই। সাত বছরের খুকি নই। যদি তাই হতাম... যদি তাই.....

—হুঁ, কি হল বলো! যদি তাই হতে—

চুপ করে থাকে ও। যেন একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। উত্তেজনার দরুন ঘনঘন শ্বাস ফেলছে। আর তাই না মুখের কথা আটকে গেল।

পয়েজন, ক্যান ক্যান, মে কুইন্ বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অভ্রণী স্টোরেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সম্পৎ সেবামিক্স প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

—বলো। থেমে আছ কেন। খোঁচা দেওয়ার মতন করে অমিয় বলেন—যা বলছিলে শেষ কর। তুমি খুকি নও—হুঁ তারপর!

—আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

—এই, এদিকে তাকাও! অমিয়বাবুর চোখেমুখে উত্তেজনা।

আর একদিকের দেওয়ালে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াতে গেছে ও। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন। এখানে চেঁচালেও কেউ শুনবে না তিনি জানেন। একটেরে বাড়ি মিসেস গাঙ্গুলীর এটা। ঝোপঝাড়ে ঢাকা। দুদিকে দুটো পড়ো জমি। কাজেই এবাড়ির এখনও কোনো প্রতিবেশী হয়নি। পিছনের একটা গাছে পাখিটা টি-টি করছিল।

ধমক খেয়ে বড় বড় চোখ করে ও তাকায়। চোখের তারা দুটো আর গনগনে কয়লার মতন জ্বলছে না। যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে রঙ ধরেছে।

—হুঁ খুকি নও। সাত বছরের ছোট্ট মেয়েটি নও আর। যদি হতে তবে কি হত? নিশ্চয় আমাকে দিয়ে কিছু বলতে চাইছিলে। কিছু ইঙ্গিত করছিলে।

সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন অমিয়বাবু। উত্তেজনায় তাঁর গলার স্বর কাঁপছে। চোখ নামিয়ে ও আবার হাতের নখ খোঁটে।

—কি আশ্চর্য শক্ত মেয়ে তুমি। রাগটা সত্যি চাপতে পারেন না অমিয়। হাত বাড়িয়ে ওর সোনালী নখশুদ্ধ ছোট্ট হাতটা প্রকাণ্ড মুঠোর মধ্যে টেনে ধরেন। তারপর জোরে চাপ দেন। একটা ঝাঁকুনি দেন। ঝাঁকুনি খেয়ে ওর ফ্রক পরা সবটা শরীর নড়ে ওঠে। যেন হাতে লাগল। যন্ত্রণায় 'ওফ' করে উঠল ও। গালে ও চিবুকে ভাঙা ভাঙা ঢেউ দেখা গেল।

—লাগল? ব্যথা পেলে! সঙ্গে সঙ্গে অমিয়বাবু হাতটা ছেড়ে দেন। সোজা হয়ে বসেন। যেন এবার খুব অবাক হন। ভয়ংকর একটা কৌতূহল নিয়ে খুঁটিয়ে ওর চোখ দুটো দেখতে থাকেন। চোখের কিনারে এক ফোঁটা জল টলটল করছে।

—বেশি ব্যথা পেয়েছ! অমিয় আবার ঝুঁকে বসেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ফোঁটা অন্য চোখের কোণা বেয়ে গাল বেয়ে ওর চিবুকের কাছে এসে ঠেকল। আগেরটার চেয়ে এই ফোঁটাটা বেশি উজ্জ্বল ও বড়।

—ওরে ব্বাস একেবারে কাঁদতেই শুরু করে দিলে। অমিয়র গলার স্বরে হতাশা। তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। আমার দিকে তাকাও। দেখি কোথায় লাগল। একটু ধরতে না ধরতে—

কিন্তু এদিকে ও তাকায় না। দু হাতে চোখ ঢাকল। অমিয় ওর হাত ধরতে গিয়ে হাতটা গুটিয়ে নেন। একভাবে চেয়ে থাকেন। ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়ে। পা থেকে মাথা অবধি গোটা ফ্রেমটা একটু একটু কাঁপছে। বিতৃষ্ণার মতন একটা স্বাদ গলার কাছে ঠেকে থাকে অমিয়বাবুর। শক্ত করেন না। ঐ অবস্থায় তিনি চিন্তা করলেন। যদি শাড়ি পরা থাকত চোখে আঁচল চাপা দিত ও। মেয়েরা তাই করে। ফ্রকের সেই সুবিধেটা নেই। তা হলে অনেকটা ফ্রক ওকে তুলতে হয়। তাই হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফোঁপান কান্না।

মুস্কিলে পড়া গেল। বিরক্তবোধ করেন অমিয়। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। সান্ত্বনা দেবার জন্য ওর মাথায় পিঠে একটু হাত বুলোবেন কিনা ঠিক বুঝতে পারেন না। টেবিলের টাইমপিসটা দেখেন। তিনটে দশ। মিসেস গাঙ্গুলীর অফিস থেকে ফিরতে সন্ধ্যে ছটা সাতটা বাজে। ও সেদিন বলেছিল। কাজেই ভদ্রমহিলার ফিরতে এখন অনেক দেরি।

ঠিক এই অবস্থায় অশরীরি ছায়া হয়ে সেই নিঃশব্দ বাড়ির একটা জানালায় দাঁড়িয়ে আমি সুজনকে দেখছিলাম। ধরা যাক আমি পূবের জানালায়। পশ্চিম দিকের জানালা মুখ করে দাঁড়িয়ে অমিয়বাবুও যেন ঝোপঝাড়ে ঢাকা একতলা বাড়িটার নির্জনতা ও নৈঃশব্দের গভীরতা অনুভব করছিলেন। বাইরে গাছের ডালে পাখিটা কিছুক্ষণ ধরে আর ডাকছে না। পশ্চিমের জানালার গ্রীলের গায়ে বিকেলের খানিকটা লাল রোদ ঢেউয়ের মতন তিরতির করে কাঁপছিল। আসলে গাছের পাতাটাতার ফাঁক দিয়ে রোদটা ওখানে পড়েছিল। হাওয়ায় পাতার ছায়ার কাঁপন থেকে ওটাকে রোদের কাঁপন বলে মনে হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল। অমিয়বাবুর কিন্তু গাছের পাতার ছায়া কি এত সুন্দর লাল রোদের ছটার দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না। একটা ভয়ংকর উদ্বেগ ও চঞ্চলতার ছাপ ভদ্রলোকের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে তখন। তাঁর বাঁয়ে ড্রেসিং-আয়নার সামনে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে গোপা। চোখে দু হাত চাপা। যেন ওর নিশ্বাস পড়ছে না। শরীরটা এখন আর একটুও কাঁপছে না। একটু সময় জানালায় অপেক্ষা করে অমিয়বাবু সোফাটায় এসে আবার বসলেন। তারপর অত্যন্ত মৃদু গলায় ওকে ডাকলেন। —এই শুনছ!

ও চোখ থেকে হাত সরায় না এদিকে তাকায় না এবং মুখে কোনো শব্দ করে না।

—আমার ভুল হয়েছে। গলার সুরটা আর একটু নরম করেন অমিয়। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে তোমার হাতে লাগবে। আর এভাবে হাত ধরে ঝাঁকুনি দেব না। কক্ষনো না। না কোনোদিন না।

মেয়েটি নীরব নিঃস্পন্দ।

—এই শোনো আমার দিকে তাকাও। গোপা ফ্লেমিঙ্গো! অমিয় আদর করে ডাকেন। তোমার হাতের তৈরী ইনস্ট্যান্ট কফি খাচ্ছি। তোমার কথার কেমন বাধ্য হচ্ছি দেখ।

কিন্তু তখনও ও চোখ খুলছে না। একভাবে দাঁড়িয়ে।

(ক্রমশঃ)

চিত্রতারকাদের চলন বলন এমনকি পোষাক ও সাজ নকল করার প্রবণতা আজকাল খুব বেশী দেখা যায়। রঙিন পর্দায় সোনালী আলোয় আর দর্শকদের কল্পনায় মিশে যে সৌন্দর্য খুব স্বাভাবিক ও সুন্দর মনে হয় তা কিন্তু এই বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়ে করলে সুন্দর লাগা তো দূরের কথা সময় সময় খুবই খারাপ দেখায়। এর আসল কারণ হল পর্দায় যা শোভন বা চলে তা ঠিক দৃষ্টির সামনে চলে না। আগেও বহুবার লিখেছি আবারও লিখছি—নিজের চেহারা ও গড়নের সঙ্গে মানিয়ে পোষাক পরাটাই সবচেয়ে দরকার। পোষাক—তা শাড়ীই হোক বা ম্যাক্সি, লুঙ্গিই হোক—তা পরার ঠিক ভঙ্গী ও রুচির দরকার। আর একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার, তাহল অন্তর্বাস। নিচে পরার পোষাকগুলি ঠিক মাপসই ও ঠিক মতন হলে তবেই ওপরের জামা কাপড়ের সুন্দরতা ফুটে ওঠে। যেমন পেটিকোট যদি একটু ঠিক কাটের হয় তাহলে তা শরীরের ভাঁজের সঙ্গে লেগে থাকে ও চেপে বসে। তাহলে তার ওপর শাড়ীও ঠিক সেইভাবে পরা যেতে পারে। তাতে শরীরের গঠন দেখতে ভাল লাগে। যুগের ফ্যাশানের সঙ্গে চলতে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় না। যেমন এখন দেখা যায় খুব আঁট করে বাঁদিক থেকে টেনে কাপড় গুঁজে ডানদিক ঘেঁষে কুচি দেওয়া হয়। এর ফলে শরীরের গঠন আরও স্পষ্ট হয়। কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাদের দেহে থলথলে চর্বি আছে কিম্বা পেটের মাংস বেশী—তাদের শরীরের ওই অংশগুলি কুৎসিতভাবে ফুলে থাকে। ফলে খুব খারাপ দেখায়। তাদের আঁট করে শাড়ী না পরে বরং একটু ঢিলে করে কাপড় পরা উচিত। সুতরাং ফ্যাসানের স্রোতে গা না ভাসিয়ে নিজের চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্টাইল করে পোষাক পরা অনেক যুক্তিযুক্ত। ম্যাক্সি জাতীয় পোষাক পরতে হলে নিজের শরীরের গঠন সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার। খুব বেশী চর্বিযুক্ত মোটা শরীর অথবা অস্থি চর্মসার শরীরে এই সব পোষাক পরা উচিত নয়।

এখন গরম পড়ছে, আরও পড়বে। এই সময়ে হাল্কা নরম পোষাক আর ফিকে সুন্দর রং-ই সবচেয়ে ভাল লাগে। কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশী যে বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত, তাহল শরীরের দুর্গন্ধ ও ঘাম ভেজা চেহারা। অনেকে ঘামেন কিন্তু গন্ধ হয় না। আবার দেখা গেছে অনেকের শরীরে ভীষণ দুর্গন্ধ হয়। অনেক সময় এই দুর্গন্ধের কারণ অবশ্য লিভার শারীরিক কোন গোলযোগের থেকে হয় বলে দেখা গেছে। সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তাছাড়া কতকগুলি করণীয়ও আছে। যেমন—নিয়মিত ২।৩ বার সাবান মেখে ও জলে ২।৩ ফোঁটা ডেটল দিয়ে স্নান করা। এতে শরীরের বীজাণু মুক্ত হয় আর পরিষ্কারও থাকে। তারপর শেষ জলে একটু গোলাপ জল দিয়ে সেটা ঢেলে শরীর ভিজিয়ে নেওয়া। তারপর পাউডার দেওয়া এবং আগে ঘরে তৈরী যেসব সুগন্ধির আলোচনা করেছি সেগুলি অথবা দেশী-বিলাতি ভাল পারফিউম দিয়ে নিলে ভাল হয়। লেবুপাতা জলে সেদ্ধ করে সেই জল ঠাণ্ডা করে তাতে স্নান করলেও একটা স্নিগ্ধ সুন্দর সুগন্ধি ভাব পাওয়া যায়। শরীরের যে সব অংশে ঘাম বেশী হয় সেই সব অংশ বিশেষভাবে পরিষ্কার রাখা দরকার। এবার কতকগুলি মোটামুটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি :

(১) প্রশ্নটি হোল মুখে গন্ধ হওয়ায় খুব লজ্জা পেতে হয়। কি করা উচিত? নিয়মিত ভাল পেস্ট দিয়ে (যাতে ফেনা খুব হয়) দাঁত দুবার মাজা। তারপর ব্রাস সর্বদা নুন জলে ভিজিয়ে রাখা। এছাড়া দিনে অন্ততঃ একবার 'লিস্টারিন' জলে দিয়ে মুখ কুলকুচি করে নেওয়া। এছাড়া লবঙ্গ ২।৩টি থেঁতো করে একটু গরম জলে ফেলে সেই জল দিয়ে মুখ কুলকুচি করা। আর মাঝে মাঝে লবঙ্গ চিবিয়ে নেওয়া। কিন্তু এসব করা সত্ত্বেও যদি মুখে দুর্গন্ধ থাকে তাহলে জানবেন তা পেটের গোলমাল থেকে অর্থাৎ যেমন পেট পরিষ্কার না হলে কিম্বা লিভার খারাপ হলে। সেই সব ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ খুব জরুরী।

(২) চোখের পাতা খুব কম, প্রায় নেই বল্লেই হয় তাতে খুব খারাপ দেখায়। কি করলে ভাল দেখাবে? প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময় চোখের পাতার ওপর একটু দুধের সর দিয়ে রাখতে হবে, তারপর সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই দুধের সর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে চুল গজায় ও ঘন হয়। আর সাজার সময় চোখের ওপর ও নীচ উভয় পাতাতেই আই লাইনার লাগালে ভাল দেখাবে।

(৩) মুখে ব্রণ বেরোচ্ছে, তাই গাল খসখসে হয়ে যাচ্ছে। কি করা যায়? ব্রণ অনেক সময় বেরোয় যার কারণ পেট! পেট পরিষ্কার না থাকলে ব্রণ বেরোয়। কিম্বা রোমকূপের মুখে রস ও ময়লা জমেও ব্রণ হয়। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এছাড়া মনে রাখতে হবে যে ব্রণ কখনও গেলে দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া সেই সময় কোনরকমের প্রসাধন ব্যবহার করা ঠিক নয়। প্রতিদিন রাত্রে মুখ কোন ওষুধ দেওয়া সাবান দিয়ে একটু গরম জলে ধুতে হবে, তারপর ব্রণর মুখে চন্দন বেটে লাগিয়ে রাখতে হবে। চন্দন শুকিয়ে গেলে তার ওপর বোরোলিন দিয়ে রেখে দিতে হবে। এতে ফল ভাল পাওয়া যায় বলে শোনা গেছে।

(৪) নাকটা মুখ অনুপাতে খুব ছোট। সাজবার সময় কি করলে ঠিক দেখাবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করেছি, তবুও লিখছি। মুখটি গোল ও ভরা আর নাক ছোট—এই অবস্থায় সাজার সময় প্রধান লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে নাক নিটোল সুন্দর লাগে। মেকআপ দেওয়ার সময় আঙুলের ডগায় একটু লাল লিপস্টিক বোরোলিনের সঙ্গে মিলিয়ে নাকের দুপাশে অর্থাৎ চোখের কোন থেকে নাকের ডগা অবধি টেনে লাগিয়ে দিতে হবে। এই লালচে ভাবে নাককে লম্বা দেখাবে। এছাড়া চোখ বেশ গভীর কালো করে আঁকতে হবে। তবে আইলাইনার দিয়ে চোখ বেশী লম্বা করে টানা চলবে না। এছাড়া মুখে অর্থাৎ গালে বেশী রং দেওয়া চলবে না। এই করলে সাজ সুন্দর হয় ও চেহারার কমটুকু ঢাকা পড়ে যায়।

(৫) পিঠে জামা পড়লে অনেক ভাঁজ পড়ে, দেখতে খারাপ লাগে—কি করা যায়। পিঠে ভাঁজ পড়ার কারণ হল—(ক) মেদ বেশী, (খ) নিচের জামা ও ব্লাউজ ঠিক মতন না পরতে পারা।

সুতরাং প্রথমতঃ মেদ কমানোর জন্য ঠিক খাদ্য খাওয়া উচিত ও নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। সে সম্বন্ধে পরে সবিস্তারে আলোচনা করবো। অবশ্য আগে কিছু করেছিও। আর দ্বিতীয়তঃ নীচের জামা ও ওপরের জামা ঠিক মতন না পরতে পারলেও এই অবস্থা হয়। নীচের জামা খালি গায়ে টেপ দিয়ে মাপ নিয়ে সেই অনুযায়ী পরা উচিত। আর সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে নীচের জামা শরীরের সঙ্গে খাপ খেয়ে বসেছে—জোর করে বসান হয় নি। শরীর আঁট রাখার জন্য অনেকেই নীচের জামা খুব আঁট করে পরেন—তাতে কাঁধে বিচ্ছিরী দাগ হয়, তাছাড়া পিঠেও খাঁজ পড়ে। এটা ভুল। নীচের জামা এমনভাবে কেনা উচিত যাতে বুকের সামনের অংশ ঠিক খাপে বসে যায়, একটুও বেরিয়ে না থাকে ও পিঠে খাঁজ না পড়ে। তারপর ওপরের ব্লাউজের সম্বন্ধেও লক্ষ্য রাখা দরকার। ওপরের ব্লাউজের নীচের পট্টি একটু চওড়া ও গায়ের ঠিক মাপে করলে জামা পিঠের মেদের সঙ্গে ঠিক মতন বসে যায়। আর বুকের অংশ একটু ঢিলে রাখা ভাল। তাহলে পিঠ কোন খাঁজ পড়ে দেখতে খারাপ লাগবে না।

বরবর্ণিনী

মা মারা গেলেন।

বিশেষ কিছুই হয়নি মার, অন্তত মরবার মতন কিছুই নয়। সামান্য বুক কনকন। বিজন এল। দেখে গেল। —একটু সাবধানে থাকতে বলল মাকে। ঘুমের বড়ি দিল একটা আর সাধারণ দু-চারটে ওষুধ। আমাকে বলল, দু-একটা দিন দেখি, তারপর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। ভয়ের তো তেমন কিছু দেখছি না।

কিন্তু কে জানত ব্যবস্থা নেবার আগেই যাবার ডাক এসে যাবে মার। সন্ধ্যেবেলা মুকুল বকুলের সঙ্গে লুডো খেললেন মা। লুডো খেলা শেষ হলে বকুল গল্প শোনার বায়না ধরল। মা বোধহয় ভেতরে ভেতরে

অশৌচ

শিশির লাহিড়ী

ক্লান্ত বোধ করছিলেন, একটু বকেই কেমন যেন থমকে গেলেন। লতিকাকে ডেকে বললেন, বৌমা, আমার শরীরটা ভাল ঠেকছে না। রাতে আমি কিছু খাব না। এবারে আমি শোব মা।

লতিকা শুনল না। সামান্য একটু দুধ কুসুম কুসুম গরম করে নিয়ে এল। মুকুল বকুলকে তুলে খেতে পাঠাল। মার বিছানা-পত্তর ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে মাকে ওষুধ খাইয়ে, শুইয়ে দিল। বকুলটা মার বড় ন্যাওটা, কিছুতেই মানল না। রোজকার মতন ওর দিদুর গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

লতু রাগ করতে লাগল। কী অসভ্য মেয়ে বাবা, কারও বাদ কথা শোনে।

আমি স্তোক দিলাম। ঘুমিয়ে পড়ুক, তুলে আনব। এখন জেদাজেদি করে লাভ কী?

লতু আমার দিকে রাগের চোখ তুলে বলল, তোমার আস্কারাতেই ওরা এত বেড়ে উঠেছে। শাসন তো নেই।

ছেলেমেয়েদের আমি শাসন করতে পারি না। বাবা কোন ছেলেবেলায় মারা গিয়েছেন। মা আমাকে বুকে-পিঠে আগলে মানুষ করেছেন। গায়ে এতটুকু কাঁটা ফুটতে দেননি। আমি কোনদিন মার বকুনি খাইনি। তাছাড়া মুকুল বকুলেরই বা দোষ কী! মায়ের বুকের দুধ ছাড়া অবধি, ওরা ওদের দিদুর কাছে শুয়ে আসছে। দিদুই ওদের পৃথিবী, মা-বাবা।

রাতে শোবার আগে লতু বলল, আমার বাপু ভাল ঠেকছে না। আমি ও ঘরে শুচ্ছি। মা যেন কী রকম করছেন।

ডাক্তার ডাকব?

লতু বলল, একটু দেখি। ঘুমের বড়িটা এইমাত্র দিলাম। —তারপর না হয় ডাকা যাবে।

রাত একটা নাগাদ লতিকার চিৎকারে আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। মা তখন হিসেবের বাইরে। বিজন এল। একটা ইনজেকশন দিল। গম্ভীর মুখে আমার দিকে

চোখ না তুলেই বলল, আই অ্যাম-সো সরি মৃগাঙ্ক।

লতুর কোলে মাথা, মা ভোর রাতের দিকে চলে গেলেন। যাবার আগে অল্পক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরেছিল মার। মা নাতি-নাতনিদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বিমলা এসেছে কিনা জানতে চাইলেন। তারপর আমার আর লতুর হাতদুটো বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে লতুকে বললেন, বৌমা, খোকাকে রেখে গেলাম। ও আমার বড় দুঃখে-কষ্টে মানুষ করা মা।

আমি কেমন ঝিম মেরে গেছি। বোধ-বুদ্ধি সবই টলমলে, পদ্মপাতায় জলের মতন কাঁপছে। মুকুলটা ডাক ছেড়ে কাঁদছিল, বকুল হতবুদ্ধি। একটু বুঝি ভয়ও পেয়েছে। কিন্তু লতিকা খুব সামলে নিল। দু হাতে চোখ মুছে বাঁশ টেনে ধরল সংসারের। আসি-জন বাসিজন, সবাই শোকে মুহ্যমান হলে সংসার কে দেখবে।

দুঃসংবাদ বাতাসে ছড়ায়। রোদ্দুর ওঠবার আগেই বিমলা, রঞ্জন এসে হাজির; দুচারজন আত্মীয়স্বজন। পরক্ষণেই কান্না-কাটি, আমাদের বাড়িতে পূর্ণোদ্যমে শোক উৎসব সুরু হয়ে গেল।

দাহকার্য শেষ করে আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ততক্ষণে ব্রজকাকা, অবিনাশ দাদু, নকুলমামা এসে উপস্থিত। ধ্রুবটুর শ্মশানে গিয়েছিল, আমাদের সঙ্গে ফিরল। মামা কাকা সব ফরাস বিছিয়ে বারান্দায় বসে। লতিকা ওরই মধ্যে বন্দোবস্ত করে পাশের বাড়ির মাধুরীকে দিয়ে চা জল খাইয়ে দিয়েছে গুরুজনদের।

আমি একটু সুস্থির হয়ে বসতেই সবাই আমাকে ঘিরে ধরল। আমার কিছু ভাল লাগছে না। এতদিনে সত্যি সত্যি অনাথ হয়েছি আমি। মনে হচ্ছিল পায়ের নিচে মাটি নেই, মাথার সামনে পাহাড়ের আড়ালটাও সরে গিয়েছে। ওঁদের সব কথা আমি ভালভাবে শুনতে পাচ্ছি না, বুঝতেও পারছি না। আমি কথার কথায় শুধু হুঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ছি।

আচমকা এ বজ্রাঘাতে সবাই মর্মাহত। মার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করছিলেন অবিনাশ-দাদু। মা কেমন করে আমায় মানুষ করে-ছিলেন, কখনও একটি কুশাঙ্কুরও ফুটতে দেননি, সে কথা সবিস্তারে বলছিলেন। নকুল মামা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। —এ অবধারিত সত্য মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। মৃত্যু শোক উজিয়ে ধ্রুব জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, শোকে ভেঙে পড়লে চলবে না এসব বলছিলেন। এখন আমার করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করছিল ধ্রুবরা। রঞ্জন গালে হাত দিয়ে মুহ্যমানের মতন বসে। বিমলা বকুল মুকুলকে সামলে উদাস চোখে তাকিয়ে। লতিকা চোখ মুছছে। আর কাজের ফাঁকে এ-ঘর ও-ঘর করছিল।

মহাগুরু নিপাতের দায়-দায়িত্ব অনেক, ব্রজকাকা বলে উঠলেন। মৃগাঙ্ক তোমায় সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা নেই। কিন্তু একটা কথা বলি বাবা। ধরতে গেলে একা হাতেই তোমাকে সব কিছু সামলাতে হবে। সুতরাং তোমার একটু সাবধানে থাকা উচিত। অশৌচ সংক্রান্ত আমাদের যে সব নিয়ম-কানুন, আচার-বিচার আছে, তার থেকে যুগ অনুযায়ী কিছু বর্জন কিছু গ্রহণ করলে, বোধ হয় ক্ষতি নেই। শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপার আছে, জিনিসপত্র সওদা আছে, আত্মীয়-স্বজনের দ্বারস্থ হওয়া আছে, তোমাকে বাইরে বের হতেই হবে। আজ-কালকার যা দিনকাল যা রাস্তাঘাটের ছিরি, যা গাড়িঘোড়ার ব্যাপার, তাতে তুমি খালি পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াবে এটা ঠিক নয়। বিপদ বাধতে কতক্ষণ। পায়ে তুমি একটা রবারের চটি ব্যবহার করতে পার, আশা করি তাতে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হবে না।

ব্রজকাকার কথা ঠিক। শ্মশান যাত্রার পথে, পায়ে যে পাথরের কুচি ফুটেছে, এরি মধ্যে সে জায়গাটা টাটিয়ে উঠেছে। নকুলমামা সায় দিলেন, হ্যাঁ এটা চলতে পারে। অবি-নাশদাদু নিমরাজী হয়ে বললেন, আতুরে নিয়ম নাস্তি।

লতিকা শুধু বলল, ও কথা বলবেন না। দুদিন না হয় কষ্টই হবে। মা কারও দুবার মরবে না দাদু।

এরপর কোন কথা চলতে পারে না। আমিও মেনে নিলাম। মা-ই যখন চলে গেলেন, তখন পাটুকু বাঁচাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে লাভ কী। সংসারে এই আটত্রিশ চল্লিশ বছর আতুপাতু করে চালিয়ে দিলাম, দুদিন না হয় কষ্টই করি। —বাবা নেই। মা-ই আমার পিতৃতুল্য। সজ্ঞানে মার জন্যে কিছু করতে পারছি এতেই আমার কৃতার্থ বোধ করা উচিত।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। বিমলা এসে ছেলেমেয়েদের শোবার ব্যবস্থা জানতে চাইল। লতু মার ঘরে আমাদের শয্যা পেতে, বড় ঘরে বাকি সকলকে শুতে দিল। হাজার হোক ছেলেমানুষ সব ভয় পেলে, কে দেখবে।

দেওয়ালে মার ফটো, পাশে বাবার। বাবার ফটো বিবর্ণ, রং জ্বলে গিয়েছে। মার উজ্জ্বল চেহারা। মুখের হাসি, ঠোঁটের কোণে অস্ত আভাব মতন লেগে আছে। ফটোয় গোড়ের মালা দিয়ে সাজিয়েছে লতু, চন্দন পরিয়েছে। প্রদীপ জ্বেলেছে। একটা ধূপ-দানিতে ধূপ। সামান্য কিছু ধূপের গন্ধ এখনও ঘরে। মাটিতে খড় বিছিয়ে কম্বল পেতেছে লতিকা। এসব ব্যাপারে মেয়েদের অতীন্দ্রিয় কোন বোধ থাকে কিনা জানি না, তবু লতু কোথাও কোন খুঁত রাখেনি। আমি খাব না বলছিলাম। কিন্তু লতু শুনল না। পাথরের রেকাবে ফল-মিষ্টি গঙ্গাজলে চা করে খানিক খাইয়ে দিল।

শরীর খুব ক্লান্ত হলে অনেক সময় ঘুম আসে না। অবশ্য সদ্য শোকের এই বিজন রাত্রে ঘুম আসাও শক্ত। শুয়ে শুয়ে মার কথা মনে পড়ছিল। মনের মধ্যে হু হু করছে। আমি চোখ বুজলেই মার হাসি, কথা, চলাফেরা সবকিছু শুনতে, দেখতে পাচ্ছি। আমার ফিরতে একটু দেরী হলে সেই ব্যস্তসমস্ত ভাব, অসুখ হলে চমকে চমকে ওঠা।

লতু মাথায় হাত রাখল। আর উসখুস কোর না, ঘুমিয়ে পড়। লতু বলল। কাল থেকে সব কাজ তো আবার একা একা সামাল দিতে হবে।

লতিকার গলা কোমল শোনাচ্ছে। আমি বললাম, ঘুম আসছে না।

আসবে। —একটু চেষ্টা কর।

চোখ বুজলেই মাকে দেখতে পাচ্ছি। আমি বললাম। এই ঘরেই যেন মা রয়েছেন। মা যেন তেমনি করে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলছেন কীরে শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

লতু আমার চুলে বিলি কাটছিল। —মা কী আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন ভেবেছ? মা আছেন। তোমার জন্য মার যা আতুপুতু, অত সহজে কী মায়া কাটে? বাব্বা! তোমাকে নিয়ে মার সঙ্গে কতদিন ঝগড়া করেছি। তোমার একটু কিছু হলেই মার প্রাণ ফেটে যেত। অত ভালবাসা, মা বকুল-মুকুলকেও বাসতেন না।

সত্যি! একথা একশোবার ঠিক। আমার সুখ-ই মার সুখ। আমার দুঃখে মা মুষড়ে পড়তেন। শোক-তাপ দুঃখ-কষ্ট অন্য লোকে পায় পাক, আমি না পেলেই হল। অনেকটা স্বার্থপরের মতন ভালবাসা। এক একদিন হাসি-মস্করার সুরে বলতেন, বৌমা, আমি মরলে তুমে খোকাকে হবিষ্যি করতে দিও না। —ওর পেটে আবার ঘি সহ্য হয় না।

লতিকা রাগ করত। মার যেমন কথা। সুখ-সুবাদে খালি মরি মরি।

মার চোখ উদাস, মা ধরা গলায় বলতেন, একদিন তো মরব বৌমা, তখন খোকার আমার খুব কষ্ট হবে। অত কষ্ট কী ও সহ্য করতে পারবে? না তাতেই আমার সুখ হবে প্রাণে?

লতিকা রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলত। আপনি বড় একালষেড়ে মা। খালি খোকা আর খোকা। বুড়ো ছেলেকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা ভাল লাগে না।

মার মুখ করুণ, চোখ কোমল দেখাত। —তুমি সেই গল্পটা জানো বৌমা, সেই বৃত্তান্ত। এক ছেলে তার ভালবাসার মেয়েকে পাবার জন্যে মার মাথাটা কেটে ফেলল। কাটা মুণ্ড নিয়ে মেয়েকে দেখাতে হবে, তা না হলে বিশ্বাস করবে না মেয়ে। ছেলে মুণ্ড নিয়ে যেতে যেতে চৌকাঠে পা বেঁধে হোঁচট খেল। কাটা মুণ্ডটা হঠাৎ ফিস ফিস করে বলে উঠল, খোকা লাগে নি তো! হাজার হোক মার প্রাণ, না বলে উপায় আছে।

লতু ক্ষেপে উঠত। এ ছেলেকে আপনি ছেলে বলেন মা? আমি মা হলে অমন ছেলে দু টুকরো করে বানের জলে ভাসিয়ে দিতাম।

মা হাসতেন। প্রসন্ন, করুণাময় হাসি। বৌমা, বলা সোজা, করা সোজা নয়।

দেখতে দেখতে আটটা দিন কোথা দিয়ে চলে গেল। কাল নয় পরশু দশ। দশ দিনে কামান, একাদশে শ্রাদ্ধ। হাতে কাজের দিন

বলতে একটা দিনই বাকী। এখনও কত কাজ পড়ে আছে। ত্রি-পাদ দোষ অর্ষেছে, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতে হবে। বড়বাজারের সব মশলাপাতি আনা হয় নি। টালিগঞ্জে নিবারণ খুড়োর ব্যবস্থা হওয়া হয় নি। এখনও। তাছাড়া অফিসেও একবার যাওয়া দরকার। সুখ-দুঃখের পনেরোটা বছর যাদের সঙ্গে হেসে-খেলে কাজেকর্মে কাটল, তাদের শুধু ওই ও গঙ্গা-মার্কা চিঠি পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করলে ভাল দেখায় না। নিজে যাওয়া উচিত।

ভেবেছিলাম শোক শোক করে ভেঙে পড়ব, এখন দেখছি কাজের চাপে মাথা তুলতে পারছি না। মাতৃদায় বলে কথা। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে, মৎসমুখী করতে হবে। আজ কদিন ধরেই বকুল মুকুলটা কিছু খাচ্ছে না, কতদিন আর নিরামিষ সহ্য হয়। তবু উপায় নেই শিশু বলে নিয়ম ওল্টানো চলবে না।

আমার অবস্থাও কাহিল। শোকের চেয়ে আনুষঙ্গিক পরিবেশই আমাকে কেমন যেন ঠুঁটো করে দিয়েছে। এত ঘি-দই-ফল-মিষ্টি পেটে সহ্য হয়? খাব না, খাব না করেও, মুখে কিছু দিতে হয়, তার ওপর উৎকণ্ঠা। রাতে ভাল ঘুম হয় না কেমন একটা অস্বস্তি ঘিরে থাকে। খেয়ে তৃপ্তি নেই, শুয়ে শান্তি নেই লতিকা রাগ করে। বলে, এত অবুঝ হলে চলে। মাথার ওপর দায়-দায়িত্ব পড়লেই যদি আকাশ ভেঙে পড়ে, তবে চলবে কী করে? ঋতটা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও দিনমানে কাজ কর। ব্যস। ফুরিয়ে গেল। কটা দিন বই তো নয়!

লতিকা বলেই খালাস। বলতে ট্যাকস লাগে না। কিন্তু আমার কথা আমি বুঝি। বাবা মা দুজনে থাকলে বাবা যদি যেতেন তবুও মা আমাকে এতশত করতে দিতেন না। খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে পা ফেটেছে। শ্মশান যাত্রার সেই দিনের ব্যথাটা আজও যায় নি। এক মুখ কাঁচাপাকা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। থুতনির কাছে আজ কদিন ধরে দারুণ চুলকোচ্ছে। চুলে জট। তৈলবিহীন রুক্ষ গা। এই অল্প শীতেই ফাট ধরেছে শরীরে। তার ওপর কম্বলে শোওয়া। রোঁয়া ওঠা কম্বলের আঁশ গায়ে লাগলে গা কুটকুট করে শোওয়ার দোষে কম্বলের নীচে খড় সরে যায়, পিঠে আঁটির মতন ফোটে।

অথচ লতিকা কত নির্বিকার। গায়ে একটা কোরা শাড়ি জড়িয়ে এই ভূমিশয্যায় শুয়ে কী অঘোর ঘুমই না ঘুমোয়। একটু আগে আমরা যখন শোবার বন্দোবস্ত করছি লতিকা তখন পিঠের শাড়ি সরিয়ে পিঠটা চুলকে দিতে বলল। আমি আমার আটদিনের আকাঙ্ক্ষা নখ দেখিয়ে বলেছি ছাল চামড়া উঠে গেলে আমি কিন্তু জানি না।

লতু কী ভেবেছে জানি না। গায়ের কাপড় গায়ে জড়িয়ে চিরুনি দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। —না বাপু থাক। তোমার আর চুলকে দুঃখকার নেই।

মেয়েদের সুখ-দুঃখ হাসি-ঠাট্টা কত সহজেই আসে। কথা বলতে বলতেই লতু হাতে মাথা রেখে শুয়েছে। তারপর দে ঘুম। কিন্তু আমার এখনও ঘুম আসছে না। চোখের পাতা ভারী গা এলিয়ে আসছে কেমন যেন চমকে চমকে উঠছি। এ অ-সুখ তো আমরা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছি শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়ম-নিষ্ঠায় পালন করছি তবু কেন এত অসুখী বোধ করছি আমি? কেন ভার বোধ হচ্ছে আমার? তবে কী আমি মাকে যথার্থ ভালবাসি ন? শ্রদ্ধা করি না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মার প্রয়োজন ফুরিয়েছে আমার?

মাথা চড়ে যাচ্ছে। কী আবোল-তাবোল ভাবতে সুরু করেছি। আজ রাতে বোধহয় ঘুম আসবে না। ঘুম না হলে বড় আতান্তরে পড়ব। কাল অনেক কাজ। অনেক কাজ। এখন একবার বাথরুম যাওয়া দরকার। জল খেতে হবে। ভিজে হাত ঘাড়ে গলায় বুলিয়ে শীতল করতে হবে শরীর মন।

আমি বাইরে বের হয়ে এলাম। রাত গভীর। বারান্দার কোন দিয়ে এক চিলতে আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশ কঠিন নীল। বাতাসের গায়ে হিমের চাদর জড়ানো। আহ! শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। আমি অন্যমনস্ক হাতে সিগারেট ধরালাম। ঘড়ির কাঁটায় অতন্দ্র রাত কিছু খসে যাক মন শীতল চোখের পাতা নরম নত হয়ে আসুক তখন আমি বিছানার আশ্রয় খুঁজব।

সময় বাতাসের মতন বয়ে যাচ্ছে। দূরে কোথাও একটা রাত জাগা পাখি ডাকল। বড় ঘরে বকুলটা ঘুমের মধ্যে কথা কইছে। আমি বারান্দা ছেড়ে বড়ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘরে হলুদ আলো। সামনেই খাট। খাটের মাথায় আমার আর লতুর জোড়া ছবি। লতিকার কচি মুখ হাসি হাসি কেমন একটা লজ্জার ছোপ পড়েছে তাতে। আমার মুখ একটু বোকা বোকা তবু গর্ব আর গৌরবের মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

আশ্চর্য! কতকাল আমি ছবিটাকে লক্ষ্য করিনি। ধুলোমলিন আসবাবের মতন এ ছবিটা এতদিন কোথায় যে লুকিয়ে ছিল। এই মুহূর্তে ছবির দিকে তাকিয়ে অলক্ষ্যে আমার মনে হাজারো স্মৃতি তীরবেগে বয়ে যাচ্ছে।...দুধে আলতায় পা ডোবানো লতিকার মা বউ বরণ করছেন।...হাতে ভাত। লতিকা। নিজের হাতে পরিবেশন করছে সবাইকে। সংসারের চাবিটা নিজের আঁচল থেকে খুলে লতিকার আঁচলে বেঁধে দিতে দিতে মা হাসিকান্নার গলায় বলে উঠছেন সুখে থেক। সুখে রেখ মা।...

স্মৃতি ক্রমশ বিস্ফারিত হচ্ছে।—কত স্মৃতি। তিলে তিলে জমানো সহস্র, অজস্র। আমি কপালে হাত রাখলাম। বিন্দু বিন্দু ঘাম, নাকের ডগ কাঁপছে। চোখের পাতা থেকে ঘুম ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। না, আজ রাতের মতন নিদ্রাহীন, নির্জনবাস; স্বেচ্ছাবন্দী আমি। দূরে কোথাও একটা বেড়ালের কান্না বাতাসে ভাসছে।

আধপোড়া সিগারেট ফেলে আর একটা সিগারেট ধরালাম। জল খেলাম। দূরমনস্ক পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘরে আসছি। প্রদীপের আলো দপ দপ করে জ্বলছে। লতিকা কেমন যেন এগিয়ে শুয়ে। বুকের ওপর হাত, মাথা সামান্য কাত লতিকার। অজস্র রুক্ষ চুল কপালে চোখে। ঠোঁটের কোন ইষৎ বাঁকা বোধ হয় সুখস্বপ্ন দেখছে লতু। গায়ের চাদর পায়ের কাছে কোরা শাড়ি ঘুমের ঘোরে সরে গিয়েছে। লতিকার গোল নিটোল উরু প্রদীপের আলোয় গেরুয়া শরীর আরও গৌর, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে

চোখের কোল থেকে আমি হাত সরিয়ে নিলাম। নাক টিপে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়ালাম। লতিকার ঘুমন্ত শরীরে অনেক ধুম। আমি লতিকাকে ভালবাসব। লতুর ঘুম আমার চোখে নেমে আসবে। সে ঘুম বড় সুখের, বড় শান্তির।

চোখের তৃষ্ণা স্পর্শ সুখের জন্য মাতাল হয়ে উঠল। আমি হাঁটু মুড়ে ধীরে ধীরে লতুর পাশে বসলাম। চোখের তারা প্রত্যাশায় কাঁপছে আমার নিশ্বাস উষ্ণ বোধ হচ্ছিল। লতিকার গায়ে কাঁটা হিমের হাওয়ায় তিনতির করে কাঁপছে লতিকা। হঠাৎ মনে হল। —না, বাবা থাক। তোমাকে আর চুলকোতে হবে না। লতু কেমন যেন ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসেছিল। আমি চোরের মতন লতুর গায়ে হাত রাখলাম।

কে? কে! লতিকা ঘুমের মধ্যে চমকে চিৎকার করে উঠল।

আমি। আমি বললাম।

লতু অবাক চোখে তাকাল। ঘুমোওনি?

ঘুম আসছে না লতু। ঘুম আসছে না।

শুয়ে পড়। লতু পায়ের চাদর গায়ে টেনে বলল, শুয়ে পড় লক্ষ্মীটি।

আমি লতুর দিকে তাকালাম। লতু ঘুম দাও। আমি নিঃশব্দে উচ্চারণে প্রার্থনার মত বললাম।

লতু শুনল, কী শুনল না। আবার চোখ খুলে আমার হাত ধরে টানল। শুয়ে পড়। কী ছেলেমানুষী করছ।

আমি লতুর গলায় হাত জড়িয়ে নিলাম। —লতু!

লতু কেমন করে কী যেন বুঝল।

তারপর রাগের গলায় চিৎকার করল। ছিঃ! তোমার না অশৌচ!

লতু সজোরে চাবুকের বাড়ি মারল যেন। আমি আহত যন্ত্রণায় চমকে সরে এলাম। আমি অশুচি। আমি অপবিত্র। লতু পর্যন্ত এখন আমাকে ছুঁতে দেবে না।

আমি চোখ তুলে মার ছবির দিকে তাকালাম। চন্দনের গুঁড়ো করে ঝরে পড়ছে। গোড়ের ফুল বিষণ্ণ—ধূপ নিভে গিয়েছে। কেবল একটা পোড়া কাঠি ধূপদানিতে কঙ্কালের মতন দাঁড়িয়ে। প্রদীপের বুক জ্বলছে।

লতু সামান্য এগিয়ে এল। দুহাতে আমার মুখ ধরে বলল, পাগল কোথাকার!

খেলার জগৎ

বিশ্ব হকি বিজয় ও তারপর

এক আধ বছর নয়, পাকা দশটি বছর অতিক্রান্ত হবার পর ভারতীয় হকি আবার স্বস্থান ফিরে পেয়েছে। আত্ম-বিস্মরণের অন্ধকার যুগ পেরিয়ে আজ আবার আলোর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন। মনো-ভঙ্গের বেদনা ভুলে সাফল্যের সান্ত্বনায় ভারতীয় ক্রীড়ামহলের অন্তর উদ্ভাসিত। লগ্নটি অবিস্মরণীয়। ভারতের খেলা-ধুলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক লাল হরফের দিন।

এমন শুভদিনের স্পর্শের প্রলেপে ভারতীয় ক্রীড়ার শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনের ক্ষত নিরাময় হয়ে উঠেছে। অনেক দিনের আশা ভঙ্গের যন্ত্রণা ভুলে অনেক কিছু পাওয়ার আনন্দে তাঁরা আজ বিভোর। কিছুটা বিহ্বল বুঝি। দিকে দিকে তাই আনন্দের জোয়ার। ইতিহাস স্বীকৃত একদল কুশলী ক্রীড়াবিদের জয়ধ্বনি সোচ্চার। প্রীতি, কৃতজ্ঞতা সেই সঙ্গে মুক্তহস্তে উপঢৌকন নিবেদনের পালা চলেছে।

এই উচ্ছ্বাস স্বতঃই উৎসারিত। এই আনন্দ অভিব্যক্তির হেতুও বুদ্ধিগ্রাহ্য। দীর্ঘ দশটি বছর ধরে অনিশ্চয়তার মাঝ-দরিয়ায় হাবুডুবু খেয়ে ভারতীয় হকি অবশেষে প্রত্যাশা পূরণের তটভূমি স্পর্শ করতে পেরেছে। কাজেই দশ বছর ধরে হা হুতাশে বাতাস ভারী করে যাঁরা শুধু কপাল চাপড়াচ্ছিলেন, নতুন দিনের মোহনার ঠাওর পেয়ে তাঁরা আজ স্বভাবতই আনন্দিত। কিন্তু আনন্দসাগরে অবগাহনের নেশায় মাততে গিয়ে যদি বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে ব্যাপারটা কেমন যেন বিসদৃশ হয়ে পড়ে। মনে হয় আতিশয্যের আদিখ্যেতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বুঝি হালকা করে ফেলা হলো।

কোয়ালালামপুরে ভারতীয় হকি দলের বিশ্ব কাপ বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কোনো ভারতীয়ই হালকা করে দেখতে চান নি সত্যি। কিন্তু জয়ের আনন্দ আকণ্ঠ পান করতে গিয়ে কেউ কেউ কি নিজের অজান্তে নিজেদের আচরণকে ছেলে-মানুষীর পর্যায়ে টেনে নামিয়ে আনেন নি?

কোয়ালালামপুরের আসর মাতিয়ে দক্ষিণ সুরে বিশ্ব বিজয়ী ভারতীয় দল যেদিন রাজধানীর পালামে পৌঁছালো সেদিনের অভিজ্ঞতার কথাই ধরা যাক না। সাত সকালে অনেক গুণমুগ্ধ ভারতীয় পালামে হাজির ছিলেন গুণী খেলোয়াড়দের আন্তরিক ও সম্ভ্রমপূর্ণ সম্বর্ধনা জানাতে। একটি ভাবগম্ভীর মর্যাদামণ্ডিত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রও ছিল প্রস্তুত। কিন্তু মাটি ছোঁয়া বিমানের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সব-কিছুই যেন এলোমেলো হয়ে গেল। প্রত্যাশিত পরিমিতি বোধের কোনো তোয়াক্কা না রেখেই পাঞ্জাবের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীউমরাও সিং সবাইকে ঠেলেঠুলে বিমানের মধ্যে ঢুকে বিশ্বকাপটিকে জাপটে ধরে নিজের মাথায় তুলে সেটিকে বহন করে বাইরে নিয়ে এলেন।

তারপর পালামের অন্যসব অনুষ্ঠানই গৌণ হয়ে গেল। মুখ্য চরিত্রে জাঁকিয়ে বসলেন ওই ওমরাও সিং। অজিতপাল সিং ও তার সতীর্থ খেলোয়াড়েরা হট্ট-গোলে গেলেন হারিয়ে। সকলের চোখের সামনে ভাসতে লাগলেন কাপ মাথায় অত্যুৎসাহী উমরাও সিংয়ের নর্তন কুর্দনের ছবিটি। বুঝি অজিত পালেরা কেউ নন, ওই অনুষ্ঠানের মূল নায়ক উমরাও সিংই। মানী মন্ত্রী তিনি। পরিমিতিবোধের পরিচয় রাখার দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁকে কেউ সেদিন সচেতন করে দেওয়ার সাহস পেলেন না বটে। তবে ওই মুহূর্তে অনেকের ঠোঁটের ডগায় যে গুঁড়ো হাসির ঝিলিক জেগে উঠেছিল প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতায় আমি তা স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

হকিতে হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার সান্ত্বনায় ভারতীয় মাত্রেই যখন আনন্দে মসগুল তখনও প্রকাশ্যে এক মন্ত্রীর নাটুকেপনার সাক্ষী সাজার জন্যে মনে মনে যাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না ওমরাও সিংকে দেখে হেসেছেন তাঁরাই। প্রশ্ন তাঁদেরই এই আদেখলেপনার কি সত্যিই কোনো প্রয়োজন ছিল? ভারত কি এর আগে আর কখনো হকিতে বিশ্ব শ্রেষ্ঠের সম্মান পায় নি যে পাঞ্জাবের শীর্ষ সম্মান প্রাপ্তির আনন্দে এক মন্ত্রীর প্রকাশ্য আবেগজড়িত আচরণে স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও সম্ভ্রমবোধে ঘাটতি ঘটে যাবে? একবার বিশ্ব কাপ বিজয়েই ওমরাও সিংয়ের এই মুক্তকচ্ছ অবস্থা। জানি না তেমন সুযোগ হাতে পেলে ভারতীয় হকি দলের পরপর দুবার ওলিম্পিক জয়ের মুহূর্তটিকে তিনি অন্য কোনো অভিনব কায়দায় স্বাগত জানাতেন! সুখের কথা সেই মহাসুযোগ ওমরাও সিং ও তাঁর সমধর্মীদের জীবনে আসে নি। তাই ভারতীয় হকির স্বর্ণ-যুগকে যথোচিত মর্যাদায় ও মনের গভীরতায় গ্রহণ করতে পেরেছিল সারা ভারত। যে দেশ খেলাধুলায় বিশ্ব বিজয়ের সামর্থ্য ধরে সেই দেশের সাধারণ ক্রীড়া-নুরাগীরাও সংযমে, পরিমিতিবোধে বিজয়ী খেলোয়াড়দের পাশে মানানসই ঠাঁই নিতে না পারলে সব ব্যাপারটাই কেমন যেন হালকা হয়ে যায়। তাই নয় কি?

বিশ্ব কাপ বিজয়ী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা ও উপঢৌকন নিবেদনের প্রয়াসে আরও কিছু হালকা ও অযৌক্তিক কাজ করা হয়েছে। যথা তাঁদের আর্থিক পুরস্কার দানের পরিকল্পনা। বিশ্ব কাপ বা ওলিম্পিক অথবা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র অপেশাদার খেলোয়াড়দের জন্যেই নির্দিষ্ট। ভারতীয় খেলোয়াড়েরাও ঘোষিত মতে অপেশাদার। নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি অর্থ পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ করলে তাঁদের অপেশাদার সংজ্ঞা হারাতে হবে। ফলে চিহ্নিত খেলোয়াড়দের কেউ ভবিষ্যতে আর কোনো আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। আশ্চর্য এই যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার এই সাধারণ নিয়মাবলীর ল্যাজ উলটে না দেখেই অনেকে মায় দায়িত্বশীল রাজ্য সরকারও বিজয়ী ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রকাশ্যে আর্থিক পুরস্কার দিতে এগিয়েছিলেন। এও এক ধরণের বাড়া-বাড়ি। এবং বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় দিতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কেউ কেউ ভারতীয় খেলোয়াড়দের জাতিচ্যুত করার উপক্রম ঘটিয়েছিলেন।

আমরা বলি বিনয় সংযম পরিমিতি-বোধ হলো খেলোয়াড়-চরিত্রের ধর্ম। তাই যদি হয় তাহলে ভারতীয় ক্রীড়ারসিকমহল খেলোয়াড়োচিত চরিত্র ধর্মে উজ্জীবিত থাকার প্রেরণা পাবে না কেন? যে কোনো

খেলায় ভারত জিতলেই একশ্রেণীর ভারতীয় অধুনা বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্ন দেখছেন। আর হার হলেই শ্মশানের স্তব্ধতার অভিশাপে তাঁরা হচ্ছেন শোকাহত। এই দৃষ্টান্ত, এই স্বপ্নসুখ ও শোক দুই কিন্তু মানসিক বিকারের লক্ষণ। কারণ, খেলায় হার এবং জিত দুই বাস্তব সত্য। খেলতে গেলে হারতে হবে। জিতও হবে। হারজিত উভয়ই সমান নজরে দেখা ভাল। খেলোয়াড় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখায় এ ছাড়া অন্য পথও নেই। আমরা খেলতে চাই। জিততেও চাই। কিন্তু সবার ওপরে চাই, খেলোয়াড়োচিত চরিত্রে সনিষ্ঠ ও অবিচল থাকতে। খেলাধুলার এই মৌল তত্ত্ব সম্পর্কে সারা ভারত যতো তাড়াতাড়ি সচেতন হয়ে ওঠে ততোই আমাদের মঙ্গল।

কোয়ালালামপুরে বিশ্ব কাপ জয়ের পথে চূড়ান্ত পর্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্থানকে হারাতে ভারতীয় দল যথার্থই উন্নততর ক্রীড়া সংগতি জোগাড়ে আনতে পেরেছিল। ফাইনালে ভারতের জয় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা নয়। দক্ষতা, যোগ্যতার পরিচয়ে প্রতিপক্ষকে নিজেদের এলাকায় বন্দী করে রেখে তবেই ভারত ওই গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালের ফয়সালা করে নিতে পেরেছিল নিজেদের অনুকূলে।

শক্তিধর পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের এই উজ্জীবিত ভূমিকা অর্থবহ। দেশ বিভাগের পর ভারতীয় উপমহাদেশের দুটি শাখা হকি মাঠে বারে বারে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। কখনো পাকিস্থান, আবার কখনো ভারত জিতলেও মুখোমুখি সাক্ষাতকারের সূত্রে প্রায় প্রতিবারই ভারতীয় দলকে যেন স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগতে হয়েছে। হয়তো বড় হওয়ার দায় দায়িত্ব ভারতীয় দলের মনের ওপর বোমার মতো চেপে বসেছিল। তাই এই মানসিক পশ্চাদপসরণ। সুখের কথা কোয়ালালামপুরে ভারতীয় দল স্নায়ু দুর্বলতা জয় করে নিজেকে পুনরাবিষ্কার করার উদ্যম দেখিয়েছে। ভারতীয় দলের এই ভাবান্তর দেখে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে পাকিস্থানী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারতকে হয়তো আর স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগতে হবে না।

উন্নত ক্রীড়াশৈলীর বাঁধনে যদি পাকিস্থানী ক্রীড়ারীতিকে বেঁধে রাখা যায়, বর্ধিত মনোবলের চাপে যদি পাকিস্থানী চ্যালেঞ্জকে অকেজো করে তোলা যায় তাহলে অনাগত ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষে হকির অধিকৃত সাম্রাজ্য হারাবার ভয় থাকবে না। কারণ বিক্ষিপ্ত লগে নেদারল্যান্ডে বিশ্ব কাপ এবং পশ্চিম জার্মানী ওলিম্পিক হকি জয় করলেও হকি খেলার উন্নত ক্রীড়াকৌশল ও তার শিল্পচাতুর্য এখনও ভারতীয় উপমহাদেশের খেলোয়াড়দেরই আয়ত্তে রয়েছে। আত্ম বিস্মরণের কালে ভারতীয়েরা নিজেদের সৃজনধর্মী ক্রীড়ারীতির মাহাত্ম্য ভুলে ইউরোপীয় ক্রীড়াপদ্ধতি অনুসরণে মন দিয়ে নিজেরাই নিজেদের সংকট ডেকে এনেছিলেন। এই সংকটের উৎস ছিল নিজেদের চিন্তার দৈন্য। মনে হচ্ছে, ভারতীয়েরা এতোদিনে বুঝি আবার চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব বাধিয়ে সাময়িক সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। এই মানসিক বিবর্তনে ভারতীয় হকির কল্যাণই হবে।

তবে কোন ক্রীড়াপদ্ধতি কল্যাণকর এবং কোনটি নয়, সে সম্পর্কে ভারতীয় খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষকদের স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। গত দশ বছর ধরে ভারতীয় খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষকেরা ভিন্নমুখী ধারণার উলটো পালটা টানে সনাতন ভারতীয় ক্রীড়াপদ্ধতি বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়ে হিট ও রানে সাজানো ইউরোপীয় ক্রীড়া পদ্ধতি অনুসরণে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাতে সুফল ফলে নি। ইওরোপীয় তরুণদের মতো দৈহিক সঙ্গতি ও গতির পুঁজি না থাকায় পরের বিদ্যা নকল করায় তাঁরা মুন্সীয়ানা দেখাতেও পারেন নি। উল্টে গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে গিয়ে তাঁরা কেবলই অনিশ্চয়তার গোলক ধাঁধায় ঘুরে ফিরে হেলিয়ে মরেছেন। আশা করি, কোয়ালালামপুরের শিক্ষায় উপকৃত হয়ে তাঁরা ভবিষ্যতে সুস্থ পথ পরিক্রমণে সনাতন ভারতীয় ক্রীড়ারীতির প্রতি চিরাগত শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। ভারতীয় ক্রীড়ারীতি মানেই সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়াকলাপ, টিকের কাজের ভিত্তিতেই যার পরিচ্ছন্ন বিন্যাস। হিট ও রানের মাধ্যমে মুশকিল আসানের পথ খোঁজার মতো নিরর্থক প্রয়াস নয়।

সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে কোয়ালালামপুরে বিশ্ব কাপ জয়ের পর ভারতীয় দলের কাঁধে বাড়তি দায়িত্বের বোঝা আরও ভারবহ হয়ে পড়েছে। বিশেষতঃ যখন দলে দলে ক্রীড়াগত ব্যবধান ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। ব্যবধান যে কমছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোয়ালালামপুরে ভারত বনাম আর্জেন্টিনার খেলার ফলাফল। সে খেলায় বিশ্ব বিজয়ী ভারতকে অল্পখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে। ভারত এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বিশ্ব বিজয়ী স্বীকৃতি নিজের মুঠোয় ধরে রাখতে হলে ভারতীয় হকিকে গড়ার কাজে চিন্তার ক্ষেত্রে কর্মঘর্মের সমন্বয় ঘটাতে হবে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যেহেতু বড় হওয়ার দায় যে অনেক।

কিন্তু ভারতীয় হকির লালন পালনের ভার যাদের ওপর তাঁরা আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে বোধহয় রাজী নন। তাঁরা এখনও হকির ঘরোয়া কোঁদলকে জিইয়ে রাখতেই তৎপর।

ভারতীয় হকিকে হাতিয়ার হিসাবে কাজে খাটিয়ে মোড়লীর ছড়ি ঘোরাতেই কর্তারা সশব্যস্ত। আত্মকলহের পরিণামে ভারতীয় হকির নিয়ামক সংস্থা ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেছে। সরকারী হস্তক্ষেপেও ভাঙা কাঠামোয় জোড়া লাগে নি। আশা ছিল যে বিশ্ব কাপ বিজয়ের মতো এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার পর হয়তো বিবদমান দুগোষ্ঠী জাতীয় স্বার্থে সম্বিৎ ফিরে পাবে। কিন্তু সে আশাও পূর্ণ হয় নি। উলটে ভারতীয় হকির সাফল্যকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিস্বার্থ নিজের কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করছে।

কর্মকর্তাদের এই আত্মকলহের পরিণামে ভারত নিজের দেশে বিশ্ব কাপ হকি সংগঠনের অধিকার হারিয়েছিল। ব্যক্তি স্বার্থের সংঘাতে ভারতীয় হকি নিয়ামক-সংস্থা টুকরো টুকরো না হলে তৃতীয় বিশ্ব কাপ হকির আসর কোয়ালালামপুরের বদলে ভারতের মাটিতেই সাজানো হোত। নিজের অধিকার এইভাবে হাতছাড়া করায় বিদেশীদের চোখে ভারতীয় হকির ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে গিয়েছে। তবুও কর্তারা অভ্যন্তরীণ কলহের মীমাংসায় উদ্যোগ দেখান নি।

কর্তাদের হানাহানি, আত্মকলহের সূত্রে খেলোয়াড়দের মনেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। এমন এক অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতিতে মাঠে নেমে তাঁদের পক্ষে আশানুরূপ উন্নত মানে খেলা রীতিমতো কঠিন। তবু সেই কঠিন কাজ তাঁরা সাধ্যায়ত্ব করেছেন বলে জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের কাছে আমরা জাতিগতভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু যে কর্তাব্যক্তিরা আত্মকলহ জিইয়ে রেখে খেলোয়াড়দের চলার পথ বন্ধুর করে তুলছেন, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের সংকল্পে জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করছেন, কোন বিশেষণে বাক্য সাজিয়ে আজ আমরা তাঁদের প্রশস্তি গাইবো?

জানি না, কবে এইসব ধাপ্পাবাজ কর্মকর্তার ব্যক্তিস্বার্থের প্রভাব থেকে ভারতীয় হকি রেহাই পাবে। কতোদিনে তার রাহুমুক্তি ঘটবে। জাতীয় হকি দলের বিশ্ব বিজয়ের পরও কি ইতিহাসের শিক্ষা নিষ্ফল হয়ে যাবে? জাতির কপালে আজ জয় তিলক আঁকা হয়েছে। এখন আর আত্মকলহ বোঝা বয়ে বেড়ানো চেষ্টা কেন? খেলোয়াড়েরা তাঁদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। দেখে, শিখে কর্মকর্তারা কি নিজেদের কর্তব্য সম্পাদনে সনিষ্ঠ হতে পারেন না?

অজয় বসু

খেলাধূলা

দর্শক

ডেনিস অ্যামিশ

এস রায় শীল্ড

আন্তঃকলেজ নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিদ্যাসাগর কলেজ (দিবা) ৫ উইকেটে আনন্দমোহন কলেজকে হারিয়ে অধ্যক্ষ এস রায় শীল্ড জয়ী হয়েছে। এবার নিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজ সাতবারই এস রায় শীল্ড পেল।

ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে আনন্দ-মোহন কলেজের প্রথম ইনিংস ১৩৫ রাণের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজ ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১০৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে মাত্র ২৫ মিনিটের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। বিদ্যাসাগর কলেজ দলের প্রথম ইনিংসের ১৩৮ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আনন্দমোহন : ১৩৫ রান (প্রবীর রায় ৩০ রান। গোপাল রায়চৌধুরী ১৯ রানে ৪ এবং পি নন্দী ৫৩ রানে ৩ উইকেট)

বিদ্যাসাগর : ১৩৮ রান (৬ উইকেটে। পি নন্দী ৪২ রান। প্রকাশ আচার্য ৬৩ রানে ৪ এবং অনুপ মিত্র ৪৯ রানে ২ উইকেট)

বছরের পাঁচজন ক্রিকেটার

১৯৭৫ সালের বিশ্ববিখ্যাত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জিকায় 'বছরের সেরা পাঁচজন ক্রিকেট খেলোয়াড়' অধ্যায়ে ইংল্যান্ডের চারজন এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একজন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। তালিকায় স্থান পেয়েছেন ইংল্যান্ডের ডেনিস অ্যামিস, টনি গ্রীগ, মাইক ডেনেস ও নরম্যান গিফোর্ড এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অ্যান্ডি রবার্টস। এঁরা সকলেই স্বদেশের ক্রিকেট দলের সঙ্গে ভারত সফরে এসেছিলেন এবং সকলেই স্বদেশের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন।

জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতা

ত্রিবান্দ্রমে আয়োজিত ৩০তম জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে বিহার (৪০ পয়েন্ট), মেয়েদের বিভাগে ওড়িশা (১৫ পয়েন্ট) বালক বিভাগে রাজস্থান (২২ পয়েন্ট) এবং বালিকা বিভাগে পশ্চিমবাংলা ও রাজস্থান (৬ পয়েন্ট) দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন—পুরুষ বিভাগে বিহারের অমর সিং (১৫ পয়েন্ট), বালক বিভাগে মহারাষ্ট্রের ফিরডাস সোনজী (১০ পয়েন্ট) এবং বালিকা বিভাগে পশ্চিমবাংলার বাণী ঘোষ (৮ পয়েন্ট)।

চূড়ান্ত ফলাফল

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম বিহার (৪০ পয়েন্ট) ২য় রেলওয়ে (১৬ পয়েন্ট) এবং ৩য় রাজস্থান (১২ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ১ম ওড়িশা (১৫ পয়েন্ট), ২য় রাজস্থান (৮ পয়েন্ট) এবং ৩য় পশ্চিমবাংলা (৪ পয়েন্ট)।

বালক বিভাগ : ১ম রাজস্থান (২২ পয়েন্ট) ২য় মহারাষ্ট্র (১০ পয়েন্ট) এবং ৩য় অন্ধ্র।

বালিকা বিভাগ : ১ম পশ্চিমবাংলা ও রাজস্থান (৬ পয়েন্ট), ২য় ওড়িশা (৩) এবং ৩য় মধ্যপ্রদেশ (১ পয়েন্ট)।

রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতায় আনন্দকুমার ঘোষ এ বছরও চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে উপর্যুপরি চারবার রাজ্য দাবা খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। প্রতি-যোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছেন যথাক্রমে জগদীশ বসু এবং শ্যামল দত্ত।

মাইক ডেনেস

টনি গ্রিগ

ম্যারাথন রেস

এথেন্সে আয়োজিত ১২শ বার্ষিক ম্যারাথন রেসে রাশিয়ার জুরি ল্যাপটেভ প্রথম হয়েছেন। প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এথেন্স স্টেডিয়াম পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করতে তাঁর সময় লাগে ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড। ১৯৬৮ সালে বৃটেনের বিল অ্যাডককস এই পথ ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৭-৩ সেকেন্ডে অতিক্রম করে যে রেকর্ড করেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

পোলভল্টে বিশ্ব রেকর্ড

ফ্লোরিডা ট্রাক ক্লাবের ডেভ রবার্টস পোলভল্টে ১৮ ফিট ৬½ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

এই মুহূর্তে ভারত বিশ্ব হকির শীর্ষ বিন্দুতে অধিষ্ঠিত। বার্সিলোনা আমস্টারডামের ব্যর্থতাকে ধুয়ে মুছে কোয়ালালাম-পুরের আসরে চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্থানকে হারিয়ে ভারতীয় তরুণরা হকির নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পঞ্চান্ন কোটি ভারতবাসীর উষ্ণ অভিনন্দনে সিক্ত, প্লাবিত আজ অজিতপাল সিংয়ের নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী ভারতীয় হকি খেলোয়াড়।

অভিনন্দন অপ্রত্যাশিত নয় কারণ প্রায় এক যুগব্যাপী ব্যর্থতা আর হতাশার অন্ধকার অঞ্চলে পদচারণার পর নতুন আলোর ঠিকানা খুঁজে পাওয়া তো কম নয়! যে ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গণে হকিতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব একদা প্রশ্নাতীত ছিল, তা আজ ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৪ সালের পর—ভারতের ভাগ্যে আর স্বর্ণপদক স্পর্শের সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু তবু বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের যা কিছু স্বীকৃতি তা ঐ হকির দৌলতেই। ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, বাবু বলবীর বা কুডিয়সের যোগ্য উত্তর সাধক এখনও অনুপস্থিত, অনাবির্ভূত। অনেক বিদগ্ধজনের মতে ভারতীয় হকি অবক্ষয়ের পথে। কে ঠিক কে ভ্রান্ত তা নিয়ে বিতর্কে না নেমেও একথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায় যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াভূমিতে ভারতের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে।

হকি পুনরুজ্জীবনের সূত্র ধরে এবার থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিশ্রুতিপূর্ণ পশ্চিম বাংলার হকি খেলোয়াড়দের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হোল।

সমর মুখার্জি

প্রস্তাবটা শুনেই প্রেস বকস থেকে শ্রীমানের ঝম্প প্রদান এবং দ্রুত প্রস্থান। পলানোর ধরণ দেখে আমি তো হেসেই অস্থির।

অমিতাভ বচ্চনকে (অন্য মতে শশী কাপুর) চেনেন? বোম্বাইয়ের নয়, কলকাতার! দেখেছেন কখনও? যদি না চিনে থাকেন বা না দেখে থাকেন তা হলে হকির মরশুমে যে কোন দিন বিকেলে মোহনবাগান মাঠে আসুন, কলকাতার অমিতাভর দর্শন মিলবে।

আমি মোহনবাগানের হকি গোলরক্ষক সমর মুখার্জির কথাই বলতে চাইছি। প্রবাসী বাঙালী সমরের খ্যাতি তাঁর অনন্য ক্রীড়াকৃতীর সূত্রে। খ্যাতি পশ্চিমবঙ্গেই শুধু নয় খ্যাতি সারা ভারতময় কেননা একাধিক ক্ষেত্রে স্বদেশে এবং বিদেশে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জব্বলপুর থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে বোম্বাই এবং আবার কলকাতায় ফিরে আসা—সব কিছুই সমরের জীবনে দ্রুত লয়ে ঘটেছে বটে কিন্তু উন্নতির সূর্য স্বর্ণ-শিখরে উঠেছেন কিন্তু ধীরে ধীরে।

আসলে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে এসে দাঁড়ানোই ছিল সমরের এক সমস্যা। থাকতেন অখ্যাত স্থানে, প্রতিনিধিত্ব করতেন দুর্বল দলের। তাই সেদিনের সমর মুখার্জিকে আজকের সমর মুখার্জি বলতে অনেক পরিশ্রম, অনেক সাধনা অনেক নিষ্ঠার পথ বেয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে।

বলা বাহুল্য ঐ গুণাবলীর অধীশ্বর বলেই তিনি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। অসাধারণ বিচার বুদ্ধি অটল প্রত্যয়, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারঙ্গম সমর। দলের সহযোগীরা সমরকে ভাল করেই বোঝেন তাই ভুলত্রুটি কিছু ঘটে গেলেও ভরসা রাখেন 'শেষ প্রতিশোধ প্রাচীর' সমর অত সহজে টসকাবে না।

সমরের জন্ম ১৯৪৪ সালের ১২ নভেম্বর জব্বলপুরে। বাবা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখার্জি ছিলেন মার্টিন বার্ণ কোম্পানীর অফিসার। কিছু দিন হল অবসর নিয়েছেন। সমররা পাঁচ ভাই দু বোন (দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ভাই ফাইজার কোম্পানীর সেলস একজিকিউটিভ। স্বচ্ছল সংসার। ঝুটঝামেলা কিছু নেই; দু ছেলে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ভাল রোজগারপাতি করে (সমর কলকাতায় ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার চাকুরে)। ছোটবেলা থেকেই অর্থাৎ স্কুলে পড়ার সময়েই সমরের হকির প্রতি অনুরাগ। জব্বলপুরে ক্রিশ্চিয়ান হাইস্কুলের ছাত্র হিসেবে নিজের ক্লাশের এবং স্কুলের হয়ে হকি খেলেছেন নিয়মিত। ১৯৫৯ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় পাশ করার পর ভর্তি হলেন জব্বলপুর বরার্টসন সায়েন্স কলেজে (এখন এই শিক্ষায়তনের নাম গভর্নমেন্ট সায়েন্স কলেজ) ১৯৬৩ সালে বি এস সি পাশ করলেন। ভর্তি হলেন এম এস সিতে। ইচ্ছা ছিল ফিজিকস নিয়ে পড়ার কিন্তু চাকরী জুটে গেল ভিলাইয়ে রিসার্চ এণ্ড কন্ট্রোল ল্যাবরেটারীতে। পড়া সাঙ্গ হোল। কিন্তু দু বছর চাকরী করার পর ভিলাই আর ভাল লাগল না। চলে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এলেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবেন এই আশা নিয়ে। কলকাতায় প্রথমে খেললেন মোহনবাগানে (১৯৬৭-৬৮)। ১৯৬৯ সালে যোগ দিলেন ইষ্টবেঙ্গলে। ভাল লাগল না। '৭০ সালে ফিরে এলেন আবার সেই মোহনবাগানে। সেই থেকে আর দল পাল্টান নি। মাঝখানে ১৯৬৯ সালে বোম্বাইয়ে কিছু দিন কেটেছে টাটা অয়েল মিলসের মার্কেট রিসার্চ বিভাগের চাকরীর সূত্রে। কলকাতায় হিন্দুস্থান লিভারেও চাকরী করেছেন কিছু দিন। বর্তমান চাকরীতে যোগদান ১৯৭২ সালে।

এত পজিসন থাকতে হঠাৎ তুমি গোলে খেলার সিদ্ধান্ত নিলে কেন? এক গাল হেসে সপ্রতিভ সমর উত্তর দেন : সে এক ইনসিডেন্ট বটে। স্কুলে ফুটবল খেলতাম লেফট আউট (এখন স্ট্রাইকার)। হকি রাইট ইনে, লেফট ইনে। দলের দশজন মোটামুটি কাজ চালাবার মত হলেও আমাদের গোলকীপার ছিলেন একটু সৌকি। মাষ্টারমশাই শ্রীরামজী বললেন : মুখার্জি প্যাড বাঁধো গোল-মে খেলো। মাষ্টারজীর কথার অবাধ্য হতে পারি নি। সেই থেকে আমি গোলকীপার। ফুটবলে কিন্তু ফরোয়ার্ডেই খেলি। গত বছর কলকাতার থার্ড ডিভিসন লীগে চ্যাম্পিয়ান বেলেঘাটার হয়ে খেলেছি। গোলও করেছি অনেকগুলি।

সমর মুখার্জি স্কুল ও কলেজ হকিতে নাম করার পর আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় আসরে জব্বলপুরের প্রথম প্রতিনিধিত্ব করেন ১৯৬০ সালে। ৬১, ৬২ এবং ৬৩ সালেও জব্বলপুরের অন্যতম গোলকীপার ছিলেন তিনি। সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশে জার্মান দলের বিরুদ্ধে খেলেছেন ১৯৬১-৬২ এবং ৬৩-৬৪ সালে। ১৯৬৪ সালে ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান ভারতীয় দলের বিরুদ্ধেও বাছাই ভারতীয় দলের গোলরক্ষক ছিলেন তিনি।

জাতীয় হকির আসরে প্রথম আবির্ভাব এই কলকাতায়ই ১৯৬০ সালে। সমর মুখার্জি এসেছিলেন মহাকোশলের হয়ে খেলতে। ১৯৬০ সালে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় হকিতে ঐ মহাকোশলের হয়েই খেলেছেন। ১৯৬৭ থেকে বাঙলার হয়ে। ১৯৭৩ সালে বাংলা দলের অধিনায়কও ছিলেন তিনি। খেলা হয়েছিল বোম্বাইয়ে। এর আগে ১৯৬৪ সালে ভারত সফরকারী ফ্রান্স জার্মানী হল্যান্ড জাপান ও নিউজিল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে খেলার সৌভাগ্যও হয়েছে তাঁর। সর্বভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর নজর কেড়ে ছিলেন সম্ভবত ঐ সমস্ত আসরের মাধ্যমেই। ১৯৬৭ সালে তাই মাদ্রিদের বিশ্ব কাপ হকির আসরে ভারতীয় দলে সমরের অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

কিন্তু তারপরই কোথায় যেন কি ঘটে গেল সবার অলক্ষ্যে। ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো ওলিম্পিকের দল গঠনের ট্রায়ালে ডাকই পেলেন না। ১৯৭১ সালটা ভাল কাটে নি আঙ্গুলের আঘাতের জন্য। আমষ্টারডাম বিশ্ব কাপ হকির নির্বাচনী শিবিরে যোগ দিয়েও দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছে। যেমন হতে হয়েছে এবারের বিশ্ব কাপ দল থেকেও। কিন্তু সে জন্য সমরের বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। আফটার অল উই স্যুড টেক ইট স্পোর্টিংলি। এই তো পাকিস্থানকে হারিয়ে ভারত ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলো, এতে আমার আনন্দ কি অন্যদের চেয়ে এতটুকু কম?

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবিদেশের খেলা

করচনোই-এর চোখে কারপভ

বছর দুয়েক আগে ববি ফিশার ও স্পাসকির মধ্যে দাবাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছিল। উত্তেজনা আধিক্যের অন্যতম প্রধান কারণ হল রুশ মার্কিন লড়াইকে ঘিরে। কারণ ইতিপূর্বে আর কোন মার্কিন নন্দন বিশ্ব দাবা জগতে একছত্র রুশ আধিপত্যকে খর্ব করার জন্যে ফাইনালে ওঠেননি।

সেবার ফিশার বিশ্ব খেতাব ছিনিয়ে নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। আবার রুশ মার্কিন লড়াই। তবে এবারকার দাবাযুদ্ধে স্পাসকির জায়গায় অ্যানাতোলি কারপভ ববি ফিশারের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কে জিতবে এ নিয়ে বাক বিতণ্ডার শেষ ছিল না।

কারপভ স্বদেশীয় করচনোইকে হারিয়ে চূড়ান্ত খেলায় অংশ গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। খেলার নিষ্পত্তি হয় ৬—৬ ম্যাচে। করচনোই পরাজিত হলেও একজন প্রথম শ্রেণীর স্বীকৃত দাবাড়ু। ইন্টারন্যাশনাল গ্রাণ্ডমাষ্টার। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা অদূর ভবিষ্যতে করচনোই বিশ্ব খেতাবের অধিকারী হবেন। অনতিকাল পূর্বে কারপভের বিপক্ষে পরাজিত হওয়ার পর করচনোইকে এক সাক্ষাৎকারে কয়েকটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন করা হয়। এই সাক্ষাৎকারের আলোকে কারপভ এবং করচনোই উভয়েরই দাবাদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে নীচের প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়ে।

প্রশ্ন : কারপভের বিরুদ্ধে খেলার ফলাফল সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : কারপভ বলেছেন তিনি নাকি তেমন গা দিয়ে খেলেননি। খেললে ফলাফল অন্যরকম হত। অর্থাৎ একটু মনঃসংযোগ ও গুরুত্ব আরোপ করলে তিনি নাকি আরও অধিক পয়েন্টের ব্যবধানে জিততে পারতেন। কিন্তু খেলার নিষ্পত্তির পর ফলাফল যা হয়েছে তাই চূড়ান্ত। কি হত বা, কি হতে পারত এ নিয়ে মন্তব্য করা এখন অপ্রয়োজনীয় নয় কি? আমার বিরুদ্ধে

৩—২ ম্যাচে জয়লাভ করেছেন। খেলার গুণাগুণ ও গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী ফলাফল যথার্থ হয়েছে। হেরে গেলেও তুলনামূলকভাবে আমি যে কারপভের চেয়ে ভাল খেলেছি তা উপস্থিত দাবা অনুরাগীরা অবশ্যই স্বীকার করবেন। শক্তিশালী চতুর কারপভের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে যাইনি। খেলায় জয় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা গড়ে তোলাই প্রত্যেক খেলার মূল কথা। এই অর্থে প্রতিযোগিতা সফল।

প্রশ্ন : প্রতিপক্ষ হিসেবে কারপভ সম্পর্কে আপনি কেমন ধারণা পোষণ করেন?

উত্তর : আমার মতে কারপভ একজন পাকা চতুর দাবাড়ু। তবুও তার ক্রীড়াশৈলীতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আমার চোখে ধরা দিয়েছে। কোন কোন অসতর্ক মুহূর্তে নিজের দুর্বলতা ও ভুল অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশ করে ফেলেছেন। যা তার মত ব্যক্তিত্বের কাছে অনভিপ্রেত। অপর পক্ষে স্বকীয় পরিকল্পনা ও চিন্তাকে নিখুঁত করে গতিশীল করে তুলতে কারপভ ছাড়া আমি আর কাউকে দেখিনি। তার ইচ্ছাশক্তি অসাধারণ। প্রতিপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অপরিসীম। সত্যি বলতে কি কারপভ দাবার জগতে এক বিরল ব্যক্তি।

প্রথম পর্বের প্রত্যেকটি ম্যাচে কারপভ আমার বিরুদ্ধে সহজেই জয়লাভ করেন। দ্বিতীয় পর্বে পর পর কয়েকটি ম্যাচ অমীমাংসিত হওয়ায় খেলা আকর্ষণীয় স্তরে পৌঁছায়। সেই সময় কারপভের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতি লক্ষ্য করেছি। যখন দুজনে দুজনকে বাঘবন্দী করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি সেই সময় আকস্মিক সুক্ষ্ম দাবার চালে কারপভ বাজীমাৎ করে দেন। তবে দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই চালিয়ে যাবার অসীম ধৈর্যের অভাব আমি কারপভের মধ্যে লক্ষ্য করেছি।

আমাদের এই ম্যাচকে তুলনামূলকভাবে ফিশার বনাম স্পাসকির মধ্যে অনুষ্ঠিত সেই ঐতিহাসিক খেলার সঙ্গে তুলনা টানা চলে। সেখানে খেলার মীমাংসা হয়েছিল দীর্ঘ অমীমাংসার পর। আমার কারপভের মধ্যে খেলাটির সিদ্ধান্ত হয়েছে আরও দীর্ঘ অমীমাংসার পর। ফলে আমাদের দুজনকেই দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে আরও অনেক অধিক মনঃসংযোগ করতে হয়েছে।

প্রশ্ন : কারপভের বিশেষ গুণ কি?

উত্তর : চরম ইচ্ছাশক্তি যে মানুষকে চরম সার্থকতা ও সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দিতে পারে কারপভ তার এক জ্বলন্ত নিদর্শন। একাগ্র একনিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি কার্পভের বিজয়ের মূল চাবিকাঠি বলে আমার মনে হয়।

প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান বব ফিশার ও কারপভের মধ্যে চূড়ান্ত খেলাকে ঘিরে টালবাহানা চলছিল অনেকদিন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিশারের কোন জবাব না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থা আনাচোলি কারপভকে বিশ্ব বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছেন। তেইশ বছরের রুশ নন্দন কারপভ কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান। কারপভের এই সম্মান ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

প্রশান্ত দাঁ

ভিকটর করচনোই

খেলার জগতে মেয়ে

ব্যাডমিণ্টনে আবিরা ভট্টাচার্য

কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও এক-একজন ক্রীড়াপ্রেমিক ব্যক্তি আছেন, যাঁদের সস্নেহ উৎসাহের কোমল উত্তাপের স্পর্শ পেয়ে অনেক ছেলেমেয়ে খেলাধুলায় পটুত্ব অর্জন করে। নারকেলডাঙ্গায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন পাড়া অঞ্চলে তেমনি এক সহৃদয় ব্যক্তি হলেন অনিলচন্দ্র মিত্র বা জনপ্রিয় 'মামাবাবু'। এঁরই উৎসাহে ওই অঞ্চলের অনেক ছেলেমেয়ে ব্যাডমিন্টন খেলার সুযোগ পেয়েছে—এবং রাজ্য ব্যাডমিন্টনে সবার নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। এই পাড়ার মেয়ে আবিরা ভট্টাচার্যও 'মামাবাবুর' সস্নেহ উৎসাহ লাভ করে ব্যাডমিন্টন চর্চা সুরু করে। তারপর স্যার গুরুদাস ইনস্টিটিউটে খেলার সুযোগ পাওয়ার সূত্রে বিদ্যানাথ দাস ও কাজল সাহার মত বাংলার কুশলী ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের সংস্পর্শে এসে এই খেলা অনুশীলন করতে থাকে। ওদের সহায়তায় আবিরা গর্ডেনরীচে রেলওয়ের কোর্টে অনুশীলন করার সুযোগ পায়। তবে গত দু বছর যাবৎ ও চৌরঙ্গীর ওয়াই এম সি এ-তে অনুশীলন করছে এখানে ওকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বাংলার কুশলী খেলোয়াড় সুকুমার দেব। আবিরা কাঁকুড়গাছি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রী। আগামী বছর ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে।

আবিরা ভট্টাচার্য

আবিরার সঙ্গে কথা হচ্ছিল ওদের বাড়ীতে বসে, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন লেনে। নারকেলডাঙ্গা রেলসেতুর পাশে পুকুর ও গাছে ঘেরা জায়গাটিতে বেশ গ্রাম-গ্রাম ভাব আছে।

আবিরা বলে আমরা এখানকার প্রাচীন বনেদী ঘর। আমাদের পরিবারের মেয়েদের পক্ষে বাইরে গিয়ে খেলাধুলায় যোগ দেবার কথা আগে কেউ চিন্তাই করতে পারতেন না। কিন্তু আমার মা, বাবার ওসব কঠোরতা নেই। বাবা আমার দিদিদের মানে বড়দি ও মেজদির ব্যাডমিন্টন খেলায় আপত্তি করেননি। আমার বেলাতেও তাই।

আবিরারা তিন বোন, এক ভাই—ভাইও ওয়াই এম সি এ-তে ব্যাডমিন্টন খেলে। আবিরা বলে, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও সম্পাদক আমার খেলার খুব সমর্থন করেন। বাবা শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একটি রবার কোম্পানীতে চাকরী করেন।

—আমাদের ক্রীড়ামান উন্নত নয় বলে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ার আসরে বাংলার ছাত্রীদল পাঠানো হল না। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি এদিকে আরও সচেতন না হন তাহলে আমাদের ক্রীড়ামানের উন্নতি হবে কি করে? দেখুন স্কুল সেরে এখান থেকে যাই ওয়াই এম সি এ-তে অনুশীলন করতে। ওখানে সদস্য সংখ্যা অনেক, কোর্ট মোটে একটি। রোজ যেতে পারি না সপ্তাহে মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবার যাই। বাসে প্রচণ্ড ভীড়ে পিষ্ট হয়ে যখন চৌরঙ্গী পৌঁছোই তখন আর অনুশীলনের সামর্থ্য থাকে না। তবু কোন রকম ব্যবস্থা হয়।

—তুমি অন্য কোন খেলা কর না?

হ্যাঁ করি। স্কুলে একশ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছি। ব্যাডমিন্টন খেলার জন্যও দৌড়, স্কিপিং ও পি টি করতে হয় নিয়মিত। সুকুমারদা আমাকে অনেক পি টির ফিগার শিখিয়ে দিয়েছেন।

—খেলার জন্য তোমার পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছে না?

—না না। তাছাড়া আমি খুব একটা ভাল রেজাল্টের আশা করি না সাধারণভাবে পাশ করতে চাই। তাই খেলা অনুশীলনের সঙ্গে পড়া তৈরীর কাজে তেমন ব্যাঘাত ঘটে না। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বালিকা বিভাগে খেলবার পর আমি মহিলা বিভাগে খেলা চালিয়ে যেতে চাই, আর খেলার উন্নতি করতেও চাই। বাড়ীর সমর্থন আর সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাই।

—ব্যাডমিন্টন খেলার প্রতি তোমার আগ্রহ এত বাড়লো কেন?

—মামাবাবু নানা টুর্নামেন্টে আমার নাম পাঠিয়ে দিতেন। ঐসব টুর্নামেন্টে প্রতিযোগীদের খেলা দেখে দেখে আমারও ভাল খেলোয়াড় হবার আগ্রহ বেড়ে গেছে। জানেন, আমি এখন পূর্ব কলকাতা ব্যাডমিন্টনে মেয়েদের সিনিয়র ও জুনিয়র দু-বিভাগেই চ্যাম্পিয়ান।

আবিরার ক্রিকেট, ফুটবল ও ভলিবল খেলার খুব ইচ্ছা আছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী আবিরা পড়ার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলা চালিয়ে যেতে চায়। তবে অনুশীলন ব্যবস্থার আরও উন্নতি করা খুব শক্ত বলে ও মনে করে না। ক্ষুদিরাম স্টেডিয়ামে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের অনুশীলনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারই করতে পারেন।

সর্বভারতীয় আসরে অন্যান্য রাজ্যের মেয়েদের খেলা কি রকম দেখলে? ওদের ক্রীড়ামান উঁচু বলে মনে হল?

—হ্যাঁ। মরিন ম্যাথিয়াস বা ঐ পর্যায়ের মেয়েদের খেলায় স্মেসিংই প্রধান অস্ত্র। তাছাড়া কোর্টে ওঁদের গতিবিধিও বেশ সাবলীল মনে হয়। ওঁদের শরীর খুব 'ফিট'। আমাদের মত নার্ভাস বা লাজুক নন। মনে হয় ওঁরা খুব বেশী অনুশীলন ও পি টি করেন। কারণ, তাহলেই এ খেলায় উন্নতি করা যায়।

—তোমার খেলবার সময় কি রকম মনে হয়?

—প্রথম দিকে বেশ ভয় ভয় করে। প্রায় নার্ভাস হয়ে পড়ি। মনে হয়, হেরে গেলে সবাইয়ের কাছে লজ্জা পেতে হবে। তবে, হ্যাঁ সুকুমারদা হেরে গেলেও আমাকে উৎসাহ দেন—হতাশ না হতে উপদেশ দেন। আগামী সেপ্টেম্বরে হয়ত ক্ষুদিরাম স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের আসর বসান হবে। তখন বিশ্বের অন্তত কয়েকজন নামী খেলোয়াড়ের খেলা দেখতে পাব, আশা করি।

এখানকার কুশলী বা অভিজ্ঞ মেয়েদের কাছ থেকে পরামর্শ নাও না?

—হ্যাঁ। বিশেষ করে বলি তুলসীদি (তুলসী ব্যানার্জী) আমাকে খেলার নানা রকম মার দেখিয়েছেন। খুব সাহায্য করেছেন। তুলসীদি এখন বিহারের হয়ে খেলেন।

আবিরার খেলায় স্মেসিংয়ের চেয়ে স্ম্যাশ ও জোর মারের প্রাধান্য রয়েছে। তাই সেদিন রাজ্য ব্যাডমিন্টনের ১৮ বছরের অনূর্ধ বালিকাদের ফাইনালে প্রতিপক্ষ সর্বাণীকে স্বল্পায়াসে হারিয়ে দেয়।

আবিরা রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আসরে প্রথম নামে ১৯৭১ সালে। সেবার বালিকা-বিভাগে ও সিঙ্গলসে সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল। আবিরা যে মেয়েটির কাছে সেবার হারলো, সেই মিঠু মুখার্জীই বিজয়িনী হয়। তবে পরের বছরই আবিরা ঐ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা জয় করে। '৭২-এ ফাইনালে সুপ্রিয়া দেবরায়কে আবিরা হারিয়ে দিয়েছিল। ৭৩-৭৪ মরশুমে আবিরা কিন্তু তার বিজয়িনী আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি, নীলা পালের কাছে ফাইনালে হেরে যায়। এ বছর ১৮ বছর অনূর্ধ বিভাগে আবিরা বিহারের জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান সর্বাণী চৌধুরীকে সহজে হারিয়ে বিজয়িনীর আখ্যা পুনরুদ্ধার করেছে।

আবিরার বড় আফশোষ, ৭৩-এ স্কুল-ক্রীড়ায় বাংলার ছাত্রী-ব্যাডমিন্টন দলের অধিনায়িকা হলেও কি একটা গন্ডগোলের জন্য সেবার কটকে দল পাঠান হল না। ৭৪-এ জয়পুরে স্কুলক্রীড়ার আসরে আবার ব্যাডমিন্টন দলের নেত্রী হয়। কিন্তু সেবার প্রথম খেলাতেই উত্তরপ্রদেশের ছাত্রীদের কাছে বাংলার হার হয়। এ বছরও আবিরা স্কুল-ক্রীড়ায় ব্যাডমিন্টন দলে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু দলের ক্রীড়ামান খুব নিচু এই অজুহাতে বাংলার ছাত্রী ব্যাডমিন্টন দলকে ইম্ফলে যেতে দেওয়া হয়নি।

অমর

সিনেমাটিক

এখন গরম পড়তে আরম্ভ করেছে ফলে চারিদিকে ভজকট ব্যাপারও শুরু হয়েছে। গরমে ঘেমে-নেয়ে আপনি যদি-বা টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর গেট পার হতে পারলেন ফ্লোরে ঢোকার আর উপায় নেই। কারণ গরম। এবং উত্তমকুমার। উত্তমকুমার সাফ বলে দিয়েছেন বাইরের গেস্ট থাকলে তাঁর পক্ষে শুটিং করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে এ-ছবিতে। অনাদি বাড়ুয্যে আমায় বলল। ভাই এই এক হয়েছে ভ্যালো ডিউটি। সকাল থেকে লোকের পর লোক আসছে আর শুটিং দেখতে চাইছে! কেন শুটিং দেখে কি হবে? ছবি রিলিজ হলে ট্যাক্সের নগদ পয়সা খরচা করে যত খুশী দেখুন আমরা বরং খুশীই হবো কিন্তু এখন নাথিং ডুয়িং ফ্লোরে বাইরের লোক যেতে দেওয়ায় নিষেধ আছে।

একদল মেয়ে সেজেগুজে এসেছিল এখন বসন্তকাল তাই সাজের কি ঘটা অনাদি বাড়ুজ্যের ডায়লগ শুনে তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারপর কত কাকুতি-মিনতি কিন্তু অনাদি যেন পাষাণ, না না অসম্ভব ফ্লোরের মধ্যে এখন কাজের ঠালায় সব্বাই চোখে অন্ধকার দেখছে এখন আপনারা ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে আমার চাকরী সংগে সংগে নট হয়ে যাবে। এখন বাড়ি যান। অন্য দিন আসবেন অন্য কোনও সেটে দেখিয়ে দেব শুটিং!

ইদানিং অনাদি বাড়ুজ্যে এইসব নিয়ে বড়ই তিতবিরক্ত হয়ে আছে। আড্ডা আজকাল আর তেমন হচ্ছে না। হাজারটা কাজের ঝঞ্ঝাট অনাদির এখন আড্ডায় বসবার তেমন সুযোগই নেই। নিজে মোমবাতি নামে একটা ছবি প্রোডিউস করছে প্রোডাকশন ম্যানেজারী করছে কমসে-কম তিনখানা ছবিতে তারপর এর ওর পেছনে কাঠি করছে আর টুপি পরাতে তো মাষ্টার লোক। সর্বক্ষণ এর টুপি ওর মাথায় চাপিয়ে গ্যাট হয়ে বসে আছে।

স্মরণ থাকতে পারে এই অনাদি একদা নর্থ ক্যালকাটার মাস্তান ছিল। তখন লোকে মস্তানদের রংবাজ বলে ডাকত। আর কি কুক্ষণে অনাদি যে সেই রংবাজ দলে ভিড়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রকান্ড ধোলাই খেয়ে একদিন নর্থ ছেড়ে সাউথে দে-চম্পট। তারপর থেকে রংবাজির রোগটা ওর বেমালুম সেরে গেছে এখন শুধু ফিচলেমো নিয়ে আছে। বাংলা ছবিতে মাঝে-মধ্যে ওকে পার্ট করতে দেখা যায় হাসির পার্টে বাস্তবিক ও বেশ জমিয়ে রাখে। আচ্ছা অনাদির আর এক বন্ধু ছিল নর্থে আমাদের সরকারী মামা প্রভাত দাস এখন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর ম্যানেজার মানুষ হিসেবে জবাব নেই। এই অনাদি আর প্রভাতকে চেনে না হেন মানুষ আজ আর ফিল্ম লাইনে নেই। দুজনেই খুব উঁচু দরের প্রোডাকশন ম্যানেজার। কানন দেবীর প্রোডাকশন বলুন বা নরেশ মিত্তিরের ওরা দুজন ঠিক লেগে পড়ে ছিল, লোকে বিস্তর খাতিরও করত ওদের। পরিচালক এবং কলাকুশলীরাও ওদের যথেষ্ট ভালবাসত এখনও বাসে মতামতের মূল্য দেয় তা এর ভেতর আবার অনাদির খচড়ামো বুদ্ধিটা এটু প্রবল ছিল।

টালীগঞ্জে এসে অনাদি সেবার ফিল্ম লাইনে সবে পাকাপোক্ত হয়েছে। বাড়ির লোকেরা সেই সুযোগ বুঝে দড়াম করে ওর বিয়েটা দিয়ে দিল। অনাদির অবশ্য একেবারে ইচ্ছে ছিল না। কোথায় নতুন পাড়ায় এসে এটু ইয়ে-টিয়ে করবে তা-না অভিভাবকেরা পত্রপাঠ ছাদনাতলায় বসিয়ে দিল! কোন মানে হয়?

তারপর দেখুন কি কান্ড!

অনাদি তো পয়লা নম্বর আড্ডাবাজ। সে সব সেরে বাড়ি ফিরতে তার রোজ রাত এগার বারোটা বেজে যায়। নতুন বৌ নাকি এটু ঘুম কাতুরে ভাত আগলে বসে বসে হাই তুলে তার সময় কাটতে চায় না। একদিন না পেরে রাগ করে ঘুমিয়ে পড়েছে রাত তখন যথেষ্ট হয়েছে অনাদি ঘুট ঘুট করে এসে হাজির। টালীগঞ্জ ওর বাসায় তখনও ইলেকট্রিক বসে নি হ্যারিকেন জ্বালাতে হয়। অনাদি এসে দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে হদ্দ। খুলবে কে বৌ যে ওদিকে ঘুমিয়ে কাদা!

অনাদি তখন দমাদম দরজা পিটতে আরম্ভ করল। পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গে আর কি। যাই হোক এক সময় বৌয়ের ঘুম ভাঙ্গল। বেচারি মহা অপ্রস্তুত তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল।

অনাদি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে লন্ঠন উসকে কাকে যেন গম্ভীর মুখে খুঁজতে আরম্ভ করল। বৌ তো অবাক ওর কান্ড দেখে।

অনাদি একবার খাটের তলা দেখে আলমারি খুলে দেখে আলমারির পেছনটা দেখে রান্নাঘর দেখে বাথরুম দেখে এটা দেখে—সেটা দেখে। বৌয়ের তো ভয় ধরে গেল—এত দেখছে কি মানুষটা? জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না। তারপর তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেতে এক সময় বিস্ময় সূচক একটা শব্দ করে অনাদি যেন স্বগতোক্তি করল—তাহলে মালটা গেল কোথায়?

—কোন মালটা? বৌ বেচারি বিস্ময়ে একখানা হয়ে প্রশ্ন করল—কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছিনে আমি—

অনাদি পোশাক পরিবর্তন করতে করতে বলল—হাতে-নাতে যখন ধরতে পারলাম না তখন আর বলি কি করে।...আচ্ছা লোকটাকে কোন রাস্তা দিয়ে বের করে দিলে বলত? আমি তো তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি—

এর পর আর না বোঝার কি থাকে! বৌ রেগে এক নিমেষে সাক্ষাৎ যেন টাটার ফার্নেস। রেগে চোখ-মুখ লাল করে বলল—ছি ছি, একথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা করল না? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে দরজা খুলতে দু' মিনিট না-হয় দেরী হয়েছে তা বলে তুমি—

বলা আর শেষ হয় না বেচারি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আর কি। অনাদি তখন মিটি-মিটি হাসছে—আহা চটে যাচ্ছ কেন শোন আমার কথাটা শোন—

—ছোটলোক ইতর তোমার সঙ্গে আর কোন কথা নয় আমি এক্ষুণি বাপের বাড়ি চলে যাব—

যেতে অবশ্য তাকে শেষ পর্যন্ত হয় নি, অনাদি যেতে দিলে তবে তো, তবে এই ঘটনার পর অনাদিকে দরজায় একবারের বেশী দুবার আর কড়া নাড়তে হয় নি।

*

এমন রসিক প্রাণোচ্ছল মানুষ আমি কদাচিৎ দেখেছি। অনাদি প্রভাত দাস এরা ফিল্ম লাইনের সত্যিকারের অ্যাসেট এদের কীর্ত্তি কাহিনী সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার মত। বিশ্বাস না হয় ফিল্মের যে কাউকে প্রশ্ন করুন সঠিক জবাবই পাবেন।

ওরা প্রোডাকশন ম্যানেজারী করে একের পর এক ছবিতে সেসব ছবি কাড়ি কাড়ি টাকা রোজগার করছে দেখে এক সময় ওদেরও বেশ লোভ ধরে গেল। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করল মাইরি আমরা খেটে খেটে চিচিং ফাঁক হয়ে যাচ্ছি আর দারোগায় ডিম খেয়ে যায়? নাঃ এবার নিজেদের গুছিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে জম্পেশ করে ছবি তৈরী

করে বড়লোক হতে হবে। বল ভাই? অনাদি চুঁ-কুঁচকে বলল কিন্তু আমাদের পয়সা কোথায়? কাজ শুরু করতে হলে তো কমপক্ষে দশ-বিশ হাজার ক্যাশ দরকার—

প্রভাতের বক্তব্য—ওর জন্যে চিন্তা করতে হবে না। লাগে টাকা যোগাবে গৌরী সেন। এখন মাথা ঠাণ্ডা করে বল যে নামবে কি না।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত অনাদি বলল—ঠিক আছে চল মায়ের নাম করে ঝাঁপিয়ে পড়ি—

বলে মশাই বিশ্বাস করবেন না ওই ভর দুপুর বেলায় ওখানে হাঁটু গেড়ে বসে ওরা মাতৃস্তব করল। একজন পাশে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে ওদের এই কান্ড-কারখানা দেখছিল। সে স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল—কি ব্যাপারটা বলত ভাই? কিছু ঠাহর করতে পারছি নে—

অনাদি গম্ভীর মুখে ঘোষণা করল—আমরা ছবি প্রোডিউস করব বলে ঠিক করে ফেললাম।

ব্যস, আর যায় কোথা এই ভয়ঙ্কর বার্তা রটে যেতে ফিল্ম লাইনে সামাল সামাল রব উঠে গেল। এই দুই দুঁদে প্রোডাকশন ম্যানেজার যদি ছবি আরম্ভ করে তো কেউ একটি পয়সা পাবে না। বিলকুল টুপি পরিয়ে কাজ সারবে ওরা। ধ্য তিকড়মবাজ লোক অনাদি আর প্রভাত নয়কে হয় করতে ওস্তাদ।

ওদিকে ছবি করছে বলে নিজেরাই আহ্লাদে আটখানা। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ওর গল্প চিত্রনাট্য তৈরী হয়ে গেল ঠিকঠাক হয়ে গেল পরিচালক কলাকুশলী আর শিল্পিবৃন্দ। সিদ্ধান্ত হলো গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে ওরা ওদের এই ছবির শুভ মহরৎ করবে। ভাল কথা।

নির্ধারিত দিনে রেকর্ডিং শুরু হল ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে। সন্ধ্যা মুখার্জি গান গাইছেন। তারই রিহার্সাল চলছে। তবলা বাজাচ্ছিল বিখ্যাত রাধাকান্ত নন্দী। এক ফাঁকে আমায় দেখে চোখের ইসারায় ডেকে খাটো গলায় বলল—হ্যাঁরে, ছবিটা শুনছি অনাদি আর প্রভাতের তা শেষ পর্যন্ত মাল পাওয়া যাবে তো?

আমি হেসে জবাব দিলাম—না না পয়সা মারবার লোক নয় ওরা তোমার ধুরন্ধর মশ্কুরী ঠিকই দিয়ে দেবে—

শুনে হাত ঘুরিয়ে রাধা নন্দী নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল—কি জানি রে ভাই ওদের ভাব-গতিক যা দেখছি শেষ পর্যন্ত ট্যাকসি ভাড়াটা দেয় কিনা সন্দেহ হচ্ছে—

বলে তবলায় মনোনিবেশ করল রাধা নন্দী।

তেড়ে গান রেকর্ডিং হচ্ছে কিন্তু বুঝতে পারছি মিউজিশিয়ানদের মনে ভয় ঢুকে গেছে যে পয়সা হয়ত পাওয়া যাবে না। চাইছে [illegible] হয়ত বলবে—বারে সাল্ [illegible] কোন-না-কোন প্রোডাক- [illegible] বাজিয়ে বেশ টু-পাইস রোজগার করছ আমরা প্রোডিউসারদের বলে তোমাদের বরং বেশ কিছু উপরি টাকা রোজগার করিয়ে দিচ্ছি আর এটা হচ্ছে আমাদের ছবি কন্টসন্ট করে কোন গতিকে দাঁড় করাচ্ছি এখানে ভাই আমরা দিতে পারব না—

ঝোঁকটা অনাদির-ই সেই দিকে বেশী অর্থাৎ মাগনায় বাজিয়ে নেওয়া। এখন হয়েছে কি কালিবাবু একজন নিরীহ মানুষ ভদ্রলোক ডবল বেস বাজিয়ে সংসার চালান কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। ভদ্রলোক সেদিন ওদের রেকর্ডিং-এ তাঁর সেই ঢাউস যন্ত্রটি এনে আপন মনে বাজনা বাজাচ্ছিলেন। সুরের রিদম্-এর জন্যে ডবল-বেস অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র। যন্ত্রটিকে দেখতে অনেকটা বেহালার মত। তবে সাইজে এত পেল্লায় যে একটা গোটা ট্যাকসি লাগে ওটিকে কোথাও নিয়ে যেতে। তাও ধরে না। ট্যাকসির জানলা দিয়ে মাল খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। যন্ত্রটি ফ্লোরের ওপর দাঁড় করিয়ে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে তবে বাজাতে হয়। ভং-ভং-ভং গম্ভীর আওয়াজে তখন ওটা বাজতে থাকে।

কালিবাবু স্বরলিপির দিকে চোখ রেখে একাগ্র চিত্তে তাঁর যন্ত্র ছেড়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ খেয়াল হল তাঁর দু' পাশে দুই মাল দাঁড়িয়ে—অনাদি আর প্রভাত। ওরা যন্ত্রটি গভীর মনোনিবেশ সহকারে দেখছে।

কালিবাবু তো অবাক—একি ওরা এভাবে যন্ত্রটা দেখছে কেন? তার-ফার খুলে গেল নাকি? কই না তো! তাহলে?

অনাদি দেখছিল যন্তরের কাঠের তৈরী খোলটা। সম্ভবত মেহগনী কাঠ। বেশ পালিশ করা।

কালিবাবু বিস্ফারিত চোখে দেখলেন অনাদি তাঁর যন্তরের কাঠে টোকা দিচ্ছে আর অভিজ্ঞ টিম্বার মার্চেন্টের মত ঘাড় নাড়ছে। বারকতক এ-রকম করার পর অনাদি গম্ভীর গলায় প্রভাতকে উদ্দেশ্য করে বলল—ফাসক্লাস কাঠ ভাল জানলা হয় এই কাঠে—

শুনে কালিবাবুর আক্কেল গুড়ুম। রিদম ছাড়া তাঁর তখন প্রায় মাথায় উঠে গেছে—জানলার কাঠ-ফাঠ কি বলছে ওরা এ্যাঁ? কোথায় গান রেকর্ডিং আর কোথায় জানলা?

কালিবাবু আর স্থির থাকতে না পেরে যন্তর রেখে ছুটলেন টোপাদার (অমর দত্ত) কাছে—অ্যাঁ টোপাবাবু শুনেছেন ইয়েদের কথা? বলে কিনা আমার যন্তরের কাঠ ফাটিয়ে ওরা কি-সব দরজা-জানলা করবে! না না এ-আমার মোটেও ভাল ঠেকছে না আপনি মোশাই এক্ষুণি এর এট্টা পিতিকার করুন। তা না হলে আমি রিদম ছাড়তে পারব না—

টোপাদা বাজাচ্ছিল খঞ্জনী কালিবাবুর কথা শুনে বাজনা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল—বুঝেছি ওরা ক্যাশ দেবে না ও রাধু এক্ষুণি কষে বেতালা বাজা আগে ফয়শালা হোক তবে রেকর্ডিং। কি অন্যায় কথা ওরা নাকি বলছে আমাদের কালিবাবুর যন্তর ভেঙে জানলার কাঠ তৈরী করবে। এ-সব কি ধরনের মাস্তানী?

অমনি চোখে চোখে ইসারা। বাজনা হঠাৎ বেতালা আরম্ভ হয়ে গেল। মিউজিক ডিরেকটার লাফিয়ে উঠে বললেন—স্টপ স্টপ বেতালা বাজছে কেন?

রাধা বলল—আগে পেমেন্টের ব্যাপারটা জানলার কাঠের ব্যাপারটার এট্টা নিষ্পত্তি হোক তবে তালের বাদ্যি...

হৈ হৈ কান্ড।

সব শুনে অনাদি গম্ভীর মুখে বলল—পেমেন্ট রেডি আর কাঠ? সে তো শুধু মুখে বলেছি নিয়ে তো আর নিইনি তালে এ-সব কলরব কেন?

বটেই তো খুব ন্যায্য কথা। টোপাদা সরেজমিন তদন্ত করে এসে রিপোর্ট দিল—না হে ক্যাশ ওদের রেডি নামে নামে ভাউচার লিখে ক্যাশ গেঁথে রেখেছে। অতএব সবাই দম দিয়ে বাজাও ভাই বেশ সুর দিয়ে দিয়ে.....

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কর্বন ও
ইংরেজী ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণ স্টেশনারী স্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-২২৬৭
গ্রাম : অভাবীপন, পোর্ট বক্স-৩৬ হাওড়া
পরিবেশক : কমলিন প্রতিষ্ঠান
(স্টেশনারী বিভাগ)

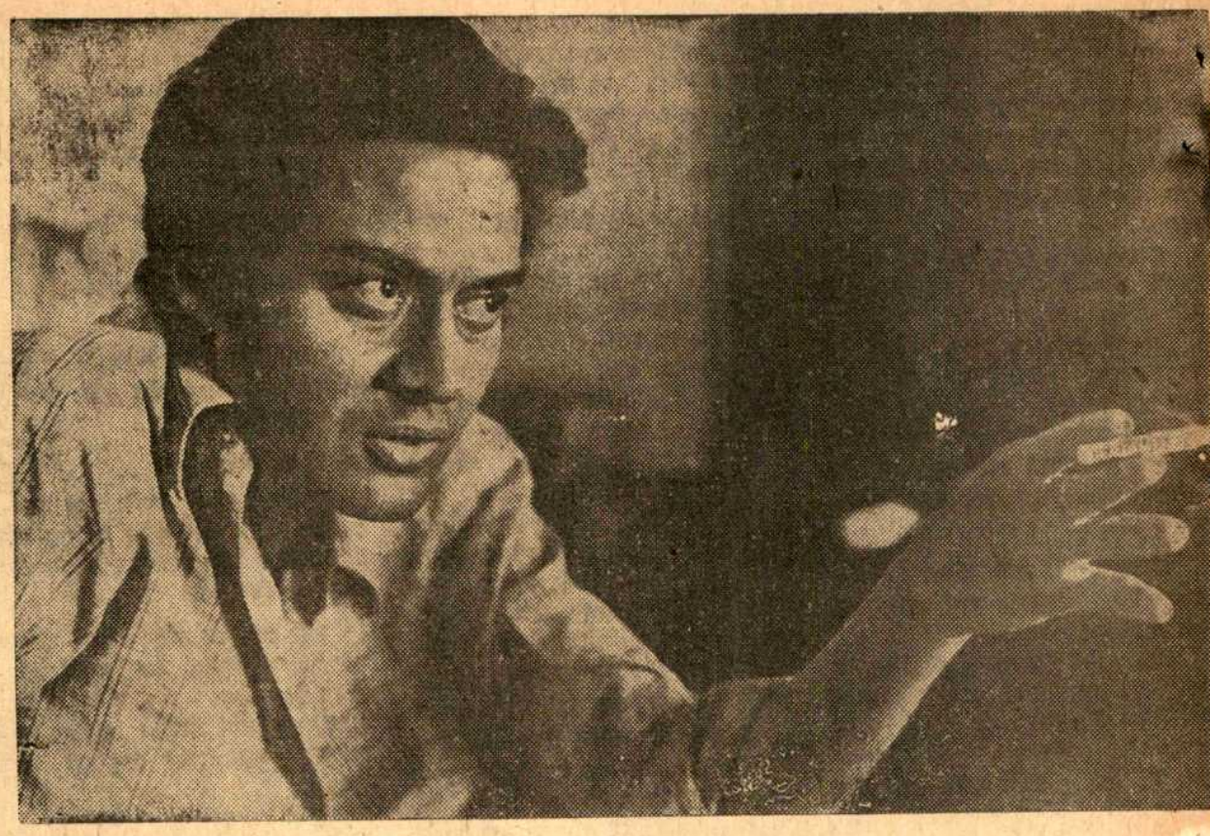

কিছুক্ষণ

শুভেন্দু চ্যাটার্জি

এই নিয়ে বোধহয় তিনবার বাড়ী চড়াও হলাম শুভেন্দু চ্যাটার্জির। আগের দুবারই ওঁকে যথারীতি বাড়ীতে পেয়েছি, কিন্তু থিতু হয়ে বসে যে দু-মিনিট কথা কইব তা পারিনি। বাড়ীর অসুখ-বিসুখ নিয়ে খুবই ব্যস্ততায় কেটেছে তাঁর মার্চ মাসের অর্ধেকটা। বেচারীকে ছোটাছুটি কম করতে হয়নি। আমি নিজেও গেছি দু-একবার ওঁর সঙ্গে কয়েক জায়গায়।

দু-দুবার ফেলিওর হবার পর ভাবলুম ওঁর গাড়ীতে করে তো প্রায় এসপ্লানেড পর্যন্তই যাব। ওই ফাঁকে যতটুকু দেখা যায় বাজিয়ে ভদ্রলোককে, দেখি না। মন্দ কি!

ছোট্ট স্ট্যান্ডার্ডখানার স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বাড়ী থেকে বেরিয়েই শুভেন্দুবাবু বললেন—'ইঞ্জিনের খাবার ফুরিয়েছে।' লেক পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়ীর খাবার নিয়ে ল্যান্সডাউন দিয়ে সোজা আসছে গাড়ী। শুভেন্দুবাবু বেশ সোজা হয়ে বসে, হাতে গাড়ীর হালখানা, মানে স্টিয়ারিং। চোখ সামনে থাকলেও কথা চলছে আমার সঙ্গেই। 'কোরাসে'র সাংবাদিকের মত দৃষ্টিখানা রাস্তার চারদিকে খুব সজাগ। সব দেখছেন, শুনছেন আর উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। কখনও সহাস্যে পাশে ফিরে কখনও বেশ সিরিয়স-ভাবে।

এরই ফাঁকে 'দুত্তোর সব.....অন্ধের মত পথ চলে নাকি!' কথাগুলো কানে আসতে না আসতেই একরদ্দা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীখানা ক্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-চ করে গেল থেমে। দেখি একজন মাঝারি বয়সের লোক বেল-তলা বাজার থেকে বেরিয়ে হেলতে-দুলতে রাস্তা পার হচ্ছেন। 'কলকাতার রাস্তায় গাড়ী চালানোও এক ঝামেলা' বলে আবার গিয়ারে চাপ দিলেন মৃদু। গাড়ী ছুটল।

অভিনেতা শুভেন্দু অবশ্য এখন আর তেমন ছুটতে পারছেন না। একটু থেমে পড়েছেন যেন। ছুটতে পারলে হয়তো অনেক 'পথচারী'ই চাপা পড়ত তাঁর কাজের তলায়। 'আকাশকুসুম' দেখে চিত্রসমালোচক এন-কে-জি লিখেছিলেন—'নিজের ব্যক্তিত্ব ছাপিয়ে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন এই নবাগত শিল্পী।' কথাটা আজ সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুভেন্দুবাবুও বললেন—'কথাটা তখন ঠিক বুঝিনি, এখন বুঝতে পারছি।'

ইনট্রোভার্ট অ্যাকটিং প্রথম দিকের দু-চারটে ছবিতে করার ফলে ছবি-কারিয়েরা শুভেন্দু সম্পর্কে একই ধাঁচের চিন্তা করতেন। একসট্রোভার্ট অ্যাকটিংয়েও যে কম একসপার্ট নয়, সেটা দেখাবার সুযোগই তিনি পাননি। যদিওবা দু-একটা ছবি করে-ছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত সে-ছবিগুলো ক্লিক করেনি।

গাড়ী রেসকোর্সের পাশ দিয়ে চলছে তখন। শূন্য মাঠ। আলো জ্বলছে কিছু কিছু। একটু আগে—'নিজের এই পিছিয়ে থাকার দরুন আপনার ত্রুটি কোথায় ভেবেছেন কখনো?'—এই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছি তাঁর দিকে।

গাড়ীর গতির সঙ্গে তাল রেখে হয়তো বা ফেলে-আসা পথটার কথা ভাবছেন, ভাবছেন অনেকক্ষণ। খিদিরপুর রোডে

সস্ত্রীক

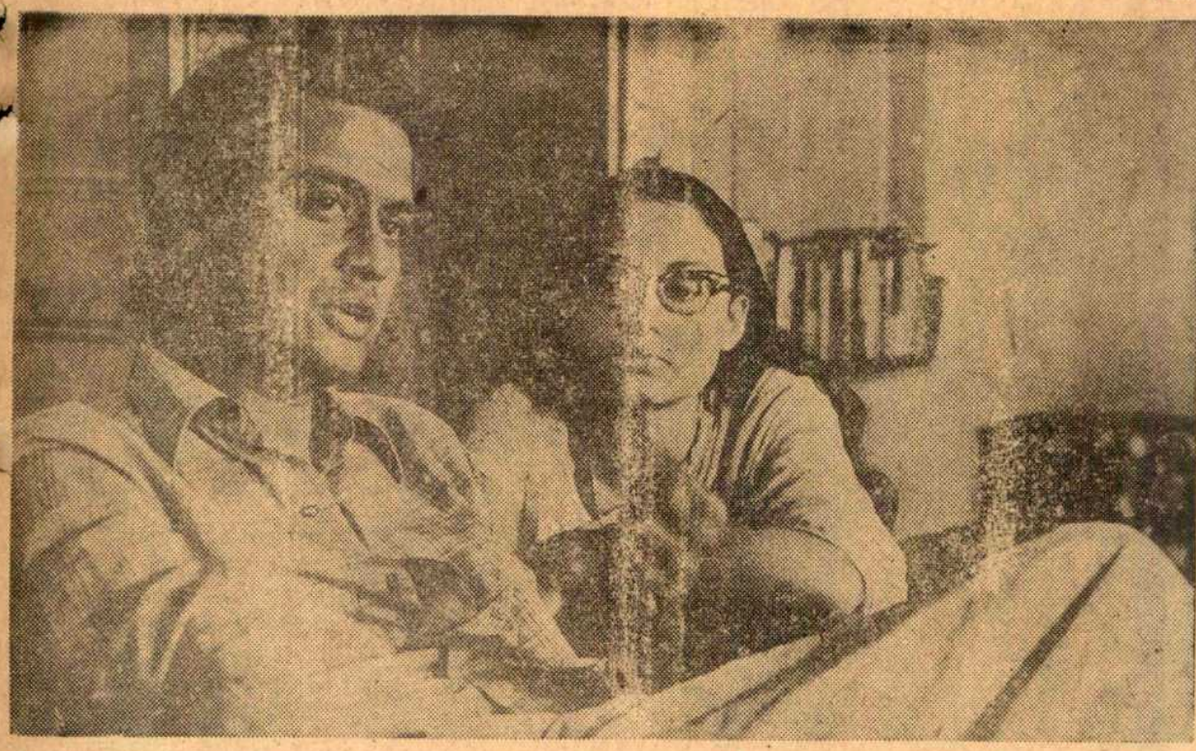

গাড়ীটাকে ফেলে একটু স্পিড কমালেন, আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'চরিত্র সিলেকশন ঠিকমত করতে পারিনি তাই এই অবস্থা। লোভ সামলাতে পারিনি। আজে-বাজে চরিত্র নেওয়া হয়ে গিয়েছিল।' এরকম ফ্রাঙ্ক কনফেশন খুব কম শুনেছি আমি। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের চাউনি-গল্প নয়, একবারে চুলচেরা সত্যি কথা! ক'জন শিল্পী বলতে পারবেন?

শুভেন্দু চ্যাটার্জীর চরিত্রই এই রকম। কোনো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। যা করেন, সবার সামনে করেন, যা বলেন জোর গলায় বলেন, পরিষ্কার ভাবে বলেন, 'আঁ ও না ও-ও না'— এমন কথা তিনি বলেন না কখনও। এক সময় সোমরসের প্রতি একটু বেশীই আসক্তি হয়েছিল কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ এবং অভিনয়ের কথা ভেবে এখন চুপচাপ। ড্রিংক প্রায় বন্ধ। এসব কোনো কথাই স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না তিনি।

গাড়ী হঠাৎ গ্রেট ইস্টার্ণের পাশে ওয়াটারলু স্ট্রীটে ঢুকতে বললাম—এখানে কেন?

—রবিদার দাঁত তোলা হবে। ওঁকে নিয়ে বাড়ী যাব। নার্সিংহোমের কাছে গাড়ী থামতেই দেখি রবিদা মানে আপনাদের রবি ঘোষ গাড়ীতে উঠে এলেন। শুনলাম সেদিন ওঁর দাঁত তোলা হয়নি, পরে হবে। এসপ্ল্যানেডে এসে বিদায় নিলাম। গাড়ী থেকে নেমে মনে করিয়ে দিলাম—'আসছে সপ্তাহে আবার আসছি। প্রদ্যোৎবাবুকে থাকতে বলবেন।

তৃতীয় দিন শুভেন্দুবাবুর বাড়ীতে ঢোকার আগে প্রদ্যোৎবাবুর পরিচয়টা পরিষ্কার করে নিই। খাঁটি বন্ধুত্বের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা উৎসবে ব্যসনে চৈব-দুর্ভিক্ষে ইত্যাদি যে সংস্কৃত শ্লোকটা আওড়াই ঠিক সেই রকম বন্ধু শুভেন্দুবাবুর এই প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। খুব ছোট বেলার বন্ধু, বালীতে থাকেন। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছেন। কলেজের সময় ছাড়াছাড়ি হলেও দু'জনার বন্ধুত্বের ছাড়াছাড়ি হয়নি। এখনও অফিস শেষে প্রত্যেকটা দিন প্রদ্যোৎবাবু সোজা চলে আসেন শুভেন্দুবাবুর বাড়ীতে। ওখানে রাত দশটা পর্যন্ত কাটিয়ে হাওড়া থেকে গাড়ী ধরেন দশটা চল্লিশের, বাড়ী পৌঁছতে সাড়ে এগারটা। যেদিন থিয়েটার থাকে সোজা চলে যান থিয়েটারে। ঝড়-জল-কিছুই কোনদিন দু'জনকে আলাদা করতে পারে নি। পারবেও না। একদিন তাই হাসতে হাসতে শুভেন্দুবাবুর বৌ বলেছিলেন 'প্রদ্যোৎদা আমার আগের জন্মে সতীন ছিল, এ জন্মেও আছে।'

কথাটা সত্যিই। শুভেন্দুবাবুকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা এবং বোঝার ভাগীদার একমাত্র প্রদ্যোৎবাবুই।

ক'দিন বাদে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হোল। একবারে সাদা-মাটা লোক। কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি চেহারায় একবারে নির্ভেজাল আপিসের বাবুর ছাপ তবে চোখে এমন একটা দীপ্তি আছে যা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না ভদ্রলোকের জ্ঞান খুব বেশী। শুভেন্দুবাবু আমার সঙ্গে পরিচয়টা করে দিয়ে বললেন—'তোমরা কথা বল—আমি আসছি।'

একজন প্রায় অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সহাস্যে আর কতক্ষণ বাক-যুদ্ধ চালানো যায়! তাও আবার পেছনে বসে দ্বিতীয় শুভেন্দু অর্থাৎ বাচ্চা অপু পড়ার বই থেকে মুখ তুলে আমাদের কথা শুনছে। তাই না দেখে প্রদ্যোৎবাবু চোখের ইশারায় পড়ায় মন দিতে বলছেন ওকে।

সম্পূর্ণ ফ্ল্যাটখানা পাওয়ায় এখন বসবার ঘরখানা বেশ বড় হয়েছে। খুব ছিমছাম ঘরখানা। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই, আবার যা আছে তাও যে খুব সাজানো গোজানো তা বলা যায় না। বসার সোফার পেছনে অপর ছোট্ট পড়ার টেবিল। তার পাশে নানা জিনিসে সাজানো একটা আলমারি। তার ওপর রাখা আছে সেরা অভিনেতা হিসাবে পাওয়া একখানি পুরস্কার। দেয়ালেও ছবি কম। হেমন্ত মুখার্জীর সই করা একখানা ছবিই মাত্র আছে।

ঘরখানার চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবছি আমাদের কথা তো থেমে গেছে। শুরু করা দরকার! দুম করে তাই বলে ফেললাম—'স্কুল লাইফের শুভেন্দু আর আজকের শুভেন্দুর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন?'

উত্তর দেবেন কি দেবেন না ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর একটুখানি হাসি মুখে করে বললেন 'আমি যা বলব সেটা তো বায়াসড্ হয়ে যাবো! ওর প্রতি আমার তো দুর্বলতা আছে—সেটাকে ডিঙিয়ে কি কিছু বলা যাবে?'

সংসার সীমান্তে : সন্ধ্যা রায়

আর কোনো মন্তব্য করলেন না প্রদ্যোৎবাবু তবে শুভেন্দুর অভিনয় সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ ভয়ানক সায়েন্টেফিক। মাঝে মাঝে ওঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল শুভেন্দুবাবু প্রায় সব কাজেই প্রদ্যোৎবাবুর পরামর্শ নেন। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপারেও নয় সাংসারিক কাজেও।

ইতিমধ্যে শুভেন্দুবাবু এসে গেছেন। বাবাকে দেখে অপু পড়ায় মন দিয়েছে দেখলাম। বড় বড় কাপে চা-এর পান পর্ব চলছে তখন। বৌদি ঘরে ঢুকতেই শুভেন্দুবাবু বলে উঠলেন—'দেখো এই মগ গুলো পাল্টাও। এ-গুলো দেখলে কেমন যেন কয়েদখানার কথা মনে পড়ে।' উত্তর দিলেন না বৌদি। হাসলেন মুচকে। ফরসা গালে মিষ্টি টোল পড়ল। কাপগুলো পাল্টালেন তার স্বীকৃতি ছিল হাসিতে। বসতে বললাম বৌদিকে। কিন্তু আর চেয়ার নেই, তাই বসলেন না। দাঁড়িয়েই রইলেন।

ছবির সংখ্যা এখন কম বলে শুভেন্দুবাবু থিয়েটারে ঝুঁকেছেন বেশী। 'বিবর' তো করছেনই, আরও দু-একটা নাটক স্টেজ করার ইচ্ছে আছে। বললাম—'ছবিতে ডিরেকশন দিন না।' কথাটা শুনে একটু উজ্জ্বল হোল মুখখানা। হাসিও ফুটল! প্রদ্যোৎবাবুর কিন্তু কোনো রি-অ্যাকশন নেই। চার মিনার ধরিয়ে সুখটান দিচ্ছেন। শুভেন্দুবাবু ডান হিল খাবার জন্য বলেছিলেন নেননি।

—ছবি পরিচালনা তো করবই। মোটামুটি রেডি হচ্ছি।

: সাবজেক্ট কি?

—ও-টি এখন বলা যাবে না। তোমাকে তো নয়ই, কাগজে লিখে দাও আর কি! তার ওপর নকলনবিশের তো আর অভাব নেই! ফর্ম্যালি আমাকে গল্পটা না বললেও ইনফর্ম্যালি তিনি সব-কিছুই বলেছেন আমাকে। আর সেটুকু শুনেই বলছি—শুভেন্দুবাবুর এ ছবি ভারতীয় চিত্রজগতে এক নতুনত্বের স্বাদ এনে দেবে।

বৌদি ইতিমধ্যে বে-রসিকের মত বলে উঠলেন—'কি গো ও বাড়ী যাবে না? ও বাড়ী মানে বৌদির বাপের বাড়ী আর কি!

আড্ডা তাই ভাঙল।

অপুকে পড়াশুনোয় মন দিতে বলে নেমে এলাম তিনতলা থেকে। আমরা চারজনই। গ্যারেজ থেকে স্ট্যান্ডার্ডখানা বার করলেন। উঠলাম আমরা। বেলতলা রোডে বৌদিকে নামিয়ে দিয়ে শুভেন্দুবাবু বললেন 'চলো রবিদা'র বাড়ী, আমার আড্ডাখানাটা দেখে আসবে।' প্রদ্যোৎবাবুও সঙ্গে আছেন।

রবি ঘোষের ঘরে ঢুকে দেখি মুখের আড্ডা নয় তাসের আসর বসেছে। বেশ জোর তালে চলছে খেলা। চিন্ময় রায়, সৌমেন্দু রায়, প্রডিউসার ভোলাবাবু ক্যাপসের রবিবাবু সব বসে। কেউ খেলছেন, কেউ মজা করছেন।' শুভেন্দুবাবু ঝপাস করে গিয়ে বসে পড়লেন আসরে। হাতে তাস নিয়ে 'নো ট্রাম্পস' 'থ্রি হার্টস' 'টু ক্লাবস-য়ে মত্ত হতে বেশীক্ষণ সময় লাগল না। আমি শুধু দেখছি, দেখছি আর দেখছি শিল্পী শুভেন্দু চ্যাটার্জী তাসুড়ে শুভেন্দু হয়ে গেলেন।

নির্মল ধর

প্রেমের ফাঁদে
রবি ঘোষ

স্পা কর ক্যাবারে : উত্তমকুমার। পরিচালনা : দিলীপ মুখার্জি। ফটো : অমৃত

ফেরে থেকে বলছি

এই যে মিঠু মুখার্জি ক্যামেরার সামনে শেল-ব্যাক বাজনার তালে তাল দিয়ে নাচছে বলতে গেলে সেই সকাল থেকে, একে আমরা কি বলব? সেনো ফকস ক্যাবারে ছবির নাম, এটা আমেরিকার নটোরিয়াস পর্তুগিজ শহর লেস ভেগাস-এর যে-কোন হোটেল হতে পারত, সেখানে স্বল্পবাস ক্যাথেরিনারা ঠিক এই ভঙ্গীতে নেচে জিভ্বা শরীরের রোমকূপে শিরা-শির জাগানো সুন্দরীরা যদি প্যারীর মুলাঁ রুজ রেস্তোরাঁর লম্বা লম্বা পা ছুঁড়ে ক্যান ক্যান নেচে কিম্বা ন্যুঅর্ক শহরের ব্রডওয়ে অঞ্চলের টিফানী-তে স্ট্রিপ-টিজ দেখিয়ে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করেন তাহলেও মূলে তো সেই সেক্স! নাঃ, ওটা আর কোন অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। শো-বিজনেসে ওটা ছিল ওটা আছে-এবং ওটা থাকবে...

ক্যামেরা ট্র্যাক্ করছে, মিঠুর যৌবন-পুষ্ট কমনীয় শরীরকে স্টুডিওর আলো যেন ছেঁকে ঘিরে ধরেছে অদৃশ্য বাঘ-চক্ষু ক্যামেরার শক্তিশালী লেন্স তীক্ষ্ণ ভঙ্গীতে নজর রেখে চলেছে, ট্রলি হচ্ছে, ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্তর চোখ অ্যাপ্লিফ্লেকসের ভিউ-ফাইণ্ডারে বোম্বের নৃত্য-পরিচালক বদ্রী-প্রসাদ বাজনার শব্দ ছাপিয়ে তুলে হেঁকে যাচ্ছেন, ওয়ান টু থ্রী ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট.....

আর এক-একটি মুভমেণ্ট শরীরে তরঙ্গ তুলছে ভাঙ্গ ফেলছে টুইস্টেড হচ্ছে আবার সুঠাম সুগোল, সেই কমনীয় তনু বাপরে কি গরম পড়েছে ফ্লোরে, আজ এখানে কি-যেন হচ্ছে দিলীপ মুখার্জি মানে আসলে যিনি যান্ত্রিক, চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে হাই নাঃ, ওদিকে ছবির প্রযোজক মৃদু মৃদু হাসিমুখে ভারতী সিনেমার অমর নান, ভদ্রলোক অপরকে যেমন হাসান নিজেও তেমনি হাসেন, একটি সিগ্রেট শেষ করলেন এই কিছুক্ষণ আগে, দিলীপ মুখার্জির হাই আর তোলা হল না ইয়েস রেডি ফর দি টেক।

সেদিন ফ্লোরে এসেছিলাম।

উত্তমকুমার, সুব্রত সেন মিঠু মুখার্জি আর বিজু ফুকন—এই চারজনকে নিয়ে শট হচ্ছিল। উত্তমকুমার এই সেনো ফকস ক্যাবারের প্রাইম সিঙ্গার পপুলার সিঙ্গার। এই বয়েসে ওয়াকি মাইক হাতে নিয়ে যখন সুরের তালে তালে ভঙ্গী করে শেল-ব্যাকের মায়া সুরে গান গাইলেন, তখন ইয়াহু ইয়াহু শব্দে প্রথমেই একস্ট্রারা মুখর, এটা গুরুর ব্যাপার, উত্তম এখন যা করেন লোকে হট কেকের মত লুফে নিচ্ছে গিলছে, এ-রকম পাবলিক ইমেজ শুনেছি একমাত্র মাদ্রাজে শিবাজী গণেশেরই নাকি আছে, বাদবাকী না বলাই ভালো। উত্তমের হাসিটা জবরদস্ত মেয়েরা তো মরে যায় মজে যায়। উত্তমও অকৃপণ, চাই হাসি? মিষ্টি হাসি মধুর হাসি? ওক্কে, নাউ হ্যাভ ইট! আর তার ঠেলা সামলাতে কত কাণ্ড ...

সেনো ফকস সেটে সেদিন উত্তমকুমার নাকে রুমাল চেপে এক টেবিলে, সাম আগরওয়ালের কোম্পানীতে। সে ভদ্রলোক ততক্ষণে বেশ কয়েক পেগ হুইস্কি পেটে চালান করে কিঞ্চিৎ চনমনে ভঙ্গীতে ঠোঁটে মধুর একফালি অমায়িক হাসি ঝুলিয়ে নিজের দর বাড়াচ্ছেন।

—খাবেন নাকি একটু ?

উত্তম সহাস্যে—নাঃ, ওটা খেলে আমাকে আবার কোলাসিকল গান গাইতে হয়, হ্যাঁ বলুন, আপনার হেলথ ডিপার্ট-মেণ্টের খবর বলুন সুগার, প্রেসার?

মারোয়াড়ী ভদ্দরলোক সবিনয়ে জানা-লেন—নতুন বাজেটটা বেরোবার পর সামান্য একটু ট্রাবল দিচ্ছে...

হঠাৎ উত্তমকুমারের চোখ, পূর্ব-পরি-কল্পনামাফিকই গিয়ে পড়ল সামনের একটা টেবিলের দিকে। সেখানে মিঠু অনিশ্চিত-ভাবে বসে আছে। উত্তম তক্ষুনি সহাস্যে উঠতে উঠতে বললেন—হাই মণিকা তুমি এখানে! একা!

মিঠু হাসল, মৃদু মিষ্টি অথচ ধারাল হাসি। হাসিতেই তার উত্তর প্রচ্ছন্ন, মুখে বলার প্রয়োজন ঘটল না।

উত্তমকুমার এগোলেন ওর টেবিলের দিকে। সেই ভুবন-ভোলানো হাসি, বুকের রক্ত চলকে চলকে ওঠে যে হাসিতে—কাম

অন কাম অন মেয়েদের একলা বসে থাকতে দেখতে আমার কেমন বিরহী বলে মনে হয়, অ্যান্ড দ্যাট কাণ্ট বি প্লীজ জয়েন আস—

মিঠুর যৌবন-শরীর সমুদ্রের তরঙ্গের মত অকস্মাৎ যেন ফুঁসে ওঠে—ট্রলি হয়ে যাওয়া ক্যামেরার লেন্সে আ, কি হাসি ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্তর অভিজ্ঞ মুখের ভাঁজে, পরতে পরতে ছবি ভালভাবে উঠছে বলেই হয়ত-বা উত্তম সযত্নে ওর বাহুমূল ধরে নিয়ে আসেন আগরওয়ালার টেবিলে। ভদ্দরলোকের মেদবহুল মুখে চাপা উত্তেজনা, সমস্ত ব্যাপারটাই এখন লোভনীয় ফাঁদ-পাতা এই পৃথিবী, চারিদিকে ফাঁদ, অসংখ্য যেমন চাঁদের বুকে গর্ত সেখানে স্বেচ্ছায় পা দেবার জন্যে কত মানুষই যে ব্যগ্র, আগরওয়ালা তো সামান্য মানুষ!

—এনি ড্রিংক, শ্যাম্পেন, হুইস্কি, লাইম-জিন, খাবেন নাকি কিছু?

মিঠু ঘাড় নাড়িয়ে জানাল—না কিচ্ছু না থ্যাংকস—

উত্তম তাদের এই কথোপকথনে বাধা দিলেন—ওয়েল মিঃ আগরওয়ালা, আপনারা গল্প করুন আমার একটা জরুরী টেলিফোন এসেছে, আমি আসছি—

বলে সতর্ক ভঙ্গীতে মিঠুর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন ইঙ্গিতটা পরিষ্কার, ক্লায়েন্টকে খুশী কর, পৃথিবীর সব ক্যাবারে এক এবং অভিন্ন, সব ক্যাবেরিনার দুটি সত্ত্বা, এক—ক্লায়েন্টকে খুশী করা এবং দুই—নিজের হাতে নিজেকে তিল তিল করে পুড়িয়ে মারা! কি-জানি গল্পে কাহিনীকার বা ছায়াছবিতে পরিচালক সে-কথা কিভাবে বলছেন!

উত্তমকুমার আগরওয়ালা ও সুন্দরী ক্যাবেরিনাকে টেবিলে রেখে শট আউট হয়ে গেলেন...

এখন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর বড় ফ্লোরে বিরাট সেটে চিত্রযুগের 'সেনো ফকস ক্যাবারে' ছবির একটানা ছাব্বিশদিনব্যাপী শুটিং চলছে। এতে মান্না দে-র গাওয়া নচিকেতা ঘোষের সুরারোপিত মোট সাতখানা গান চিত্রায়িত হচ্ছে আর বেশ কয়েকখানা নাচ। নাচের তালিম দেবার জন্যে বোম্বে থেকে সংগীত-পরিচালক বদ্রীপ্রসাদ এসেছেন। এতে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, মিঠু মুখার্জি শিপ্রা মিত্র অসিতবরণ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ঝুমুর গাঙ্গুলী, সমিতা বিশ্বাস কল্যাণী মণ্ডল গীতা দে এবং কল্যাণ চ্যাটার্জি।

*

রাত এখন আটটা, আমি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে নিশিমুগয়া ছবির সেটে। দীনেন গুপ্ত এ-ছবির পরিচালক এবং ক্যামেরাম্যান। বিরাট একটা দোতলা বাড়ির সেট লাগিয়েছেন শিল্পনির্দেশক সূর্য চ্যাটার্জি। ফ্লোর থেকে একটা সিঁড়ি সোজা দোতলায় উঠে গেছে, থেমেছে একটা একপাল্লা দরজায়, সেই দরজায় এক স্বল্পবাস নৃত্যরতা মেয়ের প্রমাণ-সাইজ ছবি আঁকা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বোঝা গেল, অর্থাৎ ফ্লোরে যারা অভিনয় করছিল তাদের আচরণেই এটা স্পষ্ট হলো জায়গাটা ক্রিমিন্যালদের একটা আড্ডা। ভয়ঙ্কর চেহারার কিছু লোকজন কয়েকটি মেয়ে নিয়ে হুল্লোড় করছে এখানে, এখন। হাতে হাতে মদের গ্লাস ঢলাঢলি নাচগান হৈ এবং হুল্লোড়।

দীনেন গুপ্ত ফ্লোরে তখন একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে শট নিতে ব্যস্ত। শরীরকে ঢোলা গাউনে ঢেকে একটি মেয়ে ইতস্তত ঘুরছিল ফ্লোরে, চোখাচোখি হতে বুঝলাম—এ হচ্ছে চন্দ্রকলা। রঙ্গজগতে স্বল্পবাসে নেচে-গেয়ে মেয়েটি ইতিমধ্যেই বেশ পসার করেছে, কলকাতার একটা পশ হোটেল, একটা থিয়েটারে ও এখন নিয়মিত নাচছে। বলা বাহুল্য সেকস-ই মূলধন। এই ধরনের ডেন সেটে মেয়েরা যা করে

প্রিয় বান্ধবী
উত্তমকুমার/সুচিত্রা সেন

আনন্দমেলা : মহুয়া রায়চৌধুরী/তিলক চক্রবর্তী

থাকে আপাতত ঘটনাটা তাই, আজকাল বেশীর ভাগ দর্শকরা চাইছে গান নাচ আনন্দ মারপিট। অর্থাৎ সেকস ভায়োলেন্স ক্রাইম। এটা যিনি ছবিতে দিতে পারবেন তারই জয়জয়কার। ভাল ছবি মন্দ ছবি বলে আর কোন বাছাবিচার নেই। দীনেন গুপ্ত দর্শকের পালস বুঝে ছবি করছেন ঠিকই করছেন। নিশিমৃগয়া-তে অভিনয় করছেন অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চ্যাটার্জি উৎপল দত্ত বসন্ত চৌধুরী কাজল গুপ্ত শেখর চ্যাটার্জি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপকুমার দিলীপ রায় এবং নবাগতা যূথিকা। নরেশকুমার এ-ছবির নৃত্যপরিচালক হেমন্ত মুখার্জি হচ্ছেন সংগীত-পরিচালক। রমেন ঘোষ সম্পাদক।

•

শ্যামল মিত্রের সঙ্গে দেখা হল স্টুডিওতে। ও'র প্রযোজিত 'আমি সে ও সখা' সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছে। শ্যামল মিত্র হিন্দী 'অমানুষ' ছবিরও সংগীত-পরিচালক। কয়েকদিন আগে বোম্বে থেকে ফিরেছেন। উনি বললেন, বোম্বেতে হিন্দী অমানুষ হিট করেছে। দর্শকরা উত্তম-কুমারকে হৃদয়ের সঙ্গে নিয়েছেন ও'র অভিনয় দর্শকদের খুব ভাল লাগছে। সে-কথার সাপোর্ট করছেন চরিত্রহীন ছবির প্রযোজক দেবেশ ঘোষও। ও'র মতে হিন্দী অমানুষ অল ইণ্ডিয়া মার্কেটে ভাল ব্যবসা করবে। বোম্বের বাসু চ্যাটার্জি কলকাতায় এসেছেন। উনি ও'র পরের ছবিতে শ্যামল মিত্রকে নিচ্ছেন সংগীত-পরিচালক হিসাবে। বাংলা নয়, হিন্দী ছবি-ই। প্রযোজক দিলীপ সরকার কলকাতায় না করে বোম্বেতে একটা হিন্দী ছবি করবেন বলে পরিচালক হৃষিকেশ মুখার্জিকে সাইন করে এসেছেন। আইনগত কারণে এতদিন যে 'হাতি মার্কা সিম্বল' ব্যবহার করা যায়নি এবার দিলীপ সরকার সেই সিম্বল ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছেন। অতএব বোম্বেতে এখন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর সেই বিখ্যাত 'জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম'-সহ হাতির মনোগ্রামে ও'র হিন্দী ছবিটি নির্মিত হবে।

স্টুডিও সংবাদ

হাজারিবাগ থেকে 'অসময়' ছবির আউট-ডোর শুটিং করে পরিচালক ইন্দর সেন সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। সেদিন স্টুডিওতে দেখা হতে বললেন, ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ। মোট ষোলদিন আউটডোর শুটিং হয়েছে এর আগে সাতদিন হয়েছে ইনডোর শুটিং। হাজারিবাগের ক্যানারি হিলসের তলায় একটা বাড়িতে ছবির দিন ও রাতের দৃশ্যেরও চিত্রগ্রহণ করেছেন ইন্দর। বিমল করের কাহিনীর এই চিত্ররূপে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে অপর্ণা সেন স্বরূপ দত্ত দীপঙ্কর দে মহুয়া রায়চৌধুরী অনিল চট্টোপাধ্যায় কল্যাণ চ্যাটার্জি চিন্ময় রায় প্রভৃতি শিল্পী। ছবির চিত্রগ্রহণ ও সংগীত-পরিচালনা করছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং আনন্দশঙ্কর।

শর্মিলা : রাজশ্রী বসু

খ্যাতনামা পরিচালক তপন সিংহ তাঁর স্বরচিত 'হারমোনিয়াম' ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ করে এনেছেন। তপন সিংহ নিজেই এ-ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন। এতে অভিনয় করছেন অরুন্ধতী দেবী, অনিল চ্যাটার্জি কালী ব্যানার্জি ভানু ব্যানার্জি সন্তোষ দত্ত ছায়া দেবী অরতি ভট্টাচার্য প্রেমাংশু বসু তরুণ মিত্র অরুণ মুখার্জি শিউলী মুখার্জি অলকা গাঙ্গুলী সোনালী গুপ্ত কাজল গুপ্ত ভীষ্ম গুহঠাকুরতা গীতা নাগ সন্তু মুখার্জি অলক বাগচী স্বরূপ দত্ত ও সমিত ভঞ্জ। চিত্রগ্রহণ করছেন বিমল মুখার্জি।

'রাজরক্ত' নামে স্বরচিত কাহিনীতে পরিচালক পীযূষ বসু খুব শিগগির একটি ছবি তৈরীর কাজে হাত দিচ্ছেন। এতে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার, আরতি ভট্টাচার্য এবং অমানুষ-খ্যাতা বোম্বের প্রেমা নারায়ণ। সংগীত পরিচালনা ও প্রযোজনা করবেন যথাক্রমে শ্যামল মিত্র এবং অসীম সরকার।

'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবির পর পরিচালক সুশীল মুখার্জি ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনীতে 'সুদূরে নিহারিকা' ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন। সম্প্রতি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবির চারখানি গান রেকর্ডিং হয়েছে। গেয়েছেন আরতি মুখার্জি সন্ধ্যা মুখার্জি হেমন্ত মুখার্জি এবং মান্না দে। ছবির নায়ক ও নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও সোমা দে।

মুসাফির

এক গাঁও কী কহানী
মঞ্জুলা/রাকেশ পাণ্ডে

একটি ছবির জন্ম-রোমাঞ্চ

জেমিনি চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীএস এস বালন তিনটি ভাষার এক নতুন ছবির সুটিংয়ের জন্যে এক চমৎকার লোকেশান খুঁজে পেয়েছেন বাঙ্গালোর থেকে ১৩৪ মাইল দূরে কলসপুরা নামক এক অখ্যাত গ্রামে। সেখানে গড়ে উঠল জেমিনি কলোনি পরিপূর্ণ বৈভব ও গ্ল্যামার নিয়ে শুধুই একটি ছবির জন্যে। সেই জেমিনি কলোনিতে নির্মিত হল অনেক ঘরবাড়ি। মনে হয় যেন ফাইভ স্টার হোটেল-এর কক্ষ সব। কি নেই সেখানে? শুধু তাই নয়, মেকাপ, এডিটিং, প্রোজেকশন, ডেভেলপিং; প্রিন্টিং ইত্যাদির জন্য পৃথক পৃথক কক্ষের আয়োজন ঃ এমন কি ২২০ ভোল্টের নতুন ট্রান্সফরমার বসিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা একটি ছবির সুটিংয়ের জন্যে—ইতিহাস সৃষ্টি নিশ্চয়ই। এখানে প্রতিটি কর্মীই পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সুখে ও আরামে থেকেছেন ও উৎসাহে কাজ করে গেছেন। এখানে সুটিং চলেছিল সর্বসাকুল্যে সাড়ে তিন মাস। এক নাগাড়ে একশ বারোদিন ধরে সুটিং চালিয়ে হিন্দী, তামিল, তেলেগু ভাষায় তোলা এই ছবিটি সম্পূর্ণ হয়। এটি একটি রেকর্ড কৃতিত্ব সন্দেহ নেই।

ছবিটির হিন্দী ভার্সনের নাম ঠিক হয়েছে 'এক গাঁও কী কহানী।' সত্যি গ্রামীণ পরিবেশেই গোটা ছবিটা তোলা হল। প্রত্যেকদিন ফিল্ম ইউনিটটি কাজ করেছে ডবল শিফটে। এবং বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা নিয়মিত সুটিং হত প্রতিদিন। গ্রামটিতে কয়েকটি বাড়ী ছাড়া আর কোন সেট নির্মাণ করা হয় নি। ফলে ব্যবহৃত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাড়ীটি নির্মাণ করতে আশী হাজারেরও বেশী খরচ হয়েছে। গ্রামবাসীদের পূর্ণ সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রযোজক-পরিচালক শ্রীবালন ও জেমিনির ম্যানেজিং ডিরেকটর মোটা অঙ্কের টাকা দান করেছেন গ্রামটিতে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন গৌরি রামস্বামী আয়েঙ্গার। ফটোগ্রাফী ডি ভি রাজারামের। সংগীত সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্র জৈন। গান রচনা ইন্দিবরের। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তামিল ও তেলেগু চিত্রের জনপ্রিয় তারকা শ্রীমতী মঞ্জুলা। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের শিক্ষা-প্রাপ্ত অভিনেতা রাকেশ পাণ্ডে হয়েছেন নায়ক।

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

ছত্রিশ বুক আর ছত্রিশ হিপের ঝাঁকুনি দেখতে দেখতে দর্শকদের চোখগুলো যখন বুক-হিপ ছেড়ে দেহের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে চায় হেলেন তখনও নেচে চলে। হয়তো বা তখনও অপরের গলা ধরে গেয়ে যায়—হোঠো কী লালী পাসংকী কে সায়ে, সাগর মেঁতনমন ডুবা সা জায়ে...ছত্রিশ ইঞ্চির যৌবন সাগরে তখন হাবুডুবু খাচ্ছে অনেকে।

হেলেন অবিশ্যি শুধুমাত্র দর্শকের রঙীন নেশা ধরিয়ে ক্ষান্ত নয়। ছবির হিরোদেরও নেশায় বুঁদ করে দিতে পারে খুব সহজেই। ও নিজেই নাকি বলে—ছবিতে বুক দেখানো নাচের পর হিরো কা ভিলেন যখন চুকচুক দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকায় তখন কি মজাই না হয়! স্বাভাবিক। তবে হেলেনের এই পুরুষ ক্ষ্যাপানোর স্ট্রাটেজি হোল পুরুষদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে সময় মতো কেটে পড়া।

সেজন্যই বুঝি কোনো নায়কই এ পর্যন্ত বেশী দূর এগোতে পারে নি

হেলেনের সঙ্গে। আর পারবেই বা কি করে! হেলেনের গডফাদার পি এন অরোরা বুড়ো হলেও সহজে চোখের আড়াল করতো না ওকে। খুব কড়া শাসনে রেখেছিল পি এন হেলেনকে। প্রতিদিন স্টুডিও থেকে নির্দিষ্ট সময়ে কর্তাকে জানিয়ে দিতে হোত আমি অমুক জায়গায় আছি এই সময় ফিরব। সন্ধ্যের পর পি এন-এর কড়া আদেশ ছিল হেলেন কাজ করতে পারবে না। সন্ধ্যের পর সে পি এন-এর একজন।

জানি না কেন হেলেনের মত চালু মেয়ে বছরের পর বছর এই বৃদ্ধকে সঙ্গ দিয়ে এসেছে। কিন্তু শেষ অবদি ধোপে টিঁকল না। পি এন ছেড়ে দিল হেলেনকে। আসলে হেলেনই এদ্দিনে সার বুঝেছে যে বৃদ্ধকে দিয়ে কিসসু হবে না। আর সঙ্গী হিসেবে পি এন-এর শারীরিক পৌরুষত্বই বা কতটুকু! সুতরাং যা হবার তাই হয়েছে। দুজনে আলাদা এখন।

এই বিচ্ছেদে হেলেনেরই সুবিধে বেশী। যখন যেখানে খুশি মধু খেতে যেতে পারছে এখন সে।

কদিন আগে এই তো বৈরাগ ছবির একটা বেশ গা-গরম করা হট দৃশ্য গ্রহণ করা হোল। নায়ক ছিলেন দিলীপকুমার। হেলেনের পোষাক ছিল প্যান্টি আর ব্রা। দিলীপকুমার পরেছিলেন শুধুমাত্র লুঙ্গী। গা খালি। এই অবস্থায় দুজনে জড়াজড়ি করছেন এন্তার। পরিচালক যেটুকু বলেছেন তার চাইতে কয়েকশ ফুট বেশীই করেছেন কাজ। ছ দিন ধরে শুধু এই হট সিনেরই টেক করা হয়েছে।

আহা! কি মজা দুজনের যদি দেখতেন! একটা সিন কিছুতেই একেবারে টেক করা হয় না। চার-পাঁচবার রিহার্সাল না দিয়ে টেকিংই হচ্ছে না কোন সিনের। উপভোগের আনন্দে একবারে ডগমগ ছিলেন কটা দিন দিলীপকুমার। এমনি কি বাড়ী থেকে বিছানার চাদর বালিশের ঢাকনা অব্দি নিয়ে আসতেন তিনি। একদিন ইয়ার্কি মেরে বলেছিলেন—ব্ল্যাঙ্কেটটাও নিয়ে আসতাম, সায়রার জন্য আনতে পারলাম না।

দু-দুটো দিন জড়াজড়ি করার পর হেলেনরও কম উশুল হয় নি। সে তাই দিলীপকে বলতে গিয়েছিল—তোমার সঙ্গে কাজ করে আমার প্রচণ্ড আনন্দ হয়েছে। জবাবে দিলীপকুমার বেহায়ার মত নাকি বলেছেন—আনন্দটা আমারও কম হয় নি।

মদ আর মেয়েছেলের প্রতি প্রেমনাথের দুর্বলতা চিরদিনের। চোদ্দ বছর আগে যখন ফিল্ম লাইন প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন থেকেই ভাব জমেছিল সমবয়সী প্রৌঢ়া অভিনেত্রী কামিনী কৌশলের সঙ্গে। এখনও দুজনের গাঁটছড়া খোলে নি। তাই বলে প্রেমনাথ যে অন্য কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে আকায় না—তা মনে করবেন না। ছোক ছোক বাই কি সহজে যায়!

আর সেই সঙ্গে মদের প্রতি প্রেমনাথ একটু বেশীই আসক্ত। মদের পিপে হিসেবে তার সুনাম আছে। ফিল্মল্যান্ডের কোন পার্টিতে প্রেমনাথ না থাকলে সে পার্টি কখনই জমে না।

এহেন প্রেমনাথ হঠাৎ ক মাস আগে একদিন প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন—মদ আর ছোঁব না। ও'র জনৈক চামচে আর সি কুমার জাতে প্রোডিউসার একই পথের পথিক হলেন। বাজী ছিল প্রায় দু লাখ টাকা। বেশী দিনের জন্য নয় অবশ্য। মাত্র চার মাস।

দিন যায় মাস যায়। মদ ছুঁতে না পেরে তো প্রায় পাগল হবার দাখিল দুজনেই। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর বাঁ হাতে কামিনীকে জড়িয়ে প্রেমনাথ সবাইকে বলে বেড়িয়েছেন—আমি সাধু হবো, হিমালয়ে আমার গুরুর কাছে শিগগির চলে যাচ্ছি।

কিন্তু হায়! কামিনী-কাঞ্চনের মায়া ত্যাগ করা কি সোজা! বিশেষ করে কামিনীর! বোধ হয় সন্ন্যাসী হওয়া তাঁর আর হল না। আর মদের গন্ধে তো তাঁর দেহ-মন-প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছে কদিন ধরে। কবে যে চার মাস শেষ হবে সে প্রতীক্ষায় দুজনেই শবরীর মতো বসে ছিল। শুধুমাত্র মেয়ে নিয়ে কি দিন কাটে!

অবশেষে সেই শুভ দিনটি এলো। পঁচিশে মার্চ ছিল প্রতিজ্ঞা ভাঙার দিন। আর সি কুমারের বাড়ীতে সেদিন সূর্যাস্তের পর স্কটল্যান্ডের রঙীন জল মেঝের কার্পেটকেও হাবুডুবু খাইয়েছে। সূর্যাস্তের পর সান্তাক্রুজ স্বামীজীর আশীর্বাদ নিয়ে প্রথম বোতলটি খুললেন প্রেমনাথের নাম্বার ওয়ান চেলা সুনীল দত্ত। মহাগুরু প্রেমনাথের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল ছোটা গুরু সুনীল দত্তের হাতে। সারা রাত চলল পার্টি।

পরদিন শ্যাম বহেল প্রেমনাথের অনারে পার্টি থ্রো করলেন নিজের বাড়ীতে। সেখানেও একই অবস্থা। চার মাসের তৃষ্ণার্ত প্রেমনাথ আকণ্ঠ মদ খেয়ে বেসামাল। নেশা যেন কিছুতেই আর মেটে না। পিপের মত মদ গিলেও নেশা কই! যে নেশায় সে কামিনীদের সহজ কৌশলেই নিজের ফাঁদে ফেলতে পারে!

সুতরাং আবার পার্টি। এবার আর অন্য কোথাও নয়, নিজের বাড়ীতে। মহাগুরুর পার্টি। বৈশিষ্ট্য থাকতেই হবে। ছিলও। নিমন্ত্রিতদের প্রতি নির্দেশ ছিল গেরুয়া রংয়ের পোশাক পরতে হবে। জামা প্যান্ট নয়, লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। 'লুঙ্গিতে কি সুবিধে ঠাওর করা যাচ্ছে না ঠিক!) মহাগুরুর নির্দেশ অবশ্য কেউই অমান্য করেনি এমনকি ফটোগ্রাফার পর্যন্ত।

পার্টি চলছিল সারারাত। রাত্রি শেষে ভোরের আলোয় দেখা গেল কামিনীরা সব ধরাশায়ী, কেউ একা কেউ যুগলে। একমাত্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোটাগুরু সুনীল দত্ত। গলায় পুঁতির মালা গেরুয়া পোশাক আর হাতে গোলাপ নিয়ে মহাগুরুকে খুঁজছে সে। মহাগুরু তখন মহাতপস্যায় সমাধিগ্রস্ত।

উদোম হয়ে জুহু সীবীচে ছবি তোলার পর থেকেই কবীর বেদীর বৌ প্রতিমা বেদী এখন সবচাইতে জনপ্রিয়। কেটি মির্জা চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতি নিয়ে যা করতে পারেনি প্রতিমা বেদী ছত্রিশ ইঞ্চি হিপ দিয়ে তাই করেছে। কবির বেদীর স্ত্রোমশ বক্ষপটের চাইতে সে যে কম আকর্ষণীয় নয় তা প্রমাণ করার এর চাইতে ভালো উপায় আর কিইবা হতে পারে! কিন্তু এইভাবে জনপ্রিয় হওয়ায় তার মুশকিলও কম হয়নি। যে পার্টিতেই প্রতিমা সেখানকার অনেকেই তার বাইরেটা দেখে আর সন্তুষ্ট নয় ভেতরটা দেখতে চায়। অনেকে একথা স্পষ্টা-স্পষ্টি বলেওছে প্রতিমাকে। সাড়া দেয়নি সে; গভীর জলের মাছ—সহজে কি সাড়া দেয়।

মেয়েধরা আই-এস-জোহর অবশ্য অত কাঁচা খেলোয়াড় নয়। খেলতে এবং খেলাতে সে তুখোড়। প্রতিমার ভেতরটা দেখবার জন্য সেও আকপাঁক করছে ঠিকই কিন্তু সহজে এগোনো যাবে না জেনেই সে এখন বুঝি খেলাচ্ছে প্রতিমাকে।

এইতো 'জমিন' ছবির প্রিমিয়ারে দুজনের সে কি অবস্থা! পেছনে সব ফিল্ম লাইনের লোকরা বসে আছে, আর সামনের সিটে বসে প্রতিমা আই এস এর কি উচ্ছলতা! জড়িয়ে ধরেও দুজনে ঠিক থাকতে পারেনি। চুমুটুমু খেয়ে একাকার কাণ্ড! পেছনের লোকদের তো চোখ টাব্।

গান্ধর্বী

রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন

রবীন্দ্রসংগীত এবং নৃত্যবিভাগে মে মাস থেকে নূতন শিক্ষাবর্ষ সুরু হচ্ছে

ভর্তির সময়: শনিবার বিকেল ৪—৮টা
রবিবার সকাল ৮—১১টা

প্রধান কেন্দ্র: ১২ লেক এভিনিউ, কলিকাতা-২৬। উত্তর কলিকাতা শাখা: ৫, বিধান সরণী, দ্বিতল, ঠনঠনিয়া কলিকাতা-৬।

ঘড়ি
জড়োয়া গহনা
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪ জলহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

প্রেক্ষাগৃহ

ফুলু ঠাকুরমা

প্রযোজনা : সাধনা ফিল্মস্
দুর্বল চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সত্ত্বেও একটি উপভোগ্য হাসির ছবি

ঠাকুর্দা চন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর সখের দাড়ি ও চুরোট সামলাতে গিয়ে ফুলু ঠাকুরমার পোষা টিয়াপাখিটা উড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে শুরু হোল বিবাদ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। ঠাকুর্দার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ফুলু ঠাকুরমা কলকাতায় ও'র ছেলের বাড়ীতে চলে আসেন। সেখানে গিয়ে উনি জানলেন তাঁর আদরের নাতি রবীন বাড়ী ছাড়া। রবীন সঙ্গীতভক্ত আর ফুলু ঠাকুরমার ছেলের সঙ্গীতে এলার্জি। রবীন আশ্রয় নিয়েছে বন্ধুদের মেসে এবং গানের মাস্টারী করেই কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করে। এদিকে একটি মেয়েকে (রুবী) গান শেখাতে গিয়ে রবীন তাকে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু রুবীর বাবা গানের মাস্টারকে ভাল চোখে দেখতেন না তাই সে রিভালবারের ভয় দেখিয়ে তাকে বিদায় দিয়েছেন। এবারে আসরে এলেন বিলেতী ভ্রমর বিশু। কিন্তু রায়বাহাদুরের ভয়ের জন্যে সেও প্রেমের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। অবশেষে এক ঘটকের মারফৎ রায়বাহাদুর এবং রবীনের বাবা পাত্র ও পাত্রীর বিবাহের জন্যে উঠেপড়ে লাগলেন। অন্যদিকে ফুলু ঠাকুরমার উদ্যোগ চলল গোপনে। বন্ধুরা মিলে রবীনের বিবাহের ব্যবস্থা করলো রুবীর সঙ্গে। গোপনে খবর পেয়ে রায়বাহাদুর এবং রবীনের বাবাও সেখানে উপস্থিত হলেন; এই অসিদ্ধ বিবাহকে স্বাগত জানাতে এবং ও'রা বুঝলেন ঘটকের পছন্দকরা ছেলে ও মেয়ে হোল রবীন আর রুবী। সুতরাং এই বিবাহ উপলক্ষ্যে ঠাকুর্দা দাড়ি গোঁফ কামিয়ে সুদূর বেনারাস থেকে কলকাতায় চলে এলেন—অর্থাৎ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'।

এ ছবির মূল কাহিনী প্রবোধবন্ধু অধিকারী ও শৈলেন গুহনিয়োগীর 'সেমসাইড' অবলম্বনে রচিত। কাহিনীর আসল বক্তব্যকে পরিবর্তিত করতে গিয়ে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সাধন সরকার ছবিকে দুর্বল করে ফেলেছেন। হাসির ছবি অথচ হাসির সিচুয়েশানের বড়ই অভাব বলে মনে হোল। অভাব বাস্তবতারও। অভিনয়ে—নামভূমিকায় মলিনা দেবী অপূর্ব অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায়—জয়শ্রী রায় (রুবী), নবাগত ইন্দ্রজিৎ (রবীন), কমল মিত্র (ঠাকুর্দা), বিশুর ভূমিকায় চিন্ময় রায় রায়বাহাদুরের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীনের বাবার ভূমিকায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্ধুর ভূমিকায় অনুপকুমার ভালো অভিনয় করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় এবং নেপথ্যসঙ্গীতে শ্যামল মিত্র তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কলাকৌশল ও সম্পাদনার কাজ পরিচ্ছন্ন।

—চিত্রদূত

ফুলু ঠাকুরমা/মলিনা দেবী

চোর চোর

গতানুগতিক হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ আবেদন

প্রযোজনা : নবকেতন এণ্টারপ্রাইজ

আচমকা চন্দন নামে এক কুখ্যাত ব্যক্তি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আকাশের বাবাকে খুন করে। এই খুনের কিনারা করবার জন্যে আকাশ নিজেই চেষ্টা করতে থাকে। এদিকে কীর্তি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার দৌলতরাম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আকাশকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চাঙ্গিনী এসে তার পিতার হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়ায়। তার কাছে একমাত্র প্রমাণ আততায়ীর জামার কলারের উপর দর্জির দোকান স্টাইলোর নাম। সেই দোকানের দর্জি মাষ্টারজীর কাছ থেকে জানলে, হ্যান্ডলুম হাউসের ম্যানেজারের নাম। কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে জানতে পারলো আকাশ গেষ্টহাউসে উঠেছে। ইতিমধ্যে আততায়ী আকাশকে ভয় দেখিয়ে শহর ছেড়ে যেতে বলেছে। গেষ্টহাউসের প্রধানের কন্যার (হেমার সঙ্গে) পরিচিত হয়ে আকাশ এই ঘনীভূত রহস্যের কিনারা করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। আসলে ওখানকার সৎ ডাক্তারবাবুই একের পর এক খুন করে আসছিলেন। মাসের প্রথমে কীর্তি ব্যাঙ্ক থেকে এক পার্টির নকল টাকা চুরি করার সুযোগ দিয়ে ডাক্তাররূপী পিতৃহত্যাকারী চন্দনকে আকাশ ধরে ফেলে। পুলিশও আসল অপরাধীকে পেয়ে গ্রেপ্তার করে। এরপর আর আকাশের সঙ্গে হেমার বিবাহের বাধা কোথায়? ইতিপূর্বে বি আর চোপড়া ও'র কানুন ও ইত্তেফাক ছবিতে কোন গান ব্যবহার করেন নি। প্রযোজক, কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার ও সম্পাদক

বিজয় আনন্দও অবাস্তবতার জন্যে এই রহস্য ছবিতে গান ব্যবহার করেন নি। বরং কাহিনী, অভিনয়ে ও সম্পাদনার মাধ্যমে ছবির রহস্যকে ঘনীভূত করার চেষ্টা করেছেন। পরিচালক প্রেম-প্রকাশও দর্শকদের একেবারে হতাশ করেন নি। অভিনয়ে আকাশের ভূমিকায় বিজয় আনন্দ, হেমার চরিত্রে লীনা চন্দ্রাভারকর। দৌলতরাম (জয়রাজ) ও কুচক্রী ডাক্তারের ভূমিকায় ত্রিলোক কপূর সুন্দর অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায়—রঞ্জন, দুলারী, দর্শন অরোরা, রঞ্জনা, ইফতিকার ও কেষ্ট মুখার্জির অভিনয় চিত্রনাট্যানুযায়ী। কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের।

ছুপ কে ছুপ কে

সকলেরই এ ছবির অভিনয় ও আঙ্গিক এবং পরিচালনা ভালো লাগবে!

পরিমল ত্রিপাঠী বোটানীর অধ্যাপক হলেও প্রেমের ব্যাপারে সে কখনও দারোয়ান হয়ে 'সুলেখা' নামে এক তরুণীর সঙ্গে প্রেম করছে আবার কখনও গাড়ীর সোফার সেজে প্রেমের অভিনয় করছে নিজের বিবাহিত পত্নীর সঙ্গে। পরিমল ও সুলেখার বিবাহে ওঁর দিদি ও জামাইবাবু উপস্থিত হতে না পারায় পরিমল ও ওঁর স্ত্রীকে 'হানিমুন' উদযাপন করবার জন্যে বম্বে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

কিন্তু পরিমল ও সুলেখা মন্ত্রণা করলো, বম্বে গিয়ে দিদি ও জামাইবাবুকে অভিনয়ের মাধ্যমে একটু শিক্ষা দিতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী পরিমল সোফারের চাকরী নিয়ে ওর জামাইবাবুর কাছে থাকবে সুলেখা পরে বোম্বে গিয়ে পরিমলের সঙ্গে মিলিত হবে। সুলেখা জামাইবাবুর কাছে গিয়ে, গোপনে গোপনে পরিমলের সঙ্গে দেখা করলেও ঘুণাক্ষরে জানতে দেয়নি ওঁরা স্বামী স্ত্রী।

লীনা চন্দ্রভারকর

শর্মিলা ঠাকুর

দিদি এবং জামাইবাবু ওদের দুজনের ঘনিষ্ঠ আচরণ দেখে সন্দেহ করায় ওঁরা দুজনেই বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। তখন পরিমল এর ভূমিকায় এলেন শ্রীমান কুমার, তিনি অতিঅভিনয়ের মাধ্যমে পরিমল সেজে এলেও ওঁর দৃষ্টি ছিল বন্ধুর বোন 'বসুধা'র উপর। অনেক ভুল বোঝাবুঝির পর জানা গেল ঠকানোর ব্যাপারে পরিমল সুলেখা, কুমার ও বসুধার মধ্যে ভাব হয়ে গেছে। ওঁরা বাড়ীর সকলকেই তাঁদের পূর্বপরিচয় জানিয়ে দিল। ওঁদের বিবাহে অর্থাৎ 'কুমার' ও 'বসুধা'র বিবাহে সকলেই খুশী হোল।

ইতিপূর্বে পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় 'গল্প হলেও সত্যি' ছবির হিন্দী সংস্করণ 'বাবুর্চি'তে যতটা না হাসিয়েছেন তার চেয়ে বেশী হাসিয়েছেন 'ছদ্মবেশী'র এই হিন্দী সংস্করণে। তবে এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ, স্থানীয় ও সর্বভারতীয় দর্শকের চিন্তাধারা।

অভিনয়ে—ধর্মেন্দ্র (পরিমল) অমিতাভ (কুমার), শর্মিলা (সুলেখা), জয়া (বসুধা) আসরানী (বন্ধু) লিলি চক্রবর্তী (বন্ধুর স্ত্রী) ওমপ্রকাশ (জামাইবাবু), ঊষাকিরণ (দিদি) ডেভিড (বড় ভাই) এবং খৃষ্টান ড্রাইভারের চরিত্রে কেষ্ট মুখার্জি সুন্দর অভিনয় করেছেন। 'ছদ্মবেশী'র বাংলা সংস্করণের অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা না করেই বলছি একথা। আঙ্গিক ও কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের। সঙ্গীত পরিচালনা এবং শচীন দেববর্মণের সুর দেওয়া গানগুলি মন্দ নয়।

—চিত্রদূত

শতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিভিন্নমুখীন প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নাট্য-রথী অমরেন্দ্রনাথ। প্রিয়দর্শন উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী অমরেন্দ্রনাথের সহজাত প্রতিভা যেমন অভিনেতা হিসাবে তাকে অনন্য করে তুলেছিল তেমনি তার অনুশীলন-স্পৃহাও জন্মগত প্রতিভাকে প্রদীপ্ত করে তুলেছিল। অমরেন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ তদানীন্তন বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের, বিভিন্ন বিদগ্ধজনের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ করে দিয়েছিল। আর পরে মাত্রায় এই সুযোগের মর্যাদা রেখেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। যখনই যাদের সংস্পর্শে এসেছেন তখনই তাদের কাছ থেকে কিছু না কিছু শিক্ষা-লাভ করেছেন। ধারাবাহিকভাবে চিত্ত-চাঞ্চল্যের জন্য শিক্ষালাভ করতে না পারলেও নাট্যজগতে প্রবেশ করার পর গভীরভাবে পড়াশুনায় লিপ্ত হন। তাছাড়া সব সময়ই সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের মিলিত কেন্দ্র করে তুলেছিলেন তাঁর থিয়েটারকে। অমর দত্তের সমস্ত গুণ-রাশিকে নষ্ট করে দিয়েছিল সুরা আর সুন্দরী। ধনীর ছেলে। ছোটবেলায় এমন কয়েকজন বন্ধুদের সংস্পর্শে আসেন যারা তাঁকে বিপথগামী করে তোলে। সুরা ও সুন্দরীর অংকে শায়িত থেকেও নাট্য-লক্ষ্মীকেই জীবনে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন। সুরা ও সুন্দরী তাঁর ব্যক্তি বা আর্থিক জীবনকে বিষিয়ে দিলেও নাট্য-জীবনকে ব্যাহত করতে পারেনি। কয়ত পূর্ণ বিকাশকে রাহুগ্রাসের মত রুদ্ধ করে রাখতো মাঝে মাঝে। গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী যোগ্য উত্তরসাধক হিসেবে নাট্য-শালার ইতিহাসে নানাদিক দিয়ে অমর দত্ত স্মরণীয়। বাংলা রঙ্গ-মঞ্চের সংস্কার সাধনে অমর দত্তের বিভিন্নমুখিন কর্মতৎপরতা ছাড়া এদেশের মাটিতে চলচ্চিত্র নির্মাণের পথিকৃৎ হিসেবে অমর দত্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন হীরালাল সেনের পাশাপাশি।

সাহিত্য-সাধনায় বাল্যবয়স থেকেই অমর দত্তের প্রতিভার উন্মেষ দেখা যায়। বাগানবাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নাট্য চর্চার সঙ্গে সুরা ও সুন্দরীর অংকে শায়িত অবস্থাতেও তিনি কাব্য-সাধনায় মগ্ন থাকতেন এবং 'জন্মভূমি' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। এই সময়ই বাংলা ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে গিরিশ-চন্দ্রকে সম্পাদক করে অমরেন্দ্রনাথ 'সৌরভ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নিজের নাম সহ-সম্পাদক, প্রকাশক ও কোষাধ্যক্ষরূপে প্রচার করেন। সৌরভের প্রথম সংখ্যায় গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ ছাড়া বিনোদিনী এবং তারাসুন্দরীর কবিতাও প্রকাশিত হয়। সৌরভের দ্বিতীয় সংখ্যাতেও এদের কবিতা প্রকাশিত হয়, তাছাড়া প্রকাশিত হয়েছিল নারায়ণী দাসীর স্বরলিপি।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটার থেকে 'রঙ্গালয়' নামে নাট্য-সম্পর্কিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময় 'রঙ্গভূমি' নামে আর একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। 'রঙ্গালয়' নিরপেক্ষ মতবাদে জনপ্রিয়তার্জন করে। অবশ্য স্বদলীয় প্রচারের প্রাধান্য কিছুটা যে না ছিল এমন নয়। তবু নাট্য-সাংবাদিকতায় রঙ্গালয় প্রথম পথ-প্রদর্শক বললেও অত্যুক্তি হবে না।

পরবর্তী কালে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে অমরেন্দ্রনাথ নাট্যশালার মুখ-পত্র হিসেবে প্রকাশ করেন 'নাট্যমন্দির' মাসিক পত্রিকা। নাট্যমন্দির বাংলার রঙ্গ-শালার অতীতকে পরম যত্নে ধরে রেখেছে। নাট্যমন্দির পত্রিকা নাট্য-গবেষকদের কাছে পরম সম্পদ। স্বগতঃ নাট্যকার মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরে এই পত্রিকার সহ সম্পাদক পদে বৃত হন। তিন বৎসর নাট্য মন্দির পরিচালনার পর অমর দত্তমশায় মণিলালবাবুকেই পত্রিকার সমস্ত দায়িত্ব প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু মণিবাবুর পক্ষেও নাট্যমন্দির বেশী দিন প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার নামে একটি প্রচার-পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্টার থিয়েটারে থাকাকালীন সময়ে প্রতি শনি ও রবিবার হ্যাণ্ডবিল প্রকাশ করা হতো। এই হ্যাণ্ড-বিল বন্ধ করে অমরেন্দ্রনাথ প্রতি সপ্তাহে 'থিয়েটার' প্রকাশ শুরু করেন। প্রথমে বিনে পয়সায় 'থিয়েটার' প্রচার করা হতো। পরে এক পয়সা মূল্য ধার্য করা হয়। শেষ পর্যন্ত ৩।৪ মাস চালাবার পর থিয়ে-টারের প্রকাশও বন্ধ করা হয়।

তিনখানি নাট্য-বিষয়ক পত্রিকা ছাড়া অমরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে, নাটক ও উপন্যাসে। অমরেন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাসের মধ্যে আদর ও অভিনেতার রূপ উল্লেখযোগ্য। গীতিনাট্য, প্রহসন, রঙ্গনাটক ও মৌলিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখ করতে হয়—উষা মানকুঞ্জ নির্মলা শ্রীকৃষ্ণ [illegible] দুটি প্রাণ থিয়েটার চাবুক গুপ্ত কথা ফটিক জল লাটগোরাঙ্গ শ্রীরাধা চোখের বালি ঘুঘু বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রণয় বা বিষ এস যুবরাজ দলিতা ফণিনী কেয়া মজাদার আশাকুহকিনী জীবনেমরণে আহামরি কিসমিস রোকশোধ বড় ভালবাসি অ[illegible] নেত্রীর রূপ প্রেমের জেপলিন নেপোলি[illegible] বোনাপার্ট প্রভৃতির। দেবী চৌধুরানী ইন্দিরা ভ্রমর সীতারাম প্রতাপাদিত্য কুন্দ কামিনী ও কাঞ্চন জীবনসন্ধ্যা কমলাকান্ত রানী ভবানী প্রভৃতির নাট্যরূপেও অমরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন।

অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন করে গবেষণার প্রয়োজন আছে এবং এ-বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তথা নাট্য-গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অমৃতবাজার পত্রিকা গিরিশচন্দ্রের যোগ্যতম উত্তরসাধক-রূপে অমরেন্দ্রনাথকে অভিহিত করে বলে-ছিলেন যে গিরিশচন্দ্র যদি বাংলা রঙ্গ-মঞ্চের জনক ছিলেন—তবে অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন তার পালিত পিতা।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

বেনারসী • সিল্ক
ভঁত • গোয়াক
রত্নদীপ
৭৩, জি.টি.রোড, সাউথ, হাওড়া
ফোন: ৬৭-৫৩২৫

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।
মেরামতেরও সুবন্দোবস্ত আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৩৫, যশোর রোড এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন: ২৪-৪৭৯৩

নাট্যমঞ্চ

রবীন্দ্র সদনে নাট্যোৎসব

গত ১৬ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র সদন আয়োজিত নাট্যোৎসব নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রসদন সৃষ্টির প্রায় প্রথম থেকেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশন করে রবীন্দ্রসদন মঞ্চ কোলকাতার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সঙ্গে ইদানিং যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ আয়োজিত নানা অনুষ্ঠান। যার মধ্যে অন্যতম হোল নাট্যোৎসব।

সর্বশেষ নাট্যোৎসবের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে মোট আটটি নাটক পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন দিন বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী এতে অংশ গ্রহণ করেন।

নাট্যোৎসবের সূচনা হয় থিয়েটার জুভেনিস প্রযোজিত রণযাত্রা নাটকটি দিয়ে (সকালে)। নাটকের বিষয়-বস্তু এবং পরিবেশনে একটা স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করা গেছে। এতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রদীপ শ্যামল ও সঞ্চিতা। দ্বিতীয় দিন পি এল টির 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটক দুটি উপহার দেন দর্শককে। এতে বিভিন্ন ভূমিকায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেন সত্য ব্যানার্জী সমীর মজুমদার শোভা সেন ও উৎপল দত্ত। উভয় নাটকই দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। উৎসবের তৃতীয় দিনের নাটক ছিল অভিনেতৃ সংঘের বিদেহী। অভিনেতৃ সংঘ ইতিপূর্বে এই নাটক পরিবেশন করে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন। অতএব এদের নাটক সম্বন্ধে নতুন করে কোন মন্তব্য প্রকাশের অবকাশই নেই। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র সুলতা ও নীলিমা।

চতুর্থ দিন প্রতীক নাট্যগোষ্ঠী উপহার দিলেন এককালের মঞ্চে আলোড়নসৃষ্টিকারী নাটক 'শ্যামলী'। যার সঙ্গে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রায় রূপকথার মত জড়িয়ে দর্শকদের মুখে মুখে ফিরত একদিন। রবীন্দ্রসদনেও সেই সাবিত্রী দেবীই মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকালিপিতে সর্বেন্দ্র, দীপিকা সরযূবালা ইত্যাদি।

নাট্যোৎসবের পঞ্চম নাটক শেখর চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ও অভিনীত 'জন্মভূমি'। এই নাটকটি পরিবেশন করে থিয়েটার ইউনিট একদা বেশ একটা সাড়া ফেলেছিলেন নাট্যজগতে। এ নাটকে শেখরবাবুর অভিনয় মুগ্ধ হয়ে বসে দেখতে হয়। সাধনা রায়চৌধুরীর অভিনয়ের অবকাশ কম থাকলেও তিনি নাটককে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত সহায়তা করেছেন। এ নাটকে সম্মিলিত অভিনয় অর্থাৎ টিমওয়ার্ক দেখবার মত।

এই উৎসবের একমাত্র অন্য ভাষার নাটক হোল অনামিকা প্রযোজিত 'বড়ি বুয়াজী'। মূলত প্রহসন নাটক। বাংলা হালকা কমেডি নাটকের ছোঁয়া এর সর্বত্র। গল্পটা পুরনো মেজাজের হলেও আশ্চর্য হয়ে এদের অভিনয় দেখতে হয়। এত সহজ এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা নাটক সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষ করে এর নায়িকা এবং বড়ি বুয়াজীর ভূমিকাভিনেত্রীর অভিনয় অনবদ্য বললেও অত্যুক্ত হয় না। অথচ নাম দেখে বোঝা যায় (বকুল ঘোষ ও মমতা চৌধুরী) এঁরা বাঙালী।

এই প্রসঙ্গে একটি নিবেদন আছে রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষের কাছে। ভবিষ্যতে আবার যখন নাট্যোৎসবের ব্যবস্থা করবেন তখন যেন বাংলা হিন্দী ছাড়াও অন্যান্য ভাষাভাষীর নাটককে তাঁরা অনুষ্ঠানভুক্ত করেন। তাতে উৎসবের বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য বাড়বে বৈ কমবে না। আশা করি তেমন নাটকের দল কোলকাতায় আছেও। না থাকলেও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বাছাই করা দলকেও তাঁরা আমন্ত্রণ করে আনতে পারেন। তাতে একাধারে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং ভাববিনিময়ের একটা সেতুবন্ধন ঘটবে।

অনুষ্ঠানের ষষ্ঠ নাটক থিয়েটার সেণ্টারের সেদিন দুজনে। দেবরাজ রায় ও অনসূয়া ঘোষের অভিনয় সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল নাটক বলে মনে হয়েছে।

উৎসবের শেষ দিন অভিনীত হয় কবচ কুণ্ডল প্রযোজিত ও বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'আজ বসন্ত' নাটক।

বিজন ভট্টাচার্যর প্রত্যেকটি নাটকে সর্বদাই একটা নতুন স্বাদ এবং ভাববার মত বস্তু পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি তাঁর নাটকে সব সময়ই নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। এ নাটকেও তার ব্যতিক্রম নেই।

'আজ বসন্ত' নাটকে মোট চারটি চরিত্র। দুজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ এবং দুটি আজকের যুগের যন্ত্রণাদগ্ধ যুবক যুবতী। যাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যত। যাদের কাছে ঘর বাঁধা বা বেঁচে থাকার স্বপ্ন নির্মম বিলাস মাত্র। একটি পার্কের একটা বেঞ্চ ও তার পারিপার্শ্বিককে কেন্দ্র করে নাটকের ঘটনা বিস্তার।

শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে মেয়েটি যখন আত্মহত্যা করতে যায় তখনই নাটক ক্লাইমেকসে পৌঁছয়। দুটি অহেতুক কৌতূহলী বৃদ্ধের (তার মধ্যে একজন জজ) সেই মুহূর্তের অভিনয় (যা অপত্য স্নেহ ও সহৃদয়তায় সিক্ত) অবিস্মরণীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিজন ভট্টাচার্য স্বয়ং ও বিভূতি মুখার্জি (?)। অবশ্য আগাগোড়াই এই দুই বৃদ্ধের অভিনয় বিস্ময়কর। সেই অনুপাতে নায়ক কিছুটা নাটকীয় এবং ক্লান্তিকর। তবে নায়িকা (মঞ্জুশ্রী) ভাল।

রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে এমন উৎসবের ব্যবস্থা করবেন আশা রাখি।

মৌচোর নাটকের দৃশ্য

আরক্ষা বিভাগের অভিনয়

পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা আরক্ষার চার শাখা। বিশেষ শাখা ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্মীদের সম্মিলিত উদ্যোগে ২৫ মার্চ শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে সলিল সেনের 'মৌ-চোর' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। নির্দেশনায় ছিলেন চিত্ত দে ও ননী হালদার। আলোকসম্পাতে মুক্তাঙ্গনের দিলীপ মিত্র। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন—চিত্ত দে (বংশীবদন) বাদল চ্যাটার্জি (ধর্মদাস), সনাতন (ননী হালদার) সরোজ ঘোষ (রতন) দেবাশিস ব্যানার্জি (গোরাচাঁদ), ক্ষেত্র মিত্র (কবিরাজ), জগদীশ্বর রায়চৌধুরী (নিতাই বৈরাগী), কান্তি ব্যানার্জি (জলিল), দিবাকর ব্যানার্জি (ফকির) সমীর ঘোষ (চাপরাশী ও দারোগা), সুদর্শন সিংহ (কনস্টেবল) স্বপন চক্রবর্তী (ফড়িং), সবিতা রাহা (ময়না) রাণী ব্যানার্জি (এলোকেশী) ও নমিতা বসু (নকাইর মা)। নাটকের প্রতিটি চরিত্রই শিল্পীদের সাবলীল ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। দলগত অভিনয়নৈপুণ্য ছিল শিল্পীদের আর একটি বিশেষত্ব। উপস্থিত দর্শকগণ নাটকটির অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মনোরঞ্জন বর্ধন অনিল সেনগুপ্ত প্রশান্তকুমার মিত্র এবং সুহাসরঞ্জন দত্তচৌধুরী।

—নাট্যসমালোচক

স্বদেশী ছবি

পূর্ব জার্মান চলচ্চিত্র উৎসব

লেখার শুরুতেই যে কথাটা বলে রাখা ভালো সেটা হোল সাধারণ দর্শকের মত আমরাও বর্তমান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রায় ছবি দেখেই নিরাশ হয়েছি।

তবে একথা ঠিক যে পশ্চিম জার্মাণীর ছবিতে যে বিশেষ এক স্বাদ পাওয়া যায় পূর্ব জার্মানীর ছবিতে তা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। যার জন্য এক জাতের দর্শক পূর্ব জার্মানীর ছবির চেয়ে পশ্চিম জার্মানীর ছবির দিকে অনিবার্যভাবেই ঝুঁকে থাকে।

পূর্ব জার্মানীর ছবির মধ্যে এবার যুদ্ধের পটভূমিকায় তোলা ছবি নেই। তবে বিদ্রোহের ছবি স্বাধিকার রক্ষার ছবি আছে। যেমন 'হোয়াইট উলভস'।

এ উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি আমার মতে 'দি ম্যান হু রিফ্লেসড গ্রাণ্ডফাদার'। আপাতে অত্যন্ত উপভোগ্য হাসির ছবি হলেও এ ছবি দর্শককে সচেতনও করে দেয় এমন একটি বিষয় সম্পর্কে যা পৃথিবীর সব দেশেই সর্বকালের জন্য সত্য। আমাদের দেশেও মা ঠাকুমা কি দিদিমাদের এই কিছুকাল আগেও একান্নবর্তী পরিবারে সে গুরুত্ব এবং আধিপত্য ছিল, যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন আমাদের সংসার ভেঙে যাচ্ছে অথবা তাদের হাত থেকে হাল কেড়ে নেওয়ায় যে অগোছাল ভাবের সৃষ্টি হচ্ছে সংসারে যেটা এই ছবি দেখে মনে হোল সব দেশেই সত্য। একটি বৃহৎ পরিবারে একজন অক্ষম অভিভাবকের যে কি ভূমিকা এবং প্রয়োজন বর্তমান ছবি হাসির মাধ্যমে তা নতুন করে যেন দর্শককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

পূর্ব জার্মান ছবির উৎসবের অধিকাংশ ছবিতে পরিণত এবং যুক্তিগ্রাহ্য ছবির গল্পের অভাব অনুভব করা গেছে। সেদিক থেকে এ ছবি অবশ্যই ব্যতিক্রম। এবং এ গল্পের আবেদন বা বক্তব্য এ দেশেও সত্য। বন্ধ্যা এবং একজাতীয় নর-নারীর কুৎসা রটনার প্রবণতা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল আমরা যেন নিজেদের চরিত্রেরই প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি পর্দায়।

তার ওপর অনবদ্য এবং উপভোগ্য অভিনয় ছবিটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। পরিচালক রোল্যাণ্ড কোহমে।

দ্বিতীয় উপভোগ্য ছবি 'মাই ডিয়ার রবিনসন'। স্বল্পবয়স্ক এক দম্পতির (নায়কের বয়স ১৯, নায়িকার ১৮) ভালোবাসা ও সমস্যার গল্প। উভয়েই উভয়কে দারুণ ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার ফলস্বরূপ তাদের সংসারে একটি সন্তানও এলো। কিন্তু পিতা হয়েও ছেলেটি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। কোন দায়িত্ব তার ওপর চাপাবার চেষ্টা হলেই সে তার শিশুসুলভ স্বভাব দিয়ে তা এড়িয়ে যায়। তাকে যেন কোন কিছুই সিরিয়স করে তুলতে পারে না। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই সে তার স্বাধীনতাকে তার খেয়ালখুশীকে অন্যের হাতে তুলে দিতে রাজী নয়। বস্তুত সে প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তার মনুষ্যকতায় দায়িত্ববোধ দানা বাঁধেনি। এর জন্য তার স্বল্পবয়সও হয়তো দায়ী। তবু একসময় সেই সমস্যার অধিকে গিয়ে তারা আবার সুখী দম্পতিতে রূপান্তরিত হয়। নায়ক ছেলেটির নির্বিকার অভিনয় দর্শককে বিস্মিত করেছে। ছবিটির পরিচালক রোল্যাণ্ড গ্রাফ।

'হাউ টু নার্স এ ডাণ্কি' ছবিটিও মোটামুটি হালকা মেজাজের এবং উপভোগ্যও বলা যেতে পারে। একজন ট্রাক ড্রাইভারের গল্প। বুলগেরিয়ায় ট্রাক নিয়ে যাওয়ার পথে মাঝ রাস্তায় এক দুর্ঘটনায় তার সহকর্মী ছোট্ট মাউথ অর্গান গিলে ফেলে বিপত্তি ঘটানোয় তাকে সেখানকার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে তাকে সঙ্গী হিসেবে নিতে হয় একটি মেয়ে ট্রাক ড্রাইভারকে (ওদেশে মেয়েরাও যে পুরুষের চেয়ে শ্রমসাধ্য কাজে বিমুখ নয়, এটা তার থেকেই প্রমাণিত করা হয়েছে।) ক্রমে সেই মেয়েটির সঙ্গেই প্রেম এবং তার পরিণতি এই ছবির উপজীব্য। ফেরার পথে একটি গাধার ভূমিকা ছবিটিকে মোটামুটি উপভোগ্য করে তুলেছে। পরিচালক রোল্যাণ্ড ওহমে।

এই উৎসবের দ্বিতীয় ভালো ছবি বলে চিহ্নিত করা যায় 'রাইপ চেরিজ' ছবিটিকে।

এ ছবির নায়ক প্রৌঢ় বয়সেও কর্মক্ষম এবং কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন। জনজীবনের কল্যাণকার্যে দেশের উত্তরাঞ্চলে একটি নিউক্লিয়ার প্ল্যাণ্ট তৈরী করার মূলত দায়িত্ব তারই। তার সন্তানরা তখন সবাই সাবালক। সেই সময়েই দীর্ঘকাল পর তার স্ত্রীর গর্ভে এক সন্তান এল। প্রথমটা তারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ল জীবনের এই অপরাহ্ণ বেলায় পিতামাতা হতে যাচ্ছে বলে। তবু তারা শেষ পর্যন্ত ঠিক করল যে আসছে তাকে আসতে দেওয়াই উচিত। যথাসময়ে তাদের একটি সন্তানও ভূমিষ্ঠ হোল। প্রৌঢ় নায়ক তখন কর্মস্থলে। খবর পেয়ে সে সন্তান এবং তার মাকে একদিন দেখেও এলো। স্ত্রীকে সেদিন যেন সে আরো নতুন করে ভালবাসল।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সন্তান নিয়ে ঘরে ফেরার মুখে তার স্ত্রী এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেল কিন্তু সন্তানটি আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল।

খবরটা পেয়ে প্রৌঢ় নায়ক যেন স্ত্রীর শোকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেল। স্ত্রীকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত তার কর্তব্যজ্ঞানই তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনল। সে তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার কাজে ব্রতী হোল। এ ছবিটি পরিচালনা করেছেন হোরসট সীমান।

সীমান্ত পেরিয়ে পূর্ব জার্মাণীতে আরবান নামক এক ইঞ্জিনিয়ার কমরেডকে খুঁজতে এসে সেই দেশের কর্মকাণ্ড দেখে দুই ভাইয়ের মনে কিভাবে কাজের প্রেরণা এলো এবং কি করে ক্রমে ক্রমে তারা পরিশ্রমী কাজে স্বেচ্ছায় নিজেদের নিয়োজিত করল (সে দেশে সুস্থ সক্ষম লোকের জন্য কাজের অভাব হয় না এবং কোন কাজকেই তারা ছোট বলে মনে করে

...বয়ং চেষ্টা গঠনে অংশগ্রহণ করছি এটাই ...ন করছি—এই কথাটাই ছবিতে বলা ...রছে) তাই 'ডু ইউ নো আরবান'এর ...খ্যানভাগ। ছবিটি মাঝে মাঝে মনকে ...কর্ষণ করলেও দীর্ঘ সময়ের ছবি বলে ...র মনে হয়েছে। দীর্ঘত্বের দিকে ...ক অবশ্য প্রত্যেকটি ছবিরই। তবু সেই ...ক থেকে প্রথম বোধহয় 'হোয়াইট ...লভস'। ('ডু ইউ নো আরবান' ছবিটির ...রচালক ইনগ্রিড রেসচকে।) ছবিটির মূল ...তিপাদ্য স্বাধীনতা স্পৃহা ও আমেরিকার ...ষণ নীতি। ঘটনাকাল ১৮৭৯ সালের ...র পরই। যখন গৃহবিবাদে এবং আমেরিকান ...র সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে দেশের পশ্চিমা-...লের রেড ইণ্ডিয়ানরা বিভ্রান্ত এবং ...তিরোধস্পৃহায় মরিয়া। ছবি শুরু ...য়েছিল গুরুগম্ভীর মেজাজেই। কিন্তু ...ল পরেই সে ছবির রূপান্তর ঘটে ...শ্চর্য শিকচারে। শেষ পর্যন্ত শত্রু নিধন ...আত্মবিসর্জন দিয়ে ছবি শেষ হয়।

অবশ্য ধ্বসে দেখতে মন্দ লাগে না। এ ...ছটি সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা ...করলে দর্শক আকর্ষণ করবে নিশ্চিত।

কিন্তু উপরিউক্ত ছবিগুলির সব কটিই ...ব উৎসবে প্রদর্শনের যোগ্য এ কথা মেনে ...নতে কষ্ট হয়। কারণ এর চেয়েও উন্নত ...মানের এবং বলিষ্ঠ বক্তব্যে চিহ্নিত পূর্ব ...জার্মানীর ছবি আমরা এই কোলকাতায় ...সেই দেখেছি ইতিপূর্বে।

কিন্তু যা আমাদের অবাক করেছে তা ...হল এইসব ছবিতে ক্যামেরার কাজ এবং ...সঙ্গীতের ব্যবহার। ক্যামেরা এক এক সময় ...অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষিপ্র এবং বিস্ময়কর।

আর আমাদের বিস্মিত করেছে শর্ট-...গুলি। (সিগভোলে নাতুর ওয়াটারবার্গ ...ইন স্পোর্ট, উইন্টার এম মীর ...স্পোর্ট ও ড্রেসডনের ক্লৎজোর) যা এক ...পূর্ব জার্মানীর চলচ্চিত্র শিল্পের ...এবং গৌরব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মোট ছটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এবং ছটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয় বর্তমান উৎসবে।

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রক এবং পূর্ব জার্মানের স্থানীয় দূতাবাসের যুক্ত উদ্যোগে এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

•

বোম্বাই এবং মাদ্রাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টির পর ভিন্ন স্বাদের ওয়েস্টার্ন ছবি 'গ্রিংগো' বর্তমানে কলকাতার লাইটহাউসের আকর্ষণ। ...লিটের বর্তমান আকর্ষণ ব্লেক ...এডওয়ার্ডের চিরনতুন ছবি 'দি গ্রেট গেস'।

শাঃ রঃ চ

বিশ্ব সংবাদ

মহারাষ্ট্রের নাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র

সম্প্রতি বোম্বাইর রঙ্গ ভবনে অনুষ্ঠিত ১৪শ মহারাষ্ট্র রাজ্য নাট্যোৎসবের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে প্রখ্যাত অভিনেতা-প্রযোজক শ্রীশম্ভু মিত্র ভাষণদান প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র ও বাংলার মধ্যে নাট্য ভাবনার মিল উল্লেখ করে বলেন দুই রাজ্যের নাট্য আন্দোলনে একটি গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘ তিন দশক পূর্বে মহারাষ্ট্রে নাটক পরিবেশন ও আন্দোলনের যে রূপ ছিল আজ তার সঙ্গে কোনই মিল নেই। তখন তার গণ্ডী ছিল সীমাবদ্ধ; আর আজ মহারাষ্ট্রের সুদূরতম প্রান্তরেও নাট্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। এর থেকেই প্রমাণিত যে মহারাষ্ট্র আজ নাটক সম্পর্কে কতটা আগ্রহী এবং সচেতন।

তিনি একালের নাট্যকার ও শিল্পী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডাঃ শ্রীরাম লগুর কথা উল্লেখ করে বলেন, এই অভিনেতাকে পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

শ্রীমিত্র নাটকের উন্নতি বিধান ও নাট্য-দল ইত্যাদিকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যথাসাধ্য সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য অনুরোধ জানান। পঃ বঙ্গ সরকারের এই বিষয়ের ভূমিকা এবং সচেতনতার কথাও তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে রাজ্য সরকার এই বিষয়ে বিশেষ-ভাবে আগ্রহী এবং সক্রিয় না হলে কোন ভাষার নাট্য আন্দোলনই সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠতে পারে না।

গোর্কি সদনে রবিশঙ্করের জন্মোৎসব পালিত

গত ৭ এপ্রিল গোর্কী সদনে এক আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত সেতারী পণ্ডিত রবিশঙ্করের ৫৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হোল। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিল 'রাগিনী' সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় শ্রীমতী তানিয়া মোরোজোভার গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে।

প্রধান অতিথি শ্রীহীরু গাঙ্গুলী, সোভিয়েট ভাইস কনসাল মিঃ ওয়াই এম মোরোজোভ ডাঃ অরুণ ভট্টাচার্য, শ্রীতরুণ ঘোষ এবং সভাপতি শ্রীঘোষ সঙ্গীতজগতে এবং বহির্ভারতে শ্রীরবিশঙ্করের দান ও খ্যাতি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

অনুষ্ঠানে সেতার বাজিয়ে শোনান কুমারী বীণা চক্রবর্তী এবং কত্থক নাচ পরিবেশন করে কুমারী মায়া চট্টোপাধ্যায় শ্রোতা ও দর্শকদের আনন্দ দেন।

নাট্যকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা

কলকাতার মঞ্চে রবীন্দ্রভারতী অনুমোদিত সংস্থাগুলিসহ সকল নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে পৌরকর প্রদর্শনী পিছু নিম্নতম ৫০ টাকা ও উর্ধ্বপক্ষে ১০০ টাকার অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের ফলে নাট্যসংস্থা-গুলির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

এই অযৌক্তিক কর বৃদ্ধির প্রতিরোধে নাট্যকর্মীরা দৃঢ়সঙ্কল্প। 'অভিনয়' পত্রিকার আহ্বানে আগামী ২৯শে এপ্রিল, সোমবার বেলা সাড়ে পাঁচটায় স্টুডেন্টস হলে নাট্য-কর্মীরা মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

নেতাজী মঞ্চ (নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট)
(শিয়ালদহের উত্তরে কাইজার স্ট্রীটে প্যারামাউন্ট সিনেমার সামনে)
প্রতি বৃহঃ ৬॥টা শনি, রবি : ৩টা ৬॥টা
সমরেশ বসুর
বিবর
পরিচালনা—রাজু ঘোষ
অসিতবরণ, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, জয়শ্রী রায়, চিন্ময় রায় হারাধন ব্যানার্জী, প্রমোদ গাঙ্গুলী, গীতা দে, ছন্দা দেবী রত্না ঘোষাল, সুব্রত সেন এবং গৌরীশঙ্কর ও রবি ঘোষ।
নাটক : সমর মুখার্জী
আলো : কার্তিক সেন, মঞ্চ : শৈলেন দে
সঙ্গীত : আনন্দশঙ্কর
শোর ৬ দিন আগে থেকে বুকিং

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম----১৪'০০
২। গুল বুলবুলিচা----৩'৫০, ৩। কাব্য আমপারা--৪'০০
৪। পূবের হাওয়া----২'০০, ৫। ঘুমপাড়ানি মাসীপিসি--২'০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫-০৬৩৩ কলিকাতা-৯

উলেখ

মণিপুর নর্তনালয়ের সাহায্যার্থে জাভেরী সিস্টারস

একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে মণিপুরে নর্তনালয়ের সাহায্যার্থে জাভেরী ভগ্নী সম্প্রদায়ের নৃত্য এর আগে এই স্তম্ভে আলোচিত হয়েছে। ঐ একই অনুষ্ঠান আবার রবীন্দ্র সদন মঞ্চে দেখা গেলো। বালিকা ও শিশুশিল্পীদের অভিনয় ও নৃত্য এইদিন উপভোগ্যতার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। এ'রা হলেন—ব্রততী মুখার্জি শাশ্বতী রায়-চৌধুরী, গৌরী দত্ত দীপা সেনগুপ্ত প্রীতি প্যাটেল অণুরিতা মুখার্জি, মিত্রা মিত্র, শর্মিলা গাঙ্গুলী সুপ্রিয়া চ্যাটার্জি লক্ষ্মীপ্রিয়া রায় ঝুমি দাস, অমিতা দাস মালিকা গাঙ্গুলী, রিতা দাসগুপ্ত ভুলু দত্ত ঈশানী ঘোষ, সুস্মিতা রায় স্বর্ণালী চক্রবর্তী, নন্দিনী গাঙ্গুলী ললিতা গাঙ্গুলী সেদিনী রায়, অন্তরা সেন ঊষা রাক্কা, সুকন্যা চৌধুরী সোমাজিতা ব্যানার্জি সোনি চৌধুরী, নন্দনা সেন ঈশ্বরী চন্দ্রশেকরন, রিনা রায় রাখী সেথ অজন্তা সরকার অরুন্ধতী সরকার প্রিয়দর্শিনী রায়।

নৃত্যমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নৃত্যম এক পারিবারিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য কাজের মধ্যেও নাচ, গান ও অভিনয়ের একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে নিয়মিতভাবে কোলকাতার বিশিষ্ট মঞ্চে উপভোগ্য নৃত্যনাট্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে এ'রা রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সম্প্রতি বিদ্যাসুন্দর মঞ্চে নিবেদিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎসব এ'দের খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন প্রীতি চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য ও সঙ্গীত নির্দেশনায় যথাক্রমে পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়। নৃত্যনাট্য রূপায়ণের কৃতিত্ব সুনন্দা মুখোপাধ্যায়ের।

প্রথম পর্যায়ে ছিলো নৃত্যমের শিশু ছাত্রীদের ঋতুনাট্য—বসন্ত। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন সোমা রায় পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রিংকি সেনগুপ্ত বিমলি সেনগুপ্ত এবং বিশেষ উল্লেখের দাবীদার ঊষশী মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে ভানুসিংহের পদাবলী অবলম্বিত রাধা নৃত্যনাট্যে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী পূর্ণিমার নৃত্য অভিনয়ে শ্রীমতীর প্রেমবিহ্বলতা ও বিরহকাতরতার প্রকাশ চিত্তস্পর্শী। কৃষ্ণরূপী সুনন্দা মুখোপাধ্যায়ের চপল চরণের নৃত্য এ অধ্যায়কে সু-সম্পূর্ণ করেছে।

রাধার অভিসার ও বিরহের গানগুলি সুন্দর গেয়েছেন অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে আসে 'হৃদয়ক সাধ গানটির কথা।

সারারাত্রব্যাপী গানের আসর

প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে হরলাল এথলেটিক ক্লাব গত সপ্তাহে বাগবাজারে সারারাত্রব্যাপী এক সঙ্গীত উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এ সভায় উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়েছেন শ্রীমতী ইরাণী বিশ্বাস। এবং আবৃত্তি দিয়ে সূচনাপর্ব সম্পূর্ণ করেন আর এক বালিকা শিল্পী ইলোরা সাহা।

রবীন্দ্রসদনে মণিপুরী নর্তনালয়ের অনুষ্ঠানে অন্তরা সেন ও নন্দনা সেন

জনপ্রিয় তরুণ শিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্য তাঁর গানের পালা শুরু করেন একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। এর পর একাদিক্রমে গাওয়া তাঁর ১০ খানি হিট সংএর প্রত্যেকটি শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত করতালি আদায় করে নিয়েছে। কন্ঠমাধুর্য উচ্চারণের স্পষ্টতা প্রাণবন্ত পরিবেশন। সব মিলিয়ে পিন্টু ভট্টাচার্যকে পাওয়া গেলো তাঁর পূর্ণস্বরূপে।

বাংলার চার্লি চ্যাপলিন জহর রায়ের বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক পরিবেশনা সারা আসরকে সরগরম করে তোলে। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগ, উচ্ছলতা ও সুখ-সমৃদ্ধ গীতিগুচ্ছের প্রত্যেকটি আপনাপন স্বাতন্ত্র্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো।

হিমাংশু বিশ্বাস ক্লাসিক্যালধর্মী শিল্পী হলেও তাঁর সঙ্গীতমানসের আর একটি দিক প্রতিফলিত হোলো অর্কেস্ট্রা ও চিত্রগীতি দিয়ে আসর জমানোর দক্ষতায়।

ইন্দ্র বসু অনেক গান স্বভক্তিগতে গেয়েছেন। কিন্তু আবেদনে সরস হয়েছিলো 'আমি সঙ্গীত শিল্পী'।

তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর উজ্জ্বল তারকা হৈমন্তী শুক্লা অনেক রকমের গানে তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার কথা আর একবার মনে করিয়ে দিলেন।

পপ গানে অমৃত সিং ও কৌতুক-গীতিতে মিন্টু দাসগুপ্ত আসরকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছেন।

চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৯/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ॥ মূল্য ৬৫ পয়

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

১৬৮২ (বাং)

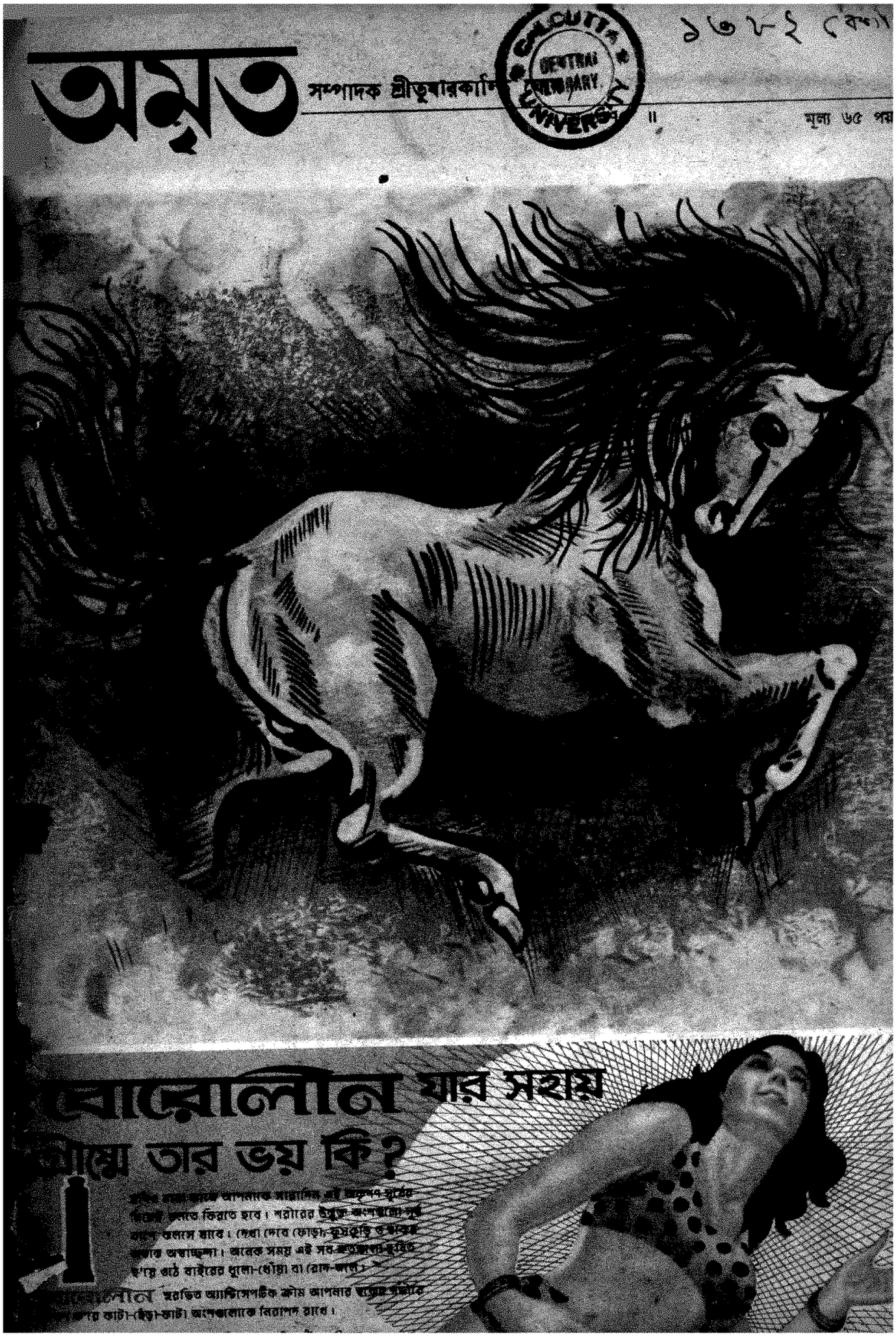

শুধুই কেশ তৈল নয় একটি কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকীই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্কতা রোধ ক'রে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্ম্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৪

SA-2/69

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সদ্য-প্রকাশিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রস-মধুর উপন্যাস

চাঁদের কাছাকাছি ৭৲

এই লেখকের আর একখানি প্রণয়-মধুর উপন্যাস

আর এক সাজ ৬৲

কল্‌হনের সদ্য-প্রকাশিত নতুন উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ৭৲

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাম্প্রতিক উপন্যাস

স্বাতী ও দীপু ১০৲

শক্তিপদ রাজগুরুর নতুন উপন্যাস

অভয়ারণ্য ১২৲

গৌড়জন বধূ ১২৲

নয়াবসত (অমানুষ নামে ছায়াচিত্রে রূপায়িত) **৬৲**

সুভাষ সমাজদারের সার্থক সৃষ্টি

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮৲

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮৲

চিরঞ্জীব সেনের রহস্যোপন্যাস

মিরানজিয়া রহস্য ১০৲

নারায়ণ সান্যালের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০৲

শঙ্কু মহারাজ-এর সার্থকতম ভ্রমণ-কাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে তিন পর্বে সম্পূর্ণ

ব্রজপর্ব ১০৲ * বনপর্ব ১০৲ * মহাবনপর্ব ১২৲

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভালো বেসেছিলাম ৮৲

নিগূঢ়ানন্দের উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮৲

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপন্যাস

যুগস্বাক্ষর ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আকাশের আয়না ১০৲

নিখিলচন্দ্র সরকারের

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০৲

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্ণশিরি ২০৲

শ্রীহংস-এর উপন্যাস

লাস্ট ওয়ার্ড ৮৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২৲

শৈলেশ দে'র

আমি সুভাষ বলছি

(তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)

মূল্য : প্রতি খণ্ড কুড়ি টাকা

"আমি সুভাষ বলছি" বইটির প্রতি খণ্ডের মূল্য সম্পূর্ণ অগ্রিম পাঠালে রেজিঃ ডাকে বই পাঠানো হয়। ডাকমাশুল আমরা বহন করব।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

"সে হবে দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ আর তার থাকবে দৃঢ় ঝকঝকে দাঁত"

"কারণ আমি নিয়মিত ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ খাচ্ছি"

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আপনার অন্তঃস্থ সন্তানের দাঁত এবং হাড়ের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ক্যালসিয়ামের। সহজ ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ-এর দ্বারা কেবল আপনি আপনার ভাবী সন্তানের সেই চাহিদা মেটাতে পারেন।

প্রতিদিন তিন চারবার ৩-৪টি সুস্বাদু রাজবেরির স্বাদগন্ধবিশিষ্ট ও ভাইটামিন সি, ডি, বি১২ যুক্ত ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ বড়ি চিবিয়ে খান। তার ফলে আপনার সন্তানের দাঁত হয়ে উঠবে সবল এবং হবে মজবুত হাড়। আর আপনিও ক্যালসিয়ামের অভাবের দরুণ ক্লেশকর পায়ের খেঁচুনিতে বা মাংস পেশীর ব্যথায় ভুগবেন না।

সারা বিশ্বে বিশুদ্ধ ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে অগ্রদূত স্যাণ্ডোজ-এর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখুন।

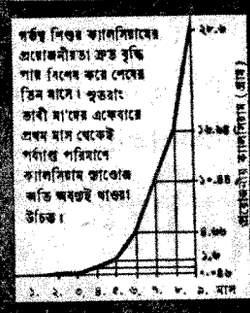

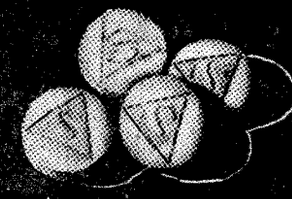

SANDOZ

ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ
প্রতিদিন প্রত্যেকের জন্যে

১৪ বর্ষ

অমৃত

৫১ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার্স সোসাইটির সদস্য"

Fdiday, 2nd May, 1975 শুক্রবার—১৮ বৈশাখ, ১৩৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	চিঠি	(গল্প)	শ্রীশৈলেন রায়
১০	এই বাংলার বন্দর		শ্রীদেব দত্ত
১২	পঞ্চমুখি		শ্রীচাণক্য
১৩	দেশেবিদেশে		শ্রীপুণ্ডরীক
১৫	বিজ্ঞান	(কবিতা)	শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়
১৫	মানুষের করুণায়	(কবিতা)	শ্রীপ্রণব মাইতি
১৫	অবিশ্বাস্য	(কবিতা)	শ্রীশান্তি সিংহ
১৬	সূর্যের আগুন		শ্রীসন্ধ্যা সেন
২০	নির্জন খেলা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক
চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল
হোমিও বই

মূল বিক্রয়কেন্দ্র — আমাদের কলিকাতার চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ও হেড অফিস।

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ঃ ১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫ এবং ৫৩ গ্রে স্ট্রীট, কলি-৬

হেড অফিস ঃ ৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করিবেন

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়া মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকুমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়া মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম সুখাদ্যের তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন ঃ

ডাটা রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকুমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার ব্যয় দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। সেখানে সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৯

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর হইতে সদ্য প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদক : অশোক মিত্র

এই খণ্ডে আছে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার নানা পূজা-পার্বণ ও মেলার বিস্তারিত বিবরণ। গ্রামবাংলা এবং এর উৎসবাদির বিচিত্র ইতিহাস ও সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থটিতে।

৪টি মানচিত্র, ৫৫টি বিভিন্ন দেবালয়, মূর্তি ও মেলার ছবিসম্বলিত ৫২৬ পৃষ্ঠার ডিমাই কোয়ার্টার সাইজের এই বৃহৎ গ্রন্থটির মূল্য মাত্র ১০-৫০ পয়সা।

এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে আছে মালদহ, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বিবরণ। মূল্য ৯-৫০ পয়সা।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে মুর্শিদাবাদ নদীয়া, হাওড়া ও হুগলী জেলার বিবরণ। মূল্য মাত্র ১৪-৫০ পয়সা।

তৃতীয় খণ্ডে আছে চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার বিবরণ। মূল্য মাত্র ১০-৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস অফিস, ২০ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট কলিকাতা-১
(২) গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া বুক ডিপো, ৪ হেস্টিং স্ট্রীট, কলিকাতা।
(৩) ভারত সরকারের পাবলিকেশন্স ব্রাঞ্চ, সিভিল লাইনস্, দিল্লী-১১০০০৬ এবং অনুমোদিত পুস্তক বিক্রেতা

ডিএভিপি—৭৫।৪২

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

৬ মে থেকে ২০ মে

সুলভ মূল্যে—শতকরা ১২½ টাকা বাদ দিয়ে—রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থ এবং বিশ্বভারতী প্রকাশিত অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। কবিপক্ষে সকলেই যাতে রবীন্দ্রনাথের দু-একখানা গ্রন্থ সুলভে কেনবার সুযোগ পান, তার জন্য এই উদ্যোগ। যে-কোনো পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুযোগ পাবেন।

এজন্য পুস্তক-বিক্রেতাগণ ২ মে থেকে অতিরিক্ত কমিশন পাবেন এবং এই কয়টি কেন্দ্রে পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার । কলিকাতা ১২

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ বিধান সরণী । কলিকাতা ৬

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯

জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো । কলিকাতা ৯

বিশ্বভারতী শিল্পসদন
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

দামোদর পুস্তকালয়
২৪ বিজয়চাঁদ রোড
বর্ধমান

ভারতী ভবন
গোবিন্দ মিত্র রোড
পাটনা ৪

চিঠিপত্র, অগ্রিম ও মফস্বল থেকে অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট । কলিকাতা ১৬ ॥ ফোন ৪৪-৯৮৬৮-৬৯

মফস্বলের ক্রেতাগণ অনুগ্রহপূর্বক মোট পুস্তকমূল্যের ২৫% অগ্রিম পাঠাবেন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
২৭	রোজনামচা	ফাদার দ্যাতিয়েন
২৯	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	শ্রীউপগুপ্ত
৩১	গোয়েন্দা ধাঁধা	শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
৩৩	সেই জয় জানুদ (উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু
৩৫	চিঠিপত্র	
৩৭	শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে	শ্রীদিলীপকুমার রায়
৩৯	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীঅয়স্কান্ত
৪২	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৩	রূপসীর খাতা	শ্রীবরবর্ণিনী
৪৪	রান্না করে দেখুন	শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৪৫	শেষ বিচার (উপন্যাস)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
৪৭	কাগজের ফুল (গল্প)	শ্রীগৌতম ভট্টাচার্য
৫০	খেলার কথা	শ্রীঅজয় বসু
৫২	খেলাধুলা	শ্রীদর্শক
৫৩	মাঠের নায়ক	শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৪	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅমর
৫৬	দেশবিদেশের খেলা	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৫৮	সিনেমাটিক টক্স	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৯	গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান	
৬০	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মল ধর
৬৩	প্রেক্ষাগৃহ	শ্রীচিত্রদূত
৬৪	ফ্লোর থেকে বলছি	শ্রীমুসাফির
৬৭	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৬৮	বিদেশী ছবি	শ্রীশা-র-চ
৬৯	নাটমঞ্চ	শ্রীনাট্য সমালোচক
৭০	বোম্বাই ফিল্মের কড়চা	শ্রীঅভিজিৎ
৭২	জলসা	শ্রীচিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : শ্রীনির্মল সাহা

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হইল

শৈলেশ দের অবিস্মরণীয় গ্রন্থ :—

বিনয়-বাদল-দীনেশ ৭৲

এ কৃতিত্ব মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশেরই

লেখকের অন্যান্য বই :—

যেন ভুলে না যাই ৮৲

রক্তের অক্ষরে ৯৲ ক্ষমা নেই ৫৲

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা

ও

রসমধুর কাহিনী সমারোহ।

দাম : সাত টাকা।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

অফিস এবং ইন্‌জিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম

এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

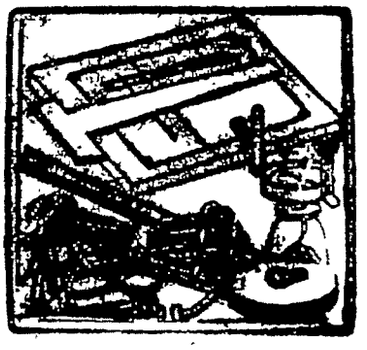

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ, খাতা, লেজার, ক্যাশবই, ফাইল ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য

অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১

ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৩৩৬৩

গ্রাম : অবারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া

পরিবেশক : ফ্যাবলিন প্রতিষ্ঠান (ষ্টেশনারী বিভাগ)

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

মহান শিক্ষক, দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মৃত্যু শুধু ভারতের পক্ষে নয় পৃথিবীর সকল দেশেরই সংস্কৃতিবান মানুষের কাছেই এক অপূরণীয় ক্ষতি। কারণ, তিনি ছিলেন মানবতাবাদী প্রাজ্ঞ দার্শনিক। পৃথিবীর সভ্যতার যা কিছু সুন্দর, যা কিছু বরণীয় ও গ্রহণীয় তাকেই তিনি মহৎ উত্তরাধিকাররূপে আপন করে নিয়েছিলেন। প্রাচ্যের জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করে তিনি প্রতীচীর কাছে সেই অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করেছিলেন দুই সভ্যতার সমন্বয় সাধনের আকাঙ্ক্ষায়। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই ছিলেন পাশ্চাত্যে ভারতের মুখ্য প্রবক্তা। স্মরণীয় যে তরুণ বয়সেই রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন সম্পর্কে গভীর তত্ত্বান্বেষী গ্রন্থ রচনা করেন। পরে রাধাকৃষ্ণনের কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গুণগ্রাহী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে সাদরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রধান অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য।

কলকাতা ও বাংলার সঙ্গে এই মহান দার্শনিকের যোগ সারা জীবনই অক্ষুণ্ণ ছিল। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কলকাতায় অধ্যাপনাকালেই ডঃ রাধাকৃষ্ণনের বিখ্যাত গ্রন্থাবলী রচিত হয়। অক্লান্তকর্মা সত্যানুসন্ধানী ডঃ রাধাকৃষ্ণন বিশুদ্ধজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করে ভারতীয় দর্শনের সারবস্তু উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা অসামান্য প্রাঞ্জলভাষায় প্রকাশ করে গেছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও উপলব্ধিতেই তিনি ক্ষান্ত না হয়ে সারাজীবন তিনি রচনাকর্মে সমান উৎসাহ দেখিয়েছিলেন এবং তার ফলেই এই মনীষীকে পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষ জানবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর রচনা নিঃসন্দেহে ভারতীয় দর্শন ও জীবনকে পাশ্চাত্যের কাছে সত্যের আলোকে তুলে ধরেছে। এ জন্য ভারতীয় মাত্রেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর মৃত্যুতে যে-ক্ষতি হল তা অদূর ভবিষ্যতে পূরণ হবার নয়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সব বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁকে সম্মান জানিয়ে ধন্য হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ, যেমন লেখায় তেমনি বলায়। পরাধীনতার যুগে রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি ছিলেন আমাদের জাতীয়তার অগ্রণী দূত। নিশ্চিতই রাধাকৃষ্ণনের মতো ব্যক্তি ভারতবর্ষের প্রতি প্রতীচীর আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা বাড়িয়েছে। ভারতবর্ষ কেন স্বাধীন হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথের মতো রাধাকৃষ্ণন ছিলেন এ-প্রশ্নের জ্বলন্ত উত্তর। স্বাধীনতার পর তাই এই দার্শনিক মানুষটিকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নে। দার্শনিক-কূটনীতিক ডঃ রাধাকৃষ্ণন সোভিয়েট নেতা স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সে সময়ে সারা দুনিয়ায় প্রভূত কৌতূহল সৃষ্টি করেছিলেন। কেননা এই প্রথম স্ট্যালিন এশিয়ার অ-কমুনিস্ট দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে এভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর সূচনাও রচিত হয় স্ট্যালিন-রাধাকৃষ্ণন সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়েই। দেশে ফিরে আসার পর তাঁকে প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি এবং পরে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতির পদে বৃত করা হয়। দার্শনিক ও শিক্ষক ভারত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে পৃথিবীর কাছে এক অনুপম দৃষ্টান্তই রাখলেন। কেননা শিক্ষক হিসাবে যেমন তিনি ছিলেন সর্বজনবরেণ্য রাষ্ট্রপতি হিসাবেও তেমনি তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। আমাদের কাছে তাঁর জীবন ও কর্মসাধনা উজ্জ্বলতম স্মৃতি হয়ে থাকবে চির অম্লান।

চিঠি

শৈলেন রায়

আপনি যদি ভেবে থাকেন যেহেতু আমি একজন উঁচুদরের একজিকিউটিভ - মোটা মাইনে পাই বচর চল্লিশের নীচে দেখতে মোটামুটি ভালোই (বিনয় করেই বললাম; অনেকের মতে লেডী-কিলার বলতে যা বোঝায় আমি নাকি তাই যদিচ আজ পর্যন্ত কোন মহিলাকে জখম করতে পেরেছি বলে মনে পড়ে না) স্বাস্থ্য ব্যায়ামবীরের মত না হলেও স্লিমের ওপর বেশ পেটানো শরীর অসুখ-বিসুখ বড় একটা করে না এমন কি মাথাও ধরে না যদিচ মাথার খাটুনীটাই মারাত্মক রকমের বেশী; এতদিন চাকরি হয়ে গেল—তা বছর বারো-তেরো বৈকি এর মধ্যে অসুস্থতার জন্যে ছুটি নিয়েছি বলে মনে তো পড়ে না; হ্যাঁ একবার নিতে হয়েছিল অবশ্য যখন ডেঙ্গুর তাড়নায় কলকাতা শুদ্ধ লোক কুপোকাৎ তখন, দিন দুয়েক, তাও নিতাম না যদি না শিবানী আড় হয়ে পড়তো। শিবানী আমার বউ। এই যে আমি এতগুলো বিশেষণে ভূষিত যে ব্যক্তিটি সেই আমাকে আপনি যদি ভেবে থাকেন একজন সত্যিকারের সুখী লোক এক কথায় আপনার অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবো না যদিচ বুকে হাত রেখে কোনমতেই আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না; পারছি না এই কারণে যে সত্যিকারের সুখী লোক বলতে যা বোঝায়—যাকে বোঝায় আমি সে লোক নই।

অথচ একজন মানুষকে সুখী করার

জন্যে যে যে উপকরণ প্রয়োজন, আমার জীবনে তার প্রতিটিই বর্তমান। স্বাস্থ্য অর্থ রূপ সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রী ফুলের মত দুটি সন্তান—বড়টি ছেলে বছর দশেকের ছোটটি মেয়ে পাঁচে পা দিল। আরও। গাড়ি সোফার অঢেল পেট্রোল এই কড়াক্কাড়ির বাজারেও—সবই কোম্পানীর পয়সায়। যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানো উইক-এন্ডে পিকনিক বন্ধু-বান্ধব পার্টি হৈচৈ ছুটিতে দূরে দেশ-বিদেশ—মোটরে রেলে কিংবা হাওয়াই জাহাজে যেখানে খুশি সবই কোম্পানীর পয়সায়। গোটা চারেক পরিচারক, যারা সদা-সর্বদা আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বসে আছে। যে বাড়িতে আমার বাস সেই বাড়ির ড্রইংরুম ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠ বা তার চেয়েও প্রশস্ত। আমার এই ড্রইংরুম স্বর্গের নন্দনকানন; আমার দুপাশে দুই বাহু-লগ্ন আমার দুই সন্তান স্ত্রী শিবানী যেখানে যে অবস্থায়ই থাক ছুটে আসে—এসেছে যেন বহুদিন পর বিদেশ থেকে ফিরলো গৃহস্বামী অথচ প্রকৃতপক্ষে মাত্র ঘন্টা চারেকের অদর্শন লাঞ্চ খেয়ে ফিরে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে; আমি বাড়িতেই লাঞ্চ খাই শিবানী আমার সঙ্গে বসে খেতে ভালোবাসে—তাই।

শিবানীর একটা দোষ আছে। দোষ বলেই মনে হয় আমার। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমি যখন সোফায় ডুবে যাই যখন মনে হতে থাকে শিবানী ওর বিশাল কোল পেতে বসে আছে আর আমি ক্লান্ত এক শিশু সেই কোলে আশ্রয় নিয়েছি—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ আশ্রয় শিবানী তখন হুড়মুড় করে আমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আমার জুতো খুলতে থাকে। কতদিন ওকে বারণ করেছি ও শোনে না। বলে বলে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। শিবানী তখন সযত্নে আমার জুতোর ফিতে ঢিলে করতে থাকে আমি চোখ বুজে আরাম উপভোগ করি। আমার ছেলে দেবু মেয়ে শর্মিলা ওরা আমার দুই বাহু নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে থাকে আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার চেষ্টা করে। ওদের নরম শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে আমি এক স্বর্গরাজ্যে চলে যাই। দেবরাজ ইন্দ্রের চেয়েও নিজেকে সুখী বলে মনে হয়। ইন্দ্র কখনও অফিসে যাননি। অফিসের পর বাড়ি ফেরার সুখ যে কী উনি কোনদিন জানতে পারেন নি।

চায়ের টেবিলে শিবানী প্রশ্ন করে 'এমন চুপচাপ? কি ভাবছো?'

বিষম বিরক্ত বোধ করি। শিবানীর হাতে তৈরী গরম ফুলকপির সিঙ্গারায় কামড় বসাতে বসাতে বলি 'কিছু না। কি আবার ভাববো? ভাবার মত কি আছে? কিছু নেই।'

শিবানীর সংশয় দূর হয় না। বলে 'অফিসের কথা?'

চেয়ারের পিঠে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে দিতে তাচ্ছিল্যের সুরে বলি 'নাঃ। অফিসের কোন কথা নেই। নিরেট ইট-কাঠ সিমেন্টের অফিস ধান্দাবাজ কতগুলো মানুষ—তাদের আবার কথা।'

শিবানী সরল প্রকৃতির মানুষ; আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস যা বলি বিশ্বাস করে। 'শরীর ভালো আছে তো যা খাটুনী!'

হঠাৎ শশব্যস্তে বলে উঠে ওরা গেল কোথায় দেবু শর্মি?

শিবানী এবার রীতিমত বিস্মিত হয়। বিস্ময়ের মাত্রা বেশী হলে ওর অধর ঘন ঘন স্ফুরিত হতে থাকে। 'সে কী তুমিই তো গাড়ি করে ওদের মেজদির বাড়িতে পাঠালে! আজ মেজদির মেয়ের জন্মদিন আমাদেরও যেতে বলেছিল তুমি বললে যেতে ইচ্ছে করছে না মনে নেই?'

শিবানী যেভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। চোখ সরিয়ে নিয়ে লম্বু কণ্ঠে হেসে উঠি। জানো আজ এক দারুণ মজার ব্যাপার হয়েছে অফিসে। এক ভদ্রলোক কানে কম শোনেন আমাদেরই এক সাপ্লায়ার যত বলি আমাদের একটু টানাটানি চলছে এই সময় দুদিন অপেক্ষা করুন উনি তত এক নাগাড়ে বলে চলেছেন পেমেন্টটা যদি এখন না পাই স্যার বউ ছেলেপুলে নিয়ে

১৬-৫-৭৫ তারিখের সংখ্যায়
গল্প লিখবেন
শ্রীলেখা বসু

পথে দাঁড়াতে হবে; অথচ আমি জানি ভদ্রলোক ব্যাচিলার। আমার হাসি দেখতে দেখতে শিবানীর উদ্বিগ্ন চোখে খুশীর আলো ঝলকে ওঠে। হাসলে ওর গালে টোল পড়ে। সেই টোল দেখতে আমার ভালো লাগে। সুযোগ বুঝে আবার বলি 'তুমি বরং মেজদির বাড়িটা ঘুরে এসো। দুজনে না গেলে ভালো দেখায় না।'

শিবানী ছোট মেয়ের মত ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলতে থাকে 'একা কোথাও যাই আমি? একা যাব না।'

শিবানীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলি 'যাও লক্ষ্মীটি কথা শোন।' আমি জানি এভাবে বললে শিবানী আপত্তি করে না করতে পারে না।

অনুনয়ের ভঙ্গিতে শিবানী তবু বলে 'পৌঁছে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে তারপর যেও। আজ তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

শিবানী এসে আমার পাশে থম হয়ে দাঁড়ায়। ওর কোমড় জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলি 'সত্যি আমি আজ খুব ক্লান্ত।'

শিবানী যে এত মৃদু কথা শুনতে পাবে বুঝতে পারিনি। ও হঠাৎ বেঁকে বসলো 'এভাবে তোমাকে একা রেখে—'

ওর কথার মাঝখানেই তাড়াতাড়ি বলে উঠতে হয় 'এমন না যে আমি খুব বাচ্চা ছেলে একা পেলে কেউ টপ করে গিলে খাবে।'

শিবানী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে 'বাচ্চা ছেলের চেয়েও অধম তুমি। তারা ক্ষিধে পেলে কাঁদে খেতে চায় তুমি তাও বোঝ না। ক্ষিধে নেই ক্ষিধে নেই করছিলে কটা সিঙ্গারা খেলে হিসেব রাখো?

শিবানীর বাহুর ওপর মুখ চেপে ধরে রসিকতা করার চেষ্টা করি কার হাতের তৈরী দেখতে হবে তো!

শিবানী খুশী হয়। খুশী মনে সাজতে চলে যায়।

এই মুহূর্তে শিবানীকে আমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে চাইছিলাম। আমি একটু একলা থাকতে চাই এখন। পিছনের একটা জানালা খুলে আমি একজনকে দেখতে চাই। বড্ড ইচ্ছে করছে দেখতে।

অরুদি, তোমাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে এই সময়।

এই পিনাকী ওঠ। চুলে টান পড়তেই পিনাকীর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠতে আলস্য লাগছিল। আবার চোখ বুজতে যাচ্ছিল পিনাকী, তার আগেই চুলে প্রচণ্ড টান পড়ল। ধড়মড় করে উঠে বসল পিনাকী। দু হাত কোমড়ে তুলে সামনে দাঁড়িয়ে অরুদি। কি ঘুম যে বাবা, তখন থেকে ডাকছি! এমন জানলে নিতাইকে সঙ্গে নিতাম।

নিতাইয়ের নামে পিনাকীর ঘুম-ঘুম ছুটে গেল। এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দৌড় দিতে যাচ্ছিল আরতি খপ করে ওর হাত চেপে ধরে ধমক লাগাল, বাইরে হিম পড়ছে, গায়ে জামা দে।

পিনাকী যেমন-তেমনভাবে গায়ে জামা গলিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। তখনও ভোর হয় নি। আকাশে ঝক ঝক করছে অনেকগুলো তারা। আরতি পিনাকীর বুকের কাছে সরে এসে বলল, দাঁড়া বোতাম লাগিয়ে দিই ঠাণ্ডা লাগবে।

পিনাকী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলতে চাইল, শীত করছে না একটুও।

আরতি আবার ধমক লাগাল, বেশী বাহাদুরী দেখাতে হবে না। গত বছর তো মরতে মরতে বেঁচে গেলি।

পিনাকী খিল খিল করে হেসে উঠল মরে গেলে বেশ হতো। নিতাইকে নিয়ে শিউলী কুড়নো বুঝতে মজা।

উত্তর দিতে গিয়ে আরতির চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল। চোখ তুলতেই দেখল, পিনাকী তার দিকে তাকিয়ে আছে। আবছা আলোয় যদিও পিনাকীর চোখের ভাষা পড়া গেল না, আরতি বুঝল পিনাকী হাসছে।

ঘটনাটা খুবই সামান্য। আবার সামান্যও না। গত বছর এমন দিনে পিনাকীর অসুখ যদিও সেরে গেছে কিন্তু সকালে বেরোন বারণ তার; আরতি নিতাইকে নিয়ে ফুল কুড়োতে গিয়েছিল। আরতি যখন নীচু হয়ে কুড়োচ্ছিল নিতাই নাকি অতর্কিতে তাকে জাপটে ধরেছিল। নেহাৎ খেলাচ্ছলেই হয়ত

কিন্তু আরতির তুলনায় নিতাই ছিল অনেক বেশী বলবান; প্রাণপণ চেষ্টা করেও আরতি যখন নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি তখন সে নিতাইয়ের হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল। এত জোরে কামড়ে দিয়েছিল যে যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছিল। নিতাইয়ের মুখ থেকে পিনাকী এ ঘটনাটা শোনে নি, শুনেছিল আরতির কাছে। আরতি হাসতে হাসতেই বলেছিল কথাটা, কিন্তু পিনাকী দেখেছিল আরতির দুটো গাল সেই মুহূর্তে সিঁদুরের মত লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছিল।

আরতি ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, কি মজা বুঝতাম! নিতাইয়ের হাতে আবার কামড় বসাতাম। কথা বলেই আরতি হেসে উঠলো। পিনাকীও হাসলো। আরতি হাসলে পিনাকী না হেসে পারে না।

কথায় বলে কায়ার ছায়া। পিনাকী সেই ছায়া। আরতির ছায়া। নিরালা দুপুরে পিনাকীদের বাড়ীর ছাদে তেঁতুল মাখে আরতি কোনদিন বা কয়েতবেল; দৌড় ঝাঁপ করে তেল লঙ্কা নিয়ে আসে পিনাকী। চিলেকোঠার ছায়ায় বসে সেই নিষিদ্ধ বস্তু খায় দুজনে। খায় রসিয়ে রসিয়ে।

আকাশ ছাপিয়ে নামে শ্রাবণের বর্ষা। ছেদহীন, বিরামবিহীন বর্ষা। মাঠঘাট যায় তলিয়ে। সেই জলে ছপছপিয়ে চলে দুই কিশোর কিশোরী। উদ্দেশ্যবিহীন তাদের যাত্রা, তবু প্রাণপণ ছুটছে যেন যেতে হবে বহু দূরে যেখানে আকাশ গিয়ে মিলেছে পৃথিবীর গায়ে—সেই দিগ্বলয়ে। শুধুই ছোটা—বৃষ্টিতে হাত ধরাধরি করে, দুজনে কাছাকাছি, পাশাপাশি, যেন এর বেশী কিছুই থাকতে পারে না চাওয়ার। কারণে অকারণে অরুদি অরুদি বলে ডাকা সাড়া দিলেও না শুনতে পাওয়ার ভান, যেন শুনতে পেলেই ডাকটা যাবে ফুরিয়ে।

কী এমন যাদুমন্ত্র লুকোন ছিল তিন অক্ষরের এই ডাকের মধ্যে অরুদি, যে বার বার ডাকতে ইচ্ছে করতো?

কৈশোর কাটলো।

এল কলেজে পড়ার লগ্ন। গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার পালা।

সেদিন ছিল মেঘলা-মেঘলা আকাশ। ঘামে ভেজা বিবর্ণ চাদরের মত ক্লেদাক্ত আকাশ। খোলা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে পিনাকীর মনে হয়েছিল পৃথিবীটা আশ্চর্য রকমের নিঃস্তব্ধ হয়ে গেছে। এমন পৃথিবী এর আগে আর কখনও সে উপলব্ধি করে নি।

পিনাকীর ভয়-ভয় করছিল। কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকলো, 'অরুদি!'

আরতি উত্তর দিল না। পিনাকীর মাথা আরও জোরে বুকে চেপে ধরলো। পিনাকীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, সে ছটফটিয়ে উঠলো। আরতির কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

'যাবার সময় হলো অরুদি। মা ডাকছে।'

আরতি যেন গভীর নিদ্রা থেকে ধড়মড় করে জেগে উঠলো। পিনাকীকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে আরতির মৃদু কণ্ঠস্বর পিনাকীর কানে এসে পৌঁছল, 'তুই যদি আমার চেয়ে বড় হতিস!'

১৬-৫-৭৫ তারিখের সংখ্যায় গল্প লিখবেন শ্রীলেখা বসু

'কি হতো বড় হলে, কি হতো অরুদি?'

আরতি বিচিত্র ভঙ্গীতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আরতিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে পিনাকী কখনও দেখে নি। পিনাকীর গা শিরশির করে উঠলো। অস্ফুট স্বরে সে আবার বলল 'বড় হলে কি হতো অরুদি?'

আরতি হঠাৎ দমকা হাসিতে ফেটে পড়ল। উচ্ছ্বসিত হাসি চাপতে চাপতে এক সময় বলল, 'আমার হাত কামড়ে দিতিস, যেমন আমি দিয়েছিলাম নিতাইয়ের।' আরতি আর দাঁড়াল না দুরদাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

আজ বিকেলের ডাকে চিঠিটা এসেছিল। দু-লাইনের চিঠি। 'কতদিন তোকে দেখি না পিনাকী। ভেবেছিলাম, আর দেখবো না—দেখতে চাইব না। কয়েকদিন হল তোদের শহরে এসেছি যদি পারিস একবার দেখা করিস। অরুদি।'

একটা গাড়ী হর্ন টিপছে। উর্দিপরা একটা লোক আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হর্নটা চেনা, লোকটাও। আমাকে তাকাতে দেখে সে দ্রুতপায়ে কাছে এগিয়ে এল, সসম্ভ্রমে বলল 'মেমসাব গাড়ী ভেজ দিয়া আপকা লিয়ে।'

প্রকাশিত হোলো

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

বন্ধু, রহো রহো দাম পাঁচ টাকা

প্রখ্যাত একটি সিনেমা-পত্রের পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে সাড়া জাগিয়েছিল। বর্তমান যুগের পটভূমিতে কয়েকটি যুবচরিত্রের আশ্চর্য প্রাণময় চিত্রণ। বাস্তবের কঠিন রূঢ়তায় ব্যথিত একটি মন নারীর অতলস্পর্শী ভালোবাসার মধ্যে কিভাবে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল তার ইতিহাস। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখার বৈশিষ্ট্য। সমাজের অবহেলিত একজন মানুষ ব্রজর চরিত্র-চিত্রণের ভেতর দিয়ে সেই ভালোবাসা স্পষ্ট হয়ে ফুলের মত ফুটে উঠেছে।

শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের গল্পসমগ্র

আনুমানিক চার খণ্ডে বাংলাসাহিত্যের এই যাদুকরের সমগ্র গল্পের মালা গেঁথে আমরা উপহার দিতে চলেছি। জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে গজেন্দ্রকুমারের চেয়ে রসঘন ছোট গল্প আর কেউ লিখতে পেরেছেন কি? তার বিচার পাঠকেরাই করবেন। প্রতি খণ্ড আনুমানিক ২০·০০, গ্রাহক চাঁদা ১০.০০

এছাড়া

শৈলজানন্দের সুনির্বাচিত রচনাবলী ৫ খণ্ডে

এইচ, জি, ওয়েলসের রচনাবলী ৬ খণ্ডে

দুটিরই প্রতি খণ্ড ২০·০০ (আনুমানিক) গ্রাহক চাঁদা ১৫·০০ প্রতি রচনাবলীতে। একসঙ্গে দু'টির গ্রাহক হলে ২০·০০, গ্রাহকেরা ২০% ছাড় পাবেন।

আনন্দতীর্থ ॥ ৮২।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা—৯

এই বাংলার খবর

লে-অফ, ছাঁটাই

পশ্চিমবাংলার কলকারখানায় শ্রমিক লে-অফ ইদানীং কয়েক মাসে যেভাবে বাড়ছে, তাতে রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন না-হয়ে পারছেন না। গত তিন মাসে নানা ধরনের শিল্পে মোট প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিককে লে-অফ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি লে-অফ হয়েছে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে, প্রায় ৩০ হাজার। তারপর হলো চটকলে, সাত হাজার। তাছাড়া কাপড়ের কলে ছ'শ' এবং অন্যান্য শিল্পে প্রায় সাত হাজার শ্রমিককে লে-অফ করা হয়। ঐসব কলকারখানার মালিকেরা বলছেন তাঁরা যেসব জিনিসপত্র তৈরি করেন তার তেমন চাহিদা নেই, তাই উৎপাদন ছাঁটাই করতে হয়েছে তার ফলেই এই শ্রমিক লে-অফ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাঁটাই। চাহিদার অভাবে খুব মুস্কিলে পড়েছে মোটর গাড়ি তৈরির একটা বড় কারখানা। একে তো গাড়ির দাম সম্প্রতি বেশ চড়েছে, তার ওপর পেট্রলের দামও বেড়ে চলেছে। তাই গাড়ির চাহিদায় এই ভাঁটা। ফলে কারখানায় কাজ অনেক কম গেছে। তবু কোম্পানীটি রাজ্য সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রমিক ছাঁটাই না করে শুধু লে-অফ করছে। যেসব ছোটখাটো কোম্পানী ঐ বড় কোম্পানীকে মালপত্র যোগায় তারাও এর ফলে অসুবিধেয় পড়েছে।

এদিকে অনেক চটকলের অবস্থাও ভালো নয়। বিশেষ করে যেসব কল রপ্তানির জন্যে পাটজাত পণ্য তৈরি করে তারাই বেশি মুস্কিলে পড়েছে। কিছুদিন ধরে বিদেশের বাজারে পাটজাত পণ্যের খুব চাহিদা হয়েছিল দামও চড়েছিল। কিন্তু ইদানীং ঐসব দেশে দেখা দিয়েছে মন্দার ছায়া। তাই চাহিদা আগের তুলনায় কম। তা ছাড়া কৃত্রিম তন্তুজাত পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সমস্যা তো আছেই। এদিকে ওয়াগনের অর্ডার রেল দপ্তর থেকে ঠিকমতো না-আসায় ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে দেখা দিয়েছে সংকট। ১৯৭৪-৭৫ সালে রেলওয়ে বোর্ড নাকি ওয়াগনের কোনো অর্ডারই দেয় নি। এ বছর পাঁচ হাজার ওয়াগনের অর্ডার পাওয়া যাবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছেন, এতে সমস্যার বিশেষ সুরাহা হবে না। ভারত চেম্বারের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা করতে উঠে মুখ্যমন্ত্রীও এই সব সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে বছরে অন্তত ১৫ হাজার ওয়াগনের অর্ডার পাওয়া দরকার। তা ছাড়া পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির ওপর এখন যে শুল্ক ধার্য করা হয় তা প্রত্যাহারের জন্যেও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান। এই সব সমস্যা নিয়ে তিনি দিল্লিতে কথাবার্তা বলেছেন, আরো বলবেন।

হকার বিদায়

মধ্য কলকাতার পর দক্ষিণ কলকাতার পালা। বাংলা নববর্ষের আগের দিন পুলিশ ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেয় গড়িয়াহাট রোড, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আর নিমকমহল রোডের ফুটপাথ ১৬ এপ্রিলের মধ্যে খালি করে দিতে হবে। তা না হলে ঐদিন রাত থেকেই পুলিশ হকারদের স্টল ভাঙতে শুরু করবে। পুলিশের এই নোটিশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু হকার নিজেরাই তাঁদের স্টল ভেঙে দেন। হকার উচ্ছেদে পুলিশকে তাই বেগ পেতে হয় নি। নির্দিষ্ট তারিখে পুলিশ ও পৌরসভার কর্তা-ব্যক্তিরা সদলবলে হকারদের তুলতে যান। কিন্তু তার আগে প্রায় সব স্টল হকাররা নিজেরাই ভেঙে দিয়েছিলেন। যে কটি বাকি ছিল শুধু সেই কটিই তাঁরা ভেঙে দেন। হকাররা যদিও নানা রকম ধ্বনি দিতে থাকেন (পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি) তাঁরা কিন্তু স্টল ভাঙায় কোনো বাধা দেন নি। ফুটপাথ হকারমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌরকর্মীরা সেই সব ফুটপাথ কেটে ছোট করার কাজ সুরু করে দেন। হকাররা যাতে আবার ফিরে ঐসব জায়গায় বসতে না পারেন সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

ফুটপাথ থেকে উচ্ছেদের ফলে যেসব হকার রোজগারের পথ হারালেন তাঁদের পুনর্বাসনের জন্যে পৌরসভা কলকাতার কয়েকটি রাস্তায় মীনাবাজার বসাবার পরিকল্পনা করেছেন। এই পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের অনুমোদনও পেয়েছে। আপাতত বাসেল স্ট্রীট এবং সাদার্ন অ্যাভিনিউতে এই মীনাবাজার বসবে। এই মীনাবাজারে হকাররা দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় মাল বেচবেন। চৌরঙ্গী থেকে যাঁরা উৎখাত হয়েছেন, তাঁরা জায়গা পাবেন বাসেল স্ট্রীট এবং দক্ষিণ কলকাতার হকাররা সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মীনাবাজারে। কিন্তু হকারদের এই মীনাবাজারের প্রস্তাবে তেমন সায় নেই। কারণ ঐ বাজারে তাঁদের সকলের জায়গা হবে না তাছাড়া বাসেল স্ট্রীট বা সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মতো জায়গায় তাঁদের বেচাকেনাও তেমন জমবে না বলে তাঁদের আশঙ্কা।

সাঁওতাল ডিহির বিদ্যুৎ

পুরুলিয়ায় সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক নম্বর ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় গত বছর জানুয়ারি মাসে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সেই বিদ্যুৎ সরাসরি সাঁওতালডিহি থেকে কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা ছিল না। কারণ এর জন্যে প্রয়োজনীয় ট্রান্সমিশন লাইনই ছিল না। তাই ঐ বিদ্যুৎ আসতো ডি ভি সি-র লাইনে। ১৪ এপ্রিলে হাওড়ায় আন্দুল রোডে একটি সাব-স্টেশন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালডিহি থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ আনার জন্যে ট্রান্সমিশন লাইন বসানোর কাজ শেষ হলো। ঐ লাইনে বিদ্যুৎ আসাও শুরু হলো। এই লাইন তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯৭১ সালে। তৈরি করতে খরচ পড়লো পাঁচ কোটি টাকার বেশি। পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া, হুগলী হয়ে এই লাইন হাওড়ায় এলো। এখন সাঁওতালডিহিতে তৈরি হচ্ছে দৈনিক ৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। তার মধ্যে ৬০ মেগাওয়াট পাবে কলকাতা ও আশপাশের শিল্পাঞ্চল।

হাওড়ায় সাব-স্টেশনের উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী গণি খান চৌধুরী। তিনি স্বীকার করেন যে রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে পারেননি, তবে এই সাব-স্টেশনের উদ্বোধন একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আসছে জুনেই সাঁওতাল-ডিহির দু' নম্বর ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। ফলে

বিদ্যুতের যোগান বেশ কিছটা বাড়বে। ডি ভি সি এবং দুর্গাপুর প্রজেকটস লিমিটেডে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে সুনীতিমতো অগ্রগতি ঘটেছে। কলকাতা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কর্পোরেশন উৎপাদন বৃদ্ধির যে-পরিকল্পনা করেছেন তা যদি রূপায়িত হয় তবে কলকাতার বিদ্যুৎ ঘাটতি মিটে যাবে। উত্তর বাংলাতেও দক্ষিণ বাংলা থেকে বিদ্যুৎ যোগান দেওয়া যাবে। ফারাক্কা থেকে খাজুরিয়াঘাট পর্যন্ত ট্রান্সমিশন লাইন তৈরির কাজ শেষ হলেই উত্তর বাংলায় দক্ষিণ বাংলার বিদ্যুৎ পেতে পারে।

রবীন্দ্র ভারতী

মার্চ মাসের মাঝামাঝি হাঙ্গামার পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার জট খুলতে সময় লাগছে অনেক। উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন না। অথচ একদল ছাত্রের দাবিতে কিছু সংখ্যক অধ্যাপক ক্লাস নিতে শুরু করেছেন। কী করে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটানো যায় তা নিয়ে শিক্ষা দপ্তরও যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করছেন। শোনা যাচ্ছে অনেকে বর্তমান উপাচার্যকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে চান। তাঁদের ধারণা ডঃ চৌধুরী তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাছাড়া একদল ছাত্র এবং শিক্ষক তাঁকে অপসারণের পক্ষপাতী। উপাচার্য ইতিমধ্যে রাজ্যপাল ডায়াসের (তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য) সঙ্গে দেখাও করেছেন। প্রকাশ, রাজ্যপাল তাঁকে বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সভা ডাকতে। যে-অবস্থার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে আছে সে-বিষয়ে কর্মসমিতির সভায় আলোচনা হওয়া উচিত। তাছাড়া চলতি বছরের বাজেট পাস হওয়া উচিত ছিল মার্চ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে। কিন্তু এখনও তা হয়নি। ফলে এখন যা খরচ হচ্ছে তা সবই নিয়মবহির্ভূত। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এ. [illegible] শান্ত হলেও ১৯ এপ্রিল তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যে একজন ছাত্র ছুরিকাহত হয় এবং কে বা কারা তাকে নিয়ে চলে যায় বলে ছাত্র সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।

চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে

সারা দেশের মতো পশ্চিমবাংলায়ও গত বছর চোরাচালানিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। পশ্চিম উপকূলে যেমন চোরাচালানের বাড়বাড়ন্ত পূর্ব উপকূলে ততোটা নয়। তবু এই রাজ্যেও জন-আশি চোরাচালানিকে আটক করা হয়েছে এপর্যন্ত। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয় তাদের সবাইকে আটক করা যায়নি। এদের মধ্যে অনেকেই ফেরার। পশ্চিমবাংলায় এইরকম চোরাচালানি বলে অভিযুক্ত অথচ ফেরার ব্যক্তির সংখ্যা হবে ৬২ জন। এদের দ্রুত আটক করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। ঐসব ফেরার ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধী বলে ঘোষণা করার জন্যে আদালতে আবেদন করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি তারা আত্মসমর্পণ না করে তবে তাদের সম্পত্তি ক্রোক করার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। চোরাচালানিদের আটক করার জন্যে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে স্ক্রিনিং কমিটি আছে। কিন্তু এপর্যন্ত ঐ কমিটি ফেরার চোরাচালানিদের ধরার জন্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে জানা গেছে। পশ্চিমবাংলায় যাদের বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ আছে তারা অধিকাংশই চোরাই মালের বিক্রেতা, সরাসরি চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত নয়।

দেবদত্ত

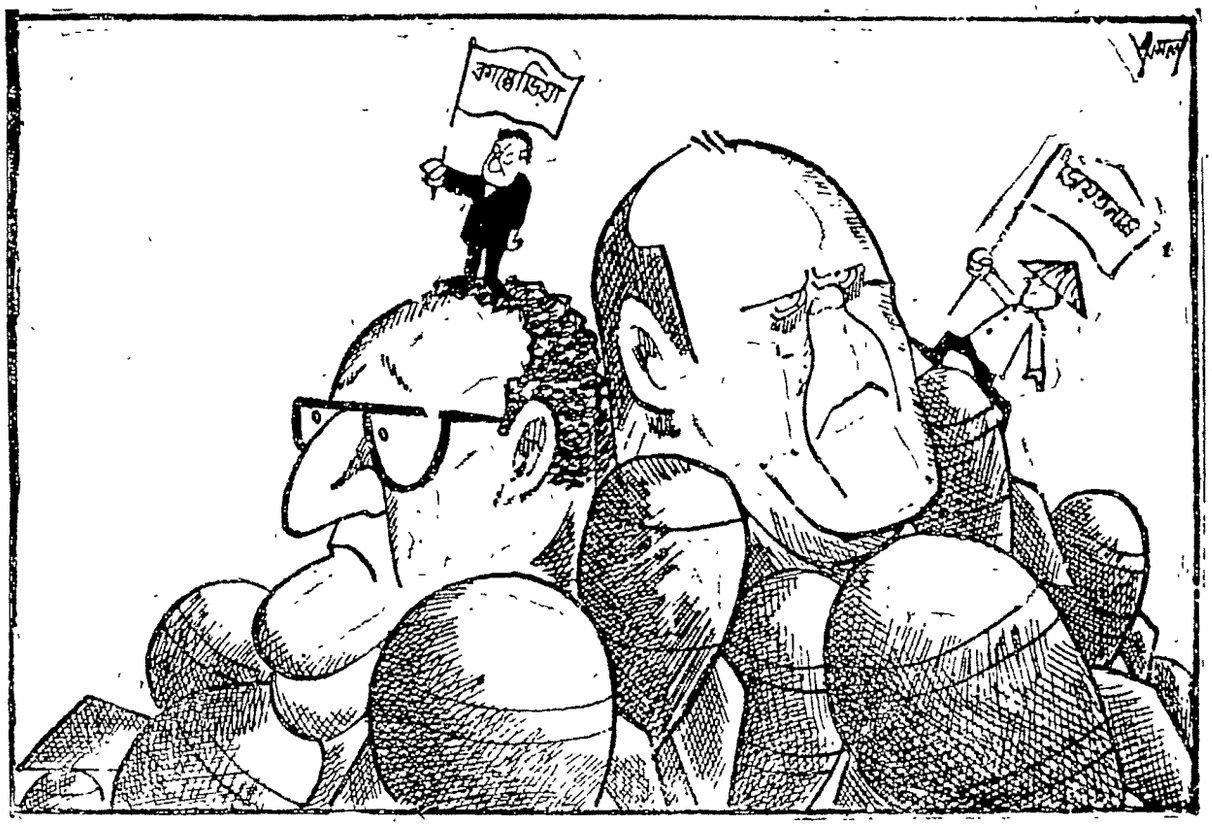

পটভূমি

সি পি এমের কণ্ঠে পাক-চীন সুর

ভারতের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সিকিমের ভারতভুক্তি চায় না। পাকিস্তান ও চীনও চায় না। পাকিস্তান ও চীন বলছে : ভারতীয় সংবিধান সিকিমের উপর চাপিয়ে দিয়ে সিকিমের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত হস্তক্ষেপ করছে। চীন ও পাকিস্তানের আগ্রাসী নীতির দোসর ভারতের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিও কণ্ঠ মিলিয়ে বলছে : ভারত সিকিমের জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। সিকিমের জনগণের জন্য সি পি এম-এর মনোবেদনার অন্ত নেই। সিকিম আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রীড়নক হোক এটাই চীনা নীতি।

সিকিম সীমান্তে ভারত প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকলে চীনের ছোবল মারার নীতি ভবিষ্যতে কার্যকর হওয়া কঠিন। তেমনি পূর্ব সীমান্তে অশান্ত চক্রের অরাজকতা সৃষ্টির সম্ভাবনাও কমছে। সীমান্তের পাহাড় ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উপর চীনের শোন দৃষ্টি বহুকালের। তাই চীনের এতো সমালোচনা।

সি পি এম-এর পক্ষে সিকিমের ব্যাপারে এই নীতি ঘোষণা খুব অস্বাভাবিক নয়।

যারা বাংলাদেশের ব্যাপারে বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সমর্থনে ও সাহায্যে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের নীতির বিরোধিতা করেছে সেই সি পি এম সিকিমের ব্যাপারেও সেই কথাই বলছে। এই সি পি এম নেতাদের কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল 'ইয়াহিয়া-ইন্দিরা এক হ্যায়' সেই জঘন্য আচরণের জবাব পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ১৯৭২ সালের নির্বাচনে দিয়েছিল। বাংলাদেশের জনগণের বন্ধু হিসাবে মানবতার ডাকে সেদিন ভারত যা করেছিল তা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ও তার মিত্র চীন ছাড়া সকলেই মেনে নিয়েছে।

সি পি এম-এর বাংলাদেশ নীতি সারা ভারতে নিন্দিত হয়েছে। তেমনি সিকিম-নীতিও নিন্দিত হতে বাধ্য।

সিকিম সম্পর্কে সি পি এম-এর গৃহীত প্রস্তাবটি সারা ভারতে নিন্দিত হবেই। তার সাথী দলগুলোও সি পি এম-এর এই নীতির প্রতি সমর্থন জানাবে না।

সিকিমের চোগিয়ালের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস লক্ষ্য করে জনগণের নির্বাচিত সরকার চোগিয়াল প্রথার অবসান ঘোষণা করেছে। ভারতভুক্তির ব্যাপারে গণভোট গ্রহণ করা হয়েছে। সিকিমের জনগণ ভারতের জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ভাবধারায় জীবন ও জীবিকার পূর্ণ বিকাশ করতে চাইছে।

চীন সিকিমের ব্যাপারে ভারতের আচরণে রোষা করেছে। নেতৃমহল ভারত সম্পর্কে কটূক্তি করছেন। তেমনি পাকিস্তানও প্রথম থেকেই সিকিমের চোগিয়ালের অবস্থিতিতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চোগিয়ালের দুর্দশায় মর্মাহত।

কার্যত চীন-পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই তিন বন্ধু সিকিমের প্রশ্নে ভারতকে বেকায়দায় ফেলবার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। কিন্তু ভারত সরকার তার ন্যায় ও নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নীতি নিয়েই সিকিমে ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তন করতে চলেছেন। কারণ, ভারতের কাছে সিকিমের জনগণের তাই দাবী। এই দাবী পূরণের জন্য সংসদে সিকিম বিল আসছে। এর একমাত্র বিরোধী হল মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি।

কিন্তু আমরা জানি, শেষ পর্যন্ত সি পি এম এই বিরোধিতার কৌশলেই সিকিমের মানুষের কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করবে। কারণ সি পি এম-এর কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করছে যে, সিকিমের নেতা ডোরজীর আশেপাশে যাঁরা এখনও আছেন তাঁদের দু'-চারজনকে তাঁদের চীনা লাইনের প্রভাবে প্রভাবিত করা যাবে। প্রকাশ, সীমান্তের পার্টি কর্মীরা জানিয়েছেন যে সিকিমের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে তাঁদের একজন আছেন। পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সিকিমের জনগণের মন জয় করার আগ্রহও সি পি এম-এর আছে।

ভারতের গণতন্ত্রকামী মানুষের কর্তব্য সিকিমের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ চিন্তা করা এবং ভারত সরকারের নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সিকিমের ভারতভুক্তির নিন্দা ও বিরোধিতার অর্থই হল ভারতের শত্রুর হাত শক্ত করা।

চাণক্য

দেশে বিদেশে

তিন দশকের বেশী সময় ধরে ইন্দোচীনে আগুন জ্বলছে। এই আগুনের তীব্রতা কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনও সে আগুন নিভে যায় নি। গোটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মোট যে পরিমাণ বোমা ব্যবহার করা হয়েছে এই ক্ষুদ্র দেশের মাটিতে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী বিস্ফোরক প্রয়োগ করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। আরও কত লক্ষ যে পঙ্গু হয়ে গেছে কত শিশু যে অনাথ হয়ে গেছে, আদর্শহীন নীতিহীন সৈনিকের ভ্রষ্টাচার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূখণ্ডে সমাজ ও ন্যায়নীতির শৃঙ্খলাকে যে কিভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, কত হাজার জারজ সন্তানের উত্তরাধিকার যে রেখেছে, তার সম্পূর্ণ হিসাব পেতে সময় লাগবে। ফরাসী জাপানী ও আমেরিকানরা ক্রমান্বয়ে ইন্দোচীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। কাম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে আমেরিকার তাঁবেদার সরকারের চূড়ান্ত পরাজয় ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে মুক্তিবাহিনীর আসন্ন শেষ বিজয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ত্রিশ বৎসরের সেই শোচনীয় রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের অবসান হতে চলেছে। ইন্দোচীনের বীর জনগণ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলার অধিকার অবশেষে পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রান্ত শক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চলেছে।

ইন্দোচীনের মানুষদের এই এক প্রজন্মের অধিক কালের লড়াইকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে এটা ছিল ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদী শক্তির লড়াই। সেই লড়াইয়ে ফরাসীরা হার মেনে নিয়েছে অনেক আগেই। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক প্রাক্তন উপনিবেশের মতই ইন্দোচীনের মুক্তিসংগ্রামের ইতি সেখানেই হতে পারত কিন্তু তা হয় না। আর তা হয় নি বলেই ইন্দোচীনের [illegible]র দ্বিতীয় পর্বটা এমন রক্তাক্ত এমন [illegible] হয়ে উঠেছে।

[illegible]র সময় জাপান ইন্দো-[illegible] বাও দাই-এর নেতৃত্বে একটি পুতুল সরকার খাড়া করেছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা পূরণ করার জন্য অনেকেই একসঙ্গে এগিয়ে এল। হো চি মিন তাঁর কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলের জোট গঠন করে হ্যানয়ে একটি সরকার স্থাপন করলেন। কুওমিন্টাং চীনেরও কিছু নেতার সে সময়ে ইন্দোচীনের উপর নজর ছিল। পরে সুবিধা হতে পারে ভেবে কুওমিন্টাং চীন হো চি মিনকে সাহায্য করতে লাগল। ওদিকে দ্য গলের নেতৃত্বে ফ্রান্সও তার সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করার চেষ্টায় নেমে গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চান নি যে যুদ্ধের পর ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক। তাঁর পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানও সেই নীতি আঁকড়ে ছিলেন। ফল হল এই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দোচীনে ফরাসীদের সাথে হো চি মিনের অনুগামীদের সংঘর্ষ বাধল। এই সংঘর্ষে ফ্রান্স তার যুদ্ধকালীন মিত্র আমেরিকার সাহায্য পায় নি। পরবর্তীকালে ভাগ্য এর প্রতিশোধ নিয়েছে। তখন আমেরিকা ভিয়েতনামের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে আর ফ্রান্স তফাতে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে।

ত্রুটি স্বীকার

গত সংখ্যায় প্রকাশিত ত্রিভুজ কিংবদন্তী গল্পের কয়েকটি ছেদচিহ্নে 'কমার' জায়গায় 'দাঁড়ি' হওয়ায় অর্থবিভ্রাট ঘটেছে বলে আমরা দুঃখিত।

১৯৪৬ সালের ২৩ নভেম্বর ফরাসীরা হাইফং বন্দরে বোমাবর্ষণ করে ৬ হাজার মানুষকে মেরে ফেলে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভিয়েতনামীরা হ্যানয়ের ফরাসী দুর্গ আক্রমণ করে এর প্রতিশোধ তুলল। সেই থেকে ইন্দোচীনের যুদ্ধে প্রথম পর্বের সূত্রপাত। সেই পর্বের শেষ হল দিয়েন বিয়েন ফু-র লড়াইয়ে। ফরাসীরা মনে করেছিল দিয়েন বিয়েন ফু-র দুর্গ অভেদ্য। কিন্তু কম্যুনিষ্ট সেনাপতি গিয়াপের রণকৌশলের বিরুদ্ধে ফরাসীদের হার মানতে হল। ১৯৫৬ সালের মে মাসে দিয়েন বিয়েন ফু-র লড়াইয়ে মোট ১৬ হাজার ফরাসী সৈন্য মারা গিয়েছিল বা বন্দী হয়েছিল। এতেই ফ্রান্সের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। ফ্রান্সে প্রধানমন্ত্রী লানিয়েলের সরকারের পতন ঘটল এবং ফরাসীরা ইন্দোচীন থেকে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল।

এত দিনে ইন্দোচীন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অনেকটা বদলে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই এত দিনে পুরো দমে শুরু হয়ে গেছে। চীনে চিয়াং কাইশেককে হটিয়ে দিয়ে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করেছে। লাল চীনের চার দিকে একটি বেষ্টনী গড়ে তোলার দিক থেকে এই সময়ে ভিয়েতনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্র তাই ১৯৫০ সালের গোড়ার দিক থেকে ইন্দোচীনে দখল বজায় রাখার জন্য ফ্রান্সকে মদত দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। চার বছর পরে ফ্রান্স যখন ইন্দোচীন ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে তখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলতে গেলে ফ্রান্সের বদলে ইন্দোচীনে লড়াই আরম্ভ করে দিয়েছে।

দিয়েন বিয়েন ফু-র লড়াই মাস পরে ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত হল জেনিভা চুক্তি। ঐ চুক্তি অনুযায়ী সপ্তদশ অক্ষরেখা বরাবর উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম ভাগ হয়ে গেল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সায়গনে প্রতিষ্ঠিত হলে নো দিন দিয়েমের সরকার। আমেরিকা ও দিয়েন সরকার জেনিভা চুক্তি মেনে নিতে রাজি হল না।

এর পরই শুরু হল ভিয়েতনামের যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব। কম্যুনিষ্ট ও উত্তর ভিয়েতনামী আক্রমণকারীদের ঠেকাবার নাম করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন সৈন্য ঢোকান হতে থাকল। প্রায় দশ বছর পরে নো দিন দিয়েম যখন খুন হলেন তখন দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যসংখ্যা ১৬ হাজারে পৌঁছে গেছে। দিয়েমের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিও আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। জনসন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে টনকিন উপ-

সাগরের ঘটনা' নামে পরিচিত একটি সাজান ঘটনার ছুতো ধরে প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণের আদেশ দিলেন। সে-সময়ে বলা হয়েছিল যে, উত্তর ভিয়েতনামীরা টনকিন উপসাগরে মার্কিন জাহাজের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। পরবর্তী কালে প্রমাণ হয়েছে যে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ এবং উত্তর ভিয়েতনামে বিমান আক্রমণ চালাবার অজুহাত হিসাবেই এই মিথ্যা প্রচার করা হয়েছিল। পরবর্তী এক বছরের মধ্যে আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধের তীব্রতা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে। ১৯৬৮ সাল নাগাদ দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা ৫ লক্ষে পৌঁছে যায়। ইতিমধ্যে আমেরিকায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ উঠতে থাকে। সে-দেশের জনমত থেকে প্রশ্ন উঠতে থাকে, একটা অর্থহীন যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে মার্কিন তরুণদের প্রাণবলি দেওয়া হচ্ছে কেন? মাই লাইয়ে মার্কিন সৈন্যদের নৃশংস আচরণ সারা দেশের বিবেককে আহত করে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে ভিয়েতনামী মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ আমেরিকানদের মনোবল অনেকখানি ভেঙে দিল। এর তিনমাস বাদে দেশের ভিতর প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করলেন তিনি পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। ভিয়েতনামের যুদ্ধের অবসান করার ও মার্কিন সৈনিকদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে এলেন নিকসন।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকসনের আমলেও ভিয়েতনামে যুদ্ধের আগুন জ্বলতে থাকল। উপরন্তু ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে আমেরিকা এমন একটি কাণ্ড করে বসল যার ফলে যুদ্ধের আগুন কাম্বোডিয়ায় ছড়িয়ে গেল। সে-সময়ে আমেরিকার প্ররোচনায় মার্শাল নল লন যদি প্রাক্তন সম্রাট

প্যাট্রী, ক্যান ক্যান, মে কুইন, বোকের মতো বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধী সমস্ত অগ্রণী স্টোর্সেই পাওয়া যায়।
বাংলার পরিবেশক :
সম্পৎ সেবামিকস্ প্রাঃ লিঃ
১১ পোলক স্ট্রীট কলিকাতা-১

ও কাম্বোডিয়ার জনপ্রিয় নেতা প্রিন্স সিহানুকের মধ্যপন্থী সরকারকে উৎখাত না করতেন তাহলে আজ হয়ত আমেরিকাকে ও তার সাকরেদদের এমনভাবে চোরের মতো কাম্বোডিয়া থেকে পালিয়ে আসতে হত না। দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকার পরাভবের গ্লানির সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হত না কাম্বোডিয়ায় ব্যর্থতার জ্বালা।

ভিয়েতনামের যুদ্ধের অবসান ঘটাবার জন্য উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করার পরও আমেরিকা বিমান আক্রমণসহ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকল। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট নিকসন আবার নতুন করে হ্যানয়ে বোমাবর্ষণের আদেশ দিলেন।

প্যারিসে একদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার ও অন্যদিকে উত্তর ভিয়েতনামের লে ডুক থো ও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের মাদাম বিনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে স্বাক্ষরিত এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি। এই কৃতিত্বের জন্য ডঃ কিসিঞ্জার নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন।

এই যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুসারে সর্বশেষ মার্কিন সৈনিক দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাটি ছেড়ে গেল ১৯৭৩ সালের ২৯ মার্চ তারিখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের শেষে হিসাব করে দেখা গেল, এই যুদ্ধে ৫০ হাজারেরও বেশি মার্কিন সৈনিক প্রাণ দিয়েছে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সঙ্গে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সংশ্রবের অবসান ঘটলেও গত দু'বছর যাবৎ দক্ষিণ ভিয়েতনামে কিন্তু রক্তপাত ও লোকক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল। নোবেল শান্তি পুরস্কার একটা মিথ্যার প্রহসনে পরিণত হচ্ছিল।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধের অন্তিম পর্যায়। এই পর্যায়ে থিউ সরকার তাঁর সেনাবাহিনীকে মধ্যাঞ্চলের মালভূমি থেকে সরিয়ে এনে সায়গন ও মেকং ধ্বীপ অঞ্চলের প্রতিরক্ষা বেষ্টনী দৃঢ় করার একটি পরিকল্পনা চালু করতে গিয়ে এই পশ্চাদপসরণ একটা চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ বিনা যুদ্ধেই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। শত শত কোটি ডলার মূল্যের মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে তারা পালিয়ে যায়। এখন বাকি শুধু ভিয়েতনামের রক্তাক্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটি—বিজয়ী মুক্তিবাহিনীর সগৌরবে সায়গনে প্রবেশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক দম্ভের এই চূড়ান্ত পরাজয়ের দিনে আমেরিকা যে ব্যাপারটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন সেটি হল এই যে, সারা দেশ মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে যাওয়ার আগে কিভাবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে হাজার পাঁচেক আমেরিকান ও সম্ভব হলে লাখ দুয়েক মার্কিন-অনুগত দক্ষিণ ভিয়েতনামীকে সরিয়ে আনা যায়। যে আশ্রিত মানুষগুলি এতদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখ চেয়ে এসেছে আজ তাদের শত্রুর মুখে ফেলে রেখে আমেরিকা সম্পূর্ণ হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষগুলি-সহ সারা পৃথিবীর মানুষ আজ এটা চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে। সময়মত আমেরিকানদের সরিয়ে আনতে না পারলে তাঁরা হয়ত একই সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর ও থিউবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদের আর এক ভাবনা বিপদের দিনে বন্ধু বিসর্জনের এই দৃষ্টান্ত সারা পৃথিবীতে আমেরিকার বন্ধু-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রেসিডেন্ট ফোর্ড তাই ঘোষণা করেছেন যে, বন্ধু-রাষ্ট্রগুলিকে আশ্বস্ত করার জন্য তিনি এইসব রাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে আলাদা করে আলোচনা আরম্ভ করবেন।

ইন্দোচীনের মানুষ আজ বহু বৎসর বাদে যখন স্থায়ী শান্তি ও স্বাধীনতার আশা করছেন তখন সারা পৃথিবীতে পর্যবেক্ষকরা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন, মুক্ত ইন্দোচীনের দেশগুলির রাজনীতি অতঃপর কোন খাতে প্রবাহিত হয়—রুশ ও চীন প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় কোন পক্ষ কতখানি জয়ী হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির সরকার বিরোধী শক্তিগুলি অতঃপর ভিয়েতনাম থেকে কতখানি অনুপ্রেরণা, সাহায্য বা প্রশ্রয় পায় কাম্বোডিয়ার নতুন সরকারের মধ্যে কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট শক্তিগুলির বিন্যাস কিভাবে হয় ইত্যাদি।

কবিতা

বিছানা ॥ বিজয়া মুখোপাধ্যায়

বিছানাটা মাঝে মাঝে বড় হয়ে যায়
মশারির চারপ্রান্তকে ছুঁয়ে থাকে বম্বে মাদ্রাজ
দিল্লি ও কলকাতা।
দুপাশে হাত ছড়ালে নির্বাধ প্রসার
ঘর্মাক্ত মদির হাওয়া নিরুদ্দেশ
চাদরে পরিপাটি শীত
শরীর ক্রমশ দীর্ঘ আর বিছানাটা চওড়া।
ভোর ছ'টাকে মনে হয় দ্বিপ্রহর
মাথা ধরে, গলায় উঠে আসে মস্ত একটা ঢিল।

হঠাৎ বিছানাটা বড় হয়ে ওঠে
মশারিটা ছাড়িয়ে যায় বম্বে দিল্লি আর মাদ্রাজের
উপকূল ঘেঁষে—
যতদিন না শুনতে পাই টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম
যতদিন না হঠাৎ বিছানাটা আবার হয়ে ওঠে
সরু, ঘর্মাক্ত ও স্বাভাবিক।

মানুষের করণীয় ॥ প্রণব মাইতি

সময়ের দেয়াল ছুঁয়ে ধাক্কা দ্যায় দীঘার প্রবাহ
অলস শরীর নিয়ে খেলা করে সামুদ্রিক ঢেউ
একরাশ গাঙচিল ছোঁ-মেরে টুকরো করে মন
তবুও দেওদার গাছ ঢেলে দ্যায় লম্বমান ছায়া
অগত্যা পায়রাব ডানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে যায় দিন
নদীর সৈকত ছুঁয়ে একদল বিবাগী ট্যুরিস্ট
দিগন্তের নামে তারা দিব্যি করে গিলে নেয় ঢেউ
কেউ কেউ তবু তারা জীবনের উঠোনে খেলায়
মেলায় ওখানে কিছু জীবনেব নগ্ন দেয়াল
জীবনে উঠোনে কিছু ফুল টবে ফোটে কুঁড়িময়
তন্ময় চিল তবু খুঁজে নেয় স্রোতময়ী নদী থেকে মাছ
বোহিসেবী কিছু ছায়া মুখে নামে আলপনার মত'

সামুদ্রিক পাখিরাও অবেলায় ফিরে যায় প্রবাসের পথে
অথচ সময় আর সৈকতের পাশাপাশি মানুষ কি করে!

অবিশ্বাস্য ॥ শান্তি সিংহ

আমার বুকের রক্তে গড়া প্রতিটি স্বপ্ন
হামাগুড়ি দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে জয়করা ক'ফালি ভূখণ্ড
দীর্ঘশ্বাসের আগুনে জ্বলে-ওঠা ব্যর্থতা ও পরাজয়
ট্রাক্টরের দাঁতাল ফলায় মাটি কাটার দুঃখ ও আনন্দ
সবই আজ পৌষালি জ্যোৎস্নারাতের চন্দনমণি পাহাড়
আমি খরগোসের মতো অতিক্রান্ত দূরত্বের পথে দৌড়াই
বেদনার দানার মতো লাল চঞ্চল চোখে কী সব ভাবতে থাকি...
ভাবতে ভাবতে পেরিয়ে যাই নদী নালা সোঁদাগন্ধ...
আমার শরীরে বাদামী জোয়ার নিয়ে আসে কাঠ গোলাপের স্মৃতি
জোনাক-জ্বলা-আলোয় অশথপাতার পতপত আওয়াজ
অর্জুনের পরুষ শরীরে কাঠঠোকরার ঠকাঠক্ শব্দ
আমার ভালো-লাগা বোধ আমার দুঃখ সবই নিভে যায়
রাতের অন্ধকারে হিমেল জ্যোৎস্নায় আমি প্রবল ঘামতে থাকি
মরামাছের মতো স্থির চোখে ভরাভাদ্রের নদী হতে চাই
আমার স্বপ্ন আমার ভালোবাসা হঠাৎ কেউটের মতো ছোবল তোলে
চমকে গিয়ে নিজেকেই নিজের অসম্ভব অবিশ্বাস্য মনে হয়

সুরের আগুন

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রথম যুগে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে অনস্বীকার্য ভূমিকা নিঃসন্দেহে পঙ্কজ মল্লিক সায়গল ও কানন দেবীর। ছায়াচিত্রের পথ বেয়ে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের ছায়া আলোতে মিশে মানুষের প্রাণের দ্বারে না পৌঁছলে এ গান এত সহজে 'পিপলস সং' হয়ে উঠতে পারত না।

পরের যুগে এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কবির গানের এই দুর্বার গতির মাতন জাগাবার কৃতিত্ব একান্তভাবেই তাঁর আর এইজন্যেই আমাদের অনেক কৃতজ্ঞতার তিনি ন্যায্য পাওনাদার।

রবীন্দ্রসঙ্গীত তার রসমূল্য, ইত্যাদি গম্ভীর কথা বোঝবার মত বয়স, জ্ঞান কিংবা উপলব্ধি কোনোটারই অধিকারী তখন হইনি (এখনই বা কতটা হয়েছি?)। নিতান্তই স্কুলের ছাত্রী। তবু মনে দোলা দিত তাঁর প্রাঙ্গণে মোর শিরীষমাথে আমার আর হবে না দেরী' 'হে নিরুপম', 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে', 'তোমায় গান শোনাব'। (ফাগুন মাসের উচ্ছ্বাস মনকে উদাস করে দিত সে কোন অলখজনের চরণধ্বনিতে। নিরুপমার বিহ্বল তানে অবশ আবার পাগলা হাওয়ার গতির ছন্দে উধাও।) এতসব গানের মাতনে তখনকার তরুণ চিত্তগুলিকে স্বপ্নময় করেছিল যাঁর গভীর গম্ভীর কণ্ঠ 'ঘুমঘোরে গানীয়া' তিনিই। এসব গানের সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগীদের চিত্তে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। কারণ এ অনুপম ভাবমাধুরীর সঙ্গে তিনিই রসিকচিত্তকে পরিচিত করেছেন।

অথচ রবীন্দ্রিক বলতে সচরাচর যা বোঝায় হেমন্তবাবু তার ধারকাছ দিয়েও যান না। তিনি গান তাঁরই নিজস্ব ঢঙে। কোনো কোড ডগমার সফিস্টিকেটেড ছাঁদে নয়। সাদামাটা সহজ সরল ভঙ্গিতে। সুরের কারুকার্যের মনোহারিত্ব নয় কায়দার বঙ্কিম ঠাটের চলনও নয়। একেবারে সোজাসুজি মনের সামনে এসে দাঁড়ান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কাছে এসে বসেন আপন অধিকারের জোরেই। কলিংবেল টিপে, আগমনবার্তা ঘোষণা নয়; ড্রয়িংরুমে বসে প্রতীক্ষাও নয়। একেবারে বিনা-

আমার মন রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে ঝুঁকেছে পঙ্কজ মল্লিকের গান শুনেই। আর এই হিসেবে তাঁকেই আমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু বলা যায়। —হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

ভূমিকায় অন্দরমহলে প্রবেশ। সহজ হতে পারার এই দুর্লভ মাধুর্য আছে বলেই হেমন্ত আজও নিঃশেষ হয়ে যাননি। গত তিন দশকেরও বেশী তিনি জনপ্রিয়তার আসনে সম্মানের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

গলার আওয়াজ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পরিভাষায় যাকে বলে 'জোয়ারী' তাঁর গানের অন্যতম আকর্ষণ হলেও শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নয় হেমন্তদার গলার আওয়াজটি কেমন? কিসের মত? (অনেকবার ভেবেছি। নিজে অচঞ্চল থেকেও অন্যকে চঞ্চল করেন, নিজে নির্বিকার অনাসক্ত কিন্তু শ্রোতাদের সুরের নেশায় কেমন যেন নেশাগ্রস্ত করে তোলেন এ কোন মায়া? সমুদ্রের ঊর্মি-মুখরতা নয়—এলোমেলো হাওয়ার অস্থিরতাই বা কই?) মনে হয় দাবদগ্ধ দিগন্তে হঠাৎ ঘনিয়ে আসা মেঘের শ্যামল আশ্বাসভরা গুরু গুরু গর্জন। গান শুরু করা মাত্রই স্তব্ধ পরিবেশ। শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু তবু বলব গলার আওয়াজেই তাঁর গানের একমাত্র আকর্ষণ নয়। অনেক কিছু মিলেই গড়ে উঠেছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আকর্ষণীয় সঙ্গীত-ব্যক্তিত্ব। এ যেন তাঁর সহজাত আলোর মতই, অন্যান্য গানকে যতখানি স্পষ্ট করে তোলে ঠিক ততখানি স্বচ্ছ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মবাণীকে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার জন্য তাঁর অতিরিক্ত কোনো সচেতনতা নেই—নেই কোনো দুরূহ প্রয়াস অথবা ওভারসিরিয়াস পোজ। আবেগ বা অনুভব ত সকল শিল্পীরই অল্পবিস্তর আছে। কিন্তু হেমন্ত মুখার্জির অনুভবের স্বরূপটি কি? কোথায় তিনি অনন্য?

এই প্রশ্নটিই সেদিন রাখলাম হেমন্তদার সামনে আমাদের উভয়েরই অনবকাশের উজান ঠেলেই।

'আমি ভাল গান গাইতে চেয়েছিলাম, সে যার গানই হোক। এর গান ভাল—ওর গান খারাপ এরকম কোনো সীমারেখা টেনে চললে শিল্পীমন সংকুচিত হয়ে যায় বলেই আমার বিশ্বাস। কোনো সুরকার অথবা গীতিকারকে আমি সামান্য বলে মনে করি না। কারণ সকলের সৃষ্টিই (সেটা এতটুকুই হোক আর এতবড়ই হোক) জন্ম সৌন্দর্য প্রেরণা থেকে। তবে গাইবার আগে ভাল করে বুঝে নিতে হবে—যাঁর গান গাইছি তাঁর প্রকাশভংগির বৈশিষ্ট্য কি? কোন গান দিয়ে তিনি কি বলতে চান? এবং কিভাবে?

প্রথম প্রথম স্বরলিপি দেখেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছিলাম। তারপর নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেবার পর এলাম পঙ্কজ মল্লিকের সংস্পর্শে। তখন বুঝলাম রবীন্দ্রসঙ্গীত কি জিনিস। কত গভীর অতলস্পর্শী এর ভাব। বলতে গেলে—পঙ্কজদাই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে—'

'কিন্তু একটি কথা—' হেমন্তদাকে বাধা দিয়েই বলি—রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা কি মুক্তি পরিচয় অথবা জীবনমরণের মুষ্টিমেয় কয়েকটি গান থেকেই শুরু হয়নি? তার আগে রবীন্দ্রসঙ্গীত সীমিত ছিলো সমাজের অতিবিদগ্ধ গম্ভীর মধ্যে। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের চারপাশে ঠাকুর-বাড়ীরই প্রগতিশীলা স্বল্পকয়েকজন মহিলার মধ্যে। শুনেছি মাঝে মাঝে দু-একখানা রেকর্ডে 'তব চরণতলে' বা এই ধরণের ব্রাহ্মসঙ্গীত জাতীয় গানকেই সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে জানতেন এবং সসম্ভ্রমে তার থেকে দূরে থাকতেন। এ গান বারবার শোনবার অথবা আনপমনে গাইবার প্রেরণা অনুভব করতেন না।'

'কথাটা হয়ত ঠিক, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে কোনো শিল্পের প্রথম স্টেজ যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন তার একটা বিশেষ দাম আছেই। আমার মন রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে ঝুঁকেছে পঙ্কজ মল্লিকের গান শুনেই। আর এই হিসেবে তাঁকেই আমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু বলা যায়। তাঁর আগে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েদের পরিসর সত্যিই খুব ছোটো ছিলো ঐ তুমি যে কথা বললে। একটা বিশেষ গোষ্ঠী কবির গানকে নিজেদের মনোপলাইজড প্রপার্টির মতন আগলে রাখতে চাইতেন। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে যেন প্রচণ্ড প্রতিবাদের মত রুখে দাঁড়ালেন পঙ্কজ মল্লিক।

গুরুদেব নিজের গানের সম্বন্ধে খুবই স্পর্শকাতর ছিলেন। তাঁর নিজের প্রকাশ-ভংগির বাহন ছিলো তাঁর গানের সুর। এর মধ্যে কোনো রদবদল বরদাস্ত করতে রাজী নন। কিন্তু তবু তিনি পঙ্কজবাবুকে 'দিনের শেষে' গানটিতে সুর দেবার এবং ছায়াচিত্রে এ গান ব্যবহার করবার অনুমতি দিলেন। এ নিয়ে তাঁর প্রিয়জনমহলে আপত্তি এবং অভিমানের গুঞ্জন কি ওঠেনি? উঠেছিলো। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ মত দিলেন কেন? কবি তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রতিভাকে চিনেছিলেন পুরুষ-কণ্ঠের ওজস বলিষ্ঠতা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রবাহ যা আগে ছিলো না—তাই দিয়ে যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে

প্রকাশিত হয়েছে

কথাসরিৎসাগর আশাপূর্ণা দেবীর নবতম উপন্যাস

হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা ১০·০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সব ফুল কিনে নাও ৮·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
ফেরারী অতীত ৭·০০

বীরেন্দ্রনাথ সরকার
গৌরী গঙ্গা ৯·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
মন জানে না ৭·০০

শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়
সুখের আড়াল ৫·৫০
ঘরের পথ ৬·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
তোমার আমার নীল লোহিতের চোখের সামনে
৪·০০ ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবী
ভালবাসার মুখ ৫·০০
তরঙ্গহীন ৫·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
একবোন পারুল ৬·০০
বনকরবী ৬·৫০

চিরঞ্জীব সেন
রাসিয়ান রুবির রহস্য
৭·০০

অনিল রায়
সোনার পাতায় রক্ত
৭·০০

সাহিত্য সংস্থা ॥ ॥ ১৮সি টেমার লেন ॥ কলিঃ—৯

নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন পঙ্কজদা তাঁর একান্ত ব্যক্তিত্বে। গীতিকাব্যের মধ্যে ব্যথ বেদনা অশ্রুজলের সিক্ততা মিলে এমন এক অপরূপ মাধুর্যের সৃষ্টি হোলো যে কবি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এ কোয়ালিটি প্রসাদগুণ আগের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে ছিলো না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পঙ্কজ মল্লিককে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যুগস্রষ্টা নিশ্চয় বলা যায়। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর মত পরিবর্তন করতে যতখানি অন্তর্দ্বন্দ্ব আর যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ঠিক ততখানি বিরুদ্ধ মতামতের আঘাত পঙ্কজবাবুও সহ্য করেছেন। কিন্তু এঁদের সংগ্রামের দাম ভাবীকাল দিয়েছে। আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের বন্যা কূলপ্লাবী। আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুভবের দ্বার খুলে দিয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অফুরন্ত প্রাচুর্য। আর জাতির জীবনে এতবড় সাংস্কৃতিক বিপ্লব কখনই ঘটত না —যদি কবির গান জনমানসের দ্বারে না পৌঁছে একটা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত।

আর একটা কথা। তখনকার যুগ এখনকার মত প্রগ্রেসিভ ছিলো না। রক্ষণশীল দলের ভ্রূকুটি যথার্থ প্রতিভার সৃজন প্রয়াসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু প্রগতির বিপ্লবের রাজরাজেশ্বর রবীন্দ্রনাথ তখন বেঁচে। এইখানেই হোলো পঙ্কজবাবুর জিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে আত্মজের মত ভালবাসতেন বলেই পঙ্কজবাবুকে এতখানি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু যদি তিনি তখন না থাকতেন আর তাঁর গানের অভিভাবকদের হাতেই থাকত কবির গান দেওয়া নেওয়ার ভার তাহলে পঙ্কজবাবুর ভাগ্যে কি ঘটত বলা যায় না। আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তাও এত তাড়াতাড়ি এগোতো না।

এবার বল পরের প্রশ্ন কি? স্বচ্ছ গম্ভীর দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে হেমন্তদার।

'বড় শিল্পী যেমন তাঁর গায়কীর ব্যক্তিত্ব দিয়ে শ্রোতা গড়ে তোলেন বিদগ্ধ শ্রোতারাও তাঁদের শ্রবণ মনন রুচি প্রকৃতি দিয়ে শিল্পীর প্রকাশভংগিকে আরো সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ করে তোলেন না কি?'

'নিশ্চয়। শুধু বিদগ্ধ কেন সাধারণ শ্রোতার অবদানও এতে যথেষ্ট।'

'কিভাবে?'

'ধর সাধারণ শ্রোতা ধ্রুপদী বা ভাবগম্ভীর গান পছন্দ করছেন না অথচ সব শ্রোতাকেই খুশী করবার দায়দায়িত্ব শিল্পীর আছে বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে শিল্পীকে ভাবতে হবে কিভাবে রবীন্দ্র অনুভূতির মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না করে সুরের নানারঙ্গ আকর্ষণে সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের মন ছোঁওয়া যায়। তখনই খোঁজ পড়ে নানান ছন্দের মধুর সুরের ও সহজ ভাবের সুন্দর গানের। এতে শিল্পীর অতি সঞ্চয়ের ভাণ্ডার বিস্তৃত হয়, শ্রোতাদের সঙ্গে একাত্ম হবার ক্ষমতা জন্মায়। আর এইসব ছোটখাটো আবেগের পথ বেয়ে অনেক সময় এমন বড় অনুভবের রাজ্যে হঠাৎ পৌঁছে যাওয়া যায় যা গুরুগম্ভীর গানের সাধ্য হয় না। এটা শিল্পীর শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই লাভের। শ্রোতাদের মন বড় কছুকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয় আর সকল রকম গানে ওয়াকিবহাল হয়ে অল্পতেই শিল্পীর সবরকম শ্রোতাকে আকৃষ্ট করবার দক্ষতা জন্মায়। গায়কীর ডাইমেনশনও বাড়ে।

ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের গুরু হলেও রবীন্দ্রনাথ গুরুদেব প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কোন এক বিশেষ বৃত্তে আবদ্ধ থাকলে জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটে না। মুক্ত, নির্ভীক দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলেই উনি একথা বুঝতে পেরেছিলেন আর অনুভব করেছিলেন, আরো এগোন দরকার—এ্যান্ড ইট ইজ ফর দি নন-টেকনিক্যাল এ্যান্ড আনসাফিসটিকেটেড পিপল। সেইজন্যই রবীন্দ্রসঙ্গীতে জীবনের প্রতিটি দিকের এমন হৃদয় ছোঁওয়া অনুসরণ।

রবীন্দ্রসঙ্গীত যিনি গাইবেন একটি বিষয় তাঁকে মনে রাখতে হবে। এ-গানে কথার স্থান সবার ওপরে। সেইজন্যে আমি কথার পারফেকশনের ওপর চিরকাল জোর দিয়েছি। প্রতিটি কথা ও তার ভাব উচ্চারণ দিয়ে স্পষ্ট করে তোলা দরকার। আর একটি কথা — রবীন্দ্রসঙ্গীতে মানে কোন বিশেষ ছাঁদের প্রাণহীন উচ্চারণ নয়। এ হচ্ছে প্রাণের নিভৃতলোকের অতি সুকুমার, অতি পেলব অস্ফুট অনুভবের মধুর প্রকাশ এ অনুভব নিজেকে জানান দিতে চায় না বলেই এর প্রকাশভংগীতে একটু সলাজ মধুরতা থাকা দরকার। এই কথাটি মনে না রাখলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে যাওয়াই একটা পণ্ডশ্রম।

শান্তিনিকেতনী অথবা রবীন্দ্রিক কথাগুলিতে আমি বিশ্বাসী নই। কোন বিশেষ গায়নরীতি বিশেষ শিল্পীকে মানায় —তার নেচার টেম্পারামেন্টের সঙ্গে খাপ খাওয়ার দরুন। ঐ ধরনের গায়কীতে তিনি সিদ্ধ বলেই সার্থক। কিন্তু তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন বলেই তাঁর মত করে গেয়ে সকলেই জনপ্রিয় হতে পারবেন একথা ভাবাটা ভুল।

শান্তিনিকেতনের সব শিল্পীকে একত্র কর। দেখবে অধিকাংশই তেমন এ্যাপিলিং নন—কয়েকজন ব্যতিক্রমী ছাড়া। কিন্তু যাঁরা শিখিয়েছেন তাঁরা কি আর কাউকে যত্ন করে শেখান নি? তা ত হতে পারে না। তবু আর কেউ তেমন ইম্প্রেস করতে পারলেন না কেন? কথাটা ভাববার মত।

আপনি ত নিজেকে সব সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্টাডি করেন। সেইজন্যই জিজ্ঞেস করছি রবীন্দ্রসঙ্গীতে আপনার অনতিক্রমী জনপ্রিয়তার কারণ কি? উচ্চারণ?

জনপ্রিয়তায় আমি অনতিক্রমী কিনা জানি না। কিন্তু যদি কিছু জনপ্রিয়তা হয়েই থাকে তার কারণ এই যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমি অন্যান্য গানের মতই সহজ হতে চেয়েছি। একসপ্রেসনে যাতে কোনরকম আড়ষ্টতা না থেকে স্বাভাবিক হয় সেই চেষ্টাই করি। হয়ত সেইজন্যই সবাই আমার গান একটু-আধটু ভালবেসে থাকে।

গান গাইবার সময় আমি মনে রাখি যে গান দিয়ে আমি কথা বলছি। সকলের কণ্ঠস্বর এক নয় কথা বলার স্টাইলও আলাদা। আবার সব কথাই সমান টোনে আমরা বলি না। গান গাওয়াটা কথা বলার মত স্বাভাবিকভাবে নিলেই তা লোকের মনের দ্বারে সহজে ধাক্কা দেয়। যেমন ধর আমরা হঠাৎ কথাটা উচ্চারণ করবার সময় হঠাৎ বলি না হটাৎ বলি? হটাৎ—তা? অথচ গাইবার সময় অতি শুদ্ধ হতে যেয়ে অনেকে হঠাৎ উচ্চারণ করে থাকেন। এর ফলে একসপ্রেশনের মধ্যেও একটা কৃত্রিমতা এসে পড়ে। তাতে রসের প্রবাহ সাবলীল থাকে না।

আমার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রিক মহলের অনেকেরই অভিযোগ এই যে আমি কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরুর কাছে গান শিখি নি। কিন্তু এর উত্তরে এই কথাই বলব—আত্মপ্রকাশের দুর্বার তাগিদে আমি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও একধারে গুরু ও পথদ্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছি আমার যা কিছু শিক্ষা সাধনা সব তাঁরই কাছে। আমি ক্লাসিক্যাল গান শিখি নি। কিন্তু ঐ একটি মানুষকে অধ্যয়ন ও অনুসরণ করে গানের মধ্যে কোথায় কিভাবে ক্লাসিক্যাল ডিগনিটি আনতে হয়, সেটা অজানতেই কিছুটা রপ্ত হয়ে গেছে। এটা আমার কোন সচেতন প্রয়াসজাত বস্তু নয়। আর আমার এই অন্বেষণে আলোকস্তম্ভের মত পথ দেখিয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসঙ্গীতগুলি। কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে একটা প্রসঙ্গ পরিষ্কার করে নিই। রবীন্দ্রনাথের গানের ছোটখাট ইঙ্গিত, পথরেখা ধরে আমি এমন একটা নির্মল আনন্দের রাজ্যে পৌঁছেছি যে কারো কোন বিরুদ্ধে সমালোচনা আমায় আর দমাতে পারবে না। কারণ আমি যে দেখতে পেয়েছি আমার এই বিরামহীন খুঁজে বেড়াবার আন্তরিকতাকে সকল শ্রেণীর শ্রোতা কতখানি দাম দিয়েছে।

আমি যখনই রেকর্ড করেছি যতদূর সম্ভব স্বরলিপিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই গেয়েছি। অথচ ষ্টেজে বা পারফরমেন্সে গাইবার সময় স্বরলিপি দেখে গাই নি। গানে সত্যিকারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই স্বরলিপি সামনে না রেখে গাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

কখনও আমার রেকর্ড নিয়ে বিশ্বভারতীর সঙ্গে কোন বিবাদ ঘটে নি। কারণ আমার ওপর তাঁদের এ বিশ্বাস আছে যে স্বরলিপি নির্দিষ্ট গানকে আমি কখনও

স্থানচ্যুত করব না। আর এ-বিষয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের কঠোরতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য এই নিয়মবদ্ধতার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। নইলে রবীন্দ্রসংগীত ও নিধুবাবুর টপ্পাতে কোন প্রভেদ থাকে না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব স্বরলিপি সামনে রেখে গান গাইবার যে প্রথা শান্তিনিকেতন চালু করেছে সেটা আমি একটুও সমর্থন করি না। বড় শিল্পীদেরও দেখেছি স্বরলিপি সামনে রেখে গাইতে। কোন শিল্পী যখন আপনহারা হয়ে গান—তখন স্বরলিপির দিকে দৃষ্টি যায়? না যেতে পারে? ওদেশের শিল্পীদের মধ্যে এটা কমপালসারী কারণ স্বরলিপির মধ্যে ভল্যুম ছোট-বড় করার ইঙ্গিত ভয়েস ট্রেনিংয়ের পদ্ধতি আমার মতে লয় থেকে লয়ান্তরে যাবার বিশেষ ভঙ্গী সবই বাঁধাধরা। তাই লিপিবদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশের গান ভাবপ্রধান এবং আবেগনির্ভর। কাজেই এ-গানের ব্যাপকতা অনেক বেশী। স্বরলিপি দেখে গাইলে এ ব্যাপকতা অনেকখানিই সঙ্কুচিত হয়ে যায়। স্টেজে যখন আমি গাইতে বসি—সামনে বই খোলা থাকলেও স্বরলিপির দিকে আমার দৃষ্টি কখনও যায় না।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে যেটুকু প্রবেশ করতে পেরেছি তার মূলে আছে তাঁর নৃত্যনাট্যগুলির অবদান। নৃত্যনাট্যগুলি যেন গরুর মত পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে।

আর একটু বুঝিয়ে বলুন না?

নৃত্যনাট্যগুলি হল রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সৃষ্টি। এর মধ্যে রয়েছে চিন্তার অসাধারণ একসপ্রেশন। আজকে জগৎ ছোট হয়ে গেছে এক সেকেণ্ডে মানুষ পৃথিবীর অপর প্রান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানের গান-বাজনার সুর জেনে-শুনে নিতে পারে। কিন্তু তখন তা ছিল না। কখন? যে সময়ের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ দিয়েছেন। কল্পনার দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়েছে নাটকের নানা ধরনের চরিত্রের দ্বন্দ্ব, বেদনা ও সংঘাতের ওঠা-পড়া। কথার এখানে একটা মস্তবড় ভূমিকা রয়েছে। শুধু সুর নয় শুধু কবিতা নয় সংলাপের তুলনাবিহীন সৌন্দর্যে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

চণ্ডালিকার কথাই ধর না। ভাবনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লয়ের গতির রূপান্তর। লয়ের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে ছবির মত মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আবেগ যেন স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। প্রথমে চণ্ডালিকার বিষণ্ণ—কেন জন্ম দিলি মা? অপমানিত চিত্তের করুণ জিজ্ঞাসা। টেম্পো এখানে কত মন্থর। আমাদের যখন মন খারাপ হয়ে থাকে আমরা কি তখন তাড়াতাড়ি কথা বলি? না তাড়াতাড়ি হাঁটি? — তাই সংলাপের মর্ম এখানে ধ্বনির গতিতেই ধ্বনিত। তার আগে মায়ার সংলাপ লক্ষ্য কর। সারাদিন কাজকর্ম করে ঘরে ফিরে এসে দ্যাখে প্রকৃতি আনমনা। ঘর-দোর অগোছাল। বাইরে থেকে তেতেপুড়ে মানুষ যখন বাড়ী ফেরে তখন মনের মত পরিবেশ না পেলে বিরক্ত হয়ে চেঁচামেচি করে বাড়ীর লোকদের সঙ্গে উচ্চগ্রামে কথা বলে। তাই মায়া যেন তারস্বরে চিৎকার করে মেয়েকে বকতে থাকে কি যে ভাবিস তুই অন্যমনে? নিষ্কারণে? বেলা বহে যায় বেলা বয়ে যায় যে।

এখানে প্রতিটি কথার একসপ্রেশনকে ব্যক্ত করা হয়েছে লয়ের গতি দিয়ে। একই রিদমে চলেছে। কাহারবাই দাদরার ধার দিয়েও গেলেন না। আনন্দ এসে জল চাইলেন।

সে এক অন্যরাজ্যের মানুষ অন্য অনুভূতিতে আচ্ছন্ন তার মন; নিস্পৃহ বৈরাগীর একটি গণ্ডূষ জল প্রার্থনা—লয় এখানে শান্ত মন্থর। অস্পৃশ্যর কাছে এই একটি গণ্ডূষ জল প্রার্থনায় প্রকৃতির মনের ভেতর যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। তার এত দিনের জমান নিষ্ফল বেদনা, অভিমান যেন প্রচণ্ড আবেগে বেরিয়ে এল—ক্ষমা করো মোরে ক্ষমা কর প্রভু আমি চণ্ডালীর কন্যা—এখানে ডবল লয়ে মনের উত্তেজনার দুরন্ত প্রকাশ।

তারপর কিছুক্ষণের জন্য সাম্ললেন্স। সব একেবারে নিশ্চুপ। প্রকৃতি চঞ্চলা কিন্তু আনন্দ অচঞ্চল। তার কোন তীব্রতা তীক্ষ্ণতা অথবা দ্বিধা নেই। নির্বিকল্প, এক বিরাট পার্সোনালিটি। তার চরিত্রের গাম্ভীর্য ও মর্যাদাকে রূপ দেবার জন্যই যেন অনেক নীচু পর্দায় মন্দ্রিত হল তার বাণী—বেই মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা আজ প্রকৃতির জলদানের পর তার চেয়েও মন্দ্র সুরে কল্যাণ হোক তব কল্যাণী বলে ধীরে প্রস্থান। কখনও লয়ের রূপান্তর কখনও সামান্য একটি কোমল পর্দার ছোঁওয়ায় অন্তরের কত নিভৃত চাওয়া মূর্ত হয়ে ওঠা (যেমন ফুল বলে ধন্য আমিতে দেবতা ওগো অথবা নয়ন তোমার নত কর) এসব যখন লক্ষ্য করি বিস্ময়ের সীমা থাকে না অবাক হয়ে ভাবি। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি মন সুধাকরই নন কত বড় মিউজিশিয়ান ছিলেন। আর তার চেয়েও বড় স্রষ্টা।

শুধু কি তাই? জীবনকে এমন করে খুঁটিয়ে দেখেছেন চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন থেকেছেন বলেই প্রতিটি প্রকসপ্রেশন এত স্বাভাবিক এত বাস্তব। যথা—?

দ্যাখো না তার অপরিণত বয়সের রচনা 'মায়ার খেলাতেই, 'দেলো সখি দে—পরায়ে দে গলে—যতনে কুসুম ফুলহার'। এখানে একটি মেয়ে সাজছে। সাজার আগে সাজের সম্বন্ধে তার একটি পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছে? তারপর যখন সাজ শুরু হোলো—তার বাস্তবতা। মেয়েরা যেমন বলে না? শীগ্গির চিরুনীটা দে, মাথার ফুলটা কোথায়? দে, দেরী হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশ করবার জন্যই যেন 'দেলো সখি দে, পরায়ে দে গলে' অবধি বেশ ঢিলেঢালা চলন তাই লয় এখানে বিলম্বিত। আবার হার পরার জন্য তাড়াহুড়ো,—তাই যতনে কুসুম ফুলহার দ্রুতলয়ে। এইভাবে জীবনকে উনি নানান দৃষ্টিকোণ থেকে অনুরাগ ভরে দেখেছেন—আর সেই নিবিড় করে দেখার, পাওয়ার আস্বাদের মাধুর্য নিয়ে ভরে দিয়েছেন গানের সুর কথা বিশেষ করে নৃত্যনাট্যে; ভাবের আনাগোনা যেখানে সহজ, স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। তাই বলছিলাম রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি যেন আমায় গরুর মতই পথ দেখিয়েছে। রবীন্দ্র-মানসলোকে পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর সবকথা বুঝেছি বা সব অনুভূতিকে আমার গানে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছি এমন কথা বলি না। রবীন্দ্রনাথকে যদি সবটা বুঝতে পারতাম তাহলে তো সাধকই হয়ে যেতাম। তবে যেটুকু বুঝেছি তার আনন্দেই মনটা এমন ভরপুর হয়ে আছে যে বেশী বুঝতে চাই না। এই ফাঁকে এই কথাটিও জানিয়ে রাখি যে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য গীতিনাট্যগুলিই আমার সুর-রচনারও প্রেরণা। নাটকীয় সংঘাতের ধারাতে যথার্থভাবে অনুসরণ করলে শ্রোতার মনে দোলা দেওয়া সহজ হয়ে ওঠে। আর কি বলব? এই ত আমার রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার ইতিহাস, দর্শন যা বল।

রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য সৃষ্টিকে হেমন্তবাবু যেভাবে অনুভব করার সাধনা করেছেন সেটাও রীতিমত সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। মার্বান্দ্রিক না হয়েও রবীন্দ্র-গীতের শ্রেষ্ঠ গায়কদের পুরোভাগে এঁর স্থান সেই কথাটা স্বচ্ছ হোলো তাঁর সঙ্গে আলোচনায়। স্বচ্ছ হোলো আর একটি সত্যও যে খোঁজার আন্তরিকতা থাকলে বহুমূল্যের বস্তুও আপনিই ধরা দেয় হাতের মুঠোয়। এইজন্যই কি বেথেলহেমের সত্যসন্ধানী ক্রুশবিদ্ধ মানুষটি বজ্রাঘাত বেদনার মধ্যেও যন্ত্রণার মুহূর্তেও বলেছিলেন খোঁজো—মিলবে। চাও—পাবে; আঘাত কর, দুয়ার খুলবে?'

সন্ধ্যা সেন

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

তখন রাত কত খেয়াল নেই, ঘরের ভেতর অতি ক্ষীণ একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। এমনিতে ঘুমুলে আমাকে জাগিয়ে তোলা রীতিমত কুম্ভকর্ণের নিদ্রা-ভঙ্গের সামিল, কিন্তু জবরদস্ত শীতের দৌরাত্ম্যে ঘুমটা হেমন্তের হিমের মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তাই সামান্য শব্দটুকুও কানে বাজল। চেয়ে দেখি অন্ধকার ঘরের কোণে কি যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার চলেছে। দগদগে লাল ডুবুডুবু সূর্যের মত কি একটা বস্তু দপদপ করে আমার দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি ওর পাশ থেকে উঠে দাঁড়াতেই আমি শীতের ভয় ছেড়ে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে চাবপাই-এর করুণ কান্না ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতর।

কে?

নিজের গলার স্বর নিজের কানেই কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল। দরজার পাশে তখন সেই ছায়ামূর্তি সরে দাঁড়িয়েছে।

আমি ঝিন্নি।

বললাম এত রাতে? ঘুমোও নি?

মনে হলো ও খুবই সংকুচিত হয়েছে গভীর রাতে আমার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ায়। বেশ কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলল আপনার খুব শীত করতে পারে মনে করে হীটারটা জ্বালিয়ে দিতে এসেছিলাম।

ও আর কোন কথা বলল না। চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই আমি বললাম তুমি হয়ত ভেবেছ আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কিন্তু ঘুম আসছে না আমার। কেমন যেন শীত শীত করছে। লেপ কম্বলে শীতটাকে বাগে আনা যাচ্ছে না।

ও ঘুরে দাঁড়াল। বলল আজ হঠাৎ ঠান্ডা পড়েছে। তাই আপনার তকলিফ হতে পারে ভেবে পিতাজীর পুরানা হিটারটা জ্বালিয়ে দিলাম।

সাগ্রহে জানতে চাইলাম আমার বাবা বুঝি আমার মত শীতকাতুরে ছিলেন ঝিন্নি?

ও বলল নভেম্বরের শেষ থেকেই প্রতি রাতে ওঁর ঘরে হিটার জ্বালানো চাই। আমার ওপর পিতাজী এটুকু কাজের ভার দিয়েছিলেন।

বললাম তোমার ঘুমটা নষ্ট হলো ঝিন্নি। এত রাতে আমার কষ্টের কথা ভেবে এসেছ ভারী খারাপ লাগছে তাই। শীতের রাতে তোমাকে অনেক কষ্ট পেতে হল।

ও বলল আপনি এসব কথা মনে করছেন কেন? আমার হঠাৎ মনে হলো তাই ওপরে চলে এলাম। কেন জানি না বিছানায় শুয়ে পিতাজীর কথা মনে এল। ভাবলাম ওঁর স্বভাবের সঙ্গে আপনার মিল থাকা তো স্বাভাবিক। হয়তো শীতে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন।

বাবার কথা উঠলেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। অভিমান হয় কেন তিনি আমাকে তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত করলেন। মায়ের মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে রাখলেন। কিন্তু যাকে এ পৃথিবীতে আনলেন তার ওপর কেন তিনি কোন আকর্ষণ বোধ করলেন না। বাবা আর ছেলের সম্পর্ক কি শুধু কর্তব্যের?

ঝিন্নি দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ঘর। ঘুম হিটারের লাল আগুনের হাল্কা একটা আভা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে প্রথম বসন্তের হাওয়ার মত একটা উপভোগ্য উত্তাপ আমার শরীরটাকে ছুঁয়ে ভারী সুখকর এক ধরণের অনুভূতির সৃষ্টি করছে।

বললাম, ঝিন্নি বড় কষ্ট হয় বাবার কথা ভেবে। যখন বাবাকে কাছে পেয়েছিলাম তখন বাবার জন্যে তেমন কোন মনের টান ছিল না। যখন বাবাকে দেখার জন্যে মন অস্থির তখন তিনি আমার চোখের আড়ালে সরে গেলেন।

ঝিন্নি বলল, চাচাজী কিন্তু আপনাকে এখানে নিয়ে আসার জন্যে পিতাজীকে বারবার বলতেন। পিতাজীর ঐ এক কথা—নরসিংলাল আমার ছেলের মুখখানাতে যদি তার মায়ের মুখের ছাপ না থাকত তাহলে হয়ত কুলুতে আসার আগেই আমি দেশে ফিরে যেতাম। ওকে দেখলে আমি অস্থির হয়ে পড়ব।

এতদিন বাবার পালিয়ে বেড়ানোর ভেতর যে রহস্য ঘনিয়ে উঠেছিল তার ওপর নতুন একটা আলো এসে পড়ল। বাবা তাহলে তাঁর ছেলেকে ভোলেন নি। মায়ের সঙ্গে অভিন্ন আকর্ষণে আমিও তাহলে জড়িয়েছিলাম তাঁর মনের মধ্যে।

ঝিন্নি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম বড় খারাপ লাগছে তুমি দাঁড়িয়ে আছ এমনি করে। রাত অনেক হয়েছে ঘুম পেয়েছে নিশ্চয়। কোন চিন্তা নেই, ঘর কিছুটা গরম হয়ে উঠলেই সুইচটা আমি অফ করে দেব।

ও বলল আপনি ঘুমিয়ে পড়লে আমিই সাফ করে দিয়ে চলে যাব। বিছানায় না বসে থেকে শুয়ে পড়ুন তো দেখি।

হেসে বললাম একজন আমার ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে একথা ভাবলেই আমার ঘুম আসবে না। তার চেয়ে ইচ্ছে হলে আমার বিছানায় বসে গল্প করতে পার। আমার এখন ঘুম আসবে না।

ঝিন্নি বললো ভারী অদ্ভুত স্বভাব তো আপনার। ঘুমের ব্যাপারে যেমন ওস্তাদ জেগে থাকার ব্যাপারেও ঠিক তেমনি।

বললাম পরীক্ষার সময় অনেকগুলো রাত একনাগাড়ে বই নিয়ে জেগে থেকেছি, ক্লান্ত হয়ে পড়ি নি। আবার দু'এক ঘন্টা বাদ দিয়ে দিনে রাতে শুধু পড়ে পড়ে একটানা পাঁচ-সাতদিন ঘুমিয়েছি, এ নজীরও আছে।

ঝিন্নি আমার বিছানার কোণায় এসে বসল।

একটা কম্বল ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম এটা মুড়ি দিয়ে বস। শুধু একখানা গরম জামায় আর যা হোক ডিসেম্বরের শীত তাড়ানো যায় না।

ও কিছু না বলে কম্বলখানা গায়ে ঢেকে নিল।

বললাম এখন অনেকটা আরাম হচ্ছে তো?

ও বলল আমার সবেতেই অভ্যেস আছে। নাগ্‌পুরে রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর কোয়ার্টারে আমি ভোর চারটেতে উঠি। একখানা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভোর হতে দেখি।

বললাম বরফের পাহাড় আর বিপাশার দেশে থেকে তোমার শীতবোধটা একেবারেই চলে গেছে।

ঝিন্নি কিছু সময় চুপচাপ বসে থেকে অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল একটু আগে আপনি আপনার ঘুমোনো আর জেগে থাকার কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন না? আমি কিন্তু তখন আপনার ঐ অদ্ভুত স্বভাবের সঙ্গে আপনার পিতাজীর অনেক মিল দেখতে পাচ্ছিলাম।

বাবার প্রসঙ্গে কৌতূহলী হয়ে বলে উঠলাম যেমন?

ঝিন্নি বললো, পিতাজী তাঁর জীবনের অনেক গল্প আমাদের শুনিয়েছিলেন। তাতে তাঁর অদ্ভুত কতকগুলো স্বভাবের কথা জানতে পেরেছিলাম।

ও চুপ করে গেল দেখে বললাম বাবার কথা আমার জানতে বড় ইচ্ছে করে ঝিন্নি।

ঝিন্নি বলল আপনি হয়তো জানেন না পিতাজী একসময় দেশছাড়া হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হরিদ্বার পেরিয়ে সপ্তধারায় যান। সেখানে সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরের মন্দিরে মন্দিরে আরতির ঘন্টাধ্বনি শোনেন। দূরের নীল পাহাড় গঙ্গার নীল জল, নীল আকাশ, পবিত্র তপোবন সব যেন তাঁকে টানতে থাকে। সেখানে একটি মন্দিরে তিনি অনেকগুলি দিন কাটিয়ে দেন। প্রতি সন্ধ্যায় ঘন্টা বাজানোর কাজ ছিল তাঁর। ছোট-বড় অনেকগুলো ঘন্টা বিভিন্ন আওয়াজ তুলে বাজত। নির্জন প্রকৃতির বুকে সে সব শব্দ আশ্চর্য সুর তুলে ছড়িয়ে পড়ত। তিনি কান পেতে তাই শুনতেন।

বেশ বিভোর হয়ে। ছিলেন গঙ্গাতীরের মন্দিরে। হঠাৎ একদিন খেয়াল হল আমি স্বার্থপরের মত এখানে শান্তিতে বসে আছি আমার ছেলে হয়ত কষ্ট পাচ্ছে টাকার অভাবে। অমনি ব্যবসার ঝোঁক চাপল। পাহাড়ী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তিনি উল সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। পাহাড়ী মেয়েদের দিয়ে গরম পুলওভার বানালেন। সেগুলো নিয়ে সমতলের সঙ্গে ব্যবসা জুড়ে দিলেন।

এমনি যখন অনেক টাকা হল তখন আপনার কাছে কিছু পাঠিয়ে দিলেন আর বাকী টাকা তীর্থের পথে পথে কয়েকটা ঢাঁট বানানোর জন্যে খরচ করে দিলেন।

বললাম অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ ছিলেন দেখছি।

ঝিন্নি বলল, এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এলেন কুলুতে। ভারী ভাল লেগে গেল জায়গাটা। অতি সামান্য টাকা তখন হাতে। কিন্তু সম্বল ছিল ওঁর বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি দিয়েই আবার ব্যবসা শুরু হলো। ফলে ফেঁপে উঠল পশমিনার কারবার। তারপর ধীরে ধীরে মানালী আর কুলু দু-জায়গাতেই বাংলো তুললেন। কিনলেন দু-দুটো ফলের বাগান।

বললাম চাচাজীর সঙ্গে আলাপ হল কখন?

কুলুতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাচাজীর সঙ্গে আলাপ। সেই থেকে চাচাজী আপনাদের ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন।

বললাম এখনও কিন্তু তুমি তোমার পিতাজীকে নিজের বলে ভাবতে পারনি ঝিন্নি।

ঝিন্নি গলায় বিস্ময় ঢেলে বলল, কি করে একথা বলছেন আপনি? যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন তাঁকে ডাকছি চাচাজী বলে, আর আপনার বাবাকেই ডেকেছি পিতাজী বলে তাতেও কি বোঝা যায় না আমি ওঁকে কতটা ভালবাসতাম।

বললাম তাহলে তুমি তোমার পিতাজীর ব্যবসাটাকে নিজের বলে ভাবতে পারছ না কেন? বারবার ওটা আমাদের সম্পত্তি বলেই বা উল্লেখ করছ কেন?

ঝিন্নি চুপচাপ বসে রইল। বলল আপনার বাবা কোনদিন খাতার হিসেব

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
নবতম বই
তিনে একে চার ২০৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অশনি সংকেত ১০৲ অরণ্য মর্মর ৭॥

বিমল মিত্রের
তিন ছয় নয় ৮৲ পরস্ত্রী ২৫৲

শঙ্কু মহারাজের
গঙ্গাসাগর ৮॥ গিরিকান্তার ৯৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনী
কিরীটী অমনিবাস
ষষ্ঠ খণ্ড—পনেরো টাকা

অমর সাহিত্য প্রকাশন ৭ টেমার লেন, কলি-৯

দেখতেন না। আমার বাবা যেখানে বলতেন সেখানেই তিনি না দেখে সই করে দিতেন। কিন্তু আপনি নতুন এসেছেন।

বললাম আমার মেজাজ মর্জি কেমন হবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না তাই না ঝিন্নি ?

ঝিন্নি আর কিছু বলল না।

আমি বললাম বিষয়ের টান কোনদিন আমাকে কুলুতে টেনে আনতে পারত না ঝিন্নি। বাবার সম্পর্কে কৌতূহল মেটাবার ইচ্ছাই আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। যে মিস্টিরিয়াস মানুষটি জীবিত থাকতে ছেলের দিকে তাকালেন না সে মানুষটি কি ধাতুতে গড়া তাই জানবার জন্যে তোমাদের কাছে আসা। হিসেবী মানুষ আমিও কোনদিন নই তবে কাজ ভালবাসি বাবার মত।

ঝিন্নি বলল আমার কথায় গুসসা করবেন না। ভুলত্রুটি হলে মাপ করে নেবেন।

বললাম ঝিন্নি কুলুতে এসে এমন বাঁধা পড়ে গেলাম মনে হচ্ছে হঠাৎ করে দেশে ফেরা বুঝি সম্ভব হবে না।

হেসে আবার বললাম চারদিকে এমন সব ছবি সাজিয়ে রেখেছে তোমরা যে তাই দেখতে দেখতে জীবনটা ফুরিয়ে যাবে যাবে তবু ছবি দেখা শেষ হবে না।

ঝিন্নি বলল এ আপনার কৃপা।

হঠাৎ বলে ফেললাম ঝিন্নি আমার সম্বন্ধে চাচাজী কি বলেন একটু জানতে ইচ্ছে করে। মানালীতে তো কাটালাম কয়দিন একই সঙ্গে।

ঝিন্নি হাসল। হাসি থামলে বলল, সে শুনতে নেই।

বললাম কেন ?

ও বলল শুনলে বহুৎ গুসসা হবে আপনার।

তবু বল। শুনতে ইচ্ছে করছে।

ঝিন্নি বলল চাচাজী বলেন আপনি বিলকুল বাচ্চা কিছু বোঝেন না বুঝতেও চান না।

বললাম কি হবে ওসব বুঝে বল ? এতকাল চাচাজী একাই বুঝে এসেছেন দরকার কি আমার মাথা ঘামিয়ে। আমি বরং একটা প্রস্তাব করেছি চাচাজীর কাছে।

ও বলল তাও শুনেছি।

কি শুনেছ বল ?

ঝিন্নি বলল আপনি মানালীতে একটা দাওয়াইখানা খুলে প্র্যাকটিশ চালাতে চান।

বললাম চাচাজীর কি মত বুঝলে ?

ঝিন্নি বলল উনি আর কি বলবেন আপনার ইচ্ছেমতই কাজ হবে। শুধু বললেন বেটা বিলকুল দাদাজীর মত হয়েছে। বুড়ো বয়স অবধি এই ব্যবসার কাজে আমাকে খাটিয়ে ছাড়বে।

হেসে বললাম যার কাজ তারই সাজে ঝিন্নি ওসবে নাক গলাতে যাবার কোন মানেই হয় না।

ঝিন্নি বলল সত্যি এখন মনে হচ্ছে আপনার আর পিতাজীর ভেতর কোন ফারাক নেই।

ঘরটা অনেকখানি গরম হয়ে উঠেছে। ঝিন্নি তার গায়ের থেকে কম্বলটা সরিয়ে সরিয়ে রাখতেই বললাম উঠছ বলে মনে হচ্ছে ?

ঝিন্নি বলল কতক্ষণ আর আপনার ঘুম নষ্ট করব বলুন।

বললাম তুমি ঘুমুতে চলে গেলেও আজ রাতটা আমার জেগে জেগেই কাটবে ঝিন্নি।

ও বলল তা কেন হবে এখনও অনেক রাত বাকী। একটু চেষ্টা করলেই ঘুম এসে যাবে। আপনি শুয়ে পড়ুন তো দেখি আমি মাথাটা ম্যাসাজ করে দিচ্ছি। আপনার নিদ আলবৎ এসে যাবে।

হেসে বললাম তাহলে তো এখুনি শুয়ে পড়তে হয় ঝিন্নি। কিন্তু মাথা ম্যাসেজের ব্যাপারটা শিখলে কোত্থেকে ?

পিতাজী শিখিয়ে দিয়েছেন বলল ঝিন্নি।

আমি আর কোন কথা না বলে লেপখানা গায়ে টেনে নিয়ে বললাম দেখি তোমার হাতের ম্যাজিক। ওতেই হয়ত ঘুমটা এসে যাবে, আর তাহলে তুমিও রাত জাগার হাত থেকে রেহাই পাবে।

ঝিন্নি আমার চুলের ভেতর হাত চালিয়ে বিলি কাটতে লাগল। আমি শুয়ে শুয়ে কোন একটা সুখের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

মনে হলো কলকাতার এক আবর্জনাভরা গলি থেকে অ্যারাবিয়ান নাইটস-এর কোন এক জিন আমাকে তুলে এনে কুলুর এই নির্জন সীমাহীন সৌন্দর্যের জগতে শুইয়ে রেখে দিয়ে গেছে। আমি এইমাত্র এক হুরীকে আমার মাথার পাশে বসে পালকের মত নরম আঙুলে আমার চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে দেখছি।

আমি এবার চোখ বন্ধ করলাম। জানি চেয়ে থাকলেই ঝিন্নির হাত চলবে আর ও জেগে থাকবে সমানে। ওকে বেশী সময় কষ্ট দিতে সংকোচ হচ্ছিল, কিন্তু ও চলে যাক এটা মন কোনরকমে মেনে নিতে চাইছিল না। অনেক সময় ও আমার চুলে বিলি কাটল। আমি নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছি দেখে ও একবার আমার মাথা থেকে হাত তুলে নিল। তারপর আবার কিছুক্ষণ খুব ধীরে ধীরে ও হাত চালাতে লাগল চুলের ভেতর। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা ভাবছে ঝিন্নি। কারণ ওর হাতটা একবার থামছে আবার চলছে। ভাবনার ভেতরে থেকে [illegible] কাজটা হতে থাকে এলোমেলো।

এবার ও হাতের কাজ থামিয়ে মনে হলো আমার চোখের ওপর সিধে ওর মুখখানা নামিয়ে এনেছে। উষ্ণ একটা নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেলাম আমি। সে নিঃশ্বাস ঢেউয়ের মত আমার সারা শরীরের ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

একসময় ও অতি সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর চারপায়ার শব্দ বেজে উঠল না। আমি চোখ চেয়ে দেখলাম ঝিন্নি মাথার কাছের জানালাটা টেনেটুনে ভাল করে বন্ধ করে দিল। সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে হিটারের সুইচটা অফ করল।

এখন ওকে আর আমি দেখতে পাচ্ছি না। যতক্ষণ হিটারটা সামান্য এক আধটু আলো ছড়াচ্ছিল, ততক্ষণ ওর শরীরটার উপস্থিতি অস্পষ্টভাবে অনুভব করছিলাম। হিটারটা একেবারে নিভে গেলে ঝিন্নিও অন্ধকারে মিশে গেল।

আমি এখন ওর পায়ের মৃদু সাড়া পাচ্ছিলাম। ও আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। অনুভবে বুঝলাম, লেপের ওপর ধীরে ধীরে কম্বলখানা টেনে দিল। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। অতি সন্তর্পণে ওর হাতের একটা মৃদু ছোঁয়া লাগল মাথায়। তারপর হাতখানা তুলে নিল ও। শেষ স্পর্শ রেখে ও চলে যেতে চায়। হয়ত বা আমার ঘুমের নিবিড়তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে চায়।

ও ফিরে দাঁড়াতেই অন্ধকারে অনুমানে ওর হাতখানা ধরে ফেললাম।

চমকে ও ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু জোর করে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল না। আমার বিছানার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে অস্পষ্ট গলায় বলল, আপনি ঘুমোন নি ?

বললাম, কষ্টই যখন পেলে তখন পুরোপুরি কষ্টটা ভোগ করে যাও। এসো আজ রাতটা গল্প করেই কাটিয়ে দিই। কপালে আজ আর ঘুম নেই।

ঝিন্নি বলল, আপনি ভীষণ দুষ্টু তো কেমন ঘুমের ভান করে এতক্ষণ চুপচাপ পড়েছিলেন।

ওর হাতটা আমার হাতে ধরা রইল।

বললাম, তুমি তো আমার বন্ধ চোখের ওপর চেয়ে চেয়ে অনেক পরীক্ষা করলে কই ধরতে পারলে কিছু ?

ও বলল, ছল করে পড়ে থাকলে কি ধরা যায়।

আমি বিছানার ওপর উঠে বসলাম। আমার গায়ের থেকে কম্বল আর লেপ খসে পড়ে যেতেই ঝিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে ওগুলো আমার ওপর চাপিয়ে দিতে গিয়ে বলল, এমন করে খোলা গায়ে থাকলে আর দেখতে হবে না। তখন আপনার আর কি শাস্তি পাবে অন্যে।

কথাগুলো শেষ করে ও সুইচ বোর্ডের কাছে চলে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে বাধা দিয়ে বললাম, দোহাই তোমার ঝিনি, আলোটা আর জ্বেলো না।

ততক্ষণে ও টুক করে সুইচটা অন করে দিয়েছে। আমিও আলোর ঝলক থেকে চোখ বাঁচাব বলে দুটো হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছি।

কিন্তু আলো কই। অন্ধকার তেমনি নিশ্ছিদ্র। চোখ চেয়ে দেখি হিটারটা ঘরের কোণে ধীরে ধীরে আবার রাঙা হয়ে উঠছে। আর তারই আভায় ঘন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে ঝিনি।

বললাম, গায়ের ঢাকাগুলো খুলে ফেলতে বড় ইচ্ছে করছে ঝিনি।

ও চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কেন এমন করছেন?

বললাম তোমাকে শাস্তি দেব বলে। আমি অসুখে পড়লে তোমারই তো শাস্তি।

ও হেসে বলল, কখন কি বলেছি, তাই অমনি মনে করে রেখে দিয়েছেন।

বললাম আমার মেমারি খুব সার্প ঝিনি। সহজে কোন কিছু ভুলি না।

ঝিনি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, সে আর এগিয়ে এল না। রাতের অন্ধকার হিটারের হালকা রাঙা আভায় তরল হয়েছে, কিন্তু মুছে যায় নি। তাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না ঝিনিকে। আর ওতেই ও কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

ঝিনি বলল কাল ভোরবেলা আর নাস্তা খেতে পাবেন না। রাত শেষ বিছানায় গেলে বেলা হবে বিছানা ছাড়তে।

বললাম, নাস্তা রোজ সকালেই তোমার হাতে খেতে পাবো, কিন্তু রোজ রাতে তো আর তোমাকে গল্পের জন্য পাব না।

ঝিনি একবার কোন জবাব না দিয়ে একটা কুর্শি আমার চারপায়ার কাছে তুলে এনে বসল।

বললাম কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে বস। তুমি আবার শাস্তি দিতে চাও নাকি কাউকে?

ঝিনি মাথা দোলাতে দোলাতে সেতারের মিষ্টি ঝঙ্কারের মত হাসি ছড়িয়ে বলল, আপনাকে ডাক্তারী করার একটা সুযোগ দিতে চাই। ডাক্তারের হাত-যশের পরীক্ষাটা আমার ওপর দিয়েই হয়ে যাক।

বললাম, আমি তেমন ডাক্তার নই। রোগ হতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখলেই ট্রিটমেন্ট শুরু করে দি। তাই রোগে পড়ার সুযোগই কেউ পায় না।

ঝিনি আবার হেসে উঠল।

বললাম চাচাজী যদি তোমার হাসি শুনতে পান তাহলে এক্ষুনি কিন্তু এখানে এসে হাজির হবেন।

ঝিনি বলল, সারাদিন কাজের ভেতর ঘুরে বেড়ান তাই বিছানা নিলে আর ওঁর জ্ঞান থাকে না।

অমৃত

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮২

প্রতি বছরের মত এবারও অমৃতের নববর্ষ সংখ্যা ৯ মে প্রকাশিত হবে।

এবার এক নতুন পরিকল্পনায় প্রকাশিত হচ্ছে অমৃতের এই নববর্ষ সংখ্যা। অমৃত এবার পনের বছরে পড়ছে। আমরা স্থির করেছি, গত ১৪ বছর ধরে যে সব বিখ্যাত লেখকের গল্প অমৃতে প্রকাশিত হয়েছে তারই ভেতর থেকে বেছে ৩৮টি শ্রেষ্ঠ গল্পের একটি সংকলন এ বছর উপহার দেব।

যাঁদের লেখা থাকবে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রমথনাথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তুষারকান্তি ঘোষ, বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, সতীকান্ত গুহ, পরিমল গোস্বামী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বুদ্ধদেব গুহ, প্রফুল্ল রায়, সুমথনাথ ঘোষ, নিমাই ভট্টাচার্য অদ্রীশ বর্ধন, মহাশ্বেতা দেবী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, শৈলেন রায়, শ্রীলেখা বসু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কীরেন্দ্র দত্ত

তাছাড়া থাকবে
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

তোমার জন্যে

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে লিখবেন
উজ্জ্বল মজুমদার

বৃহদায়তন ও সুঅলঙ্কৃত

দাম ৪·৫০ পয়সা

অন্য প্রসঙ্গে এলাম।

আচ্ছা ঝিন্নি নাগগরে একা একা থাকতে বোর ফিল কর না?

নাগগরের কথায় ঝিন্নি বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, একটুও না। আমি ছবি খুব ভালবাসি। তাই আর্ট গ্যালারীতে ঘন্টার পর ঘন্টা ছবি দেখে কাটাতে আমার একটুও খারাপ লাগে না।

একটুখানি থেমে ঝিন্নি আবার বলল ছবির গ্যালারী থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেও চারদিকে ছবি দেখতে পাই। যে ছবি এক সময় শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ দেখতেন।

হঠাৎ মনে এল, তাই বললাম, তুমি ছবি আঁকতে পার ঝিন্নি?

ও বলল সিমলাতে থেকে পড়াশোনা করার সময় ছবি আঁকার অভ্যেস ছিল।

একটু অবাকই হলাম। বললাম, এত দূরে থেকে পড়াশোনা করতে তুমি?

ঝিন্নি বলল, পিতাজী চেয়েছিলেন তাই ওখানে যেতে হয়েছিল। তিনি নিজে গিয়ে রেখে এসেছিলেন। পিতাজী যা ভাল মনে করতেন তাই করতেন ঘরের আর সবাই তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নিত। তাঁর ওপর কারো কোন কথা চলত না।

বললাম, নাগগরের আর্ট গ্যালারীর কেয়ারটেকারের চাকরীটা কি পিতাজীই করে দিয়েছিলেন নাকি?

ঝিন্নি বলল, না। এক সময় দিল্লীর একটা আর্ট কম্পিটিশানে ছবি পাঠিয়ে প্রাইজ পাই। তাতেই সরকারী কর্তৃপক্ষের কারো নজরে পড়ে যাই। আমি কুলুতে থাকি জানতে পেরে ওঁরা রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর ঐ চাকরীটা অফার করে পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে পিতাজীর সম্মতি মিলল আর আমি রাজি হয়ে গেলাম।

বললাম মনের মত চাকরী কিন্তু।

ও বলল, এমন করে বলবেন না, চাকরীটা না জানি হাত-ছাড়া হয়ে যায় কখন।

ছোট বড় কিছু কিছু সংস্কার আছে ঝিন্নির।

বললাম কি কাজ করতে হয় ওখানে?

ঝিন্নি বলল ভিজিটার এলে ছবির বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেওয়াই আমার কাজ। তাছাড়া নিকোলাস রোয়েরিখের লাইফ সম্বন্ধেও অনেকে জানতে চান

বললাম, নাগগরে যাওয়াই হয়নি একদিন গিয়ে দেখে আসতে হবে তোমার রাজ্যটা।

ঝিন্নি উৎসাহে কুঁড়ির মত ফুটে উঠল।

সত্যি যাবেন আপনি! কি ভাল যে লাগবে। আমি সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব।

উত্তেজনায় ঝিন্নি কুর্শি ছেড়ে আমার বিছানার একটা কোণ আবার দখল করে বসল। বসেই বলল, এত ভাল লাগবে না আপনার আপনি ওখান থেকে আর নড়তেই চাইবেন না।

বললাম, সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওখান থেকে যদি না নড়ি তাহলে থাকা খাবার ব্যবস্থাটা কি কেয়ারটেকারের কোয়ার্টারেই হবে নাকি?

ঝিন্নি বললো, কি আছে, চাচাজী আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তো ওখানেই ওঠেন।

বললাম জানা রইল, সময়মত কাজে লাগানো যাবে।

ঝিন্নি হঠাৎ অবিশ্বাসের সুরে বলল, আপনি আর যেতেন।

বললাম, এই তো সবে এলাম তোমার দেশে। বলতে পার দেখার সবকিছুই বাকী। এক এক করে তারিয়ে তারিয়ে সব দেখব।

ঝিন্নি বললো মানালীতে ডিসপেনসারী স্টার্ট করলে কি আর ঘরে বেড়াতে পারবেন, না—ঘুরে বেড়ানোর মন থাকবে।

বললাম, খুব থাকবে। কাজের ভেতর থেকে পালিয়ে বেড়ানোতেই তো আনন্দ। দেখো ঠিক একদিন না জানিয়ে নাগগর গিয়ে তোমাকে চমকে দেব।

ঝিন্নি মনে হল অন্যমনস্ক হয়েছে। কোন কথা আর বলল না। মুখখানাও ধীরে ধীরে একপাশে ফিরিয়ে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। দেখলাম ঝিন্নি পরিবেশ ভুলে মুহূর্তে নিজের ভাবনার ভেতর ডুব দিতে পারে।

হঠাৎ একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল আজ লক্ষ্মীছেলের মত শেষরাতটা ঘুমোবার চেষ্টা করুন, ক'দিনের ভেতরেই আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।

বললাম, ঘুম না আসাগুই কথা তবে দেখি তোমার সারপ্রাইজের লোভে যদি এসে যায়।

শুয়ে পড়লাম। ওকে আর বসিয়ে রেখে কষ্ট দিতে চাইলাম না। মনে মনে অনেক কিছুই চাওয়া যায়, কিন্তু চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি সবকিছুই পাওয়া যায়? আর যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণই তো পাওয়ার জন্যে রাজ্যের মাথা খোঁড়াখুঁড়ি।

ঝিন্নি সুইচটা এবার অফ করে দিয়ে বলল, ঘুমোন।

বলেই ও সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। এমন সন্তর্পণে নামল যে পায়ের সাড়া প্রায় পাওয়াই গেল না।

এলোমেলো কত কি কথা আর ছবি মনে নাড়াচাড়া করতে করতে কখন ঘুম এসে গেল জানতে পারলাম না।

ঘুম ভাঙল ঝিন্নির হাতের ঠেলায়। ও আমাকে নাড়া দিয়ে তুলল। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, রোদ্দুরে পথ পাহাড় বাগান সব ভেসে গেল আর আপনি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছেন! উঠুন। এদিকে চাচাজী দু দুবার আপনার খোঁজ করেছেন। আপনার জন্যে তাঁরও নাস্তা খাওয়া হয়নি।

বললাম খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি একটু আগেও তো ডেকে দিতে পারতে আমায়।

ও বলল, ডাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চাচাজী বারণ করলেন। এখন উনি বাগানের ওপারে গেছেন তাই চুপি চুপি আপনাকে জাগিয়ে দিতে এলাম।

আমি ঝিন্নির হাতখানা খপ করে ধরে ফেলে বললাম, চোর ধরে ফেলেছি, আর ছাড়ছিনে। চাচাজী এসে দেখুন তাঁর বারণ না শুনে তুমি আমার ঘরে কেমন চুরি করে ঢুকেছ।

ঝিন্নি অনুনয় করে বলল, দোহাই আপনার ছোটে সাহেব, ছেড়ে দিন দয়া করে। চাচাজী এখখনি এসে পড়বেন।

বললাম ছাড়তে পারি একটি সর্তে।

ঝিন্নি করুণ করুণ চোখ করে তাকাল।

বললাম, সর্তটা মেনে নেবে কথা দাও।

ঝিন্নি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

বললাম, আমি যখন মানালীতে থাকব তখন মাঝে মাঝে তুমি ওখানে যাবে।

ও বলল, চাচাজী আপনার ওখানে থাকলে বিনি কারণে কেমন করে যাই বলুন। তাছাড়া আমার চাকরী আছে। শীতের এই দুটো মাস ছুটি। এখন বরফ পড়বে নাগগরে। তারপর ছুটি ফুরোলে চব্বিশ ঘন্টা কাজের জায়গাতে থাকতে হবে।

হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম তাহলে আর হল না। ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার সর্ত।

ও হঠাৎ কষে আমার ছেড়ে দেওয়া হাতখানা ধরে ফেলে বলল যেতে খুব ইচ্ছে করবে আমার। আচ্ছা কথা দিচ্ছি খু-উ-ব চেষ্টা করব আমি। কিন্তু আপনি তো বোঝেন, একবার কথা দিয়ে না রাখতে পারলে আপনার চেয়ে আমারই কষ্ট হবে বেশি।

ওর হাত ছেড়ে দিলে বললাম তোমার কাছে আমার আর কোন সর্ত নেই ঝিন্নি। আমার ডাকের অপেক্ষা না করেই জানি তুমি মানালীতে কোনদিন এসে পৌঁছবে।

এবার ও অতি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আবার যেন ঘুমিয়ে পড়বেন না। খুব তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নীচে নেমে আসুন।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে প্রায় রোজই মেঘ জমছে উত্তরের পাহাড়ে। মেঘ সরে গেলে দেখা যাচ্ছে, বরফ ঘন হয়ে

ঢেকে ফেলছে পাহাড়ের চূড়োগুলো। দিনে দিনে পাহাড়ের অনেকখানি নীচ অবধি বরফ তার এক্তিয়ার বাড়িয়ে চলেছে। এখন ভোরে বিছানা থেকে উঠে জানালা খুললেই চোখ চলে যায় সোজা বরফের সীমানায়।

এপারের পাহাড়গুলো এখনও তাদের বাদামী আর পাংশুটে গা-গুলো খুলে নাঙ্গা সন্ন্যাসীর মত বসে আছে। তাদের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা পাইন গাছ। ঝিন্নি বলে জানুয়ারির মাঝামাঝি ওদের খোলা গাগুলোও সাদা আলোয়ানে ঢাকা পড়ে যাবে।

এখন একটি ছবি আমাকে অবাক করে দেয়। এই প্রায় ন্যাড়া পাহাড়গুলোর ফাঁক দিয়ে বহুদূরে আর একটা পাহাড় দেখা যায়। দূর বলে কুয়াশার একটা আবছায়াতে সে সব সময় ঢাকা থাকে। দু তিন সারি কুচকাওয়াজরত সৈন্যের মত কতকগুলো গাছ দাঁড়িয়ে। কেউ যেন হল্ট বলে ওদের কুইক মার্চটাকে রুখে দিয়েছে।

সেদিন বৃষ্টি এল। বেশ ঝমঝমিয়েই নামল। ওপারের ঐ পাহাড় আর পাইন গাছগুলো সূর্যাস্তের গলিত সোনার ক্যানভাসে আঁকা ছবি হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ কে যেন জল ছিটিয়ে মুছে দিল সব রঙ। জাঁকিয়ে নামল ডিসেম্বরের বর্ষা। সন্ধ্যা থেকে সেই যে বর্ষার শুরু, তার সপাসপ আওয়াজ চলল গভীর রাত অব্দি।

খেতে বসে চাচাজী বললেন, ডিসেম্বরের এ বর্ষায় গমের চারা বহুৎ জোর পাবে।

বললাম ক্ষতি হবে না এই অকাল বৃষ্টিতে?

চাচাজী বললেন, ক'দিন একটানা বরসাত চলতে থাকলে ক্ষতি হবে ঠিক তবে জলের ব্যবস্থা তো নেই, তাই আশমানকী বরসাতকা হি ভরসা।

মাঝে মাঝে চাচাজী তাঁর শেখা বাংলা শব্দের সঙ্গে কিছু কিছু হিন্দির মিশ্রণ ঘটিয়ে দেন। শুনতে ভালই লাগে। এদিকে ঝিন্নির আলাপের ধরনই আলাদা। বাংলা শব্দ নির্বাচন থেকে উচ্চারণ পর্যন্ত এমন নিখুঁত যে তার কুলুর ঐ পোশাকখানা বদলে শাড়ি পরিয়ে দিলে অবাঙালী ভাববার কোন উপায় নেই।

রাতের বৃষ্টিতে আমি চাচাজীকে বাগান পেরিয়ে আউটহাউসে শুতে যেতে বারণ করলাম। চাচাজী বললেন, নিদ আসবে না বাবুজী। অভ্যেস বিলকুল খারাপ হো গিয়া।

হাসতে হাসতে চাচাজী চলে গেলেন।

ঝিন্নিকে বললাম আজ রাতে বিছানায় শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে খুব ভাল লাগবে।

ঝিন্নি বলল, জেগে থাকলে কতরকম কথা মনে আসে, তাই না?

হেসে বললাম তাই বুঝি?

ঝিন্নির মুখে একটা লাজুক লতার ছায়া পড়ল।

মুহূর্তে সে-ভাব কাটিয়ে মুখখানা তুলে বলল আপনার মনে আসে না বুঝি? সত্যি করে বলুন তো?

বললাম, তোমার দিকে চেয়ে অন্তত মিথ্যেটা বলি কি করে বল। সব মানুষ জেগে থাকলেই স্বপ্ন দেখে। আর সে-স্বপ্নটাই আসল স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্নগুলো সব ভুয়ো।

ঝিন্নি বলল, যান এখন চারপাই-এর ওপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রাত জাগুন গে।

মনে মনে বললাম, চলই না আমার সঙ্গে। ওপরে বসে রাতভোর বৃষ্টির বাজনা শুনি দুজনে।

কোথায় যেন বাধল কথাটা বলা গেল না। কেউ যদি আপনি আসে তাহলেই তো সেটা আবির্ভাব, টেনে নিয়ে আসা মানেই তো আসামীকে হাজির করার সামিল।

একটু হেসে বিদায় নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি, পেছন থেকে ঝিন্নির ডাক এল আপনি উঠে যান, আমি আসছি। কথা আছে।

কিছু না বলে উঠে এলাম ওপরে। শীতের আগুনের মত একটা মিঠে তাপ আমার দেহেমনে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি ওকে নিজের থেকে কিছু বলতে দিতে চাই। আমি শুধু শুনব। ওর সব কথা যেন একমুহূর্তে ফুরিয়ে না যায়। অনেক সময় ধরে অনেক কথা যেন ও আমাকে বলে যায়। এমনি একটা ইচ্ছা আমার ভেতর থেকে উঠে হেমন্তের হিমের মত চারদিকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঝিন্নি কাজের লোকটির সঙ্গে কি যেন কথা বলছিল। আমি বিছানার ওপর বসে আওয়াজটুকু পাচ্ছিলাম, কিন্তু অর্থবোধ হচ্ছিল না। কুলুহী ভাষায় ওরা টুকরো টুকরো কথা বলছিল।

এক সময় আমার মনে হল, প্রয়োজনের ভাষাগুলো মানুষের কত দীর্ঘ। সারাদিন ঐ ভাষাগুলো সংসারের আসর জাঁকিয়ে বসে থাকে। অভিধান থেকে ওদের একটু ছাঁটাই করে দিলে ক্ষতি কি। অকাজের ভাষাগুলো না হয় কিছু দীর্ঘই হল।

ঝিন্নি এল। সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল ও। যেন বিপাশায় জলতরঙ্গ বাজিয়ে সাঁতরে আসছে।

ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতেই বলল বাব্বাঃ কি মানুষ, দরজাটা ভেজিয়ে দিতেও ভুলে গেছেন।

বললাম, তুমি আসবে তাই।

দরজা ভেজিয়ে ও আস্তে আস্তে পা ফেলে এসে বসল আমার বিছানায়। পা তুলল না কিন্তু। ওর পায়ে চোখ ফেলতেই ও চারপাই-এর তলায় পা দুটো ঢেকে রাখার চেষ্টা করল।

বললাম মূল্যবান কিছু একটা লুকোচ্ছো বলে মনে হচ্ছে।

ঝিন্নি পায়ের ওপর পোষাক ঝেঁপে বলল, ও কিছু না।

নিউ এজ

॥ প্রকাশিত হল ॥

নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা

বিজন রায়চৌধুরী : ১৬,

[নাটক যাঁরা পড়েন, নাটক যাঁরা দেখেন, বা লেখেন, বা নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাদের সকলের পক্ষেই বইটি অপরিহার্য। বইটিতে নাটক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য রয়েছে। যথা নাটকের আঙ্গিক, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতিসহ সমস্ত কলা-কৌশল। আর রয়েছে বাংলা নাটকের আদি হতে আধুনিক ইতিহাস।]

॥ উপহার দেবার মত বই ॥

বিশ্বের প্রবাদ : ইবনে ইমাম : ১০,

[বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য বই। বইটিতে রয়েছে বিশ্বের সমস্ত ভাষা থেকে ভাল ভাল প্রবাদগুলির একত্র সমাবেশ। বিদেশী প্রবাদগুলির স্বাদ ও পরিচয় পেতে হলে, সেই সঙ্গে নিজেদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে এই বইটি অবশ্যই পড়ার মত বই, রাখার মত বই ও দেবার মত বই। বইটিতে এইসঙ্গে রয়েছে বহু সুন্দর সুন্দর ছবি যা প্রবাদগুলিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। সুন্দর ছাপা ও সুন্দর প্রচ্ছদে বইটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।] ভারতীয় সমাজ ও

বিবাহ : নৃপেন্দ্র গোস্বামী : ১২·০০; **কাজের পুতুল :** বুদ্ধদেব বসু : ৫·০০; **রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্য :** বুদ্ধদেব বসু : ৫·০০; **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ :** শিবনাথ শাস্ত্রী : ১০·০০; **বাঙালীর ইতিহাস :** [সংক্ষিপ্ত] নীহাররঞ্জন রায় : ৬·০০; **রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা :** নীহাররঞ্জন রায় : ৪০·০০; **বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি :** নৃপেন্দ্র গোস্বামী : ১৫·০০; **লোকায়ত দর্শন :** দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ১৫·০০; **লেখকের কথা :** মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বললাম, রুপোর ঝলকানি চোখে পড়ল যে।

ঝিন্নি বলল, ওঃ সবতাতেই চোখ। ছেলেদের সবকিছুতে অমন চোখ দিতে নেই।

বলতে বলতে কিন্তু পা দুটো জোড়া করে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই দেখুন সোনাদানা নয় সামান্য রুপোর ঝাঞ্জর।

বললাম, আওয়াজ এসেছিল কানে। তবে ঘরে ঢুকেই দরজা হাট হয়ে আছে বলে অভিযোগ তুললে তাই মিষ্টি শব্দটার কথা ভুলেই গেলাম।

ও তেমনি বসে আছে দেখে আবার বললাম কই তোমার পায়ে আগে তো দেখিনি।

ঝিন্নি বলল, ছিল তবে সামান্য টুটে গিয়েছিল তাই সারাতে দিয়েছিলাম। আজ আখরা বাজার থেকে চাচাজী নিয়ে এসেছে। আপনি এই প্রথম দেখলেন।

খুব সুন্দর মানিয়েছে ঘুঙুরের জোড়াটি ওর পায়।

বললাম দারুণ দেখতে হয়েছে কিন্তু।

আমার উৎসাহে ও পা দুটো আবার ঢেকে ফেলল। বলল, ধ্যেৎ ভাল দেখাচ্ছে না ছাই।

বললাম, ভাল লাগা তো সকলের সমান নয় ঝিন্নি। কারো হীরে, পছন্দ কারো বা সোনাদানা, আমি কিন্তু রুপোর সমজদার।

ঝিন্নি বলল, সত্যি?

আমি বললাম, শুধু একটা সত্যি নয়, তিন সত্যি।

ও হাসল।

আমি বললাম, ঐ যে কদিন আগে তুমি একটা সারপ্রাইজ দেবে বলেছিলে, নিশ্চয়ই সেটা তোমার আজকের এই ঝাঞ্জর।

ঝিন্নি বলল, কি সব যে ভুল ভাল আঁচ করে বসে থাকেন তার ঠিক নেই। আমি কি আপনাকে ঝাঞ্জর দেখাতে এলাম নাকি।

বললাম, তাহলে বল তোমার কথা। ঝাঞ্জরের আওয়াজটা আমার উপরি লাভ।

ঝিন্নি আলোটার দিকে একবার তাকাল। চারপাই থেকে উঠে চলে গেল সুইচ বোর্ডের দিকে। টুক্ করে রুম-হিটারের সুইচটা অন করল। ঠিক পর-মুহূর্তে আলোর সুইচে হাত দিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, অফ্ করে দিলে অসুবিধে হবে?

হেসে মাথা নাড়তেই ও আলোটা নিভিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ঝিন্নি ছায়া হয়ে গেল।

ঘরের কোণে হিটারটা প্রথম সূর্যের মত লাল হয়ে উঠছে। তাপ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। একটা ঘুঙুরের আওয়াজ এগিয়ে চলেছে জানালার দিকে। ভারী মিষ্টি লাগছে কানে। আবার ফিরতে লাগল সে শব্দ। মনে হচ্ছে, ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের সেই তরুণী ইরাণীর মত রহস্যময়ী ঝিন্নি ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়।

ও কাছে এসে আমার বিছানায় বসল। বসেই বলল, আর ক'দিন বাদেই কোলি-বি-দেয়ালী। সারা কুলু জুড়ে উৎসব চলবে। নাগ্‌গরে মেলা বসবে। যাবেন সেখানে?

বললাম, দেয়ালী তো পার হয়ে গেছে, এখন ডিসেম্বর শেষ হতে চলল, আবার দেয়ালী কি?

ঝিন্নি বলল, এটা কুলুর একটা বিশেষ উৎসব। ডিসেম্বর মাসেই হয়। সে যা হোক্ যা বলি চুপচাপ বসে শুনে যান তো।

মেয়েরা চিরদিনই শাসনের অধিকার নিয়ে জন্মায়। বললাম, বলো।

ঝিন্নি বলল, নাগ্‌গরে এসময় খুব ঠাণ্ডা পড়ে। চাচাজীর পারমিশান ছাড়া যাওয়া যাবে না আর সে পারমিশান আদায় করার ভার আপনার।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ও হুড়োহুড়ি করে ভুলিয়ে দিয়ে বলল, কিন্তু খবরদার, আমার নামটি ভুলেও যেন করবেন না।

বললাম, উনি যদি জানতে চান, আমি দেয়ালী ফেস্টিভ্যালের কথা কি করে জানলাম?

ঝিন্নি কপালে চাপড় মেরে বলল, তামাম কুলু মাতবে কোলি-বি-দেয়ালীতে, দীপ জ্বলবে, বাজী পড়বে, আকাশ জুড়ে রোশনাই, আর আপনি সে খবর আগে থেকে জানবেন না।

বললাম, তা না হয় হলো। কিন্তু চাচাজী যদি বলেন, চল আমি তোমাকে দেখিয়ে আনি, তখন কি হবে?

ঝিন্নির গলায় বিচিত্র সুর বাজল, যাবেন।

বললাম, এত শীতে আবার নাগ্‌গরে যাওয়া!

ঝিন্নি বলল, চাচাজী কাজ ফেলে যাবেন না নাগ্‌গরে। এক আধদিনের ব্যাপার তো নয়, তিন-চারদিনের হৈ-হুল্লোড়। ও সবের ভেতর নেই চাচাজী। আপনি বলেই দেখুন না। আর এত শীতকাতুরে কেন আপনি?

বললাম তুমি যাবে কি করে?

ঝিন্নি বলল, দেখা যাবে, আগে তো পারমিশানটা মিলুক।

বললাম তখন আমাকে আবার বরফের রাজ্যে একা ঠেলে দেবে না তো?

ঝিন্নি আবার হাসিতে সেতার বাজাল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, তাই না হয় দিলাম। আচ্ছা, আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়?

বললাম, যাক্ গে, যথাসময়ে দেখা যাবে। এখন চাচাজীর পারমিশানটা পেলে হয়।

ঝিন্নি বলল, পারমিশান হলে উনি আপনাকে একা পাঠাবেন না, আমাকে নিশ্চয়ই সঙ্গে যেতে বলবেন।

বললাম, কি করে এতখানি নিশ্চিত হতে পারছ?

ঝিন্নি প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল, চুপ করুন তো, আমার চাচাজীকে আমার চেয়ে আপনি ভাল চেনেন নাকি!

একটু থেমে গলা নরম করে আবার বলল, আমার ওপর একটুও কি ভরসা রাখতে পারেন না।

বললাম, ঠিক আছে, তোমার প্ল্যান-মাফিক কাজ হবে।

ঝিন্নিকে যত দেখছি ততই মনে হচ্ছে, কি দ্রুত ওর মনের আনাচেকানাচে ভাব-ভাবনাগুলো চড়ুইএর মত হুটপাট খেলা করে বেড়ায়।

সে রাতে ঝিন্নি কিন্তু আমার অনুচ্চারিত ইচ্ছাগুলোর কোন দামই দিল না। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডায় বৃষ্টি ঝরার শব্দ, ভেতরে রুমহিটারের ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা উত্তাপ, একটি পুরুষের সান্নিধ্য, সব কিছু আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করে ঝিন্নি চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলল, আমি হিটারটা নিভিয়ে দিয়ে যাই?

বললাম, তোমার খুশি।

ও হিটারটার সুইচ অফ করে আমার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরের জমাট অন্ধকার লাফিয়ে পড়ল হিটারের নিভে আসা লাল আলোটুকু শুষে নিতে।

ঝিন্নির ছায়া আস্তে আস্তে অন্ধকারে মুছে যাচ্ছে। আমি একটা দরজা ভেজিয়ে দেবার আওয়াজ পাচ্ছি। অস্পষ্ট পায়ের সাড়া নীচে নেমে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন বেজে উঠছে বাইরের ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির একটা সম্মেলক শব্দ। কেউ যেন অশান্ত আবেগে কাউকে বুকে চেপে ধরে অর্থহীন শব্দের প্রলাপে চারদিক ভরে তুলছে।

আমার হঠাৎ পাওয়া আশ্চর্য ক'টি মুহূর্ত আমার উন্মুখ যৌবনের ভাবনাকে ছুঁয়ে দিয়ে প্রজাপতির মত উড়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

ফাদার দ্যতিয়েন রোজা নামচা

সুলক্ষণ কুলক্ষণ আমি বুঝি না। আর তা ছাড়াও জানবেন সেদিন সকালে আমি লক্ষ্মীর সামনে ঘন্টা দুর্গার সামনে বাঁশি শিবের সামনে করতাল ব্রহ্মার সামনে ঢাক বাজাইনি...শুধু ঝাজিয়েছিলাম হার্মোনিয়াম তাও নিভৃতে—হঠাৎ মনে আসা এক বাউলের সুর তুলতে চেষ্টা করে। আপনারা বলবেন তাহলে নিশ্চয় বেরোবার সময়ে আমার হাঁচি এসেছিল। এসেছিল বৈকি—হাঁচি আমার বরাবরই আসে।

কৈফিয়ৎ বাড়াব না শুধু বলব মুরশেদদের চৌকাঠ আমি যে এত অশুভক্ষণে মাড়িয়েছি তার জন্য আমি দায়ী নই: ডায়েরির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি সেইদিনের অপরাহ্নেই মুরশেদদের ওখানে আমার যাবার নিমন্ত্রণ ছিল।

ঘরে প্রবেশ করে দেখি মুরশেদের শ্বশুর সাহেব সোফায় বসে দু হাতে মাথা ধরে কাঁদছেন ভেউ ভেউ করে কাঁদছেন। মুরশেদ বলে: টাকার কুমীরের কুম্ভীরাশ্রুপাত...তারপর পাশের কামরায় আমাকে বসিয়ে কুশল সংবাদ-পর্ব চুকিয়ে নির্লিপ্ত সুরে সে বোঝায় এই কসপ্তাহে ঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাচক্র। ট্র্যাজেডির কুশীলব পাঁচজন: রহিমুল্লা মুরশেদের শ্বশুর রহিমুল্লার বড় বিবি ফরিদা ছোট বিবি পোকবাজ পোকবাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহেদ শাহেদের চাচাতো বোন আয়েশা।

রহিমুল্লার বয়স আটপঞ্চাশ (আটান্নো ওরা বলে না)। কিশোর বয়সে রুষ্ট আব্বা বোরহানুদ্দীন আম্মা আর শস্যশ্যামল আদিবাস নোয়াখালিকে পরিত্যাগ করে মুক্ত জীবন আর অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে মায়াবিনী কোলকাতায় তিনি পদার্পণ করেন দু বছর ধরে দুরাগত জাহাজের অভিযাত্রীদের ডিঙি করে ডাঙ্গায় নামিয়ে দু পয়সা উপার্জন করেন। একদিন এক অথর্ব মেম-কে কোলে করে ভাটার কাদা থেকে বাঁচিয়ে বকশিশ নিতে অস্বীকার করে রহিমুল্লা উক্ত মেমের কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে ওঠেন। মেমের কর্তার আনুকূল্যে চাকরি পেয়ে আপন গুণে পদোন্নতি করে শ্বশুরবরের জিম্মায় পাটের ব্যবসা ও নতুন কেনা শেভরলেটটি রেখে স্বাধীন ভারত ছেড়ে কপর্দকশূন্য হস্তে রঙ্গুন আব্বার মৃত্যুশয্যায় তিনি ফিরে যান। এক সপ্তাহ যেতে না যেতে পিতৃহীন রহিমুল্লার ঐ কপর্দকশূন্য হস্তে আসে শস্যশ্যামল নোয়াখালির এক শত বিঘা উর্বরা ভূমি। ফসল কেটে ভেনে বিক্রী করে তিনি তখন ফরিদাকে গ্রামে রেখে পোকবাজকে সঙ্গে করে দ্বিতীয় সংসার পাততে যান চাটগাঁয়ে সদ্য নির্মিত এক ত্রিতল দৌলতখানায়।

সেখানেই পোকবাজের গর্ভে রহিমুল্লার পয়লা পুং ওয়ারিস শাহেদের জন্ম। বাচ্চাকে ওর আব্বার কোলে রেখে হিংসুটে রাক্ষুসী ধাই (পাড়ার ছেলেরাই ওকে রাক্ষুসী বলে খেপায়) আনন্দ মিশ্রিত অনুকম্পার সুরে বলে: ইহা হামিদু। বিবিসাহেবা বাঁটিতে কুমড়ো কাটতে গিয়েছিলেন কেন? বলা বাহুল্য সম্ভ্রান্ত অতিথিকে ছাড়া অভিজাতা বিবিসাহেবা নিজের হাতে রান্না করে কাউকে খাওয়ান না..আর উক্ত অতিথির পাতে তিনি যে কুমড়ো নামক পদার্থটাকে পরিবেশন করবেন তারও সম্ভাবনা অল্প...অথচ দেখুন পোকরাজের ঐ নয়নমণিটি রহিমুল্লার পয়লা পুং ওয়ারিস ঠোঁট-কাটা জন্মাবধি ঠোঁট-কাটা।

ডিফেকটিভ হলে কি হবে ছেলেটি তো পড়ে ভালো খেলে বেশ ক্লাসে বরাবর স্ট্যান্ড করে রীতিমতো স্থান পায় \ বিদ্যালয়ের ক্রিকেটের টিমে। তবে হ্যাঁ সে লাজুক খুব নতুন ইয়ার সে সহজে করে না। অস্ত্রোপচার হয়েছে তিনবার বড় বড় ডাক্তারের হাতে ফল হয়েছে অল্পই: শাহেদের গলা থেকে যেসব সুর বেরোয় বাড়ির লোকজন আর ছোটবেলার বন্ধু ছাড়া কেউই বিশেষ কিছু বোঝে না।

প্রতিবেশীদের ধারণা ছিল শাহেদের প্রতি রহিমুল্লার আছে স্নেহজাত পক্ষপাত। ছেলেটি যেদিন বি-কম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সেদিন তারা বুঝল ধারণাটা কত ভ্রান্ত: রহিমুল্লা নিজেকে আর নিজের ব্যবসাকে ছাড়া কাউকেই পেয়ার করেন না। শাহেদের চিকিৎসার পিছনে তিনি যে অঢেল টাকা খরচ করেছিলেন সেটাও আসলে ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া আর কিছু নয়: স্নাতক ছেলেটির মধ্যে তিনি শুধু দেখেন নিজের ব্যবসা ফলাবার উপায়। তাই রহিমুল্লার অলঙ্ঘ্য প্রস্তাব: কোনো মন্ত্রীকে ধরে আমদানির লাইসেন্স ও আদায় করেক ইতিমধ্যে জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর বেটির সঙ্গে—ছেলেটা পণ সমেত—তিনি ওর বিয়ের বন্দোবস্ত করবেন।

শান্তশিষ্ট শাহেদের স্তূপীকৃত আক্ষেপ যেন সেই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল এবারে বিস্ফোরিত হল। বিদ্রোহ ঘোষণা করে সে বলল: চাকরি হোক বাণিজ্য হোক কোনো মন্ত্রীমামার জোরে ও কিছুই করতে বাজি নয় নিজেরই ক্ষমতায় ও পরিশ্রমে করবে। আর বিয়ে..? ও তো জানে আই-বুড়ো বেটির আব্বাবা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর বেটার চারিধারে ভন ভন করে ঘুরে বেড়ায় নলেন গুড়ের সন্দেশের ভাঁড়ে লোলুপ মাছির ঝাঁকের মতো। তারা কেউই ওকে চায় না আপন স্বার্থ চায়। শাহেদ কিন্তু এমন এক মেয়েকে বিয়ে করবে স্থির করেছে ওর কণ্ঠের সুর না বুঝলেও অন্তরেরই ভাষা যে বুঝবে আর ওর পদমর্যাদা বা সম্পদগরিমা নয় ওকেই পারবে ভালোবাসতে—ভালোবাসবে।

কিছু দিন আত্মপরীক্ষা করে শাহেদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সমস্যার

জটিলতা আব্বার রোষ ও বাড়ির অশান্তি এড়াতে হলে একমাত্র উপায়ঃ বিদেশ যাত্রা। বিদেশ যাত্রা কিন্তু পয়সা ছাড়া হয় না আর লক্ষ্মীর ভাঁড় আব্বার হাতে। হাতে নয় সেফ ডেপজিট ভোল্ট-এ। শাহেদ আম্মার শরণাপন্ন হয়। পোকরাজ বেগম অল্প শিক্ষিতা তাঁকে যে যা যেমন বোঝায় তিনি ঠিক তাই তেমন বোঝেন। এতদিন বুঝেছিলেন স্বামীর বায় এবার বুঝলেন ছেলের যুক্তিঃ কথা দিলেন প্রয়োজন হলে নিজেরই গয়না বিক্রি করে শাহেদকে তিনি বিদেশে পাঠাবেন। বিদেশ যে কোন দেশ তা অবশ্য তিনি বোঝেন না।

রহিমুল্লার আর যত দোষ থাকুক না কেন সহরে সংসারের মতোই গাঁয়ের সংসারটির প্রতিও তিনি সমদৃষ্টিবানঃ তার অর্ধেক সময়টা কাটে নোয়াখালিবাসিনী ফরিদার ওখানে। একদিন স্বামীর ফেরার সময় অতিক্রান্ত হওয়াতে পোকরাজ শাহেদকে পাঠান সতীনের কেল্লায় বিলম্বিত মিয়ার অন্বেষণার্থে। এক ঢিলে দুই পাখির মারঃ এক সপত্নী শিবিরে গুপ্তচর বৃত্তির সুযোগ প্রাপ্তিতে আত্মতৃপ্তি; দুই মফস্বলের বায়ুসেবনে শাহেদের মানসিক সংগ্রামে কিছুটা স্বাস্থ্যলাভ।

ফরিদাদের বাড়ির পাশেই করিমুল্লার গরিবখানা। করিমুল্লা রহিমুল্লার ছোট ভাই শাহেদের চাচা আপন চাচা। এতদিন দু ভাইয়ের ছিল অভিন্ন সংসারঃ একই ঘরে থাকত সবাই একই হাঁড়িতে খেত শাহেদের আব্বার অনুপস্থিতিতে চাচারাই তাঁর জমি দেখত। একদিন গত শীতকালের এক অমাবস্যায় একান্নবর্তী হেঁসেলটা কেঁপে উঠল দুই জায়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধে। শাড়ির আঁচলটা কোমরে ভালোমতো বেঁধে নেওয়ার সময় না পেয়েই শাহেদের চাচীর এক ঘুষিতে ফরিদা হারালেন তাঁর উপর মাড়ির বাঁদিকের নড়বড়ে স্বদন্তটা। বিজয়িনী বিজয়াস্বাদনের ফুরসত পেলেন কম; ভূপাতিত ট্রফিটা তিনি তুলে নেবার আগেই ছোঁ মেরে ফরিদা তাঁর মাথার একমুঠো চুল এক খাবলায় উপড়ে নিলেন। সেদিন থেকেই ফরিদার সেই দন্তহরণের অপঘাতের স্মরণে বেচারা করিমুল্লার সঙ্গে পোকরাজের অমীমাংস্য বৈরিতাঃ সতীনে সতীনে দা-কুমড়ো সম্পর্ক থাকলে কি হবে পোকরাজ বেগমের চোখে পরিবার চৈতন্য বলে জিনিস আছে।

দুই জায়ের প্ররোচনায় দুই ভাই আজ পরস্পরের গৃহে পদার্পণ থেকে বিরত; দেখা সাক্ষাৎ ঘটে মসজিদে আঙ্গনে। একদিন অঞ্চলের মাতব্বরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক মিলাদে শাহেদের চাচা শাহেদের আব্বাকে বলেনঃ মেজো বেটি এবার ম্যাট্রিক দিচ্ছে.. ইংরেজিতে ও বড় কাঁচা...তোমার খোকারে তুমি যদি দয়া করে...বিবিদের ঝগড়া হয়েছে বাচ্চাদের তো ঝগড়া হয়নি!

সেদিন থেকে শাহেদ ছোকরা ষোড়শী আয়েশার অবৈতনিক বেসরকারী সাময়িক গৃহশিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়। এই প্রথম দায়িত্বভার গ্রহণে ছেলেটির অন্তর ফুলে ওঠে অনাস্বাদিত আনন্দে; আত্মপ্রত্যয়ও বাড়ে বৈকি।

আয়েশা মেয়েটি স্মার্ট গ্রাম্য সমাজের পাহারাদার প্রাচীরমালা দিনে দিনে সে টপকে যায় আধুনিকাসুলভ লক্ষণেঃ রাস্তাঘাটে বিনা অনুচরে সে ঘোরে তিন সন্ধ্যা পংলিংগের যত বেকার অকর্মণ্যের সঙ্গে ইয়ারকি মারে পরদা নামটা পর্যন্ত তার অভিধান থেকে লুপ্ত। গুরুস্থানীয় প্রতিবেশীরা নিন্দা করে বলেঃ বেআব্রু বেহায়া ছুঁড়িটিকে দেখ! শহরে যা মানায় পাড়াগাঁয়ে মেয়ের তা কি সাজে? মেয়েটি ভাবে গুরুস্থানীয় প্রতিবেশীদের ঐ পাড়াগাঁটাকে তার অনাবৃত লাবণ্যে ও স্বতঃস্ফূর্ত রঙরসে চিরকালের মতো অলঙ্কৃত করার বাসনা তার ক্ষীণ একদিন অস্বাবুড় এক রাজপুত্র সভ্যতার এই আঁস্তাকুড় থেকে তাকে উদ্ধার করে শহর নামক স্বাধীন রাজ্যে নিয়ে যথোচিত মহিমায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন...ভাবতে ভাবতে অধ্যাপনরত শাহেদের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে তার কম্পিত হৃদয়ের সঙ্গে ওর শিহরিত হাত মেলায়।

শাহেদ আব্বাকে এসে বলে আয়েশাকে আমি বিয়ে করব। মানি ছেলেটি অল্পবিস্তর গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদতে পারত এই ধরুন প্রস্তুতিপর্বরূপে ও খোঁজ নিতে পারত রহিমুল্লার উচ্চ চাপের কথা হুঁকো বাড়িয়ে বলতে পারত আব্বা সোফাটায় একটু আরাম করে পা তুলে বসুন আপনার সঙ্গে কথা আছে...। করতে পারত করেনি এবং না করে ভালো করেনি ত্রুটি হয়েছে গাফিলতি হয়েছে কিন্তু জিগ্যেস করি প্রেমে পড়ার নবোত্তেজনায় এত সাত-পাঁচ ভাবে কে বলুন ... আর জানতে চাইঃ বাইশ বছরের বি-কম পড়া প্রথম পুং সন্তানকে তার ছোট ভাইয়ের সামনে (হোক না সে ভিন্নোদর) এত অমানুষিকভাবে প্রহার করার কি কোনো অনিবার্য প্রয়োজন ছিল?

সেদিন রাত্রে গ্রামবাসে হাঁত টেনে অকালে অবসরপ্রাপ্ত মাস্টার শাহেদ শহরে ফিরে যায় ছাদের খুপরিতে বোষগৃহ বানিয়ে স্বয়ম্বর তথা স্বয়ম্ভরের পরিকল্পনায় মন দেয়। এদিকে পোকরাজ দৃঢ়সংকল্পঃ তাঁর কায়াতে যতদিন জান থাকে ঐ সাদিতে তিনি মত দেবেন না... দেওরমিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা দেখ! বড়বিবির দুর্বদন্ত কেড়ে জনাব সন্তুষ্ট নন ছোটবিবির বেটাকেও চুবি করার মতলব তাঁর...। রহিমুল্লাও প্রমাদ গোনেনঃ ভাতিজীকে ঘরে আনলে তো আর মোটা পণ ভাঁড়ে তোলা যায় না! আর এদিকে ভাবুনঃ অনেকদিন থেকে তিনি স্থির করেছেন গ্রামস্থ ঐ এক শত বিঘা জমি ভোগ করবে খরিদার গর্ভজাত দুটি মাত্র সন্তান শহরের সম্পত্তি (তিনটি বাড়ি একটা ঘানি চারটি বাস) ভোগ করবে পোকরাজের আধ ডজন ঔলাদ। এমন বন্দোবস্তে শহরিয়া বংশধরেরা যে প্রবঞ্চিত হবে তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই.. আর এতেও তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে শাহেদকে জামাই পেলে করিমুল্লা শহরিয়া বংশধরদের তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে অবহিত করাবেনই।

এবার রহিমুল্লা ও পোকরাজের শয়তানী ষড়যন্ত্রটা দেখুনঃ শাহেদের বোনের উপযুক্ত বর একমাত্র কলকাতায়ই মেলে কথাটা ঘোষণা করে রহিমুল্লা প্লেন ধরলেন; প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু শাহেদেরই জন্য দৌলতমন আহলিয়া আর স্ফীত পণের খোঁজ। এমন সানিক উৎখাতিত হল খিদিরপুরের মাণখনিতে। মেয়েটি রহিমুল্লার বংশধরের পক্ষে সর্বতোভাবে সুযোগ্যঃ কেটে ট্যারা উর্দু ভাষিণী অর্ধশিক্ষিতা (অর্ধশিক্ষিতা নয় সিকি শিক্ষিতা) তবে ওর আব্বা বাইশটি লরির মালিক আর ওর যৌতুক খাস ঢাকা শহরে ত্রিতলান্বিত অট্টালিকান্বয়।

ইতিমধ্যে চাটগাঁয়ের রাজপুত্র শাহেদ নোয়াখালির চাচাজানের বাড়িতে সিঁদ কেটে (অলংকারিক অর্থে সিঁদ কেটে) বিরহিনী আয়েশাকে অপহরণ করে বাসের ভাড়া চুকিয়ে প্রেমাস্পদার সঙ্গে গান্ধর্ব বিবাহে আবদ্ধ হয় ঢাকার এক কাজীর আপিসে।

এত সাধের চক্রান্তের এমন আকস্মিক বৈফল্যে বিমর্ষ হয়ে ক্রোধে রোষে ফুসে ওঠেন শাহেদের বাপ। ছেলেটিকে গিরিবৎ অবিচল দেখে তোষামোদ করে তিনি বলেনঃ আমার সম্মান রক্ষা কর বাবা... তোমার বোনকে তালাক দাও দেন মোহর আমি চুকিয়ে দেব.. ধুমধাম করে খিদিরপুরে সাদি হোক। আব্বার সম্মান রক্ষার আবশ্যকতা শাহেদের দৃষ্টিতে স্বতঃসিদ্ধ নয়; আর তাই আজ জামাইয়ের বাড়িতে টাকার কুমীর রহিমুল্লার কুম্ভীরাশ্রুপাত।

...ঘূর্ণির বেগে ঘরে ঢুকে এই অধমের উপস্থিতি ভ্রূক্ষেপই না করে শুষ্ক চক্ষু রহিমুল্লা ঘোষণা করেনঃ শাহেদকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শিশু সাহিত্যের জন্য জাতীয় পুরস্কার :

শিশু সাহিত্যের জন্য ঊনবিংশ জাতীয় পুরস্কার সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। অসমীয়া—বি কে মেধ্য (এখন দেশ অলখ মানুহ) বাংলা—আর এস রায় (মুকুটমালা লেনিন) গুজরাটি—কে দেশাই (মট নে হাতভালি); হিন্দী—এ বইগার (ভারত সেরা দেশ); হিন্দী—কে বাংগা (মহারাজা রঞ্জিত সিং); মালয়ালম—জি করণওয়ার (নমুককু এন্টুমল্ল); মারাঠী—এস শিরোলকর (চন্দ্রলেবী মুলে) সিন্ধী—এ বেদী (কেরমির) তামিল—এস সৌন্দরারাজান (নাল্লা কৈগাল) তেলেগু—এ ডি এস রামারাও (আকশানী চড়ুম)।

নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন :

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নতুন পরিচালক পরিষদ ও কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দিল্লীতে। পরিচালক পরিষদের সভায় সবাই অভিমত প্রকাশ করেন যে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্মেলনের আগামী বার্ষিক অধিবেশন ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদি ভাগলপুরে সম্ভব না হয় তাহলে বোম্বাই শহরে পরবর্তী অধিবেশনের জন্যে প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

সংস্থার গঠনতন্ত্র পুরস্কার ও শাখা পরিচালনার ব্যাপারে কতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

এই উপলক্ষে দিল্লী শাখার উদ্যোগে একটি সাহিত্য সভা বাঙ্গালীর বাংলা শিক্ষা বিষয়ক একটি আলোচনাচক্র ও একটি সংগীত আসরেরও আয়োজন করা হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন দিল্লী শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী।

পুরুলিয়া সাহিত্য মেলা

পুরুলিয়া শহরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পুরুলিয়া সাহিত্য মেলা একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত হয়েছে। উপলক্ষ্য ছিল পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত প্রখ্যাত পত্রিকা 'ছত্রাক'-এর পঞ্চম বর্ষপূর্তি। এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে পুরুলিয়া অঞ্চলে এযাবৎ প্রকাশিত প্রাচীন ও আধুনিক পত্রিকা ও গ্রন্থের সমাবেশ করা হয়েছিল। এই সাহিত্য মেলায় প্রধান আলোচ্য বিষয়টি ছিল 'আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনে লিটল ম্যাগাজিনের গতি-প্রকৃতি'। অনুষ্ঠানে 'ছত্রাক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির পর্যালোচনাও করা হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ দেবকুমার ঘোষ অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পুরুলিয়ার লেখক ও কবি গোষ্ঠীকে সম্বর্ধনা জানানোও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটির অন্তর্গত ছিল।

ছত্রাক সম্পাদক সুবোধ বসুরায় সহ-সম্পাদক তুহিন চট্টোপাধ্যায় 'ছত্রাক' গোষ্ঠীর অপূর্ব সান্যাল প্রকাশ জয়সুর্য হরিনারায়ণ মিত্র প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতির মুখপাত্র 'ছত্রাক' পত্রিকার উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রগতিশীল কর্মধারা আলোচনা করেন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন : ত্রিবৃত্ত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

সম্প্রতি ত্রিবৃত্ত সংস্থার উদ্যোগে কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে তিন দিনের জন্য উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন ও ত্রিবৃত্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অধিবেশনে উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং লিটলরেবী ওয়ার্কশপ কার্যক্রমের সূচনা হয়। আলোচনার সূত্রপাত করেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়। এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে ভাষণ দেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রণজিৎ দেব ও ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। মূল সভাপতি ও ডঃ অমলেন্দু বসু আঞ্চলিকতা থেকে বিশ্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রমোপরিণতির নিজস্বতা সম্পর্কে বলেন। নিজস্বতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সাহিত্য যে সার্বজনীন হয়ে ওঠে এবং এই ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য আন্দোলন যে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে মিশে সার্বজনীন হয়ে উঠবে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্যের ধর্ম সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ২৩শে মার্চ সকাল ৯টায়। এই অধিবেশনে স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং কবিতার উপর আলোচনা হয়। অপরাজিতা গোপ্পী শিশির ভট্টাচার্য জীবন সরকার বিমল ভট্টাচার্য রণজিৎ দেব এবং আরও অনেক তরুণ কবি কবিতা পাঠ করেন। এ ছাড়া ছিলেন অতিথি কবি সুশীল রায় কৃষ্ণ ধর প্রণয় কুণ্ডু ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রোতাদের অনুরোধে কৃষ্ণ ধর ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি কবিতা দরাজ গলায় পাঠ করে শোনান। উদাহরণ টেনে দীর্ঘ এবং অসাধারণ মূল্যবান একটি ভাষণ দেন। মনোজ্ঞ ভাষণে ডঃ অমলেন্দু বসু বলেন কবিতা থেকে ছন্দ কি ক্রমশই অবলুপ্তির পথে? আসরে পঠিত কবিতার সূত্র টেনে কবিতার উপর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। শাখা সভাপতি ডঃ সুশীল রায় ছন্দ আধুনিক কবিতায় কোথায়? সেই উৎস টেনে আলোচনা করেন।

তৃতীয় অধিবেশনে বসে বিকেল বেলা সাংবাদিক সম্মেলনের সূচনায়। যোগদান করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। এই সম্মেলনে মফঃস্বলের সাংবাদিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। অমিয়ভূষণ মজুমদার হরিপদ

HINDU MYTHOLOGY

by W. J. WILKINS

The reader can conveni ently gain a good general idea of the names, character and relationship of the principal deities of Hinduism. Classified and Illustrated.

A Rupa Paper back : Rs. 18/-

Rupa & Co

Calcutta-700 012

মুখোপাধ্যায় বাম্বীন রাহা যোগেশ রায় তাঁদের বক্তব্য রাখেন। পৌরোহিত্য করেন বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী।

চতুর্থ অধিবেশন হয় সন্ধ্যায় ত্রিবৃত্ত পুরস্কার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। ত্রিবৃত্ত পুরস্কারের মাধ্যমে নতুন লেখক আবিষ্কারের জন্য ত্রিবৃত্ত সংস্থার এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য বলে শ্রীঘোষ স্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের প্রয়াস মফঃস্বল থেকে যে করা হচ্ছে তা এক নতুন পথেরই সন্ধান দেয়। প্রধান অতিথি দক্ষিণারঞ্জন বসু তাঁর ভাষণে ত্রিবৃত্ত পুরস্কারের গুরুত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। এই সভায় পুরস্কার অর্পণ করেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। 'অর্জুন' উপন্যাসের জন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'দেবেশ রায়ের গল্প' ছোট গল্পগ্রন্থের জন্য দেবেশ রায় 'কাছিম' ছোট গল্পের জন্য জীবন সরকার 'অন্য দিন' লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনার জন্য শিশির ভট্টাচার্য 'উত্তর বাংলার পল্লীগীতি' লোক সংস্কৃতি গ্রন্থের জন্য হরিশচন্দ্র পাল পুরস্কৃত হন। প্রত্যেক সাহিত্যিককে তাম্রপত্র ও মানপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়। ডঃ অমলেন্দু বসু তুষারকান্তি ঘোষ দক্ষিণারঞ্জন বসু ও জীবন দেকেও মানপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

পঞ্চম অধিবেশনে নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন অধ্যাপক বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়। এই বিতর্কমূলক আলোচনার বিপক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। শাখা সভাপতি ডঃ সুশীল রায় বিতর্কমূলক নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় সমন্বয় ঘটিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন।

ষষ্ঠ অধিবেশনে লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেন হেমন্তকুমার রায়বর্মা ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ও হরিশচন্দ্র পাল। মূল সভাপতি ডঃ অমলেন্দু বসু লোকসংস্কৃতি বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন। ইহাতে এই অঞ্চলের অধিবাসীদেরও সহযোগিতা করবার জন্য অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে ঝাইটল পুজো বিষহরি কৃষাণ প্রভৃতি পালা গান ও মইষাল বন্দু প্রভৃতি স্কেচ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

সরোজ রায়চৌধুরী স্মরণসভা :

কথাশিল্পী সরোজকুমার রায়চৌধুরীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় তিনদিনব্যাপী একটি সুন্দর সাহিত্য সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হোল। কবি সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র। শ্রীমিত্র তাঁর ভাষণে বলেন কথাসাহিত্যে সরোজকুমারের অসাধারণ প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন এখনো করা হচ্ছে না এ ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখজনক।

স্মরণদিবসে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বলেন সরোজকুমারের মূল্যবান রচনাবলী যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

গল্প পাঠ ও আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ। বাংলা ছোটগল্পের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সরোজকুমারের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকসম্পাত করেন শ্রীঘোষ। গল্প ও কবিতা পাঠ করেন মহাশ্বেতা দেবী সত্যেন্দ্র আচার্য সুনীলকুমার নন্দী অমিত গুপ্ত তুলসী সেনগুপ্ত রাণা বসু বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সরোজ সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে সভাগুলো পরিচালনা করেন তরুণ লেখক জীবন সরকার প্রতাপরঞ্জন হাজরা স্বপ্নেন্দু ভৌমিক ও তুষারাভ রায়চৌধুরী।

উপগুপ্ত

নতুন বই

চোটো কাহিনী : গ্রন্থকার সুকুমার ভট্টাচার্য মৌসুমী প্রকাশনী।। কলকাতা-৯। মূল্য সাত টাকা।

টোটো সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গেরই মানুষ। একটি ক্ষয়িষ্ণু উপজাতি যাদের বাস ভুটান রাজ্যের পাহাড়ী পাদদেশে। লেখক সুকুমার ভট্টাচার্য সেই টোটো উপজাতিদের কথাই কাহিনীর আকারে পরিবেশন করেছেন। ছোটোদের জীবনের ধ্যান-ধারণা আচার-বিচার সমাজ জীবন ভালবাসা বিরাগ সবই তিনি পাঠকদের জানিয়েছেন নানা ঘটনা ও গল্পের মাধ্যমে। বইটি নিতান্ত শুষ্ক রিসার্চ নয় সরস কাহিনীতে ভরপুর। সাধারণ পাঠক যাতে টোটোদের জীবন ও মানসিকতাকে বুঝতে পারে সেই ভাবে এবং অনেকটা উপন্যাসের ছদ্মবেশে টোটো নরনারীকে ও তাদের সমাজকে উপস্থিত করেছেন লেখক। ভাষা ও রচনাশৈলী বেশ সরল ও সরস। ইতিহাসের চাকার তলায় হয়ত একদিন এই উপজাতির বিলোপ হবে। শুধু পরিচয় থাকবে। নৃতত্ত্বের পাতায়।

বই এর ছাপা ও বাঁধা মনোরম। পাঠকদের কৌতূহল বাড়াবে বলে মনে করি। টোটোদের দৈনন্দিন জীবনের কিছু ছবি থাকলে আরও ভাল হত।

খোঁয়াড় : কালীকুমার চক্রবর্তী। পরিবেশক বিশ্বজ্ঞান ৯।৩ টেমার লেন কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

ছোটখাটো গল্প প্রায় সমান দু অংশে পর পর সাজিয়ে 'খোঁয়াড়'। কালীকুমারের গল্পে ভিত রয়েছে অবশ্যই। তবে মধ্যবিত্ত সমাজের কথা তিনি যখন বলতে চেয়েছেন তখন এ সমাজের মানুষদের দিয়ে 'হায়নার দাঁতে হাসা, যৌবন ছানতে ছানতে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় বা এর স্ত্রী অমুকদার পাশে অমুকদার স্ত্রী এর স্বামীর পাশে বসে রং দ্যাখা অব মানুষের আদিম চিৎকার অথবা বাঁজা সময়ের বুক কামড়ে থাকা'. কথাগুলো চোখে ঠেকে যেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে থাকছে যায়—সাহিত্যের হাটে কত উৎসাহীই ত আসেন সীমাহীন ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় সোজাসুজি মাতামাতি করতে কালীকুমারও না হয় তাঁদের একজন। একথা মনে পড়ল বইয়ের প্রথম দিকে আর মাঝখানে অপেক্ষাকৃত বড় হরফে 'মগজ এঁটে পড়ুন কলজে দিয়ে পড়ুন' এ জাতীয় পরিহাসসূচক এবং হাস্যকর শব্দ চোখে পড়ায়।

গল্প গ্রন্থের পেছনের মলাটে—'আমরা প্রত্যেকেই একেকটি খোঁয়াড়ে আবদ্ধ প্রেমের বা হিংসার রাজনীতির বা অধ্যাপনার...। খোঁয়াড়ই আমাদের লক্ষ্য: খোঁয়াড়ই মোক্ষ!' এ শব্দগুলোও ভোলার নয়। আর যাই হোক গল্পগুলোর ভেতর দেয়াল খোলা জ্বালাযন্ত্রণার তেজী ভাবটা গল্পকার প্রকাশ করতে চেয়েছেন বার বার এখানেই তাঁর সততা এখানেই নিষ্ঠার পরিচয়। গৌতম রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ নিঃসন্দেহে চোখে লেগে থাকে।

কল্পনার শরীর : অভিজিত ঘোষ। পরিবেশক—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় ২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলকাতা—৭০০০১২। ছয় টাকা দাম।

আর সব তরুণ কবির মত অভিজিত ঘোষও শ্রদ্ধেয়দের কাছে ঋণ স্বীকারের সুযোগ নাকি পেলেন এ বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে। একটা লাইনের ওপর চোখ থাকছে খেল—'আমার কোন লেখাই আমাকে কখনো পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে নি। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি কোনদিন আরো ভাল কিছু লিখতে পারি এই ভেবে।'

ভাষায় নিজস্বতা অনুভূতিতে চাকচিক্য লক্ষ্য করা গেল। তবে ভেতরের পাতার কয়েকটা লেখায় যেমন—হেমন্তের অনুভূতিমালা গদ্য কবিতা (পৃষ্ঠা নম্বর নেই) সংলগ্ন অসংলগ্ন আলোচনা আদেশ অথবা উপদেশ সংক্রান্ত ইস্তাহার (কবিতা) এ অভিজিত ঘোষ ছাপা হয়েছে। বাকী সব লেখার লেখকের নাম নেই তাহলে সেগুলোর লেখক কে? ধরে নিতে অবশ্য অসুবিধে হয় না সেগুলোও ওঁর। কারণ মলাটে ত ওঁর নামই ছাপা রয়েছে। আবার এ-ও অনুমান করতে পারা যায় বইয়ের লেখাগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাগজে ছাপা হয়েছে আর পরক্ষণেই বুদ্ধি করে দেওয়া বাড়তি কাগজে ছাপা হয়ে গেছে। 'সৈনিকের ডায়েরী থেকে' 'অবেলায় ঘোর দুর্যোগের দিনে ভাল লেখা। সোমনাথ বিশ্বামিত্রের আঁকা প্রচ্ছদও ভাল লাগল।

গোয়েন্দা ধাঁধা

ফিরোজা নিয়ে ফেরেববাজি।।

শার্লক হোমস্ ॥

স্যার আর্থার কোনাল ডয়াল

আগের রাতে খুব বরফ পড়েছিল লন্ডনে। বরফ জমা রাস্তার ওপর দিয়ে তুকী নাচ নাচতে নাচতে এক ভদ্রলোক এলেন শার্লক হোমসের আস্তানায়।

কাল রাতে তাঁর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

'কি সর্বনাশ?' শুধোলো হোমস।

'বেরিল-মুকুটের নাম শুনেছেন তো? জাতীয় সম্পত্তি বললেই চলে। উনচল্লিশটা অমূল্য বেরিল রত্ন আছে তাতে। একটা রত্ন হারালেও জোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাল রাতে মুকুট থেকে খোয়া গেছে তিন-তিনটে রত্ন!

'কি করে?'

'আমি ব্যাঙ্কার। আমার নাম আলেক-জান্ডার হোল্ডার। গতকাল মুকুটটা বন্ধক রেখে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড নিয়ে গেলেন মুকুটের মালিক—কথা রইল চারদিন পর ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। ব্যাঙ্ক লুঠ আকছার হচ্ছে বলে মুকুটটা আমি বাড়ী নিয়ে এলাম। দেরাজে রাখলাম। রাত্রে খেতে বসে আমার অপোগন্ড ছেলে আর্থার আর মা-লক্ষ্মী ভাই-ঝি মেরীকে বললাম মুকুটের কথা। সুন্দরী ঝি লুসী হয়ত বাইরে থেকে সে কথা শুনেছিল। হাসতে হাসতে আর্থার অবিশ্যি বলেছিল, গুদোমের তাকে রাখা চাবী দিয়ে দেরাজ নাকি খোলা যায়। ও নিজে খুলেছে ছেলেবেলায়।

আর্থার মা-মরা ছেলে। আর বিয়ে করিনি। আদর দিয়ে নিজেই তার মাথা খেয়েছি। এখন ক্লাবে গিয়ে অনেক কাপ্তেন বন্ধু পাকড়েছে। যখন-তখন টাকা চায়। জুয়ো খেলতেও শিখেছে। স্যার জর্জ বার্ণওয়েল ওর বড় দোস্ত। অতি পাজী নচ্ছার লোক। প্রায় বাড়ী আসে। আর্থার ওর খপ্পর থেকে বেরোতে পারছে না। সে ছাড়া বাড়ীতে অন্য কেউ আসে না।

'মেরীর বাপ-মা নেই। আমার কাছেই মানুষ। বড় ভাল মেয়ে। দু-দুবার আর্থার ওকে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়েছে। রাজী হয়নি মেয়ে। হলে এই সর্বনাশ হত না। আর্থারকে ভাল করতে পারে কেবল সে-ই।

'ঝিয়েরা সব পুরোনো লোক। আলাদা থাকে। লুসীই নতুন। কাজের মেয়ে। কিন্তু রূপসী বলে অনেক ভোমরাকে আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়।

'কাল রাতে খাওয়াদাওয়ার পর আর্থার এসে ফের দুশ' পাউন্ড চাইল। হাঁকিয়ে দিলাম। মুখ কালো করে চলে গেল বটে কিন্তু পথে বসিয়ে দিয়ে গেল আমাকে।

শুতে যাবার আগে আমি নিজে সারা বাড়ীর দরজা-জানলা বন্ধ আছে কিনা দেখে নীচে নেমে দেখলাম জানলা খুলে দাঁড়িয়ে আছে মেরী। আমাকে দেখেই পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে বললে, লুসী ফের রাস্তায় বেরিয়েছিল। ওকে একটু বকা দরকার।

'মাঝরাতে দড়াম করে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল আমার। পাশের ঘরে খসখস আওয়াজ শুনে এসে দেখি আর্থার মুকুট ভাঙবার চেষ্টা করছে দেরাজের সামনে দাঁড়িয়ে। খালি পা। পরনে নাইট ড্রেস। 'চোর চোর' করে চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার চীৎকারে আর্থার ভীষণ রেগে উঠল। মুকুট কেড়ে নিয়ে দেখলাম, কোণটা ভাঙা। তিনটে বেরিল রত্ন উধাও। চীৎকার শুনে মেরী ছুটে এসেই অজ্ঞান হয়ে গেল কোণ ভাঙা রত্নমুকুট দেখে।

'পুলিশ ডেকে আর্থারকে ধরিয়ে দিলাম। আর্থার কিন্তু রেগেমেগে যেন আমাকেই মারতে এল। রত্ন তিনটে কোথায় কিছুতেই বলল না। পুলিশও বলছে, রত্ন উদ্ধার তাদের ক্ষমতায় কুলোবে না। মিস্টার হোমস, আমাকে বাঁচান!'

শার্লক হোমস সব শুনে অদ্ভুত কথা বলে বসল—'আর্থার বেঁকা মুকুটকে সোজা করবার চেষ্টা করেনি তো?'

শুনে ভো ব্যাঙ্কারমশায় রেগে কাঁই—'কী! আপনি আবার বকাটে ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন?'

'আচ্ছা আর বলব না। চলুন আপনার বাড়ী যাওয়া যাক।'

যাওয়ার পথে গুম হয়ে বসে রইল হোমস। ব্যাঙ্কারের বাড়ী পৌঁছে পকেট থেকে বার করল মস্ত একটা আতস কাঁচ। যে জানলার সামনে মেরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন ব্যাঙ্কার তার গোবরাট আর ফ্রেম দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর নেমে গেল বাড়ীর পাশে আস্তাবলের সামনেকার সরু গলিটায়। পুলিশ নাকি সারা বাড়ী তন্নতন্ন করে দেখেছে—বাইরে উঁকিও মারেনি।

ওয়াটসন রইল বাড়ীর মধ্যে। কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকল মেরী। মুখ অতি বিষণ্ণ। ব্যাঙ্কারকে বললে মিনতি করে—'আর্থার নির্দোষ। ওকে ছাড়িয়ে আনুন।' কিন্তু ব্যাঙ্কার কোনে কথাতেই কান দিলেন না। এমন সময়ে বুট থেকে কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে ফিরে এল শার্লক হোমস। মেরীকে দেখে জিজ্ঞেস করল—'লুসী রান্না-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যার সঙ্গে কথা বলছিল, তার একটা পা কাঠের তৈরী, তাই না?' শুনে হেসে ফেলল মেরী—'হ্যাঁ। ভিস্তিওলার একটা পা কাঠেরই বটে।' হোমস কিন্তু হাসল না।

গেল ওপরে। গুদোম ঘরের তাকে রাখা চাবি দিয়ে দেরাজ খুলে রত্নমুকুট হাতে নিয়ে বললে ব্যাঙ্কারকে—'মশায় আপনি এর আরেকটা কোণ ভাঙতে পারবেন?' আঁৎকে উঠলেন ব্যাঙ্কার। হোমস ততক্ষণে গায়ের জোর দিয়ে কোণ ভাঙতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কিন্তু না পেরে বললে—'দেখলেন তো? যদিও বা কেউ ভাঙতে পারে, এমন জোর আওয়াজ হবে যে, পাশের ঘরে থেকে ঠিকই শুনতে পাবেন।'

'তাহলে? ঢোঁক গিলে বললেন ব্যাঙ্কার।

'আপনার ছেলে আর যাই হোক চোর নয়। বলে ভদ্রলোককে ফের বাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হোমস। যাওয়ার আগে বলে গেল—'কাল সকাল ন'টায় আসবেন বাসায়।'

কাজী নজরুল ইসলামের
শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
১। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ----- ১৪'০০
২। গুল বাগিচা---- ৩'৫০. ৩। কাব্য আমপারা-- ৪'০০
৪। পূবের হাওয়া---- ২'০০ ৫। ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী-- ২'০০
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ. সূর্যসেন স্ট্রীট
ফোন-৩৫ ০৬৩৩ কলিকাতা-৯

বেকার স্ট্রীটে ফিরেই হোমস ছদ্মবেশ ধরল। লোফারের ছদ্মবেশ। বেরিয়ে গেল শিস দিতে দিতে। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে এক জোড়া বুট ওয়াটসনের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে আবার নামল রাস্তায়। সারা-রাত বাইরে থেকে ফিরল পরের দিন ভোরে।

ন'টার সময়ে ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক আসতেই হোমস বললে—'এক-একটা বেগিল রত্নের জন্যে হাজার পাউন্ড দিতে রাজী?'

'দশ হাজার দেব।'

'অত চাই না। এই নিন কলম। চেক সই করুন। লিখুন চার হাজার পাউন্ড—আমার পারিশ্রমিক সমেত। বাঃ, 'উঠে গিয়ে দেরাজ খুলে রত্নমুকুটের ভাঙা কোণটা এনে ব্যাঙ্কারের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—'খুশী?'

আলেকজাণ্ডার হোল্ডারের তখন হয়ে এসেছে। দু'চোখ প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসে আর কি! হোমস কি তুকতাক জানে?

গম্ভীর কণ্ঠে বললে হোমস—'আর একটা ঋণশোধ বাকী রইল আপনার।'

খপ করে চেক-বই তুলে নিয়ে বললেন ব্যাঙ্কার—'বলুন কত পাউন্ড?'

'পাউন্ড নয়—ক্ষমা চাইতে হবে। আপনার ছেলের কাছে। আর্থার ছিল বলেই রত্নমুকুট ফিরে পেয়েছেন। নইলে পুরোটাই যেত। দুশ' পাউন্ড না চেয়ে পারিনি বেচারী। ঘুম আসছিল না রাত্রে। এমন সময়ে শুনল বাড়ী থেকে জানলা-পথে পাচার হয়ে গেল রত্নমুকুট। দেখে আর চুপ করে থাকতে পারেনি। জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে বেদম ঠেঙিয়ে চোরের হাত থেকে ছিনিয়ে আনে রত্নমুকুট। চোরের মাথা ফেটে যায় ওর মারে—হাতের মধ্যে থাকে শুধু মুকুটের ভাঙা কোণ। জানলা দিয়ে বাড়ী ঢুকে দড়াম করে পাল্লা বন্ধ করে দোতলায় উঠে ভাঙা মুকুটের কোণ সিধে করার চেষ্টা করছিল আর্থার—আপনি তাকে চোর বলায় আর মুখ খোলেনি।'

'কিন্তু আ-আপনি জানলেন কি করে?'

'দেখলাম গলির বরফে জুতো পরে কে যেন পায়চারী করেছে—আর একজন খালি পায়ে সেই দাগ মাড়িয়ে গিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেখলাম জুতো পায়ে লোকটা দৌড়ে পালিয়েছে—রক্তের ফোঁটা পড়তে পড়তে গেছে। গোবরাট পরীক্ষা করে দেখলাম আর্থার জানলা দিয়েই লাফিয়ে নেমেছিল। তাই ছদ্মবেশে চোরের বাড়ী গিয়ে চাকরের সঙ্গে ভাব জমিয়ে মনিবের একজোড়া বুট জোগাড় করলাম। আপনার গলিতে এসে পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। ফিরে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করলাম চোরকে। এমনিতেই তার মাথা ফেটেছিল। তারপর আমার রিভলবার দেখে উগড়ে দিল রত্নের হদিস। বিক্রী করেছিল ছশ' পাউন্ডে—আমি কিনে নিলাম হাজার পাউন্ডে।'

কিন্তু চোর কে? কে রত্নমুকুট পাচার করেছিল তার হাতে?' রাগে ফেটে পড়লেন ব্যাঙ্কার।

আপনি কিন্তু ধরে ফেলেছেন—তাই না?

অদ্রীশ বর্ধণ

(গোয়েন্দা ধাঁধার উত্তর—৫৯ পৃষ্ঠায়)

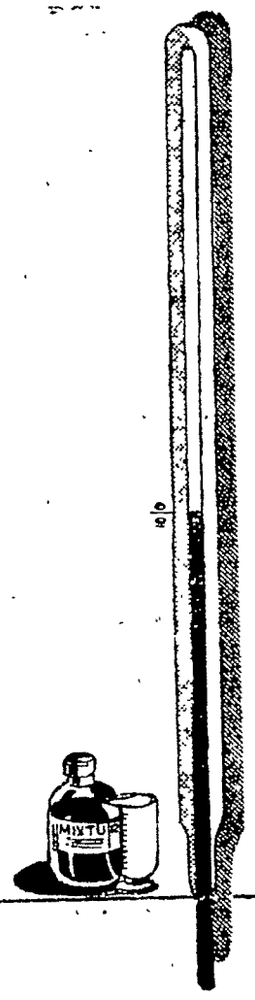

জ্বর

আর সঙ্গে

কাঁপুনি হলে

ম্যালেরিয়া

হতে পারে

অবিলম্বে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে জেনে নিন ম্যালেরিয়া হয়েছে কি না। স্বাস্থ্য কর্মী আপনার শরীর থেকে শুধু এক ফোঁটা রক্ত নেবেন। যদি ম্যালেরিয়া হয় তাহলে অবিলম্বে আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

রক্ত পরীক্ষা করানোর জন্যে পয়সাকড়ি কিছু দিতে হয় না

সব প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে

স্বাস্থ্য বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রক

davp 74/461

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

ভবনাথের উঠোনে ধান উঠে গেছে। তাই ছেলেদের বায়না নতুন চালের ফ্যানসা ভাত খাবে। কিন্তু পুজো না দিয়ে নবান্ন না করে খাবার নিয়ম নেই। একদিন তাই পরদিন ডেকে পুজো আচ্চাও হয়ে গেল। ভাটিয়াল চালের মিষ্টি ফ্যানসা ভাত গরম গরম পাতে পড়তেই বাচ্চাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দেবুবুড়িও তাদের মাঝখানে বসেছেন। একবার এর গালে একবার ওর গালে ভাত তুলে দিচ্ছেন। যেন উৎসব লেগে গেছে। এদিকে ভবনাথের বিলে যাবার তাড়া। ছেলেরা সব লায়েক হয়েছে। জলকাদা ভাঙতে তাদের বয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই তিনি কাঁধে চাদর ফেলে ছাতা ও লাঠি হাতে হন হন করে বিলমুখো চললেন। উঠোনে তখন বাড়ির মেয়েদের বাড়ি দেবার ধুম লেগেছে। এই সময় মাঠের আর এক চেহারা মাঠে মটর গাছ লতিয়ে উঠেছে। লকলকে সবুজ লতা—শুঁটি সামান্যই ধরেছে—অফুরন্ত বেগুনি ফুল। তার ওপরেই দামাল ছেলেদের হামলা চলে। নিস্তরঙ্গ গ্রাম আবার প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে ওঠে। ভবনাথের বাড়িতেও তার ছোঁয়া লাগে। ডাক পিওন এসে সেই ভাবকে যেন আরো বাড়িয়ে দিল। বিশেষ করে সে বাড়ি এবং আশপাশের বাড়ির বৌঝিদের মধ্যে।

ক্রমে সে খবর পাড়ায়ও খবর হয়ে যায় পিওনঠাকুর গাঁয়ে এসেছেন। পিওন-ঠাকুরই এখন যেন এই গ্রামের খবর। আর পিওনের দুর্বোধ আকর্ষণ আছে এই গ্রামের প্রতি। এক চিঠিচাপাটি বিলি করে সার বিকেলটা জমিয়ে দাবা ও পাশা খেলা এবং খাবার সময় সোনাখড়ির হাট থেকে সস্তা দরে হাটবাট করা।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

উঠানে এসে পুঁটি চেঁচাচ্ছে: ও বউদি গাড়ি চড়ে তোমার মেয়ে বাড়ি এসেছে কেমন দেখ।

বেড়ার ফাঁকে অলকা এক নজর তাকিয়ে দেখল। দাওয়ায় পিওন ঠাকুর, চেঁচিয়ে কথা বলতে পারে না। উঠে দাঁড়িয়ে টুকটুকির গাড়ি চড়ে আসা ভাল করে দেখবে তা-ও সম্ভব নয়। ছোট শাশুড়ি নিরামিষ হেঁসেলে—তিনি ভাববেন দেখ রান্নাবান্না ফেলে হাঁ করে মেয়ে দেখছে। সে বড় লজ্জা।

উমাসুন্দরী কোন দিক দিয়ে এসে ধংকার দিয়ে উঠলেন: দেখ, উদভট্টি কাণ্ড দেখ, বাচ্চা নিয়ে খোলার উপর বসিয়েছে। মুখ থুবড়ে পড়বে এক্ষুনি। নামা বলছি, নামিয়ে কোলে করে আন। দুধ খাবার সময় হল, মায়ের কাছে এনে দে।

গুণমণি কাজ শেষ। আর এখন মাথা খুঁড়ে মরলেও কিছু করবে না। রান্নাঘরের পিছন দিকে এক দরজা—সেইখানে গিয়ে কাঁসর পাতল। বুড়ো গোপাল বাড়িতে চান-টান করে পথ তাকাচ্ছে। পেট চনচন করছে, অন্য কিছু না পেয়ে কলকের পর কলকে তামাকই টেনে যাচ্ছে শুধু। গুণমণি ঐ যে কাঁসর পেতে ধরেছে, সেখানে ভাত পড়বে দু-জনের মতন; প্রতিটি তরকারি সমান দুই ভাগে। হেরফের হলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুণমণি গালির চোটে পাড়া তোলপাড় করবে।

ভাতের কাঁসর নিয়ে গুণমণি সুপারি বাগানের সুঁড়ি পথ ধরে নাথপাড়ায় চলল।

পাথরের থালায় ভাত, বাটিতে বাটিতে তরকারি, প্রকাণ্ড দুধ-খাওয়া বাটিতে ঘন, আঁটা দুধ আমসত্ত ও নলেন পাটালি। যাদব ষাঁড়ুয্যে ডাকসাইটে রাঁধুনি, ভোজের রান্নায় ডাক পড়ে, তাঁর হাতের সাধারণ সামান্য ব্যঞ্জনেও অপরূপ এক তার—অন্য কারো রান্নায় সে জিনিস পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র ভাত আর মাছের ঝোলটা নামিয়ে নিয়ে ভোজনের পাট তাড়াতাড়ি সেরে দাবায় বসবেন, এই মতলব করেছিলেন। নিমি বলল, পিওনকাকা, যেদিন আপনার পাত পড়ে পাঁচ রকম ভালমন্দ প্রসাদ পেয়ে থাকি আমরা। আজকে কেন তা হবে না? নিমি বলে যাচ্ছে, আর মাথার কাপড় একটু তুলে দিয়ে তরঙ্গিণী হাসছেন। নিমির কথা ছোটগিন্নিরও কথা এবং বাড়িসুদ্ধ সকলের কথা, বোঝা যাচ্ছে। গৃহস্থের ইচ্ছায় এতগুলো পদ রাঁধতে হল পিওন ঠাকুরকে।

রেঁধে বেড়ে এইবারে খেতে বসবেন কালীময় ও ভবনাথ বিল থেকে উঠে বাড়ি ঢুকলেন। কালীময় গজর-গজর করছে: বয়স হয়েছে তা মানবেন না। অন্যের উপর ভরসা পান না, সব কাজে আগ বাড়িয়ে গিয়ে পড়বেন। শামুকে কেটে পায়ের তলা ফালা-ফালা হয়েছে, শামুকের কুচি বিঁধেও আছে দু-চার গণ্ডা। আলে পা হড়কে পড়েছিলেন আমি না ধরে ফেললে হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যেত আজ।

এ সমস্ত ভবনাথের কানে যাচ্ছে না, পিওন ঠাকুরকে বাড়ির উপর দেখে পরমাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন: চিঠি-পত্তোর আছে আমার?

যাদব সহাস্যে বললেন, চিঠি আছে। আর সকলের বড় যা তাও আছে।

মনিঅর্ডার?

দু-হাতের দশ আঙুল পাশাপাশি বিস্তার করে যাদব বললেন, তিনখানা।

অর্থাৎ দশ টাকার নোট তিনখানা মনি-অর্ডারে এসেছে। বললেন, বসুন, টাকাটা দিয়ে দিই আগে, তারপরে খেতে বসব। পরের কড়ি যতক্ষণ আছে ভাব বোঝা হয়ে থাকে।

রান্না হচ্ছে বলে চামড়ার ব্যাগ যাদব চালের নিচে আনেন নি মাচার খুঁটি পুঁতে সর্বচক্ষুর সামনে ঝুলিয়ে রেখেছেন। সই করার জন্য ফরম হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে

আপনার পরিবারের সবার নিত্য প্রয়োজনীয় সব্যের জন্য
হাওড়া সমবায়িকা

বলেন সংসার খরচা হল দশ টাকা মামলা-খরচা তার দুনো—

ভবনাথ লুফে নিয়ে বলেন, দশ-ই বা লাগে কিসে সংসারে? খাওয়ার মানুষ কুল্যে জনা বারো না হয় পনেরোই হল। ধান-চাল ডাল কলাই তরিতরকারি সবই ক্ষেতের গোয়ালে দুধেল গাই তিনটে, শুকনোর মাস কটা বাদ দিয়ে খালের মাছও নিখরচায় অল্পবিস্তর আসে। মামলার পক্ষে বিশ টাকায় অবশ্য কুলানো মুশকিল। সংসার-খরচা থেকে কিছু কিছু টানতে হবে ছাঁদিকে।

কুপনে চোখ বুলিয়ে চিন্তিতভাবে বলে উঠলেন দেবনাথের শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। ব্যস্ত হব বলে আমায় কিছু জানায় না। কাকার মানা শুনে কেষ্টাটাও চাপা দিয়ে যায়। এত করে লিখছি, বাড়ি এসে মাস তিন-চার থেকে যাও। ডাক্তার-কবিরাজ কিছু লাগবে না, এমনিতেই চাংগা হয়ে যাবে।

খামের আঁটা চিঠি। পিওনঠাকুর বললেন, পাটোয়ারি মানুষের নামে রকম-বেরকমের চিঠিপত্তোর আসে—এ চিঠি তাই কারো হাতে দিই নি।

ভাল করেছেন—

ঠিকানার লেখা ভবনাথ ঠাউরে ঠাউরে দেখেন। এমনি হল না তো ঘরে গিয়ে চশমা-জোড়া নিয়ে এলেন। হাতের লেখা থেকে ছাঁদস হল না। খামটা বোদে ধরে আন্দাজ নিলেন ভিতরের চিঠি কোন দিকটায়। ছুরি নিয়ে এসে সন্তর্পণে খামের মুখ কেটে চিঠি বের করলেন।

দু-দুটো পয়সা খরচা করে খামের চিঠি কে আবার লিখতে গেল—বড় গিন্নি এক নজরে তাকিয়ে আছেন। মুখ তুলে ভবনাথ বললেন, তোমার ছোটছেলের বিয়ে গো—

উমাসুন্দরীর বোধগম্য হয় না: কার বিয়ে বললে?

হিরুর বিয়ে এ মাসের তেইশে। তোমার ভাই নেমন্তন্ন পাঠিয়েছেন, সর্বারম্ভে গিয়ে পড়ে শুভকর্ম তুলে দিয়ে এসোগে।

উমাসুন্দরী অবাক হয়ে বলেন, বনকরের চাকরি করছে না সে?

চাকরি না ঘোড়ার ডিম। বনকরে যেতে বয়ে গেছে তার। দেবনাথের টাকা সস্তা—চাকরির নামে এক কাঁড়ি টাকা খসিয়ে মাথার বাড়ি বিয়ের বরপাত্তোর হয়ে বসেছে। অমন ছেলে বলি দিতে হয় ছাইগাদার উপর রেখে—রক্ত যাতে মাটিতে না পড়ে।

ভবনাথ রাগে গরগর করছেন। বড়-গিন্নিরও দুঃখ হয়েছে—পেটের ছেলের বিয়ে পরের মতন নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়েছে। তার মধ্যে ভরসাও যৎকিঞ্চিৎ: বিয়ে থাওয়া হয়ে ঘরসংসারে মতি হয় যদি এবারে। বাড়িসুদ্ধ জ্বালাতন-পোড়াতন এই ছেলে নিয়ে। রাজীবপুর হাইস্কুলে চেষ্টা হয়েছিল গোড়ায়। সুবিধা হয় না দেখে দেবনাথ নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে শহরের ইস্কুলে ভরতি করে দিলেন। পড়াশুনো হিরুর কাছে বাঘ—এক নিশিরাত্রে টিপি-টিপি দুয়োর খুলে সে লম্বা দিল। ছেলে-মানুষ একা একা রেল-স্টিমার করে এবং ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেঁটে বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে বাড়ি এসে উঠল। আছে বাড়িতে—বয়সও হচ্ছে সংসারের কুটোগাছটি ভাংবে না। খায় দায় আর সমবয়সি নিষ্কর্মা কতকগুলোর সঙ্গে তল্লাট জুড়ে উৎপাত করে বেড়ায়। নতুন বাড়িতে নিশিদিনের আস্তানা—তিনবেলা শুধু খাওয়ার সময়টা মিনিট কয়েকের জন্য বাড়ি যায়।

এমনি চলছিল। দেবনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে বইকি। জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার হওয়ায় বহু জনের সঙ্গে তার জানাশোনা দহরম-মহরম। বাড়ির বড় ছেলে কৃষ্ণময়কে নিজ এস্টেটে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। মেজোজন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আছে—শ্বশুর যা রেখে গেছেন, নেড়ে চেড়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছে। ছোট হিরণ্ময় মাথা ঠাণ্ডা করে একটা কিছুতে লেগে গেলে আর ভাবনা থাকে না। অনেক রকম করে দেখেছেন দেবনাথ—গোড়ায় ঠিকাদারি ফার্মে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। পরে উকিলের সেরেস্তায়, তার পরে মার্চেন্ট অফিসে এবং শেষে কাঠের গোলায়। কোথাও বনিয়ে থাকতে পারে না ঝগড়াঝাঁটি করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বেরোয়। এইবারে এত দিনে ঠিক হয়েছে। কন্ট্রাক্টার অম্বুজাক্ষ দাম—খুঁজলে দেবনাথদের সঙ্গে বোধ হয় একটু আত্মীয়-সম্বন্ধও বেরিয়ে যাবে—একটা চক্কের বন্দোবস্ত নেবেন বলে ভদ্রলোক কিছু দিন ধরে খুব হাঁটাপেটা করছেন। বনকরের শিক্ষানবিশী কাজে হিরুকে দেবনাথ দাম-মশায়ের হেপাজত করে দিলেন। এইবারে ঠিক হয়েছে—বাড়ির সবাই নিশ্চিন্ত, বাদার জংগলই হিরুর উপযুক্ত জায়গা। জংগলে সংগীসাথী এয়ারবন্ধু নেই, মন বসিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজকর্ম করতে পারবে। যেমন তেমন চাকরি দুধ-ভাত-বনকরের চাকরি তা হলে সেই নিরিখে দুধে চান করা ঘিয়ে আঁচানো। ফরেস্টার অম্বুজই তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত—চকের পর চক কিনে যাচ্ছেন।

হরি, হরি! কোন কৌশলে করে যে হিরণ্ময় অম্বুজ দামের চোখ এড়িয়ে বাদা-বন ছেড়ে মামাবাড়ি গিয়ে উঠেছে, অন্তর্যামী ঈশ্বর বলতে পারেন। আর পারেন খানিকটা বোধহয় মাতুল ভূদেব মজুমদার। চাকরিবাকরি বাতিল করে সে বিয়ে করতে চলল। দিন দশেক মাত্র বাকি সে বিয়ের।

(১৭)

বিয়েয় ভবনাথ যাবেন না, যেতে পারেন না। বাপ-মা খুড়োখুড়ি এবং চারি চরণে সমস্ত বর্তমান থাকতে মামার বাড়িতে মামার ব্যবস্থায় বিয়ে হতে যাচ্ছে—কোন মুখ নিয়ে ভবনাথ কাজের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবেন? লোকে শুধায়: বিয়ে কোথায় হচ্ছে বড়-কর্তা? কালো মুখ করে ভবনাথ জবাব দেন: আমি কিছু জানি নে, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞাসা করো গে।

বাড়ির মধ্যে অর্থাৎ উমাসুন্দরীর সঙ্গে মন-কষাকষি এই ব্যাপারে বিয়েয় যাবেনই তিনি। অন্যায় তো এদেরই—অত রাগের কি আছে? ছেলের ভাগনেয় কি তফাত? দাদার ছেলে নেই, পুতের-বউর স্থলে ভাগনে-বউ এনে সাধ মেটাবেন। আগের দু-ছেলের বিয়ে তোমরা দিয়েছ—দাদা-বউঠান দুজনে এসে পড়ে কাজ তুলে দিয়েছেন। হিরুর বিয়েটা এবারে তাঁরাই না-হয় দিলেন।

উমাসুন্দরী যাচ্ছেন। নেমন্তন্ন পেলে কালীময় সাধ্যপক্ষে কখনো ছাড়ে না—সে-ও যাচ্ছে মাকে নিয়ে। কনিষ্ঠের বিয়ের বরযাত্রী হয়েও যাবে। এবং বুড়োমানুষ মামা কন্যা-পক্ষের বাড়ি সশরীরে যদি না যেতে পারেন, কালীময়ই তখন বরকর্তা।

পুঁটি লাফাতে লাফাতে এসে বলল, আমিও যাচ্ছি রে। জেঠাইমা বলেছে।

কমল বলে আমি?

তোকে নেবে না। তুই যে মা ছেড়ে থাকতে পারিস নে আমি পারি। শুই-ই তো জেঠাইমার কাছে।

(ক্রমশঃ)

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রণা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হ'লে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

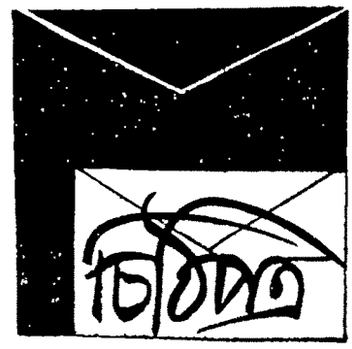

রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গে

গত ১৪ই মার্চ 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মজুমদারের 'রবীন্দ্র সংগীতে স্রষ্টা বনাম শিল্পী' নামক বিতর্কিত প্রবন্ধটি সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কিছু মতামত প্রকাশের বাসনা রাখি।

ইদানীং রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে শিল্পীদের স্বাধীনতা কতখানি সে সম্পর্কে একটা গুঞ্জন শ্রোতা সাধারণ্যে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্র ও নিবন্ধ মারফৎ প্রয়াশই শোনা যায়।

এবং ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে দুটো মতবাদও রূপ নিচ্ছে বলে অনুমান করি।

কিন্তু আমার বক্তব্য আপনাদের সাপ্তাহিকে প্রকাশিত নিবন্ধটির কয়েকটি মন্তব্য সম্পর্কে। সেটা হোল প্রবন্ধকার তাঁর লেখার মধ্যে এক জায়গায় লিখেছেন 'সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কোন কোন সংগীত সমালোচক কয়েকজন প্রবীণ ও বর্ষীয়ান গাইয়েকে রবীন্দ্রসংগীতে কিছু কিছু অতিরিক্ত কাজ সংযোজন করবার অধিকার দেবার প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন। কিন্তু এই করে তাঁরা ঐ সব গাইয়েদের রবীন্দ্র সংগীতে তাঁদের স্বকীয় ঢং আমদানী ও কিছুটা পরিমাণে কয়েকটি ঘরানা সৃষ্টির পরোক্ষ অনুমোদন করছেন না কি? এই প্রসঙ্গে তিনি একজন প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত গায়েকে নিজস্ব ঢং-এ রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনের জন্য প্রকারান্তরে দায়ীও করেছেন।

আমার প্রথম জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথ কি কোথাও এমন কথা বলে গেছেন যে, সমস্ত গানই তাঁর কণ্ঠস্বরের অনুকরণ বা অনুসরণে গাইতে হবে অথবা নির্দিষ্ট কিছু গাইয়ে বা ট্রেনারের শিউাপদ্ধতি অনুযায়ী গাইতে হবে?

কিছুকাল পূর্বেও রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা ক্লান্তিকর মেজাজে গান রপ্ত করার (নাকি শিক্ষকের অনুকরণ?) রেওয়াজ ছিল। যার ফলে বেশীর ভাগ সচেতন শ্রোতার কাছেই রবীন্দ্র সংগীত শোনা একটা ক্লান্তিকর ব্যাপার ছিল। তা সত্ত্বেও সেই রেওয়াজটা এপিডেমিকের মতই ক্রমশ ছড়িয়ে গিয়েছিল। যার ফলে রবীন্দ্র-কাব্য পাঠকের চেয়ে শ্রোতা অনেক কমে গিয়েছিল। সেই অক্ষমতা বা এপিডেমিকের হাত থেকে রবীন্দ্র সংগীত আজও রেহাই পায়নি।

কিন্তু স্বয়ং স্রষ্টা কি এই রীতিটা প্রবর্তন বা অনুমোদন করে গিয়েছিলেন? এটাও কি এক ধরনের স্টীম রোলার চালানো নয়? সেদিক থেকে এই সব বর্ষীয়ান গাইয়েরা তাঁদের শর্তের ক্ষেত্রে অনেক সৎ। [illegible] রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও তাতে যে সুর [illegible] আছে, তাকে ভাবে ও রসে মূর্ত [illegible]ই রবীন্দ্র সংগীত গাইয়ের প্রধান [illegible]য়া উচিত বলেই আমার মনে হয়। তাতে গায়কের নিজস্ব কিছু মেজাজ বা আবেগ থাকলে আমার বিশ্বাস সেই গান মূর্ত হয়ে উঠবারই অবকাশ পাবে। এবং সেখানেই রবীন্দ্রনাথ সার্থক। নচেৎ শত চেষ্টায়ও এবং ট্রেনারের শত নিষেধ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি সততা থাকলেও সেটা রবীন্দ্র সংগীত হয়ে উঠবে না। আমাদের ভুললে চলবে না যে, যিনি সার্থক গাইয়ে তিনি নিজেও কমবেশী একজন স্রষ্টা। তার স্বকীয়তা সৃষ্টিকে সার্থকই করে।

তবে অতিরিক্ত সুর সংযোজন অর্থাৎ যেটা সেই গানের পক্ষে অপরিহার্য নয়, সে ক্ষেত্রে সেই ধরনের ঝোঁক না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাগাশ্রয়ী গানের ক্ষেত্রে একথা নিশ্চয়ই খাটে না। সেখানে রাগের বিস্তার বা অতিরিক্ত তান যোগ হতেই পারে।

আর একটি প্রশ্ন রবীন্দ্র সংগীতে বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকায় ও সৌভাগ্যক্রমে সেগুলো এখন অবধি বেশীর ভাগ শিল্পী বজায় রাখায় রবীন্দ্র সংগীতে একটা গায়কী গড়ে উঠেছে—। আমার জিজ্ঞাসা সেটা কি? অর্থাৎ কিছু পপুলার গায়ক কিংবা গায়িকার রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনের ঢং-টাই কি রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ও সুর বোঝার পক্ষে যথেষ্ট? গায়ক কিংবা গায়িকার নিজস্ব কোন সত্তাই কি তবে থাকতে পারবে না রবীন্দ্রনাথের গানে? এবং সেটাই কি স্বয়ং স্রষ্টার উদ্দেশ্য ছিল?

এগুলি অবশ্যই আমার নিজস্ব মতামত। প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ, তিনি এমন একটি বিতর্কিত প্রবন্ধ লিখে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেছেন বলে।

কানাই সামন্ত
কলিকাতা—৬

রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর কণ্ঠরোধ

রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী শ্রীদেবব্রত বিশ্বাসের অপমানজনক সংবাদে আমি বিশেষ ভাবে মর্মাহত হয়েছি। বিশ্বভারতীর এই খামখেয়ালীপনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

স্বরলিপি অনুযায়ী কজন শিল্পী রবীন্দ্রসংগীতের শুদ্ধতা বজায় রাখেন? রবীন্দ্রনাথ সংগীতের সুর (স্বরলিপি) আমাদের উপহার দিলেও তিনি কি যন্ত্রসংগীতের সুরের ব্যবহারের (মানে গানের সাথে যথোপযুক্ত ব্যবহৃত সেরকম কোনো যন্ত্রসংগীতের সুর বা স্বরলিপি) পদ্ধতি উপহার দিয়ে গেছেন? তাহলে, রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে যে ধরনের যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার করলে সেই সংগীতটি আরো ভালো এবং সুখশ্রাব্য হয়, সে ধরনের কিছু করলে কিংবা করার চেষ্টা হলেই কি রবীন্দ্র ভারতীর কর্মকর্তাদের জ্বালা শুরু হয়ে যায়। আমি রবীন্দ্রসংগীত প্রেমিক হিসেবে বিশ্বভারতীর এই ধরনের আমলাতান্ত্রিক আদেশকে প্রত্যাহার করতে বলছি। এবার তাঁরা শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস মহোদয়কে তাঁর স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করুন।

চিন্ময় রায়
ত্রিবৃত্ত সর্বাণি কোচবিহার

শিল্পীর কণ্ঠরোধ

শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসকে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে সকল রবীন্দ্রসংগীত অনুরাগীই স্তম্ভিত হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। এখানে একটি প্রশ্ন—বিশিষ্ট বেতারশিল্পীরা কেন এমন নীরবে রয়ে গেছেন? তাঁরা সকলেই কি বিশ্বভারতীর খামখেয়ালীপনাকেই সমর্থন করেন? না, ব্যক্তিস্বার্থই তাঁদের প্রতিবাদের পথে অন্তরায়?

ধ্রুবতারা যেমন সত্য রবীন্দ্রসংগীত জগতে দেবব্রত বিশ্বাস, তাই সংগীতের মুক্তপ্রাঙ্গণে কেন এই বন্ধনীতি? কেন এক স্বীকৃত শিল্পীর কণ্ঠরোধ? শ্রীবিশ্বাসের কণ্ঠের সুরের অভিব্যক্তি ও মানবিক আবেদন বিশ্বভারতীর কজন ভাগ্যবানের কণ্ঠে পাওয়া যাবে? জর্জদার (ডাকনাম) কণ্ঠরোধ রবীন্দ্রসংগীতের অপমৃত্যু। আমরা যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত ভক্ত এবং এর [illegible] সমর্থক সবাই জানি, এই সংগীত জনপ্রিয় হওয়ার মূলে সকলের আদরের এবং শ্রদ্ধার উদাত্ত কণ্ঠ, অধিকারী জর্জদা এবং তাঁর অবদান কত বেশী। তা না করে দেবব্রত বিশ্বাসের মতো

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস. এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ভি.পি.

সচেতন ও বিদগ্ধ-রবীন্দ্রভক্ত শিল্পীর কণ্ঠ-রোধ করে রবীন্দ্রসংগীতকে একটা বদ্ধ ডোবার মধ্যে ঠেলে মারবার চেষ্টা কেন? এটা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর ভয়প্রসূত নয়তো কি?-কবে সেই মহিলার (যিনি শিল্পীর কণ্ঠরোধ প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন) নামটা প্রকাশ হবে? সেদিন চিনতে পারবো কে এই ভদ্রবেশধারী উপরতলার মানুষ।

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, 'অন্তরঙ্গ'
পোঃ বেলগাই (হুগলী)

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংখ্যাটি' পরিকল্পনার অভিনবত্বের জন্যে নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। বিশেষতঃ অজয় হোম, শেখ জব্বার, বুদ্ধদেব গুহ, কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখের লেখা ভালো লাগলো। তবে কিছু লেখায় তথ্যগত অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। যেমন, মানুষের ভয়ে ও অভয়ে বন্য প্রাণী রচনাটিতে 'লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায়' বেশ কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ ও পাখির তালিকা দেওয়া হলেও তার মধ্যে বিলুপ্ত প্রায় সাপ, মাছ বা কীটপতঙ্গের উল্লেখ দেখলুম না। এই সূত্রে কিছু দুষ্প্রাপ্য (বা বিলুপ্ত) মাছ ও সাপের উল্লেখ করি; মাছ : বুকোতিয়া (লাতিন নাম : বোতিয়া গেটো), মোয়ারি চেলা (এসপিডোপারিয়া মোরাস) বাঘাড় (বাগেরিয়াস ইয়ারেল্লি), কাজোলি (আইলিয়া কোইলিয়া), সলাকাটা (সুইডোচেনসিস সুলকাটাস), রিঠা (রিটা বুকনানি) সোনাখড়কে (কোরিকা-গণ) প্রভৃতি; এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক নামহীন তেলাটুপি, লাবচ, লাদিন সীতাহার ফিরফিরে খেচা চিরুং আতুশী গাংলা উরাট আড়গেল কোকো খড়িয়া হলদা প্রভৃতি মাছও হয় লুপ্ত নয়তো লুপ্তপ্রায়। সাপ : স্বর্ণ বোড়া বা ধোবিয়া (ভাইপার) উলু বোড়া (বাসেলস ভাইপার) ফরসা দুমুখো সাপ (আর্থ স্নেক), অজগর (পাইথন) প্রভৃতিও বিলুপ্তির মুখে।

এ ছাড়া 'প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী' রচনাটিতেও আরও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজিত করা যেত। যথা, 'ভারতের বেত্রবতী ও চম্বল নদী উপত্যকায় ছত্রিশগড়ের সিংহালপুরে মিরজাপুরের লিথমিয়ায় যে সব প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে নানা জাতের বন্য পশু-পক্ষীর আশ্চর্য জীবন, রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। ম্যামথ বাইসন বা গৌর গণ্ডার সম্বর হরিণ ভালুক বন্য গাধা বরাহ প্রভৃতি পশু, শিকারের যে সব চিত্র গুহামানবেরা এঁকে রেখে গেছেন সেগুলি তাঁদের নিখুঁত পশু পর্যবেক্ষণের পরিচয় বহন করছে। প্রত্যেকটি প্রাণীর অবয়ব সংস্থান...তুলির দু-একটি আঁচড়েই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা।' (দ্রষ্টব্য : পশুচিন্তা...সেকালে একালে অমৃত ৭-১-৭৩) ঋকবেদেও বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৩০টি পশু পক্ষীর উল্লেখ পাওয়া যায়; তবে সেখানে বাঘের (শার্দুল) নাম দেখতে পাওয়া যায় না। অথর্ব বেদে প্রথম বাঘ ও সিংহের নাম পাই। শিবলিক পাহাড়ে যে সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন জীবজন্তুর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তার মধ্যেও জাতীয়-পশু বাঘের কোন কঙ্কাল পাওয়া যায়নি। বরং অধুনা ভারত থেকে বিলুপ্ত আফ্রিকার হাতী, জিরাফ, জলহস্তী ওবাংওটাং, বেবুন প্রভৃতির জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের মতে বাঘ এসেছে সাইবেরিয়া থেকে। মালয়েশিয়া, ব্রহ্মদেশের পথে পূর্ব ভারতে। সেই জন্যেই তার নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এক সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যাপক ভাবে যে ভারতীয় সিংহ দেখা যেত তারও আগমন ঘটে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে।

গুপ্ত যুগে বনের পশুকে পোষ মানানোর কেমন চেষ্টা চলতো তার প্রমাণ পাওয়া যাবে কালিদাস কথিত উদয়ন রাজার কাহিনীতে; সেখানে 'বন্যবারণ সংযমের' বাস্তব বর্ণনা লভ্য। পালকাপ্যের 'হস্তি আয়ুর্বেদে'ও হাতী ধরা ও পোষার কথা আলোচিত। সেকালে গণ্ডার, গৌর প্রভৃতি বন্য প্রাণীকে পোষ মানিয়েও ঘরের কাজে লাগানো হত। সিন্ধু প্রদেশে বন্য ঘোড়া ধরে তাকে শিক্ষা দেওয়ার উত্তম ব্যবস্থা ছিল। শিকারের প্রয়োজনে পোষা হত শিকারী চিতা। গোতম ও শালিহোত্র সংহিতায় গো এবং অশ্ব পালনের বিস্তারিত বিবরণ আছে। প্লিনির লেখা থেকে জানা যায় প্রাচীন রোমের অভিজাত সমাজে ভারতের চিতাবাঘ শিকারী চিতা ধনেশ পাখি, সিংহ, বাঘ, ময়ূর বানর গণ্ডার টিয়া, ফেসান্ট প্রভৃতির বিশেষ চাহিদা ছিল। (দ্রষ্টব্য : বর্তমান লেখক রচিত 'পশুচিন্তা সেকালে একালে' অমৃত)।

উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ, ২৪ পরগণা।

(২)

অমৃতের 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংখ্যাটি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হিসেবে নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখতে পারে। পরিকল্পনার দিক থেকে তো বটেই প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

অরণ্যের কথাশিল্পী বিভূতিবাবুর 'আরণ্যকের' আদিক অনুচ্ছেদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন লেখকের লেখা—অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে এক-ই সঙ্গে কৌতূহল জাগায় এবং অনেক অজানা বিষয় জানা যায়। এর মধ্যে সু-সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহের 'টাঁড়বারো' নামক নিবন্ধটি সত্যিই সুন্দর। সবল বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এই বিশেষ সংখ্যাটির মান আরও উজ্জ্বল করেছেন তিনি। তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁর শেষ কয়েকটা কথা যেন সংরক্ষণের সমস্যাটা আজকে অনেক অনেক যুগলপ্রসাদকে খুঁজে বের করার সমস্যা)—খুবই বাস্তবসম্মত। আর পালামৌ ও সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সু-পরিকল্পনা যেন ওখানকার খেটেখাওয়া মানুষদের জীবনধারণের অধিকারকে ধ্বংস না করে সেদিকটা নজর দেওয়া সরকারের আশু কর্তব্য বলে মনে করি।

ধ্রুব বাগচী শ্রীরামপুর, হুগলী

(৩)

অমৃতের 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংখ্যা' উৎসুক পাঠকদের কাছে এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে বলা চলে। 'বুদ্ধদেব গুহের' সংবেদনশীল প্রবন্ধ 'টাঁড়বারো' মনকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দেয়।

একদিকে বন্যপ্রাণী সম্পদের প্রতি সরকারী ও রাজামহারাজাদের দীর্ঘকালীন ব্যবসায় ও আভিজাত্য-ভিত্তিক বিচার—অন্যদিকে 'বাঘপ্রকল্প' চলাকালে তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিঃস্ব মানুষের জীবিকার প্রতি সরকারী তরফের অকরুণ ঔদাসীন্য মনের গভীরে নাড়া না দিয়ে পারে না।

সেই সঙ্গে মনে পড়ে আরণ্যকের 'যুগলপ্রসাদের' কথা। হায় এই যুগেও কি যুগলপ্রসাদেরা আছে?

রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দুষ্প্রাপ্য প্রাণী সংরক্ষণ সম্বন্ধে চিন্তাগর্ভ আলোচনাও বেশ ভাল লাগল।

অমলকৃষ্ণ গুপ্তের 'প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী' উৎসুক পাঠকের আকর্ষণ বাড়িয়েছে সন্দেহ নাই।

মানুষের 'ভয় ও অভয়' প্রবন্ধে লেখক অমল দাশগুপ্তের বন্যপ্রাণী সংহারের অতীত ও বর্তমান পর্যায় সংক্রান্ত আলোচনায় বেশ চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়।

বংশী মান্না, কল্যাণ চক্রবর্তী ও সুনীতিপ্রসন্ন মল্লিকের আলোচনা মুখ্যতঃ তথ্য ও তত্ত্ববহুল হওয়ায়—এগুলো গবেষকদের কাছে সমাদৃত হবে। উৎসাহী পাঠকেরাও অবশ্য জানার অনেক কিছু পাবেন।

মহম্মদ সফিউল্লা ও অজয় হোমের পাখী সংক্রান্ত আলোচনা এক বিরল-বৈচিত্র্যপূর্ণ আকর্ষণ। বিশেষতঃ আলোচনায় নানাধরনের প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া পাখীর কাহিনী পড়তে পড়তে মন—কি ছিল, কি হারাচ্ছি—ভাবতে ভাবতে যুগপৎ সুখ দুঃখের দোলায় দুলতে থাকে। এইসব পাখীর [illegible] জন্য লেখকদের উদ্বেগে পাঠকদের মনও অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে।

সবশেষে বলছি— অমৃতের বর্তমান সংখ্যা প্রাণীবিদ্যার এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

অরূপচন্দ্র [illegible]
বিরাটী, কলি-[illegible]

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গীতায় আছে অর্জুন যুদ্ধ করার [illegible]ধ নানা জোরালো যুক্তিকে নানা [illegible]টমেন্টাল মশলা মিশিয়ে পেশ করতে [illegible] উত্তর দিয়েছিলেন 'প্রহসন্নিব'—অর্থাৎ [illegible]স্য করে। শ্রীঅরবিন্দও এ-চিঠিটি [illegible]লেন কৃষ্ণের ঢঙে যাব মূলে ধমক—[illegible] বন্ধুকে বলা: পাগলামি ছেড়ে ওঠো—কেন না হৃদয়-দৌর্বল্য আসলে পাগলামিরই সগোত্র—ভূয়োদর্শীর সাজে [illegible]। শ্রীঅরবিন্দের প্রথম নিশানা হল তথা-কথিত বুদ্ধির গোঁয়াতুর্মি যে প্রায় অন্ধ [illegible]লেই চায় যে সবাই তার নির্বাচিত [illegible]চরণকে মান দেবে তার বিশ্বাসে সায় [illegible]। কিন্তু এ-চাওয়া কখনোই পাওয়ার [illegible] পায় না—কেন না যাকে আমরা বলি [illegible]রে সে মানুষের মন ও জীবনকে [illegible] করে চালাতে চায় যে-পথে তারা চলতে [illegible] না। তারপরে আশ্রমগুরুর সহিষ্ণু-[illegible]র উল্লেখ করে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন :

'তোমার বন্ধু তোমাকে ধমকালেন বুদ্ধি ছেড়ে অন্ধ বিশ্বাসকে বরণ করার জন্যে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি কি আসলে যৌক্তিক বিশ্বাস নয়? তুমি চলছ তোমার বিশ্বাসে ভর করে—যেটা খুবই স্বাভাবিক—তিনি চলছেন তাঁর মতে যে-মত তাঁর বিশ্বাস সমর্থিত—এ-ও স্বাভাবিক—কিন্তু তার বেশি নয়—মানে বলা চলে না যে তাঁর বিশ্বাস তোমার বিশ্বাসের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। তাঁর মত চলে তাঁর যুক্তি মেনে। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও চলেন তাঁর নিজের যুক্তি মেনে—কিন্তু তাঁর চলার পথ তোমার বন্ধুর পথের উল্টো। যুক্তি কী করে বলবে এঁদের মধ্যে কে ঠিক কে বেঠিক পথের পথিক? তাঁরা যুক্তিগর্জন করতে করতে এলিয়ে পড়লেও কোনো সমাধান হবে না—কে ভ্রান্ত আর কে অভ্রান্ত। বলতে কি, অভ্রান্ত বিশ্ব-জনীন যুক্তি বলে জগতে কিছুই নেই আছে—আমার যুক্তি তোমার যুক্তি ক খ গ ঘ...অন্তহীন যুধ্যমান প্রবক্তার যুক্তি। [illegible]তি মানুষই চলে তার মনের গড়ন বা [illegible]ভাবের পক্ষপাত তাকে যে-পথে চালায়। তাই বিশ্বাসকে অপরাধী করে লাভ কী বলো—বিশেষ যখন দেখা যাচ্ছে যে সে [illegible]তত একটা খুঁটি দেয় যা ধরে উঠে [illegible]নো যায়—এই বিশ্বের গোলকধাঁধায় [illegible] জ্ঞানের আলোকলোকে পৌঁছন তাহলে অবশ্য আলাদা কথা কিন্তু যতক্ষণ অজ্ঞানই চলে অবোধ যুক্তির তীরন্দাজি করে ততক্ষণ বিশ্বাসকে বরখাস্ত করা চলে না। এমন কি বিশ্বাস হতে পারে প্রজ্ঞার একটি অগ্র রশ্মি—সে-প্রজ্ঞা যত সুদূরেই হোক না কেন। আর যতদিন সে-আলো না আসে ততদিন বিশ্বাস নিঃসন্দেহে আমাদের সিদ্ধির সহায় হতে পারে। এই দেখ, তোমাকে আমি যুক্তিবাদের কিঞ্চিৎ নমুনা দিলাম—ঠিক আর সব যুক্তিজালের মতন, মানে যারা যুক্তিতে বিশ্বাস করে তাদের কাছে প্রামাণিক কিন্তু যারা করে না তাদের কাছে নামঞ্জুর। খতিয়ে যুক্তি-বাদ হল মনের একটি পরিমিত নৃত্য, তার বেশি নয়।'

শ্রীঅরবিন্দের এ-পত্রটি আমার একটি গভীর সংশয়ের অন্ধকারে আলোর দিশা দিয়েছিল—আমার চোখ খুলে দেয় যে বিশ্বজনীন সর্বস্বীকৃত যুক্তি বলে কিছু নেই—শুধু তাই নয়, দৈনন্দিন সংসার-যাত্রায় যুক্তি নানাভাবেই পথের নির্দেশ দিতে পারলেও কোনো গভীর উপলব্ধি বা সত্যের ধ্রুবলোকে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে না। বহু বৎসর বাদে বাসেকের নানা লেখায় যুক্তির এই অক্ষমতার ইঙ্গিত পাই। তিনি বললেন হাল আমলে যে তাঁর মনে এক সাংঘাতিক সংশয়কীট আস্তানা পেয়েছে যে নাছোড়বান্দা প্রশ্ন করে—এমন কিছু কি আছে এ-জগতে যার সম্বন্ধে মানুষ নিঃসংশয়তার পূর্ণিমানন্দে পৌঁছতে পারে—বা বলা চলে যুক্তির দামামা বাজিয়ে যে অমুক নীতি বা পথ সবার পক্ষেই রাজপথ, যা ভালো তা সবার পক্ষেই ভালো? এ নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না যাঁরা এ-সমস্যার অর্থই জলে সাঁতার কাটতে চান তাঁরা পড়তে পারেন তাঁর human society in ethics and politics দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাসেল লিখছেন যে, যেহেতু নানা দেশে নানা মুনির নানা মত, সেহেতু বলা চলে না যে অমুক কাজ ঠিক তমুক কাজ ভুল

(In view of this diversity of moral codes, we cannot say that acts of one kind are right or acts of one kind wrong).

শ্রীঅরবিন্দ যুক্তিকে পথিকৃৎ বলে মনে করেন না, মনে করেন যুক্তির একটি মুখ্য প্রবক্তা—আমরা যা তাই তার ওকালতি করা—তাই তার রায়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা আস্থা রাখতে না পেরে চেয়েছেন অন্তর্মুখী আবিষ্ট-চক্ষু হয়ে ধ্রুবসত্যের খোঁজ করতে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে লিখেছেন মৃদু হেসে (২-৯) :

An inconclusive play is Reason's toil:
Each strong idea can use her as its tool;
Accepting every brief she pleads her case,
Open to every thought she cannot know
The eternal Advocate seated as judge,
Armours in logic's invulnerable mail
A thousand combatants for Truth's veiled throne
And sits on a high horseback of argument
To tilt for ever with a wordy lance
In a mock tournament where none can win.

বিচিত্র বুদ্ধির লীলাখেলা।
তার বাঙ্ময় যুক্তি
বহু প্রয়াসেরো অন্তে পায় না সে
নিশ্চিতের দিশা।
প্রতি দীপ্ত ভাবধারা কহে তাকে
নিত্য আত্মবাহী।

বরণ করে সে প্রতি চিন্তা
তবু লভে না তো জ্ঞান।
একাধারে চিরন্তন ব্যবহারাজীব
বিচারক

সত্যের-প্রচ্ছন্ন-সিংহাসনলুব্ধ
লক্ষ যুধ্যমানে
ন্যায়ের দুর্ভেদ্য বর্মে সুরক্ষিয়া
—করিয়া আসীন
তুঙ্গ-তর্ক-তুরঙ্গমপৃষ্ঠে করে
উদ্দীপিত শুধু,
তাদের অসাঙ্গ—কথা [illegible]
মল্লযুদ্ধে—এক
মায়া-রণাঙ্গণে—যেথা পারে না
কেহই হ'তে জয়ী।

কত কথাই এসে গেল—ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে। তাই এ-প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু মন্তব্য করেই আমি যে শ্রীঅরবিন্দ যুক্তির সীমা যেভাবে দেখিয়েছেন, তাঁর ভাগবতী প্রজ্ঞার আলোকপাত করে, সে-ভঙ্গি আমার কাছে অনবদ্য মনে হয়—যদিও আশৈশব যুক্তি বুদ্ধির এলাকায় বসবাস করে আসার দরুন বুদ্ধি যে-কোনো গভীর বোধের (ওরফে যোগিক) দিশা দিতে পারে না—

এ-সত্যকে বরণ করতে আমাকে প্রথমটায় শুধু যে বেগ পেতে হয়েছিল তাই নয়,—রীতিমত ব্যথিত হতে হয়েছিল। কিন্তু এ-ব্যথা শুভ ফলপ্রসূ হয়েছিল কেননা আমি বুদ্ধি-যুক্তির উপরওয়ালা এক গভীর দৃষ্টির নাগাল পেয়েছিলাম মানস বিচারকে 'নেতি' করতে শিখে—আর এই দৃষ্টির প্রসাদেই আমি ইন্দিরাকে চিনতে পেরেছিলাম উচ্চকোটির সাধিকা বলে। এবার ভনিতা রেখে শুরু করি পালাগান—কিভাবে তার দেখা মিলল।

*

বলেছি, চ্যারিটি কন্সার্ট-এর পরে আমি এখানে-ওখানে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও বাণী সম্বন্ধে কিছু কিছু বলতাম। 'লিখতে লিখতেই সরে, বলতে বলতেই স্বপ্নে।' তাই আমার ভক্তি-উদ্বুদ্ধ রসনা থেকে ঠিক সুধাধারা না ঝরলেও রকমারি ভাবধারা ঝরত—যাদের উৎস শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানগোমুখী। ফলে হল এই যে, আমি নানা শহরেই আহূত হতাম শুধু গান করতে বা চ্যারিটি কন্সার্ট দিতে নয় ভাষণ দিতেও বটে। বলতে বলতে আত্মপ্রত্যয় এসে গেল—আমার মুখে খই ফুটতে শুরু করল। জব্বলপুরের রবার্টসন কলেজের কর্তা আমাকে সাদর নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন—জব্বলপুরের নাগরিকেরা বিশেষ করে কলেজের ছাত্রেরা আমার মুখে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু শুনতে উৎসুক। আমি গেলাম সেখানে ১৯৪৬ সালে—উৎসুকদের সাড়ায় উন্মুখ হয়ে। নৈলে মানাবে কেন?

বক্তৃতা দিলাম, গানও করলাম এক বিরাট হলে। কিছু চাঁদাও পেলাম আশ্রমের জন্যে—হাজার খানেক হবে। পরদিন হঠাৎ এক ভদ্রলোক মুলুকরাজ এসে আমাকে এক হাজার টাকার চেক দিয়ে গেলেন বললেন—'দাত্রী আমার স্ত্রী শ্রীলা জনককুমারী মালহোত্র। তিনি আপনার শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ভাষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছেন..... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার পরদিন আমার গান—কলেজ হলে। শ্রীলা ধনদাত্রী আসবেন—বলেছিলেন ভর্তা শ্রীল মুলুকরাজ মালহোত্র। কিন্তু আসতে পারেননি—জ্বর একশো চার।

পরদিন ডাক এল জায়গা কাছ থেকে—ভর্তা স্বয়ং এলেন নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে। সলজ্জে বললেন: 'আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি একবোখা দেবী—বললেন: 'হোক তাঁর কাজ আমার অসুখ আমি যখন পর্বতের কাছে যেতে পাচ্ছি না তখন পর্বতেরই আসতে হবে মহম্মদের কাছে।'

বুঝলাম দম্পতী উভয়েই রসের কারবারী বললাম খুশী হয়ে: 'আচ্ছা যাব মধ্যাহ্নভোজে।'

পরিচয় হল। দেখলাম মস্ত বাড়ী—প্রচুর অর্থ—একান্নবর্তী পরিবার—পাঁচটি ভাই, সবাই কৃতী, পাঁচটি বনিতা—সবাই শিক্ষিতা সুকুমারী...ইত্যাদি।

শ্রীলা দাত্রী ভার্যা একটিও কথা বললেন না—তবে ভর্তা আমার জন্যে একটি মস্ত ডিনার দিলেন বহু অর্থব্যয় করে। যথাবিধি আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ফের কিছু প্রণামী। মন হৃষ্ট। কাজেই যখন তাঁরা নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের ওখানে দু-চারদিন থাকতে, তখন আমি সানন্দেই রাজী হলাম।

ইতিমধ্যে আমার নিমন্ত্রণ ছিল আমেদাবাদে তথা বরোদায়। স্থির হল—উভয়ত্রই চ্যারিটি কন্সার্ট ও ভাষণ দিয়ে আশ্রমের জন্যে বেশ কিছু প্রণামী সংগ্রহ করে প্রয়াণ করব কলকাতায়—পথে জব্বলপুরে 'যাত্রাভঙ্গ' করে। নিমন্ত্রণ ছিল শ্রীলা দাত্রীর—যাঁর মুখে সৌকুমার্যের ছাপ দেখে বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছিলাম—সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহীও হয়ে উঠেছিলাম শুনে যে তিনি আধুনিক শ্রেষ্ঠ ইংরাজ লেখকদের রচনার রসগ্রাহিণী।

অতঃপর ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি সিংহল-প্রয়াণ। সেখান থেকে বাঙ্গালোরে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়ার সুরম্য হর্ম্যে আতিথ্যস্বীকার। সেখান থেকে সোজা আমেদাবাদ। উপলক্ষ—বন্ধুবর আম্বালাল সরাভাইয়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী ভারতীর বিবাহ ডেনিস নামে এক ইংরাজ যুবকের সঙ্গে। ভারতীর প্রসাদে সমর্সেট মমের নাট্যগ্রন্থাবলী পড়ে পুলকিত হয়ে আম্বালালের সঙ্গে আলোচনা করছি—দিল্লি গিয়ে গান্ধীজীর কাছে কী গান গাইব এমন সময়ে এক জরুরি তার। খুলে হেসে বন্ধুকে দিলাম। তারে ছিল:

"Please break journey here
wife Janak Kumari"

আম্বালাল একগাল হেসে বললেন: ভারতীর বিয়ের আগেই তুমি বিয়ে করে ফেলেছ চোরাগোপ্তা?' বলা বাহুল্য wire-কে তারকর্তা নবজন্ম দিয়েছিলেন wife রূপে। যাই হোক কলহাস্য হল প্রচুর—আম্বালাল পরিবারের প্রত্যেকেই খিলখিলিয়ে সে-হাস্যকে সিম্ফনি করে তুলেন।

অতঃপর অকটোবরে দিল্লীতে মহাত্মাজীর প্রার্থনা-সভায় উপর্যুপরি তিনদিন ভজন গেয়ে প্রয়াণ জব্বলপুর। কিন্তু শ্রীমতী জনককুমারী একেবারে নিশ্চুপ। তাঁর জা-রা কলভাষিণী হয়ে আমাকে বললেন এক গঙ্গা কথা, কিন্তু জনককুমারী হুঁ-হাঁ ছাড়া কোনো কথাই বললেন না। তবে তিনি এক হাজার টাকা প্রণামী দিলেন আমার জন্মদিনের উপহার—অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের জন্যে।

কলকাতায় তার পেলাম জনককুমারীর: 'আমি আঁধারে হাতড়াচ্ছি, আপনার কাছে আলো চাই।' উত্তরে তার করলাম ফেব্রুয়ারিতে পণ্ডিচেরী আসতে। অতঃপর একদা এক শিখ বন্ধু, মুলুকরাজ বেদী, আমাকে বললেন: 'জনকের কাছে চলুন সে বড় মনঃকষ্টে আছে। না কোনো বৈষয়িক সমস্যা নয়—জানেনই তো জনকের পিতৃদেব ক্যাপ্টেন কৃপারাম ক্রোড়পতি, স্বামীও প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার—অর্থ এ-পরিবারের পোষমানা পাখী। জনক চায় আপনার উপদেশ—সে স্বভাবে স্বপ্নালু—আদর্শপন্থিনী...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আমার জব্বলপুরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও কোনোমতেই সময় করে উঠতে পারলাম না। কর্মচক্রে ঘূর্ণমান হয়ে হাঁপিয়ে ওঠা সত্ত্বেও কর্মফলকে এড়ানো সম্ভব হল না—সারা ভারতের নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্টের ব্যবস্থা—'বাস ফেলাবও ফুর্সৎ নেই'—যাকে বলে।

অবশেষে ১৯৪৭ সালে আমার জন্মদিনে জনককুমারীর অভিনন্দন এল সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি: 'আমি অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছি না। আপনি পথ না দেখালে...' ইত্যাদি।

আমি উত্তরে লিখলাম স্পষ্টাক্ষরেই: 'আমি নিজে জিজ্ঞাসু তোমাকে পথ দেখাব কেমন করে? তবে যদি চাও তো এসো সোজা পণ্ডিচেরী। আমার অতিথি হয়ে থাকবে আমি তোমাকে শ্রীঅরবিন্দের হাতে সঁপে দিতে চাই। পথ দেখাতে পারেন কেবল তিনি...' ইত্যাদি।

এ চিঠিগুলি সম্ভবত আমার দপ্তরে এখনো আছে খুঁজলে মিলবে। আরো দু-তিনটি পত্র চালাচালির পর জনককুমারী লিখল সে একাই আসছে উড়ে ১৯-২-৪৭ তারিখে। আমি মাদ্রাজে গেলাম ১৮ই। ১৯-এ তাকে নিয়ে উঠলাম মাদ্রাজে যশোদানারায়ণ ঘোষ নামে এক প্রিয় গুরুভাইয়ের স্থানে। পরদিন মোটরে অভিযান—পণ্ডিচেরি। জনককুমারী আমার কাছেই রইল বলাই বাহুল্য। অতি অমায়িক কিন্তু মৃদুভাষিণী—সৌজন্যে নিখুঁত কিন্তু গভীর জলের মীন—ধরবে কে? আমাকে কিছুই বলল না। আমি একটু নিরাশ হলাম কিন্তু বুঝলাম যে 'বরফ ভাঙার' দেরি আছে। ভাঙল দর্শনের দিন—২১-এ ফেব্রুয়ারি শ্রীমার জন্মদিনে।

২১-এ দর্শনের পরে ঘটল প্রায় অঘটন: আমরা আশ্রম থেকে ফিরে ধ্যানে বসতেই জনককুমারীর নিশ্চল সমাধি!

এ কী ব্যাপার!! তিন ঘণ্টা পরে ওর বাহ্য সংজ্ঞা ফিরে এল। চোখে জল কিন্তু মুখে কথা নেই। এ তিনঘণ্টা ওর সমাধি দেখে অনেক সাধক-সাধিকা ছুটে এসে ওকে পরিক্রমা করে গেলেন—কিন্তু ওর সেই এক অবস্থা—স্থির শান্ত ভাবমুখী। আমিও অবাক আরো অনেকে বাঙ্মূঢ়। কিন্তু তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেনি—পরে খবর পেলাম। 'এ কখনো হয়? আমাদের সমাধি হয় না অথচ ও বাইরের সংসারী মেয়ে ওর দর্শন হতে না হতে সমাধি...!' ইত্যাদি

পৃথিবীর মানুষের জীবনটা কেমন হবে—আরও পঞ্চাশ বছর পরে? ধরা যাক ২০২৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ? একমাত্র মহাকাশ-গবেষণার দিকে চোখ রেখে এ-প্রশ্নের জবাব যদি চেষ্টা যদি করা যায়, তাহলেও প্রায় একটা হতবুদ্ধিকর ছবি বেরিয়ে আসে। হতবুদ্ধিকর এই অর্থে যে এখনকার জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কল্পনা করাও শক্ত যে মাত্র পঞ্চাশটি বছরের মধ্যে এমনটি হওয়া সম্ভব, তাও মাত্র মহাকাশ-গবেষণার দিক থেকে। সম্ভবত প্রায় একই রকমের হতবুদ্ধিকর ছবি পাওয়া যেতে পারে অন্য যে-কোনো বিজ্ঞানের দিকে চোখ রেখে একই প্রশ্নের জবাব চেষ্টা করলেও—বিশেষ করে জীববিজ্ঞানের কেননা এ-বিষয়ে সবাই একমত যে আগামী পঞ্চাশ বছরে জীব-বিজ্ঞানের উদ্ভাবনা আবিষ্কার ও অগ্রগতি হবে প্রকৃতই বিরাট ও বিস্ময়কর। যাই হোক, মহাকাশ-গবেষণার দিকেই চোখ রাখা যাক।

ছবিটি সৌরমণ্ডলের। কেন্দ্রে সূর্য, তারপরে পর-পর বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো। কোথায় আছেন আপনি? ছবিতে তীরচিহ্ন দিয়ে তার নির্দেশ রয়েছে। এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে। কিন্তু এমন দিনও আসছে যখন অন্য যে-কোনো গ্রহ হতে পারে। তখন এমনি একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হদিশ নেবার প্রয়োজন হতে পারে—কোথায় আছেন আপনি? ছবিটি এঁকেছেন বি রায়চৌধুরী, 'স্প্যান' পত্রিকার এপ্রিল ১৯৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

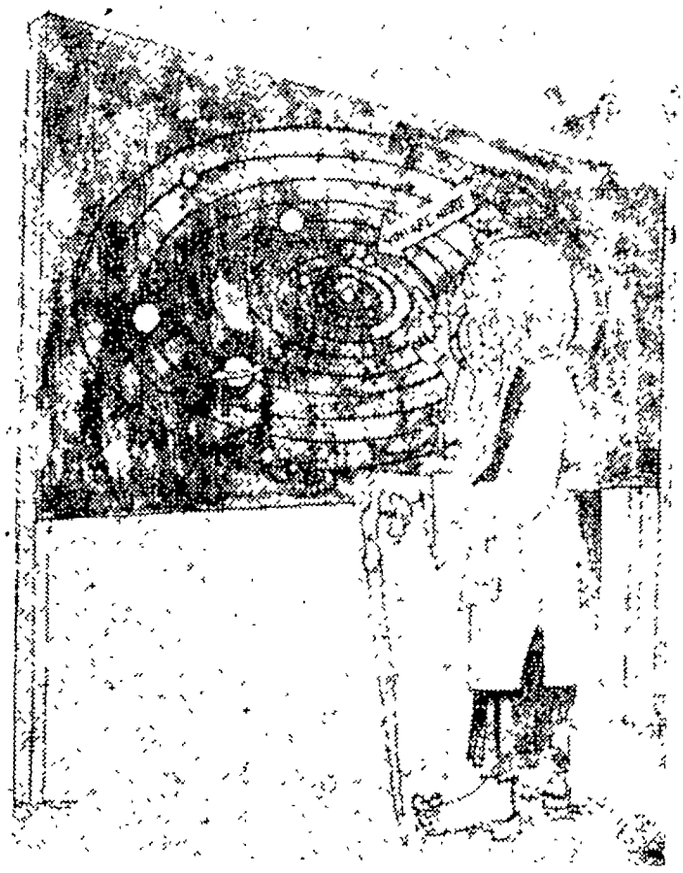

মহাকাশ গবেষণায় ও অভিযানে আরও পঞ্চাশ বছর পরে

তার আগে বিগত মাত্র সতেরো বছরের কয়েকটি তারিখ ও ঘটনা স্মরণ করলেও স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে হয়, তাই তো, প্রথম স্পুৎনিক এই তো মাত্র সেদিনের ঘটনা তারপরে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কিছু! মাত্র কয়েকটি তারিখ ও ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট—যথা

৪ অকটোবর ১৯৫৭ : স্পুৎনিক-১

১২ এপ্রিল ১৯৬১ : ভোস্তোক-১ ব্যোমযানে বিশ্বের প্রথম নভশ্চর য়ুরি গাগারিনের কক্ষ-পরিক্রমা

১৬—১৯ জুন ১৯৬৩ : ভোস্তোক-৬ ব্যোমযানে বিশ্বের প্রথম নভশ্চরী ভালেন্তিনা তেরেশকোভার কক্ষ-পরিক্রমা

১২—১৩ অকটোবর ১৯৬৪ : ভোসখদ-১ ব্যোমযানে তিনজন কক্ষ যোগে কক্ষ-পরিক্রমা

১৮—১৯ মার্চ ১৯৬৫ : ভোসখদ-২ ব্যোমযান থেকে বেরিয়ে এসে লিওনভের মহাশূন্যে সঞ্চরণ (পাঁচ মিনিট)

৩—৭ জুন ১৯৬৫ : জেমিনি-৪ ব্যোমযান থেকে বেরিয়ে এসে হোয়াইটের মহাশূন্যে সঞ্চরণ (একুশ মিনিট)

১৬ মার্চ ১৯৬৬ : মহাশূন্যে দুই ব্যোমযানের প্রথম সংযোগ

২১—২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮ : চাঁদের ১১২ কিলোমিটারের মধ্যে মানুষ (অ্যাপোলো-৮)

১৬—২৪ জুলাই ১৯৬৯ : চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম অবতরণ (অ্যাপোলো-১১)। ঘটনাটি ঘটে ২১ জুলাই ১৯৬৯ তারিখে, গ্রীনউইচ সময় ০২৫৬ ঘটিকায়। আরো কয়েক ঘণ্টা পরে চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম পদার্পণ (আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিন)। মোট ২২ ঘণ্টা চাঁদের দেশে অবস্থান ও ২২ কিলোগ্রাম নমুনা-পাথর সংগ্রহ।

মাত্র বারো বছরের মধ্যে কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল। কেউ ভাবতে পেরেছিল? যখন ভাবতে হল তখনো কি এই ভাবনা ছিল যে, তারপরেও এমন কিছু ঘটতে পারে যা আগো বড়ো? বলা বাহুল্য আরো বড়ো ঘটনাও ঘটেছে। মানুষের তৈরী ব্যোমযান উপস্থিত হয়েছে বৃহস্পতি-গ্রহের এলাকায়, সেখান থেকে প্লুটোর উদ্দেশে, সেখান থেকে সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে অসীম মহাবিশ্বে। মানুষের তৈরী ব্যোম-যান অবতরণ করেছে শুক্রে ও মঙ্গলে। আরো কত-কি।

এখন আর কোনো কিছু নিশ্চিত বলা চলবে না যে এই হচ্ছে শেষতম বা শীর্ষ-তম। বিশেষ করে ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাইয়ের পর থেকে মহাকাশ-অভিযান তো অচল হয়ে গেছে। এখন প্রায় সাধারণ ঘটনা বলার মতো করেই বলা চলে, মানুষ তৈরি হচ্ছে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও আরো

বাইরের গ্রহে অবতরণ করার জন্য—এমনকি সৌরজগতের বাইরে সীমাহীন বিশ্বের হদিশ নেবার জন্যেও।

এ-অবস্থায় মাত্র পাঁচ বছর পরের কথা বলাটাই শক্ত—পঞ্চাশ বছর তো অনেক দূরের ব্যাপার। তবে মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে এত অসম্ভবকে যাঁরা সম্ভব করে তুলতে পারেন তাঁদের অসাধ্য কী! তাই মহাকাশ-গবেষণার একজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী অনায়াসেই প্রবন্ধ লিখে জানাতে পেরেছেন খৃষ্টীয় ২০২৫ সালে জীবন কি-রকম দাঁড়াবে—এমনভাবে জানিয়েছেন যেন একটি স্ফটিক-দর্পণে গোটা ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে দৃশ্যমান (বিজ্ঞানীর নাম ভের্নহের ফন ব্রাউন, মহাকাশ-গবেষণায় আমেরিকার সাফল্যের পিছনে তিনিই অন্যতম প্রধান মস্তিষ্ক, তাঁর প্রবন্ধটি 'স্প্যান' পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত)।

পঞ্চাশ বছর পরের মানুষ পিছনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাববে মহাকাশ-গবেষণার হাতিয়ার যখন মানুষের হাতে ছিল না তখন এই গ্রহের সীমাবদ্ধ পরিসরে মানুষ জীবন কাটাত কি করে? আজকের মানুষ যেমন ভাবতে পারে যে টেলিফোন ও বিমান ছাড়া মানুষের জীবন অচল তেমনি সেই মানুষও একই কথা ভাববে ব্যোমযান সম্পর্কে। ব্যোমযান ছাড়া মানুষের জীবন অচল।

২০২৫ সালে মানুষের সামনে এমন বহু সমস্যা দেখা দেবে যার মোকাবিলা করার জন্য চাই বিশ্বব্যাপী সমন্বিত ব্যবস্থা, চাই সমগ্র বিশ্বের অবিরাম সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। তার সঙ্গে চাই কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে সংগৃহীত তথ্য সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এমনি এক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মূলে থাকবে সমীক্ষা ও যোগাযোগের মনুষ্যবিহীন কৃত্রিম উপগ্রহ এবং কক্ষ-পরিক্রমারত স-মনুষ্য বীক্ষণাগার।

আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে মানবজাতির সামনে মুখ্য সমস্যা হয়ে থাকবে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে পৃথিবীর সীমিত সম্পদের প্রকট বিরোধ। চাহিদা শুধু আরও বেশি বেশি সংখ্যক মানুষের নয়, বৈষয়িক প্রত্যাশারও — আনন্দের জন্য দুশ্চিন্তাহীন উপভোগের জন্য, কিন্তু পৃথিবীর ভাঁড়ার অফুরন্ত নয় পৃথিবীর সহনশীলতা অসীম নয়।

কতকগুলো সমস্যা তো এখনই আমাদের ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে। যেমন, একটি হচ্ছে জ্বালানী তৈল ও গ্যাসোলিনের আচমকা ঘাটতি দেখা দেওয়া। আমরা যেন ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে, যতো তৈল চাই ততোই পেয়ে চলব। এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই যে ঘাটতিটা সাময়িক—রাজনৈতিক টানাপোড়েন বা মালিকের মুনাফা-লালসা থেকে উদ্ভূত। বরং এই ঘাটতিকে মনে করা উচিত মারাত্মক রকমের গুরুতর এক ঝড়ের সংকেত। মোটরে প্রমোদবিহার করার কথা এখন চিন্তা না করাই ভালো। বরং শিক্ষা নেওয়া উচিত পৃথিবীর ধাতু-আকরের সীমিত সম্পদকে আরও সুষ্ঠুভাবে কি করে ব্যবহার করা যায়, খাদ্য উৎপাদনের সীমিত ক্ষমতাকে কি করে বিস্ফোরণের মতো বেড়ে চলা জনসংখ্যার উপযোগী করে তোলা যায়।

সত্তর আশি ও নব্বইয়ের দশকে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অন্বেষণ শুরু হবে আরও বেশি ধাতু-আকর ও কয়লা ও তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের বিশেষ উপযোগী কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হবে।

শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান চলবে খাদ্য ও অন্যান্য ফসলের বাৎসরিক উৎপাদনের চক্র নিয়ে অরণ্যের গাছ কাটা ও নতুন গাছ তৈরি হওয়ার চক্র নিয়ে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য উৎক্ষিপ্ত রকেট থেকে ফল পাওয়া গিয়েছে আশাতিরিক্ত। এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আমেরিকার প্রথম ই-আর-টি-এস বা আর্থ রিসোর্সেস টেকনোলজি স্যাটেলাইট (১৯৭২ সালে উৎক্ষিপ্ত) বা বিশ্বের সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য প্রযুক্তিগত উপগ্রহ। বর্তমান শতাব্দী শেষ হবার মুখে এই বিশেষ ধরনের উপগ্রহের সাহায্যে বিবিধ ফসলের (গম বাই বার্লি ধান, সয়াবীন তুলো ইত্যাদি) ফলন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সে-সময়ে একটি-দুটি নয়, এই বিশেষ ধরনের উপগ্রহ ঝাঁকে ঝাঁকে পৃথিবীকে পাক দিয়ে চলবে।

এই সমস্ত উপগ্রহ থেকে খবর পাওয়া যাবে শুধু ফসলের ফলন সম্পর্কে নয় বিশ্বব্যাপী মানুষের বসতির প্যাটার্ন সম্পর্কেও।

অর্থাৎ, দুটি সবচেয়ে জরুরি উদ্দেশ্য এই সমস্ত উপগ্রহের সাহায্যে চরিতার্থ হচ্ছে। এক খাদ্যের যোগান কোত্থেকে আর কী পরিমাণে। দুই, খাদ্যের চাহিদা কোথায় আর কত সংখ্যকের।

চরিতার্থতা থাকবে শুধু আশু কতকগুলো সমস্যার সমাধানের জন্যই নয় শিল্পসভ্যতার কতকগুলো দীর্ঘকালীন তাৎপর্যকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যেও। যেমন এ-প্রসঙ্গে অনেক দিন থেকে চলতে থাকা একটি বিতর্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষ জ্বালানী তৈল পোড়াচ্ছে, তার ফলে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই-অকসাইড বাতাসে ছাড়া পাচ্ছে এবং তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে উদ্ভিদ উৎপাদনের জন্য কাঁচের তৈরি ঘরের মতো (গ্রীন-হাউস) একটা অবস্থা। এ-কারণে গ্রহ হিসেবে পৃথিবী নাকি ক্রমেই আরো বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এটা কি ঠিক? নাকি একই কারণে কলকারখানা থেকে নিঃসৃত ধোঁয়ার দরুণ টুকরো পড়ে যাওয়ায় সূর্যের আলো আরো কম পরিমাণে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারার (ফলে) উল্টোটা—অর্থাৎ, পৃথিবী ক্রমেই আরো বেশি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে? যেটাই হোক অতীব উদ্বেগের বিষয়। পৃথিবীর গড় তাপ যদি মাত্র কয়েক ডিগ্রীও বেড়ে যায় তাহলে মাত্র কয়েক-শো বছরের মধ্যে মেরুর সমস্ত বরফ গলে ও দক্ষিণ উপরি তল উঠে আসবে সমুদ্রের মিটারের মতো, সমুদ্র-উপকূলের ১৫ শহর ও নগর জলের নিচে সমস্ত আর যদি পৃথিবী ক্রমেই ঠাণ্ডা হতে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে হিমযুগ আসন্ন—তাও কিছুই দুর্বিপাক নয়। কোনটি ঘটছে, না কোনোটি ঘটছে কিনা তা সন্দেহাতীত ভাবে জানাটা অতিশয় জরুরি। কল্পনার প্রয়োজন নেই, উপগ্রহ থেকে যে সমস্ত নির্ভুল তথ্য পাওয়া যাবে তা থেকে অবধারিত সিদ্ধান্ত যে-কোনো একটিকেই নির্দিষ্ট করতে পারে—কিংবা কোনোটিকেই নয়।

কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে আরো একটি বড়ো রকমের বিপদ সম্পর্কেও সঠিক হদিশটি পাওয়া সম্ভব হবে। বিপদের ক্ষেত্রটি হচ্ছে কনটিনেনটাল শেলফ বা মহীসোপান। সমুদ্রের মোট এলাকার মাত্র তিন শতাংশ জুড়ে তার অবস্থিতি মাত্র কয়েক-শো ফুট গভীরতা পর্যন্ত তার বিস্তার। এবং যেহেতু সূর্যের আলো এই গভীরতা ভেদ করতে সক্ষম, অতএব সালোক-সংশ্লেষ (ফটোসিনথেসিস) নির্ভর সামুদ্রিক উদ্ভিদের জন্মও এই এলাকাতেই। সমুদ্রের জীব প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে এই উদ্ভিদ ভক্ষণ করেই বেঁচে থাকে—অতএব মহীসোপানই প্রকৃত পক্ষে সামুদ্রিক জীবনের নির্ভর।

এখন সমস্যাটা দেখা দিয়েছে এ-কারণে যে দূষিত জলবাহী বিশ্বের অধিকাংশ নদী এই মহীসোপানেই এসে পড়ছে, খোলা সমুদ্রে নয়। আরো যে-ব্যাপারটি ঘটে তা এই যে সমুদ্রের বাতাস নদীর এই নোংরা জলকে তীরের দিকে ঠেলে দেয়—ফলে মোহানার কাছে উভয় দিকেই বহু দূর পর্যন্ত মহীসোপান কলুষিত হয়ে ওঠে। মহীসোপান কলুষিত হবার ফলে বিশ্বের পরিবেশ আরো কতখানি খারাপ হয়ে ওঠে তা এখনো পর্যন্ত সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন একটি খারাপ ফল হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অকসিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া। কেননা কার্বন ডাই-অকসাইড থেকে পুনরায় অকসিজেন তৈরি হওয়ার ব্যাপারটি শতকরা ৫০ ভাগ ঘটিয়ে থাকে সমুদ্রের এই

বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক একটি উপগ্রহ, মানুষের তৈরী। আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমনি বহুসংখ্যক উপগ্রহ পৃথিবীকে কক্ষপথে পরিক্রমা করা চলবে এবং বিবিধ কর্তব্যপালনে নিয়োজিত থাকবে।

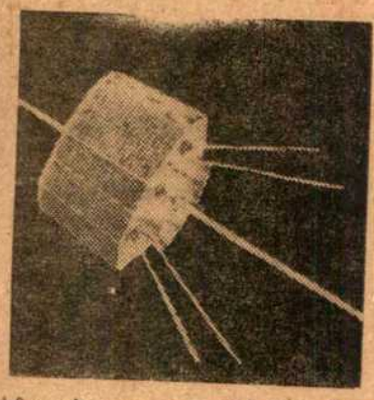

উদ্ভিদরাই। স্থলভাগের উদ্ভিদ ঘটিয়ে থাকে বাকি ৫০ ভাগ।

এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সংশোধনের কী পথ গ্রহণ করা যেতে পারে? তার হদিশ দেবে এই কৃত্রিম উপগ্রহ।

এমনকি খোলা সমুদ্রের এলাকাতেও কৃত্রিম উপগ্রহের সজাগ দৃষ্টি সদা আপতিত থাকতে পারে। ২০২৫ সালে খোলা সমুদ্র দিয়ে চলতে চলতে কোনো তৈলবাহী জাহাজের ক্যাপটেন মনে করতে পারেন যে রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কিছু জরুরি কাজ সেরে নেওয়া যেতে পারে এবং সেজন্য যদি কিছু তৈল সমুদ্রের জলে ছেড়ে দিতে হয় তাহলেও ধরা পড়ার আশঙ্কা নেই। ক্যাপটেনকে অচিরেই বুঝতে হবে তিনি ভুল করেছেন, রাতের অন্ধকারেও কৃত্রিম উপগ্রহের দৃষ্টি কার্যকর থেকেছে এবং তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন।

আবহাওয়া কলুষিত হচ্ছে কিনা, এ-ব্যাপারেও আকাশ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সদা-সতর্ক দৃষ্টি ও অবিরাম পাহারা রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কলুষীভবনের মাত্রা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠলেই পরিবেশ-সংরক্ষণের বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থার কাছে খবর পৌঁছে যাবে।

অর্থাৎ ১৯৭৫ থেকে ২০২৫ সাল—এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন কিছু নিখুঁত ব্যবস্থা সম্পন্ন হতে পারবে যার ফলে মহাকাশে পরিক্রমারত পৃথিবী নামক এই গ্রহটির ব্যবস্থাপনা আরো সুষ্ঠু হয়ে উঠবে।

উপগ্রহের মাধ্যমে অপর একটি বিপ্লব ঘটবে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। ষাটের ও সত্তরের দশকের অভিজ্ঞতাতেই দেখা গিয়েছে যে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় একশোটি দেশকে নিখুঁত যোগাযোগ-ব্যবস্থায় যুক্ত করা সম্ভব। ২০২৫ সালে আভ্যন্তরিক যোগাযোগ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বড়ো রকমের ভূমিকা নেবে কৃত্রিম উপগ্রহ—টেলিফোনে, টেলিভিশনে ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে, এমনকি ব্যাঙ্কের কাজ-কারবারে ও টিকিট সংরক্ষণে।

২০২৫ সালের মধ্যে মহাশূন্যে গড়ে উঠবে বহু নতুন শিল্প, বিশেষ করে ভার-হীনতার অবস্থার পক্ষে যেগুলো বিশেষ উপযোগী। অতিমাত্রায় বিশুদ্ধ টাকা, স্ফটিক, সংকর-ধাতু, ইলেকট্রনিক সামগ্রী ইত্যাদির উৎপাদন তখন স্কাইল্যাব-জাতীয় স্পেস-স্টেশনেই সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে থাকবে।

আর অন্য যে-ব্যাপারটি সম্পর্কে সে-সময়ে প্রায় দু-সপ্তাহ আগে থেকেই সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা চলবে তা হচ্ছে আবহাওয়া। বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তখন অনেক আগে থেকেই সাবধান হওয়া চলবে। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এমনকি আমাদের দেশেও এখন অনেক বেশি সঠিক, অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট। আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই বিশেষ ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকার কোনো কারণই নেই।

আরো একটি কথা। এখনো পর্যন্ত ব্যোমযান আকাশে তোলার পরে সেটিকে আর ফিরিয়ে আনা চলে না। কিন্তু আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একই ব্যোমযান শাটল-সার্ভিসের মতো ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশের কক্ষপথে বারবার যাতায়াত করে চলবে। পরীক্ষামূলকভাবে ব্যাপারটা ১৯৭৯ সাল থেকেই প্রবর্তিত হবার কথা। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এখনকার বিমান চলাচলের মতোই সহজ ও নৈমিত্তিক হয়ে উঠবে।

সম্ভবত এই ২০২৫ সালের মধ্যেই চাঁদে তৈরি হতে পারবে বৃহৎ একটি গবেষণা স্টেশন। এবং সম্ভবত এই ২০২৫ সালের মধ্যেই মানুষ মঙ্গলগ্রহে পদার্পণ করবে।

পৃথিবীর সম্পদ যতোই সীমিত হোক, কিন্তু পৃথিবী নামক এই গ্রহের কাছাকাছি অন্য এমন সব প্রাণীহীন গ্রহ থেকে গিয়েছে যেখানকার সমস্ত সম্পদ এখনো অটুট এবং সেই সম্পদ সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে কোনো বাধা থাকছে না।

অয়স্কান্ত

এই ছবিটি আমেরিকান নভশ্চর এডওয়ার্ড হোয়াইটের। ব্যোমযান থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মহাশূন্যে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছেন। এমন দিন আসছে যখন অতি সাধারণ মানুষও অতি সামান্য খরচে বিনা আয়াসে এমনিভাবে মহাশূন্যে সঞ্চরণ করবে।

আপনো

নীরব সমাজসেবী

আর্তের সেবা, দরিদ্রের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের ইচ্ছা প্রায় প্রতিটি মানুষের অন্তরের এক গভীর বাসনা। অথচ অন্তরের এই দুর্বার বাসনাকে কার্যকরী করা নানা-কারণে সকলের সাধ্যের মধ্যে নয়। এরজন্য চাই একনিষ্ঠতা দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন দৃঢ় মনোবল। পরের হিত করার মহান ব্রতকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য চাই সংগঠনের নৈপুণ্য। দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট রোডের উনসত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধা শ্রীমতী বীণাদেবী সেনের মাঝে খুঁজে পেলাম এক গভীর আত্মপ্রত্যয়। পরের উপকারের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সংকোচ জড়তা সব কিছুকে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়েছেন। পিতা স্বর্গতঃ মহেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ও মাতা স্বর্গতা

মহেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ও মাতা স্বর্গতা

জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মহিলা সমিতি 'স্মরণিকা'র সম্পাদিকার গুরু দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। অন্যান্য মহিলা সমিতির মত এরও আদর্শ মহান, সম্পাদিকা হিসেবে তিনি বললেন দুঃস্থ দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের কথা চিন্তা করে এবং যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করে দুঃখ লাঘব করার উদ্দেশ্যেই এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মধ্যবিত্তের আত্মসম্মান জ্ঞান প্রখর—হাত পাতার প্রয়োজন হলেও তাঁরা সহজে কারো কাছে হাত পাততে পারেন না। পরিণামে যে দুঃসহ জীবনযাপন করতে হয় তা দেখবার অভিজ্ঞতা মোটামুটি সকলেরই আছে। মধ্যবিত্ত যদি সুযোগ ও সুবিধা পায় তবে সুসন্তান তৈরি করতে পারে। সুতরাং তাঁদের জন্য সাধ্যমত যৎসামান্য একটি 'ভান্ডার' তৈরি হল। এই ভান্ডার থেকে নানাপ্রকার সাহায্য করা—যেমন বই কিনতে কিছু অর্থ দেওয়া, স্কুলে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ-সুবিধার জন্য মাইনে দেওয়া উপরন্তু দরিদ্রদের কিছু বস্ত্রের সংস্থান করা।'

শ্রীমতী সেন আরও বললেন আমাদের পুঁজি বলতে বিশেষ কিছু নেই—সামান্য অর্থ নিয়েই আমাদের ভান্ডার। হয়তো মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে আমরা সাহায্য দিতে পারি। তবুও মুষ্টিমেয় হলেও যতটুকু সাহায্য করতে পারি—সেটাই আমাদের তৃপ্তি ও সৌভাগ্য।

বীণা দেবী

স্মরণিকার সদস্য ও সদস্যা সংখ্যা জানতে চাইতেই তিনি বললেন, আমাদের পৃষ্ঠপোষক, সদস্য ও সদস্যা সব মিলিয়ে একশো পঞ্চাশজন। কার্যনির্বাহক কমিটিতে আছেন সতেরোজন। এই সমিতির বাৎসরিক চাঁদা দশ টাকা ধার্য করেছি। ছ'টাকা সদস্য হবার জন্য আর মধ্যবিত্ত দরিদ্র ভান্ডারে ন্যূনতম চার টাকা দিতে হবে। তারপরে ভান্ডারে যাঁর যা খুশী এর উপরেও দিতে পারেন।

প্রঃ আপনারা কিভাবে অর্থসংগ্রহ করেন — বিশেষ কাউকে আপনারা এই অর্থসংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করতে পেরেছেন কি?

উঃ আমাদের ভান্ডারের আয় অল্প। তাই অর্থসংগ্রহের জন্য এখনও পর্যন্ত কাউকে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। যাঁরা ছ' টাকা চাঁদা দেন তাঁদের বছরে দুবার অনুষ্ঠান করে আনন্দদান ও জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। এই আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অন্তরের কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলির স্ফুরণের সুযোগ দি।

প্রঃ চাঁদা ছাড়া আপনারা আর কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করেন?

উঃ আমরা দোরে দোরে ভিক্ষে চেয়ে অর্থ পুরনো পোশাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করি।

প্রঃ এরকম সাহায্যের ব্যাপারে গৃহিণী-দের মনোভাব কেমন?

উঃ চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের বেগ পেতে হয়েছে অনেক—এখনও হচ্ছে। সবচেয়ে মর্মাহত হয়েছি যে এমন অনেক স্বচ্ছল ব্যক্তি তাঁদের পুত্র-কন্যার বিয়েতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন কিন্তু ভান্ডারের জন্য চাঁদা চাইতে গেলে তাঁরা রীতিমত বিরক্তি-বোধ করেছেন এবং তাঁরা রিক্ত এমন মনো-ভাবও ব্যক্ত করেন। কোনো শুভকর্মে দীন-দুঃখীকে দান করা যে শুভবিয়ের অংশ তা তাঁরা স্বীকার করতে ভুলে যান।

স্মরণিকার কোষাধ্যক্ষা শ্রীমতী আরতি শাসমল নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত। সমিতির সঙ্গে শ্রীমতী বীণা ঘোষ ও শ্রীমতী লতিকা চৌধুরী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রীমতী চৌধুরী বললেন, বীণাদির ছায়ায়ই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। অর্থ ও বস্ত্রসংগ্রহের মত কঠিন কাজের বেশীর-ভাগই পালন করছেন এই বৃদ্ধ বয়সে বীণাদি।

শ্রীমতী বীণাদেবী সমাজসেবার আস্বাদ নিয়েই জন্মেছেন বলা যায়। জ্ঞান হতেই ভাই-বোন সকলেই বাবা-মায়ের সমাজসেবা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ১৯০৫ সালের ৮ই নভেম্বর বিহারের দুমকাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে স্কুলের শিক্ষা শুরু হয় গিরিডিতে। ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনে কিছুদিন পড়াশুনা করার পরে ঢাকা ইডেন হাইস্কুল থেকে ১৯২২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। বেথুন কলেজ থেকে আই-এ ও বি-এ পাশ করেন। ১৯২৭ সালে মাইকেল মধুসূদন-এর ওপর কবিতা লিখে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। যশোর সাহিত্য সম্মেলন থেকে তিনি মাইকেল মধুসূদন-এর ওপরে গবেষণা করে 'সাহিত্য সরস্বতী' ও 'কাব্যভারতী' উপাধি পান। ১৯৩২ সালে তাঁর দেশপ্রেমিক মাখনলালের পরিবারে বিয়ে হয়। সেখানেও তাঁর ছিল সমাজ-সেবার অফুরন্ত সুযোগ।

বীণাদেবী তাঁর কথার শেষে একবার বলেছিলেন, 'সমাজসেবার কতটুকু করতে পেরেছি জানি না তবুও এ সুযোগটুকু পাবার জন্য আমি ধন্য। আরও ধন্য হয়েছি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সান্নিধ্য পেয়ে।'

শ্রীমতী সেন নীরব সমাজসেবী। মাতৃ-সুলভ ব্যবহার, কথার মাধুর্য আর আন্ত-রিকতায় তিনি সকলের আপনার জন।

অঞ্জলি চৌধুরী

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

দৃশ্যটা হঠাৎ রঞ্জুও দেখে ফেলল দূর থেকে। বাবার পাশে এক ঝাঁক টিয়ের মত টুটুনদের দলটা। সবাই আজ শাড়ি পরেছে। বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। তার পাশে বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে মনে হচ্ছে ভীরু রোগা তাড়া খাওয়া শেয়াল। বাবার পাশে গোপাও আছে। তার সঙ্গে গোপার একটা নীরব সম্পর্ক আছে। যেটা কেউ জানে না। কাল রঞ্জু ঝুঁইদির সঙ্গে কেষ্টনগর চলে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে। সেই খবরটা ওকে দেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চলতা অনুভব করে রঞ্জু। রঞ্জু সুযোগও পেল বাড়ীতে যখন গানের আসর বসিয়েছিলেন বাবা। রঞ্জু তখন তার পড়ার ঘরে ঝুঁইদির সামনে বসে কেষ্টনগরে যাবার জন্যে গোছগাছ করছিল। তার মধ্যেই সে ফাঁক বুঝে কথাটা বলে ফেলল বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। সেই রাত্রেই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার শুনল সে। মা চেপে ধরায় টুটুন বোটানিকেলে গিয়ে তার বাবা তারই বান্ধবী গোপাকে ছুতো করে গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল, এই কথাটা কবুল করতেই মার মুখ চোখ রাগে কঠিন হয়ে উঠলো। তাহলে বাবাকে কি মা সন্দেহ করে?

অথচ অমিয়র ধারণা সে মুক্ত পুরুষ। মেয়েব বান্ধবীদের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক সেটা নিছকই স্নেহের। তার পেছনে তার কোন খারাপ মতলব নেই। কিন্তু তার হাবভাব কি সেই কথাই বলে? তাহলে নির্জন দুপুরে, গোপার মা তখন অফিসে এবং একা বাড়ীতে গোপা তখন সে ওদের বাড়ি গেল কেন? সেটা কি নিছক টানের ব্যাপার?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাত বাড়িয়ে অমিয়বাবু কফির পেয়ালাটা তুলে নেন। হাতে নিয়ে টের পান জিনিসটা একেবারে জল হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রাহ্য করেন না। যেন গোপাকে খুশি করতে হবে। শব্দ করে পেয়ালাটা চুমুক দেন তিনি।

—থাক ওটা খেতে হবে না। নরম ভাঙ্গা গলার স্বর ওর। অমিয়বাবু চমকে উঠে ঘাড় সোজা করেন। দেখলেন, চোখ থেকে হাত সরিয়েছে গোপা। যতটা ভেবেছিলেন ততটা জল ওর চোখে তিনি দেখতে পান না। বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে ও চোখ ঘষছে। ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

—কি হবে! অমিয়বাবু বুঝতে পারেন পেয়ালাটা ও ধরতে চাইছে। —না না! তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে তিনি মাথা ঝাঁকান। আমার বেশ লাগছে খেতে। কোল্ড কফি আমি দারুণ ভালবাসি।

—আবার আমি করে দেব। ওটা খেতে হবে না। দিন।

ও ঠিক পেয়ালাটা ধরল। একরকম জোর করে অমিয়বাবুর হাত থেকে সেটা সরিয়ে নিল।

—কি মুস্কিল! আবার তুমি কষ্ট করবে। খুঁতখুঁত করার মতন গলার শব্দ করেন। অমিয় ভিতরে ভিতরে নিশ্চিন্ত হল যদিও। বিচ্ছিরি কান্নাকাটির পালাটা যে এত সহজে ও শেষ করল।

কফির পেয়ালা হাতে পর্দা সরিয়ে গোপা ডাইনিংস্পেশের দিকে এগোয়। অমিয় বসে থাকেন না। উঠে ওর পিছনে হাঁটেন। ট্যাপের কাছে সরে গিয়ে ঠান্ডা কফিটা বেসিনে ঢেলে দিয়ে কাপটা ধুয়ে নেয় ও। তারপর পাশের দেওয়ালের হুকে ঝোলান একটা ছোট কেটলি পেড়ে নিয়ে ট্যাপের মুখের কাছে ধরে। জল পড়ার ছরছর শব্দ হয়। অমিয় পিছনে দাঁড়িয়ে দেখেন। জলের শব্দটা শোনেন। ওর পিঠ বেঁকে আছে। ঘাড় গুঁজে ট্যাপের মুখে কেটলি ধরে রেখেছে। ওর ঘাড়ের বাঁক সুন্দর। এই জন্যই কি ওর ফ্লেমিঙ্গো নাম রেখেছিলেন। ভাবেন এখন।

—মিছিমিছি কেন যে কষ্ট করছ।

—এইটুকুন কষ্ট মেয়েরা খুব করতে পারে। কথাটা বলার সময় গোপা ঘাড় ফেরায় না। কেটলিতে জল ধরা হয়ে যায়। কোণার দিকে দাঁড় করানো ইলেকট্রিক স্টোভের কাছে ও সরে গেল। অমিয় সেদিকে এগোল।

স্টোভ জেবলে কেটলি চাপিয়ে দিয়ে গোপা আবার ঝুঁকে দাঁড়ায়। মিসেস গাঙ্গুলীর ছিমছাম ছোট্ট মিটসেফ-এর ডালা খুলে দুধ চিনি ও কফির কৌটো বের করে আনে।

এই সময়টায় অমিয় আর কোনো কথা বলেন না।

দেখতে দেখতে কফি বানান হয়ে যায়।

—আসুন ও ঘরে। কাপ ও কফির পট হাতে তুলে ও ঘুরে দাঁড়ায়।

—এখানে বসে খেতে দোষ কি। আঙুল দিয়ে অমিয় ডাইনিং টেবিল দেখান।

—এঘরে পাখাটা ভাল নেই। গোপা ওপরের দিকে তাকায়। চোখ তুলে অমিয় দেখলেন পাখাটা স্থির হয়ে আছে। নিশ্চয় গোলমাল আছে।

—পাখার দরকার কি। জায়গাটা বেশ ঠান্ডা। ঐ তো কতবড় একটা জানালা রয়েছে ওদিকটায়। সরে গিয়ে তিনি জানালার দুটো পাল্লাই খুলে দেন। মিসেস গাঙ্গুলীর কিচেন গার্ডেনের সবুজ ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। বাড়ির পিছন দিক ওটা বুঝতে কষ্ট হয় না। যেন বেগুন গাছে টুনটুনি বাসা বেঁধেছে। দৃশ্যটা একনজর দেখে অমিয় ডাইনিং টেবিলের কাছে সরে আসেন। পেয়ালায় কফি ঢেলে দেয় ও।

—তুমি একটু খাবে না!

গোপা মাথা ঝাঁকাল।

দুপুরবেলা কফি ওর ভাল লাগে না।

—এখন যে বিকেল হয়ে এল। কফিতে চুমুক দিয়ে অমিয় হাসেন। ওয়ান্ডারফুল! চমৎকার হাত তোমার। একটু খেলে পারতে। পেটে অনেকটা রয়ে যাচ্ছে দেখছি।

—আপনি সবটা খাবেন।

—হুঁ, আমি তো খাবই—খাচ্ছি।

পেয়ালায় ঠোঁট ডোবালেন তিনি। তারপর চোখ তোলেন। মুখটা এখনও বেজার বেজার রয়ে গেছে ওর। যে জন্য অমিয়বাবুর নিজের মুখের হাসিটা ভাল খুলল না।

—আপনি বসে খান। আমি আসছি।

—কোথায় চললে।

কথা বলে না ও। পর্দাটা সরিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে। অমিয় ঘাড় ফেরালেন। পর্দাটা দুলছে। এক পাশে একটু ফাঁক হয়ে আছে। ও যেন বারান্দায় যাচ্ছে। তাই তো। পর্দার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা গেল গোপা বারান্দায় বেরিয়ে গেল। কিন্তু তারপর? কোথায় গেল? আর ওকে দেখা যাচ্ছিল না। অমিয়বাবুর কপালের চামড়ায় বড় বড় দুটো রেখা জাগল। এত ভাল কফিটা হঠাৎ মুখে খারাপ লাগতে লাগল। ও কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বড্ড খেয়ালী মেয়ে—ভাবেন তিনি।

আমি মনে মনে হাসছিলাম। কেননা অশরীরী ছায়া হয়ে আমি পরিষ্কার দেখলাম বারান্দা থেকে নেমে মিসেস গাঙ্গুলীর মেয়ে সোজা গেট-এর কাছে চলে গেল। বিউগল ভিলার কুঞ্জে ছাওয়া সাদা রঙ করা লোহার গেটটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। যেন কি করে ও টের পেয়েছে অমিয়বাবু ভিতরে ঢোকার সময় ওটা ফাঁক করে রেখে গেছেন। ওর সুন্দর ঝকঝকে ভুরুতে বিরক্তির ছাপ। পাতলা ঠোঁট দুটো নেড়ে নিজের মনে কিছু যেন বলল। কেউ শুনল না। আমি ওর মনের কথা টের পেলাম। বড্ড অসাবধানী ভদ্রলোক। অস্ফুট ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে কথাটা বুদবুদের মতন ওর বুক ঠেলে উঠে এল। তারপর ভাল করে গেটটা আটকে দিয়ে ঠোঁট চেপে স্থির চোখে রেলিঙের বাইরে কাঁকুলিয়া রোডের বিকেলের ছায়া দেখল। সবুজ রঙের আইসক্রীমের গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। দুটি ছোট মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। একটা রিকশা ঠুনঠুন শব্দ করে ছুটে যায়। রাস্তা দেখা শেষ করে আর দাঁড়ায় না ও। বারান্দায় উঠে আসে।

ইতিমধ্যে অমিয় আবিষ্কার করেন এ-ঘরেও সামনের দেওয়ালের গায়ে একটা সুন্দর ফ্রেমে বাঁধান মীধার ঝুলছে। ঠিক ওয়াশ-বেসিনের ওপরটায়। নিশ্চয় মিসেস গাঙ্গুলী হাত-মুখ ধোয়ার সময় দু-তিনবার করে মুখ দেখেন চুল দেখেন। অমিয় চিন্তা করলেন। হাত-মুখ ধোয়ার সময় অনেকের এই অভ্যাস আছে। অম্বুজা-নিলয়ে ওয়াস-বেসিনের দেওয়ালে কিন্তু মীরার নেই।

ও এসে ভিতরে ঢুকল। অমিয়বাবু এদিকে চোখ ফেরালেন। পর্দাটা কাঁপছে। কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়ায় না গোপা। দেওয়ালের কাছে সরে যায়। যেন ট্যাপ খুলে মুখ ধোবে। কিন্তু ট্যাপ খুলল না। তবে কি আয়নায় মুখ দেখবে। অমিয় ভাবেন। তাই দেখা যাচ্ছে। ঘাড় সোজা করে ফ্লেমিঙ্গো আয়নার ভিতর তাকাচ্ছে ফলে—যেহেতু অমিয়বাবুও সেদিকে তাকিয়ে—আয়নার মধ্যে দু'জোড়া চোখের ঠোকাঠুকি লাগল। যেহেতু একটু আগে কান্নাকাটি করেছিল ও এবং হাতের পিঠ দিয়ে চোখ দুটো ঘষেছিল, তাই ওর দু'চোখ সামান্য ফোলা এবং চোখের ভিতরের রক্ত মালঞ্চ ফুলের পাপড়ির মতন দুধ-লাল দুধ-লাল হয়ে আছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর সেই চোখের পাশে অমিয়বাবুর চোখ কত ফ্যাকাশে পুরোনো মরা-মরা মনে হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি।

।।ছাব্বিশ।।

চুপিচুপি সদরের গেট আটকে দিয়ে ফিরে এসে ও নিশ্চয় চাইছিল না চেয়ারে বসা মানুষটির সঙ্গে চোখাচোখি হোক। যে জন্য ভিতরে ঢুকেই সোজা ওয়াল-বেসিনের কাছে চলে গেল। কিন্তু সেখানে আয়নার ভিতর যে একজন জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে আছে ও তা জানত না। সেদিকে চোখ পড়া মাত্র ও রীতিমত থমকে গেল। আড়ষ্ট হয়ে গেল। অমিয়বাবু অবশ্য খুশি হল। খুশি হয়ে আয়নার ভিতর সামান্য হাসেন। ও একদম হাসে না। গম্ভীর থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাম্ভীর্যটা রাখতে পারে না। প্রাণপণে ঠোঁটের কোণা দুটো টিপতে থাকে। বোঝা যায় হাসি পাচ্ছে—হাসিটাকে বেরোতে দিচ্ছে না। ঠোঁট দিয়ে চেপে চেপে রাখছে। এত চট করে ওর ওই মূর্তি দেখবেন অমির আশা করেননি। ফলে আয়নার ভিতর তাঁর মরা ফ্যাকাশে চোখ রীতিমত উজ্জ্বল রং ধরল। বুঝতে পারেন অপর পক্ষ এখন একটা আপস-মীমাংসা চায়। স্বাভাবিক। নিজের হাতে কফি বানিয়ে দিয়েছে ও। আর তুষ্ট হয়ে অমিয়বাবু তা চুকচুক করে খেয়েছেন—খাচ্ছেন। পেয়ালাটা শেষ করে পটের বাকিটাও ঢেলে নিয়েছেন। ভিতরে ভিতরে ওর একটা গর্ব আছে না।

কিন্তু—অমিয়বাবু বুঝতে পারেন—খুশিটা এখনি ধরা পড়ুক ও চাইছে না। তবে আর মেয়েজাত বলে কেন। লুকোচুরি খেলা যাদের স্বভাব।

আবার এক চুমুক কফি গিলতে টেবিলের দিকে তিনি চোখ নামালেন। তারপর ঘাড় সোজা করে যেই না আয়নার ভিতর তাকালেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল ফ্লেমিঙ্গো। বেশ বড় একটা ভেংচি কাটল।

অন্য সময় হলে কুলকুল করে তিনি হেসে গড়িয়ে পড়তেন। এখন হাসলেন না। তা হলে জিনিসটার গাম্ভীর্য থাকে না। না হেসে ঘাড়টা কাত করলেন তিনি। অর্থাৎ ওকে বুঝিয়ে দিলেন—বেশ করেছ ভাল করেছ। পনের ষোল বছরের একটি কচি মেয়ের কাছ থেকে ছাপ্পান্ন বছরের একটা বুড়োধাড়ির এই ভেংচি বিদ্রূপই প্রাপ্য। একটু আগে সে তোমাকে যেমন আঘাত দিয়েছে। অত শক্ত করে হাত চেপে না ধরলেও হত। ফুলের ডাঁটার মতন নরম হাত তোমার।

আর এক ঢোক কফি গিলে অমিয় আবার আয়নার দিকে তাকালেন। এবার টিয়ে-ঠোঁট ছোট্ট নাকটা কুঁচকে চোখ দুটো পিটপিট করে তাকানর মতন করে লাল টুকটুকে জিভের ডগাটা সাপের লেজের মতন বের করে দিয়ে অন্যরকম একটা ভেংচি কাটল ও।

একটা স্বাদু জিনিস উপভোগ করার মতন এবারও অমিয় ঘাড় কাত করলেন। অর্থাৎ জানিয়ে দিলেন—এই ভেংচিটাও আমার প্রাপ্য। আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। তারপর তিনি চোখ নামিয়ে যথারীতি কফি খেয়ে নেন এবং এক সেকেন্ড আবার দেওয়ালের আরসির দিকে তাকান।

এবার আর এক রকম ভেংচি। মা কালীর মতন সবটা জিভ বের করে দিয়েছে ও। ভুরু জোড়া বেঁকিয়ে কপালে তুলেছে। নাকের পাটা ফোলান। চোখ একেবারে বোজা।

অমির এবার মনে মনে হাসলেন। চোখ বুজে আর একজনকে ভেংচি কাটা কত সহজ; কেননা যাকে ভেংচি কাটা হল তার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া ঘটল বা তার ফলে তার চেহারাটাই বা কেমন দাঁড়াল যে ভেংচি কাটছে তাকে দেখতে হচ্ছে না।

তা হলেও আয়নার দিকে দু চোখ ধরে রেখে বড় করে একটা নিশ্বাস ফেললেন তিনি ও গলা দিয়ে হুম করে একটা আওয়াজ বার করলেন। অর্থাৎ আওয়াজ দিয়ে ওকে বুঝিয়ে দিলেন—এবারের শাস্তিটাও আমি হাসিমুখে গ্রহণ করছি ফ্লেমিঙ্গো। এবং যতবার তুমি আমাকে এই ধরনের শাস্তি দেবে বুক পেতে মাথা পেতে আমাকে নিতেই হবে।

কফি শেষ হয়ে গেল। হাতের পিঠ দিয়ে নিজের লাল ট্যাপসা পুরোনো ঠোঁট দুটো মুছে ফেললেন তিনি। পকেটে রুমাল আছে। রুমাল বের করার সময় নেই। আবার তাঁকে দেখতে হবে আয়নার ভিতর চতুর্থ ভেংচিটা না জানি কেমন হয়।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন আর ও ভেংচি কাটছে না। আয়নার দিকেও মুখ করে আর দাঁড়িয়ে নেই। এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হাসছে। সেই ঠোঁট টেপা হাসি। ভুরুর আগায় যদিও বিরক্তি। তা হলেও বুকটা দারুণ হালকা হয়ে গেল অমিয়বাবুর।

—খুশি হয়েছ ফ্লেমিঙ্গো? সরাসরি তিনি জিজ্ঞেস করেন।

—হয়েছি বৈকি। ঠোঁটের হাসি নিভিয়ে দিল ও।

—যদি আর কোনো রকম শাস্তি দেবার থাকে আমাকে দাও। আমি আপত্তি করব না। গাঢ় গলায় অমিয় বললেন।

—দেখছি। মাথা ঝাঁকাল ও। চিন্তা করছি আর কি শাস্তি দেওয়া যায়। শূন্য পট ও পেয়ালাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে এবার ট্যাপের কাছে ও সরে যায়।

(ক্রমশঃ)

কাগজের ফুল

গৌতম ভট্টাচার্য

ছোটু—প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের নিছকই একটা মানুষ। যুবক নয়। কেননা যৌবন বলে জিনিসটা কোনদিনই ওর ছিল না। ছেলেবেলায় বারকয়েক শক্ত অসুখে পড়ার ফলে ওর শরীরটা খুব অল্পবয়সেই বুড়োটে মেরে গিয়েছিল। —কুঁজো শিরদাঁড়া, হাড়চামড়াসার চেহারা, লিকলিকে হাত-পা, ক্ষয়াটে মুখের গাল-দুটো ঢোকা, চোখদুটো হলদেটে। এককথায় স্বাস্থ্য ও শ্রী বলে কিছুই নেই। আরও অনেকদিক দিয়েই ও হতভাগ্য। ছোটবেলা-কার ঐ অসুখবিসুখের জেরেই ও মানসিক দিক দিয়ে কিছুটা পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

ঐ পঙ্গুতার জন্যেই ও কথাবার্তায় আড়ষ্ট আর চালচলন কাজেকর্মে ক্রমশই অ্যালবেলে হয়ে উঠেছে। বিদ্যের দৌড়ও নাম সই তক্। বছর দশেক আগে মা মারা গেছে, তার কিছুদিন পরেই বাবাও। কাজেই ওকে এখন দেখবারও কেউ নেই। দাদা বৌদিরা তো পুরোপুরি নিজেদেরটাই বোঝে, ছোটুকে নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না। ওর একটা অংশ আছে বলেই বোধহয় বাড়ীতে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পেয়েছে আর সংসারের যাবতীয় ফাইফরমাশ খেটে দেয় বলেই হোক কিম্বা ওর ভাগের কোল-টুকুও ভবিষ্যতে নিজেদের কোলে টানার ফিকিরেই হোক বাড়ীর লোকেরা ওকে অছেদ্দা করেও দু-বেলা দুমুঠো খেতে দেয়। ঐ থাকা খাওয়া মানে কোনরকমে বেঁচে থাকা ছাড়াও ওর যে আরও কোন-কিছুর গভীর অভাব থাকতে পারে আর সে অভাববোধের সুতীব্র জ্বালায় ওর বেঁচে থাকাটাই নিরর্থক হয়ে পড়তে পারে তা নিয়ে কারো একটুও মাথাব্যথা নেই। মাথা থাকতে তা ছিল। অর্থাৎ মা বেঁচে থাকতে তিনিই মাঝেমধ্যে এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতেন। কিন্তু মনে মনে এক পা এগিয়েও দুপা পেছিয়ে গেছেন। কেননা আর পাঁচটা সাধারণ সুস্থ মানুষই যা করতে হিমশিম খেয়ে যায়, নিজেরটাই খুঁটে খাওয়ার সামর্থ্য নেই যার সে তা পারবে কেন! শুধুমুধু আর একটা জীবন নষ্ট করা হবে।

তা মা মারা যাবার পর আর কেউই ছোটুর ঐ নির্দিষ্ট অভাবটা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায়নি। তবে পাড়ার নিকম্মা লোকগুলো মাঝেমধ্যে মজা করতে কেউ কেউ ছোটুর সামনে কথাটা তোলে—ছোটুদাস আমার হাতে একটা ভালো মাল আছে, বস তোর সঙ্গে তালে লাগিয়ে দিই। আমাদেরও একপাত হয়ে যাক। সঙ্গে সঙ্গে বড়রা মুচকি মুচকি হাসতে থাকে আর খুচরোরা ছোটুদার বিয়ে হবে, হেমা মালিনী বৌ আসবে' বলে ছোটুকে খ্যাপাতে শুরু করে। আর এসব মজা তো মজার পাত্রটি গরহাজির থাকলে ঠিক জমে না তাই এসময় বড়রা কেউ ছোটুর হাত ধরে, ছোটুর কেউ ওর পাজামার কষিটা ধরে টেনে ওকে আটকে

মাথার চেষ্টা করে। তবু ছোট্টু ঢিল খাওয়া একটা কুকুরের মত ঠিকই ব্যূহ ভেদ করে সে জায়গা ছেড়ে চলে যায়।

আশপাশের বাড়ীর নাগ-বৌরাও ছোট্টুকে নিয়ে মজা করে। তাদের ধারণা ছোট্টুর কাছে কোনকিছুতেই লজ্জা বা ভয় পাবার কিছু নেই। তাই আশেপাশে কেউ না থাকলে তাদের মজাটা খুব সহজেই মোটা দাগের হয়ে ওঠে। তারা ছোট্টুর খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। আঁচলটা গা থেকে খসিয়ে দু-তিনটে বাচ্চা বিয়োনো বোগুলো তাদের বুক চিতিয়ে চোখে এক চিলতে আবেশ নিয়ে দরদীর ভঙ্গিতে ছোট্টুকে বলে—ছোট্টুদা এবার একটা বিয়ে কর। বউ আসবে, এক-সঙ্গে শোবে—সে যে কি সুখ। মাইরি বলছি ছোট্টুদা! ছোট্টুর শরীরটা একটা অজানা সুখানুভূতিতে কেঁপে কেঁপে উঠলেও বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচিয়ে ওঠে।

শুধু কি তখন, কাঁটাটা তো সবসময়ই খোঁচা মারে। আর সেই খোঁচার জ্বালায় ও যে অহোরাত্র জ্বলেপুড়ে মরে। ওর এই জ্বলুনীটা কেউ তেমনভাবে জানতে পারে না। কেননা সেটা তো ওর বুকের ভেতরেই হয় আর পাড়ার বউ-ঝিদের পেছনে একটু আধটু ছুঁকছুঁকি বাই থাকলেও দৃষ্টিকটু রকমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সবার চোখের আড়ালে, কোন নিরিবিলি দুপুরে কিম্বা দেড়পোয়া রাতে ওর একার ঘরটিতে। এসময়টা ছোট্টু কেমন যেন হয়ে ওঠে। কখনও কখনও একটা শান্ত গোবেচারীর ছবি, গৃহকর্মরতা ও সেবাপরায়ণা কোন এক বধূর মুখ আর একটি কচি শিশুর স্পর্শের কথা কল্পনা করে ও একরাশ হতাশা আর আত্মগ্লানিতে ভেঙে পড়ে, হয়ত বা আবছাভাবে ওর মৃত জনকজননীর কথাও মনে পড়ে যায়। হঠাৎ ওর খুউব কাঁদতে ইচ্ছে করে কিন্তু কিছুতেই আর চোখে জল আসে না, চোখের পাতাদুটো একটু ভিজেও ওঠে না। তখন ও কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে। কোন কোনদিন এর ঠিক পরেই হঠাৎ দেরাজের ভেতর থেকে সন্তর্পণে একটা বই বের করে চারদিকটা তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয় তারপর বিছানায় শুয়ে সে বইটার ছবিগুলো তারিয়ে তারিয়ে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে ওর হলদেটে চোখদুটো চকচকিয়ে আর তামাটে ঠোঁটদুটি ভিজে ওঠে। তারপর কয়েক মুহূর্ত বাদেই হঠাৎ একটা জান্তব চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে ছুটতে থাকে।

ছোট্টুদের পাড়াতেই থাকে অরুণারা। বাপ বাস ড্রাইভার ছিল। দম বন্ধ একদিন মরে গিয়ে বউ আর চার মেয়েকে পথে বসিয়ে গেছে। আর পথে বসা মানেই তো আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল হয়ে যাওয়া। শুধু মাতৃর পেটের দায়েই চার বোনের তিনজনই প্রায় অন্যের মেয়েমানুষ হয়ে গেছে। ভদ্রপাড়ার ভদ্রপরিবারের মেয়ে, তাছাড়া পৈত্রিক ভিটেও একটা আছে, তাই বাজারে ঘর নেয়নি। তবু বাজারী মেয়েমানুষ হতে বাধেনি। ভদ্দরলোকেরাও যেমন আসে তেমনি নাচু জাতের লোচ্চা-লাফাংগা মানুষরাও আসে। রেতবিরেতে তো বটেই দিনদুপুরেও দরজা হাট করা থাকে। কাবো ভালো হওয়ার খবরটা জানতে দেরী হলেও মন্দ হয়ে যাওয়ার খবরটা জানতে একটুও সময় লাগে না। কাজেই ঐ তিনটি মেয়ের নিরুপায় দেহবেসাতির কথা পাড়ার আর কারো অজানা নেই। ত ছোট্টুও তো পাড়ারই মানুষ তার ওপর চিরউপোসী। কাজেই কদিন ধরেই বড়টার ওপর টো মেরেছিল। বড়টা দেখতে হাড়কুচ্ছিৎ, একেই রোগাটে কাঠামোর শরীর তার ওপর নিত্যদিনের ধকল কাজেই শরীরটা ক্রমশঃ চিমড়েসার হয়ে গেছে। এখন কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। রাস্তায় ঘাটে ওর তাল-ঢ্যাঙা রোগা কালো শরীরটার দিকে চোখ পড়লে সবারই মুখে একটা বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে ওঠে, ঠোঁটদুটো বেঁকে যায়, আর পরমুহূর্তেই চোখদুটো অন্যদিকে ঘুরে যায়। ছেলেছোকরাদের দঙ্গলের মুখে পড়লে, চুটকি ঝাড়ে—মলা যেন বিচ্ছুন্দরী। নিজেকে তখন খুব দীন খুব নিঃস্ব মনে হয় অরুণার। মাথাটা তখন ঘুরে ওঠে, অবোধ্য একটা কষ্টের মধ্যে পাক খেতে খেতে ও নিজের মরণ কামনা করে। হালে ওর বাজার একেবারেই মন্দা হয়ে পড়েছিল। আর এরকম অবস্থায় তো মানুষ সামান্যজনকেও হেলাফেলা করে না। তা অরুণাও ছোট্টুকে আর পাঁচজনের মত তুচ্ছতাচ্ছিল্য তো করেনিই বরং তার ছটফটানি টের পেয়ে গত পরশু একটু নির্বিবিলিতে নিজেই এগিয়ে এসে আদুরী গলায় আবদার জানিয়েছে—ছোট্টুদা কত লোক তো আমাদের বাড়ীতে আসে, কই তুমি তো একদিনও এলে না। তুমি এলে আমার খুউব ভালো লাগবে।

অন্ধকার পথে পা বাড়াতে গেলেই প্রতিটি সাধারণ মানুষের মনেই কমবেশী জড়তা আসেই। তা ছোট্টুদের মত লোকদের তো আসবেই, বরং একটু বেশী মাত্রাতেই।

ঐ জড়তার জন্যেই ওকে শরীর মন দুদিকেই উপোসী থাকতে হয়েছে। মনে মনে আর সবার মত ঘরসংসার করার ইচ্ছা থাকলেও বারবার পেছিয়ে এসেছে। নইলে ফুটপাথের ভিখিরিগুলোও যেখানে একটা ঝুগ্গি থাকে আর সেই ঝুগ্গিতে বউ থাকে ছেলেপুলেরা থাকে, তা ছোট্টুরতো সে জায়গায় বাপের পাকা ভিটের একটা অংশ আছে। আর বাপ মরে যাবার সময় সবাইকে লুকিয়ে ছোট্টুর নামে একটা ব্যাঙ্কের পাশ-বই খুলে কিছু নগদ টাকাও তো জমা করে দিয়ে গেছে। ছোট্টু সেকথা কাউকে জানায় নি আর সে টাকায় হাতও দেয়নি। আবার এদিকে য্যামন দ্যাবা তেমনি দেবীরও তে অভাব নেই। মোদ্দাকথা ছোট্টু ইচ্ছে করলেই কোন একটা খেঁদী বুঁচিকেও জুটিয়ে নিয়ে সংসার পততে পারত। কিন্তু সেসব কিছুই আর হয়ে ওঠে নি। আবার ঐ জড়তার জন্যেই শরীরের ছটফটানি বন্ধ করতে ছবি দেখা কি বাচ্চা মেয়েদের কোঁৎ পেড়ে পেড়ে আদর করার বেশী এগোতে পারেনি।

কিন্তু গত পরশুদিন অরুণার ঐ সাদর আমন্ত্রণের ফলে ঝাঁপির মুখ খুলে গিয়ে ছোট্টুর কামনা বাসনার বিষাক্ত সাপটা একেবারে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। আর ছোট্টু তো ওঝা নয় সে সাপ বশ করার মন্ত্র জানবে। একটা নেহাতই রক্তমাংসে স্থূল মনের সাধারণ মানুষ, তাও ও আর কিছুতেই সাপটাকে ঝাঁপি বন্ধ করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্থির করল যে ও অরুণার কাছে যাবেই এবং আজই সন্ধেবেলায়। এটা স্থির করার পরই ও একটা অজানা পুলক আর উত্তেজনার স্রোতে ভেসে চলল। তাড়াহুড়ো নোংরা জামা-পাজামাটাকে সাবান দিয়ে কেচেকুচে নিল। দুপুরের দিকে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা তুলে আনল। আর বিকেলে কলতলায় ঢুকে ঝাড়া অর্ধঘন্টা ধরে গা ধুলো। কলতলা থেকে বেরিয়ে ঘরে এসে আয়নার সামনে বসল। বৌদিদের থেকে একটু ঝেড়ে খানিকটা স্নো মুখে মাখল সামনের টাকটা ঢেকে পরিপাটী করে চুলও আঁচড়ালো। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে ঘাড় দুলিয়ে মৃদুমন্দ হাসতেও লাগল। সন্ধে হতেই ছোট্টু এযাবৎ অপূর্ণ তার রক্তমাংসের একমাত্র ইচ্ছাটি পূরণের জন্যে যাত্রা করল।

অরুণা বোধহয় তার ভালোলাগা মানুষটির জন্যেই আনচান করছিল। ছোট্টু দরজায় খটখট করতেই বাড়ির বাইরের দরজাটা খুলে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই ছোট্টুকে হাত ধরে ভেতরে টেনে নিল। দরজাটা আবার বন্ধ করতে করতে বলল—জানি আমার ছোট্টুসোনা আজকেই আসবে। অরুণাদের বাড়ীটা কেমন যেন সুমসাম। ছোট্টু জিজ্ঞাসা করল—বাড়িতে আর কেউ নেই? অরুণা জবাব দিল—ছোট বোনটাকে নিয়ে মা গেছে পিসীর বাড়ি। বাকি দুবোন বেরিয়েছে। সান্ধ্যরাতে কেউ আর ফিরছে না। আমি একাই আছি। ছোট্টু এবার হালকা বোধ করল, আচমকা অরুণার গালটা টিপে দিয়ে ওকে একটু আদর করল। তারপর ওর পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল। ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। তাই সারা ঘরটা জুড়েই আলোআঁধারির খেলা চলছে। ছোট্টু এবার অরুণাকে সামনাসামনি দেখতে পেল। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শাড়ি পরেছে, মাথার চুল বিনুনি বেঁধে কচি সেজেছে আর কালো মুখে এক ধাবড়া পাউডার মাখার ফলে মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে। তবু

ছোট্টু আপনা থেকেই বলে উঠল—তুমি কি সুন্দর। অরুণা মুচকি হেসে বলল—এখনই এত না জানি আর কিছুক্ষণ পরে কি বলবে কে জানে। তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল—দাঁড়াও আজ প্রথম আমার ঘরে এলে, একটু মিষ্টিমুখ করাই। মিষ্টি বলতে চা কিন্তু। দাঁড়াও। বলেই অরুণা পাশের ঘরে চলে গেল। ছোট্টু এবার বিছানার উপর তেমাথা হয়ে বসে দুলতে লাগল। আর ক্রমশঃ আগুনে ফেলা লোহার মত গনগনে হয়ে উঠতে থাকল। শেষপর্যন্ত ওর মনে হল ও বোধহয় এবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

কয়েকমিনিট পরেই অরুণা চায়ের কাপ হাতে ঘরে এসে ঢুকল। কাপের ডাঁটিটা ধরতে গিয়ে ছোট্টুর হাত কেঁপে গিয়ে খানিকটা গরম চা ওর পাজামার ওপর পড়ল। অরুণা তা দেখে কি ভেবে হেসে ফেলল। চাটা কয়েক চুমুকে শেষ করেই ছোট্টু কাপটা খাটের নীচে নামিয়ে রাখল। তারপরই এক ঝটকায় অরুণার হাতটা ধরে তাকে কোলের কাছে টেনে নিল। অরুণা অস্ফুটস্বরে বলল—আঃ আর তর সইছে না যেন! হাতটা ছাড়ো। কায়দা করে হাতটা ছাড়িয়ে অরুণা ঘরের একটা কোণে সরে গেল। ভেতরকার সব খুলে ফেলে শুধু-মাত্র শাড়িটা গায়ে জড়িয়েই ছোট্টুর সামনে এসে দাঁড়ালো। ছোট্টুকে দু হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ওর চোপসনো গালে চুমু খেল। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরেই বিছানা আশ্রয় করল। ছোট্টুও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অরুণার রোগা কাঠের মত শরীরটার রক্ত-মাংস সবকিছুকে চেটেপুটে খেয়ে ফেলার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত হল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে অরুণা বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল। ছোট্টু আর উঠল না। খুব শান্তভাবে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। তার ভেতরের এতদিনকার রুক্ষ জমিটা যেন ইতিমধ্যেই বর্ষণসিক্ত হয়ে উঠেছে। তাই বোধহয় অরুণার ঘরের এই গুমসানির মধ্যেও একটা ঠান্ডা বাতাস ছোট্টুর শরীর মন সবকিছুর ওপরে এক পরত মোলায়েম পরশ বুলিয়ে গেল। কেন জানে না এই মুহূর্তে অরুণাদের এই ঘরটাকে নিজের ঘর বলেই মনে হল ওর। মনে হল ও যেন নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে।

কয়েকমিনিট পরে অরুণা এসে ঘরে ঢুকতেই ছোট্টু উঠে বসল। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে অরুণার হাতে দিয়ে বলল—রাখো। নোটটা দেখে অরুণার চোখ দুটোয় খুবই খুশীর একটা ভাব ঝিলিক মেরে গেল। অনেকদিন পরে এক খেপে এত টাকা রোজগার। ছোট্টু বলল—আজ তোমার এখানেই খাবো। অরুণা আন্তরিক গলায় বলল—আমিও তোমায় কথাটা বলব ভাবছিলাম। তা এস্টোভে তেল আছে, হাঁড়িতে করে দুটো চাল চড়িয়ে দিই। কথাটা বলে অরুণা ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছে, ছোট্টু ডাকল—একটু শোনো। অরুণা ফিরে এসে ছোট্টুর সামনে এসে দাঁড়ালো। ছোট্টু বলল—অত তাড়া কিসের, একটু দাঁড়াও না। অরুণা খাটের ওপর ছোট্টুর গা ঘেঁষে বসে পড়ল। ছোট্টু কেমন যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অরুণা একটু অস্বস্তি বোধ করল। ছোট্টু হঠাৎ বলে উঠল—অরু আজ তুমি সিঁদুর পরনি কেন? ছোট্টুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল অরুণা ভাবল, বলতে চাইল—আঃ মর আমি যে আইবুড়ো। কিন্তু তা বলল না তার পরিবর্তে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, অনেক দূরের কি একটা যেন খুঁজতে চাইল। খুঁজেও পেল তা। আর সঙ্গে সঙ্গে ও এই প্রথম ছোট্টুর জন্যে একরাশ মমতা বোধ করল। তার সঙ্গে আর কিছু কি নয়? নিজে যা কোনদিন পায়নি, কোনদিন পাবেও না সেই মূল্যবান কামনার তীব্র হাহাকার বোধের কাঁটাটার খচ-খচানি। অরুণার চোখ দুটো সামান্য ভিজে উঠল। একটু উতলা হয়ে বলে উঠল—তুমি তো জানো সংসারের কত কাজ, রোজ কি আমার মনেও থাকে! তা তুমিই পরিয়ে দাও না, দাও নাগো। মাঝেমধ্যে কাজে লাগে বলে ঘরেতেই একটা কৌটোয় করে খানিকটা সিঁদুর রাখা আছে। অরুণা কৌটোটা এনে ছোট্টুর হাতে দিতে ও তার সিঁথিতে অনেকখানি সিঁদুর লেপে দিল। অরুণা লজ্জায় মুখটা নামিয়ে ফেলল। ব্যস্তস্বরে বলল—তুমি কাজ থেকে ফিরলে, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব। ভাতটা চড়িয়ে দিইগে।

পাশের ঘর থেকে স্টোভটা নিয়ে অরুণা এ ঘরে ফিরে এল। সেটার আগুন ধরিয়ে রান্নার জোগাড়যন্ত্রে লাগল। ওর চাল চড়ানো, কুটনো কোটা আর সব টুকিটাকি কাজকর্মগুলোও ছোট্টু লোভীর মত তাকিয়ে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এমনকি ওর রসা চলাফেরা হাত-পা নাড়া সবকিছুর মধ্যেই একটা নতুন স্বাদ পেল। অরুণা মুখ নীচু করে কাজকর্ম সেরে যাচ্ছিল। তবু মাঝেমধ্যে মুখ তুলে তাকাচ্ছিল। আর মৃদুমন্দ হাসিতে ছোট্টুকে ক্রমশঃ ভরিয়ে তুলছিল।

খেতে বসার সময় অরুণা কি সুন্দরভাবে আসন পেতে ভাতের থালা আর ডাল তরকারীর বাটিগুলো সাজিয়ে দিল। গরম ভাত জুড়োতে সামনে বসে পাখার বাতাস করতে লাগল। খেতে খেতে ছোট্টুর একটু অস্বস্তিবোধ হলেও পরম তৃপ্তিতেই ও মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। মা মারা যাবার পর এই প্রথম ও যেন সাদামাটা ভাত-ডাল-তরকারীর মধ্যে একটা স্বাদ খুঁজে পেল। আর অরুণা ছোট্টুর খাওয়া দেখতে দেখতে মাঝেমাঝেই এক মহার্ঘ স্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকল।

ছোট্টুর এখন কেমন যেন সবকিছুই ভালো লাগছে। এই ঘুপচি ঘর, বিছানাটা অরুণা সবকিছুকেই একান্ত নিজের বলে মনে হচ্ছে। তাই বোধহয় খেতে খেতেই ও অরুণাকে বলল—আজকে এখানেই থাকব। মুহূর্তের জন্যে একটু দ্বিধা জাগলেও অরুণা হাসিমুখে ব্যগ্রস্বরে বলে উঠল—থাকো না, থাকো নাগো।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকতে অরুণা বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে নিল। ছোট্টুর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল—ভোরে উঠেই তো আবার কাজে ছুটতে হবে তা আর বেশী রাত কোর না। তারপর স্পষ্টভাবে বলল—তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। ছোট্টু শুয়ে পড়ল, অরুণাও মোমবাতিটা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ল। ছোট্টু ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ভাঙা গলায় এক নতুন ডাকে ডাকল—বৌ। যে ডাকটা শোনার জন্যে অরুণা কত কতরাত নিজের ভেতরে ভেতরে মাথা খুঁড়ে মরেছে সেই ডাকটা এই প্রথম একজন পুরুষের মুখে শুনতে পেয়ে ওর শরীরটা থিরথির করে কেঁপে উঠল। এক অনাস্বাদিত সুখের ভরপুর আস্বাদে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে যেতে ও ছোট্টুর বুকের মধ্যে মিশে যেতে চাইল। আর ছোট্টুও অরুণার মধ্যে একইভাবে মিশে যেতে যেতে আবার ঐ ডাকটা ডাকল—বৌ! বোরে। লাজুক স্বরে সাড়া দিল অরুণা—উঁ!

খেলার জগৎ

কি আফশোষ 'মজার খেলা' ক্রিকেট বুঝি এক সর্বনেশে খেলায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

এ কি শুধু কথার কথা? না। অতি বাস্তব এক ঘটনা ঘিরেই এই আশঙ্কার উৎপত্তি। সাম্প্রতিক কালের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটির দিকে আগে চোখ ফিরিয়ে দেখা যাক।

গত মার্চে নিউজিল্যান্ড বনাম ইংলন্ডের এক টেস্ট খেলায় নিউজিল্যান্ডের এগারো নম্বরী ব্যাটধারী ইউবিন চ্যাটফিল্ড ইংলন্ডের আক্রমণ প্রতিরোধে বুক ফুলিয়ে মুখে দাঁড়াতেই ওই অঘটন ঘটে যায়।

একেবারে নীচের দিকের ব্যাটধারী এই চ্যাটফিল্ড। কিছুক্ষণ টিকে থাকবেন, এমন আশা কেউ করে নি। তবু অন্য সকলের পূর্ব ধারণাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে চ্যাটফিল্ড প্রায় পঁচাত্তর মিনিট মাঝমাঠে মেরুদণ্ড সোজা রেখে খাড়া দাঁড়িয়ে যান।

ব্যাটসম্যান হিসেবে একেবারেই অস্বীকৃত। অথচ উইকেটে এমন দীর্ঘমেয়াদী অবস্থিতি। নাছোড়বান্দা চ্যাটফিল্ডকে দেখে কি যে করে উঠবেন ইংলন্ডের বোলাররা ভেবেই তার কূল পাচ্ছিলেন না। স্পিনের ফাঁদ, পেসের হুংকার, সব কিছুই বৃথায় যায় দেখে পেস বোলার পিটার লেভারের মাথার পোকা উঠলো নড়ে। দুষ্টু বুদ্ধি চাগিয়ে উঠলো। ঠুকলেন একটি বাম্পার। ব্যাস, তাতেই ঘটলো সেই ভয়ঙ্কর অঘটন।

খাটো লেংথের খুনে বাম্পার। মাটিতে পিচ পড়া মাত্রই ফোঁস করে লাফিয়ে চ্যাটফিল্ডের দস্তানা ছুঁয়ে সজোরে ছোবল কষাল তার কপালে। আচম্বিত চোট। তাও আবার কপালে। সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটফিল্ড কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে উপড়ে পড়েন। যন্ত্রণায় কাতরান সেকেন্ড কয়েকের মতো। তারপরই কেমন যেন নিঝুম মেরে যান। নাড়ীর স্পন্দন যায় থেমে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

গেল গেল রব ওঠে খেলার মাঠে। সবাই কেমন হকচকিয়েও যায়। শুধু বুদ্ধিভ্রম ঘটে নি ইংলন্ড দলের সঙ্গে পরিভ্রমণরত শারীরতত্ত্ববিদ বার্নার্ড টমাসের। মস্তো বিপদ সামনে। বিপদের গন্ধ পেয়েই প্যাভিলিয়ন থেকে ছুটে মাঠে এসেই টমাস চ্যাটফিল্ডের মুখের ফোকরে ফুঁ দিতে সুরু করেন। ঝাঁঝালো ভেষজ নয়। অস্ত্রোপচারও নয়। সামান্য ফুঁ। তাতেই কিন্তু অসাধ্যসাধন হলো।

মিনিট কয়েক আগেও যে কাঠামোয় প্রাণের সাড়া ছিল না, সেখানে প্রাণস্পন্দন জাগলো। হাত পা নড়ে ওঠার লক্ষণ পেস প্রকাশ। অন্য সবাই ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আর একটু সামলে উঠতেই চ্যাটফিল্ডকে হাসপাতালে পাঠানো হলে যথাসময়ে তিনি আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ফাঁড়া আপাততঃ কেটে গেল। কিন্তু চিকিৎসকেরা বল্লেন, ডাক্তারী মতে চ্যাটফিল্ড কিছুক্ষণের জন্যে 'মারা' গিয়েছিলেন। বরাত ভাল যে ব্যাপারটা কিছুক্ষণের। তাই চ্যাটফিল্ড মরণের ওপার থেকে এপারে ফিরে আসতে পেরেছেন। নইলে মাঠ হচ্ছে খুনোখুনির আড্ডা, এই বিশেষণের ঘন্টাটি ক্রিকেটের গলায় ঝোলানো হোত নিশ্চয়ই।

তবে আপাততঃ এই সর্বনাশ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও, বাম্পারের খুনী মেজাজের আস্ফালনে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা কি বিঘ্নিত হচ্ছে না? বিশেষ করে নীচের দিকের ব্যাটধারীদের ব্যাটসম্যান হিসেবে যাদের কোনো স্বীকৃতিই নেই?

ইনিংসের শেষ দিকে ব্যাট হাতে সাধারণতঃ যাঁরা মাঠে নামেন, ব্যাটিং রীতি ও প্রকরণ বিদ্যা তাঁদের অধিগত নয়। অতর্কিত বাম্পার সামাল দেওয়ার মুরোদ নেই তাঁদের। এসব কথা জেনেও অধুনা কোনো কোনো পেস বোলার তাঁদের লক্ষ্য করে তাল ঠুকে বাম্পার ছাড়ছেন। যেমন ছেড়েছিলেন সেদিন ওই পিটার লেভার। লেভারের অনুগামীরা অন্যরও আছেন। তাঁদের দু-একজনকে দিনকয়েক আগে আমরা এই কলকাতার মাঠেই দেখতে পেয়েছিলাম রণজি ট্রফিতে বাংলা বনাম ওড়িষ্যার খেলা উপলক্ষে। চ্যাটফিল্ডকে সরাতে না পেরে লেভার বাম্পারের ঘায়ে চ্যাটফিল্ডের জ্ঞান নিতে চলেছিলেন। আর কলকাতার আসরে ওড়িষ্যার শেষ খুঁটিটিকে নড়াতে না পেরে বাংলার বোলারেরা একই অস্ত্র প্রয়োগে বিপক্ষ দলের শেষজনকে মারাত্মক ভাবে আহত করেছিলেন। বড় ছোট আসরে তফাৎ যাই থাকুন কেন, ছোট বড় আসরের চরিত্রগুলি লেভার ও বাংলার বোলারেরা, মনের দিক থেকে অভিন্নপ্রায়।

বাম্পার পেস বোলারের হাতে এক আইনসিদ্ধ অস্ত্র। যেমন ব্যাট দক্ষ ব্যাটসম্যানের হাতের হাতিয়ার। স্বীকৃত ব্যাটসম্যানদের লক্ষ্য করে এই অস্ত্রে শান্ দেওয়া হলে আপত্তি করার কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ব্যাটসম্যান হিসেবে যাঁদের কোনো স্বীকৃতি নেই, তাঁদের বিরুদ্ধে বাম্পারের দাওয়াই প্রয়োগ করতে গেলে প্রতিবাদের ঝড় উঠবেই উঠবে। এই প্রতিবাদ বোলারের আইনগত অধিকার নিয়ে নয়। তার নৈতিক অধিকার ঘিরেই।

ন্যায়, নীতি সদাচরণের ওপর ভিত্তি করেই ক্রিকেট দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্রিকেট শব্দটিও শোভনতার প্রতীকি মর্যাদামণ্ডিত। সেই ক্রিকেট বলেই তো ন্যায় পথে চলার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু ব্যাটসম্যান হিসেবে যাঁরা শিক্ষানবীশ ও অপটু, ইনিংসের শেষদিকের সেই সব খেলোয়াড়কে বাম্পারের মুখে ঠেলে দেওয়া কি ন্যায় পথে চলার বা শুদ্ধমতে ক্রিকেট খেলার পর্যায়ে পড়ে? পড়ে না।

তাই বলি, ন্যায়যুদ্ধে শেষদিকের ব্যাটধারীদের হার মানাতে না পেরে যাঁরা ভয় দেখাতে বাম্পার ছাড়ছেন, তাঁরা কেউই সত্যিকারের ক্রিকেট খেলছেন না। ক্রিকেটের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে তাঁরা শ্রদ্ধাশীল নন। তাঁরা অসুন্দরের পূজারী। মাঠে মাঠে তাঁদের দাপাদাপিতেই এবারে ক্রিকেটের সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে। চ্যাটফিল্ডের চোট একটি সামান্য ঘটনা নয়। বলা যেতে পারে যে এই ঘটনায় ক্রিকেটের দিগন্তে কোড়ো মেঘের সঙ্কেত পাওয়া গেছে।

ক্রিকেটের লালন-পালনের ভার যাঁদের ওপর, ঈশানকোণে জমে ওঠা ওই একখণ্ড মেঘের হদিশ জানতে তাঁদের ভুল না হলেই ভাল। তাঁরা ভুল করলে কিন্তু ন ইঞ্চি পরিধিতে মোড়া সাড়ে পাঁচ আউন্স ওজনের রাঙা ক্রিকেট বলটি তাজা রক্তের স্বাদ পেতে আরও লকলকিয়ে উঠতে পারে। আজ বাধা না পেলে অনাগত ভবিষ্যতে বাম্পারের এক ঘায়ে মাঝমাঠে কোনো হতভাগ্যকে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হতে পারে। তেমন অলক্ষণে কাণ্ড যদি কোনোদিন সংঘটিত হয় তাহলে মজাদার খেলা ক্রিকেটের ক্রিকেটত্ব কি বজায় থাকবে?

মাঝমাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মেজাজ যতোই চড়ুক না কেন, আসলে ক্রিকেট একটি খেলাই, যুদ্ধ নয়। খেলার ছলে ক্রিকেটকে যারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত করতে চায় তারা স্বধর্মে সনিষ্ঠ নয়। তারা ব্রাত্য। তাদের সম্পর্কে আজ গম্ভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সময়ে এদের সামলাতে না পারলে ক্রিকেট খেলতে এসে কেউ হয়তো একদিন খুনই হয়ে যাবে। সেদিন চোখের জল ফেলে বিলাপে সোচ্চার হয়েও আত্মদোষ স্খালন করা যাবে না। চ্যাটফিল্ডের ভোগান্তি দেখে আশঙ্কা হয় যে, সেই ভয়ঙ্কর দিনটি বুঝি আর বহুদূরে নেই। তাই এই সতর্কবাণী, ক্রিকেটের আশু সংকট দূর করায় সময় থাকতেই আটঘাট বেঁধে রাখায় তোড়জোড় দেখানো হোক।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে আগেভাগে আটঘাট বেঁধে রাখায় কার্যকর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? এ সম্পর্কে প্রয়োজনমাফিক নিয়ম সংশোধন করলেই কি যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে?

নিয়ম সংশোধন করলে অবশ্যই বাঞ্ছিত সুফল ফলবে। তবে চূড়ান্ত সংশোধনী সিদ্ধান্ত চালু করার আগে অন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশও জানানো যেতে পারে। যথা, সাধারণ ভাবে সব ক্রিকেটারকে নির্দেশ দেওয়া হোক যে নীচের দিকের ব্যাটধারীদের, ব্যাটসম্যান হিসেবে যাঁদের কোনো স্বীকৃতি নেই তাঁদের লক্ষ্য করে বাম্পার ঠোকা চলবে না। এই নির্দেশে যদি সুফল না ফলে তাহলে নিয়ম সংশোধন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দুঃখের কথা এই যে নীচের দিকের ব্যাটধারীদের লক্ষ্য করে বাম্পার না ছাড়ার কথা আজ বোলারদের মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে। কারণ, নীচের দিকের ব্যাটধারীদের উদ্দেশ্যে বাম্পার ঠোকা যে ক্রিকেটে নীতিবিরুদ্ধ কাজ, রীতিমতো অসদাচরণ, এ উপলব্ধিতে ক্রিকেটার মহল অনেককাল অবিচল ছিল। অতি সম্প্রতি যেন কেউ কেউ ক্রিকেটারের চরিত্রধর্ম ভুলতে সুরু করেছেন। বিপদ বাড়ছে তাতেই।

নীচের দিকের ব্যাটসম্যানদের বাম্পার ঠুকে ভয় দেখানো বা আহত করা নিয়মবিরুদ্ধ না হলেও যে কতোটা নীতিবিগর্হিত কাজ, অতীতের অনেক খেলোয়াড় তাঁদের অনুসৃত কর্মনীতিতে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রেখে গেছেন। এমন একটি প্রমাণের উল্লেখ রাখার লোভ সামলাতে পারছি না।

সে ঘটনা ত্রিশের দশকের। ঘটেছিল আমাদের দেশেই, বোম্বাইয়ের এক ক্রিকেট মাঠেই। প্রাক রণজি ট্রফি আমলের কাহিনী সেটি। তখনকার দিনে পঞ্চদলীয় ক্রিকেটেই ছিল ভারতের বৃহত্তম প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা চলছিল মুসলিম ও হিন্দু দলের মধ্যে।

দু পক্ষেই ভারতবিখ্যাত খেলোয়াড়েরা ছিলেন। মুসলিম দলের ইনিংসের গোড়ার পর্বে পেস বোলার সুটে ব্যানার্জির একটি বাম্পারে দিলওয়ার হোসেন মাথায় চোট পান। দিলওয়ার সুখ্যাত ব্যাটসম্যান। আকস্মিক এক বাম্পারের চমক জাগিয়ে তাঁকে বেসামাল করার মতলব ভেঁজে পেস বোলার সুটে ব্যানার্জি বে-আইনী বা নীতিবিরুদ্ধ কিছুই করেন নি। তবু মুসলিম দলের অধিনায়ক ওয়াজির আলি সুটে ব্যানার্জিকে ক্ষমা করতে চান নি।

হিন্দু দলের ইনিংসের শেষ দিকে ব্যাট হাতে সুটে ব্যানার্জি যখন মাঠে নামেন তখনই ওয়াজির দুরন্ত পেস বোলার মহম্মদ নিসারের হাতে বল তুলে দিয়ে হুকুম চালান : আভি বাম্পার ডালো। তুমভি সুটেকো শির তোড় দেও।

কিন্তু জাতিক্রিকেটার মহম্মদ নিসার দলপতির হুকুমের পাশে দাসখৎ লিখে দেন নি। ক্রিকেটার চরিত্রের শালীনতা বজায় রাখতে তিনি দলপতিকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন : সুটে ব্যাটসম্যান নয়, বোলার। সুটের উদ্দেশ্যে বাম্পার ছাড়বো কেন? যে স্বীকৃত ব্যাটসম্যান নয় তার বিরুদ্ধে বাম্পার ঠোকা ক্রিকেটারের পক্ষে অধর্মের কাজ। ও কাজ আমায় করতে বলবেন না। আর আমি এসেছি ক্রিকেট খেলতে। মানুষ মারতে নয়। ও আমি পারবো না। মুসলিম দলপতি সেদিন অনেক পেড়াপেড়ি করেছিলেন। তবু নিসার তার কথায় রাজী হননি। এই সব কথা চালাচালির পর পাছে কোনো সূত্রে তাঁর বলে নীচের দিকের ব্যাটধারীরা চোট পান এই ভয়ে নিসার সেদিন আর বলই করেননি এবং ওই ফাইনালে হিন্দু দলই শেষ পর্যন্ত জিতে গিয়েছিল।

এই মহম্মদ নিসার, সর্বকালের নিরিখে যিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পেস বোলার এবং তাঁর সমধর্মীরা আদর্শের সঙ্গে সুসমঞ্জস থেকে সত্যিকারের ক্রিকেট খেলেছেন। নিজেদের আচরণে ও অনুসৃত রীতিনীতিতে তাঁরা ক্রিকেটের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পূর্বসূরীদের কীর্তি ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত নস্যাৎ করে আজ যাঁরা নীচের দিকের ব্যাটধারীদের লক্ষ্য করে হাতের গুলি ফোলাচ্ছেন ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধার পরিণামেই ক্রিকেটে সংকট দেখা দিয়েছে। ক্রিকেট যে কি বস্তু তা তাঁরা জানেন না। কতোদিনে যে তাঁদের সত্যোপলব্ধি ঘটবে তাই বা কে জানে! আদৌ ঘটবে কি?

আদর্শের সঙ্গে বেমানান ক্রিকেটের বেয়াড়া চরিত্ররা যদি ক্রিকেটের আত্মিক বৈভবের ঠিকানা জানায় কোনো আগ্রহ না দেখান, তাহলে নিয়ম সংশোধন করেই তাঁদের চরিত্র শুদ্ধির পথ পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া অন্য উপায় কিই বা আছে?

অনেকদিন আগে সেই ত্রিশের দশকে বডি-লাইনকে রুখতে ক্রিকেটের আইনের বয়ান বদলাতে হয়েছিল। তাতে সাময়িক সংকট প্রতিহত হয়েছিল। কিন্তু বছর চল্লিশ বাদে আদর্শচ্যুত আর এক দলের উৎপাতে ক্রিকেটে নতুন করে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা যথার্থ ক্রিকেটপ্রেমীদের ভাবিয়ে তুলেছে। এসম্পর্কে একটা কিছু করার প্রয়োজন ঐতিহাসিক।

কথায় কথায় বডি-লাইন শব্দটি উচ্চারিত হয়ে গেল। বডি-লাইন কি এবং কেন ক্রিকেটের সংকট বাধাতে বডিলাইন কি আসুরিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে প্রসঙ্গে পরে একদিন আলোচনা করবো।

অজয় বসু

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আগামী জুন মাসে ইংল্যাণ্ডে প্রথম বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসছে। এই প্রতিযোগিতার প্রতিটি খেলাই মেয়াদ একদিন। ভারত এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় দল গঠনের উদ্দেশ্যে একদিনের দুটি নির্বাচনী খেলা হয়ে গেছে। বোম্বাইয়ের প্রথম নির্বাচনী খেলায় ভেঙ্কটরাঘবনের নেতৃত্বে 'এ' দল ১১০ রানে অশোক মানকাদের 'বি' দলকে পরাজিত করে এবং মাদ্রাজের দ্বিতীয় নির্বাচনী খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একাদশ দল ৫ উইকেটে তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট দলের কাছে হেরে যায়।

বোম্বাইয়ের প্রথম নির্বাচনী খেলায় বাংলা থেকে স্থান পেয়েছিলেন দুজন গোপাল বসু (বি দলে) এবং পেস বোলার বরুণ বর্মণ (এ দলে)।

মাদ্রাজের দ্বিতীয় নির্বাচনী খেলায় বাংলা থেকে স্থান পেয়েছিলেন অম্বর রায় (বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একাদশ দলে) এবং সব্রত গুহ (তামিলনাড়ু ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট দলে)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

প্রথম নির্বাচনী খেলা

ভেঙ্কটরাঘবনের 'এ' দল : ২২৮ রান (সুরীন্দর অমরনাথ ৩৫ ব্রিজেস প্যাটেল ৫৬ সৈয়দ কিরমানি ৪৫ মদনলাল ২৭ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ২৩ রান। পি শর্মা ৫১ রানে ৪ এবং এস এ হাতিয়া ২৬ রানে ২ উইকেট)।

অশোক মানকাদের 'বি' দল : ১১৮ রান (পি শর্মা ৫৩ এবং এম অমরনাথ নট আউট ২১ রান। বরুণ বর্মণ ২১ রানে ২ আবিদ আলি ১৫ রানে ২ মদনলাল ২৫ রানে ২ এবং ভেঙ্কট ১৬ রানে ৩ উইকেট)।

দ্বিতীয় নির্বাচনী খেলা

বোর্ডের সভাপতির একাদশ : ১৭৫ রান (আবিদ আলি ৪৯ পি শর্মা ২৮ পার্কার ২৫ এবং বিশ্বনাথ ২২ রান। এম অমরনাথ ৪৯ রানে ৪ গুহ ৩২ রানে ১ এবং বেদী ২৩ রানে ১ উইকেট)।

তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি একাদশ : ১৭৯ রান (৫ উইকেটে। এম দলভি ৫১ দলজিৎ সিং ৩৭ সুরীন্দর অমরনাথ ৩৩ এবং ভেঙ্কটসুন্দরম ২৫ রান। ভেঙ্কট ৩১ রানে ২ পি শর্মা ২৬ রানে ১ এবং সালগাওকার ২০ রানে ১ উইকেট)।

বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ১৪ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দল গঠন করা হয়েছে। এই নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে বিষেণ সিং বেদী এবং ভেঙ্কটরাঘবন বাদে আর কারও ইংল্যাণ্ডের মাটিতে একদিনের ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা নেই। দলের চোদ্দজন খেলোয়াড়ের মধ্যে আছেন বোম্বাইয়ের ৪ জন কর্ণাটকের ৩ জন দিল্লীর ২ জন এবং একজন করে তামিলনাড়ু বরোদা হায়দরাবাদ রাজস্থান এবং পাঞ্জাবের। দলের খেলোয়াড়দের গড় বয়স ২৭। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের বয়স ৩৭ এবং সর্বকনিষ্ঠ ব্রিজেস প্যাটেলের বয়স ২৩।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

অধিনায়ক এস ভেঙ্কটরাঘবন (তামিলনাড়ু) সহ-অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার একনাথ সোলকার ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এবং কার্ষণ ঘাবাড়ি (সকলেই বোম্বাই) জি আর বিশ্বনাথ ব্রিজেস প্যাটেল এবং এস এম এইচ কিরমানী (সকলেই কর্ণাটকের) বিষেণ সি বেদী ও মদনলাল (সকলেই দিল্লীর) অংশুমান গায়কোয়াড (বরোদা) আবিদ আলি (হায়দরাবাদ) পার্থসারথী শর্মা (রাজস্থান) এবং মহীন্দর অমরনাথ (পাঞ্জাব)।

মেয়েদের ক্রিকেট

ইডেন উদ্যানে প্রথম বার্ষিক আন্তঃ সংস্থা মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে হোয়াইট বর্ডার ক্লাব (এ) ২৮ রানে উত্তর কলকাতা মহিলা ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলকে পরাজিত করেছে। এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন ব্যাটিংয়ে শাকিলা বিশ্বাস এবং বোলিংয়ে সুমিতা রায়।

ফাইনালের সংক্ষিপ্ত স্কোর

হোয়াইট বর্ডার : ৬৯ রান (৮ উইকেটে। ২৫ ওভারে। চন্দনা মুখার্জি ৩০ রান। অমীতা সরকার ২০ রানে ২ এবং মিঠু মুখার্জি ২৩ রানে ২ উইকেট)।

উত্তর কলকাতা মহিলা এসো : ৪১ রান (শ্যামলী গাঙ্গুলী ১৫ রান। সুমিতা রায় ১০ রানে ৮ উইকেট)।

আন্তঃ জেলা ক্রিকেট

কোচবিহারে আয়োজিত আন্তঃ জেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে কোচবিহার চন্দননগর জেলা দলকে হারিয়ে ও মজুমদার ট্রফি জয়ী হয়েছে।

এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

কুয়েতে আয়োজিত সপ্তদশ এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় গতবারের যুগ্ম বিজয়ী ভারত মূল প্রতিযোগিতার নক আউট পর্যায়ে উঠতে পারে নি—লীগের ডি গ্রুপে তারা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল এ গ্রুপ থেকে ইরাণ ও ইরাক বি গ্রুপ থেকে বাহেরিন ও হংকং সি গ্রুপ থেকে কুয়েত ও চীন এবং ডি গ্রুপ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ইয়েমেন।

সেমিফাইনালে ইরাণ ৩—১ গোলে কুয়েত এবং ইরাক ১—০ গোলে উত্তর কোরিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

লীগ পর্যায়ের খেলা

এ গ্রুপ : ইরাণ ইরাক ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রুনেই।

বি গ্রুপ : বাহেরিন হংকং ফিলিপাইন বাংলাদেশ এবং সিরিয়া।

সি গ্রুপ : কুয়েত চীন জাপান সিঙ্গাপুর এবং আফগানিস্থান।

ডি গ্রুপ : কোরিয়া ইয়েমেন ব্রহ্মদেশ ভারত এবং মালেয়েশিয়া।

ফাইনাল খেলা

ইরাণ বনাম ইরাকের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য থাকায় উভয় দেশকে যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

কুক্কু ওয়ালিয়া

'বড় হয়ে আমি তোমার মত খেলার মাঠে বাঁশী বাজাবো, গোল হয়ে গেলে তুমি যেমন পি পি করে বাঁশীতে লম্বা ফুঁ দিয়ে দু হাত সামনে বাড়িয়ে মাঝ-মাঠে বল আনতে হুকুম দেবো। পিতাজী আমি তোমার মত হকির আম্পায়ার হবো।'

ছোটবেলায় ঐ আব্দার ধরে ধরে বাবাকে কি উত্যক্তই না করেছি। বাড়ীর সামনের লনে পাড়ার পার্কে হকি হোত, আমি স্টিক হাতে করে খেলতাম বটে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ইচ্ছে করতো সাদা ফুলপ্যান্ট, সাদা সার্ট সাদা জুতো মোজা পরে আম্পায়ার হতে। ইচ্ছেটা অস্বাভাবিক কিছু নয় কেননা আম্পায়ারিং যে আমার রক্তে।

হক্ কথা। আম্পায়ারিং কুক্কু ওয়ালিয়ার রক্তে কারণ কুক্কু ভারত তথা বিশ্ব-বিখ্যাত হকি আম্পায়ার ও কোচ জ্ঞান সিংয়ের পুত্র। জ্ঞান সিং কিন্তু পুত্র কুক্কু ওয়ালিয়ার শৈশব স্বপ্নে উৎসাহ দেন নি। দেন নি, বোধ হয় আম্পায়ারিং হাজারো ঝামেলার কথা বিবেচনা করেই। তিনি চেয়েছিলেন কুক্কু হকি খেলুক, বড় হকি খেলোয়াড় হোক। হকিকে অন্তর দিয়ে ভালবাসুক, যেমন ভাল বেসেছিলেন তিনি নিজে।

জ্ঞান সিংয়ের প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় নি। কুক্কু ওয়ালিয়া হকি খেলোয়াড়ই হয়েছেন, আম্পায়ার না। শুধু খেলোয়াড় বললে অন্যায় হবে নিঃসংকোচে বলতে হবে যে কুক্কু ওয়ালিয়া রীতিমত ভাল খেলোয়াড় হয়েছেন। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হকির আসরে তিনি সর্ব পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত সর্বজন স্নেহধন্য।

জন্ম দিল্লীতে। ঘরানা হকির। তাই বলাই বাহুল্য শৈশবেই কুক্কু ওয়ালিয়ার হকি খেলায় হাতেখড়ি। কিন্ডারগার্টেনের গন্ডী পার হয়ে স্কুলের অঙ্গনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হকির উৎসাহ বাড়তে থাকে কুক্কুর। কলেজে পড়ার সময় তো কথাই নেই। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় হকির আসরে তাঁর প্রথম আবির্ভাব এবং প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী পর্বে নেহরু হকির এবং ডি সি এম হকির আসরেও আজকের সার্থক, সুযোগসন্ধানী সপ্রতিভ সেন্টার ফরওয়ার্ড কুক্কু ওয়ালিয়া গুণীজনের নজর কেড়েছেন। চূড়ান্তভাবে সেন্টার ফরওয়ার্ড পজিসনে এসে দাঁড়াবার আগে জ্ঞান সিং বা অন্যান্য প্রশিক্ষকরা যে কুক্কুকে অন্য পজিসনে বাজিয়ে নেন নি, এমন নয় কিন্তু অভিজ্ঞ চোখে এটাই বারংবার ধরা পড়েছে যে, কুক্কু সেন্টার ফরওয়ার্ডেরই উপযুক্ত। গতিবেগ 'ড্যাস' বল ডিসিভিংয়ের পারদর্শিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণভাগের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে সুবিধে মত জায়গা করে নেওয়া, চলতি বলে চমকে হিট নেওয়া লম্বা 'থ্রু' পাস বাড়ানো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'স্কুপ' করে প্রতিপক্ষকে বেসামাল করে দেওয়া এবং সর্বোপরি গোল বানানো সব কিছুতেই তিনি পারঙ্গম। দম, পরিশ্রম-শক্তি অফুরন্ত প্রতাপ সুগভীর। মাঠে যখন নামেন জয়ের লক্ষ্য নিয়েই নামেন, তা সে প্রতিদ্বন্দ্বী যত নামী দামী বা শক্তিধরই হোক না কেন। অথচ ছোটখাটো ফর্সা ছিপছিপে চেহারাটি দেখে কে বলবে কুক্কুর ভেতর এত শক্তি? তাই লোকে বিশেষতঃ সমর্থকরা, গুণগ্রাহীরা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্নাতকটিকে যখন 'মিনি লোকোমোটিভ' আখ্যা দেয় তখন আশ্চর্য হই না। বছর কয়েক আগে বেটন

কাপের ফাইনালে আই এইচ এফ ব্লুর বিরুদ্ধে মোহনবাগানের খেলায় কুক্কু ওয়ালিয়ার ভূমিকাটি কি কলকাতার হকি প্রেমিকদের মন থেকে মুছে গেছে? বোধহয় না, কেননা শিখনন্দন কুক্কুই ছিলেন মাঠের সব চেয়ে বড় নায়ক। অশোককুমার, গোবিন্দ, অজিত পাল সিংয়ের মত স্বনাম খ্যাত খেলোয়াড় মাঠে থাকা সত্বেও কুক্কু ওয়ালিয়াই ছিলেন সেই সায়াহ্নে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় মোহনবাগানের একমাত্র গোলদাতা।

কুক্কু ওয়ালিয়া মোহনবাগানের সর্বোচ্চ গোলদাতা আগের মরশুমেও ছিলেন, এবারও তিনি ঐ গৌরবের অধিকারী। কুক্কু মোহনবাগানের হয়ে কলকাতায় খেলতে আসেন ১৯৭২ সালে। ৭৩, ৭৪, ১৯৭৫ সালে মোহনবাগানের লীগ জয়ের পেছনে তাঁর ভূমিকা সম্ভবতঃ সব চেয়ে উজ্জ্বল। সম্ভবতঃ অনন্য ঐ ভূমিকার ঐ স্বীকৃতির উদ্দেশ্যেই পশ্চিম বহু ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী (দিল্লী) ১৯৭৩ সালে কুক্কু ওয়ালিয়াকে বছরের সেরা হকি খেলোয়াড়রূপে চিহ্নিত করে অতীন্দ্রনাথ দে স্মৃতি ট্রফি উপহার দেন।

কুক্কুর নিজের মুখেই ওঁর নিজের কথা শুনেছিলাম সেদিন মোহনবাগান ক্লাবের ইলিয়ট রোডের মেসে বসে বসে। বুকের মধ্যে এখন কুক্কুর অনেক আশা অনেক স্বপ্ন। আরও ভাল খেলতে হবে জাতীয় দলের একজন হতে হবে। দিল্লী বা বাংলার হয়ে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসরে বহুবার খেলা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে সর্ব ভরতীয় দলে খেলতে চাই। এ স্বপ্ন শুধু আমার নয়, আমার পরমারাধ্য পিতারও।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

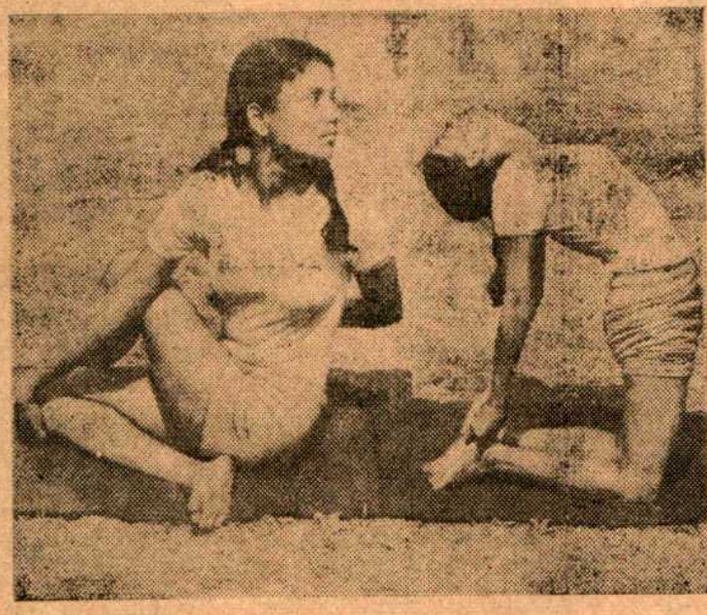

যোগব্যায়ামে শীর্ষাসীনা তাপসী ঘোষ

খেলার জগতে মেয়ে

তাপস ঘোষ মূলতঃ এথলেটিক ক্রীড়াতেই মনোনিবেশ করেছিল। প্রশিক্ষক বিজয় চক্রবর্তীর কাছে স্বল্পপাল্লার দৌড়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিত। আস্তে আস্তে স্কুলের ক্রীড়ায় নাম করছিল। এমন সময় ১৯৬৮ সালে কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে ও একেবারে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়ে। দৌড়ঝাঁপ তো দূরের কথা, চলাফেরা করা পর্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সে সময় প্রশিক্ষক শ্রীচক্রবর্তীই ওকে যোগব্যায়াম করার উপদেশ দেন, এবং ৭।৮ মাসেই আবার ও সুস্থ সবল হয়ে উঠবে বলে আশ্বাস দেন। তাপসী বলে, ওঁর উপদেশ মত আমি মহিলা যোগব্যায়াম কেন্দ্রের সভ্যা হয়ে নিয়মিত যোগব্যায়াম চর্চা করতে থাকি। ফলে মাত্র তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি। এতেই যোগব্যায়ামের ওপর আমার গভীর আস্থা জাগে। তাই যোগব্যায়ামকেই আমার প্রধান ক্রীড়াচর্চায় পরিণত করি। তবে এই সঙ্গে এথলেটিকসও চালিয়ে যাচ্ছি। এ বছরও রামমোহন কলেজে (প্রাতঃ বিভাগ) একশ দশ মিটার দৌড়ে প্রথম হই। আর রিলেতেও আমাদের দলই প্রথম হয়। ৭৩-৭৪-এ আন্তঃ কলেজ যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় আমি চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছি। এবছর রাজ্য যোগব্যায়াম আসরে আমি বিজয়িনীর ট্রফি জয় করেছি। আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতা এখনও হয়নি।

সুন্দর রৌপ্যাধার ও পদক দেখিয়ে তাপসী বলল, যোগব্যায়াম করি বলেই আমার কোন সময়ে কোন কাজেই ক্লান্তি বোধ হয় না। তাপসী যোগব্যায়াম প্রদর্শনীতে নামে, তাছাড়া বিভিন্ন মহিলা যোগব্যায়াম কেন্দ্রে গিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণও দেয়।

মা বাবা-হারা এই মেয়েটির অভিভাবক হচ্ছেন এর কাকা শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ। এরা তিন বোন ও এক ভাই। দু বোন বিবাহিতা। ১৯৬৯-এ বাবা ও '৭০-এ তাপসীর মা মারা যান। তাপসী বলে খেলাধুলায় আমার বাবার কিছু কিছু উৎসাহ থাকলেও মা একেবারেই এর পক্ষপাতী ছিলেন না। কাকা আমার খেলাধুলা, বিশেষ করে যোগব্যায়াম ও লেখাপড়ায় খুবই উৎসাহ দেন। আমি ক্রিকেটও প্র্যাকটিস করতাম। কিন্তু পড়াশোনার চাপ বেড়ে যাওয়ায় ক্রিকেট প্র্যাকটিশ বন্ধ রেখেছি।

তাপসী নাচ-গানের চর্চাও করে। অন্ধদের সাহায্যের জন্য ব্লাইন্ড পারসন এসো-

সিয়েন নামে একটি সংগঠনের নৃত্য-গীত প্রদর্শনীর কাজেও সাহায্য করে। তাছাড়া সামরিক কুচকাওয়াজে যোগ্যতার প্রশংসাপত্রও লাভ করেছে তাপসী।

তাপসী বলে—'এত রকম ব্যাপারে যোগ দিতে পারছি, প্রধানতঃ যোগব্যায়াম করে সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হওয়ার জন্যই। আমাদের দেশের এই ব্যায়ামটি যে কতখানি উপকারী তা বলে শেষ করা যায় না।

প্রসঙ্গতঃ বলি, মহিলা যোগব্যায়াম কেন্দ্রের সম্পাদিকা কুশলা দাসের সঙ্গেও লেডিস পার্কে কেন্দ্রের অফিসে গিয়ে দেখা করেছিলাম ও'র কাছে যোগব্যায়াম কেন্দ্র স্থাপন ও তার কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেল। প্রথমে '৬৫ সালে উলুবেড়িয়াতে এই মহিলা যোগব্যায়াম কেন্দ্রের পত্তন করা হয়, তারপর '৬৭তে এ'রা কলকাতায় কেন্দ্র স্থাপন করেন মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে যোগব্যায়াম চর্চা প্রচার উদ্দেশ্যে। দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র ষ্টেডিয়ামে ৭০-৭১-এ একটি শাখা খোলা হয়েছে। তাছাড়া আর একটি হয়েছে দেশবন্ধু পার্কে। এদের সভ্যা সংখ্যা পঁচিশ ছাড়িয়ে গেছে। এরা সরকার ও পৌর কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য কিছু কিছু পেয়েছেন। বস্তুতঃ যোগব্যায়াম শুধু খেলা বা শরীর চর্চাতেই শেষ নয়। এর আর এক মস্ত দিক হল শরীরের নানা রোগ সারিয়ে দেওয়া। ডায়বেটিস রক্তচাপ, টনসিল, নানারকম পেটের রোগ এমন কি একটি ক্ষেত্রে এক প্রখ্যাত ক্রীড়া-কর্মকর্তার আত্মীয়ার মস্তিষ্ক বিকৃতি পর্যন্ত এ'রা যোগব্যায়াম করিয়ে সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে দিয়েছেন। তবে, কোন রোগের ক্ষেত্রে কি কি আসন করতে হবে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের কাছ থেকে সে বিষয়ে উপদেশ নিতে হয় এবং নিয়মিত চর্চা করা দরকার বলে শ্রীমতী দাস জানালেন। উনি বললেন, সংক্রামক ছাড়া শরীরের অন্য সব ব্যাধিই যোগব্যায়ামে সারানো যায়।

তাপসীও বলে, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই যোগব্যায়াম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর সঙ্গে একটা ধর্মীয় নিষ্ঠার প্রভাবও জড়িয়ে আছে, তাই আমার ইচ্ছা বাংলাদেশের মা-বোনেদের মধ্যে যোগব্যায়াম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করি। জানেন তো আমাদের দেশের মেয়েদের শরীর-স্বাস্থ্য নানা কারণে সুস্থ-সবল নয়। অথচ শক্ত-সামর্থ্য সন্তান না হলে দেশ শক্তিশালী হবে কেমন করে? আর মা যদি সুস্থ-সবল না হয়, তাহলে তার সন্তান কি করে সুস্থ হবে? আমাদের এখানকার অনেক সভ্যা তাই মেয়েদের স্কুলে গিয়ে যোগব্যায়াম শিখিয়ে আসে।

তাপসী বলে, সারা দেশে স্বাস্থ্য চর্চার অঙ্গ হিসাবে যদি যোগব্যায়াম কেন্দ্র গ্রামে গ্রামে বসানো যায়, তাহলে শহর থেকে দূরে গন্ডগ্রামের মা বোনেরাও যোগব্যায়াম চর্চার সুযোগ পাবে এবং এতে করে একটা প্রকৃত সুস্থ সবল উজ্জ্বলকান্তি জাতি তৈরী হবে।

—যোগব্যায়ামে শরীরের গঠন কঠিন হয়ে যায় না?

—না, না ঠিক উল্টো। এর দ্বারা শরীরের উপরের পেশী তো বটেই অন্তরঙ্গের পেশীগুলিও নমনীয় এবং সবল হয়ে দেহের ভিতরকার রোগ তাড়ায়। জানেন বোধ হয় মানুষের শরীরের ভেতরে ফুসফুস নাড়িভুঁড়ি (অন্ত্র) যকৃত রক্তবহা নাড়ি এবং মস্তিষ্কের গঠনে বহু ধরনের পেশী রয়েছে। এইসব পেশীর নিয়মিত ব্যায়াম করাতে পারলে ওগুলিতে রক্ত চলাচল সুষ্ঠু হয় এবং পেশীগুলিও নমনীয় সবলও মজবুত হয়ে ওঠে। অন্যসব ব্যায়ামে শরীরের বহিরঙ্গের পেশীর উপকার হয়, কিন্তু তার ফল অভ্যন্তরের পেশীর ওপর পড়ে না। কিন্তু যোগব্যায়ামে এই কাজটি হয়। প্রাচীনকালে মুনি ঋষিদের হাজার বছর আয়ু সম্পর্কে যেসব কথা শোনা যায়, তার কাল্পনিক অংশ বাদ দিয়ে বলা যায় যোগব্যায়াম সঠিক পন্থায় হলে মানুষের পক্ষে শতায়ু হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। অনেকে বলেন, আমাদের খাদ্যবস্তু যথেষ্ট নয়। কিন্তু যা কিছু আমরা খাই তা-ও তো ঠিকমত হজম করা হয় না। যোগব্যায়ামের ফলে গৃহীত খাদ্যবস্তুর পুষ্টিকর অংশটা যথাযথভাবে শরীরে নেওয়া যায়, তাই শরীর অমন সুস্থ থাকে। তাপসী বলে, আমি যোগব্যায়াম চর্চা করতে করতে প্রত্যক্ষভাবে এটা বুঝেছি। যোগাসন করলে শরীরের শ্রী এবং লাবণ্যও বাড়ে।

—বিবাহিতা মহিলারাও কি যোগব্যায়াম করেন?

—করেন মানে? ১৯৭৩-এ প্রথমবারের রাজ্য যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে বড়দের গ্রুপে যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সেই শান্তি অধিকারী তখন দু সন্তানের জননী। দ্বিতীয় বছর (৭৪-এ)ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন তিন সন্তানের জননী লক্ষ্মী দেবী।

তাপসী বলে, আমার খেলাধুলার কথা বলতে গিয়ে কেবল যোগব্যায়ামের কার্যকারিতার বিবরণই দিলাম। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, এমন একটা ব্যায়ামের কথা সবার—বিশেষ করে আমাদের মেয়েদের অজানা থাকে—এটা আমার মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। ধনীদের মেয়েরা অতিআহারে মেদবহুল হচ্ছেন, আর গরীব, মধ্যবিত্তরা হচ্ছে অসুস্থ চিররুগ্ন।

কিছু পরে তাপসী ওদের কেন্দ্রের দলীয় পোশাক হলদে গেঞ্জী ও লাল হাফপ্যান্ট পরে মাঠে এসে কয়েকটি আসন করে দেখাল। সুষ্ঠু সাবলীল এই আসনগুলির ছবি নিলেন আমাদের ফটোগ্রাফার সুকুমার রায় (খ্যাতিমান আলোকচিত্রশিল্পী হিসেবে যিনি বিশেষভাবে পরিচিত)। আসনগুলি হল :—১) অর্ধ মৎস্যেন্দ্রাসন, ২) ভদ্রাসন, ৩) গড়ুরাসন, ৪) উত্থিত পদ্মাসন ৫) উষ্ট্রাসন আর ৬) ধনুরাসন।

তাপসীর কাছ থেকে খেলাধুলার কথার সঙ্গে নতুন বিষয় জানা গেল—সত্যিই আমাদের সব মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারেই ছেলেমেয়েরা যা হোক করে পড়াশোনা করে স্কুল-কলেজে যায়, মেয়েদের অনেকে আজকাল অর্থনৈতিক কারণে ছেলেদের মত চাকরী-বাকরীও করছে, কিন্তু এরা ব্যায়াম করার কোনো সময়ই পায় না। অথচ এই সব মেয়েরও শরীর, সুস্থ সবল কর্মঠ রাখার জন্য দৈনিক কিছু সময় অঙ্গচালনা করা একান্তভাবেই দরকার। খালি হাতে ব্যায়ামের সঙ্গে ৪।৫টি যোগব্যায়াম করলেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয়ে শরীর মজবুত ও সক্ষম থাকতে পারে। এ-বিষয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামান না কেন, একথা ভাবতে ভাবতে বিদায় নিই লেডিস পার্ক থেকে।

অময়

দেশবিদেশের খেলা

কিংবদন্তীর নায়ক

ব্রাডম্যান

কালের চালচিত্রে চিত্রিত অধিকাংশ ছবি ম্লান বিবর্ণ হয়ে হারিয়ে যায় একদিন অজ্ঞাতেই। আর কিছু মুখ স্বকীয় কীর্তিতে চির সমুজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকে কালের ইতিহাসে। স্যর ডোনাল্ড ব্রাডম্যান এমনই একটি কালোত্তীর্ণ নাম। যার উজ্জ্বল ক্রীড়াদীপ্তির বিচ্ছুরিত আলোক-শিখা অনেককাল পেরিয়েও এখনও আমাদের কাছে জ্বলজ্বলে। যার অনেক রেকর্ড এখনও অম্লান।

ক্রিকেটের মহানায়ক ডোনাল্ড ব্রাডম্যানকে ঘিরে এমন অনেক গল্প ও কাহিনী আছে যে তাঁকে অনায়াসে লিজেন্ডারী চরিত্ররূপে আখ্যায়িত করা যায়। একবার অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের দীর্ঘকালের খ্যাতনামা সদস্য—জ্যাক রাইডারকে প্রশ্ন করা হয় হেয়াট সর্ট অফ ব্যাটসম্যান ওয়াজ ডন ব্রাডম্যান রাইডার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে কঠিন প্রশ্নের জবাবে বললেন—ওয়েল অল আই ক্যান সে ইজ দ্যাট হি জাস্ট বেল্টস দি হেল আউট অফ এভরি বল।

ক্রিকেটের ইতিহাসে ডন ব্রাডম্যান চিরন্তন নায়ক। সর্বকালের সেরা। একটি ইতিহাস বললেও অত্যুক্তি হয় না।

১৯৪৮ সালে ওভালে ইংলন্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে পঞ্চম টেস্টের খেলা চলছে। অস্ট্রেলিয়া স্বচ্ছন্দে এ্যাসেস ছিনিয়ে নিয়েছে ব্রাডম্যানের নেতৃত্বে। জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে গেলেও অনুরাগী দর্শকবৃন্দ কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে ব্রাডম্যানের ব্যাটের দিকে। কারণ ব্রাডম্যান তখনও উইকেটে এবং সারা মাঠ তার নয়নাভিরাম চিত্তাকর্ষক খেলা উপভোগ করছে। আর অপেক্ষা করছে ইপ্সিত সেঞ্চুরীর জন্যে। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত লেগব্রেক ও গুগলী বোলার এরিখ হোলিস বল করতে সুরু করেন। দ্বিতীয় গুগলী বলটিকে পা বাড়িয়ে খেলতে গিয়ে ব্রাডম্যান বোল্ড আউট হয়ে যান। সারা মাঠ বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেটারের ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়ে। পরের দিন সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থানলাভ করে ব্রাডম্যানের ব্যর্থতা। কারণ এইভাবে শত রান ছাড়া আউট হয়ে যাওয়া ব্রাডম্যানের জীবনে কতকটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলা যায়। তাই ব্রাডম্যান শত রানের পূর্বে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলে সেটাই হত মুখ্য সংবাদ।

জিজ্ঞাসা করা হলে ব্রাডম্যান বলেন—মনের একাগ্রতা আমার সাফল্যের মূল রহস্য। এটি আমার ক্রিকেটজীবনের শেষ টেস্ট খেলা। ক্রীড়ামোদীদের উষ্ণ সম্বর্ধনায় আমি স্বভাবতঃই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। বিক্ষিপ্ত অশান্তি মনকে খেলার দিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। এই আউট তারই ফলশ্রুতি।

খেলার শেষে ইংলন্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে এসে ব্রাডম্যান ক্রিকেট নির্বাচক-মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন এবং ক্রীড়া সাংবাদিকতা সুরু করেন।

বোরাল নামে অস্ট্রেলিয়ার এক অতি নগণ্য গ্রাম্য শহরে ব্রাডম্যানের জন্ম। স্কুল-জীবন কেটেছে বাড়ীর দেওয়ালে বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। পড়াশুনায় সামান্য মেধাও ছিল না। ক্রিকেটের মহানায়ক না হলে ব্রাডম্যানকে বোরাল-এর বাইরে কেউই কোনদিন চিনত না।

স্থানীয় একটি ছোট ক্লাবে ব্রাডম্যানের ক্রিকেটজীবনের হাতেখড়ি। স্বল্পকালের মধ্যে ক্রীড়াখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে নিউ সাউথ ওয়েলস ক্লাব ব্রাডম্যানকে দলে টানেন। অনতিকাল পরে মাত্র আঠার বছর বয়সে ১৯২৮ সালে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলে খেলার জন্যে ব্রাডম্যানের ডাক পড়ে। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে এই খেলায় ব্রাডম্যান প্রথম ইনিংসে ১৮ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১ রান করেন। অনুল্লেখনীয় ফলাফলের জন্যে পরের টেস্টে ব্রাডম্যানকে স্বাদশ খেলোয়াড়রূপে রাখা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে পনসফোর্ড আহত হওয়ায় মেলবোর্ণের তৃতীয় টেস্টে ব্রাডম্যানকে ব্যাট ধরতে হয়। দ্বিতীয় সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে ব্রাডম্যান প্রথম ইনিংসে ৭৯ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১১২ রান করে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলে নিজের আসন পাকা করে নেন। ব্রাডম্যানের জীবনের পরের ঘটনা ক্রিকেটের পুরনো নজীরগুলোকে মুছে দিয়ে একে একে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ার ইতিহাস। এখানে কেবল দুশ ও ততোধিক রানের পরিসংখ্যানটি তুলে ধরছি।

১৯২৮-২৯ নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম ভিকটোরিয়া (সিডনী) ৩৪০ অপরাজিত

১৯২৯-৩০ উডফুলস একাদশ বনাম রাইডারস একাদশ (সিডনী) ২২৮

১৯২৯-৩০ নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম কুইন্সল্যান্ড (সিডনী) ৪৫২ অপরাজিত

১৯৩০ অস্ট্রেলিয়ান্স বনাম ওরসেস্ট-সায়ার (ওরসেস্টার) ২৩৬

১৯৩০ অস্ট্রেলিয়ান্স বনাম শারে (ওভাল) ২৫২ অপরাজিত

১৯৩০ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড (লর্ডস) ২৫৪

১৯৩০ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড (লীডস) ৩৩৪

১৯৩০ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড (ওভাল) ২৩২

১৯৩০ অস্ট্রেলিয়ান্স বনাম কেন্ট (ক্যান্টারবারি) ২০৫ অপরাজিত

১৯৩০-৩১ নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম অস্ট্রেলিয়া (এডিলেড) ২৫৮

১৯৩০-৩১ নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (ব্রিসবেন) ২২৩

১৯৩০-৩১ নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম ভিকটোরিয়া (সিডনী) ২২০

১৯৩১-৩২ অস্ট্রেলিয়া বনাম সাউথ আফ্রিকা (ব্রিসবেন) ২২৬

১৯৩১-৩২ নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম আফ্রিকান্স (সিডনী) ২১৯

১৯৩১-৩২ অস্ট্রেলিয়া বনাম সাউথ আফ্রিকা (এডিলেড) ২৯৯ অপরাজিত

১৯৩২-৩৩ নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম ভিকটোরিয়া (সিডনী) ২৩৮

১৯৩৩-৩৪ নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম কুইন্সল্যান্ড (ব্রিসবেন) ২০০

১৯৩৩-৩৪ নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম কুইন্সল্যান্ড (সিডনী) ২৫৩

১৯৩৪ অস্ট্রেলিয়ান্স বনাম ওরসেস্টার-শায়ার (ওরসেস্টার) ২০৬

১৯৩৪ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড (লীডস) ৩০৪

১৯৩৪ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড (ওভাল) ২৪৪

১৯৩৫-৩৬ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড (এডিলেড) ২৩৩

১৯৩৫-৩৬ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম ভিকটোরিয়া (মেলবোর্ণ) ৩৫৭

১৯৩৫-৩৬ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম টাসমানিয়া (এডিলেড) ৩৬৯

১৯৩৬-৩৭ ব্রাডম্যান একাদশ বনাম রিচার্ডসন একাদশ (সিডনী) ২১২

১৯৩৬-৩৭ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড (মেলবোর্ণ) ২৭০

১৯৩৬-৩৭ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড (এডিলেড) ২১২

১৯৩৭-৩৮ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম কুইন্সল্যান্ড (এডিলেড) ২৪৬

১৯৩৮ অস্ট্রেলিয়া বনাম ওরসেস্টশায়ার (ওরসেস্টার) ২৫৮

১৯৩৮ অস্ট্রেলিয়ান্স বনাম এম সি সি (লর্ডস) ২৭৮

১৯৩৮ অস্ট্রেলিয়ান্স বনাম সমারসেট (তউনটন) ২০২

১৯৩৮-৩৯ অস্ট্রেলিয়া বনাম কুইন্স-ল্যান্ড (এডিলেড) ২২৫

১৯৩৯-৪০ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস (এডিলেড) ২৫১ অপরাজিত

১৯৩৯-৪০ অস্ট্রেলিয়া বনাম ভিকটো-রিয়া (মেলবোর্ণ) ২৬৭

১৯৩৯-৪০ সাউথ অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া (পার্থ) ২০৯ অপরাজিত

১৯৪৬-৪৭ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড (সিডনী) ২৩৪

১৯৪৭-৪৮ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইণ্ডিয়া (এডিলেড) ২০১

একবার সেফিল্ড শীল্ডের এক ম্যাচে রসিক ব্যাটসম্যান ক্রীজ ছেড়ে গিয়ে উইকেটরক্ষককে বললেন—পরের বল যেমনই আসুক না কেন আমি তোমার মাথার ওপর দিয়ে স্ট্রেট বাউণ্ডারী মারব। যেমন কথা তেমন কাজ। পরের বল উইকেটরক্ষকের মাথা ডিঙিয়ে সোজা চার।

১৯৩০ সালে ইংল্যান্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলে খেলতে এসে ব্রাডম্যান তার ক্রিকেট দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন স্বর্ণাক্ষরে। ওরসেস্টার-এর সঙ্গে প্রথম খেলায় রান করেন ২৩৬। প্রথম টেস্টে ১৩১ এবং ঐ সিরিজে পর্যায়ক্রমে ব্রাড-ম্যানের রান সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩৬, ১৮৫, ৭৮, ৯, ১৮ (অপরাজিত); ৬৬, ৪, ৪৪, ২৫ ২; ৩২ এবং ১৯১।

পুরনো নজীরগুলো শীতের শুষ্ক-পত্রের মত হারিয়ে যায় ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের সৃষ্টিশীল অভিনব মারের চাতুর্যে। ষ্টাইল-এর দিক থেকে তাঁর খেলা রসিকের কাছে ততটা ভাল লাগেনি কতটা মনে দাগ কেটে যায় তাঁর অর্পিত হেঁয়ালী খেয়ালী মনমাতানো মারের বৈচিত্র্যে। অনেক সময় ক্রিকেটের প্রথাগত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে তিনি এমনভাবে খেলতেন যা লোকচক্ষে খারাপ লাগলেও হাসির খোরাক হত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রাডম্যানকে জ্যাক হবস ফ্রাঙ্ক উলী ও রঞ্জিৎ সিংজীর সমধর্ম বলা যায়। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ৪৫২, লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী এবং উপর্যুপরি ছয়টি সেঞ্চুরী ক্রিকেটার ব্রাডম্যানের জীবনের কয়েকটি উল্লেখনীয় নজীর। প্রসঙ্গতঃ বলা ভাল শেষের রেকর্ডের (উপর্যুপরি ৬টি সেঞ্চুরী) অধিকারী একমাত্র সি বি ফ্রাই।

১৯৩০ সালের টেস্টে ব্রাডম্যান ১৩১ ও ২৫৪ রান করেন লর্ডসে এবং ২৩২ রান করেন ওভালে। ইংল্যান্ডের প্রচণ্ড ক্ষুরধার আক্রমণ নিষ্ফল হয়ে যায় একমাত্র ব্রাড-ম্যানের শক্তিশালী ব্যাটিং নৈপুণ্যে।

ডোনাল্ড ব্রাডম্যান ছিলেন বোলারের কাছে দুঃস্বপ্নের মত। কারণ তিনি নৃশংস হত্যাকারীর মত বোলারের সব চেষ্টাকে নির্মম আঘাতে ভেঙ্গে দুমড়ে দিতেন। এই চৌকস ক্রিকেটারকে বাগে আনবার জন্যে ভীত ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ ১৯৩২-৩৩ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংলণ্ডে দলে ডগলাস জার্ডিনকে অধিনায়ক নির্বাচিত করেন। শান্ত মেজাজের দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ডগলাস একদিকে যেমন ভয়ঙ্কর অন্যদিকে তেমনই বুদ্ধিদীপ্ত।

জার্ডিন-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেন-তেনপ্রকারেন ব্রাডম্যানকে রান তুলতে না দেওয়া ও সর্বোপরি আউট করা। তিনি বোলারদের সেইভাবে নির্দেশ দিয়ে বললেন প্রয়োজনবোধে দেহ লক্ষ্য করে বল দিয়ে ব্রাডম্যানকে আহত করতে। হ্যারল্ড লারউড বিল বোস, গার্নি এলেন প্রচণ্ড ঠুকে বাউনসার বলের আক্রমণে অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ারদের মনে গভীর ভীতি সঞ্চার করেন। খেলার পরিবর্তে ব্যাটসম্যানেরা দেহ বাঁচাতে ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতেও সিরিজে ব্রাডম্যানের রান ছিল ০, ১০৩ (অপরাজিত), ৮, ৬৬, ৭৬; ২৪; ৪৮ ও ৭১।

ক্রিকেট ইতিহাসে ব্রাডম্যানের বহু রেকর্ড বহু কীর্তি রয়েছে, যা সবিস্তারে এই স্বল্প পরিসরে প্রকাশ করা অসম্ভব। চাঞ্চল্যকর দু একটি দ্রুততম সেঞ্চুরী ৩ ওভারে (আট বলে ওভার)। একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলায় লিথগো ক্লাবের বিরুদ্ধে ২৫৬ রান করেন। তার মধ্যে এক সময় তিন ওভারে রান ছিল ১০২ (দশটি ৬ ও নয়টি ৪ সহ)। এই সেঞ্চুরী করতে সময় লেগে-ছিল ১৮ মিনিটের মত। এর আগে এই সময়ের মধ্যে ১৯১০ সালে লরি কুইনল্যান সেঞ্চুরী করেছিলেন।

শেফিল্ড শীল্ডে ব্রাডম্যানের রান (১৪৪৮) ছিল সর্বাধিক। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ব্যারি রিচার্ডস ১৮৫০ রান করে ঐ নজীরকে অতিক্রম করেন। আর ব্রাডম্যানের এক মরশুমে সর্বাধিক রানের অঙ্ক হল ১৯২৮-২৯ সালে ১৬৯৩ রান। ১৯৪৮ সালে ওভালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ব্রাডম্যান টেস্ট খেলে অবসর গ্রহণ করেন।

চিরন্তন নায়ক ডন ব্রাডম্যানের ক্রীড়া-প্রতিভাকে শব্দের বিশেষণে সম্যকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ ক্রিকেটের ইতিহাসে ব্রাডম্যান অদ্বিতীয়।

সিনেমাটিক

যাই হোক, ধুমধামের সংগে তো অনাদি বাঁড়ুজ্যে আর প্রভাত দাসের ছবির শুটিং আরম্ভ হল। আমার ওপর ওদের গোড়া-গুড়ি কেমন যেন একটা দুর্বলতা ছিল, আমাকে ওরা ছাড়ল না, ওদের ছবির সংগে কায়দা করে যুক্ত করে নিল ছবির অন্যতম সহকারী পরিচালক হিসাবে। তাবড় সব শিল্পীরা ছবিতে অভিনয় করতে লাগলেন। তখন অনাদি আর প্রভাতের সে কি হেঁকড়; তাদের এতদিনের স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে এ আনন্দ কি আর সহজে চেপে রাখা যায়? সংগে সংগে কিছু লোক লোট হয়ে গেল। তারা হাউমাউ করতে অনাদি তাদের সাফ বলে দিল দেখ আমরা এখন থেকে প্রোডিউস্যার, ফালতু নই, এটু-সাটু চোট-চাট না দিলে ধম্মো বজায় থাকে কি করে?

মনে আছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে ছবির বিরাট সেট লেগেছিল। ঘোরতর বর্ষাকাল তখন। ছবির ডিস্ট্রিবিউটার ওদের বলে দিয়েছেন মশাই, বর্ষার মধ্যে যদি ছবি শেষ করে দিতে পারেন তাহলে শীতকালে আমি এ-ছবি রিলিজ করে দিতে পারব। ভাল সিজিন মানুষের মনে তখন ফুর্তি থাকে দেদার, আপনারা অল্প দিনের মধ্যে পয়সা লাভ সমেত ফেরৎ পেয়ে যাবেন অবশ্য—

—অবশ্য।

—মানে আপনাদের ছবি যদি ভাল চলে—

—চলবে না মানে, পয়সা খর্চা করছি কি লোকসান দেবার জন্যে? আলবৎ চলবে—অনাদির দৃঢ় বক্তব্য।

বর্ষার সময় স্টুডিওতে শুটিং করা দায়। কারণ ফ্লোরের ছাতে জল পড়লে বড় আওয়াজ হয়। তখন সাউন্ড টেক্ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর হলোও তাই। দু'দিন যেতে না যেতেই সাউন্ড রেকর্ডিস্ট আপত্তি করলেন—ও অনাদি, এ-যে কিছুতেই টেক্ করা যাচ্ছে না—একটা উপায় বের কর।

সাউন্ড শুটিং-এ বিঘ্ন হলে সব বন্ধ করে বসে থাকতে হয়, ফলে প্রযোজকের সমূহ ক্ষতি। অনাদি আর প্রভাতের মুখ শুকিয়ে আমসি—একি কান্ড ভাই, আমাদের টাকার ছেরাদ্দ হবে আর ওরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে?

প্রভাত দাস বলে—সে আর কি করা যাবে বল? বৃষ্টি-বাদলার ওপর তো আমাদের কোন হাত নেই, যতক্ষণ না থামছে ততক্ষণ এইভাবে মার খেতে হবে।

—হুঁম! মানে—বুঝলাম।

অনাদি আর প্রভাত মাথা খাটিয়ে কিছুতেই এমন একটা পন্থা বের করতে পারল না যাতে করে টেকনিশিয়ান বা আর্টিষ্টদের এই বৃষ্টির দরুন পয়সা না দিয়ে কাজ করান যায়। ওরা প্রথমে ম্যানেজ করবার চেষ্টা করেছিল পাহাড়ী সান্যালকে। তিনি তো এমনিতে ক্ষ্যাপাটে ধরনের মানুষ, ওরা ওঁর পারিশ্রমিক থেকে কিছু ছেঁটে দেবার মতলবে আছে শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ মেকআপ খুলতে উদ্যোগী হলেন—না ভাই, মাগনায় আমি অ্যাকটিং করতে পারব না—

অনাদি যত বোঝায়, আরে দাদা মাগনায় নয় মাগনায় নয়, বিস্টি বিস্টি—পাহাড়ীদা তত চেঁচান—বিস্টি তো আমার কি? বিস্টি তোদের। জানিস আজ স্টুডিওয় আসতে আমার দু-গ্যালন পেট্রল ফালতু পুড়েছে: যেদিকে যাই জলে থৈ থৈ, শেষে যাদবপুর দিয়ে ঘুরে তবে এসেছি। এখন এই দু-গ্যালনের দাম দেবে তোমরা—

পাহাড়ীদার বেঁটে খাটো খেঁকুড়ে গাড়িটা দেখলেই অনাদি চটত—এঃ, এলেন যেন প্রিন্স চারশো ছত্রিশ রকমের আওয়াজ বের করতে করতে, যেমন বিটকেল দেখতে তেমন কুচ্ছিত ব্যাভার গাড়িটার। আর ওই গাড়িটা ছিল পাহাড়ী সান্যালের প্রাণ। গাড়ি নিয়ে কেউ কোন বাজে মন্তব্য করলে পাহাড়ীদার মাথায় যেন খুন চেপে যেত।

ওরা অতএব রণে ভংগ দিল।

আক্ষেপে একখানা হয়ে অনাদি বলল—বুঝলি প্রভাত, এই জন্যে বায়োস্কোপের লাইনের কোন উন্নতি হয় না। তিন দিন শুটিং হয় নি আমাদের, এক কাঁড়ি টাকা নষ্ট, শুনে কোথায় সবাই এটু সহানুভূতি দেখাবে তা-নয় উল্টে দু-গ্যালনের জন্যে ক্যাশ চাইছে! ভাবছি ছেড়ে দেব এই হতচ্ছাড়া লাইন—

তারপর ছবি যখন বাস্তবিক শেষ হল তখন ওদের জিভ বেরিয়ে এসেছে স্বপ্ন-টপ্ন সব ধূলিসাৎ। তখন মুখে ওদের একটাই ডায়লাগ—ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি.....

তারপর একটা শুভক্ষণ দেখে ছবি রিলিজ হলো।

রিলিজের দিন পরিচালক বললেন, যাবে নাকি হাউসে?

—চলুন।

বেলা দুটো নাগাদ আমরা অর্থাৎ পরিচালক এবং তাঁর দুজন সহকারী এসে দাঁড়ালাম ভারতী সিনেমার উল্টো দিকের ফুটপাতে, গীত-বিতান স্কুলটা ঘেঁসে। পরিচালকের সংগে ছবির শেষের দিকে অনাদি-প্রভাতের সম্পর্কটা কিঞ্চিৎ তেতো হয়ে পড়েছিল, তাই পরিচালক আর হাউসের লবি-তে এক চান্সে যেতে রাজী হলেন না। বললেন ফার্স্ট-শো'র রিপোর্ট নিয়ে তবে যাবেন। আমি অবশ্য ধরে নিয়েছিলাম ছবি খুব ভাল চলবে না। অনাদি আর প্রভাতের-ও সেই এক ধারণা। এই হাসির ছবিতে এক হাসি ছাড়া নাকি সব আছে—এই হচ্ছে ওদের নিজেদের ছবি সম্পর্কে মন্তব্য। তখন সবাই বুঝিয়ে বলেছে—আহা চিন্তা করছ কেন, রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত কোন ছবির কি হয় তা আগে থেকে বলা শক্ত—

হাউস তো প্রচন্ড রকম 'ফুল'। ছবির উদ্বোধনী শো, ভাল ভাল সব আর্টিস্ট এবং ব্লেল-ব্যাক সিংগার, কিছু টিকিট তো ফটাফট ব্ল্যাক-ই হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে। দেখে পরিচালক খুব খুশী। চোখ নাচিয়ে ইঙ্গিতে বললেন—কি হে ছোকরা, কেমন বুঝছ?

বললাম—দাদা ঠিক সাড়ে পাঁচটায় সব বোঝা যাবে—

পরিচালক অপ্রস্তুত ভংগীতে দ্রুত বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো ঠিক কথা—

অনাদি আর প্রভাত আগে থেকেই দুখানা ফ্রন্ট স্টলের মানে দশ আনার সিটের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ওরা ফ্রন্ট স্টলে টিকিট কেটে বসে ছবি দেখবে শুনে হাউসের স্টাফেরা তো অবাক—এ কি রকম প্রোডিউস্যার ছবি দেখছে তাও ফ্রন্ট স্টলে বসে?

প্রভাতের মিচকি মিচকি হাসি—হ্যাঁ দাদা ওই ফ্রন্ট স্টলের লোক যদি ছবি দেখে ভাল বলে তো বুঝবো আমাদের ছবি চলবে আর ওরা যদি অপছন্দ করে তো ছবি আমার থান ইঁটের মত ফ্লপ। সেই জন্যে ওদের সংগে বসেই আমরা ছবি দেখব।

জয়শ্রী রায়

কিছুক্ষণ

এবারে আর গড়িয়াহাটের বাড়ীতে নয় জয়শ্রীর সংগে দেখা করার জন্য যেতে হয়েছিল পার্ক সার্কাসের নর্থ রেঞ্জে। ওখানে ও'র বাপের বাড়ী। স্বামীর সংগে মতবিরোধের জন্য আপাততঃ উনি ওখানেই আছেন, থাকবেনও কিছুদিন। কতদিন অবশ্য জানি না।

বাড়ীটা খুঁজে পেতে ভেবেছিলাম খুব ভোগান্তি হবে তা হয়নি, সেটা অবশ্য পুষিয়ে দিয়েছেন জয়শ্রী নিজেই। দোষটা অবশ্য ও'র নয়। গলব্লাডারে একস-রে করার জন্য গিয়েছিলেন একস-রে ক্লিনিকে।

সাড়ে ন'টা থেকে এগারটা অবধি বসবার ঘরটায় বসে স্টেটসম্যান কাগজটার বিজ্ঞাপন সমেত আগাপাস্তলা পড়া শেষ করার পর এলেন জয়শ্রীর বাবা। বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন খবরের কাগজ সব সময়ের পক্ষে যথার্থ সংগী নয়।

কথাটা সত্যিই। উনি আসতে আমিও একটু মুখ খোলার সুযোগ পেলুম। মিঃ দাশগুপ্ত তাঁর প্রেস-ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে শুরু করলেন আলোচনা। যথাসম্ভব হুঁ-হাঁ আর নিরপেক্ষ জবাব দিতে দিতে ভাবছি কখন জামাই-এর কথাটা তুলবেন। ব্যবসা দেখার লোকের অভাব বলতেই ভাবলাম এই সময়। বললাম—'কেন প্রবীরবাবুকে তো কাজে লাগাতে পারতেন?'

জবাবে তিনি জানালেন এ-ব্যাপারটা নিয়ে তিনি নাকি ভেবেছেনও অনেকবার। একাধিকবার নাকি জামাইকে অফার দিয়েও-ছিলেন। কিন্তু ও বড় ইনকনসিসট্যান্ট। মন দিয়ে কোনো কিছু করতে চায় না'—বললেন জয়শ্রীর বাবা। কিছুদিন আগে নাকি স্টেটসে (মানে আমেরিকায় আর কি) যাবার কথা হয়েছিল, যাননি। কেন জানতে চাইলে বললেন—'ওটাই তো ও'র খেয়াল কি বলব বলুন!' ছেলে হিসাবে খুব বুদ্ধিমান, ভয়ানক ইনটেলিজেন্ট। সেজন্য শ্বশুরের জামাইকে পছন্দও খুব। কিন্তু ঐ খেয়ালি-পনার জন্যই মিঃ দাশগুপ্তের কাছে জামাই হয়েও প্রবীরবাবু একটু দূরের মানুষ যেন।

কতখানি দূরের সেটা জয়শ্রীর বাবার কথায় ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছি জয়শ্রীর কাছে স্বামী প্রসঙ্গ পাড়তেই।

বেশ ক্লান্ত শরীর নিয়ে এগারটা নাগাদ জয়শ্রী যখন ঘরে ঢুকলেন তখন তাঁর চোখেমুখে বেশ ক্লান্তির ছাপ।

আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—'এই দেখুন না একস-রে করতেই তিন ঘন্টা লাগিয়ে দিল!' গলায় একটু লজ্জার সুর। ফটোগ্রাফার সুকুমারবাবু বোধহয় রাস্তা থেকেই ধরেছেন জয়শ্রীকে। উনি বললেন—'তুমি অনেকক্ষণ বসে আছ বলেই তো ধরে নিয়ে এলাম।' জয়শ্রী টোলপড়া হাসি ছড়িয়ে একটু আলগা হয়েই বসে পড়লেন সামনের সোফায়।

বাবা ততক্ষণে আমাদের দুজনের জিম্মায় মেয়েকে রেখে বোধহয় বাইরে বেরোবার জন্য তৈরী হতে গেলেন। বসার ভঙ্গি আর মেজাজ দেখে মনে হলো এই বুঝি জয়শ্রী বলবেন 'শরীরটা বড্ড খারাপ ছেড়ে দিন আজ আমাকে।' তৈরী হয়েই ছিলাম এমন পরিস্থিতির জন্য। অসুস্থতার ইতিবৃত্ত শুনেছি আর ভাবছি এই বুঝি উঠতে হোল।

কিন্তু না। উঠতে হোল না তখন। উঠলাম যখন তখন বেলা দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে।

ইতিমধ্যে চা পাঠিয়ে দিয়েছেন মা। জয়শ্রীও বোধহয় একটু বেটার ফিল করছিলেন। হাতের ঘড়িটা খুলে হাতে নিয়ে বলল—'শুরু করুন এবার।'

বললাম—'শুরু আর কি করব—এটা তো ঠিক ইন্টারভিউ নয়। নো প্রশ্ন—স্যুট কিসসু। বরং আলোচনা করা যাক।'

শুরু হোল আলোচনা। আড্ডাও বলা যায়। পলিটিকস বাদে সবকিছুই এসেছিল। সুকুমারবাবুও মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিলেন।

শিয়ালদার কাছে নেতাজী মঞ্চে নিয়মিত 'বিবর' হচ্ছে—এ সংবাদ আপনাদের অজানা নয় আর ঐ নাটকের নায়িকা যে এই জয়শ্রী সে-খবরটাও জানা। নাটকে এই তাঁর প্রথম কাজ। তাই জিজ্ঞেস করলাম কেমন লাগছে? জবাবে নতুনত্ব কিছু ছিল না। আরও পাঁচজন আর্টিস্টের মত তিনিও নাটক করতে ভালোবাসেন তাই করছেন দর্শকের খুব ক্লোজ টাচে থাকা যায় জানালেন। সেজন্যই করছেন এই নাটক জয়শ্রী। নাটকে ওঁর অভিনয় সম্পর্কে মা প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাবারও ভালো লেগেছে মেয়ের কাজ।

আর জয়শ্রী সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো সার্টিফিকেট দিয়েছেন নাটকের নায়ক শুভেন্দু চ্যাটার্জি। কথায় কথায় শুভেন্দুকে একদিন জিজ্ঞেস করতে তিনি বলেছিলেন—'জয়শ্রী যে একজন কত ভালো অভিনেত্রী তা এ-নাটক না দেখলে বোঝা যাবে না। এদিন তো ওঁকে কোনো স্কোপই দেওয়া হয়নি।'

কথাটা মোটেই মিথ্যে নয়। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' থেকেই জয়শ্রী যেন টাইপ হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী প্রায় প্রত্যেকটা ছবিতেই তাঁকে একটু রিজার্ভড সফিসটিকেটেড চরিত্রে নেওয়া হয়েছে। তাঁর মধ্যে যেন একটা চাপা দুঃখ আর একাকীত্বের বোঝা রয়েছে। টাইপ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে কথা তুলতে উনি অবশ্য বললেন—এটা তিনি বিশ্বাস করেন না। 'পিকনিক' ছবিতে তাঁর চরিত্র নাকি একেবারে অন্য রকমের ছিল।

'সব্যসাচী'র ভারতী দেখবেন, দারুণ। একেবারে উল্টোধরনের চরিত্র। বলে একটু গর্বে হাসি ছড়াল মুখে। সেই সঙ্গে জানতে পারলাম সুমিত্রা মুখার্জির সঙ্গে তাঁর ঠান্ডা বিরোধের কারণ। 'সব্যসাচী' ফ্লোরে আসার আগেই নাকি উত্তমবাবু বলেছিলেন ভারতীর আর্টিস্ট সিলেকশন উনিই করবেন।

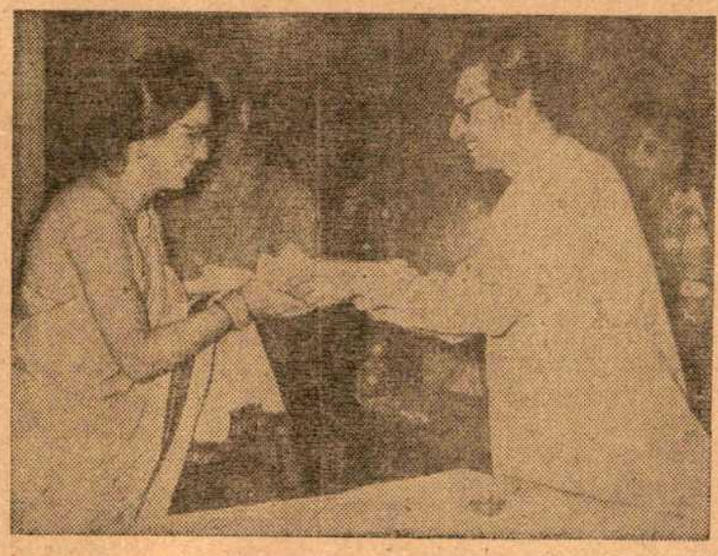

বোম্বাই-এর রঙ্গ ভবনে ১৪শ মহারাষ্ট্র রাজ্য নাট্যোৎসবে শ্রীমতী রোহিণীওককে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার দিচ্ছেন শ্রীশম্ভু মিত্র

সবাই তাতে মোটামুটি রাজীও ছিল। তবে উত্তমবাবুর এই কথা হবার আগে সুমিত্রা ভারতী করবে এমন কথা একটা হয়েছিল বটে। কিন্তু উত্তমবাবু যখন সুমিত্রাকে নাকচ করে জয়শ্রীকে এই চরিত্রের জন্য সিলেক্ট করলেন তখন সুমিত্রার শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই ভাবলেন—উত্তমবাবুর কাছে বলেকয়েই বুঝি জয়শ্রী রোলটা নিয়েছে। সুমিত্রার কানে একথা যেতে সে-ও মনে মনে ক্ষুব্ধ। শুরু হোল ঠাণ্ডা বিরোধ দুজনের মধ্যে। অথচ ঘটনা কিছুই নেই। একটু অভিযোগের সুরেই জয়শ্রী বললেন—'দেখুন তো, কি বিচ্ছিরি ব্যাপার? সুমিত্রা আমার সঙ্গে কথাই বলে না।'

(আশা করব সুমিত্রা এ-লেখা পড়ার পর ঠাণ্ডা বিরোধের অবসান ঘটবে।)

এই প্রসঙ্গে 'ছেঁড়া তমসুক'-এ তো আপনার কাজ করার কথা শুনেছিলাম—কি হোল জানতে চাইলে বেশ মজার হাসি নিয়ে জয়শ্রী বললেন—'জানেন তো সবই! ডিস্ট্রিবিউটর-প্রোডিউসারদের ব্যাপার। ওসব নিয়ে আলোচনা করে কি হবে?' সুমিত্রার সঙ্গে তার সম্পর্ক যাই থাক না কেন অন্যান্য আর্টিস্টদের সম্পর্কে তিনি কিন্তু যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সোমা দে-কে ওঁর খুবই ভালো লাগে। রাজশ্রীর কোনো ছবি ও এখনও দেখেন নি তবে ওর সম্পর্কে অনেক বিশ্বস্ত লোকের কাছে প্রশংসা শুনেছে।

নিজের কাজ সম্পর্কে জয়শ্রী নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সিনিয়র। সমবয়সী শিল্পীদের সঙ্গে নোংরা প্রতিযোগিতা কোনদিনই করেন নি করতে চানও না। কিন্তু অভিজ্ঞ শিল্পীদের সম্পর্কে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা আছে। সাবিত্রী চ্যাটার্জি সম্পর্কে জয়শ্রীর মত—ওঁর মত শিল্পী খুব কমই মেলে। সিনেমা এবং থিয়েটারে কি দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছেন ভাবুন তো।

স্বাভাবিকভাবেই সুচিত্রা সেনের প্রসঙ্গ এলো। কদিন আগে উনি আবার 'আঁধি' [illegible] ভালো লেগেছে। শ্রীমতী সে[illegible] ও জয়শ্রী বেশ বিনয়ী, শ্রদ্ধাও আছে। নায়িকা হিসাবে এঁরা এখনও কাজ করে যাচ্ছেন। জয়শ্রীও করছে। অভিজ্ঞ এই সব শিল্পীদের সঙ্গে কখনও প্রতিযোগিতামূলক আচরণ অনুভব করেন কিনা জিজ্ঞেস করতে বললেন—'সেকি বলছেন! ওঁরা আমার নমস্য। ওঁদের সঙ্গে আমার কোনো তুলনাই চলে না। কম্পিটিশন তো দূরের কথা!'

চায়ে মগ ইতিমধ্যে শেষ। দেখলাম ফটোগ্রাফার ঝোলা থেকে ক্যামেরা বার করেছেন। আমি বললাম—'এবার উঠুন ছবি তোলার জন্য সুকুমারবাবু দেরি।'

কি পোষাক পরে ছবি তুলবেন তাই নিয়ে দু-চারটে কথা চালাচালির পর ঠিক হলো কাট-ম্যাকসি পরেই ছবি তুলবেন। সুকুমারবাবু চাইছিলেন একটু অ্যাট্রাকটিভ ছবি। জয়শ্রীও কোনো সঠিক সাজেশন দিতে পারছিলেন না। সুতরাং কাট-ম্যাকসিই ফাইনাল বহাল।

আলমারি থেকে পোষাকটা বার করে বললেন 'আসছি'।

এলেন যখন তখন একবারে অন্য রূপ। শাড়ি-পরা তরুণী জয়শ্রীর কাট-ম্যাকসিতে বয়স বছর পাঁচেক গেল কমে। কোনো পোজ দিতে হবে কিনা জানতে চাইলে সুকুমারবাবু বললেন—'কোনো পোজের দরকার নেই। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলে যান। আমি আমার কাজ করে নেব।

সুতরাং কথা শুরু হোল আবার।

এবার স্বামী প্রসঙ্গ। কিন্তু উৎসাহ দেখলাম না খুব একটা।

নিঃস্পৃহ উদাস যেন। শুধুমাত্র উত্তর দেওয়া ছাড়া কিছু বলছেন না। মাঝে মাঝে প্রবীরবাবু এখনও আসেন এই বাড়ীতে। কখনওসখনও দেখা হয়? 'বেশীরভাগ দিনই তো নানা কাজে বাইরে থাকি দেখা কি করে হবে বলুন!' বলে একটু গম্ভীর হল জয়শ্রী। স্বামীর আমেরিকা যাবার খবরটা জয়শ্রীও বললেন। বাড়ি-টাড়ি নিয়ে একটু ঝামেলায় আছে ওগুলো মিটিয়ে শিগগিরই যাবে।'

আগেরবার মেয়ে মৌ এসে আমাদের কথাবার্তায় অহেতুক কৌতূহল দেখিয়েছিল, বায়না ধরছিল। আদুরে মিষ্টি ইংরেজীতে তাকে বকেছিলেন জয়শ্রী এবারে আর তাকে দেখতে পেলাম না। কৌতূহল বেশ। বললাম—মৌকে দেখছি না, ও কোথায়?

—চন্দননগরের মিশনারী স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার দু-বোনও আছে ওখানে।

ঃ মন কেমন করে না?

একটু চুপচাপ জয়শ্রী। অবশ্য মুহূর্তের জন্য। বুকটা বুঝি ভারী হয়েছিল। 'না মন কেমন করবে কেন—মাসে মধ্যে যাই, ছুটিতে ও আসে।' বলে আবার চুপ।

সুকুমারবাবু ক্লিক করে ছবি তুলে যাচ্ছেন। জয়শ্রী একবার সেদিকে তাকাতেই শুনতে পেলেন—'আমার দিকে তাকাতে হবে না। কথা চালিয়ে যান।'

কথা চলতে চলতে জয়শ্রী একবার পা গুটিয়ে, মাথা সরিয়ে, রিল্যাক্স করে বসছেন। সুকুমারবাবু ছবি তুলে যাচ্ছেন। যখন সিগন্যাল পেলাম তাঁর কাছ থেকে তখন আলোচনা চলছে বাংলা ছবি নিয়ে। আর সকলের মত জয়শ্রীরও মন্তব্য 'ভালো ছবি হচ্ছে না।' সুতরাং আলোচনা ততক্ষণে সুকুমারবাবুর ব্যাগবন্দী।

আমরা দুজন বাড়ী ছেড়ে গলিতে। জয়শ্রী দাঁড়িয়ে আছেন গেটের কাছে। লং ডিস্টেন্ট থেকে কাট-ম্যাকসিতে জয়শ্রীকে 'ফাইন' লাগছিল।

নির্মল ধর

শাবানা আজমী কোমিল্লা রিক

ফসলা

প্রযোজনা ঃ নয়া সংসার
সংলাপে, অভিনয়ে ও আঙ্গিকে
একটি উপভোগ্য চিত্র

গৌতমচন্দ্র ধনীর দুলাল না হয়েও, প্রাসাদের মতো বাড়ী, ইমপালা গাড়ী এবং বিরাট অফিসের একমাত্র অংশীদার। এই বিরাট সম্পত্তি গৌতমের দাদামশায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। এর জন্য ওকে বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। অতুল ঐশ্বর্যের পাশে ওর এক আধুনিকা বান্ধবী (মায়া) আছে। আচমকা অফিসের কাজের শেষে বান্ধবী মায়ার বাড়ীতে গিয়ে দেখে, এক অপরিচিত ব্যক্তি ঘনিষ্ঠভাবে মায়ার পাশে বসে ওর দেওয়া মদ্য পান করছে। এ দৃশ্য দেখে গৌতম ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গাড়ী চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে, একটি বালককে চাপা দেয়, পরে যখন আহত ছেলেটিকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে গিয়ে ওর দিদি আশার সঙ্গে আলাপ হয়। কিন্তু প্রথম দিন থেকে আশা ওকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে ধনী বলে। এবার একটা অন্যায় কাজ করবার জন্যে আশা ওকে দিয়ে দু মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করালো ভাইয়ের উপর অবিচারের জন্যে শাস্তিস্বরূপ। গৌতম তার অপরাধকে কমাবার জন্যে আশার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তার মনে সমবেদনার আমেজ সৃষ্টি করলো। কিন্তু এত সহজে আশা গৌতমকে ক্ষমা করতে রাজী নয়। ক্রমশ ওদের দুজনের প্রতি দুজনের ভুল বুঝতে পেরে ঘনিষ্ঠ হোল। কিন্তু গৌতমের পিসী ও অফিসের অন্যান্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ওকে পাগল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেও মোকদ্দমায় হেরে গেল। সেই মোকদ্দমায়ই প্রমাণ হোল, গৌতম পাগল নয়, পিসির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ওকে পাগল প্রতিপন্ন করে হেয় করার চেষ্টা, কিন্তু কুচক্রীরা হেরে গেল।

ছবির কাহিনী পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার কে এ আব্বাস গতানুগতিক ভাবকে না এড়িয়ে অন্যান্য হিন্দী ছবির মতোই উনি ক্যাবারে নাচ ও গান, ভিলেন, ভ্যাম্প সবই সৃষ্টি করেছেন। বম্বের আরো দু-একটা কমার্শিয়াল ছবির মতো, ওঁর মতো প্রবীণ ও প্রগতিবাদী চলচ্চিত্র পরিচালক অনায়াসে কাহিনীর দুর্বলতাকে জোরালো অভিনয় ও আঙ্গিকের মাধ্যমে পরিবেশন করবার চেষ্টা করতে পারতেন।

অভিনয়ে গৌতমের ভূমিকায় রমন খান্না নবাগত হয়েও সুন্দর অভিনয় করেছেন, আশার ভূমিকায় নবাগতা শাবানা আজমীর অভিনয়ও সুন্দর। 'অংকুর' ছবির পরে ওর অভিনয় নিয়ে বিশেষ কিছু বলবার নেই। অন্যান্য ভূমিকায় ডোভড কোমিল্লা (মায়া) রিক, চাঁদ উসমানী, সেন্টাল, দিনেশ ঠাকুর রবিকান্ত ইমতিয়াজ নিতীন শেঠী আকাশ দীপ সুন্দরভাবে অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন। কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের। সঙ্গীত পরিচালনায় জয়দেবের আবহসঙ্গীত রচনা এবং সুরারোপিত গানগুলি মন্দ নয়। সম্পাদনার কাজ প্রশংসনীয়। —চিত্রদূত

ফ্লোর থেকে বলছি

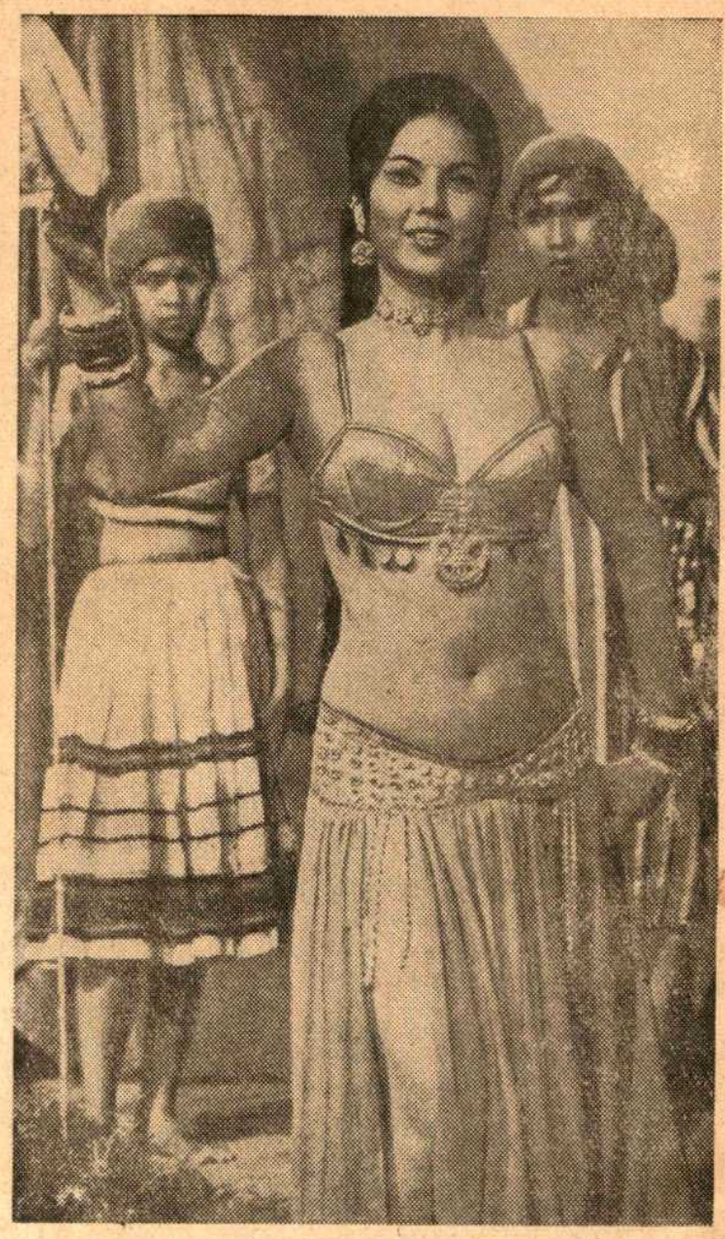

বলছি বটে কিন্তু ফ্লোর থেকে কথা বলা বাস্তবিকই বিপজ্জনক। স্টুডিওতে যা দেখি যা শুনি তা যদি হুবহু আপনাদের বলতে পারতাম তাহলে অনেক অজানা তথ্যের সম্মুখীন হওয়া যেত, অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপারও শোনানো যেত। কিন্তু তা হবার নয়। এখানে সবাই স্পর্শকাতর পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষে নেই।

ধরুন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আমার, শুধু আমার কেন প্রায় শতখানেক কৌতূহলী মানুষের চোখের সামনে এই যে মেয়েটি নাচছে ইয়েস জিপসী নাচ, এটা না ইণ্ডিয়ান না ওয়েস্টার্ণ ড্যান্স। শটের আগে পর্যন্ত শরীর-সর্বস্ব এই মেয়েটি, যার নাম শেফালী শরীরটা ঢাকা ছিল পাতলা একটা ওড়নায়, পরিচালক টেকিং-এর নির্দেশ দিতেই ছবির কস্টুমম্যান তাড়াতাড়ি সেই ওড়না খুলে নিয়ে গেল। ব্যস একরাশ সেকস কোথায় ছিল, হুড়মুড় করে লাফিয়ে চোখের সামনে হাজির হল। কত পয়েন্টের কত রকমারী চাউনী। শেফালী অঙ্গী-ভঙ্গী করে নাচছে বুকের আঁট-সাঁট কাঁচুলী আর পরণে ঘাঘরা কতক্ষণ আর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবে?

আনন্দমেলার সেট, ছবিটি পরিচালনা করছেন মঙ্গল চক্রবর্তী এখন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ফ্লোরে এ-ছবির দাপ্দাপ শুটিং হচ্ছে। মঙ্গল চক্রবর্তী ইতিমধ্যে আমি সে ও সখা নামে একটা হিট ছবি বাজারে দিয়ে বসে আছেন, রমরম করে চলছে ভদ্রলোক ফিল্ম লাইনের বহু প্রবীণ মানুষ, ধরুন সেই সোনার হরিণ ছবি করেছিলেন, মানদণ্ড ছবি করেছিলেন সে আজ কবেকার কথা। বছর কয়েক আগে তিন অধ্যায়, তারপর দিনান্তের আলো। তারপর বেশ কিছুদিন বসে থাকবার পর আমি সে ও সখা দিয়ে আরম্ভ করেছেন এই আনন্দমেলার যা ব্যাপার শুনলাম—এ ছবিও সম্ভবত লেগে যাবে। উত্তমকুমার এ ছবিতে নাকি ফ্যান্টাস্টিক অভিনয় করছেন। ক্যারেকটার অ্যাকটিং-এ উত্তমকুমারের অভিনয় দিনে দিনে জমে উঠছে। আজকাল উত্তমকুমারের বয়েসের সঙ্গে তার মিলিয়ে গল্প করা হচ্ছে, রোমান্টিক চরিত্র উনি আর করতে চাইছেনও না।

ইন্দ্রপুরীতে চোখের সামনে স্বল্পবসনা শেফালীর জিপসী নৃত্য দেখতে দেখতে আমার মনে হল এই একই নৃত্য হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ড্যান্স ফ্লোরে পরিবেশিত হয় তখন চারিদিকে জেগে থাকে কৃত্রিম জ্যোৎস্নার আলো, টেবিলে টেবিলে শেরি শ্যাম্পেন আর হুইস্কির কাট-আউট বিলিতি গ্লাস দামী শাড়ির খসখসানি, ইস্টিমটের পাগল করা গন্ধ চিলি চিকেনের প্লেট লক্ষ টুকরো হয়ে যাওয়া মেয়েলী হাসি আর পুরুষের নির্লজ্জতা—অসম্ভব মানিয়ে যায়, অসম্ভব অসম্ভব। তবে সে আর এক জগৎ শেফালী সম্রাজ্ঞীর জগৎ, সেখানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত। আর এটা হচ্ছে মামুলী স্টুডিও বৈশাখের গরমে ইতিমধ্যেই এটা নগা-ডাউন টাটার স্টিল ফার্নেস, কুল-কুল করে ঘামতে ঘামতে তাবৎ শিল্পী আর কলা-কুশলীরা এখানে শটের পর শট টেক করেছেন শুধু এক ফালি মরুদ্যানের মত জেগে আছে কমণীয় লোভনীয় রমণী-শরীর, সে শেফালী। সিনেমার বকস অফিস এখন এই রমণীকে সযত্নে লালন করছে করবে ঠিক ততদিন...

...কত বড় মেলার সেট এটা, রকমারী জিনিষের দোকান-পাট লেগেছে এখানে। মাঠের এক পাশে যাযাবরদের তাঁবু লেগেছে। সম্ভবত ইরাণী এরা। এদের সুন্দরী মেয়েরা নেচে গেয়ে দর্শকদের

আনন্দ মেলা/মহুয়া রায়চৌধুরী

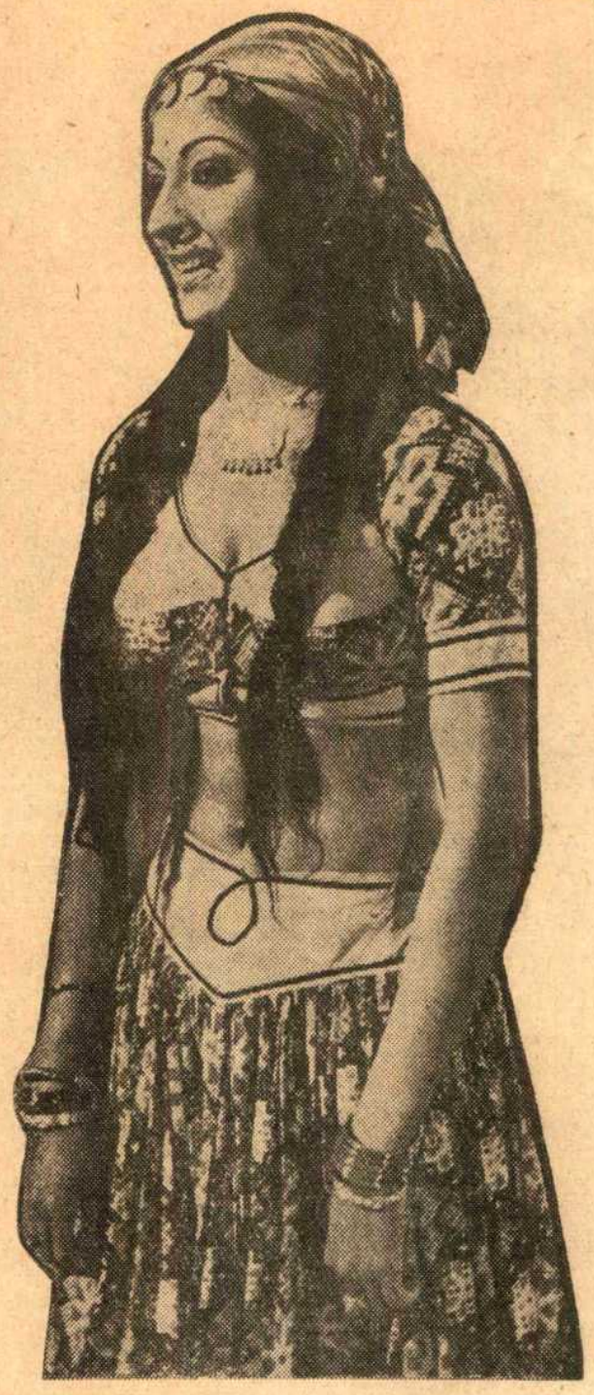

আনন্দ দিয়ে চলেছে। এখন হয়েছে কি মেলার অন্য আর এক দিকে ছবির নায়ক তিলক চক্রবর্তী আর নায়িকা মহুয়া রায়-চৌধুরী বসে সম্ভবতঃ প্রেমালাপে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ নায়িকার চোখে পড়ল—এই রে। এদিকে আসছে। পালান পালান—

ব্যস, অমনি দৌড় দুজনের।

মেলার জনতার ভীড় ঠেলে-ঠুলে ওরা চলে এল সেই যাযাবরদের তাঁবুর কাছে। কিন্তু সেখানেও রেহাই নেই। অভিভাবকের সর্তক দৃষ্টি সেখানেও তাদের যেন তাড়া করে এল। ফলে ওরা ঢুকে পড়ল একটা তাঁবুতে তারপর কিছুক্ষণ পর সেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল একটি ইরাণী মেয়ে আর তাকে অনুসরণ করে আর একটি ইরাণী মেয়ে। আসলে লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে নায়ক-নায়িকার এই ডিসগাইজ। মহুয়াকে দেখলাম ফ্লোর থেকে মেকআপ-রুমে যাচ্ছে ওই বিচিত্র জিপসী পোষাকে। ছবিটা বেশ মজার হবে বলে মনে হচ্ছে।

গত সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে দীনেন গুপ্তর 'নিশিমৃগয়া' ছবির সেটে হঠাৎ একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেল। দীনেন গুপ্ত এই সেটে, বেশ বড়-সড় দোতলা সেটে ড্যান্স পিকচারাইজ করছিলেন। বেশ ভালয়-ভালয় শিডিউল উঠে যাচ্ছিল হঠাৎ বিপত্তি ঘটল, তারপর হৈ-চৈ চিৎকার, চেঁচামেচি ডাক্তার এবং হাসপাতাল!

ফ্লোর থেকে ন' ফুট উঁচু দোতলা বাড়ি। প্রধানতঃ কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরী। ফ্লোর থেকে একটা সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে দোতলায় মিশেছে। ছবির কিছু চরিত্র ওই সিঁড়ি বেয়ে যাতায়াত করছিল। সেই দৃষ্টান্তে পরিচালকের নির্দেশে ড্যান্সার গার্ল-ও (ইনিও সেই স্বল্প-বসনা রমণী) নাচতে নাচতে উপরে উঠল। সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে এক পাল্লার একটা দরজা। সেটা খুলে তবে দোতলার বারান্দায় যেতে হয়। নাচিয়ে মেয়েটি তাই-ই করেছিল কিন্তু হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে সটান ন' ফুট নেমে এসে প্রচন্ড জোরে আছড়ে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে অচৈতন্য। প্লে-ব্যাক মেশিন বন্ধ হল। পরিচালক দৌড়ে গিয়ে মেয়েটিকে তুলে ধরলেন। চারদিক থেকে সবাই ছুট এল। একজন ছুটল ডাক্তার ডাকতে। তারপর হাসপাতাল। কেউ বলছে পা-ফসকে কেউ বলছে সেটের পাটাতন আলগা ছিল বলে ওর পা হড়কে গেছে কিন্তু যে-যাই বলুক, অ্যাকসিডেন্ট-টা মারাত্মক হয়েছে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে, পরে হাসপাতালে আরও ভাল চিকিৎসা দিতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। দীনেন গুপ্ত ছবির শুটিং বন্ধ রেখে এখন হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করছেন। কামনা করি মেয়েটি দ্রুত আরোগ্য লাভ করে আবার তার কাজের জগতে ফিরে যায়।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর মাঠে যেখানে এই কিছুদিন আগে পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর 'সংসার সীমান্তে' ছবির বিরাট এক বস্তির সেট খাড়া করে আউটডোরের শুটিং করছিলেন, সেখানে সম্প্রতি আর একটা বস্তি নির্মাণ করে পরিচালক নবেন্দু চ্যাটার্জি 'বণিক থেকে নাবিক' নামে একটা ছবির শুটিং করছেন। লোকেশানে গিয়ে দেখি তখুনি একটা শট টেক করা হচ্ছে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন শোভা সেন আর সুশীল রায়। সুশীল রায় এ-ছবিতে এক খোঁড়ার ভূমিকায় অভিনয় করছেন, ওঁর বগলে ক্রাচ হাতে রেশন ব্যাগ দারিদ্র্যের (চলচ্চিত্রে যেমন দারিদ্র্য দেখানো হয়) চিহ্ন। মোটা-মুটি ওঁর সর্বাগ্রে। শোভা সেনেরও সেই এক অবস্থা।

নিশিমৃগয়া/উৎপল দত্ত অপর্ণা সেন। পরিচালনা ঃ দীনেন গুপ্ত। ফটো ঃ অমৃত

শোভা সেনের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন—এনেছ?

—হ্যাঁ এনেছি, এই নাও—বলে সুশীল রায় শ্লেশনের ব্যাগটি স্ত্রীর হাতে দিলেন বিষণ্ণ করুণ এবং পরাজিত মুখভঙ্গী, পৃথিবীর সব কিছুর ওপর বিশ্বাস টলে গেলে মানুষের যা হয় কতকটা সেই রকম, শোভা সেন ব্যাগটা নিয়ে সপ্রশ্ন—কত আছে চাল?

—দু কিলো।

—মাত্র দু কিলো? একে কি করে চলবে?

—এতেই চালাতে হবে...আমি আর পারছি না—

শটটা এখানেই শেষ হল। ক্যামেরা ঘুরল। এবার আর্টিস্টদের ক্লোজে এই টুকরো কথাগুলো নেওয়া হবে কে এ বেজা ক্যামেরাম্যান। আজকাল ভাল ক্যামেরম্যান হিসাবে ওর বেশ নামযশ হয়েছে, তৎক্ষণাৎ হেঁকে ক্যামেরা শিফটিং-এর নির্দেশ দিল। শট দিয়ে শোভা সেন লোকেশানের মাঝ বরাবর একটা চেয়ারে এসে বসলেন। কিছুদিন আগে আমাদের অমৃত পত্রিকায় শোভা সেনের একটা চমৎকার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে শোভা সেন বললেন—আমরা ভাই বাতিল হয়ে গেছি। এখনও কি আমাদের লেখা কেউ পড়ে?

—পড়ে, নিশ্চয় পড়ে যেমন ধরুন আমি খুব মনোযোগ দিয়েই পড়েছি। আমার খুব ভাল লেগেছে। ইতিমধ্যে এ ছবির নায়িকা সুমিত্রা মুখার্জি এসে বসল। মেকআপের কোন বালাই নেই। একটা সাধারণ ডুরে কাপড় ঘরোয়া ভঙ্গীতে পরা। সুমিত্রা আজকাল খুব ভাল অভিনয় করছে। কিছুদিন আগে জ্ঞানেশ মুখার্জির স্বীকারোক্তি ছবিতে ওর অভিনয় দেখলাম। ভাল খুউব ভাল। রঞ্জিৎ মল্লিকের পাশে ওকে চমৎকার মানিয়েছেও।

সুমিত্রা বলল ও এখন অনেকগুলো ছবিতে অভিনয় করছে। যার কিছু ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে, কিছু অল্পদিনের মধ্যে আরম্ভ হবে। কথায় কথায় বোম্বের প্রসঙ্গ এল। সুমিত্রাকে এর আগে দু-একবার বোম্বে ডেকেছে চরিত্র পছন্দ হয়নি বলে ও নাকি সে ডাকে সাড়া দেয় নি। কিন্তু সম্প্রতি একটা খুব ভাল অফার নাকি এসেছে। বোম্বের একজন বিখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক ওকে একটা হিন্দী ছবির নায়িকা চরিত্রে নেবেন বলে স্থির করেছেন।

—কে?

—এ্যাঁ সুমিত্রা একটু ইতস্তত করল তারপর বলল—তাঁর নামটা এখুনি বলতে একটু অসুবিধা আছে, তবে কণ্ট্রাকট-টা যদি এরই মধ্যে হয়ে যায় তো আমায় আর বলতে হবে না আপনারা এমনিতেই খোঁজ পেয়ে যাবেন...

মিঠু মুখার্জি বোম্বে যাচ্ছে শুনেছি, মহুয়া রায়চৌধুরী ইতিমধ্যে গিয়েই নাকি বসে আছে। সুপর্ণা সেন অপর্ণা সেন তো অলরেডি একটা ছবির শুটিং করছেন ওখানে আবার সুমিত্রা যবে বলে পা বাড়াচ্ছে, তাহলে কলকাতার কি হবে? কলকাতায় আর রইল কে?

সেদিন দুপুরে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর প্রোজেকশান রুম থেকে দেখি—অফ অল পার্সনস, বোম্বের শক্তি সামন্ত বেরিয়ে এলেন। উনি এতক্ষণ অরবিন্দ মুখার্জির অগ্নীশ্বর ছবির ট্রায়াল দেখছিলেন। শুনেছি উত্তমকুমার এ-ছবিতে নাকি ওঁর জীবনের এক স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। ছবিটি আমার দেখব দেখব করেও দেখা হয়নি। শক্তি সামন্তর সঙ্গে বেরোলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তারপর ওঁরা হাঁটতে হাঁটতে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেলেন। শক্তি সামন্ত এখন কলকাতায় এসেছেন ওঁর অমানুষ ছবির প্লাটিনাম জুবলী উৎসবে যোগদান করতে। সেই সঙ্গে রয়েছে কলকাতার ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার উৎসব উনি সেখানেও আমন্ত্রিত। শক্তি সামন্ত এখন দুটি গল্পের মাঝে দুলছেন, একটি ডাক্তার অপরটি স্ত্রী। শুনছি উনি এই দুটি ছবি-ই হিন্দীতে করবেন যেখানে উত্তমকুমার ইজ এ মাষ্ট! অমানুষ যে আজ এখানে এত চলছে তার প্রধান কারণ উত্তমকুমার। ডাক্তার যদি শক্তি সামন্ত তৈরী করেন তাহলে ওটা সম্ভবত ডবল ভার্শানে-ই হবে।

এখন পুরোনো ছবি তোলার একটা জোয়ার এসেছে। সম্প্রতি কবি গিরিজা হয়েছে। এরপর আসছে প্রিয়বান্ধবী আর স্বয়ংসিদ্ধ। সম্প্রতি শুনলাম সুজাতা সিনেমেকের পর পরিচালক পিণাকী মুখার্জি প্রতিশ্রুতি তুলবেন বলে স্থির করেছেন।

মুসাফির

শতবর্ষের স্মরণীয়

নাট্য সম্রাজ্ঞী বিনোদিনী ॥ ১

নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী— বিনোদিনী দাসী। বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় একটি নাম। শতবর্ষের নাট্যশালার ইতিহাসে বহু প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর অভিনয়-সৌকর্যের কথায় আমাদের বিস্মিত হতে হয়—কিন্তু বিনোদিনীর মত আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা দ্বিতীয়া অভিনেত্রীর সন্ধান পাওয়া যাবে না। এদিক থেকে তিনি নাট্যশালার ইতিহাসে অনন্যা।

রেইয়ং এণ্ড ধায়ত ও তদানীন্তন কালের অন্যান্য পত্র-পত্রিকা—যারা বিনোদিনীর অভিনয়-চাতুর্যের প্রশংসা করে যেকোন বিদেশী অভিনেত্রীদের সঙ্গে তুলনা করে শ্রেষ্ঠত্বের জয়মাল্যে অভিনন্দিতা করেছিলেন—তারাই কিরণবালার অভিনয়-প্রতিভাকে অনুরূপ স্বীকৃতিদানে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। কিন্তু স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় বিনোদিনীর আত্মত্যাগের অনুরূপ নিদর্শন আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বিনোদিনীর আত্মত্যাগে প্রতিষ্ঠিত বাংলার তৃতীয় নাট্যসেউল স্টার থিয়েটার ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হাতিবাগানে স্থানান্তরিত হলেও তার নাট্য-সাধনায় কোনদিনই ছেদ পড়েনি। কিন্তু মুষ্টিমেয় ঐতিহাসিক বা অনিসন্ধিৎসুকরা ছাড়া—স্টার থিয়েটারের সঙ্গে নাট্য-সাম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর কথা ক'জন স্মরণ করেন। ক'জন খবর রাখেন যে বর্তমান স্টার থিয়েটারের সামনে এবং সামান্য দক্ষিণে কেটেছিল নাট্য-সাম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর প্রথম ও শেষ জীবন।

চিত্তরঞ্জন এভেনিউ আর বিডন স্ট্রীটের পূব-উত্তর কোণের ভগ্ন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েও আজও হয়ত মুষ্টিমেয় ঐতিহাসিক স্তব্ধ হয়ে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েন। বিস্মৃতির যবনিকা ভেদ করে হয়ত মানসচক্ষে ভেসে ওঠে—অতীতের অনেক কথা। ভেসে ওঠে বিনোদিনীর স্টার গোপাললাল শীলের এমারেল্ড অমর দত্তের ক্লাসিক আর মনমোহন পাড়ের মনমোহন থিয়েটারের কথা।

সিপাহী বিদ্রোহের বিজয়োল্লাস তখন স্তব্ধ। আনুমানিক ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৪৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে (বর্তমান বিধান সরণি) নাট্য-সাম্রাজ্ঞী বিনোদিনী জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজ কৃপাপুষ্ট কলকাতার তদানীন্তন বেশীর ভাগ ধনীদের প্রাসাদ সন্নিকটবর্তী স্থানে গড়ে উঠেছিল এক একটি বস্তী বাড়ী। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবার থেকে এই বস্তীবাসীরা ছিল পৃথক এক সমাজের। ধনীদের গৃহে এইসব পরিবারের পুরুষেরা ভৃত্য ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে যেমন জড়িত থাকতো—তেমনি মেয়েরা থাকতো পরিচারিকা হিসেবে। উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা ধনী সন্তানদের নেকনজরে পড়ে অনেক মেয়েরা অবৈধভাবেও জড়িয়ে পড়তো। সাধারণ সমাজে নিন্দনীয় হলেও এদের সমাজে এমনি অবৈধ সম্পর্ক নিন্দনীয় ছিল না। বরং কোন ধনী সন্তান বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে স্ত্রীর অবৈধ যোগ সম্ভবতঃ আর্থিক কারণেই স্বামীও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতেন।

এমনি এক পরিবারে বিনোদিনী জন্মগ্রহণ করেন। বিনোদিনীদের পরিবারে ছিলেন তার মাতামহী মাতা, বিনোদিনী ও তার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বস্তীবাড়ীর বিভিন্ন ঘর পৃথকভাবে ভাড়া দিয়ে যা আয় হতো বলতে গেলে তা দিয়েই চালাতে হতো সংসার। পাঁচ বছর বয়সের ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেওয়া হয় আড়াই বছরের এক শিশু কন্যার সঙ্গে। এই সূত্রে কিছু অলংকারাদি পাওয়া যায় এবং অলংকারাদি বিক্রয় করেও অনেক সময় সংসার চালানো হতো।

বিনোদিনীরও বিয়ে হয়েছিল বালিকা বয়সেই। ভাই, ভাই বৌ বিনোদিনী এবং তার বর চারটি বালক বালিকা একসঙ্গে খেলা করতো। বিনোদিনীর দিদিমা এবং মা কোনদিনই তাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে দেন নি। বিনোদকে বিয়ে দিয়ে তার বরকে বড় করে তোলার ইচ্ছাই তাদের ছিল। কিন্তু ছেলেটির মাসী শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে যায় এবং আবার বিবাহাদি দিয়ে নিজের সংসারে আটকে রাখেন। স্বামী বা শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে বিনোদিনীর আর কোন যোগ থাকে না। বিনোদিনীর ভাইটিও শেষ পর্যন্ত মারা যায়। অর্থাভাবে দাতব্য চিকিৎসালয়েই তাকে ভরতি করা হয়েছিল। একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে বিনোদিনীর মা এবং দিদিমা খুবই ভেঙ্গে পড়েন।

বিনোদিনীদের বাড়ীর কাছেই থাকতেন একজন দয়াবতী মহিলা। প্রতিবেশীদের যেকোন অভাব অভিযোগে তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন।

ছোটবেলার দারিদ্র্যের দিনগুলির কথা পরবর্তী জীবনে ঐশ্বর্য ও খ্যাতি মাখাও বিনোদিনী ভুলতে পারেন নি। এই সময়কার একটি করুণ কাহিনী বিনোদিনী তার আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন। বিনোদিনীর তখন বছর সাতেক বয়স। ছোট ভাইটি তখনও জীবিত। কোন বড়লোকের বাড়ীর কোন উৎসব উপলক্ষে তার মা উপস্থিত থেকে ছেলেমেয়েদের জন্য কয়েকটি সন্দেশ ছেয়ে আনেন। কয়েকদিনের বাসি সন্দেশ নষ্ট হয়ে যায় তবু সেই সন্দেশ পরম আনন্দের সঙ্গেই তখন খেয়েছিলেন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা-সংকলন

জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব ব'লে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখছেন আকৈশোর। বিশ্ববিদ্যালয় পর্বেই নানা সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কবিতা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। নিজের কবিতার নির্মম সমালোচক, তাঁর কাছে কবিতাকর্ম এক নিরন্তর আন্তরিক বোঝাপড়া। সম্ভবত সেই কারণেই সংকলন প্রকাশের প্রস্তাব এতদিন গ্রাহ্য করেননি।

জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব ব'লে

স্বনামধন্য অভিনেতার জটিল দুরূহ ভূমিকার নেপথ্যলোকে সন্তর্পণে গড়ে উঠেছে এক কবি—সংবেদনশীল, আত্মসচেতন, প্রত্যয়গাঢ় ঋজুতায় স্বতন্ত্র। স্ব-সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকার বাইরে গত প্রায় এক যুগের উপর সে-পরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে কদাচিৎ।

জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব ব'লে

কবিতাপ্রেমিক বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে এই প্রথম তাঁর কবিতা-সংকলনের প্রকাশ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, সৌমিত্রের কবিতায় স্মৃতি ও অনুষঙ্গ, দেশ ও সময়, প্রেম ও বিষণ্ণতা মিলেমিশে এমন অন্তরঙ্গ এক জগৎ রচিত হয়েছে যার সর্বাঙ্গীণ অনন্যতা প্রথাসিদ্ধ কবিতার অতি অন্যমনস্ক পাঠককেও অপ্রত্যাশিত উপহার দেবে অবয়ব ও ভাবনার নতুন কান্তি, ঐশ্বর্য। প্রচ্ছদশিল্পী ঃ শ্রীসত্যজিৎ রায়। দাম ঃ চার টাকা মাত্র।

অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস

৭ই লিণ্ডসে স্ট্রীট । কলিকাতা ১৬

ভাই মারা গেছে। সংসারও চলছিল না কোন মতে। এমনি সময় বিনোদিনীদের বাড়ীতে এলো এক নতুন ভাড়াটে। নাম গঙ্গা বাইজী। গঙ্গা বাইজীর অভিভাবক কেউ ছিল না। বিনোদিনীর দিদিমা এবং মা খুবই স্নেহ করতেন গঙ্গামণিকে। গঙ্গামণিও ফুটফুটে বিনোদিনীকে ভাল না বেসে পারলেন না। বয়সের অনেক ব্যবধান হলেও পরস্পরের মধ্যে গভীর সখ্যতা গড়ে উঠলো। পরবর্তীকালে এই গঙ্গামণি বাংলা রঙ্গমঞ্চের একজন প্রখ্যাতা নায়িকা হয়ে ওঠেন এবং গঙ্গামণির খ্যাতিতেও বিনোদিনী কিছুটা আত্মহারা হয়ে পড়েন।

গঙ্গামণি তখন যুবতী। তার কাছে অনেকেরই ছিল আনাগোনা। গঙ্গামণির কাছে গান শিখতে লাগলো বিনোদিনী গানের আসরের বাইরে গল্পগুজবের আসরেও বালিকা বিনোদিনী সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠলো। গঙ্গামণি তখনও কোন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তবে তার কাছে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত দু' একজন যাতায়াত করতেন। এদের মধ্যে প্রাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ শেঠের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৭২ খৃস্টাব্দে যখন ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন স্ত্রী ভূমিকায় ছেলেরাই অভিনয় করতেন। যাত্রা সাথী সংবাদ বা গীতিনাট্যে নৃত্য ও সঙ্গীতাংশে সে সময় মেয়েরা অংশ গ্রহণ করতেন—তাদের কেউ সুনজরে দেখত না। বা এই সব সম্প্রদায়গুলিও খুব মর্যাদা পেত না। এরা ব্যক্তিগতভাবে দল গঠন করে আর্থিক চুক্তিতেই গাওনা করতেন। পূর্ণবাবুরা এমনি দলের অধিনায়ক ছিলেন। সীতার-বিবাহ নামে তারা তখন একটি পালা-নাট্যের প্রস্তুতিতে মগ্ন ছিলেন।

হেরাশীম লেবেডফের দি বেঙ্গলী থিয়েটারে এবং নবীন বসুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ে মহিলা নিয়োগ করা হয়েছিল। হাওড়ার দি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ৭ মে বিদ্যাসুন্দর নাটকাভিনয়ে বিদ্যা ও সুন্দর চরিত্রে দুটি মেয়েকে নিয়োগ করেন বলে তদানীন্তন ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজে পাওয়া যায়।

১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ১৬ আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটার মাইকেলের শর্মিষ্ঠা নাটক দিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করে। শর্মিষ্ঠা নাটকে এলোকেশী জগত্তারিণী শ্যামাসুন্দরী ও গোলাপ সুন্দরী এবং চারজন অভিনেত্রী সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার দ্বারোদ্ঘাটন করলেও অভিনেত্রী নিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল অভিনয় শুরু করেন সতী কি কলঙ্কিনী নাটকের সময় ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে। এ সময় রাজকুমারী ক্ষেত্রমণি খন্তমণি লক্ষ্মীমণি ও হরিদাসী এই ৫ জন অভিনেত্রী সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ করেন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে পূর্ণবাবুর যোগ ছিল। বিনোদিনীদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন তাই বিনোদিনীকে থিয়েটারে দেবার জন্য একদিন প্রস্তাব দেন বিনোদিনীর দিদিমাকে। অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করে বিনোদিনীর দিদিমা পূর্ণবাবুর প্রস্তাব স্বীকৃতা হন।

(ক্রমশ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

শতাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত
লক্ষ্মীবিলাস তৈল

যুগোপযোগী
রুচির চাহিদা মত
এবং প্রিয়জনকে
উপহার দেওয়ার মত
প্যাকিংএ পাওয়া
যাচ্ছে। কেশ তেলে
এরূপ প্যাকিং
এই প্রথম।

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১৬

স্বদেশী ছবি

পঃ জার্মান ছবির উৎসব

পূর্ব জার্মানীর চলচ্চিত্র উৎসবের প্রায় পর পরই ম্যাকসমুলার ভবন ও ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে ম্যাকসমুলার ভবনে পশ্চিম জার্মানীর মোট ছ'টি ছবি দেখানো হোল।

ছবিগুলির নাম যথাক্রমে ও জোনাথন ও জোনাথন দি ফলস ওয়েট রেন ওয়াসড লুড উইগ টু দি পেডেস্ট্রেন গড প্রোটেকটস দি লাভার্স।

এর মধ্যে ও জোনাথন ও জোনাথন এবং রেন ওয়াসড ইতিপূর্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে। এবং ঐ দুটি ছবিই দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল।

অন্য ছবিগুলির মধ্যে দি পেডেস্ট্রেন ও লুডউইগ টু অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ছবি বলে মনে হয়েছে।

কিন্তু লুডউইগ টু দীর্ঘায়ত এবং ক্লান্তিকর ছবি হলেও এর বিন্যাস কাব্য গুণান্বিত পরিবেশ রচনার কথা অস্বীকার করা যায় না। ছবির প্রায় দুই তৃতীয়াংশই স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণের পরিবেশ। মিথ্যে নয় ছবির এই অংশ বসে দেখার পক্ষে প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন। কিন্তু ছবি যখন যতই পরিণতির দিকে এগিয়েছে ততই সে দর্শককে আবিষ্ট করে রেখেছে। এবং একদম শেষ অংশে গিলোটিনের দৃশ্যটি দর্শকদের মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এই দৃশ্যটিকে যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। এই চমক সৃষ্টিই গল্পটিকে আগাগোড়া মনে করিয়ে দিয়েছে।

লুডউইগ এমন এক রাজার গল্প যে চিরকাল স্বপ্ন দেখে জীবন কাটাতে চেয়েছিল বলে পরিণামে তাকেই গিলোটিনে গলা দিতে হয়েছিল।

দি ফলস ওয়েটে নারীচরিত্রের বিভিন্ন রূপকে ছবিতে বলার চেষ্টা হয়েছে। এই ছবিতে নুডিটি এবং বেডসিনকে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে দেখা গেছে। তবে তার বেশীটাই গল্পের প্রয়োজনে এসেছে। একটি সক্ষম সৎ মেজাজের পুরুষের করুণ পরিণতিও এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। ছবিটির গল্প মনকে যেমন আবিষ্ট করে রাখে, তেমনি নাড়াও দেয়।

গড প্রটেকটস দি লাভার্স মূলত বস্তুধর্মী ছবি। একটা রহস্য রোমাঞ্চের আমেজ আছে এতে। বসে দেখতে ভালই লাগে।

ও জোনাথন এবং রেন ওয়াসড সম্পর্কে ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে।

এবারের পঃ জার্মানের ছবি আগের চেয়ে অনেক উন্নতমানের বলে মনে হোল। তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যে জাতের ছবি এদেশের দর্শকরা দেখেছে তার অভাব যেন রয়েই গেল এই যা দুঃখ।

কলকাতায় জাপানী ছবি

২৩শে এপ্রিল একাডেমী অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে জাপান কনসুলেটের উদ্যোগে জাপানী পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'ফারিনকাজান' বা সামুরাই ব্যানার প্রদর্শিত হয়।

—শা র

নাট্যমঞ্চ

থিয়েটার কমিউনের 'স্বদেশী নক্সা'

নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী নকসা'র অন্যতম নায়ক দুকড়ি দত্ত সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী এবং ইংরেজের সহযোগী ও কৃপাধন্য তৎকালীন কলকাতার একজন ধনাঢ্য বাবু। যিনি শোষণের পয়সায় ফুর্তি করেন মেয়েমানুষ ও মোসাহেব নিয়ে দিন কাটান—অর্থাৎ আর দশটা ছলেবলে কৌশলে বিত্তবান হওয়া খেতাবধারী ভূস্বামীর যতগুলি গুণ আছে সবই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। যে গুণপনার পেছনে রয়েছে মহামান্য বৃটিশ সরকারের পূর্ণ মানসিকতা। সেই দুকড়ি দত্তের দুটি যমজ সন্তান দুই রূপে জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে রাজনীতি বা দেশসেবার নামে বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মকান্ডে অবতীর্ণ হয়। তাদের পিতা জমিদারী এবং ব্যবসার মাধ্যমে দেশটাকে শুষে নিয়েছে। দুই পুত্র সেই পথ অনুসরণ করেই (শুধু মুখোস আলাদা) গোটা দেশটাকে নিজেদের জমিদারী এবং রাজনীতিকে নবরূপে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হিসেবে রূপান্তরিত করে নিল। এদেশে শোষণ এবং স্বার্থ সঞ্চয়ের যে প্রবাহমান রক্তধারাটি ছিল বংশপরম্পরায় এরা যেন তারই পরিপূরক প্রতীক। এ নাটকে নতুন পরিবেশে নতুন কায়দায় সেই অবাধ বহমান স্রোতকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। শেষে মহিষাসুরের এক ফোঁটা রক্ত থেকে যে অজস্র অসুরের জন্ম হয়েছিল এ নাটকে তারই রক্তবীজের তরঙ্গলীলা এবং অশুভ পরিণামের কথা বলা হয়েছে।

এর কাহিনী রচনার জন্য নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা', প্রমথ চৌধুরীর গল্প 'রাম ও শ্যাম', বিনয় ঘোষের সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', ডবলিউ সি ব্যানার্জির 'ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান পলিটিকস, এবং সেকালের নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে তার মালমশলা সংগ্রহ করেছেন।

এতে অন্যদিকে আছে বৃটিশ কূটনীতির প্রকাশ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবার স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাকে নির্মূল করার ষড়যন্ত্রের মূল সূত্র এবং সেকালে চারিত্রিক রূপান্তকরণের অন্তরালের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

সেদিক থেকে এমন একটি প্রচেষ্টাকে নাট্যে উপস্থাপন ও তার প্রয়োগ দুরূহ ঠিকই। কিন্তু থিয়েটার কমিউন তা বিস্ময়করভাবে পেরে গেছে।

নাটকটি আগাগোড়াই হালকা চালে পরিবেশিত। মেজাজে হালকা হলেও নাট্যরস কোথাও ব্যাহত হয়নি। বরং স্থানে স্থানে একদিকে যেমন সিরিয়স হয়ে উঠেছে নাটক তেমনি অন্যদিকে উপভোগ্য হয়েছে উঠেছে।

নাটকের প্রথমাংশে দুকড়ি দত্তই সব। তার মেজাজ, তার মোসাহেব পরিবেষ্টিত দৈনন্দিন জীবন, সাম্রাজ্য শাসনের ভূমিকা, অর্থনৈতিক বনেদীয়ানার ক্ষেত্রে বেষারেষির রূপ ইত্যাদি নানা মানসিকতা ও পরিবেশের মাধ্যমে বিধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়াংশের পাদপ্রদীপের নায়ক বলা যায় তার দুই সন্তান রাম ও শ্যাম। এই অংশে তাদের স্বদেশী আন্দোলনের দিকে ঝোঁকায় বাহির ও ভিতরের রহস্য, জনতার ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তারে টেকনিক(!) দলকে নিজেদের মতানুযায়ী চালিত করার চাতুরী, দুই ভায়ের ঘরে এক বাইরে বিপরীত ভূমিকার অভিনয়, মাঝে কিছুকাল আত্মগোপন করে ফিরে এসে অবিসংবাদী নেতা সাজা এবং এই সব কিছুর পিছনে পিতার সঙ্গে তাদের গোপন বোঝাপড়া—অর্থাৎ তারা যে আসলে পিতারই অনুসারী (তবে অন্যরূপে) তারই প্রকাশ, পরে রাজনীতি ক্ষেত্রে ডিকটেটরী ইত্যাদি দৃশ্যে দৃশ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অভিনয়ে যিনি একাই মাত করে দিয়েছেন তিনি দুকড়ি দত্তরূপী সুব্রত ভট্টাচার্য। না দেখলে বিশ্বাস হবে না যে তিনি কি স্বচ্ছন্দ এবং অবাককরা অভিনয় করেছেন। যেমন দুরূহ তেমনি পরিশ্রমসাপেক্ষ এঁর ভূমিকাটি। তাঁকে প্রায় দেড় দুই ঘন্টা মঞ্চে উপস্থাপিত করা বড় কম কথা নয়। তার কয়েকটি দৃশ্যের অভিনয়ের যেন তুলনাই হয় না।

এর পরেই নাম করতে হয় তন্ময় সেন, দেবব্রত দাশগুপ্ত ও নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের (নাটকের পরিচালক)। এমন স্বচ্ছন্দে এবং প্রাণবন্ত অভিনয় সহসা মঞ্চে দেখা যায় না।

রাম ও শ্যামের (যথাক্রমে মানস ভট্টাচার্য ও খোকন মজুমদার) মুখে প্রচুর সংলাপ সত্ত্বেও ভূমিকাদুটিকে অনেকটা বাস্তব করে তুলেছেন অভিনেতারা।

হরি চরিত্রে চন্দন সেনগুপ্তের অভিনয়ও দর্শককে অবাক করেছে। চরিত্রটি যেন তাঁরই বলে মনে হয়েছে। তাঁর মুখে শ্রীঅরবিন্দর কথা বড় সুন্দর লেগেছে। অমিতাভ মিত্র, বিশ্বজিৎ বোস, গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও অমিত মিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এ নাটকের আর একটি বড় সম্পদ এর গান (সুর ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য)। যেমন মনমাতানো সুর তেমনি কন্ঠদান (গেয়েছেন গণেশ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, দেবল সেনগুপ্ত, চন্দন সেনগুপ্ত, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খোকন মজুমদার, বিশ্বজিৎ বোস ও দেবব্রত দাশগুপ্ত)। মুক্তকন্ঠে স্বীকার করছি অপেশাদারী নাটকের ক্ষেত্রে মঞ্চে এমন সুরেলা গান বড়একটা শোনার সৌভাগ্য হয় না।

মঞ্চ (দেবাশিষ মজুমদার) সম্পর্কেও সেই কথা বলা যায়। কণিষ্ক সেনের আলো নাটককে বেগবান করেছে। শ্রীপতি দাসের শব্দপ্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নাটকের দৃশ্যকে এফেকটিভ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

অর্থাৎ টোটাল টিম ওয়ার্কই 'স্বদেশী নকসা' নাটকটি সার্থক হবার মূল কারণ। কয়েকটি দৃশ্যে মাইম ও ফ্রিজের প্রয়োগও সুন্দর।

নাটকটি বৃহত্তর দর্শককুলকে আকর্ষণ করুক, এই আশা অবশ্যই করবো।

নাট্য সমালোচক

গান্ধর্বী

॥ রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষায়তন ॥

গান্ধর্বীর যুগপূর্তিকে স্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পাঁচটি বৃত্তি দেওয়া হবে। সর্বোচ্চ বৃত্তির মূল্য মাসিক ৪০ টাকা। ছয়মাস গান্ধর্বীতে শিক্ষা গ্রহণের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরাই এই বৃত্তি লাভের যোগ্য হবে। বৃত্তি গ্রহণেচ্ছুক শিক্ষার্থীদের আবেদন ৩১শে মে পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। আবেদনপত্র এবং নিয়মাবলী গান্ধর্বীর নিম্নোক্ত দুই কার্যালয়ে শনিবার বিকেল ৪—৮টা এবং রবিবার সকাল ৮—১১টার মধ্যে পাওয়া যাবে।

প্রধান কার্যালয় ॥ ১২ লেক এভিনিউ, কলিকাতা—২৬

উত্তর কলিকাতা শাখা ॥ ৫ বিধান সরণী; দ্বিতল, ঠনঠনিয়া কলিকাতা—৬

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

বুক ভরা লোম আর মুখ ভরা কথা নিয়ে কবির বেদী এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন মন্দ নয়। বৌকে বোধ হয় ভুলেই মেরে দিয়েছেন। উনি অবশ্য জীবনের সারকথা জেনে ফেলেছেন এরই মধ্যে বুঝেছেন 'এ জীবনে কেউ কারও নয়, সবই মায়া মাত্র।' হক কথা বটে। (আই এস জোহর, মনে মনে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন নিশ্চয়ই।)

তাইতো বৌকে ছেড়ে এখন সে বিদেশী ললনার দিকে হাত বাড়াতে চাইছে। কিছুদিন আগে কবির বেদী গিয়েছিলেন রোমে শুটিং করতে। ছবিটাও বিদেশী, নায়িকা বিদেশিনীতো বটেই। নাম ক্যারল অন্দ্রে। ছবির নায়ক যখন কবির সুতরাং নায়িকার সঙ্গে কিছু ফ্লিটিনেস না করলেতো নায়কের ইমেজ থাকে না। কবির এ সুযোগ মুহূর্তের জন্যও ছাড়েন নি। সময়ে অসময়ে নায়িকার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু কপাল মন্দ! খুব একটা এগোতে পারেন নি। ফরাসী মেয়ে দেখে যতখানি দরাজ ভেবেছিলেন তাঁকে, ঠিক সেই ধরনের মেয়ে নয় ক্যারল। কটা চোখ আর ছ' ফুট লম্বা হলেইতো ফরাসী হওয়া যায় না—এ সত্যটা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন কবির। যাই হোক হোঁচট খেয়ে বেশ জবর শিক্ষাটি পেয়েছেন তিনি। আমার মনে হয় তিনি ভালবাসা করতে গিয়েছিলেন খাঁটি ইণ্ডিয়ান স্টাইলে—একটু রয়ে সয়ে আর কি। মানে প্রেম করতে গিয়েছিলেন বোধ হয়। জাতে ফরাসী তায় অভিনেত্রী, সুতরাং প্রেমের প্যানপ্যানানি তাঁর ভালো লাগবে কেন। ক্যারল হয়তো ইনস্টাণ্ট প্রেমে বিশ্বাস করেন।

সুতরাং কবিরের সব চেষ্টাই মাঠে মারা গেল এবার। সেই জন্যই বুঝি তিনি এখন বলে বেড়াচ্ছেন—'আরেকবার যদি ইন্টারন্যাশনাল কোনো আর্টিস্টকে পাই এই বুকের মধ্যে, সহজে ছাড়বো না।' সারা ছবিতে কয়েক শ ফুট চুমটুমু খেয়েও নায়িকা যে এভাবে কব্জা খুলে পালিয়ে যাবে এটা কবিরের কাছে অপমানের সমান। সুতরাং বম্বে ফিরে তিনি উল্টো গাইছেন। বলছেন—আমার মতো সৌভাগ্য কজনের হয়েছে বলুন তো? কোস্টার হিসেবে পেয়েছি অ্যাডলফ সিল্ল, ফিলিপ লিরয়, হানস কাননবার্গের মতো শিল্পী ডঃ ক্রিভার্গের মেক-আপম্যান 'ওয়ার্টারলু'-র ফাইট কম্পোজার ক্রিওপেট্রার আর্ট ডিরেকটর আরও কতজন! কিন্তু সব পেয়েও ক্যারলকে তো পাওয়া গেল না।

*

ভিনি-ভিডি-ভিসি কথাগুলো ভিলেন রণজিৎ সম্পর্কে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। প্রণ প্রেম চোপরা আজ যেখানে বহু দিনের কসরৎ-এর পর আসতে পেরেছে রণজিৎ মাত্র দু বছরের মধ্যে সেখানে। আসলে রণজিৎ তো আসল 'ভিলেন'। কি পর্দায় বা পর্দার বাইরে ভিলেন রণজিৎ সর্বত্রই ভিলেনরূপী। পরিচালকের নির্দেশমত ক্যামেরার সামনে ঝাপটা-ঝাপটিতে সে যেমন পারদর্শী ক্যামেরার বাইরেও কম নয়। নায়িকাদের পেছনে লাগতে সর্বদাই সে উদগ্রীব।

তবে সম্প্রতি একটা জব্বর কাজ করেছে সে। একবারে জন্মদিনের পোশাকে নেমেছে পর্দায় 'আদম খান' ছবির জন্য প্রায় আটশ ফুটের এক দৃশ্যে সে অভিনয় করেছে উলংগ হয়ে। সেট থেকে কাউকেই সে বের করে দেয় নি—এমন কি লাইটম্যানও পর্যন্ত ছিল সেটে। ছবিটা অবশ্য এক তান্ত্রিকের। উদাম হয়ে কাজ করতে লজ্জা-ফজ্জা সে পায়নি। উল্টে বলছে—লজ্জা কিসের? সবাই কি জানে না প্যান্টের নীচে কি থাকে, আমার তো আর আলাদা কিছু নেই।' 'সাম সিদ্ধার্থ' ছবিতে নগ্ন হয়ে অভিনয় করার পর যে কথা বলত রণজিতের মুখেও আজ সেই একই কথা শোনা যাচ্ছে, বলছে ভারতীয় পুরুষরা বড় লাজুক শেবার ঘরেই খালি জামা কাপড় ছাড়তে পারে, আর কোথাও নয়। আসলে দেখবার মত ফিগারই(?) নেই কারও। আমার ফিগার(?) আছে দেখবার মতো সাহস আছে ন্যাংটো হবার। তাই হয়েছি।'

রণজিতের এই নতুন রূপ দেখে অনেক নায়িকাই তার সঙ্গে কাজ করতে চাইছে। কেউ কেউ আবার একটু ফিস ফিস করে বলছে—'আমার সামনে ন্যাংটো হয় হোক কিন্তু সবার সামনে তাই বলে!'

রণজিৎ অবশ্য এতখানি সাহসী ছিল না প্রথমটায়। রেপ সিন-টিন করতে গিয়ে বেশ মুশকিলে পড়ত। খুব নার্ভাস হয়ে যেত। আবার কখনও উত্তেজিতও হয়ে পড়ত। প্রথম প্রথম তো বেশ হুঁশিয়ার নামত রেপ করতে। নইলে উত্তেজনার মাথায় কখন কি ঘটে যায়!

এখন সে পাকপোক্ত খেলোয়াড় হয়ে গেছে। যৌবনের উত্তেজনা এখন তার আয়ত্তে। রেপ সিন করতে এখন আর হুঁশিয়ার হয়ে নামতে হয় না। অনায়াসে ঝাপটা-ঝাপটি করতে পারে মেয়েদের সঙ্গে। উত্তেজনা বাড়লে নায়িকাকে অবশ্য ক্যামেরার বাইরে নিয়ে যেতে অসুবিধে হয় না তার। তারপর তো সবই ঠাণ্ডা!

•

রাজেশ খান্না ডিম্পলকে কবে প্রথম বিয়ের কথা পেড়েছিল জানেন, কবে প্রথম চুমু খেয়েছিল এবং কোথায়—তা বোধহয় জানা নেই আপনাদের।

তাহলে বলি শুনুন। সেই ছোটবেলা থেকেই তো রাজেশ চিনত ডিম্পলকে। ওর বাবার সঙ্গে একাধিকবার দেখেছে তাকে রাজেশ। কিন্তু পুঁচকে বাচ্চার দিকে তখন সে নজরই দেয়নি। বহুদিন পেরিয়েছে। দেখা হয়নি দুজনের বহুদিন।

হঠাৎ আবার দেখা এক পার্টিতে। তখন ডিম্পল রূপে-রসে বর্ণে একেবারে ভরপুর। রাজেশ আর চোখ ফেরাতে পারে না। অন্যের সঙ্গে তখন ঘরোয়া প্রেম চললেও মানসিকভাবে বেশ ডিপ্রেসড রাজেশ। সেই প্রথম দেখেই বুঝি প্রেমে পড়ে গিয়েছিল রাজেশ। সেই পার্টিতে কোনো কথাবার্তা হয়নি দুজনের। নীরবে চার চোখ আর দুটি মনের জানাজানি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে 'কাব' ছবিতে কাজ করে ডিম্পল প্রায় স্টার হতে চলেছে।

রাজেশ তো ডিম্পলকে পাবার জন্য আঁকুপাঁকু করছেন সুযোগ মেলে না মেলে না করতে করতে মিলে গেল হঠাৎ। আমেদাবাদে 'চিত্রলোক' পুরস্কার নেবার জন্য বম্বে ফিল্মের বহু লোক যাচ্ছিল একই প্লেনে। রাজেশ ছিল ডিম্পল ছিল সঙ্গে ছিলেন বাবা। যাবার পথে উত্তেজনায় রাজেশ থরথর করে প্রায় কেঁপেছে। পুরস্কার নেবার সময় মঞ্চে উঠতে দর্শকরা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেছিল—কবে বিয়ে করছেন? জবাবে রাজেশ প্রশ্ন নিজের অজান্তেই বলে ফেলেছিল—'বম্বে

বেনারসী • সিল্ক
ভাঁত • গোষাক
রত্নদীপ
৭৩, জি.টি.রোড, সাউথ, হাওড়া
ফোন: ৬৭-৫৩২৫

বেনারসী শাড়ী
১০% বাদ
কিছু জামা কাপড়ে
২৫% পর্যন্ত বাদ
হরলালকা
• ৫২।১।১, কলেজ স্ট্রীট
শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়
YMCA বিল্ডিং কলেজ স্ট্রীট

ীর বেদি

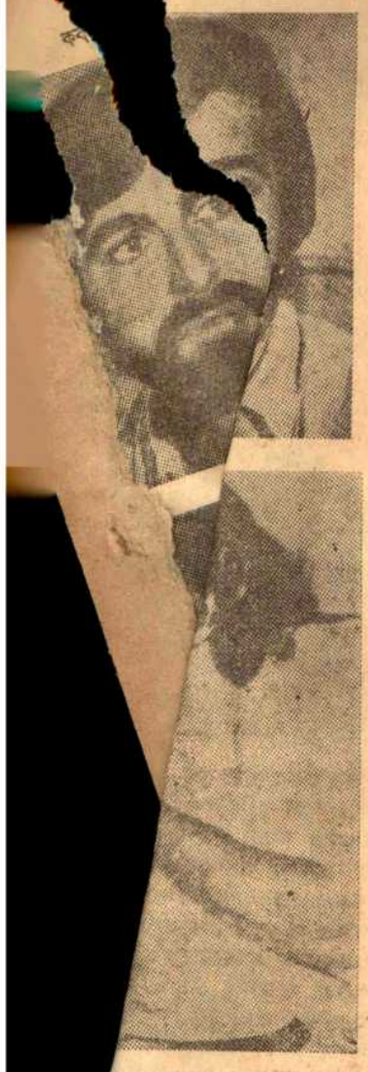

রণজিৎ

আমেদাবাদের মেয়েকেই বিয়ে
র কাউকে নয়। প্রসঙ্গতঃ বলি
মেদাবাদেরই মেয়ে।
ন্ত নাটকের গন্ধ পাচ্ছেন না
পারছি। আসুন এবার আসলে।
ন। আমেদাবাদ থেকে একই
ছে সকলে বম্বেতে। কায়দা
শ করল কি—ডিম্পলের পাশের
য়ে বসে পড়ল। (ডিম্পলও
টি চাইছিল) কয়েক হাজার
প্লেন। হঠাৎ ডিম্পল রাজেশকে
ম একটু ককপিটে যাব। প্লেন
চালায় দেখব। নিয়ে যাবেন?'
পারলে এক পায়ে রাজী।
জ্ঞাপনের মতো হাসি হাসি
রাজেশ মুহূর্তে রাজী।
র পথে পেছনের পর্দার
পলকে পেয়েই রাজেশ আর

কায় ডিম্পলকে কাছে টেনে
নিক্ষেপ করল ডিম্পলের
ককপিটে যাবার আগেই

প্রায় প্রেমের স্বর্গে পৌঁছল দুজনে। বিয়ের প্রস্তাবও দিল রাজেশ কানে কানে। ডিম্পল তখন প্রেমের ছোঁয়ায় লালে লাল। কোনো কথা নেই মুখে শুধু প্রেম। রাজেশও ভুলে গেছে হাজার ফুট নীচে কয়েকশ মাইল দূরে অঞ্জু তখন প্রেমের শয্যা পেতে অপেক্ষা করছে তাঁরই জন্য। এর পরের ইতিহাসতো আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে।

*

অমিতাভ বচ্চন। এই নামটা এখন বম্বের অনেক প্রোডিউসার জপের মালার মত। 'দিওয়ার' ও 'জমীর' হিট করার পর অমিতাভ এখন অপুলারিটি গ্রাফে বুঝি সবার ওপরে। অথচ আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না 'বম্বে টকি' ছবিতে একটা সিনে প্রায় একসট্রা হিসাবে কাজ করার জন্যও তাঁকে কম ঘুরতে হয়নি। শশীকাপুর ছিল সেই ছবির নায়ক। একটা মড়া পোড়ানের দৃশ্যে তাঁকে রাখা হয়েছিল একসট্রাদের দলে। আর আজ সেই শশী কাপুরের সঙ্গে অভিনয় করে 'দিওয়ার' ছবিতে তাঁকে একেবারে কোণঠাসা করেছে সেই একসট্রা বন্ধু অমিতাভ বচ্চন। শুধুমাত্র প্রফেশনাল সবাইকে বলি কেন, হোমফ্রন্টেও তার আজ প্রায় একাধিপত্য। জয়া ভাদুড়ীকে নিয়ে সুখের সংসার তার এখন জমজমাট।

কিন্তু পপুলারিটির সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ম স্টারদের যে বদগুণটা আসে তা থেকে নাকি অমিতাভ বাদ যায়নি। স্টার ইমেজ তৈরীর পক্ষে এই বদগুণটা নাকি মোটেই বদ নয় সৎগুণ। গুণটা হচ্ছে একটু-আধটু বুকনি মারা আর ঠিক সময়ে সেটে না গিয়ে প্রোডিউসারদের নাজেহাল করা। পরিচালক অরবিন্দ সেন তো ওর ওপর রেগে একেবারে কাঁই। 'সসেউটি' ছবির সময় কম ভোগায়নি তাঁকে। ছবিটা তেমন হিট না হওয়ার জন্য অরবিন্দবাবু এখন অমিতাভকেই দায়ী করছেন।

লোকে যাই বলুক—অমিতাভ সম্পর্কে কিন্তু আমার অভিমত অন্যরকম। চামচাদের একদম সহ্য করতে পারে না, চামচা তার নেইও। কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে। প্রশংসা অসহনীয়। ছবি ভালো হলে বলে—সব ক্রেডিট পরিচালকের আমিতো তাঁর কথামত কাজ করেছি শুধু। তার এই বিনয় কতখানি আন্তরিক সেটা অবশ্য আমার জানা নেই, কিন্তু কলকাতার কিছু সাংবাদিক বন্ধুর কাছে শুনেছি অমিতাভ কলকাতায় গেলে নাকি সবার সঙ্গে দেখা করে। কুশল সংবাদাদি নেয়।

একটা ব্যাপারে অমিতাভ অবশ্য খুব গোঁয়ার বলা যায়। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ নাক গলাক সেটা সে কখনই বরদাস্ত করে না। বন্ধু বা যত ঘনিষ্ঠ লোকই হোক না কাউকেই সে এব্যাপারে সহ্য করতে পারে না। শোনা যায় জয়া-অমিতাভর কি একটা ব্যাপারে মা তেজি বচ্চন কিছু বলতে গিয়েছিলেন বলেই নাকি আজ তাঁকে বম্বে ছেড়ে দিল্লীবাসী হতে হয়েছে। জয়ারও অবশ্য এতে সায় ছিল। যাই হোক অমিতাভ আজ খ্যাতির চূড়োয় উঠে ফেলে আসা কষ্টের দিন আর দুঃখের বন্ধুদের ভুলতে পারেনি এটাই তার মহত্ব। বদগুণ সদগুণ যাই থাক বা না থাক, অমিতাভ যে একজন শিল্পী সেটারই পরিচয় আজ বড় কথা। —অভিজিৎ

ভাণ্ডার পড়ুন

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র 'ভাণ্ডারে'র রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় লিখেছেন :—

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বনফুল

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগোপাল হালদার

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচী এবং আরও অনেকে।

এ ছাড়া নিয়মিত বিভাগ, আলোর সন্ধান, অতীতের পাতা থেকে ইত্যাদি থাকবে।

ভাণ্ডার প্রচারের অন্যতম বলিষ্ঠ মাধ্যম।

সম্পাদক : শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে ২৩-এ নেতাজী সুভাস রোড, (অষ্টমতল), কলিকাতা-৭০০০০৯ থেকে ভাণ্ডারের প্রকাশক শ্রীঅনিমেশরঞ্জন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

30 APR 1975
CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ডালেনা

গ্রামোফোন কোম্পানীর বসন্ত বন্দনা

এবার গ্রামোফোন কোম্পানীর বসন্ত বন্দনা সিরিজের বিশেষ অবদান হোলো একটি সুপার সেভেন ডিস্কে ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের দুখানি গান। 'মহুয়া বনের বনপাপিয়া', 'ফুল ফাগুনের এলো মরশুম' 'বেদিয়া বেদেনী ছুটে আয়', 'এ বাসি বাসরে' 'থৈ থৈ জলে ভেসে গেছে ঐ' এবং 'আমি কুল ছেড়ে চললাম'—গানগুলিতে ছন্দ ও সুরের অপরূপ মিলন-সুষমায় রোমান্টিক নজরুলের রঙিন রূপটি যেন মন ভরে দেয়। শ্রীমতী মুখার্জির মুক্ত ও পরিশীলিত কণ্ঠে ও ভাববিভোরতায় প্রতিটি গান রসোত্তীর্ণ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি ডিস্কের প্রধান আকর্ষণ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোরা সর্বাধিকারীর চারটি গানের একটি ই পি ডিস্ক। কণিকার আত্মলীন ভঙ্গিতে গাওয়া 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি' ও 'শেষ নাহি যে'—বারবার শুনেও আশ মেটে না।

গোরা সর্বাধিকারী রসিকসমাজে নিজের জায়গা অনেক আগেই করে নিয়েছেন। এবারের গাওয়া 'কবে আমি বাহির হলেম' ও 'তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে' গানদুটি তাঁর প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করে তুলবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সেরা আকর্ষণের আর একটি ডিস্কে শোনা যাবে জনপ্রিয় তরুণ শিল্পীদ্বয় বাণী ঠাকুর, অর্ঘ্য সেন ও গীতা ঘটকের কণ্ঠে দুটি করে ছটি রবীন্দ্রসঙ্গীত।

। ই পি ডিস্কে ইলা বোসের চারখানি নজরুল গীতিতে তাঁর ক্ল্যাসিক্যাল গান চর্চার নিদর্শন মেলে। গজলের চটুল ভবপ্রবণতা 'তোমার আঁখির কসম সখি' ও সুরের গাম্ভীর্যভরা 'নদীর নাম সই অঞ্জনা'—রসবৈচিত্র্যের স্বাদ সৃষ্টি করেছে।

বাংলা গানের অন্যান্য ধারাগুলিকে মেলে ধরা হয়েছে দুটি ই-পিতে—একটিতে ডি এল রায়ের গান শুনিয়েছেন—শর্বানী সেন। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্দনা সিংহ। অন্যটিতে অতুলপ্রসাদের গান শোনা যাবে পরিণতমনা ও নবীনা শিল্পী শ্যামলী সেনের কণ্ঠে। শিল্পীরা সকলেই সুপরিচিত—এঁদের গাওনা গানগুলির রসমূল্যও অনস্বীকার্য। গানগুলি হোলো 'হীরা কি আঁধার' ও গগনভূষণ তুমি' (সর্বানী সেন) 'আমি চেয়ে থাকি' ও 'আমায় মলয় বাতাসে' (রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়) 'এসো প্রাণসখা' ও 'এসো এসো বধূ' (বন্দনা সিংহ) গানগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোহর সঙ্গীত মানসটির দেখা মেলে। দিলীপ রায়ের গাওয়া 'গগনভূষণ'কে নূতন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হোলো শর্বানী সেনের কণ্ঠে। 'করুণ সুরে ওকে' 'এ মধুর রাতে' (শিখা বসু) ও 'দিয়েছিলে যাহা' ও 'মানুষ যখন চায় আমারে'—(শ্যামলী সেন) গানে অতুলপ্রসাদের কান্তকোমল ছবিটি ফুটে উঠেছে।

জার্মানীর আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীতের প্রতিযোগিতায় সুবর্ণ পদকপ্রাপ্ত আর্য চৌধুরী সঙ্গীতমহলে সুপরিচিত। এঁর সঙ্গে জনসাধারণের ব্যাপক পরিচয় ঘটবে এবারের ই-পি ডিস্কে গাওয়া তাঁর চারখানি উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে—'ভাওয়াইয়া', 'থুকনী', 'অলকাপ' ও 'গম্ভীরা'। গানের তথ্যমূল্যও প্রচুর। আর দুটি চিত্তাকর্ষক ডিস্ক ডি বালসারা পরিচালিত 'মেলডিস অফ গ্লোরী'—অর্কেস্ট্রা।

ডঃ অঞ্জলি মু

এতে শোনা য
সুর 'বলো বকে
জাহাসে আচ্ছা
আনসান' ও
অন্য ডিস্কে আ
গীটার ও ওয়াই এ
একর্ডিয়ানে যথাক্রমে
বাংলার অর্কেস্ট্রার গে
অর্কেস্ট্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত
মাধুর্য মুগ্ধ করবার ম
গুপ্ত তাঁর দায়িত্ব সুস
আধুনিক গানে ভি
যথাযথ রূপ দিয়েছেন
তাঁর দুটি গানে। অভি
কথা ও সুরে দুটি সু
স্বপ্না ঘোষাল।

নচিকেতা ঘোষের
ধরচৌধুরী ও কৌশিক
শুনতে খুব ভালো লা
'জে-পি-ডি-ডি' কে
তুলেছেন সুশীল চক্র
গাঙ্গুলী।

ভাস্কর বসুর রচনা
পাধ্যায়ের সুরসংযোজনা
ছোটদের অফুরন্ত আন
উঠবে। লোভনীয় শিল্প
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (
গুপ্ত (কুমীর), ইপ্প
মুখোপাধ্যায় নবনালা
এবং আরো অনেক শি

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ম ছবিতে আরতি ভট্টাচার্য।

ফটো : অমৃত

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

AMRITA

30 APR 1975

Friday

Phon

শতবর্ষেরও বেশী সবার প্রিয়
নিপুণা গৃহিণীর চাই-ই চাই

কুকমী

গুঁড়ে
মশ

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-০৯৯৫,
ফ্যাক্টরী—কাশীপুর